



ভারতবর্ষ



পৌষ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

দুঃখ-জয় ও অমৃতত্ব

শ্রীঅনিলবরণ রায়

শক্নোতি ইহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ ॥
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥

যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ ইহ এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ সোঢ়ুং শক্নোতি সঃ যুক্তঃ, সঃ সুখী নরঃ।

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহলোকেই কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী মানব।

বাহ্য বিষয় সুখের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মানুষ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু শুধু ইহার দ্বারাই উচ্চতর আধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যায় না। দুঃখের ভয়ে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া তামসিকতা, তাহার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। শান্তভাবে, অনাসক্তভাবে সংসারের সকল সুখদুঃখের স্পর্শ গ্রহণ করিবার শক্তি চাই, গীতার মতে এই সমতাই হইতেছে প্রকৃত অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি। ইন্দ্রিয়সকলের ভিতর দিয়া আমাদের মন জগৎকে যেভাবে দেখে, গ্রহণ করে—সেইটিই হইতেছে আমাদের সাধারণ মানবজীবন—তাহার স্বরূপই হইতেছে সুখদুঃখ, শুভ-অশুভ, জন্মমৃত্যুর দ্বন্দ্বে পূর্ণ। এই দ্বন্দ্বময় জীবনেই আমাদের অন্তরাত্মা আনন্দ পাইলেও এইটিই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বা চরম সম্ভাবনা নহে—আমাদের যাহা প্রকৃত জীবন তাহার ভিত্তি রহিয়াছে ভিতরে—বাহিরে নহে, নেদং যদিদমুপাসতে। সংসারে জরা-মরণ-মৃত্যু-দুঃখ দেখিয়া মানুষ যদি এই বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণ হয়, ভিতরের দিকে বিতৃষ্ণ হয়, ভিতরের দিকে ফিরিতে পারে—তাহা হইলে এইরূপ তামসিকতাও অধ্যাত্ম জীবনের সূচনারূপে বিশেষ সহায়প্রদ হইতে পারে—সেই জন্য গীতা ইহারও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (১৩।৮)। এই ভাবে বুদ্ধের সাধনার সূচনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তবে এইরূপ সংসারত্যাগ যে করিতেই হইবে এমনও কোন কথা নাই—সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়াও মানুষ সংসারে থাকিয়াই (ইহৈব) তাহাকে

করিবার প্রয়াস করিতে পারে এবং গীতার মতে প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধনার আরম্ভ হইতেছে এইখানে, সংসারের সকল সুখদুঃখ, সকল বেগকে সমানভাবে সহ্য করিতে অভ্যাস করা। সংসারের সকল দুঃখ ও কষ্ট হইতে সরিবার একটা প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, বস্তুত ইহা হইতেছে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, উপনিষদের ভাষায় জুগুপ্সা। অন্য দিকে সকল বাধা, সকল দুঃখকে জয় করিবারও প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, এইটিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তির পথ, সিদ্ধির পথ—গীতা অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবৃত্তিটিকেই উৎসাহিত করিয়াছে, কামক্রোধকে জয় কর, সুখদুঃখ সমানভাবে সহ্য কর—ইহাই মুক্তির পন্থা।

কিন্তু মানুষ কি ইচ্ছা করিলেই সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করিতে পারে; সুখের প্রতি কামনা, দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে পারে? প্রথমেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির বিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সুখদুঃখের দ্বারা কামক্রোধের দ্বারা আমাদের জীবনের কতকগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। তাই সেগুলি রহিয়াছে—কিন্তু এ-সব আদৌ নিত্যবস্তু নহে, অবশ্যম্ভাবীও নহে। কোন বাহ্য স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে আমরা বাধ্য নই, তেমনই কোন স্পর্শে দুঃখ অনুভব করিতেও আমরা বাধ্য নই—কেবল অভ্যাসের বশেই আমরা কোন জিনিষে সুখ, কোন জিনিষে দুঃখ অনুভব করি—এই অভ্যাস বর্জ্জন করা যায়, এমন কি যেখানে আগে সুখ পাইতাম তাহাতেই দুঃখ পাইতে পারি, যাহা হইতে দুঃখ পাইতাম তাহা হইতেই সুখ পাইতে পারি। আবার আমাদের অন্তরে আনন্দময় আত্মা যে সংসারের সব কিছুর স্পর্শেই আনন্দ উপভোগ করে, আমাদের বাহ্য চৈতন্যকেও তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া সব কিছুতেই সমান আনন্দ লাভ করিতে পারি—আর এইটি হইতেছে সমতা অপেক্ষাও বড় জয়, কারণ ইহার দ্বারা আমরা সুখদুঃখকে কেবল সহ্য করি না, পরন্তু তাহারা যে আনন্দের অপূর্ণ রূপ ও বিকৃতি সেই আনন্দই আমরা লাভ করি।

সুখ দুঃখ যে অবশ্যম্ভাবী নহে, সুখই দুঃখ হয়, আবার দুঃখই সুখ হয়—মনের জিনিষে ইহা সহজেই বুঝা যায়—জয়-পরাজয়, মান-অপমানে আমরা সাধারণত বিচলিত হই, কিন্তু অভ্যাস করিলে এই দুইটিই আমরা সমানভাবে অগ্রাহ্য করিতে পারি। কিন্তু শরীরের ব্যাপারে এইরূপ করা তত সহজ নহে, প্রাণের ব্যাপারেও নহে—কাম, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে আমাদের হৃৎপিণ্ড দ্রুত তালে নাচিয়া ওঠে, সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, এ-সব যেন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। চিনি যেমন মিষ্ট লাগিবেই, তেমনই আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় পুরুষের কাছে অপমান, অশুভ, পরাজয়—এ-সব দুঃখ উৎপাদন করিতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের মনে এরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই, পরাজয়, অপমান, ক্ষতি—এ-সবই সে উদাসীন-ভাবে গ্রহণ করিতে পারে; এমন কি, এ-সবকেও সে পূর্ণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। তাই মানুষ দেখি—সে যত দেহ, প্রাণের প্রতিক্রিয়াস্তে সায় দিতে অসম্মত হয়, সে-সবের বশে পরিচালিত হইতে না চায়, ততই সে অধিকারমুক্ত হয়। এই ভাবে মানুষ সংসারের সকল আঘাতের উপর জয়ী হইতে পারে, তাহাকে আর বাহ্য স্পর্শের অধীন থাকিতে হয় না।

শরীরের ব্যাপারে ইহা সিদ্ধ করিয়া তোলা কঠিন, বাহ্যস্পর্শের বশে চালিত হওয়া শরীরের অলঙ্ঘ্য ধার বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এখানেও আমরা একই সত্যের ইঙ্গিত পাই। এখন আমার শরীর যাহাতে কষ্ট পাইতেছে, অভ্যাসের দ্বারা তাহাতেই সুখ পাইতে পারে। এক ব্যক্তি যাহাতে কষ্ট পায় আর এক ব্যক্তি তাহাতে আরাম পায়। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে শরীরের যন্ত্রণা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতি থাকে না—অন্য সময়ে যে ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, যুদ্ধক্ষেত্রে সেইরূপ একাধিক ক্ষত লইয়াও সৈন্যগণ অম্লানবদনে যুদ্ধ করে, হয়ত শরীরের মধ্যে কত বন্দুকের গুলি প্রবেশ করিয়াছে, যোদ্ধার সেদিকে খেয়ালই থাকে না। সাধারণ জীবনেও দেখা যায়, হয় ত কোন অঙ্গ কাটিয়া গিয়াছে, আমাদের খেয়ালই নাই, কিন্তু যখনই দেখা গেল রক্ত পড়িতেছে, অমনিই পুরাতন অভ্যাসের বশে যাতনা আরম্ভ হইল। কিন্তু এই যে শারীরী-আঘাতে যাতনা-বোধ করার অভ্যাস, ইহা অপরিহার্য্য নহে। কোন ব্যক্তিকে হিপ্‌নোটাইজ্ করিয়া তাহার অঙ্গে সূচ বিদ্ধ করিয়া যদি তাহাকে যন্ত্রণা বোধ করিতে নিষেধ করা যায়—সে যন্ত্রণা বোধ করিবে না, তাহাকে কুইনাইন খাইতে দিয়া

যদি বল—চিনি খাইতেছে, সে সেই কুইনাইন চিনির মত সুখে খাইবে ; আর চিনি দিয়া যদি বল—কুইনাইন, সে মুখ বিকৃত করিয়া "থূ" "থূ" করিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহার ব্যাখ্যা অতি সহজ, হিপ্‌নটিজিমের দ্বারা মানুষের অভ্যস্ত বাহ্য চেতনার ক্রিয়া বন্ধ করা হয়—এই চেতনাতেই মানুষ স্নায়ুমণ্ডলের গতানুগতিক অভ্যাস সকলের দাস হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু তাহার যে আভ্যন্তরীণ মানস-সত্তা তাহা ইচ্ছা করিলে শরীরের ও স্নায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারে—হিপ্‌নটিজিমের দ্বারা বাহ্য চেতনাকে নিদ্রিত করিয়া সেই আভ্যন্তরীণ মানস-সত্তাকে যেমন করিতে বলা হয় সে সেই ভাবেই বাহ্যস্পর্শসকলকে গ্রহণ করিতে পারে—কারণ, সে কোনরূপ অভ্যাসের বশ নহে। আর হিপ্‌নটিজিমের সময় অস্বাভাবিকভাবে আমরা যে সুখ-দুঃখ অনুভবের বশ্যতা হইতে মুক্ত হই, অভ্যাসের দ্বারা, সাধনার দ্বারা সাধারণ জীবনে আমরা নিজেদের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারে অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে, ক্রমশ ঐরূপ শক্তি লাভ করিতে পারি, শরীরের অভ্যস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুখদুঃখ বোধ, কামক্রোধের বেগ—সবকেই জয় করিতে পারি এবং গীতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে। এই ভাবে যে সমতা লাভ করা যায় তাহাতে আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়, আত্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তখন সংসারের সব কিছুতেই পরম অধ্যাত্ম আনন্দ উপভোগ করা যায়, অমৃতমন্ময়তে।

মন ও শরীরের যে কষ্ট ও বেদনা, এটা হইতেছে প্রকৃতির একটা কৌশল। মানুষকে এই ভঙ্গুর শরীর লইয়া যে জগতের মধ্যে বাস করিতে হয় সেখানে তাহাকে অনেক স্পর্শ, অনেক আঘাত গ্রহণ করিতে হয়—যে-সব আঘাতে বিপদ আছে মানুষ যাহাতে সে-সব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে সেই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি মানুষের মধ্যে বেদনা-বোধ দিয়াছে। প্রকৃতির এই প্রবৃত্তিই হইতেছে জুগুপ্সা। মানুষ যতক্ষণ অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে, নিজেকে অহং ভাবের বশে জগতের অন্য সকল বস্তু ও জীব হইতে পৃথক বলিয়া দেখিতেছে এতক্ষণ সে বাহ্যস্পর্শের সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়, কুণ্ঠিত হয়, তাহার নিজের সহিত যাহার সামঞ্জস্য হয় না তাহাকে বর্জ্জন করিতে চায়, নিজের পক্ষে যেটি শুভ বলিয়া মনে হয়, আগ্রহের সহিত সেইটি গ্রহণ করিতে যায়, এই ভাবে রাগ ও দ্বেষ হইতে কাম ও ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয়, আর তাহাদের বশে মানুষ বাহ্যস্পর্শ হইতে সুখ বা দুঃখ পায়। মানুষের মন যতক্ষণ দেহ ও প্রাণের অধীন, ততক্ষণই এ-সবের উপযোগিতা আছে—এই সব অনুভূতি ও বেগের দ্বারাই তাহার জীবন রক্ষা হয়। মন যখন অজ্ঞান ও অহং ভাব হইতে মুক্ত হয়, অন্য সকল বস্তু, সকল শক্তির সহিত নিজের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, তখন আর দুঃখ ও বেদনাবোধের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, সংসারের সব কিছুকেই এক ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলিয়া মুক্তভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে, শুধু নিজের ক্ষুদ্র "আমি"র স্বার্থের কথা না ভাবিয়া প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে যে রস রহিয়াছে (ভগবানই রসরূপে বিরাজ করিতেছেন), তাহাকে ঠিক মত গ্রহণ করিতে পারে—তখন সংসারের এক সুখদুঃখ-অনমুভবতা এক অনির্ব্বচনীয় অসীম আনন্দ-ধারায় পরিণত হয়।

মানবজীবনে যে অশেষ দুঃখ রহিয়াছে, ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন এই সব দুঃখেরই অন্ত হইবে। ইহা সম্ভব, কারণ—সুখ ও দুঃখ দুইই হইতেছে সৃষ্টিতে যে আনন্দ-স্রোত বহিতেছে তাহারই দুইটি ধারা—সুখ হইতেছে ঐ আনন্দেরই একটি অপূর্ণ রূপ এবং দুঃখ হইতেছে উহারই একটি বিকৃত রূপ। এই যে অপূর্ণতা ও বিকৃতি, ইহার কারণ হইতেছে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া—এই অজ্ঞানের বশে মানুষ নিজের আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, জগতের সব কিছুর মূলে যে এক সর্ব্বব্যাপী আত্মা রহিয়াছে, সে আত্মা তাহার নিজেরও আত্মা, তাহা ভুলিয়া সে নিজেকে সংসারের আর সব বস্তু, সব জীব হইতে স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করে এবং বাহ্য জগতের সকল স্পর্শকে উদার ভাবে গ্রহণ না করিয়া সঙ্কীর্ণ অহংভাবের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ-ভাবে গ্রহণ করে। যে-ব্যক্তি সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা অনুভব করে, সে সংসারে সকল বস্তু, সকল স্পর্শের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আনন্দের আস্বাদ পায়, সংস্কৃত ভাষায় এই অন্তর্নিহিত আনন্দকে সাধারণ ভাবে রস নামে অভিহিত করা হয়—সব কিছুর মধ্যে সচ্চিদানন্দ ভগবানই হইতেছেন এই রস, রসো বৈ সঃ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল। বিষয়ের মধ্যে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহা সচ্চিদানন্দ ভগবানেরই বিভূতি ; গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, জলের মধ্যে

আমি, পৃথিবীতে যে পুণ্য গন্ধ তাহাও আমি। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে মূলগত আনন্দ রহিয়াছে তাহা সচ্চিদানন্দেরই আনন্দ—আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা ভগবানেরই স্পর্শ পাই, আনন্দের স্পর্শ পাই—কিন্তু এই আনন্দ সুখদুঃখ, রাগ-দ্বেষে পরিণত হয়, কারণ আমরা এই স্পর্শকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, অজ্ঞান ও অহংভাবের ভিতর দিয়া খণ্ডিত ও বিকৃত করি। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মায়া, অবিদ্যা। বস্তুসকলের মূল সত্তার রসের সন্ধান আমরা করি না, আমরা কেবল দেখি তাহাদের স্পর্শে আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের কি লাভ বা ক্ষতি হইবে, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা-কামনা কতটা পূর্ণ হইবে বা ব্যাহত হইবে—সেই জন্যই রস সুখদুঃখের বিকৃত রূপ গ্রহণ করে। যদি আমরা আমাদের মনে ও হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরহং নিঃস্বার্থ হইতে পারি, রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং আমাদের প্রাণ ও স্নায়ু—মণ্ডলকেও সেইরূপ সমতায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে ক্রমশ ঐ অপূর্ণতা ও বিকৃতিকে দূর করা সম্ভব হয় এবং অখণ্ড আনন্দকে তাহার সকল বৈচিত্র্যে উপভোগ করা আমাদের আয়ত্তাধীন হয়। কাব্য ও চারুকলায় আমরা যে অখণ্ড রস পাই, সুখদুঃখ, সুন্দরভীষণ, পাপপুণ্য, শুভঅশুভ—সবই কাব্যরসের বিচিত্র রূপ বলিয়া অনুভব করি—তাহাতে আমরা কতকটা এই সামর্থ্যেরই পরিচয় পাই। আর ইহার কারণ হইতেছে এই যে, এখানে আমরা অনাসক্ত, নিঃস্বার্থ, নিজেদের শুভাশুভ বা আত্মরক্ষার কথা না ভাবিয়া—বস্তুটি এবং তাহার অন্তর্নিহিত সত্তার কথাই ভাবি। অবশ্য এই যে কাব্যামৃত রসাস্বাদ—ইহা সেই অধ্যাত্ম আনন্দের আস্বাদন হইতে ভিন্ন জিনিষ। কারণ অধ্যাত্ম আনন্দের মধ্যে দুঃখ, ভয়, ঘৃণা, এ সবের স্থান নাই। তবু মুক্ত আত্মা কিরূপে সকল বস্তুর মধ্যেই রস পায়, অহং ভাবের বশে আমরা যেখানে শুধু দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা দেখি তাহার মধ্যেই সুসামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য দেখে তাহার কতকটা আভাস এইখানে পাওয়া যায়। পূর্ণ মুক্তি তখনই আসিবে যখন আমাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সবই আসক্তি হইতে, রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইবে, অথচ সংসারে সব কিছুর সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিবে।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ;

—গীতা ২।৬৪

আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য-শক্তি রহিয়াছে তাহা জগতের স্পর্শসকলকে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারে না, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হয়—ইহাই হইতেছে দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ, আর ইহার মূল হইতেছে অহংভাব হইতে উদ্ভূত অসমতা; আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে সচ্চিদানন্দ ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞান, আমরা অহং ভাব লইয়া সব কিছুকে দেখি, ধরিতে যাই—সেই জন্যই অশেষ দুঃখ পাই। অতএব আমাদের প্রকৃতি হইতে দুঃখকে নির্ম্মূল করিতে হইলে আমাদিগকে জুগুপ্সা বা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির বশে পদে পদে ভীত সঙ্কুচিত না হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তিতিক্ষার দ্বারা সংসারের সকল স্পর্শ, সকল আঘাতকে গ্রহণ করিতে, সহ্য করিতে, জয় করিতে হইবে। এইরূপ সহিষ্ণুতা ও জয়ের দ্বারা আমরা যে সমতা লাভ করিব—তাহার স্বরূপ হইতে পারে সকল স্পর্শের প্রতিই সমান উদাসীনতা, অথবা সকল স্পর্শেই সমান আত্ম-প্রসাদ; আবার এই সমতার ভিতর দিয়াই আমরা ইহার অধ্যাত্ম ভিত্তিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে পারিব, সেই চৈতন্যের স্বরূপই হইতেছে আনন্দ, তাহা আমাদের অহংচৈতন্যের ন্যায় সুখ-দুঃখ ভোগ করে না। এই যে সচ্চিদানন্দ-চৈতন্য, ইহা জগতের উর্দ্ধে, বিশ্বাতীত হইতে পারে—এই উর্দ্ধস্থিত দূরবর্ত্তী আনন্দের মধ্যে যাইবার পথ হইতেছে সংসারের সব কিছুর প্রতি সমান উদাসীনতা; সন্ন্যাসীগণ এই পন্থাই অনুসরণ করেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-চৈতন্যের ঐটিই একমাত্র পদ নহে। উহা একই সঙ্গে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত হইতে পারে, আর এই যে আনন্দ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সব কিছুকে ধরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে উঠিবার পন্থা হইতেছে আত্ম-সমর্পণ, বিশ্বভাবের মধ্যে ক্ষুদ্র অহংভাবের বিলয় এবং সর্ব্বত্র সমান আনন্দের উপলব্ধি। এইটিই ছিল প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের পন্থা; গীতার মধ্যে আমরা এই পন্থারই সন্ধান পাই।

কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিয়া সংসারের সকল স্পর্শ, সকল আঘাতে অবিচলিত থাকিয়া যে সমতা ও অখণ্ড আনন্দলাভ করা যায়, গীতা বলিয়াছে মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রাক্

শরীরবিমোক্ষণাৎ, সেই মুক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে। সন্ন্যাসিগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের মত যতক্ষণ এই দেহ আছে, ততক্ষণ পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নহে। তাঁহারা এই দেহটাকে স্বরূপত অশুচি এবং আত্মার বন্ধনস্বরূপ, কারাগারস্বরূপ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের মতে অবিদ্যা ও অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের সকল দুঃখের মূল, সংসারের মূল—আর এই অশুচি দেহে শুচিতা জ্ঞান হইতেছে ঐ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতার টীকায় বলিয়াছেন, "অশুচি (অপবিত্র) পরমবীভৎস অতিশয় ঘৃণিত যে শরীর তাহাতে শুচিতাজ্ঞান যথা—এই কন্যা অভিনব চন্দ্রলেখার ন্যায় কমনীয়া, ইহার অবয়বগুলি যেন মধু অথবা অমৃতের দ্বারা নির্ম্মিত; যেন এ চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া আসিয়াছে; নীলকমলপত্রের ন্যায় আয়তনয়না এই কন্যা হাবভাবযুক্ত লোচনদ্বয়ে যেন জীবজগতকে আনন্দময় করিতেছে—এই প্রকারে অশুচিতে শুচিতাজ্ঞান হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ?"

বস্তুত শরীরটাকে অধ্যাত্মজীবনের পরম প্রতিবন্ধক-স্বরূপই মনে হয়; শরীরের দাবী মিটাইতে গিয়া মানুষ আত্মার সন্ধান করিতে পারে না, শরীরের স্থূল ভোগের মধ্যে তাহার সূক্ষ্ম কোমল বৃত্তিসকল বিকশিত হইতে পায় না। তাই প্রায় সকল ধর্ম্মই শরীরটাকে অভিশাপ দিয়াছে, মায়াবাদীরা ত ইহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছে, বলিয়াছে—জড় শরীর সত্য নহে, জড় জগৎই সত্য নহে—অবিদ্যা বা মায়ার বশেই মানুষ এ-সবকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া আসক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের মতে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ ও পরীক্ষাই হইতেছে এই শরীরটাকে অগ্রাহ্য করা—ইহার মধ্যে সাময়িক জীবনটা কোন রকমে অতিবাহিত করিয়া পূর্ণ মুক্তির জন্য শরীর ত্যাগের অপেক্ষা করা। শঙ্করাদি সন্ন্যাসীগণ এই ভাবেই গীতার প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাক্" শব্দের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে "পূর্ব্বে", কিন্তু শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে এই অশুচি শরীরের মধ্যেই পূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবন ও মুক্তিলাভ করা যায় এ-কথা সন্ন্যাসীগণ স্বীকার করিতে পারেন না—তাই তিনি "প্রাক্" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "পর্য্যন্ত"—যে-ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়; মরণ পর্য্যন্ত সীমা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ দেহধারী জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাহার নিমিত্ত অনন্ত। সুতরাং আমরণ উহাকে বিশ্বাস করিবে না। এই বিশ্বাসঘাতক শরীরটাকে জব্দ করিবার জন্য সমাজ যে কত বিধিনিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছে তাহার অন্ত নাই—তাই মানুষের আত্মা হাঁফাইয়া উঠিয়া এই দেহটাকে পরম শত্রুস্বরূপ জ্ঞান করে এবং ইহার জীবনকে একেবারেই ছাড়িয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৈদিক যুগে সমাজের বিধিবন্ধন এত কড়া হইয়া ওঠে নাই, তখনকার মানুষ এই জড় দেহ ও জড় পৃথিবীকে শত্রু বলিয়া মনে করিত না, বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবীকে মাতা বলিয়া এবং স্বর্গকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উভয়কেই সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিগূঢ় শিক্ষা আমাদের বোধগম্য হয় না, আমরা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন কল্পনা করিতে পারি না, হয় জড়বাদের বশে স্বর্গকে অস্বীকার করি, অথবা মায়াবাদের বশে এই পৃথিবী ও পার্থিব জীবনকে অধিকার করি।

কিন্তু গীতা তাহা করে নাই; গীতা সেই প্রাচীন বৈদিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া জোরের সহিতই বলিয়াছে—মরণের পূর্ব্বে এই দেহেই চরম মুক্তিলাভ করিতে হইবে, সেইজন্যই গীতা এখানে 'প্রাক্শরীরমোক্ষণাৎ' কথাটিকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য 'ইহৈব' কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। বস্তুত শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন "আমরণ", মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, তাহাতে গীতার এই শ্লোকটি অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে শরীরপাতের সময় পর্য্যন্ত কাম-ক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে হইবে, তবেই মানুষ সুখী হইবে—শ্রীধর টিপ্পনী করিয়াছেন, "কেবল ক্ষণমাত্র সহ্য করিলে হইবে না, দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।" তাহা হইলে যতক্ষণ না মৃত্যু আসিতেছে ততক্ষণ এই শ্লোক অনুযায়ী আমি কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারিব কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাহা হইলে এ-জন্মে ত কাহারও পক্ষেই যোগী হওয়া, সুখী হওয়া সম্ভব নহে—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যদি মানুষ কামক্রোধের বেগকে সহ্য করিতে পারে তবেই অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরকালে সে সুখী হইবার আশা করিতে পারে। কিন্তু গীতা এখানে

স্পষ্ট বলিতেছে, ইহৈব, এই সংসারে, এই দেহেই যোগ ও সুখলাভ করিতে হইবে। অতএব শঙ্কর প্রভৃতির ঐরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। গীতার এই শ্লোকটির সহজ ও সরল ব্যাখ্যা হইতেছে—যে-ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই দেহেই কাম ও ক্রোধের বেগকে জয় করিয়াছে সে-ই যোগী এবং সে-ই সুখী।

শঙ্কর প্রভৃতির মতে এ-জীবনে এ-রূপ সুখের কোনই সম্ভাবনা নাই। শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "মরণ পর্য্যন্ত সীমা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাহার নিমিত্ত অনন্ত। সুতরাং আমরণ উহাকে বিশ্বাস করিবে না।" অতএব শঙ্করের মতে এই দেহের মধ্যে থাকিয়া জীবিতাবস্থায় কাহারও পক্ষেই সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-জয় সম্ভব নহে, যাঁহারা কল্যাণকামী তাঁহাদিগকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা নিজের উপর সজাগ পাহারা দিতে হইবে। কিন্তু যেখানে কামক্রোধের অসংখ্য নিমিত্ত রহিয়াছে সেখানে বাস করিয়া আমরণ কয়জন ব্যক্তি এইরূপ সতর্ক জীবন যাপন করিতে পারে? তাই শঙ্করের ব্যবস্থা, যাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে চান তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিতেই হইবে, এ-সব হইতে যত দূর সম্ভব দূরে থাকিয়াই অধ্যাত্ম-সাধনা করিতে হইবে।

কিন্তু বস্তুত ইহা গীতার শিক্ষা নহে। গীতা বার বার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে, এই দেহের মধ্যে থাকিয়া এই জীবনেই সম্পূর্ণভাবে কাম ও ক্রোধকে জয় করা যায়, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় (২।৫৫-৭২)। বুদ্ধিকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া ইহসংসারেই পাপ ও পুণ্যের অতীত হওয়া যায়, মুক্ত হওয়া যায়,

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে। ২।৫০

আর যে ব্যক্তি এইভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছেন তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তাহার আর পতনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১

মুক্তিলাভ করিতে হইলে এই সংসার ছাড়িয়া, এই দেহ ছাড়িয়া যাইতে হয় না, পরন্তু মানুষ যে অজ্ঞানের মধ্যে অহংভাবের মধ্যে বাস করিতেছে, ইহার ঊর্দ্ধে অধ্যাত্ম-চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠাকেই গীতা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, ইহা একবার লাভ করিতে পারিলে মানুষকে আর কখনই কামক্রোধের বেগের মধ্যে, মোহের মধ্যে পতিত হইতে হয় না,

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। ২।৭২

আত্মোপলব্ধির দ্বারা আমরা ব্রহ্মকেই আমাদের প্রকৃত আত্মা বলিয়া অবগত হই, তখন আমরা যে দিব্য শক্তিলাভ করি তাহা আমাদিগকে সাধারণ মানবজীবনের সকল ত্রুটি, দুর্ব্বলতা, মোহ ও দুঃখের ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, এই দেহেই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হই, জগতের সকল জীবে, সকল ঘটনায় এক ব্রহ্মকে দেখিয়া আমরা এই সবের ঊর্দ্ধে, দিব্যজীবনের অসীমতা, সর্ব্বজয়ী শক্তি, সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতি, শুদ্ধ পরমানন্দ লাভ করি।

কেন উপনিষদেও বলা হইয়াছে, এই মহান সিদ্ধি এই মরজগতে এই দেহেই লাভ করিতে হইবে,

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদম্মহতী বিনষ্টিঃ॥ —কেন ২।৫

যদি ইহজীবনে সেই জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা হইলেই মানুষ তাহার প্রকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহজীবনে যদি সে জ্ঞানলাভ করা না যায় তাহা হইলে মহান্ অনর্থ হয়। কারণ তাহা হইলে আমরা দেহ, প্রাণ, মনের বাহ্য জীবনেই বদ্ধ থাকি, এই জীবনের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের অনিত্য সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঊর্দ্ধের যে সত্য অতি-মানস জীবন তাহার মধ্যে আমরা উঠিতে পারি না। এটা মনে করা ভ্রান্তি যে, ইহজীবনে আমরা যদি সেই জ্ঞানলাভ করিতে না পারি, মৃত্যু আমাদিগকে অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সহজ লোকে লইয়া যাইবে, সেখানে আমরা সহজেই সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করিতে পারিব। কেবল যাঁহারা তাঁহাদের জাগ্রত বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্ব ভূতের মধ্যে এক অদ্বিতীয় অমৃত-স্বরূপ ব্রহ্মের সন্ধান পান তাঁহারাই এই মর্ত্ত্য জীবনের ঊর্দ্ধে অমৃতত্ব লাভ করেন।

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

ফেড্ ইন্।

কুন্তল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে সাধারণের উপভোগ্য নগরোদ্যান; উদ্যান ঘিরিয়া প্রশস্ত রাজপথ; রাজপথের অপর পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা, বিপণি, মদিরাগৃহ, পতাকা ও তোরণ মাল্যে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

নগরোদ্যানের কেন্দ্রে একটি অতি সুদৃশ্য মর্ম্মর নির্ম্মিত কন্দর্প-মন্দির; মন্দিরের দেয়াল নাই, তাই বাহির হইতে কন্দর্প দেবের ধনুর্দ্ধর মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে নাগরিকদের উপবেশনের জন্য গোলাকৃতি প্রস্তর বেদিকা। উদ্যানের চারিপ্রান্তে চারিটি প্রস্রবণ; উহার জল গো-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া বৃহৎ শ্বেত জলাধারে পড়িতেছে। একঝাঁক পারাবত উদ্যানের ভূমিতে বসিয়া নির্ভয়ে শস্য খুঁটিয়া খাইতেছে। কুঞ্জে বিতানে বাটিকায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া নব বসন্তের জয় ঘোষণা করিতেছে।

আজ মদনোৎসব; তাহার উপর আবার রাজকন্যার স্বয়ংবর। নগরের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের সমাগমে নগরে সমারোহের অন্ত নাই।

উদ্যান ও রাজপথের মাঝখানে অগণিত ফুলের দোকান বসিয়াছে। দারু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিটি দণ্ডের উপর স্থাপিত; তাহার মধ্যে রাশীকৃত ফুল। ফুলের রাশির মধ্যে এক একটি যুবতী মালিনী বসিয়া আছে; বিম্বাধরে হাসিয়া বিলাসী নাগরিকদের পুষ্পমালা পুষ্পের অঙ্গদ কুণ্ডল শিরোভূষণ বিক্রয় করিতেছে।

পথে জনস্রোত আবর্ত্তিত। মাঝে মাঝে উষ্ট্রের সারি বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া উদ্ধত অবজ্ঞাভরে চলিয়াছে। দোলা চতুর্দ্দোলারও অভাব নাই; সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদের লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়াছে।

সহসা এই পথের উপর ক্ষণকালের জন্য এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। প্রধান পথটি হইতে কয়েকটি সঙ্কীর্ণতর পথ বাহির হইয়া গিয়াছিল; এইরূপ একটি পথ হইতে প্রচণ্ড বেগে একটি উন্মত্ত অশ্ব আসিয়া প্রবেশ করিল—অশ্বের পৃষ্ঠে একটি আরোহী কোনও ক্রমে চড়িয়া আছে। ক্ষিপ্ত অশ্ব দেখিয়া পথের জনতা সভয়ে চারিদিক ছিট্‌কাইয়া পড়িল। একটি ফুলের দোকানের সম্মুখ পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া অশ্ব দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গতিবেগ সম্বরণ করিল, তারপর উগ্রবেগে ছুটিয়া আর একটা পথ দিয়া দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল।

অশ্ব ও আরোহী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। তাহারা অন্তর্হিত হইলে পথের কোলাহল ও উত্তেজনা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

যে ফুলের দোকানটিকে অশ্ববর প্রায় বিমর্দ্দিত করিয়া গিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাত্রী মালিনী এতক্ষণে ফুলের স্তূপের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া চাহিল। দোকানের সম্মুখে তিনটি নাগরিক ছিলেন, অশ্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন; এখন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন দোকানের নিম্নদেশ হইতে গুড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বেশভূষা কিছু অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংস্কার করিতে করিতে ও জানুর ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে এক ব্যক্তি সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রথম নাগরিক: বাবাঃ—রগ ঘেঁষে গেছে! আর একটু হলেই উচ্চৈঃশ্রবা বুকের ওপর পা চাপিয়ে দিয়েছিল আর কি!

দ্বিতীয় নাগরিক স্খলিত কর্ণভূষা আবার কর্ণে পরিধান করিতেছিলেন, বিরক্তি-ভরে বলিলেন—

দ্বিতীয় নাগরিক: অনেক রাজা রাজকুমারই তো স্বয়ংবরে এসেছে কিন্তু এমন বেপরোয়া ঘোড়সোয়ার দেখিনি। ভাগ্যে শ্রীমতীর দোকানের তলায় ঢুকেছিলুম, নইলে মুণ্ডটি পিণ্ড ক'রে দিয়ে চলে যেতো!

দোকানের মালিনী এবার কথা কহিল, উৎসুকভাবে বলিল—

মালিনী: নিশ্চয় কোনও রাজকুমার! চিনতে পারলে না?

এতক্ষণে তৃতীয় নাগরিকটি, যেন কিছুমাত্র বিচলিত হ'ন নাই এমনি-ভাবে ফুলের পাখার বাতাস খাইতে খাইতে ফিরিয়া আসিলেন। মালিনীর প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিলেন; অবজ্ঞায় ভ্রূ তুলিয়া অপর দুইজনের প্রতি দৃকপাত করিয়া বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে কহিলেন—

তৃতীয় নাগরিক: চোখ চেয়ে থাকলে তো চিনতে পারবে! ঘোড়া দেখেই শ্রীমানদের পদ্মপলাশ নেত্র কমল-কোরকের মত মুদিত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় নাগরিক: আরে যাও যাও, তুমি তো দৌড় মেরেছিলে। সরু সরু একযোড়া পা আছে কি-না—

মালিনীর কিন্তু এই দেহতাত্ত্বিক আলোচনায় রুচি ছিল না, সে সাগ্রহে তৃতীয় নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল—

মালিনী: তুমি চিনতে পেরেছ বুঝি?

তৃতীয় নাগরিক উচ্চাঙ্গের একটু হাস্য করিলেন।

তৃতীয় নাগরিক : চেনা আর শক্ত কি? একনজর দেখেই চিনেছি। মাথার শিরস্ত্রাণটা দেখলে না!

মালিনী : হ্যাঁ হ্যাঁ, শিরস্ত্রাণটা নতুন ধরণের—রোদ্দুরে ঝকমক্ করে উঠল—

তৃতীয় নাগরিক : (গম্ভীরভাবে) আর্য্যাবর্ত্তের দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজার রাজকীয় লাঞ্ছন আমার নখদর্পণে। ইনি হচ্চেন সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার!

মালিনীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

মালিনী : নিশ্চয় স্বয়ংবর সভায় গেলেন। তাই এত তাড়া।

প্রথম নাগরিক হুঁ হুঁ করিয়া আনুনাসিক হাস্য করিলেন।

প্রথম নাগরিক : যতই তেড়ে যান, গুড় গুড় করে ফিরে আসতে হবে। সে বড় কঠিন ঠাঁই; রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারছে না।

তৃতীয় নাগরিকের নাসা অবজ্ঞায় স্ফুরিত হইল।

তৃতীয় নাগরিক : প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বিদ্যা এবং বুদ্ধি দুইই দরকার—বুঝলে হে? অথচ যে-সব রাজা-রাজড়া রথি-মহারথ যাচ্চেন, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের কোনোটাই নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক : (শ্লেষভরে) কিন্তু তোমার তো দুইই আছে—তুমি গিয়ে ঢুকে পড় না! চণ্ডাল পামর কারুর তো যেতে মানা নেই।

তৃতীয় নাগরিক ঈষৎ রুষ্টমুখে চাহিলেন; তারপর সগর্ব্ব মর্য্যাদার সহিত বলিলেন

তৃতীয় নাগরিক : যাব। আগে রাজা-রাজড়াগুলো শেষ হয়ে যাক, তারপর যাব।

দ্বিতীয় নাগরিক শ্লেষের অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রথম নাগরিকের মুখে কিন্তু একটু করুণতার ছায়া পড়িল।

প্রথম নাগরিক : (বিমর্ষকণ্ঠে) আমিও যেতুম—কিন্তু; সদর দেউড়িতে যে দুটো আখাম্বা হাব্‌শী খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

ডিজল্‌ভ্।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তোরণ ও প্রতীহার-ভূমি। অতি স্থূল তোরণ স্তম্ভ অভ্যন্তরে প্রতীহারদের জন্য বিশ্রাম-কক্ষ আছে। স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে উচ্চ কারুকার্য্যখচিত প্রাচীর প্রশস্ত প্রাসাদভূমিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

দুইজন নগ্নকায় ভীমকান্তি হাব্‌শী মুক্ত কৃপাণ হস্তে তোরণ-সম্মুখে প্রহরা দিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে প্রায় শতহস্ত দূরে রাজভবনের প্রথম মহল দেখা যাইতেছে। তাহার পশ্চাতে অন্যান্য যে সকল মহল আছে, সম্মুখ হইতে তাহা দেখা যায় না।

দূর রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি লোক তোরণের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। লোকটি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত, মস্তকে ধাতুময় শিরস্ত্রাণ আছে। তাহার হাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া লোকটি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—

ব্যক্তি : নারীজাতি রসাতলে যাক। আমার ঘোড়া কোথায়?

মূক হাব্‌শীদ্বয় উত্তর দিল না, প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় একটি অশ্বের বল্গা ধরিয়া এক অশ্বপাল তোরণ-মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বপৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অশ্বপাল মুচ্‌কি হাসিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল; যাইবার সময় হাব্‌শীদের দিকে একবার চোখ টিপিয়া গেল।

বোধ করি অশ্বের ক্ষুরশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি প্রবীণ ব্যক্তি তোরণ-স্তম্ভের অভ্যন্তরস্থ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ক্ষৌরিত মস্তকে একটি সুপুষ্ট শিখা আছে, কর্ণে হংসপুচ্ছের লেখনী, হস্তে একটি মোটা দপ্তর। ইনি রাজ্যের পুস্তপাল।

পুস্তপাল মহাশয় বিলীয়মান অশ্বারোহীর দিকে একবার দৃক্‌পাত করিলেন, তারপর নিরুৎসুক কণ্ঠে হাব্‌শীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

পুস্তপাল : বিদর্ভ রাজকুমার চলে গেলেন?

বিশদ হাস্যে হাব্‌শীদ্বয়ের সুকৃষ্ণ বদন মণ্ডল দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গেল; তাহারা যুগপৎ মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। পুস্তপাল মহাশয় গম্ভীর-ভাবে কর্ণ হইতে লেখনী লইয়া দপ্তরে লিখিতে লিখিতে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন—

পুস্তপাল : বিদর্ভ-কুমার। উনপঞ্চাশৎ সংখ্যা—

ডিজল্‌ভ্।

একটি বৃহৎ সভাগৃহ; এত বৃহৎ যে পাঁচশত লোক অনায়াসে তাহাতে বসিতে পারে। গোলাকৃতি কক্ষ; প্রাচীর সাধারণ কক্ষের চতুর্গুণ উচ্চ। প্রাচীরের নিম্নভাগে নানাবিধ পৌরাণিক ঘটনার চিত্র সারি সারি অঙ্কিত রহিয়াছে; ঊর্দ্ধে প্রায় ছাদের নিকট আলিসার মত প্রশস্ত ব্যাল্‌কনি প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া আছে। তাহার উপর শূলধারী দুইজন হাব্‌শী রক্ষী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতে

করিতে পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা এক বিচিত্র অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিতেছে: স্কন্ধ হইতে শূল নামাইয়া পরস্পর যেন আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; তারপর যেন উভয়ে উভয়কে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া শূল স্কন্ধে তুলিয়া আবার বিপরীত মুখে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিতেছে। এই অভিনয় বস্তুত অহিংস হইলেও দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর।

সভাগৃহের নিম্নে মণিকুট্টিমের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ চক্রাকার বেদী, ভূমি হইতে মাত্র এক ধাপ উচ্চ। মূলত ইহা রাজসভায় সিংহাসন রক্ষার জন্য পট্টবেদিকা; কিন্তু রাজসভা স্বয়ংবর সভায় রূপান্তরিত হওয়ায় সিংহাসন অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বেদীর সম্মুখে অল্প দূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আর একটি ক্ষুদ্র বেদিকা—ইহা রাজার সহিত ভাষণপ্রার্থী মান্য অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট। উপস্থিত এই বেদিকাটি শূন্য।

কিন্তু প্রধান পট্টবেদিকাটি শূন্য নহে, বরঞ্চ কিছু অধিক পরিমাণেই পূর্ণ। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি সুন্দরী সুবেশা তরুণী এই বেদীর উপর, পদ্মের উপর প্রজাপতির মত ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বেদীর উপর স্থানে স্থানে স্বর্ণস্থালীতে মালা পুষ্প চন্দন শঙ্খ লাজ ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। তরুণীরা কলকণ্ঠে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে; কেহ বা বেদীর উপর অর্দ্ধশয়ান হইয়া অলস অঙ্গুলি সঞ্চালনে বীণার তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতেছে।

বেদীর উপর একটি দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে দুইটি শুক পক্ষী চরণে শৃঙ্খল পরিয়া বসিয়া আছে। একটি তরুণী মৃণাল বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া তাহাদের ধান্যের শীষ খাওয়াইতেছেন। এই তরুণীর মুখাবয়ব পশ্চাৎ হইতে দেখা না গেলেও তাঁহার গ্রীবা ও দেহের মর্য্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিমা হইতে অনুমান হয় যে ইনিই রাজকন্যা।

আর একটি যুবতী বেদীর কিনারায় বসিয়া গভীর মনঃসংযোগে কজ্জল-মসী দিয়া ভূমির উপর আঁক কষিতেছে। অন্য কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; মুখে উদ্বেগ ও শঙ্কা পরিস্ফুট। অবশেষে অঙ্ক শেষ করিয়া যুবতী হতাশাব্যঞ্জক মুখ তুলিল; হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

যুবতী: উনপঞ্চাশ!

যুবতীর কণ্ঠস্বরে রাজকুমারী পক্ষীদণ্ডের দিক হইতে ফিরিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মুখ দেখা গেল। এতগুলি সদ্বংশকুলোদ্ভবা রূপসীর মধ্যে তিনিই যে প্রধানা, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। অভিমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈদগ্ধ্য ও সৌকুমার্য্য মিশিয়া মুখে অপূর্ব্ব লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

প্রিয়সখী চতুরিকার হতাশ মুখভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারীও একটু বিষণ্ণ হাস্য করিলেন, তারপর অলসপদে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমারী: চতুরিকা, ঠিক জানিস উনপঞ্চাশটা? আমার তো মনে হচ্ছে, একশ' উনপঞ্চাশ—

চতুরিকা আবার হিসাবের দিকে দৃষ্টি নামাইল, মনে মনে হিসাব পরীক্ষা করিল, তারপর বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

চতুরিকা: উহুঁ, উনপঞ্চাশ। এই যে হিসেব—তের জন রাজকুমার, সতেরোটি সামন্ত, চৌদ্দজন শ্রেষ্ঠীপুত্র, আর পাঁচটি নাগরিক। কত হল?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সখী চতুরিকার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একজন চট্ করিয়া জবাব দিল—

প্রথমা: সাতচল্লিশ!

দ্বিতীয়া: দূর মুখপুড়ি, তিপ্পান্ন!

রাজকুমারী হাসিলেন।

রাজকুমারী: তোরা সবাই অঙ্কশাস্ত্রে বররুচি!

চতুরিকা সকৌতুক ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজকুমারীর পানে চোখ তুলিল—

চতুরিকা: শুধু তোমার বুঝি বরে রুচি নেই!

সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজকুমারীও হাসিতে হাসিতে চতুরিকার পাশে উপবেশন করিলেন। আর সকলে তাঁহাদের ঘিরিয়া বসিল। রাজকন্যা মুখের একটি কৌতুক-করুণ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী: রুচি থেকেই বা লাভ কি চতুরিকা? উনপঞ্চাশ জনের একজনও তো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না—

চতুরিকা রাজকুমারীর সবচেয়ে প্রিয় সখী, তাঁহার মনের অনেক খবর জানে। সে মিটিমিটি হাসিয়া প্রশ্ন করিল।

চতুরিকা: আচ্ছা সত্যি বল পিয়সহি, এদের মধ্যে কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তুমি খুশী হতে?

রাজকুমারীও হাসিলেন।

রাজকুমারী: যদি বলি হতুম!

চতুরিকা মাথা নাড়িল।

চতুরিকা: তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি না; ওদের মধ্যে একজনকেও তোমার মনে ধরেনি।

সখীদের মধ্যে একজন তরল কৌতুকচপল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল

প্রথমা: শুধু রামছাগলটিকে ছাড়া!

হাসির লহর উঠিল। একটি হতভাগ্য পাণিপ্রার্থীর ছাগ-সদৃশ চেহারা লইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক রসিকতা হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারী একমুঠি ফুল ছুঁড়িয়া রহস্যকারিণীকে প্রহার করিলেন।

রাজকুমারী: রামছাগলটিকে মৃগশিরার তারি ম—

ধরেছে, ঘুরে ফিরে কেবল তারই কথা! তোর জন্তে চেষ্টা ক'রে দেখব না কি? এখনও হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে।

মৃগশিরা রাজকুমারীর নিক্ষিপ্ত ফুলগুলি কবরীতে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—

মৃগশিরা: তা মন্দ কি! আমি গররাজি নই—

আর একজন ফোড়ন কাটিল।

দ্বিতীয়া: রাজযোটক হবে—মৃগশিরা আর রামছাগল—

চতুরিকা একটু গম্ভীর হইল।

চতুরিকা: ঠাট্টা নয়, ভারি আশ্চর্য্য কথা। এতগুলো বড় বড় লোক, একটা প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারলে না!

তৃতীয়া: যা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন!

রাজকুমারী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী: প্রশ্ন বিদ্‌ঘুটে নয় মালবিকা, লোকগুলো বিদ্‌ঘুটে। ওদের যদি সহজবুদ্ধি থাকত, তা হ'লে সহজেই উত্তর দিতে পারত।

একটি সখীর কৌতুহল দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সে রাজকুমারীর কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া আব্‌দারের সুরে বলিল—

চতুর্থী: বল না পিয়সহি, প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি?

আর একজন তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—

পঞ্চমা: না না, আমরা সবাই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই—পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট কি?

রাজকুমারী অন্য একটি সখীর পৃষ্ঠে নিজ পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন, একটু অলস হাসিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী: তোরাই বল্ না দেখি।

সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। একটি সরলা যুবতী উৎসাহভরে বলিল—

শিখরিণী: আমি বলব? আনারস। (ঝোল টানিয়া) আনারসের চেয়ে মিষ্টি পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই।

মৃগশিরা মুখ তুলিল।

মৃগশিরা: আমি বুঝেছি—আক! ইক্ষুদণ্ড! আকের চেয়ে মিষ্টি আর কি আছে? আক থেকেই তো যত সব মিষ্টি জিনিষ তৈরি হয়।

তৃতীয়া আপত্তি তুলিল।

তৃতীয়া: তা হ'লে মধু হবে না কেন? মধুই বা কি দোষ করেছে। হ্যাঁ পিয়সহি, মধু—না?

রাজকুমারী হাসিয়া উঠিলেন।

রাজকুমারী: দূর হ' পেটুকের দল! কিন্তু আর তো পারা যায় না। মাথার ওপর উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য তো হয়ে গেল; আর কি সহ্য হবে!

রাজকুমারী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চতুরিকার পানে তাকাইলেন। বিদ্যুল্লতা সান্ত্বনার সুরে বলিল—

বিদ্যুল্লতা: এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন!—এখনও সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে!

রাজকুমারী অধীরভাবে মাথা নাড়িলেন।

রাজকুমারী: তা নয় বিদ্যুল্লতা। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের এত অধঃপতন হয়েছে! এক অশিক্ষিতা মেয়ের তিনটে সামান্য প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারছে না!

চতুরিকা মুখভঙ্গী করিল।

চতুরিকা: তুমি অশিক্ষিতা মেয়ে! বাব্বাঃ!—চতুঃষষ্টিকলা শেষ করে বসে আছে!

বনজ্যোৎস্না রাজকুমারীকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিল।

বনজ্যোৎস্না: হতাশ হয়ো না পিয়সহি, এখনও অনেক আসবে; কেউ না কেউ ঠিক উত্তর দিয়ে ফেলবেই—

রাজকুমারী: উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়—যাঁরা আসবেন তাঁরা সবাই ঐ রামছাগলের ভায়রা ভাই। তার চেয়ে যদি আমার শুকসারীকে প্রশ্ন করতুম, ওরা ঠিক উত্তর দিতে পারত।

চতুরিকা: তবে তাই কর, সব হাঙ্গাম চুকে যাক। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে, শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। তা হ'লে মহারাজকে তাই বলি গিয়ে? কি বল?

রাজকুমারী একটু মৃদু হাসিলেন।

কাট্।

তোরণ ও প্রতীহার-ভূমি। কৃপাণধারী হাব্‌শীদ্বয় পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সম্মুখে চাহিয়া তাহারা আরও সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল।

যাহাকে দেখিয়া হাব্‌শীদ্বয় সতর্ক হইয়াছিল, সে আর কেহ নহে, আমাদের অশ্বারূঢ় কালিদাস। নগরের বহু স্থান ঘুরিয়া উন্মত্ত ঘোটক অবশেষে রাজপ্রাসাদের দিকে উল্কার বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কালিদাস ঘোড়ার কেশর ধরিয়া কোনও মতে টিঁকিয়া আছেন।

ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাব্‌শীদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হাব্‌শীরাও তৈয়ার ছিল, ডালকুত্তার মত লম্ফ দিয়া পড়িয়া দুই দিক হইতে ঘোড়ার বল্‌গা চাপিয়া ধরিল। হাব্‌শীদের দেহে অসুরের শক্তি, ঘোড়া আর অধিক আস্ফালন করিতে পারিল না, শান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস এই সুযোগই খুঁজিতেছিলেন, পিছ্‌লাইয়া ঘোড়ার ঘর্ম্মাক্ত পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘকাল একটা উদ্দাম অসংযত ঘোড়ার পিঠে খাড়ি-খাচি ভাবে

আঁকড়াইয়া থাকিবার পর কালিদাসের মানসিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তিনি কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অশ্বপাল আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গিয়াছিল; পুস্তপাল মহাশয়ও ব্যস্ত-সমস্তভাবে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কালিদাসকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—

পুস্তপাল : আসুন, আসুন কুমার—

পুস্তপাল নত হইয়া কালিদাসের জানু দুই হস্তে স্পর্শ করিলেন; কালিদাস থতমত খাইয়া গেলেন।

কালিদাস : আমি—আমি—

পুস্তপাল : পরিচয় দিতে হবে না সৌরাষ্ট্রকুমার—আপনার শিরস্ত্রাণ কে না চেনে?—আসতে আজ্ঞা হোক—এইদিকে—মহামন্ত্রী প্রতীক্ষা করছেন—

পুস্তপাল আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দুই হস্ত ভিতরের দিকে প্রসারিত করিলেন। ভ্যাবাচাকা অবস্থায় কালিদাস পুস্তপাল মহাশয়ের সঙ্গে রাজতোরণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

রাজপুরীর প্রথম মহলে মহামন্ত্রী যুক্তকরে কালিদাসকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শীর্ণকায় তীক্ষ্ণচক্ষু একটি বৃদ্ধ, তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

মহামন্ত্রী : স্বাগতম্—শুভাগতম্! অষ্টোত্তর শ্রীযুক্ত পরম-ভট্টারক পরম-ভাগবত সৌরাষ্ট্রকুমারের জয় হোক।

অভিভূত কালিদাস ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিতে লাগিলেন। মহামন্ত্রী বলিয়া চলিলেন—

মহামন্ত্রী : আসুন মহাভাগ—আপনার পদদ্বন্দ্ব স্পর্শে—

কালিদাস এতক্ষণে কেবল 'পদ' শব্দটি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু 'পদদ্বন্দ্ব' কি বস্তু? কালিদাস ত্রস্তভাবে নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টি নামাইলেন।

কালিদাস : পদদ্বন্দ্ব?

মহামন্ত্রী : (স্মিতমুখে) পদযুগল—

কালিদাস তথাপি বিভ্রান্ত।

কালিদাস : পদযুগল?

মহামন্ত্রী সপ্রশংস মুখে একটু হাস্য করিলেন।

মহামন্ত্রী : কুমার দেখছি পরিহাসপ্রিয়। পদদ্বন্দ্ব অর্থাৎ পদযুগল—অর্থাৎ দুটি পা—!

কালিদাসের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল।

কালিদাস : ওঃ! দ্বন্দ্ব মানে দুটি! তাই বুঝি পদদ্বন্দ্ব বলছেন—?

মহামন্ত্রী আসিয়া কালিদাসের বাহু ধরিলেন। রসিক ও কৌতুকী রাজপুত্র এ জগতে বড়ই বিরল। বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন—

মহামন্ত্রী : বৃদ্ধের সঙ্গে পরিহাস করবেন না কুমার; রসালাপের যোগ্যতর স্থান কাছেই আছে। আসুন, আপনাকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাই—

ডিজল্‌ভ্। ক্রমশঃ

সীতার প্রতি রাম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ভাঙ্গি শঙ্করের ধনু, ভার্গবের দর্পের সংহার
করিয়া অর্জ্জিনু তোমা—পৌরুষের তুমি পুরস্কার!
লভি তোমা—বীর-ভোগ্যা বসুধার বীরার্চ্চ্যা নন্দিনী,
আমার পৌরুষ ধন্য। তোমারে আনিনু গৃহে জিনি,
সূর্য্যবংশ-রাজলক্ষ্মী মহাশৌর্য্য-বারিধি-মন্থনে
সমুত্থিতা, তূর্য্যনাদে অভ্যর্থিতা এ পৌর ভবনে।

তারপর মনে পড়ে, সৌভাগ্যের সে মাহেন্দ্রক্ষণে
মহেন্দ্রের বজ্রসম নেমে এলো মোদের জীবনে
বিমাতার দণ্ডাদেশ; দৃপ্ত শিরে করিনু বরণ
শুনি তাহা একদণ্ড করি নাই সময় হরণ,
যাচি নাই কৃপা তাঁর, ফেলি নাই ক্ষোভে আঁখিজল
রাজ্যলোভে করি নাই বিনিয়োগ নিজ বাহুবল,
ভরতের প্রতীক্ষায় রহি নাই কোনো ভরসায়,
যুক্তি দিয়া চাহি নাই এড়াইতে পিতৃসত্য-দায়,
পিতৃ-বাৎসল্যের পানে চাহি নাই সতৃষ্ণ নয়নে
লক্ষ্মণের তেজোদৃপ্ত আস্ফালন শুনিনি শ্রবণে,
সত্যের মুখোষখানা ফেলিনিক ছিঁড়িয়া সবলে,
বিগলিত হই নাই জননীর নয়নের জলে,
শিরে কর হানি নাই, অদৃষ্টেরে দিইনি ধিক্কার,
পৌরুষের অভিমানে বনে গেছি ঠেলি রাজ্যভার

বিদায় লইতে গিয়া তারপর তোমার সকাশে,
বুঝালাম কত শঙ্কা সঙ্কট যাতনা বনবাসে,
গর্জ্জিয়া উঠিলে তুমি দৃপ্তফণা ফণিনীর মত।
তীব্র বিষ-বাক্যে মম পৌরুষেরে করিলে আহত,
বলিলে অক্ষম আমি পতিত্বের দায়িত্ব-পালনে।
পৌরুষের অভিমান হুঙ্কারি উঠিল মোর মনে,
তোমারে লইয়া সাথে নত শিরে করিনু বরণ
ঘনঘোর ভবিষ্যৎ।
চিত্রকূটে আসিনু যখন
মনে পড়ে ভরতের মর্ম্মন্তুদ দৈন্য আকিঞ্চন,
প্রায়োপবেশন ব্রত, জাবালির যুক্তি-পরম্পরা,
একপাশে দাঁড়াইয়া সেই বামা লজ্জায় কাতরা
দাক্ষিণ্যে সজলনেত্রা। বুঝিলাম পিতার মরণে
পিতৃসত্যমুক্ত আমি। ভরতের দীন আবেদনে,
কঠোর পৌরুষ তবু গলিল না। বশিষ্ঠের প্রতি
অশিষ্ট হ'লাম ক্ষোভে। কহিলাম 'নাস্তিক দুর্মতি',
সত্যনিষ্ঠ জাবালিরে, পৌরুষের দৃপ্ত অভিমানে
ফিরালাম ভরতেরে।
চলিলাম মহারণ্য পানে,
অযোধ্যার কাছে থেকে পাছে চিত্ত হয় বিচলিত,
যাতায়াত করি পাছে মিত্রজন করে প্রলোভিত,
সে ভয়ে গভীর বনে পশিলাম। সেথা ঋষিগণ
রাক্ষসের উপদ্রবে মোর কাছে লইল শরণ।

ধীমতী শ্রীমতী তুমি বলেছিলে, 'নয় সমুচিত
অকারণ বৈরাচার বীরেন্দ্রেরো কাহারো সহিত।'
শুনিনি তোমার মানা, শিহরিয়া উঠিল পৌরুষ,
শরণাগতেরে ত্রাণ করিবনা হেন অমানুষ
কেমনে সাজিব হ'য়ে রঘুকুল-ধুরন্ধর, তাই
তুমি সাথে ছিলে তাও মনে মোর পায়নিক ঠাঁই
বীরগর্বে। একাকিনী ছিলে তুমি অবলা ললনা,
কাপুরুষ নিশাচর বিস্তারিয়া মায়ার ছলনা
তোমারে হরিয়া নিল।
করিয়াছি যত অশ্রুপাত
আধা তব শোকে দেবি, আধা মোর পৌরুষে আঘাত
দস্যু দিয়ে গেল বলি'। করিলাম তোমার উদ্ধার
প্রতিশোধ লইলাম পৌরুষের অবমাননার,
ফিরিয়া পেলাম যারে হায় দেবি তুমি তার আধা,
আধা তার বিশ্বপূজ্য রঘুকুল-বংশের মর্য্যাদা।

বনবাস যাত্রাকালে আমার সে আর্ত্ত অনুনয়
শোনো নাই, অকস্মাৎ সে স্মৃতির হইল উদয়,
কহিনু পরুষ বাক্য, বক্ষের সে অপরাধ ক্ষম।
অগ্নিপরীক্ষার শেষে পৌরুষেরই পুরস্কার সম
লভিনু তোমারে পুনঃ।
অভিমানী রামের কপালে,
স্বস্তি লেখে নাই বিধি, দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি কোনকালে
রামের জীবনে নাই। পৌরজন-নিন্দার রসনা
সহস্র ফণিনী হ'য়ে দিল মোরে দংশন-যাতনা
পৌরুষে অধীর করি'। করিতে নারিল তাহা দূর
তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ শীত হরিচন্দন মধুর।

পৌরুষের অভিমান আর প্রেমে বাধিল সমর,
লঙ্কাযুদ্ধ তার কাছে অতি তুচ্ছ। পৌরুষ বর্ব্বর
তাহাতে হইল জয়ী। গিয়াছেন পিতা শিরে নিয়ে
স্ত্রৈণতার অপবাদ, সর্পসম ভয় করি প্রিয়ে
সেই নিন্দা পরিবাদে। ঘোষিবে অনন্তকাল ভবে
রমণীর পায়ে রাম রাজধর্ম্ম কুলের গৌরবে
দেয়নিক বলিদান। তাই সেই সমস্যা অপার
সমাধানে এক দিনো হয়নিক বিলম্ব আমার।
হতভাগ্য রাম আমি। পারি নাই বিসর্জ্জিতে মান,
তোমার প্রেমের লাগি সগৌরবে দিতে পারি প্রাণ।

বজ্রাহত মর্ম্ম মোর তোমার বিরহে প্রাণেশ্বরি,
তবু নহি মুহ্যমান, দিবাভাগে তন্ন তন্ন করি'
রাজকৃত্য ক'রে যাই। নিশাকালে নিভৃতে নীরবে
অশ্রুপাত করি শুধু তব পুণ্য স্মৃতির গৌরবে।
অপরের অপরাধে করেছে দণ্ডিত আপনারে
চিরদিন এই রাম। পরদোষে তেয়াগি তোমারে
মৃত্যুদণ্ড করে ভোগ, অবনত হয়না জীবনে,
সন্ধি নাহি জানে রণে সুলভ সুখের প্রলোভনে।
আপনা দণ্ডিতে পারে আপনারে নারে সে খণ্ডিতে,
স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ গণে আত্ম-ব্রতের গণ্ডীতে।
একনিষ্ঠ প্রেমে পুষ্ট অভিমানী পৌরুষ তাহার
প্রায়শ্চিত্ত করে আজ দর্পভরে আত্ম-বঞ্চনার।

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

নবদ্বীপের "নবদ্বৈপায়ন" স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের গ্রন্থসমূহ বঙ্গদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিলে প্রাচীনতর বাঙ্গালী নিবন্ধকারগণের স্মৃতিনিবন্ধ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, রঘুনন্দনের নিজগুরু বহুতর নিবন্ধ ও টীকা রচয়িতা শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণিরও কীর্ত্তি বর্ত্তমানে প্রায় নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দনের অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা-সত্ত্বেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে বাঙ্গালী মহামহোপাধ্যায়ের একাধিক গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত স্মার্ত্তসম্প্রদায়ে অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাঁহার কীর্ত্তিকথা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

স্বর্গত রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অপূর্ব্ব গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরে বাঙ্গালায় আর কেহ যে শূলপাণি মহা-মহোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি। ১

শূলপাণির অভ্যুদয়কাল

বিগত শতাব্দীতেও বঙ্গের বিদ্বৎসমাজে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, শূলপাণি সেনরাজত্বকালে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক অর্থাৎ তাঁহার সময় খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী। কিন্তু গবেষণাপূর্ব্বক বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, শূলপাণি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেই পারেন না। কারণ তিনি তাঁহার "সংক্রান্তিবিবেক" গ্রন্থে মিথিলার প্রাচীন স্মার্ত্ত চণ্ডেশ্বরের রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কৃত্যচিন্তামণি" হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত চণ্ডেশ্বর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, ইহা নিশ্চিত।

পরন্তু শূলপাণি তাঁহার "দুর্গোৎসব বিবেক" গ্রন্থে (৪ পৃঃ) একস্থলে লিখিয়াছেন—"ইতি কালমাধবীয়-ধৃত কাঠক বচনাচ্চ।"* কালমাধবীয় বা—"কালনির্ণয়" নামক গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে সুবিখ্যাত পণ্ডিত মাধবাচার্য্যের রচিত। উক্ত মাধবাচার্য্য বুক্কণ নরপতির আশ্রয়ে থাকিয়া নানাগ্রন্থ রচন' করেন—ইহা তাঁহার নিজের উক্তির দ্বারাই জানা যায়। উক্ত নরপতির রাজ্যকাল ১৩৫৪—৬৮ খৃঃ ইহাও নিশ্চিত।

পরন্তু উক্ত মাধবাচার্য্যের "কালনির্ণয়" গ্রন্থের মলমাস প্রকরণে (৭০-৭১ পৃঃ) বৃহস্পতিচক্রের 'ভাব' সম্বৎসর (১৩৩৪ খৃঃ) হইতে 'বিকারী' সম্বৎসর (১৩৫৯ খৃঃ) পর্য্যন্ত উদাহরণস্বরূপ সমস্ত মলমাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহার পরবর্ত্তী মলমাস ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। সুতরাং উক্ত মাধবাচার্য্যের ঐ গ্রন্থ রচনাকাল খৃঃ ১৩৬০—৬২, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।

দাক্ষিণাত্যনিবাসী মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত প্রচারে অন্ততঃ একপুরুষ কাল আবশ্যক। সুতরাং যিনি মাধবাচার্য্যের ঐ "কালনির্ণয়" গ্রন্থও দেখিয়াছেন, সেই শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের গ্রন্থ রচনা কাল ১৩৯০ খৃঃ পূর্ব্বে বলা যায় না।

পরন্তু মিথিলার স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "শ্রাদ্ধচিন্তামণি" গ্রন্থে অনেকবার শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেক" গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করায় তিনি যে শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেক" রচনার পরেই "শ্রাদ্ধচিন্তামণি" রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। উক্ত বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতিনিবন্ধ রচনা কাল ১৪৪০—৮০ খৃঃ। কারণ, তিনি প্রথমে মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং পরে তৎপুত্র রামভদ্র দেবের সভাতেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন। বহু বিজ্ঞ গবেষক স্বর্গত রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সমস্ত কারণে শূলপাণির অভ্যুদয়কাল খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু স্বর্গত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু পরিশ্রমে শূলপাণির বহু গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিলেও তাঁহার ক্ষুদ্র নিবন্ধ—**"রাস-যাত্রাবিবেক"** দেখিতে না পাইয়া একটি মূল্যবান্ তথ্য জানিতে পারেন নাই। সেই তথ্য এই যে মিথিলার স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র যেমন শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেক"এর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্রূপ শূলপাণিও তাঁহার "রাস-যাত্রাবিবেক" গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের মতের উল্লেখ পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হয়, তাহা বিচার্য্য।

কোন কোন মৈথিল পণ্ডিত বলেন যে, বাচস্পতি মিশ্র গৌড়ীয় "শ্রাদ্ধ-বিবেকে"র অর্থাৎ শূলপাণি-রচিত "শ্রাদ্ধবিবেকে"র কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে "শ্রাদ্ধবিবেকে"র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মিথিলার স্মার্ত্ত রুদ্রধরের রচিত। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে রুদ্রধরের ন্যায় বঙ্গের শূলপাণির মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। যে শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেক"ও দেখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ

---

(১) J. A. S. B., Sept. 1915, pp. 336—343. চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কঠোর কর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র অবসরকালে নীরব গবেষণা দ্বারা বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকথার যে সমস্ত উপকরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। কিন্তু কৃতঘ্ন বাঙ্গালী আমরা তাঁহার সমুচিত স্মৃতিরক্ষায় পরাঙ্মুখ।

* মাধবাচার্য্যের "কালনির্ণয়" গ্রন্থে উদ্ধৃত বচনটি শূলপাণির গ্রন্থে এখন পাঠভেদে দেখা যায়। শূলপাণির উদ্ধৃত পাঠ—

"আরব্ধ্য মলমাসাৎ প্রাক্ যৎ কর্ম্ম ন সমাপিতং।
আগতে মলমাসেঽপি তৎ সমাপ্যং ন সংশয়ঃ॥"

"কালনির্ণয়ে" মাধবাচার্য্যের উদ্ধৃত পাঠ—

"প্রবৃত্তং মলমাসাৎ প্রাক্ কাম্যং কর্ম্মাসমাপিতং।
আগতে মলমাসেঽপি তৎ সমাপ্তির্ন সংশয়ঃ॥"

সোসাইটি সং—৮০ পৃঃ

বাচস্পতি মিশ্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "দ্বৈতনির্ণয়"। ঐ গ্রন্থে শূলপাণির মতের এবং রুদ্রধরের মতেরও খণ্ডন হইয়াছে।* 'উক্ত রুদ্রধর উপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী, সমসাময়িকও হইতে পারেন।

পরন্তু উক্ত রুদ্রধরও তৎকৃত "শ্রাদ্ধবিবেক" গ্রন্থে (কাশী চৌখাম্বা সং, ৫০ পৃঃ) "যত্তু ... গৌড়ীয় শ্রাদ্ধবিবেক" এইরূপ লিখিয়া শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেকে"রই উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সুতরাং মিথিলার রুদ্রধর ও বাচস্পতি মিশ্র উভয়েই যে, শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেক" দেখিয়াছিলেন—ইহা নিশ্চিত।

এখানে বলা আবশ্যক যে মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের ধর্ম্মপত্নী জয়া দেবীর অনুরোধেই বাচস্পতি মিশ্র 'দ্বৈতনির্ণয়' গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার নিজের উক্তির দ্বারাই জানা যায়। একমাত্র "পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী" ব্যতীত তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই (ভৈরবেন্দ্র সিংহের রাজত্বকালে ১৪৪০—৭৫ খৃঃ) যৌবনকাল মধ্যে রচিত হয়, ইহাও তিনি স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন।† তাঁহার ছাত্র নব্য বর্দ্ধমান ও উক্ত ভৈরবেন্দ্র দেবের সময়েই "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহাতে তিনিও শূলপাণির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

* দ্বৈতনির্ণয়ের (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৮৫৮ সংখ্যক পুথি) ৪০ ক পত্রে আছে—"যত্তু শ্রাদ্ধং যাগদানোভয়রূপমিতি শ্রাদ্ধবিবেকমতং তন্ন।" এখানে স্পষ্ট শূলপাণিরই প্রসিদ্ধ মতের উল্লেখ রহিয়াছে, রুদ্রধরের নহে। অপর, ৫৭ ক পত্রে পাওয়া যায়ঃ—"যজ্ঞদানব্রতানীত্যত্র দানপদং মহাদানপরং 'ন কুর্য্যান্মলমাসে তু মহাদানব্রতানি চ' ইত্যেকবাক্যতানুরোধাৎদিতি শ্রাদ্ধবিবেকমতং তন্ন।" ইহাও শূলপাণি গ্রন্থের মলমাসপ্রকরণ হইতে উদ্ধৃত (চণ্ডীচরণের ২য় সং, ১২৯৯, ১৭৭-৮ পৃঃ)। "দ্বৈতনির্ণয়ে"র উপর বহু টীকা রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মৈথিল কেশব মিশ্রের টীকা অতিপ্রামাণিক। কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৫২৬ শকে তাঁহার দায়কৌমুদী রচিত হয়) "দ্বৈতনির্ণয়দীপিকা" রচনারম্ভে লিখিয়াছেন—"ধৃত্বা কেশবমিশ্রস্য ব্যাখ্যানং পরতো হৃদি। বাগীশঃকুরুতে রম্যাং দ্বৈতনির্ণয়দীপিকাং॥" ঐ গ্রন্থের এক স্থলে আছে—"রুদ্রধরোপাধ্যায়মতং দূষয়িতুমুপন্যস্যতি যত্তিতি" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১ ঘ পুথির ২২ খ পত্র)। অপর একটি টিপ্পনীতেও অন্যস্থলে রুদ্রধরমতোপন্যাস ব্যাখ্যাত হইয়াছে (বারেন্দ্র মিউজিয়ামের ১৭২৮ সং পুথির ২২ক পত্র দ্রষ্টব্য)।

† "শাস্ত্রে দশ স্মৃতৌ ত্রিংশন্নিবন্ধা যেন যৌবনে। নির্ম্মিতাস্তেন চরমে বয়স্তেষ বিনির্মমে॥" পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী J. A. S. B., 1915, p. 394. চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধে (pp. 394—403) বাচস্পতি মিশ্রের ও বর্দ্ধমানের প্রমাণপঞ্জী দ্রষ্টব্য। শ্রাদ্ধচিন্তামণি ও কৃত্যমহার্ণব ব্যতীত দ্বৈতনির্ণয় (১২ ক ও ৩৮ ক পত্র) ও "কৃত্যপ্রদীপ" গ্রন্থেও "বর্দ্ধমানাঙ্কিকে"র মত গৃহীত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র রচিত কৃত্যপ্রদীপ গ্রন্থের একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি পূর্ব্বস্থলীর মঃ মঃ ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন-মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে (৬ ক পত্র দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভৈরবসিংহের রাজত্বের শেষভাগে (প্রায় ১৪৭০ খৃঃ) "দণ্ডবিবেক" রচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে (১৪৪০—৬০ খৃঃ মধ্যে) বাচস্পতি মিশ্রের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ এবং বর্দ্ধমানের ২।১ খানি গ্রন্থ রচিত হয়। রুদ্রধর তৎপূর্ব্বে এবং শূলপাণি আরও পূর্ব্বে (প্রায় ১৪২৫ খৃঃ) "শ্রাদ্ধবিবেকা"দি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শূলপাণি তাঁহার "রাসযাত্রাবিবেকে" বাচস্পতি মিশ্রের মত একাধিকবার খণ্ডন করায় আমাদিগের মনে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধান আবশ্যক।

"রাসযাত্রাবিবেক" ৪ পত্রের একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ। প্রারম্ভ শ্লোক এই :—

"নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং সুরাণামপি সেবিতং
বিবেকো রাসযাত্রায়াঃ ক্রিয়তে শূলপাণিনা॥"

পুষ্পিকা :—"ইতি শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় বিরচিতো রাসযাত্রাবিবেকঃ সমাপ্তঃ।"

প্রমাণপঞ্জী—স্কান্দ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভৃগু, হরিবংশ, ভোজ, রাজমার্ত্তণ্ড, উৎকলকলিকা, হেমাদ্রি, কালিকাপুরাণ, কল্পতরু, বরাহপুরাণ ও প্রতিষ্ঠাবিবেক ("ব্রতত্বিবৃতং প্রতিষ্ঠাবিবেকেঽনুসন্ধেয়ং")।

উক্ত "রাসযাত্রা-বিবেক" গ্রন্থে মিথিলার স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের নামোল্লেখপূর্ব্বকই তাঁহার মতের খণ্ডন দেখা যায়। (... "তীর্থচিন্তামণৌ বাচস্পতিমিশ্রেণাভিহিতং তদ্ধেয়মেব"...)। অবশ্য মুদ্রিত "তীর্থচিন্তামণি" গ্রন্থে রাসযাত্রাবিধি পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত বাচস্পতি মিশ্রের "তীর্থকল্পলতা" নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ গ্রন্থ এবং "তীর্থচিন্তামণি"র প্রাচীন প্রতিলিপির পরীক্ষা না করিয়া এ বিষয়ে কিছু স্থিরনিশ্চয় করা যায় না। পরন্তু উক্ত "রাসযাত্রাবিবেকে" দেখা যায়—

তত্র পূজাদি ব্যবস্থামাহ ব্রহ্মপুরাণে—

"যাত্রা দ্বাদশ সম্পূর্ণা যদাতুস্যাদ্দ্বিজোত্তম।
তদা কুর্ব্বীত বিধিবৎ প্রতিষ্ঠাং পাপনাশিনীং॥
প্রতিষ্ঠা স্থাপনং। তীর্থচিন্তামণাবস্তেবম্।'

মুদ্রিত গ্রন্থে (সোসাইটি সং ১৬১ পৃঃ) উদ্ধৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়॥ কিন্তু ব্যাখ্যাংশটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমরা বিভিন্ন স্থানে "রাসযাত্রাবিবেকে"র তিন-চারিখানা প্রতিলিপি দেখিয়াছি, উদ্ধৃতাংশ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তাই আমরা মনে করি প্রচলিত "তীর্থচিন্তামণি"র প্রতিলিপিতে যে সন্দর্ভ যথাযথ পাওয়া যাইতেছে না তদ্দারা "রাসযাত্রাবিবেক" গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যই সূচিত হয়, কৃত্রিমতা নহে।

গৌড় ও মৈথিল পণ্ডিতসমাজের মুকুটমণি উভয়ের যে পরস্পরের গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা অতি বিরল একটি ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে উভয়ে উভয়ের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে প্রবাদও প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ Buchanan Hamilton-সাহেব

"পূর্ণিমার" বিবরণে ১৮০৯—১০ খৃঃ পণ্ডিতদের নিকট জানিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"He (Bachaspati Misra) is supposed to have been contemporary with Sulpani of Bengal and that both flourished about 400 years ago. (Patna Ed., 1928, p. 180)

পরন্তু "শ্রাদ্ধবিবেকে"র প্রাচীন টীকাকার হরিদাস তর্কাচার্য্য ১৫০৫—২০ খৃঃ মধ্যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকার নানাস্থানে (২৫, ২৬, ৩৮ পত্রে)। হরিদাস ও শূলপাণির সমালোচিত মতবিশেষকে বাচস্পতি মিশ্রের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনিও বাচস্পতি মিশ্রকে শূলপাণির পরবর্ত্তী বলিয়া জানিতেন না ইহা নিশ্চিত শূলপাণির গ্রন্থ রচনার অনধিক ৫০।৬০ বৎসর পরে হরিদাস, শূলপাণি ও বাচস্পতি মিশ্রের সমকালীনতা জানিয়াই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়।

পূর্ব্বোক্ত নানাকারণে আমরা বুঝিতে পারি যে, মিথিলার স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের যৌবনে পূর্ণপ্রতিষ্ঠাকালে বঙ্গের স্মার্ত্ত শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় বৃদ্ধ। তিনি পরে বৃদ্ধাবস্থাতেই ১৪৬০-৭০ খৃঃ মধ্যে "রাসযাত্রাবিবেক" গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তিনি বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ পাইয়া তাঁহার মতবিশেষের খণ্ডন করেন। তৎপূর্ব্বে বাচস্পতি মিশ্র শূলপাণির "শ্রাদ্ধবিবেক" গ্রন্থ পাইয়া স্বকৃত "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে শূলপাণির মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রাণের প্রার্থনা

শ্রীসুবোধ রায়

নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হে অজস্র প্রাণ,
বিশ্বের নাড়ীর মাঝে তুমি স্পন্দমান্।
যেথা মোরা দেখি আর যেথা দেখি নাকো,
সেথা পূর্ণ মহিমায় ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকো।
মাটিরে সরস করি' অতি চুপে চুপে
বিকশি' উঠিছ নিত্য শ্যামলের রূপে ;
তৃণ, কিশলয় আর কুসুমের হাসি
তোমারি ফুৎকার-ভরা সুরময় বাঁশী ;
আকাশে, বাতাসে, গ্রহে, তারায় তারায়,
চিরপ্রবাহিত তব লীলার ধারায়
অবগাহি' এই বিশ্ব হয়েছে সুন্দর ;
নিত্য তার নব রূপ, নব জন্মান্তর।

যেথা তব নৃত্যছন্দে বাধা দেয় কেউ
সেথা গর্জ্জি ওঠে তব অন্ধকার-ঢেউ ;
চূর্ণ করি' সেই বাধা করি' দেয় পথ,
সে-পথে আবার চলে তব জয়-রথ।
আমরা চিনি না তব আঁধার-মূরতি,
মোরা দেখিয়াছি শুধু আলোকের জ্যোতি।
দুঃখ, ক্ষতি, মৃত্যু তাই লাগে ভয়ঙ্কর,
কল্পনায় স্পর্শ তার কাঁপায় অন্তর !

আঁখি মেলি' যদি দেখি, তবে মোরা জানি
আলোক ও অন্ধকার তব দুই পাণি।
এই বিশ্বকাব্য তব অপূর্ব্ব ভারতী,
জন্ম মৃত্যু যার ছন্দে গতি আর যতি।
এক সূত্রে গাঁথা ক্ষয়-ক্ষতি বেদনার
দুলিছে তোমার গলে বিচিত্র সে হার।

ওহে প্রাণ-দেব, ওহে বিশ্বের সম্বল,
দাও মোরে সেই শক্তি, দৃষ্টি অচপল,
রুদ্রের প্রসন্ন মুখ যে দেখিতে জানে
যে বুঝিতে পারে হেথা আঁধারের মানে।
সন্ধ্যারাগরক্ত এই জীবন-বেলায়
হাসিতে হাসিতে যেই প্রাণের ভেলায়
তব লীলাসাথী হ'তে আর সব ছাড়ি'
মরণ-সাগর মাঝে দিতে পারে পাড়ি।



ভারতের পুণ্যতীর্থ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএচ্-ডি, ডি, লিট্

বিহার

বৈদ্যনাথ ধাম—সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর এখন বৈদ্যনাথধাম নামে সুপরিচিত। এখানকার বৈদ্যনাথ মূর্ত্তি সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের সকল স্থান হইতে এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। বিশেষত শিবরাত্রিতে অনেক যাত্রী এখানে আসে। বৈদ্যনাথে সর্ব্বসমেত ২২টী মন্দির আছে। এখানকার জয়দুর্গার মন্দির উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, এইস্থানে সতীর দেহ পতিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ মূর্ত্তিটী দ্বাদশ মহালিঙ্গের অন্যতম।

বংসি ভাগলপুর জেলার বাঁকা মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা মন্দারগিরির নিকটে অবস্থিত। পর্ব্বতের উপরিভাগে মধুসূদনের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেবতার মূর্ত্তিটীকে এখানে আনা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন মূর্ত্তিটীকে বংসি হইতে মন্দারগিরির পাদদেশে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে একটী মেলা হয় এবং এখানকার পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রীরা আসে।

ছিন্নমস্তা—হাজারিবাগ জেলার গোলা মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। প্রাচীনকালে এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হইত।

জহ্নু আশ্রম—ভাগলপুরের পশ্চিমে সুলতানগঞ্জে জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। গৈবিনাথ মহাদেবের মন্দির একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত।

করণগড়—ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। কথিত আছে কর্ণ নামে একজন ধার্ম্মিক হিন্দু রাজার নাম হইতে ইহার নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে কতকগুলি শিবের মন্দির আছে। কেবলমাত্র একটী মন্দির প্রাচীন বলিয়া মনে হয়; অপরগুলি আধুনিক। কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন হিন্দুরা এখানে আসিয়া দেবতার মন্দিরে পূজা দেয়।

ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম—ভাগলপুর হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে ঋষিকুণ্ড নামক স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। হিন্দুদের ইহা একটী পুণ্যতীর্থ।

উড়িষ্যা

বৈতরণী—উড়িষ্যার একটী নদী। এই নদীটী কিয়নঝর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমস্থ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া যথাক্রমে কিয়নঝর ও ময়ূরভঞ্জ, কিয়নঝর ও কটক এবং কটক ও বালেশ্বর জেলার সীমার নিকটে প্রবাহিত। কটক ও বালেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী সীমানায় ব্রাহ্মণী নদীর সহিত মিলিত হইয়া ইহা ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। বৈতরণী হিন্দুদের একটী পুণ্যতীর্থ। কথিত আছে, রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারকল্পে লঙ্কা গমন কালে এই নদীর তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতি বৎসর জানুয়ারীমাসে এখানে বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

ভুবনেশ্বর—খুরদা মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা কটক হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে এবং পুরী হইতে ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার লিঙ্গরাজ মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিঙ্গরাজের অপর একটী নাম ভুবনেশ্বর অথবা ত্রিভুবনেশ্বর। ভগবতীর মন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী প্রাচীন কারুকার্য্যখচিত। এই স্থানটী যেমন পবিত্র তেমনি স্বাস্থ্যকর। এখানে যতগুলি সরোবর আছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিন্দুসাগর, দেবীপাদহর, পাপনাশিনী, কেদারগৌরী, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কপিল হ্রদ। ইহাদের মধ্যে বিন্দুসাগর সুবিস্তৃত।

গোকর্ণেশ্বর—যাজপুর মহকুমার অন্তর্গত দেউলি গ্রামে গোকর্ণেশ্বরের একটী ছোট মন্দির আছে। এই মন্দিরটী ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা উৎকল দেশের একটী প্রাচীন মন্দির। এখানে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি একটী বটবৃক্ষের তলে অবস্থিত।

যাজপুর—এই দেশে একটী মন্দিরে বিরজা নামে সতীর মূর্ত্তি আছে। বর্ত্তমান মন্দিরটী খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে বিরজা-ক্ষেত্র নামের উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দী হইতে এই স্থানটী পবিত্র বলিয়া পরিচিত।

পুরী—জগন্নাথদেবের মন্দিরের জন্য এই স্থানটী সুপ্রসিদ্ধ। বঙ্গোপসাগরের তীরে ইহা অবস্থিত। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট এই স্থানটী পবিত্র। পশ্চিমে লোকনাথমন্দির হইতে পূর্ব্বে বালেশ্বর মন্দির এবং দক্ষিণে স্বর্গদ্বার হইতে উত্তর-পূর্ব্বে মেটিয়া নদী পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এই নগরটী দুইভাগে বিভক্ত, যথা—সমুদ্রের তীরস্থ বালুখণ্ড এবং প্রকৃত শহর। স্বর্গদ্বার চক্রতীর্থের মত পরিষ্কার নয়। আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে বহু যাত্রী এখানে সমবেত হয়। এখানে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে, যথা—মার্কণ্ডেশ্বর, লোকনাথ, নীলকণ্ঠেশ্বর এবং কতকগুলি জলাশয় আছে, যথা—মার্কণ্ড, শিবগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন। জগন্নাথের মন্দির হইতে দুই মাইল দূরে গুণ্ডিচাবাড়ীর মন্দির অবস্থিত। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে অনেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যথা—চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি।

সাক্ষীগোপাল—পুরী হইতে দশ মাইল দূরে সাক্ষীগোপালের মন্দির অবস্থিত। এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণ এখানে আপনাকে প্রস্তরে পরিণত করিয়াছিলেন। পুরী হইতে প্রত্যাগমনকালে সাক্ষীগোপাল স্টেশনে নামিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া না আসিলে পুরী তীর্থগমন সফল হয় না বলিয়া যাত্রীগণের বিশ্বাস।

যুক্তপ্রদেশ

অযোধ্যা—যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত নগর। ইহা হিন্দুদের একটী পুণ্যতীর্থ। ফৈজাবাদ রেলওয়ে স্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে সরযূ নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। ফৈজাবাদ হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী চলাচলের রাস্তা আছে। অযোধ্যা শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী ছিল। এখানে রাম, সীতা, হনুমান প্রভৃতির মন্দির আছে। বর্ত্তমানকালে মানসিংহের মন্দির ও হনুমানগড় নামক অট্টালিকা অযোধ্যার প্রধান দ্রষ্টব্য।

এলাহাবাদ (প্রাচীন প্রয়াগ)—দুই বা ততোধিক নদীর সঙ্গম স্থান বলিয়া এই দেশকে প্রয়াগ-সঙ্গম বলা হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে মেলা হইয়া থাকে। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে কুম্ভ মেলা হয় এবং সঙ্গম স্থলে স্নান করিবার জন্য অসংখ্য যাত্রী সমবেত হয়। প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। রামচন্দ্র এই আশ্রমটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বদ্রীনাথ—যুক্তপ্রদেশে গড়ওয়াল জেলার একটী গ্রাম। শ্রীনগর হইতে ৫৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। অলকনন্দা নদীর মোহানার নিকটে নরনারায়ণের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই মন্দিরটী খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে কুম্ভমেলা উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বেনারস (বারাণসী)—বারাণসী হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ। বরুণা এবং অসী, এই দুইটী ক্ষুদ্র নদীর মিলন হইতে স্থানের নাম হইয়াছে বারাণসী। কাশী নামেও ইহা আখ্যাত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং বেনারসে বিন্দুমাধবের মূর্ত্তি থাকায় বৈষ্ণবদিগের নিকট এই স্থানটী পরম পবিত্র। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা এই দুইটী মূর্ত্তির হিন্দুরা পূজা করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এখানে আরও অনেক দেবমূর্ত্তি দেখা যায়। আদিকেশবের মন্দিরটী বহু পুরাতন। এখানে কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ স্নানের ঘাট আছে, যথা—দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি। মণিকর্ণিকা নামক শ্মশান ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র।

বিন্ধ্যাচল—এই দেশটী গঙ্গা নদীর তীরে একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। ইহা একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে বিন্দুবাসিনীর মন্দির আছে। বিন্দুবাসিনীর মন্দির হইতে কিছু দূরে অষ্টভুজা যোগমায়ার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, সতীর বাম পায়ের একটী অঙ্গুলী এখানে পতিত হইয়াছিল।

বিঠুর—কানপুর হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে রামায়ণ-গ্রন্থ-প্রণেতা বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

বৃন্দাবন—মথুরার পাঁচ মাইল উত্তরে যমুনা নদীর তীরে বৃন্দাবন অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দির আছে। মদনগোপালদেবের মন্দিরটী বহু পুরাতন; মদনগোপালের বর্ত্তমান নাম মদনমোহন। গোবিন্দজীর মন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোপীনাথজীর মন্দিরটী কোন এক রাজপুত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেশীঘাট, রাজঘাট, বরাহঘাট, আদিত্য ঘাট, যুগল ঘাট, শৃঙ্গারবট ঘাট—এই সকল ঘাট

সুপ্রসিদ্ধ। এই ঘাটগুলির নিকটে কতকগুলি কুঞ্জবন ও কুণ্ড আছে, যথা—নিকুঞ্জবন, নিধুবন, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতকুণ্ড ইত্যাদি।

কথিত আছে, কৃষ্ণ একটী গোহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া রাধা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করেন। সেইজন্য কৃষ্ণ একটী কুণ্ড খনন করিয়া তাহার জলে স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। এই কুণ্ডটী শ্যামকুণ্ড নামে অভিহিত। ইহারই পার্শ্বে রাধা একটী কুণ্ড খনন করাইয়াছিলেন। উহা রাধাকুণ্ড নামে পরিচিত।

গড়মুক্তেশ্বর—মীরাট জেলায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটী নগর। গঙ্গা, মন্দির ও স্নানঘাটের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। গঙ্গার তীরে তপস্যা করিয়া অনেক ঋষি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানটী হিন্দুদের নিকট পরম পবিত্র। কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে এখানে একটী বড় মেলা বসে এবং বহু যাত্রী সমবেত হয়।

গোকুল—এই গ্রামটী যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে গোকুলনাথজীর মন্দির আছে। কংসের ভয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের আলয়ে রাখিয়া মথুরায় পলায়ন করেন। পুতনা এবং তৃণবর্ত্তক নামক অসুরদ্বয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া নন্দ কৃষ্ণকে লইয়া নন্দীগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামটী খুব পুরাতন। মথুরা হইতে গোকুল পর্য্যন্ত মোটরগাড়ী চলাচলের রাস্তা আছে। ভারতের সকল স্থান হইতেই যাত্রীরা এখানে আসে। চৈতন্যের সমসাময়িক বল্লভাচার্য্য এইখানে স্বীয় মত প্রথম প্রচারিত করেন এবং মহাবনের অনুকরণে নূতন গোকুল প্রতিষ্ঠা করেন।

গোবর্দ্ধন গিরি—মথুরা হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে হরিদেব, চক্রেশ্বর ও মহাদেবের মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত শ্রীনাথজীর (গোপাল) মূর্ত্তি আছে। মথুরা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে মহাবন অবস্থিত। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী পুণ্যস্থান।

হরিদ্বার—সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গা নদীর তীরে হরিদ্বার অবস্থিত। মহাভারতে ইহা গঙ্গাদ্বার এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে মায়াপুরী নামে অভিহিত। গঙ্গানদীর তীরে বিদুর মৈত্রেয় মুনির দ্বারা পঠিত শ্রীমদ্ভাবগবৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে এখানে অবতরণ করিতেছে। এখানে নকুলেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

হৃষীকেশ—হরিদ্বার হইতে ২০ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। বৈষ্ণবদের মতে ইহা নারায়ণের বাসস্থান। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত বদরিনারায়ণের মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে গঙ্গা নদী সর্ব্বদাই বরফে আচ্ছন্ন। অর্দ্ধ বদরিনারায়ণের মন্দিরটী অত্যন্ত সুন্দর। অনেক সাধু এখানে বাস করেন।

কন্খল—হরিদ্বার হইতে দুই মাইল পশ্চিমে একটী গ্রাম। গঙ্গা নদী ও নীলাধর নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট ইহা অবস্থিত। এই স্থানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল।

লছমনঝোলা—হৃষীকেশের অনতিদূরে ইহা অবস্থিত। এখানকার পার্ব্বত্য দৃশ্য অতি মনোরম। হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ যাওয়া যায়। হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার মধ্যস্থিত স্বর্গদার ও কৈলাসাশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মথুরা—বর্ত্তমান মথুরা দুইভাগে বিভক্ত, মথুরা শহর ও মথুরা সেনানিবাস। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী ও জনাকীর্ণ নগর। এখানে অনেক মন্দির আছে, যথা—কেদারেশ্বর মন্দির, কুব্জা মন্দির, কালভৈরব মন্দির ইত্যাদি। এখানে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং সুন্দর। কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

নৈমিষারণ্য—সীতাপুর জেলার অন্তর্গত গুম্‌তি নদীর তীরে অবস্থিত। ৫১টী পীঠস্থানের মধ্যে ইহা একটী। পুরাণ-প্রণেতা আর্য্য ঋষিদের ইহা বাসস্থান ছিল। এখানে প্রায় ষাট হাজার ঋষি বাস করিতেন। এখানে হিন্দু যাত্রীদের জন্য দুইটী ধর্ম্মশালা আছে। প্রতি মাসে অমাবস্যার দিন একটী মেলা হয়।

পঞ্জাব

ব্রহ্মোর (ব্রহ্মপুর)—এই গ্রামটী চম্বা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানে তিনটী প্রাচীন মন্দির আছে। যে মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেইটী শিবের অবতার মণিমহেশের উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় মন্দিরটী বিষ্ণুর অবতার নরসিংহের উদ্দেশ্যে এবং তৃতীয় মন্দিরটী লক্ষণাদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

ধরমশালা (ধর্ম্মশালা)—কাঙ্গড়া জেলার প্রধান নগর। কাঙ্গড়া হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। সেপ্টেম্বর মাসে এখানে একটী বড় মেলা হয় এবং বহু লোকের সমাগম হয়। ভগ্সুনাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটী এখান হইতে দুই মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

অমৃতসর—শিখদিগের একটী পুণ্যতীর্থ। ইহা লাহোর হইতে ৩৩ মাইল পূর্ব্বে, কলিকাতা হইতে রেলপথে ১২৩২ মাইল, বোম্বাই হইতে ১২৬০ মাইল এবং করাচী হইতে ৮১৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

এখানকার স্বর্ণমন্দির ও সরোবর সুপ্রসিদ্ধ। গুরু রামদাস এই সরোবরের নিকটে বাস করিতেন। অমৃতের সরোবর বলিয়া এই সরোবরটীকে অমৃতসর বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, রামদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অমরদাসের নাম হইতে সরোবরটীর নাম হইয়াছে অমৃতসর। গুরু অর্জ্জুন মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী ভারত হইতে চলিয়া গেলে মন্দিরটীর পুনরুদ্ধার করা হয়। এই সময় হইতে অমৃতসর প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীষ্টীয় ১৮০২ সালে রণজিৎ সিং বহু অর্থব্যয় করিয়া মন্দিরটীর সংস্কার করেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিক সরোবর-বেষ্টিত।

জ্বালামুখী—কাঙ্গড়া জেলার একটী প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে ইহা একটী সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল; পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জ্বালামুখী দেবীর মন্দিরের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। দেবীর মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইতেছে বলিয়া স্থানের নাম জ্বালামুখী। কাহারও কাহারও মতে জলন্ধর নামক দৈত্যের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হয় বলিয়া এই স্থানটী জ্বালামুখী নামে সুবিদিত। এই দৈত্যকে শিব বিনাশ করিয়াছিলেন। যখন যাত্রীর সমাগম খুব বেশী হয় তখন ব্রাহ্মণেরা ঘি ঢালিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখে। ভবনের মন্দিরে দেবীর মস্তকহীন মূর্ত্তি সুরক্ষিত আছে। মন্দিরের প্রচুর আয় ভোজ্কি পুরোহিতদের প্রাপ্য। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এখানে একটী উৎসব হয় এবং সেই সময় বহু যাত্রী সমবেত হয়।

কালাইত—পাতিয়ালা রাজ্যের একটী গ্রাম। কাইথল হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। চারিটী প্রাচীন মন্দিরের জন্য এই স্থানটী প্রসিদ্ধ। রাজা শালবাহন এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরগুলি নানাবিধ কারুকার্য্যে শোভিত।

কটাস—ঝেলাম জেলার অন্তর্গত একটী পবিত্র দহ। ইহা হইতে একটী ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দহে স্নান করিবার জন্য অনেক যাত্রী এখানে আসে। কথিত আছে, সতীর মৃত্যু হইলে শিবের চক্ষু হইতে যে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে দুইটী জলাশয়ের সৃষ্টি হয়—একটী কটাস অথবা কটাক্ষ এবং অপরটী আজমীঢ়ের নিকটে অবস্থিত পুষ্কর।

কোটেরা পর্ব্বতের পাদদেশে ১২টী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে সাতঘর বলা হয়। কথিত আছে, অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবেরা এখানে বাস করেন।

মুক্তসর (মুক্তেশ্বর)—ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে জানুয়ারী মাসে শিখদের একটী বড় উৎসব হয়। ১৭০৫ সালে গুরু গোবিন্দ সিং রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারই স্মৃতিকল্পে তিন দিন ব্যাপী এই উৎসবটী অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী সুবৃহৎ সরোবরে বহু যাত্রী স্নান করে।

নিরমান্দ—কাঙ্গড়া জেলায় কুলু মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরটী পরশুরামের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

পহোয়া—কার্নাল জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। থানেশ্বর হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। ইহার নিকটে পৃথুডকেশ্বর এবং স্বামী কার্ত্তিকের মন্দির আছে। পৃথুডকেশ্বরের মন্দিরটী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত। কার্ত্তিকের মন্দিরটী ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠিত।

থানেশ্বর—কার্নাল জেলার অন্তর্গত সরস্বতী নদী তীরস্থ একটী প্রধান নগর। থানেশ্বর অথবা স্থানেশ্বর বলিতে ঈশ্বরের স্থান অর্থাৎ পুণ্যস্থান বুঝায়। হুয়েন-সাং এই স্থানটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ইহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর মামুদ এই স্থানটী আক্রমণ করেন এবং মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন। ১০৪৩ সালে দিল্লীর হিন্দু রাজারা ইহা পুনরুদ্ধার করেন। আওরঙ্গজেব এখানকার পবিত্র হ্রদের মধ্যে একটী দুর্গ স্থাপন করেন। এই দুর্গ হইতে তাঁহার সৈন্যেরা যে সকল তীর্থযাত্রী স্নান করিতে যাইত তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিত। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর ইংরেজদের হস্তগত হয়। দ্বৈপায়ন হ্রদ এখানে অবস্থিত। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে বহু সংখ্যক যাত্রী এখানে স্নান করিতে আসে। ক্রমশঃ

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

বিনয় যখন পরীক্ষা সমাপনান্তে বাড়ী আসিল তখন তাহার এই উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে বাড়ীর যেটুকু সাচ্ছল্য ছিল সমস্তই কর্পূরের মত উড়িয়া গেছে। তবুও আজ অনেকদিন পর সে-বাড়ীতে আনন্দের একটা সাড়া পড়িয়াছে। সবাই মনে করিতেছে দুঃখের দিন যাহা ছিল কাটিয়া গেল, এবারে সমস্ত ভাবনা চিন্তা কর্ত্তব্য দায়িত্ব বিনয়ের ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা।

রত্নময়ী একনিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন, বাবা, অতুলটা তো উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। তাকে এইবার তোর কাজ হয়ে গেলেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দে। আর মেয়েটার বিয়ে, তা এবারে সে বিষয়েও একটু চাড় করতে হয়েছে। মেয়েটার পানে আর তো চাওয়া যায় না।

বিনয় ম্লান হাসিল। মনে মনে ভীত হইল। এই সমস্ত সংসার বুভুক্ষুর মত করুণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। এত বড় দায়িত্ব সে কেমন করিয়া বহন করিবে! মাকে বলিল, সমস্ত ছুটিটা এখানে বসে থাকলে তো চলবে না। দু-চার দিন থেকেই আমি ক'লকাতা চলে যাব। কাজ জোগাড় করা কি আজকাল মুখের কথা মা! দেখি কি হয়। বলা যায় না কিছুই।

রত্নময়ী কহিলেন—পাশ তুই নিশ্চয়ই করবি। আর পাশ করলেই সেই যে তোর বাবার চেনা কে একজন বন্ধু—

বিনয় আবার বড় ম্লান হাসিয়া কহিল, সংসারে সব জিনিষেই অত স্থিরনিশ্চয় সিদ্ধান্ত করে ব'সে থেকো না মা। বিশেষ বড়লোকের বন্ধুত্ব। তাঁদের খেয়ালখুশী কখন যে কি পথে চলে!

রত্নময়ী কিন্তু তেমন নিরাশ না হইয়া বলিলেন, আমি বলছি ঠিক লেগে যাবে। কত মুরুখ্যু লোকে মুরুব্বির জোরে কাজ পাচ্ছে আর তুই তো তিন তিনটে পাশ দিলি।

নীহার আজ বড় উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া রান্নার কাজে লাগিয়াছে, রাখু বাগ্‌দীকে বলিয়া কহিয়া জাল কাঁধে সে মাছের সন্ধানে পাঠাইয়াছে। দাদাকে কিসে কেমন করিয়া একটু যত্ন করা যায়, কোন্ জিনিষটি হইলে তাঁর সুবিধা হয় সেদিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রহিয়াছে। চা করিতে বসিয়া চায়ের সরঞ্জামের মধ্যে কেবল একটি এনামেল করা বাটি ও একটা ভাঙ্গা কেৎলি দেখিয়া সে সইয়ের কাছে গোটা দুই পেয়ালা চাহিয়া আনিতে মালতীদের বাড়ীতে ব্যস্তভাবে আসিল। মালতী তখন সবেমাত্র রান্না চড়াইয়া মশলা পিষিতেছে।

নীহার কহিল, সই, তোমার আলমারী থেকে আমাকে গোটা দুই পেয়ালা দাও না বার করে। দাদা কাল রাত্রিতে এসেছে। সকালে উঠেই চা খাওয়া অভ্যেস। অথচ আমাদের এতদিন ও পাট ছিল না, কাজেই কিছুই সাজ-সরঞ্জাম নেই।

মালতী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, তাই নাকি? দাঁড়া ভাই, আমি হাতটা ধুয়ে চট্ করে পেয়ালা নিয়ে আসি।

মালতীর মামাবাড়ী কলিকাতায়, তাহার মামারা সৌখীন অবস্থাপন্ন লোক। আদর করিয়া মা-মরা ভাগিনেয়ীকে অনেক জিনিষ অনেক উপহার দিতেন, সে সমস্ত সে যত্ন করিয়া একটা আলমারীতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। আলমারী খুলিয়া পেয়ালা পীরিচ্ চা-দানি—সমস্ত বাহির করিয়া নীহারের হাতে দিয়া বলিল, এই নে, এ বাসনগুলো এখন আর ফেরত দিসনে। হয়তো অসুবিধে হবে। আমার এখানে তো কোন দরকারে লাগে না, ভরাই থাকে।

নীহার খুশী হইয়া বাসনগুলা লইল। তাহার কাজের তাড়া ছিল, তখনও অনেক কাজ বাকী, দাঁড়াইবার অবসর নাই। চলিয়া যাইবার সময় অনুনয় করিয়া বলিল, একবার যাস্ ভাই মালতী ওবেলা।

মালতী হাসিয়া কহিল, যেতে তো খুবই ইচ্ছে করে। কিন্তু জানিস ত সব। যাব একবার নিশ্চয়—যেমন করেই হোক। তোর দাদা নতুন কিছু বই এনেছেন?

—হ্যাঁ, এনেছেন। রবিঠাকুরের 'মানসী' আর

'শিশুভারতী' নামের কতকগুলো মাসিকপত্র। না গেলে কিন্তু পড়তে দিচ্ছিনে।

নীহার চলিয়া গেল। মালতী হাসি হাসি মুখে আবার তাহার অসমাপ্ত কাজে মন দিল। সেই তো খড়ের চালের রান্নাঘর ছেঁচা বাঁশের প্রাচীর। সেই হাঁড়ি কুড়ি, শিল নোড়া লইয়া মশলাপেষা, সেই চিরদিনের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। কিন্তু মালতীর কাছে সমস্তই যেন আনন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। আজ ছোটমার বকুনি, গৃহের যাবতীয় উঞ্ছ কাজ, ছোট ভাইয়ের দুরন্তপনা অত্যাচার, কিছুই যেন আর গায়ে লাগিতেছে না।

চায়ে চুমুক দিয়া বিনয় কহিল, এসব নতুন পেয়ালা, চায়ের আসবাব কোথা থেকে পেলি নীহার?

নীহার সগর্ব্বে কহিল, আমার সই মালতীর কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। মালতী তোমার কথা প্রায় বলে। নতুন কোন বই পাঠিয়েছ কি-না, কতবার জিজ্ঞেস করে। যখনই কোন বই পাঠাও, আগে আমার কাছে কেড়ে নিয়ে পড়ে।

বিনয় চা খাইতে খাইতে বাইরের কাঁঠাল গাছটার দিকে চাহিল। তাহাদের বাড়ীটা একটু একপাশে, এধারে গ্রামের বিরল বসতি। স্নিগ্ধ পল্লী-প্রভাতের রৌদ্রে সবুজ পাতাগুলি যেন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আপনাদের মেলিয়া ধরিয়াছে। একটা কাঠবিড়ালী গাছের গুঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে। এই স্নিগ্ধ প্রশান্তির দিকে চাহিলে মালতীর কথা মনে পড়িয়া যায়। তাহার কালো চোখে এই শান্ত পরম সহিষ্ণু নির্ভরতাময় ভাব মাখানো।

বিনয় প্রশ্ন করিল, আচ্ছা নীহার, তোর সই কেমন ক'রে লেখাপড়া শিখলো? শুনেছি তার সৎমা নাকি তাকে সারাদিন খাটিয়ে নেয় আর ভারি কষ্ট দেয়।

নীহার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই তাই। তবে সে এতদিন ক'লকাতায় তার মামাবাড়ীতে থাকত। তার মামা খুব বড়লোক না হ'লেও তাকে খুব স্নেহ যত্ন করে রেখেছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলেই বেচারা যথেষ্ট সুখী হ'ত। কিন্তু তার মামা হঠাৎ মারা গেলেন। কলকাতায় একা বাসা বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে মামীমা তার একলা থাকতে পারেন না। তাই ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি বাপের বাড়ী চলে গেছেন।

বিকালের দিকে মালতী আসিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বিনয়ের ঘরে আলো জ্বালিয়া আনিয়া দিল নীহার। মালতী একটু সলজ্জ হাসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। বিনয় সহজভাবে তাহাকে কুশল-প্রশ্ন করিয়া বসিতে বলিল। পাড়াগাঁয়ের পক্ষে মালতী একটু অসাধারণ। তাহার সুকুমার মার্জ্জিত মনটি লইয়া তাহার বাপের বাড়ীতে ও ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে যে মেয়েটিকে অনেক দুঃখ পাইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া বিনয়ের মনটি আর্দ্র হইয়া উঠিল।

তারপর নীহার ও মালতী আবিষ্ট হইয়া শুনিতে লাগিল, তাহাদের বারংবার অনুরোধে বিনয় তাহার এইবার-কার আনা রবিঠাকুরের কবিতার বই সঞ্চয়িতা হইতে পড়িতে লাগিল:

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি'
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে।
শুধু কি চাহিব শূন্যে, কেন নিজে নাহি লব চিনে'
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্‌গা পাশে।
দুর্জ্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ ..."

পড়া হইয়া গেলে মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, তুলসী প্রাঙ্গণে প্রদীপটি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে শাঁখের আওয়াজ শোনা যাইতেছে। আকাশে দু'-একটি করিয়া তারা উঠিতে শুরু করিয়াছে। মালতীর চিরাভ্যস্ত জীবনের উপর হইতে হঠাৎ যেন একটা পর্দ্দা উঠিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, এতদিন যেমন করিয়া দিন কাটিয়াছে সে ভাবে দিন কাটান যে কত অন্ধকার ছোটো আজ বড়

করিয়া চোখে পড়িতেছে। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ওমা, সন্ধ্যে যে কখন হয়ে গেছে, যাই। কত কাজই পড়ে রয়েচে।

নীহার অনুরোধ করিয়া বলিল, যাবি কেন, আর একটু বোস্ না।

মালতী ভীতকণ্ঠে বলিল, না ভাই, এতেই ছোটমার কাছে হয় তো কত বকুনি শুনতে হবে। আর ··· কি বলিতে গিয়া বিনয়ের দিকে চোখ পড়ায় সে থামিয়া গেল। সেথান হইতে ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল কথাটা শেষ না করিয়াই।

বিনয় বইখানা মুড়িয়া না রাখিতেই বাইরে কাশির খক্ খক্ আওয়াজ শোনা গেল এবং পরেশ খুড়ো লাঠি হাতে ঢুকিলেন। তিনি গ্রামসম্বন্ধে বিনয়ের গুরুজন, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিবেশী। তিনি কি বলেন শুনিবার জন্য বিনয় নতমস্তকে সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বার দুই কাশিয়া হাতের লাঠিটা দেওয়ালের কোণে ঠেকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, ঐ মেয়েটি কে হন হন ক'রে এইখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল বিনু? আমাদের অনন্তর কন্যে মালুর মতই বোধ হ'ল না?

নীহার বলিল, হ্যাঁ পরেশকাকা, আমার সই মালতী এসেছিল। পরেশ গম্ভীর হইয়া গিয়া কহিলেন, হুঁ। তা দেখ নীহার, একটা কাজ কর দিকি বাপু, এক কল্কে তামাক খাওয়া দিকি মা।

তামাক সাজিয়া আনিবার জন্য নীহার চলিয়া গেলে পরেশ উপদেশ দিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দিই বিনয় বাবাজী। অনন্ত বোসের ঐ নষ্টা মেয়েটার সঙ্গে বেশি মেলামেশা কোরো না, বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।

বিনয় চমকাইয়া উঠিল। বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া সে সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ লোকটার দিকে চাহিল। এ কি! বয়সে বৃদ্ধ এবং সম্পর্কে গুরুজন হইয়া তিনি ভদ্রঘরের একজন কুমারী মেয়ের নামে অসঙ্কোচে কি গর্হিত কথাই না উচ্চারণ করিলেন। মনে কোন বিকার নাই, কণ্ঠে জড়তা নাই। দিব্য সহজ প্রফুল্লভাবে পরচর্চ্চার সুরে পরেশ আবার বলিতে লাগিলেন, এখন মনে করচ বাবাজী এ বুড়োটা আবার বলে কি! কিন্তু যা বলচি তার প্রত্যেকটি কথা খাঁটি সত্য কি-না পরখ করে দেখে নিও। অত বড় ধাড়ি মেয়ে, এই সেদিন পর্য্যন্ত কলকাতায় মামার কাছে থেকে বাইউলির মত নাচ গান শিখেছে, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরতে শিখেছে, শেখেনি কি! তাইতেই না এত বড় বয়স অবধি বিয়ে হচ্ছে না, নইলে অনন্ত ভায়ার অবস্থা তেমন মন্দ নয় যে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না।

নীহার তামাক লইয়া আসায় পরেশ কথাটা আর অগ্রসর হইতে দিতে পারিল না। কেবল থামিয়া হুঁকায় দু'-একটা টান দিয়া বলিলেন, তারপর বাবাজী, কলকাতা যাচ্ছ কবে? শুনলাম কাজকর্ম্মের একটু সুবিধে নাকি এর মধ্যেই করে ফেলেছ, কেবল পাশের খবরটা বার হ'লেই হয়।

বিনয় উত্তরোত্তর শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। চাকরি তাহার এক রকম ঠিক হইয়াই আছে এই কথাটা গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেছে কেমন করিয়া। পাড়াগাঁয়ে একটা কথা একবার বাহির হইলে মুখে মুখে তাহা পল্লবিত এবং প্রচারিত হইতে বেশি দেরী হয় না। এ কথা কে রটাইল, কেনই বা রটাইল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বিনয়ের মা নিজেই যে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে প্রত্যেক দিনই নানা ছলে গল্প করিয়াছেন—তাঁহার বিনু পাশটা দিলেই বড় চাকরিতে বাহাল হইবে—একথা সে জানিত না। তাই ভীত এবং লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে না। আজ-কালকার বাজারে চাকরি জোগাড় করা কি মুখের কথা? ঠিক কিছুই হয়নি। চেষ্টা করতে হবে। শীগ্‌গীর যাব ক'লকাতা।

পরেশ মৃদু স্মিত হাস্যে কহিলেন, আরে বাবাজী, সাক্ষাৎ শাস্ত্রের বচন যাবে কোথা। ঐ যে আমাদের শাস্ত্রে কি একটা কথা আছে—বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। হাজার হোক, তিনটে পাশ বিদ্বান তো বট। তাই ঘুরিয়ে বলচ কথাটা। কিন্তু সে যাই হোক বাপু, একটু ভালো চাকরি-টাকরি হলে আমার দেবাটার একটু গতি ক'রে দিও। বামুনের ঘরের ছেলে দু'পাতা লেখাপড়াও শিখেচে, ছোট মোট একটা যাতে হয় ঢুকিয়ে দিলে একবার নিজের আখের নিজেই গুছিয়ে নেবে। সেই যে বলে, ছুঁচ হয়ে ঢুকি তো ফাল হয়ে বার হই। আসলে ঢোকা নিয়েই কথা। ঐ কাজটি বাপু, তোমাকে করে দিতেই হবে। যেমন করে পার।

বিনয় শুনিতে শুনিতে উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া

পড়িতেছিল। সে নিজেই নিজের সমস্যার ভারে ক্লান্ত জর্জ্জর অবসন্ন। ভাবিয়া ভাবিয়া কোথাও কিছু কূল-কিনারা পাইতেছে না। অথচ ইহারই মধ্যে কেমন করিয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেছে, সে ইচ্ছা করিলেই মুরুব্বি হইয়া যাহা তাহা ছোট-মোট একটা কাজ পরেশ ভট্‌চাযের বেকার ছেলে দেবুকে বা ক্ষান্ত পিসীর ভাইপোটাকে জুটাইয়া দিতে পারে! হায় রে, তাহার উপর এই অভ্রভেদী বিশ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ছবিটা যখন ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে তখন ঐ পরেশ খুড়ো, ঐ ক্ষান্ত পিসী কি ঘৃণা এবং ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিবে। সেই দৃষ্টি কল্পনার চোখে দেখিতে পাইয়া এখন হইতেই সে যেন কাঠ হইয়া উঠিল। তথাপি পরেশের হাত হইতে নিস্তারের আর অন্য উপায় না দেখিয়া সে মৃদু বিনীতকণ্ঠে কহিল, যে আজ্ঞে। পরেশ খুশী হইয়া হাতের হুঁকাটায় গোটা দুই টান দিয়া বলিলেন, আমি বলি কি পরশু দিনটে ভালো আছে, ঐ দিনটায় তুমি দুর্গা দুর্গা বলে ক'লকাতায় চলে যাও। বৃথা দেরী করে আর কি হবে। কথায় বলে, শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্। তাঁহার এই বহুমূল্য সদুপদেশও বিনয় মাথা পাতিয়া নির্ব্বিচারে মানিয়া লইল। তখন আরও খুসী হইয়া হাতের হুঁকাটা সাবধানে দরজার কোণে ঠেশাইয়া রাখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দরজার নিকট অবধি গিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিলেন, আর দেখ, আর একটা কথা বলে যাই। তোমরা হ'লে একেবারে সাক্ষাৎ নিজের জন, তাই মনে করেই বলচি। ঐ ছুঁড়িটার সঙ্গে তোমার বোনের অত মেলামেশা ভালো নয়। হাজার হোক, নীহার বেটির বয়স তো কম নয়। সময়ে বিয়ে হ'লে এতদিন দু-তিন ছেলের মা হ'ত। ঐ কাজটি কিন্তু ভালো করছ না বাবাজী। শশীদা বেঁচে থাকতে একথা আমি অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। চেষ্টাও তাঁর কম ছিলো না, তবে বুঝলে কি-না ঠিক সময়টি না এ'লে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ না হ'লে শুধু তোমার আমার চেষ্টায় তো আর কিছু হবে না। কিন্তু আর দেরী করা ভালো দেখাচ্ছে না। যা পাও একটা খুঁজে পেতে এ'নে কন্যা দান করে দাও।

এক নিঃশ্বাসে এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। খানিকক্ষণ কাশিয়া আর একবার শীঘ্র কলিকাতা যাইবার উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

নীহার চোখ মুখ লাল করিয়া ঘরে ঢুকিল। বোধ করি সে কাছাকাছি কোথাও ছিল, সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিল। উত্তেজিত স্বরে কহিল, এতক্ষণ ধরে পরেশ-কাকার ছাই-ভস্ম কি কথা শুনছিলে দাদা? তোমার লজ্জা লাগে না এসব শুনতে?

বিনয় ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, আমি যে বাঙ্গালী, নীহার। বাঙ্গালীদের আর এসব কথা বলতেও লজ্জা করে না, শুনতেও লজ্জা করে না।

নীহার তাহার কথায় কান না দিয়াই বলিল, আসল কথা তুমি জান না দাদা। মালতীর উপর ওঁর অত রাগ অত মিথ্যা বিদ্বেষ কেন জানো? সে যদি শোন, তবে সত্যিই লজ্জায় তোমার মাথা হেঁট হবে। ঐ পরেশ-কাকা বয়সে মালতীর বাপের সমান। ছেলেপুলে, মেয়েজামাই, বাড়ী একেবারে ভর্ত্তি। আজ বছরখানেক হ'ল স্ত্রী মারা গেছেন। দিনকতক আগে ঘটক পাঠিয়ে মালতীর সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করেন। ছি ছি, ভাবতে পার এমন কথা! মালতী তার বাবাকে বলেছিল, এমন হ'লে সে লুকিয়ে কাউকে সঙ্গে নিয়ে মামাবাড়ী পালিয়ে যাবে। পরেশকাকা তাই শুনে খাপ্‌পা হয়ে উঠেছেন। পথে ঘাটে যাকে পাচ্ছেন তাকেই দাঁড় করিয়ে ওর নামে মিথ্যে করে-যা তা শোনাচ্ছেন। তাই আজ তোমাকেও অযাচিত উপদেশ দিয়ে গেলেন।

নীহারের কথা শুনিয়া বিনয় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাঙ্গালা দেশের মেয়ে হইয়া জন্মানো কি এতই অপরাধ!

মালতীকে তাহার মনে পড়িল, সরলতাপূর্ণ শান্ত তাহার মুখের রেখা, ইহার মধ্যেও যে সত্যকার তেজ লুকান আছে মনে করিয়া তাহার প্রতি সে শ্রদ্ধা অনুভব করিল। নীহারের দিকে চাহিয়া বলিল, না, পরেশকাকার এ কথা আমি জানতাম না। তুই না বললে হয়. তো বিশ্বাসও করতাম না। এমনই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নীহার। এই সব অসহ্য পাপ পুঞ্জীভূত হয়েই আজ বাঙ্গালার শোচনীয় পরাজয় চারিদিকে সম্ভব করে তুলছে। কিন্তু তোর সই মালতী যে পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দাঁড়িয়েছে, জড়তা আর অসহায়তার ভারে ভেঙ্গে পড়েনি, তা জেনে ওর প্রতি

আমার খুবই শ্রদ্ধা হ'ল। মেয়েদের দরকার পড়লে এমনই করে নিজের সম্মান নিজে বাঁচাতে শিখতে হবে।

১৬

তাহার পরের দিন রাত্রির ট্রেনে বিনয় কলিকাতা গেল। আসিবার সময় মা হাস্যোৎফুল্ল মুখে পূর্ণ ঘটটা একবার ঠিক করিতে লাগিলেন, দধিমঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক দইয়ের পাথর বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া আনিলেন। ট্রেন রাত্রি ন'টায়। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশন এখান হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরে। বেলা তিনটা-চারটায় সে গরুর গাড়ী করিয়া রওয়ানা হইল। ভাই বোন মা—সবারই হৃদয় আশায় এবং আনন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, এ যেন বিনয়ের জয়যাত্রা। পাড়াপ্রতিবেশীরা অবধি তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ আশা ও উৎসাহসূচক কথা বলিল, কেহ বা বাড়ীতে দু'দিন জুড়াইতে না পাইয়াই আবার যে তাহাকে ছুটিতে হইতেছে এজন্য সমবেদনা প্রকাশ করিল। পরেশ তাঁহার অনুরোধ আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। অপরাহ্নের বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে, শীতের হাওয়া শূন্য প্রান্তরের ভিতর দিয়া বহিতেছে। বিনয় একাকী শূন্য মনে গরুর গাড়ীর ছইয়ের ভিতর আসিয়া বসিল। ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়া, মেঠো রাস্তার উপর দিয়া কখনও গ্রামান্তের গৃহস্থ বাড়ীর অঙ্গনের পাশ দিয়া গাড়ী চলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শীতকালের বেলা নিঃশেষে নিভিয়া গেল। 'গায়ের কাপড়টা গায়ে ভালো করিয়া জড়াইয়া বিনয় ছইয়ের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, মাঠ ব্যাপিয়া অন্ধকারের স্রোত নামিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের নিকষ কালো আকাশে তারার আলো কাঁপিতেছে। নিকটে দূরে কোথাও আর কিছু দেখা যায় না। কেবল গরুর গাড়ীর সঙ্গের কেরোসিনের বাতিটি ক্ষীণ শিখায় জ্বলিতেছে। ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, একটা গাড়ী আসিয়া বোধ করি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়াছে। তীব্র হুইসিল্ শোনা যাইতেছে। অন্ধকার রাত্রিকে চিরিয়া যেন একটা আর্ত্তনাদ। বিনয়ের মনটা দুলিতে লাগিল। অন্ধকার ভবিষ্যতের বুক চিরিয়া তাহার এই শঙ্কিত অনির্দ্দেশ যাত্রা, না জানি ইহার শেষ কোথায়, থামিবে কেমন করিয়া। নিরাশার অতলতায়, না সফলতার আলো একটু-খানিও অন্তত আসিয়া পড়িবে তাহার যাত্রাপথে। কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে। ক্রমশঃ

অস্তদিনে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণের সেই দিনে উৎকণ্ঠিত অস্তাচল দ্রুত বুঝি এল আগুসরি,
আকাশে ছিল না মেঘ, ওঠেনি গুমরি দেয়া বরষার অন্ধকারে ভরি।
পূর্ব্বরাত্রি পূর্ণিমার শুভ্রালোকে ছিল ভরা অনিন্দিত মেদিনী আকাশ,
বিনিদ্র তারার সাথে ওঠা-নামা করেছিল প্রতীক্ষিত বহু দীর্ঘশ্বাস।
যে রবি প্রত্যহ ওঠে পূর্ব্বাশার দ্বারপ্রান্তে বর্ণময় যবনিকা তুলি,
নিত্য সে বিশ্রাম লভে পশ্চিম সায়াহ্ন-কক্ষে পরিক্রমা-পথ নাহি ভুলি।
আমাদের সেই রবি একদা পাঠায়েছিল সারা বিশ্বে আলো, হাসি, গান,
জীবন-কাকলী কত পরিস্ফুট হয়েছিল বসন্ত শরতে করি স্নান।
নভোচারী বিহঙ্গের পক্ষ বিধুনন সাথে ঝিলমের বক্র-অসিরেখা,
কালের কপোলতলে একবিন্দু শুভ্র অশ্রু চিরদিন রহে বুঝি আঁকা।
হৃদয়-যমুনা নীরে কুম্ভ কান্না ভরে যায়, মৃত্যুশ্যাম পরশ রভসে
বিকচ কদম্ব প্রায় শিহরি উঠিত তনু কলাপীর উতলা আলাপে,
বিশ্ব-অরবিন্দ মাঝে চির-যৌবনার লাস্য ফুটেছিল মধুর অম্লান
দূরতম জ্যোতিষ্কের গাঢ়তম প্রাণরস আকণ্ঠ সে করেছিল পান।

শালবনে ঝরে যবে শাওনের বারিধারা চাঁদ-হারা সুপ্ত নীলাকাশ
ব্যোমে বিশ্বে কানাকানি নিশীথ রাত্রির বুকে প্রাণকথা প্রথম প্রকাশ।
অচ্ছোৎ সরসীনীরে হেরি নিজ প্রতিবিম্ব রেবা মালিনীর কূল জাগে,
সাগর-সঙ্গম-তীর্থে ক্ষুধিত দেবতা হাসে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা পথে কেবা মাগে ?
নাগর নদীর কূলে চৈতালীর হাওয়া লাগে—মর্ম্মরিয়া ওঠে কার প্রাণ,
চির মাতা বালিকার পরিপূর্ণ রূপখানি স্বর্ণ তুলিকায় পায় স্থান।
বুদ্ধ পূজা লাগি শ্যামা স্তূপমূলে জ্বেলেছিল হৃদয়ের অনির্ব্বাণ শিখা
ব্রহ্মচারী বাণী পিয়ে পতিতার চক্ষে বুঝি দিব্য বিভা যায় ওই দেখা।
সোনার ফসলে ভরা স্বর্ণ তরীখানি কার এপারের বালুচরে লাগে,
উষর মরুর বুকে কত বালু ফুল হলো, সৌরভেতে চিত্ত কত জাগে।
ভারতের তীর্থক্ষেত্র মিলনের কবি-স্বপ্নে কোন দিন হইবে সফল
ভিখারী বালক সম দেবীর প্রাঙ্গণ তলে আছি মোরা প্রতীক্ষা-চঞ্চল।
কার হার-ছেঁড়া মণি দুলালের রথচক্রে পিষ্ট হয়ে লভিছে মরণ,
ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কোথা যামিনী ফুরায়ে গেল—ফুলকলি মুদিল নয়ন !
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কোন্ শিলাতট 'পরে, অন্তর্যামী কহে কোন্ বাণী,
'যেতে নাহি দিব' বলি কোন্ কন্যা কণ্ঠস্বর নিত্য রুধে যাত্রাপথখানি ?
শহরের সৌধে কাঁদে বন্দিনী বধূর দল, আকাশে সুচির চাঁদ হাসে
অস্তগিরি শির'পরে অলক্ষিতে নামে সন্ধ্যা—ওপার হইতে শীত আসে।
আত্মার স্বরূপ জানি ভয়ের মুখোস যেথা খুলিয়া গিয়াছে বহুদিন,
অর্দ্ধেক শতক ধরি বৈরাগ্য বীণায় বাজে সেই সুর দুঃখগ্লানিহীন।
প্রকৃতির তুচ্ছ দান, মানুষের মর্ম্মক্ষত—অবিশ্রান্ত উঠিছে উথলি
তন্ময় বিভোর প্রাণে মুছে যায় রাত্রি দিন, ক্লান্তিহীন চলিতেছে তুলি।

কঠিন শ্রাবণ দিন মৃত্যুরথ ঘর্ঘরিয়া রাজপথ করিছে উতল
রুদ্ধশ্বাসে কাটে ক্ষণ, দীপ্ত দিনকর তাপে নগরী যে জর্জ্জর বিহ্বল।
কখন পরমক্ষণে শ্যামরূপে সৌরকান্তি মিশে গিয়ে হবে একাকার,
সুধারস পাত্রখানি ভূমিতে পড়িবে ভাঙ্গি নিখিলে জাগিবে হাহাকার।
আসে নি সায়াহ্ন দিন, আকাশে প্রখর আলো, পরিপূর্ণ স্রোতে ভরা নদী,
জীবনের পাত্রখানি চুম্বনে হয় নি শেষ উছলি উঠিছে নিরবধি।
সুন্দর ভুবন মাঝে ভুবনের শ্রেষ্ঠ কবি তবু কেন চলে যেতে চায় ?
যে ঢেউ তটেরে ধরে, সেই বুঝি ফিরে যায় গভীরের গোপন গুহায়।
বিচিত্র সৃষ্টির রূপ এপারেতে তৃণে ফুলে মানুষের মনোশতদলে
কোটি বর্ষ ব্যাপ্ত করি অমলিন জ্যোতিরূপে শাশ্বত প্রদীপে রবে জ্বলে।
শ্রাবণের ভরা দিনে পরিপূর্ণ সেই জ্যোতি ওপারের পথ বহি যায়
জুড়ে গেল দু'টি কর, আনত হইল শির, মৃত্যুহীন মৃত্যু মহিমায়।

গান্ধার শিল্পে বুদ্ধের জীবনী

(২)

শ্রীগুরুদাস সরকার

৬৯ হইতে ৭১নং চিত্রত্রয় দেবদত্ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত ঘাতকগণ কর্ত্তৃক বুদ্ধদেব আক্রান্ত হওয়ার ঘটনামূলক। বুদ্ধের পিতৃষ্বসার পুত্র দেবদত্ত হিংসা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে একাধিক বার হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল। একবার কয়েকজন দেবদত্তের অর্থে বশীভূত হইয়া বুদ্ধদেবকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে—কিন্তু বুদ্ধদেবকে মারিবে কি, তাহারা নিজেরাই সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং ষড়যন্ত্রের সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ৭০ নং চিত্রের বামার্দ্ধে পাপাশয়েরা একটি প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে একত্র সম্মিলিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। চিত্রের দক্ষিণার্দ্ধে বুদ্ধদেব আতপত্রতলে দণ্ডায়মান, আর আততায়ীদের মধ্যে একজন তাঁহার পাদমূলে নতমস্তকে অভিবাদন করিতেছে। ইহার দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকার শেষাংশ সূচিত হইয়াছে। ৬৯নং ও ৭১নং এই একই ঘটনার চিত্র। ৭১নং চিত্রে মাংসপেশীবহুল বজ্রপাণি ও দস্যুনিচয়ের মূর্ত্তিতে যুনানী প্রভাব স্পষ্টতই ধরা পড়িতেছে। এই দুইটি অংশ খাড়াখাড়ি ভাবে ফলকগাত্রে খোদিত, একটি যেন প্রাচীর দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। ইহাতে একাধারে পটভূমির বিস্তৃতি এবং ঘটনার পারম্পর্য্য অর্থাৎ দস্যুগণের আক্রমণ এবং তাহাদিগের বশ্যতা-স্বীকার এই উভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭৪ ও ৭৫ নং চিত্রে মত্তহস্তী নলগিরির দ্বারা বুদ্ধদেবকে নিহত করার চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব এই সময়ে রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবদত্তের প্ররোচনায় হস্তী নলগিরিকে সুরাপানে উন্মত্ত করিয়া বুদ্ধের গমন-পথে ছাড়িয়া দেয়। দুইটি ফলকেই দেখা যায়, হস্তী দ্বারপথে বাহির হইয়া আসিতেছে। ৭৪নং চিত্রে হস্তীটি শুণ্ডের দ্বারা দণ্ডের ন্যায় একটি ভারী বস্তু ধারণ করিয়া আছে। বুদ্ধের প্রভাবে হস্তী যে সম্পূর্ণ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে এবং তাঁহার আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে তাহা শিল্পী অতি সহজেই বুঝাইয়াছেন—হস্তীর মস্তকে বুদ্ধদেব হস্তার্পণ করিয়া রহিয়াছেন এই দৃশ্যটি উৎকীর্ণ করিয়া।

৭৬নং চিত্র জ্যোতিষ্কের জন্ম কাহিনী। ইহাও রাজগৃহেরই একটি ঘটনা। তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশ একটু রেষারেষি চলিতেছিল। জৈনদের চেষ্টা ছিল যাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব হয়। রাজগৃহের সুভদ্র নামক একজন জৈন নাগরিকের পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। বুদ্ধদেব এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সে গর্ভে পুত্র জন্মিয়া পিতৃকুল উজ্জ্বল করিবে। সুভদ্র বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। জৈন সাধুগণ ইহাতে হিংসাপ্রণোদিত হইয়া সুভদ্রকে সাবধান করিবার ছলে জানাইয়াছেন যে তাঁহার পুত্র হইতে তাঁহার ঘোর অমঙ্গল ব্যতীত কিছুই ঘটিবে না। সুভদ্র ইহাতে ভীত হইয়া গর্ভ নষ্ট করার জন্য পত্নীকে বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া দেন। ফলে মাতার মৃত্যু ঘটিল বটে কিন্তু শিশু শবদাহন করিবার সময় জীবিতাবস্থায় মাতৃজঠর হইতে বহির্গত হইয়া আসিল। পরিব্যাপ্ত অগ্নি-শিখার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই শিশুর নামকরণ করা হইয়াছিল জ্যোতিষ্ক। বুদ্ধদেবের কথায় রাজা বিম্বিসার এই শিশুকে গ্রহণ করেন। চিত্রে দেখিতে পাই, জ্যোতিষ্ক তাহার জননীর প্রজ্জ্বলিত চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেছে এবং বিম্বিসার স্বয়ং তাহাকে গ্রহণ করিতেছেন। যে সুদীর্ঘ মূর্ত্তিটি চিত্রের ডাহিন দিকে দণ্ডায়মান তিনিই বুদ্ধদেব। চিত্রনিহিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শুধু সাধারণ নাগরিক নহে, সম্রান্ত রাজবংশীয়দিগের উপস্থিতিও আধুনিক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন শ্রমণও তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন।

৭৭নং চিত্রের বিষয়—ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক যক্ষ আটবিকের উদ্ধার। এই যক্ষটি মানুষ ধরিয়া খাইত। অরণ্যপ্রদেশের একজন রাজার সহিত তাহার চুক্তি হইয়াছিল যে, তাহাকে প্রত্যহ একজন করিয়া মানুষ আহারের জন্য যোগাইতে হইবে। দেশের যত দুষ্ট ও পাপাশয় ব্যক্তি ছিল তাহাদিগকেই রাজা এক এক করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। একদিন আর এ চরিত্রের লোক পাওয়া গেল না। তখন ধার্ম্মিক রাজা অপর কাহাকেও না পাঠাইয়া নিজের অল্পবয়স্ক পুত্রকেই যক্ষের আহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বালকটিকে যখন যক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন বুদ্ধদেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ যক্ষের আবাসে প্রবেশ করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে তথা হইতে সরাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। খোদিত চিত্রে দেখিতে পাই, বুদ্ধ সিংহাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত। ডাহিন দিক হইতে যক্ষ বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছে। যে মূর্ত্তিটি বালককে ক্রোড়ে করিয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হইতেছে সে সেই যক্ষই বটে। সে এখন হিংসা ত্যাগ করিয়া প্রত্যর্পণের জন্য বালকটিকে বুদ্ধের নিকট আনয়ন করিতেছে। চিত্রের শেষাংশে বালকটিকে কয়েকজন পরিচারক পিতৃ-গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে।

৭৮নং চিত্রে বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন। বুদ্ধদেব একবার তাঁহার শিষ্যগণের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গিয়াছিলেন তাঁহার মাতাকে নিজ ধর্ম্মনীতি অবগত করাইবার জন্য। বর্ষা ঋতু ধর্ম্মপ্রচারে কাটাইয়া তিনি স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন সাঙ্কাশ্যের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে। বুদ্ধ একা ফিরেন নাই; তাঁহার সহিত ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রও আসিয়াছিলেন; তিনখানি সিঁড়ি (দেবাবতরণ) তাঁহাদের অবতরণের জন্য দৈববলে আবির্ভূত হইয়াছিল। উৎপলবর্ণা নামে এক শ্রমণী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সসম্মানে বুদ্ধদেবের প্রত্যুদ্গমন করেন। এই খোদিত চিত্রের কতকাংশ বিনষ্ট হইলেও

তিনখানি সিঁড়ি বা মই স্পষ্টই দেখা যায়। বুদ্ধ মধ্যস্থলের সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছেন ; আর ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আপন আপন সিঁড়ি ধরিয়া নামিতেছেন, যথাক্রমে বুদ্ধের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে। শক্রের সিঁড়ির নিম্নভাগে তাঁহার ঐরাবত দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সুবিখ্যাত শ্রাবস্তী প্রতিহার্য্যের(১) পর ঘটিয়াছিল। সাঙ্কাশ্য যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশা।

৭৯ ও ৮০নং চিত্রে শ্রীগুপ্ত ও গ্রহদত্তের নিমন্ত্রণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা ছিলেন শ্রাবস্তীবাসী দুই বন্ধু। শ্রীগুপ্ত ছিলেন বুদ্ধের গৃহী ভক্ত, আর গ্রহদত্ত ছিলেন দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের শিষ্য। গ্রহদত্ত শ্রীগুপ্তকে বড়াই করিয়া বলেন যে, বুদ্ধ অপেক্ষা তাঁহার জৈন গুরুদিগের ভবিষ্যৎ উদ্‌ঘাটন করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী—অতএব শ্রীগুপ্ত কেন বুদ্ধকে ত্যাগ করিয়া শেষোক্তগণের শরণাপন্ন হইবেন না ; ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ কথান্তর ঘটে। শ্রীগুপ্ত জৈন সন্ন্যাসীদিগকে পরীক্ষা করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তিনি উহা অমেধ্য দ্রব্যে পূর্ণ করেন এবং তাঁহাদের বসিবার আসন এরূপ ভাবে স্থাপিত হয় যে বসিতে গেলেই তাঁহারা যেন উহার মধ্যে পড়িয়া যান। জৈন সাধুরা আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিতেই শ্রীগুপ্ত যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন সেইরূপই ঘটিল। তাঁহারা সেই কুণ্ডের ভিতর পড়িয়া গেলেন। গ্রহদত্ত ইহার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া সশিষ্য বুদ্ধদেবকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিলেন, তিনি কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা মারাত্মক রকমের। তিনিও একটি গর্ত্ত খুঁড়িলেন কিন্তু তাহা পরিপূর্ণ করিলেন জ্বলন্ত অঙ্গারের দ্বারা। সামান্য আচ্ছাদনের সাহায্যে এই অঙ্গার আবৃত করিয়া তাহার উপর নিমন্ত্রিতদিগের আসন সংস্থাপিত করা হইল। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রহদত্ত তাঁহাদের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। বুদ্ধ তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে সমস্তই অবগত হইলেন। সেই সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ড "মঞ্জু গুপ্ত সরোজিনী"তে রূপান্তরিত হইলে একটি সুবৃহৎ পদ্ম ফুটিয়া উঠিল এবং বুদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরাও এইরূপ বিভিন্ন পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দৈববলে বহুবিধ আহার্য্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আনীত হইল। বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই তাহা গ্রহণ করিলেন। গৃহস্বামী এইরূপে তাঁহার দৈবশক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার নিকট নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই কাহিনীটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ভাবেও দেখা যায় ; তাহাতে দেখিতে পাই—শ্রীগুপ্তই তাঁহার গুরু পূরণ নামক "নিগ্রন্থের" প্রভাবে বুদ্ধের প্রাণ হরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই এই গল্প অনুসারে শ্রীগুপ্ত ছিলেন রাজগৃহবাসী। এক সময় জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল তাহাতে এ গল্পের উদ্ভব পরবর্ত্তীকালে রাজগৃহে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

৭৯নং চিত্রে দেখিতে পাই—মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বুদ্ধদেবের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি দ্বারা একই চিত্রে একাধিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। চিত্রটিতে গল্পের শেষোক্ত বিবরণই যে অনুসৃত হইয়াছে, বুদ্ধের ডান দিকে তাঁহার শিষ্যগণের এবং বামে শ্রীগুপ্ত ও তাঁহার পরিচারকবর্গের অবস্থান দ্বারা তাহা বুঝা যায়। শ্রীগুপ্তকে দুইটি বিভিন্ন স্থানে দেখান হইয়াছে, একস্থানে তিনি ভৃত্য কর্ত্তৃক ধৃত পাত্র হইতে খাদ্য সামগ্রী বিলাইবার জন্য প্রস্তুত আছেন, আর একস্থানে তিনি নতজানু হইয়া তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিতেছেন। বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই পদ্মের উপর দণ্ডায়মান।

৮০নম্বরে এই একই বিষয় বর্ণিত। ইহার ডান দিকের ফলকে সশিষ্য বুদ্ধদেব ও বজ্রপাণি, সকলেই পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। দৈবপ্রভাবে এই উপলক্ষে যে প্রচুর ভোজের আয়োজন ঘটিয়াছিল বামদিকের ফলকে তাহাই দেখানো হইয়াছে। অভ্যাগতগণ থালা ও বাটির ন্যায় পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। বুদ্ধদেবের জন্য খাদ্য রক্ষিত হইয়াছে ছোট একটি টেবিলের উপর।

৮১নং চিত্র পাংশু অঞ্জলির চিত্র বলিয়া পরিচিত। এই ঘটনাটিও রাজগৃহে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। একদিন বুদ্ধদেব দুইটি শিশুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা পথের উপর ধূলা লইয়া খেলা করিতেছিল। হঠাৎ একটি বালক বুদ্ধদেবকে কিছু দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া এক মুষ্টি ধূলি লইয়া ইহা যবচূর্ণ বলিয়া তাঁহার পাত্রে অর্পণ করিল। অপর বালকটি অনুমোদনের ভঙ্গীতে ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। বুদ্ধদেব এই পাংশু অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে, বালক পুণ্যবলে পরজন্মে পাটলীপুত্রে রাজা অশোকরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। চিত্রে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব শিশুদিগের নিকট দান গ্রহণ করার জন্য ভিক্ষাপাত্র আগাইয়া ধরিয়া আছেন। একটি শিশু তাহাতে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, অপর শিশুটি নিকটেই বসিয়া আছে। ইহার বামদিকের ফলকটি খণ্ডীকৃত। উহাতে চিত্রের যে অংশটুকু বিদ্যমান তাহাতে দুইজন উপবিষ্ট শ্রমণ মাত্র দেখা যায়। ৬০নং চিত্রের সহিত এই সাদৃশ্যটুকু হইতে অনুমান হয়, ইহা বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের চিত্র।

৮২নং চিত্রে শ্রাবস্তীপুরীর একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে শুক নামক এক গৃহস্থের গৃহে গমন করিলে পর তাহার একটি শ্বেত কুক্কুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণভাবে চীৎকার করিতে থাকে। বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে কুক্কুরটির এই বিরক্তির কারণ নির্ণয় করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শুকের ঘোর কৃপণস্বভাব পিতা পরলোকপ্রাপ্তির পর কুক্কুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রের গৃহেই আশ্রয় লইয়াছে। তিনি শুককে বলিলেন যে, পূর্ব্বজন্মে যে স্থানে সে ধনরত্ন ভূগর্ভে লুক্কায়িত রাখিয়াছে এজন্মে তাহা সে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। বুদ্ধের অনুজ্ঞাবতে কুক্কুর মাটি আঁচড়াইয়া যে স্থানে গুপ্তধন প্রোথিত আছে সে স্থানটি দেখাইয়া দিল। চৈনিক ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। চিত্রে কুক্কুরটি "চারপাই"-এর ন্যায় একটি খট্টায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছে এবং বুদ্ধ এই অহেতুক হীন অশিষ্ট আচরণের জন্য কুক্কুরকে তাঁহার প্রতিবাদ জানাইতেছেন।

(১) পরে বর্ণিত ৮৯ হইতে ৯৬ সংখ্যক চিত্রে শ্রাবস্তী প্রতিহার্য্যের বিষয় স্থান পাইয়াছে।

পর দেখিতে পাই, কুক্কুর বুদ্ধের প্রভাবে অভিভূত হইয়া নিজ গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নতশীরে চারপাই-এর নীচে প্রবেশ করিয়াছে। বুদ্ধের মূর্ত্তি এই চিত্রে অপর দুই স্থানেও দেখা যায়, সম্ভবত ঘটনা কিরূপে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু শিল্পী গল্পের যে সংস্করণ অবলম্বন করিয়া চিত্র খোদিত করিয়াছিলেন উহার ভারতীয় সংস্করণ অধিগম্য না হইলে শিল্পীর ঘটনাবিন্যাসের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি হইবে না। চিত্রে শুক ও তাহার পরিজনবর্গ যে স্থান পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধের অনুচর বজ্রপাণিকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। তাঁহার বামহস্তে বজ্র অপর হস্তে চামর। বজ্রপাণি ও চিত্রে নিহত অপর কয় ব্যক্তির দেহ পেশল ও সুগঠিত। কেবল চিত্রের কেন্দ্রস্থলে জনৈক শীর্ণকায় ব্যক্তি জলপাত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। যে একটি নগ্ন মূর্ত্তি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে সেটিও সনাক্ত হয় নাই। তবে কোনও কোনও স্থলে বজ্রপাণিও নগ্নাবস্থায় পরিকল্পিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

অভয়ের কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যুদ্ধ, কলহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা,
মনেতে জাগায় ভীতি, সংশয়, ব্যথা।
তিক্ত হইয়া ওঠে যবে সারা প্রাণ,
শুনি যেন কার মধু গুঞ্জন গান
মানবে মানবে বিরাট আত্মীয়তা।

২

সত্য এ গীত, প্রভেদ থাকুক যত
মানুষে মানুষে স্নেহ প্রেম প্রীতি কত!
পৃথক হউক বর্ণে, ধর্ম্মে, দেশে
এক পরিবার বক্ষের পুরে এসে—
পরমাত্মীয় বিদেশ-প্রত্যাগত।

৩

জানিনে কোথাও ছিল কি না 'লুসি গ্রে'
মনে হয় তারে বড় আপনার যে।
বাছিনে আমরা 'ভ্রমর' কি 'অফিলিয়া'
দুয়ের মরণই যায় বড় দাগা দিয়া,
একি জ্ঞাতিত্ব আর্য্যে অনার্য্যে!

৪

অচেনার কথা শুনেছি পড়েছি কবে
কেন তারা আপন হইয়া রবে?
তাদের লাগিয়া বেদনা ও আকুলতা
জানায় মানব জাতির অখণ্ডতা,
প্রাণের পরশ এক ক'রে দেয় সবে।

৫

অন্তর্যামী দেওয়া এই অন্তর,
তাঁহারি পাঞ্জা বহিছে নিরন্তর।
সব চুম্বকে উত্তর দিকে টান,
সকল মানুষ একই সুধা করে পান,
'বিনি-সুতো হারে' গ্রথিত পরস্পর।

৬

আছে হানাহানি হয় না ইহার শেষ,
জানি নবরূপ ধরে আসে বিদ্বেষ।
তবুও মানুষ অতি অপূর্ব্ব জীব,
রুদ্রতা তার জাগ্রত করে শিব,
বিচ্ছেদই রয়ে মিলনের পরিবেশ।



বহুমূত্র বা ডায়াবিটিস

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি

লক্ষণ—ডায়াবিটিস এত চুপি চুপি শরীর আক্রমণ করে যে প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ রোগীই রোগ বুঝতে পারে না। অনেক সময় অন্য কারণে প্রস্রাব পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ এই রোগ ধরা পড়ে যায়—যেমন জীবন-বীমার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

দুর্ব্বলতা, ওজনের হ্রাস, তৃষ্ণা, বেশী ক্ষুধা, বার-বার প্রস্রাব—এই কয়টি ডায়াবিটিসের লক্ষণ বিশেষ। রাত্রে বার-বার প্রস্রাব হলে ডায়াবিটিসের কথা মনে ভাবা উচিত। তবে একটা কথা বলে রাখি ; ঘুম না·হ'লে সুস্থ লোকেরও রাত্রে অনেকবার প্রস্রাব হতে পারে। ঘুম ভেঙে যাদের বার বার উঠ্‌তে হয় তাদেরই এই রোগ থাকা সম্ভব। ঘা হলে সহজে না শুখানো, বার বার ফোড়া বা ব্রণ হওয়া, এগ্‌জিমায় ভোগা, এখানে-ওখানে ব্যথা বোধ করা প্রভৃতি লক্ষণ ডায়াবিটিসের সঙ্গে অনেক সময় থাকে।

যারা স্থূল বা মোটা লোক—যারা পেটে খায় বেশী, গতরে খাটে কম—ডায়াবিটীস্ প্রধানতঃ তাদেরই রোগ—তার মানে বড়লোকের রোগ। সুতরাং এই ধরণের লোকের যদি উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)। রোগ নির্ণয় করতে হলে কতকগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন।

১। প্রস্রাব পরীক্ষা। এই পরীক্ষা করে যদি চিনি পাওয়া যায়—তাহলে সব সময়ই ডায়াবিটিসের কথা ভাবা উচিত—কারণ প্রস্রাবে চিনি থাকা ডায়াবিটিসের একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এখানে একথা বলে দেওয়া ভালো যে ডায়াবিটিস হলেই প্রত্যেক প্রস্রাবেই যে চিনি থাকবে একথা মনে করবেন না। এই থাকা বা না থাকা নির্ভর করছে ব্লাড্ সুগার পার্সেন্টেজ্ বা হারের উপর। সব সময়ই যে ব্লাড্ সুগার কিড্‌নি থ্রেস্‌হোল্ড বা রক্ষণ-শীল সীমার চেয়ে বেশী থাকবেই এমন নয়। গুরুতর ডায়াবিটিসে তাই হয় বটে, আর সেই জন্তেই সব সময়েই প্রস্রাবে চিনি মেলে ; কিন্তু লঘু (mild) ডায়াবিটিসে সব সময় প্রস্রাবে চিনি থাকে না। তার মানে সব সময়ই তাদের ব্লাড্ সুগার রক্ষণ-শীল সীমার বেশী নয়। সমস্ত দিনের মধ্যে হয় তো কয়েক ঘণ্টা ব্লাড্ সুগার এ সীমা অতিক্রম করে থাকে, আর সেই জন্যই এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায় ; কিন্তু অন্য সময়ে পাওয়া যায় না।

আমরা আগে বলেছি যে ব্লাড্ সুগার সব চেয়ে কম থাকে অনশনে থাকলে, আর সব চেয়ে বাড়ে আহারের পরে। এটা সাধারণ লোকের পক্ষে যতটা সত্য—রোগীর পক্ষেও ততটাই সত্য। তাই আহারের পর ব্লাড সুগার রক্ষণ-শীল সীমার উপরে উঠে যায় সেই সব রোগীদেরও—যাদের অনশনে ব্লাড সুগার এই রক্ষণশীল সীমার নীচেই থাকে। এই অনশনের ব্লাড সুগার মানে প্রাতকালের ব্লাড সুগার অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি অনশন থাকার পরের ব্লাড সুগার। রাত্রি ৮ বা ১০টার সময় শেষ খাওয়া হয়—সুতরাং সকালে পেটে আর কিছু থাকে না।

তাহলে লঘু ডায়াবিটিসে অনশন ব্লাড সুগার রক্ষণ-শীল সীমার নিচে থাকার জন্তে সকালের প্রস্রাবে চিনি থাকে না। রাতের চিনি-ওয়ালা প্রস্রাব রাত্রেই বেরিয়ে শেষ হয়ে যায়। খাওয়ার পর যখন ব্লাড্ সুগার রক্ষণ-শীল সীমা ছাড়িয়ে যাবে—তখন আবার প্রস্রাবে চিনি আস্‌বে। সুতরাং ভোরের প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায় না বলে—এরা নীরোগ নয়।

একটা ধারণা চলে এসেছে এবং দুঃখের বিষয় সে ধারণা এখনো অনেক ক্ষেত্রে বদ্ধমূল—যে প্রস্রাব পরীক্ষা মানেই প্রাতঃকালের প্রস্রাব পরীক্ষা। আগে যা বলেছি তা থেকে আহারের একঘণ্টা থেকে ১।।০ ঘণ্টা পরে যে প্রস্রাব হয়—সেই প্রস্রাব পরীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়—যেহেতু এই সময়ের প্রস্রাবে চিনি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমি অনেক সময় ডায়াবিটিস্ ধরে দিয়েছি আহারের পরের প্রস্রাব পরীক্ষা করে বা করিয়ে—যাদের ভোরের প্রস্রাবে কখনো চিনি মেলেনি।

এখানে একটা মজার কথা বল্‌বো। আমি এমন লোক ঢের দেখেছি (এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও

উচ্চপদস্থ) যাঁরা প্রস্রাব পরীক্ষা করাতে একান্ত নারাজ। তাঁরা বলেন—"বড় ভয় করে মশাই, প্রস্রাব দেখাতে। কি জানি যদি বলে চিনি আছে।" এতে একটা কথা আমার সব সময়ে মনে পড়ে—সে কথাটা হচ্ছে হরিণের প্রাণরক্ষার চেষ্টা বাঘের কবল থেকে। হরিণ ছুটে গিয়ে ঝোপে মুখ লুকোয়—ভাবে—সে যেমন বাঘকে দেখতে পাচ্ছে না—বাঘও বোধ হয় তাকে তেমনি দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ফল যে কি দাঁড়ায় তা সকলেরই জানা আছে। মনকে আঁখি ঠেরে যমকে এড়ানো যায় না। বিপদ এলে তার সম্মুখীন হওয়া শুধু বীরের কাজ নয়—বুদ্ধিমানের কাজ ; কারণ বিপদ উদ্ধার তাহলেই হতে পারে। চোখ বুঁজে থাকলে বিপদ দয়া বা মায়া দেখায় না।

প্রস্রাবে চিনি না থাকলে সব ক্ষেত্রেই যে ব্লাড সুগার স্বাভাবিক রক্ষণ-শীল সীমার নীচে আছে বুঝতে হবে, তা নয়। পুরাতন ডায়াবিটিকের রক্ষণ-শীল সীমা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে যেতে পারে। এই বাড়াটা প্রকৃতির সামঞ্জস্য (compensation) করবার চেষ্টায় হয়—প্রকৃতি যতখানি সম্ভব চিনি শরীরের ভিতর ধরে রাখতে চেষ্টা করে। পরে দেখাব যে ব্লাড সুগার ০·১৮%এর অনেক বেশী হলেও কোন কোন রোগীর প্রস্রাবে চিনি আসে না। এদের প্রস্রাবে চিনিকে আসতে হলে ব্লাড সুগারের হার ০·২% বা ততোধিক হতে হবে। ১নং গ্রাফে একটি রোগীর রক্ষণ-শীল সীমা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ০·২৫। তার মানে ব্লাড সুগার এই উন্নত সীমা পার হলে তবে এই রোগীর প্রস্রাবে চিনি আসে। তাই প্রস্রাব চিনিশূন্য হ'লে রক্ত পরীক্ষা করে দেখা উচিত—ব্লাড সুগারও স্বাভাবিক হয়ে গেছে কিনা। প্রস্রাবে চিনি নিঃসরণকে গ্লাইকো-সিউরিয়া বলে (Glycos = চিনি, uria = প্রস্রাবে)।

২। ব্লাড সুগার পরীক্ষা। আমরা আগে বলেছি যে সুস্থ লোকের ব্লাড সুগার ০·০৮% থেকে ০ %এর কম হয় না এবং ০ ১৮%এর বেশী হয় না। ০·১৮%এর বেশী ব্লাড্ সুগার হলে সেই অবস্থাকে হাইপার-গ্লাইসিমিয়া (Hyper-glycaemia) বলা হয়। হাইপার (hyper) মানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী এবং গ্লাইসিমিয়া (glycaemia) মানে রক্তে গ্লুকোজ বা চিনি। হাইপার গ্লাইসিমিয়া হলে প্রস্রাবে সাধারণত চিনি আসে।

সাধারণ আহারগুলির পর সুস্থ শরীরে, লঘু (mild) ডায়াবিটিসে ও গুরু (severe) ডায়াবিটিসে ব্লাড সুগারের কি রকম পরিবর্ত্তন হয় তা' ডাক্তার লরেন্স্ এক ঘণ্টা অন্তর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে সুস্থ লোকের ব্লাড সুগার কোন আহারের পরেই সাধারণ রক্ষণ-শীল সীমা (০·১৮%) পার হয় না।

লঘু (mild) ডায়াবিটিসে দেখা গেছে যে প্রাতঃকালে সুস্থ লোকের তুলনায় ব্লাড সুগার বেশী হলেও রক্ষণশীল সীমার নীচেই ব্লাড সুগার আছে এবং প্রাতরাশের পরও সীমা টপ্‌কায় নি। কিন্তু মধ্যাহ্ন (গুরু) ভোজনের পর প্রায় সর্ব্বসময় ব্লাড সুগার এই সীমা পার হয়ে আছে।

গুরু (severe) ডায়াবিটিসে প্রাতঃকালেই ব্লাডসুগার রক্ষণশীল সীমার উপর—আহারের পরে তো বাড়বেই। এক্ষেত্রে দিবারাত্রই ব্লাডসুগার রক্ষণশীল সীমা ছাড়িয়ে আছে। এই রোগীর প্রস্রাবে সর্ব্বদাই চিনি থাকা উচিত—যদি এই রোগীর রক্ষণশীল সীমা অস্বাভাবিক ভাবে উন্নত না হয়ে গিয়ে থাকে। যদি উন্নতই হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে সেই উন্নত সীমা পার হলে তবে প্রস্রাবে চিনি আস্‌বে।

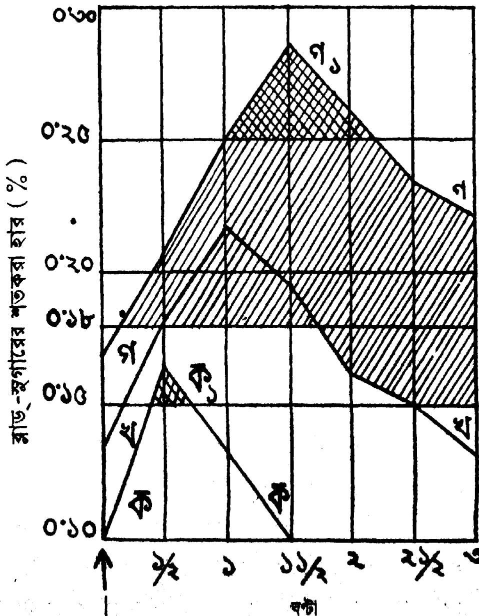
এই রকম এক ঘণ্টা অন্তর রক্ত পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না এবং সাধারণতঃ রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনও নেই। একদিন দুবার রক্ত পরীক্ষা করলেই কাজ চলে। প্রাতঃকালে অনশন অবস্থায় আর ভরা-পেট্ খাওয়ার ১½ ঘণ্টা বাদে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। "অনশন-ব্লাড সুগার যদি ০·১৩%এর বেশী হয় ও খাওয়ার পরের ব্লাড্ সুগার যদি ০·২%এর বেশী হয় তাহলে আসল ডায়াবিটিস্‌ই প্রমাণ হয়" (লরেন্স্)।

৩। গ্লুকোজ-সহতা নির্ণয় (Glucose tolerance test). এরকম অনেক রোগী পাওয়া যায় যাদের প্রস্রাব পরীক্ষা করে ও এক-আধবার ব্লাড সুগার দেখে রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অতি লঘু ডায়াবিটিসে অনশন-ব্লাড্ সুগার অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক থাকে (০·০৮%-০·১%), আর আহারের পরে তা' ০·২%এর বেশীও হয় না। তাছাড়া রক্ষণ-শীল সীমা স্বভাবতঃই নীচু হ'তে পারে—আর সেই জন্যই এই সব ক্ষেত্রে, আহারের

পর ব্লাড্ সুগার রক্ষণশীল সীমা পার হয়ে যায় বলে, প্রস্রাবে বিনা-রোগে চিনি আস্‌তে পারে। এই সব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্য ও অসুখের গুরুত্ব জান্‌বার জন্য গ্লুকোজ-সহ্যতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষায় বুঝ্‌তে পারা যায় যে রোগীর শরীর এবং বিশেষতঃ লিভার কতখানি এবং কত শীঘ্র গ্লাইকোজন তৈরী করতে পারে গ্লুকোজ থেকে।

গ্লুকোজ-সহ্যতা নির্ণয় করতে হলে প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় রক্ত ও প্রস্রাব নেওয়া হয়। তারপরই রোগীকে ৫০ গ্রাম (১¾ আউন্স্) গ্লুকোজ ।৪ আউন্স জলে গুলে খাইয়ে দেওয়া হয়। এর পর আধ ঘণ্টা অন্তর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা চল্‌তে থাকে—২ ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ের জন্য। এই সব বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষার ফল গ্রাফে বসিয়ে কার্ভ টানা হয়। এই কার্ভ থেকেই বোঝা যায় যে রোগ আছে কি না ও রোগ থাকলে তার গুরুত্ব কত। সুস্থ লোকের ব্লাড্-কার্ভ এবং মাঝামাঝি ও অল্প ডায়াবিটিসের কার্ভ ১নং গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

গ্রাফ নং ১



৫০ গ্রাম গ্লুকোজ।

উ-র-সী = উন্নত রক্ষণশীল সীমা (একটি পুরাতন রোগীর, গ১)

সা-র-সী = সাধারণ রক্ষণশীল সীমা

বি-র-সী = বিনত রক্ষণশীল সীমা (একটি সুস্থ লোকের, ক১)

ক = সুস্থ লোকের ব্লাড-কার্ভ

ক১ = সুস্থ লোকের বিনত-রক্ষণশীল-সীমাযুক্ত কার্ভ। চিকে কাটা জায়গাটি প্রস্রাবে চিনি দেখাচ্ছে।

খ ও গ = অল্প ও মাঝারি রোগের কার্ভ দেখাচ্ছে।

গ১ = একটি রোগীর ব্লাড-কার্ভ যার রক্ষণশীল সীমা উন্নত হয়ে গেছে। এর রক্ষণশীল সীমা ০.২২৫%। চিকে-কাটা জায়গাটি প্রস্রাবে চিনি দেখাচ্ছে।

সুস্থ লোকের (ক) ব্লাড্ সুগার অনশন অবস্থায় ছিল ০.১%। গ্লুকোজ খাওয়ার পর ব্লাডসুগার আধ-ঘণ্টার মধ্যে সব চেয়ে বেশী হয়েছে, কিন্তু দেড় ঘণ্টার ফের ০.১% হয়ে গেছে।

অল্প ডায়াবিটিসে (খ) সব চেয়ে বেশী ব্লাড সুগার পাওয়া গেছে ১ ঘণ্টা পরে এবং কমে আস্‌তে সময় লেগেছে প্রায় তিন ঘণ্টা।

মাঝারি ডায়াবিটিসে (গ) ব্লাড সুগার বেশ বেশীই ছিল, তবে রক্ষণশীল সীমা ছাড়িয়ে ছিল না। এখানে সব চেয়ে ব্লাড সুগার বেশী হল ১½ ঘণ্টায় এবং আরো ১½ ঘণ্টা পরে দেখা যাচ্ছে যে ব্লাড্ সুগার এত মন্থর গতিতে নাম্‌ছে যাতে আরো অনেক ঘণ্টা লেগে যাবে প্রাথমিক ব্লাড্ সুগার স্তরে নেমে আস্‌তে।

এই গ্রাফের বাঁকানো-দাগ-দিয়ে-নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি থেকে বুঝানো হচ্ছে—যে এই সব রোগীর প্রস্রাবে কখন এবং কতক্ষণ চিনি পাওয়া গেছে।

মূত্রগ্রন্থির রক্ষণশীল সীমা
(Kidney Threshhold).

স্বাভাবিক বা সাধারণ রক্ষণশীল সীমা বলে তা আমরা আগে বুঝিয়ে বলেছি

খানিকটা চিনি বা গ্লুকোজ বা দুটো কমলা নেবুর রস খেয়ে ফেললে এ ভাবটা ১৫ মিনিটেই কেটে যায়। যদি ১৫ মিনিট বাদেও কষ্ট থাকে তাহলে আরো একটু চিনি বা গ্লুকোজ বা কমল নেবুর রস খেতে হয়। যাঁদের খুব বেশী ইন্সুলিন নিতে হয় এবং তাঁরা যদি কাজ করে বেড়ান—তাঁদের সঙ্গে সব সময় কিছু চিনি বা গ্লুকোজ থাকা উচিত। হাতের কাছে চিনি বা কমলা নেবু না থাক্‌লে—এ অবস্থায় বেশী করে চা বা কফি খাওয়া চল্‌তে পারে—যতক্ষণ চিনি বা কমলা নেবু না মেলে। চায়েতে কফিতে একটু বেশী চিনি থাক্‌লে আর বড় চিনির প্রয়োজন হয় না।

বেশী হাইপো গ্লাইসিমিয়া হলে চিকিৎসকের প্রয়োজন। এখানে (adrenalin chloride ½ or I c.c) এ্যাড্রিনালিন ½ থেকে ১ সি সি ইন্‌জেক্‌সান ও গ্লুকোজ মুখ দিয়ে বা ইন্‌জেকসান করে দিতে হয়। ভয় পাবেন না—এ রকম অবস্থা অত্যন্ত অসাবধানী লোক না হলে বা নেহাৎ হাতুড়ের পরামর্শে না চল্‌লে কখনো হয় না। হাইপো-গ্লাই-সিমিয়ার কারণগুলি মনে রেখে ও সেগুলিকে বাঁচিয়ে চল্‌লে কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

ইনসুলিনের কার্য্যকারিতা

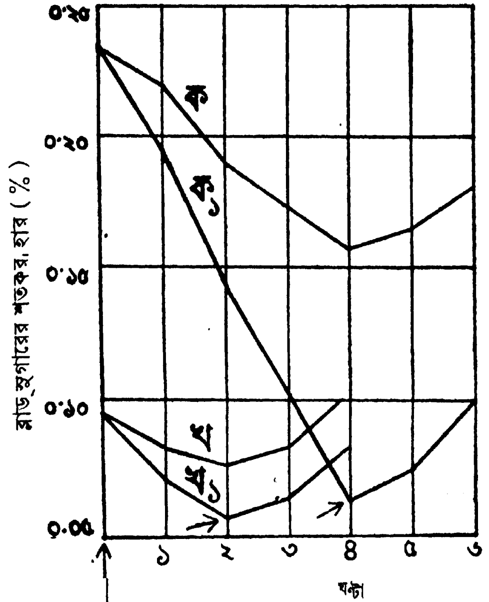
১। ব্লাড সুগার কমান। ইন্‌সুলিন ইন্‌জেক্‌সান দিলে ব্লাড সুগার কমে যায়—তা সে সুস্থ শরীরই হোক, আর অসুস্থ শরীরই হোক। বেশী ইন্‌সুলিন দিলে ব্লাড সুগার বেশী কমে—কম দিলে কম কমে। সুতরাং ইন্‌সুলিনের মাত্রা, ডোজ্ বা পরিমাণ আর ব্লাডসুগারের হার সমানুপাতিক (directly proportional)। ২নং গ্রাফে কি ভাবে ইনসুলিন সুস্থ ও অসুস্থ লোকের ব্লাড সুগার কমায় তাই দেখানো হয়েছে—বিভিন্ন মাত্রার ইন্‌সুলিন ইনজেকসান দিয়েও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে।

অভুক্ত অবস্থায় একটি সুস্থ লোককে আর একটি শুরু ডায়াবিটিক্‌কে ইনসুলিন ইনজেকসান দিলে ব্লাড সুগারের কি রকম এবং কত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় তাই দেখানো হয়েছে —১ ঘণ্টা অন্তর রক্ত পরীক্ষা করে।

গুরু ডায়াবিটিক্‌কে ১০ ইউনিট ইন্‌সুলিন দিলে ক কার্ভ পাওয়া যায়, কিন্তু ২০ ইউনিট দিলে ক, কার্ভ মেলে। সুস্থ লোককে এই ভাবে ইনসুলিন দিলে খ ও খ, কার্ভ পাওয়া যায়।

গ্রাফে বাণ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কখন হাইপো গ্লাইসিমিয়ার জন্যে গ্লুকোজ ইন্‌জেকসান দেওয়া হয়েছিল।

গ্রাফ নং ২



এই গ্রাফে দেখা যাচ্ছে যে একই লোককে কম ও বেশী মাত্রায় ইন্‌সুলিন দিলে ব্লাড সুগার কেমন সমানুপাতিক ভাবে কমে আসে। এখানে আরো দেখা যাচ্ছে যে সুস্থ শরীরে ইন্‌জেক্‌সান দেওয়ার ২ ঘণ্টা বাদে ব্লাড সুগার সব চেয়ে কম হয়—কিন্তু ডায়াবিটিকের সব চেয়ে ব্লাড সুগার কম হতে লাগে ৪ ঘণ্টা। বাণ-চিহ্ন দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে কোন সময় হাইপো-গ্লাইসিমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার জন্য গ্লুকোজ ইন্‌জেকসান দেওয়া হয়েছে।

২। কিটোসিস্ নিবারণ বা দূর করা। ইন্‌সুলিন গ্লুকোজের দাহ বাড়ায়। সেই আগুনে চর্ব্বি বা fat সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। তাই কিটোন্ বডিস (ketone bodies) শরীরে তৈরী হতে পারে না বা তৈরী কিটোন বডিস্ থাকলে তা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৩। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরী করা ও

গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ হওয়ায় বাধা দেওয়া। ইন্‌সুলিন রক্তের গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরী করে লিভার ও মাংসপেশীতে জমিয়ে রাখে। তাছাড়া ইনসুলিন গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরী হবার চেষ্টাকে সংযত করে। আমরা আগে বলেছি যে চর্ব্বি ও প্রোটিন থেকে গ্লুকোজ তৈরী হতে পারে আর ডায়াবিটিকের শরীরে এটা হয়ই। সুস্থ শরীরে এ ভাবে গ্লুকোজ তৈরী হয় না—যদি না অত্যন্ত দৈহিক পরিশ্রমের জন্য গ্লাইকোজেনের গ্লুকোজ পুড়ে পুড়ে অত্যন্ত কমে আসে। এই চর্ব্বি ও প্রোটিন থেকে গ্লুকোজ তৈরী হতেও বাধা দেয় ইন্‌সুলিন। সুতরাং ইন্‌সুলিন নিয়ে অতিশয় দৈহিক পরিশ্রম করলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হবার সম্ভাবনা বেশী—কারণ প্রয়োজন হলে চর্ব্বি বা প্রোটিন (মাংসপেশী) থেকে শরীর গ্লুকোজ তৈরী করে নিতে পারে না ইন্‌সুলিনের এই বাধার জন্য।

ডায়াবিটিক কোমা বা অচৈতন্য অবস্থা

আগে বলেছি যে চর্ব্বি (fat) ভালো রকম না পুড়লে কিটোন বডিস (ketone bodies) তৈরী হয় ও রক্তে জমতে থাকে। বেশী জমলে এদের বিষক্রিয়া (ketosis) প্রকাশ পায় এবং কিটোসিস (ketosis) বেশী হলে রোগী অচৈতন্য হয়ে মারা পড়তে পারে। সব ডায়াবিটিসেই কিটোসিস হয় না। যাদের গ্লুকোজের আঁচ অত্যন্ত কম তাদেরই হয়।

ডায়াবিটিক কোমা হয়ে পড়লে অধিকাংশ সময়ই তা নির্ণয় করা সহজ—যদিও কখনো কখনো সব কথা ঠিক জানতে না পারলে নির্ণয় (diagnosis) করা দুরূহ হয়ে উঠে।

কোমা হবার আগে থেকে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়—যেগুলি কোমার অগ্রদূত। সেইগুলি বুঝতে পারলে ও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করলে কোমা হয়ে পড়তে পারে না।

কোমা হবার বহু আগে থেকে (মাস বা বৎসর) প্রস্রাবে কিটোন বডিস্ বেরুতে থাকে এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করলে তা' ধরা পড়ে। কোমা হবার কিছু বা অব্যবহিত পূর্ব্বে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়—যেমন দুর্ব্বলতা বোধ, বিরক্তি, গা বমি-বমি, বমি, কখনো কখনো পাত্‌লা বাহ্যে বা বাহ্যে বন্ধ। হাঁপ ধরা একটি বিশেষ লক্ষণ—নিশ্বাস দ্রুত হয় না, গভীর হয়—ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। ক্রমে রোগীর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে আরম্ভ করে। অবশেষে রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। প্রস্রাবে প্রভূত চিনি ও কিটোন বডিস্ পাওয়া যায়।

কোমার সূচনা বুঝতে পারলে এবং তখনি চিকিৎসা সুরু করলে কোমা প্রতিরোধ করা অনেক সময়ই সহজ। কিন্তু এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি অধিকাংশ সময়েই এত অল্প ও সাধারণ যে রোগী তাদের গ্রাহ্যই করে না—ভাবে এগুলি শুধু শরীরের দুর্ব্বলতার বা অন্য কোন সাধারণ বৈষম্যের পরিচায়ক। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি রোগীর কথা বলবো।

সম্ভ্রান্ত কুলের গৃহিণী স্থূলাঙ্গী ; বয়স ৫৫ ; ব্লাড প্রেসার আছে ; প্রস্রাবে ৪% সুগার ; ইনসুলিন নেন না বা খাওয়া-দাওয়ার কোন ধরাকাট করেন না—কারণ "তাঁর আর ক'দিন !" একদিন সকালে মাথা ঝিম ঝিম্ করতে লাগলো। ভাবলেন বোধ হয় ব্লাড-প্রসারের জন্যে। ওদিকে বাহ্যে বন্ধ আছে আর প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে আছে ঘণ্টা ছয়েক। পেট ফুলে উঠেছে—নিশ্বাস দীর্ঘ হচ্ছে—কিন্তু তিনি মনে করেছেন যে বদহজমের জন্যে পেট দম্‌সম্ হয়ে উঠেছে এবং পেট দম্‌সম্ হয়েছে বলেই নিশ্বাসের কষ্ট। এদিকে কিন্তু মাঝে মাঝে নেশাখোরের মতন ঝিমিয়ে পড়ছেন। এই সময় তাঁকে দেখি এবং তৎক্ষণাৎ ডায়াবিটিক কোমার চিকিৎসা সুরু করা হয়। চার ঘণ্টার মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে উঠেন—বাহ্যে ও প্রস্রাব হয় এবং অন্যান্য সমস্ত কষ্ট দূর হয়। যখন তাঁকে প্রথম ইনসুলিন ইনজেকসান দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি ছুঁচ বিঁধানে টের পান নি। এর মানে তখন রোগীর চেতনা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। আর কয়েক ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় থাকলেই সম্পূর্ণ কোমা হয়ে পড়তো।

অচৈতন্য অবস্থা বেশী হাইপো গ্লাইসিমিয়াতেও হয়—সুতরাং যদি কোন রোগী, যিনি ইন্‌সুলিন নেন, অচৈতন্য হয়ে পড়েন তা'হলে কোমা কি হাইপোগ্লাইসিমিয়া তা' নির্ণয় করে চিকিৎসা করা উচিত। যদি হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলে কোন সন্দেহ থাকে তৎক্ষণাৎ গ্লুকোজ ও এড্রিনালিন ইন্‌জেকসান দেওয়া উচিত। এই ইন্‌জেকসানে কোমা হলেও কোন ক্ষতি হয় না ; হাইপোগ্লাইসিমিয়া

মিনিটেই উপকার পাওয়া যায়। এই ১৫ মিনিট অপেক্ষা কোন তফাৎ হয় না। ডায়াবিটিক কোমার চিকিৎসা পরে করায় ডায়াবিটিক কোমার ভাবী ফলের (prognosis) বল্‌বো।

কোমা ও হাইপোগ্লাইসিমিয়ার তফাৎ নিচে দেখান হল।

লক্ষণ পাশাপাশি।

	কোমা	হাইপোগ্লাইসিমিয়া
আরম্ভ	ধীরে ধীরে।	হঠাৎ।
জিব্	শুথ্‌নো।	ভিজে।
নিশ্বাস	দীর্ঘ, দ্রুত নয়। রোগী হাওয়া চায়।	সাধারণ।
নাড়ী	দুর্ব্বল ও দ্রুত।	দুর্ব্বল নয়—দ্রুত।
ব্লাডপ্রেসার	স্বাভাবিকের চেয়ে। নীচু বা কম।	স্বাভাবিক বা বেশী।
তাপ্	সাব্‌-নরম্যাল।	নরম্যাল।
চোখ	নরম।	স্বাভাবিক।
চোখের তারা	ছোট (Contracted) বা স্বাভাবিক	বড় (dilated).
বমি	হ্যাঁ।	না।
স্নায়বিক	তড়কা নাই।	তড়কা।
প্রস্রাব		
চিনি	+ + + (খুব বেশী)	নেই বা ছিটেফোঁটা।
কিটোন	÷ + +	নেই বা ছিটেফোঁটা।
ব্লাড সুগার	হাইপার।	হাইপো।

(ক্রমশঃ)

এস হেমন্ত

শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

এস হেমন্ত! স্নান করি' পূত স্বচ্ছ-সরসী জলে
শুচিতার পদচিহ্ন আঁকিয়া স্নিগ্ধ ধরণীতলে।
এস সবিতার স্বর্ণ কিরণে, শিশিরসিক্ত ঘাসে—
কাজলা দীঘির কমলিনী বনে, ঝরা শেফালির রাশে।
রূপালী রঙের জ্যোছনা-উজল ধবল কাশের বনে
এস শ্বেতকায় কুজ্ঝটিকায় হংস-বলাকা সনে।
শঙ্খ চিলের কূজনমুখর বিজন পল্লী-পথে
এস হেমন্ত! গগন-প্রান্তে 'শুভ্র মেঘের রথে'।

এস গোধূলির রক্তিম রাগে বনস্পতির শিরে—
এস স্রোতোহীন শীর্ণা নদীর শান্ত শীতল নীরে।
কুহেলিকা সাথে এস হিমপাতে দূর দিগন্ত জুড়ে—
এস বনানীর অন্তর-ব্যথা-ভরা-মর্ম্মর সুরে।
ধান্তের শীষ আন্দোলি' ধীরে মন্দ মলয় দোলে
বরষ অন্তে এস কৃষকের হরষিত কলরোলে।
পল্লীমায়ের অঞ্চলখানি ভরিয়া সোনার ধানে
এস হেমন্ত! মাতায়ে জগৎ 'গন্ধে বরণে গানে'।



কথায় মেশানো তান

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমার "সাঙ্গীতিকী" বইটিতে আমি লিখেছি যে বাংলা গানে তান খুবই সুন্দর শোনাতে পারে যদি কথার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এযুগে অনেক ভালো গায়কও দেখতে পাই কোনো চরণের শেষে হঠাৎ বেখাপ্পা তান দেন আ-আ ক'রে—হিন্দুস্থানি গানের ঢঙে। কিন্তু বাংলা গানের তুলনায় হিন্দুস্থানী গান নিম্নতর শ্রেণীর, তাই নিকৃষ্টের অনুকরণ করলে ভুল হবে। ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রথম "রাঙাজবা" জাতীয় গানে কথার সঙ্গে মিশিয়ে তান দিতেন। এ-পদ্ধতির আরো অনেক উন্নতি সম্ভব।.'কি ভাবে তার একটু আভাষ দেবার চেষ্টা করেছি গ্রামোফোনে গাওয়া শ্রীমতী উমা দেবীর "আধ ফোটা ছোট তারা" এবং "ভোরের পাখী" গান দুটিতে। এদেরই একটি স্বরলিপি দিলাম এখানে—কিন্তু যাঁরা গ্রামোফোনে এ গান দুটি শুনেছেন তাঁদের এ থেকে শেখার আর একটু সুবিধে হবে একথা বলাই বাহুল্য। "গহন রজনী অন্তে" ভুয়েটে গাওয়া হয়েছে।

নিশিকান্ত :—

এই গহন রজনী-অন্তে
আমি আলোছায়া-আঁকা পাখি।
এই কালের কালো দিগন্তে
মম অপরূপ মায়া রাখি
আমি আলোছায়া-আঁকা পাখি।

আমি সুদূরের শাখে কাঁপা
কার উদয়-আগের আভা
মম সুরগুলি গোলাপিয়া
রাঙি ধরার ধুসর হিয়া
তারে ঘুম ভাঙাবারে ডাকি।

আমি জীবনের মঞ্জুষা
সাধে আধ ঢাকা আধখোলা
কোন্ অচেনা রতন-উষা
করে আমারে আপন-ভোলা
তাই আধ ঘুমে আধ জাগি।

কোন্ গোপন গভীর আশা
মম বিকাশে যে পায় ভাষা
কোন্ কবির স্বপন লভি'
আমি স্বপনে মগন কবি
কার 'অতল মাধুরী মাখি।

শ্রীমতী লতিকা দেবী :—

ওই তারার মালার কুঞ্জে
আমি আধ ফোটা ছোট তারা

এই চাঁদের আলোর পুঞ্জে
আমি আপনি আপনহারা
আমি আধ ফোটা ছোট তারা।
কভু মেঘের বুকেতে ফুটি
কভু চাঁদের আলোর লুটি
কভু মেঘেতে নিজেরে ঢাকি
তার আলোছায়া মুখে মাখি
আমি আধফোটা ছোট তারা।

০ ১ + ৩ ০ ১ +
{সা রা ॥ জ্ঞা জ্ঞা সা | মা মা সা | পা মা গমা | মঋা সা ঋা ॥ সা রা জ্ঞা | মা পা দা | মপা মজ্ঞা মজ্ঞা |
এ ই গ হ ন র জ নী অন্ - - তে আ মি আ লো ছা য়া আঁ কা পা খি -
ও ই তা রা র মা লা র কুন্ - - জে আ মি আ ধ ফো টা ছো ট তা রা -

রজ্ঞা ঋা ণ্সা ॥ ণ্ ণা ণধা | র্সণা দা পা | ণদা পা -া | -া } পঋা পা ॥ ণা ণধা ণা | পণা পণর্সর্রা র্সা |
- আ মি আ লো ছা য়া আঁ কা পা খি - - এ ই কা লে র কা লো দি
- আ মি আ ধ ফো টা ছো ট তা রা - - এ ই চাঁ দে র আ লো র

ণধা ণর্সা ণণা | ণপা পা পঋা ॥ পা পণা দণদা | পমা মদা পদপা | মগা মা গা | -া ঋা সন্া ॥ সা ণা ণধা |
গন্ - - তে ম ম অ প রূ প মা য়া রা খি - - আ মি আ লো ছা
পুন্ - - জে আ মি আ প নি আ প ন হা রা - - আ মি আ ধ ফো

র্সণা দা মপা | ণদা পা -া | -া পা পা ॥ পণা দপা জ্ঞমা | পা -া -া | পদা ণর্সা ণর্সা | পা -া -া ॥
য়া আঁ কা পা খি - - গা ই আ - - লো - - ছা - - য়া - -
টা ছো ট তা রা - - আ মি আ - - ধ - - ফো - - টা - -

মপা ণর্সা র্জ্ঞা | র্সা -া -া | র্সর্রা র্মজ্ঞা র্রর্সা | ণদা পমা জ্ঞরা ॥ সা ণা ণধা | র্সণা দা মপা |
আঁ - - কা - - পা - - খি - - আ লো ছা য়া আঁ কা
ছো - - ট - - তা - - রা - - আ ধ ফো টা ছো ট

ণদা পা -া | -া পা পমা ॥ পা পণা ণদা | দপা পমা মজ্ঞা | জ্ঞসা সজ্ঞা জ্ঞমা | মপা পা দা |
পা খি - - আ মি সু দূ রে র শা খে কাঁ - - পা কো ন্
তা রা - - আ মি মে ঘে র বু কে তে ফু - - টি ক ভু

র্সা র্সা র্সা | র্রা র্সণা ধণা | র্সা পা -া | -া পা পা ॥ মপা দণা র্সর্রা | র্জ্ঞর্রা র্সণা ধণা | র্সা সা -া |
দ য় আ গে ০র আ ভা - - ম ম সু র গু ন্জি গো লা পি য়া -
দে র আ লো ০য় লু টি - - ক ভু মে ঘে তে নি জে রে ঢা কি -

-া সরা সনা্ | সা রা সা | জ্ঞা সা মা | সা পা -া | -া পদা মা ॥ পা র্সা ণা | ধা ণা র্সা |
- রা ঙি ধ রা র ধূ স র হি য়া - - তা র ঘু ম ভা ঙা বা রে
- তা ০০র আ লো ছা য়া মু খে মা খি - - আ মি আ ধ ফো টা ছো ট

ণর্সা ণদপা মপা | -া পা দা ॥ পদা ণর্সা ণদা | পমা গমা পদা | পণা দপা মজ্ঞা | রজ্ঞা মপা দপা ॥
ডা কি - - তা র ঘু - - ম - - ভা - - ঙা - -
তা রা - - আ মি আ - - ধ - - ফো - - টা - -

পদা পমা জ্ঞরা | সরা জ্ঞমা পমা | গমা পমা গপা | মগা ঋসা -া | সা ণা ণধা | র্সণা দা মপা |
বা - - রে - - ডা - - কি - - আ লো ছা য়া আঁ কা
ছো - - ট - - তা - - রা - - আ ধ ফো টা ছো ট

ণদা পা -া | -া ণা ণধা ॥ র্সণা ধণা দা | পা মপা মপা | ধা ণধা ণা | -া ণধা র্সণা ॥ জ্ঞা র্রা র্সা |
পা খি - - আ মি জী ব নে র মন্ - জু ষা - - সা ধে আ ধো ঢা
তা রা - -

ণধা ণা র্সা | ণর্সা ণদা ণদা | -া দা ণা ॥ পা ণা ণা | দা দা দণা | পা পদা দমা | -া মা মণ্া ॥
কা আ ধো খো লা - - কো ন্ অ চে না র ত ন উ ষা - - ক রে

ণ্া সা রা | জ্ঞা মা পা | ধা ণর্রা র্সণা | -া ণা জ্ঞা ॥ সা র্রা র্সা | ণধা ণা র্সা | ণর্সা ণদপা মপা |
আ মা রে আ প ন ভো লা - - তা ই আ ধো ঘু মে আ ধো জা গি -

-া পা পা ॥ মপা ণর্সা র্জ্ঞা | সর্রা জ্ঞর্রা র্সণা | র্সর্রা জ্ঞর্রা র্সণা | দপা মজ্ঞা রসা ॥
- আ মি আ - - ধো - - ঘু - - মে - -
আ - - ধো - - ফো - - টা - -

সরা জ্ঞমা পদা | মপা দণা র্সর্রা | জ্ঞর্রা র্সর্রা ণর্রা | র্সণা দা পা ॥
আ - - ধো - - জা - - গি - -
ছো - - ট - - তা - - রা

সা ণা ণধা | র্সণা দা পা | ণদা পা -া | -া পা দা ॥ র্সা ণা ধা | ণা দা পা | মা জ্ঞা সা | পা পা পদা |
আ লো ছা য়া আঁ কা পা খি - - কো ন্ গো প ন গ ভী র আ - - শা ম ম

র্সা র্সা র্সা | র্রা র্সণা ধণা | র্সা ণদা ণদা | -া পা দা ॥ মা পা দা | ণা র্সা র্রা | র্জ্ঞর্রা সা -া |
বি কা শে যে পা ০য় ভা বা - - কো ন্ ক বি র স্ব প ন ল ভি -

-া র্সর্রা র্সর্র্সা ॥ ণর্সা ণর্সা ণর্সা | পণা পণা পণা | দা পা -া | -া পা সা ॥ সা রা জ্ঞা |
- আ মি স্ব প নে ম গ ন ক বি - - কা র অ ত ল

মা পর্রা র্সা | ণর্সা ণদপা মপা | -া পা পা ॥ মপা ণর্সা র্জ্ঞা | র্সর্রা -া -া | র্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা |
মা ধু রী মা খি - - কা র অ - - ত - ল মা - -
আ - - ধ - - ফো - -

ণা -া ণা ॥ ধণা র্সর্রা জ্ঞর্রা | র্সণা ধণা র্রর্সা | ণা ধা দা | পা -া -া | পদা পমা জ্ঞমা | জ্ঞা -া -া |
ধু - রী মা - - - - - খি - - - - - অ - - ত - ল
টা - - ছো - - ট - - তা - - রা - - আ - - ধ - -

রজ্ঞা মপা ধণা | ধণা -া ণা ॥ ণা র্সা পা | র্রা র্সা ণা | ধণা র্সণা ধণা | পা -া -া ॥
মা - - ধু - রী মা - - - - - খি - - - - -
ফো - - টা - - ছো - - ট - - তা - - রা - -

সা ণা ণধা | র্সণা দা পা | ণদা পা -া | -া সা সা ॥ সা ঋা গা | মা পা দা | না র্সনা র্সা | -া -া -া |
আ লো ছা য়া আঁ কা পা খি - - আ মি আ লো ছা য়া আঁ কা পা খি - - - -
আ ধ ফো টা ছো ট তা রা - - আ মি আ ধ ফো টা ছো ট তা রা - - - -

তোমার কবিতা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

তোমার কবিতা লিখিতে বসিলে কোথা দিয়ে কাটে দিন
আলোকের ছবি ডুবে যায় রবি, রাতি আসে ভাতিহীন
বাহিরের আলো লোপ পেলে জ্বলে হৃদয়-দীপের শিখা—
আলোর আঁখরে কালো রূপ ধরে বুকের রক্ত লিখা!

মসীভরা মোর ঝর্ণা-কলমে ঝরে না যখন মসী—
আমি ত থামিতে পারি না, কবিতা তখনো লিখি যে বসি' !!
বুকের রক্তে লেখনী ডুবাই, মনের কাগজে লিখি—
কত না নূতন ছন্দে তোমার বন্দনা গীতি-শিখি!

সে গীতি গাহিয়া, সে লেখা লিখিয়া, যখন নয়ন খুলি
সবটুকু তার কি করিয়া হায় একেবারে যাই ভুলি?
জাগিয়া সে গান গাহিতে পারি না, সে সুর খুঁজে না পাই—
লেখনী ভরিয়া লিখিতে বসিলে, দেখি সে কবিতা নাই!

তোমার কবিতা তন্ময় করে, আপনা হারায়ে ফেলি
তাহার 'চরণে' ও রাঙা চরণ রহে যে পাপ্‌ড়ি মেলি'!
তাহার ছন্দে ঝঙ্কারি' ওঠে তোমারই অলঙ্কার—
তোমারই কাব্যে তোমারই ভূষণ আমার অহঙ্কার!

আরতি-দীপের আড়ালে দাঁড়ায়ে প্রতিমা দেখিতে পাই—
তাই ত তোমার কবিতা ফাঁদিলে পাগল হইয়া যাই!
বন্দনা-ধূপ-চন্দন-ধূম কুণ্ডলী হয়ে ওঠে—
বন্দিতা দেবী-মূরতিটি তাহে ছন্দিতা হয়ে ফোটে!

ধ্যানের মূরতি ধীরে ধীরে ধরে ধ্যানের অতীত ছবি—
তোমার কবিতা লিখিয়া তোমারে বন্দে তোমারই কবি!
সে মধু-ছন্দে ধরা প'ড়ে, আর আড়াল হ'তে না পারো!
সে ছবি কেবল কবি ছাড়া আর নয়নে পড়ে না কা'রো!

জঙ্গম

বনফুল

৩১

একটা বিরাট প্রান্তরে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। সুরা-উন্মত্ত ঘূর্ণিত-লোচন, ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ একদল পুরুষ অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গলায় নারী-মুণ্ডের মালা, কটি বেষ্টন করিয়া নারী-হস্ত-পদ-রচিত মেখলা। মুক্তোর দেহটা অদূরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দেহটা ঘিরিয়াই নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূরে একদল বন্দিনী—মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, শৈল, রিণি, চুনচুন—তাহাদের ঘিরিয়াও একদল উন্মত্ত পুরুষ পাশব চীৎকারে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে, সকলের হাতে খড়্গ। নিকটে অভ্রভেদী একটা রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠ··· সহসা শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের ঘোরটা তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, মাংসলোলুপ নর-পশুদের উন্মত্ত চীৎকার তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল। খানিকক্ষণ মুহ্যমানের মতো সে বিছানায় বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিতেই মিসেস স্যানিয়াল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, "দুদিন থেকে আপনার এই চিঠিখানা এসে পড়ে আছে, আমার আর দিতেই মনে থাকে না;" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "মনে থাকবে কি ক'রে, আপনার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল—"। মিসেস স্যানিয়াল ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া অগ্নি-গর্ভ এবং কর্তব্য-দ্যোতক একটা দৃষ্টি শঙ্করের দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং শঙ্করকে চিঠিখানা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর খামটা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, দামী নীল রঙের খাম, হাতের লেখা চিনিতে পারিল না। খুলিয়া দেখিল বেলার চিঠি!

শঙ্করবাবু,

আপনাকে ইতিপূর্বে কখনও চিঠি লিখিনি এবং জীবনে আর হয় তো কখনও লেখবার সুযোগও ঘটবে না। আজও না লিখলে চলত, কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে (কেবল আপনার সঙ্গেই) একবার দেখা ক'রে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি যে চলে যাচ্ছি এ খবর কাউকে জানালাম না, জানাতে ইচ্ছে হল না। যে বুড়ো সায়েবটিকে আমি রোজ পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতাম তাঁর সঙ্গে বিলেত চললাম। তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সংসারে আপনজন কেউ নেই, তিনি অনেক দিন থেকেই আমাকে বলছিলেন তাঁর সঙ্গে যেতে। দেশ ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে ছিল না বলে এতদিন রাজি হই নি। কিন্তু এখন দেখছি এদেশে আমার মতো মেয়ের পক্ষে ভদ্রভাবে বাস করা অসম্ভব। এদেশে যে কোন মেয়ে, তা সে সুরূপা কুরূপা যাই হোক, যদি ভদ্রভাবে থাকতে চায় তা হলে তাকে বিয়ে করে অর্থাৎ একজন পুরুষের পদানত হয়ে থাকতে হবে—সে পুরুষটি যুবক বৃদ্ধ মূর্খ বিদ্বান সচ্চরিত্র দুশ্চরিত্র যাই হোন। অধিকাংশ মেয়ের পক্ষে এইটেই হয় তো বাঞ্ছিত পরম গতি এবং সমাজের কল্যাণের পক্ষে এইটেই হয় তো সুচিন্তিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আমি কিন্তু পারলাম না, আমার বিদঘুটে রুচি নিয়ে কিছুতেই এ ব্যবস্থা মানতে প্রবৃত্তি হল না আমার। এর জন্যে অহরহ ক্ষণে ক্ষণে অপমানিত হয়েছি কিন্তু দমি নি, কিন্তু শেষটা হার মানতেই হল। এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছি। কারণ এখন এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, এদেশে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। ওদেশ নিরাপদ কি না জানি না, কিন্তু যতদূর শুনেছি তাতে মনে হয় ওরা আর যাই করুক নারীকে অপমান করে না। বহুকালব্যাপী স্ত্রী স্বাধীনতার ফলে ওদের সে ভাব ঘুচেছে। এসব অবশ্য আমার কল্পনা, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যে কি সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। সেখানেও যদি গিয়ে দেখি যে ওদেশও এদেশেরই মতো, তা হলে অনতিক্রম্য নিয়তিকে মেনে নিয়ে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে আমরা কাগজে কলমে যতই না কেন নিজেদের মহিমার ঢাক পেটাই, আসলে এখনও মেয়েরা পুরুষ-পদানত জীব ছাড়া আর কিছু নয় এবং মানব-সভ্যতার পরিধি তার আদিম গুহা ছাড়িয়ে বেশী দূর অগ্রসর হয় নি।

আমাদের জাহাজ ৩রা ছাড়বে। আমি বাসা ছেড়ে দিয়েছি, মিষ্টার স্মিথের ফ্ল্যাটেই আছি, ৭৫০নং চৌরঙ্গী ষ্ট্রীট। আপনি যদি সময় করে একবার দেখা করে যান বড়ই সুখী হব। আপনি আমাকে যে বায়রণের গ্রন্থাবলী দিয়েছিলেন সেটা আমি সযত্নে রেখেছি এবং যতদিন বাঁচব সযত্নে রাখব। কিন্তু আপনার একটা অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি—I could not aocept Byron.

কাল নিশ্চয়ই আসবেন, সকালের দিকে আমি বাসায় থাকব। ইতি

বেলা মল্লিক

শঙ্কর ক্যালেণ্ডারের পানে চাহিয়া দেখিল, আজ পাঁচ তারিখ। পরশু দিন বেলার জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। শঙ্কর কল্পনায় দেখিতে লাগিল জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা তাহার পথপানে চাহিয়া আছে।

৩২

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল।

এই সাতটা দিন শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে ইম্পারিয়াল লাইব্রেরিতে কাটাইয়া দিল। যেদিন সে বেলার চিঠি পাইল সেই দিনই সে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া উঠিল। মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভন্টুর আপিসে মৃন্ময়ের চাকরিটা হইয়া যাওয়াতে মুকুজ্যে মশাই শঙ্করের চাকরির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে একটি ভাল চাকরি খালি ছিল। মুকুজ্যে-মশায়ের পরিচিত পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের একজন পদস্থ অফিসার সিমলায় ছিলেন, চিঠি লেখার চেয়ে নিজে গেলে বেশী কাজ হইবে ভাবিয়া মুকুজ্যে মশাই নিজেই সেখানে গিয়াছিলেন। মৃন্ময় কাজে যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং শঙ্করের দিনগুলি রাস্তায় এবং ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটিতেছিল। দিনে সে মৃন্ময়ের সহিত খাইয়া বাহির হইয়া যাইত এবং রাত্রে ফিরিত সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর। তাহার খাবার বাহিরের ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকিত। সে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল। তাহার অত্যুচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা সে হজম করিতে পারিতেছিল না; কারণ ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত যে নিজের অহঙ্কারের প্রেরণাতেই সে মৃন্ময়ের উপকারটা করিয়াছে, ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ। মৃন্ময় যদি না-ও থাকিত তাহা হইলেও সে ভন্টুর আপিসে ভন্টুর অধস্তন কর্ম্মচারী হইয়া কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু মৃন্ময় ইহা জানে না, সে শঙ্করকে দেখিলে এমন একটা মুখভাব করে যেন সে দেব-দর্শন করিতেছে। শঙ্কর মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়ে, অনুপার্জ্জিত এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় এবং এইজন্যই তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের সান্নিধ্য যে কত কারণেই এড়ায়!

শঙ্কর শুধু যে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল তাহা নয়, সে সকলকেই এড়াইয়া চলিতেছিল। মানুষের সঙ্গই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মিলটন, শেক্‌সপীয়ার, শেলি, কীটস, রবীন্দ্রনাথের জগতে পরিভ্রমণ করিয়া, অবাস্তব কল্প-লোকের নর-নারীর সাহচর্য্যে সে নিজেকেও ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিতেছিল যে এই অবাস্তব লোকের প্রাণীগুলিকেই বাস্তবজীবনের স্থায়ী অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ উহারা নির্ভরযোগ্য, চিরকাল উহাদের এক রূপ। শেলি কীটসের স্কাইলার্ক, নাইটিঙ্গেল কখনও বেসুরা গাহিবে না, রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কখনও জরাগ্রস্ত হইবে না, শেক্‌সপীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি চিরদিন এক সুরে এক ভাবে এক ভঙ্গীতে কথা বলিবে, ব্রুটাস্ কখনও দেশ-দ্রোহী হইবে না, ওফেলিয়া কখনও পাপীয়সী হইবে না, ইয়াগো কখনও মহাত্মা হইবে না। কিন্তু বাস্তব জগতের ক্ষণভঙ্গুর মানুষেরা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া বুদ্বুদের মত অবশেষে একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। তাহাদের উপর নির্ভর করিলে নিরাশ হইতে হইবে। কল্প-জগতের সার্থক সৃষ্টিগুলি অমর এবং অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই নির্ভরযোগ্য। তাহারা আজ এক কথা—কাল আর এক কথা বলে না। স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া শঙ্করের মন দিব্যলোকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সহসা একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে রূঢ় মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিতে হইল। বাসায় ফিরিয়া টেলিগ্রাম পাইল সন্ন্যাস রোগে বাবা মারা গিয়াছেন। টেলিগ্রামটার দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ট্রেনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল না কেন! সমস্ত অন্তরটা মাঝে মাঝে মুচড়াইয়া উঠিতেছে, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা, কিন্তু চোখে জল নাই। কিছুতেই সে কাঁদিতে পারিল না, ট্রেনের কামরায় একা শুষ্ক-চক্ষে অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৩৩

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল মাস দেড়েক পরে।

আসিয়া স্টেশন হইতেই সে সোজা ভন্টুর বাসায় গেল।

"কবে এলি ?"

"এখনই, সোজা স্টেশন থেকে তোর কাছেই এসেছি—"

"কেন ?"

"তোর সেই কানা করালির খবর কি বল্ তো ?"

"তাকে নিয়ে কি করবি ?"

"বাবা এক অদ্ভুত উইল ক'রে গেছেন। আমি জানতাম না করালিচরণ বক্‌সির সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মায়ের নামে ব্যাঙ্কে একটা fixed deposit ক'রে গেছেন, তারই সুদ থেকে মায়ের চলে যাবে। দেশের বাড়িটাও মা-কে দিয়ে গেছেন। আর বাকি সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন করালিচরণ বকসির উপর। উইলে লেখা আছে করালিচরণ যদি দেখেন যে আমি নিজের পায়ে ভাল-ভাবে দাঁড়াতে পেরেছি তা হলে এবং যদি তিনি সমীচীন মনে করেন তা হলে তাঁর বাকী সম্পত্তি আমি নয়, আমার স্ত্রী পাবে। আমি নিজের পায়ে যদি ভালভাবে দাঁড়াতে না পারি তা হলে সমস্ত সম্পত্তি কোন সৎকার্য্যে দান ক'রে দিতে হবে, আমার স্ত্রী কিছু পাবে না।"

ভন্টু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "করালিচরণ তো দ্রাবিড়ে—"

"তাই না কি ?"

"হ্যাঁ। তবু চল্ তার বাড়ির একটু খোঁজখবর নিয়ে আসা যাক। অনেক দিন যাওয়া হয় নি সেখানে—"

"মহামুস্কিলে পড়ে গেছি ভাই, মা ভয়ানক মুষড়ে গেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না আমাকে; অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি আমি, উইলের কথা মা কি জানে না। আমি করালিচরণকে শুধু বলতে এসেছি একথা মাকে কিছুতে যেন জানানো না হয়। একটা চাকরি জুটলেই মাকে এনে নিজের কাছে রাখব আমি—"

"হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি তুই রাস্কেল, তোর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। মুকুজ্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর ? সে চাকরিও তোর হয় নি, উনি যাবার আগেই লোক বাহাল হয়ে গেছে—"

উভয়ে করালিচরণের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গলিতে ঢুকিয়াই পানওয়ালির সঙ্গে দেখা হইল। ঠিক মোড়েই তাহার দোকান। দোকানে দুজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়াছিল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র মিশিমণ্ডিত দন্ত বাহির করিয়া একমুখ হাসিয়া পানওয়ালি বলিল, "ঘর খোলাই আছে, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এই পান ক'খিলি সেজে দিয়েই যাচ্ছি—"

এই বলিয়া নিপুণ ত্বরিতহস্তে চেরা পানগুলিতে সে চুন ও খয়ের-গোলা মাখাইতে লাগিল; ভন্টু ও শঙ্কর বক্‌সি মশায়ের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তাহা দেখিয়া ভন্টু বলিল, "দেখেছিস্ মাগির আক্কেল, কপাট খোলা রেখে দিয়েছে, কেউ ঢোকে যদি! বকসি মশায়ের অনেক জিনিসপত্তর আছে ঘরের মধ্যে। এই মোল্লাদের কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস করবার উপায় নেই—"

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উভয়েই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিল। পচা ঘায়ের গন্ধ। মোস্তাক চৌকির উপর শুইয়াছিল, তাহারা প্রবেশ করিতেই উঠিয়া বসিল এবং মুখবিকৃতি করিতে করিতে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় তাহাদের স্যালিউট করিল। মোস্তাকের বাঁ পায়ের পাতায় ময়লা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঘা। পুঁজরক্তে ন্যাকড়াটা ভিজিয়া রহিয়াছে এবং তাহা ঘিরিয়া প্রচুর মাছি ভনভন করিতেছে। মোস্তাকের মুখময় গোঁফ দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ধুলায় অযত্নে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত, বেদনাতুর। স্যালিউট করিয়া মোস্তাক আবার চোখ বুজিয়া চৌকির উপর শুইয়া পড়িল, কোন কথা বলিল না, যেন তাহার যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিল, আর কিছু করিবার নাই। ভন্টু ও শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে ?"

"ও মোস্তাক, বক্‌সি মশায়ের বন্ধু—"

পানওয়ালি আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ওকে নিয়েই বিপদে পড়েছি বাবু। বলছে পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছে। পরশু থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু ওষুধবিষুদ কিছু লাগাতে দেবে না, পাড়ার ডাক্তারবাবুটির খোশামুদি ক'রে তাঁকে ডেকে এনে দেখাতুম, তাঁর ব্যবস্থা মত তুলো, আইডিন, ব্যাণ্ডেজ কিনে আনলুম, কিন্তু আনলে কি হবে—ও পায়ে হাত দিতে দেবে কি—একে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো—"

ভন্টু বলিল, "হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও—"

পানওয়ালি ইহাতে আপত্তি করিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা আমি পারবো না, হাসপাতালে শুনেছি বড় কষ্ট দেয় গরীবদের। ওরে পাগলা, ভাত খেয়েছিস ?"

মোস্তাক কোন জবাব দিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পানওয়ালি ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল।

"খেয়েচে দেখছি। কত ভাত ছড়িয়েছে! কাল তো সমস্ত রাত খেলে না, সকালে এসে দেখি ভাতের থালা যেমনকার তেমনি পড়ে আছে; সে ভাত আবার কুকুরকে ধরে দি। আ আমার কপাল, একেই বলে পাগল! শাক-চচ্চড়ি সব খেয়েছে, মাছটা খায় নি। মাছের পেটিটা দিলাম বেছে কাঁটা নেই বলে—ভাগ্যিস বেরালে নিয়ে যায় নি। নে—খা—"

পানওয়ালি মাছের পেটিটা তুলিয়া মোস্তাকের মুখে ধরিল, মোস্তাক কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল। ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, "কাকটা কই ?"

"ওধারে উঠোনে আছে। কি দস্যি কাক! পরশু জলখাবার করে নাওয়াতে গেছি, এমন ঠুকরে দিয়েছে হাতে যে জ্বলে মরি!"

পানওয়ালি হাতের ক্ষত দেখাইয়া হাসিল। "আচ্ছা, এই বইগুলোর কি করি বলুন তো, উই ধরেছে, ঝেড়ে ঝেড়ে রোদে দিয়েছিলুম। কবে আসবে? কোন খবর পেয়েছেন ?"

"কিছু না।"

"খবর পেলে আগে থাকতে জানাবেন আমাকে একটু। তা না হলে আমাকে এখানে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্বলে যাবে—"

মিশি-মাখানো দাঁত বাহির করিয়া পানওয়ালি হাসিল। "বইগুলো চল তো দেখি। অনেক দামি বই আছে—"

"দেখুন না—"

শঙ্কর চুপ করিয়া ছিল। পানওয়ালি, মোস্তাক এবং খাঁচায় পোরা দাঁড়কাকের সহিত একচক্ষু করালিচরণকে সংযুক্ত করিয়া তাহার মন এক বিচিত্র রসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই লোকটিরই হাতে বাবা বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া গিয়াছেন! সহসা একটা কথা মনে করিয়া লোকটার উপর শঙ্করের শ্রদ্ধা হইল। তাহার বিবাহ-সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করালিচরণ করিয়াছিল তাহা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।

ভন্টু আলমারি খুলিয়া দেখিতেছিল।

"ওরে এখানে একটা লম্বা খামে কি একটা দলিলের মতো রয়েছে, দেখ তো এটাই তোর ব্যাপার কি না।"

"হ্যাঁ, এ তো বাবার হাতের লেখা।"

খুলিয়া দেখিল বাবার উইলের একটা কপি এবং করালির নামে একখানি চিঠি। চিঠিতে অম্বিকাবাবু করালিচরণকে এই ভার গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্ত পড়িয়া শঙ্কর বলিল, "এগুলো এখন এখানেই থাক, করালিবাবু এলে তখন যা হয় করা যাবে।"

ভন্টু পানওয়ালিকে বলিল, "আমরা চললাম এখন—"

পানওয়ালি চোখের ইসারায় ভন্টুকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "পাগলটাকে আপনি একটু ভয় দেখিয়ে শাসন ক'রে দিয়ে যান, যাতে ও ওষুধ লাগাতে দেয় আমাকে।"

ভন্টু মোস্তাকের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, "তুমি যদি ওষুধ লাগাতে না দাও, কালই তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব, সেখানে পা কেটে দেবে তোমার।"

মোস্তাক চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

পানওয়ালি মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভন্টু ও শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল।

শঙ্কর বলিল, "চল মৃন্ময়ের বাসায় যাই—"

"তুই যা, আমাকে জুলফিদারের কাছে যেতে হবে—" বলিয়া সে বাইকে সওয়ার হইল।

৩৪

মৃন্ময় বাড়িতে ছিল না। গিয়াই মুখুজ্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা হইল।

"সব নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল তো ?"

"হ্যাঁ।"

"শিরিষের সঙ্গে দেখা হ'ল ? অমিয়া এসেছিল ?"

"সকলেই এসেছিল। শ্বশুর মশায় চলে গেলেন, অমিয়া মায়ের কাছেই রইল।"

"তোমার বাবা কোন উইল ক'রে গেছেন না কি ?"

শঙ্কর উইলের কথা খুলিয়া বলিল, মুকুজ্যে মশায়ের নিকট ইহা গোপন করার কোন প্রয়োজন সে দেখিল না। সব শুনিয়া মুকুজ্যে মশায়ের চোখ দুটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"নিজের পায়ে তো তুমি দাঁড়িয়ে গেছই, চাকরি তোমার হয়ে গেছে।"

"শুনলাম যে হয় নি—অন্য লোক—"

"সিমলেতে হয় নি, কিন্তু বোম্বের চাকরিটা তোমার হয়ে গেছে। বোম্বে যেতে হবে না, এইখানেই আপিস খুলে বসতে হবে—বাংলা মাসিকপত্র একটা চালাতে চান তাঁরা, তারই ভার তোমার ওপর দিচ্ছেন। এই যে সব দেখ না—"

মুকুজ্যে মশাই উঠিয়া ইংরেজীতে লেখা একখানি চিঠি আনিয়া দিলেন। জনৈক পি-দত্ত তাহাকে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে "আদর্শ" নামক বাংলা মাসিক পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি শঙ্করকেই কলিকাতায় আপিস খুলিবার ভার দিয়াছেন। মাসিক একশত টাকা বেতনের মধ্যে একজন সহকারী সম্পাদক ও একটি ক্লার্ক নিয়োগ করিতে এবং একটি ভাল প্রেসে কাগজ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কাগজের ছাপা এবং গেট-আপ যেন ভাল হয়, প্রেসের বিল তিনি আলাদা দিবেন। লেখকদেরও যথোচিত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। শঙ্করের পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতার ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির সব বন্দোবস্ত করিবেন।

উত্তেজনায় শঙ্করের কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিল। কে এই পি-দত্ত তাহার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য বোম্বেতে বসিয়াছিল?

মৃন্ময় উপরে ছিল, নামিয়া আসিল।

"আপনার আর একখানা চিঠি এসেছে, আমার কাছে আছে।"

টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটি মোটা খামের চিঠি মৃন্ময় শঙ্করকে দিল। শঙ্কর দেখিল সুরমার চিঠি।

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেল। আজ রাত্রেই আমি খুলনা যাচ্ছি।"

"খুলনা? কেন?"

"দরকার আছে।"

মুকুজ্যে মশাই মনোরমা এবং আসমির খোঁজে বাহির হইতেছেন সে কথা আর বলিলেন না; অপ্রয়োজনীয় কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন।

লোকের সঙ্গ শঙ্করের আর ভাল লাগিতেছিল না; সুরমার পত্রটা পকেটে পুরিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

গড়ের মাঠের একটি নির্জ্জন অংশে বসিয়া শঙ্কর সুরমার পত্রখানি পড়িতেছিল। খামের ভিতর দুইখানি চিঠি ছিল, একটি সুরমার, আর একটি উৎপলের। সুরমা লিখিয়াছে—

শঙ্করবাবু,

এই আপনার কাছে আমার প্রথম চিঠি। অর্থাৎ এ চিঠির ভাব, ভাষা, হাতের লেখা সবই আমার। এতদিন আপনাকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি সেগুলোর হাতের লেখা আমার ছিল বটে, কিন্তু ভাব ভাষা আমার দিয়ে না। আপনার বন্ধু চিঠিগুলো বিলেত থেকে লিখে পাঠাতেন, আমি সেগুলো টুকে দিতুম। আপনার বন্ধুকে চেনেন তো? একটা অদ্ভুত রকম কিছু ক'রে মজা দেখতে পেলে আর কিছু চান না উনি। এমন কি সেবার যে ফোটোগুলো পাঠিয়েছিলুম সেগুলোও উনি বিলেত থেকে তুলে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর পাল্লায় পড়ে আপনার সঙ্গে এই যে সামান্য চাতুরীটুকু করেছি এর জন্যে আমি লজ্জিত এবং এর জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—যদিও পনেরো আনা দোষ আপনার বন্ধুটিরই। উনিও এই সঙ্গে আপনাকে চিঠি দিচ্ছেন তাতে সব কথা জানতে পারবেন। আমার নমস্কার নিন। আশা করি ভাল আছেন। ইতি—

শ্রীসুরমা ঘোষ

ভাই শঙ্কর,

এতদিন সুরমার বেনামীতে তোমাকে যে চিঠি-গুলি লিখেছি তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তোমার নাড়ী-পরীক্ষা করা। কোলকাতায় লক্ষ্য করেছিলাম যে সুরমার সান্নিধ্যে তোমার নাড়ী কিঞ্চিৎ রসস্থ হয়েছিল। সে ধারণা আরও দৃঢ় হল যখন দেখলাম—তুমি আমার আসবার দিন হন্তদন্ত হয়ে হাওড়া ষ্টেশনে একরাশ লাল লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হলে! ট্রেনে যেতে যেতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল, সুরমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলা গেল যে, তোমার ঈষৎ-সচেতন রস-পিপাসাকে উতলা করে তুলতে পারে এমন একটা কিছু করে দূর থেকে বসে মজা দেখতে হবে। চিঠি লেখাই সাব্যস্ত হল, কিন্তু সুরমা নিজে কিছুতেই চিঠি লিখতে রাজি হল না। একটা জিনিস লক্ষ করেছ? আমাদের দেশের মেয়েরা সব বিষয়েই সর্ব্বক্ষণ সিরিয়াস, রসিকতাকে নিছক রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা ওদের সাধ্যাতীত। যাই হোক, সুরমাকে

অনেক কষ্টে রাজি করালুম যে আমি চিঠিগুলো লিখে দেব, ও টুকে পাঠিয়ে দেবে এবং তোমার উত্তর এলে উত্তরগুলো আমার কাছে পাঠাবে। এটা অবশ্য আশা করি নি যে তুমি "যাও পাখী বলো তারে" মার্কা গোলাপী চিঠির কাগজে সবুজ কালি দিয়ে রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে উচ্ছ্বসিত প্রেম-পত্র লিখতে থাকবে—তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করেছিলুম যে তোমার সভ্যভব্য চিঠির মধ্যেও এমন এক আধটা খোঁচ থাকবে যা উপভোগ করে আমরা আনন্দ পাব। তুমি কিন্তু আমাদের নিরাশ করেছ। অমন নিরামিষ চিঠি বোধ হয় ভাইও বোনকে লেখে না! নিরাশ হয়ে অবশ্য আনন্দিতই হয়েছি এবং বুঝেছি কোলকাতায় সুরমার সান্নিধ্যে তোমার মনে যে রস-সঞ্চার হয়েছিল সে রকম রস-সঞ্চার যে কোন সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্যে যে কোন সুস্থ যুবকের মনে হওয়া জৈবিক ধর্ম্ম অনুসারেই স্বাভাবিক। বিলেতে থাকবার সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্য দু-চারবার হৃদয়ঙ্গম করেছি। রস-সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু রস-দমন করাটাই মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্বের পরিচয় তোমার মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

যাক ওসব কথা, এইবার কাজের কথা বলি শোন। বিলেতে গিয়েছিলাম ব্যারিষ্টারি পড়তে, পড়ে এসেছি জার্নালিজম্। অক্সফোর্ডের একটা ডিগ্রিও অর্জ্জন করেছি। সেই ডিগ্রি নিয়ে বহু তৃতীয় শ্রেণীর লোকের দ্বারস্থ হয়ে তাঁদের দৈহিক নানাস্থানে প্রচুর তৈল নিষেক করতে পারলে হয় তো দুশো আড়াইশো টাকা বেতনের একটা চাকরি জোগাড় করতে পারা যেত, কিন্তু তা করতে প্রবৃত্তি হল না। তুমি তো ভাই জানই, চাকরি করা জিনিসটাকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। সেইজন্যেই বোধ হয় কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আমাকে একটি শাঁসালো শ্বশুর জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর ব্যবসা করে ব্যাঙ্কে যে টাকা সঞ্চয় করেছেন তার পরিমাণ ঠিক কত আমি জানি না। তবে তিনি মেয়েকে (অর্থাৎ সুরমাকে) পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকাটা অযাচিত ভাবে হাতে এসে পড়াতে ঠিক করেছি যে একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী মাসিকপত্র বেশ ভাল ভাবে বার করব। খুব ভাল মাসিকপত্র আমাদের দেশে নেই, উঁচু আদর্শ রক্ষা করে যদি চালাতে পারা যায় নিশ্চয়ই ভাল ভাবে চলবে। বাংলা কাগজটার নাম দিয়েছি "আদর্শ", ইংরেজীটার "The Ideal." ইংরেজী কাগজটা আমি এখান থেকে চালাব, বাংলা কাগজটার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি প্রথমে বাংলা কাগজটার একজন সহকারী সম্পাদকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আবেদনকারীদের মধ্যে একজন শঙ্করসেবক রায় দেখে সন্দেহ হল যে হয় তো এ আমাদেরই শঙ্কর। ফোটো চেয়ে পাঠালাম। ফোটো আসাতে সন্দেহ দূর হল। তোমার বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে কোন উত্তর পাই নি, তাই ফোটো চাইতে হয়েছিল। তোমাকে "সহকারী" নয়, পুরোপুরি সম্পাদকই হতে হবে। পি-দত্তের সই করা চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছ। পি-দত্ত অপর কেউ নয়, আমার বড় সম্বন্ধী, প্রবীর দত্ত। আমি ইংরেজী কাগজটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি; প্রবীর আমার হয়ে বাংলা কাগজটার সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখালেখি করছে।

এই সম্পর্কে আমার অনেক হিতৈষী বাঙ্গালী-চরিত্রের অতীত নজির উদ্ধার করে আমাকে সাবধান করছেন যে টাকাটা মারা যাবে অর্থাৎ তোমার অপটুতা, অথবা অসাধুতা অথবা দুইই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করবে যে আমি চমকে যাব। বন্ধু-প্রীতি বিষয়ে নাতিক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ রচনা করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার এমন একটা সুযোগ পেয়েও আমি সেটা ছেড়ে দিলাম, তার কারণ জিনিসটা অত্যন্ত 'ভালগার' শোনাবে। দ্বিতীয়ত, টাকাগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়েছি, অপ্রত্যাশিত-ভাবে যদি যায়ও খুব বেশী লাগবে না আমার। তবে এ বিষয়ে আমার সত্যিকার মত কি তা তোমাকে বলছি। বেশী জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। সাঁতার শিখতে গিয়ে দু-চার জন ডুবে মরে তা সত্যি, কিন্তু এই দু-চারজনের উদাহরণ আস্ফালন করে সব সাঁতার-শিক্ষার্থীদের ভড়কে দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না। বন্ধু হিসেবে তোমাকে এইটুকু শুধু অনুরোধ করছি যে, যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে সাঁতারটা শিখে ফেল। অগাধ জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতরাবার কৌশলটা আয়ত্ত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমাকে যতদূর জানি অসাধ্যসাধন করবার শক্তি তোমার আছে। আর একটা কথা, যদি ডোব, আর কারো কিছু হবে না, তুমিই ডুববে। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু করে দাও। আশা করি অন্যান্য সব খবর ভাল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হলাম। শৈলর চিঠিতে তোমার সব খবর জেনেছি। অবিলম্বে উত্তর দিও। ইতি

উৎপল

"কে শঙ্করবাবু নাকি, এখানে একা বসে কি হচ্ছে?"

শঙ্কর চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল ঠিক পিছনে অচিনবাবু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভদ্রলোক যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শঙ্কর মোটেই টের পায় নাই।

"এখানে কি করছেন?"

"এমনিই বেড়াতে এসেছি।"

"আচ্ছা, একটা খবর আমাকে বলতে পারেন, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম খবরটা জানবার জন্যে নেমে পড়লাম।"

"কি খবর?"

"মিস বেলা মল্লিক আজকাল কোন ঠিকানায় আছেন?"

"তিনি এদেশে নেই, বিলেতে গেছেন—"

"বলেন কি, বিলেত! কার সঙ্গে—"

"একটি বুড়ো সায়েবকে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন, তাঁরই সঙ্গে—"

অচিনবাবু গম্ভীর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"যাক, তা হলে তো মিটেই গেল! চলুন, আপনাকে পৌঁছে দি।"

"না, আমি এখন যাব না।"

"কবিতা ভাবছেন বুঝি!"

মৃদু হাসিয়া অচিনবাবু কারে গিয়া আরোহণ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর বাসায় ফিরিল। ঢুকিতে যাইবে এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টা দিতে দিতে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল এবং হাসিয়া বলিল, "তুই কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি?"

"না, আমি এই ফিরছি।"

"তা হলে তো ভালই হল। আমি জুলফিদারের কাছে গেসলাম; সব বলছি চ, জুলফিদার দি গ্রেট আবার এক হাত দেখিয়েচে! কড়া নাড়।"

কড়া নাড়িতেই মৃন্ময় দ্বার খুলিয়া দিল।

মৃন্ময়কে দেখিয়া ভন্টু বলিল, "মিস্টার ক্যাণ্ডল; তুই আর মিসেস স্মাইল পরশু দিন সকালে আমাদের বাসায় যাস। শঙ্কর, তুইও যাস। পরশু রোববার আছে, জুলফিদার আমাকে ব্লেসিং আপিস খুলবে ঠিক করেছে।"

"সে আবার কি?"

"আশীর্ব্বাদ করবে রে রাস্কেল, এটা বুঝতে পারছিস না! জুলফিদার কিন্তু এগেন এক হাত দেখিয়েছে!"

"কি রকম?"

"তোর কথা আজ আবার জুলফিদারকে বলেছিলাম। জুলফিদার বললে যে আমাদের আপিসে তো আর চাকরি খালি নেই, তবে হল্ আ্যাণ্ডারসানে একটা পোস্ট শিগগিরই খালি হবে সেটা আমি জোগাড় করে দিতে পারি—"

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, "ওঁর খুব ভাল চাকরি হয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

মৃন্ময় সব কথা খুলিয়া বলিতে ভন্টু খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

"চোর কোথাকার, আমাকে তো কিচ্ছু বলিস নি এতক্ষণ। তা হলে চা খাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই। স্মাইলকে খুব কড়া করে চা করতে বল্। চা খেয়ে এখুনি বেরুতে হবে।"

মৃন্ময় চায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

"আবার কোথায় বেরুবি এখন?"

"ওহো, তোকে বলতেই ভুলে গেছি, ওরিজিন্যাল গন্। তাকে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"মারা গেলেন?"

"বেঁচে গেলেন বল্!"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভন্টু বলিল, "বাবাজীর কাণ্ড শুনেছিস?"

"না।"

"বাবাজীকে বিয়ের খবর দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম, বাবাজী কি উত্তর দিয়েছে, দেখ্—"

ভন্টু পকেট হইতে একটি পোস্টকার্ড বাহির করিয়া দিল।

কল্যাণবরেষু,

তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল। তুমিও যে শেষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুচরণের মত বিবাহ করিয়া এক দঙ্গল অপোগণ্ড সৃষ্টি করিতে থাকিবে ইহা আমি ভাবি নাই। আমি প্রায় পনেরো দিন হইল প্রয়াগে আসিয়াছি, ইচ্ছা ছিল তোমাকে গিয়া একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সংসারের কীট তোমরা, সংসারের পাঁকেই সমস্ত জীবন কাটাও। আমাকে আর উহার মধ্যে টানিও না। দূর হইতেই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। ওই অবস্থায় যতটা সুখ সম্ভব ততটা সুখ যেন তোমাদের ভাগ্যে ঘটে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
তোমার মেজকাকা

পড়িয়া শঙ্কর পোস্টকার্ডখানি ফেরত দিল।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, "চাম চামাটু বাবাজী—"

কিন্তু বাবাজীর চিঠিতে ভন্টু যে মর্ম্মাহত হইয়াছে তাহা সে হাসি দিয়া ঢাকিতে পারিল না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজিল।

চা খাইয়া ভন্টু চলিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে মৃন্ময় উপরের ঘরে উঠিয়া গেল, তাহার ঘুম পাইয়াছিল। নীচের ঘরে শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অপরিচিত পি-দত্তের চিঠি পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিলেও সুরমা ও উৎপলের চিঠি পাইয়া সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এ চাকরি সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। শৈলেন দাদা ও সুরমার স্বামী বাল্যবন্ধু উৎপলের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে..

জীবনযাপন করিতে পারিবে না। যাহাদের চক্ষে সে নিজেকে এতদিন মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের কাছে নিজের গৌরব খর্ব্ব করিতে পারিবে না। ভনটু এবং উৎপল শ্বশুরের প্রসাদে প্রসন্নমনে থাকুক এবং নিজেদের লইয়াই থাকুক, শঙ্করের উপর তাহাদের কৃপাবর্ষণ করিতে হইবে না। ঈর্ষায়, ক্ষোভে, তিক্ততায় তাহার সমস্ত অন্তরটা জ্বালা করিতে লাগিল। সে তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিল এবং উৎপলের চিঠির জবাব লিখিয়া ফেলিল।

ভাই উৎপল,

তোমার চিঠি পেয়ে এবং তোমার আর্থিক সচ্ছলতার কথা শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিলাস-ব্যসনে মন না দিয়ে সাহিত্য-সেবায় মন দিয়েছ, এটাও আনন্দের কথা। আমি যদিও তোমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে স-ফোটো দরখাস্ত করেছিলাম কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, যে ভার আমাকে তুমি দিতে চেয়েছ সে ভার নিতে আমি অক্ষম। প্রথমত, তোমার সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আদর্শ না মিলতে পারে, দ্বিতীয়ত কোন বন্ধুর অধীনে কাজ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বন্ধু প্রভু হলে উভয় পক্ষকেই অশান্তি ভোগ করতে হয়। সাহিত্য-সেবা আমিও করব, কিন্তু এভাবে করতে পারব না। কারণ মনের প্রসন্নতা এবং স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্যচর্চা করা যায় না। তুমি অন্য লোক দেখ।

তোমরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলে তার থেকে যে আমি মানে মানে উত্তীর্ণ হয়েছি এটা উভয়তই সুখের বিষয়! সেদিন আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করে লাল লাল গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ তখন আমি বোকা ছিলাম। নি-খরচায় ঠোঁটের কোলে একটু হাসি আর চোখের কোণে একটু ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা বিকীরণ করে কাজ হাসিল করবার আর্টটা তখনও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারি নি। বোকার মতো অর্থ-ব্যয় করে বসেছিলাম। এখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করছি যে, আমার বোকামিটাকে কেন্দ্র করে তোমরা দুজনে আনন্দলাভ করেছিলে তো! পরোক্ষভাবেও বন্ধু-দম্পতীকে খুশী করতে পেরেছি—তাই বা কম কি!

তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সুরমার মতো মহিলা তোমার সহধর্ম্মিণী এবং সুরমার বাবার মত স-হৃদয় ব্যক্তি তোমার শ্বশুর। আশা করি ভাল আছ সব। মাঝে মাঝে গরীব বন্ধুর খবর নিও। ইতি—শঙ্কর।

চিঠিটা খামে পুরিয়া সে ঠিকানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল চিঠিটা এখনই পোস্ট করিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ কি জানি আবার যদি মত বদলাইয়া যায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে বিবেকের যুক্তি হয়তো না-ও টিঁকিতে পারে। টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া দেখিল একটা টিকিটও আছে। খামে টিকিট আঁটিয়া কপাট খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নিকটে কোন ডাকবাক্স ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর বড় রাস্তায় গিয়া পড়িল। বড় রাস্তাতেও খানিকক্ষণ হাঁটিয়া তবে সে ডাকবাক্স পাইল। চিঠিখানা পোস্ট করিয়া দিয়া যেন সে বাঁচিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের কপাট খোলা। মনে পড়িল সে নিজেই কপাট খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ভিতরে ঢুকিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত সায়েবি পোষাকপরা এক ব্যক্তি তাহার বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! সর্ব্বাঙ্গে মদের গন্ধ। শঙ্কর খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ আবার কে!

গায়ে হাত দিয়া একটু ঠেলিতেই সাহেব উঠিয়া বসিলেন এবং মদিরা-বিহ্বল চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে এক সেকেণ্ড চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি এইখানে থাকি।"

"আপনি এখানে থাকেন? You mean this is your house?"

"আমার নিজের বাড়ি নয়, আমরা ভাড়াটে। আপনি কে?"

"মাই গড্! এটা কি বীডন্ ষ্ট্রীট নয়?"

"আজ্ঞে না, এটা সারপেনটাইন লেন।"

"আই সী!"

সাহেব খানিকক্ষণ খোলা দ্বারটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সাধারণত গেরস্ত বাড়িতে এত রাত্রে কপাট খোলা থাকে না, তাই ভাবলাম বুঝি আমারই বাড়ি! আই অ্যাম সো সরি, এটা সারপেনটাইন লেন, আই অ্যাম সো সরি—"

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। শঙ্কর বলিল, "বসুন, যাচ্ছেন কেন?"

ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া সাহেব বলিলেন, "আই সী, you are a gentleman. না, আমি আর বসব না, উঠি এবার—"

ভদ্রলোকের টলমলায়মান অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর আবার বলিল, "না, না, বসুন।"

"O you are a damned good fellow."

তাহার পর শঙ্করের মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনি কি স্টুডেণ্ট ?"

"না।"

"No? But you look it. কি করেন আপনি ?"

"কিছুই করি না আপাতত।"

"No? কিছু করবার ইচ্ছে রাখেন ?"

তাহার পর ঘাড়টা একটু কাত করিয়া সাহেব বলিলেন. "What is your propensity? To swindle or to dwindle? These are the two things one must choose between!"

কথাবার্তা শুনিয়া লোকটিকে নেহাৎ খেলো বলিয়া শঙ্করের মনে হইল না। শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল—এই অদ্ভুত অতিথিটিকে তাহার বেশ লাগিতেছিল।

সাহেব বলিলেন, "নিজে যদিও আমি একজন রটার, কিন্তু বাপের দৌলতে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। I can shunt you off to any one of those two lines, I mean, swindling and dwindling. There are marvelous possibilities in both of them. আপনার মনের ঝোঁক কোন্ দিকে ?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "আমি সাহিত্য-চর্চ্চা করতে চাই—"

"O God Almighty, you are a poet!
That's funny and that's great!"

তাহার পর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "Yes, yes, I can help you in that way too. হিরণের দলে ভিড়ে যান, তারা একটা কাগজ বার করছে—দাঁড়ান লিখে দি তা হলে—"

সাহেব পকেট হইতে একটা কার্ডকেস বাহির করিলেন; তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "Will you lend me your poet's plume please?"

শঙ্কর হাসিয়া দোয়াত কলম আগাইয়া দিল।

সাহেব কার্ডের পিছনে লিখিলেন, "Hiron, he is a gentleman. Please take him in your gang." তাহার নীচে নিজের নাম সই করিয়া কার্ডখানি শঙ্করের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "হিরণ is a bright boy. —সেও সাহিত্যচর্চ্চা করছে, at least that's his present pose—চলে যান তার কাছে—আমি উঠি। I am so sorry I disturbed you.—"

সাহেব উঠিলেন।

"আমি কি আপনার সঙ্গে গিয়ে পৌছে দিয়ে আসব ?"

"No, thanks.—মোটরে উঠে বসে স্টিয়ারিং ধরতে পারলে I am as steady as a rock."

সাহেব টলিতে টলিতে গিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর স্টার্ট করিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কার্ডখানা উলটাইয়া দেখিল, নাম লেখা রহিয়াছে—যোগেন রায়।

কে এই যোগেন রায় ?

শঙ্কর কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনকে নানাভাবে নাড়া দিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িবার পর সে স্বপ্ন দেখিল, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নয়, অমিয়াকে।

(ক্রমশঃ)

হরেশুঁড়ির দহ

কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গোবরডাঙ্গার পরপারে শোভে ভগ্ন প্রাচীন পথ,
এই পথ দিয়ে চলে গেছে কত ষোড়শ যুগের রথ।
গৌড়-বঙ্গ রাজধানী হ'তে যমুনার মোহানায়,
মিশে গেছে সে যে—অতীত কাহিনী বহিতেছে বেদনায়।
কোনমতে আজো রয়েছে জাগিয়া অতীতের পদলেখা,
এই পথ রচি' হরে শুঁড়ি তার রেখে গেছে স্মৃতিরেখা।

শৌণ্ডিক নয়, তবু শুঁড়ি ব'লে রটেছিল তার নাম,
তাহারি জীবন-স্মৃতিটুকু নিয়ে রহে চারঘাট গ্রাম।
ইছামতী যেথা যমুনার সাথে দিয়েছে আলিঙ্গন,
মোহানার ধারে দেখা যায় গত যুগের আলিম্পন।
মৃত্তিকা হ'তে উঠেছে হরির বিশাল ভগ্ন তরী,
তাম্রপাতের অংশটি তার অতীতের শতনরী।



মিসেস্ ভজহরি সরখেল
(আয়নার সম্মুখে বসিয়া চুল বাঁধিতেছেন)

প্রতিদিন আহারাদির পর দুইজনে উপরোক্ত কাটিংগুলি এবং কয়েকখানা ভিজিটিং কার্ড লইয়া বাহির হন এবং যেখানে যেখানে সাক্ষাৎ করা দরকার, সেখানে সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। কাজ হউক বা না হউক, ভজহরি দেখিতেছে যে এখন আর সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে কোন অসুবিধা নাই। নরহরির প্ল্যান যে একটু কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

একদিন হোটেলের ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা রোজই দুপুরে বেরোন দেখ্‌ছি। কোথায় যান বলুন তো?

ভজহরি বলিল, আর বলেন কেন মশাই! স্ত্রীর হয়েছে ফিমেল ডিজিজ। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি থেকে আরম্ভ করে কত কি করলুম, কিছুতেই কিছু হয় না। রোজ এক একজন নূতন ডাক্তার দেখাচ্ছি। ফতুর হয়ে গেলাম মশাই!

আহা, তাইতো! এইটুকু বয়সে—

গেরো মশাই, গেরো! নইলে কি আর—

ম্যানেজার আর কিছু বলে না। এমন রোগী তার হোটেলে প্রায়ই আসে। এই সব রোগীর পয়েই সে হোটেল এই কয়বৎসরেই এমন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

মিসলেনিয়াস ওয়ার্কার্স লিমিটেড। ম্যানেজার মিঃ তরুণকান্তি ব্যানার্জি। দুইপাশে ফাইলের গাদা, পিছনে ফাইল-হাতে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, উপরে ঘূর্ণ্যমান পাখা। বেলা সাড়ে এগারটা। বেয়ারা একখানা কার্ড আনিয়া দিল—বলা বাহুল্য, ভজহরির কথাইও কার্ড। কার্ডখানি হাতে করিয়াই মিঃ ব্যানার্জি সহকারীকে বলিলেন, একটু পরে আসবেন। বেয়ারাকে বলিলেন, সেলাম দেও।

সস্ত্রীক ভজহরি ভিতরে আসিয়া পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে বসিল। নমস্কার-পর্ব শেষ করিয়া ভজহরি একটি কাটিং মিঃ ব্যানার্জির হাতে দিল। মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন, কাজ একটা আছে বটে, তবে সেটা মিসেস্ সরখেলেরই উপযুক্ত কাজ। মানে, সর্টিং অব লেটার্স। এই ঘরেই বসে উনি কাজ করবেন। কোন অসুবিধে হবে না। সর্টিংটাই অফিসের সব চেয়ে দরকারী কাজ, বুঝলেন কি না। দরকারী চিঠিগুলো ঠিক মত সর্ট করে অফিসের সবাইকে পৌঁছে দেওয়া দরকার। এসব বেয়ারাদের দিয়ে ওকাজ চলে না। তা বেশ, কাল থেকেই উনি আসবেন। দশটায় অফিস খোলে, সাড়ে দশটার মধ্যেই আসা চাই। আচ্ছা, নমস্কার!

ভজহরি সস্ত্রীক হোটেলে ফিরিল। কেষ্ট বলিল, এ কি হ'ল? আপনি যে একেবারে চুপ ক'রে রইলেন সেখানে?

ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ হলো যে আমি কি বলব বা কি বলব না, তা ঠিকই ক'রতে পারলুম না। ম্যানেজারটাকে চটাতেও সাহস হ'ল না। দেখি, নরহরি কি বলে।

সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে হোটেলে রাখিয়া ভজহরি নরহরির মেসে গিয়া তাহাকে বলিল, তোমার বুদ্ধিটা যে অতিবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়াল।

ব্যাপার কি?

এযে উল্‌টা বুঝিলি রাম!

মানে?

মানে কেষ্টর চাকরি হ'য়ে গেল।

নরহরি সবিশেষ শুনিল। তারপর দুইজনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিবার পর ভজহরি হোটেলে ফিরিল। কেষ্ট বলিল, এখন উপায়?

উপায় হবে। ঘাবড়াস কেন?

আমার সঙ্গে কিন্তু তিনমাসের চুক্তি। এর মধ্যে যা করুন।

তিনমাস না হয়, ছমাস হবে। তোর তো দেখছি, পোয়া বারো। ডবল মাইনে আর বসে বসে পাখার বাতাস খাওয়া।

যাই হোক, যা ক'রবেন শিগ্‌গির করে ফেলুন। বেশি দিন কিন্তু আমি এসব পারব না।

বেশিদিন করতে হবে না।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর ভজহরি সস্ত্রীক আহারে বসিল।

পরদিন এ হোটেল ছাড়িয়া আদর্শ-নিবাসে গিয়া উঠিল।

৫

মিসলেনিয়াস্ ওয়ার্কার্স লিমিটেড্। তরুণবাবুর অফিস। বেলা পাঁচটা। ফাইল-বগলে অ্যাসিষ্টাণ্টদের দল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। ঘরের একপাশে টেবিলের উপর বাঁ হাতের কনুই রাখিয়া এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া মিসেস সরখেল চোখ মিট মিট করিতেছেন।

তরুণবাবু একটু বিরক্তির সুরেই বলিলেন—ওঃ, ফাইল আর ফাইল! আমাকে আপনারা মেরে ফেলবেন দেখ্‌ছি। আপনাদের সব হ'ল কি? যেখানকার যত পুরাণো কেস, সব একসঙ্গে করে সবাই এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেছেন। অফিসটা কি পালিয়ে যাচ্ছে, না ফাইলগুলো পাখা মেলে উড়ে যাবে? এত তাড়া কিসের? আজ আর না। আমি এখুনি বেরুবো। দরকারী এনগেজমেণ্ট আছে। যাচ্ছি একটা ক্যাপিটালিষ্টের কাছে। লাখ-খানেক টাকার শেয়ার গতাতে হবে।

একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট নিম্নস্বরে বলিলেন, মোটে লাখ-খানেক !

অ্যাসিষ্টাণ্টগণ আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইলেন। তরুণবাবু বলিলেন, মিসেস্ সরখেল !

বলুন।

আপনি কি এখুনি বাড়ী যাবেন ?

অপিসই যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি আর বসে থেকে কি করব ? চিঠি সর্ট করা তো হ'য়ে গেছে বারটায়। বসে বসে তো আমার পায়ে খিল ধরে গেল।

আমিও তো যাচ্ছি আপনাদের ওদিকেই। চলুন না আমার গাড়ীতেই—

আমি তো ট্রামেই যেয়ে থাকি।

আচ্ছা, আজ চলুন আমার সঙ্গে।

মিসেস্ সরখেল নিরুত্তর। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। তরুণবাবু বলিলেন, আচ্ছা আপনি তাহলে আগে যান, আমার গাড়ী তো চেনেন—বসুন গিয়ে। আমি আসৃছি।

গাড়ীতে বসিয়া তরুণবাবু বলিলেন, উঃ কি গরম ! একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক। আউটরাম ঘাটের নিকট গিয়া তরুণবাবু বলিলেন—আসুন, এক কাপ চা—

না, থাক্।

না, সে হবে না। চলুন, আপিসের এই হাড়-ভাঙা খাটুনির পর একটু—। চিঠি সর্ট করা কি যা তা কাজ—অফিসের সব কাজের চেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে ওইটি। টুমস্ত বিজ্‌নেসটাই তো চলছে চিঠির উপরে।

মৌন সম্মতির সহিত মিসেস সরখেল তরুণবাবুর সঙ্গে গিয়া চায়ের টেবিলের পাশে বসিলেন। তরুণবাবুর বাড়ীর পাশের বাড়ীর একটি ছেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আউটরাম ঘাটে বেড়াইতে আসিয়াছে। ছেলেটি তরুণবাবুকে দূর হইতে একটা নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। তরুণবাবু চা-পান শেষ করিয়া জলের ধারে একটু পায়চারি করিয়া মোটরে উঠিলেন।

তরুণবাবু বলিলেন—এ জায়গাটা বেশ, না ?

হুঁ।

এখনই বাড়ী যাবেন ?

কোথায় যেতে চান ?

মেট্রোয় যাবেন ? একটা ভাল ছবি আছে। আপনার স্বামী কিছু মনে ক'রবেন না ত ?

এতে আর মনে ক'রবার কি আছে ?

মেট্রোর প্রশস্ত বারান্দার পাশে গাড়ী থামিল। তরুণবাবু এবং মিসেস সরখেল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিটঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের দিক হইতে তরুণবাবুর পিসতুত ভগিনী রমা ব্যাগ হাতে হন্ হন্ করিয়া উহাদের সামনে দিয়াই চলিয়া গেলেন। তরুণবাবুর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল, ক্ষণিকের জন্য। সম্ভবত সঙ্গে অপরিচিতা মহিলা দেখিয়াই রমা কোন বাক্যব্যয় না করিয়া সোজা ধর্মতলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সিনেমা দেখা শেষ হইলে তরুণবাবু বলিলেন—চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, থাক, আমি ট্রামেই যাব।

কেন, গাড়ী যখন রয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে ?

বিশেষ ধন্যবাদ। আমি ট্রামেই যাব। আপনাকে আর ট্রাবল দেবো না। নমস্কার !

নমস্কার !

শ্রীমতী কেষ্ট আদর্শনিবাসে ফিরিলেন। গুঞ্জহরি বলিল, এত দেরি যে !

মেট্রোয় গিয়েছিলুম।

বেড়ে আফিস।

৬

তরুণবাবুর বাড়ী। তরুণবাবু যখন মেট্রোতে ঢুকিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সহধর্মিণী সুরমা দেবী রেডিওর চাবি খুলিয়া গান শুনিতেছিলেন। একটু পরে আউটরামঘাট-প্রত্যাগত প্রতিবেশী ছোকরার ভগিনী সুলেখা আসিয়া বলিল, মাসিমা, আপনি যে বড় বাড়ীতে বসে ?

কেন ?

মেসোমশায় তো বেড়াতে গেছেন গঙ্গার ধারে !

যাঃ, আজকাল ওঁর কাজ কত বেড়ে গেছে। তাই ফিরতে দেরী হয়। বোস এখানে, গান শোন।

তা শুনছি। কিন্তু দাদা যে ব'ললে সে একটু আগে দেখে এসেছে, মেসোমশাই আর—, ইয়ে—, মেসোমশায় গঙ্গার ধারে চা খাচ্ছেন আর বেড়াচ্ছেন।

তা হ'তেও পারে। হয় তো আপিসের পর একটু—

হ্যাঁ, তা তো ঠিক। দাদা ব'ললে, মানে—, দাদা ব'ললে—

দাদা কি ব'ললে ?

ব'ললে, মানে—ইয়ে—

কি ব'ললে, বল্ না।

ব'ললে, মানে, মেসোমশাই গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন আর চা খাচ্ছিলেন।

এই কথা বলিয়াই সুলেখা উঠিয়া পলাইয়া গেল।

সুরমাদেবী রেডিওর চাবি বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হয় সুলেখার কথার সুর ও ভঙ্গীর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহাতে সুরমা যেন একটু অস্বস্তি বোধ না করিয়া পারিলেন না। উঠিয়া গিয়া কিছুক্ষণ গোটা কয়েক নিরর্থক কাজ করিয়া ফেলিলেন। দম দেওয়া ঘড়িতে পুনরায় দম দিলেন। পরিষ্কার আয়নাখানি আবার মুছিলেন। ফাইলে গোঁজা পুরোনো চিঠি ও ক্যাসমেমো পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। ঝিটাকে ডাকিয়া অনর্থক একবার বকিয়া দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া রেডিওর চাবি খুলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তেই সম্মুখে উপস্থিত পিস্তুত বোন রমা। সুরমাদেবীর প্রায় সমবয়সী।

সুরমাদেবী বলিলেন, হঠাৎ কি মনে করে ?

এই যাচ্ছিলাম এই পথে। ভাবলুম একবার তোর এখানে ঢুঁ মেরে যাই।

তা বেশ করেছিস। বোস একটু চা ক'রতে বলি।

না, না। চা তো আমি বেশি খাই নে। তা ছাড়া, এই একটু আগেই খেয়েছি। এখন আর কিছু খাব না।

তবে, গান শোন।

তুই যে বড় বাড়ীতে ব'সে ব'সে গান শুনছিস? জামাইবাবুকে তো দেখে এলাম, মেট্রোয় ঢুকতে।

সুরমাদেবীর মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া গেল, মেট্রোয় ?

হ্যাঁ, আশ্চর্য হ'লে যেন!

না, না। আজকাল ওঁর আপিসের কাজ ভয়ানক বেড়ে গেছে কি না। তাই হয় তো, আপিসের পর একটু—

আমি তো দূর থেকে ভাবলুম, তুইও সঙ্গে রয়েছিস। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলুম—

কি দেখলি ?

দেখলুম, মানে—, দেখলুম তুই যাস নি। তবে—

তবে কি ?

সঙ্গে আর একজনকে দেখলুম।

কাকে ?

আমি চিনি নে।

বোধ হয় আপিসের কোন বন্ধু টন্ধু হবে।

বোধ হয়। আচ্ছা, আমি আজ আসি। তুই তো আর আমাদের ওদিকে মাড়াস নে। যাস একদিন।

যাবো।

রমা চলিয়া গেল। রমার কথাগুলির সুর এবং ভঙ্গীও সুরমাদেবীর পছন্দ হইল না। বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, তরুণবাবু ফিরিলেই একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্থির করিলেন, না এইরূপ সামান্য অছিলায় একটা 'সীন' করা সমীচীন হইবে না। এখন সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন। স্বামীকে তাঁহার মনের সন্দেহ কিছুতেই জানিতে দিবেন না। আরো কিছুদিন দেখিয়া পরে যাহা হয় করা যাইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া সুরমাদেবী নিজেকে সংযত করিলেন এবং মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিলেন।

৭

মিঃ ব্যানার্জি বাড়ী ফিরিয়াছেন। সুরমা দেবী অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, তোমার আজকাল বড় দেরি হয় আপিস থেকে আসতে।

হ্যাঁ, কাজ ভয়ানক বেড়ে গেছে। ওয়ারের জন্য জার্মেনি, ইতালি প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সব বন্ধ। যত অর্ডার, তার বেশির ভাগই এসে পড়ছে আমাদের মিসলেনিয়াসে।

তোমাদের ব্যবসা কিসের গো ?

মিসলেনিয়াস, মানে—নানারকম।

ও। যাই বল, আজ তোমার বড় দেরি হ'য়ে গেছে। এত দেরি ক'রো না, শরীর খারাপ হবে।

কি করি বল? আমাদের কাজ বেড়ে চলেছে ব'লে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিট্যালও বাড়াতে হচ্ছে কি না! আজই বিকেলে এক মাড়োয়ারীকে আড়াই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রী করা হ'ল। সেই সব কাগজপত্র ঠিক করতে করতে—

এত খাটুনির পর একটু বিশ্রামও তো দরকার। আপিসের পর বরঞ্চ একটু যদি গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে তার পর বাড়ী ফের তো মন্দ হয় না।

তরুণবাবু স্বগত বলিয়া ফেলিলেন, গঙ্গার ধারে! বলে কি!—পরে গৃহিণীকে বলিলেন, হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। তবে কি জান, আপিসের ছুটী হ'লেই বাড়ীতে এসে পৌঁছানর জন্য মনটা ছটফট ক'রে ওঠে।

তা করুক। তাই ব'লে তো শরীরটা মাটি করা যায় না। অত খাটুনি, তার পর একটু বিশ্রাম না ক'রলে চলবে কেন? বরঞ্চ এক আধ দিন আপিসের কাউকে সঙ্গে ক'রে একটু সিনেমা দেখে এসো। তোমার কাজের যে ভীষণ চাপ পড়েছে, তাতে সময়মত বাড়ী ফিরে আমাকে নিয়ে বেরোনো—সে তো এখন হ'য়ে উঠবে না—

তরুণবাবু মনে মনে বলিলেন, ব্যাপার কি? গঙ্গার ধার, সিনেমা—। প্রকাশ্যে বলিলেন, হ্যাঁ—তা মন্দ কি? তবে কি না, তুমি সঙ্গে না গেলে আমার ছবি দেখাই হয় না।

তাই নাকি গো! আমার জন্য বুঝি ফুল এনেছ? পকেটে বুঝি? কেমন সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে!

ফুল! পকেটে! গন্ধ বেরুচ্ছে! মানে, ভুলে ট্রামে লেডিজ সীটে বসে পড়েছিলাম কি না—। কিংবা বোধ হয়—মানে, ওই যে মাড়োয়ারিটা সাড়ে চার লাখ টাকার শেয়ার কিনলে, তাকে একটা পার্টি দেওয়া হ'ল কি না—সেখানে আতর, গোলাপ জল, কত কি—বোধ হয়—

নাও, হয়েছে! এখন কাপড়চোপড় ছেড়ে খাবে চল। রাত হয়েছে।

৮

কিছুদিন পরে। মিসলেনিয়াস ওয়ার্কার্স আপিস। মিঃ ব্যানার্জির ঘর। তরুণবাবু ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, শ্রীমতী তাঁহার পূর্বেই আসিয়া স্বস্থানে বসিয়াছেন। টুপি এবং ছড়ি যথাস্থানে রাখিয়া তরুণবাবু নিজ চেয়ারে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, শ্রীমতী কাঁদিতেছেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া রুমাল বাহির করিয়া শ্রীমতীর চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিছনের দিকে সুইং-ডোর খুলিয়া কয়েকজন অ্যাসিষ্টান্ট এবং কেরাণী তরুণবাবুর অলক্ষ্যে

নানাবিধ নীরব মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী দেখিয়াও দেখিলেন না।

তরুণবাবু বলিলেন, কি হ'য়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?

শ্রীমতী আরও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তরুণবাবু রুমাল দিয়া ক্রমাগত চোখ মুছাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ একবার পিছনের দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, কোথা গেল দরওয়ানটা। এই বেয়ারা—

বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তরুণবাবু চটিয়া বলিলেন, তুমলোক কেয়া করতা হায়? টেবিল পর সিগারেটকা ছাই সাফা নেহি করতা হায়, আর ওহি ছাই উড়কে উড়কে মেমসাহেবকা আঁখমে চলা যাতা হায়—

এই কথা বলিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে তরুণবাবু নিজ চেয়ারে বসিলেন এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্টদিগকে বলিলেন—দেখি, কনফিডেন্সিয়াল ফাইলটা—এটা এখানে রেখে যান। এই ফাইলটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা কেউ এঘরে আসবেন না। আমার এটা শেষ করতে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগবে।

অ্যাসিষ্টান্টগণ চলিয়া গেলেন।

তরুণবাবু শ্রীমতীকে ডাকিয়া বলিলেন, এখানে আসুন। হ্যাঁ, বসুন। এবার বলুন, আপনার কি হয়েছে।

আপনাকে বলে আর লাভ কি?

তবু, বলুন না।

আমাদের বাড়ীওয়ালা আজ ইজেক্টমেন্টের নোটিশ দিয়েছে। আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই।

কেন, আপনার স্বামী ত—

তিনি আজ তিন বছর বেকার। ওঁর একটা চাকরি না হ'লে আমাদের মান মর্যাদা দূরে থাক, কলকাতায় দুবেলা দুটো—

আচ্ছা, আমি দেখছি, কি ক'রতে পারি।

যদি দয়া করে এই আপিসেই একটা কাজ দেন—

দেখুন, সেটা আমার খুব পছন্দ নয়। মানে একই আপিসে স্বামী-স্ত্রী। ওতে কাজের ক্ষতি হবে। বরঞ্চ দেখছি, আমার জানা একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দিতে পারি কি না।

দয়া ক'রে একটু বিশেষ চেষ্টা ক'রবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

তা'হলে এখন যাই, চিঠি সর্ট করি গে।

আচ্ছা—যান।

৯

ভজহরির চাকরি হইয়াছে। আদর্শ-নিবাস ছাড়িয়া উহারা সুরুচি-আশ্রমে উঠিয়া আসিয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে এক হোটেলে বেশিদিন থাকিতে উহাদের সাহস হয় না।

রবিবার। আপিস নাই। আহারাদির পর কেষ্ট বলিল, আর কেন, এইবার আমাকে ছেড়ে দিন। শেষে কি জেলে যাব? আর দুদিন আদর্শ-নিবাসে থাকলেই ধরা পড়ে যেতাম। ওখানকার ম্যানেজারের শ্যালকটি যেভাবে আমার পিছু নিয়েছিল—

আর কটা দিন একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। আমার প্রোবেশনারি পিরিয়ডটা উৎরে যাক। কি জানি বাপু, এর মধ্যে আবার কি ক'রে বসে।

প্রোবেশনারি পিরিয়ডও শেষ হইল। ভজহরির বেকারত্ব সত্যই ঘুচিল! কম হউক, বেশি হউক, মাস অন্তর কিছু তো আসে। আর নরহরির ফ্রেণ্ড হইতে হইবে না। ফ্রেণ্ডস্ চার্জের জন্য আর নরহরিকে মেসের ম্যানেজারের তাড়া খাইতে হইবে না। রাত্রে খাইবার পরে একটা মিঠে পানের অভাব হইবে না।

ভজহরি কেষ্টকে রেহাই দিল। কেষ্ট আর আপিস গেল না।

তরুণবাবু একদিন ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভজহরি অতি ভারাক্রান্ত বিষণ্ণমুখে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। তরুণবাবু বলিলেন, আপনার স্ত্রী আজ কয়দিন আসেন নি। অসুখ বিসুখ করে নি তো! কোন খবরও তো দিলেন না!

ভজহরি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তরুণবাবু শশব্যস্তে বলিলেন, ব্যাপার কি?

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, সার। সে সর্বনাশী আমার সর্বনাশ ক'রে গেছে। উঃ কি ভীষণ কলেরা—একেবারে এশিয়াটিক কলেরা, সার্।

তরুণবাবু সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, যা হবার হ'য়ে গেছে। কেঁদে আর কি করবেন। নিয়তিকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতেই বাহির হইয়া গেল।

১০

মুস্কিল হইল কেষ্টাকে লইয়া। ভজহরি স্বীয় মেসে নরহরির ঘরে সীট লইয়াছে। কেষ্ট একে তো যাত্রাদলের সখী। তারপর গত কয়েক মাস যাবৎ ইলেক্ট্রিক পাখার বাতাস, মোটরে ভ্রমণ, হোটেলে খাওয়া, সিনেমা দেখা এবং অন্যান্য নানাবিধ আদর যত্নে খাঁটি থিয়েটার-বাবুতে পরিণত হইয়াছে। এখন তাহার পক্ষে আর মেসের ত্রিশজন মেম্বারের খাটুনি খাটা সম্ভব নয়। অথচ একটা কিছু চাই তো! ভজহরিরও একটা মর‍্যাল রেস্‌পন্সিবিলিটি আছে। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কেষ্টকে বলিল, ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করবি? ছোট পরিবার, বেশি ঝামেলা নেই।

কেষ্ট অগত্যা বলিল, আচ্ছা।

পরদিন আপিস যাইবার সময়ে একটু দেরি করিয়াই মেস হইতে বাহির হইল। কেষ্টকে সঙ্গে লইয়া তরুণবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইল। তরুণবাবু তখন আফিস চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে তরুণবাবু ভজহরিকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার চাকরটা দেশে চলিয়া গিয়াছে। যদি তাঁহার জানা বা তাঁহার কোন বন্ধুর জানা ভাল চাকর থাকে, তাহা হইলে

যেন তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দেন। ভজহরি তাই কেষ্টকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তরুণবাবুর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, বাবু আমাকে একটা চাকরের কথা বলেছিলেন। এই লোক দিয়ে গেলাম। মাইজিকে ব'লো, এ কাজকর্মে খুব ভাল।

ঠাকুর মাইজিকে সংবাদ দিল। চাকর অভাবে বাড়ীতে খুবই অসুবিধা হইতেছিল। মাইজি বলিলেন, ওকে ব'লো—এখন থেকেই থাকতে।

কেষ্ট কাজে ভর্তি হইল।

যাত্রার দলে এবং ব্যবসায়-অফিসে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে অভ্যস্ত, গৃহস্থ-ঘরের বিশ্বস্ত চাকরের অভিনয় তাহার পক্ষে খুবই সহজ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেষ্টর কাজকর্ম চালচলন দেখিয়া সুরমা দেবী মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তরুণবাবুর আপিসের কাজ আজকাল কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ঠিক পাঁচটায় বাড়ী ফেরেন।

আজও ফিরিয়াছেন। সুরমা দেবী বলিলেন, একটা চাকর-রত্ন পেয়েছি।

কলকাতার চাকর-রত্ন। তোমার ধনরত্নগুলো সাবধান।

সে ভয় নেই। চেনা লোক। ভজহরিবাবু দিয়ে গেছেন। কাজ-কর্ম কি নিখুঁত, আর কি পরিষ্কার! মনেই হয় না যে চাকর!

কই, ডাক তো দেখি তোমার রত্নটাকে—

কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। ও আসছে চা আর খাবার নিয়ে।

তরুণবাবু প্রস্তুত হইলে সুরমা দেবী ডাকিলেন, কেষ্ট!

আজ্ঞে!

চা আর খাবার নিয়ে আয়।

যাই মা।

কেষ্ট চা এবং খাবার লইয়া তরুণবাবুর সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। চায়ের বাটি এবং খাবারের থালা মাটিতে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই কেষ্ট ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইল।

এদিকে তরুণবাবু কেষ্টকে দেখিয়াই 'ওঃ' বলিয়া চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। একটু পরে ঠাকুরকে ডাকিয়া ধরাধরি করিয়া সুরমা দেবী তাঁহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তরুণবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া সুরমা দেবীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুরমা দেবী বলিলেন, এই ধরণের একটা কিছু আমি অনেক আগেই সন্দেহ ক'রেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আমি ভাল ক'রেই চিনি, তাই কিছু বলিনি। আমি জানি, বেশি কোন অন্যায় তুমি ক'রতে পার না।

তরুণবাবু আবার বলিলেন, আমায় ক্ষমা কর।

সুরমা দেবী বলিলেন, যাও, তুমি ভারি ছেলেমানুষ!

তরুণবাবু বলিলেন, ওই ভজহরিটা কি রাস্কেল! ওকে আমি জেলে দেবো।

থাক। আর বীরত্বে কাজ নেই। তাছাড়া, বেচারী—পেটের দায়ে—কি আর এমন অন্যায় ক'রেছে?

যা করবার তা তো করেছে! তার পর আবার কেষ্টকে আমাদেরই বাড়িতে পাঠানোর মানে?

আর কোনো মানে থাক বা না থাক, এতে তোমার আর আমার দুজনেরই মনের অস্বস্তিটা যে কেটে গেল, এটা কি কম লাভ?

এই কথা বলিবার পর সুরমা দেবী কেষ্টকে ডাকিলেন। কেষ্ট সভয়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং গলবস্ত্র হইয়া মিষ্টার ব্যানার্জি এবং সুরমা দেবীকে প্রণাম করিল।

স্বপন-চারিণী

শ্রীহেনা হালদার

হে স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী তোমারে দেখেছি প্রতিদিন
প্রতি রাত্রে প্রতি ক্ষণে পলে পলে বিরামবিহীন।

ধীর পদক্ষেপে তব নিত্যকার এই যাওয়া-আসা
গতির চঞ্চল ছন্দে প্রকাশিতে নাহি পায় ভাষা।
অন্ধকার নভোতলে যখন উদিবে চন্দ্রলেখা
রূপার জোয়ার মাখি পূর্ণিমা রজনী দিবে দেখা
চম্পক উঠিবে ফুটি, রজনীগন্ধার বৃন্তখানি—
আপনারে রিক্ত করি পশরা ভরিয়া দিবে আনি;
রূপ-রস-গন্ধ ভরা পরিপূর্ণ একটি অঞ্জলি—
তখন আসিবে লগ্ন, হে আরাধ্যা যেও না ক' চলি।

তোমার প্রতীক্ষা লাগি, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, প্রতি ক্ষণে,
শিরায় শিরায় জাগে উন্মাদনা, রক্তের কম্পনে,
উৎকণ্ঠ তোমার লাগি জেগে থাকি আকুল আগ্রহে—
উন্মুখ হৃদয় মত্ত দুর্নিবার প্রবল বিদ্রোহে,
চায় যে তোমারে পেতে, একান্ত নিজের ক'রে নিতে,—
নিত্যকার লুকোচুরি উন্মুক্ত আলোকে উদ্ঘাটিতে।
অন্তরাল ভেঙে দিয়ে ভেদ ক'রে মৌন যবনিকা
চিরন্তনী ক'রে নিতে হে স্বপন-চারিণী ক্ষণিকা।

ভারতীয় শিল্পে অদ্বৈত, দ্বৈত ও ত্রিত্ববাদীদের রূপবার্ত্তা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন তত্ত্ববারিধি

সকল সভ্যতার চিরন্তন প্রাণোৎস ফলিত হয় নিজের তত্ত্ববাদে ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতায়। মিশর, ব্যাবিলন ও গ্রীক্ সভ্যতার পটভূমিতে এসব জাতির



ত্রিমূর্ত্তি—কুম্ভকোনম্

তাত্ত্বিক অনুভূতি কিরূপ ছিল তা লক্ষ্য করা কঠিন হয় না। মিশরেও একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। হিরোডোটাস বলেন যে, থিব্‌সের (Thebes) মিশরীগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল—মিশরীর ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবানকে অনাদিও বলা হয়েছে।(১) কিন্তু এই একত্ববাদ জাতিকে অমরত্ব দান করতে পারেনি—পরবর্ত্তী বহুত্ববাদও মিশরকে মৃত্যুর ভীতি হ'তে মুক্ত করতে পারে নি। সে ভীতি অমরত্ব কল্পনা করেছে মৃতদেহ রক্ষা ক'রে, মর্ম্মর দেহ ও মৃত্যুর মন্দির রচনা ক'রে। তার ভিতর আত্মা এসে জীবন দান করবে—এ প্রত্যাশা মিশরীয় তত্ত্ব চিরকালই করেছে। ফলে মৃত্যুভয়ে ভীত সমগ্র সভ্যতাই ইতিহাস হ'তে মুছে গেছে। এমনি ক'রে নানা কারণে গ্রীক, ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি সভ্যতাও অস্তমিত হয়েছে। কেন এসব জাতির এ রকম পরিণাম হ'ল—তা খুঁজ্‌তে হ'লে যেমন সাহিত্য ও ধর্ম্মপ্রেরণাসমূহকে বিশ্লেষণ করতে হয়, তেমনি শিল্পকলায় নিহিত বিচিত্র বার্ত্তাকেও অনুধ্যান করতে হয়; কারণ উভয়ই অঙ্গাঙ্গী এবং একটি অন্যকে প্রকাশ করেছে নিজের রূপবিম্বে।

যে সব সভ্যতার তত্ত্ববাদ যুগে যুগে বাস্তবের সঙ্গে নিজের যোগ রক্ষা করতে পারেনি তারা নূতনতর আবেষ্টন



বরাহ অবতার—মধ্যভারত

বা আগন্তুক বিপ্লবকে শিরোধার্য্য ক'রে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা লাভ করতে পারে নি। ফলে জীবনযুদ্ধে তারা

(১) Vide Ancient History of the East, p. 318. F. Lenormrant and E. Chevallier.

নিজের পরাজয় স্বীকার ক'রে অন্তর্হিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের জাগ্রত সংজ্ঞান এত বড় প্রাচীন সভ্যতাকে আহত ও পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিহ্ন হ'তে দেয় নি—নব নব তত্ত্ববাদের সৃষ্টি ক'রে। এর প্রত্যেকটিরই সার্থকতা ছিল। ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যায়সমূহ এখনও ফাঁকা অবস্থায় আছে। কিরূপে নানা চিন্তা, অনুধ্যান ও তত্ত্বপ্রসঙ্গের স্রোত প্রবাহিত হয়ে ইতিহাসের অঙ্কগুলিকে প্রাণহীন হ'তে দেয় নি, তার আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হয় নি। ষড়দর্শন ও গীতার তত্ত্বাদি কোন্ কোন্ যুগে কি ভাবে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল—বৌদ্ধ বাস্তববাদ ও শূন্যবাদ, জৈনবাদ, তান্ত্রিক শক্তিবাদ, বৈষ্ণব প্রেমবাদ ও শৈব বৈরাগ্যবাদ কোন্ কোন্ যুগের মনের ইতিহাসে কিরূপ প্রাধান্য লাভ করে—তা আর্য্য, মৌর্য্য, গ্রীক্, কুষাণ, গুপ্ত ও [illegible] প্রভৃতি যুগের সাহিত্য, দর্শন, শিলালিপি, মুদ্রা ও রূপসৃষ্টির অজস্র উপাদানের ভিতর লক্ষ্য করতে হবে। এ সমস্তই পরস্পরসাপেক্ষ হলেও ভারতীয় তত্ত্বের জটিল অরণ্যে প্রবেশ ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের পক্ষে সব সময় সহজ হয়নি। শিল্পসাধনায় নানা তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হ'লেও সে সব অনেকের নিকট দুরূহ। এজন্য ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য ভারতীয় কলাকেলিকে "অদ্ভুত" (bizarre), "বিসম্বাদী" ও হাস্যজনক বলতে ইতস্তত করে না। (২)



নটরাজশিব—অন্ধ্র



জাম্বল—মগধ

ভারতীয় সভ্যতা নানা কঠিন তত্ত্বকে যে গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়ে রূপদান করেছে—এ কথা এখনও ভূয়িষ্ঠভাবে অজ্ঞাত। যুগে যুগে নব নব ধ্যান ও মনন নূতন আধার খুঁজেছে—ভাবের নূতন বিগ্রহকে মূর্ত্ত করেছে ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও সৌধসৃষ্টির ভিতর। মূর্ত্তির বিচিত্র ও বহুমুখী রচনার ভিতর দিয়ে এক একটি অপ্রত্যাশিত তত্ত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সব সহজ তত্ত্বের শুষ্ক গণ্ডী অতিক্রম ক'রে জীবনের উল্লোল উর্ম্মিভঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে গেছে। অতিপ্রাকৃত, আধিদৈবিক দর্শনের দানও একটা অভিনব বাস্তবতার স্তরে মণ্ডিত হয়ে একটি বিপুল সৌন্দর্য্যসঙ্গম সম্ভব করেছে। সে আলোচনার অধিকার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হয়েছে কি-না সন্দেহ।

গোড়াতেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা একটি প্রকাণ্ড ভুল ক'রে থাকেন—ভারত ও ভারতেতর সভ্যতার আলোচনায়। একেশ্বরবাদ ঋক্‌বেদেও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পুরুষসূক্তিতে অতি বিচিত্রভাবে এই এক-ঈশ্বরের বর্ণনা আছে। তবুও বাইরের আলোচকেরা ভারতকে polytheistic বা বহু দেববাদী বলে থাকেন। ম্যাক্সমূলার আবার একে henotheism ও বলেছেন। মিশরের দেববাদে যে সব দেবতা আছে তাদের প্রকৃতি এবং ভারতীয় দেবদেবীর প্রকৃতি একেবারে বিপরীত। ওদের দেবদেবীর রচনা যে তত্ত্ব হ'তে হয়েছে এখানে তা সম্ভব হয় নি। উপনিষদে আছে :

"বৃক্ষঃ ইব দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"।

এই এক ভারতে বহু হয়েছিল অভিনব ভাবে। "একাহং বহু

(২) লর্ড জেটল্যাণ্ড : Heart of Aryavarta-এ এ সব কথা সমর্থিত হয়েছে।

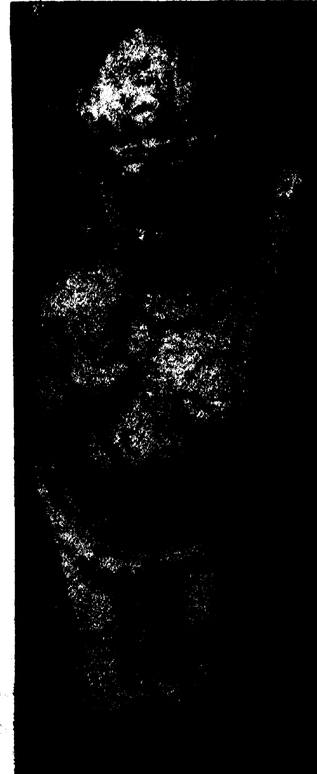
স্যাম্" এই তত্ত্বের বহুত্বের মূলে আছে ঐক্যবাদ। এক বহু হ'লেও একই থাকে—ভারতীয় তত্ত্ববাদে এটাই বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। এখানে একের বহুত্ব সত্ত্বেও ঐক্য



তারা

হয়েছে গণিতের গুণপ্রকরণের চিহ্নিতে—অন্যত্র এক বহু হয়েছে যৌগিক প্রথায়। অর্থাৎ ভারতীয় তত্ত্বে ১×১×১×১×১ ··· অসীমভাবে=১। অন্যতত্ত্বে এক বহু হয়েছে ১+১+১+১=অসীমভাবে যোগের সাহায্যে। পূর্ব্ব প্রকরণে ফল হচ্ছে সব সময় এক—দ্বিতীয় প্রকরণে সব সময় বহু। প্রথমটিতে অন্বয়ী বা অঙ্গাঙ্গী প্রথা—দ্বিতীয়টিতে ব্যতিরেকী বা ভিন্নাঙ্গী প্রথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কলার রম্য আধারে একত্বের দুই তত্ত্বও এই বিভিন্নতার সুপ্রকাশ হয়েছে। জড়বাদের ঐক্য ও অধ্যাত্মবাদের ঐক্য এক ব্যাপার নয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপ কল্পিত হয়েছে—ইদানীং মহাকালী, অবলোকিতেশ্বর, গণপতি প্রভৃতি দেবতারও বিরাট রূপ রচিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এরূপ মূর্ত্তি গ্রীক্, মিশর বা ব্যাবিলনীয় তত্ত্বের প্রতিফলক নয়। এসব মূর্ত্তি বহুশীর্ষ বটে—কিন্তু বহুগ্রীব নয়—একটি গ্রীবাই ঐক্যের প্রতিপাদক হয়েছে। অন্যদিকে দশভুজা দুর্গা বা সহস্রভুজা কালিকার স্কন্ধের বাহুল্য নেই—একই স্কন্ধের ভিত্তিতে সমগ্র রচনা কল্পিত। বিরাট রূপের বাহুল্য কল্পনা এইভাবে ঐক্যের শ্রীতে মণ্ডিত হয়েছে। এই বিরাটত্বের ভিতর ঐক্যের সূত্র অনুধ্যান করতে পারেনি বলে পশ্চিম এসব সৃষ্টিকে দুর্বোধ্য ও হাস্যজনক বলেছে। লর্ড জেটল্যাণ্ড এসবকে "travesties of human form" বলেছেন ; অথচ এতে কোন সত্যিকার travesty নেই। প্রত্যেক দেবমূর্ত্তি একত্বে যেমন কল্পিত হয়েছে, তেমনি বহুত্বের বা বিরাটত্বের মর্য্যাদায়ও অভিষিক্ত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে। কাজেই হিন্দুদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নেই—তা গ্রীকদেরই একচেটে—এ রকম মন্তব্য করা বাতুলতা। একত্বের তত্ত্ব নিতান্ত সহজ নয়।



মহাকালের দ্বারপাল—মধ্য এশিয়া

নেপালে প্রাপ্ত মহাকালী মূর্ত্তি বহুশীর্ষ দেখে বিস্ময় জন্মে—বস্তুত এই সমস্ত মস্তক সমবায়ের অন্তর্নিহিত ঐক্য—

একটি বিশিষ্ট তত্ত্ববাদের ফল। মহাকালী মূর্ত্তিকে এ সমস্ত বাহুল্য বর্জ্জিত প্রাকৃত অবস্থায় অদ্বৈতরূপেও রচিত করা হয়েছে। অথচ মিনার্ভা বা আইসিস্ (Isis) সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। নেপালের অবলোকিতেশ্বরের একাদশ মস্তক আছে—অথচ এ মূর্ত্তি উপরোক্ত কারণে অস্বাভাবিক নয়।

ভারতের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।(৩) এ মূর্ত্তির ভিতর ভারতের দু'টি তত্ত্ববাদ পরিস্ফুট হয়েছে। অথচ ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এ মূর্ত্তি দেখে একে বীভৎস বলে এবং মূর্ত্তিটিকে Amazon বলতেও কুণ্ঠিত হয় নি। ভারতবর্ষ চিরকালই সত্যজ্ঞান অর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিল। 'জ্ঞাতা' 'জ্ঞেয়', 'দ্রষ্টা' 'দৃষ্ট' প্রভৃতির সম্পর্ক এখানকার চিন্তার গভীরতম স্তরকে আলোড়িত করেছে। একের সাহায্যে সৃষ্টি হয় না—দ্বৈত প্রয়োজন; subject ও object—এই যুগ্মসম্পর্ক ছাড়া সৃষ্টির স্তরে কেউ আস্তে পারে না। অথচ একান্তভাবে এ দুটি অবস্থা চিরন্তন স্থিতিমূলক ব্যাপারও হ'তে পারে না। বাদ, প্রতিবাদ ও সংবাদে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়ে থাকে; জ্ঞানের তন্ত্রকার এই ত্রিভুজকে ত্রিপুরাসুন্দরী বলেছে। হেগেল এ প্রথাকে বলেছেন



সূর্য্য—মধ্যভারত ও খাজুরাহো



অর্দ্ধনারীশ্বর—মৎস্যেন্দ্রনাথ

"thesis," "antethesis" ও "synthesis"। এই synthesis-এর ভিতর দ্বৈত আবার অদ্বৈত হয়ে যায়। ফলে যুগ্মের অভাবে সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং সৃষ্টির প্ররোচক জ্ঞানও সম্ভব নয়। এই গেল একটা দিক।

অপরদিকে হিন্দুর তত্ত্ববাদ আর একটি বিরাট সত্যকে অনুধাবন করেছে—যা জগতের কোন সভ্যতার পক্ষেই সম্ভব হয় নি। যে বিপরীতবাদ বা polarisation-এর উপর সৃষ্টি ও সৃষ্টির সংজ্ঞান নিহিত, তা বিশ্বময় একটি ঐক্যের সূত্রে ধৃত—এরূপ কল্পনা হয়েছে। ইউরোপের খৃষ্টতত্ত্ব, মাতৃত্বের নিকট অবনত হয়েও মাতৃত্বের অবিসম্বাদিত অধিকার স্বীকার করতে লজ্জিত ও কুণ্ঠাগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য খৃষ্টের মাতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'লেও পিতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। "Immaculate conception" একটা আত্ম-বিরোধী উক্তি—'সোনার পাথরবাটির' মত। এ ধারণায় সমগ্র তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারবিজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দর্শনবিধি এ রকমের ভীতিগ্রস্ত নয়। প্রত্যেক

(৩) এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত নূতন সংস্করণ বিশ্বকোষে লেখকের [illegible] দ্রষ্টব্য।

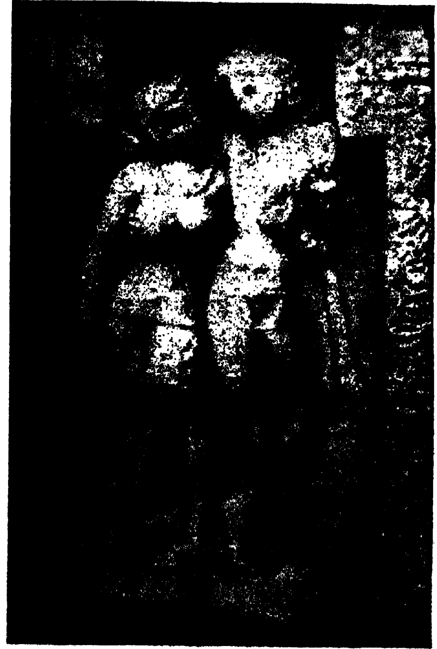
ভৌতিক ব্যবস্থাকে তা ভৌম দিক্ থেকে দেখ্তে ব্যাকুল। এজন্য স্ত্রী-পুংতত্ত্বকে একটা ইতর ব্যাপার বলে ভারতবর্ষ



মঞ্জুশ্রী—নেপাল

কখনও মনে করে নি এবং মাতৃত্বকে নিরালম্ব ও নিঃস্ব অবস্থায় কল্পনা ক'রেও আশ্বস্ত হয়নি। বস্তুত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে জগতে দেবদেবী বা নরনারীর অদ্বৈতও নয়, দ্বৈতও নয়—দ্বৈতাদ্বৈত অবস্থা কল্পিত হয়েছে। অর্থাৎ দু'য়ে এক এবং একে দুই কি ভাবে এদেশের তাত্ত্বিকেরা উপলব্ধি করেছিলেন তা রূপাধারে বিম্বিত করা হয়েছে। দেবী ছাড়া দেব সম্ভব নয়, স্ত্রী ছাড়া স্বামী অর্দ্ধ অঙ্গ মাত্র—একথা এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে রূপান্বিত হয়েছে। মানবের মাংসজ স্তরে যাকে গ্লানিযুক্ত মনে করা হয়—তুরীয় স্তরে মাংসজ সম্পর্ক নেই বলে সেরকম কোন তথাকথিত অশোভনতা তাতে থাকে না। কাজেই রাধাকৃষ্ণের যুগ্মসম্পর্কে যে আকর্ষণ আছে তা একটি অধ্যাত্ম চৌম্বক ব্যাপার—একই শক্তির সূক্ষ্মতর প্রকাশ ঊর্দ্ধতম স্তরে। নিম্নতম জড়জগতেও এই সম্পর্ক আণবিক আকর্ষণে প্রকট হয়েছে। বস্তুত যে আকর্ষণ বিকর্ষণ সমগ্র সৃষ্টিপ্রকাশে বর্ত্তমান, তা স্ত্রী-পুংতত্ত্বের মত দ্বৈতাদ্বৈত ব্যাপার। কুম্ভকোনমের, বাঙ্গালা দেশের বা এলোরার অর্দ্ধনারীশ্বরে ভারতীয় কলা যে অভেদ ব্যক্ত করেছে তা শুধু অধ্যাত্ম বা মানসিক স্তরে মাত্র নয়—দেহের স্তরেও। দু'টি নরনারী মিলে এক হ'তে বাধ্য তুরীয় বিধির বিধানে—কাজেই এতে কুৎসিত বা গ্লানিযুক্ত কোন ব্যাপার আছে মনে করা ভুল।

এ মূর্ত্তির অন্য দিকে ব্যক্ত হয়েছে হিন্দু সভ্যতার বিপুল শক্তিতত্ত্ব। সমগ্র এশিয়া প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে এই শক্তিতত্ত্বকে শিরোধার্য্য করেছে এবং যেখানে তা শিথিল হয়েছে—সেখানে যে পতন ও মৃত্যু এসেছে তাও দুর্লঙ্ঘ্য নয়। তন্ত্রের শক্তিবাদ দেবীকে শক্তিস্থানীয় করেছে এবং দেবকে করেছে শক্তির আধার অর্থাৎ দেবীবর্জ্জিত দেবের ভিতর কোন ক্রিয়ার প্রকাশ কল্পিত হয় নি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও শক্তির এ দুটি দিক্‌কে ব্যাখ্যা করেছে "positive" ও "negative" আখ্যা দিয়ে। একটি সক্রিয়, অন্যটি নিষ্ক্রিয়—সক্রিয়ের পক্ষেও অন্যটি অবলম্বন প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক মনীষীদের



রাধাকৃষ্ণ—পাহাড়পুর

থিওরী তাদের মতবাদে বা অপরিহার্য্য মনে করেছে—ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা তারই বৃহত্তর চক্রবাল দেখিয়েছে। দেবী-

ভাগবতে আছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বষ্টির প্রারম্ভে যখন কারণসলিলে ভাসমান ছিলেন তখন শক্তি বাক্‌রূপিণী হয়ে



মহাকালী (বিদ্যুজ্জ্বালা)

ত্রিদেবকে তাঁর উপাসনা করতে বলেন—যাতে ক'রে দেবতারা শক্তি লাভ করতে পারেন। এ জন্যই দেবী-ভাগবতে আছে :

"এতে পঞ্চমহাভূতা মম পাদমূলে স্থিতাঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতার উপরেই দেবীর স্থান। এই শক্তি-তত্ত্বের উৎস প্রাচীনকালেও অনুধাবন করা যায়। উপনিষদে আছে :

"দেবী হ্যেবাগ্র আসীৎ সৈব জগদণ্ডমসৃজত।"

বস্তুত সর্ব্বভূতে প্রকট শক্তিকে পরবর্ত্তী ভাবুকেরা দেবীরূপেই গ্রহণ করেছে। নাগোজী ভট্ট দেবীমাহাত্ম্যের টীকায় এই আদ্যাশক্তি সম্বন্ধে বলেছেন :

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা"।

এজন্য শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য ধর্ম্মপিপাসুগণ দেবের নামের পূর্ব্বে দেবীর নাম যোগ ক'রে থাকে—যথা গৌরীশঙ্কর, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-পুংতত্ত্বের কঠিন সমস্যার সমীকরণের প্রমাণ হচ্ছে এসব দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক মূর্ত্তিসমূহ। জগতে এই সম্পর্ক নানা-ভাবে কল্পিত হয়েছে। কোথাও এ সম্পর্ক হয়েছে একটা বিরোধের ও বৈপরীত্যের এবং তার সামঞ্জস্য হয়েছে একটি চুক্তির উপর। অন্যত্র তা প্রভু ও দাসী বা ধনী ও ধনের সম্পর্কে একটা বোঝাপড়ার ভিতর গেছে—যেসব মতামত একান্ত ভঙ্গুর, খণ্ড ও আত্মবিরোধী—জীববিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দিক হ'তে। দেহগত সম্পর্কেও স্ত্রীপুরুষের এই অখণ্ডতা ভারতের কোন সভ্যতাই উপলব্ধি করতে পারে নি। ভারতীয় কলাশাস্ত্রাদি এসব কঠিন তত্ত্বকে রূপদান করেছে—পাহাড়, নদী প্রভৃতি আঁকা বা প্রতিরূপ রচনা করাই শেষ কাজ মনে করেনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নিগূঢ়ভাবে অধ্যয়ন করলে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে একটি বিশ্বজনীন সমস্যার পূরণ হয়েছে—অতি কঠিন তত্ত্বকেও এই রূপবিম্বে সহজ ও সরল করা হয়েছে। মূর্ত্তির হিল্লোলিত রেখাপ্রাচুর্য্যের তরলগতি ও ছন্দ উভয় অর্দ্ধের মূর্ত্তিকে আশ্চর্য্যভাবে সঙ্গত করেছে - যা জগতের আর কোথাও কল্পনার স্তরেও আস্‌তে পারেনি।

এ দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বকে প্রদক্ষিণ ক'রে ভারতীয় দর্শন আরও একটি বিরাট সত্যকে বিচারের জন্য অগ্রসর হয়।



শক্তি গণেশ—উত্তরভারত

তা হচ্ছে কালতত্ত্ব—এই তত্ত্বপ্রসঙ্গে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মক কালের গতি যে তুরীয় উপলব্ধি প্রকট করে তা একটি

ত্রিত্ববাদে রূপায়িত করা হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—এই তিনটি একই অবস্থার তিনটি দিক। একে তিন এবং তিনে এক—এরকমের ত্রিত্বমূলক অচিন্ত্য ভেদাভেদকে মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকট করা হয়েছে। একই মুহূর্ত্তের ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রকটিত হচ্ছে, আর এমনি ক'রে মহাকাল এগিয়ে চলেছে। এই হ'ল এর কাজ। মর্ম্মরের আধারে এই ত্রিত্ববাদকে এমনি ভাবে উৎখাত করা হয়েছে যে বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পী রেঁাদ্যা এই মূর্ত্তির প্রশংসাব্যঞ্জক এক দীর্ঘ কবিতা লিখে' এর ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছেন। এই মূর্ত্তির তিনটি মস্তক ইউরোপীয় আলোচকদের পরিহাসের ব্যাপার হয়েছে। রসশিল্পী রদেন-স্টাইন একে ইউরোপের চোখে সমর্থন করতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়েছেন এবং শুধু মর্ম্মরের সৌন্দর্য্যগত তক্ষণ কৃতিত্বের দিক্ হতে মাত্র প্রশংসা করতে সাহস করেছেন। তিনি বলেন:

"A strong bias existed against certain elements of true Indian carving—the many armed figures of Durga, the three-headed form of Brahma ··· some of the sculpture seemed monstrous and indecent."(৪)

হ্যাভেল সাহেবকেও শিথিলভাবে ব্যাপারটির পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি বলেন: "Before a perfect specimen of art like this, the question whether it has two or more heads does not arise."



নাগরাজ—খিচিঙ্গ



যমুনা—কনারক

এঁদের মতে মর্ম্মরের স্থাপত্যগত ছন্দ ঠিক আছে। ভুল ও উৎকট এর ভিতরকার শিরের ব্যাপার হচ্ছে বহুত্ব—সে সব ইউরোপের অসহ্য। কারণ ইউরোপ দেহের সন্নিবেশকে দেহ-হিসেবেই দেখে, তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখ্‌তে অভ্যস্ত নয়। ভারতের মূর্ত্তি ও চিত্র রচনায় ভারতীয় তত্ত্বই উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এসব তত্ত্ব যে সফলভাবে কলিত করা হয়েছে তার স্বীকৃতি ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে। Rene Grousset বলেন: "The masterpiece in the Elephanta Sculpture is Maheswara Murti—that is the three-headed bust representing the three aspects of God. There are few material representation of the divine principle at once as powerful and as well as this in the art of the whole world". এরকমের কথা কুড়ি বছর আগেও বলা সম্ভব হয়নি এবং এখনও গৃহীত হচ্ছে না সর্ব্বত্র।

এমনিভাবে এলিফেন্টা গুহার এক দিকে ত্রিত্বের ঐক্য—অন্য দিকে অর্দ্ধনারীশ্বরে দ্বৈতের ঐক্য কলিত করা হয়। প্রবেশমাত্রই দর্শককে এই দুটি বিরাট তত্ত্বগত সমস্যা সমাধানের সম্মুখীন হ'তে হয় গুহার ভিতর। অথচ এই দুটি সৃষ্টিই জড়চোখে ইউরোপের কাছে "grotesque" ও "monstrous" মনে হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন, শুধু অদ্বৈতবাদমূলক মূর্ত্তিও ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছে। বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শিবমূর্ত্তি একক অবস্থায়ও রচিত হয়েছে। শিবের নটরাজ মূর্ত্তি শিবকে

(৪) স্ত্রীকে এক সময় ধন মনে করা হ'ত।
Examples of Indian Sculpture at the British Museum, p. 7.

একক ও অদ্বৈতভাবে দ্যোতিত করা হয়েছে—এজন্য ইউরোপীয়দের নটমূর্ত্তি খুব প্রিয়। বাদামি গুহার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বা উড়িষ্যার ত্রিভঙ্গের তত্ত্বদ্যোতক শ্রীকৃষ্ণ একক হয়েও বিরাট। ভারতের "একমেবাদ্বিতীয়ং"-এর প্রাকাম্য গভীরতা, অখণ্ডতা ও বৈপুল্যের প্রতিফলন এসব মূর্ত্তিতে আছে। অথচ ইউরোপের চোখে এ সব ত পড়ে না।

দ্বৈতাদ্বৈত প্রিয় হ'লেও প্রস্ফুট দ্বৈতবাদের স্থান ভারতীয় সাধনায় প্রচুর। এজন্য যুগল মূর্ত্তি রচিত হয়েছে দ্বৈতভাবে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের দ্বৈত মূর্ত্তি লালিত্যে অপরাজেয়। এলোরার শিবপার্ব্বতী সৌন্দর্য্যে ভরপুর।

বস্তুত ভারতীয় শিল্পপ্রদক্ষিণ কোন কোন ব্যাপারে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণের সহিত তুলনীয়। মানুষের চিন্তায় যতরকম কঠিন জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে মর্ম্মরের মুখরতায় ও বর্ণের উল্লোল বিস্তারে সে সবের অফুরন্ত উত্তর পাওয়া যাবে।

নটরাজের নৃত্যে সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একই তত্ত্বের এপিঠ ও ওপিঠ। ধ্বংস না হ'লে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয় না, কাজেই একই ছন্দে দুটি ঘটনার উদ্বোধন হয় নটরাজের নর্ত্তনে। এটি ধ্বংসাত্মক নয়। বস্তুত তুরীয় গতিমাত্রই ছন্দমূলক—এর ভিতর এলোমেলো অবিসম্বাদী কিছু নেই। জীবন ও মৃত্যু, আলো ও ছায়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ—সবই তুরীয় ছন্দে গ্রথিত, ভারতীয় কাজেই কল্পনায় মৃত্যু কোন ভীষণ, কুৎসিত ও দাহকর ব্যাপার নেই। ষড়ঋতুর আবর্ত্তনের মত, সৌরমণ্ডলের ঘূর্ণিত গতির মত, পৌনঃপুনিক মৃত্যুর ছন্দ লতার মত জীবনের মহীরুহকে বেষ্টন ক'রে অগ্রসর হয়। কাজেই নটরাজের প্রলয় নৃত্যাত্মক হয়েছে—ধ্বংসের বিস্ফোরক বজ্র তাতে লক্ষ্য করা ভুল।

অপর দিকে শিবতত্ত্বের আরও বহুদিক্ আছে। এক দিকে শিব তপস্বী, অন্য দিকে তিনি কান্তাসহিত গৃহী। শিবতত্ত্বে হয়েছে বিপরীতের মিলন। কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও তিনি কৃত্তিবাস, তপস্বীশ্রেষ্ঠ হয়েও তিনি শক্তিযুক্ত:

"একৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসম্মিশ্র দেহোঽপ্যবিষয় মনসাং যঃ পরস্তাদ যতীনাম।"

ভোগের সহিত যোগের একাত্মকতা শিবমূর্ত্তিতে প্রকট করা হয়েছে। এটাতে তান্ত্রিকতত্ত্বের সমন্বয়।

রাসলীলায় মধ্যমণিরূপে শ্রীকৃষ্ণ অভিনব তত্ত্বের দ্যোতক হয়েছে। শ্রীধর গোস্বামী এবং অন্যান্য ভক্তগণ রাসলীলা যে মণ্ডলাকারে সম্পাদিত হয় একথা বলেছেন। এতে একটা পূর্ণতা ও সমাপ্তির তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। ঝুলনের গতি অগ্রে ও পশ্চাতে—তাতে সীমান্তের মিলন হয় না—তার ভিতরকার তথ্য হচ্ছে—'হাঁ' ও 'না', thesis ও antethesis. এটাই হ'ল জগতের প্রকাশধর্ম্মের একটা বড় দিক। মিলন ও



অর্দ্ধনারীশ্বর—দক্ষিণভারত

বিরহে যে দ্বৈত রস সঞ্চারিত হয় তা পরস্পরসাপেক্ষ বা relative. কিন্তু যতক্ষণ না সব একটা পূর্ণতাতে আসে, তখন সব কিছুই হয় আনুষঙ্গিক—চরম নয়। শক্তিতত্ত্বে বিরোধের দিক একমাত্র ব্যাপার নয়—মিলনের দিকও আছে। কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি যমুনাতীরের বংশীবাদকরূপেও খোদিত ও চিত্রিত হয়েছেন। রাসলীলায় পরিপূর্ণতা

শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যমণি ক'রে কল্পিত হয়েছে। জগৎ একটি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণামৃতে বলেছেন—রাসলীলা নিত্য ও অনন্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—ভগবান রাসমণ্ডল তৈরি করলে পার্শ্ব হতে রাধিকা উৎপন্ন হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গী—এদের সম্পর্ক অচিন্ত্যভেদাভেদ। শ্রীরাধিকা হ্লাদিনী শক্তি। দ্রষ্টার চোখে এজন্য চারিদিকেই বৃন্দাবন উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগত যে বিচিত্র রসমূর্ত্তি আছে তাতে এই বৈষ্ণবতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার ও রসতত্ত্ব ইউরোপ গভীরভাবে জানে না।

বৌদ্ধতত্ত্বের বিচিত্র জ্ঞান 'আত্মা'র অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে অগ্রসর হয়। একটা অভিনব বাস্তব-বাদের ভিত্তিপত্তন হয় এ সময়। নির্ব্বিকার একক বুদ্ধকে সমগ্র জগতের চরম প্রতিমারূপে অঙ্কিত বা খোদিত করা অসম্ভব ছিল। এজন্য প্রাথমিক ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে বুদ্ধমূর্ত্তিরচনা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী ইতিহাসেও এই মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতার দ্যোতক কোন ইঙ্গিত রক্ষা করা হ'ত মূর্ত্তির আবেষ্টনের ভিতর। যখন গ্রীকেরা বৌদ্ধ হয়, তখন তারা মূর্ত্তি পূজক ব'লে বুদ্ধের মূর্ত্তি তৈরি না ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না। এজন্য গান্ধার শিল্পীরা মূর্ত্তি রচনা শুরু করে। তবুও বুদ্ধগয়ার প্রধান মূর্ত্তি যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি বরভুধরের ভিতরকার প্রধান মূর্ত্তিকে অসম্পূর্ণ রেখে ভারতীয় শিল্পীরা জগতের চরম তত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিজেদের অক্ষমতাকে মুখর করেছে। ফরাসী পণ্ডিত এ. ফুসে এ তত্ত্ব মোটেই যে উপলব্ধি করতে পারেন নি তা তাঁর লেখায় বোঝা যায়। একক ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থাও ইউরোপের পরিহাসের ব্যাপার হয়েছে—ভিন্‌সেন্ট এ. স্মিথ এ-মূর্ত্তিকে suet pudding-এর সহিত তুলনা করেন। জগতের আদিতম মনস্তত্ত্বের পীঠ ভারতবর্ষকে এরূপভাবে ভুল বোঝা ইউরোপের পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছে। এ মূর্ত্তি par psychic—পরবর্ত্তীযুগ বুদ্ধকল্পনায় একে পাঁচ এবং পাঁচে এক এই অপরূপ তত্ত্ব উপস্থিত করে। পঞ্চভূতের নিয়ামক পঞ্চবুদ্ধ কল্পিত হ'ল, বিরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ। যথাক্রমে এসব বুদ্ধ, ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতের দ্যোতক। এদের সহিত পঞ্চ-শক্তিও কল্পিত হয়েছিল। সমগ্র ব্যাপারই যান বৌদ্ধবাদের বচিত্র তত্ত্বের পরিপোষক হয়েছে।

অপর দিকে বৌদ্ধজগতে তারামূর্ত্তি কল্পনায় অকল্পনীয় বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়েছে। এ সৃষ্টির মূলে ভারতীয় দর্শন জলসিঞ্চন করেছে—একান্তভাবে এগুলি ভৌতিক বা দৈহিক সৃষ্টি নয়। সিত তারা, পীত তারা প্রভৃতি বৌদ্ধতত্ত্বের অলঙ্কার স্থানীয়। বৌদ্ধবাদের মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, বাঙ্গলাদেশ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে এই দেবতার অপরূপ তাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখা যায়। মঞ্জুশ্রী কল্পনাও আদিবুদ্ধ হ'তে জন্মলাভ করেছে। তাঁর এক হাতে অজ্ঞান বিনাশের তরবারি আছে, অন্য হাতে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। তিনি 'বোধিরাজ' ও বাগীশ্বর। মঞ্জুশ্রী—জ্ঞানের প্রতিমা। বস্তুত পঞ্চবুদ্ধ মঞ্জুশ্রীতে ঐক্যলাভ করেছে। এ তত্ত্বও অতি ব্যাপক ও গভীর এবং সমগ্র বৌদ্ধজগতের বিধিকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

পৌরাণিক দশমহাবিদ্যা, অষ্টমাতৃকা প্রভৃতিও এক একটি অখণ্ড তত্ত্বের দ্যোতক। ভারতীয় শিল্পে এসব দেবীর অনিন্দ্য ও সুগঠিত মূর্ত্তি দেহলাবণ্য সত্ত্বেও উচ্চতর তত্ত্বের প্রতিবাদক। ইউরোপীয় বিশ্বমাতৃবাদ এক ম্যাডোনাতে (Madonna) নিবদ্ধ। পশ্চিমে একটি লাবণ্যময়ী ললনার অঙ্কে উপবিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট শিশু এই তত্ত্বের দ্যোতক হয়েছে। ভারতের বিশ্বমাতৃত্ব কল্পনা এই সামান্য দেহজ স্তরে নিবদ্ধ নয়। ভারতের বিশ্বমাতা কখনও বা দশভুজারূপিণী ও অসুরমর্দ্দিনী। তিনি স্বীয় ভুজবলে সমগ্র বিরুদ্ধ শক্তি হ'তে সন্তানকে রক্ষা ক'রে সন্তানের নমস্য হয়ে ন। ভারতের অপর বিশ্বমাতা কল্পনা কালিকামূর্ত্তি জগতের আদ্যাশক্তি-স্থানীয়া—রক্তাক্ত ধ্বংসের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সন্তানকে উর্দ্ধ করে অভয় দান করছেন। জগতের মাতা এমনি ক'রে বিনাশের অগ্নিকটাহে অগ্রসর হয়ে সন্তানকে রক্ষা করেন। এসব তত্ত্ব ইউরোপের অজ্ঞাত—এজন্য ইউরোপ এর ভিতর দেখে বীভৎসতা। জগতের জাগ্রত হাহাকার, আগ্নেয় আবেষ্টন এবং ক্রন্দনমুখর অত্যাচার হ'তে মাতৃশক্তি শিশুকে তেমনি ক'রে রক্ষা করে—যেমন ক'রে ধাত্রীরূপিণী ব্রততী, কোরক ও মুকুলকে পত্রপুঞ্জের আবেষ্টনের সাহায্যে রৌদ্রাতপ ও ঝড়ের ঘনঘটা হ'তে বাঁচায়। সে তত্ত্ব ইউরোপের রূপবিদ্যায় কোথায়

অপর দিকে রতের যাকে 'রসস্বরূপ' ব'লে বর্ণনা করেছে—তাকে বিচিত্র রসের ভিতর দিয়েই অনুসেচন করেছে,

বিশুদ্ধ সাময়িক ঘটনার ভিতর দিয়ে নয়। সকল ঘটনা শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়—কিন্তু রসবস্তুর জীবন চিরন্তন। শৃঙ্গার, রৌদ্র, হাস্য, কারুণ্যাদি রসের রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টির শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত চলতে থাকে। এসব জাতি, দেশ ও কালনিরপেক্ষ। এজন্য ভারতীয় শিল্প রসমৌলিক বিশ্বে রসের উদ্ঘাটন ক'রেই আনন্দ পায়। কাব্য, নাটক, শিল্প, সঙ্গীত সর্ব্বত্রই রসপরিবেশে ভারতীয় শিল্প আত্মহারা। এই সব রসমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে নানা তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়। একই মূর্ত্তি নানা রসের আধারে রচিত হয়। শিবের নটরাজমূর্ত্তি, কল্যাণসুন্দর মূর্ত্তি, গৌরীসহিত-মূর্ত্তি, সতীস্কন্ধযুক্তমূর্ত্তি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে দ্যোতিত হয় শিবতত্ত্বের নব নব দিক্। সাধনা-মালায় এরূপে এক এক দেবতার বহু রসরূপ কল্পিত হয়েছে।

দশাবতার রচনায় ভারতের পরিণামবাদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। জটিলতর রূপভঙ্গের দিকে সৃষ্টির প্রয়াণ এতে সমর্থিত হয়েছে। সর্ব্বভূতে ভগবান কল্পনায় জলদেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর ও নাগরাজাদি কল্পিত হয়ে ভারতীয় শিল্পের গৌরব বর্দ্ধন করেছে। অপর দিকে জৈনতত্ত্বের স্যাদ্বাদ জন্মদান করেছে ক্ষুদ্র ও অণুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিরাটের সহিত তার যোগসাধন। একদিকে আবুপাহাড়ের সূক্ষ্মতম মর্ম্মর রচনা স্ফটিকের মাধুর্য্য ধারণ করেছে, অপর দিকে শ্রাবণবেলগোলার ৬৫ ফুট উচ্চ গোমতেশ্বর মূর্ত্তি বিরাটত্ব, সৌকুমার্য্য ও ঐশ্বর্য্যে জৈনবাদে বিরাট কল্পনার স্থানীয় হয়েছে। ভারতীয় কলাচর্চ্চায় কোন প্রতীচ্য আলোচকই তাই এসব বহুমুখী সম্পর্ক উপলব্ধি করেনি, করতে পারেনি।

অনন্ত পিয়াসী

শ্রীআভা দেবী

অহর্নিশি শুনিতেছি
নির্ব্বাণের মহামুক্তি বাণী
প্রতি রন্ধ্রে বেজে ওঠে
হে সুন্দর তারি ছন্দখানি,
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী
গাহে তার সুমধুর গান
অলক্ষ্য ইঙ্গিত-ভরা প্রিয়তম,
তোমার আহ্বান
মুক্ত করে মোর সুপ্ত
মোহ মুগ্ধ আত্মার পরাণ।

কেবা আমি কেন হেথা আসা ?
ছিনু কোথা ? কি নামে ডাকিত মোরে সবে,
আজ তাহা কিছু মনে নাই,
পথিক কুড়ায়ে যাই পথের পাথেয়
ধরণীর স্নেহ ভালবাসা
পুনঃ আসি পুনঃ চলে যাই।

যুগে যুগে কত বন্ধু
কাঁদিয়াছে আমার লাগিয়া,
নিজে আমি কাঁদিয়াছি কত
তিলেক বিচ্ছেদ ব্যথা পারিনি সহিতে
সে জীবন হ'লে অন্তগত।
ভুলে গেনু সব ব্যথা সব ভালবাসা
নীরবে আসিয়া পুনঃ ধরণীর বুকে
স্নেহনীড়ে বাঁধিলাম বাসা।

বিগত দিনের সব বিস্মৃত-চেতনা
অতৃপ্ত আত্মার মাঝে আমার কামনা
আমারে টানিয়া আনে মৃত্তিকার বুকে,
যুগে যুগান্তরে, নানা দুঃখ-সুখে।
কে বলিয়া দিবে কবে, পূর্ণ হবে
সেই যাওয়া-আসা !
ক্লান্ত মোর যাত্রাপথশেষে
পাব প্রিয় সেই ভালবাসা !

অঙ্গরাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্

সুপ্রাচীনকালে ভারতে 'অঙ্গ' নামে এক রাজ্য ছিল। অথর্ব্ববেদে অঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে :—

"গং ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ" (৫।২২।১৪)

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়—যযাতি পুত্র পুরুরাজ-বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। অঙ্গ নামে বলির এক পুত্র সন্তান জন্মে। কালে অঙ্গ রাজা হইলে, রাজ্যটী 'অঙ্গরাজ্য' নামে অভিহিত হয়।

পৌরাণিক নামাবলীতে লিখিত আছে—অঙ্গরাজ্যে চম্পনামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইঁহারই প্রপৌত্র বৃহন্নলের বিজয় নামে এক পুত্র ছিলেন। বিজয় স্বীয় গুণরাজি প্রভাবে 'ব্রহ্মো ক্ষত্রোত্তর' নামে বিশেষ সম্মানসূচক উপাধিতে বিভূষিত হন। বিজয়ের প্রপৌত্রের পুত্রের নাম অধিরথ। ইনি কুন্তির পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণকে লালন পালন করিয়াছিলেন। অধিরথের মৃত্যুর পর কর্ণ অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

'হরিবংশ পুরাণে' বর্ণিত আছে—অঙ্গ, দধিবাহন, দিবিরথ, দশরথ, লোমপাত, চতুরঙ্গ, পৃথুলাক্ষ, চঁপ, হরক্ষ, ভদ্ররথ, বৃহৎকর্মা, বৃহদ্গর্ভ, বৃহদ্রল, জয়দ্রথ, দৃঢ়রথ, বিশ্বজিত ও কর্ণ অঙ্গরাজ্যের রাজা ছিলেন।

বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভকালে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে অঙ্গরাজ্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 'মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে যে 'চম্পানগর' অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার প্রভাবে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—বর্ত্তমান বিহার-প্রদেশে ভাগলপুর জেলার দক্ষিণার্দ্ধ লইয়া সেই সুপ্রাচীন অঙ্গরাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভাগলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগর অবস্থিত। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভগবান বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত চম্পানগর সমৃদ্ধ ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে জানা যায়—এক সময়ে অঙ্গরাজ্যের বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ সম্মিলিত হইয়া চম্পানগরে 'চতুর্মাস্য নিবাস' করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ তীর্থঙ্কর 'বসুপূজ্য' এবং লঙ্কাবতার রচয়িতা প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত 'জিন' মহাশয় চম্পানগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুবিখ্যাত স্মৃতিকার কাত্যায়নের উৎপত্তিস্থান এই চম্পানগর। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে চম্পানগরের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

মগধরাজ অজাতশত্রু এই অঙ্গরাজ্য জয় করিয়া আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি চম্পানগরের রাজধানীর গৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

যাহা হউক বৌদ্ধযুগে বা পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্যের যে সকল অঞ্চল সবিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহার একটী ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত সাহিবগঞ্জ লুপ লাইনে সুলতানগঞ্জ একটী বিশিষ্ট ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে প্রবাহিত গঙ্গাগর্ভে একটী স্ফটিক প্রস্তরের পাহাড় পরিদৃষ্ট হয়। সুপ্রাচীনকালে গোপীনাথ নামে জনৈক নাথযোগী এই মনোরম পবিত্র নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন; কালে তিনি দেহত্যাগ করিলে পরিত্যক্ত পবিত্রদেহ এক শিবলিঙ্গে পরিণত হয়। এই শিবলিঙ্গ তাঁহারই নামানুসারে 'গোপীনাথ' নামে বিদিত। এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে যে—এই শিব হরিনাথ নামে এক যোগীকে পূজার্চ্চনার নিমিত্ত স্বপ্নাদেশ করিলেন। হরিনাথ স্বপ্নাদেশানুসারে উক্ত পাহাড়ে আসিয়া যথারীতি পূজার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও নেপালের পশুপতিনাথের ন্যায় গোপীনাথ প্রসিদ্ধ ছিল।

এই পাহাড়ের অনতিদূরে 'জাহ্নুগিরি' নামে অপর একটী পাহাড় রহিয়াছে। কথিত আছে, জাহ্নুগিরি নামক একজন যোগী এই পাহাড়ে তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে পাহাড়টী 'জাহ্নুগিরি' নামে অভিহিত হয়। পাহাড়টীর গাত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের বহু মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত পাহাড় হইতে প্রায় ৪৫০ গজ দূরে একটী পাহাড় দৃষ্ট হয়; ইহার নাম "বহিষ্করণ পাহাড়"। ইহার গাত্রে গুপ্ত যুগের প্রারম্ভকালীন কলা-শিল্প ও অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। ক্যানিংহাম সাহেব এই সকল প্রাচীন নিদর্শন পরীক্ষা করতঃ অভিমত প্রদান করিয়াছেন যে—"এই স্থানটী সম্পূর্ণ হিন্দুগণের অধিকারে ছিল এবং এতদঞ্চলের হিন্দুগণ ভগবান বুদ্ধদেবকে দশমাবতারের অন্যতম বলিয়া মনে করিতেন।"

এতদ্ভিন্ন সুলতানগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটে একটী প্রাচীন বিহার ও একটী স্তূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। তথায় একটী সাতফুট উচ্চ তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি ও আরও কতিপয় মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। বৃহত্তম মূর্ত্তি গাত্রে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

সুলতানগঞ্জ হইতে ৩৪ মাইল পূর্ব্বে বাহলগাঁও ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে 'পাথরঘাট' নামক স্থানে প্রাচীন 'বিক্রমশিলা' বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে পালবংশীয় নরপতি পরমসৌগত পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল এই বিশ্ববিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১)। তক্ষশিলা, নালান্দা এবং উদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিক্রমশিলা প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নয়পালের রাজত্বকালে বিক্রমশিলার সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গৌড়দেশস্থ বিক্রমপুরনিবাসী প্রখ্যাত

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp. 150—51; Nepalese Budhist Literature by Rajendra Mitra, pp. 129.

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পরিশেষে খৃষ্টীয় ১১৯৯ অব্দে বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ মগধ আক্রমণ কালে বিক্রমশিলা চিরতরে ধ্বংস করিয়াছিলেন। (২)

কহলগাঁও হইতে ৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে "চৌরাশি মূর্ত্তি" নামক একটা পাহাড় দৃষ্ট হয়। ইহার উপরিভাগে চুরাশিটী বুদ্ধ মূর্ত্তি ও কতিপয় গুহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কহলগাঁও হইতে কয়েক মাইল দূরে পীরপৈঁথি ষ্টেশন। এই ষ্টেসনের সন্নিকটে কাসবা নামক পল্লীতে প্রাচীন মৃন্ময় পাত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহিবগঞ্জে রেলওয়ে বিভাগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

এইরূপে অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত পল্লীসমূহে ভ্রমণ করিলে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(২) *Taranath—pp. 94 and 262; Kern's Manual of Budhism.*

লোকোত্তর

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দেবতারে পূজা করি'—সে দেবতা সীমার বাহিরে
নাগাল পাই না তার ফুল দিই উদ্দেশে তাঁহার
আভূমি প্রণত হয়ে সকাতরে জানাই প্রার্থনা
সে প্রার্থনা কভু মিটে, ব্যর্থ হয় কত শত বার।
কেহ কয়ে স্তবগান, মন্ত্র পড়ি কেহ যাপে ব্রত
যাগযজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন—দেহি দেহি মানুষের রবে
দেবতারও শ্রুতিমূলে বধিরতা আসে অবশেষে
যুগল কমল আঁখি অন্ধ হয় হোমের ধোঁয়ায়
কদাচ মেলেন আঁখি স্বর্গ হতে প্রসন্ন আননে
আশীর্ব্বাদ নামে কভু কালে ভদ্রে মানুষের ঘরে,
মানুষের ঘরে যেথা নিশিদিন ওঠে আর্ত্তধ্বনি
ক্ষুধা তৃষ্ণা অভাবের, অন্তরের দীনহীনতার
দেবতারও সাধ্য নয় সে দীনতা নিশ্চিহ্ন করিতে;
বিমুখ হইয়া তাই মানুষ ফিরিয়া যায় ঘরে
ঘরে ঘরে ওঠে রব—প্রাণহীন পাষাণ দেবতা।

দেবতা যা পারে নাই, যে প্রার্থনা পর্ব্বতপ্রমাণ
স্বর্গের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ভ্রুকুঞ্চিত তাচ্ছিল্য হেলায়
ধূলায় মিশিয়া গেছে নিত্যদিন শতখান হয়ে
আমি জানি একজনে সহস্রের সকল প্রার্থনা
হাসিমুখে তুলি নিল আপনার সমুন্নত শিরে।
আমি জানি সেইজনে মানুষেরই গৃহে জন্ম তার
মানুষেরি দেহ নিয়ে, মানুষের মহা মহিমায়
দেবতারে লজ্জা দিল আপনার অকুণ্ঠিত প্রেমে
অযাচিত দাক্ষিণ্যের অবারিত শুভ আকাঙ্খার
দারিদ্র্য মর্য্যাদা পেল, দুঃখ পেল মহৎ সম্মান।
নিত্যদিন মানুষের অবিরাম বিচিত্র প্রার্থনা
পুঞ্জীভূত দেখিয়াছি সেই মানুষের সদাব্রতে
বিফল হয়নি কভু; বাঞ্ছাকল্প তরুমূলে
দেখিয়াছি জনে জনে নিয়ে যেতে সফল-সম্ভার।
অন্তরের উৎস হতে উচ্ছ্বসিত মহত্ত্বের ধারা
আকণ্ঠ করেছে পান তৃষ্ণাতুর নরনারী সবে।
দেবের অসাধ্য যাহা মানুষে তা সাধিল কেমনে
সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যা, ভাগবত গীতার সমান
মানুষের ধ্যানযোগ্য, পুণ্যস্মৃতি দেয় প্রাণে আশা
দেবত্ব লাভের আশা মানুষের হয় না বিফল।
হবে না বিফল কভু যতদিন মানুষের ঘরে
দেবতা লভিবে প্রাণ যোগসিদ্ধ মানুষের দেহে
লোকোত্তর চরিত্রগাথায় অমর হইয়া রবে
ইতিহাসে মানুষের কথা
যে মানুষ মনুষ্যত্বে মহনীয় করে দেবতারে।

নহি মোরা হতভাগ্য, সৌভাগ্য এ মানবজীবনে
হেন মহাজন আসি আমাদেরি মাটির সংসারে
মাটির সামান্য মূল্য আরোপিয়া অতুল বৈভবে
কৃতার্থ করিয়া গেছে আপনার সকৃতার্থ দানে
মানুষে করেছে ধন্য মানুষের বিপুল গৌরবে।
নয়নে দেখেছি তাঁরে লভিয়াছি স্নেহস্পর্শ তাঁর
শ্রবণে শুনেছি তাঁর সঞ্জীবনী বাণী অনুপম
লভিয়াছি সমুদার অনিরুদ্ধ আতিথ্য সৎকার।
স্নেহে প্রেমে করুণায় মানুষের পরম আত্মীয়
আত্মার আত্মীয় যিনি বেদনার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত,
প্রজ্জ্বলন্ত দানযজ্ঞে সর্ব্বশেষে আহুতি যাঁহার
তাঁহারে স্মরণ করি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আজ,
আত্মার উদ্দেশে দিই প্রাণভরা
শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

বোলে

শ্রীচিন্তামণি কর

কৃষ্ণাতঙ্কে আলো নিভিয়ে পারী যেন রূপকথার রাজধানীর মত স্বপ্নময় হয়েছে। প্লাস সাঁমিশেল স্যেন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আঁধারের পটভূমিতে অস্পষ্ট নোতরদাম্ গীর্জা দেখে মনে হচ্ছিল—যেন কত ছায়াময় মূর্ত্তি, প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে, স্তম্ভগুলির আড়ালে, খিলানের কুক্ষিতে ঘোরাফেরা করছে। ঘণ্টাবাদক কুব্জটি যেন গীর্জার চূড়ামণ্ডপের কীর্ত্তিমুখের ছিদ্র দিয়ে নীচের লোকগুলিকে দেখছে। কি উদ্ভট কল্পনা! রাতের পারী কত যুগ যুগান্তের কথা চিন্তা দিয়ে লোককে ভাবুক পাগল ক'রে তোলে। নদীর সেতুর উপর দিয়ে যে যানগুলি গমনাগমন করছে তারা যেন দিনের বেলার সময় ও গতির প্রতিযোগী বিংশ শতাব্দীর বাস বা ট্যাক্সি নয়, আট ঘোড়ায় টানা গোবল্যাঁ কার্পেটে মোড়া গাড়ী। এরই একটিতে হয়ত মাদাম পম্পাদুর বা নানা বসে। পথচারীর দলগুলিতে উচ্চরব আর হস্ত আস্ফালন দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন লা সিতেতে কার গিলোটিন দেখে তারই উত্তেজিত বর্ণনা ও আলোচনা করছে। অন্ধকার রাত্রে নির্ব্বাপিত দীপ—পারী যেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চুণ বালির আস্তর ফেলে পুরানো সপ্তদশ শতকে ফিরে গেছে।

একটি চেনা গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। গলিটি চেনা হলে কি হয়, যথনই এপথে পা দিই, গলিটি অচেনা হয়ে ভয় দেখায়। এই বুঝি গা ঢাকা দিয়ে কে একজন সাঁ ক'রে পাশ দিয়ে চলে গেল। হাতে তার কি একটা চক্ চক্ করছিল না! একটি কাঠের দরজায় খড়ি আর কাঠকয়লা দিয়ে কি ভয়ানক আর নোংরা ছবি আঁকা। কোন দুষ্টু ছেলের কাজ বোধ হয়। কিন্তু বাড়ীওয়ালা বা পাড়ার লোক এগুলি মুছে দেয় না কেন? জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বলে বসবে, "এ দাগ পাঁচ শতাব্দীর রোদ জল খেয়ে পাকা হয়ে গেছে, কিছুতেই আর তোলা যাবে না। কে একজন দরজা খুলে বাইরে এল—সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল উজ্জ্বল আলোকিত একটি কাউণ্টার, আর তার সামনে উঁচু টুলে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষে পানপাত্র নাড়া চাড়া করছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভিতর থেকে বেরিয়ে নিশ্বাসটাকে বন্ধ ক'রে দেবার জোগাড় করলে। এটি একটি বিশেষ কাফে অর্থাৎ নৈশ পানাগার। এই পানাগারটির পিছনে অনেক ইতিহাস আছে বলে টুরিস্ট কোম্পানীর পরিদর্শকেরা পর্য্যটকদের এখানে প্রায়ই নিয়ে আসেন। আমি বন্ধু ডাঃ দেবের আমন্ত্রণে এখানে এসেছিলাম।

কৌতূহল নিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হলাম। কিন্তু ঢুকেই সামনে যা দেখলাম তাতে আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তার প্রকট প্রমাণ পেলাম, কারণ তিনি দেহকে ছাড়তে চাইছিলেন। একটি কঙ্কাল, তার চক্ষু কোটরগত ও বিকশিত দন্তমুখ-গহ্বরে লাল বাতি জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছিল—আর মাথার উপরে একটি বৃহৎ পাখীর কঙ্কাল। তার চঞ্চুটি ঠিক আমার ব্রহ্মতালুকে লক্ষ্য ক'রে ঝুলছিল। ঘরে যথেষ্ট আলো থাকলেও ধোঁয়ায় কিছু ভাল দেখা যাচ্ছিল না। একটা গলা-চেরা হাসি উঠল. তারপর হাহা হোহো হিহি খক্ খক্! বাপরে, ভুশুণ্ডীর মাঠে তাল-বেতালের সভায় এসে পড়লাম নাকি! অন্ধকার থেকে আলোর হঠাৎ-আসায় সাময়িক অন্ধ হয়েছিলাম। চোখে আলো যখন সয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম—তাল বেতালের দলটি সভ্য নরনারীতে পরিণত; তখন অপ্রস্তুতের একশেষ। ডাঃ দেব আমার আগেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বুঝতে পারছিলাম না কেন কাফেটিকে এত ভূতুড়ে ক'রে রেখেছে। দেওয়ালে অসংখ্য প্যাস্টেলে আঁকা মুখ। তাদের ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয় যত রাজ্যের শুঁড়ী, মাতাল, ডাকাত, চোর, খুনে আর নটনটীর দল। দেওয়াল ছাদ মেঝে সবই অত্যন্ত অসমান আর ধোঁয়া-ঝুলে ভর্ত্তি। মাটির নীচে থেকে একটা হল্লা, গান আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে মেঝেটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। দেবের বান্ধবী বললেন, "আসুন, নীচে থেকে একবার ঘুরে আসি। পিতৃদেবকে স্মরণ করে ভাবলাম, এরও আবার নীচে! রসাতলই হবে! একজন কোনমতে

ঢুকতে পারে এমন একটি গর্ত্তে ছোট বড় মাঝারি হরেক রকম আকৃতির ধাপ বেয়ে টাল সামলে একটি সমান জায়গায় নামলাম। সামনে মাথা ঠুকে যায় এমন নীচু ছাদওয়ালা একটি ঘরে কয়েকটি বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে মদ্যপান করছিল আর তাদের সামনে একটি সামান্য উঁচু মঞ্চে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষে গান বাজনা করছিল। এই ঘরে ঢুকতে সামনে একটি কূপ পড়ে। শুনলাম, পূর্ব্বে অপরাধীদের এই কূপে ফেলে দেওয়া হ'ত। এই ঘরের অপর দিকে আর একটি ছোট গহ্বরের মত বায়ু-প্রবেশ-পথ-বিহীন ঘরে কে একজন যেন নিশ্চিন্তভাবে আরামে শুয়ে রয়েছে। ভাল ক'রে দেখি তার হাত পা পশুর মত লোহার শিকলে বাঁধা। এটা কাফে না ডাকাতের ডেরা! উপরে উঠতে ব্যস্ত হ'তেই সঙ্গী বললেন, "আরে, ভয়ে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ও জীবন্ত নয়, মাটির মূর্ত্তি। কিন্তু ঐখানে একদিন আসল জীবন্ত মানুষটি ঐভাবে দশ বছর বাঁধা ছিল। আঠারো বছরের ছেলেকে বন্দী ক'রে আটাশ বছরে এই শহরের বুকে সমস্ত লোকের সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।" বললাম, "কারা মারে?" বন্ধু বললেন, "কে আবার, তদানিন্তন সম্রাট ও তাঁর শাসন। গরীবের উদরের ক্ষুধার বহ্নি হৃদয়ে পৌঁছে যে জ্বালা ধরিয়েছিল তারই আগুনে মত্ত কয়েকটি বিপ্লবী আত্মাহুতি দিয়ে ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিপ্লব-পথের সৃষ্টি করেছিল। এ ছেলেটি তাদেরই একজন। আজ এই নকল বীভৎস রূপে তোমার সভ্য মন ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর ইতিহাস জানলে তোমার মনেও হয়ত উত্তেজনা আসবে।

চতুর্দ্দশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম পম্পাদুরের প্রাসাদ এইখানে ছিল। এই বোলে কাফে ছিল তাঁর অশ্বশালার ঘাস ও দানা রাখবার ভাণ্ডারের একটি অংশ। পঞ্চদশ ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে এরই ভূগর্ভস্থ ঘরে বসে কত বড় বড় বিপ্লবী অত্যাচারী শাসককুলের উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখেছেন এবং তাঁদের স্বপ্ন সফল হলে এই ঘরেই হয়ত কত বিচার-গৃহের অভিনয় হয়ে কত হতভাগ্য রাজপরিবার ও কাউণ্ট ডিউকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এইখানেই রবস্‌পিয়ের, মারা, দাঁতোর কত পরামর্শ ইতিহাসের পাতাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে। তখন উপরে ঠিক আজকের মতই চলত মদ্যপান আর হাসি, নীচে চলত এমনি কুৎসিত, অশ্লীল গান—আর বিগতযৌবনা গণিকার প্রেমাভিনয়, আর এরই অন্তরালে শানিত হ'ত বিপ্লবীর গিলোটিন। পারীর অনেক কিছুরই উপর আধুনিকতার ছাপ পড়েছে—কিন্তু বোলের একটি দাগও মুছে কেউ নতুন রঙ নতুন সজ্জা দিতে পারে নি। এর রূপ বীভৎস, কিন্তু এর মধ্যেই জড়িত রয়েছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস ও মানব-জীবনের উত্থান-পতনের নির্ম্মম সত্য কাহিনী।"

কাফেটির উপর নীচে সর্ব্বত্রই দেওয়ালে আঁকা বাঁকা প্রাচীর সমসাময়িক নামের রেখায় ভর্ত্তি। এরই মধ্যে হয়ত কোন হতভাগ্য নির্ব্বাপিত জীবনদীপের অঙ্গারটুকুও কয়েকটি রেখায় অমর করতে চেয়েছে, আবার হয়ত কোন জিঘাংসু বিপ্লবী বন্ধশীকারের তালিকা লিখে শাসকদলের অদৃষ্টের পরিহাস করেছে। কৌতূহলী দর্শকদল মুহূর্ত্তের আনন্দ পান ও হাসির মধ্যেও নিজের উপস্থিতিকে অমর করতে ভোলেনি। বন্দী বা বিপ্লবীর আঁকা রেখা নতুন রেখার জালে মুছে যায়, কালদেবতা অলক্ষ্যে হয়ত হাসে। বহু মনীষী লেখক এই বোলেতে বসে জীবনের অনেক স্মরণীয় এবং আনন্দময় মুহূর্ত্ত কাটিয়েছেন। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত অস্কার-ওয়াইল্ড এইখানে মদিরা ও হাস্য পরিহাসে ডুবে হয়ত বিতাড়নের বেদনা ভুলবার চেষ্টা করতেন।

উপরে যখন উঠলাম তখন দেখি হাস্য পরিহাস গুরুতর তর্কে পরিণত হয়েছে। কাউণ্টারের পাশে উপবিষ্ট একজন মজুর এক ব্যাঙ্কের কেরাণির সঙ্গে রাজনৈতিক মতভেদে বিষম তর্ক লাগিয়েছে। মজুরটির অভিমত—দেশের জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের একমাত্র পথ কম্যুনিজম্। কেরাণি বললেন, "একজন ডিক্টেটর—তার হাতে সব হাঙ্গাম তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে যে যার কাজ কর। রাজনীতিতে সকলে মাত্‌লে অন্য কাজ করবে কে? তোমার কম্যুনিজম্ ত বলে নির্ম্মম হও, সকলকে মার, বাপ-মাকে ত্যাগ কর, আগুন লাগাও—এই ত?" কাউণ্টারে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে মজুর বললে, "চোপরাও, ফ্যাসিষ্ট ইতর! তোমরা রক্ত-শোষা ধনীদের অন্নদাস, তাই তাদের গুণ গাইতে এসেছ। যারা ধনী তারা চিরকাল ধনী থাক, গাড়ী চড়ে প্রাসাদে থেকে মুরগীর-লড়াইয়ের বাজিতে পয়সা উড়িয়ে দিক, আর আমরা মুখে রক্ত তুলে খেটে তাঁদের সৌভাগ্যের বাড়ীতে একটির পর একটি সোনার ইট বসিয়ে দিয়ে তারই দেওয়ালে

নিজেদের কবর দিয়ে দি। আমরা চাচ্ছি ধনীরা অপব্যয় বন্ধ করে গতর খাটাক—আর আমরা আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেয়ে একটু পেট ভরাই। তা তোমাদের সহ্য হচ্ছে না বলেই হয়ত আবার গিলোটিন খাড়া করতে হবে।" কেরাণি গলার সব ক'টা শিরা ফুলিয়ে বলল, "শুনলেন ত মশায়রা, ওঁরা বিচার মীমাংসা ফেলে জোর জবরদস্তি খুন গলাকাটা দিয়ে দেশে সুখশান্তি আনতে চান।" কেরাণির নৈশাহারের আদবী পোষাকে গলায় একটি সাদা সিল্কের বড় রুমাল বাঁধা ছিল। মজুরটি হঠাৎ সেটি টেনে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বলল, "বল, ফ্যাসিস্ট কুকুর, আর কম্যুনিজমের নিন্দে করবি!" ফাঁসের চাপে মুখ লাল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলেও কেরাণি ভাঙ্গাগলায় বললে, "কম্যুনিজম প্রচারের কি সৎ উপায় দেখুন!" ব্যাপার এতদূর গড়াবে কেউ আশা করে নি। কেরাণির সমর্থনকারী একজন একটি মদের বোতল আস্ফালন ক'রে বললেন, "ছেড়ে দে বলছি খুলে ইতর, নইলে এই বোতলে তোর মাথা ভাঙ্গব।" যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করছিল তারা সবাই এল ছাড়াতে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ বললেন, "আরে, তোমার কম্যুনিজমই বড় হোক আর ফ্যাসিজমই বড় হোক—সবচেয়ে বড় কথা আমরা সকলেই ফরাসী, এতে আর কোন ভেদ নেই। এ ত তোমরা স্বীকার কর?" দুজনে সমস্বরে বলল, "নিশ্চয়ই।" বৃদ্ধ তখন গম্ভীর হয়ে বললে, "তবে কেন বাপু, মিছে ঝগড়া করছ। আমার মতে ফ্রান্সের মাটি থেকে যদি তোমাদের ফ্যাসিজম্, কম্যুনিজম, সোস্যালিজম-এর ভূতগুলি চলে যায়, তা হ'লে সব চেয়ে মঙ্গল হবে। এগুলি কেবল আমাদের মধ্যে ভেদের পাঁচিল তুলছে।" কেরাণি নরম হয়ে বললে "ওই ত আগে আমায় গালাগালি করলে!" মজুর তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল—"কম্যুনিজম্ আর ফ্যাসিজম ত অমনি জন্মায়নি, জন্মিয়েছে শ্রেণীগত প্রয়োজনে এবং স্বার্থে। মিছে নিন্দে না ক'রে কম্যুনিজম্‌কে ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা কর না।" তারপর নিজেই মাথা নেড়ে বলল, "না, তুমি কিছুতেই বুঝবে না। এ কেবল ভুক্তভোগীতেই বিনা তর্কে বুঝতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই।"

গোলযোগ মিটে গেল। কেরাণি হুকুম দিলেন, "দু'গ্লাস মদ।" মজুর বললে, "দাম কিন্তু আমি দেব।" কেরাণি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "আরে না না, ঝগড়াটা আমিই প্রথম বাঁধাই, দাম দেবার আমিই অধিকারী।"

আবার বুঝি তর্ক হাতাহাতি লাগে। কাজের কর্ত্রী তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনারা তর্ক ও মীমাংসা ক'রে আমাদের যে আনন্দ দিলেন তার সম্মানে এ পানীয়টির সদ্ব্যবহার আমার খরচেই হোক।"

সামনের একটি কুলঙ্গীতে একটি নরকপালের চোখ লাল আভায় রক্ত হয়ে যেন এ মীমাংসাকে সমর্থন করছিল না। ডাঃ দেব অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বান্ধবীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও নিষ্ক্রান্ত হলাম। কিন্তু ভয়ে নয়, কৌতূহল ও উত্তেজনায়।

রাম ও রহিম

(কবীর)

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

হিঁদু বলে রাম, রহিম আমার
বলিছে মুসলমান
মিছা ভ্রমে ঘুরে কলহ করিছে
হ'ল না'ক কারো জ্ঞান।
দেখেছি অনেক সাধু ও আচারী
প্রাতঃস্নান সারি তারা
করে প্রাণহীন পাষাণের পূজা
এমনি জ্ঞানের ধারা।

হৃদয়েতে দয়া নাহিক কাহারো
ছাড়ি গেছে চির তরে
এরা করে বলি, জবাই উহারা
অগ্নি দোঁহারই ঘরে।
আপন গরবে হাসিয়া কাটায়
সেয়ানা সবার হতে
কবীর কহিছে বল কে পাগল
এ দুটির মাঝ হ'তে।

আগম ও শ্রীঅরবিন্দ

(২)

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

এইবার তটস্থ হ'য়ে দু-চার কথা বলে নিই। সকল কিছুরই বীজ, নাভি, কেন্দ্র ব'লে একটা ঠাঁই আছে দেখেছি। যেগুলোকে জড় বলি, প্রাণী বলি, আর যাদের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার আছে জানছি—তাদের সকলকারই আপন আপন "নাই" বা নিউ-ক্লিয়াস্ ব'লে একটা কিছু আছে। সেইটে তার "আমি" বা আত্মা। সেইটে আশ্রয় ক'রে, তারই সত্তাশক্তিতে ও ক্রিয়াশক্তিতে, জড়ে, প্রাণে, মনে যত কিছু যন্ত্র বা সংঘাত (ব্যূহ, অরগানিজেশন্) গ'ড়ে উঠেছে ও কাজ ক'রে যাচ্ছে। বিশ্বের মহাশক্তি গোড়ায় আপনাকে এই রকম ধারা অশেষ কেন্দ্রে "ঘনীভূত" ক'রে নেয় এবং তাহা দ্বারা বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টির ধারা চলতে থাকে। একটা কেন্দ্রে বা point-এ মহাশক্তির ঘনীভাব হওয়া মানে বিন্দু-শক্তি। এই বিন্দুশক্তিই সৃষ্টির মূলে বীজশক্তি। সৃষ্টির বিচিত্র ধারাগুলো ফোট্‌বার আগে তাদের উৎস বা Spring-গুলো তৈরি হয়। একটা হাইড্রোজেন এটম্ থেকে সৃষ্টির ধারা চলছে ; মূলে র'য়েছে তার নিউক্লিয়ার উৎসটি। একটা জীবকোষেও তাই, একটা মনেও তাই। প্রত্যেকের আলাদা গতিচক্র। চক্রগুলোর সাজ কাজ তো এক নয়। কিন্তু নাভি ? স্বরূপে, সমগ্র পূর্ণভাবে নিলে—নাভিতে সব কিছুই এক। সব কেন্দ্রই "বিন্দু"। বিন্দু মানে দেশ-কালের পয়েন্ট নয়। বিন্দু মানে পার্ফেক্ট Potency-পূর্ণ ক্রিয়াশক্তি। মহাশক্তির যার পর নাই ঘনীভূত ভাব। শক্তিব্রহ্মকে মহতো মহীয়ান্ ভাবে দেখা, তা হয় নাদ ; অণোরণীয়ান ভাবে দেখ্‌লে তাই হয় বিন্দু, দুই-ই কিন্তু এক। বিন্দু থেকে নাদ, আবার নাদ থেকে বিন্দু। আমাদের দেখার রকমারি মহত্ব, অণুত্ব। অণু আর বিরাট—এ দু'য়ের কেন্দ্রে র'য়েছে বিন্দু, কিন্তু তাতে সে ছোটও হয় না, বড়ও হয় না। কেন না, বিন্দু হচ্ছে নিখিল পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম ভূতেষু—ভূতেষু গূঢ় আত্মা। বিশ্বের যেটা "মূল আদর্শরূপ" Perfect Pattern অথবা Archetype—তাকে যদি বিশ্বনাথের ভাগবতী তনু বলি, তবে সকল ভূতের নাভিতে বিন্দুরূপে বিরাজ করছেন সেই ভাগবতী তনু। সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ব'লে অশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের মাপে সে ভাগবতী সত্তা জান্‌তে হয়, দেখ্‌তে হয়, তাতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়। তবে না চরিতার্থ! তবে না চলার শেষ ! বিন্দু-প্যাটার্ণ কেবল যে পূর্ণ এমন নয় ; তা শুদ্ধ, শাশ্বত, অক্ষয় –Pure internally realised, তার ক্রমিক আর আংশিক পরিণতিরও একটা দিক আছে। সেখানে দেশ-কাল-নিমিত্তাদি সম্বন্ধের এলাকা। তাই একটা হাইড্রোজেন এটম্, একটা প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম সেল, একটা ভাবনা—চিন্তা-করা-মন—এ সব কারবারে আলাদা হয়ে রয়েছে। অক্ষর বিন্দু ভাবে সব এক ; ক্ষর বিন্দু ভাবে বহু। ব্যবহারত, কার্য্যত তারা নানান থাকের ; মূলে সম্ভাবনায় আর পরিসমাপ্তিতে তারা একই ঠাঁই।

মূল উৎসে—এমন কি একটা ধূলো বালিরও—যে বীজ-শক্তি তাকে একটা বিশেষ সৃষ্টিধারা সম্পর্কে "বীজ" বা বীজমন্ত্র বলব ; আর সে বীজ বিশেষভাবে বিকল-পরিণতির জন্যে যে-সংঘাত, আয়তন বা শক্তিব্যূহ গ'ড়ে গ'ড়ে নেয়—তাকে বলব যন্ত্র ; আর সেই বিশেষ মন্ত্র—মন্ত্রের ঋত ও ছন্দে যে ক্রিয়া-প্রবাহ, তাকে বলব তন্ত্র। এ রকমে মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র সব কিছুরই গোড়ার বন্দোবস্তে দেওয়া রয়েছে। রকমারি জিনিসে, আর তাদের রকমারি গতিধারায় (অর্থাৎ তাদের আপন আপন ইউনিভার্সে বা জগতে) মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র রকমারি। মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র বদলালে জিনিস বদলে যায়, তার গতিধারাও বদলে যায়। সেইটে হচ্ছে সব—তার গতি ও পরিণতির মূল আবেগ ও আদি নিয়ন্ত্রণ (এলান্ ভাইটাল্)।

"জড়ে"রও কেন্দ্রে যে শক্তি রয়েছে তা যে অন্ধ জড়-শক্তি নয় তা কি আর বলতে হবে ? হিরণ্য-রেতাঃ—হিরণ্য-তেজ তাঁর। জ্যোতিঃ রস বা আনন্দ, ছন্দঃ আর লীলা—এই চারটে রয়েছে সব-তার যেটা মূল উৎস বা নাভি তাতে, আর তাতে শুদ্ধ, অখণ্ড, পূর্ণ হ'য়েই রয়েছে। তবে কোন বিশেষ বিশে সৃষ্টিধারার জন্যে যে বিশে বিশেষ মন্ত্র-যন্ত্র-

তন্ত্রের বন্দোবস্ত, তাতে ক'রে ঐ মূল উৎস-ধারার কোন কোন স্রোত হয় ত বাধা পেল, প্রচ্ছন্ন হ'ল অথবা বিক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। অর্থাৎ ঐ ধূলোর মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র তাকে মূল ধারায় পুরোটা, আসলটা হয় ত পেতে দিচ্ছে না। তোমাকে আমাকে হয় ত বা একটু বেশীই দিচ্ছে, তবুও অনেকটাই দিচ্ছে না। আবরণ হচ্ছে, বিক্ষেপ হচ্ছে। সৃষ্টির আরম্ভে বিষ্ণুর "নাভি"তে থেকে প্রজাপতিরও মধুকৈটভের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল; প্রজাপতির বেলায় মধুকৈটভ মরল, কিন্তু তাদের মেদেই গঠিত হ'ল মেদিনী!

তার মানে? সৃষ্টি চার রকমের। তপসা চীয়তে ব্রহ্ম—কি ক'রে যেন মৌন-শান্ত সচ্চিদানন্দ সমুদ্র উথলে উঠল! তা থেকে কত না অজস্র বিকাশ—উন্মেষের ধারা এখুনই ফুটে বেরুবে যে! এখনও কিন্তু আবর্ত্ত বীচি তরঙ্গ কিছু জাগে নি! কি একটা রহস্য-হিল্লোল শুধু খেলে গেল—আর তাতে শান্তের একটা উচ্ছৃঙ্খলতা (Heaving) জেগে উঠল! কাম, সঙ্কল্প, ঈক্ষা? কথায় হেঁয়ালিতে কি সে আদিম হেঁয়ালির ওপর রশ্মিপাত হবে? অক্ষয় বস্তু আপনা থেকে আপনাকে নিয়ে এই যে উথ্‌লে উঠ্‌ল—এইটে তার স্বভাব অথবা অধ্যাত্মসৃষ্টি। উথলে বড় হ'ল না ছোট? তাতো ধারণায় আসে না। তবে যদি নেহাৎই ধারণা একটা ক'রতে চাও তো ভাব—দুই-ই। মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতিও হ'ল, আর ঐ যে মূল নাভি বা বিষ্ণুর কথা হচ্ছিল, তা-ও হল; মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। মহদ্‌ব্রহ্মরূপ যোনিতে বিন্দুব্রহ্মরূপ শক্তির অবধান হ'ল। সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্মমহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ এই গেল স্বভাব সৃষ্টি। এতে ব্রহ্ম অথবা বল পুরুষোত্তম স্বীয় প্রকৃতি বা পরমা প্রকৃতিরূপে যেন অভিব্যক্ত হয়ে উঠলেন।

তারপর ব্রহ্মের সেই মূল পরমা প্রকৃতি (সচ্চিদানন্দময়ী লীলা শক্তি) থেকে কারণ-কার্য্য-পরম্পরাক্রমে প্রকৃতি-ধারা অভিব্যক্ত হ'তে থাকল। সে প্রকৃতি ধারায়—দু'-রকমের প্রকৃতি আমরা সহজে চিহ্নিত ক'রে নিতে পারি—গীতার সেই পরা আর অপরা। পরা জীবভূতা সনাতনী—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। অপরা হচ্ছে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ইত্যাদি থেকে ওপরে মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি পর্য্যন্ত। অপরা—Physical. Vital, Mental নানা রকম সঙ্ঘাত অথবা Apparatus তৈরির উপাদানগুলো। এরা দেখেছি, এক একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে তারই "আবেগে" তারই চারি ধারে গ'ড়ে ওঠে। আমাদের ভেতর সেই কেন্দ্রটাকে বলি—অহঙ্কার, ইগো। কিন্তু এই নিয়ত পরিণমমান সঙ্ঘাত (বা অর্গ্যানিজেশন্) অক্ষয়, অব্যয় একটা সত্ত্বাশক্তি, চিচ্ছক্তির ও ক্রিয়াশক্তির আধার নিলে দাঁড়াবার ও চলবার ভূমি পায় না; পায় কি? সেই ভূমিটা হ'ল পরা প্রকৃতি। সেটা প্রত্যেক সঙ্ঘাতের পক্ষে মূলতঃ এক অভিন্ন হ'লেও আলাদা আলাদা ভাবে থাকায় ও কাজ করার সম্ভাবনা যুগিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবে দেখ্‌লে—সে হচ্ছে জীব, ভগবানের অংশ, তাঁ থেকে স্ফুলিঙ্গ, স্পার্ক বা রাডিয়েশন্। অশেষ প্রকৃতির, অপরা প্রকৃতির বিবর্ত্তনের (Evolutionএর) জন্যে ভগবান তাঁর পরমা প্রকৃতির মহাশক্তির উৎস থেকে বিবিধ বিচিত্র অভিব্যক্তির "মৌলিক সম্ভাবনা" (Basic Possibilities)রূপে স্পার্ক বা রেডিয়েশন্ যেন বের করতে থাকেন। প্রদীপ্ত পাবক থেকে স্ফুলিঙ্গের উপমা স্বয়ং শ্রুতিই দিয়েছেন। আরও কত কত ভাবে ইঙ্গিত ক'রেছেন; আদ্যাশক্তি সৃষ্ট্যুন্মুখী হ'য়ে পরম ঘনীভাব পেয়ে হ'ল মহাবিন্দু বা মূল বিন্দু। এ হচ্ছে Perfect policy to Great। এ মহাবিন্দু তার পর যেন আপনাকে ভেঙ্গে অংশ অংশ ক'রে নিচ্ছে। যেমন একটা জীব সেল্ ভেঙ্গে নিজেকে বহুধা ক'রে নেয়। তাতে একের যায়গায় বহু সেল্ হয়। প্রত্যেকটাই কাজের লায়েক। ব্যক্তি, ব্যষ্টি বা Individual অভিব্যক্তির জন্যে মূল বিন্দু থেকে ঐ রকম ধারা "কাজের লায়েক" আলাদা আলাদা বহু বিন্দু পয়দা হওয়া চাই, নয় কি? অপরা প্রকৃতির মশলাগুলো নিয়ে বিশেষ এক একটা সঙ্ঘাত বানিয়ে নেবার আদি সম্ভাবনাই হচ্ছে এরা। মূল বিন্দুকে যদি বলি "হিরণ্য-গর্ভ" তা হ'লে এরা হচ্ছে "জীব"। জড়ের অণুর নাভিতেও জীব র'য়েছে। হয়ত আমাদের কারবারি সম্পর্কে ঘুমিয়েই র'য়েছে। ভগবানের পরমা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতির স্পার্কিং বা রেডিয়েশনের "মধ্যস্থতায়" অপরা প্রকৃতির যে সব নানান ভাবের সঙ্ঘাত রচনা—সেইটে হ'চ্ছে দ্বিতীয় সৃষ্টি—অধিভূত সৃষ্টি; এ হচ্ছে অর্ব্বাক সৃষ্টি, অধঃক্রমে, নীচু মুখো, রাজি থেকে ক্রমেই স'রে সৃষ্টি। এতে করে যত নীচের দিকে আসা যায়, ততই সঙ্ঘাতগুলো জমাট, আড়ষ্ট,

আবদ্ধ "গুহার" মতো হ'তে থাকে। সত্তা তার অসীম স্ফূর্ত্তিপ্রাণতা, বিকাশপ্রবণতা হারিয়ে যেন ততটুকু নিরেট্ হবার মতো হয়; জ্যোতিঃ তার অচ্যুত চিৎস্বভাব থেকে যেন বিচ্যুত হ'য়েই চ'লে যায়; তেজঃ, Energy or forceএ; রস আনন্দের নিত্যধাম থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে একটা বাধ্য অন্ধ আবেগ বা Impetusএ এসে পৌছায়; লীলা তার স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে একটা ধরা-বাঁধা আড়ষ্ট রুটিন্ ছন্দ হ'য়ে দাঁড়ায়। গুণী শিল্পীর সঙ্গীতের লীলায়িত হার্মনি (harmony) হ'য়ে দাঁড়ায় একটা mechanical Rythm এর monotony; অপরার ভূমিতে এই earth planeএ ভোগ-ব্যবহারের জন্যে এই রকম ধারা গণ্ডীবদ্ধ হওয়া চাই বলেই এটা হ'য়ে থাকে। এ প্লেনে "ভোগায়তন" ওভাবের না হ'লে যে ভোগই হবে না। এ প্লেনে থাকতে আর কাজ করতে গেলে যেমনটি চাই তেমনটিই বন্দোবস্ত হ'য়েছে।

তুমি, আমি, সে, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, মাটি পাথর, জলবাতাস—সব কিছু এই প্লেনে "সংসার" করবার মতোই নিজ নিজ ভোগায়তন পেয়েছি। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নানান ভাবের নানান থাকের "আমি"—Centre of existential action re-action ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকের "গুহা" আলাদা, গুহার গড়ন আলাদা, বাইরের সঙ্গে অবিমিশ্র—উদাসীনভাবে কারবার চালাবার বন্দোবস্তও আলাদা অর্থাৎ মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র আলাদা, অপরের সঙ্গে কারবারি অনুপাতে ঠিক হচ্ছে কোন্ আমিটা তার নিজের কাছে ও অপরের সম্পর্কে কি, কেমন হবে না হবে। ব্যবহারিক পারস্পরিক অনুপাত—Practical inter-Central Ratio-Proportion—ষ্টেজে সবার পার্টগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক ক'রে দিচ্ছে।

প্রত্যেকেই হচ্ছে প্রকৃতি বা মূল উপাদানের একটা "বৈকারিক কেন্দ্র" Centre of strain; নাভির সেই শুদ্ধ, সমগ্রের ঠাঁই থেকে যে যত তফাতে এসেছে, ততই তার strain হয়েছে বেশী। সুতরাং stressও বেশী। stress দু'রকমের। একটা চাপের মতো তাকে ঐ তার নিজস্ব গণ্ডী-কারায় পুরে রেখেছে এবং তাতেই তাকে খাটাচ্ছে। এটাকে বলি অদৃষ্ট। আর একটা উল্টো চাপ হ'য়ে তাকে অবিরত কায়া-কপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে বড় হবার মুক্ত হবার চেষ্টায় লাগিয়ে রেখেছে। এটাকে বলি কর্ম্ম। এ চেষ্টা আবার দু'দিকে হয়—প্রত্যক্ আর পরাক্—নাভিমুখো আর উল্টোমুখো। একে অভ্যুদয়, উন্নতি—ascent, অন্যে অবনতি descent।

কর্ম্ম দিয়ে কায়া ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে, শেষকালে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পূর্ণও হতে হবে বটে, কিন্তু কর্ম্ম আসছে কোত্থেকে? আমি বা নিউক্লিয়াস্ থেকেই সন্দেহ নেই। তবে "আমি"র আবার নানান "কোঠা" বা কারায় বৈঠক (Plane of existence)। মোটামুটি তিনটে—ওপর, নীচ, মাঝারি বা সন্ধি। শুধু "আমি" কেন, তার বিশ্ব সঙ্ঘাতের সব কিছু (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ইত্যাদি) নানান্ থাকে সাজান। সাত সাত, তিন তিন। ভূর্ভবঃ স্বঃ। ভূ নিম্নভূমি—Lower, স্বঃ উচ্চভূমি—upper; ভুবঃ—অন্তরীক্ষ সন্ধি বা Link medium—তিনে সাজ কাজ সব আলাদা রকম। "ভূ"তে—Earth planeএ কারবার মামুলী। তাতে বাধ্যতাই বেশী; লীলাস্বাচ্ছন্দ্য (True autonomy) এক রকম নেই বললেই হয়। সত্যিকার জ্যোতিঃ Light রস বা আনন্দ ও স্পষ্টতঃ শুদ্ধতঃ নেই। অথচ মামুলিতে ঠিক মগ্নতাও নেই। অ-পাওয়ার অস্বস্তি, পাওয়ার তাগিদ রয়েছে। কেন রয়েছে? অ-পাওয়াই বা কি, পাওয়াই বা কি?

এতেই দেখা যায়—মামুলি ধরণে কারবার করে, ভাবনা চিন্তা, আশা-আকাঙ্খা করে যে আমিটা, সেটা "আমি"র সবটা, এমন কি আসলটাই নয়। ওটা হচ্ছে "ভাসা" আমি Surface Self—বাইরের ষ্টলে ব'সে কারবার করে, খুচরো কাঁচা হিসেব রাখে। তার পেছনে একটা "বিরাট সম্ভাবনার" (Infinite possibilities)এর আমি রয়েছে। কুণ্ডলিনী শক্তি তার নাম। সে বিপুলের সঙ্গে এই ষ্টলের ছোট্ট কারবারটী আমিটার একেবারে যোগ নেই এমন নয়। তলায় তলায় আছে। সাগর সৈকতে বালি খুঁড়ে গর্ত্ত বানালে সাগরের জলই চুঁয়ে আসে। তা ছাড়া আর জল মিলবে কোথা?

কিন্তু গর্ত্তটার সঙ্গে সাগরের সহজ, সরল, "প্রাণিক," "আত্মিক" যোগ সচরাচর দেখা নেই। তাই বালিতে গর্ত্তটা বুজে আছে। জলটুকু শুখিয়ে যাবার মতো হয়, প'চে ভট্ভটেও হয়। কিন্তু তবু গর্ত্তের যেটা প্রাণ যেটা জীবন, যেটা আত্মা—সেই জলটুকু তার প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং

বীজমব্যয়ং যে সাগর, তার স্পর্শ, তার দান, তার যোগানের প্রতীক্ষা না ক'রে পারে না। সে স্বভাবে স্বাধারে স্বচ্ছন্দে যা, সেইটে হবার বিপুল সম্ভাবনা (vital urge of potentiality) ; তার কারবারি সত্তায় অল্পতা ও ক্ষুদ্রতায় তাকে সুস্থির ক'রে বেঁধে রাখতে দেয় না। potential টানতে চায় actualকে তার ক্ষুদ্র গণ্ডীর (Little limitations) ভেতর থেকে প্রসার ও মুক্তির দিকে।' প্রত্যেক আংশিক, অপূর্ণ, বাধিত সত্তাকে তার পূর্ণ শুদ্ধ আকৃতির, perfect pattern বা type এর যে সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবনাই স্থির থাকতে দেয় না, আপনাতে অঙ্গীকার আত্মসাৎ করতে চায়। এ আকুতিটা পারস্পরিক mutual। সম্ভাবনার যে শক্তি তা সেই পদ্মনাভেরই নাভিশক্তি। তার চাইতে "বাস্তব" শক্তি বিশ্বে আর নেই।

রেশম-কীট পাতা-টাতা খেয়ে নিজের ভেতর থেকেই রেশমের গুটি বানিয়ে তাতে আপনাকে পুরে রাখে। রাখা দরকার ব'লে রাখে। কিন্তু তার আবার প্রজাপতি হ'য়ে পাখা মেলে বিশ্বের আকাশে বাতাসে, আলোকে-পুলকে মুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী হবার সম্ভাবনাটিও ঠিক হয়ে আছে যে! কাজেই গুটি কেটে বেরোনর,তাগিদটাও তার জোরাল কম নয়! নিজের খোলা পিঠে ক'রে অতি আস্তে আয়াসে চলছে যে শামুকটি, তাকে একদিন হিমাচলের এভারেষ্ট বিজয়াভিযানে বেরুতে হবে। ছায়াপথেরও ওপিঠে যে সব বিপুল অজানার জগৎ—তাদের রহস্য পাথারে ঝাঁপিয়ে সাঁতরে পাড়ি দিতে হবে যে! কাজেই শামুকের ঐ ছোট্ট খোলাটির মধ্যে থাকলেই চলছে কৈ? তার ভেতর একটা দৈবী সম্পদের আবেগ দেখা রয়েছে। Divine possibility নিজেকে সমগ্রভাবে বাস্তব করবে বলে এই Inner urge—এই প্রত্যক্ প্রবণতা।

কিন্তু ঐ গুটি পোকাটি, ঐ শামুকটিও নেহাৎ কম পাত্র নয়! তার গুটি—তার খোলা, কত না জব্দ করে, কায়েমি ক'রে সে বানিয়ে রাখতে চায়! অর্থাৎ Ego-centric সত্ত্বাতের কাজ হচ্ছে তার আটপৌরে চলতি ব্যবহারের খাতিরে আপনাকে যতটা পুরু দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে পারে ততটা ঘিরে রাখা। নিজেকে সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত করা অস্বচ্ছ করা, opaque, Insulate করা। ভূমা অথবা সেই নাভির উৎস থেকে বিচ্ছুরিত তড়িৎ রশ্মিবাহী তারগুলো থেকে যতটা পারে নিজেকে যোগশূন্য disconnect করে রাখা। এ কর্ম্মটি করেই তার মামুলি সংসার-জীবন চলছে। এই তার "পশুভাব"। কাজেই Inner urge চোরা ভাবেই থেকে যায় অনেক সময়। কিন্তু যাই মোড় ফেরে, অর্থাৎ "ভূ" থেকে প্রাণিক, আত্মিক স্রোতগুলো উর্দ্ধাভিমুখী হয়—"স্বঃ" কিনা দিব্য ভাবের দিকে turn নেয়, তখনি তার ভেতর জেগে ওঠে ঐ Inner বা upper urge। প্রথমে শুভেচ্ছা বা শ্রেয়োবুদ্ধির অস্ফুরণে হয়ে: তখন মাঝখানে যিনি ত্রিশঙ্কুর মতন নিশ্চল হয়েছিলেন এদ্দিন, সেই "ভুবঃ" বা "সন্ধি মনের" selfটি জেগে সক্রিয় হ'লে ওঠেন। ইনি "ভূ"কে "স্ব"য়ের সন্ধি বা সন্ধান বাতলে দেন। এঁর কাজ হচ্ছে সন্ধান, সাধন। ইনি অন্তরীক্ষচারী মেঘ-বাহন মঘবা। ত্যাগ তপস্যার অস্থি দিয়ে তৈরি বজ্রে ইনি বৃত্র বা অহিকে বধ করেন। বৃত্র মানে যেটা বাধা হয়েছিল, রোধ ক'রে রেখেছিল—সেই ব্যারিয়ার, ইনস্যুলেটর্। ইন্দ্রবল সাহস; কাজেই পশুভাব আর দিব্যভাবের মাঝখানে "বীরভাব" বৃত্রসংহারকারী বজ্রের এসেন্স-ডিসেন্স দুটো দিকে পূর্ণ ক্রিয়া। নীচে থেকে যেটা উঠল সেটা হ'ল আকুতি সমর্পণ—aspiration surrender; চাহিদা ও যোগান মাপে নয়—ভাবে যেন সে সমান হবে; ডাক ও সাড়া অনুপাতে নয়, সুরে সমান হবে। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্—উপর থেকে যেটা নামল—সেটা তার করুণা, প্রেম, অঙ্গীকার Divine Grace, Love, Acceptance। দু'য়ে মিলে একটা পূর্ণ ক্রিয়া—complete act, complete harmony। বজ্রশক্তি না হলে জীবের পশুত্বের ক্ষুদ্রত্ব-অল্পত্বের কৃপণ-কুণ্ঠিত্বের বদ্ধ-বঞ্চিতত্বের শাপমুক্তি হয় না। তাই তার দিক থেকে খাঁটি খাঁটি aspiration surrender চাই-ই, পুরো প্রোজ্মিত কৈতবভাবে হ'লে তবে পুরো কাজটি হবে। তার জন্যেও শিক্ষানবিশি দরকার। পূর্ণ-নিবেদন সাধ্য শিরোমণি।

অধিভূত সৃষ্টির মধ্যেই দেখা আছে অধিদেব সৃষ্টির সম্ভাবনা। সম্ভাবনা মানে অবিশ্রান্ত অমোঘ তাগিদ-দেয়া উর্দ্ধাভিমুখী একটা টান Higher centre pull, "দেব" মানে দ্যোতনশীল, লীলাপর—অর্থাৎ জ্যোতি, আনন্দ, লীলার লোক। অধঃস্রোত উর্দ্ধস্রোত হ'লে—পরাকপ্রবণ প্রত্যক্-

প্রবণ হ'লে—ভূতাত্মা প্রাণাত্মা মন-আত্মা এসব প্রত্যগাত্মার অন্বেষণপর হ'লে—অধিদেব সৃষ্টি আরম্ভ হলো। অধঃ আর ঊর্দ্ধ দুটো সৃষ্টিধারা কৃষ্ণ আর শুক্ল, এই শুক্লধারা কৃষ্ণধারায় আগেও বটে, সঙ্গেও বটে, পরেও বটে। শুক্লপন্থা: —দেবযান-ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়।

এ তিন ছাড়া এক অদ্ভুত সৃষ্টি আছে। অধিযজ্ঞ সৃষ্টি। "প্রকৃতিম্ স্বামধিষ্ঠায়" সাক্ষাদ্‌ভাবে সরাসরি ভাগবতী সৃষ্টি। ভগবানের পরমা-প্রকৃতির পরশমণি ছুঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাথর সোণা হ'য়ে গেল—অপরায় পাথর পরমায় শুদ্ধ চিন্ময় হ'য়ে গেল—শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্পর্শে পাষাণী অহল্যা যেমন। ভাগবতী শক্তির অবতরণে ভূঃ বা আর্থ প্লেন অচিন্ত্যভাবে transform হয়ে গেল। এতে সাধারণ অধঃ বা ঊর্দ্ধ সৃষ্টির ক্রম, ধারা সর্ত্ত টর্ত্তর বালাই নেই। হিসেব নিকেশের ঝামেলা নেই। যা কোটি যুগে হবার, তা এক লহমায় হ'য়ে গেল। যে সিন্ধু বিন্দু বিন্দু ক'রে আহরণ করায়, সে সিন্ধু শাওনের এক নিরাশা নিঝুম-বাসরে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেল! ভগবানের অবতার, তাঁর লীলা সহচর লীলাধামের "অবতরণ", সাধকের ভেতরে ভগবানের গুরু-শক্তির কৃপা; অতিমানুষ প্রতিভার সৃষ্টি, শক্তিতে, ভাবে, সুরে, ছন্দে; প্রেমের মহাভাব, যোগের জ্ঞানের নিদিধ্যাসন সাক্ষাৎকাররূপ ফল; স্বয়ং মহাযোগেশ্বরের বিশ্বরূপাদি সাক্ষাৎ সৃষ্টি; এসব দেশ-কাল-কার্য্য-কারণ নিয়মে আসে না। এসব অপ্রাকৃত transcendental। আগে যে অধঃ আর ঊর্দ্ধ ধারায় কথা বলা হ'ল, তারা অপরার ভেতর দিয়ে পরার অধ্যক্ষতায় কানুন মাফিক চলে। যেন রেলের ডবল লাইন পাতা আপ আর ডাউন। সিডিউল্ মত ক্রমে ক্রমে ঘাঁটির পর ঘাঁটি পেরিয়ে চলতে হয়। Gradual and partial achievementsএর সিঁড়ি ভেঙে উঠ্‌তে হয়। কিন্তু এই অচিন্ত্য অনির্ব্বাচ্য "অহৈতুকী" সৃষ্টিতে স্বর্গের তোরণ যেন সহসা খুলে গেল স্বর্গদ্বারমপাবৃতং—বৈকুণ্ঠের অভয়, কৈলাসের আনন্দ, ত্রিদিবের অমৃত বন্যার মতো মর্ত্ত্যের যা কিছু তা এক মহা-মুহূর্ত্তে সত্য শিব সুন্দর করে দিয়ে গেল! নাভিমুখে চলার পথে খানিকদূর কানুন-মাফিক চলা—বিধিমার্গ। তারপর নাভির টানে পড়ে গেলে আর রুটিন বন্দেজি চলা না—সাঁৎ ক'রে নিয়ে তাতে ঢুকতে হয়। এই শেষেরটাও অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। অনেক সাধ্যসাধনায় যা ছিল অসম্ভব দূরে, এক লহমায় তাতে আমাতে আশ্চর্য্য মিলন হ'য়ে গেল! সকল চড়াই, উৎরাই ভাঙ্গার একটা সীমা আছে, তারও পিঠে ভগবানের পরমা প্রকৃতির অহেতুক (অর্থাৎ সাধ্য আর সাধনের আর সিদ্ধির অনুপাত নিয়মটা যেখানে রদ হ'য়ে গেল) টান মিলে যায়। দদামি বুদ্ধিযোগং তে—বুদ্ধির যোগ কিছুতে হচ্ছে না, যোগ হ'য়ে গেল। তাতে ক'রে সঙ্গে সঙ্গে অপরার কয়লার দানা বদ্‌লে হ'ল সাচ্চা হীরে—শুদ্ধ সমুজ্জ্বল। তাকে নিয়ে আর ঘসতে মাজতে হয় না। বৈষ্ণবেরা কেউ কেউ বলেন—রাধারাণীর দয়া। এটা অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য সৃষ্টি। ভগবানের পরমাপ্রকৃতির "অবতরণে" সাক্ষাৎ সৃষ্টি। অদ্বৈত প্রভু এই সৃষ্টির তরেই মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন—গৌড়ীয় ভক্তেরা বলবেন মূল কথা—Direct Transcendental creation from above। কার above? অপরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতিতে আটকে পড়া (Involved) যে জীব, তার ওপর কোন দায় থেকে অপরা-পরার যোগে যে সৃষ্টি তা ভূত—ভৌতিক সৃষ্টি হ'লেও তার control apparatus হচ্ছে মন-বুদ্ধি অহঙ্কার এক কথায় মন। অতএব এ সৃষ্টি মনকে নিয়ে। জড় অণু, অণু-সঙ্ঘাতগুলো পর্য্যন্তও মনের সৃষ্টি, মন দিয়েই সৃষ্টি, একথা বিজ্ঞানও বলতে লেগেছে, তাহ'লে ভগবানের পরমা প্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ সরাসরি সৃষ্টি—একেবারে নূতন অথবা যা চলছে তারই "নবীকরণ" Transformation এটাকে কি বলা যাবে? অতিমানুস—supermental? সেটা মূলে আসলে কি, তাই দেখ্‌তে হবে। কোথা কি ভাবে কখন সে কাজ করছে না করছে, বা করবে না করবে সে কথা পরে। supramental creationএর সাধারণ বিশেষ, নিত্য-নৈমিত্তিক দু'রকমের প্রয়োগ মেলা সম্ভব। ভগবানের পরমা প্রকৃতি সাক্ষাদ্‌ভাবে অপরা-পরার সঙ্ঘাতে অবতরণ ক'রে ডাকে জ্যোতিঃ আনন্দ ও ছন্দে নতুন ক'রে দেবে ঋদ্ধ পূর্ণ করে দেবে!

শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য বাসরে কথাগুলো ব'ললাম—তাঁর মত বা পথ ভুলিয়ে দেবার জন্যে নয়, সে দাবী আমি রাখি না। অনুভূতির ওপরকার ভূমিতে যাঁরা আরূঢ়, তাঁদের অনুভূতিগুলো তলায় থেকে সাধারণ লজিকের মান-মেয়াদির মাপকাঠি দিয়ে বুঝতে যাওয়াতে আগেই ভুলে রাখতে হয়—যেটি ঠিক হবার নয় সেইটি করতে বসেছি। আমি নিজের ভাবেই কথাগুলো পাড়লাম। যায়গায় যায়গায় ঋষি বচনের সঙ্গেও মিল পেয়েছি। আগম মানে যা এসেছে—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র মহাজনবাণী।

শ্রীঅরবিন্দের বাণীর সঙ্গেও তেমন অসঙ্গতি হবে না ভরসা করছি। ভেতর থেকেই এ ভরসা আসছে। তাঁর অন্তেবাসী যাঁরা, শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বানুরাগী, শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বদর্শী যাঁরা, তাঁরা ভেবে দেখবেন।



গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

পঁচিশ

যতীন যে মনে মনে এই পল্লীবাসীগুলির প্রকৃতির সঙ্গে কচ্ছপের তুলনা করিয়াছেন সে তুলনা তাহার ভুল হয় নাই। পরের দিন বেলা দশটা হইতে-না-হইতে ধারণাটা তাহার বদ্ধমূল হইয়া গেল। জমাদারের নাম শুনিয়াই তাহারা ঘরে ঢুকিয়া বসিল এবং পরদিন ঘর হইতেই অনিরুদ্ধকে নেপথ্য উক্তিতে জানাইয়া দিল যে তাহারা ও-সব কংগ্রেস ফংগ্রেসের মধ্যে নাই। হরেন ঘোষাল তো রাত্রে উঠিয়াই শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। তাহার ধারণা ছিল, 'সে এককালে পিকেটিং করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম পুলিশের খাতায় ভারত-উদ্ধারকারীদের মধ্যে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এবং সে সর্ব্বাগ্র ক্ষণটি আগামী প্রত্যূষ, যখন পুলিশ তাহার বাড়ি ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।' যাইবার আগে পর্য্যন্ত সে খুঁজিয়া পাতিয়া যত কাগজে বন্দে-মাতরম্ লেখা ছিল সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিল এবং দেওয়ালে যত জায়গায় লেখা ছিল লেপিয়া মুছিয়া দিল। জগন ডাক্তার মুখে হটে নাই—তবে সেও বলিয়াছে সকলেই যখন গররাজী তখন—;

কচ্ছপের মত তাহারা মুখ বাহির করিয়াছিল—জমাদারের পদশব্দে ভীত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই খোলার মধ্যে গুটাইয়া বসিয়াছে।

কেবলমাত্র অনিরুদ্ধ এখনও বদ্ধপরিকর। সে বলিল—কাউকে চাই না আজ্ঞে, একাই আমি কমিটি করব।

হাসিয়া যতীন বলিল—একা কি কমিটি হয় অনিরুদ্ধ-বাবু। কমিটি মানেই হ'ল কোন কাজের জন্যে পাঁচজনের পঞ্চায়েৎ। আপনি বরং সদর কংগ্রেস কমিটির একজন মেম্বার হয়ে যান। বছরে চার আনা চাঁদা। আর কতকগুলি নিয়ম আছে—

অনিরুদ্ধ বলিল—সে আমি হয়েছি বাবু। শহরেই সেক্রেটারী বাবু চাঁদা নিয়েছে, ফরমে সই নিয়েছে। আপনার কাছে লুকোব না বাবু, আমি মদ গাঁজা খেতাম, নেশা-ভাং করতাম, তা সেইদিন থেকেই আমি বেবাক বাদ দিয়েছি। ছিরুপালের মাথা না-খেয়ে, ওর সব্বনাশ না-করে আমার সোয়াস্তি নাই। আক্রোশে সে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল।

যতীন বলিল—কারও সব্বনাশ করবার জন্যে কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে লাভ নাই অনিরুদ্ধবাবু, আর কংগ্রেসও সে রকম মেম্বার নেয় না। তা ছাড়া, শ্রীহরি ঘোষও তো এই দেশের লোক—সেও তো কংগ্রেসের মেম্বার হতে পারে—

অনিরুদ্ধ যতীনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; শ্রীহরি ঘোষও কংগ্রেসের মেম্বার হইতে পারে এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আর শুনিল না, বলিয়া উঠিল—তা হ'লে আমিও কংগ্রেসের মধ্যে নাই। সে উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—গান্ধী মহারাজ শুনেছি সিদ্ধপুরুষ, কলির যুধিষ্ঠির, তা ছিরুর মতন পাপীকেও তিনি দলে নেন না কি? পেনাম আমার গান্ধী মহারাজার চরণে! উত্তর না-শুনিয়াই সে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন সে আর যতীনের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিল না। ওই ছেলেটিও গান্ধীর দলের একজন বলিয়া তাহার উপরেও তাহার বিরাগ জন্মিয়া গিয়াছে। যতীনের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ম্লান হাসি। কিছুক্ষণ পরেই দুধের পাত্র হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল দুর্গার-মা।

সকালবেলা হইতে দুর্গাও আজ আসে নাই। দুর্গার-মা আসিয়া দুধ দিয়া গিয়াছে। যতীনকে সে আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—দুধ ল্যান বাবা। দুগ্‌গা আজ আসতে নারলে, লতায় কামুড়েছিল কাল রেতে, পা ফুলেছে—

ব্যগ্রভাবেই যতীন প্রশ্ন করিল—কেমন আছে এখন?

—ভাল আছে বাবা, ভাল আছে। দুর্গার-মা যখন অন্য লোকের সঙ্গে কথা কয় তখন প্রতি কথায় একটি অভিভাবকোচিত বিজ্ঞতা ফুটিয়া ওঠে। দুধের পাত্রটি নামাইয়া দিয়া সে বলিল—আমাকে সে ব'লে দিলে—বাবুকে বলিস আমি ভাল আছি।

অকপট অন্তরেই যতীন বলিল—বড় ভাল মেয়ে তোমার।

—এই পাঁচখানা গাঁয়ের ভেতরে এমন মেয়ে পাবা না বাবা। এমন ছিরি, এমন রীত, ছোট নোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কয় না বাবা।

এ কথার অর্থ যতীন বুঝিতে পারিল না; উত্তরও সে দিল না।

দুর্গার-মা আবার বলিল—তা দুগ্‌গাকে তুমি কিছু দিয়ো বাবা। যা হয় খানিক সোনাদানা। দশদিন পরে তো তুমি চলে যাবা, তোমার নাম করবে ছেরদিন।

কথাটা যতীনের ভাল লাগিল; ওই মেয়েটির সেবা, গত রাত্রির অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা এবং অকৃত্রিম মমতার কথা মনে করিয়া সে ভাবিল—প্রতিদানের এ উপায় বড় সুন্দর এবং শোভন। হাসিয়া বলিল—তা আমি দেব।

দুর্গার মা খুশী হইয়া বলিল—বেশ বাবা বেশ! দেখবা তুমি কেমন মেয়ে আমার!

দুধের পাত্রটি ভিতরে রাখিতে গিয়া যতীনের খেয়াল হইল সমস্ত ঘরটা বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। বিছানা এখনও তেমনিই পড়িয়া আছে, গতরাত্রের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি এখনও মাজা হয় নাই। উচ্ছিষ্টের গন্ধে মোটা নীল মাছি পঙ্গপালের মত বাসন ও মেঝের উপর বসিয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিন-ঘিন করিয়া উঠিল। দুর্গা প্রত্যহ সকালে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়; এখানে আসিবার দিন হইতেই এ চিন্তা করিবার তাহার প্রয়োজনই হয় নাই। এ বাড়ির গৃহিণীও তাহার কাজ করিয়া দেয়, কিন্তু সে আজ এদিকে আসে নাই। সে কিছুক্ষণ ঘরের অবস্থার দিকে চাহিয়া দেখিয়া ডাকিল—অনিরুদ্ধবাবু!

অনিরুদ্ধ বাড়িতে ছিল না, মনের ক্ষোভেই সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। গান্ধী মহারাজের দলে ছিরুও ইচ্ছা করিলে মেম্বার হইতে পারে! মদ গাঁজা-ছাড়িলেই কি ছিরুপাল সাধু হইয়া যাইবে! ছিরু পালের যদি গান্ধী মহারাজার দলে ঠাঁই হয়, তবে তাহার ঠাঁই কোথায়? সে এবং ছিরু পাল কি একদলে থাকিতে পারে? ছিরু যদি আজ কংগ্রেসের মেম্বার হয় তবে সে-দলে থাকিয়া তাহার কি উপকার হইবে? কি লাভ? এই বিক্ষোভেই সে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে নদীর ধারে বাঁধের উপর গিয়া বসিয়াছিল।

ডাকিয়া উত্তর না-পাইয়া যতীন বাড়ির ভিতর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বারান্দাটাও অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে; বাড়ির অপর অংশটা পরিষ্কার। এ বারান্দাটা ভাড়ার অধিকারে তাহারই নির্দ্দিষ্ট। ও-দিকের বারান্দায় পদ্ম বসিয়া শুকনা তিল গাছ পিটিয়া তিল ঝরাইয়া লইতেছিল। যতীন বলিল—যে মেয়েটি কাজকর্ম্ম করে সে আজ আসে নি। কাল রাত্রে সাপে কামড়েছিল। এঁটোবাসন গুলো—

পদ্ম মুহূর্ত্তে পিছন ফিরিয়া বসিল।

যতীন আবার বলিল—অনিরুদ্ধবাবু কোথায় গেলেন? যদি অন্য কাউকে ডেকে দিতেন, আমি পয়সা দিতাম।

পদ্ম এবার হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া কোঠার উপরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিল—ঢং! সাপে কামড়ালে তো ম'ল না কেনে?

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এমন করিয়াই কি মানুষ মানুষের মৃত্যুকামনা করিতে পারে! এই মেয়েটি কি কি ধরণের মেয়ে সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মেয়েটির মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর কিছু আছে, এটা সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল। নীরবে নিঃশব্দ পদক্ষেপে অবগুণ্ঠিতা মেয়েটি তাহার সেবা করিয়া যায়—যেন আদিম কালের রবহীন অবয়বহীন জীবের মত তাহাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরে! ঈর্ষায় ক্রোধে সে বাঘিনীর মত—অকপট উচ্চ গর্জ্জনে সে-ঈর্ষা সে ঘোষণা করে!

নিরুপায় যতীন ফিরিয়া আসিয়া আর একবার ঘরের অবস্থাটা দেখিয়া নিজেই পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত পরিষ্কার করিয়া সে যখন উঠিল তখন সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিতে গিয়া হাতে, মুখে, দেহের স্থানে স্থানে ছাই এবং কাদা লাগিয়াছে। সমস্ত শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে গামছাটা টানিয়া লইয়া স্নানের জন্য বাহির হইয়া গেল। আজ ওই কাদায় ঘোলা এক হাঁটু জলে স্নান ভিন্ন উপায় নাই। নদী অনেক দূর। খানিকটা বিক্ষোভও ছিল। সে বিক্ষোভ ওই দীর্ঘাঙ্গী অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটির উপর। এ বিক্ষোভ তাহার নিতান্তই অধিকার-বহির্ভূত, অন্যায়,

কিন্তু তবু মন সে বিক্ষোভকে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

শেষ বৈশাখের দ্বিপ্রহর। মাটি তাতিয়া সত্যই যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে। গরম ধূলিকণাপূর্ণ এলোমেলো বাতাস বেশ জোরেই বহিতে সুরু করিয়াছে। এখানকার লোকে বলে 'ঝলা'। বড় বড় অশথ বট শিরীষ গাছ চৈত্রের শেষে কচি পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে—সে কচি পাতাগুলি ইহারই মধ্যে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মাঠ জুড়িয়া একটা ধূলি-ধূসরতা কুয়াসার মত মাটির কোল হইতে আকাশের কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভাসিতেছে। এই দুরন্ত প্রখর রৌদ্রে মাঠে এখনও চাষীদের হাল ঘুরিতেছে। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে—ঘর্ম্মসিক্ত কাল চামড়া রৌদ্রের আভায় চকচক করিতেছে তৈলাক্ত লোহার মত। চাষীদের মেয়েরা চাষীদের জন্য মাঠে জলখাবার আনিয়াছিল, তাহারা এখন ঝুড়িতে করিয়া গোবর এবং কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—সমস্ত ধু ধু করিতেছে। এই সেদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—সে বৃষ্টির জলও আর এক বিন্দু কোথাও জমিয়া নাই। প্রাচীন-কালের বড় বড় সিচের পুকুরগুলি এমন ভাবে মজিয়া গিয়াছে, আর এমন ভাবে মোহানার বাঁধ ভাঙিয়া হাঁ করিয়া আছে যে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে জল ভিতরে জমে সে জলও নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। গ্রামের প্রান্তেই এমনই একটা প্রকাণ্ড মজা পুকুরে এখনও খানিকটা জল আছে, সেই জলায় হাত দেড়েক গভীর শেওলা ও পানায় ভর্ত্তি জল, এই জলে ভদ্র চাষী গৃহস্থেরা স্নান করে—এই জলই খায়। পূর্ব্বে নদীতেই সকলে যাইত, কিন্তু ওপারের জংসনটা এমন ভাবে নদীর কোল ঘেঁষিয়া আগাইয়া আসিয়াছে যে, গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের আর আব্রু রক্ষা করিয়া নদীর ঘাটে যাওয়া চলে না। যতীন সেই পুকুরের পাড়ে উঠিয়া একবার দাঁড়াইল। মাথার উপরেই একটা বড় শিরীষ গাছকে আশ্রয় করিয়া প্রকাণ্ড একটা লতা গোটা গাছটাকেই প্রায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। লতাটার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ফুল। সে ফুলের গন্ধে সমস্ত স্থানটা ভুরভুর করিতেছে। মৌমাছি এবং ভ্রমরের গুনগুনানিতে মৃদুতম ঐক্যতান সঙ্গীতের যেন একটা জাল বিছাইয়া দিয়াছে। গোটা দুয়েক 'বেনে বউ' পাখী 'গেরস্তের খোকা হোক' ডাকিয়া পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। এক ঝাঁক বন-টিয়া আকাশে উড়িয়া ফিরিতেছে তিল ফসলের শূন্য প্রত্যাশায়। অসংখ্য বিচিত্র রঙে রঙীণ প্রজাপতি ফড়িং বেড়াইতেছে—দেবলোকের পুষ্পের মত। পুকুরটার ও-পারের পাড়ে রাঙা ফুলে ভরা একটা গাছ। গাছটার অদ্ভুত শোভা। যতীন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। গাছটা অশোকের গাছ। গাছটার শোভা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। ক্রমশ তাহার কানে ধরা দিল—কত বিচিত্র সঙ্গীত। অদূরবর্ত্তী গ্রামটির মানুষের কলরবের মধ্য হইতে সে শুনিল কত রকমের পাখীর ডাক। ধূলিধূসর রণ-কুয়াসার মধ্যেও সে দেখিল গ্রামখানার চারিপাশের ঘন জঙ্গলের গাছে গাছে কত বিভিন্ন রকমের ফুলে কত বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে কত বিচিত্র মিষ্ট গন্ধও সে অনুভব করিল। এ গন্ধে—এ গানে—এ বর্ণচ্ছটায় কেমন যেন একটা নেশা আছে, কেমন একটা যেন হাতছানির ইসারা আছে। অনেকক্ষণ সে এ-দিক ও দিক ঘুরিয়া ফুল ও পাখাগুলিকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! লুকোচুরি খেলার মত—কাছে গেলে ফুল লুকাইয়া যায়, পাখী চুপ করে। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সে যখন পুকুরের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সূর্য্য মধ্যাকাশ পার হইয়া পশ্চিমে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে-খেয়াল তাহার নিজের ছিল না, খেয়াল করাইয়া দিল অপরে। সে নিবিষ্টচিত্তে 'বেনে বউ' পাখীর সন্ধানে একাগ্র-দৃষ্টিতে গাছটার দিকে চাহিয়াছিল। 'কে ডাকিল — বাবু!

যতীন ফিরিয়া দেখিল—তারা নাপিত। সে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ।

তারা নাপিত জংসনে কামাইয়া ফিরিতেছিল, সে বলিল—অনেক দূর হ'তে আমি দেখছি, একটি লোক ঘুরছে। চাষীতে তো এমন করে ঘোরে না! কি দেখছেন বাবু এমন ক'রে?

—পাখী। কি পাখী একটা ভারী মিষ্টি ডাকছে।

—ও 'বেনে বউ' পাখী বাবু, ডাক আমি শুনেছি। তা এত বেলায় খালি গায়ে—গামছা নিয়ে—চান করবেন না কি? বেলা যে দুপ'র গড়িয়ে গেল বাবু!

এতক্ষণে যতীনের সময়ের খেয়াল হইল। উঃ—তাই

কোমল সুমিষ্ট শস্য আত্মপ্রকাশ করে—তেমনি ভাবেই যতীনের অসুস্থ হাতের আকর্ষণে পদ্মের অবগুণ্ঠন খসিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহার অনবগুণ্ঠিত এক নূতন রূপ। এই দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যে সে প্রায় অহরহই যতীনের শিয়রে বসিয়া থাকিত। মাথায় অবগুণ্ঠন থাকিত না, কত সময় তাহার বেশ-বাস অসম্বৃত হইয়া পড়িত, সে-দিকে সে ভ্রূক্ষেপই করিত না। সাত দিনের দিন যতীনের জ্বরটা খুব বাড়িয়াছিল, ১০৬ ডিগ্রীর কাছাকাছি। আরক্ত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে বিহ্বলের মত চারিদিক খুঁজিতেছিল; শিয়র হইতে পদ্ম ঈষৎ ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হচ্ছে?

যতীনের সমস্ত ভুল হইয়া যাইতেছিল; অসুস্থতার মধ্যে সে খুঁজিতেছিল তাহার একান্ত আপন জনকে। পদ্মকে সে চিনিয়া উঠিতে পারিল না—কিন্তু চেনার স্মৃতিটাও একেবারে মুছিয়া যায় নাই; ব্যাকুল হইয়া সে দুই হাতে পদ্মের চুলের মুঠা ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়া চোখের সম্মুখে মুখখানা টানিয়া আনিয়া চিনিতে চেষ্টা করিল। ছাড়াইয়া দিল সে মুঠি জগন ডাক্তার। অনিরুদ্ধ পদ্মকে বলিল—তু সর, আমি বসি। বিকারের মত লাগছে।

পদ্ম উঠিয়া গেল; যতীনের কঠোর আকর্ষণে তাহার এলো চুলের গোঁজ-খোঁপাটা প্রায় খুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, —বাহিরে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে খোঁপাটা খুলিয়া ফেলিয়া আবার বাঁধিতে বাঁধিতে সে বলিল—পরের ছেলে নিয়ে এ কি বিপদে পড়লাম মা! 'ভালোয়-ভালোয়' উঠে বসলে যে বাঁচি।

একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তৃপ্তি কিন্তু সে অনুভব করিতেছিল। এ স্বাদ যেন সে কখনও পায় নাই। অনিরুদ্ধ তাহাকে বহুবার প্রহার করিয়াছে; সব ক্ষেত্রে না হউক—অনেক ক্ষেত্রে সে তৃপ্তিও অনুভব করিয়াছে কিন্তু এমন তৃপ্তির স্বাদ তাহাতে ছিল না। সেই তাহার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল; রূঢ় কাঠিন্যের আবরণটা যেন শতধা হইয়া ভাঙিয়া গেল। যে অবগুণ্ঠন যতীন টানিয়া খুলিয়া দিল, সে অবগুণ্ঠন পদ্ম আর মাথায় তুলিল না।

পথ্য করিবার দিন বন্ধ ঘরে গরম জলে গা মুছিতে মুছিতে প্লীহাস্ফীত পেটটির উপর যতীনের দৃষ্টি পড়িল; সে হাসিয়া ফেলিল। পল্লীগ্রামের এতখানি প্রেম সে কামনা করে নাই। পেট টিপিয়া সে পিলের রাজত্বের সীমান্ত নির্দ্ধারণ করিতেছিল, পদ্ম পথ্যের থালা লইয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তিরস্কার আরম্ভ করিয়া দিল—এখনও হয় নাই? হুড় হুড় করে জল ঢালছ বুঝি?

হাসিয়া যতীন বলিল—না।

—তবে? গা মুছতে লাগে কতক্ষণ?

—পিলেটা মাপছি। উঃ পাথরের মত শক্ত!

পদ্মও এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল—এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা। পাথর দিনকে-দিন পাহাড় হয়ে উঠবে!

—পাহাড়! এর চেয়েও বাড়বে! যতীনের চোখ দুটা ভয়ে বড় হইয়া উঠিল।

সে ভয় দেখিয়া পদ্ম হাসিয়া সারা হইল। এমন হাসি পদ্ম বহুদিন হাসে নাই।

•

অনিরুদ্ধ বাড়িতে ছিল না। সে ছিল মাঠে। যতীনের এই অসুখের মধ্যেই সে পাইকারদের কাছে দুইটা বুড়া মহিষ কিনিয়াছে। চাষের সময় আসিয়া গিয়াছে; শুকনা মাঠের কাজ—ধূলার মাটি চাষ, সার দেওয়া, বীজ ফেলা, সময় হু-হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে দিন দুই কাল বৈশাখীর জল-ঝড়ও হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে মাঠে এখন চাষের কাজ চলিয়াছে খুব দ্রুত গতিতে। হাতীর বোঝার তুল্য অভাব-অনটন হাতে ঠেলিয়া অনিরুদ্ধও কোন রকমে তাল রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। আজ দিন ভাল ছিল, পাঁজির নির্দ্দেশে বীজ বপনের উপযুক্ত শুভ দিন; আজ সে মাঠে ধানের বীজ ছড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিল প্রায় বেলা তিন প্রহরের সময়। পাতুর কাঁধে লাঙল—সেই-ই মহিষ দুইটাকে তাড়াইয়া আনিতেছিল, অনিরুদ্ধর হাতে কেবল বীজের ডালাটা। পাতুকে বলিল—মোষ দুটোকে নিয়ে যা—তোদের পাড়ায় ভাগাড়ের ধারে খানিক চরুক। সেই ওবেলায় চান করিয়ে দিয়ে যাস। সে সটান আসিয়া যতীনের ঘরে ঢুকিয়া বসিল। এই একুশ দিনে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সে সব কথা যতীনকে না বলিয়া তাহার সোয়াস্তি হইতেছিল না। আঠারো দিনে যতীনের জ্বর ছাড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই কথাগুলা পেটের মধ্যে গজ গজ করিতেছে। কিন্তু খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, বেশীটা পদ্মের নিষেধে সে বলিতে পারে নাই। যতীন একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল। পদ্ম বারবার

তাহাকে বলিয়াছে—খবরদার দিনে ঘুমিয়ো না; ঘুমুলেই জ্বর চলে আসবে—হুঁ—হুঁ করে!

পদ্ম পিছন হইতে বলিল—ভাল মানুষের ছেলেকে বেজার করতে চললে তো! কথাগুলা পেটের মধ্যে ফুটছে না কি?

অনিরুদ্ধ আজ আর গ্রাহ্যই করিল না। যতীনের প্রতি তাহার এবং গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা এই অসুখের মধ্যে একটি ঘটনায় অনেক গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। সদর হইতে খোদ ডাক্তার সায়েব আসিয়াছিল তাহাকে দেখিতে। পুলিশ সায়েব আসিয়াছিল দুই দিন। দারোগা জমাদার নিত্য পালা করিয়া দুই বেলা আসিয়াছে, গিয়াছে। উপায় থাকিলে না কি যতীনকে সদরেই লইয়া যাওয়া হইত।

পদ্মের কথাটা যতীনের কানে গিয়াছিল, অনিরুদ্ধ ভিতরে আসিতেই সে হাসিয়া বলিল—কি কথা? আসুন।

—কথা অনেক বাবু, আমাকে তো বেড়াজালে ঘিরেছে। অনিরুদ্ধ একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

কথা অনেক।

'অনিরুদ্ধের গাছ কাটার তদন্ত হইয়া গিয়াছে। তদন্ত করিয়া গিয়াছে সার্কেল ডেপুটি। কংগ্রেস কমিটির 'সেকেটারী বাবু' আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেই মোক্তার। ভদ্রলোক ইংরেজী-বাংলায় জোর বক্তৃতা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফৌজদারী আইনের এলাকায় আর বিষয়টা নাই। ফৌজদারী আইনের কাঁটা-তারের বেড়া টপকাইয়া দেওয়ানীর সীমান্তে গিয়া পড়িয়াছে। চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নাই। তবে ডেপুটি নাকি ছিরুকে বেশ চোখ রাঙাইয়া সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে। থানার জমাদারকেও বাদ দেয় নাই। অনিরুদ্ধ ইহাতেই খানিকটা খুশী হইয়াছে। 'সেকেটারী' বাবুর ভাড়া ও অর্দ্ধেক ফি, সে 'কাবুলে চৌধুরীর' কাছে ধার-করা টাকা হইতেই দিয়াছে। দেওয়ানী মামলা করিলে ফল হইবে বলিয়াই 'সেকেটারী' বাবু আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার একজন বন্ধু উকীলের ঠিকানাও তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেস কমিটি হয় নাই; সেই দিনের ঘটনায় সকলে সেই যে ঘরে ঢুকিয়াছে—আর কেহ পা বাহির করে নাই।

ছিরু পালের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ খুব ঘটার সঙ্গেই হইয়া গিয়াছে। 'চন্দন-ধেনু' শ্রাদ্ধকর্ম্মে গাইগরুর গায়ে লোহার চক্র চন্দন মাখাইয়া ছাপ দিতে হয়, সে চক্র গড়িয়া দিবার কথা অনিরুদ্ধের, কিন্তু অনিরুদ্ধ গড়িয়া দেয় নাই; গিরীশ ছুতারের কতকগুলি কাঠের সামগ্রী দিবার কথা, সেও দেয় নাই; পাতু মুচীর ঢাক বাজাইবার কথা—পাতু সে দিন ঘরেই ছিল না। অনিরুদ্ধ,গিরীশ, পাতু প্রত্যাশা করিয়াছিল, ছিরু বেশ খানিকটা বিব্রত হইবে, অন্তত খানিকটা হৈ-চৈ হইবে; কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। নগদ দামে ছিরু এ সব কাজ করাইয়াছে। ছিরুর বাড়ির নিমন্ত্রণেও তাহারা খাইতে যায় নাই—সে কথা লইয়াও পঞ্চগ্রামের লোকে কেহ কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। তবে এ শ্রাদ্ধকর্ম্মে ছিরুর মান খাতির অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ছিরু একটা কুয়াও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

দুর্গাকে একদিন থানায় ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার ঘরে না কি দাগী-সন্দেহভাজন লোক আসে, মজলিশ করে, মদ গাঁজা খায়! অসমসাহসী মেয়েটা না-কি উত্তর দিয়াছিল—'আমাদের গমস্তামশায়, জমাদারবাবু, ইউনান বোর্ডের পেসিডেনবাবু যে দাগী, তা মশায় আমি জানতাম না।' ফলে তাহাকে সমস্ত দিনটি থানার হাজতে থাকিতে হইয়াছিল।

যতীন এই কয়েক দিনই দুর্গার কথা ভাবিয়াছে; সে প্রশ্ন করিল—সে আর এ দিকে আসে না কেন বল তো? দুধ দিয়ে যায় তো এক নতুন মেয়ে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, দুধ সে-ই পাঠিয়ে দেয়, তবে সে নিজে আর আসে না। আমার পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

—ঝগড়া হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুগগা মেয়েটি তো ভাল লয়। বেজায় বাড়। একদিন উনোনে আপনার সাবু চড়ানো ছিল; এসেই একবারে পুড়ে গেল ব'লে হাতা দিয়ে দিলে। এই আমার পরিবার বকেছিল। অবিশ্যি এখানে যারাই ছিল, জগন ডাক্তার, চৌধুরী মশায় সবাই বললে—এ তোরই অন্যায় দুগ্‌গা। বাস, সেই চলে গেল—আর আসে না। তা' ছাড়া পাতুর একটি সন্তান হয়েছে, ছেলে পোয়াতী দেখতে শুনতে হয়, কাজও অনেক।

যতীন চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—জগন ডাক্তারকে শুধোলেই সব শুনতে পাবেন। ডাক্তার আপনার ভারী তদ্বির করেছে মশায়। দিন রাত এইখানেই থাকত। গাঁয়ের লোকে কত ভয় দেখিয়েছে বাবু, বলে—'ঠিক জগন ঘোষকে পুলিশে পাকড়াও করবে। বিনি পয়সায় এত পিরীত কিসের!' জমাদারও একদিন বলেছেন—'ডাক্তার দেখি দিন-রাত এইখানে। গুরুসেবা করছ না কি?' তা ডাক্তার বললে—'মানে?' জমাদার বললে—'এই হয়েন ঘোষালের মত তুমিও চেলা হয়েছ না কি?' সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে দিলে—'আমি ডাক্তার মানুষ। বিদেশী ভদ্দলোক অসুখে পড়েছে। আসা আমার কত্তব্য, আমি আসি। তাতে তোমার যা খুশী ভাবতে পার। খুশী হয় রেপোট করতেও পার।' তার পরে পুলিশসায়েব আর ডাক্তার সায়েব যেদিন এল, ডাক্তার ছিল এখানে, গরম জলে আপনার পা ধুয়ে দিচ্ছিল; ডাক্তারসায়েব শুধোলে, 'তুমি কে?' ডাক্তার বললে—'আমি এ গাঁয়ের ডাক্তার। বিদেশী মানুষ এখানে এসে অসুখে পড়েছে, তাই আমি দেখা-শুনো করি।' দুই সায়েবেই মহা খুশী। ডাক্তার-সায়েব তো 'সেকহ্যান' করলে। তখন ডাক্তার দিলে বলে—'সায়েব আপনারা তো খুশী হলেন, কিন্তু আপনাদের জমাদার আমাকে শাসায়, বলে এখানে এলে রেপোট করবে আমার নামে।' সায়েবরা চটে লাল। তারপরে ডাক্তারের ফি মঞ্জুর করে দিয়ে চলে গেল; বলে গেল—'কোন ভয় ক'র না তুমি, নির্ভয়ে তুমি দেখা-শুনো করবে।' ডাক্তার বললে—'ভয় কি সাহেব। কত্তব্য করব, তাতে ভয় আমি করি নাই, করবও না।'

যতীন বিস্মিত হইয়া গেল। জগন ডাক্তারের মত লোক যে এমন নির্ভীক কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে—এ কথা সে কথনও কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে যেদিন প্রথম পরিচয়ে গ্রামের সমস্ত লোককে গালিগালাজ করিয়াছিল সে দিন সে বিস্মিত হয় নাই; শ্রীহরি পালের সিধা গ্রহণ করায় সে যখন চলিয়া গিয়াছিল—তখন সে মনে-মনে হাসিয়াছিল। সেদিন যখন কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট হইবার জন্য সে আসিয়াছিল তখনও তাহার ভুল হয় নাই। জমাদারের আগমন সংবাদে সে চলিয়া গিয়া যে ডুব মারিয়াছিল—তাহাতেও বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। সেই জগন ঘোষের ডাক্তার হিসাবে এ যে বিচিত্র পরিচয়!

অনিরুদ্ধ বলিল—তা আপনার, গাঁয়ের নোক সবাই খোঁজ খবর করেছে। চৌধুরী মশায় তো দুটি বেলা আসতেন। কোন দিন একটা বাতাবি, কোন দিন কিছু ফল দিয়ে যেতেন। ছিরুও এসেছিল ক'দিন, ছেরাদ্দের ভাঁড়ার থেকে ফলমূলও পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর খেটেছে আপনার পাতু বায়েন, দুগগার ভাই। দুবার তিনবার করে জংসনে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে; রাত দুপরে একাই গিয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন থাকত। সেদিন আপনার রাত তখন বারোটা, ডাক্তার বললে—জংসনে ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে। গেলাম পাতুর কাছে; ওদিকে পাতুর বউএর তখন পেসব বেদনা উঠেছে। তা' পাতু বউকে ফেলে চলে গেল তখুনি। আমি বললাম—আমিই যাই পাতু, তু থাক বাড়িতে, বউটার পেসব বেদনা উঠেছে। তা পাতু বললে—পেসব তো হয়ে যাবে এখুনি, দুগগা রইল, মা রইল—আমি আর থেকে কি করব! দুগগাও বললে—চলে যা দাদা—নির্ভাবনা, আমি রইলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যতীন বলিল—কই, আপনি কি করেছেন বললেন না তো!

একমুখ হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আমার তো করবার কথাই বাবু। আমার পরিবার একটা সম্বন্ধ পাতিয়েছে আপনার সঙ্গে, তখন আমার কথা ছেড়েই দেন।

কথাটা যতীন বেশ বুঝিতে পারিল না। সে মনেই করিতে পারিল না, কবে কি সম্বন্ধ সে পাতাইয়াছে।

অনিরুদ্ধ সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল—আপনি যখন তাকে ধম্ম মা বলেন—আর সে যখন ধম্ম ছেলে বলেছে আপনাকে, তখন তো আপনি আমার ছেলের মতন গো। আমরা না-করলে ধম্মের কাছে জবাব দোব কি?

যতীন অবাক হইয়া গেল। এই সম্বন্ধ পাতানোর কথা সে কিছুই জানে না, কিন্তু সেই জন্যই নয়। মেয়েটির বয়স আর কত? তাহাকে দেখিয়া তো বয়স মনে হয় নিতান্তই কম, তাহার চেয়ে বড় জোর চার পাঁচ বছর বেশী। কিন্তু মনে মনে সে তাহার মা সাজিয়া বসিয়া আছে! তাহার মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা—তাহার দিদি তাহাকে ছেলে সাজাইয়া নিজে সাজিত মা।

অনিরুদ্ধ আবার আরম্ভ করিল—একুশ দিনের ঘটনা এখনও শেষ হয় নাই—সেটেলমেণ্টারের—পাঁচ ধারার ক্যাম্পো বসে গিয়েছে; আট-দশটা তাঁবু পড়েছে, কাগজ-পত্ত, চেয়ার টেবেল—আলমারি, সে আপনার দশ-বারো গাড়ী চলে এসেছে। প্যায়দা, পেশকার, আমীনও এসে গিয়েছে আপনার। হাকিম আসবে—কি-কাল এসেছে। ছিরু তো খুব গরমের ওপরেই আছে—শুনছি না কি টাকায় আট আনা বৃদ্ধি করবে—ছ' আনা তো পাবেই। দেবু ঘোষ তো দিন-রাত কাগজ লিখছেই—লিখছেই। আরজির ফরম ছকছে সব।

—আর তুমি বকছ কেনে বকর বকর ক'রে বল দেখি! সেই এসে লেগেছ রোগা মানুষের সঙ্গে, তার আর বিরাম নাই! এস উঠে এস!—পদ্ম আসিয়া এবার বাধা দিল।

—বকলাম তো হ'ল কি? আমিই তো বকছি, উনি তো বকছে না!

—খাজনা বৃদ্ধি, পাঁচ ধারা, ঝগড়াঝাঁটি, তোমরা যা করবে করগা বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে তোমরা টানাটানি ক'র না।

পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—ই তো ভারী 'টিকির টিকির' লাগালে দেখছি!

—কি? কেমন আছেন মশায়? যতীনবাবু!—জগন ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

যতীন ব্যস্ত হইয়া আহ্বান করিল—আসুন—আসুন!

অনিরুদ্ধ পদ্মকে বলিল—যা' যা' ঘরকে যা' বাপু!

অনুচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পদ্ম বলিয়া গেল—ভাত নিয়ে আমি আর ব'সে থাকতে লারব। আমারও মানুষের শরীর। সুখ দুখ আছে।

যতীন বলিল—যান, যান, আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন গিয়ে। বেলা আর নেই।

জগন ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পাঁচ ধারার ক্যাম্প তো ব'সে গেল যতীনবাবু! খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে তো মামলা-মকর্দ্দমা হবেই। একটা বেশ জুৎ করে দরখাস্ত লিখে দেন দেখি—যে দেশের এই দুরবস্থায় খাজনা বৃদ্ধি হ'লে চাষী প্রজা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর খবরের কাগজেও বেনামীতে একটা চিঠি ছাপিয়ে দেন!

যতীন বলিল—আপনি আমার যে উপকার করেছেন-সে আমি শুনেছি। চিরদিন আমার মনে থাকবে।

জগন বলিল—মানুষের মত মানুষ আপনি, স্বীকা[র] করলেন। অথচ দেখুন, এই গ্রামখানার এমন লোক নাই যার অসুখ বিসুখে আমি করি নাই। ডাকুক চাই [না] ডাকুক, আমি যাই; 'ফি' আমি গাঁয়ের কারুর কা[ছে] নিই না। বলুক, কেউ দিয়েছে। এই তো ছিরু পাল[ের] পরিবার যখন মারা গেল—তখন ছিরু নিজে টাকা দি[তে] এসেছিল, নিই নাই। কিন্তু এ গাঁয়ের সব বে[টা] নেমকহারাম! বেইমানের দল সব। মুখেও কেউ স্বীকা[র] করে না।

—ডাক্তারবাবু না কি গো!—অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কাহা[র] আহ্বান।

—কে?

—আমি, তারাচরণ!—দেবু ঘোষে আর ছিরুতে [যে] বেশ এক পাল্টা হয়ে গেল।

—ঝগড়া?

—হ্যাঁ। খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে। দেবু বলে, ওসব [...] আনা—আট আনা কেলেম ছাড়। ছ-পয়সা কি দু আ[না] একটা সঙ্গতমত ধর। ছিরু বলেছে—সে হবে না। [দে...] তো কাগজ ফেলে দিয়ে উঠে চলে গেল—বলিতে বলিতে সে পথ হইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল; যতীনকে একটি প্রণ[াম] করিয়া বলিল, এখন বেশ ভাল আছেন, আজ পথ্যি করলে[ন] —নয় বাবু?

মৃদু হাসিয়া যতীন বলিল—হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ?

—আজ্ঞে হাঁ। আজ সন্ধ্যেতে দারোগা জমাদ[ার] দুজনাই আসবে আপনার খবর করতে।

জগন ডাক্তার বলিল—আর কি খবর বল্?

—নাদের সেখের বেটা কালু সেখ বাহাল হল, কি হবে[...] আনাগোনা করছে খুব। আজও এসেছিল।

—কালু সেখ তো দাগী ডাকাত!

—আজ্ঞে হ্যা। আর শিগ্‌গিরি জমিদারের না[মে] আসছে, চণ্ডীমণ্ডপে ডাক হবে গাঁয়ের লোকের। তার[পর] জমিদার আসবে একদিন।

(ক্রমশঃ)

মনের অপমৃত্যু

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি

আমার বয়স নাকি যৌবনের সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াছে; আমি এখন প্রৌঢ়।

হইবেও বা।

যে দেশে পুরুষের সমস্ত আশা-ভরসা চল্লিশের মধ্যে ফরসা হইবার সনাতন প্রথা বা রীতি আছে সে দেশে যৌবনের দেওয়া রাজটিকা পুরুষের ললাট হইতে নিশ্চিহ্ন হইবার কথাও চল্লিশের মধ্যেই, হয়ত এই দুয়ের মধ্যে কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই—না থাকুক, প্রথা—প্রথাই, রীতি—রীতিই। প্রথা, রীতি, দেশাচারের মধ্যে যুক্তি কে কবে খুঁজিয়া পাইয়াছে! চলিত প্রথা না মানিয় উপায় নাই। না মানিলেই বরঞ্চ পদে পদে ঠকিতে হয়।

আমার বয়স আমি গোপন করিতেছি না। এই স্ত্রীজনসুলভ মনোবৃত্তি বোধ হয় পুরুষের নাই। এককালে ছিল না ত জানি, তবে বর্ত্তমান যুগের কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কারণ—থাক্, কারণটা আর নাই বলিলাম। বুড়া পরশুরাম বোধ হয় বাঙ্গালী লালিমা পাল (পুং) লইয়া নিছক রসিকতাই করিয়াছেন। পুরুষেরা না হয় আজকাল একটু মেয়েলি ঢং-এ সাজিতেছে, নাচিতেছে, কথা বলিতেছে, গান করিতেছে; তাই বলিয়া কি তাহাদের প্রকৃতিও বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে?

যাক্—যে কথা বলিতেছিলাম।

জীবনের যাত্রা-পথটাকে যদি ব্রিটিশ যুগের তৈয়ারী সড়কের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে আমি চল্লিশের মাইলষ্টোন বছর তিনেক আগেই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি এবং এই হিসাবে যৌবনের নিকুঞ্জ-বন হইতে আমি চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত। অর্থাৎ এই বয়সটা যেন দস্যুর মত অতর্কিত আক্রমণে আমাকে একেবারে জীবনের যৌবন-সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া ধরণীর ধূলায় বসাইয়া দিয়াছে।

আমি প্রৌঢ়।

কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, আমার তা মনে হয় না। কেন হয় না—জানি না। আর জানিলেও নির্লজ্জের মত, নিতান্ত বেহায়ার মত মনের ভাবটা প্রকাশ করা চলে না। কারণ এখন জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে শুনি আমার বয়স হইয়াছে; স্ত্রী বলেন, পুত্রকন্যাদের সভয় সম্ভ্রমের মধ্যে তাহাদের মনের কথা উঁকি দেয়, মেয়েটা ত মাথার পাকা চুল খুঁজিতে হায়রান—আর আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরত কথাই নাই। তাহারা বারংবার এই বয়সের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া যেন খুশী হন।

কেউ কেউ বলেন—তোমার চেহারা বড় কচি কচি—দেখলে মনে হয় বয়স ত্রিশের বেশী নয়।

কথাটা হয়ত সত্য। হয় ত কেন নিশ্চয়ই। কারণ আমার স্ত্রীই আমাকে মাঝে মাঝে বলেন—তোমার আবার বর সেজে বিয়ে করতে যাওয়া চলে।

আমার চেহারার সঙ্গে বয়সের সামঞ্জস্য নাই—এ ব্যাপারটা আমার স্ত্রীর দিক দিয়া সুখের কিংবা দুঃখের, তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না। নারী চিরদিনই রহস্যময়ী—একথা আমি বিশ্বাস করি। একান্ত সান্নিধ্যে পাইয়াও নারীকে কোন পুরুষই বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। নারীর দুর্জ্ঞেয় দুর্গম রহস্যঘন অন্তরের অন্তরালে আছে বোধ হয় বনানীর নিবিড়তা আর সাগরের গভীর অতলতা—তাই নারীকে কাছে পাইয়াও তাহাকে বুঝিতে পারা যায় না।

স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, দীর্ঘ বিশ বৎসর ঘর করিয়া আমি আমার স্ত্রীকে এখনও ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই এবং ইহজীবনে আর পারিব বলিয়া ভরসাও নাই। তবে আমাকে দ্বিতীয়বার বর সাজাইবার রসিকতার মধ্যে তাহার অবচেতন মনের একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা যে মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিব না বলিয়া অবশ্য অনেক বারই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু ভারতবর্ষে ভীষ্ম নামক অতি বিখ্যাত পুরুষটি যে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিবেন না—এ সম্বন্ধে তাহার ধারণা অতিমাত্রায় দৃঢ় এবং কোনমতেই তাহার এই ধারণার ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া আমি আমার একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের জয়ধ্বজা তাহাতে প্রোথিত করিতে পারি নাই। আমার বয়সের সঙ্গে চেহারার মিল নাই, আর এই অমিলটাই স্ত্রীর ধারণাকে অতি মাত্রায় প্রভাবিত করিয়াছে বুঝিতেছি। তিনি তাহাই দেহের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বাঙ্গালী গৃহিণীর সুনাম যে পরিমাণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন—ভুঁড়ি বাড়াইয়া, মাথায় টাক উড়াইয়া, কাঁচাপাকা চুলের বাহার দিয়া, আমি সেই পরিমাণে বাঙ্গালী সংসারের কর্ত্তৃত্বের দাবীর সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিতেছি না বলিয়া গৃহিণীর মনে ক্ষোভ না থাকিলেও লজ্জার সীমা নাই। ফলে পোষণের ভার আমার হইলেও শাসনের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার তাম্বুলকরঙ্কবাহকের যোগ্যতাও যে আমার নাই, তিনি একথা আমাকে পদে পদে স্মরণ করাইয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। অর্থাৎ নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে স্ত্রীর পিছনে পিছনে হতভাগ্য স্বামী নামক জীবটিকে আর যাইতে হয় না, সিনেমা থিয়েটারের সঙ্গী আজকাল তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র, কিংবা তাহার বি-এ পড়া কনিষ্ঠভ্রাতা, কচিৎ বাড়ীর চাকরটাও এক্ষেত্রে গৃহিণীর পথপ্রদর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য হয়। আমি থাকি বাড়ী, বাড়ী পাহারা দিই, ছেলেদের দেখাশুনা করি, আর মাঝে মাঝে—যখন সিনেমায় যাইবার সময় উত্তীর্ণ হইবার ভয়ে গৃহিণী তাড়াতাড়ি চলিয়া যান, তখন তাহারই হুকুমে

আমাকে ভাতের হাঁড়ী নামাইয়া ফেন গালিয়াও রাখিতে হয়। প্রথম প্রথম ফুটন্ত ভাতসহ গরম হাঁড়ীটাকে গামলার উপর উপুড় করিয়া রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে অনেক দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু অভ্যাস এমনিই জিনিষ, এখন আর কষ্ট হয় না। অনবরত অভ্যাসে ব্যাপারটা জলের মত সহজ ও সরল হইয়া গিয়াছে।

এককালের এমন অনেক দুরূহ ও দুর্গম জিনিসই আমার কাছে ক্রমশ সহজ ও সুগম হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু জীবনের স্বাভাবিকতা যেন হারাইয়া ফেলিতেছি। আমি যাহা চাই তাহা ভাল করিয়া বলিতেও পারি না, কেহ বুঝিতেও চেষ্টা করে না।

সেদিন মধ্যাহ্নে বসিয়া এই কথাটাই বারংবার ভাবিতেছিলাম। ছুটির দিন। গৃহিণী মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া গভীর সুপ্তিতে নিমগ্না—বুকের উপর একখানা বই—বোধ হয় কোন আধুনিক উপন্যাস। জ্যেষ্ঠপুত্র খোলা ছাতে ঘুড়ি উড়াইতেছে, কনিষ্ঠ খালি দিয়াশলাইয়ের বাক্সের সাহায্যে বারান্দায় বসিয়া রেলগাড়ী নির্ম্মাণের মত অতি দুরূহ কার্য্যে নিবিষ্ট, কন্যা পুতুল খেলিতেছে।

পাশের বাড়ীতে রেডিয়ো এবং সামনের বাড়ীতে গ্রামোফন বাজিতেছে। দক্ষিণের বাড়ী হইতে এস্রাজের সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। সান্যাল মহাশয়ের বাড়ী আমার বাড়ীর ঠিক পিছনে। তাহার কন্যা নূতন গান শিখিতেছে—হারমনিয়ম-সংযোগে সে গান ধরিয়াছে—'এমন দিনে তারে বলা যায়'—

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি—দীর্ঘ রাজপথ এই প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া আছে—পথিপার্শ্বস্থ গাছগুলি—নিম, নারিকেল, আম, জাম আকাশে মাথা তুলিতে তুলিতে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, আকাশে অসংখ্য ঘুড়ি উড়িতেছে—লাল, নীল, শাদা, আবার কতগুলি বহুরূপী, আকাশে যেন ঘুড়ির অরণ্য ; এই অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ, আকাশের গায়ে গায়ে শুভ্র মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—অকূল অতল অসীম নীল সাগরের বুকে ফেনার মত।

আমি চাহিয়া থাকি। আমার মনটা এই ঘুড়ির অরণ্যে হারাইয়া যায়—মুগ্ধ দৃষ্টির আলো এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যপ্রদীপ্ত আকাশের নীল রঙের সঙ্গে কখন যে মিশিয়া গিয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই।

যাহা ভাবিতেছিলাম তাহা আর মনে নাই। পাশে বাঙ্গালা দৈনিক কাগজটা পড়িয়াছিল, তুলিয়া লইলাম। বিজ্ঞাপনের পাতাটা খোলাই ছিল। বিবাহের বিজ্ঞাপনের উপর চোখটা পড়িল—পাত্র চাই, পাত্রী সুন্দরী শিক্ষিতা, নৃত্যগীত জানে, বয়স সতর বৎসর ইত্যাদি।

নিদ্রিতা গৃহিণীর দিকে একবার চাহিলাম। তাহার পর বিজ্ঞাপনটা আবার ভাল করিয়া পড়িয়া লইলাম। শিক্ষিতা, সুন্দরী, নৃত্যগীত জানে, বয়স সতর বৎসর—

কাগজটা রাখিয়া দিই, মনটা উদাস হইয়া যায়, চোখের দৃষ্টি অলস হইয়া আসে। অনেক কথাই মনে ভিড় করিয়া আসে, বুঝিতে পারি না—অনন্তের গুঞ্জনের মত বাণীহীন অনাহূত ধ্বনিই শুধু মনে মনে ভাসিয়া বেড়ায়।

হাসিও পায়।

সর্ব্বপ্রকার দৈহিক বিলাসিতা বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু মনের এই স্বপ্ন-বিলাস? স্বপ্ন? হয় ত স্বপ্ন। কিন্তু বাকী জীবনটা কি আমাকে এই স্বপ্নের মধ্যেই বাঁচিতে হইবে?

দূরের আমগাছটার উপর একটা শীতার্ত্ত বিশীর্ণ লতা দেখিতেছি। গাছটার নীচেই একটা বৃদ্ধ ভিখারী বসিয়া আছে—গায়ে শতসহস্র তালি দেওয়া একটা জামা। জামা নামে—জামাটা আর নাই, তালির মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।

মনে মনে হাসিয়া একটা বিড়ি ধরাইব ভাবিতেছি, আমার পক্ষে বিড়ি টানাটাও এখন বিলাসিতার পর্য্যায়ে পড়িতেছে।

স্কুলেই লুকাইয়া তামাক টানিতে শিখিয়াছিলাম, কলেজে সিগারেট টানিয়াছি, কর্ম্মজীবনের প্রথম কয়েক বৎসর সিগারেটেই চালাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন বিড়িতেই নামিতে হইয়াছে, এখন বুঝিতেছি বিড়িও আমার পক্ষে বিলাসিতা। দুইটি পুত্রই স্কুলে যায়—তাহারা প্রত্যহই জল খাবারের পয়সার জন্য বায়না করে। মনে মনে ভাবি আমার বিড়ির বরাদ্দ দৈনিক দুইটা পয়সা এবার হইতে তাহাদিগকে দিয়া দিব।

কিন্তু পারি না। নেশা এমনই জিনিস।

দেশলাই হাতড়াইতে গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি, গৃহিণী নিদ্রান্তে উঠিয়া বসিয়াছেন। অঙ্গের বসন শ্লথ, মাথার কুন্তলরাজি বিস্রস্ত, নয়নে সদ্য জাগরণের অলস আভাষ। অরুণাকে এইরূপে অনেকদিন দেখি নাই। সত্যই অনেক দিন দেখি নাই। সত্যই অনেক দিন অরুণাকে ভাল করিয়া দেখি নাই, আমার জীবনে সে একটা অতি তুচ্ছ নিষ্প্রয়োজন জিনিসের মত কবে যেন একেবারেই হারাইয়া গিয়াছে। সে একদিন ছিল প্রিয়, প্রয়োজনীয়, প্রার্থনীয়, সত্য, সুন্দর—হঠাৎ কেমন করিয়া জানি না সে আজ আমার কাছে একান্তই নিরর্থক হইয়া গিয়াছে—আমার কাছে যেন আজ তাহার কানাকড়িরও মূল্য নাই।

অরুণার কাছে গিয়া বসিয়া ডাকিলাম—অরুণা!

অরুণা আমার দিকে চাহিল। এই নামে আমি তাহাকে অনেক দিন ডাকি নাই, হয় ত এই ডাকের মধ্যে আমাদের বিগত জীবনের একটা বিস্মৃত-প্রায় সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, হয় ত এই ধ্বনি-[illegible] সঙ্গে তাহার হৃদয়তন্ত্রীও হইয়াছিল অনুরণিত।

অরুণা কোমলকণ্ঠে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—কি? একটু সরে বস, ছেলেরা হয় ত এক্ষুণি আসবে।

সরিয়া বসিয়া বলিলাম—আজকে কি বার জান? কোন্ তারিখ?

আজিকার এমন দিনেই আমার সঙ্গে অরুণার বিবাহ হইয়াছিল।

অরুণা আবার সেই মৃদু হাসিয়া জবাব দিল—জানি। কেন তারিখ বার নিয়ে কি হবে?

—তুমি যদি রাজী হও, তবে বলি।

অরুণা বলিল—না শুনেই মত দিই কি করে বল? ভণিতা না করে কথাটা বলেই ফেল।

আমি এ[illegible] চাহিয়া, গলাটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া

বলিলাম—রাত্রে একটু ভাল খাবার দাবার—ধর, একটু মাংস, পোলাও, দই মিষ্টি—

থামিয়া গেলাম। কথাটা শুনিয়া গৃহিণীর মুখের প্রতিক্রিয়াটা কি রকম হয়, দেখিতে হইবে।

অরুণা হাসিয়া বলিল—কেন গো, আজ ব্যাপার কি?

মনে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া জবাব দিলাম—তুমি কি গো? একেবারেই ভুলে গেলে? আজ যে আমাদের বিয়ের দিন ও তারিখ? তারই স্মৃতি-উৎসব আজ আমরা করব। অর্থাৎ এই জয়ন্তী গোছের—

অরুণা বাধা দিয়া বলিল—থাক, অর্থাতে আর কাজ নেই, উৎসব টুৎসব আমি বুঝি না, খাও দাও, আমার আপত্তি নেই।

ছলনাময়ী নারীর চিত্ত-কথা যদি বুঝিতেই না পারি তাহা হইলে বৃথাই আমি সাইকলজি পড়িয়া পাশ করিয়াছি।

আমি বলিলাম—না-না, ঠিক উৎসব নয়, ঢাকও বাজবে না ঢোলও বাজবে না। এই ধর—আচ্ছা, আমাদের ক বছর বিয়ে হয়েছে বলতে পারো?

আমি অরুণার দিকে আর একটু সরিয়া আসিলাম। শঙ্কিতচিত্তে বাহিরে চাহিয়া দেখি জ্যেষ্ঠপুত্র আকাশে ঘুড়ির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, কনিষ্ঠের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ এখনও শেষ হয় নাই, কন্যার সাড়া শব্দ নাই, হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নতুবা এখনো পুতুলই খেলিতেছে।

অরুণা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জবাব দিল—সে কি আজকের কথা? তাহ'ল গিয়ে প্রায় বছর কুড়ি।

—তা হোক বছর কুড়ি, আমাদের ফুলশয্যার কথাটা হঠাৎ কিন্তু আজ মনে পড়ে গেল।

—ফুলশয্যার কথা? ফুলশয্যার কি কথা?

আমি হাসিয়া বলিলাম—মনে নেই? মনে করিয়ে দেব?

এবার বুঝিতে পারিয়া এবং আমাদের মিলোৎসবের প্রথম রাত্রির চিরস্মরণীয় অথচ বিস্মৃতপ্রায় কথাটা সহসা বোধ হয় স্মরণ করিয়াই অরুণা লজ্জিতকণ্ঠে বলিল—থাম, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। বুড়ো বয়সে রস যে আবার উথলে উঠছে।

অরুণা আপনার বিস্রস্তবসন যথাসম্ভব গুছাইয়া লইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

আমি অরুণার বস্ত্রাঞ্চল ফস্ করিয়া টানিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম—[illegible]। আমি এখনি বেরোচ্ছি, চাকরটাকে সঙ্গে দাও। আর [illegible] পাঠিয়ে দেব। আমি তোমার জন্য একখানা কাপড় [illegible] ফিরব।

[illegible] কন্যা ডাকিল—মা।

আমি তাড়াতাড়ি স্ত্রীর বস্ত্রাঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে সম্মতির আশায় চাহিয়া রহিলাম।

ধীরে মাথা হেলাইয়া সস্মিত সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া মা মেয়ের ডাকের জবাব দিল—কি মা?

—খেতে দেবে না?

—এখন খেতে দিব কিরে? কলে জল আসুক।

আজ আমার মনটা অতি উদার হইয়া উঠিয়াছে, খাবার চাওয়া ত দূরের কথা, আজ যদি হঠাৎ মেয়ে আমার পাঁচ টাকা দামের একটা জলি পুতুল চাহিয়া বসে তাহা হইলে পুতুলটাকে আমি এখনি কিনিয়া আনিয়া দিতে পারি।

আমি অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলাম—দাও, আজ ওদের শীগ্‌গীর খেতে দাও। সেই কখন খেয়েছে, যাও মা, পুতুলগুলো গুছিয়ে রেখে এস, এখুনি মা তোমাদের খেতে দেবেন। আর একটা খবর শুনেছ মা?

কি?

আজ যে তোমাদের নেমন্তন্ন।

অরুণা আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল—আঃ, কি ছেলেমানুষি করছ। থাম।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় বাবা?

—কেন, আমাদের বাড়ীতে, সন্ধ্যেবেলা—

মেয়ে একেবারে লাফাইয়া উঠিল এবং তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দাদাকে এবং ভাইটিকে সুসংবাদটা দিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি আলনা হইতে জামাটা গায়ে দিতে দিতে বলিলাম—আর একটা কথা।

অরুণা বলিল—আবার কি?

আমি নিম্নস্বরে হাসিয়া বলিলাম—তোমার বিছানাটাও আমার ঘরেই করো।

—সে হবে না। ছেলেরা কি মনে করবে?

আমি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—কিছুই মনে করবে না। তা ছাড়া, তারা মনে করবার সময় পাবে কখন? দশটা বাজতেই ত তারা সব ঘুমিয়ে যাবে। আমি চললুম। চাকরটাকে ডাক।

অরুণার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। খানিকক্ষণ পরে পিছনে ফিরিয়া দেখি চাকরটা একটা ধামা লইয়া আমার অনুসরণ করিতেছে।

৫

বাজার সহ চাকরটাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন আমার অখণ্ড অবসর।

প্রায় পাঁচটা বাজে, দশটার আগে বাড়ী ফিরিব না, সঙ্কল্প করিয়াছি।

বহুবাজারের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়াই দেখি চায়ের দোকানের সামনে হরিচরণ দাঁড়াইয়া। সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। ভয়ে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িলাম। আর দেখা করিয়া কাজ নাই—উহার পাল্লায় পড়িলে আজ আর বারোটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিবার ভরসা নাই।

এখনি একবার সেলুনে চুল কাটাইবার জন্য যাইতে হইবে। তাহার পর কাপড় কিনিবার জন্য দোকানে দোকানে ঘুরিতে হইবে। এক শিশি সেন্ট হইলে মন্দ হয় না। হঠাৎ মনে পড়িল, একটা ফুলের মালাও কিনিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফুল। একটা কেন, দুইটা বেশ হইবে। মনে মনে আমাদের আজিকার রাত্রির মিলনোৎসবের কথা ভাবিতে লাগিলাম। না, পথ চলিতে চলিতে কল্পনা করিতে পারা যায় না। কোথাও একটু বসিতে হইবে। আগে সেলুনের কাজটা সারিয়া আসি।

সামনেই একটা দ্বিতল বাস যাইতেছিল। উঠিয়া পড়িলাম। একেবারে ধর্ম্মতলায় নামিব এবং কাজ সারিয়া নিউ মার্কেটে যাইব। নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিয়া ফিরিবার মুখে কাপড় কিনিয়া বাড়ী গেলেই চলিবে।

আজিকার সন্ধ্যা আমার কাছে যেন নূতন, অপরূপ সন্ধ্যা—মন্থরে শহরের বুকে নামিতেছে, মাথায় তাহার তারার কিরীট, সর্ব্বাঙ্গে আলোর অলঙ্কারের ঝলমলানি, আরতির শঙ্খে ও কাঁসরের ঝঙ্কারে যেন তাঁহার চরণের নূপুর রণিয়া বাজিতেছে অভিসারের পথে পথে।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি আসিয়া হঠাৎ বাসটা থামিয়া গেল।

আমি নামিয়া পড়িলাম। কে জানে কতক্ষণ পরে ইঞ্জিন আবার ঠিক চলিবে।

সামনেই একটা সেলুন। ঢুকিয়া পড়িলাম।

ঢুকিয়াই দেখি প্রমথ বড় একটা আয়নার দিকে মুখ করিয়া চুল ছাঁটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সেও আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—বিপিন যে—পথ ভুলে নাকি?

আমি গম্ভীরভাবে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলাম—না, এখুনি একটা বিয়ের নেমন্তন্নে যেতে হবে। ক্ষৌরকার ক্লিপ ধরিয়াছে, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—কার?

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—ধরো আমারই। বিপিন আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষৌরকারকে বলিলাম—তাড়াতাড়ি করতে হবে। তুমি হাত চালাও।

আমার সামনেই একটা বড় আয়না, আয়নার দিকে সবেমাত্র মুখ ফিরাইয়াছি, এমন সময়ে প্রমথ আবার বলিল—বিপিন, ব্যাপার শুনেছ?

প্রমথর ব্যাপার শুনিবার আমার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, কারণ সে যে ব্যাপারেরই অবতারণা করে তার শেষ করিতে ঘণ্টাখানেকের কম লাগে না। ভদ্রতার খাতিরে এবং কতকটা আন্দাজে তাহার মনোগত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া জবাব দিলাম—লেকের ব্যাপার ত?

প্রমথ বলিল—হাঁ, সেখানেই আজ যাচ্ছি। যাবে আমার সঙ্গে? মহিলা মেলার দু'খানা টিকিট আছে। আজই শেষ দিন।

প্রমথ আমার সমবয়সী বন্ধু। মুখে অসম্মতি জানাইলাম কিন্তু মনে মনে হাসিলাম। আজ যদি অকস্মাৎ কলিকাতার বুকে অর্দ্ধেক পরীরাও নামিয়া আসে তাহা হইলে ভুল করিয়াও বোধ হয় আমি তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখি না।

প্রমথটা চলিয়া গেল। আমি সেলুন হইতে বাহির হইয়া দেখি—বিবাহের শোভাযাত্রা চলিয়াছে—গাড়ীর সারি, অজস্র আলোক বন্যাধারার মত রাজপথে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, বাজনার সুরে ও তালে একটা অনাহত মাধুর্য্যের ঝঙ্কার।

আমি আর দাঁড়াইলাম না। ভিড় ঠেলিয়াই নিউ মার্কেটের দিকে যাইবার জন্য ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম।

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজে। হাতে ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া, কাপড়। ট্রাম হইতে নামিয়া বাড়ীর পথ ধরিলাম। আর এক ঘণ্টা বাকী, কিন্তু দেরী করিতে পারি না। ছেলেরা বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় ত আমার জন্য অরুণা অপেক্ষা করিতেছে।

দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ থামিতে হইল। কি যেন ভুল করিয়াছি। মনে করিতে পারিতেছি না। কি ভুলিয়া আসিয়াছিলাম। কাপড়, মালা, ফুল—আর কি?

মনে পড়িল সেন্ট কিনি নাই। আবার ফিরিয়া গলির পাশের দোকান হইতে একশিশি সেন্ট কিনিয়া পুনরায় বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলাম। বুকটা দুরু দুরু কাঁপিতেছে, পা দুইটাও যেন ভারী ভারী—যতটা দ্রুত চলিবার চেষ্টা করিতেছি—ততটা যেন পারিতেছি না। নিঃশ্বাস গভীর হইয়া আসিতেছে।

বাড়ীর যতই কাছে আসিতেছি—পা দুইটা ততই অসাড় মন্থর হইয়া আসিতেছে। একটু থামিলাম।

দূর হইতে বাড়ীটা যেন নূতন নূতন দেখাইতেছে। ভুল হয় নাই ত। চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। না, ঠিকই চলিতেছি। মনে মনে হাসিয়া একেবারে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইলাম। দরজা অর্দ্ধমুক্ত। উপরে ছেলেদের কোলাহল শুনিতেছি। ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইলাম।

চাকরটা বোধ হয় দরোজার কাছেই বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই ফুল, ফুলের তোড়া, কাপড় আমার হাত হইতে লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া বলিল—বাবু, দিদি ও জামাইবাবু এইমাত্র এসেছেন।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত আমার সর্ব্বাঙ্গের গতি যেন হঠাৎ থামিয়া গেল; অসাড় অবশ দেহের চেতনাস্রোত যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি পাথরের মূর্ত্তির মত চাকরটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মুহূর্ত্ত মাত্র।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাকরটাকে বলিলাম—তুই ভিতরে গিয়ে আলো নিয়ে আয়। আমি যাচ্ছি।

চাকরটা চলিয়া গেল। আমিও তাড়াতাড়ি রাস্তায় আসিয়া পাশের ডাষ্টবিনে ফুলের তোড়া, ফুলের মালা দুইগাছি, সেন্টের শিশিটা ফেলিয়া দিয়া শুধু কাপড়খানা হাতে করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া [illegible] সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলাম।

দরবেশ শাহজালাল

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীহট্টের স্বনামধন্য দরবেশ শাহজালাল এবং তাঁহার অনুচর তিনশত ষাট আউলিয়ার কীর্ত্তিকাহিনী, নানা অলৌকিক জনপ্রবাদের সহিত মিশিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে লোকের মুখে মুখে আজিও ছড়াইয়া রহিয়াছে। শাহজালালের জীবন-চরিত্র ও কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে পারসী, উর্দ্দু ও ইংরেজীতে একাধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকে জনপ্রবাদ ও ইতিহাস মিশিয়া ঐতিহাসিক মহাপুরুষ শাহ-জালালের প্রকৃত চিত্র ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আমি সংক্ষেপে এই মহাপুরুষের প্রকৃত ইতিহাস সকলকে জানাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে শাহজালালের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া আবশ্যক।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার পুত্র ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ সহসা নদীয়া আক্রমণ করিলেন। তখন সমগ্র উত্তর ভারত মুসলমান বিজেতাগণের করতলগত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ এবং আসাম মাত্র আশঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য আক্রমণকারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্যে শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকে। মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে এইজন্য কি ব্যবস্থা ছিল, আমাদের জানা নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, সেন রাজ্যে এই শ্রেণীর ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না। ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন বহু অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ঝড়ের বেগে আসিয়া নদীয়ার উপর পতিত হইলেন; সেনরাজ ভাগীরথীর পশ্চিমস্থ পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাংশ এবং গঙ্গার উত্তরস্থ উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ মুসলমান বিজেতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া রাজ্যের পূর্ব্বাংশে সরিয়া আসিলেন। প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় মুসলমান রাজ্য আর ইহার বেশী বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আরও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ কাল রাজত্ব করিয়া সেন বংশের পতন হইলে দশরথ দেব নামক একজন রাজা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব লাভ করেন। ইঁহার উপাধি ছিল অরিরাজ দনুজমাধব। লোকে সংক্ষেপে ইঁহাকে বলিত দনুজ রায়। ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। এই বৎসর দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের বিদ্রোহী সুলতানকে দমন করিতে আসিয়া দনুজ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ ও সন্ধি করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য আরও কয়েক বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বল্‌বন্ লক্ষ্মণাবতীতে নিজের পুত্র নসিরুদ্দিনকে সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। নসিরুদ্দিন নিজে শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র কৈকায়ুস্ শাহ এবং ফিরোজশাহের আমলে মুসলমান সুলতানগণ বঙ্গের অবশিষ্টাংশ জয়ে মনোযোগী হইলেন। প্রথমেই পশ্চিম বঙ্গের অবশিষ্টাংশ বিজিত হইল। তাহার পরে পূর্ব্ববঙ্গ বিজিত হইল। ইহার পরেই শ্রীহট্টবিজয়ের চেষ্টা আরব্ধ হইল।

এই সময় শ্রীহট্টে কোন প্রবল রাজা ছিলেন না। তবে বিনা বাধায় মুসলমানগণ শ্রীহট্ট অধিকার করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র শ্রীহট্ট রাজ্যের বীর রাজা গৌড়গোবিন্দ প্রাণপণে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

৭০১ হিজরি অর্থাৎ ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান নসিরুদ্দিনের পুত্র ফিরোজ শাহ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্বেই ভ্রাতা কৈকায়ুসের রাজত্বকালে ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম অঞ্চল বিজিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পরেই কৈকায়ুসের রাজত্ব কালেই পূর্ব্ববঙ্গও বিজিত হয়। ফিরোজশাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যের সীমানা পূর্ব্বদিকে আরও প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেনাপতি সেকান্দর খাঁ গাজীকে শ্রীহট্ট আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। সেকান্দর খাঁ গুরুতররূপে পরাজিত হইয়া সোনার গাঁ ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গালার সুলতান পুনঃপুনঃ সেকান্দর খাঁ গাজীকে শ্রীহট্ট আক্রমণে প্রেরণ করিলেন। পুনঃপুনঃ সেকান্দর খাঁ পরাজিত হইলেন। এই সঙ্কটকালে দরবেশ শাহজালাল তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৬০ জন অনুচর সহ সেকান্দর খাঁ গাজীর সহায় হইলেন।

শাহজালালের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। শ্রীহট্টের শাহজালাল দরগার কোন শিলা-লিপিতে তাঁহাকে "কুম্যা" নামক স্থানের দরবেশ বলা হইয়াছে। তাঁহার জনপ্রবাদমূলক যে কয়খানি জীবনচরিত আছে তাহাতে তাঁহাকে আরব দেশের ইয়েমেন প্রদেশের অধিবাসী বলা হইয়াছে। প্রথম যৌবনেই তিনি নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে গুরুর আদেশে * তিনি হিন্দুস্থানকেই নিজের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্থির করিয়া সেই দেশের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। পরবর্ত্তীকালে আফ্রিকা-দেশীয় ভ্রমণকারী ইব্‌নে বতুতার নিকট তিনি বলিয়াছিলেন যে মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী হোলাগু যখন বোগদাদ অধিকার করিয়া খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাকে লগুড়াঘাতে বধ করেন তখন দরবেশ শাহজালাল বোগদাদে ছিলেন। এই ঘটনা ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ৬৫৬ হিজরিতে সংঘটিত হয়। এই সময় শাহজালালের প্রথম জীবন অর্থাৎ তাঁহার বয়স ২৫ হইতে ত্রিশের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই হিসাবে তিনি ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

হিন্দুস্থানের পথে এক রাজা বিষযুক্ত সরবৎ প্রদান করিয়া শাহজালালের যোগবল পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ফলে তিনি নিজেই নিহত হ'ন এবং তাঁহার পুত্র শিষ্য হইয়া শাহজালালের অনুসরণ করেন।

শাহজালাল হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিল্লীতে এই সময় নিজামুদ্দিন আউলিয়া নামক একজন বিখ্যাত সাধু ছিলেন। একজন মহাপুরুষের আগমন জানিতে পারিয়া নিজামুদ্দিন নিজের শিষ্যগণকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। কথিত আছে দরবেশ শাহজালাল বস্ত্রখণ্ডে জ্বলন্ত অঙ্গার বাঁধিয়া নিজামুদ্দিনের নিকট প্রেরণ করেন। নিজামুদ্দিন মহা-সমাদরে দরবেশ শাহজালালকে গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গে আনন্দে দুই মহাপুরুষের দিন কাটিতে লাগিল। নিজামুদ্দিন এক জোড়া ধূসর বর্ণের কবুতর শাহজালালকে উপহার প্রদান করিলেন। শাহজালাল আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ এই কবুতর যুগল এবং তাহাদের বাচ্চা-গুলিকে চিরজীবন সমাদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি শ্রীহট্টের শাহজালাল দরগায় অসংখ্য জালালী কবুতর বাস করে। দরগার খাদিমগণ সযত্নে এই জালালী কবুতরগুলিকে পালন করেন। এই জালালী কবুতরের বংশধরে পূর্ব্ববঙ্গ ছাইয়া গিয়াছে। এই কবুতর কেহ মারে না, মারা মহাপাপ বলিয়া মনে করে। পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের বিশ্বাস, যদি কাহারও বাড়ীতে জালালী কবুতর আসিয়া বাসা বাঁধে, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার সমৃদ্ধির দিন আসিতেছে। আর লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলে কাহারও বাড়ীতে জালালী কবুতরের বাসা থাকিলেও সহসা নাকি তাহারা বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। এই বিশ্বাস হিন্দু মুসলমান জনগণের মধ্যে অদ্যাপি সমান প্রবল। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার এই বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

কিন্তু দিল্লীতেও গুরু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থানের সন্ধান না পাইয়া শাহজালাল ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যখন বাঙ্গালা দেশে আসিয়া পৌছিলেন, তখন বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বল্বনের পৌত্র সুলতান ফিরোজশাহ বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিতেছেন। এই সময় শাহজালালের সহিত তাঁহার অনুরক্ত ৩৬০ শিষ্য বা আউলিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম অঞ্চল এবং পূর্ব্ববঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা কৈকায়ুসের আমলে বিজিত হইয়াছে। জাফর খাঁ গাজী ত্রিবেণী জয় করিয়া তথায় মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে ইঁহার নাম রাখিয়াছিল দরাফ খাঁ। এই মহাত্মা নিজের ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রতিও যে তাঁহার আশ্চর্য্য রকমের উদার মনোভাব ছিল, দরাফ খাঁ রচিত বিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্র পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। দলাদলি রেষারেষির সীমানা অতি অল্প দূর পর্য্যন্ত। তাহার একটু উপরে উঠিয়া যাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ—তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্ত

* কথিত আছে, রওনা হইবার আগে গুরু তাঁহাকে এক মুষ্টি মাটি দিয়া বলেন, হিন্দুস্থানের যে স্থানে এই বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধের মাটি পাইবেন, তাহাই তাঁহার নিজস্ব কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া জানিবেন। তিনি ক্রমশঃ শ্রীহট্টে আসিয়া ঐ প্রকার মাটির সন্ধান পাইলেন, তাই শ্রীহট্টকেই জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্থির করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

সমান বলিয়াই অনুভূত হয়। নচেৎ জাফর খাঁ লিখিতে পারিতেন না।

> সুরধুনী মুনিকন্তে, তারয়ে পুণ্যবন্তং
> স তরতি নিজপুণ্যৈঃ তত্র কিংতে মহত্বং।
> যদি তু গতিবিহীনং তারয়ে পাপিনং মাং
> তন্মহত্বং মহত্বং॥

মালিনী ছন্দে রচিত এই সরল সুললিত গঙ্গাস্তোত্র অদ্যাপি গঙ্গাতীরে সহস্র ভক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

জাফর খাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া শাহজালাল যখন ত্রিবেণীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এই সময় শ্রীহট্টে অশান্তি উপস্থিত হয়। কথিত আছে শ্রীহট্টের স্বাধীন হিন্দু রাজা গৌরগোবিন্দের রাজ্যে এই সময় দুই চারিজন মুসলমান প্রজা বাস করিত। তাহাদের একজনের নাম ছিল বুরহানুদ্দিন। গৌরগোবিন্দ এই বুরহানুদ্দিনের উপর কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যাচার করিলে বুরহানুদ্দিন আসিয়া বাঙ্গালার সুলতান ফিরোজশাহের নিকট নালিশ করিলেন। ফিরোজশাহ সেকান্দর খাঁ গাজী নামক সেনাপতিকে শ্রীহট্ট জয় করিতে পাঠাইলেন। গৌরগোবিন্দ অসংখ্য হাউই বা অগ্নিবাণ ছুড়িয়া মুসলমান সেনার মধ্যে এমন ভয় ধরাইয়া দিলেন যে সেকান্দর খাঁ গাজী সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ফিরিলেন। কথিত আছে, গৌড়গোবিন্দ সেকান্দর খাঁ গাজীকে এইরূপ তিনবার পরাজিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে সেকান্দর খাঁ গাজী শাহজালাল ও তাঁহার অনুচরগণের সাহায্য লাভ করেন।

বুরহানুদ্দিন যখন সেকান্দর খাঁ গাজীর পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের খবর লইয়া ফিরোজশাহের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি নসিরুদ্দিন শিপাহ-সলার নামক এক ধর্ম্মপ্রাণ সেনাপতিকে সেকান্দর খাঁর সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। শাহজালাল দরবেশ ত্রিবেণীতে অনুচরগণ সহ উপস্থিত আছেন জানিয়া বুরহানুদ্দিন ও নসিরুদ্দিন শিপাহ-শালার এই মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে ত্রিবেণী গমন করিলেন। শাহজালাল শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সানুচর তিনি এই অভিযানে যোগদান করিলেন।

জনপ্রবাদ এই মিলিত অভিযানের নায়কস্বরূপ সেকান্দর খাঁ গাজী বুরহানুদ্দিন, নাসিরুদ্দিন, সিপাহ্-সলার এবং দরবেশ শাহজালাল, এই চারিজন কৃতী পুরুষের নামই অদ্যাপি জাগরূক রাখিয়াছে। সমসাময়িক আফ্রিকা মহাদেশজ ভ্রমণকারী ইব্‌নে বতুতা এই ঘটনার প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর পরে শাহজালালকে দেখিতে শ্রীহট্টে গমন করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে শ্রীহট্টের জনসমূহ শাহজালালের দীক্ষাতেই ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। শাহজালাল দরগায় প্রাপ্ত এই ঘটনার দুই শত বৎসরের পরবর্ত্তী একখানা শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে ৭০৩ হিজরি অর্থাৎ ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সেকান্দর খাঁ গাজীর হস্তে শ্রীহট্ট প্রথম মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। শ্রীহট্টের অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশ শাহজালালের ৩৬০ অনুচরের কোন না কোন অনুচরকে বংশের আদি পুরুষ বলিয়া দাবী করেন। কাজেই এই অভিযানের ঐতিহাসিকতা এবং সময় সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এই অভিযানের কাহিনীর সহিত অনেক অলৌকিক গল্প জড়াইয়া আছে। কোন অলৌকিকের আশ্রয় না লইয়াও বুঝা যায়, এই সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিচালিত অভিযানের ফলে গৌড়গোবিন্দ পরাজিত হইলেন এবং কাছাড় চলিয়া গেলেন; শ্রীহট্টে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং মহাপুরুষ শাহজালালও শ্রীহট্টকেই নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্থির করিয়া সানুচর তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে এই সময় শাহজালালের বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

শাহজালাল সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ একমাত্র ইব্‌নে-বতুতার ভ্রমণকাহিনী হইতেই অবগত হওয়া যায়। ইব্‌নে-বতুতা ভারতসম্রাট মুহম্মদ তুঘলকের দূতস্বরূপ জাহাজে চড়িয়া চীন দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে শাহজালালকে দেখিতে চট্টগ্রামে জাহাজ হইতে নামেন। পূর্ব্ববঙ্গ তখন সুলতান ফখরুদ্দিনের নায়কতায় স্বাধীন অর্থাৎ মুহম্মদ তুঘলকের অধীনতা স্বীকার করিত না। ইব্‌নে-বতুতা তাই এই বিদ্রোহী সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সোজা শ্রীহট্ট অভিমুখে স্থলপথে রওনা হইলেন।

ইবনে-বতুতা শীঘ্রই শাহজালালের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। চট্টগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট প্রায় ২২৫ মাইল দূরে। ১৫ মাইল করিয়া দিনে

অগ্রসর হইলে ১৫ দিনে পৌঁছাইবার কথা। শ্রীহট্ট পৌঁছিতে যখন আর দুই দিন বাকী আছে, তখন ইব্‌নে-বতুতা দেখিলেন—শাহজালালের চারি জন শিষ্য তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন। শাহজালাল তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন, পশ্চিম দেশ হইতে একজন ভ্রমণকারী আসিতেছেন, তাহাকে যাইয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস। ইব্‌নে বতুতা লিখিয়াছেন—"আমি ইঁহাদের সহিত সেখকে দেখিতে রওনা হইলাম। একটি গুহার বাহিরে তাঁহার আশ্রম, তথায় উপনীত হইলাম। তাঁহার আশ্রমের নিকট অন্য কোন বাড়ী ঘর নাই, কিন্তু চারিদিকের বহু হিন্দু মুসলমান সেখকে দেখিতে আসিত এবং খাদ্যদ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিত। আশ্রমের ফকীরগণের ও অতিথিগণের তাহাতেই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সেখের নিজের সম্পত্তির মধ্যে ছিল শুধু একটি গাই। প্রত্যেক দশ দিন উপবাসের পরে এই গাইয়ের দুধে তিনি উপবাস ভঙ্গ করিতেন। এই সময় তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৃশ এবং লম্বা ছিলেন, মুখে গোঁফ দাড়ী অল্পই ছিল। সারা রাত্রি তিনি দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিতেন। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি দশাহ উপবাসব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের প্রধান সাধুগণের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা হয়।"

"আমি সম্মুখে যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমার দেশ ও ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উত্তর দিলাম। বিদায়ের দিন সেখের পরিধানে একটি শালের চাপকান ছিল। আমি মনে মনে বলিতেছিলাম, 'সেখ যদি পোষাকটি আমাকে দেন, তবে ভারী খুসী হই।' সেখ নিজে একটি সাততালি দেওয়া পোষাক পরিয়া শালের চাপকানটি সত্যই আমাকে দিলেন। বাহিরে আসিলে পরে তাহার শিষ্যেরা আমাকে বলিল—সেখ বলিয়াছেন, আমি এই পোষাকটি চাহিব, তিনিও দিবেন। কিন্তু পোষাকটি প্রকৃতপক্ষে সেখের দোস্ত চীন দেশে ইসলামপ্রচারকারী বুরহামুদ্দিন সাগরজির জন্য তৈরী। যথাসময়ে তাঁহার হাতেই ইহা পৌঁছিবে। কারণ চীনে পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় এক রাজা আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবে এবং সাগরজীকে নিয়া উপহার দিবে। আমি শেখের শিষ্যগণকে বলিলাম, সেখের আশীর্ব্বাদ-পবিত্র এই পোষাক আমি কাহাকেও দিব না, তিনি রাজাই হউন, আর যে-ই হউন।"

"অনেক দিন পরে যখন আমি চীনে উপস্থিত হইলাম, খান্‌সার রাজা কৌশলে পোষাকটি আমার নিকট হইতে লইলেন। পর বৎসর পিকিনে যাইয়া বুরহামুদ্দিন সাগরজীর সহিত দেখা করিতে গেলে দেখি, তিনি সেই পোষাক পরিয়া বসিয়া পুস্তক পড়িতেছেন। আমি পোষাকটি বিস্ময়ের সহিত বারে বারে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বারে বারে কি দেখিতেছ, পোষাকটি চিন নাকি?' আমি সমস্ত কথা বলিলে তিনি বলিলেন, 'দোস্ত জালালুদ্দিন (শাহজালাল) পোষাকটি আমার জন্য তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে আমার হাতে পৌঁছিল তাহাও লিখিয়া জানাইয়াছেন।' এই বলিয়া তিনি শাহজালালের পত্র খুলিয়া দেখাইলেন। পত্র পড়িয়া শাহজালালের অলৌকিক ক্ষমতার আর এক নিদর্শন পাইয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।"

সাগরজীর নিকটই ইব্‌নে বতুতা শুনিতে পান, শাহজালাল দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরে ইব্‌নে-বতুতা এই মহাপুরুষের দেহরক্ষার বিশেষ বিবরণ তাঁহার শিষ্যগণের নিকট অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন শিষ্যগণকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, কাল আমি বিদায় লইব। ভগবানে বিশ্বাস রাখিও, এখন হইতে তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। পরের দিন দুপুরের নমাজে যখন তিনি নমস্কার করিয়া নতজানু নতমস্তক হইলেন, অমনি ভগবান তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন। ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মহাপ্রস্থান ঘটিয়া থাকিলে এই সময় তাঁহার বয়স ১১৯ বৎসর হইয়াছিল।



ভারতীয় নৃত্যের ক্রমপরিণতি

নৃত্যবিদ্ শ্রীমণি বর্দ্ধন

নৃত্যচর্চ্চা আদিম যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। নৃত্য ছিল তখন অন্তরের আনন্দের অভিব্যঞ্জনা। কেহ নৃত্য করিয়াছে দলপতির গৃহে—কেহ বা রুষ্ট দেবতার তুষ্টিসাধনের জন্য। কালক্রমে দেশকালপাত্রভেদে আদিম মানবের রীতি-বিধিবর্জ্জিত এই নৃত্যেই আসিল বিভেদ—বৈচিত্র্য। দেশকালপাত্রভেদে রুচি ও সৌন্দর্য্য-ভেদে বৈষম্য ঘটে, কাজেই বিকাশধারায়ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। মানুষ আনন্দে রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, মানবের আত্মপ্রকাশ তাহার শিল্পেই। যেহেতু শিল্পীমন দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কারের অধীন, সেজন্যই তাহার রূপ-সৃষ্টিতেও তদ্দেশীয় ধর্ম্মসংস্কার ও প্রথার ছাপ থাকিবেই এবং নিয়ন্ত্রিতও হইবে। ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে জাপানী নৃত্যের জাপানী নৃত্যের সঙ্গে যবদ্বীপ ও



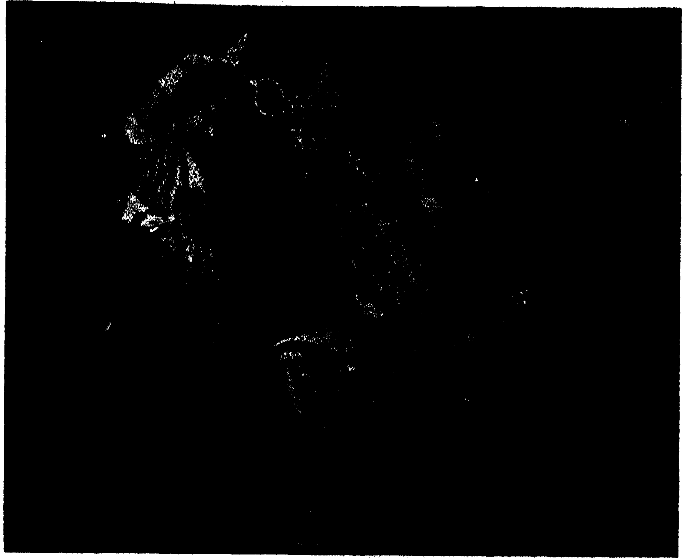
নৃত্যবিদ্—মণি বর্দ্ধন

বলিদ্বীপের নৃত্যের, প্রাচ্য নৃত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য নৃত্যের সেজন্যই বৈসাদৃশ্য যথেষ্ট। তাহার কারণ—দেশকালধর্ম্ম-সংস্কারের বিভিন্নতা। আবার এক ভারতেই নানা প্রদেশে সৃষ্টি হইয়াছে নানা পদ্ধতির নৃত্য—মালাবারের কথাকলি, তাঞ্জোর ও মাদুরা অঞ্চলের ভারতীয় নাট্যম্ বা দক্ষিণী নৃত্য, উত্তর ভারতের কথক নৃত্য এবং মণিপুরের রাসনৃত্য, গোষ্ঠনৃত্য—থাংহায়বা (অসিনৃত্য) এবং জাতীয় নৃত্য লায়হরাওবা দেবপ্রীতির জন্য মৈরাং অঞ্চলে থাংজিং (দেবতার সম্মুখে যে নৃত্য হয়)। যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন আসে শিল্পজগতেও এবং পরিবর্ত্তনেই থাকে শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা। পূর্ব্ব রীতি-প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কোন শিল্পেরই অগ্রগতি অসম্ভব। শিল্পীকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জাতির স্বাজাত্য তাহার স্বকীয়তায়;—সেই স্বকীয়তার বিনাশ—জাতিরই বিনাশ। ধরাপৃষ্ঠ হইতে বহু জাতি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নাই। যেটুকু সন্ধান পাই তাহা তাহাদের শিল্পকলা হইতেই—তাহাদের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য হইতেই। আবার গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া চলাও বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা হইলে নূতন সৃষ্টির আশা কোথায়? তাই প্রাচীনকে ভিত্তি করিয়া যুগোপযোগী চিন্তাধারা ও রূপরসবোধের সঙ্গে মিল রাখিয়া রূপসৃষ্টি শিল্পীর কর্ত্তব্য। আর ভারতে অন্তত ললিতকলা ক্ষেত্রে প্রাচীনের আমূল পরিবর্ত্তনের কোন প্রশ্ন জাগাই উচিত নয়—কারণ, প্রাচীন ভারত নৃত্যক্ষেত্রে যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল—আধুনিক ভারতকে সেই পর্য্যায়ে পৌঁছিতে সুদীর্ঘকাল সাধনার প্রয়োজন। ভারতের নৃত্যবিষয়ক কোন প্রকার গবেষণার অভাবে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না এবং লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে—যে ভারতের নৃত্যকলা শত শত বৎসর পূর্ব্বেই চরম বিকাশ লাভ করিয়া ললিতকলা ক্ষেত্রে অতুলনীয় হইয়াছিল যে ভারতের ধর্ম্মজীবন সামাজিকজীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল নৃত্য—সেই ভারতের অধিবাসী আমাদের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধায় ভারতের সেই নৃত্য আজ লুপ্তপ্রায়। চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে নৃত্য প্রাচীন ভারতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং নৃত্যচর্চ্চা যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই—এমন কি, রাজান্তঃপুরে রাজকন্যাদের মধ্যেও চলিত ছিল, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

অধুনা নৃত্যে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে—আশার কথা। ভারতের সেই লুপ্তকলা পুনরায় স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হউক—ইহাই কাম্য। কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্যের গবেষণা ও চর্চ্চা ব্যতীত প্রাচীন ভারতের নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া শক্ত। প্রাচীন নৃত্য-বিষয়ক পুস্তকের বিধি-বিধান হইতে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে অনুমান করা ভিন্ন বর্ত্তমানে আর কোন উপায় নাই। বংশ-পরম্পরায়ও ভারতে শাস্ত্রীয় নৃত্যরীতি-পদ্ধতির চর্চ্চা ও প্রথা রক্ষিত হইয়া আসে নাই এবং পুস্তক পড়িয়া বা নৃত্য দেখিয়া শিখিবার মত সঙ্গীতের স্বরলিপির ন্যায় নৃত্যের স্বরলিপি বা গতিলিপির কোন প্রতিলিপি নাই। কিন্তু এদিকে আমাদের নৃত্যবিদ্ সাজিবার লোভ আছে—অথচ আয়াসে আমরা বিমুখ। কাজেই প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্র হইতে দুই-চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া—অনুবাদ করিয়া নৃত্যবিদ্ কিংবা নৃত্যরসিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করা ভিন্ন আমরা আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। কালেভদ্রে দুই-চারিটি প্রবন্ধের দর্শন মাসিকের পৃষ্ঠায় যদিও মিলে—কিন্তু নৃত্যের রূপরীতির কোনও

অভিনবত্ব থাকে না—পুরাতনের পুনরাবৃত্তি—সেই মামুলী প্রাণহীন অনুবাদ! ইহাদের সার্থকতা কতদূর? জনসমাজে নৃত্যবিদ্‌রূপে নাম করা যায় সত্য, কিন্তু দেশের পক্ষে, শিল্পের পক্ষে বিন্দুমাত্র উপকার তাহাতে হয় না। ফলে আমরা যে তিমিরে—সে তিমিরেই।

নৃত্যবিষয়ক প্রাচীন ভারতের যে কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, নাট্যশাস্ত্রই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহার রচনাকাল কোন কোন পণ্ডিতের মতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকে। কেহ কেহ আবার নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল পাণিনির পরবর্ত্তী যুগের বলিয়া মনে করেন—কাহারও কাহারও মতে আবার নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল পৌরাণিক যুগের অব্যবহিত পরেই। —নানা মুনির নানা মত! যাহা হউক, প্রাচীন ভারতে নৃত্য-সম্প্রদায় যে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—ভরত-সম্প্রদায় এবং নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায়—একথা স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর জনপ্রিয় ছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।



অজন্তা নট নৃত্যে—রবীন বর্দ্ধন

উভয় সম্প্রদায়ের বিধি-বিধানের বিভিন্নতাহেতু—এই দুই সম্প্রদায় বিভিন্ন যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিংবা ইহাও হইতে পারে যে পাত্রভেদে দেশভেদে এ বিভিন্নতা আসিয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের নাম এবং ভরতের নাম অভিনয় দর্পণের স্থলে স্থলে (অভিনয় দর্পণ, শ্লোক ৫৯, ১৭৫, ১৯১, ২৬৫) উল্লিখিত দেখিয়া স্বতঃই এ ধারণা মনে জাগে—নন্দিকেশ্বর-কৃত "অভিনয় দর্পণ" পরবর্ত্তী যুগের এবং ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। নাট্যশাস্ত্রে এবং অভিনয়-দর্পণে নৃত্য-রূপরীতির এত সূক্ষ্ম যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ ও বিধি-বিধানাদি দেখিয়া মনে হয়, এসকল গ্রন্থ রচনার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে শাস্ত্রোক্ত নৃত্যচর্চ্চা চলিয়া আসিতেছিল। দীর্ঘ সাধনা ব্যতিরেকে এতদূর উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সময়ের রচিত এ নৃত্য-ব্যাকরণ হইতেই ভারতের নৃত্যচর্চ্চার প্রারম্ভকাল যে কত প্রাচীন তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।



শিব নৃত্যে—মণি বর্দ্ধন

ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্য আজ লুপ্তপ্রায়। ভিন্ন রসবোধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পদ্ধতির নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে—কেরলের "কথাকলি" —মাদুরা ও তাঞ্জোর অঞ্চলের "ভারতীয় নাট্যম্" ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন পদ্ধতির সঙ্গে কোন পদ্ধতির সামঞ্জস্য নাই। "কথাকলি" নৃত্য অভিনয়প্রধান—অভিনয়ে নব রসের অভিব্যঞ্জনা আবশ্যক। অভিনয়ের প্রাধান্য হেতু—অভিনয়ের সুবিধার্থে "কথাকলি" নৃত্য-মুদ্রাবহুল। কিন্তু অঙ্গহার, করণ, পাদকর্ম্মের অভাব বুলিয়া "কথাকলি" নৃত্য একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট। এ নৃত্যে পূর্ব্বে নৃত্যের বিষয়বস্তু শ্লোকে

গীত হয়—নৃত্যকার তাহা মুদ্রা, অঙ্গ, উপাঙ্গ কর্ম্মে অভিনয়ে প্রকাশ করেন। কিন্তু অত্যাবশ্যক আহার্য্যাভিনয়, পোষাক পরিচ্ছদ হেতু



রূপকুমার নৃত্যে—মণি বর্দ্ধন

অভিনীয়মান নর্ত্তকের ভাব সম্পূর্ণরূপে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং মুদ্রার প্রতি শিল্পীর দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ায়—নৃত্যের ভাব প্রকাশ মুদ্রা-অনভিজ্ঞের নিকট অর্থহীন—অপরিস্ফুট। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রচলিত নৃত্যের মধ্যে "কথাকলি" নৃত্যেই মুদ্রার প্রয়োগ অধিকতর। তবে নাট্যশাস্ত্রোক্ত কিংবা অভিনয়-দর্পণোক্ত মুদ্রাব্যঞ্জনার সঙ্গে "কথাকলি" অভিনয়ের ব্যবহৃত মুদ্রার পার্থক্য যথেষ্ট আছে অনেক স্থলেই। কিন্তু একথাও সত্য, ভারতের নৃত্য-সম্পদের অনেকটা কথাকলি নৃত্যে প্রাচীন কাল হইতেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা অভিনয়-প্রিয় বলিয়া নৃত্য ও নৃত্যরীতি সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান হইতে পারেন নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নৃত্যরীতি-পদ্ধতি অধিকাংশই ভারতীয় নাট্যমে অদ্যাবধি সংরক্ষিত। এই নৃত্যপদ্ধতি ভিত্তি করিয়াই ভারতের দেবদাসীগণ (তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি অঞ্চলে) দেব-সান্নিধ্যে নৃত্য করিত এবং অদ্যাবধিও দেবদাসীগণের নৃত্যে ভরতোক্ত শাস্ত্রীয় বহু নৃত্যকর্ম্মেরই সন্ধান পাওয়া যায়। করণ, অঙ্গহার, ভ্রমরী, চারী, মণ্ডল, উৎপ্লাবন প্রভৃতি দেহভঙ্গী দ্বারা নৃত্যশিল্পীকে দেহরেখায় তাহার মনের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবহাওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেশে "ভারতীয় নাট্যম"-এর সৃষ্টি; সেজন্যই বীর রৌদ্র প্রভৃতি রসই "ভারতীয় নাট্যমে" প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কথাকলি নৃত্যের মত এ নৃত্যে আহার্য্য অভিনয়ের অযথা আড়ম্বরে রসধারা ব্যাহত হয় না। শাস্ত্রে আছে—ভারতীয় নাট্যম-এর প্রবর্ত্তক দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং—কিন্তু এসকল তথ্য হয়ত (প্রবাদ) ভিত্তিহীন—তবে ইহার জন্মকাল যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। "ভারতীয় নাট্যম" হইতেই কালক্রমে অভিনয়কে প্রধান করিয়া "কথাকলি" নৃত্যের রূপান্তর-প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

মোগল যুগে উত্তর ভারতে "কথক" নৃত্যের সৃষ্টিকাল। "কথক"-শিল্পীগণ যদিও বলেন, মহাদেব কর্ত্তৃক নৃত্য মর্ত্ত্যে প্রচলিত হইবার পর হইতেই যে সকল শিল্পী বংশ-পরম্পরায় এ নৃত্যচর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন—তাঁহাদের নামই "কথকনৃত্যশিল্পী" এবং তাঁহাদের নৃত্যপদ্ধতিই "কথক"। ইহার সম্ভাব্যতা কতদূর? প্রাচীন ভারতের নৃত্যশাস্ত্রে নৃত্যের যে রূপ দেখিতে পাই তাহার সহিত কথক নৃত্যের কোনও সঙ্গতি নাই। এমন কি প্রাচীন কোন গ্রন্থেই "কথক" নৃত্যের বিশেষ পদ্ধতির ও রীতির কোন উল্লেখই নাই। এমন কি, আমাদের মনে হয় কথক নৃত্য সম্পূর্ণ ভারতীয়ও নহে—পারস্য ও আরবের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরও



অজন্তা নৃত্যে—মণি বর্দ্ধন

সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে কথক নৃত্যে। আকবরের রাজত্বকালকে কেহ কেহ কথকের সৃষ্টিকাল বলিয়া অনুমান করেন। প্রথমে ইহার সৃষ্টি হয়

দরবারি নৃত্যরূপে—সঙ্গীতজ্ঞ গুণিগণের আসরেই তখন কথক নৃত্যের প্রচলন ছিল—সেজন্যই "কথক" নৃত্য ছন্দ তাল লয়ের এত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। "কথকে"র ছন্দে, তালে, লয়ের এ কারুতা গুণিগণের নিকট যতদূর সমাদর লাভে সক্ষম—অনভিজ্ঞের নিকট ততদূর প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। ছন্দে লয়ে কথক সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু পাদকর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের দিকেই কথকশিল্পীর দৃষ্টি কেবল নিবদ্ধ থাকায় কথকশিল্পীগণ অন্যান্য অঙ্গ উপাঙ্গ দেহকর্ম্মের বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে নাই। "কথকে" সেজন্যই দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্য কম এবং নৃত্যের বিষয়বস্তুর রূপ-প্রকাশে দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্যের অভাবে একঘেয়েমি ও অবসাদ আসে। 'গৎ' ও ভাও বাৎলান বলিয়া "কথকে" যে অংশটি আছে অনেকে সেখানে বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনার সহায়তায় বৈচিত্র্য আনিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু কথক নৃত্যে মূল 'ত্রিভঙ্গ' দেহভঙ্গীতে যত ভাবের ব্যঞ্জনাই সুপরিস্ফুট হউক না কেন "ঘরয়ানার" বিশেষ রীতিতে আবদ্ধ ও অনুশাসিত বলিয়া দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্যের অভাবে অবসাদ আসিবেই। কোন কোন কথকশিল্পী কথকের 'মানেদার' বোলের গর্ব্বে গর্ব্বিত, অর্থাৎ তাহাদের নৃত্যে তাহারা বলেন এমনও বোল আছে যাহার নিজেরই ভাব আছে—অর্থ আছে; অন্য কোন প্রাদেশিক নৃত্যেই তেমন নৃত্যবোল নাই—তাঁহারা বলেন। কিন্তু 'মানেদার বোলের' ভাব দেহরেখায় সম্পূর্ণ প্রকাশের অভাবে—এই মানেদারিত্বের দাম কি? কথকনৃত্য প্রধানত শৃঙ্গার রসাত্মক—শিল্পী অন্যান্য রসের অভিব্যঞ্জনার জন্য সচেষ্ট বটে—কিন্তু আদর্শ ততটা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তাছাড়া, শাস্ত্রীয় করণ, অঙ্গহার, মণ্ডল, চারী ইত্যাদির বৈচিত্র্যও নাই। তবে পাদকর্ম্ম, তাল লয় ছন্দে যে কথকনৃত্য অপূর্ব্ব ইহা স্বীকার্য্য।

মণিপুরী নৃত্য বলিতেই আমরা বুঝি ভক্তিশান্তরস-প্রধান মণিপুরের নৃত্য। কিন্তু ভক্তি ও শান্ত রসাত্মক নৃত্য ব্যতীতও মণিপুরে বীর রৌদ্র রসমূলক নৃত্যও আছে—থাংহায়বা (অসিনৃত্য) "তাখোসাবা" (শূলনৃত্য) ওলায়হরাওবণ নৃত্য। পূর্ব্বে মণিপুর যখন শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ছিল—তখন মণিপুরে এ সকল বীর রৌদ্র রসাত্মক নৃত্যের চর্চ্চা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান মণিপুর বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। আজকাল শান্তিপ্রিয় অহিংস ধর্ম্মের শিল্পী ভক্তি ও শান্ত রসাত্মক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক "রাস" নৃত্যে যতদূর আত্মপ্রসাদ লাভ করে—প্রাচীন বীর রসের নৃত্যে ততটা করে না। সেজন্যই "তাখোসাবা", "থাঙ্হায়বা" নৃত্যের স্থান আজ "রাস", গোষ্ঠ" প্রভৃতি নৃত্য অধিকার করিয়া আছে। মণিপুরে এখন প্রধান নৃত্য রাস; ছয় ঋতুতে ছয় রাসের যদিও বিধান আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে মহারাস, কুঞ্জরাস ও বসন্তরাসেরই প্রচলন দেখা যায়। বিভিন্ন ঋতুতে ইহাদের অনুষ্ঠানের প্রথা। এতদ্ব্যতীত নিত্যরাস বৎসরের যে-কোন সময়েই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। দেবতার সম্মুখে মণিপুরে নৃত্যের প্রচলন। ভক্তিনম্র সাধক-শিল্পীর অনাবিল শান্ত চিত্তের বহিঃপ্রকাশই তাহার নৃত্যে। মণিপুরী শিল্পীর দৃষ্টি কোন এক বিশেষ অঙ্গেই আবদ্ধ রহে নাই—সকল অঙ্গ উপাঙ্গ সম্বন্ধেই সচেতন। তবে মণিপুরী নৃত্যে মুদ্রা প্রচলন অতি অল্প এবং বাইজীসুলভ ভ্রূ, অক্ষিপুট প্রভৃতি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'ভারতীয় নাট্যম্' নৃত্যের পদ্ধতিতে অদ্যাবধি বহু শাস্ত্রোক্ত নৃত্য-রীতি-পদ্ধতি সংরক্ষিত আছে। কিন্তু 'ভারতীয় নাট্যম' ব্যতীতও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক নৃত্যেও শাস্ত্রীয় বহু বহু রূপরীতি চোখে পড়ে। যেমন শাস্ত্রীয় করকরণ "আবেষ্টিত","উদ্বেষ্টিত", মণিপুরী 'খুবেং'-এ মানবীগতি "চৎপা'র, "ধুতশির" এবং "পরিবাহিত শির" নানারূপ গ্রীবাকর্ম্মে মণিপুরে রূপান্তরিত হইয়াছে। "কথাকলি" নৃত্যেও এমন বহু নৃত্যরূপরীতির সন্ধান মিলে। শুধু ভারতেই নহে—ভারতের বাহিরেও নানা দেশের নৃত্যে ভারতীয় নৃত্যের রূপবন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে—কারণ ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিই একদিন সে সকল দেশে গিয়াছিল। "উৎক্ষিপ্ত শির" যবদ্বীপের বীররসমূলক গ্রীবাকর্ম্মে শাস্ত্রোক্ত "বিষম সঞ্চার" সর্পগতিতে' ভিন্ন রূপ পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় নৃত্যে "মেটিতোৎ প্রবনম্"—কাণ্ডী নৃত্যে "ঐন্দ্রস্থানক"—ইত্যাদি এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। এ সকল নৃত্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে এবং পর্য্যবেক্ষণকারীর শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে—প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের উৎকর্ষ ও পুনরুদ্ধারের আশা হয় ত কেবল দুরাশাই নয়, যথেষ্ট সম্ভাবনার কথাই মনে হইবে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্যের জন্ম ও রীতির কথা লিখিলাম। এবার বাঙ্গালার নৃত্যকলার পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বাঙ্গালার নিজস্ব শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি বলিতে আজ কিছুই নাই। প্রাচীন বঙ্গে নৃত্যের চর্চ্চা ছিল—পুঁথিপত্রেই কেবল প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে নিজস্ব প্রাদেশিক পদ্ধতি বলিয়া "রায়বেশে" প্রভৃতি লোকনৃত্য ব্যতীত আর নৃত্য পদ্ধতি কই? বর্ত্তমানে ওরিয়েণ্টাল নৃত্যের নামে রঙ্গমঞ্চে যে অশাস্ত্রীয় অভিনয় চলিয়াছে ভারতীয় নৃত্যকলার তাহাই চরমতম বিকাশ বলিয়া মনে করিতেছি। যে বাঙ্গালা সাহিত্যে শিল্পে—জ্ঞানে বিজ্ঞানে—ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিনায়কের আসনে আরূঢ় —সেই বাঙ্গালায় আজ নৃত্যের নামে—তাহাও সমগ্র প্রাচ্যের দোহাই দিয়া —যে অর্থহীন, ভাবহীন অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা রঙ্গমঞ্চ পরিভ্রমণ ও নিষ্ক্রামণ চলিয়াছে—তাহা বাঙ্গালার পক্ষে আদৌ গৌরবজনক নহে। বাঙ্গালী নৃত্যশিল্পী আমরা—সাধনা-বিমুখ—শ্রমে অপারগ, কিন্তু নৃত্যবিদ্ হইবার লোভ আছে যথেষ্টই। কাজেই—অনন্যোপায় হইয়া রীতি-বিধানবর্জ্জিত নৃত্যের সৃষ্টি করা ব্যতীত —আমাদের সে খেয়াল চরিতার্থ করিবার গত্যন্তর কই! নৃত্য-শিক্ষায় আমাদের ইচ্ছা হয় না—হয় খেয়াল। সত্য সত্যই আমরা নৃত্য শিক্ষায় উৎসুক হইলে "ওরিয়েণ্টাল" নৃত্যের নামে এ ছেলেমানুষি আমাদের নিজেদেরই বিসদৃশ মনে হইত। নৃত্য সাধনাসাপেক্ষ। সাধনা ব্যতীত এখানেও সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমরা 'ওরিয়েণ্টাল' নৃত্য রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত করিয়া ভাবি—নৃত্য-জগতের ইহাই কলুষনাশিনী—পূত মন্দাকিনী। যত কিছু ভুলভ্রান্তি—নৃত্যে যথেচ্ছাচারিতাজনিত রসভঙ্গের দোষ—সকলেরই ইহার সংস্পর্শে আসিয়া নির্ভুল মোক্ষলাভ। অশুদ্ধ হয় শুদ্ধ, অজ্ঞতা হয় পাণ্ডিত্য—দৃষ্টিকটু হয় দৃষ্টিমধুর—নীরস হয় সরস। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখি না যে, শুদ্ধের বিপরীত-ধর্ম্মী বলিয়াই তাহা অশুদ্ধ—রসের বিধর্ম্মী বলিয়াই নীরস—মাধুর্য্যের বিপরীতমুখী

বলিয়াই কদর্য্য। অশুদ্ধ কখনও শুদ্ধ হয় না—অজ্ঞতার পাণ্ডিত্যের দাবী—দুরাশা, স্পর্দ্ধা। শুধু ভারতের সভ্যতা সংস্কারের বিকাশই আমাদিগের দ্বারা এ যাবৎ কাল সম্ভব হয় নাই, আবার সমগ্র প্রাচ্যের ললিতকলার বৈশিষ্ট্য লইয়া টানাটানি করা নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। প্রতিবাদী হয় ত শাস্ত্রোক্ত বিধানের দোহাই পাড়িতে পারেন। হয় ত বলিবেন "নাট্য ধর্ম্মী" অভিনয়ের শিল্পী সর্ব্বকালে বিধিবিধান মানিয়া চলিতে পারে না। "নাট্যধর্ম্মী"-অভিনীয়মান শিল্পীর স্বাধীনতার বিধানও শাস্ত্রে আছে। স্বীকার আমরাও করি। কিন্তু 'নাট্যধর্ম্মী'-অভিনয়েও শিল্পীকে রসসৃষ্টিতে অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। বিধি-বিধানানুযায়ী অভিনয়কালে শিল্পী স্বীয় প্রতিভাবলে তদুপরি নূতন রূপ রসের সংমিশ্রণ করিতে পারেন—সে স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু স্বাধীনতা অবাধ নহে। "নাট্যধর্ম্মী" হওয়ার অর্থ যথেচ্ছাচার নয়।

বর্ত্তমানে আমরা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যে দৃশ্যে অবতীর্ণ হই—অভিমন্যু নৃত্যে—সাপুড়ে নৃত্যে—গন্ধর্ব্ব নৃত্যে—কেবলমাত্র পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া।—আকৃতিতে বৈষম্য—প্রকৃতিতে সবই এক। আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, যুদ্ধক্ষেত্রে সপ্তরথী-বেষ্টিত "অভিমন্যুর" সঙ্গে সাঁপুড়ের, সাঁপুড়ের সঙ্গে গন্ধর্ব্বের চরিত্র ও কার্য্যের রূপব্যঞ্জনায় সাদৃশ্য নাই কোথাও। ভিন্ন ভিন্ন রসের নৃত্য, আমাদের বিশ্বাস, কেবল পোষাক পরিচ্ছদের উপরই নির্ভর করে। অন্তর্নিহিত ভাবানুযায়ী নৃত্যেরও বিভিন্ন রূপ হইবে—সে কথাটিই আমাদের মনে জাগে না। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় যে, আজ গণচিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বাংলায় নৃত্যশিল্পী যে হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছে—তাহা শিল্পীজনের অনুচিত। গণচিত্তরঞ্জনার্থে শিল্পী একই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে—নূতন রূপসৃষ্টির আশা কোথায়? আর, গণরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশের সহায়ক শিল্পী ও তাহার রূপসৃষ্টিই—একথা শিল্পীকে স্মরণ রাখিতে হইবে। শিল্পীর কর্ত্তব্য সত্য-সুন্দরের রূপ মানবমনে আরও প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা।

আজ নৃত্যশিল্পীকে, ভারতীয় নৃত্য রীতি ও প্রথা সম্বন্ধে প্রথমত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। জানিতে হইবে—ভারতীয় নৃত্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্য কোথায়? ভারতীয় নৃত্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া ভারতীয় নৃত্যের নূতন রূপ সৃষ্টির প্রয়াস—অর্থহীন। আবার কোন এক বিশেষ পদ্ধতি আঁকড়াইয়া থাকাও সমীচীন নহে। প্রত্যেক নৃত্যপদ্ধতির সারাংশ গ্রহণ করিয়া যুগোপযোগী করিয়া আজ শিল্পীকে নূতন রূপে গড়িতে হইবে। সকল নৃত্যপদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে—এ ধরণের সংমিশ্রণ সম্ভবপর নহে; লবণ চিনির বাহ্যসাদৃশ্য সত্ত্বেও—ইহাদের সংমিশ্রণ বিষাক্ত।

শিল্পীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, রূপরীতির রুক্ষতায় যেন নৃত্যের রস-পূরণ ব্যাহত না হয়। নৃত্যে রূপরীতি থাকিবেই, কিন্তু প্রয়োগনৈপুণ্যে সে রূপরীতির রুক্ষতা যেন বিসদৃশ না মনে হয়। রসের বিকৃতি না ঘটায়। মেঘদূত যখন পড়ি—বিরহী যক্ষের বেদনা অন্তরে গিয়া করুণ মূর্চ্ছনা তুলিয়া বাজিতে থাকে—ব্যাকরণের নীরস বিধিবিধান রসভঙ্গ করে না! কিন্তু কবিকেও ব্যাকরণের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইয়াছে। কুম্ভকারের নৈপুণ্যে, প্রতিমা দর্শনকালে কাঠামোর কথা মনেই জাগে না—সেজন্য কি কাঠামো নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচ্যজগতের ভাণ্ডারে যে বাঙ্গলার দান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—সেই বাংলার অধিবাসী আমরা আত্মবিস্মৃত। বাংলার সভ্যতা, শিল্প, সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানিবার আমাদের আগেই কৌতূহলও জাগে না। মণিপুরী নৃত্য দেখিয়া মণিপুরের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসি—কিন্তু জানি না যে, মণিপুরের এ নৃত্যসম্পদ তাহার নিজস্ব নহে, আমাদের বাঙ্গালার চৈতন্যদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ হইতেই গৃহীত। মণিপুরীদের বাঙ্গালা কীর্ত্তনগানের উচ্চারণ সব সময়েই শুদ্ধ হয় না, কিন্তু তবু সাধনা বলে—অশুদ্ধ উচ্চারণের ভিতরেও সুরের যে রূপ ফুটিয়া ওঠে—তাহার আবেদন উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের সে সাধনা নাই—কাজেই, বাংলার এ অপূর্ব্ব সম্পদকেও মণিপুরের বলিয়া চোখ বুজিয়া মনকে প্রবোধ দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনার হাত হইতেও অব্যাহতি লাভ করি। নিজের জিনিসকে পরের বলিয়া চোখ বন্ধ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার এ প্রবৃত্তি কি আমাদের কখনও ঘুচিবে না?



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, বাঙ্গালী জাতি জীবন সংগ্রামে সকল ক্ষেত্রেই ক্রমে পিছাইয়া পড়িতেছে। একথা যে সত্য নহে, তাহা বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন বাঙ্গালী ক্রমে ক্রমে অপর সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে, সেবাক্ষেত্রেও তেমনই বাঙ্গালী পিছাইয়া নাই। আমরা একটি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি কার্য্যের বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি ; তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের একটি ছোট দল বাঙ্গালীর হিন্দুর সংগঠনের জন্য কিরূপ কার্য্য করিতেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম এখন বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বজনপরিচিত। স্বর্গত স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই সংঘের কর্ম্মীরা বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য নানা প্রকার মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহারা তীর্থ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে বড় বড় তীর্থগুলিতে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে অবাঙ্গালীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত ধর্ম্মশালায় বাস করিতে হইত এবং অবাঙ্গালী পাণ্ডাদের হাতে নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। সেজন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্ম্মীরা প্রথমে রথযাত্রার সময় পুরীতে, পিতৃপক্ষ মেলার সময় গয়াতে, কুম্ভমেলায় হরিদ্বার, এলাহাবাদ বা উজ্জয়িনীতে, অন্নকূট উৎসবে কাশীধামে—এইরূপ ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলিতে মেলার সময় যাইয়া বাঙ্গালী যাত্রীদের সুখসুবিধা দেখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে এখন তাঁহারা কাশী, গয়া, প্রয়াগ বা এলাহাবাদ ও পুরী—এই ৪টি প্রধান হিন্দু তীর্থে ৪টি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিতভাবে সকল সময়ে হিন্দু বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদের সেবার ভার লইয়াছেন।



সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত স্বামী প্রণবানন্দ

গয়ায় তাঁহারা রেল ষ্টেশনের অতি নিকটে ম্যাকলিয়ডগঞ্জ রোডে এক প্রকাণ্ড জমীর উপর সেবাশ্রম, যাত্রী-

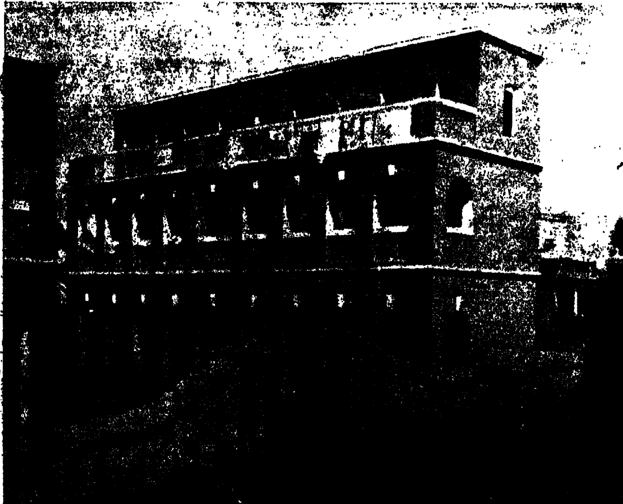


সঙ্ঘের সন্ন্যাসী কর্ম্মীবৃন্দ

নিবাস, মন্দির, দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। যে কোন হিন্দু তথায় যাইয়া সপরিবারে বিনা ভাড়ায় বাস করিতে পারেন এবং সন্ন্যাসী কর্ম্মীরা যাত্রীদের সকল প্রকার সুখসুবিধার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। যাত্রীরা যাহাতে গয়ালী পাণ্ডাদের দ্বারা অত্যাচারিত না হন, সেজন্য সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কলিকাতা প্রেসি-



গয়া সেবাশ্রমের যাত্রীনিবাস



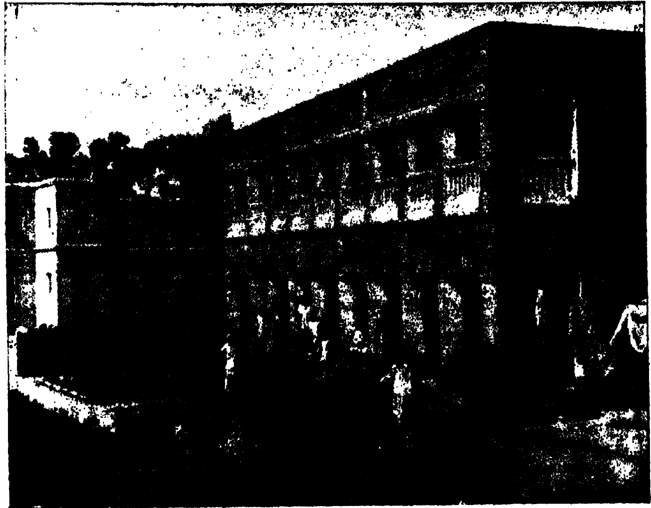
পুরীধামে যাত্রীনিবাস

ডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তথায় নিজ পিতা মাতা পুত্র প্রভৃতির স্মরণার্থে কয়েকটি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। খুলনার অধিবাসীদের সম্মিলিত দানে তথায় অপর একটি গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। ভাগ্যকুলের কুমার শ্রীযুত প্রমথ নাথ রায় মহাশয়ের দানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শুধু গয়া কেন্দ্রে নহে, কাশী, প্রয়াগ ও পুরী—৪টি কেন্দ্রেই চারিটি সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কাশীধামে ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে মাত্র এক মাইলের মধ্যে বিদ্যাপীঠ রোডে সঙ্ঘের ধর্ম্মশালা অবস্থিত। তথায় দুইটী বড় বড় বাড়ী যাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অপর বাড়ীতে দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রয়াগে ত্রিবেণীর নিকট ক্যানিং রোডে সঙ্ঘের ধর্ম্মশালা অবস্থিত। সেখানেও যাত্রীনিবাসের জন্য দুইটি গৃহ এবং চিকিৎসালয় ও পাঠাগারের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরীতে সমুদ্রের নিকট স্বর্গদ্বার রোডে সঙ্ঘের ধর্ম্মশালায় কয়েকটি বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। সকল স্থানের ধর্ম্মশালাতেই সঙ্ঘের বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরা বাস করেন এবং শুধু ধর্ম্মশালায় অবস্থিত যাত্রীদের জন্য নহে—ঐ সকল তীর্থক্ষেত্রে সমাগত সকল বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদের সেবা ও সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। সঙ্ঘের কর্ম্মীরা উপযুক্ত অর্থসাহায্য ও উৎসাহ পাইলে ভারতের অন্যান্য তীর্থ-ক্ষেত্রে—হরিদ্বার, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি যে সকল স্থানে সর্ব্বদা বাঙ্গালী যাত্রীরা অধিক সংখ্যায় গমন করেন—তথায় এইরূপ ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিতে পারিবেন। ধনী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তাঁহাদের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি রক্ষার জন্য এইরূপ কার্য্যে অর্থসাহায্য করিলে তাহা দ্বারা জাতির একটি প্রকৃত অভাব দূর হইতে পারে। অবাঙ্গালীদের ধর্ম্মশালা গুলিতে বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা বাঙ্গালী মাত্রই অবগত আছেন।

সঙ্ঘের কর্ম্মীরা শুধু এই তীর্থ সংস্কার কার্য্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই। একদল কর্ম্মী দেশে শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মাদারীপুর, খুলনা, বাজিতপুর ও কলিকাতা—৪টি স্থানে তাঁহারা বহু অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া ১২টি

বিভিন্ন স্থানে ১২টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সঙ্ঘের কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। রাজসাহীতে দিঘাপাতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অর্থসাহায্যে তাঁহারা এক বিরাট ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় একটি বাড়ীতে শুধু কলেজের ছাত্র ও অপর একটি বাড়ীতে স্কুলের ছাত্র রাখা হয়। তাহাদের অধিকাংশ বিনাব্যয়ে তথায় বাস করেন—কয়েকজনের নিকট মাসে মাত্র ৫ টাকা খরচ লওয়া হয়। ছাত্রাবাসের সঙ্গে শিব-মন্দির, উপাসনা-হল প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গত ধরণীকুমার বসু মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত এ, কে, বসু হলের প্রথম তলের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুত জে, এল, চট্টোপাধ্যায় হলের দ্বিতীয় তল নির্ম্মাণের জন্য অর্থদান করিয়াছেন।



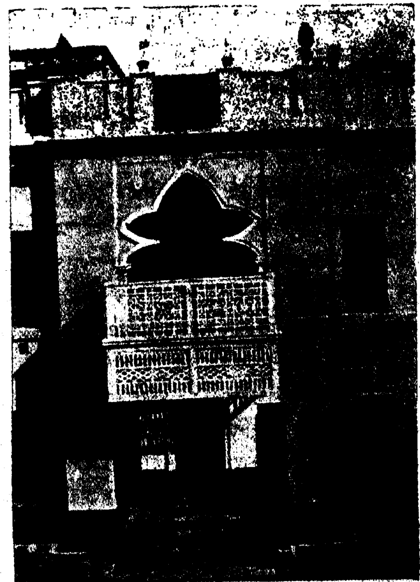
এলাহাবাদে যাত্রীনিবাস

মেলা ছাড়াও দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতিতে কোন দেশ বিপন্ন হইলে সঙ্ঘের কর্ম্মীরা সেখানে যাইয়া আর্ত্তত্রাণ কার্য্য করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানে বন্যার পর ও যশোহরে দাঙ্গাহাঙ্গামার পর তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য ঐ অঞ্চলের লোক তাঁহাদের কথা চির-কাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

হিন্দু সংগঠন আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৯৩৩ সাল হইতে সঙ্ঘের কর্ম্মীরা ফরিদপুর জেলার বাজিতপুরে বৎসরে একবার করিয়া নিখিল বঙ্গ হিন্দু সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতে-ছেন—রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির মত মনীষীরা ঐ সকল সম্মেলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন। কলিকাতাতে ও ১৯৩৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর একটি করিয়া হিন্দু সম্মিলন করা হয়—রায় বাহাদুর জলধর সেন, রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি কলি-কাতার সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

কলিকাতায় বালীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে ২১১ রাসবিহারী এভেনিউতে সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় সঙ্ঘের কর্ম্মীরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সভাপতিত্বে কয়েকটি হিন্দু নেতৃ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই সকল কার্য্য ছাড়া সঙ্ঘের কর্ম্মীরা সারা বৎসর বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। প্রতি গ্রামে যাইয়া তাঁহারা হিন্দুদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য 'হিন্দু মিলনমন্দির' স্থাপন করেন এবং 'হিন্দু রক্ষী দল' গঠন করেন। বাঙ্গালার প্রতি জেলায় তাঁহারা এইভাবে শত শত মিলন মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যে কার্য্য করিতে-ছেন, সেজন্য বাঙ্গালীজাতি প্রকৃতই উপকৃত হইবে এবং বাঙ্গালার বর্ত্তমান হিন্দু জাগরণের ইতিহাসে সঙ্ঘের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।



বালীগঞ্জে সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়

সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে একটি 'হিন্দু মিলন মন্দির হল'ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার

পাবনা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু মিলন মন্দিরের বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া ঐ অঞ্চলে হিন্দুদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দান ও রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সঙ্ঘ এখন এরূপ বৃহৎভাবে নানাদিকে নানাপ্রকারের কার্য্য করিতেছেন যে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান অসম্ভব। আমাদের বিশ্বাস, সঙ্ঘের এই হিন্দু ধর্ম ও সমাজ এবং হিন্দু জাতিকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টায় কোনদিন অর্থের অভাব হইবে না এবং সহৃদয় দেশবাসীরা হিন্দু ধর্ম্মের জন্য এবং বর্ত্তমান সমাজ রক্ষার জন্য সঙ্ঘের কার্য্যে অর্থদান করিয়া ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের কার্য্য করিবেন।

ভারতের আদমসুমারি—১৯৪১

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বক্তৃতা, বিবৃতি, গালাগালি—সকল হট্টগোলের অবসানে ভারতের লোকসংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যেখানে যুদ্ধ জয় অপেক্ষা সংখ্যাগুরুত্ব দেখাইতে পারিলে অতি অবহেলায় এক একটি প্রদেশের অধীশ্বর বা মালিক উজির হওয়া যায়, সেখানে লোকগণনার সময় কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষত যেখানে দুপক্ষেরই সন্দেহ বর্ত্তমান যে পূর্ব্বেকার গণনায় ভুল আছে, তাহা না হইলে কোনও প্রদেশে সংখ্যা সমান সমান হইত—সেরূপ স্থলে দলপুষ্টি করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সকল পক্ষেই অবলম্বন করিলে বিক্ষোভ না হইয়াই পারে না। বর্ত্তমানে যাহা হইয়া গিয়াছে, অন্তত আগামী দশ বৎসরের জন্য তাহা মানিয়া লইতে হইবে এবং তাহারই উপর শাসনযন্ত্র, ভোটাভুটি, খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণের পরিমাপ, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি সবই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

সকল রকম হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন অংশে কতক হিসাব প্রকাশিত হইয়া গেলেও এখন প্রায় সবই বাকী। পূর্ণ লোকসংখ্যা ও অক্ষর-পরিচিতের সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে কয়েকটা বিষয় বেশ পরিস্ফুট হইতেছে: ব্রিটিশ ভারতে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫·২ এবং দেশীয় রাজ্য ও এজেন্সীসমূহে ১৬·৩ হইয়াছে। সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভারতের বাৎসরিক মৃত্যুর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, কমবেশ ষাট লক্ষ হইবে; একমাত্র ম্যালেরিয়াতে সাড়ে পনেরো লক্ষ লোক মরে, তার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে মরে চার লক্ষেরও উপর। সুতরাং সারা ভারতে শতকরা পনেরো জন বৃদ্ধি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভারতে জন্মহার খুব বেশী। অন্যান্য সভ্য দেশের মত মৃত্যুহার কম হইলে, এইভাবে লোক বৃদ্ধির সম্ভাবনায় দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কথা। যেখানে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, শিক্ষার জন্য অর্থ ও উপায় নাই, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুচারু ব্যবস্থা নাই, সেখানে এইভাবে লোক বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দশ বৎসরে পাঁচ কোটির উপর জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। এই বিরাট লোকের জীবনযাত্রা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সেই অনুপাতে শস্য ও আয় বৃদ্ধি যে হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

যাহাদের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা নিজের নাম সহি করিতে পারে, তাহারা ইংরেজি ভাষায় 'literate'। সারা ভারতবর্ষে ৩৯ কোটী লোকের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা পাঁচ কোটির কম বা শতকরা ১২·১৭। এই অনুপাত যে ইংরেজ জাতির একটা প্রকাণ্ড কলঙ্ক, তাহা বহু ইংরেজ পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করিয়া যাঁহারা বিদেশী ধাঁচে বিদেশী শিক্ষার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দুইশত বৎসর শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত শাসন চালাইবার পর ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় অক্ষর-পরিচিতের হার শতকরা ১২ মাত্র। ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি থাকিতে পারে।

শাসনযন্ত্রের বিভিন্নতা হিসাবে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম সাক্ষাৎ ইংরেজের অধীন, আর দ্বিতীয় করদ নরপতি ও ইংরেজ প্রতিনিধির (Age oy) অধীন। ভারতের আয়তন ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৮৭ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে বৃটিশ-ভারতে পড়ে ৮,৬২,৬৭৯ বর্গ মাইল বা শতকরা ৫৪·৮—আর বাকী ৭,১২,৫০৮ বা ৪৫·২% ; অর্থাৎ কমবেশী থাকিলেও অনেকটা কাছাকাছি।

	ব্রিটিশ-শাসিত	করদ নৃপতি-শাসিত
আয়তন বর্গ মাইল	৮,৬২,৬৭·৯	৭,১২,৫০৮
শতকরা	৫৪·৮	৪৫·২
লোকসংখ্যা (হাজার)	৩৮.৮১,১৯	৮,১৩,৬৭
শতকরা	৭৬·০৮	২৩·৯২
অক্ষর-পরিচিত (হাজার)	৩,৭০,১৬	১,০৩,০৭
শতকরা	৭৮·২২	২১·৭৮

উপরোক্ত অঙ্ক হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে কেবল যে লোকসংখ্যা বেশী তাহা নহে, অক্ষর-পরিচিতের সংখ্যাও তুলনায় অনেক বেশী।

বলা বাহুল্য, সকল স্থানে সমানভাবে লোক বাস করে না। হিসাব মত বাঙ্গালা দেশ এখনও অনেক অংশে ভারতের প্রধান। বর্গমাইলের মাত্র শতকরা ৪·৯ অংশ (৭৭,৫২১) পড়িলেও মোট লোকসংখ্যার শতকরা

১৫·৫১ (৬,০৩,১৪,০০০) ভাগ এবং অক্ষর-পরিচিতের শতকরা ২০·৫ (৯৭,২০,০০০) এখানে বাস করে। আয়তন হিসাবে মাদ্রাজ সর্ব্বাপেক্ষা বড়—অর্থাৎ শতকরা ৯ ভাগ, বাঙ্গলার প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু লোক-সংখ্যা শতকরা ১২·৭ ও শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৩·৫, বাঙ্গলা হইতে অনেক কম। মাদ্রাজের পরেই আয়তন হিসাবে রাজপুতানার করদ রাজ্য-গুলির স্থান (Rajputana States Agency), অর্থাৎ—শতকরা ৮·২ (১,২৯,০৫৯ বর্গমাইল) কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র শতকরা ৩·৫ ও শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ১·৬।

আয়তন হিসাবে নিম্নলিখিত প্রদেশ ও করদরাজ্যগুলি মোট আয়তনের শতকরা (৩%) তিন ভাগেরও অধিক স্থান দখল করিয়া আছে। আয়তনের অনুপাতে পরে পরে নাম দেওয়া হইল :—

মাদ্রাজ ৯%, রাজপুতানা করদ রাজ্য ৮·২%, যুক্তপ্রদেশ ৬·৭, পঞ্চনদ ৬·৩, মধ্যপ্রদেশ ও বিরার ৬·৩, কাশ্মীর ৫·৮, হায়দরাবাদ ৫·২, বালুচিস্থান ৫·১, বাঙ্গালা ৪·৯, বোম্বাই ৪·৯, বিহার ৪·৫, আসাম ৩·৫ বালুচিস্থান (ব্রিটিশ) ৩·৪ ; মধ্যভারত করদরাজ্য ৩·২%।

নিম্নলিখিত প্রদেশ ও করদরাজ্যগুলিতে শতকরা তিন ভাগের (৩%) অধিক অধিবাসী বাস করে :

বাঙ্গালা ১৫·৫১ ; যুক্তপ্রদেশ ১৫·৪৩ ; মাদ্রাজ ১২·৭ ; বিহার ৯·৩ ; পঞ্চনদ ৭·৩, বোম্বাই ৫·৩, মধ্যপ্রদেশ ও বিরার ৪·৩ ; হায়দরাবাদ ৪·১৬, রাজপুতানা করদরাজ্য ৩·৫।

নিম্নলিখিত প্রদেশ ও করদরাজ্যগুলিতে শতকরা দুই ভাগ (২%) ও ততোধিক অক্ষর-পরিচিত লোক বাস করে :

বাঙ্গলা ২০·৫%, মাদ্রাজ ১৩·৫ ; যুক্তপ্রদেশ ৯·৮ ; বোম্বাই ৮·৬, পঞ্চনদ ৭·৭, বিহার ৭, ত্রিবাঙ্কুর ৬·১ ; মধ্যপ্রদেশ ও বিরার ৪·০ আসাম ২·৫, হায়দরাবাদ ২·৩, উড়িষ্যা ২%।

ভারতবর্ষের প্রতিবর্গমাইলে গড়ে ২৪·৬ জন লোক বাস করে।

উপরিলিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের বহু অংশ জনবিরল। অবশ্য তন্মধ্যে বিরাট বনপ্রদেশ ও নদী প্রভৃতির জলভাগ বাদ দিতে হইবে। সমস্ত ভারতবর্ষ ৩৯টি অংশে বিভক্ত করা আছে, তন্মধ্যে নয়টিতে (তন্মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতে সাত) শতকরা ৭৭·৫ ভাগ লোক বাস করে। অনেকগুলি প্রদেশ ও রাজনৈতিক বিভাগ আছে, যথা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্থান, আজমীঢ়, কুর্গ, দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর এবং করদরাজ্যের মধ্যে দশটি অংশে ভারত-লোকসংখ্যার শতকরা একজনও পড়ে না। ইহাদের কতগুলিকে একত্র মিলিত করিয়া সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল।

ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র দশটি প্রদেশ ও করদরাজ্যে (তন্মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতে আটটি) সমস্ত অক্ষর-পরিচিতের ৮৬% বাস করে। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কি অবস্থা। এত অজ্ঞতা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে বিদেশীর শান্তিতে শাসন করা সুবিধা-জনক, কিন্তু স্বাস্থ্য, উপার্জ্জন, জগতে জ্ঞানভাণ্ডারের অংশ গ্রহণ ও তাহাতে নিজের দান, জাতীয়তার আন্দোলন ও আত্মোন্নতির উপায় উদ্ভাবন প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়। যাহারা এ সকল অন্তরে অন্তরে জানে, বুঝিতে পারে, তাহারা এ দিকে কোনও চেষ্টা করিবে না। সুতরাং এ দিকে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যিনি যে আন্দোলনই করুন, সকল সময় স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে যে, বিনা শিক্ষায় জাতি অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা মানেই চাকুরির সুবিধা নয়, জগৎসভায় উপযুক্ত স্থান লাভের প্রচেষ্টা মাত্র।

ব্রিটিশ ভারতের কয়েকটি প্রদেশ এবং করদরাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর বাদ দিলে ভারতের যাহা পড়িয়া থাকে তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে শোভা পাইত, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা শাসন ও শাসিত—উভয়েরই কলঙ্ক। ভালর পক্ষে ত্রিবাঙ্কুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সারা ভারতের মাত্র ·৫ আয়তন (৭,৬২৫ বর্গ মাইল) অধিকার করিয়া লোকসংখ্যায় ১·৫ (৬০,৭০,০০০) ধারণ করে। কিন্তু অক্ষর-পরিচিতের হিসাবে সেখানে ৬·১% (২৮,৯৪, ৪০০) লোক বাস করে। ত্রিবাঙ্কুরে নর ও নারী উভয়েই শিক্ষালাভে আগ্রহান্বিত এবং শিক্ষিত নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের মধ্যে সিন্ধু ও উড়িষ্যার কথা আলোচনা করা দরকার। সিন্ধুর আয়তন ভারতবর্ষের ২·৯%, অধিবাসীর সংখ্যা ১·২% এবং অক্ষর-পরিচিত মাত্র ১·০%। উড়িষ্যার অবস্থা অক্ষর-পরিচিতের বেলায় অনেকটা ভাল, কারণ শতকরা ২, লোকসংখ্যা ২·৩% ও আয়তন মাত্র ·৮%

কাশ্মীর ও জম্মু আয়তনে হায়দরাবাদ অপেক্ষা কিছু বড়, যথাক্রমে ৫·৪% ও ৫·২% কিন্তু লোক ও অক্ষর-পরিচিতের সংখ্যায় বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরে যথাক্রমে ১·০৩% ও ·৫%, সেস্থলে হায়দরাবাদে ৪·১৬% ও ২·৩%। সুখের বিষয়, ঐ দুই রাজ্যের নিজ অধিবাসীদিগের মধ্যে অক্ষর-পরিচিতের হার প্রায় সমান, অর্থাৎ হায়দরাবাদ ৬·৮% ও কাশ্মীর ৬·৪%। এই ভাবে সকল বিষয় সবিস্তার আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন।

এখনও সেন্সাসের অনেক হিসাব প্রকাশিত হইতে বিলম্ব আছে ; কিন্তু যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অনুসন্ধিৎসু লোকের কাছে তাহা গোপন থাকিতে পারে না। এ বিষয় যত লোকে যত দিক দিয়া আলোচনা করে ততই মঙ্গল।



চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশিয়ার রণাঙ্গন

রুশিয়ায় শীতের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তর রণাঙ্গনে লেনিনগ্রাড, মধ্য রণক্ষেত্রে মস্কো এবং দক্ষিণে ক্রিমিয়া ও রষ্টোভে জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। শীতের পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া নাৎসী বাহিনীর অভিযান পরিচালনার ইহাই শেষ প্রচেষ্টা। মস্কো অধিকারের জন্য প্রতিদিন নূতন বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও সমরোপকরণ মধ্য রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইয়াছে মস্কোকে কেন্দ্র করিয়া। অসংখ্য লোকক্ষয় করিয়া সর্ব্বস্বের বিনিময়ে শত্রুর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল দখলের প্রচেষ্টা আজ হিটলারকে বাধ্য হইয়াই করিতে হইতেছে। কারণ গলদ আছে গোড়ায়—হিটলারের হিসাবে। শীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হিটলার রুশিয়ায় বিজয় অভিযান সমাপ্তির আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। প্রতিটি রুশ সৈন্য দেশ ও আদর্শকে রক্ষার জন্য অতুল পরাক্রমে নাৎসী বর্ব্বরতাকে বাধা দিয়াছে। মস্কো নগরী রক্ষার্থ যুদ্ধরত সৈন্যদের প্রতি ষ্ট্যালিনের আদেশ—পিছনে এক পাও সরিয়া আসিবে না। এ আদেশের অর্থ জীবনের পরিবর্ত্তে জীবন দান। ফলে নাৎসী সৈন্য মস্কোর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও আজ মস্কো অধিকার করিতে পারিল না। লেনিনগ্রাডেও জার্ম্মানবাহিনী প্রবল চাপ দিতেছে বটে, কিন্তু মস্কো অপেক্ষা লেনিনগ্রাডের অবস্থা অনেক ভাল। লেনিনগ্রাডের অবরুদ্ধ রুশ সৈন্যগণ পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। কিন্তু মস্কো অধিকতর বিপন্ন। মস্কোর সহিত বিভিন্ন রেলপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। টুলা মোজাইস্ক ও কালিনিনে যুদ্ধের অবস্থা গুরুতর। নাৎসী বাহিনী তিনদিক হইতে টুলাকে বেষ্টন করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও নাৎসী বাহিনীর গতি আজ শামুকের ন্যায় মন্থর। সে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ আর নাই। প্রতিদিন নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ আনাইয়া অগ্রসর হইবার কি প্রচণ্ড প্রয়াস! কারণ হিটলার জানেন উত্তর রুশিয়ার তীব্র শীত ও তুষার পাতের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ পরিচালন অসম্ভব। নাৎসীবাহিনী শীতকালেও যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত বটে, কিন্তু উত্তর রুশিয়ার শীত নাৎসী সৈন্য অপেক্ষাও বর্ব্বর। সমগ্র শীতঋতু যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের মধ্যে কাটান অসম্ভব। 'লণ্ডন টাইমস্'-এর মতে জার্ম্মান সৈন্য পিছাইয়া আসিয়া এই সময়ে কোন উপযুক্ত আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিছাইয়া আসা অত সহজ বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। এক বিশাল রণক্ষেত্রের বিরাট বাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার সহিত বিজিত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পিছাইয়া লইয়া যাওয়া কি সহজ কথা? বাহিনীর বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ রক্ষা, রসদবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে যথেষ্ট বিঘ্ন হইবার আশঙ্কা। তদুপরি নাৎসী বাহিনী পিছাইয়া যাইলে রুশিয়া কি সেই সুযোগ গ্রহণ করিবে না? রুশ সৈন্যগণ নাৎসী সৈন্যাপেক্ষা ঐ দুর্দ্ধর্ষ শীত সহ্য করিতে অভ্যস্ত। তাহার পর যদিই বা নাৎসী সৈন্য পিছাইয়া যায়, তাহারা যাইবে কোথায় এবং কতদূর পর্য্যন্ত? রুশ সৈন্যগণ প্রত্যেক গ্রামটি পরিত্যাগের পূর্ব্বে তাহা অগ্নিদগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং জার্মান সৈন্যদের আশ্রয় এবং খাদ্যাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা কৈ? অধিকন্তু পশ্চাদবর্ত্তন কালে রুশ গরিলা সৈন্যগণ সুবিধা পাইবে যথেষ্ট। কাজেই প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। তবে, শীতে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা হ্রাস পাইবে। কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব হিটলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দখল করিতে যত্নবান। যদিও রাজধানী মস্কো হইতে কুজবিশেভে স্থানান্তরিত হইয়াছে, মস্কো ও তদঞ্চলের শিল্পদ্রব্যাদিও অপসারিত হইয়াছে তাহা হইলেও মস্কো অধিকারের একটা গুরুত্ব আছে। রুশ সৈন্যদের নৈতিক শক্তির বিশেষ ক্ষতি না হইলেও নাৎসী বাহিনী এই অধিকারের ফলে বিশেষ লাভবান হইবে। শীতের পূর্ব্বে কেন্দ্রসকল অধিকার করিতে পারিলে সমগ্র শীতকাল জার্মানগণ সেই অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি প্রদান করিতে পারিবে। তাই শীত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী বাহিনী আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে বদ্ধপরিকর। ১২৯ বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক প্রচণ্ড শীতের দিনে নেপোলিয়ঁ ও সেকালের সমরোপকরণ ও সৈন্যবাহিনী লইয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮১২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নেপোলিয়ঁ মস্কোতে প্রবেশ করেন। আজকের রুশ যোদ্ধৃগণের ন্যায় সেদিনও মস্কোর গভর্ণর সহরে আগুন লাগাইয়া দেন। বহু আয়াসে লব্ধ বিজয়ের পরেও নেপোলিয়ঁর শোচনীয় পশ্চাদ-পসরণের কাহিনী ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট অজ্ঞাত নয়। সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত জীবন যাপনের সময়ে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের পরাস্ত করিয়াছেন; কিন্তু পরাভূত করিতে পারেন নাই রুশিয়ার প্রকৃতিকে। নেপোলিয়ঁ মস্কো প্রবেশ করিয়াছিলেন শীতের প্রাক্কালে—সেপ্টেম্বরে। ডিসেম্বরের তুষার সমাচ্ছন্ন বরফস্তূপে হিটলারের মাথা ঠোকাই সার হইবে কি না কে জানে।

দক্ষিণ রণক্ষেত্রেও নাৎসী বাহিনীর অভিযান চলিয়াছে প্রবলভাবে। রুশগণ কর্ত্তৃক কার্চ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং জার্মান সাঁড়াশী বাহিনীর একাংশ সেবাস্তোপোলের দিকেও অগ্রসর। কার্চ অধিকারে জার্মানীর পক্ষে কৃতিত্বের অথবা রুশদের অগৌরবের বিশেষ কোন কারণ নাই। কারণ দুর্ভেদ্য দুর্গাদি দ্বারা কার্চ বিশেষ সুরক্ষিত অঞ্চল নয়। তবে সেবাস্তোপোল পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং শীতের তীব্রতা এখানেও যথেষ্ট। সুতরাং সেবাস্তোপোল বিজয়কালে জার্মান সৈন্যদের কার্চ দখল অপেক্ষা অধিকতর বেগ পাইতে হইবে। এদিকে রষ্টোভে যুদ্ধের অবস্থা গুরুতর। মার্শাল টিমোসেঙ্কোর

সুপরিচালনায় এই অঞ্চলে রুশ সৈন্যগণ এখনও বিশেষ অসুবিধায় পড়ে নাই। পরন্তু পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া রুশবাহিনী ৬০ মাইল স্থান পুনর্দখল করিয়াছে। তবে নাৎসী বাহিনী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যেমন মস্কো দখলের নিমিত্ত অগ্রসর, দক্ষিণ রণক্ষেত্রেও সেইরূপ তাহারা রুশ বাহিনী ভেদের নিমিত্ত প্রাণপণ প্রয়াস পাইবে। কারণ ককেশাসের এই দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে পারিলে জার্মান সৈন্যদের বিশের সুবিধা। প্রবল শীতে উত্তর রণাঙ্গণে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইবার সঙ্গে এই অঞ্চলে জার্মান-তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়াই সম্ভব। তবে তৈল ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ককেশাসের অঞ্চল কুক্ষীগত করিবার উদ্দেশ্যে হিটলার যদি শীতকালীন অভিযান এই অঞ্চলে পরিচালিত করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অগ্রসর হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কারণ উত্তর রুশিয়া অপেক্ষা দক্ষিণাঞ্চলে শীতের তীব্রতা কম এবং এই অঞ্চলে শীতকালীন যুদ্ধ সম্ভব বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিলেও ইহাতে বাধা আছে যথেষ্ট। কারণ উত্তর রুশিয়ার ন্যায় এই অঞ্চল বিস্তীর্ণ প্রান্তর অথবা অরণ্য ও জলাভূমি মাত্র নয়। দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে ককেশাস দুরধিগম্য। ককেশাসে বিভিন্ন পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতা আদৌ অল্প নহে। ককেশাসের প্রবেশ দ্বারে এলবর্জ পর্ব্বত শিখর ১৮৫২৯ ফিট উচু। ইহার পরেই কাজবেক চূড়া—উচ্চতা ১৬৬৪৮ ফিট। ইহার পরে আজার বাইজানের দক্ষিণাঞ্চলে পড়ে আরারাৎ—১৬৯০০ ফিট উচ্চ গিরিচূড়া। এই দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া বিরাট বাহিনীর পরস্পর সংযোগ রক্ষা করিয়া পরিচালন—রণনীতির দিক দিয়া বিশেষ চিন্তার বিষয়। দুইটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ আছে—একটি কৃষ্ণসাগরের তীর দিয়া, অপরটি কাস্পিয়ান হ্রদের উপকুল ধরিয়া। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সৈন্য পরিচালনাও বিশেষ আয়াসসাধ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত না করিয়া অসংখ্য সৈন্যকে এই অঞ্চলে লইয়া যাইবার সুবিধা নাই। তাহার পর পার্ব্বত্য অঞ্চল বলিয়া উত্তর রুশিয়া অপেক্ষা শীতের প্রাবল্য এখানে বিশেষ কম নয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণসাগরের উপকুল তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। তাহার উপর আবার এই উপকুল ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইলে কৃষ্ণসাগরস্থ রুশ নৌবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বাটুমের তৈল সম্পদ লাভ করিতে হইলে নভোরোসিস্ক, টুয়াপ্‌সে, পোটি প্রভৃতি উপকুলস্থ বিভিন্ন সহর ও ঘাঁটি পূর্ব্বে অধিকার করা প্রয়োজন। আবার বাকু অধিকার করিতে হইলে কাস্পিয়ান হ্রদের তীর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু এই পথ অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে অষ্ট্রাখান দখল করা আবশ্যক। অষ্ট্রাখান রুশিয়ার একটা বিশেষ শিল্প কেন্দ্র। কাস্পিয়ান তীরস্থ এই নগরী অধিকার করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ রুশেরা অসুবিধায় পড়িবে, জার্মানীর পক্ষে সেইরূপ লাভ হইবে যথেষ্ট। রষ্টোভ হইতে অষ্ট্রাখান পর্য্যন্ত নাৎসী সাঁড়াশীর একটি বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার সংযোগ রক্ষা করিতে পারিলে ককেশাস অঞ্চলে শত্রুদের বাধা দানে নিরত রুশ সৈন্যগণকে মূল রুশবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রথমে অষ্ট্রাখান দখল করা প্রয়োজন।

তাহার পর, হ্রদ তীরস্থ পথ হইলেও ককেশাসের পূর্ব্বাঞ্চলের এই সকল স্থানেও শীতে তুষারপাত হয়। এতদ্ব্যতীত আছে পর্ব্বত শ্রেণী এবং নদী। এলবার্জের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তেরেক নদীর মোহানা। শীতের সময় জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। কাজেই কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিম তীরস্থ পথও সৈন্য পরিচালনার পক্ষে বিশেষ দুর্গম। তাহার উপর ককেশাসের এই অভিযানে নাৎসী সৈন্য আক্রমণকারী, ফলে তাহাদের অসুবিধাই অধিক। পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করিয়া শত্রু সৈন্যকে বাধাদানের সুবিধা রুশবাহিনী লাভ করিবে। সেই জন্যই এই শীতে ককেশাস অঞ্চলে অভিযান পরিচালনের ইচ্ছা থাকিলে হিটলারের অভিযান পরিচালনার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও দ্বিতীয়বার চিন্তা করা প্রয়োজন। এই সকল কারণেই আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর বিগত সংখ্যায় কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে তুরস্কের মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনের সুযোগ পাইলে নাৎসী বাহিনীর পক্ষে ককেশাস অঞ্চলে পৌঁছিবার বিশেষ সুবিধা। তুরস্ক-জার্মান সম্পর্কের কথা আমরা 'ভারতবর্ষে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। জার্মান সাঁড়াশী বাহিনীর একটি শাখা তুরস্ক দিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে ককেশাসে প্রবেশ করা যেমন সুবিধাজনক, ইরাণ সীমান্তে উপস্থিত হওয়াও তেমনই সহজ। বৃটিশ এবং সোভিয়েট মিলিত বাহিনী পূর্ব্ব হইতেই এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ইরাণে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে ইহা পূর্ব্ব সংখ্যাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে ভারতের প্রধান সেনাপতির পক্ষে দেশরক্ষা সমন্বয় সচিব মিঃ উইলিয়াম্‌স্ প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, চক্রশক্তি অধিকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত সহর ভারত হইতে বর্ত্তমানে ১৮০০ মাইল দূরে। কিন্তু নাৎসী বোমারু বিমান ২৫০০ মাইলের মধ্যে যে কোন স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়া সাফল্যজনকভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। বর্ত্তমানে যন্ত্র-যুদ্ধের যুগে সেইজন্যই শত্রুকে যতদূর হইতে বাধা প্রদান করা যায় ততই সুবিধা। ইহাতে শত্রুর আক্রমণের প্রাবল্য প্রথমে দূরাঞ্চলেই বাধাপ্রাপ্ত হয়, সাময়িক পশ্চাদপসরণের প্রয়োজন হইলেও তাহা বিশেষ উদ্বেগজনক হইয়া উঠে না এবং তৃতীয়তঃ যুদ্ধক্ষেত্রের মর্ম্মন্তুদ ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর আশ্বিন সংখ্যাতেই উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষের অবস্থান বর্ত্তমানে মিত্রশক্তির পক্ষে বিশেষ সুবিধা আনয়ন করিয়া দিয়াছে এবং রুশিয়াকে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত ভারতবর্ষকে ভাণ্ডার গৃহরূপে ব্যবহার করা চলে। আমাদের ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। ইরাণ হইতে রুশিয়ার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। লব্‌ওজনের সমরোপকরণ ইতোমধ্যে কিছু প্রেরণ করাও হইয়াছে। রুশিয়াকে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত ভারতবর্ষকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা প্রয়োজন, ভারতবর্ষকে রক্ষার নিমিত্তও সেইরূপ দূর হইতেই শত্রুকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। নাৎসী বাহিনী যদি রণোন্মাদে প্রমত্ত হইয়া ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে জেনারেল ওয়াভেলকেও প্রত্যক্ষ সমরে লিপ্ত হইতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণ সাগরের

দক্ষিণ তীর দিয়া যদি আর একটি জার্মান অভিযান দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে পরিচালিত হয় তাহা হইলে দুর্দ্ধর্ষ জার্মান-বাহিনী সাঁড়াশীর আকারে ককেশাসকে বেষ্টন করিয়া যে উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করিবে, পশ্চিম এশিয়াস্থ বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে তাহা নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে লক্ষ্য করা অসম্ভব।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ

গত ১৯শে নভেম্বর বৃটিশ বাহিনী অতর্কিতে উত্তর আফ্রিকায় অভিযান সুরু করিয়াছে। সুদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বৃটিশ বাহিনী হঠাৎ লিবিয়া অঞ্চলে তৎপর হইয়া উঠিলেও 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠকগণের নিকট ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই মধ্যপ্রাচী প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে, শীতের সময় মধ্য ইয়োরোপে যুদ্ধ পরিচালনা দুষ্কর হইলেও আফ্রিকাতে সেই সময় কোন অসুবিধা নাই। আর অচিনলেক এই সময়ে লিবিয়ার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে আমাদের ইঙ্গিত অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও নির্ভুল হইয়াছে। প্রায় একশত মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে বৃটিশবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ সুরু করিয়া প্রথম দিনেই সাইরেনাইকার মধ্যে ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। কাপুজ্জো ও বার্দিয়া দখল করিয়া বৃটিশ-বাহিনী তব্রুকের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার এই যুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই উল্লেখের মূল্য কতখানি, ভারতবাসী তাহা বিশেষভাবেই জানে। "মায়াবী" ওয়াভেলের নেতৃত্বে বৃটিশবাহিনী যখন ইটালীয় সৈন্যদের পর্যুদস্ত করিয়া উত্তর আফ্রিকায় একটির পর একটি ঘাঁটি দখল করে, তখনও ভারতীয় সৈন্যদের বিস্ময়কর বীরত্বের কথা ভারতবাসীকে শোনান হইয়াছিল। কিন্তু মজার কথা এই, যখনই ভারতবাসী ভারতীয় সৈন্য দ্বারা গঠিত দেশরক্ষাবাহিনী সংগঠনের দাবী জানায়, তখনই শোনে—ভারতবাসী যুদ্ধের জানে কি!

উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার এই নূতন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি ও প্রধানযুদ্ধের গতি কতটা সংশ্লিষ্ট তাহার আলোচনা প্রয়োজন। রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতার মতে মধ্য-প্রাচীতে সৃষ্ট এই দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্যই রুশিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। রুশিয়া যে জার্মানীর প্রতিকূলে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র চায় ইহা সত্য। কয়েক দিন পূর্ব্বে মঃ ষ্ট্যালিন যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বৃটিশ জার্মানীর বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনা না করার প্রচ্ছন্ন অনুযোগের আভাসও তাহার মধ্যে ছিল। কারণ নূতন কোন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইলে জার্মানীকে বাধ্য হইয়া সেইদিকেই মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে বৃটেন কর্ত্তৃক যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি হইল তাহাতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। প্রথমতঃ, এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন রুশিয়ায় সৃষ্ট হয় নাই। একেবারে ইয়োরোপের বাহিরে উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইহার কেন্দ্রস্থল। রুশ অভিযানে নিযুক্ত সৈন্যদলকে অবিলম্বে সরাইয়া আনিয়া এই যুদ্ধে প্রেরণের কোন কারণ নাই। তাহার পর, উত্তর রুশিয়ায় শীতের প্রাবল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জার্মান অভিযানের তীব্রতাও হ্রাস পাইবে। কাজেই এই সময়ে হিটলারের পক্ষে অন্য রণক্ষেত্রে দৃষ্টি দিবার অবসর পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত বৃটিশের দিক হইতেও এই যুদ্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। লিবিয়ার যুদ্ধে বৃটেন গতবারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিলেও মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধে জার্মানী আবার বৃটিশ অধিকৃত ঘাঁটি সকল অধিকার করিয়াছিল। উত্তর আফ্রিকার এই মরুভূমিতে যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই। মুসোলিনী যখন আফ্রিকার যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলা হইয়াছিল—*Mussolini is collecting deserts*, মুসোলিনী মরুভূমি কুড়াইতেছেন! কিন্তু এই মরু অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুদ্ধে বৃটিশের যে সৈন্য এবং সমরোপকরণ বিনষ্ট হইবে তাহার তুলনায় লাভ হইবে যথেষ্ট কম। খনিজ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদে এই অঞ্চল সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী নয়। তদুপরি এই যুদ্ধে জার্মানীকে কতখানি বিব্রত করা যাইবে, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রধানতঃ জার্মানীর মিত্র ইটালীর সহিত এই যুদ্ধ। জার্মানী যদি এই শীতের অবকাশে কৃষ্ণসাগরের তীরে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর একাংশকে আটক রাখার জন্য তাহার যেটুকু করা প্রয়োজন তদধিক তাহার পক্ষে না করাই সম্ভব। আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি যে, পশ্চিম এশিয়ায় যদি যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জেনারেল ওয়াভেলকে যেরূপ সেদিকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, সার অচিনলেককেও সেইরূপ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। এই দিক দিয়া হিসাব করিলে বর্ত্তমানে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

তবে বৃটিশের পক্ষ হইতে কয়েকটি কারণে লিবিয়ার যুদ্ধ বিশেষ মূল্যবান। লিবিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ বাহিনী যে রুশিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লিপ্ত হইল এ কথা অস্বীকার করা চলে না। ইহার পর আছে ভূমধ্যসাগরের প্রশ্ন। আফ্রিকার উপকূলে সিদিবারাণী, বেনঘাজী প্রভৃতি ঘাঁটি শত্রুপক্ষের হাতে থাকায় এবং ক্রীট, সিসিলি প্রভৃতি দ্বীপে জার্মান সৈন্য অবতরণ করায় ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। জিব্রাল্টারের পূর্ব্বে বৃটিশের বিমানবাহী জাহাজ 'আর্ক-রয়াল'-এর নিমজ্জন হইতেই ভূমধ্যসাগরে জার্মান সাবমেরিণের তৎপরতা বুঝা যায়। ইহার পূর্ব্বে 'কারেজস্' ও 'গ্লোরিয়াস্' নামক আর দুইটি বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ নাৎসী টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে—প্রথমটি ইংলিশ প্রণালীতে এবং দ্বিতীয়টি নরওয়ের উপকূলে। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় জয়লাভ করিতে পারিলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর চলাচলের যে অসুবিধাটুকু সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও পুনরায় দূরীভূত হইবে।

মধ্যপ্রাচী সম্বন্ধে আলোচনাকালে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। জেনারেল ওয়েগাঁকে কয়েকদিন পূর্ব্বে পদচ্যুত করা হইয়াছে। এদিকে জার্মানরা নাকি বিজার্টা ব্যবহারের দাবী জানাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই দুইটি কাক-তালীয়বৎ হইলে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার

নাই ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকিলেই চিন্তার কথা। স্বাধীন ফরাসী নিউজ এজেন্সীর কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানান যে, জার্মানীর দাবী মানিয়া লইতে অসম্মত হওয়াতেই নাকি জেনারেল ওয়েগাঁকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। ফ্রান্সকে জার্মানীর হাতে ক্রীড়নকের স্থায় ব্যবহার করিতে দিতে বিশেষ আপত্তি ছিল দুই জনের—একজন জেনারেল হাংৎজিগার ; বিমান দুর্ঘটনার ফলে কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জেনারেল ওয়েগাঁ ; তিনিও সম্প্রতি অপসারিত। এই অবস্থায় জার্মানীর দাবী সম্বন্ধে ফ্রান্স কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহা চিন্তার বিষয়। বিজার্টা, ফ্যালজিয়ার্থ এবং ওরাণ—ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ ফরাসী অধিকৃত বন্দর। সিসিলি, ক্যালাব্রিয়া এবং স্পেনের সীমান্তে জার্মানী সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ক্যাসারাঙ্কাতেও জার্মাণ বিশেষজ্ঞগণ নাকি প্রেরিত হইয়াছে। তদুপরি ওরাণ, ফ্যালজিয়ার্থ এবং বিজার্টা যদি জার্মান কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং যদি ডাকারেও সে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে সে বৃটিশ নৌবাহিনীকে বিব্রত করিবার যথেষ্ট সুবিধা লাভ করিবে। তদুপরি য়্যাটলান্টিকে তাহার সাবমেরিণের তৎপরতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। উপকূলস্থ বন্দরগুলি সাবমেরিণের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিয়া মার্কিন জাহাজকে য়্যাটলান্টিকে অধিকতর তৎপরতা ও শৃঙ্খলার সহিত আক্রমণ করা তখন তাহার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু লিবিয়ায় বৃটিশের এই অতর্কিত আক্রমণে হিটলারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে হিটলারের এই গোপন অভিসন্ধির সংবাদ পাইয়াছিলেন ইহা সুপরিস্ফুট ; তবে হিটলারের পরিকল্পনা এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় হিটলার যুগপৎ ডাকার দাবী ও ককেশাস অঞ্চলে প্রচণ্ড সমর আরম্ভ করিতে পারেন। স্পেনকেও অদূর ভবিষ্যতে জিব্রাল্টার সম্বন্ধে কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনের জন্য প্ররোচিত করাও বিশেষ বিচিত্র নয়।

সুদূর প্রাচী

সম্প্রতি কয়েকদিনের মধ্যেই সুদূরপ্রাচীর অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। জাপ সরকার মুসোলিনীর স্থায় যে কূটনীতিক চাল দিতে গিয়াছিলেন মার্কিন সরকার তাহার সেই বহ্বাস্ফোটে ভোলেন নাই। জাপানের স্থল সৈন্যের শক্তির পরিমাণ চীন-জাপান যুদ্ধেই পাওয়া গিয়াছে। তাহার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাও আজ মার্কিন সরকারের নিকট গোপন নাই। এরূপ অবস্থায় জাপানের মাত্র নৌবহরের ক্ষমতা যে কতখানি তাহা সহজেই বোধগম্য। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আমেরিকার সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যে জাপানের পক্ষে একটা জুয়া খেলা ব্যতীত আর কিছু নহে, মার্কিন সরকারের নিকট তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ জাপ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ কুরুসুকে আমেরিকায় পাঠান হইয়াছে। কর্ণেল নক্সের সহিত তাঁহার আলোচনা আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। কর্ডেল হালের সহিত যে আলোচনা হইয়াছে তাহাও সমাপ্ত হইয়াছে অমীমাংসিতভাবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত আলোচনাও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মার্কিন সরকার জানাইয়াছেন যে, জাপান যদি চীন ও ইন্দো-চীন হইতে সৈন্য অপসারণ করে এবং ভবিষ্যতে অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে আমেরিকার সহিত জাপানের স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। আমেরিকার পক্ষে এই দাবী খুবই সঙ্গত। কারণ জাপান দক্ষিণে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিলে আমেরিকার পক্ষে মালয়ের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক নিরিবচ্ছিন্ন এবং অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইজারা ও ঋণদান ব্যবস্থানুযায়ী চীনকে সমরোপকরণ প্রেরণ দ্বারা সাহায্য প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই সর্ত্ত গ্রহণ করা জাপানের পক্ষেও কঠিন। কারণ চীনের যুদ্ধের সহিত আজ তাহার মানসম্ভ্রম জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর জাপ-সোভিয়েট সীমান্তে রাস্কিনো গ্রামের নিকটে রুশ-সীমান্ত রক্ষীদের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া সে যে দক্ষিণ অভিযানে বিশেষ ইচ্ছুক নহে ইহাই আমেরিকাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। এ কথা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি। সম্প্রতি কয়েকদিন পূর্ব্বে সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী নির্দ্ধারিত ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত লঙ্ঘন করায় থাই ও জাপ সৈন্যদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় অনেকেই থাইল্যাণ্ডের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাও জাপানের একটা কূটনীতিক চাল। একদিকে জাপান যেরূপ সোভিয়েট সীমান্তে সঙ্ঘর্ষ দ্বারা আমেরিকাকে বুঝাইতে চাহে—সে দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে বিশেষ ইচ্ছুক নহে, অপর পক্ষে আবার তেমনই থাই সীমান্তে সংঘর্ষের দ্বারা আমেরিকাকে ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করিবার বাসনাও তাহার আছে। এতদ্ব্যতীত, অতর্কিতে জাপান দক্ষিণে অভিযান করিলে অবিলম্বে বৃটিশ ও মার্কিন সহযোগিতা সম্ভবপর কিনা তাহা জানিয়া লওয়াও জাপানের উদ্দেশ্য। আগ্রহ এবং ভীতিপ্রদর্শন এই উভয় উদ্দেশ্যেই জাপান ডায়েটের আহ্বান এবং আলোচনা আরম্ভ হইল সেই সময়ে—যখন মিঃ কুরুসু মিঃ হালের সহিত আমেরিকায় আলোচনায় রত। ডায়েটে যে ভাষায় আলোচনা হইয়াছে এবং যেরূপ মনোভাব প্রদর্শন করা হইয়াছে আমেরিকার পক্ষে তাহা বরদাস্ত করা কঠিন। জাপান ভাবিয়াছিল মিঃ কুরুসুকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে আলোচনা করিতে পাঠাইয়া এবং টোকিওতে আমেরিকা সম্বন্ধে কড়া কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়া সে আমেরিকার সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কূটনীতিক চাল পুরাতন হইয়া গিয়াছে। গলাবাজি ও ধাপ্পাবাজি দ্বারা মুসোলিনী এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন মুসোলিনীর মুখে দম্ভোক্তি শুনিলে তাহা নিতান্ত হাস্যকর মনে করিয়া উপেক্ষিত হয়। জাপানের স্থলসৈন্যের শক্তি পরীক্ষিত এবং তাহার অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা পরিস্ফুট হইবার পর তাহার দম্ভোক্তির অসারতাও ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অন্যকার সংবাদে প্রকাশ—জাপান কুনমিংএ বোমা বর্ষণ করিয়াছে—অর্থাৎ ব্রহ্মপথের উপরই তাহার লক্ষ্য। হয়ত অতি শীঘ্রই থাইল্যাণ্ডের সহিতও তাহার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে ; কারণ আমেরিকাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য থাই সীমান্তে যে সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত করিয়াছে, স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে নিজেকেই সেই ফাঁদে পদক্ষেপ করিতে হইবে। জাপান যদি আমেরিকাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কার্য্যোদ্ধারের আশায় শেষ চেষ্টা হিসাবে কুনমিংএ বোমা বর্ষণ করিয়া থাকে তাহা হইলে এবারে তাহার চালে ভুল হইয়াছে। কারণ বৃটেন এবং আমেরিকা উভয়েই জানে যে তাহাদের সুদূর প্রাচীর স্বার্থ রক্ষার্থ জাপানকে চীনের সহিত ব্যাপৃত রাখা প্রয়োজন। ব্রহ্মপথ অবরুদ্ধ হইলে চীনকে সাহায্য প্রেরণ দুষ্কর হইয়া পড়িবে। বৃটিশ এবং আমেরিকাই এখন চীনের ভরসা। কারণ রুশিয়া বর্ত্তমানে তাহাকে সাহায্য প্রদানে অক্ষম। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক ব্রহ্ম ও ভারতের সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থ আর একটি পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন বটে, তবে জাপান ব্রহ্মপথ অবরোধ করিলে চীনকে সাহায্য প্রেরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে না। সুদূর প্রাচীতে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি কার্য্যকরী করিতে হইলে জাপানের পক্ষে যেরূপ আমেরিকাকে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখা প্রয়োজন, আমেরিকারও তেমনই অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য জাপানকে দক্ষিণে রণক্ষেত্র সৃষ্টি করায় বাধা প্রদান ও জাপানকে বিব্রত রাখার জন্য চীনকে সাহায্য প্রদান আবশ্যক।

৬।১২।৪১

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোম্পানী

আমাদের দেশে সিমেণ্টের ব্যবহার দিন দিন কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু এদেশে এখনও বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ সিমেণ্ট আমদানি করিতে হয়। এই আমদানির পরিমাণ কমিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালা বা আসামে এপর্য্যন্ত কোন সিমেণ্ট প্রস্তুতের কারখানা ছিল না। সম্প্রতি বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে আসামে একটি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সেই কোম্পানীর কথা নিম্নে বিবৃত করিব। তৎপূর্ব্বে গত কয়েক বৎসরের ভারতে সিমেণ্ট ব্যবহারের হিসাব সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম—

টনের হিসাব

	ভারতের প্রস্তুত	বিদেশী আমদানী
১৯১৪	৯৪৫	১,৫০,৫৩০
১৯১৫	৩৮,৬৭২	৮০,৫৪৩
১৯২২	১,৫১,৩৩৬	১,০৯,৯২৪
১৯২৮	৫,৫৭,৯৫৩	৭৪,৭০০
১৯৩০	৫,৬৩,৯২৯	৬৮,০০০
১৯৩৪-৩৫	৭,৪৭,৮১৮	৪৯,১০০
১৯৩৫-৩৬	৮,৮৬,২৬৭	৪২,৯০০
১৯৩৬-৩৭	১১,৫০,০০০	২৭,৫০০

উপরোক্ত হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে, এদেশে প্রস্তুত সিমেণ্টের পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার সবই বাঙ্গালার বাহিরে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮ই নভেম্বর আসামের গভর্ণর সার রবার্ট রীড শ্রীহট্ট জেলার ছাতক নামক স্থানে আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেডের নূতন কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। স্থানটি শ্রীহট্ট হইতে ২১ মাইল দূরে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীতে আছেন—(১) সর্দ্দার বাহাদুর সর্দ্দার ইন্দ্র সিং (সভাপতি), (২) শ্রীযুত পি, মুখার্জ্জি (ম্যানেজিং ডিরেকটার), (৩) কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চিফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত জে-সি-মুখার্জ্জি, (৪) ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের রাজনীতিক পরামর্শদাতা শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, (৫) বার্ড কোম্পানীর মিঃ জর্জ্জ মর্গান (৬) মেসার্স ক্লাসকো লিমিটেডের শ্রীযুত কে-এল-দত্ত, (৭) সর্দ্দার বলদেব সিং ও (৮) ভারত গভর্ণমেণ্টের বাঙ্গালাস্থ সলিসিটার শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন।



সিমেণ্টের কারখানার একটি অংশ (এখানে সিমেণ্ট জমা হয়)।

নূতন কারখানাটির অনেক দিক দিয়া সুবিধাও আছে প্রথমত—ঐ অঞ্চলে, এমন কি বাঙ্গালা আসামে আর কোন সিমেণ্টের কারখানা নাই। দ্বিতীয়ত, শ্রীহট্টে যে চুণের খনি আছে, এই কোম্পানী তাহার ইজারা লইয়াছেন। ঐ স্থান হইতে প্রচুর চুন পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, চুনের খনি হইতে কারখানা মাত্র ১১ মাইল দূরে—উভয় স্থানের

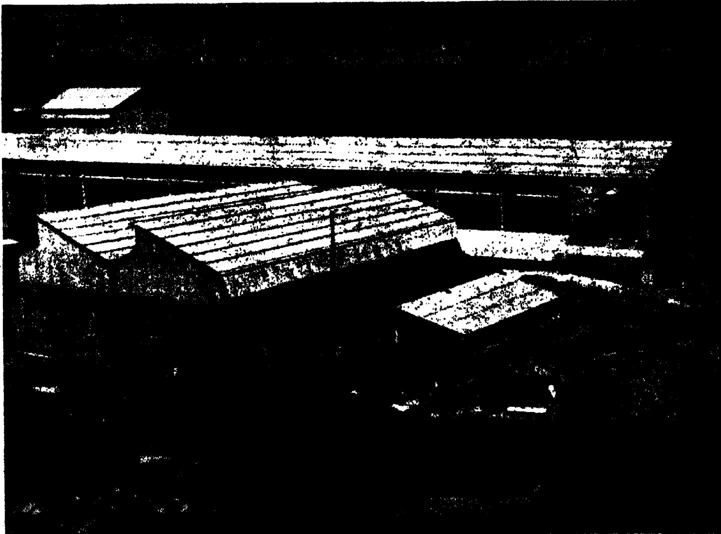
দূরত্ব কমাইবার জন্য আকাশপথে এক নূতন রাস্তা তৈয়ার হইতেছে—তাহা শেষ হইলে অতি সামান্য খরচে সিমেণ্টের কারখানায় চুন পাওয়া যাইবে। চতুর্থত, কারখানা হইতে মাত্র ৫০ মাইল দূরে কোম্পানী একটি কয়লার খনিও ইজারা লইয়াছেন। খনিটি নদীর ধারে বলিয়া জলপথে অতি অল্প ব্যয়ে কারখানায় সকল সময়ে কয়লা পাওয়া যাইবে। পঞ্চমত কারখানা হইতে সর্ব্বত্র সিমেণ্ট পাঠাইবারও বিশেষ সুবিধা। ছাতকের নীচে যে নদী, তাহাতে সকল সময়ে নৌকা চলাচল করিতে পারে। কাজেই ছাতক হইতে নৌকাযোগে বাঙ্গালা ও আসামের সর্ব্বত্র—এমন কি, ষ্টীমারযোগে বিদেশেও সিমেণ্ট পাঠাইবার অসুবিধা নাই এবং বলা বাহুল্য যে, অন্য সকল যান অপেক্ষা জলযানে মাল প্রেরণের ভাড়া কম। ছাতক হইতে যত কম খরচে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে সিমেণ্ট পাঠানো যাইবে, অন্য কোন স্থান হইতে তাহা সম্ভব হইবে না।

সর্দ্দার বাহাদুর ইন্দ্র সিং একজন কৃতী ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। তিনি এই সিমেণ্ট কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করায় সকলেই আশা করে যে, এই কোম্পানীও শীঘ্রই সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

৩৩ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং ২৫ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হইয়াছে। প্রত্যহ ঐ কারখানায় ২৫০ টন করিয়া সিমেণ্ট প্রস্তুত হইবে। সকল খরচ বাদ দিয়া প্রতি টনে ১২ টাকা করিয়া লাভ থাকিবে। ফলে বৎসরে ৯ লক্ষ টাকা লাভের সম্ভাবনা। ডিবেঞ্চারের সুদ, গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্স প্রভৃতি বাদ দিলেও অংশীদারগণ বৎসরে শতকরা ১৫ টাকা ডিভিডেণ্ড পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

গভর্ণর কর্ত্তৃক উদ্বোধনের তিনমাস পূর্ব্বেই কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ছাতক কারখানায় ৮০ জন এঞ্জিনিয়ার, ৫০জন কেরানি ও ৫শত শ্রমিক কাজ করিতেছে। চুনের খনিতে ১২জন পরিচালক ও ৪শত শ্রমিক এবং কয়লার খনিতে ১৬জন পরিচালক ও ৪৫০জন শ্রমিক কাজ করে। কোম্পানী ঐ সকল লোকের সুখ সুবিধা বিধানের প্রতিও উদাসীন নহেন।

১৯৪০ সালের ৪ঠা এপ্রিল আসাম গভর্ণরের পত্নী লেডী এমি রীড ছাতকে গিয়া একটি হাসপাতালের উদ্বোধন করিয়াছেন। তথায় চিকিৎসাদির সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৭০ ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর জলের ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া কারখানা অঞ্চলে কূপের জল সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ছাতকে পাহাড় কাটিয়া তথায় সুন্দর নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। সুদূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া সেখানকার বর্ত্তমান অধিবাসীদিগকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।



সিমেণ্ট কোম্পানীর কারখানা (এখানে যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ প্রস্তুত হয়)

বাঙ্গালীর পক্ষে এই কোম্পানী সত্যই গৌরবের জিনিষ। ৮ জন পরিচালকের মধ্যে ৫জন বাঙ্গালী। আমাদের বিশ্বাস, সুবিখ্যাত ধনকুবের সর্দ্দার বাহাদুর ইন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে বাঙ্গালী পরিচালকগণের সুদক্ষতায় কোম্পানী দিন দিন উন্নততর হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

বর্দ্ধমানে হিন্দু সম্মেলন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ নানাভাবে দলিত ও নির্য্যাতিত। হিন্দুর স্বাধীনতা আজ উপেক্ষিত, তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি আজ বিশেষভাবে আক্রান্ত। তাহার সমাজ উৎপীড়িত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উপক্রত, রাজনৈতিক অধিকার অপহৃত, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিপর্য্যস্ত, শোভাযাত্রার অধিকার সঙ্কুচিত। হিন্দুর প্রতিমা আজ অবিসর্জ্জিত, হিন্দু নারী আজ মুসলমান কর্ত্তৃক ধর্ষিত। প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরোধিতায় হিন্দুর সংস্কৃতি ও সত্তা ক্ষুণ্ণ, তাহার স্বাতন্ত্র্যও বিপন্ন। যে হিন্দুসমাজ আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন বন্ধনে বদ্ধ হইতে চাহে নাই, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের প্রভাবে সেই সমাজ আজ সর্ব্বদিক হইতেই বিব্রত। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ আজ ভারতের সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতেছে। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের বুকে হিন্দুবধের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। হিন্দু আজ তাই উপলব্ধি করিয়াছে যে তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহার হৃদয়ে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ স্বাজাত্যবোধ জাগাইতে হইবে, তাহাকে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে এবং অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে।



ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এবিষয়ে যে বাঙ্গালার হিন্দুরাও বিশেষ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার দশম অধিবেশনে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুত মহাসভার বিগত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমবেত হিন্দুসাধারণের ভিতর আত্মজাগরণের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মে যে আত্মবিস্মৃত হিন্দু আজ তাহার বিলুপ্তপ্রায় জাতীয় চৈতন্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আর্য্য সাধনার পবিত্র সিদ্ধপীঠ—শ্রীচৈতন্য, জয়দেব, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণের লীলাক্ষেত্র বর্দ্ধমানে গত ২৯শে ও ৩০শে নবেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার দশম অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুত জীবনমল ভুতোরিয়া এবং সভাপতি হইয়াছিলেন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট হিন্দু জাগরণ আন্দোলনে নিবেদিত-প্রাণ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, ভাগ্যকুলের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র, চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী, মেজর পি, বর্দ্ধন, শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট হিন্দু নেতা ইহাতে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাঁকুড়া শক্তিসঙ্ঘের দুইশত সদস্য বাঁকুড়া হইতে পদব্রজে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন।

২৯শে নবেম্বর শনিবার সকালে সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুনেতৃবর্গসহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটি, শিখ সম্প্রদায়, বার এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ করজোড়ে সহাস্যবদনে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। রক্তপতাকাসহ তরবারি হস্তে মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবকগণ, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী ও গৈরিক পতাকা হস্তে স্বেচ্ছাসেবকগণ সামরিক কায়দায় সভাপতিকে অভিনন্দিত করেন। বিপুল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি ও 'হিন্দু মহাসভা কী জয়' ধ্বনিতে ষ্টেশন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে নির্ব্বাচিত সভাপতিকে

অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সহিত এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রাটি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, স্যার বিজয়চাঁদ রোড, বালীগঞ্জ রোড প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপুষ্পশোভিত রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া বর্দ্ধমান রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই দীর্ঘ শোভাযাত্রার পুরোভাগে দুইটি সুসজ্জিত হস্তী, তাহার পশ্চাতে ব্যাণ্ড বাদ্য ও দেশীয় ঢাকঢোলের বাজনাসহ মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী, তাহার পশ্চাতে কুলটি ছাত্র ফেডারশনের সদস্যগণ, কৃপাণহস্তে মহাবীর দল ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ অগ্রসর হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৩-৪৫ মিনিটের সময়ে বর্দ্ধমান টাউন হলের বিপরীত দিকে সুসজ্জিত 'বিজয়নগর মণ্ডপে' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতরে অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ হিন্দুনেতা স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু পতাকা উত্তোলন করেন ও এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হিন্দুদের সম্মুখে আজ এক গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। হিন্দুর অধিকার আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, প্রায় সত্তরখানি প্রতিমা এখনও নিরঞ্জন করা হয় নাই। ১৯২১ সাল হইতে হিন্দুর অবস্থা ক্রমশ এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে যাহার



অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফলে হিন্দুজাতিকে বাঁচিবার পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও আত্মরক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।" বক্তা স্বয়ং হিন্দু-সাধারণের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বর্দ্ধমানে সমবেত হিন্দু



শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

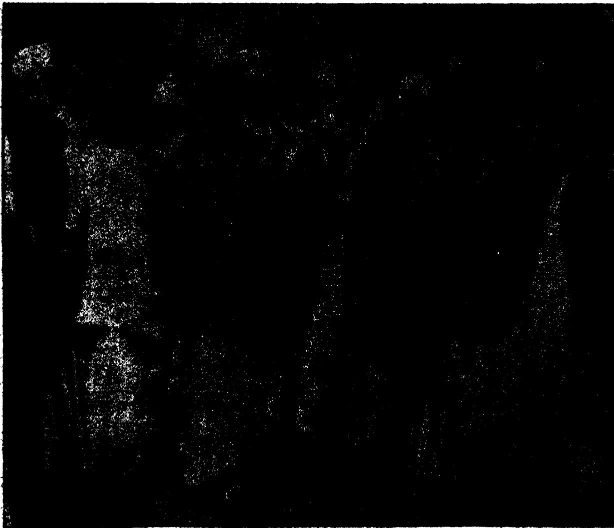
কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত যে-কোন পন্থা অনুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না বলিয়া আশ্বাস দেন এবং সমবেত হিন্দুরা যেন স্বাধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া বর্দ্ধমান ত্যাগ করে—এই আবেদন উপস্থাপিত করেন।

তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিলে পর নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি সর্ব্বজনমান্য জননায়ক বীর সাভারকর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কুমার বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি এবং অন্যান্য খ্যাতনামা হিন্দু কর্ত্তৃক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া প্রেরিত বাণীসমূহ সম্মেলনে পঠিত হয়। অতঃপর সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া এক ঘণ্টাব্যাপী একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার অভিভাষণটি সুচিন্তিত—উহা পুনঃ পুনঃ নূতন করিয়া শুনিবার প্রয়োজন আছে। উহাতে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের প্রায় সর্ব্বাঙ্গীণ সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণের

প্রারম্ভে 'প্রাচ্যের পুষ্পোদ্যান' বর্দ্ধমানের গৌরবময় অতীত ইতিহাস ও উহার বর্ত্তমান পরিণতি বিবৃত করেন। হিন্দু সম্মেলনের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গত তিনি বলেন, "হিন্দুর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর, আজ যেন মাথা তুলিবার অধিকার নাই। চীৎকার করিয়া প্রাণের বেদনা জানাইতে হইলে কণ্ঠরোধ করিয়া দেওয়া হয়। রাজপথ দিয়া তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা চালনা করিবার মৌলিক অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইতেছে।" প্রসঙ্গক্রমে তিনি হিন্দুর মৌলিক অধিকার অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে বর্দ্ধমানবাসীদের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া ১৯৩৮ সালে সরকারের বিনানুমতিতেই সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্যদের উপেক্ষা করিয়া কিরূপে ছয়ছন বাঙ্গালী যুবক অকুতোভয়ে শহরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের উচ্ছেদ কামনা করিয়া তিনি বলেন, "এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই হিন্দুর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিষম অভিশাপ। ইহারই উত্তেজক মাদকতায় উন্মত্ত হইয়া বাঙ্গলার একদল সচিব হিন্দু-বিদ্বেষী আইন করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে পঙ্গু ও শক্তিহীন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের উন্মাদিনী মায়ায় বিভ্রান্ত হইয়া বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃবৃন্দ 'পাকিস্থানের' দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন।" সামরিক শিক্ষার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি এখন বিশ্বাস করি যে, আমাদের শাসন কর্তৃপক্ষগণ যদি বাঙ্গালী হিন্দুকে বিশ্বাস করিয়া দেশরক্ষা-কার্য্যে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা এবং স্বাধীন হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়েন তবে একা বাঙ্গালাদেশ হইতেই ন্যূনাধিক দশলক্ষ সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত বীর হিন্দুযুবক দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুস্থান রক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাকারস্বরূপ সীমান্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।"

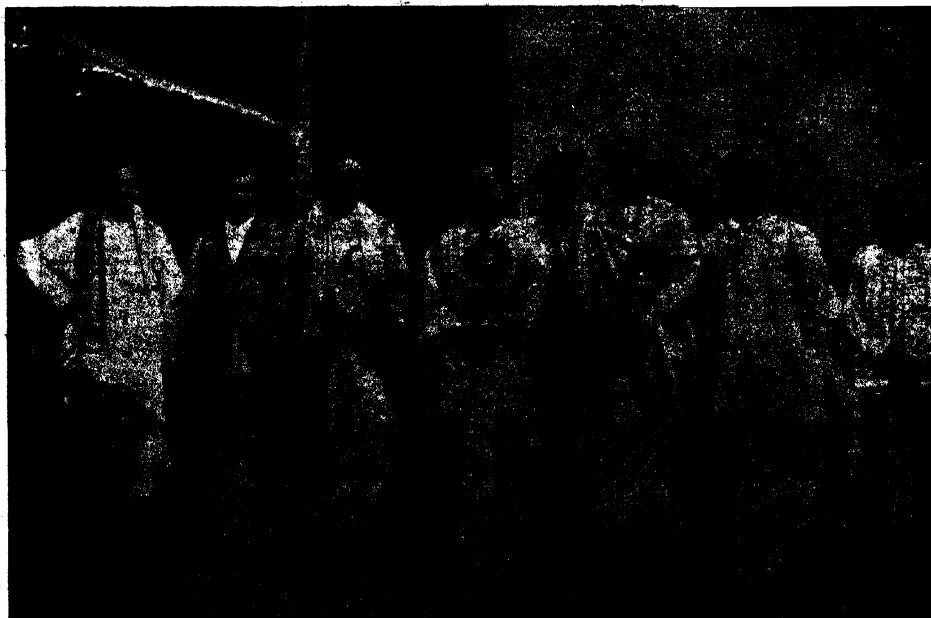
সভাপতির অভিভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "মহাসভা আন্দোলন যে হিন্দুস্থানের ন্যায়ানুমোদিত স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপোষক তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। গত পঞ্চাশ বৎসর কাল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতের উন্নতির আদর্শে ব্রতী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ মুসলমান নেতা স্বেচ্ছায় সঙ্কীর্ণতা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জাতীয় একতা ও অখণ্ডতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন। আর কংগ্রেস প্রথম হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে একটা তোষণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেসের বহু মারাত্মক ভুলের মধ্যে আর একটি প্রধান ভুল—খিলাফৎ আন্দোলন।" ভারতে স্বরাজলাভের পথে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও তৎপ্রতি কংগ্রেসের ঔদাসীন্যের কথা আলোচনা করিয়া সভাপতি মহোদয় বলেন, "কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তানীতির ফলে ভারতের, বিশেষভাবে



বর্দ্ধমানে সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ, উদ্বোধনকারী স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মৈমনসিংহের মহারাজা শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি



কলিকাতায় আসামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলুই—সঙ্গে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত,
শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুত অমিয় দাস প্রভৃতি





বাঙ্গালোরে (মহীশূর) বিজ্ঞান ইনিষ্টিটিউটে বাঙ্গালী অধিবাসীদের বার্ষিক দীপালি সম্মিলনী

পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বিভিন্ন অবস্থায় আইনসভা বর্জ্জন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অস্বী-



বর্দ্ধমানে হিন্দু ছাত্র সম্মিলনে অধ্যাপক সুনীতিকুমার, ব্যারিষ্টর নির্ম্মলচন্দ্র, মহারাজা শশিকান্ত, অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ফটো—তারক দাস

কৃতির ফলে সংখ্যালঘু প্রদেশের, বিশেষত বাঙ্গালার হিন্দুদের, বিপন্ন হইতে বাধ্য করা হইয়াছে। হিন্দুদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া সাধারণের কল্যাণবিমুখ প্রতিক্রিয়াশীল দলের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে।”

হিন্দুমহাসভার মতবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন, “মহাসভার মতে এই হিন্দুস্থানকে যিনি নিজ মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করেন এবং ভারতের ভূমিতে উৎপন্ন যে কোনও একটি ধর্ম্মমত পোষণ করেন তিনিই হিন্দু। হিন্দুগণ ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলির সহিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবিধ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদগুলির খিচুড়ী পাকাইতে চাহেন না। নিজস্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও সমাজঘটিত সমস্যার আমদানি করিয়াছেন। আজ যদি ত্রিশকোটি হিন্দু একত্রে মিলিত হইয়া মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নাগরিক জীবনের, ধর্ম্মমূলক উপাসনার ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সমানাধিকার দান করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চালনায় সমবেতভাবে অগ্রসর হয় তাহা হইলে কি আপত্তি থাকিতে পারে?”

মহাসভার মূলনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, তাঁহাদের অনুসৃত কর্ম্মপদ্ধতিতে ধ্বংসকারী কোন নীতি নাই; তাঁহারা ভারতকে স্বাধীন দেখিতে চাহেন সত্য, কিন্তু সেই ভবিষ্য ভারতকে হিন্দুর শ্মশান-ভস্মের উপর গড়িতে দিতে চাহেন না। মহাসভার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, “একটি সম্প্রদায় অপরটিকে অযৌক্তিক উপায়ে প্রশ্রয় দিয়া বা বলপূর্ব্বক অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া হিন্দু-মুসলমানের পথ সুগম হইবে না।”

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের সমস্যার উল্লেখ করিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ প্রসঙ্গত বলেন—“পরস্পর সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাবে এক অখণ্ড হিন্দুসম্প্রদায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও উপদলে বিভক্ত হইয়া সসম্মানে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি এদেশে আর এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী রাজপুরুষগণ দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, বজবজ প্রভৃতি স্থানে

দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের জন্ম রাজপথ দিয়া গীত ও বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার ন্যায্য অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঢাকায় বিগত ঈদ্ উৎসব উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা হইয়া গেল, তৎসম্পর্কে এই সরকারেরই মনোভাব অন্যপ্রকার ছিল। প্রকাশ্য ও নিঃসঙ্কোচ পক্ষপাতই বর্ত্তমান সরকারীনীতির বিশেষত্ব। বাঙ্গালার ইতিহাস গতবৎসর নানা গ্লানিকর ঘটনায় কলঙ্কিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত ঢাকায় যে অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে তাহাতে হিন্দুদের আজ জাগ্রত হইবার সময় আসিয়াছে। মুসলমানদের পাকিস্থানের জঘন্য মনোবৃত্তি লেলিহান শিখার ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। আজ আর আমাদের সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলে চলিবে না। বস্তুত অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত বাঙ্গালার তিনকোটি মানুষের প্রকৃত অধিকার রক্ষা করিতে আমরা আজও অক্ষম—ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়।” প্রসঙ্গক্রমে বক্তা আরও বলেন, “পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রের ন্যায় নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ভারতেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।



সম্মিলনে বক্তৃতা-রত সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ফটো—তারক দাস

হিটলারের কলুষমাখা হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার অধিকার যেমন ইংলণ্ডের আছে, বৃটিশ-শাসনের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার অধিকার ভারতেরও তেমনই আছে। ভারত যেমন নাৎসী অত্যাচারকে ঘৃণা করে, তেমনি ঘৃণা করে শতাধিক বর্ষব্যাপী বৈদেশিক শাসন ও শোষণের ধীরসঞ্চারী অথচ প্রাণান্তকারী বিষবেগকে।” সভায় উপবিষ্ট সকলেই তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায়, তাঁহার দৃঢ় চিত্ততায় ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার অভিভাষণ-বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

পরদিন বেলা ২টা ৪৫ মিনিটের সময় দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সমগ্র মণ্ডপ পূর্ব্বদিনের মত প্রতিনিধি, দর্শক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা পূর্ণ হয়। এই দিনের সভায় অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ জীবন ও অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কিত তিনটি মূল সমস্যা। প্রথম প্রতিমা নিরঞ্জন বন্ধ রাখায় উদ্ভূত পরিস্থিতি, দ্বিতীয়—ঢাকা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তৃতীয়—বিগত আদমসুমারির ফলাফল। ঢাকা দাঙ্গা সম্বন্ধে প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাস মন্তব্য করেন যে, ঢাকার দাঙ্গায় অনুষ্ঠিত বীভৎস নিষ্ঠুরতা ও অরাজকতা বর্ব্বরযুগের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থক শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন হিন্দুগণকে সাহসিকতার সহিত আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়া গীতার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, নির্লিপ্তভাবে সারা পৃথিবীকে হত্যা করিলেও হিংসা হয় না। আদমসুমারির সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া শ্রীযুত এন, সি, চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, হিন্দুগণ আদমসুমারির সংখ্যাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী নহেন এবং উহা মুসলমানদের হীন অপচেষ্টার ফল বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুত এন্-কে-বসু কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পর্কীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জীর আপোষ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করিয়া উহাকে স্বার্থমূলক বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রতিমা নিরঞ্জন ব্যাপারে হিন্দুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের অধিকার অর্জ্জনের জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে—এই প্রস্তাব উত্থাপন-প্রসঙ্গে সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, “নিরঞ্জন সম্বন্ধে যদি আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে হিন্দুর মর্য্যাদা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্ম বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বিনা-লাইসেন্সে প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দ্দেশ দিতে হইবে।” ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ও

দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় উক্ত নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিতে সানন্দে দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইবেন বলিয়া দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনে গৃহীত বহু প্রস্তাবের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তির দাবী, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে গ্লানিকর উক্তি প্রত্যাহারের দাবী, পাকিস্থান পরিকল্পনা ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা, শিক্ষাবিষয়ে সরকারীনীতির প্রতিবাদ, উপদ্রুত হিন্দুগণকে আশ্রয়দানের জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, আত্মরক্ষার্থ মল্লশালা স্থাপন, হিন্দুযুবকদিগকে সামরিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দুসংগঠনের আবশ্যকতা, অপহৃতা হিন্দুনারীগণকে উদ্ধার ও পুনর্গ্রহণ, নির্ব্বাচনের সময় হিন্দুমহাসভার প্রার্থীদিগকে সমর্থন, জেলে হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্মের সুব্যবস্থা ও বাঙ্গালার বাহিরের হিন্দুদিগকে বৃহত্তম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু সম্মিলনের সহিত বর্দ্ধমানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ হিন্দু ছাত্র সম্মিলনেরও অধিবেশন হইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে সমগ্র হিন্দুসমাজকে সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সর্ব্ববিধ নাগপাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হইতে হইবে। আপন শক্তির বিকাশ সাধনে তাহাকে উচ্চ নীচ, ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দু-ভ্রাতার দরদী হইতে হইবে। তথাকথিত মান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশ্রেণী মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। হিন্দুকে সুসংগঠিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইতে হইবে। নতুবা ভবিষ্যতে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না যে, বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে আজ যাঁহারা 'হিন্দু' বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিতেছেন, উপস্থিত যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান থাকিলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহারা লুপ্ত হইবেন। হিন্দুদের আজ আর অবিচলিতভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা নিষ্ক্রিয় নহে—কালবৈশাখীর ঝড়েও আজ তাহাদের ভূপাতিত করিতে অক্ষম। দেখাইতে হইবে যে, তাহারা তাহাদের লুপ্তপ্রায় স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে যে-কোন ত্যাগস্বীকারে পশ্চাৎপদ নহে। বস্তুত হিন্দুর স্বাধীনতা কি কেবল পূজার অর্ঘ্য পাইবে চারণের কণ্ঠে? হিন্দুসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে সে স্বাধীনতা কি মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে না?

কি যেন চাহিয়াছিনু

শ্রীস্মরজিৎ দাশগুপ্ত

কি যেন চাহিয়াছিনু
ছোট দুটি বাহু মেলি একান্ত আগ্রহে;
কি যেন কহিয়াছিনু
অন্তরের তীব্রতম প্রতিবাদ ভরে ক্রন্দনের রোলে;
প্রথম সে দিবসের নিশ্বাসের সাথে।

সেদিনের আকাঙ্খার শেষে,
দুমুঠি ভরিয়াছিল—মহাশূন্য বিরাট শূন্যতা;
কণ্ঠের সে ধ্বনি,
ধরিত্রীর কাঠিন্যের প্রথম বেদনা,
তরঙ্গের সৃষ্টিমাত্র তুলেছিলো তরঙ্গের পরে—
শূন্যতা সে মহাশূন্য কাঠিন্যের নিবিড় শূন্যতা।

তারপর—
বেড়ে চলে বেলা।
পৃথিবী ঘুরিয়া চলে সূর্য্যের চৌদিকে
আর ঘোরে মেসিনের চাকা।
ট্রপোস্‌ফিয়ার ভরি প্রাত্যহিক জীবনের অস্ফুট আভাষ,
ছন্দে ছন্দে ঘুরি ফেরে বর্ণহীন বন্ধনীর মাঝে।

অভিশপ্ত শতাব্দীর পঙ্কময় আবর্ত্তের আলো,
দুঃস্বপ্ন রাখিয়া যায় চিরন্তনী চিত্রের অঙ্কনে।

ললাটের শিরা উপশিরা
স্ফিত হয়ে ওঠে,
চিবুকের অস্থিদ্বয় হ'লে দৃঢ়তর।
কি যেন চাহিয়াছিনু!
কি যেন কহিয়াছিনু!
পঞ্জরের অন্তস্থলে শান্তির আশ্রয়?
সৌন্দর্য্যের দেবত্বের এতটুকু আলো?
রূপে, রসে, মাধুর্য্যেতে প্রতিভার সম্যক বিকাশ?
উপলে বন্ধুর পথে
উপলের ভিত্তি খুঁজে ফিরি,
আর খুঁজি—ভগ্ন, ছিন্ন অন্তরের মালিন্যের অনন্ত উৎসব।
চিম্‌নি গর্জ্জিয়া যায়
উদ্‌গারিয়া চলিয়াছে কলঙ্কের কৃষ্ণ ধূম্ররাশি,
একপাশে নুয়ে চলে ভারবাহী বুভুক্ষিত ভিখারী পুরুষ,
আর পাশে বেচিতেছে দেহ,
ধরার আরাধ্যা নারী—ছলনাময়ী দেহ-পসারিণী।

সাময়িকী

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

আগামী বড়দিনের ছুটীতে ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ৪ দিন কাশীধামে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সাহিত্য—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (২) দর্শন—ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার (৩) ইতিহাস—ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (৪) সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী (৫) মহিলা শাখা—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (৬) শিল্পী—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এখনও সম্মিলনের মূল সভাপতি এবং বিজ্ঞান ও বৃহত্তরবঙ্গ শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। তিন দিন সম্মিলনের পর চতুর্থদিনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র স্মৃতি বাসরের অনুষ্ঠান করা হইবে। কাশীতে শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, বিমলানন্দ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ বিশি প্রভৃতি কর্ম্মীদের চেষ্টায় সম্মিলন অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সংশয়ান্দোলিত মানুষের চিত্তে একটা নাড়া দিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। কেন না, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আদর্শবাদী সত্যযুগের কথা নহে। সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে ইহা সর্ব্বযুগের সার্ব্বজনীন সত্য; সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা কুসংস্কার মানুষের মজ্জাগত নহে,—চেষ্টা করিয়া ইহা তৈয়ারি করা হইয়াছে। স্যর সর্ব্বপল্লী বলিয়াছেন, 'আন্তর্জাতিকতা প্রাণহীন স্পন্দনহীন একাত্মতা নহে; জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতারই একটি প্রধান সোপান। উদার ও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেশপ্রেম ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং ইহাতে তাহার অর্থ আরও গভীর ও ব্যাপক হইয়া ওঠে।' বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত। জাতীয় ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি ও সৌহার্দ্দ্যই তাহার লক্ষ্য; কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে যে যুগে বাস করিতেছি, সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে, পরস্পরের প্রতি সন্দেহে, অবিশ্বাসে ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অপ্রীতিকর প্রলোভনে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে। জীবনাদর্শ ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণতার আঁধারে তলাইয়া যাইতেছে। তাই স্যার সর্ব্বপল্লী ছাত্রদিগকে বার বার উচ্চ লক্ষ্য ও মহান আদর্শের দিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন—
সঙ্গে ঢাকার ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আজিকার সন্দেহ, অবিশ্বাস ও হানাহানির যুগে যাহারা জগতে শান্তি ও সংস্কৃতির প্রসার কামনা করেন তাঁহারা যেন এই সত্যটা কখনও না ভুলেন।

পরলোকে শিক্ষাবিদ—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চান্সেলর শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা মহাশয়ের পিতা ডক্টর স্যর গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় পরলোকগত হইয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরলোকগত ঝা মহাশয়ের মত পণ্ডিত বর্ত্তমানে খুব বেশী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তিনিও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ছিলেন। গঙ্গানাথ

শুধু জ্ঞানার্জন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নানা জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞানকে দেশবাসীর গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষার সংস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কার প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নিজস্ব শিক্ষাবিভাগ খুলিয়া প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের কাজে অগ্রণী হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বিভিন্ন শিল্প, আইন ও চিকিৎসা বিদ্যা এবং আর যাহা কিছু পুথিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবলম্বন, তাহার সবগুলির উপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হওয়া প্রয়োজন এবং ভাবমূলক ও বৃত্তিমূলক—এই দুই রকম বিদ্যার প্রসঙ্গেই উপাধির মর্য্যাদাও সমান বলিয়া গণ্য হওয়া দরকার। হাতে কলমে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী যে সকল বিদ্যা বর্ত্তমানে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাস দরবারে অনেকটা অস্পৃশ্যের মতই উপেক্ষিত। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনই আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের এই পথে আকৃষ্ট করিতে হইলে এই সকল শিক্ষাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি ও মর্য্যাদা দেওয়া দরকার। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও আমরা এই সুযোগে সে দিকে মনোযোগী হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

করাচীতে শ্যামাপূজা—

করাচীর প্রবাসী বাঙ্গালীরা এবার তথায় শ্যামাপূজা উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরাই বঙ্গীয় সম্মিলনীর সম্মুখের মাঠে পূজার ব্যবস্থা করেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ নিজেই পৌরহিত্য করেন এবং মহারাষ্ট্রবাসী এক কুম্ভকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। সমস্ত রাত্রি উৎসবের পর পরদিন দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে বাঙ্গালার এই সকল উৎসব বজায় রাখার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

বিভাবতী দেবী—

জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধানসচিব ৺সংসারচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ ও দিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অপ্রকাশচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী বিভাবতী দেবী সম্প্রতি অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ—ইসলামপুরবাসী রায় বাহাদুর ৺চারুকৃষ্ণ মজুমদারের কন্যা; তাঁহার মত ধর্ম্মপ্রাণ ও স্বদেশ-



বিভাবতী দেবী

বৎসল মহিলা অতি অল্পই দেখা যায়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কমলা লেকচার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ১৯৪৩ সালের কমলা লেকচারার পদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে নির্ব্বাচন করিয়া যোগ্যতার সমাদরই করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্য ও মনীষা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে, ইতিহাসে অনুরক্তি তাঁহার মনীষাকে আরও প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—'ভারতের আবিষ্কার।'

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৩৫ সালের জন্য স্যর আকবর হায়দরী ও ১৯৪১ সালের জন্য স্যর যোগেন্দ্র সিংকে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। "ভারতীয় ঐক্য—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক" ও "শিখবাদের অভ্যুদয় ও

ও ভারতের জাতীয়তায় তাহার দান" যথাক্রমে তাঁহাদের বক্তৃতার বিষয়।

বঙ্গীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচন—

বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের নিয়োগে পরিষদে যে পদ খালি হইয়াছিল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স কেন্দ্র সেই পদে শ্রীযুত ডি. এন্. সেনকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হিসাবে শ্রীযুত সেন সর্ব্বজনপরিচিত।

শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীর কারাবরণ—

দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্স্' দৈনিক পত্রের আদালত অবমাননা মামলায় শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীকে যে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তিনি তাহা দিতে অসম্মত হইয়া কারাবরণ করিয়াছেন। হিন্দুস্থান টাইম্স্-এর মীরাটস্থ সংবাদদাতাকেও এই মামলায় অন্যতম আসামীরূপে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই বলিয়া ম্যানেজিং-ডিরেক্টররূপে শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী তাঁহার সহিত একযোগে কারাগারে যাওয়ার সংকল্প করিয়াই আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত দেবদাসের এই মহত্বে ও সহকর্মীর প্রতি মমত্ব-বোধে এদেশের সাংবাদিকমাত্রই গৌরব বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম-ভারত চুক্তি ও তাহার পর—

বেশী দিনের কথা নহে। ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে স্যর গিরিজাশঙ্কর রাজপেয়ী যে ব্রহ্ম-ভারত চুক্তিনামায় দস্তখৎ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা শুধু ভারতবাসীর আর্থিক ক্ষতিই করে নাই, পরন্ত ভারতবর্ষের আত্মসম্মানও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এক্ষেন ব্রহ্মসরকার সম্প্রতি আকিয়াবে কৃষিকার্য্যে সাহায্যের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার অশিক্ষিত শ্রমিক সরবরাহ করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত সরকার এই প্রার্থনার কি উত্তর দিবেন তাহা জানি না; তবে এ দেশের স্বার্থ ও সম্মান সম্বন্ধে ভারত সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, তিনি কখনই এই অপমানজনক প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। ভারতের শ্রমিক যখন ব্রহ্মের পক্ষে এত অপরিহার্য্য তখন তাহা জানিয়াও ব্রহ্ম সরকার ভারতীয়দের জন্য অপমানজনক ব্যবস্থা করিলেন কেন? ভারত সরকারই বা কোন্ অজ্ঞাত কারণে তাহাতে সম্মত হইলেন তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য?

শ্রীখণ্ডে বড়ডাঙ্গার মেলা—

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সহচর প্রসিদ্ধ ভক্ত নরহরি সরকার ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ শ্রীখণ্ড গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এখনও প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীখণ্ডবাসী ঠাকুরবংশীয়গণ গ্রামের নিকট নরহরির ভজনস্থান বড়ডাঙ্গার মাঠে তাঁহার তিরোভাব উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসরই উৎসবের তিনদিন মাঠে বহু জনসমাগম হয়। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়াই ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হন। এবার ঐসময়েই মাঠে মেলার পার্শ্বে শ্রীখণ্ডগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত ও কীর্ত্তনীয়া স্বর্গত রাখালানন্দ ঠাকুরের এক স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে এবার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন, ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি তথায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ স্মৃতিমন্দিরে বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ রক্ষিত হইবে এবং তথায় একটি কীর্ত্তন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব গ্রন্থসংগ্রহ বা তাহার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত কোথাও হয় নাই। শ্রীখণ্ডবাসীরা সে অভাব পূর্ণ করিলে বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রাভিনেতা নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ই নভেম্বর সিমুলতলায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। নির্ম্মলবাবু কালীঘাটনিবাসী কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব

কাউন্সিলার শ্রীযুত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। সাইলেণ্ট পিকচারে হার এবং অভিনব নামক দুইখানি চিত্রনাট্যে ইহাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তৎপরে নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত হাস্য-রসোজ্জ্বল চিত্র 'মাসতুত ভাই'-এ নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। অতঃপর 'অপরাধী', 'বড়দিদি', 'সোনার সংসার', 'শাপমুক্তি', 'মায়ের প্রাণ' প্রভৃতিতে অভিনয় করিয়া তিনি চিত্রামোদী সমাজের প্রশংসাভাজন



নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

হন। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি নির্ম্মলবাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ পিতা, বিধবা পত্নী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় নারী ও সাম্প্রদায়িকতা—

নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের পাঞ্জাব শাখার বার্ষিক অধিবেশনের সভানেত্রী লেডি ওয়াজির হাসান সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় নারীদের প্রতি যে আবেদন করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে শুধু যে দেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হইবে তাহা নহে, পরন্তু স্বাধীনতা লাভও সুগম হইবে। এবিষয়ে দেশের নারীগণ যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন তাহাও তিনি মনে করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা অনায়াসেই তাঁহাদের পুত্র-কন্যার শিক্ষার এমন ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে পারেন, যাহাতে তাহারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া উদার আদর্শের অনুগামী হইতে পারে। নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলাম। লেডি ওয়াজির হাসানের আবেদন ফলপ্রসূ হয় ইহাই আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

বন্দী মুক্তি—

কিছুদিন হইতেই জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল যে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। এদেশে ও বিলাতে ইহা লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন চলিয়াছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে অনেককে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় মহাসভার সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর দৃঢ়বিশ্বাস, ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তি না হইলে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের যে ব্যাপক কল্পনা করা হইতেছে তাহা নিষ্ফল হইবে। বন্দীদের মুক্তির মধ্যে অন্তরীণ বন্দীদের ধরা হয় নাই। তাহাতে এদেশের কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যাঁহারা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিল তাঁহারা মুক্তি পাইল; কিন্তু যাঁহাদিগকে অকারণে আটক রাখা হইয়াছে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল না; ইহার মত অযৌক্তিক অসঙ্গত আর কিছু হইতে পারে না। সে যাহাই হোক, মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিতজীর মুক্তি সংবাদে ভারতবাসী মাত্রই খুশী হইবেন। সংগ্রাম যখন ভিতরে বাহিরে আসন্ন, তখন ইঁহাদের মত নেতাদের কর্ম্ম-কুশলতা দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য।

বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার পতন—

শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন। গত ছয় মাস ধরিয়া নানা জল্পনাকল্পনা, গোপন সলাপরামর্শ প্রভৃতির পরও কিছুতেই বাঙ্গালার সুখী পরিবারকে ধরিয়া রাখা গেল না। কোয়ালিশন দল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। চারিজন মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব এক পক্ষে—আর

প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থার ষড়যন্ত্র অপর পক্ষে চলিতেছিল। একপক্ষ প্রকাশ্যে, আর একপক্ষ অপ্রকাশ্যে কর্ম্মব্যস্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষাবলম্বীদের অনাস্থার প্রস্তাব কূটচালে স্থগিত রাখিয়াও দুই পক্ষের মধ্যে মিলন যখন কোনমতেই সম্ভব হইল না, তখন নিরুপায় মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিঃ ফজলুল হকের দলে বিভিন্ন দলভুক্ত অধিকসংখ্যক সদস্য যোগ দিয়াছেন। অপরপক্ষের শক্তি উহার তুলনায় খুব কম। কাজেই আমাদের বিশ্বাস



স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের পৌত্রী ও শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নীলিমা দেবী

মিঃ ফজলুল হককেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করা হইবে। প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার পতনে নির্য্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

নিজাম রাজ্যে হিন্দি-উর্দু সমস্যা—

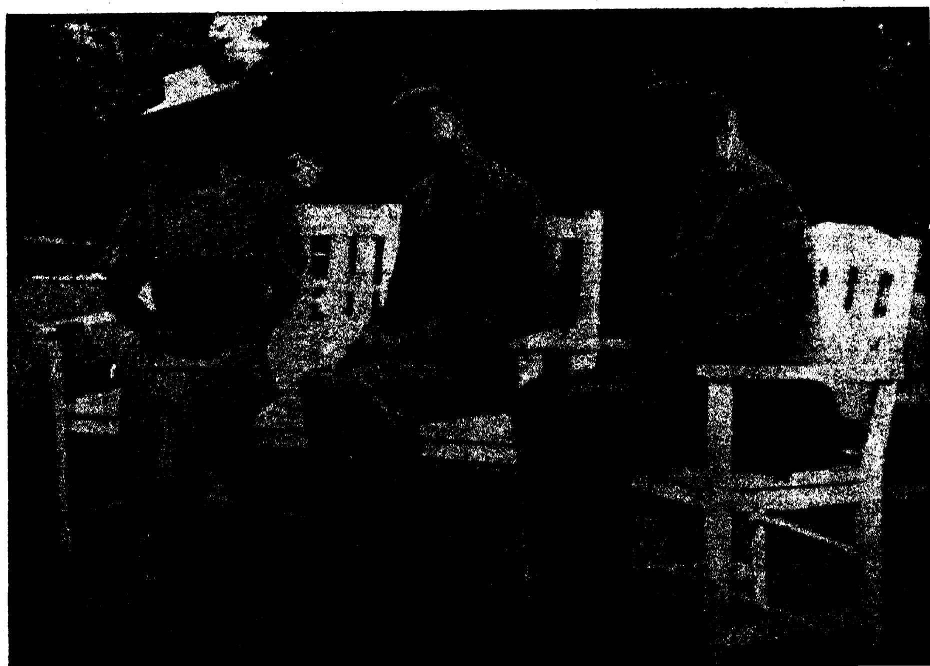
হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; কিন্তু শোনা গেল নিজাম সরকার নাকি উর্দুভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ফলে রাজ্যের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দল সম্মিলিতভাবে ইহার বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। এই স্মারকলিপিতে তাঁহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত হায়দ্রাবাদের সংযোগ স্থাপনের অনুকূলে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিবর্ত্তনে আবেদন জানাইয়াছেন। ব্যাপারটি গুরুতর; হায়দ্রাবাদ মুসলিম শাসিত রাজ্য হইলেও তাহার অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু। বলাবাহুল্য তাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দু নহে—হিন্দি। হিন্দি আর উর্দুর মূলগত পার্থক্য অনেক এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি সংস্কৃতির বাহক; সুতরাং গায়ের জোরে হিন্দুদের উর্দু ভাষায় পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। দুইটি ভাষার লিপিমালাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষার পর নিজাম সরকার উর্দুকে শিক্ষার বাহন করিয়া রাজ্য মধ্যে একটা বিরাট বিপ্লবকে আনয়ন করিবেন না।

বাঙ্গালার পত্তনি তালুক বিক্রয়—

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, বন্যা এবং ঝঞ্চাবিধ্বস্ত বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বীরভূম জেলার পত্তনি তালুকগুলি বৎসরের মধ্যভাগে নিলাম বিক্রয় হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। উক্ত জেলাগুলিতে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে শস্য নষ্ট হওয়ায় সরকার ঐ সকল জেলার কালেক্টরকে আগামী বৎসরের ফসল কাটার সময় না আসা পর্য্যন্ত বাকি রাজস্বের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তিগুলি নিলাম বিক্রয় হইতে রেহাই দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ হইতে এই আশা করা যায় যে, সম্পত্তির মালিক জমিদারেরাও তাঁহাদের অধীন প্রজাদের অনুরূপ সুবিধা দিবেন। কিন্তু জমিদারেরা সরকারের নিকট হইতে নিজেরা সুবিধা পাইয়াও নিজেদের অধীন পত্তনি তালুকগুলি খাজনা বাকির দায়ে নিলাম-বিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। নিয়মানুসারে কালেক্টরেরাও নিলাম-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। কারণ একমাত্র জমিদারদের ইচ্ছাতেই নিলাম বিক্রয় স্থগিত রাখা যায়। এই ব্যাপার বাঙ্গালা সরকারের দৃষ্টিগোচর হইলে সরকার হইতে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, জমিদারগণ নিলাম বিক্রয় বন্ধ না করিলে তাঁহারা যে সুযোগ পাইয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।



সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ কর্ত্তৃক একখানি সাঁজোয়া গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া ইষ্টার্ণ-কমাণ্ডের সশস্ত্র বাহিনী পরিদর্শন



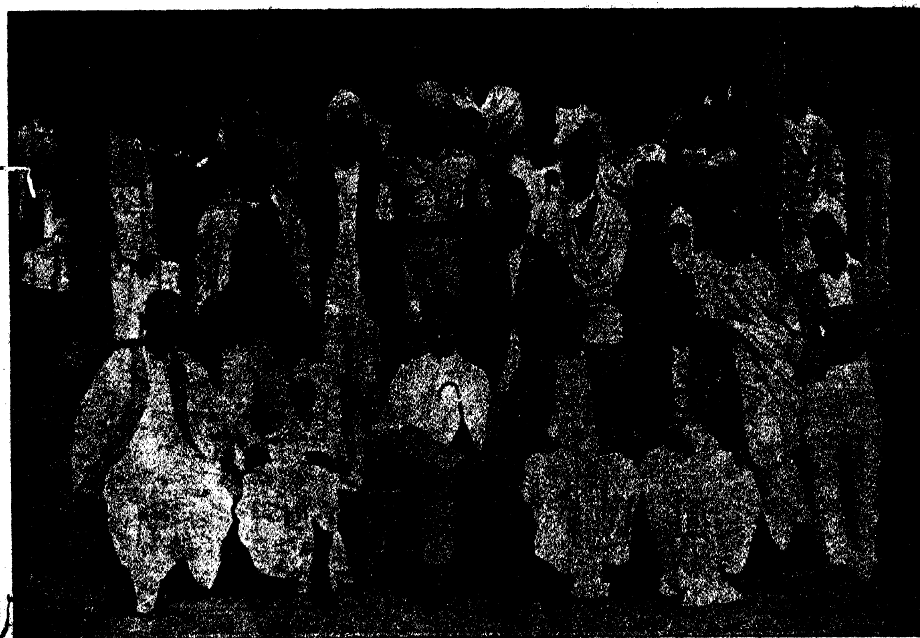
অটোয়া সহরে সম্রাটের ভ্রাতা ডিউক অফ্ কেন্ট—সঙ্গে ক্যানাডার গভর্ণর জেনারেল ও প্রিন্সেস এলিস



আমেরিকাস্থ বৃটীশ দূত—লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও তাঁহার পত্নী



ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুত প্রথম জাহাজ—'পাঞ্জাব'



[illegible] [illegible] সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত হিন্দু নেতৃবৃন্দ—মধ্যে বীর সাভারকর শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি

জগত্তারিণী পদক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগকে গুণের মর্য্যাদাস্বরূপ 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করিয়া থাকেন। এবৎসর প্রসিদ্ধ মহিলা কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়াকে এই পদক দেওয়া হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই পদক মহিলাদের মধ্যে স্বর্গতা স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী পাইয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়ার সাহিত্য প্রতিভার এই স্বীকৃতিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতেছি।

পরলোকে তরুণ সাহিত্যিকা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর (দর্শন শাখা) ছাত্রী লুলুথান ওরফে শ্রীলেখা দেবী টাইফয়েড রোগে কয়দিন ভুগিয়া মাত্র একুশ বৎসর বয়সে গত ২৪শে নবেম্বর



শ্রীলেখা দেবী

পরলোকগতা হইয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি ছিল অসাধারণ এবং শ্রীলেখা দেবী—এই নামে তাঁহার রচনাদি প্রকাশিত হইত। তাঁহার অকালবিয়োগে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

স্যর আজিজুল হকের পদোন্নতি—

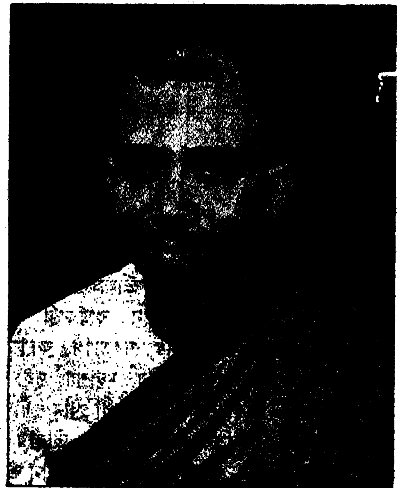
স্যর মুহম্মদ আজিজুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেন্টের পদে সমাসীন ছিলেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। স্যর আজিজুল একজন কৃতী পুরুষ, তাঁহার এই পদোন্নতিতে আমরা খুশী হইয়াছি। দেশ এবং জাতির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভগবান তাঁহাকে সাহায্য করুন—এই কামনাই আমরা করিব।



স্যর আজিজুল হক

ডাক্তারের সম্মান—

কলিকাতা মেডিকাল স্কুলের শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবারও ভারতীয় লাইসেন্সিয়েট



ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

চিকিৎসক সম্মিলনের আমেদাবাদে একত্রিংশ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসর বোম্বায়ে উক্ত সম্মিলনের ত্রিংশ অধিবেশনেও তিনিই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী ঐ সম্মান লাভ করেন নাই এবং কোন চিকিৎসকই উপর্য্যুপরি দুইবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। অমূল্যবাবু ২৪ পরগণা জিলার অধিবাসী, ২৪ পরগণা জিলা বোর্ডের সদস্য ও বারাসত লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান। আমরা তাঁহার এই গৌরবে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সম্মানলাভ—

১৯৪১ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভুবনমোহিনী দাসী স্বুবর্ণপদকটি' প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে প্রদান করিয়া প্রকৃত গুণের সমাদর করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বুবর্ণ পদক' লাভ করিয়াছেন। আমরা তাহার এই সম্মানলাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কর্পোরেশনের নূতন কর্ম্মকর্ত্তা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদত্যাগ করায় সেই পদে শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শৈলপতিবাবু দীর্ঘকাল কর্পোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং তাঁহার উক্ত পদের যোগ্যতাও আছে; সুতরাং আমাদের বিশ্বাস তাঁহার কার্য্যকালে কর্পোরেশনের অনাচার বিদূরিত হইয়া নগরবাসীদের নানা কল্যাণ সাধিত হইবে।



শ্রীশৈলপতি চট্টোপাধ্যায়

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর সম্মান—

এবার বড়দিনের ছুটিতে মাদ্রাজে নিখিল ভারত মডারেট (উদারনীতিক) সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়। বাঙ্গালী যে এখনও নিখিল ভারত রাজনীতিতে পিছাইয়া পড়েন নাই, তাহা স্যর বিজয়প্রসাদের এই সম্মান লাভের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।



স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়

দ্বিতীয় বার আর একটি বল বাউণ্ডারীতে পাঠাতে গিয়েই জব্বরের হাতে ধরা পড়েন। তরুণ খেলোয়াড় এস ব্যানার্জি ব্যাটিংয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এস দত্ত ৬৭ রানে ৩টি উইকেট পান।

বাঙ্গালাদলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয় নি।

এ দাসের নট্ আউট ৮৪ রান এবং এ দেবের ৫০ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কে বসু ৪৩ রান ও রামচন্দ্রের ৩৯ রানের উল্লেখ করা যায়। এন চৌধুরী ৮৬ রানে ৪টি উইকেট পান।

চা পানের কিছু পূর্ব্বে বিহার দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে আর দিনের শেষে এক উইকেটে ৩৭ রান করে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কিন্তু তিন দিন ব্যাপী খেলার নিয়ম অনুসারে প্রথম ইনিংসে বাঙ্গালা দল অগ্রবর্ত্তী থাকায় খেলায় জয়লাভ করেছে।

বরোদা—১৭৮ ও ১২৬

সিন্ধু—২৩৭ ও ৬৮ (২ উইকেট)

বরোদা পশ্চিমাঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় ৮ উইকেটে বরোদা দলকে পরাজিত করেছে।

বরোদার প্রথম ইনিংসে ভি এম পণ্ডিত ৪৫, অধিকারী ৪৪ এবং সি এস নাইডু ২৫ রান করেন। মোবেদ ২০ রানে ৪টি ও লাকদা ৩৯ রানে ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ইন্দালকার ২৯, নিম্বলকার ২০ রান করেন।

সিন্ধুর প্রথম ইনিংসে কিষেণ চাঁদের ৯২, দাউদ খাঁর ৫৫ এবং জনসনের ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। ৬৪ রানে হাজারী ৫টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে কামরুদ্দিন নট্ আউট ৪৫ থাকেন।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট :

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয়, পার্শি এবং অবশিষ্ট এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর এই প্রতিযোগিতাটি সুশৃঙ্খলা এবং সুপরিচালনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ক্রীড়ামোদী, জনসাধারণ এবং শুভানুধ্যায়ীর সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাব থাকলে প্রতিযোগিতা পরিচালনা ব্যাপারে পরিচালকমণ্ডলীদের বহু পূর্ব্বেই বিশেষ বেগ পেতে হত। সম্প্রতি এই প্রতিযোগিতাটি বন্ধ করে দেবার জন্য একটি বিরোধীদলের সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদল এই ধোঁয়া তুলে আন্দোলন করছেন যে, এই প্রতিযোগিতাটি দেশের জনসাধারণের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করছে। জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হিসাবে এই প্রতিযোগিতা বর্জ্জন করবার জন্য বিরোধী দল সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করছেন। প্রতিযোগিতার সপক্ষে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা বলছেন, বিগত পঁচিশ বৎসরে যে প্রতিযোগিতা যোগ্যতার সঙ্গে চলে আসছে আজ তাকে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হিসাবে বর্জ্জন করার কোন সদযুক্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিযোগিতাটি সাম্প্রদায়িকতার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করছে তা অনুধাবন করবার হঠাৎ কি কারণ ঘটল। উক্ত প্রতিযোগিতায় দল গঠন ব্যবস্থাটাই কেবল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির উপর স্থাপিত। খেলোয়াড়দের উপর তাতে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। খেলার শেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়রা ভোজ উৎসবে একত্রে মিলিত হয়ে বন্ধুত্ব এবং খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন। দীর্ঘ বৎসরে যদি কণামাত্র সাম্প্রদায়িতার বিষ প্রবেশ করত' তাহলে খেলোয়াড়দের মধ্যে এ হৃদ্যতা ও মনের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক পূর্ব্বেই দেখা দিত। পক্ষীয় দলের যুক্তির সঙ্গে আমরা একমত হয়ে প্রতিযোগিতার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বিরোধী দল যে কারণ দেখাচ্ছেন তা কিছু অংশে সত্য হলেও প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষে সমর্থন যোগ্য নহে। প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় সমর্থক দলের মধ্যে বিজয়লাভের উদ্যম লক্ষিত হয়। কোথাও তা' প্রবল কোথাও বা তা ক্ষীণ। জয়লাভের প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ কোন প্রকার দোষের নয়। দোষের হলে পৃথিবীর বহু সভ্যদেশ থেকে সকল প্রকার প্রতিযোগিতা নিঃচিহ্ন হয়ে যেত। পাশ্চাত্য দেশে আন্তর্জাতিক, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় তা অবলোকন করে বিরোধীদল নিশ্চয় হতাশ হবেন। বিরোধীতার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখ এই কারণে যে, এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যাঁরা দণ্ডায়মান হয়েছেন তাঁরা সকলে শিক্ষিত, খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদী। বিজয় নগরের মহারাজা, নবনগরের জামসাহেব, পাতিয়ালের মহারাজা, প্রবীণ খেলোয়াড় প্রফেসার দেওধর, বিশিষ্ট খেলাধূলা প্রচারক শ্রীযুক্ত তালায়ার খাঁ, কপূর্রতলার মহারাজা প্রভৃতি বিরোধীদলকে সমর্থন করেছেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্য ভাবে দলে যোগ দিয়েছেন। এমন কি মহারাজারা নিজেদের অধীনস্থ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুমতি দেন নি। বিপক্ষীয় দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলী ডিসেম্বর মাসের ১৩ই তারিখ থেকে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে খেলা আরম্ভ করবেন স্থির করেছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্নদলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। এস ব্যানার্জি, অমরনাথ এবং ভিনু মানকদ হিন্দু দলে যোগদান করতে পারবেন না। কারণ তাঁরা রাজা মহারাজার অনুমতি পান নি। দেশের সকল শ্রেণীর ক্রীড়ামোদীই পেণ্টাঙ্গুলার খেলার ফলাফলের জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে।

উত্তর ভারত লন টেনিস :

উত্তর ভারত লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলসে গাউস মহম্মদ তাঁর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এস এল আর সোহানীকে পরাজিত করেছেন। খেলাটিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে গাউস মহম্মদ ৫-৭, ৬-০, ৪-৬, এবং ৬-২ গেমে এস এল আর সোহানীকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস লীলা রাও ৬-০ ও ৬-৪ গেমে মিস্ হাজারীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস্ হাজী ও মিসেস ম্যাসে ৬-০ ও ৬-৪ গেমে মিস্ লীলা রাও ও মিস্ উডব্রীজকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডবলসে হরিশচন্দ্র ও খন্না ৬-১, ০-৬ ও ৬-৪ গেমে সালীম ও কোমদলকে পরাজিত করেছেন।

রিগস ও কোভাক্স ঃ

আমেরিকান এবং উইম্বলডন লন টেনিস চ্যাম্পিয়ান রবার্ট রিগস ও আমেরিকান 'ইনডোর' চ্যাম্পিয়ান কোভাক্স পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের দলে যোগ দিয়েছেন। প্রকাশ, তাঁরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের পেশাদার খেলোয়াড় বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁরা দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে মোট আশীটি খেলায় যোগদান করবেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ফ্রেড পেরী এবং ডোনাল্ড বাজের সঙ্গেও তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রবেন। আমেরিকান টেনিস মহলে 'ববি' রিগসের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁর বাড়ী চিকাগো হ'লেও রিগস ছেলেবেলার বেশীর ভাগ সময় কালিফোরনিয়ায় অতিবাহিত করেন। এইখানেই টেনিস খেলায় তাঁর হাতে খড়ি। বর্ত্তমানে রিগসের বয়স মাত্র তেইশ বছর। ১৯৩৯ সালে একুশ বছর বয়সে তিনি উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন এবং ঐ বৎসরেই আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৪১ সালে ডন ম্যাকনীলের কাছে পরাজিত হ'লেও বর্ত্তমান বৎসরে ম্যাকনীল এবং কোভাক্সকে যথাক্রমে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে পরাজিত করে আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানসীপ পুনরায় লাভ করেন। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় প্রথম বার অবতীর্ণ হয়ে উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার সম্মান মাত্র কয়েকজন পেয়েছেন। তাঁদের নাম খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় জি এল প্যাটারসন, ডবলউ টি টিলডন, এইচ ই ভাইন্স এবং সেই সঙ্গে তরুণ খেলোয়াড় ববি রিগস। এ ছাড়া টুর্ণামেণ্টের 'Tiple crown' লাভ করে তিনি একটি 'রেকর্ড' ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। রিগসের খেলার মধ্যেও তাঁর নিজস্ব নৈপুণ্য আছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনরূপে পরাজিত করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। খেলায় বিভিন্ন রকম মারের ভঙ্গী তাঁর খেলার প্রধান আকর্ষণ। উইম্বলডন প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে তিনি যেদিন অপূর্ব্ব ক্রীড়া কৌশল দেখিয়ে খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় পুনসেককে পরাজিত করেছিলেন সে দিনটিকে প্রতিযোগিতার জীবনে একটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয় দিন বলা যেতে পারে।

আমেরিকান 'ইন-ডোর' সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন বিজয়ী কোভাক্স একজন উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড়। আমেরিকান লন্ টেনিস মহল তাঁর উপর অনেকখানি আশা রাখে। কোভাক্সও নিকট ভবিষ্যতে জীবনের গৌরবময় দিনের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর বর্ত্তমান ক্রীড়াচাতুর্য্য খুবই আশাপূর্ণ। গত এক বৎসরের মধ্যে উইম্বলডন এবং আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়ী আর এল রিগসকে তিনি একাধিকবার পরাজিত করেছেন। এছাড়া ভূতপূর্ব্ব আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান ডন ম্যাকনীলকেও পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় ৩-০ গোলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল কাপ বিজয়ের সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করেছে। ফুটবল খেলার উপযোগী সময় না হলেও ফাইনাল খেলার দুই দিনই বহু সংখ্যক দর্শকের সমাগম হয়েছিল। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ইহাই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বে ক্রীড়ামোদিদের উদ্যোগে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের পর কোন অজ্ঞাত কারণে আবদ্ধ থাকে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ও যোগ দিত না এবং বর্ত্তমানের ন্যায় আকর্ষণও ছিল না। সেই সকল প্রতিযোগিতায় বেশীর ভাগই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জয় লাভ করেছিল। বাংলা দেশ ফুটবল খেলায় যে সত্য সত্যই অন্যান্য প্রদেশের ফুটবল প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নত এবং শক্তিশালী তা একাধিক বার প্রমাণিত হ'য়েছে।

বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা দুইদিন হয়। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ফাইনাল খেলার প্রথম দিন খেলোয়াড় সুলভ মনের পরিচয় দিতে পারেন নি বলে শিক্ষিত মাত্রেরই দুঃখের কারণ। কোন অবস্থাতেই অভদ্র ব্যবহার আমরা সমর্থন করি না। যে ক্ষেত্রে দুইটি উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে খেলার সর্ব্বপ্রকার পরিস্থিতির মধ্যেও খেলার স্বাভাবিক অবস্থা আশা করা আমাদের একেবারেই অন্যায় নয়। খেলার সূচনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়গণ খেলার বিধিনিষেধ উপেক্ষা ক'রে অযথা শারীরিক প্রয়োগে মাঠে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষায় যত্নবান থাকেন। রেফারী কর্ত্তৃক বহুবার সতর্কিত হয়েও তাঁরা তাঁদের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন নি। প্রায় সকল খেলোয়াড়কেই সতর্ক করতে রেফারী বাধ্য হ'ন। খেলার এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার দ্বিতীয়ার্দ্ধে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোমানা বিপক্ষদলের গোলের অনতিদূরে গোল করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেই অবস্থায় গোল রক্ষক আমিন সোমানার উপর উচ্চ লম্ফন দ্বারা ঝাঁপিয়ে পড়েন। রেফারী 'পেনাল্টি' সর্টের নির্দ্দেশ দিলে পাঞ্জাবদলের খেলোয়াড়রা রেফারীর এই নির্দ্দেশ অমান্য করে মাঠ ত্যাগ করবার জন্য অগ্রসর হয়। তাঁদের কয়েকজন সমর্থকও মাঠে প্রবেশ করে রেফারীকে আক্রমণ করে। পুলিশ এবং কলিকাতার দর্শকদের চেষ্টাতেই কিছু সময়ের মধ্যে মাঠে খেলার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। উভয় পক্ষে ২টি করে গোল দেয়। শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিতভাবে সেদিনের মত খেলাটি শেষ হয়।

দৈহিক শক্তি এবং শারীরিক গঠনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্থানীয় ছাত্রদের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ছিলেন। শারীরিক প্রয়োগে প্রাধান্য রক্ষা করবার চেষ্টা না করলে তাঁহারা বিজয়ী হ'লেও কোনরূপ অসঙ্গত হ'ত না। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ওয়াহিদের বল সংগ্রহ, আদান প্রদান এবং সর্ব্বোপরি বুট পায়ে বলসর্ট দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ফাউল করে খেলে সমস্ত সুযোগ তিনি নষ্ট করেছেন। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে কলিকাতা



শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী   ঝড়ের পথে   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্









মাঘ—১৩৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে জননী

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী পিএইচ-ডি (লণ্ডন)

বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে জননীর স্থান পিতার অনেক উচ্চে। তাঁর সম্মান সত্যই অতুলনীয়। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু—তাঁর জন্য যে সব ক্রিয়াদি সম্পাদন করা হয়, অথবা তিনি যে সব ক্রিয়াদি সম্পাদন করেন, তা' সব থেকে ইহাই প্রমাণিত হয়। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি পিতার থেকে সন্তানের সহস্র গুণ সম্মানের অধিকারিণী।

জননীত্বের সূচনার প্রারম্ভ থেকে তিনি সন্তানের কল্যাণের জন্য অনেক "সংস্কার"-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। সংস্কারগুলির মুখ্য কর্তা তিনি ; পিতা তাঁকে নির্বিঘ্নে ক্রিয়াসম্পাদনে যথাসাধ্য সহায়তা করেন সন্দেহ নাই। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি স্ত্রী-সংস্কার ; এগুলির মঙ্গল সম্পাদনের জন্য জননীর ব্যগ্রতা, জননীর তৎপরতা সমধিক। জননী শরীরের অংশীভূত সন্তানের মঙ্গলকামনায় অহর্নিশি নিরত থাকেন—সংস্কারগুলি তার প্রতীক মাত্র। পিতা উপস্থিত না থাকলেও সংস্কার-ক্রিয়ায় কোনও বিঘ্ন হয় না ; পিতার বিনিময়ে পিতৃব্যও এ সংস্কারে জননীকে সাহায্য করতে পারেন। জননী শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে এ সময়ে অশুচি থাকেন বলে হোমাদি তিনি নিজে করতে পারেন না ; তাই পিতা বা পিতৃব্য বা অন্য কেহ তাঁর হয়ে এসব সম্পাদন করেন।[১]

ভাবী জননী চতুর্থ মাসে[২] অনবলম্ভন ক্রিয়া সম্পাদন

১। গোপীনাথ ভট্টের সংস্কার-রত্ন-মালা, পুনা, ১৮৯৯, পৃঃ ৮১৩, পংক্তি ১০ ও পরবর্তী ; দ্রাহ্যায়নগৃহ্যসূত্র, ২.১৮ ; আশ্বলায়নগৃহ্য-কারিকা, বোম্বে, দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৯০৯, পৃঃ ২৭১, পংক্তি ১২—১৩। গর্ভিণীর পালনীয় বিধান : সংস্কার রত্নমালা, ৮১৫ পৃঃ, ১৪ পংক্তি প্রভৃতি।

২। সংস্কার-ময়ূখধৃত বাজপেয়-গৃহ্য মতে ; ময়ূখকারের মতে এ ক্রিয়া পুংসবন বা তারও অব্যবহিত পরে সম্পাদন করা যেতে পারে ; সংস্কার-ময়ূখ, বোম্বে, ১৯১৩, ২০ পৃঃ।

করেন, যাতে স্বশরীরস্থ দোষাদি সন্তানে সংক্রামিত না হয়।[৩] সংস্কার-ময়ূখোদ্ধৃত আশ্বলায়ন মতে অগ্নিশালায় শয়ান অবস্থায় তাঁর নাসারন্ধ্রে অজিতা নামক ওষধির গুঁড়া দেওয়া হয়। শৌনকের মতে[৪] পিতা একজন অল্পবয়স্কা কন্যার দ্বারা নিষ্পেষিত দূর্বা-রস মন্ত্রোচ্চারণ সহ[৫] মায়ের পশ্চিমে দাঁড়িয়ে তাঁর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে দেবেন। পিতা যখন আহুতি প্রদান করেন, তখন তিনি তাঁকে স্পর্শ করে থাকেন। তারপর পিতা তাঁকে স্পর্শ করে তাঁর দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করেন। শৌনকের মতে এ সংস্কার প্রতি সন্তানের জন্য করণীয়।

ভাবী জননী তিন[৬], চার[৭] মাস বা আরো পরে[৮] পুংসবন ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এ ক্রিয়ার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ব-বেদে।[৯] বরাহ, কাঠক, বৈখামস, ভরদ্বাজ, হিরণ্যকেশী, গোভিল, জৈমিনি প্রভৃতি সমস্ত গৃহ্যসূত্রে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এর থেকে মায়ের ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে বা আরো পরবর্তী সময়ে তিনি সীমন্তোন্নয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করেন।[১০] সন্তানের জন্মের প্রাক্কালে জননীর ক্লেশমুক্তির জন্য কতিপয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।[১১] জন্মের সময় যদি সন্তানের মৃত্যু ঘটে, তা হ'লে মৃত সন্তানের সদ্গতি ও জননীর শারীরিক কুশলের জন্য কতিপয় ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।[১২] সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই একটী আলো প্রজ্বালিত করা হয়।

শিশুর জন্মের পরবর্তী সংস্কারগুলিতেও মাতার প্রাধান্য সুপ্রকট। জাতকর্মের সময় পিতা শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়ে মায়ের কোলে দেন।[১৩] শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করতে দেওয়ার আগে পিতা জননীকে ধুইয়ে মুছিয়ে দেন।[১৪]

সন্তানের জন্মের পর দশম দিনে বা আরো কিছুকাল পরে[১৫] মাতা পিতাসহ পুত্র বা কন্যার নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। দ্রাহ্যায়ণ গৃহ্যসূত্রানুসারে[১৬] নামকরণ উপলক্ষে আহুতির পূর্বে জননী স্নাত সন্তানকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়ে দিয়ে উত্তরদিকে মস্তক রেখে সন্তানকে পিতার হস্তে তুলে দেন; পিতা জননীর উত্তরদিকে বসে' সন্তানকে স্বহস্তে জননীর কাছ থেকে গ্রহণ করেন। তারপর জননী পিতার পশ্চাৎদিকে গিয়ে পিতার বামপাশে উপবেশন করেন। আহুতির পরে পিতা জননীকে সন্তানের গুহ্য ও সাংব্যবহারিক নাম বলেন[১৭] ও পুনরায় সন্তানের উত্তরদিক থেকে তাকে জননীর হস্তে দেন। আপস্তম্ব[১৮], হিরণ্যকেশী,[১৯] ভারদ্বাজ[২০] প্রভৃতির মতে মাতাপিতা একসঙ্গে সন্তানের নামকরণ সময়ে উভয় নাম উচ্চারণ করেন।

সন্তানের জন্মের পর ষোল বা বত্রিশ দিন পরে পুত্র বা কন্যাকে প্রথমবার দোলনায় স্থাপন করার জন্য একটী সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করেন।[২১] তারপর তিনি সন্তানের

৩। শাঙ্খায়ন মতে ঋগ্বেদ ১০. ১৬৩ সূক্ত এ সময়ে মন্ত্র হিসাবে পাঠ করতে হবে; তুলনা করুন—সংস্কার-রত্ন-মালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮২০ পৃঃ, পংক্তি ১ ও পরবর্তী।

৪। শৌনক-কারিকা, ফলিও ২৪।

৫। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, ১.১৩.৬, হিরণ্যকেশি-গৃহ্য-সূত্র, ১.২৫.১, প্রভৃতি।

৬। গোভিল-গৃহ্য-সূত্র, ২.১.৬. খাদির গৃহ্যসূত্র, ২.২.১৭ প্রভৃতি।

৭। বৈখানস-গৃহ্যসূত্র, ৩.২।

৮। বৈখানস-গৃহ্যসূত্র ৩.২।

৯। ৩.২৩; তুলনা করুন, ৩৫.৮; ৩৫,১৬ প্রভৃতি।

১০। সব গৃহ্যসূত্রের সীমন্তোন্নয়ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১। কাঠক গৃহ্যসূত্রের উপর দেবপাল ও আদিত্যদর্শন, লাহোর সংস্করণ, ১৩৬ পৃঃ।

১২। কৌশিক সূত্র, ৩৪.৩, প্রভৃতি।

১৩। বৈখানস-গৃহ্যসূত্র, ৩.১৫; হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্র, ২.৩,১০ এবং বৌধায়নগৃহ্যসূত্র, ২.১.৯, পৃঃ ৩৩।

১৪। পারস্কর-গৃহ্যসূত্র, ১.১৬.১৯; বৈখানস-গৃহ্যসূত্র, ৩.১৫; মানব-গৃহ্যসূত্র, ১.১৭.৭, পৃঃ ৮২; কাঠকগৃহ্যসূত্র, ৩৪.৫, লাহোর সংস্করণ, পৃঃ ১৩৮।

১৫। মনু, দশম বা দ্বাদশ দিনে; যাজ্ঞবল্ক্য একাদশ দিনে ভবিষ্যপুরাণ, দশম, দ্বাদশ বা অষ্টাদশ দিনে; সংস্কার-ময়ূখোদ্ধৃত গৃহ্যপরিশিষ্ট দশম দিন, শত দিবস বা এক বছর; খাদির-গৃহ্যসূত্র—গৃহ্যপরিশিষ্টের সঙ্গে এক মত; গোভিলের মতও একই; বারাহ-গৃহ্যসূত্র ৩, পৃঃ ৭, দশম রাত্রি; মানব-গৃহ্যসূত্র, দশম রাত্রি।

১৬। ২.৩৬ ও পরবর্তী সূত্র।

১৭। গোভিল-গৃহ্যসূত্র ২.৪.১৭ দেখ।

১৮। ১৫.৮। ১৯। ২.৪.১১। ২০। ১২৬।

২১। সংস্কার-রত্নমালা, ৮৭০ পৃঃ। কেহ কেহ মনে করেন, মেয়ের জন্য ত্রয়োদশ দিবসই প্রশস্ত; ৮৭১ পৃঃ। এ ক্রিয়া সম্পাদনে বাইরে মেয়েরাও যোগদান করেন।

প্রথমবার বস্ত্র পরিধানের সময়,[২২] কর্ণ-বেধের সময়,[২৩] ইত্যাদি ব্যাপারে এক একটী সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। সন্তানের কর্ণবেধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় জন্মের পর দশম, দ্বাদশ বা ষোড়শ দিনে; ঐ সময় জননী তাকে কোলে করে নিয়ে বসেন। কন্যার কর্ণ-বেধের সময় প্রথমে বাম কাণ বিদ্ধ করতে হয়, পরে ডান কাণ।[২৪] পুত্র বা কন্যা উভয়ের পাঁচ মাস বয়সে প্রথমে মাটীতে বসাবার সময় আর একটী সংস্কার তিনি সম্পাদন করেন[২৫] এবং পুত্রকন্যার প্রথম দন্তোদ্গমের সময় আরো একটী সংস্কার সম্পাদিত হয়।[২৬] পাঁচ মাস বা আরো কিছুকাল পরে পুত্র বা কন্যাকে অন্নপ্রাশন সংস্কারে প্রথম মাংসাদি খেতে দেওয়া হয়।[২৭] ছয় মাস বয়সের সময় পুত্রকন্যাকে প্রথমবার পান খেতে দেওয়া হয়।[২৮] এক বছর বয়সের সময় বা আরো পরে জননী পুত্রকন্যার চৌল-কর্ম সম্পাদিত করেন।[২৯] স্নান করিয়ে দিয়ে কাপড়চোপড় সন্তানকে পরিয়ে কোলে নিয়ে তিনি আগুনের পশ্চিম পার্শ্বে বসেন।[৩০] আহুতি প্রদানের সময় তিনি পিতাকে স্পর্শ করে থাকেন।[৩১] আশ্বলায়নের মতে[৩২] পিতা সন্তানের চুল কেটে কেটে জননীর হাতে দেবেন এবং মাতা সে চুল শমী-পত্রসহ গোবরের উপরে ফেল্‌বেন। হিরণ্যকেশী[৩৩] ও বারাহ[৩৪] গৃহ্যসূত্রের মতে তিনি হাতে গোবর নিয়ে পিতার কাছ থেকে প্রতিবার কাটা চুলগুলো গ্রহণ করবেন। জননী কোনও কারণে যদি অসমর্থা হন, তাহলে চৌল-ক্রিয়া হতেই পারে না।[৩৫]

উপনয়ন সংস্কার বা পুত্র ও কন্যার শিক্ষার প্রারম্ভ: এ সংস্কার ছাড়া কেহ বেদ-পাঠে, মন্ত্র-পাঠে অধিকারী হয় না। এ সংস্কার সমস্ত সংস্কারের সেরা। এ সংস্কারে কিন্তু পিতার বিশেষ কোন স্থান নেই, মাতাই অতি বড় স্থান জুড়ে আছেন। ভিক্ষাচর্যা যখন আরম্ভ হয়[৩৬] তখন পুত্র বা কন্যা প্রথম ভিক্ষা করে মায়ের কাছে;[৩৭] জননী যদি ব্রাহ্মণী হন, তাহলে তাঁর কাছে ভিক্ষা করার সময় বল্‌তে হয় "ভবতি ভিক্ষাং দদাতু"—'ভবতি' শব্দটী তখন বাক্যের সর্বপ্রথমে থাকে। যদি তিনি ক্ষত্রিয়া হন, "ভবতি" শব্দ বাক্যের মাঝে ব্যবহার করতে হয় এবং যদি তিনি বৈশ্যা হন তা হলে "ভিক্ষাং দদাতু ভবতি" বল্‌তে হয় অর্থাৎ 'ভবতি' শব্দটী সকলের শেষে ব্যবহার করতে হয়। ব্রহ্মচর্যের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান প্রথমে মায়ের আশীর্বাদের জন্য তাঁর কাছে এসে হাজির হয়। এ থেকে দেখা যায় যে জননীই সন্তানের মঙ্গলের পথে, উন্নতির পথে, শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাপারে অগ্রণী; তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই চলতে পারে না। আমাদের এ সিদ্ধান্ত যে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না—যখন আমরা দেখি যে সমাবর্তন সময়ে ছাত্র বা ছাত্রীকে বিশেষ করে বলে দেওয়া হয় যেন জননীকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু বলে সম্মান করা হয় আজীবন।[৩৮] আপস্তম্বের

২২। সংস্কার-রত্নমালা, ৬৭২ পৃঃ।

২৩। সংস্কার-রত্নমালা, ৭৮২ পৃঃ; সংস্কার-ময়ূখ, ২৬ পৃঃ; সংস্কার-রত্নমালা ধৃত গৃহ্যপরিশিষ্ট, ৮৭৪ পৃঃ। সংস্কার রত্নমালাধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর।

২৪। সংস্কার-রত্নমালা, ৮৭৬ পৃঃ।

২৫। সংস্কার-রত্নমালা, পৃঃ ৮৯০; পৃঃ ৮৯১, কুমার্যা অপ্যেবম্।

২৬। বারাহ-গৃহ্যসূত্র, পৃঃ ৮, পংক্তি ১।

২৭। মানব-গৃহ্যসূত্র, ১.২০, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাস। বৈখানস-গৃহ্যসূত্র, ৩.২২, ষষ্ঠ মাস; সংস্কার-রত্নমালা, পৃঃ ৪৯১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

২৮। সংস্কার-রত্ন-মালামতে আড়াই মাসের সময়, ৮৭৬ পৃঃ।

২৯। সংস্কার-ময়ূখ, পৃঃ ২৯; সংস্কার-রত্নমালা, ৮৯৭, এক বৎসর। পারস্কর, শাঙ্খায়ন ও ভারদ্বাজ, তৃতীয় বৎসর; জৈমিনীয়-গৃহ্যসূত্র, দ্রাহ্যায়নগৃহ্যসূত্র ও আশ্বলায়ন স্মৃতি, প্রথম অথবা তৃতীয় বৎসর; বৈখানস-গৃহ্যসূত্র, মনু প্রভৃতি তৃতীয় থেকে এগার। অথর্ব বেদের ৬.২১. ১৩৬—১৩৭ এ চুল বর্ধিত করার উপায় বর্ণিত আছে।

৩০। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, ১.১৭.২; পারস্কর-গৃহ্যসূত্র, ২.১.৫।

৩১। পারস্কর-গৃহ্যসূত্র, ২.১.৬। ৩২। গৃহ্যসূত্র, ১.১৭.১১

৩৩। ২.১.৬. ৩—৪।

৩৪। ৪.১৬.১৩; রঘুবীরের সংস্করণের পৃঃ ১০, লাহোর ১৯৩২; সংস্কার-রত্নমালা, পৃঃ ৯০২; বৈখানস-গৃহ্যসূত্র, ৩.১৩।

৩৫। সংস্কার-ময়ূখ, বোম্বে, ১৯১৩, পৃঃ ৩০; সংস্কার-রত্নমালা, পুনা, ১৮৯৯, পৃঃ ৯০০। সংস্কার-রত্নমালা মতে জননীর গর্ভ সময় যদি পাঁচ মাস অতিক্রম না করে, তা হলে তিনি এ কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৩৬। পরবর্তী যুগে মেয়েদের এ ভিক্ষাচর্যা কেবল স্বগৃহেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে; তাঁরা বাহিরে ভিক্ষাচর্যা করতেন না।

৩৭। সংস্কার-ময়ূখ, পৃঃ ৬০; দ্রাহ্যায়ণগৃহ্যসূত্র, ২.৪. ২৯—৩০; বিষ্ণু-স্মৃতি, ২৪,২৫; মানবগৃহ্যসূত্র, ১,২২.২০, বরোদা সংস্করণের ৯৩ পৃষ্ঠা: বারাহ-গৃহ্যসূত্র, ৫.২৮। ইত্যাদি।

৩৮। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৭.১১.১২।

মতে[৩৯] গুরুগৃহ থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সন্তানের উচিত জননীকে স্বীয় অর্জনের সব কিছুই অর্পণ করা। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সন্তানকে প্রথমে জননীকে প্রণাম করতে হয় —কারণ গুরুহিসাবে পিতা থেকে মাতা সহস্র গুণ বড়।[৪০]

বিবাহ বিষয়ে জননী পুত্র ও কন্যা উভয়কেই সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।[৪১] জামাতৃ-মনোনয়নে তাঁর অনুমোদন বরণীয়।[৪২] শাশুড়ীর অসন্তোষ উৎপাদন জামাতার চরম ভীতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ।[৪৩] এ থেকে ইহাও বোঝা যায় যে বিবাহ-সময়ে জননীর সম্মতি অবশ্য গ্রহণীয়; অবশ্য বর ও কন্যার উভয় হৃদয়ের সন্নিকর্ষ হেতু সংঘটিত গান্ধর্ব বিবাহে বা তাঁদের পূর্বস্থিরীকৃত বিবাহে জননীর স্বতঃ-প্রণোদিত সম্মতির প্রমাণও রয়েছে। কন্যার বিবাহ-সময়ে জননী কুলোতে খই নিয়ে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন।[৪৪] কন্যার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে তাঁর হৃদয়োত্থ আশীর্বাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এরূপে দেখা যায় যে পুত্রকন্যার জীবনের বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত সংস্কারগুলিতে জননীর সম্মান চূড়ান্ত। আহুতি পিতা করেন বটে; কিন্তু তাঁর স্পর্শ থাকার মানে হচ্ছে যে জননী নিজেও পিতার সঙ্গে সঙ্গে আহুতি প্রদান করছেন। যদি জননী বেঁচে থাকেন, তাঁকে ছাড়া পুত্রকন্যার কোনও সংস্কার সম্পাদিত হতে পারে না।[৪৫]

মায়ের উচ্চতম সম্মান ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপেও সুপরিস্ফুট। শ্রাদ্ধের মধ্যে চন্দনধেনু সর্বশ্রেষ্ঠ; খরচও সব ক্রিয়া থেকে চন্দনধেনুতেই বেশী। এই শ্রাদ্ধ কেবল জননীর জন্যই সম্পাদন করা হয়। অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধও কেবল মৃতা জননীর উদ্দেশেই সম্পাদিত হয়; এ শ্রাদ্ধে তিনি শাশুড়ীদের সঙ্গে পিণ্ড গ্রহণ করেন। মাতৃ-শ্রাদ্ধের গুরুত্ব এতো বেশী যে যজমানের শ্রাদ্ধে পত্নী অনুপস্থিত থাকলেও বা যজমানের পিতা বেঁচে থাকলেও তাঁর শ্রাদ্ধ সুচারুরূপে সম্পাদন নিতান্ত প্রয়োজন।[৪৬] মঞ্জরীকার স্পষ্টই বলেছেন যে এ শ্রাদ্ধ অত্যাবশ্যকীয়; এমন কি অনেকগুলি সর্ত্ত অপরিপূর্ণ থাকলেও এ সম্পাদন করা চাই-ই।[৪৭]

কাত্যায়নের মতে[৪৮] মৃত্যুদিন ছাড়া অন্য কোনও উপলক্ষে জননীকে পিণ্ড দেওয়ার প্রয়োজন নেই; কারণ পিতার উদ্দেশ্যে দত্ত পিণ্ড থেকেই তাঁর সন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। এ পিণ্ডদানের নিষেধ কেবল কাত্যায়নই করেছেন; অন্য কোনও বৈদিক ঋষি এ মত পোষণ করেন না। কাত্যায়নের এ নিষেধের অন্য কোনও কারণ নেই—মাতা ও পিতার উভয়ের একই পিণ্ড-দানের বিধান করে কাত্যায়ন দেখাতে চেয়েছেন যে মাতা ও পিতা জীবনে ও মরণে, ইহলোক ও পরলোকে—সর্বত্র সর্ব সময়ে এক। পিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড থেকে মাতার সন্তোষ অবশ্যম্ভাবী—এ কথা থেকেই বোঝা যায় যে পিণ্ডে মাতার অধিকার রয়েছে; তবে মাতা ও পিতা উভয়ে এক বলে একটী পিণ্ড উভয়কে দেওয়া হয়। কাত্যায়ন মাতার শ্রাদ্ধ বারণ করেন নি;[৪৯] তা' থেকেই বোঝা যায় যে মাতা শ্রাদ্ধের সুতরাং পিণ্ডের অধিকারিণী; তবে পিণ্ডটী পিতার সঙ্গেই প্রদেয়। এ থেকে ইহা প্রতীতি হয় যে শ্রাদ্ধে, কাত্যায়নের মতে পিতা ও মাতার আলাদা দেবত্ব স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নাই। পুনরায়, এও স্মর্তব্য যে কাত্যায়নের এই বিধান কেবল পার্বণ-শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য; কারণ

৩৯। গৃহ্যসূত্র, ১.২.১৫।

৪০। গোভিলগৃহ্যসূত্রের টীকা, ২.৪.১১, পৃঃ ৩৫২ (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ), পংক্তি ১৬ প্রভৃতি—"পিত্রোস্তু প্রথমং মাতরমেব ইত্যাদি।

৪১। তুলনা করুন, ঋগ্বেদ, ১.১২.১১; অথর্ববেদ, ২.৩৬ প্রভৃতি।

৪২। ঋগ্বেদ, ৫.৬১, প্রভৃতি; বৃহদ্দেবতা, ৫৪৯, প্রভৃতি। তুলনা করুন—কুমার-সম্ভব—প্রায়েণৈবংবিধে কার্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগলভতা। শিবের সঙ্গে উমার বিবাহে হিমালয়ের সম্পূর্ণ আগ্রহ ও সম্মতি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিবাহ সভায় বার বার জননী মেনকার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, কারণ কন্যার ব্যাপারে জননী নেত্র-স্বরূপা—শৈলঃ সম্পূর্ণ কামোঽপি সেনা-মুখমুদৈক্ষত। প্রায়েণ গৃহিণীনেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ॥

৪৩। ঋগ্বেদ, ১০,৩৪.৩।

৪৪। দ্রাহ্যায়ণ গৃহ্যসূত্র, ১.১৮।

৪৫। সংস্কার-রত্নমালা, পৃঃ ৯০০, পংক্তি ৩ থেকে; সংস্কার-ময়ূখ, পৃঃ ৩০, চৌলে চ ব্রত—বন্ধে চ, প্রভৃতি।

৪৬। শ্রাদ্ধমঞ্জরী, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, পৃঃ ১৩০।

৪৭। শ্রাদ্ধমঞ্জরী, অস্য শ্রাদ্ধস্য...আবশ্যকত্বাৎ, প্রভৃতি।

৪৮। ছন্দোগ-পরিশিষ্ট বা কর্ম-প্রদীপ বা কাত্যায়ন-সংহিতা, ঊনবিংশ সংহিতায় প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৩, পৃঃ ৩২৯, শ্লোক ২২।

৪৯। ছান্দোগ-পরিশিষ্ট, ঐ, শ্লোক ২১।

কাত্যায়ন স্থানান্তরে[৫০] বলেছেন যে কোনও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ পিতৃপুরুষদের পূজা ছাড়া আরম্ভ করা উচিত নহে এবং পিতৃপুরুষদের পূজার প্রারম্ভে মাতার পূজাই সর্বাগ্রে করণীয়। সন্তানের অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধে[৫১] প্রথমে মাতার পূজা বিধেয়; পরে পিতার পূজা; সকল ক্রিয়াকলাপেই তাই।[৫২] এমন কি তিন দিন ধরে' যথন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদিত হয়, তথনও প্রথম দিনে জননীর পূজা বিধেয়।[৫৩] যাই হোক্—পিতার সঙ্গে[৫৪]বা মাতামহীর সঙ্গেই[৫৫] হোক্—জননী যে সপিণ্ডীকরণের অধিকারিণী—তা থেকেই দেখা যায় জননীও পিতার মতই পিতৃপুরুষের অন্তর্ভুক্ত ও পিতার মতই তিনি সমস্ত দাবীর অধিকারিণী।

ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসম্পাদনের বিষয়ে মাতার সকল গুরুতর অপরাধও সন্তানদের কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়,[৫৬] কিন্তু পিতার অপরাধের জন্য পিতা সম্পূর্ণ দায়ী, তিনি যদি স্বকীয় দোষ হেতু সমাজচ্যুত হন, তাঁর সঙ্গে পুত্রকন্যার তাদৃশ ভাবেই আচরণ করতে হয়—কিন্তু মাতা কিছুতেই পরিত্যজ্যা বা অবমাননার পাত্র হ'তে পারেন না।[৫৭] সর্ববিষয়ে সর্বসময়ে জননীর সম্মান অপরিসীম, অতুলনীয়।

মাতা যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু, তা মহাভারতে[৫৮] ও স্মৃতিতে[৫৯] সুস্পষ্ট বলা আছে। মনু[৬০] বলেছেন যে মাতা পিতার থেকে সহস্রগুণ অধিক সম্মানের যোগ্যা। প্রত্যেক বৈদিক যজ্ঞের প্রারম্ভে ষোড়শ মাতৃকার পূজা থেকেও মায়ের চূড়ান্ত সম্মান স্পষ্ট প্রতীত হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে সর্ববিধ বৈদিক সংস্কার, ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া এবং বৈদিক যজ্ঞ মায়ের প্রাধান্য ও গুরু হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণদ্যোতক। ভারতীয় জননীর সম্মানের তুলনা ভারতেও আর নেই, জগতেও নেই।

৫০। ছান্দোগ-পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩১৩, শ্লোক ১৭।

৫১। পারস্কর-গৃহ্যসূত্র, বোম্বে সংস্করণ, ১৯১৮, ৫০৯ পৃঃ, সংস্কার-ময়ূখ, পৃঃ ৬।

৫২। গদাধরধৃত জাবালি, পারস্কর-গৃহ্য-সূত্র, ঐ, পৃঃ ৫১২।

৫৩। কৃষ্ণমিশ্রের শ্রাদ্ধ-কারিকা, পারস্কর-গৃহ্যসূত্র, বোম্বে সংস্করণ, ১৯১৮, পৃঃ ৮১২; তুলনা করুন, ভট্ট গোপীনাথের উপোদ্‌ঘাত, পুনা, ১৯২৪, পৃঃ ৬২

৫৪। যম, পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের বোম্বে সংস্করণের ৪৯৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত; গোবিন্দানন্দের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া-কৌমুদী (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা), কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ৪২৬; শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদীধৃত লঘুহারীত, পৃঃ ৪২৬, পংক্তি, ১৭-২১।

৫৫। বৃদ্ধশাতাতপ, স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ, পৃঃ ২৩৪; পারস্কর-গৃহ্য-সূত্র, পৃঃ ৪৯৯।

৫৬। হিরণ্যকেশি-গৃহসূত্র, ২, ৪. ১০,৭; শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র, ৩, ১৩ ৫।

৫৭। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র, ১৩. ৪৭; গৌতমধর্মসূত্র, ২০. ১; ২১. ১৫; আপস্তম্বধর্মসূত্র, ১.১০. ২৮. ৯।

৫৮। ১. ১৯৫. ১৬; ১২. ৩৪২. ১৮ এবং ১৩. ১০৫. ১০।

৫৯। গৌতম ধর্মসূত্র, ২. ৫৭; যাজ্ঞবল্ক্য, ১. ৩৫।

৬০। ২. ১৪৫; তুলনীয়—২২৫-২৩৭; ৪, ১৬০; বশিষ্ঠ, ১৩.৪৮।

চাহি ও চাহি না কি

শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ

আমি কানন বকুল বাসি না কো ভাল
ভালবাসি বনফুল।
ভালবাসি ধীর মরুবুকে নীর
ভিখারিণী কানে দুল॥
চাহে না হৃদয় তটিনীর তীর
মধু যামিনীর স্নিগ্ধ সমীর
চাহে এ হৃদয় নিদাঘে মলয়
সাগরের উপকূল॥

প্রিয়ার সোহাগে জাগে না পুলক
নাচে না এ প্রাণ হিয়ার ফলক
কার আঁখি তারা জানায় ইসারা
করে হৃদি প্রেমাকুল॥
চাহি না তোমায় নীলাকাশে শশী
শ্রাবণ নিশীথে এস হে রূপসী
গভীর তিমিরে যবে আঁখিনীরে
গহন করিব ভুল॥

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

(১৭)

তাহার বৈকালিক নিদ্রা শেষ করিয়া রামকিষণ সিং সেইমাত্র খইনির দলাটা হাতে লইয়া ডলিতেছিল; বিনয়ের প্রশ্নে অবাক হইয়া জবাব দিল—বাবুর তবিয়ৎ খারাপ, তাই এক মাসেরও উপর যে তিনি চেঞ্জে গিয়াছেন এখবর কলিকাতা শুদ্ধ লোকে জানে, আর কেবল সে-ই জানে না। ইয়ে তো বড়া তাজ্জব বাত!

বিনয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে প্রায় দিন পনের কুড়ি কলিকাতায় ছিল না, ইতিমধ্যে নিশ্চয় যোগীনবাবু চেঞ্জে গিয়াছেন; নহিলে সারা কলিকাতাবাসীর সহিত নিঃসন্দেহে সেও এই খবর পাইত। তা বাবু ফিরিবেন কবে?

দারোয়ান খইনি ডলা বন্ধ না করিয়াই বলিল, হামি কি জানে। বাবু কি আমার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করে।

আর কিছু খবর বাহির করিতে না পারিয়া বিনয় বিমর্ষ হইয়া তাহার আহেরীটোলার মেসের দিকে চলিতে লাগিল।

পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে সাবেক মেসে ছিল ভালই। কিন্তু অত খরচ চলে না। তাই সেটা ছাড়িয়া দিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া আহেরীটোলার সস্তা মেসটা বার করিয়াছে।

কেবল যোগীনবাবুর ভরসায় না থাকিয়া আরও নানা
ইত্যা
৪১। চাকরির চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু বাঙালীর বেকার
৪২। যিনি জানেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন তাহার
কঙ্কন—কুমার র বোঝা। প্রত্যেক দিন বিনয় আশায়
শিবের সঙ্গে উ য়তো যোগীনবাবু ফিরিবেন, আজ হয়তো
সত্ত্বেও তিনি বিব গিয়া যাইবে। প্রত্যেক দিন যোগীনবাবুর
লাগ্লেন, কার য়া হাঁটিয়া আসে। কোন দিন দুই বেলা সে
কামোহপি
কুটুম্বিনঃ॥ যায়, সতৃষ্ণ নয়নে গেটের দিকে চাহিতে
৪৩। যদি জনসমাগমের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে।
৪৪। দুরাশা, রোজই সেই বন্ধ ফটকের সুমুখে
৪৫। দরোয়ানটাকে ঝিমাইতে দেখে। একদিন
পৃঃ ৩০, ৫

ইহারই মধ্যে একটু আশার সঞ্চার হইল, তাহার একটা দরখাস্তের উত্তরে এক জায়গায় দেখা করিতে যাইতে লিখিল। সেদিন সকাল হইতে আশায় ও আনন্দে তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। কি জানি কি হয়। যদি সত্যই লাগিয়া যায়, তবে দিক্‌চিহ্নহীন এই অন্ধকারের মাঝে একটা পথ তাহার চোখে পড়ে। বেলা দশটার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া বাক্স হইতে একটিমাত্র সযত্নে রক্ষিত গরদের পাঞ্জাবি এবং ধোয়ান কাপড় পরিয়া, গায়ের কাপড়টা পাট করিয়া কাঁধে ফেলিয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিল। জুতো জোড়াটা এ পোষাকের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না, যদিও সকাল বেলায় মেসের চাকরটাকে দিয়া সেলাই করাইয়া এবং রং দেওয়াইয়া আনাইয়াছিল। যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় ডাকপিয়ন তাহার নামে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের উপর মেয়েলী অক্ষরে আঁকা বাঁকা কাঁচা হাতের লেখায় তাহার নাম ও ঠিকানা লেখা। মায়ের চিঠি। খামখানা ছিঁড়িয়া একটু দাঁড়াইয়া সে পড়িতে লাগিল। মা লিখিয়াছেন—

চিরজীবেষু

বাবা বিনয়, অনেক দিন তোমার চিঠিপত্র পাই নাই। তোমার কাজের কি হইল? এতদিনে সেই যোগেনবাবু নিশ্চয় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তুমি পত্রপাঠ দশটি টাকা পাঠাইবে। বিশেষ দরকার, অন্যথা করিবে না। তারপর লিখি যে, নীহারের জন্য ওপাড়ার যুগল ঠাকুরপো একটি সম্বন্ধ আনিয়াছেন। পাত্রটির সুখজোড়ায় বাড়ী। গ্রামে থাকিলেও অবস্থা মোটামুটি ভালো। বেশি খাঁকতি নাই। তাঁরা আগামী সোমবারে মেয়ে দেখিতে আসিবেন। যদি পার তবে দুই-তিন দিনের ছুটি লইয়া ঐদিন একবার বাটী আসিবে। আসিবার কালীন একখানি ভাল রঙিন শাড়ী লইয়া আসিবে। মেয়ে দেখাইবার মত ভালো কাপড় বাড়ীতে একখানিও নাই। যাহা আছে তাহা পুরান ও সেকেলে। টাকা পাঠাইতে ভুলিও না। অতুলের স্কুলের

ভর্ত্তি হইবার কি ব্যবস্থা করিবে পত্রোত্তরে জানাইবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা মা

চিঠিখানা বোধ হয় কাহাকেও দিয়া লেখাইয়া থাকিবেন। অন্যান্য সময়ে নীহারই তাঁহার চিঠিপত্র লিখিয়া দেয়, এ চিঠিখানায় হয়তো তাহার বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা আছে সেজন্য অন্য লোকে লিখিয়া দিয়াছে। বিনয়ের মা নিজে বড় একটা লিখিতে পারেন না। চিঠিটা পকেটে রাখিয়া সে ভাবিতে লাগিল টাকা কেমন করিয়া পাঠায়। উপস্থিত গোটা দুই জায়গায় টিউশনি করিয়া কোনক্রমে সে খরচ চালাইতেছে। যাক, বেশি ভাবিয়া ফল নাই, বেলা ক্রমশ বাড়িতেছে, মনে মনে দুর্গা স্মরণ করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

কাজটা একটা দোকানের কাজ। ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, দোকানের জন্য একজন ইংরেজী-জানা কর্ম্মচারী আবশ্যক। একটা অন্ধকার গলির ভিতর দোকান-ঘর। এই দিনের বেলাতেও সেখানে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বলিতেছে এবং ফ্যান ঘুরিতেছে। নানা ধরণের কেনা-বেচা চলিতেছে। ম্যানেজার অফিস-ঘরে বসিয়া একতাড়া কাগজপত্র সামনে লইয়া হিসাব দেখিতেছিলেন। বিনয় ঢুকিয়া নমস্কার করিল।

কি পাশ?

আজ্ঞে আমার বি, এ-র রেজাল্ট এখনও বার হয় নাই। তবে পাশ নিশ্চয়ই হ'ব। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। ইংরেজীতে অনার্স নিয়েচি।

ম্যানেজার হিসাব সারিয়া কাগজের ফাইলটাকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া এইবার ভালো করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

বসুন।

বিনয় সামনের চেয়ারটায় বসিল।

বিনয় দেখিল, ম্যানেজারকে সে যেমন ভাবিয়াছিল রুক্ষ, ক্ষমতাগর্ব্বিত উদ্ধতপ্রকৃতির—সে মুখে তার ছাপ নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালীর সুকুমার ভাবের সহিত অকাল বার্দ্ধক্যের কুঞ্চিত রেখা পড়িয়াছে ললাটে। ভাবভঙ্গীতে একটা হতাশা ও বিতৃষ্ণার ভাব।

ম্যানেজার হাসিলেন। বলিলেন, এ চাকরিতে আপনি শেক্সপীয়র কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়েছেন কি-না তার কোন স্থান নেই। বরঞ্চ মনে মনে ভেবে দেখুন, বারো-চোদ্দ ঘণ্টা একটানা চেয়ারে বসে থাকতে পারবেন? পিঠ টন্ টন্ করবে না তো? সকাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের দোকান খোলা থাকে।

বিনয় বলিল, দেখুন চাকরি সম্বন্ধে আমার কোন পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা নেই। তবু বলতেই হবে আমার অদৃষ্ট ভালো। কারণ আপনার এই চাকরির জন্যেই হয়তো একশো দেড়শোখানা এ্যাপ্লিকেশন্ পড়েছে। তার মধ্যে আপনি আমাকেই ডেকে বিশেষ ক'রে জিজ্ঞেস করছেন, পিঠের শিরদাঁড়া কন্ কন্ করবে কি-না। এতটা সৌভাগ্য হয়তো গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ কোন শুভ যোগাযোগের ফল।

ম্যানেজার আবার একটু হাসিয়া বাঁ হাত দিয়া একতাড়া কাগজের স্তূপ নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আপনার কথা মিথ্যে নয়। মোটে তিন দিন আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছি, তার মধ্যে ঐ দেখুন ঐ অতগুলো এ্যাপ্লিকেশন এসেচে। আপনাকে ওকথাটা আমি জিজ্ঞেস করতুম না; কিন্তু আপনি বললেন কি-না, ইংরেজীতে অনার্স নিয়েচেন, তাই কেমন যেন হাসি পেল। আচ্ছা বলতে পারেন, আমাদের দেশে বাপ-মা সর্ব্বস্বান্ত হয়েও ছেলেকে কলেজে পড়ায় কেন?

বিনয় অবাক হইয়া ম্যানেজারের দিকে চাহিল।

পুনশ্চ ম্যানেজার বলিলেন, আপনার সঙ্গে আমার এই প্রথম আলাপ, তাই হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন, প্রথম আলাপেই এ সব অবান্তর কথা তুলচি কেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি মশায়, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই ভালো লেগেচে। অনেক কথাই মনে হচ্চে। আপনার নামটি?

বিনয় বলিল, বিনয়ভূষণ রায়।

এমন সময় দুইজন কর্ম্মচারী অর্ডার-সংক্রান্ত কি একটা বিষয়ে আদেশ লইবার জন্য সে ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের মুখের সেই সরল এবং সরস ভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। কপালের উপরকার রেখাগুলা ফুটিয়া বাহির হইল।

কাগজপত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তিনি খসখস করিয়া কি লিখিয়া চলিলেন। লেখা শেষ হইলে কাগজগুলা ফিরাইয়া দিয়া এবং তাঁহার যাহা বলিবার বলিয়া দিতেই কর্ম্মচারী দুইজন চলিয়া গেল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

তাহার দিকে চাহিয়া ম্যানেজার পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আপনাকে দেখে কেন জানিনা আমার নিজের প্রথম বয়সের কথা খালি মনে পড়চে। যেদিন প্রথম চাকরির জন্তে উপরিওয়ালা সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেদিনটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সকাল থেকে শুধু ভাবছিলুম, সাদা পাঞ্জাবি গায়ে দেব, না গরদেরটা পরব। চুলটা ঠিক কেমন করে আঁচড়ালে ইম্‌প্রেসিভ্ দেখায়। সেদিন আজ স্বপ্নের মত মনে হয়। আবছা সে জীবন ছিল যেন কোন এক অন্য জন্মের। অফিসে আসি, কলের মত অপরের কাছ থেকে আদায় করি কাজ। আপনি আজ এই অন্ধকূপের মধ্যে ঢুকলেন, হয়তো দিন কতক পর আমার মতই হয়ে যাবেন।

কিন্তু যাক-গে ওসব কথা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আপনার মাইনে আপাতত পঁয়ত্রিশ টাকা আন্দাজ দেওয়া যাবে। মাস তিনেক কাজের পর পার্মানেণ্ট হ'লে গোটা পঞ্চাশ-ষাট হবে। কিন্তু খাটুনিটা বেশিই মনে হবে আপনার। দোকানের হিসেবপত্র দেখতে হবে, যতক্ষণ না দোকান বন্ধ হয় অফিসেই থাকতে হবে। বেলা দশটা থেকে রাত নটা সাড়ে ন'টা অবধি দোকান খোলা থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব বা পূজার সময় তেমন ভীড় হ'লে উপরি আরও কয়েকঘণ্টা। আর ছুটি প্রায় পাবেনই না, নেহাৎ দু-চার দিন ছাড়া। মার্চেন্ট অফিস বা স্কুল কলেজ আদালত ছুটি ছাটাতে বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু দোকানের তো আর 'হলি ডে' নেই। রোজই খদ্দের আসে। মাঝে মাঝে অবশ্য অন্য লোক আপনার কাজে রেখে ছুটি পেতে পারেন, তেমন দরকার হ'লে।

বিনয় ভাবিতে লাগিল। তাহার মনটা দমিয়া গেল খানিকটা। যতটা আশা করিয়াছিল মাইনে তার চেয়ে অনেক কম। খাটুনিটাও বোধ হয় অতিরিক্ত হইবে। কিন্তু ··· কি জানি ভবিষ্যতে হয়তো উন্নতির আশাও আছে। একবার ঢোকা তো যাক। তারপরে যোগীনবাবুর অনিশ্চিত ভরসাতেই বা কত দিন বসিয়া থাকা যায়। বরঞ্চ উপস্থিত এই কাজটাই নেওয়া যাক, তারপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া যদি ভালো রকম কিছু একটা জুটাইয়া দেন তখন এটা ছাড়িয়া দিলেই চলিবে। সম্মতি দিয়াই সে বলিল, সবেতেই আমি রাজী। কবে থেকে আসতে হবে?

এপ্রিলের পয়লা থেকেই জয়েন করবেন। এ মাসের এ ক'টা দিন বাদে। আজ তো বোধ হয় পঁচিশে হয়ে গেল।

ম্যানেজার একটা নিয়োগপত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন।

বিনয় ধন্যবাদ জানাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কি একটা ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া আবার সে দাঁড়াইল। একবার ভাবিল, মাহিনার হিসাবে গোটা কুড়ি টাকা অগ্রিম চাহিবে নাকি! কিন্তু এই সবেমাত্র চাকরির কথা ঠিক হইল, এখনই টাকা চাহিতে তাহার কি রকম লজ্জা করিতে লাগিল।

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন— বিনয়বাবু, এক মাসের মাইনে আগাম দেওয়া আমাদের এখানকার নিয়ম। এই নি'ন—এই চেকটা ক্যাশিয়ারের কাছে ভাঙিয়ে নেবেন।

বিনয় বহু ধন্যবাদ দিয়া যথার্থ কৃতজ্ঞতার সহিত চেকটা লইয়া বাহিরে আসিল। বাইরে সেই ট্রাম চলিতেছে, বাসগুলো যাত্রী লইতেছে। ফাল্গুনের উষ্ণবসন্ত কলিকাতায় কোন অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতেই দেখা দেয় নাই, তবু দুপুরবেলাকার আকাশের ঘন নীল, পার্কের গাছপালায় নূতন পত্রোদ্গমের ঈষৎ চিকন সবুজের আভাস, এই সব ছোট-খাট জিনিসগুলিই বিনয়ের কাছে মধুর লাগিতেছিল। পরশু সোমবার। স্থির করিল নীহারকে যখন দেখিতে আসিবে তখন সোমবারে বাড়ী হইতে একবার ফিরিয়া আসিবে। একখানা ভালো শাড়ি মা কিনিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, শাড়িটা এখনই কিনিয়া লইলে মন্দ হয় না। কাপড় কিনিবার উদ্দেশ্যে সে একটা বড় রকম কাপড়ের দোকানে ঢুকিল। এত রকমের এত রঙের চোখ ঝলসানো শাড়ি। কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা পছন্দ করিবে সে যেন এক সমস্যা। যেগুলা খুব পছন্দ হয় তাহার দাম শুনিয়া চমকাইয়া যাইতে হয়, কোনটা কুড়ি, কোনটা ত্রিশ। বিনয় ম্লান হাসিল। নীহারকে এই নীল রঙের শাড়িখানায় খুব সুন্দর মানায় কিন্তু হায়রে, যাহার দাদার চাকরির দাম পঁয়ত্রিশ টাকা, তাহাকে কি কুড়ি টাকা দামের শাড়ি কিনিয়া দেওয়া যায়! ঐরকম রঙের একটা শস্তা দামের কাপড় ও একটা ব্লাউস কিনিয়া সে দোকান হইতে বাহির হইল। নীহারের জন্য কাপড় কিনিতে বসিয়া আর একজনের কথা তাহার মনে পড়িল।

এলোমেলো চুলে ঘেরা মালতীর মুখের ভীত করুণ চাহনি মনে পড়িয়া যায়। শেষের দিন তাহার সেই ভীত ত্রস্ত পলায়ন—বই পড়া শুনিতে শুনিতে। পাছে বাড়ীতে বকুনি খাইতে হয়। আর পরেশ কাকার মুখের সেই কাহিনী! সমস্তটা মিলিয়া তাহার উপর বড় করুণা হয়। সামনেই বিশ্বভারতীর বইয়ের দোকান—আসিতে আসিতে সে তথায় ঢুকিয়া পড়িল এবং রবীন্দ্রনাথের নূতন বই 'বিশ্বপরিচয়' কিনিয়া পকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া লিখিল, শ্রীমতী মালতী দেবী, কল্যাণীয়াসু।

১৮

দ্বিপ্রহরেও সে ঘরটায় লেশমাত্র রোদ ঢুকে না। সেই স্যাঁতসেতে অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরটায় বসিয়া মালতী কুলায় করিয়া কি সব জিনিস ঝাড়িয়া রাখিতেছিল, তাহার ছোটমা খাওয়া দাওয়া সারিয়া পাড়া বেড়াইতে গেছেন। ইহা তাহার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে। মালতী কাজ করিতেছিল, কিন্তু তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এতদিন মামাবাড়ীতে সম্মান ও স্নেহের সঙ্গে ছিল, হোক না সেটা পরের বাড়ী। কিন্তু এখানে বাবা মার কাছে আপন বাড়ীতে আসিয়া প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সৎমা, তাঁর স্নেহ নাই। বোধ করি মমতাও নাই। কিন্তু সেটা যদি বা সহা যায়, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া পল্লীর হিতাকাঙ্ক্ষিণীর দল যাহা শোনাইতে শুরু করিয়াছে সেটা একেবারেই সওয়া যায় না। ব্যাপারটা হইয়াছিল এইরূপ। সেদিন সকালবেলায় স্নানের ঘাটে নরুর মা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে শুরু করিলেন, মাগো মা, আজকালকার ছুঁড়িগুলোর বেহায়াপনা দেখে গা কেমন করে। রাজকন্যের'মত সব স্বয়ম্বরা হবেন, তার কমে আর মন উঠচে না। কিলো মালতী, সেদিন তো বাপকে খুব শুনিয়ে দিয়েছিলি, পরেশ ঠাকুরপো বুঝি দয়া করে কন্যেদায় উদ্ধার করতে চেয়েছিল; তাই বলেছিলি, অমন বিয়ের চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরণ ভালো। আর আজ যে বলবার কইবার অপিক্ষে রাখলি নে। বেহায়ার মত দিন নেই রাত নেই—তোর সই নীহারের কাছে ছুটে যাস কেন? আমরাও কিছু বুদ্ধি ধরি। ঘাস খাইনে।

মালতী কোন উত্তর না দিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কাপড় জামায় সাবান দিয়া কোনক্রমে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে নরুর মা আর ভুবন জ্যেঠাই আরও রাগিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা জানেন কাটিয়া কাটিয়া কথা বলিতে। আর যাহাকে বলেন সেও কলহ করিবে কোন্দল করিবে, সমানে জবাব দিবে এইটাই বুঝেন। কিন্তু কেহ যে তাঁহাদের সমস্ত কথার উপর এমন একান্ত উপেক্ষা দেখাইয়া ঘৃণাভরে নিঃশব্দে থাকিবে, এ তাঁহাদের কাছে অসহ্য। মালতী যত শীঘ্র সম্ভব সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনটা তাহার জ্বালা করিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখিল নীহার সেইদিনের আনন্দবাজার পত্রিকাটা বারান্দার তক্তপোষের উপর রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার খোঁজে আসিয়াছিল, পায় নাই। তাই কাগজখানাই রাখিয়া গিয়াছে। এত দুঃখ কষ্টের মাঝেও মালতী পড়াশোনা করিয়া যথার্থ গভীর আনন্দ পাইত। এই সামান্য একটু খবরের কাগজ পড়িয়া সে যে নিবিড় আনন্দ পাইত তাহার তুলনা হয় না। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এত খারাপ স্বাস্থ্য লইয়াও রাজবন্দীদের জন্য কি অমানুষিক পরিশ্রম এবং উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন। দেশের কাজে নারীরা কতভাবে যোগ দিয়াছে। কোথায় কোন্ সভায় কোন্ দেশ-প্রসিদ্ধা সভানেত্রী কি সুন্দর কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। কলিকাতার বা বড় বড় শহরের সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে প্রাত্যহিক জীবনের অতি-ব্যস্ততার মাঝে এ খবরের কাগজের হয় তো কোন মূল্যই নাই। সেখানে চায়ের টেবিলে বসিয়া একবার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াই লোকে রাখিয়া দেয়। কিন্তু এই বিজন পল্লীবাসে এই একটিমাত্র খবরের কাগজ পড়িয়াই মালতীর মনটি কত উদার বিস্তৃতির মাঝখানে নিজেকে ছাড়া পায়। নিস্তার পিসীর কোন্দল, নরুর মায়ের বাঁকা কথা—এ সব ছাপাইয়া তাহার মন দেশকে বৃহত্তরভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। তাহারই একান্ত আগ্রহে নীহার দাদাকে লিখিয়া কলিকাতা হইতে ডাকে কাগজের গ্রাহক হইয়াছে।

কাগজখানা শত কৌতূহল সত্ত্বেও কাজের তাড়ায় সকালে পড়া হইয়া ওঠে নাই। কুলার জিনিস কয়েকটা ঝাড়িয়া রাখিয়া মালতী কাগজটা লইয়া পড়িতে বসিল। মেয়েদের বিষয়ে কত খবরই না জানা যায়। মালতীর চোখের সামনে

যেন আর একটা জগত উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেখানে মেয়েদের কাছে দেশ কত কি দাবী করিতেছে। তাহারা দেশের শাসনকার্য্যে যোগ দিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতেছে। আর মালতীর কাছে কি দেশ কিছুই চায় নাই? কেবল ছোটমার গালমন্দ আর পাড়াপ্রতিবেশীদের শ্লেষ সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা ছাড়া।

পিছন হইতে মিষ্ট কলহাস্যে কে হাসিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই সেই অদৃশ্যবর্ত্তিনী মালতীর কোলের উপর একটা বই ফেলিয়া দিয়া আড়ালে লুকাইল। হাসির শব্দ হইতে মালতী বুঝিল নীহার আসিয়াছে। বইটা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া সে দেখিতে লাগিল। প্রথম পাতাতেই সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা: 'শ্রীমতী মালতী দেবী, কল্যাণীয়াসু।'

এই লেখাটুকু দেখিয়া আনন্দে এবং কাহার উপর জানি না একটা বিপুল অভিমানে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে নীহারকে আহ্বান করিয়া বলিল, কে, সই? আয় না ভাই, বো'স। তুই সকাল বেলায় এসে কাগজ দিয়ে গিয়েছিলি আমি তখন ঘাটে ছিলাম। বাঃ রে, আমার জন্যে এ বই কে আনতে বলেছিলো? তুই বুঝি? বেশ তো তুই জুলুম করিস।

নীহার আসিয়া তাহার পাশে বসিল। হাসিয়া বলিল, না, আমি কিছুই আনতে বলি নাই। দাদার চাকরি হয়েছে কি-না, তাই আমার জন্যে কি সুন্দর কাপড় এনেছে আর তোর জন্যে বই। আজ ভোরের ট্রেনে দাদা এসেছে যে। তুই একবার যাবি নে আমাদের বাড়ীতে?

মালতীর মুখে চিন্তার ছায়া ফুটিল। সে মুখ নামাইল। তাহাকে লইয়া যে কুৎসিত আন্দোলন চলিতেছে তাহা মনে পড়িয়া গেল। তাই কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নীহার বলিল, ও, আমি বুঝতে পেরেচি তুই কেন যাবি নে। লোকে অনেক কথা বলে, তাই না নয়? কিন্তু লোকের কথায় কি এসে যায়। ওঃ, লোকে বললেই ভারি ভয় করে বসে থাকতে হবে, না? তুইও শেষে এই কথা বলবি?

মালতী মুখ তুলিয়া চিন্তিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাল তোকে দেখতে আসবে, তারপরে বিয়ে হয়ে যাবে। তখন দেখব কথার সুর একেবারেই বদলে গেছে। লোকের কথাকে তখন বড্ডই গ্রাহ্য করবি। দেখা যাবে তখন। এখন তো খুব জোরেই মতামত দিচ্ছিস।

নীহার লজ্জিত স্বরে কহিল, আগে বিয়েই হোক, আমাকে দেখে হয়তো পছন্দই হবে না। কিন্তু ওসব বাজে কথা রাখ্। আমাদের বাড়ী যাবি কি না বল্? কাল কিন্তু যেতে হবে।

নীহারের মুখে লজ্জার একটি রাঙা আভা পড়িল। সংসারের বাস্তব দিকটার রূঢ় কর্কশতা ও দুঃখদৈন্যের সহিত তাহার বড় একটা পরিচয় নাই। তরুণ মনসুলভ নবজীবনের একটি সুখ স্বপ্ন তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঘনাইয়া আসিল। কাল যাইতে অনুরোধ করিয়াই তাহার লজ্জা করিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, কাল যাব। কাল তোকে দেখতে আসবে, কাল গেলে ছোটমা নিশ্চয় বকবে না। (ক্রমশঃ)



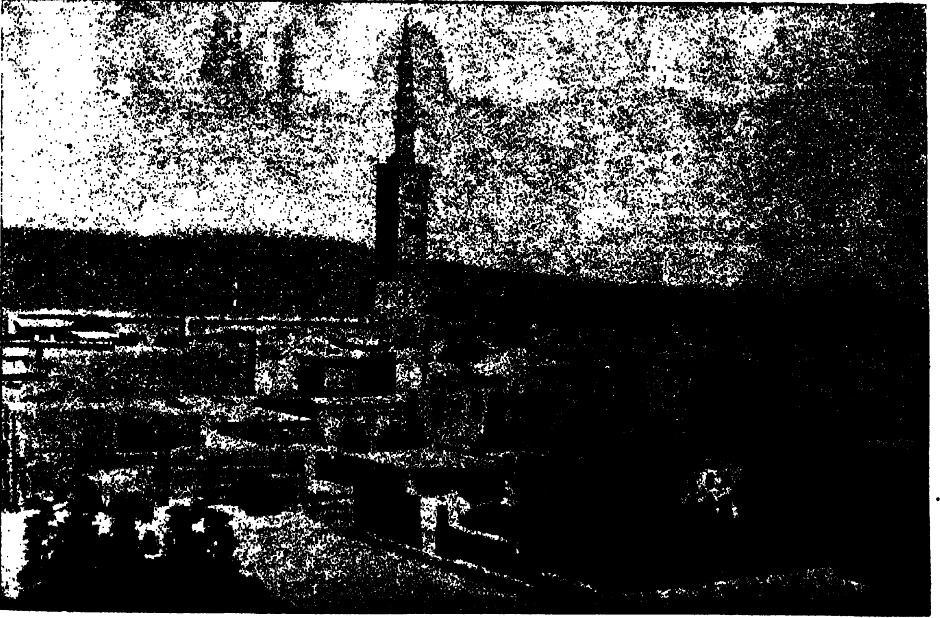
ওহাবিয়া ধর্ম্ম ও আরব জাতীয়তা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

ধর্ম্মের গ্লানি যেমন মানুষকে মহত্তর জীবনের পথ থেকে বিভ্রান্ত করে অমানুষের পর্য্যায়ভুক্ত করেছে, মানুষের সৌষ্ঠবের ওপর কলঙ্ক ছিটিয়ে তাকে রূপহীন করেছে, তেমনি ধর্ম্ম তার স্বমহিমায় মানুষকে মহিমান্বিতও করেছে। বিশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সংহত করে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম একদিন মানুষকে মহান মনুষ্যত্ব দান করেছিল—আরবের ওহাবিয়া ধর্ম্মও তেমনি দান করেছিল আরবের সমাজ-জীবনকে এক নব সমন্বয়। ওহাবিয়া ধর্ম্মের প্রেরণায় বহুদিনের সঞ্চিত জড়তা ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো এক নোতুন স্রোত, ভাঙ্গলো জাতীয় জীবনের আলস্যের আড়াল। এই মহৎ ওহাবিয়া আন্দোলনের গোড়ার দিককার গোটা কয়েক কথার কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই ওহাবিয়া আন্দোলন যখন আরবে জন্ম নেয় তখন আরব উগ্র বিশৃঙ্খলতার লীলাভূমি ছিল। উপজাতি ও সামন্ত রাজারা ব্যভিচারের পঙ্ক লেপে দিয়ে আরবকে একেবারে শ্রীহীন করে ফেলেছিল। তারা আত্মকলহের ঝড় তুলে সমাজ-জীবনকে তখন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই দুর্দ্দিনে ওহাবিয়া ধর্ম্মের জন্মদাতার আবির্ভাব হয়। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'Ayaina-এ আবির্ভূত হন। নাম মুহম্মদ ইবন আবদুল ওহায়েব। তিনি দামাস্কাস্ ও বসরায় বহুদিন অধ্যয়নে কাল অতিবাহিত করেন। বহুকাল অধ্যয়নের পর তিনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে 'Ayainaতে ফিরে আসেন। 'Ayaina-র সামন্ত রাজাকে তিনি তাঁর নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু 'Ayaina-এর রাজা তাঁকে ফিরিয়ে দেন। পরে তিনি ক্ষুদ্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাভিলাষী এক সামন্ত রাজার নিকট তাঁর ধর্ম্মমত ব্যক্ত করেন।

এই সামন্ত রাজা Dar'iya-র অধিপতি। এঁর নাম মুহম্মদ ইবন সউদ। ইনি মুহম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহেবের ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই আরবে এক সঙ্ঘবদ্ধ বেদুইন-বাহিনী গঠন করে আরবে ব্যাপক প্রভুত্ব বিস্তার করেন।

ওহাবিয়া ধর্ম্ম বৈশিষ্ট্যে শুদ্ধাচারী, সামাজিকতায় সংহতপন্থী। কোন রকম বিলাসিতা, সুরাপান বা অন্য কোন রকম জাঁকজমকের স্থান এ ধর্ম্মে নেই। সহজ সাধারণ শুদ্ধাচারী জীবনই হচ্ছে এই ধর্ম্মের বিশেষত্ব। ওহাবিয়া ধর্ম্মের এ সব সামাজিক বৈশিষ্ট্য বাদেও আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে সেইটেই বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। আরবের উপজাতীয়দের ঝগড়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অন্যান্য যে সব ধর্ম্মমত আরবে বিস্তার লাভ করেছে তাতে যতদূর জানা যায় তা থেকে মনে হয় যে, ধর্ম্মসম্প্রদায়গত ঝগড়া, উপজাতীয়দের ঝগড়া—এই সমস্যার কোন ধর্ম্মমতই একটা বিশেষ সমাধান খোঁজে নি। কিন্তু ওহাবিয়া ধর্ম্ম প্রথম থেকেই উপজাতিদের সমস্যা নিয়ে



দামস্কাস্—পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন নগরী

বিবেচনা করে এবং যাতে উপজাতিদের ভেদ বুদ্ধি লোপ পায় তার সর্ব্বরকম প্রচেষ্টা করে ; এই সর্ব্বজনীন ঐক্যের বাণী তখনকার আরবে এক নব্য চেতনার দ্বার খুলে দেয়। বস্তুত আরবের নব্য জাতীয়তার ইতিহাস এক কথায় বলতে গেলে ওহাবিয়া ধর্ম্মের পরিণতিরই ইতিহাস।

আরবের ধর্ম্মসম্প্রদায়গত ঝগড়া একদিন গিয়ে রাজনৈতিক ঝগড়ায় পরিণত হয়। এই সব আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের ফলে বাইরের শক্তিশালী প্রভাব এসে পত্তন করে বসে। গত মহাযুদ্ধের সময় আরবে প্রধানতঃ তিনটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মসম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে কেমন করে বিদেশী প্রভাব কার্য্যকরী হয়ে ওঠে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের ঘটনা থেকে।

(১) নেজ্দ-এর সামন্তরাজ ইবন সউদ ছিলেন ওহাবিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান চালিয়েছে। এই নীতির ভয়াবহ পরিণাম গোটা মধ্য প্রাচ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতের ত কথাই নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে মধ্য আরবের দুটি সামন্ত রাজপরিবারের পুনরভ্যুত্থান হয়। একটি নেজ্দ-এর আমীর, অন্যটি জেবেল সামারের আমীর। এই নেজ্দই ওহাবিয়া সম্প্রদায়ের ইবন সউদ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল রিয়াদ। এরই উত্তর সীমায় জেবেল সামারের আমীররা রাজত্ব করত। এদের রাজধানী ছিল হেইল। এরা ইবন রসিদের বংশ। এই দুই সামন্ত রাজপরিবারই মধ্য আরবে প্রভাব বিস্তার করতে মনোযোগী হয়ে ওঠে। ফলে দ্বন্দ্ব আরো উগ্র হয়। মহম্মদ ইবন রসিদ ইবন সউদের বংশকে কউৎ-এ নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে গোটা মধ্য-আরবে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করেন। কালের চাকা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটায়ই ঘুরল। ইবন সউদের বংশধরেরা রিয়াদ পুনরধিকার



জেরুসালেম—দূরে ওমর মস্জিদ্ দেখা যাচ্ছে—এ নগরী ইহুদী, ইস্লাম, খৃষ্টিয়ান সবারই পুণ্যতীর্থ

রাজনৈতিক প্রতিনিধি ইবন সউদ গত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন।

(২) হেজাজের সামন্তরাজ হাসিন—সুন্নি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ইনি গত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষ হয়ে লড়াই করেন। কিন্তু ইবন সউদের প্রতি মোটেই মিত্রভাবাপন্ন নন।

(৩) সানার ইমাম্—ইমেনের একজন অতিশয় প্রভাবশালী নেতা ও জইদি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইবন সউদ ও হাসিনের বিরুদ্ধবাদী—ধর্ম্মক্ষেত্রের বিরুদ্ধতার ত কথাই নাই। সানার ইমাম্ গত মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের এই এক বিশেষ কূটনীতি। ধর্ম্মের রন্ধ্র পথে পাশ্চাত্য কূটনীতিবিদ্‌রা ঢুকে বরাবরই ধর্ম্মসম্প্রদায়গত আচার-বিভেদকে রাজনৈতিক বিভেদে পরিণত করেছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে করলে। ওহাবিয়া সম্প্রদায়ের এই নয়া রাজত্ব পত্তনের ফলেই আবার ওহাবিয়া আন্দোলন জেগে উঠল। তৃতীয় আবদুল আসিস্ (সাধারণত বলা হয় ইবন সউদ) ইবন রসিদকে যুদ্ধে পরাজিত করে ক্রমশই তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ১৯১০ সালে ইবন সউদ 'আহ্বান' (ভ্রাতৃত্ব) আন্দোলন সুরু করেন এবং আরব জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হন। ১৯১৩ সালের মে মাসে ইবন সউদ এল্‌হাসা নামক তুর্কী প্রদেশটি অধিকার করে পারস্য উপসাগরের উপকূলে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। সাগর উপকূলবর্ত্তী প্রায় সব ব্যবসাকেন্দ্রেই ক্রমে ইবন সউদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক কথায় ইবন সউদ প্রভুত্ব ত কায়েম করলেনই, অধিকন্তু বাণিজ্যের ওপর একটা স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের পথও সুরাহা করলেন। এই নয়া প্রভুত্ব ইবনসউদকে বহির্জগতের সংস্পর্শে নিয়ে এলো। এখন দেখা গেল, আর নিছক আরবের ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলে না।

পরে ১৯২১ সালে ইবন সউদ জেবেল সামারের রাজধানী হেইল অধিকার করেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে হেজাজ অধিকার করেন। ১৯৩০ সালে আসির ও ১৯৩৪ সালে ইমেনের ইমামকে মানতে রাজী হয় নি। কেমনা তখনও তুর্কীদের সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক ভাল ছিল। ব্রিটিশের এই প্রত্যাখ্যানের ফল মোটামুটি ভালই হল। গোটা আরব জাতির মধ্যে মিলনের একটা সাড়া পড়ে গেল।



একুরে—একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বন্দর—বাইবেলের কাল থেকে এর প্রসিদ্ধি

পরাজিত করেন। ১৯২৭ সালে সেদ্দার চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এক কথায় সেদ্দা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আরব-বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

ইবন সউদের এই আন্দোলন বাদেও আরবের অন্যান্য স্থানে অনুরূপ আন্দোলন দেখা দেয়। দিকে দিকে ঐক্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ইমেন ও আসির প্রদেশে প্রায়ই বিদ্রোহ ঘটত, যদিও এরা তুর্কীর নামমাত্র প্রভুত্বের আওতায় ছিল। তবুও সেটুকু এদের বরদাস্ত হত না। মক্কার শরীফ, হাসিন ইবন আলীও সংহতি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন বহু দিন থেকে। খুব সম্ভবত তুর্কী সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য নিয়ে হেজাজ থেকে মদিনা পর্য্যন্ত এক রেলপথ তৈরী হয়। এই রেলপথের উপস্থিতিটা আরব জাতীয়তা-বাদীদের চোখে খুব ভাল ঠেকল। তারা বরং খানিকটা শঙ্কিত হয়ে উঠল ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

১৯১৩ সালে সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের ও মক্কার শরীফের মধ্যে একটা আলোচনা হয়। শরীফ লর্ড কিচেনারের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। লর্ড কিচেনার তখন মিশরদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ নিজের স্বার্থের জন্যই আরব জাতীয়তাবাদীদের কোন দাবী দাওয়া

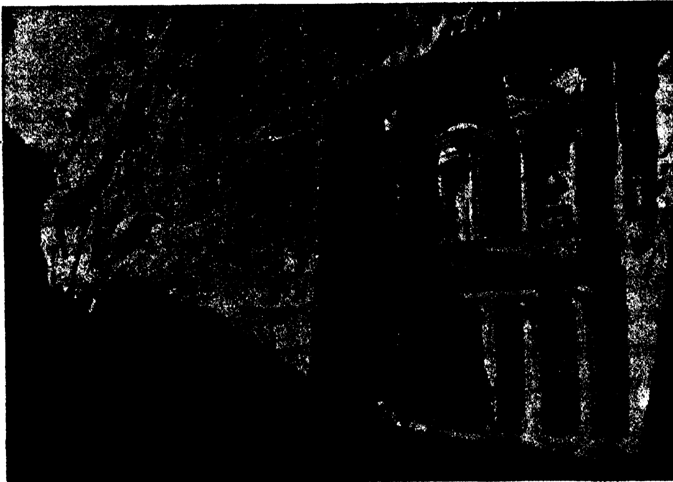
বসরার তালিব যে একটি সর্ব্বদল সম্মেলনের পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। আরবের সর্ব্বদলই তাতে সহানুভূতি জানিয়ে সাড়া দিল। ১৯১৩ সালে শরৎকালে কউৎ-এ এক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে আরবের আমীররা, শেখরা সবাই মিলিত হয়। এমন কি মেসোপটেমিয়া থেকে মাউন্টাফিক উপজাতিদের প্রতিনিধিরাও এসেছিল তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে। প্রথম থেকেই আরব জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্য—তারা উপজাতিতে উপজাতিতে যে দ্বন্দ্ব তার সমাধান করবে। কেননা তারা জানত যে এই বিভেদ দ্বন্দ্ব ভিত্তি করেই অটোমান সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে। তাই যে কোন উপায়ে হোক, সুশিক্ষিত আরব জাতীয়তাবাদীরা বিভেদের কাঁটা উপড়ে ফেলবেই এই ছিল তাদের দৃঢ় পণ। আরব জাতীয় সমিতি ১৯০৫ সালে প্রচার করলে :

"The Turks dominate the Arab only by dividing them on insignificant questions of ceremonial and religion; but the Arabs have recovered consciousness to their national, historical and racial unity and desire to detach themselves from the worm-eaten tree of Otham and to unite as an independent state."

কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে আরব জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের অধিকার-রক্ষায় যথেষ্ট দূরদর্শী ও সচেতন ছিল। তারা নব্য-আরবকে

চেয়েছিল "from the valleys of the Tigris and Euphrates to the Straits of Suez, from the Mediterranean sea to Oman"। এই সুদূরপ্রসারী স্বাধীন আরবকে যারা দেখতে চেয়েছিল তাদের চোখে গত মহাযুদ্ধ একটা বিশেষ সুযোগ। গত মহাযুদ্ধের চলতি পথে আরব এক অভিনব গুরুত্ব ধারণ করে। প্রাচ্য খণ্ডের কথা উঠলেই আরবের কথা সবার আগে ওঠে। তার প্রধান কারণ আরবের ভৌগোলিক সংস্থান। ভূমধ্যসাগরীয় দেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলের পথে আরব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এ হাতছাড়া হলে ভারত সাম্রাজ্যের যাতায়াতের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হবে। ব্রিটিশরা যদি মিশর থেকে আরবের মধ্য দিয়ে পারস্য উপাসাগরে পৌঁছোতে পারে তবে ভারতের পথে অতি সত্বর এসে পড়তে পারে—নচেৎ আসতে ঢের দেরী। তাছাড়া রাশিয়া ও জার্মানির লুব্ধ দৃষ্টি থেকে ভারতকে আড়াল করে দাঁড়াতে হলে আরবের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই নানা কারণে আরব সবার মনে মনে রয়েছে। বহুদিন থেকে আরবে ব্রিটিশ নীতি কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে দুটি বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল ছিল। এদের একদল ইঙ্গ-ভারতীয়, অপর দল ইঙ্গ-মিশরীয়। গত মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে ইঙ্গ-ভারতীয় দল আরবে তাদের নীতি কার্য্যকরী করবার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। রণনীতি ও ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে এরা এই ভাবে আরবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। ব্রিটিশজাতির রাজনীতিতে এই মনোভাবটা বরাবরই প্রবল ছিল। বিশেষ করে প্রাচ্যে এই মনোভাব আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজ্য সরাসরিভাবে দখল না করে, বৃথা হাঙ্গামা না করে, ধীরে ধীরে কৌশলে প্রভাব বিস্তার করা এবং স্থায়ী প্রভাবের উদ্দেশ্যে একটা অর্থনৈতিক স্বার্থ রাজ্যে রোপণ করা। এমন ব্যবস্থা করা—যাতে এই অর্থনৈতিক স্বার্থই কালে কালে রাজনৈতিক স্বার্থে পরিণত হয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ভারতবর্ষ। আরবের বেলায়ও এই নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয়নি; ইবন সউদ যখন প্রবল হয়ে পারস্য উপকূলবর্ত্তী এল্‌হাসা প্রদেশ জয় করেন, তখনই ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা তাদের শান্তিপূর্ণ অধিকারের নীতির বিষয় অবহিত হয় এবং ইবন সউদের সঙ্গে কৌশলে মিত্রতা করার ব্যবস্থা করে। এই মিত্রতা-স্থাপন নিশ্চয়ই কোন বিশ্বমানবতার প্রেরণা থেকে নয়, এটা সহজেই অনুমেয়।

আরবে ওহাবিয়া সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে এই ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতিক দল যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই সহায়তার মূলে কি নীতি ছিল বর্ত্তমানে তাই আলোচিত হবে। ভারতের উপর প্রভুত্বের যদি একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হয় তাহলে ভারত যাতে স্থলপথে ও জলপথে আক্রান্ত না হয় তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাছাড়া বিশেষ করে পারস্যের তেলের খনির মুনাফা যাতে নষ্ট না হয় তারও একটা পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। জলপথের প্রহরীস্বরূপ ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস ও মাল্টা দ্বীপ রয়েছে বটে, কিন্তু স্থলপথের ব্যবস্থায় কিছু গোলযোগ আছে। তাই গত মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতিক দল উঠে পড়ে লেগে গেল, যাতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থায়ী করতে পারে। ওদিকে পারস্যের তেলের খনিও বজায় রাখা চাই, নইলে চলে না। ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতিক দল চাইল যে—আরব-পারস্যের প্রভাব বিস্তারের কাযটা ভারতীয় সরকারের আওতায় থাক। এ বিষয়ে লণ্ডনের পুরোপুরি মনোযোগী না হলেও চলতে পারে। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ও বসরা দখল করে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত স্থায়ী প্রভাব বজায় রাখার ব্যবস্থা হোক। এতে করে ভারত আক্রমণের আশঙ্কাও খানিকটা বিদূরিত হবে। পারস্যের তেলের খনিরও আর ভয় থাকবে না। এই উদ্দেশ্যেই কউৎ-এর ব্রিটিশ প্রতিনিধি ক্যাপটেন সেক্স্‌পিয়র ১৯১৫ সালে জেবেল সামারের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে ইবন সউদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশ্য জেবেল সামারের আমীরও এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়—তুর্কীর সঙ্গে গত মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে। ১৯১৬ সালে পারস্য উপসাগরের রেসিডেন্ট স্যার প্রিসি কক্স্ ইবন সউদের সঙ্গে এক মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই বছরই মিঃ ফিল্‌বি নামক একজন প্রভাবশালী ব্রিটিশ রাজনীতিককে ব্রিটিশ সরকার ইবন সউদের নিকট প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মক্কার শরীফ্ হোসেনের সঙ্গে ইবন সউদের মিতালী টেকসই হয়। মিঃ ফিল্‌বির চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এখানেই ইঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতিক দলের কূটনীতির পরাজয় ঘটে। এর ফলে ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনীতিক দল প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনীতিক



পেট্রা—পাহাড় গাত্রে খচিত তোরণ, ইহার অন্তরালে বহু পুরাণো কালের একটি সৌধ বিরাজমান

দলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মিশরকে প্রভাবপুষ্ট একটি শিশুতে পরিণত করা এবং সেখান থেকে লোহিতসাগর তথা সিরিয়া-বিজয় পর্ব্ব সমাধান করা—উদ্দেশ্য যদি সিরিয়া-বিজয় শেষ করে ইস্‌লামের প্রধান তিনটি পবিত্র স্থান মক্কা, মদিনা, জেরুসালেম হাতের মুঠোয় আনা যায়। বোধ হয় ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনীতিক দলের এই ধারণা ছিল, যদি কোন প্রকারে ইস্‌লামের—প্রিয় পবিত্র স্থানগুলোর ওপর মোটামুটি একটা প্রভাব বজায় রাখা যায় তাহলে সমস্ত ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী দেশগুলোও তাদের সহায়তা করবে। তাছাড়া তুর্কীকে পদানত করে যদি কনস্তান্তিনোপলকে করায়ত্ত করা যায় তাহলে ইউরোপ থেকে আর কোন ভয়ই থাকল না। আজকে অনেকেই থমাস্ ই লরেন্সের নাম শুনেছে, অনেকে হয়ত লরেন্স অব্ আরব বলেই জানে তাঁকে, তাঁর কীর্ত্তি অনেক। আরব জাতিকে যাতে একটা চিরকেলে দাসত্বের শিকল পরিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য তিনি অনেক ব্যবস্থাই করেছিলেন। আরব জাতির সৌভাগ্য যে তাঁর ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নি; লরেন্সের অভিসন্ধিও পূর্ণ হয় নি। তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন যাতে ব্রিটিশ প্রভাব আরব জাতির মধ্যে আস্তে আস্তে আফিমের বিষের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্ত্তী কালে সেই আফিম-খোর আরব জাতিকে দিয়ে যাতে যে কোন কাজ—হোক তা' সে নিজের দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে—করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তা' ঘটেনি সেইটেই আরব ইতিহাসের মহত্তর পরিচয়। আরব জাতি প্রভাবগ্রস্ত হয় নি। লরেন্স ১৯১৬ সালে কায়রোতে আরব বুরোর সংস্পর্শে আসেন এবং আরব সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। ১৯২১ সালে যখন মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল ঔপনিবেশিক সচিব ছিলেন তখন তিনি লরেন্সকে ডেকে পাঠান। মধ্য-প্রাচ্যের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে তখন তিনি মিঃ চার্চ্চিলের সহায়তা করেন। এখানে একটু ইঙ্গ-ভারতীয় ও ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনীতিক দলের প্রভেদের কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। ইঙ্গ-ভারতীয় দল যেমন ভারত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও পারস্যের তেলের খনির স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ইঙ্গ-মিশরীয় দল ঠিক তেমন ভাবে ব্যস্ত ছিল না। মূলত মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যা একই, দুই দলের সমস্যার প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ায় একটু বাহ্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। তাহলেও ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনীতিক দলের একটু বিশেষত্ব আছে।

মিঃ চার্চ্চিলের একটা স্বপ্ন ছিল। তিনি বরাবরই একটা স্বপ্ন দেখতেন মধ্য-প্রাচ্য সাম্রাজ্যের। মিশর থেকে সুরু করে আরব পার হয়ে সোজা পারস্যে এসে ভারতের মাথায় পা ছোঁয়ান—এই ছিল মিঃ চার্চ্চিলের মহৎ স্বপ্ন। স্বপ্ন মহৎ সন্দেহ নেই। বিশ্ব মানবের কল্যাণে এমন মহান ঔদার্য্যপূর্ণ স্বপ্ন আরও কেউ হয় ত দেখে থাকবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ শত চেষ্টা করেও কোন একটা বিশেষ জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা তথাকথিত রাজতন্ত্র অথবা বণিকপ্রভাব ক্লিষ্ট তথাকথিত গণতন্ত্রের চাটুকার নির্লজ্জ বর্ণনা মাত্র। বিশ্বের জনসাধারণের অসহায়তার ওপর ভিত্তি করে যে সব সাম্রাজ্য অথবা বিশেষ প্রভাবাধীন এলাকার সৃষ্টি হয়েছে তার কোন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না।

রূপোন্মাদ

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

রূপে যে এমন পাগল করে তা সে দিন জেনেছি যমুনাতীরে,
গাগরী ভরিতে যাইয়া আমি যে ভরিয়া এনেছি নয়ন নীরে!
যমুনার কূল আলো ক'রে সখি! নীপ তরুতলে দাঁড়ায়ে ছিল,
নয়ন রাখিতে নিমেষে কেমনে সকল পরান হরিয়া নিল!
নিমেষে এমন হ'তে পারে তাহা স্বপনে কখন ভাবিনি ভুলে,
আপনি আমি যে আপনার হাতে সঁপেছি তাঁহার চরণমূলে!
নিজেরে বিকায়ে সেজেছি ভিখারী কালিয়ার
প্রেমে এত যে জ্বালা,
আপনার হাতে কণ্টক ফুলে গাঁথিয়া পরেছি ব্যথার মালা!
তাহার নয়নে এত কি যে মোহ নয়ন রাখিলে ফিরাতে নারি,
সারাটি রজনী শুধু কেন সখি! দেখেছি মধুর স্বপন তারি।

সেই বনমালা সেই শিখীচূড়া—অধরে তেমনি মুরলী ধরা,
সেই সে মধুর হাসিতে বাঁশীতে—রাধিকার প্রাণ পাগল করা।
তাহার কটিতে পীতবাসখানি - এমন মানায় আগে কি জানি,
চরণে তাহার রুণু রুণু বাজে কত যে মধুর—নূপুরধ্বনি।
কপোলে তাহার চন্দন ফোঁটা দাগ কেটে গেছে আমার মনে!
তাহার চরণ অলক্ত-রাগ অনুরাগে রাঙা জীবন সনে!
ভেবেছিনু আর যমুনার ঘাটে জল নিতে কভু যাব না একা,
পাছে সেই রূপ নয়নেতে পুরে আবার তাহারে পাইগো দেখা!
দেখিলে তাহায় বহু জ্বালা জানি,—না দেখিয়া সখি!
বাঁচিতে নারি,
একটি নিমেষে দেহমনপ্রাণ—সঁপিয়া দিয়াছি চরণে তারি!

চিদম্বরম্

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রেষ্ঠ রথ মনোরথ। এর অতি-ক্ষিপ্র বেগ অতুলনীয়। এ রথের প্রগতি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলের দুরত্ব লোপ করে। যান-বাহনের সহায়তায় দেশভ্রমণের আয়োজনের বহুপূর্ব্বে গতিশীল মন গন্তব্য স্থান পর্য্যটন করে আসে। সুতরাং এবার পূজার ছুটীতে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করবার বহুপূর্ব্বে কল্পনা মনোনীত তীর্থগুলির বহু রঙিণ চিত্র মনের পটে এঁকেছিল। তাদের মধ্যে প্রধান মূর্ত্তি ছিল রঙ্গেশ্বর



নটরাজ—দাক্ষিণাত্য—দ্বাদশ শতাব্দী

নটরাজের—তাঁর চঞ্চল চরণভঙ্গি। তাই তাঁর প্রসঙ্গ সর্ব্বাগ্রে।

নটরাজ মহাদেবের প্রধান মূর্ত্তি বিরাজিত হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ চিদম্বরমে। দক্ষিণ ভারতের সকল শৈব মন্দিরের কোন না কোন অংশে, নাচের লীলায় আপনহারা নটরাজের মূর্ত্তি বিদ্যমান—কোথাও প্রাচীরের গাত্রে কোথাও মন্দির-দুয়ারের বিমানে রচিত পাথরের দেবসভায়। কিন্তু মন্দিরের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নটরাজ পূজিত হন একমাত্র চিদম্বরমে। সে বিগ্রহও গৌণ। চিদম্বরমের প্রধান পূজ্য —ব্যোম। আকাশ মূর্ত্তি-হীন। তাই ব্যোম-মন্দিরের পীঠাসন শূন্য। পরিকল্পিত ব্যোম মূর্ত্তির দেবীর সম্মুখে, ভক্ত মানস পূজার অর্ঘ্য অর্পণ ক'রে ধন্য হয়। বিগ্রহ-বিহীন মন্দির অবুঝকে তুষ্ট করে না। যে শূন্যতায় পূর্ণতা বোঝে, অনির্ব্বচনীয় হর্ষ-শিহরণে তার চিত্ত দুলে ওঠে।

চিদম্বরম্! নামেই সূচিত হয় চিত্তের আকাশ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ, পরব্রহ্মের উপাধি—তাঁর রসস্রোতস্বতীর ত্রিধারা। তাদের বিকাশ চিত্তে সচ্চিদানন্দের এই তিন উপাধি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়—ত্রিধারার তিনটী স্রোত ওতোপ্রোত ভাবে সংমিশ্রিত। জড় বিশ্বেরও অণু পরমাণুর অন্তরে চৈতন্য ও আনন্দ নিহিত। শৈল, সাগর, শষ্প, কুসুম জড়। সত্যই কি এরা চির-অচেতন আনন্দ-হীন? শাস্ত্র বলে তাদেরও মাঝে আছে চৈতন্য এবং আনন্দ—কিন্তু তারা অজ্ঞানের আবরণে কারারুদ্ধ। তাই জড়ের জাড্য, চৈতন্য এবং আনন্দকে লুকায়ে রাখে। অভিব্যক্তির মূল-শক্তি সৃজন এবং ধ্বংশ। পালন, একটা অস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার ক্ষণিক পোষণ। ধীরে ধীরে যখন জড়ের মোহ-জড়তা অপসৃত হয়, চেতনা ফুটে ওঠে। একদিন তারও পরমাণু নব-সৃষ্টির পুলক-শিহরণের আনন্দে আপ্লুত হয়। সৎ বা যা আছে তাকে আশ্রয় ক'রে থাকে চিৎ-শক্তি। চিৎ-শক্তি অনন্ত। তাই এই শক্তির উদ্বোধনে অনন্ত জ্ঞান সম্ভব। জ্ঞানই আনন্দ। আনন্দও জ্ঞান এবং সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড হ'তে বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন নয়। জীবের চিত্তই চিৎ এবং আনন্দের লীলা-ভূমি।

এই চিত্ত-আকাশেই ফুটে ওঠে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চির-অশান্ত স্পন্দন। আর সেই স্পন্দনের ছন্দে ছন্দে, তালে তালে, উত্তাল নৃত্যের বেগে, জেগে ওঠে নটরাজের স্বরূপ। তখন সার্থক হয় কবির কথা—

তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে,
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইতো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর ও বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর।

এই আনন্দ-লীলার ভূমি—জ্ঞান-দীপ্ত চিত্তের আকাশ—চিদম্বর। আকাশ—ব্যোম—সর্ব্ব-ব্যাপী, সকল তরঙ্গের বাহন; ক্ষুদ্র-বিশাল, সূক্ষ্ম-স্থূল সবার আধার। বিশ্বের আকাশে যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্ফুরণ হয়, ক্ষুদ্র চিদাকাশও তেমনি সৃষ্টির এবং আনন্দের, অনাদি ও অনন্ত রূপের অনুভূতি-ক্ষেত্র। মানুষের চিত্তই সচ্চিদানন্দের লীলাভূমি। আর্য্য-দ্রাবিড় ঋষিদের এ তীর্থের নামকরণের মূলে আছে গভীর রসবোধ যার দীপ্ত অনুভূতির তৃপ্তি-উপভোগের ক্ষেত্র, চিত্তের আকাশ, চিদম্বর। এ-তীর্থের প্রধানমন্দিরের উপাস্য—আকাশ। এ হৃদি-মন্দির-বাসী দেবতা, পাষাণ দেবতা নন—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পঞ্চমহাতত্ত্বের অপঞ্চীকৃত প্রধান তত্ত্ব—ব্যোম।



তাঞ্জোরের একাদশ শতাব্দীর দ্রাবিড় মন্দির

এ সত্য আত্ম-প্রকাশ করে, এই প্রাচীন তীর্থের নীরব, শূন্য-বেদীর পাদ-মূলে। হয়তো ভ্রান্তি। কারণ—এ ধারণা আমার নিজস্ব। সেই পুণ্য-তীর্থে যুগ-যুগান্তর, কত তাপস, কত ভক্ত, আত্ম-জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। তাদের সূক্ষ্ম-রশ্মি ব্যোম-মন্দিরের আকাশকে শুদ্ধ করেছে। তার ক্ষীণ কিরণে সত্যই, প্রাণের গভীরে, বিশ্বের অখণ্ড অনাদি রূপ ভেসে আসে। সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ব-স্রষ্টার চির-আনন্দ-লহরের লীলা-তরঙ্গ, চিত্তের আকাশে নেচে ওঠে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের তত্ত্ব পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে এ মন্দির উৎসর্গ।

ছান্দোগ্যের নির্দ্দেশ যে আমাদের দেহ ব্রহ্মপুর। কারণ—অনাদি আত্মা, নশ্বর জীব-দেহে বিদ্যমান। সেই ব্রহ্মপুরের অন্তরে একটি অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক প্রস্ফুটিত। সে পদ্ম হৃদয়-পদ্ম। আকাশের মত সূক্ষ্ম পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, সেই হৃদয়-পদ্মে বিরাজমান। তাঁকেই অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য এবং বিশেষরূপে তাঁর তত্ত্ব জিজ্ঞাস্য। নিজের চিত্তেই মনোনিবেশ কর্লে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়।

এ-কথায় শিষ্য জিজ্ঞাসা করতে পারে—ক্ষুদ্র চিদম্বরে কী বিদ্যমান—যাঁর বিষয় এমন বিশেষ ক'রে জানতে হবে এবং যাঁকে চিত্তাকাশে খুঁজে বার করতে হবে?

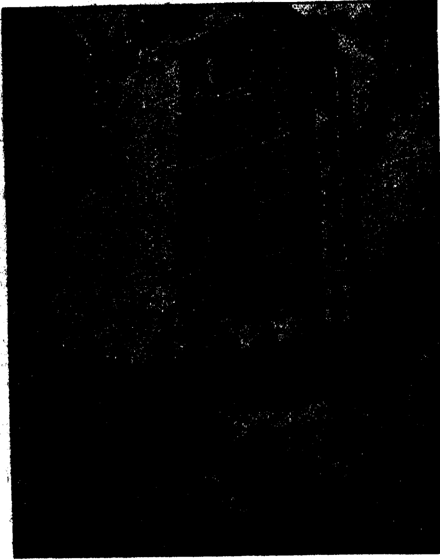
তাতে আচার্য্য বুঝিয়ে দেবেন—যেমন বিশ্বব্যাপী বাহিরের আকাশ, তেমনি অন্তরে ক্ষুদ্র হৃদয়-আকাশ। এই উভয়েরেই সমাহিত, দ্যুলোক ও ভূলোক, উভয় পৃথিবী। উভয় অম্বরেই সম্যকভাবে সন্নিবেশিত অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র। এমন কি ইহলোকে যাহা আছে আর যাহা নাই, যাহা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে বা যাহা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ক্রোড়ে নিহিত—সেই সমস্তই এই চিদম্বরে সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সেই চিত্তাকাশেই ফুটে উঠে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ।

মানুষের চিত্তের এই অনন্ত বোধশক্তি, মানুষের হৃদয় আকাশের অফুরন্ত বিশালতা, মানুষের মন অবিনশ্বর আত্মা-

রূপ রথীর রথ—এই সত্যকে মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলবার জন্য চিদম্বর তীর্থ-স্থানের প্রতিষ্ঠা। আমার এ ধারণা ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু এ উপলব্ধি আন্তরিক।

নটরাজ মূর্ত্তির পরিকল্পনার মূলে দার্শনিক তত্ত্বের সাথে ভক্তি-রস মেশানো। চিদম্বরমের নটরাজ মূর্ত্তি ধাতু-গঠিত। অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা বিগ্রহ গঠনে। নটরাজের নৃত্য-ভঙ্গিমা সপ্রাণ। লাস্য ফুটে উঠেছে প্রতি গতিশীল অঙ্গে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আনন্দ কুমারস্বামী নটরাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ললিত ছন্দে নটরাজের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন।

নটরাজের নৃত্য মাত্র প্রলয়ের তাণ্ডব নয়। অণু-পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া একই তরঙ্গ-লীলার পরিণাম। এক সমষ্টি হতে সম্বন্ধচ্যুত হ'য়ে পরমাণু মুক্তি পায়। কিন্তু



প্রাসাদের অষ্টতলাবিশিষ্ট চূড়া

তখনি আবার অন্য সমষ্টির অণু-পরমাণুর আকর্ষণে কারারুদ্ধ হয়। পলে পলে সারা বিশ্বে এই সৃজন ও প্রলয়ের নিত্য-লীলা চলিতেছে।

ভাঙ্গা-গড়ার স্পন্দন নটরাজের নাচ।

তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়।

বিশ্ব-তনুতে অণুতে অণুতে নৃত্যের ছায়া কাঁপে। পরমাণু মুক্তি পায় কিন্তু সে মুক্তি নূতন বাঁধন।

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহিমা বর্ণনায় প্রাচীন ঋষি এই সত্যের সন্ধান দিয়েছেন—বিশ্বের উপরতি নারায়ণী শক্তি কলাকাষ্ঠাদি রূপে পরিণাম প্রদায়িনী।

বিশ্ব-নিয়ন্তার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড একটা অনন্ত রঙ্গভূমি। তাই নটরাজের পদতলে মহাকাল। তাঁর নৃত্য-রঙ্গের তরঙ্গে কাল পরাজিত পদ-দলিত। মায়ার প্রধান বাঁধন-রজ্জু—কাল। কাল আর ক্ষিতি, টাইম আর স্পেস্, অসীমকে সসীম করে। কিন্তু পরব্রহ্ম শঙ্কর সে সীমা-গণ্ডীর উর্দ্ধে। তাই এক চরণ বিন্যস্ত মহাকালের পৃষ্ঠে। নটরাজের অন্য চরণ সে কাল-ভয়ের উচ্চে। সে পদে আশ্রয় নিলে তবে কালের ভয় যায়। সমস্ত নাচের ছন্দটাই মুক্তির তরঙ্গ। রুদ্রের চরণে মুক্তি। কিন্তু নৃত্যের পট-ভূমি ব্রহ্মাণ্ড—তাই তাঁর বিগ্রহ ঘিরে বৃত্ত—সংসার-চক্রের প্রতীক।

কেবল দার্শনিক অনুভূতি মানুষের মনকে সরস কর্ত্তে পারে না। আনন্দের আস্বাদন ভক্তি-রসে। সে রস যত ঘন হয়, আনন্দ তত বাড়ে। শেষে আনন্দ-ঘন চৈতন্যের অনুভূতি, চিত্তের আকাশে উষার আলোর মত রঙিয়ে ওঠে। নটরাজের নাচের ছন্দে, ডমরুর তালে, হাতের অভয় মুদ্রার সঙ্কেতে, প্রাণে আশা জাগে, মুক্তির স্পন্দনে সংসারের বাঁধন কাটে। কবির কথায়—

তোমার তাণ্ডব-তালে কর্ম্মের বন্ধন গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান, পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।
সর্ব্ব অমঙ্গল সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্তি-লয়ে।

নটরাজমূর্ত্তি পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। চিদাকাশের হৃদ্-পদ্মের অনুভূতিতে মুক্তি। আমার মনে হয় চিদম্বরমে নটরাজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার এই সার্থক সঙ্কেত।

চিদম্বরম্ ষ্টেসন মান্দ্রাজ হ'তে ১৫৫ মাইল দূরে। তারকেশ্বর যেমন বাবা তারকনাথকে কেন্দ্র ক'রে যাত্রী আবাসে

পূর্ণ—চিদম্বরমের বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণকে ঘিরে তেমনি প্রাচীন গ্রাম চিদম্বরম্। সমৃদ্ধির কোনো লক্ষণ নাই, নাগরিক প্রাণের কোনো সাড়া নাই। পথ ঘাট একদিন আড়ম্বরে নির্ম্মিত হ'য়েছিল, আজ তাদের পরিরক্ষণে কারও উৎসাহ নাই। যান-বাহনের মধ্যে আছে ঝট্কা। ঝট্কা এক-ষাঁড়ে-টানা গো-সকট। তার টপ্পর তালপাতার ও বাঁশের! অভ্যন্তরে মানুষের অন্তর তিক্ত হ'য়ে ওঠে। তবে বলীবর্দ্দগুলি বলিষ্ঠ, আর তাদের সিঙ সোজা। যে গাড়োয়ানের প্রাণে স্ফূর্ত্তি আছে, শিল্পে শ্রদ্ধা আছে, সে ষাঁড়ের সোজা শিঙ্ নারিকেল তৈল মাখিয়ে চকচকে করে, আর পিতলের চোঙা দিয়ে তাকে বাঁধিয়ে দেয়। ঘণ্টা অবশ্য গাড়ির গরুর কণ্ঠের চিরন্তন আভরণ।

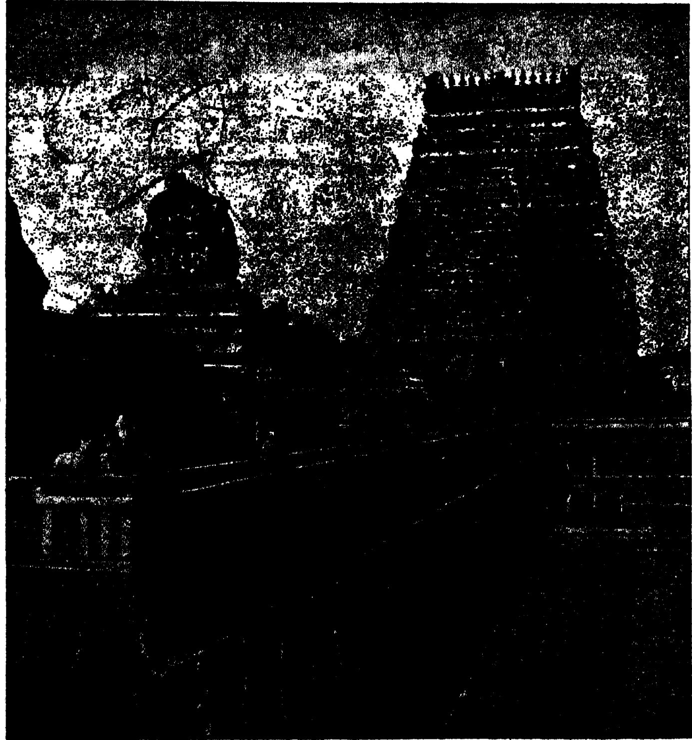
অতি-প্রত্যুষে আমরা গো-যানে, গ্রাম্য-পথে, বিষম না হক, অল্প-বিস্তর ধুপ-ধাপ ধাক্কা খেয়ে, মন্দির দ্বারে উপনীত হ'লাম। অভ্যর্থনার আয়োজন নাই। বরং প্রথমেই প্রত্যাখ্যানের ক্ষণিক ব্যথা আমাদের প্রতীক্ষা-চঞ্চল প্রাণকে কাতর করলে।

সমালোচকের মন নিয়ে তীর্থ-যাত্রা বিড়ম্বনা। দীনতা তীর্থ-যাত্রীর মনকে পবিত্র না করলে কোমল প্রাণে ব্যথা লাগা অবশ্যম্ভাবী। তাই যাত্রার পূর্ব্বে প্রার্থনা ক'রে, গৃহ-ত্যাগ করেছিলাম, যেন—

মন্দিরার মন্ত্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ।
নৃত্য মদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কালাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে, তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।

কিন্তু প্রথমেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার ফলে এ উচ্চ অভিলাষ হ'ল জলাঞ্জলি।

মাদ্রাজ প্রান্তে বাঙ্গালার মনোভাব ব্যক্ত করবার বাচনিক ভাষা—ভাঙ্গা ইংরাজি এবং কায়িক ভাষা—মূক-বধির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত হাত-মুখ-নাড়া। ঝটকা-ওয়ালাদের এতদুভয় ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোলাহল-শূন্য বাসা চাই—মন্দিরের অব্যবহিত সন্নিকটে। পরিচ্ছন্নতা বোঝাবার জন্য "এন্তা জঞ্জাল" গানের আনুসঙ্গিক ভাব-প্রকটের প্রচেষ্টাকে আমার স্ত্রী বন্ধ করলেন। একজন রেলের কর্ম্মচারীর



চিদম্বরের শিবমন্দিরের উত্তর গোপুরম্ ও জলাশয়

সহায়তায় আমাদের ইংরাজিতে ব্যক্ত মনোভাব তামিল ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ঝট্কা-ওয়ালাদের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ল। তার অনিবার্য্য ফলে তারা হাসলে এবং মাথা নাড়লে।

দক্ষিণের মাথা-নাড়াও আমাদের মাথা নাড়ার বিপরীত ভাব-ব্যঞ্জক। 'আমরা "না" বলবার সময় দুদিকে ঘাড় নাড়ি। ওরা নাড়ে একদিকে। আর ওদের সম্মতি

প্রকাশ পায় দুদিকে ঘাড় নাড়ায়। বহুবার ওয়ালটেয়ার, ভিজাগাপাটম্, বিমলীপাটম্ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ ক'রে দ্রাবিড়দের এ টেক্‌নিক্‌টা আয়ত্ব করেছিলাম।

তারা অতি-প্রত্যুষের স্নিগ্ধ আলোয় আমাদের মন্দিরের বড় এক ফটকের সম্মুখে নিয়ে গেল। পথের সকল কাঁটা ফুল হ'য়ে ফুটলো। কল্পনা হার মানলে। যে সব ছবি দেখে মনের পটে ফটকের ছবি এঁকেছিলাম, বুঝলাম তাদের শিল্প-কুশলতার অভাব এবং কল্পনার দানতা। খুব সোজা কথায়, হর্ষে ও বিস্ময়ে বল্লাম—আহা!

ঠিক মন্দিরের তোরণ দ্বারে ডানদিকে পথের উপর দ্বিতীয় বাঙলোটি চমৎকার। মনে হ'ল নূতন-গড়া। গাড়োয়ানেরা দরজা খুলে মালপত্র ভিতরে নিয়ে যাবার যখন চেষ্টা কর্লে, একটি সুপুরুষ সাধু এসে শকট-চালকদের প্রগতি প্রতিরোধ কর্লে। আমরা তখনও ভোরের আলোর খেলা দেখ্‌ছিলাম গোপুরমের দেবসভায়।

কী ব্যাপার! তর্ক চলছে তামিল ভাষায়। তাতে বেহায়া বা এলাহাবাদী তর্কের প্রখরতা নাই। এমন কি বাঙ্গালী ঝগড়ার গলাবাজী হ'তেও সুর নীচে। একটা কড়ি-ভরা খালি মাটির হাঁড়িকে একটু সোৎসাহে নাড়লে যেমন হয়, কলরবটা সেই রকম।

সে সবাক-চিত্রকে অবাক-চিত্র হিসাবে বিচার ক'রে বুঝলাম সাধু আমাদের পুর-প্রবেশের বিরোধী। সম্মানের অভিমান দূরে না গিয়ে বেশ চেপে বসলো মনের মধ্যে। যে দম্ভ প্রবৃত্তি স্বয়ং রূপে নটরাজের ডমরুর তালে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তাঁর শ্রীমন্দিরের কারু-কার্য্য-খচিত গোপুরমের কি সাধ্য তাকে অবলুপ্ত করে। ভাবলাম, লোকটা বে-য়াদব। সাধু হ'য়ে আতিথেয়তার মর্য্যাদা বোঝে না, যার সম্বন্ধে সংস্কৃত কাব্য বলে—

ছেত্তু পার্শ্বগতচ্ছায়াঃ নোপসংহরতে দ্রুমঃ এবং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

আমি ইংরাজি, বাঙ্গালা এবং হিন্দী ভাষায় ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রহস্য নিজের জালে জড়িয়ে পড়লো।

সাধু ঘন ঘন পাশের বাড়ি দেখিয়ে দিলে। তখন ঘাড় ধরে একটা ঝটকা-ওয়ালাকে পাশের বাড়ির দরজায় নিয়ে গেলাম। নিজে বাহির হতে দুয়ারে কর হানলাম। তখন এক অর্দ্ধ-নগ্ন লোক চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলো। তামিল ভাষায় সকল কথা শুনে, সে বাঙলা ভাষায় বল্লে—কঁলকাতা থেকে এঁসেছেন। আঁসুন। তারপর সেই পূর্ব্বের দুয়ারে গেল।

আমার স্ত্রী বল্লেন—ও লোকটা অপমান করেছে। ওর বাড়ী যাবে না।

যাকে গৃহস্বামী ভেবেছিলাম, সে স্বামিজী তামিল ভাষায় জবাবদীহি করলে। তারপর ঘুম-ভাঙ্গা হাঁসলে, স্বামীজি হাঁসলে, গাড়োয়ান-দ্বয় দুদিকে ঘাড় নাড়লে। বুঝলাম একটা আঁতাত কর্দ্দিয়াল হল। ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার ভ্রান্তি-বিলাস। বাড়ী বাঙলা-ভাষী তামিলের। সে সাধুকে সেই বাড়ির বাগানে ফুল তোলবার অনুমতি দিয়েছিল। সে পরের বাড়ি কেমন ক'রে অজ্ঞাত-কুলশীলদের প্রবেশ কর্ত্তে দেয়। গাড়োয়ানদের যত বলে—পাশের বাড়ি থেকে হুকুম আনতে, তারা ততই প্রবৃত্তি দেখায় হুকুম ভাঙ্গবার।

এর পর মান অভিমান রবির আলোয় ভোরের আঁধারের মত উবে গেল। সাধু হাতজোড় ক'রে আমার সহধর্ম্মিণীকে বল্লে—আম্মা ডভরং মডরং—কিম্বা ঐ রকম একটা কিছু। যার অর্থ হওয়া উচিত—মাতঃ ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ।

পরে অধিক পরিচয় হ'লে বাঙলা-নবীশ দ্রাবিড় বল্লে—সে কখনও মাদ্রাজের উত্তরে আসেনি। বাঙ্গালী যাত্রীদের সেবা ক'রে সে বাঙলা শিখেছে। বাহাদুর!

মন্দির-ভাঙ্গা বিজয়ীদের উৎপাত ছিল দক্ষিণ ভারতে কম। তাই আজও দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন চিদম্বরমের মন্দির বিদ্যমান। কিন্তু এই দেড় হাজার বছরের মধ্যে কোনো একদিন দক্ষিণ ভারতে উত্তরভারতের মন্দির ধ্বংশ ও দেবোত্তর ধন-লুণ্ঠনের সমাচার পৌঁছেছিল। কারণ পুরী হ'তে সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি সকল মন্দিরই এক একটি দুর্গ। দুর্গ-পরিখার মাঝে অনেক দেব-দেবীর মন্দির, ভোগ ও বিলাস-মণ্ডপ, লীলা সরোবর, পবিত্র কূপ প্রভৃতি বিদ্যমান। চিদম্বরমের বিশাল মন্দিরভূমি প্রাচীর বেষ্টিত। সেই পরিখার মাঝে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে নটরাজ এবং ব্যোমমূর্ত্তিকে কেন্দ্র ক'রে অষ্টালম্বি অনেকগুলি দালান। তাদের মাঝে মাঝে নানা দেব-দেবীর মন্দির,

দেবতাদের ভোগ-মণ্ডপ, কনক-সভা, দেব-সভা প্রভৃতি বর্ত্তমান।

এই মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে লীলা সরোবর। ঢল ঢলে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী বল্লেন—বেশ টোপাকুল।

—টোপাকুল? এতদিন মাদ্রাজে ঘুরে টোপাকুল? টেপাকুল্লম্। মন্দিরের সরোবরগুলাকে বলে টেপাকুল্লম্।

তিনি মাদ্রাজী ভাষার শব্দের সঙ্গে শক্ত মটর ভাজা চেবানোর শব্দের তুলনা করলেন।

আমি বল্লাম—ছিঃ! পরের ভাষা নিয়ে রহস্য? ওরা যদি বাঙ্‌লা ভাষা নিয়ে কৌতুক করে।

—করুক না। যদি বলে—বাঙলা যেন মার্ব্বেলের নুড়ির উপর দিয়ে গোলাপ জলের ঝরণার শব্দ—আমাদের রাগ করবার কি আছে?

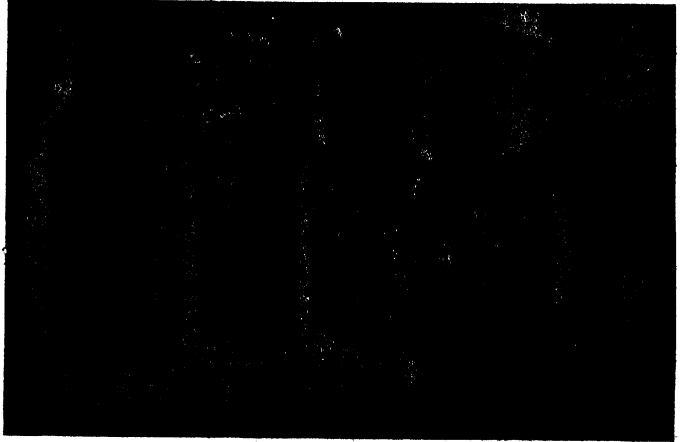
এর পর তর্ক চলে না।

টেপাকুল্লম শব্দটা কঠোর। এর মানে লীলা স রো ব র। মাদ্রাজের প্রত্যেক প্রখ্যাত-মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন আছে এক একটি সরোবর। পার্ব্বণের সময় মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা নৌকা-বিহার করেন টেপাকুল্লমে।

চিদম্বরমের টে পা কু ল্ল ম পরিখার মধ্যে—প্রধান মন্দির অট্টালিকা সংলগ্ন। পুকুরটি আয়তনে প্রায় গোলদীঘির অর্দ্ধেক—১৭৫ ফুট লম্বা এবং ১০০ ফিট চওড়া। সরোবরের নাম শিব-গঙ্গা। আমার মনে হয় সন্নিকটবর্ত্তী ভেলার নদীর সঙ্গে এর সংযোগ আছে, কিম্বা এর ভিতর উৎস আছে। আমাদের বাঙ্‌লা দেশের পুকুরের মত টেপাকুল্লমের গড়ানে সবুজ পাড় থাকে না, বকচর কুল থাকে না। এগুলি পাথর দিয়ে গাঁথা হৌজের মত। কাশীর দুর্গা-বাড়ীর সন্নিকটে এবং শ্রীক্ষেত্র-পুরীতে এমনি পুষ্করিণী আছে। শিবগঙ্গার জল কাক-চক্ষুর মত তকতকে ঝকঝকে। তার ভিতর লম্বা লম্বা সিঁড়ি নেমেছে। একদিকে সুন্দর নয়নরঞ্জন পাথরের চাতাল। কাপড় ছাড়বার ঘর। চারদিকে চারটি মন্দির। একটি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী—কালীমাতা। পুকুরের মুখে একটি পাথরের মণ্ডপের উপর আছে গণপতি মূর্ত্তি, আর তার পাশে এক প্রকাণ্ড ইঁদুর, আকারে বাঙ্‌লা দেশের একটা বাছুরের মত।

এই পুষ্করিণীর ধারে আছে—হাজার থামের একটি দালান, ৩৫০ ফুট লম্বা এবং ১৬০ ফিট চওড়া। কোণারকের মন্দিরের মত এই মণ্ডপ ৮। ১০ ফুট উঁচু পাথরের বন্ধনীর উপর নির্ম্মিত। পোস্তার চারকোণে চারটি বৃহদাকার সচল সাবয়ব পাষাণ-নির্ম্মিত হস্তী। মনে হয় যেন এই অট্টালিকা হস্তী-বাহিত। পোস্তায় অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের নিদর্শন আছে—পদ্ম, চক্র, পুষ্পলতা প্রভৃতি।

উপরের থামগুলির কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম, অতিশয় মনোরম। সারি সারি থাম, মাঝে লম্বা পথ। শেষে মণ্ডপ, বিগ্রহের উৎসবের পাথরের মঞ্চ। স্থাপত্য হিসাবে এর শোভা এবং গঠন-কৌশল উচ্চ অঙ্গের।



তাঞ্জোর দুর্গের প্রাচীন প্রাসাদের দরবার কক্ষের প্রবেশদ্বার

কিন্তু এ দালানে ফাট ধরেছে। মাঝে মাঝে উপরের পাথরের খসে পড়বার আগ্রহ-চাঞ্চল্য পর্য্যটকের পক্ষে ভীতি-জনক। শারীরিক ভীতি অপেক্ষা মানসিক পীড়া যাত্রীকে অধিক ব্যথিত করে। যদি হিন্দু ক্রোড়-পতিদের কৃপণতা এবং ঔদাসীন্য এ অট্টালিকার ধ্বংসের কারণ হয়, তবে সমগ্র হিন্দু-জাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমার রেখা পড়বে। পূজারিরাও চামচিকিকে উপনিবেশ স্থাপনের উৎসাহ দিয়ে স্থানটি ব্যথার কারণ করে রেখেছে।

ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রাম্যমান বিদেশী সম্মানিত। আমি

সেই প্রাচীন সৌধাংশে উপস্থিত লোকজন একত্র করে একটা ছোটখাট সভা করলাম। কেন? এত অবহেলা কেন? মন্দির সারানো হয় না কেন?

এক দল বল্লে—দোষ কংগ্রেসের। তারা গবর্ণমেণ্ট হাতে পেয়ে কেন দু'লাক টাকা দিয়ে মন্দির সারায় নি; এ কথার জবাব রাজাগোপাল আচার্য্য প্রভৃতি দিতে পারে।

একজন বল্লে—মাষ্টার; সত্য কথা বলব? যে রাজা-সাহেব একেলা এই মন্দির সারাতে পারে, আর যে ধন-কুবের চেটীরা প্রত্যেকে বা দু'দশ জন মিলে এ কার্য্য করতে সক্ষম, তারা শৈব। এ মন্দিরটি বিষ্ণুর। নটরাজ-মন্দিরের এক পাশে অনন্ত শয়নে নারায়ণ, কোনো প্রকারে টিঁকে আছেন। তাঁর ঘুম না ভাঙ্‌লে এর মীমাংসা হবে না। শিবের ভক্তেরা কিছু করবে না।

এর পর আমারও করবার কিছু রহিল না, মনের দুঃখে—তাইরে নাইরে নাইরে না—সুর ভাঁজা ছাড়া।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী ধরিত্রী দেবী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—এত দুর্দ্দশাতেও আমাদের ঘুম ভাঙলো না।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম—নারায়ণের গাঢ় নিদ্রার কথা হচ্চে—আমাদের তুচ্ছ সুষুপ্তির কথা নয়। শিকারীর তাড়নায় নেকড়ে বাঘ, খ্যাঁক-শেয়ালী প্রভৃতি দল বাঁধে। পশুর মত সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে হিন্দু মনুষ্যত্বের বিলোপসাধন কর্ত্তে পারে না।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের তোরণ বা গোপুরম বড় বিচিত্র। মাদ্রাজী মন্দিরের বিশেষত্ব গোপুরমের বিমানে। বিস্তৃত দ্বারের উপর উচ্চ টাওয়ার স্তরে স্তরে আকাশের দিকে উঠে যায়, কেহ সাত তলা—কেহ নয় তলা। উপরে ক্রমে সরু হয়। মাথার চূড়া গোলার্দ্ধ ভাঁজে ঘোরানো। তার উপর কলস্ থাকে! এই মীনারের উপর সন্নিবেশিত হয় পাথরে-রচা নানা দেব-দেবী, পৌরাণিক বীর ও মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্ত্তি। চিদম্বরমে এই রকম চারটি গোপুরম্ আছে। একটি উচ্চে ১৬০ ফিট। কলিকাতার মনুমেণ্টের উচ্চতা ১২৬ ফিট। ভাস্কর্য্য নিখুঁত। মূর্ত্তিগুলির ভঙ্গী ও গঠনে চারু-শিল্পের নিপুণতা দেদীপ্যমান।

প্রধান মন্দির-প্রাঙ্গণ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। আগাগোড়া পাথরের ছাদে ঢাকা। লম্বা লম্বা দালান। তার দুদিকে থাম। প্রথম চত্বরে স্থানে স্থানে নানা দেবদেবীর মন্দির। মাঝে মাঝে দালান আছে—নৃত্য-সভা কনক-সভা প্রভৃতি। থামে সংবদ্ধ মূর্ত্তি। হাতী, ঘোঁড়া বিভিন্ন ভঙ্গীতে স্তম্ভের অঙ্গে। নাচের ভঙ্গীতে নর্ত্তকী-মূর্ত্তি। সজীব সচল প্রাণবন্ত ভাস্কর্য্য কেবল একটা কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। মানুষ নিষ্ঠুরতায় আপনাকে পাষাণ কর্ত্তে পারে। আবার তার শিল্পে সে পাষাণে প্রাণ-সঞ্চার করতে পারে। এই প্রাঙ্গণে করুণা, রোষ, লাস্য, হাস্য, নির্ম্মমতা, নির্ভীকতা সমস্ত ফুটে উঠেছে নানা প্রস্তর মূর্ত্তিতে। ত্রিপুরাসুর বধ প্রভৃতি অতি মনোরম। কনক সভার স্তম্ভের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শব্দে বা চিত্রে বোঝানো অসম্ভব।

নটরাজের মন্দির রূপার সিঁড়ি বহে উঠতে হয়। মন্দিরের চূড়ায় সোণার আভরণ নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করে। চিদম্বরমের শিল্প-নিপুণতা নয়নকে মুগ্ধ করে, প্রাণে শান্তি দেয়, মনে বল দেয়। নিজের কল্পনার দীনতা স্মরণ করিয়ে দেয়! সব সত্য। কিন্তু এসব ভাবে আত্মা তুষ্ট হয়, যতক্ষণ মন্দিরের মধ্যে পর্য্যটন করা যায়। কারণ তখন অন্য কথা ভাববার অবসর পায় না মন। কিন্তু আজ এই বারো শত মাইল দূরে বসে মাত্র একটা কথা মনে হয়—লীলাময়, রঙ্গরসিক নটরাজ কী ভেঙ্গে কী গড়েছ? আমরা কি ছিলাম আর আজ কি হয়েছি?

তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ—নিরাশার আশ্বাস মাত্র।

নবীন চিদম্বরম প্রাচীন চিদম্বরম মন্দির হ'তে প্রায় তিন মাইল দূরে—রেলপথের ওপারে। সেখানে দানবীর মহাপ্রাণ রাজা সার আন্নামালাই চেটীর বদান্যতায় ১৯২৮ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাণ্ড বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ প্রভৃতি আশা-প্রদ। নিজেদের শুদ্ধ জল, বিজলীর আলোক।

ছাত্রীদের কি অবস্থা?

একটি হাস্য-মুখ মেয়ে আমার স্ত্রীকে বল্লেন—আমরা মাত্র এক শত জন আন্দাজ আছি। এঁরা স্থান দিতে পারছেন না। তা' হলে' ছেলেদের সমান সংখ্যা হবে আমাদের।

এ গর্ব্ব অন্তঃসারশূন্য নয়। দক্ষিণের শিক্ষিতা নারী সৌজন্য ও মর্য্যাদায় পুরুষ অপেক্ষা হীন নয়। নিজের দেশের মহিলা সমাজে অপ্রিয় হবার আশঙ্কায় আমি মাদ্রাজী মহিলার সাথে বাঙ্গালী নারীর তুলনা কর্ল্লাম না।

কিন্তু আমার সহধর্ম্মিণীর কথায় বলি—আমাদের মেয়েদের এত আত্মনির্ভরতা নাই, শিক্ষা নাই, নির্ভীক সরলতা নাই—তার জন্য দায়ী তোমরা। স্বার্থ-পর, স্বল্পদর্শী-নিষ্ঠুর—পাপিষ্ঠ।

যাক্ দাম্পত্য কলহ।

মনে মনে ভাবি যতই শিক্ষা দিই, গান শেখাই, শিল্প-নিপুণ করি, আমাদের মা-লক্ষ্মীদের ঘরে নেবার সময় পাষণ্ডেরা ভাবে না, ধন্য হচ্চি। কারণ তারা পণ চায়, দর কষে, মেয়ে দেখবার জন্য বলে ময়দানে নিয়ে চল। ছিঃ! প্রার্থনা করি—

নৃত্যের তালে তালে নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও—
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।

মাতাল

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আমার গল্পের নায়ক জগৎমোহন রায় ওরফে মাতাল। মাতালকে নায়ক করিয়াছি ফরমায়-ফেলা সুদর্শন ব্যক্তি বলিয়া নয়—মানুষ-হিসাবে চিনিতাম বলিয়া। তাহার চরিত্র সাধারণের সহিত তুলনা করিলে বলিব একেবারে থাপছাড়া। শরীরের গঠনে কেমন অভভ্রোচিত জোয়ান ভাব। হয়ত কুস্তী কিম্বা ঐ জাতীয় বিপদসঙ্কুল খেলা-ধূলা করিয়া থাকে। সেই কারণেই বোধ হয় কান দুইটা থেঁৎলান এবং নাকটা মুচড়াইয়া আছে। তথাপি মানুষটি আসলে ভীতিপ্রদ অথবা নির্দ্দয় নয়, একথা যাঁহারাই



—গভীর রাত্রিতে মাতালের গৃহে সজীব মাংসপিণ্ড অসাড় জড় হইয়া স্তূপীকৃত হইতে থাকে

তাহার সহিত সহজভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। মাতালকে দার্শনিক বলিয়া স্বীকার করিলেই সে পরম পরিতোষ লাভ করে, ঐটুকুই যাহা তাহার দোষ। কেহ যদি অজানাকে জানিয়া সত্যটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে তো মাতাল তাহা ঘায়েল করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইয়া ওঠে।

মাতাল এ পাড়ায় উঠিয়া আসিল কেন বলা দরকার। কলেজে পড়িতে গিয়া একটি প্রাণস্পর্শী রসে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহা জীবন্ত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া। প্রাণীটি দত্ত সাহেবের কন্যা ··· বি-এ পড়িতেন। পাশ করার পর কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়ী ভবানীপুরে ; সুতরাং প্রেমের তাড়নায় মাতালও নিকটবর্ত্তী বাড়ী ভাড়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ঘটনাটি বেশী দিনের নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাড়ার সকলে জানিয়া ফেলিয়াছে—মাতাল মদ খায়। সত্যই মাতাল মদ খায়, কিন্তু টলে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাতালের বাড়ীতে কোন রাত্রিতেই অতিথির অভাব হয় না। সে সময় মাতাল যাহাকে সামনে পায়, তাহাকে ধরিয়াই দর্শনের নানাতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং হার মানাইতে পারিলে মাতালের বেশ হৃষ্টভাব দেখা যায়। অতিথিকে উদ্দেশ করিয়া বলে, "আর এক পেগ নিন্।" ··· মাতালের গৃহে অতিথির সংখ্যা একটি নয়। নিরীহ ছাড়াও অন্যপ্রকৃতির মানুষও থাকে। দুই ঘণ্টা ধরিয়া উত্তেজক তরল পদার্থ জড় অন্তরে চলিতে থাকিলে তাহা

প্রাণবান হইয়া ওঠে এবং অনুপযুক্তকেও উর্দ্ধতর সোপানে অধিষ্ঠিত করিয়া ছাড়ে।

রাত্রি গভীর হইতে থাকে। তখনও বোতল খোলার শব্দ শোনা যায়। আগন্তুকদের মধ্যে যাহারা টিকিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতালের সহিত টক্কর দিয়া সোজা বসিবার চেষ্টা করে—কুক্কুটের বলকারক মাংসের সহযোগে বোতলস্থ পদার্থটুকুর পুনরাস্বাদনের আশায়। কিন্তু মৃত ও জীবন্তের মধ্যে তখন কোন প্রভেদ থাকে না। একের পর এক সজীব মাংসপিণ্ড অসাড় জড় হইয়া স্তূপীকৃত হইতে থাকে।

মাতালের তিনটি বাড়ী পরেই রমেশ চক্রবর্ত্তীর প্রসিদ্ধ রোয়াক। মাসান্তে করকরে তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে খুড়ো আড়াইটি ঘর ও তৎসহিত এই রোয়াকটি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করিতেছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সৎক্রিয়াগুলি তিনি সাক্ষী রাখিয়া করিয়া থাকেন। এই কারণেই তিনি প্রতিবেশীদের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া আছেন। আট-দশজন স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে রাস্তার ধারে এমন একটি রোয়াক—গল্পখোর ও তাসের খেলোয়াড়দের পক্ষে ভূস্বর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা নিষ্কলঙ্ক হইয়া এই ভূস্বর্গটির ব্যবহার দাবী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চক্রবর্ত্তী, বোস-মশাই, গণেশ, প্রেমেন মিত্তিরকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা চলে। রোয়াকের তাস ও খোস্ গল্পই প্রধান আকর্ষণ। লোকাভাব অথবা নারীহরণের অতি-আধুনিক খবর জানা না থাকিলে মাতালকে লইয়া আলোচনা চলে।

সেদিন চক্রবর্ত্তী মশাই গোড়াতেই মাতালের কথা আরম্ভ করিলেন—দত্তসাহেব না হয় সাহেবী-ধরণের মানুষ মানলাম ... একটু-আধটু ভিতরে না পড়লে খিদে আসে না। খাবার আগে জমিদার মানুষ, বিলেত-ফেরতা মানুষ একটু খেলে—আচ্ছা খাও বাপু—তাই বলে উচ্ছৃঙ্খলতাকে এইভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটা কি ভাল? ... হাজার হোক, তুমি পাড়ার পুরোনো বনেদি বাসিন্দা, গণ্যমান্য লোক! আর তোমার ছেলেটা কি-না রোজ মাতালের সঙ্গে আড্ডা দেয়! গিয়েছিলই না হয় সে বিলেত, তাই বলে একটা রয়-সয় আছে ত! ... শুধু কি ছেলে হে—সেদিন দেখি পিতাপুত্রে মাতালটার ঘরে ঢুকছেন পাছে আমাকে দেখতে পেলে সামলে নেয়, তাই কাণ্ডটা দেখবার জন্য মুখ ঢেকে রোয়াকে বসে রইলাম। ঝাড়া দু-ঘণ্টা পরে বাপ ছেলের কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে এলেন।

বোস মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন—আর বলতে হবে না, আমি আর জানিনে? পুরুষ মানুষ, জমিদার মানুষ না হয় কিছু ক্ষমাঘেন্না করলাম, তাই বলে ঐ মাতালটাকে বাড়ীতে ডেকে এক টেবিলে মেয়েদের সঙ্গে খানা খাওয়ান! শুধু তাই, দত্তসাহেবের বি-এ পাশ-করা ধপধপে ফরসা মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশার কি ঘটা! আমি ত সেদিন খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে আমার দোতলার ঘরের জানালাটির সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছি—ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গড়ায়, এমন সময় শুনলাম পিছনে চাবির থোকার আওয়াজ। ফিরে দেখি স্বয়ং গিন্নী দাঁড়িয়ে আছেন...ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম...কাচু মাচু ক'রে বললাম—এত রাত হয়ে গেল খেতে ডাকনি যে? গিন্নী সামনের লনের মানিক জোড় দেখে বললেন—এ পেশা কি তোমার নতুন? ... ও শুড়ে বালি—আসলে মেয়েটি ভাল। এখন খেতে চল, অনেকক্ষণ ভাত বাড়া হয়েছে—জুড়িয়ে গেল।... আমি ত স্বচক্ষে দেখলাম মেয়েটি কেমন?

প্রেমেন মিত্তির বয়সে ঠিক কাঁচা না হইলেও কাঁচার কিনারার কান-ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। কারণ ছিল বলিয়াই এতকাল তাহার বিবাহ হয় নাই। প্রেমেনের একটা মুদ্রা দোষ, অনেকক্ষণ সহজ মানুষের মত কথা বলার পর হঠাৎ কোন একটা জায়গায় থামিয়া যায়; এই সময় জোরে কিছুর উপর চপেটাঘাৎ করিতে না পারিলে কথাটি গিলিয়া ফেলিতে হয়। চড় যখন মারে তখন কিসের উপর তাহা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করার অবসর থাকে না। লক্ষ্য করিলেই সাবধান হইতে হয় এবং সাবধান হইলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মিত্তির জোরে মেজের উপর একটি চড় মারিয়া বলিল—তাই বলে মাতালের সাথে বি-এ পাশ মেয়েটাকে দেখলে কি হয়?

চাঁটির আওয়াজ শুনিয়া বোস মহাশয় বেশ খানিকটা সরিয়া বসিলেন। তাহার পর মাতাল-সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার পর এদিনের মত সভাভঙ্গ হইল।

পাড়ায় মাতালের স্থিতি সংক্রামক হইয়া উঠিল গণেশের কীর্ত্তির পর। তাহার তৃতীয় পক্ষের বৌ নোটিস্ দিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না বলিয়া গিয়াছে।

গণেশকে আমরা সকলেই পুরুষ বলিয়া জানি, কিন্তু ঘরে স্ত্রী না থাকায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রী কি শুধু একলাই গিয়াছে, সঙ্গে মশারীটাও লইয়া গিয়াছে। বউ গেল তো বয়ে গেল, কিন্তু সে মশারীটা সঙ্গে লইল কোন্ অধিকারে! না হয় তাহার বাবা বিবাহের সময় যৌতুক-হিসাবে মশারিখানা দানই করিয়াছিল, তাই বলিয়া কি উহা একলার?

সমস্ত রাত্রি মশার কামড়ে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাতে অর্দ্ধসিদ্ধ স্বপাক অন্ন কোন প্রকারে নাকে কানে গুঁজিয়া ডকইয়ার্ডে (dock yard) আপিস করা কি চাট্টিখানি কথা!

বড় মেয়েটাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিয়া রান্নার ব্যবস্থা যে করিয়া লইবে তাহারও উপায় নাই। বেয়াইবাড়ী সে যায় কেমন করিয়া? গত বছরের জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব এখনও বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। নিরুপায় হইয়াই পুরাতন ঝিটাকে আট আনা মাহিনা বাড়াইয়া রান্নার কাজটা গণেশ সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। রান্না হইতেছে ঠিক, কিন্তু গণেশ বেচারা কোন দিনই পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। গণেশ যাহাকে সামনে পাইতেছে তাহাকেই নিজের দুর্দ্দশার কথা বলিয়া সহানুভূতি নিংড়াইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকেই আশ্বাস দিয়াছে, একটা কিছু ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ইহার উপর আরও যন্ত্রণা, বাদলার দিনে সর্দ্দি কাসি লাগিয়াই থাকে। কখন কাহার ঔষধ দরকার হইবে কে বলিতে পারে। বিনা মূল্যে ঔষধ পাইতে হইলে একমাত্র মাতাল ছাড়া গতি নাই। দেখা হইলে অনেকেই একটা কিছু ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আসল কাজে

কেহ গা দিতে চায় না। অবশেষে গণেশ মরিয়া হইয়া আবার মাতালের নিকট আসিল। একটা কিছু বন্দোবস্ত না করিয়া উঠিবে না, ইহাই ছিল তাহার পণ।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল আসবাবপত্র পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। খালি মার্ব্বেলের মেঝেটা বেজায় দামী পারস্য দেশের গালিচায় ঢাকা। চেয়ারগুলাও কেমন স্ফীত ভাব ধারণ করিয়াছে, মোটা লাল মখমলের গদি। পায়া ও হাতা রূপার উপর সোনার কাজে ভরা। জানালা দরজার পর্দ্দা মোটা রেশমের। তাহার উপর খানসামাটা চোখে সুর্মার



চক্রবর্ত্তী খুড়োর রোয়াকে প্রেমেন মিত্তির কথা বলিতেছে

মত কাল কাজল কি লাগাইয়াছে। তাহার পোষাকও এত ধব্‌ধবে সাদা যে, সম্বোধনটা আগে ভাগেই ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। গণেশের সব গোলমাল হইয়া গেল। সে মাতালকে বলিতে আসিয়াছিল আমার কি সর্ব্বনাশ করলে, মদ খাইবার জন্য আমার স্ত্রী যে পলাইয়াছে। কিন্তু বলিয়া ফেলিল, "খানসামা মশাই, এক লার্জ কড়া দাওয়াই দিতে পার ?"

খানসামা প্রস্তুতই ছিল। বাঞ্ছিত বস্তুটি যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিট্ ব্র্যাণ্ডির গলাধঃকরণ কার্য্যটি এক চুমুকে শেষ করিয়া ফেলিল।

মাতাল ঘরে ঢুকিয়াই গণেশের এই অবস্থা দেখিয়াছিল। খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কয় পেগ দিয়া ?"

খান্‌সামা উত্তর করিল, "হুজুর! এক।"

মাতাল, "আউর দো কৌন পিয়া ?"

খানসামা, "হুজুর ম্যয়তো নহি।"

মাতাল—"কমবখৎ, তুম্‌কো রহিস্ কি চাল মালুম নহি! ···ডিক্যাণ্টার লে আ—দে বাবুকো আউর দো।"

নিটের ক্রিয়া দ্রুততর। ইতিমধ্যেই তাহার নেশা পাগ্‌লা ঘোড়ার মত ছুটিয়াছে। এমন সময় হুকুমযুক্ত অভ্যর্থনা এবং সহানুভূতিপূর্ণ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না। ঔষধের পূর্ণমাত্রাই গণেশকে খাইতে হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাতাল বুঝিল, তাহার ঔষধ ধরিয়াছে। মাতাল বলিল, "এইবার তোমার কি বলবার আছে বল।"

গণেশ কহিল, "আজ্ঞে বলবার আর কি আছে। আপনি হলেন রাজা লোক। একটু আধটু নেক নজরে রাখবেন—আর কি বলব। তা গোলমালটা যে খাসা হয়ে গেছে রাজা।"

মাতাল: "তা ত দেখছি। কিন্তু এখন আর নয়। কারপেটটা নষ্ট করতে চাই না। একজন ভদ্রলোকের অসম্মার কথা আছে। হাঁ, তোমার স্ত্রী সম্বন্ধে কি কথা বলছিলে?"

স্ত্রীর কথা উঠিতেই গণেশ তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল—"আরে রেখে দিন তার কথা। এখনও মাসে তিরিশ টাকা মাইনে পাই। তার উপর আট-দশ টাকা উপরিও আছে। ও ছুঁড়ী না এলো তো বয়ে গেল—আমি আর একটা বিয়ে করব। ও ছুঁড়ীকে আর ঘরে ঢুকতে দেব ভেবেছেন? আপনি একটু সহায় থাকলে কর্ত্তা—ও—ও রকম অ—অনেক মেয়েকেই শায়েস্তা করে দিতে পারি।"

মাতাল: "যদি জোর করে ফিরে আসে?"

এখুনি করব। আর তাগড়া বউ বিয়ে করব, যাতে ও ছুঁড়ী ফিরে এলেও আমায় না কিছু করতে পারে। দেখুন না, এখুনি ব্যবস্থা করছি।"

গণেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটার সহিত কেহ যেন ভারী ওজন ঝুলাইয়া দিয়াছে। পা দুইটাও তালপাতার সেপাই-এর মত হঠাৎ অকারণ বাঁকিয়া যাইতেছে। তথাপি সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া সে দাঁড়াইয়াছে। মাতাল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি উঠলে যে?"

গণেশ ত্রিভঙ্গ মুরারীকে অনুকরণ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর উত্তর করিল—"আজ্ঞে রাজা, বিয়ের ব্যবস্থা করতে চলেছি।"

বাড়ী ফিরিয়া গণেশ দেখিল বাহান্ন কি তিপ্পান্ন বৎসরের হাঁপানী রোগগ্রস্তা রুগ্না ঝিটা তখন উনানে ফুঁ দিতেছে আর বকিয়া চলিয়াছে—



তিপ্পান্ন বৎসরের ঝিকে গণেশ বলিল: তুই বড় মিষ্টি, আমি তোকে বিয়ে করব

তৃতীয় পক্ষের সেই বলিষ্ঠা কর্ম্মপটু স্ত্রীটির কথা মনে আসিতেই গণেশের একটু দমিবার ভাব আসিতেছিল। মাতাল ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আচ্ছা, আর আধ পেগ দিতে পারি, ··· কিন্তু বেশী না।"

আদেশানুসারে সুরার সহিত পাত্রটির আবার সংযোগ ঘটিল। ···

অল্পক্ষণের ভিতর পুরা সাড়ে তিন পেগ ব্রাণ্ডী অনভ্যস্তের অন্তরে মন্ত্রণা আঁটিতে থাকিলে নিতান্ত গোবেচারাও সাহসী হইয়া ওঠে।

গণেশ বলিল, "তা হ'লেও আর একটা বিয়ে করব। আজই করব—

আর পারি না, আট আনার তরে আগুন তাত আর সয় না। বাবু অন্য লোক দেখুক—নয় চাকরি ছেড়ে দি। বাসনমাজা ছিল ভাল। এমন লক্ষ্মী ছাড়া বউ কোথাও দেখিনি—স্বামী সোহাগ করবি না ত কি বাইরের লোকের সঙ্গে সোহাগ করবি? ··· কর্ না, তখন দেখবি তোর অবস্থা হবে আমার মত। ··· আর কত কি বকিতেছিল কে জানে।

গণেশ তখন টলিতে আরম্ভ করিয়াছে—মাথায় এবং পায়ে। কথাও যাহা বলিতেছে তাহা মাঝে মাঝে তাল পাকাইয়া অর্থহীন হইয়া

যাইতেছে। এক শ্রেণীর মাতাল আছে, যাহারা অনেকক্ষণ ঠিক থাকিয়া হঠাৎ বেসামাল হইয়া যায়। গণেশ আমাদের উক্ত শ্রেণীভুক্ত। ঝিকে সে ঝি দেখিল না। তাহার মনে হইল, গৃহলক্ষ্মী পূর্ণ যুবতীর রূপ লইয়া সংসারধর্ম্মে দেহমন উৎসর্গ করিয়াছে। অন্তর্লোক হইতে কে যেন বলিয়া দিল—জাতিতে উহারা সদ্গোপ—বিবাহে কোন বাধা নাই।

গণেশ ডাকিল—"এই ছুঁড়ী! ··· শুনে যা—তোকে আমি বিয়ে করব। আজই করব রে—গয়না দেব—পাউডার দেব—পাউডার্—পাউডার্ র্ র্ রে—"

অদ্ভুত উচ্ছ্বাস তাহার উপরই প্রয়োগ হইতেছে, ঝি বিশ্বাস করিতে পারিল না। অধুনা যে কয়টি বিশেষণ নিত্যপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের মধ্যে হতচ্ছাড়ী—নেকী হারামজাদী ইত্যাদিই প্রধান। ছুঁড়ী শব্দটি তাহার উপর খুব কম হইলেও তিরিশ বৎসর কেহ ব্যবহার করে নাই। সুতরাং বাবু মদ খাইয়া আসিয়াছেন এবং আবোল-তাবোল বকিতেছেন ভাবিয়াই ঘরে ঢুকিল আলো জ্বালিতে—হ্যারিকেনটা সবে তখন ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় গণেশ শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে ঝিয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর মরিয়া হইয়া প্রেম নিবেদন শুরু করিয়া দিল। প্রকাশভঙ্গী তখন যৎপরোনাস্তি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছিল—সত্যি তোকে বিয়ে ··· বিয়ে করব—তুই বড় মিষ্টি ··· একসের গুড়ের চেয়েও মিষ্টি ··· ওরে তুই কত মিষ্টি ··· তুই কি জানিস।

দুই যুগ অতিবাহিত হইতে চলিল—ঝিকে এই ধরণের সম্ভাষণ কেহ করে নাই। বাবু হাত-পা ধরিতেই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর আকস্মিক বিবাহের প্রস্তাবটা যখন উপলব্ধি করিল, তখন—বাবারে ··· মারে ··· রক্ষে কর ··· মেরে ফেললে রে—বলিয়া চীৎকার করিয়া ত উঠিলই, অধিকন্তু নির্দ্দয়ভাবে কর্দ্দমাক্ত ফাটা পা দুইটাও কোন প্রকারে বাবুর আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সোজা বড় রাস্তা ধরিল। গণেশ একলা ঘরের ভিতর বলিতে লাগিল—তুইও আমাকে ছেড়ে গেলি ··· এ প্রাণ আর রাখব না। কালই একটা ব্যবস্থা করব—দেখে নিস্ ··· কালই। গণেশ সব কথা শেষ করিতে পারিল না, ঠাণ্ডা মেজের উপরই শুইয়া পড়িল—রাস্তার ধারের দরজাটা খোলাই পড়িয়া থাকিল। ঝি বাড়ী ফিরিয়া গণেশের মাতলামি ও কেলেঙ্কারীর কথাটা একটু অতিরঞ্জিতভাবে রাষ্ট্র করিয়া দিল। ফলে পাড়ায় দারুণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ বলিল—আজ ঝিয়ের উপর অত্যাচার করছে, কাল ভদ্রলোকের মেয়ের উপর করবে না—তার নিশ্চয়তা কি আছে। কেহ বলে, মাতাল পাড়ায় থাকিলে সমাজ যে ব্যাভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মাতাল তাড়ানর সত্যই একটা ছোট-খাট কমিটি হইয়া গেল। প্রতিদিনই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রোয়াকে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল—রেজোলিউশনের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল—কিন্তু ম্যাও ধরিবার উপযুক্ত সাহস কেহ প্রকাশ করিল না।

অবশেষে ভোটে সাব্যস্ত হইল, বোস মশাই মাতালের নিকট যাইবেন এবং অপর সকলে দত্তসাহেবকে ধরিবেন।

মাতালের গৃহে প্রবেশ করিয়াই বোস মহাশয় সব কিছু নূতন ধরণের দেখিলেন। স্থানে স্থানে বিচিত্র কায়দায় সাহেবী ধরণের ফুলের তোড়া দিয়া ঘরটিকে সাজান হইয়াছে। ঘরোয়া চেয়ার ছাড়াও ভাড়া-করা চেয়ারও রহিয়াছে, বেশ ঠেসাঠেসি অবস্থা। আশু উৎসবের সূচনা সম্বন্ধে ভ্রম হইবার উপায় নাই। খাস খানসামা সাদা সাজ-পোষাক ছাড়িয়া জরি-দার লাল আচকান পরিয়াছে। নিম্নাঙ্গে চুড়িদার সাদা ব্রিচেস্, কোমরবন্ধে ছোরা, বাঁট তাহার হস্তী দন্তের—স্বর্ণ ও কারুকার্য্য-খচিত, বাঁটের তলায় সোনালী ঝুম্‌কি ঝুলিতেছে। মানুষটাকে দেখিলেই মনে হয় অত্যন্ত ব্যস্ত। মাঝে মাঝে তাহার অধীনে অন্য ভৃত্যদের হুকুম করিতেছে। বাড়ীর ভিতর মেয়েদেরও হুলুধ্বনি শোনা যাইতেছে। বোস্ মহাশয়ের খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছে—ব্যাপার কি! খানসামা যে রকম ব্যস্ত তাহাতে তাহাকে দাঁড় করাইয়া কথা বলিতেও ইতস্তত করিতে হয়। তথাপি চেনা লোক ত। সাহস সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"খানসামা ঠাকুর, কি কাণ্ড বল ত?"

খানসামা জরদা মুখে ফেলিয়া বলিল—"হুজুর কি সাদী হ্যায়।"

বোস মহাশয়: আরে ঠাকুর, সাদী মানে বিয়ে ত? সাহেব বিয়ে করছেন নাকি?

খানসামা: জী। আজ উন্‌কে তিলক হোনেকা ইন্তাজাম হো রহা হ্যায়। রাতমে বাঈজীকা গানা ভি হ্যায়—খাস দিল্লীওয়ালী—হাজার রূপয়া এক রাতকা মজুরা। বলিয়া একটু মুচকি হাসিল এবং চোখের বঙ্কিম ভঙ্গীতে কি একটা ইসারাও জানাইয়া দিল।

বোস মহাশয়: বাঈজি দিল্লী থেকে আসছে, আমরা মজ্‌লিস্‌মে গান শুন্‌তে পাব না—পাড়ায় থাকি ত্যায়?

খানসামা: জরুর। ম্যানেজারবাবু তো আপলোগেঁকা সুবিধা আস্কিয়ৎকে লিয়ে কেয়া কেয়া না কর রাহে হ্যাঁয়। আপও সরিফ রাখিয়ে ম্যয় হুজুরকে পাস্ যাতে হ্যাঁয় ··· মগর ইস বখৎ উনকে মিলনা মুস্কিল হ্যায়, কেঁওকি উনকে বদনমে আওরতেঁ হলদি লাগা রহি হ্যায়। আপ বৈঠে ম্যয় দেখু ক্যা কর সকতেঁ, ··· আপকো শরাব হ্ ক্যা? আরে ভুল হো গেই—দাওয়াই—দাওয়াই—হাঁ দাওয়াই হ্ ক্যা?"

বোস মহাশয়: হ্যাঁ বাবা, একটু দিলে ভাল হয়। মাথাটা টিপ্ টিপ্ করছে।

—যো হুকুম! বলিয়া খানসামা ঔষধের পেগটি টেবিলে রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাওয়াই খাইতে খাইতে বোস মহাশয় বেশ মশগুল হইয়া উঠিতে-ছিলেন। বাঈজীর নাচের চিন্তা আর খানসামার ঐ ইসারাটা তাঁহার মনকে বেশ কাঁচা করিয়া আনিয়াছিল। কল্পনায় দেখিতেছিলেন, বাঈজী তাঁহার সামনে আসিয়া নাচের তালে দুইটি পাক খাইয়া গেল—গঠনের কি অপূর্ব্ব দোলা!

আচ্ছা ত্যা:, আমি থাকিতে আমার মাতাল সাহেবকে কে তাড়ায়

দেখিয়া লইব। কমিটি কি করিতে পারে। এত বড় একটা দিলদার লোক, সে কি-না সমাজ নষ্ট করিতেছে? ··· সমাজের সকলকেই ত চিনি, যেন আমার চেয়ে তাহাদের চরিত্র ভাল ··· মাতাল আমাদের পাড়ায় থাকিবে এবং তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া সকলের সামনে ধরিব। ইহার জন্য থেঁদির মা আমাকে যদি ঝাঁটা-পেটাও করে ত কুছপরোয়া নেই।

মাতাল ঘরে ঢুকিল। ঊর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন···সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখা। হলুদে সিক্ত যজ্ঞোপবীত বামদিক হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া বিশাল বক্ষ অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। যেন পার্ব্বত্য উপত্যকায় একটি ক্ষীণ জলস্রোত চলিয়াছে। বলিষ্ঠ আকৃতি জরায় প্রপীড়িত বোস মহাশয়কে আকর্ষণ করিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিলেন। মাতাল অনুরোধ করিল বসিতে। নিজে দাঁড়াইয়া রহিল, হয় ত এখুনি অন্দরমহল হইতে ডাক আসিতে পারে। কমিটির রেজোলিউশান মনে পড়িতেই বোস ভয় পাইলেন। হয় ত ইতিমধ্যে কেহ মাতালকে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছে। সন্দেহটা কাটাইবার জন্য কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন—"শুনলাম, আপনি নাকি শীগ্‌গির বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন?"

মাতাল: "আজ্ঞে, সে কি! বাড়ী যে আমি কিনে ফেলেছি, তা ছাড়া, সামনে রবিবার আমার বিয়ে ··· এই বাড়ী থেকেই বিয়ে হবার কথা।··· বাড়ীর মালিক কিছু দিন থেকে গোলমাল করছিলেন ··· কোন কিছু সারাতে চায় না—তাই বাড়ীটা কিনেই ফেললাম। আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পান নি? আজ রাত্রে আসছেন ত? ··· একটু গান-বাজনা হবে। তারপর যাবেন।" বোস মহাশয়ের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পর একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এখন তা হ'লে উঠি বাবা।" নমস্কার করিয়া মাতাল ভিতরে চলিয়া গেল। বোস মহাশয় সোজা দত্তসাহেবের বাড়ী-মুখো ছুটিতে লাগিলেন।

ওদিকে দত্তসাহেবের বাড়ীতে কমিটির বৈঠক বসিয়াছে। ড্রইং রুমটি দেখিলে মনে হয় এখানে বাঙালী বাস করে না। প্রেমেন মিত্তির একাই একশ। সকলের হইয়া কথা বলিতেছে এবং নিজেই উত্তর দিয়া যুক্তিকে অকাট্য প্রমাণ করিয়া ছাড়িতেছে। এই সময় বোস মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ··· ভাবটা রীতিমত কড়া।··· দত্তসাহেব এখনো বাহির হন নাই—পোষাক-ঘরে রহিয়াছেন। তিনি ফিট্‌-ফাট্ না হইয়া বাহিরের লোকের সামনে আসেন না। তিনি প্রস্তুত হইতে থাকুন, ইতিমধ্যে আমরা কমিটির আলোচনা শুনিয়া লই।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উদ্ধত মিত্তিরকে বলিলেন—"বোস যে বলছিল মান-হানির মামলার কথা—তা হলে ত মাতাল আমাদেরকেও জড়াতে পারে—তোমাদের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্য্যন্ত কি আদালতে ছোটাছুটি করতে হবে নাকি? কাজ কি বাপু, ও আছে, থাক না এক কোণে।"

প্রেমেন জোর দিয়া বলিল,—"কখনই না। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না।" প্রেমেন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কথাও আটকাইয়াছে, লক্ষণ সুবিধার নয় দেখিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়া সরিয়া বসিলেন। খুড়াকে না পাইয়া বহুকোণযুক্ত বর্ম্মাদেশীয় বাটফুল থালা টেবিলে এক চাটি বসাইয়া দিল। টেবিলটি আলগোছে ব্যবহারের জন্য তৈয়ারী। সজোরে চপেটাঘাৎ প্রাপ্ত হওয়ায় শোভাবর্দ্ধনের সরঞ্জাম অনেকগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল এবং কাচের দ্রব্যগুলি ভাঙিল। প্রেমেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া বলিয়া চলিল—"আরে রেখে, দিন আপনার দয়া। না হয় পয়সাই কিছু আছে, আর কোঁচান কাপড় পরে চাল মারে। তাই বলে ভদ্রপাড়ায় যা খুশী তাই" ···

বক্তৃতাটা শেষ হইতে পাইল না, দত্ত সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। রংটা প্রায় সাহেবদের মত। তাহার উপর ঘষামাজায় প্রায় শব্দের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল। তিনি প্রেমেনের মূর্ত্তি ও



প্রেমেন জোর দিয়া বলিল: কখনই না।
আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না

টেবিলের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেই মনে পড়িল, এই ভদ্রলোকই ত তাঁহার নিকট অল্প দিন আগে চাঁদা চাহিতে আসিয়াছিল এবং অকারণ ম্যানেজার-বাবুর জানুর উপর এক চড় বসাইয়া দিয়াছিল। পরে তাঁহার পিঠটাও ব্যবহার করিবার চেষ্টায় ছিল।—কিট্‌স্ (fits) অনুবাদ করিয়া অঙ্গীকৃত চাঁদার দ্বিগুণ দিয়া অব্যাহতি পান। পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ হওয়ায় প্রেমেনের নিকট হইতে বেশ একটু দূরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি বলুন ত?"

কমিটির রেজোলিউশন যাহাতে প্রকাশ না হয় ইহাই ছিল বোস মহাশয়ের অন্তরের কথা। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি আর বলব বলুন, মাথা-ধরা আর নানা অসুখ নিয়ে মারা গেলাম। কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানাও নেই। থাকলেই বা কি হ'ত, আমরা কি ইচ্ছে করলেই পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনতে পারি?... আপনি যদি পাড়ায় একটা ফ্রি ডিস্‌পেন্সারী করে দেন, তা হলে আমরা সকলেই বেঁচে যাই—আপনাকে ধরব না ত কাকে ধরব। আপনি হলেন ..."

প্রেমেন খেপিয়াছিল, টেবিলে আবার চাটি মারিয়া বলিল—"স্যর, আমাদের রেজোলিউশান মোটে ও ফ্রি ডিস্‌পেন্সারী সম্বন্ধে নয়। আসল কথা, আমরা ঐ মাতালটাকে তাড়াতে চাই এবং বোস মশাই-এর মাতাল না হলে চলে না ... সেই জন্যই বাজে বিষয় পেড়ে ফেলেছেন। বলব না কি, কোন্ ওষুধ খেলে আপনার মাথা ধরা সারে?"

দত্ত সাহেব ব্যক্তিগত নিন্দাকীর্ত্তন পছন্দ করিতেন না।—কথাটা চাপা দিয়া তবে বলিলেন—"আহা চটেন কেন! মাতালটা-কে শুনি, ত ব্যবস্থা করতে পারি?"

মিত্তির এবার সত্যই উঠিয়া বোস মহাশয়ের নিকটে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল—কারণ ম্ ম্ মাতাল শব্দটি কোন প্রকারেই বাহির হইতে চাহিতেছিল না—গতিক খারাপ বুঝিয়া বোস মশাই নিজেই তাহার হইয়া শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মাতাল বলিয়াই জিব কাটিলেন। ইতিমধ্যে মিত্তির শব্দটি কি ভাবে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার পর বাধা না থাকায় বলিয়া চলিল—স্যর, পাড়ায় থাকেন, মাতাল কে জানেন না? আমাদের চরিত্র নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকে ধরেই ... কি বলে ... কি বলে মদ খাইয়ে ছাড়ছে ... এমন কি আমাকে পর্য্যন্ত। আপনাকে আর কি বলব, এখানে অতগুলো লোক দেখছেন, সকলেই ঐ মাতালের মদে ঘোটা হয়েছেন।



মিত্তির বলিয়া চলিল: স্যর, পাড়ায় থাকেন, ম্-ম্—মাতাল কে জানেন না?

দত্ত সাহেব: "তা মাতালটা কে, না জানলে—"

মিত্তির: মাতাল—একেবারে খাঁটি মাতাল স্যর—ওর নামটা কি আর মনে রাখবার জিনিস? মাতাল বললেই এ পাড়ায় সকলে বোঝে লোকটা কে। দাঁড়ান, মনে করছি—হাঁ ... পেরেছি—জগৎমোহন রায়, ঠিক না বোস মশায়? ওকে না তাড়ালে আমাদের সকলের চরিত্র গেল।"

ঘোস মশাই রেজোলিউশান সমর্থন করিতে আসেন নাই, একবার মার খাইবার ভয়ে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবার সাবধান হইয়া গেলেন, সুতরাং কিছুই উত্তর দিলেন না।

দত্ত সাহেব: জগৎমোহন রায়!… আপনি মহারাজকুমার জগৎমোহন রায়ের কথা বলছেন না কি? ছি ছি, আপনি বলছেন কি? মহারাজকুমার যে আমার জামাই হ'তে চলেছেন। সামনের রবিবার আমার লিলির সঙ্গে বিয়ে। কেন, আপনারা নিমন্ত্রণ-পত্র পান নি? আমি ত পাড়ার সকলের নাম নিজে লিখে দিয়েছি— most irrespo sible man is my secretary.

মাতাল—মহারাজকুমার জগৎমোহন রায়! দত্তসাহেব তাঁহার শ্বশুর হইতে চলিয়াছেন? প্রেমেন্দ্র বসিয়া পড়িল … রেজোলিউশান্ প্রকাশ করা হইল'না।

চাঁপা

শ্রীবীণা দে

রূপের শিখা পাপ্ড়ি তোমার
বর্ণ সোনার মত,
(ও চাঁপা!) তোমায় দেখে পড়ে মনে
কথা কত শত।…
কোন্ সে ছেলেবে'লা থেকে
তোমার সাথে জানা
মায়ের কাছে নিত্যি সাঁঝে
গল্প তোমার শোনা।
বোশেখ মাসে ভোরের বেলা
নিতুই তোমার তলে,
সাজি হাতে আঁকশি নিয়ে
সখী সাথীর দলে।…
চাঁপার ফুলে শিবের পূজা
বোশেখ চাঁপার ব্রত
মনে পড়ে সেই সে চাওয়া
"বরটী শিবের মত!"
গলায় সোনার "চাঁপাকলি"
কানে 'চাঁপার দুল'
চাঁপার বরণ সাড়ী পরি'
খোঁপায় চাঁপার ফুল

ভালবাসি—গর্ব্ব করি,—
রূপ বুঝাতে বলি—
"চাঁপার মতন রংটী গায়ের
আঙুল চাঁপার কলি।"
একটী চাঁপার তরু যাহার
বাতায়নের পাশে,
ঘরখানি তার স্বর্গ সম
গন্ধে রসে ভাসে।
অনুরাগ ও প্রেম সোহাগের
রংয়ে তোমার সনে
আসন তোমার গর্ব্বে পাতা
সদাই মোদের মনে।
কতকাল তো ব'য়ে গেছে
তবুও চাঁপা ভাই!
প্রথম-প্রেমের-পরশ যেন
নতুন করে' পাই।"
তোমায় দেখে মনে পড়ে
ভুলে যাওয়া গান—
'বিয়ের বাসর' 'ফুলশয্যা'
আদর অভিমান।

বাল্য, কিশোর চারকালেরই
বন্ধু আমার তুমি,
মরণ কালেও যেন চাঁপা
থেকো আমায় চুমি!

জঙ্গম

বনফুল

৩৫

পরদিন সকালে উঠিয়াই শঙ্কর ঠিক করিল—হিরণবাবু বলিয়া কেহ আছে কি-না খুঁজিয়া দেখিতে হইবে ; উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে কার্ডখানি বাহির করিল এবং কার্ডখানির দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। সুরামত্ত যোগেন রায় সবই লিখিয়াছেন, কিন্তু ঠিকানা দেন নাই। নিজেরও না, হিরণবাবুরও না। শঙ্কর তবু বাহির হইয়া পড়িল। বিডন্ স্ট্রীটটা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

প্রায় প্রতি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া বেলা বারোটা-নাগাদ শঙ্কর যোগেন রায়ের বাড়িটা বাহির করিল বটে কিন্তু যোগেন রায়ের দেখা পাইল না। শুনিল, যোগেনবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। হতাশ হইয়া শঙ্কর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা বুক-স্টলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্টলে নানারকম বই ও মাসিক পত্রিকা। শঙ্কর তাহার প্রিয় ও পরিচিত মাসিক পত্রিকা 'সংস্কারক'-খানা উল্টাইতে লাগিল। একটু পরে তাহার নজরে পড়িল 'ক্ষত্রিয়' নামে একটা নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ, সম্পাদক জ্যোতির্ম্ময় বসু। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—পিছনের দিকে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। "একজন সুদক্ষ প্রুফ-রীডার চাই। শ্রীহিরণকুমার রায়ের নিকট আবেদন করুন। ঠিকানা—", ঠিকানা দেওয়া আছে। ইনি যোগেনবাবুর হিরণ নয় তো! শঙ্কর অবিলম্বে হিরণবাবুর ঠিকানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

আধঘণ্টা পরে। শঙ্কর হিরণবাবুর বাহিরের ঘরে বসিয়া অধীর-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল।

এমন সময় দ্বার ঠেলিয়া একটি নাতিস্থূল সুদর্শন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন, ঈষৎ কটা চুলগুলি ব্যাক্ ব্রাশ করা, বাঁ হাতের অনামিকায় দামী পাথর-বসানো একটি আংটি। ডান হাতে মোটা বর্ম্মা চুরুট।

"আপনিই আমাকে খুঁজছেন ?

"আমি হিরণবাবুকে খুঁজছি।"

"আমারই নাম হিরণ, কি চান আপনি ?"

"আপনি কি যোগেন রায় বলে কাউকে চেনেন ?"

"চিনি।"

শঙ্কর কার্ডখানি তাঁহার হাতে দিল।

হিরণবাবু কার্ডে লেখা কথাগুলি পড়িলেন, কার্ডখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "যোগীনদার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে না কি ?"

শঙ্কর আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল।

"যোগীন-দা দুদিনের জন্যে কোলকাতায় এসেই একটা ইতিহাস ক'রে গেছেন দেখছি !"

একটু থামিয়া হিরণবাবু বলিলেন, "আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?"

"শুনলাম আপনারা একটা কাগজ বার করছেন, তাতে যদি আমাকে কোন কাজে—"

"আপনি লেখক ?"

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "কিছু কিছু লিখি।"

"কি লেখেন ?"

"বেশীর ভাগই কবিতা।"

"বেশ, আপনার লেখা নিয়ে আসবেন।"

"কখন আসব ?"

"আজ বিকেলেই আসতে পারেন।"

শঙ্কর কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি এখন একেবারে বেকার। গ্রাসাচ্ছাদনের মতো একটা কোন কিছু যদি জুটিয়ে দিতে পারেন ভালো হয়, আমি যে-কোন কাজ করতে রাজি আছি—"

"কবিতা লেখা ছাড়া আপনার আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে ? কতদুর লেখাপড়া করেছেন আপনি—বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

শঙ্কর একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল, হিরণবাবুও বসিলেন।

"আমি এম. এস-সি পর্য্যন্ত পড়েছি, পরীক্ষা দিই নি।"

"বেশ করেছেন। পরীক্ষাটা দিলেন না কেন ?"

"আর্থিক নানা কারণে, ফি জমা দেবার টাকা পাইনি।"

"যাক তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম পারমার্থিক কোন হেতু আছে বুঝি। রবীন্দ্রনাথের যেহেতু ডিগ্রি নেই সেই হেতু আজকাল অনেক কবি ডিগ্রি না থাকাটাকেই কবি হওয়ার স্বপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি বলে মনে করেন। আপনার সে কম্‌প্লেক্স নেই দেখে সুখী হলাম। আপনি প্রুফ দেখতে পারেন ?"

"পারি। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলাম—"

"দেখেছেন ? আমিই দিয়েছি ওটা। আপনাকে কাজটা দিতে পারি। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল' বলে আমি একটা বই লিখিয়েছি কয়েকজন ব্যায়ামবীরকে দিয়ে, সেটা ছাপা হচ্ছে। আপনি যদি তার প্রুফ ভাল ক'রে দেখে দিতে পারেন দৈনিক একটাকা হিসেবে আপনাকে এখুনি আমি বাহাল করতে পারি।"

"আমি পারব।"

"আপনি কোথা আছেন ?"

"আমার এক বন্ধুর বাসায় আছি। সেখানেই পেইং গেস্ট হয়ে থাকব আপাতত ভাবছি।"

"সেখানে যদি অসুবিধে হয় আমার একটা আন্‌ইউজ্‌ড নতুন বাথরুম আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও আপনি থাকতে পারেন ফ্রি অফ কস্ট—"

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "দেখি—"

"বেশ, তা হ'লে বিকেলে আসবেন, 'ক্ষত্রিয়' কয়েকখান মাত্র বেরিয়েছে, আমাদের মতামত মিলিটারি, আমরা যা সত্য বলে মনে করি তা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মিথ্যা আবর্জ্জনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে বলেও মনে করি। বিকেলে আসবেন, সেই সময় সব দেখাব আপনাকে।"

"আচ্ছা।"

শঙ্কর নমস্কার করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল কোথাকার অপরিচিত যোগেন রায় মদের ঝোঁকে তাহার খোলা দরজায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হিরণবাবুর ঠিকানা দিয়া গেল। জীবনের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার অন্তরালেই এই আকস্মিক যোগাযোগের রহস্য। জন্ম জীবন মৃত্যু, জীবনের এই অতি প্রত্যাশিত ঘটনাগুলিও ভাবিয়া দেখিলে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের দলেই। আনন্দের আতিশয্যে শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। হিরণবাবু লোকটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বেশ সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি।

সেইদিন বৈকালেই শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া হিরণবাবুর কাছে হাজির হইল। তাহার যেন তর সহিতেছিল না। গিয়া দেখিল আড্ডা গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত চেয়ারগুলি অধিকৃত, তক্তাপোষের অনেকখানি ভরিয়া গিয়াছে। ঘোরতর তর্ক চলিতেছে। সিগার সিগারেটও এত বেগে পুড়িতেছে যে ঘরের খানিকটা অংশ কুজ্ঝটিকাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে। তক্তাপোষের একধারে ট্রের উপর কতকগুলি চায়ের পেয়ালা ধূমায়িত হইতেছে এবং বালক ভৃত্যটি একে একে সেগুলি তার্কিকদের হাতে ধরাইয়া দিতেছে।

শঙ্কর প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।

হিরণবাবু বলিলেন, "লেখা এনেছেন ?"

"এনেছি।"

"কই, দিন—"

শঙ্কর সসঙ্কোচে পকেট হইতে কবিতা দুইটি বাহির করিয়া দিল। আশা করিয়াছিল হিরণবাবু তখনই সেগুলি পড়িবেন এবং পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হিরণবাবু সে সব কিছুই করিলেন না। লেখাগুলি একবার খুলিয়া পর্য্যন্ত দেখিলেন না, ড্রয়ার টানিয়া অতিশয় নির্ব্বিকারভাবে সেগুলি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আর একটি ড্রয়ার খুলিয়া ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেলের একতাড়া প্রুফ শঙ্করকে দিয়া বলিলেন, "কাল বিকেল বেলাই চাই—"

"একটা পেন্সিল কি কলম পেলে এখুনি আমি শুরু করতে পারি।"

"এত গোলমালে পারবেন ?"

"পারব।"

"বেশ, পেন্সিল দিচ্ছি আমি, বসুন, ওরে নব্‌নে, ওঘর থেকে টুলটা নিয়ে আয়, এক কাপ চা দে বাবুকে—"

টুল আসিল, চা আসিল। চা পান করিয়া শঙ্কর প্রুফ দেখিতে শুরু করিয়া দিল। আড্ডায় যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই যুবক। শঙ্করের আগমনে তাঁহারা মিনিটখানেকের জন্য চুপ করিয়াছিলেন, আবার শুরু করিয়া দিলেন। আলোচনা চলিতেছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আধুনিক একজন বিদ্রোহী কবিকে লইয়া। তর্ক-মুখর চটুল বিদ্রূপাত্মক আলোচনা। শঙ্করের খুব ভাল লাগিতেছিল, কিন্তু অনাহুতভাবে আলোচনায় সে যোগদান করিল না। নীরবে বসিয়া প্রুফগুলি দেখিতে লাগিল।

অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে তাহার সাহিত্যিক জীবন শুরু হইয়া গেল।

৩৬

মৃন্ময় আপিস হইতে যখন ফিরিল তখনও শঙ্কর ফেরে নাই। শঙ্কর আজকাল সকালে উঠিয়াই হিরণবাবুর কাছে চলিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। দ্বিপ্রহরের ভোজনটা সে নিকটবর্ত্তী একটা হোটেলে আনা তিনেকের মধ্যে সারিয়া লয়; আরও তিন আনা দিয়া দুই প্যাকেট সস্তা সিগারেট কেনে, রাত্রে মৃন্ময়ের বাসায় খায় এবং শোয়। ইহার জন্য মৃন্ময়কে সে মাসে দশটাকা করিয়া দিবে ঠিক করিয়াছে। মৃন্ময় প্রথমে কিছুতেই টাকা লইতে রাজি হয় নাই, কিন্তু যখন সে দেখিল টাকা না লইলে শঙ্কর থাকিবে না তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। এই শঙ্করবাবু লোকটির ব্যবহার, চালচলন এবং আদর্শনিষ্ঠা মৃন্ময়কে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল। নিজের আদর্শভ্রষ্ট জীবনে শঙ্করকে পাইয়া তাহার মন অনেকটা যেন স্বস্তি-লাভ করিয়াছিল; ভগ্নহাল ছিন্নপাল তরণীর আরোহীদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ মাঝি থাকিলে নৌকা-পরিচালক মাঝি যেমন ভরসা পায়, শঙ্করকে পাইয়া মৃন্ময়ের মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছিল। শঙ্কর অধিকাংশ সময় বাড়ীতে থাকে না, শঙ্করের জীবনযাত্রার সহিত এবং জীবনের আদর্শের সহিত মৃন্ময়ের জীবনযাত্রা অথবা আদর্শের কিছুমাত্র মিল নাই; শঙ্কর বন্ধের এই চাকরিটাও যে মনোবৃত্তি প্রভাবে লইল না সে মনোবৃত্তির সমর্থন যদিও মৃন্ময় করে না—তবু মৃন্ময় মনে মনে শঙ্করের উপর নির্ভর করিতে শুরু করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ যখনই যতটুকু দেখা হয় শঙ্কর সহানুভূতি সহকারে মৃন্ময়ের সমস্ত কাহিনী শোনে এবং আশ্বাস দেয় যে সব ঠিক হইয়া যাইবে। সব ঠিক হইয়া যাইবে! এতবড় আশ্বাস কয়জন এমন করিয়া দিতে পারে।

বাড়িতে ঢুকিতেই নীচের তলায় ডানহাতি ঘরটায় শঙ্কর থাকে। শঙ্কর যাইবার সময় তালা লাগাইয়া দিয়া যায়—হাসির কাছে ডুপ্‌লিকেট চাবি আছে, রাত্রির খাবার রাখিয়া যাইবার জন্য। মৃন্ময় ঢুকিয়া বন্ধ তালাটার পানে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করবাবু ফেরেন নাই তাহা হইলে। তাহার বগলে একটা প্যাকেট ছিল। শঙ্করবাবুকে আগে দেখাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু—। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় অবশেষে উপরে উঠিয়া গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে হাসি চুল বাঁধিতেছিলেন। হাসির সমস্ত মুখখানাতে কেমন একটা বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। মৃন্ময় যে স্বর্ণলতাকে ভালবাসে, এ কথা জানিয়া অবধি হাসির জীবনে অন্ধকার নামিয়াছে। স্বর্ণলতা যে মৃন্ময়ের পূর্ব্বপক্ষের স্ত্রী, অপর কেহ নহে, ভালবাসাটা যে তাহার ন্যায্য পাওনা—এ বার্ত্তায় সে অন্ধকার কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বরং স্বর্ণলতার প্রতি এই প্রেমটা যদি অবৈধ প্রণয় হইত তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে একটা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এবং মৃন্ময়কে এজন্য ন্যায়ত লাঞ্ছিত করিবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া হাসির আক্রোশ হয়তো কিছু কমিত। কিন্তু বিবাহিত বিগত স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী প্রেম পোষণ করে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে! মৃন্ময় প্রবেশ করিতেই সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল এবং কাগজের বাক্সটা দেখিয়া প্রশ্ন করিল, "ওটা কি?"

"কাপড়—"

"কার কাপড়?"

"ভনুটুর যে পরশু বিয়ে, ভুলেই গেছ—"

"ও—"

চুলের বিনুনিটা ঠিক করিতে করিতে হাসি আগাইয়া আসিল।

"কি কাপড় কিনলে?"

মৃন্ময় হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিল, (হয়তো

সেইজন্যই তাহার মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল) কোন উত্তর না দিয়া জুতার ফিতাই খুলিতে লাগিল। হাসি আগাইয়া আসিয়া কাগজের বাক্সের ডালাটা খুলিয়া দেখিল।

"দুখানা কাপড় কেন ?"

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই মৃন্ময় উত্তর দিল, "একখানা তোমার জন্যে। ওই ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটা—"

"আমার শাড়ি চাই না—"

বাক্সটা তাচ্ছিল্যভরে ঠেলিয়া দিয়া হাসি পুনরায় আয়নার কাছে গেল এবং দাঁত দিয়া ফিতাটি কামড়াইয়া পুনরায় প্রসাধনে মন দিল। মৃন্ময় এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তাহার লাল মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, "পছন্দ করে এনেছি—"

"আমার চাই না—"

তাহার পর সহসা ফিরিয়া বলিল, "তুমি মাইনে তো এখনও পাও নি, দাদামশায় যে টাকা দিয়ে গেছেন তার থেকেই তো সংসার চলছে, বাড়ি ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি, তুমি কাপড় কেনবার টাকা পেলে কোথা ?"

মৃন্ময় যে শঙ্করের সাহায্যে শালখানা বাঁধা রাখিয়াছিল হাসি তাহা টের পায় নাই। মৃন্ময় হাসিকে এখনও সে কথা বলিল না, মিথ্যা কথা বলিল।

"একটা চেনা দোকান থেকে ধারে এনেছি। মাইনে পেলে পরে দিয়ে দিলেই হবে—"

"ধার করে বাবুয়ানি করবার দরকার কি !"

মৃন্ময় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না ; তাহার ঠোঁট দুইটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

আগে হাসি এমন করিত না, স্বর্ণলতাকে আবিষ্কার করিয়া অবধি তাহার মন কেমন যেন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণলতা নাগালের বাহিরে, তাহার কিছুই সে করিতে পারে না, মৃন্ময়কে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাই সে মনের জ্বালা মিটাইতে চায়। অথচ এই হাসিই একদিন মৃন্ময়ের সামান্যতম কষ্ট দূর করিবার জন্য কি না করিতে পারিত !

৩৭

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শঙ্কর 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার লেখক, প্রুফ-রীডার, ম্যানেজার এবং প্রকাশক হইয়া পড়িল। যদিও হিরণবাবু তাহাতে সংশ্লিষ্ট রহিলেন এবং প্রকাশ্যত হিরণবাবুর বন্ধু জ্যোতির্ম্ময়বাবুর সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপা হইতে লাগিল কিন্তু আসলে শঙ্করই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। হিরণবাবু এবং জ্যোতির্ম্ময়বাবুর নিকট সাহিত্য-চর্চ্চা খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু শঙ্করের ইহা অন্তরের বস্তু। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া সে ইহার উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং তাহার একাগ্রতা দেখিয়া হিরণবাবু তাহার হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একদা যে শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া স-সঙ্কোচে হিরণবাবুর নিকট আসিয়াছিল (একটি হিরণবাবু মনোনীত করিয়া ছাপিয়াছিলেন, অপরটি তাঁহার পছন্দ হয় নাই) আজ সেই শঙ্করের নিকটই হিরণবাবু নিজের লেখা আনিয়া বলিতেছেন, "দেখ তো, এটা তোমার কাগজে চলবে কি না—"

বস্তুত কাগজখানা যেন শঙ্করের নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উহা লইয়াই তাহার কাটিতেছে। "ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল" নামক পুস্তকের প্রুফ দেখিতে একঘণ্টার বেশী সময় লাগে না, বাকী সময়টা সে "ক্ষত্রিয়" লইয়া থাকে। তাহার নিজের মনের মধ্যে যে নিরস্ত্র ক্ষত্রিয় এতদিন রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতেছিল, হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও সুযোগ লাভ করিয়া সে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি-আধুনিক-মার্কা ডেঁপো ছোকরাদের চাবকাইয়া পিঠের ছাল ছাড়াইয়া দিবে সে ! ইহারা অতীতের মহত্ব স্বীকার করেনা, দেশের লোকেদের চেনে না, বিদেশী আলট্রা মডার্নিজমের নকলে 'নতুন কিছু' করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে চায় এবং সেই উপলক্ষে নিজেদের নপুংসক কামনা-কণ্ডুয়নকে কখনও সুবোধ্য কখনও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় প্রচার করে। ইহাদের ভণ্ডামিটাকে চূর্ণ করিতে হইবে। অতিশয় উত্তেজনার মধ্যে তাহার দিন কাটিতেছে। অনেকগুলি ভাল লোকের সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে। ভাল লোক মানে লোকগুলিকে শঙ্করের ভাল লাগিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়বাবু—যিনি নামে কাগজের সম্পাদক—তিনি বেশ একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। নিজে যদিও তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মদের গালাগালি দিয়া তিনি যত আনন্দ পান অন্য আর কিছু করিয়া ততটা পান না। রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অদ্ভুত। তিনি আমাদের পরাধীনতাটাকে টাইফয়েড-জাতীয় একটা ব্যাধি হিসাবে

গণ্য করেন। বলেন তাড়াহুড়া করিয়া লাভ নাই, নিজের প্রাণ-শক্তি-প্রভাবে ব্যাধি যদি সারিবার হয় আপনিই সারিবে। আমাদের দেখা উচিত চিকিৎসার ছুতা করিয়া রাজনৈতিক নেতাগুলি যেন আমাদের সর্ব্বস্বান্ত না করেন। আর একটি বিচিত্র লোক সুরেন্দ্রনাথ সোম। বেঁটে খাটো মানুষটি, অত্যন্ত রোগা, মাইনাস ফাইভ চশমা, নিরামিষাশী, স্কুলে মাস্টারি করেন। যদিও মাত্র বি-এ পাশ, কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হেন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা না জানেন। মদ এবং শিকার বিষয়ে তিনি তো বিশেষজ্ঞ। নিজে যদিও কখন জীবনে মদ স্পর্শ করেন নাই, সিগারেট পর্য্যন্ত খান না? কিন্তু কোন্ মদে কত অ্যালকহল আছে, কি রকম গ্রেপ হইতে ভাল মদ প্রস্তুত হয়, সস্তা মদ এবং দামী মদের তফাত কি, কি রকম সেলারে মদ রাখা উচিত, মদের বোতলের কাচ অ্যালকালি ফ্রি হইলে বা না হইলে কি ভাবে মদের গুণে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনা, মদের ব্যবসা কোন্ দেশে কি ভাবে চলে, সাহিত্যসৃষ্টির উপর মদের প্রভাব কি এবং তাহা কতদূর বিজ্ঞান-সম্মত—এ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। শিকার বিষয়েও তাই। ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, ফরাসী সাহিত্যেও লোকটির অগাধ অধিকার। মাঝে মাঝে আড্ডায় আসেন এবং ক্বচিৎ কখনও ভারি ওজনের প্রবন্ধ লেখেন। সুরেনবাবু 'ক্ষত্রিয়' কাগজটির প্রতি স্নেহশীল —সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা হিরণদার সহিত ঘনিষ্ঠতাবশত। যে জন্যই হোক তিনি 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংশোধক হিসাবে। মাস্টার মানুষ, ভুল কিছুতেই তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। তিনি 'ক্ষত্রিয়'এর ভুল তো সংশোধন করেনই, অন্য কোন কোন পত্রিকায় কি কি ভুল বাহির হইয়াছে তাহা শঙ্করকে আনিয়া দেন এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শঙ্করের লেখনী হিংস্র হইয়া ওঠে। শঙ্করের লেখনীতে যে এমন একটা হিংস্রতা ছিল তাহা শঙ্কর নিজেও এতদিন জানিত না; নিজের এই তীক্ষ্ণ নখদন্ত-সমন্বিত নবরূপ সে নিজেই সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ছবি রায় এই আড্ডার আর একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কখনও কবিতা লেখে না, কিন্তু মনে-প্রাণে কবি। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন অবিন্যস্ত চুল, চোখে আকুল উতলা দৃষ্টি, মুখে শেলি, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, পরণে আধময়লা ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডাল। প্রত্যহ সকালে বাজার করিতে যাইবার মুখে থলিটি হাতে করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেয়, কবিতা আওড়ায়, এক একদিন ভাবের আবেগে কাঁদিয়া পর্য্যন্ত ফেলে। জীবনে তাহার অনেক দুঃখ। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে, অথচ উপার্জ্জন কম, সেইজন্য দুর্দ্দশাটা আরও বেশী। বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু একপাল ছেলে মেয়ে। দশটা পাঁচটা একটা আপিসে কেরাণিগিরি করে, বৈকালে মনোহারি দোকানে গিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য লেখে, সন্ধ্যা-বেলায় এক জায়গায় টিউশনি করে, তবু কুলায় না। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের সহিত তাহার মতের মিল নাই, কিন্তু হিরণদা'কে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। হিরণবাবুও তাহাকে স্নেহ করেন, এত স্নেহ করেন যে মাঝে মাঝে নিজের পকেট হইতে পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে মদ খাওয়ান। শঙ্করেরও ছবিকে বড় ভাল লাগে। আরও অনেকে আড্ডায় আসে। দীপেন, জ্যোতিষদা, চঞ্চল, বরেন, নিপু, শ্যামল এবং আরও অনেকে। সকলেই যুবক, সকলেই সাহিত্য-রসিক। কেহ ধনীর সন্তান, কেহ চাকুরে, কেহ বেকার, কেহ বিজনেস করিতেছে। হিরণবাবু সকলেরই হিরণদা। শঙ্করও আজকাল হিরণবাবুকে হিরণদা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। হিরণদা যদিও এই আড্ডার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেকে কখনও জাহির করেন না। তিনি কেন্দ্রেই বাস করেন বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে। তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ মতামত আড্ডার কাহারও অগোচর নাই; সকলেই তদনুসারে চলেনও, কিন্তু হিরণদা উগ্রভাবে নিজের দলপতিত্ব কখনও প্রকাশ করেন না। হিরণদার সম্বন্ধে একটা কথা ভাবিয়া শঙ্কর অবাক হয়, লোকটার প্রতিভা যে কিরূপ তাহা বোঝা যায় না। সাহিত্য চর্চ্চা যে খেয়ালমাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানাবিষয়ে কৌতূহল এবং 'ক্ষত্রিয়' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার বহুমুখী কৌতূহলে একটা মুখমাত্র। শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ এই কাগজটা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ঠিক সেই মনোভাব লইয়া—যে মনোভাব লইয়া দুষ্ট ছেলে দুষ্টামি করে। বঙ্গদেশরূপ মহারণ্যের নানাবৃক্ষে নানাজাতীয় পতঙ্গ নানারকম চক্র নির্ম্মাণ করিয়া গুঞ্জন করিতেছে, প্রত্যেক চক্রে এক একটা

লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া দেখাই যাক না কি রকম মজাটা হয়! এতদিন তিনি নিজেই লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এখন শঙ্করের মধ্যে একজন সক্ষম লোষ্ট্র-নিক্ষেপক আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহার হাতে এ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া অপর দিকে মন দিয়াছেন। একটা কুস্তির আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেখানে অনেকগুলি যুবক এবং কুস্তিগীর পালোয়ান জুটাইয়া বক্সিং, জুজুৎসু এবং শরীর-চর্চ্চার নানারূপ আয়োজন তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে অশক্ত অসুস্থ বলিয়াই আমরা ভীরু দার্শনিক হইয়া পড়িতেছি। জীবনযুদ্ধের নির্ম্মম সত্যগুলিকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই কুস্তির আখড়াতেই তাঁহার সমস্ত বিত্ত নিবদ্ধ নহে, আরও নানাদিকে তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত। জন্তু জানোয়ারের বিষয়ে ঝোঁক আছে। বাড়িতে শুধু কাবুলি-বিড়াল এবং অ্যালশেসিয়ান কুকুর নয়, বাঘের বাচ্চাও পুষিয়াছেন। ইহা ছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ, দিয়াশালাইয়ের বাক্স সংগ্রহ, পুরাতন শাল সংগ্রহ, সেকেলে বাসন সংগ্রহ প্রভৃতিতেও তাঁহার আগ্রহ কম নয়। হিরণবাবু বড়লোকের ছেলে, সর্ব্বঘটবিহারী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকার। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যই নিজের কিছু করিবার নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি অনুযায়ী সব কিছুতেই সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন। পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, সুতরাং বাধা দিবার কেহ নাই। যোগীনদাও নাকি এককালে এই ধরণের ছিলেন, একটা চাকরি জোটাতে আজকাল সব থামিয়া গিয়াছে। যোগেন রায়ের পরিচয়ও শঙ্কর পাইয়াছে। তিনি বিলাতী ডিগ্রি ও সুপারিশের জোরে একটি নামজাদা বিলাতী লাইফ ইনসিওরেন্স কম্পানির ম্যানেজার হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসেন এবং বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। যখন কলিকাতায় থাকেন না তখন বীডন স্ট্রীটের বাড়িটা খালি পড়িয়া থাকে, বাড়ী ভাড়া দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। যোগীনদাও অবিবাহিত, রসিক, কিন্তু নিদারুণ মাতাল। আর একটি নূতন ধরণের লোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় হইয়াছে, ডাক্তার মুখার্জ্জি। ইনি একজন রিটায়ার্ড আই-এম-এস অফিসার, বিলাতের এম-ডি রিটায়ার্ড লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল। এককালে হিরণবাবুর পিতৃবন্ধু ছিলেন, এখন হিরণের বন্ধু। এমন কি সিগার আদান-প্রদান চলে। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। বিদ্বান বহুদর্শী লোক, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নাই। গোঁফ-দাড়ি কামানো, ফরসা রং, ভারি মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, গায়ে ঢিলা গলাবন্ধ সাদা চায়না কোট, পরণে সাদা থান, মুখে প্রকাণ্ড সিগার এবং প্রশান্ত হাসি। মাঝে মাঝে যখন আড্ডায় আসেন, সমস্ত আড্ডাটা যেন ভরাট হইয়া ওঠে। সাহিত্য-রসিক, স্পষ্টবাদী, শক্তিশালী ব্যক্তি।

এই নূতন সমাজে নূতন প্রেরণা লইয়া শঙ্কর নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে নিজের একটা বিশিষ্ট স্থানও করিয়া লইয়াছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা তাহাকে মধ্যে মধ্যে আকুল করিয়া তুলিতেছে, হিরণদা'র "ডাম্বেল, মুগুর এবং বারবেল" পুস্তকের প্রুফ দেখা হইয়া গেলে সে কি করিবে, অর্থোপার্জ্জনের স্থায়ী রকম কোন ব্যবস্থাই তো সে এখনও পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, ডাক্তার মুখার্জি তাহাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়াছিলেন কয়েকদিন পূর্ব্বে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর তিনি আসেন নাই। তিনি কোন্ ঠিকানায় থাকেন তাহাও শঙ্করের জানা নাই ··· সহসা অমিয়ার মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল, ভীরু সরল সলজ্জ চোখ দুটি। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল, অমিয়ার কথা সে তো মোটেই ভাবিতেছিল না। এমন হয় কেন! ইহার নাম কি টেলিপ্যাথি? অমিয়ার মুখখানাই অসংলগ্নভাবে মনের ভিতর যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রুফে মনঃসংযোগ করিল। প্রুফগুলোতে কি অদ্ভুত ভুলই থাকে। সমস্ত দন্ত্য 'ন' গুলো উল্টা এবং সমস্ত 'থ' 'খ' হইয়া গিয়াছে!

যে ঘরে হিরণদার আড্ডা বসে, ঠিক তাহার পাশের ছোট ঘরটাতে (অর্থাৎ আনইউজ্‌ড্ বাথরুমটিতে) শঙ্কর নিজের জন্য ছোট একটি আপিসের মতো করিয়া লইয়াছিল। হিরণদা একটি ছোট টেবিল, শেল্‌ফ্ এবং চেয়ার দিয়াছিলেন। এই ছোট ঘরটিতেই শঙ্কর পড়ে, লেখে, প্রুফ সংশোধন করে। ইহাই 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস। কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এতদিন 'ক্ষত্রিয়'

পত্রিকার আপিস হিরণদার টেবিলের ড্রয়ারেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে শঙ্কর আড্ডায় গিয়া যোগ দেয়। আড্ডা সাধারণত শুরু হয় বৈকাল হইতে এবং চলে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্য্যন্ত। সেদিন রবিবার, একটু সকাল সকালই আড্ডা শুরু হইয়াছে এবং পাঁচটা নাগাদ বেশ গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষদার গলা-খাঁকারি এবং চঞ্চলের উচ্চহাস্য হইতেই তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। হিরণদা শঙ্করকে শুনাইয়া শুনাইয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন—"অত চেঁচিয়ে নয়, শঙ্কর চটে যাবে, প্রুফ নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ও—"

শঙ্কর জানে হিরণদার এই সতর্কবাণীর অর্থ কি। অর্থ—উঠিয়া এস। শঙ্কর উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হিরণদা বলিলেন—"আমার দোষ নেই কিন্তু, আমি সেই থেকে সবাইকে মানা করছি—"

শঙ্কর হাসিয়া টুল টানিয়া উপবেশন করিল।

হিরণদা হাঁকিলেন—"নবীন, এক কাপ চা—"

ডাক্তার মুখার্জ্জি আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সকলেই স-সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বস, বস, দাঁড়িয়ে উঠলে কেন সব! শঙ্কর তোমার চাকরি ঠিক করে এলুম, 'সংস্কারক' আপিসে প্রুফ-রীডার, মাসে ৪০৲ করে পাবে। আপাতত ওইতেই ঢুকে পড়—তারপর দেখা যাবে।"

'সংস্কারক' কাগজে তাহার চাকরি হইয়াছে! শঙ্কর নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হীরালাল মজুমদার সম্পাদিত 'সংস্কারক' কাগজে! ইহা যে সে কল্পনাও করে নাই!

৩৮

কয়েকদিন পরে শঙ্কর ভন্টু ও মৃন্ময় গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। খানিকক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, "ঝুলে তো পড়লাম ভাই, খুজবুজকে নিয়ে, এখন অদৃষ্টে কি আছে কে জানে—"

ভন্টুর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "ইন্দুমতীকে লাগছে কেমন?"

উচ্ছ্বসিত ভন্টু বলিল—"চমৎকার ভাই, ঠিক মাখন লদ্‌কানো টোস্টের মতো, বেশ নরম নরম অথচ মুচমুচে। বিড্‌ডিকার তো একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! তুই অমিয়াকে আনছিস কবে?"

"শীগ্‌গিরই আনব"

"এনে ফেল্‌।"

মৃন্ময় একটি কথাও বলে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

ভন্টু ভাবিতেছিল ইন্দুমতীর কথা, তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা, নূতন গহনা পাইয়া বউদিদির আনন্দের কথা। এতদিন দুঃখে কাটাইয়া বউদিদি এইবার বোধ হয় সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন।

শঙ্কর ভাবিতেছিল সাহিত্যের কথা। সংস্কারক পত্রিকার সংস্পর্শে সে যখন আসিতে পারিয়াছে তখন আর ভাবনা কি। শেক্‌সপীয়ার, দান্তে টলস্টয়, ডস্টয়ভেস্কি ... মহিমান্বিত মূর্ত্তিগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছিল ... বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ... এই দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কল্পনা-বিহঙ্গম মৃত্তিকা ছাড়িয়া বহু উর্দ্ধলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। (ক্রমশঃ)

কে?

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ

স্মৃতির দ্বারে ঘা দিয়ে কে
পলায় হেসে আড়চোখে?
ধরতে গেলে দেয় না ধরা!—
ডাক্‌ না সখি, ডাক্‌ ওকে!
উদাস প্রাণে উহার লাগি'
কতই রাতি রই যে জাগি'—
"তুষের মত জল্‌ছে হৃদয়
সারা জীবন ওর শোকে!
মনের দ্বারে ঘা দিয়ে কে
হঠাৎ আবার যায় স'রে?
তাকায় শুধু সজল চোখে,—
কয় না কথা হায় ওরে!

কাছে থেকেও রয় সে দূরে
হৃদয় ভ'রে করুণ সুরে;
মরণ তারে হরণ ক'রে
গেছে নিয়ে কোন্‌ লোকে!
প্রাণের দ্বারে কর হেনে কে
যায় গো চ'লে চুপ ক'রে?
স্বপনমাঝে গোপনভাবে
দেয় গো দেখা রূপ ধ'রে?
ঘুম ভেঙ্গে যায় আধেক রাতে
অশ্রু জাগে নয়ন-পাতে;—
কেঁদে বলে ব্যাকুল হিয়া
"কোথায় গেলে পাই তোকে?"

কবি-কথা

উষসী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

স্কুলের ছুটির পর ঠাকুর-বাড়ীর কয়টি ছেলেকে লইয়া বাড়ীর গাড়ী দেউড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই কবি তাড়াতাড়ি সর্ব্বাগ্রে নামিয়া দুরন্ত হাওয়ার মত বাড়ীর ভিতরে ছুটিলেন। উপরে উঠিবার দীর্ঘ সোপান-শ্রেণীর প্রতি ধাপটি মাড়াইবার আর অবসর নাই, চঞ্চল চরণে কোনটি ডিঙাইয়া—কোনটির উপর অল্প ভর দিয়া—ক্ষিপ্রগতিতে দোতালার বারান্দায় উঠিতে কি আগ্রহ তাঁর! কিন্তু ইতিমধ্যেই যে তাঁর খেলার সঙ্গিনীটি কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া প্রিয় সাথীর পিছু লইয়াছে, কবি তাহা জানিতে পারেন নাই।

উপরে উঠিতেই কবির পিঠে পড়িল একখানি কোমল করপল্লবের মধুর পরশ, সেই সঙ্গে কানে বাজিল কল-কণ্ঠের কৌতুকভরা প্রশ্ন—এত স্ফূর্ত্তি যে আজ—রাজপুত্তুর যেন হাওয়ার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীতে ফিরলেন! কি ব্যাপার?

প্রাণখোলা হাসিতে সুন্দর মুখখানা আলো করিয়া পরিহাসের ভঙ্গিতে কবি উত্তর দিলেন—ব্যাপার ভারি মজার, তুমি যা ধরেছ মিছে নয়; মায়াপুরী জয় করেই রাজপুত্তুর বুক ফুলিয়ে ফিরে এসেছে।

হাসির ভারে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া বালিকা কহিল—তা হ'লে রাজকন্তেটিকে কোথায় রেখে এলেন রাজপুত্তুর?

লম্বা পিরাণটির পকেট হইতে ভাঁজ করা এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কবি সহাস্যে কহিলেন—এই যে, সঙ্গে ক'রেই এনেছি। ইনিই যে মায়াপুরীর রাজকন্তে—সবার সামনে আমার গলায় দিয়েছেন মালা পরিয়ে।

হাতের কাগজখানি সঙ্গিনীর বিহসিত দুটি বড় বড় চক্ষুর উপর ধরিয়া কবি হাসিতে লাগিলেন।

মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর এবং আয়ত দুটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বালিকা কহিল—তা হ'লে ইস্কুলে কিছু কাণ্ড বাধিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই? বল না, লক্ষ্মীটি, কি হয়েছে?

খপ করিয়া সঙ্গিনীর হাতখানি ধরিয়া কবি কহিলেন—সে একটা ভারি মজার গল্প, তোমাকে না শুনিয়ে আরাম পাচ্ছিনে। এখানে নয়, বারান্দার দিকে চলো, সব বলবো।

বলিতে বলিতে তিনি সঙ্গিনীকে এক রকম জোর করিয়া টানিতে টানিতেই বারান্দার দিকে চলিলেন। কবি-সঙ্গিনী জানে, ইটকাঠের আবেষ্টন তাহার সঙ্গীটিকে যেন বিপন্ন করিয়া তোলে; মুক্ত আকাশ এবং গাছপালার সবুজ পাতাগুলির দিকে দৃষ্টি না পড়িলে তাহার মনের কথা মুখ দিয়া ফুটিতে চাহে না।

বারান্দায় আসিয়াই কবি উৎসাহের সুরে কহিলেন—মায়াপুরী হচ্ছে আমাদের ইস্কুলটা, আর ক্লাসের ছেলেগুলো প্রত্যেকেই যেন এক একটি মায়াধর! ওদের পেটে এক, মুখে আর; দিব্যি ভাব ক'রে কথা বা'র ক'রে নেয়, আবার একটু পরেই সেই কথাটাকে উল্টে পাল্টে এমনি বকামো করবে যে আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায়!

সমবেদনার সুরে বালিকা কহিল—সে ত আমি সব জানি গো মশাই! এক দিন আর রাগ বরদাস্ত করতে না পেরে তুমি ত নালিশ পর্য্যন্ত করেছিলে তোমাদের কে গোবিন্দবাবু আছেন—তাঁর ঘরে গিয়ে!

সহর্ষে কবি কহিলেন—তোমার দেখছি মনে আছে সে কথা—

চোখ দুটি বড় করিয়া বালিকা কহিল—তোমার কোন্ কথাটি আমার মনে নেই বল ত? নামতার মতন মুখস্ত বলে যেতে পারি, তা জান? হাঁা, তার পর কি হল?

কবি কহিলেন—সেই যে গোবিন্দবাবুর ঘরে ঢুকে নালিশ করেছিলুম দুষ্টুগুলোর নামে, সব শুনে আর আমার চোখের জল দেখে গোবিন্দবাবু ত সে বার ছেলেগুলোকে ধমকে দেন, সেই থেকে ওদের স্বভাব যেন একেবারে বদলে যায়, আমার সঙ্গে খুব মিশতে থাকে, গল্প করে, কত কি জিজ্ঞাসা করে; আমিও মন খুলে আলাপ করতে থাকি। সেইটিই শেষে কাল হয়ে দাঁড়ালো—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কবি সহসা থামিলেন। দেখিলেন—বালিকা নিবিষ্টমনেই তাঁহার কথা শুনিতেছে, তাহার চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। কবি নীরব হইতেই আগ্রহের সুরে সে কহিল—তার পর ব্যাপারটা কি হ'ল?

একটি ঢোক গিলিয়া এবং গলাটা পরিষ্কার করিয়া কবি কহিলেন—জানাজানি হয়ে গেল যে আমি কবিতা লিখি।

বিজ্ঞের মত কচি মুখখানির এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া বালিকা কহিল—কবিতার খাতাখানাও তা হ'লে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া হ'ত? হুঁ—বুঝিছি, প্রাণ খুলে প্রাণের বন্ধুদের সামনে কবিতাগুলো পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল! ভেবেছিলে, সবাই আমার মতন, শুধু কান পেতে শুনবে, মুখ দিয়ে কথাটি বেরুতে দেবে না—চেপে রাখবে! তারপর?

বিমর্ষভাবে কবি কহিলেন—তারপর ওরা সেদিনের ব্যাপারটার শোধ তুললে। গোবিন্দবাবুর ঘরে গিয়ে বলে দিলে—আমি কবিতা লিখি। শুধু তাই নয়, ক্লাসে বসে নতুন যে কবিতাটি লিখেছিলুম, সেটি পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে গোবিন্দবাবুকে দেখিয়ে জানালে যে, শুধু মুখের কথা নয়, তারা দোষীকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে।

সকৌতুকে বালিকা প্রশ্ন করিল—তার পর কি হ'ল?

কবি কহিলেন—তখনি আমার ডাক পড়ল গোবিন্দবাবুর ঘরে। আমি ত ভয়ে একবারে কাঠ, মুখখানা শুখিয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলুম—কালো চাপকান পরা আবলুস কাঠে তৈরী একটা বেঁটে খাটো মোটাসোটা মূর্ত্তি যেন প্রকাণ্ড চেয়ারখানা জুড়ে বসে আছে—আর চোখের তারা দুটো ভাঁটার মতন ঘুরছে। আমাকে দেখে সেই চোখে কটমট ক'রে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কবিতা নাকি তুমি লিখেছ ?

বালিকা—তুমি কি জবাব দিলে ?

কবি—মিছে কথা ত বলতে শিখিনি, সত্যি কথাই বললুম—'আমিই লিখিছি।' কথাটা শুনে আমার পানে ঠায় কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, আচ্ছা, 'ছেলেদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটা কবিতা কাল তুমি লিখে এনে আমাকে দেখাবে। যদি না আনতে পারো, তা হ'লে জানবো—তুমি এক নম্বরের একটা মিথ্যাবাদী, তারপর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। ছেলেদের মুখে তখন আর হাসি ধরে না, তারা ভাবলে খুব জিতে গেছে। আমি যে কবিতা লিখতে পারি না, আর কারুর কবিতা বই থেকে টুকে নিয়ে গিয়ে বড়াই করি, এবার খুব জব্দ , এই সব ভেবেই তারা আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল। কিন্তু আজ ইস্কুলে গিয়ে কবিতাটি গোবিন্দবাবুর হাতে দিতেই তারাও অবাক ! ভাবলে, এতটুকু ছেলে সত্যিই তা হ'লে কবিতা লিখতে পারে নাকি ! তার পর আরও মজা হল—টিফিনের পর গোবিন্দবাবু ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সামনে ইস্কুলের সমস্ত ছেলেকে দাঁড় করিয়ে যখন আমাকে বললেন—'তোমার লেখা কবিতাটা আবৃত্তি ক'রে সকলকে শুনিয়ে দাও !' আমার স্ফূর্ত্তি তখন দেখে কে, গলা যদিও কাঁপছিল, বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছিল, তবুও গলায় জোর দিয়ে পড়ে ফেললুম কবিতাটি। শিক্ষক মশাইরা পর্য্যন্ত বললেন—বা ! আমাকে তখন আর কে পায় ! তুমিই বল না—এটা ঠিক রূপকথার রাজপুত্তুরের মায়াপুরী জয় করার মতন নয় ?

কবি-মনের পুলকোচ্ছ্বাস তাঁর সঙ্গিনীর মনটিও যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তার পাতলা ঠোঁট দুটি চাপা হাসিতে ফুটি ফুটি হইয়া তাহা যেন ব্যক্ত করিতেছিল। মুখের হাসিটুকু পলকে চঞ্চল দুই চোখে ভরিয়া সে কহিল—এখন মায়াপুরীর রাজকন্তের ঘোমটাটি খুলে মুখখানি ত আমাকে দেখাও রাজপুত্তুর !

হাতের ভাঁজকরা কাগজখানি খুলিয়া কবি সুর করিয়া তাহাতে লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :

"মা, এবার ম'লে সাহেব হবো,
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে
পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাবো।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা
বাগানে বেড়াতে যাবো,
আবার কালো বদন দেখলে পরে
ব্লাকী ব'লে মুখ ফেরাব।"

মুখখানি বাঁকাইয়া সুশ্রী দুটি ভুরু মচকাইয়া বালিকা কহিল—বা-রে, এই তোমার রাজকন্তে ! এ তো আমার চেনা ;—মনে নেই—লিখেই আমাকে শুনিয়েছিলে। ঘোমটাখানি ত আমিই খুলেছিলুম মশাই, তবে ?

হাসিতে হাসিতে কবি কহিলেন—কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা একেই ত ধরে নিয়ে গিয়ে গোবিন্দবাবুর টেবিলের মায়াপুরীতে কয়েদ ক'রে ফেলেছিল। তা হ'লে ইনিই আমার বন্দিনী রাজকন্তে নন, তুমিই বল না ?

সকৌতুকে সাথীর মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা কহিল—বুঝতে পেরেছি, তোমার গোবিন্দবাবু এঁকে আর ছেড়ে দেন নি। তাঁর ফরমাসী কবিতা লিখে তবে রাজকন্তেকে আজ উদ্ধার করে এনেছ। কিন্তু আমার কাছে সেটি চেপে রাখা হয়েছিল, আমাকে না শুনিয়েই—

বালিকার মুখে আর কথা ফুটিল না, অভিমানে প্রফুল্ল মুখখানি যেন সহসা অন্ধকার হইয়া গেল।

কবি যেন নিজেকে বিপন্ন মনে করিলেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি কবিতা তাঁহার খাতার পাতায় রূপায়িত হইয়াছে, এই রহস্যময়ী সঙ্গিনীটির সমক্ষেই তিনি স্বহস্তে তাহাদের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়াছেন। আজই প্রথম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি কবিকে এ বিপদে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিল ; তাড়াতাড়ি কবি কহিলেন—কি ক'রে তোমাকে শোনাবো, হার-জিতের ব্যাপার তখন চলেছে ; গোবিন্দবাবুর ফরমাসী কবিতাটি যে বন্দিনী রাজকন্তের হাতের মালা হবে—সেটা ত তখন ভাবিনি ! আমার মনে হচ্ছিল কি জানো, গোবিন্দবাবুর ড্রয়ারের চাবিকাটি একটা তৈরী করছি, তাই সরাসরি তাঁর টেবিলেই সেটি দাখিল করেছিলুম।

গম্ভীর মুখেই বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—রাজকন্তে ত তোমার সঙ্গে, মালাগাছটি কোথায় ?

কবি উত্তর দিলেন—দাদাদের থবরে, সন্ধ্যের পর বড়োদের দফতরে নাকি পেশ হবে।

কণ্ঠের একটা ঝঙ্কার তুলিয়া বালিকা কহিল—হোক গে, বাসি মালায় আমার কাজ নেই, তোমার ও-লেখা আমি কখখনো শুনব না, শুনব না, শুনব না। ওর বদলে তিনটি নতুন কবিতা সত্ত সত্ত লিখে আমাকে শোনাতে হবে।

মৃদু হাসিয়া কবি কহিলেন—তাই হবে। আমি বাঁচলুম। এখন হয়েছে কি জান, জ্যোতিদার ইচ্ছা, ব্যাপারটা ওঁদের জানিয়ে দিয়ে বলবেন—ছোটর মধ্যেও বড় আছে, সেই বড়ই ছোটর ভিতর থেকে মানুষের মনকে কেবলি ঠেলে দিয়ে জানাচ্ছে—তুমি বড়, মস্ত বড় !—আমি ত ওঁর কথা শুনে অবাক, লজ্জায় মুখখানা কোলের দিকে নেমে গিয়েছিল। তুমিও বল না, ছোটদের এতটা বাড়ানো কি ঠিক ?

স্থিরদৃষ্টিতে কবির মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা কহিল—আ-হা ! জ্যোতিদা'র কথা শুনে ছেলে এখন একেবারে লজ্জাবতী লতা ! নিজের মুখের কথাগুলো তুমি না-হয় ভুলে গেছ, আমি কিন্তু মুখস্থ করে রেখেছি মশাই !

বিপন্নের মত মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া কবি কহিলেন—কি কথা?

মুখে তীক্ষ্ণ হাসির একটা ঝিলিক তুলিয়া বালিকা কহিল—তোমার মানের কথা গো! সেই-যে সেদিন বড়দের 'ওপর অভিমান করে বলা হয়েছিল—সবতাতে মানা করাটাই হচ্ছে বড়োদের স্বভাব!—মশাই বোধ হয় ভুলে গেছেন?

বালিকার স্মিত মুখখানির উপর বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কবি কহিলেন—তোমার সঙ্গে কথায় পারি আমার সাধ্য কি!

মধুর হাসিয়া বালিকা কহিল—অমন কথা ব'ল না কবি! তোমার কথাই ত বলি গো, তবে একটু ঘুরিয়ে; আর যে কথাগুলো মনের ভিতরে চাপা থাকে, ফুটি ফুটি ক'রেও ফুটতে চায় না—আমি সেগুলোকে জোর করে টেনে আনি, কথা কিন্তু তোমারই, তোমার নিজের।

কবির বিস্ময়-বিহসিত দৃষ্টি বালিকার বিচিত্র দৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া কোমল কণ্ঠ হইতে একটা স্বর মিষ্ট সুরের মত নির্গত হইল—অদ্ভুত!

কবিকণ্ঠের এই মৃদু শব্দটির প্রতিধ্বনি যেন বালিকার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিয়া উঠিল—অদ্ভুত তুমিই!

৯

এই অদ্ভুত বালকটির জীবন-যাত্রা অতঃপর কালচক্রের আবর্ত্তে বিভিন্ন ঘটনা ও কতিপয় বর্ষের ভিতর দিয়া উষসীর সীমাপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইল। কবি এই সময় রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন আহরণে ব্যাপৃত আছেন এবং নিজেকেও রহস্যাবরণে আবৃত করিয়া একটা বিস্ময় সৃষ্টির সাধনা করিতেছেন।

কবি-কথার এই অংশ—কবি-জীবনের উষসীর এই আখ্যান-বস্তুটি সর্ব্বাধিক কৌতুকপ্রদ এবং বিস্ময়বহ।

ইতিমধ্যে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন; তাঁহার সুব্যবস্থায় কবি ও তাঁহার দুই অগ্রজের উপনয়নোৎসব সম্পন্ন হয় এবং তিনি কবিকে তাঁহার হিমালয়-আশ্রমে লইয়া যান। যাত্রা-পথে বোলপুর পড়ে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ এই বোলপুরে জমি ক্রয় করিয়া একখানি একতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করান, তাহাই পরে শান্তি-নিকেতন-নামে পরিচিত হয়। হিমালয় যাইবার সময় তিনি এই শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন বাস করিতেন। তাঁহার পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিতেন। হিমালয় যাত্রা-পথে এবারও তিনি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। পিতার সহিত কবি যে সময় প্রথম শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর মাত্র এবং সময়টা ১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ—ইং ১৮৭৩, ৬ই ফেব্রুয়ারী। শান্তিনিকেতন হইতে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে তিনি পিতার সহিত হিমালয় অঞ্চলে ডালহৌসি পাহাড়ে উপস্থিত হন। এখানে পিতার তত্ত্বাবধানে কয়েক মাস অবস্থিতির পর পিতার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহিত পুনরায় জোড়াসাঁকোর ভবনে ফিরিয়া আসেন।

এই কয়েক মাসেই কবির দেহমনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিশাল বাড়ীর মধ্যে বালকের অধিকারও প্রশস্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদরযত্নের অন্ত নাই। মায়ের ঘরে মেয়েদের যে সভা বসে, কবি সেখানে বড় রকমের একটি আসন পাইয়াছেন। যে-সব দেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে তাঁর যে-সব দুঃসাহসিক অভিযান চলিয়াছিল, সেগুলি কবিকে গল্পের মত গুছাইয়া বলিতে হয়, মাতা এবং তাঁহার অনুগত পুর-মহিলারা অবাক-বিস্ময়ে এই অদ্ভুত ছেলেটির ভ্রমণ কথা শুনিতে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর জ্যোতিদাদার নববধূ সমাগমে অন্দর-মহল উল্লাস-মুখর হইয়া উঠিয়াছে, বধূও তাঁহার এই অল্পবয়স্ক দেবরটিকে অবকাশের সঙ্গীরূপে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন বধূর নিকটও এভাবে প্রশ্রয় পাওয়ায় কবির প্রসন্ন অন্তরটিকে এখন আনন্দ-উৎসাহের উৎস বলিলেও চলে। স্বাধীনতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় কবির মনের মধ্যে গুঞ্জরিয়া ওঠে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!"

অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কবি—চাকরদের শাসনপাশ অনেক আগে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, ডালহৌসির পার্ব্বত্য-বাংলোর মধ্যে গম্ভীর-প্রকৃতি রাশভারি পিতার কয়েক মাসব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য পাইয়া এবং তাঁহার নিকট বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষার নূতন প্রণালী এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রসাস্বাদ করিয়া কবির অন্তর যেমন বিস্তৃত হইয়াছে, স্বাবলম্বনের একটা আকাঙ্ক্ষাও তেমনি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ধরা-বাঁধা অবস্থায় আর কি তিনি ধরা দিতে পারেন!

পিতার সহিত বাহিরে যাইবার সময় ভ্রাতাদের সহিত কবি বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সেখানে কি যে পড়িতেছেন, তাহার কিছুই বুঝিতেন না; পড়াশুনার কোন চেষ্টাও করিতেন না, আর না করিলেও সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের কোনরূপ লক্ষ্যও দেখা যাইত না। গাড়ী হইতে নামিয়া স্কুল-বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই কবির মনে হইত, যেন খাপওয়ালা একটা বড়ো বাক্সের ভিতর তিনি ঢুকিতেছেন; তার দরজা নির্ম্মম, দেয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মত, তার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছু নাই, কোথাও কোন সাজসজ্জা নাই, ছেলেদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে—কর্ত্তৃপক্ষের সে'দিকে রুচির কোনরূপ বালাইও নাই।—এমন একটা বিশ্রী পরিবেশের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশে নিষ্ঠুর অভিভাবকেরা কবিকে পুনরায় পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়াই কবি এবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন; দৃঢ়স্বরে তিনি আপত্তি জানাইলেন, স্কুল-পালানো বিদ্যার পরিচয় দিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং বাড়ীর অভিভাবকগণকে তাঁহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। অথচ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুপযুক্ত বয়সে এই বালকই অগ্রজদের সহিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য দারুণ জিদ ধরিয়া অভিভাবকগণকে অতিষ্ঠ করিয়াছিলেন!

বোলপুর হইতে ডালহৌসি পাহাড় পর্য্যন্ত যতগুলি স্থানের সহিত গত কয় মাস ধরিয়া কবি পরিচিত হইয়াছেন, প্রতি স্থানটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন—মনের সাধে কবিতা কুসুমাঞ্জলি বাণীর চরণে অর্পণ করিয়া। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া অবধি তাহার সাধনা সমান গতিতেই চলিয়াছে, অবশ্য গোপনে। কবির সাধনা এখন আর শুধু লেখার নয়, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য প্রচুর চেষ্টাও চলিয়াছে। আর প্রকাশ্যে চালাইতে হইয়াছে—গৃহ-শিক্ষকদের নিকট পড়াশুনা, জ্যোতিদাদার নিকট সঙ্গীত এবং বউ-ঠাকুরাণীর নিকট বিবিধ কলা-চর্চ্চা !

রহস্যময়ী সঙ্গিনীর সহিত সেদিন কবির এ সম্বন্ধে তুমুল বিতর্ক চলিতেছিল।

প্রবাসে কয়মাসে কবি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া তাঁহার বিরাম-সঙ্গিনীকে প্রত্যেকটি পড়িয়া শুনাইতে হইয়াছে—বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাগানের প্রান্তদেশে একটি চারা নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া সযতনে রচিত 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে কাব্যখানি পর্য্যন্ত। লেখাগুলি এখন বালিকার আয়ত্তাধীনে রাখিয়া কবিও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

অভিভাবিকার মত অনুযোগের সুরে কবির বাল্য সঙ্গিনী বলিতেছিল—সেই যে পেনিটি থেকে ফিরে এলে নদীর জলে মাতামাতি করে, সেই থেকেই তুমি বিগড়ে গেছ একেবারে ! এবার দেশভ্রমণ ক'রে পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে রাজপুত্তুর ফিরে এলেন যেন দস্যি হয়ে। কাউকে মানবেন না, কারুর কথায় কাণ দেবেন না, নানা ছুতো করে স্কুল পালিয়ে বেড়াবেন, আর আমাকে কথা শুনতে হবে।

বালিকার কথাগুলি সকৌতুকেই কবি শুনিতেছিলেন, চক্ষুর দুটি স্বচ্ছ তারা চক-চক করিতেছিল যেন। মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে কেন কথা শুনতে হচ্ছে ?

ঝঙ্কার দিয়া বালিকা কহিল—হবে না ! সবাই কি বলে তাত জান না !

—কি বলে ?

—কত কি ! দাদারা বলেন, ওর কিচ্ছু হবে না। কাল বড়দি বলছিলেন, আমরা ভেবেছিলুম বড় ব'লে রবি মানুষের মতন হবে, কিন্তু আমাদের সেই আশাটাই সব চেয়ে নষ্ট হয়ে গেল। চাকর-বাকররা পর্য্যন্ত বলতে শুরু করেছে, আমাদের হাতের বাইরে গিয়েই ত বিগড়ে গিয়েছে, তখন আমাদের ইসারাতেই ফিরতো। এসব কথা শুনলে কষ্ট হয় না—তুমিই বল না ?

কবির মুখে আর হাসি ধরে না, সঙ্গিনীর বিমর্ষ মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিলেন—আমার কিন্তু হাসি পায়, আমি কাণ পেতে শুনি, আর খালি মুখ টিপে টিপে হাসি।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বালিকা কহিয়া উঠিল—আ-রে ছেলে, তোমার তা হ'লে পেটে পেটে দুষ্টুমী, সব জেনেও নেকা সাজতে সাধ ? ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না, নিজের নিন্দে শুনবে তবু কথা শুনবে না ! কর্ত্তা-রাজা এসে যখন সুধোবে, কি জবাব তাঁকে দেবে ?

কর্ত্তা-রাজার কথা উঠিতেই কবির মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভঙ্গিতে শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট হইল। গাঢ়স্বরে কহিলেন—চারটে মাস বাবার সঙ্গ পেয়েই ত মনের ভাব বদলে গেছে ; সেটা ত কেউ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—কর্ত্তারাজা কি তোমাকে বলে দিয়েছেন যে কারুর কথা শুনো না—স্কুল পালিয়ে বেড়িও ?

কবি কহিলেন—তুমি ত তাঁর ত্রিসীমায়ও ঘেঁষতে না, তাই চিনতে পারো নি তাঁকে। লোকে তাঁকে মহর্ষি বলে কেন জান, মহর্ষির মতই মানুষের ভেতরটা তিনি দেখতে পান—তাই। আমি যতদিন তাঁর কাছে ছিলুম আমার খাওয়া-পরা, পড়া-শোনা, বেড়ানো, গল্প করা, ঘুমানো—সবই একটা নিয়মে তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে আমাকে পাখীর মতন খাঁচার ভিতরে তিনি আটকে রাখেন নি কোনদিন। আমার স্বাধীনতা যথেষ্ট ছিল। খেলাই বলো, আর জেদই বলো, যার দিকে যখনই আমার মনটি ঝুঁকেছে আর বাবাকে বলিছি, তিনি কখনো 'না' বলেন নি, কিম্বা সেটা তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করেন নি—বরং উৎসাহই আমাকে দিয়েছেন কত ! বাবা যে আমার সঙ্গে ছোট-খাটো ব্যাপারেও কি রকম বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

আগ্রহের সুরে বালিকা কহিল—লক্ষ্মীটি, বল না ; আমার শুনতে ভারি সাধ হচ্ছে।

কবি কহিলেন—তা হ'লে বোলপুরের গল্পটাই আগে বলি শোন : বাবার সঙ্গে সেখানে যখন যাই, তখন সবে বর্ষা নেমেছে। বাবা যেখানে বাড়ী করেছেন, তার চারদিকে খোলা মাঠ ধূ ধূ করছে ; বুঝতেই পারছো, আমার মনটিও তখন গাছের পাখীর মতন কি রকম বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে—হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করবার জন্যে। পেনেটির বাগানবাড়ীতে গিয়েও এমনি একটা আনন্দ পেয়েছিলুম, কিন্তু সেখানে ছিলুম খাঁচার পাখী, মনের সাধ মনেই থেকে যেতো। ওখানে কিন্তু বাবাকে বলতেই দিব্যি খুশী মনেই বললেন—'বেশ ত, এতে আর কথা কি ! প্রকৃতির সঙ্গে তোমার ভাব করাই উচিত, সেই জন্যেই ত শহর থেকে তোমাকে সরিয়ে এনেছি প্রকৃতির রাজ্যে।' বাবার কথা শুনে মনে যেমন আহ্লাদ হ'ল, তেমনি তাঁর উপর শ্রদ্ধাটুকু আরও অনেকগুণ বেশী হয়ে উঠলো। আর অমনি আমার কাঁধ দুটিতে কে যেন দুখানি পাখা বেঁধে দিলে ; তখনকার ছুটোছুটি যদি দেখতে !

দৃশ্যটি যেন বালিকার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল, কলকণ্ঠে কহিল—আমি যদি সেখানে তখন থাকতুম !

উৎসাহের সুরে কবি উত্তর দিলেন—তা হ'লে সে আমোদটা কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠতো, সেই সঙ্গে তুমিও বাবাকে চিনতে পারতে।

বালিকা কহিল—অদৃষ্টে থাকলে ত ! হ্যাঁ, তার পর কি হ'ল তাই বল।

কবি কহিলেন—মাথার উপরে নীল আকাশ, আর সামনে যতদূর নজর পড়ে খোলা মাঠ ধূ ধূ করছে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢিপি। ছুটতে

ছুটতে তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে যেতুম রূপকথার রাজপুত্তুরটির মতন। এক একদিন মাঠ পার হয়ে আর একদিকে যেতুম—মেঘের মত দূর থেকে শাল বনের সারি আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো, কাছে গিয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতুম গাছগুলির পানে; শালের নামই শুনিছি, মরা গাছের হাড়ের তৈরী কড়ি-বরোগা দোর জানলা গরাদে—এগুলো ত অষ্টপ্রহরই দেখি—কিন্তু এদের জীবন্ত রূপটি দেখলুম সেই বোলপুরের বনে। শালগাছগুলি তখন ফুলে ভরে গেছে, কি সুন্দর সোঁধা সোঁধা গন্ধ! তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে মাঠে ফিরে এলুম। এক জায়গায় হঠাৎ চোখে পড়ল—একটা ঢিপির খানিকটা বৃষ্টির জলে ধ্বসে গেছে, আর নানারঙের নানা আকারের পাথরের নুড়ি চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমার তখন কি আমোদ, আর—জামার আঁচলটি পেতে সেগুলি কুড়োবার কি উৎসাহ! তারপর সেগুলি নিয়ে বাড়ীতে এসে সেই অবস্থাতেই বাবার সন্ধানে ছুটলুম। বাড়ীর দক্ষিণে বাবা কাঁকর-ভরা-মাটি দিয়ে পাহাড়ের মত একটা উঁচু ঢিপি তৈরী করিয়েছিলেন। সকালে বিকেলে তারই ওপরে তিনি চুড়োয় বসে থাকতেন। সেই ঢিপির উপরে উঠে রঙ-বেরঙের নুড়িভরা জামার আঁচলটি তাঁর সামনে ধরে বললুম—'দেখুন, কি সুন্দর পাথর, আমি কুড়িয়ে এনেছি।' এক নজরে সেগুলি দেখে খুশী হয়ে বাবা বললেন—'বা! চমৎকার ত! কোথায় পেলে এ সব?' আমি বললুম—'এমন আরো আছে, অনেক—অনেক; হাজার হাজার। আমি রোজ এনে দিতে পারি।' বাবা হেসে বললেন—'সে হলে ত বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়ে তুমি আমার এই পাহাড়টা সাজিয়ে দাও।' বাবার কথায় আমার উৎসাহ যে কত বাড়লো, আর মনটি আনন্দে কি রকম ভরে গেল, সে ত বুঝতেই পারছ! তখন থেকে এই পাথর কুড়িয়ে আনা আমার একটা বড় রকমের কাজ হয়ে দাঁড়ালো—যে কদিন ছিলুম। এখনো মন কেমন করে তাদের জন্যে।

মৃদুকণ্ঠে বালিকা কহিল—আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকতুম সেখানে!

কবির মুখখানি পুনরায় উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন—তা হ'লে কাজটা আধা-খেঁচড়া হয়ে থাকত না, দুজনে মিলেই বাবার পাহাড়টিকে পাথর দিয়ে সাজিয়ে ফেলতুম। এই পাথর খুঁজতে খুঁজতে আর একদিন একটা জিনিস খুঁজে বার করেছিলুম। দেখলুম, মাটি চুঁইয়ে একটা খুব বড় গর্ত্তে জল জমে আছে, আর সেই জল বালির ভিতর দিয়ে ঝির ঝির করে ঝরণার মত বইছে। বাড়ীতে ফিরেই বাবাকে বললুম—'ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখে এসেছি, জল যেন তক্ তক্ করছে। ঐ জল কিন্তু আনালে বেশ হয়।' বাবা বললেন—'বটে, আচ্ছা আমি আজই ঐ জল তুলে আনাচ্ছি।'—তুমি শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবে, বাবা শুধু আমাকে স্তোক দেননি—লোক দিয়ে সেই জলই আনাবার ব্যবস্থা করলেন। খাবার সময় আমার দিকে চেয়ে বললেন—'চিনতে পারছ ত, তোমার অধিকার করা জলই আমরা পান করছি।' ছোট ছেলের ছেলে-খেলাগুলোকে মেনে নিয়ে বাবা কেমন করে আমার মনটিকে বশ করে ফেলেন, আর সেই সঙ্গে আমার কাছ থেকে ষোল আনা শ্রদ্ধাটুকুও আদায় ক'রে নেন, তাঁর ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারছ ত?

বালিকা এই সময় সহসা জিজ্ঞাসা করিল—তা হ'লে তোমার সব কাজেই তিনি সায় দিতেন, বকতেন না কোন দিন?

কবি কহিলেন—যে ক'মাস তাঁর কাছে ছিলুম, কিছুই আমাকে চাইতে হয়নি, আমার কি চাই আমার চেয়েও তিনি সেটা ভালো করেই জানতেন। তাই আমাকেও তাঁর সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকতে হ'ত—তিনি যেগুলো চান না, তাদের ছায়াও যাতে মাড়াতে না হয়। আমার উপর বিশ্বাস করে কত শক্ত শক্ত কাজের ভার বাবা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। গীতার যে শ্লোকগুলি তিনি রোজ পড়তেন, সেগুলোর গায়ে একটা করে চিহ্ন দিয়ে বাবা আমাকে একদিন বললেন—এই শ্লোকগুলি আর নীচের অনুবাদ বেশ স্পষ্ট অক্ষরে কপি করে ফেল, আমার পড়বার সুবিধে হবে।' এত বড় শক্ত কাজের ভার বাড়ীতে কেউ কখন দিয়েছে আমাকে বলতে পার? তার পর পড়াশোনার যে ব্যবস্থা করলেন—তেমনটি আর দেখিনি। শেষ রাত্তিরে উঠে তিনি উপাসনায় বসতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে উঠে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' মুখস্থ করতুম। স্কুলে যেটি ছিল চক্ষুশূল, বাবার শিক্ষার এমনি গুণ যে, ঐ সময়টিতে বিছানা ছেড়ে ওঠা আর ব্যাকরণ পড়া অভ্যাস হয়ে গেল, এখানে এসেও সে অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। ভোর হতেই বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হ'ত। ফিরে এসে কিছু খেয়েই ইংরেজী পড়া চলতো। ভালো ভালো ইংরেজী বইগুলির শক্ত শক্ত শব্দগুলো বাবা যেন গুলে খাইয়ে দিতেন আমাকে, তাঁর কাছে পড়ায় বিরক্তি আসত না—পড়ার আগ্রহ আরো বাড়তো। রাতে আমাকে নিয়ে আকাশের তারা দেখিয়ে জ্যোতিষ শিখাতেন। ইংরেজী জ্যোতিষের বই থেকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করবার কৌশলটি দেখিয়ে দিয়ে গল্প লেখবার পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন।—এর পরে স্কুলের কয়েদখানায় ঢুকে ওদের বাঁধা-ধরা শিক্ষা কি আমার মনে ধরে কখনো? তাই যাইনে, পালিয়ে বেড়াই।

বালিকা এবার হাসিয়া কহিল—তোমার মতলব এতক্ষণ বুঝেছি, স্কুলের পথ আর মাড়াচ্ছ না। কিন্তু শুনেছ ত, আমি স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। পড়ছি, ছবি আঁকছি, গান শিখছি।

কবিও সহাস্যে উত্তর দিলেন—বেশ ত তুমি যদি পড়াশোনার ওস্তাদ হতে পার, আমি না হয়, তোমারই পোড়ো হব, তুমি পড়াবে।

কবির কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানির দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বালিকা কহিল—আমার কাছে পড়তে হ'লে বকুনি আছেই, তার ওপরে সপাসপ বেত। এই বারান্দার রেলিংগুলোকে নিয়ে গুরুমশাইগিরি মনে আছে ত!

চাপা হাসির ঝলকে পলকে দুইখানি মুখই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।



কালিদাস

৩

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিজল্‌ভ্‌।

ওদিকে রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সভায় বহুক্ষণ কোনও পাণিপ্রার্থীর শুভাগমন হয় নাই; এই অবকাশে সখীদের মধ্যে রঙ্গরস জমিয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারী পূর্ব্ববৎ একটি সখীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া অলস ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন; বিদ্যুল্লতা একটি সুদীর্ঘ ময়ূরপুচ্ছ হাতে লইয়া বেত্রের মত লীলায়িত করিতেছে ও রাজকুমারীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার গানের কথাগুলিতে যে মৃদু ব্যঙ্গ-রস রহিয়াছে, রাজকুমারী তাহা উপভোগ করিতেছেন। সখীরাও কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, কেহ বা ব্যক্তভাবেই কুন্দ-দন্ত বিকশিত করিয়া আছে একটি সখীর অলস অঙ্গুলি আঘাতে ভূমিশয়ান বীণার তন্ত্রী হইতে মুগ্ধ মূর্চ্ছনা গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

লাস্যের চটুল ছন্দে বিদ্যুল্লতা গাহিতেছে—

"আমি হব গুরুমশাই আমার নাগর হবে চেলা
বেত উঁচিয়ে বস্‌ব আমি সন্ধ্যে-সকাল বেলা—"

চতুরিকা মিটি-মিটি কণ্ঠে গান গাহিয়া প্রশ্ন করিল—

"আর রাত্তিরে সই—"

বিদ্যুল্লতা ভ্রূবিলাস করিয়া বাঁকা হাসিয়া গাহিল—

"তখন থাক্‌বে না ক' পাততাড়ি সই থাক্‌বে না ক', বই।"

বনজ্যোৎস্না ভাষ্য করিয়া যোগ করিল—

"শুধু হৃদয় জুড়ে প্রেমের লহর করবে লো থৈ থৈ।"

বিদ্যুল্লতার লাস্যবিলাস আরও দ্রুতচঞ্চল ও মদোন্মত্ত হইয়া উঠিল; চৈতালী ঘূর্ণীর মত মহা উল্লাসে রাজকুমারীর চারি পাশে আবর্ত্তন করিতে করিতে সে গাহিল—

'দুটি গুরু-চেলায় মনের মিলে খেলব প্রেমের খেলা।"

সহসা বাধা পড়িল। কয়েকটি সখী দূরে মহামন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বিদ্যুল্লতার দিকে উৎকণ্ঠ হইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—স্‌স্‌স্—! স্‌স্‌স্‌!

বিদ্যুল্লতা ঘাড় ফিরাইয়া একবার দ্বারের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিয়াই থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। রাজকুমারী ঈষৎ চকিতভাবে দ্বারের দিকে আয়ত চক্ষু ফিরাইলেন।

প্রধান দ্বার দিয়া মহামন্ত্রী কালিদাসকে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। কালিদাসের চোখে মুখে অকুণ্ঠ বিস্ময়; মাঝে মাঝে কোনও একটি সুন্দর কারুকার্য্য দেখিয়া তাঁহার অন্তর গতি [illegible] হইয়া যাইতেছে; মহামন্ত্রী তাঁহার বাহু স্পর্শ করিয়া আবার তাঁহাকে সম্মুখে পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমে উভয়ে দ্বিতীয় বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালিদাস সম্মুখস্থ যুবতীযূথের প্রতি স্মিত বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

সখীরাও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সহস্রচক্ষু হইয়া এই শিরস্ত্রাণধারী পরম সুন্দর যুবাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। রাজকুমারী একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাঁহার মুখের নিরুৎসুক ঔদাসীন্য যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এমন কান্তিমান পাণিপ্রার্থী ইতিপূর্ব্বে স্বয়ংবর সভায় পদার্পণ করেন নাই।

মহামন্ত্রী মহাশয় একবার গলা-ঝাড়া দিয়া দক্ষিণ হস্তখানি অভয়মুদ্রার ভঙ্গীতে তুলিলেন।

মহামন্ত্রী: স্বস্তি।—পরম ভট্টারক শ্রীমান সৌরাষ্ট্রকুমার রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছেন। শুভমস্তু।

রাজকুমারী দুই করতল যুক্ত করিয়া প্রণাম করিলেন; চোখ দুটি ঈষৎ উঠিয়া আবার নত হইল। বাহিরে কিছু প্রকাশ না পাইলেও তিনি যেন অন্তরে অন্তরে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, জোয়ারের জলস্পর্শে ঘাটে-বাঁধা তরণীর মত।

এদিকে মহামন্ত্রী কালিদাসকে চক্ষু-দ্বারা ইসারা করিতেছেন মাথা হইতে শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিতে; কিন্তু কালিদাস ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রী তখন তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিলেন; কালিদাস তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ওটা রাখিবেন কোথায়? এদিক ওদিক স্থান না দেখিয়া শেষে মহামন্ত্রীর হাতে উহা ধরাইয়া দিয়া সহাস্য মুখে রাজকুমারীর দিকে ফিরিলেন।

কালিদাসের শিরস্ত্রাণ-মুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যুবতীদের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, তাহারা নিঃশ্বাস সম্বরণ করিয়া দেখিতেছিল; এক ঝাঁক চঞ্চল খঞ্জন যেন কোন্‌ মায়াবীর মন্ত্রকুহকে স্থির চলৎশক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। শেষে মৃগশিরা আর থাকিতে না পারিয়া পাশের সখীর কানে কানে বলিল—

মৃগশিরা: কী চমৎকার চেহারা ভাই, রাজকুমারের! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প!—এমন আর কখনো দেখেছিস্‌?

আশেপাশের দুই-তিন জন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—স্‌স্‌স্—।

চতুরিকা রাজকুমারীর মনের ভাব বুঝিয়াছিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

চতুরিকা: মহেশ্বরের কাছে মানত কর, এবার যেন না ফস্কায়—

রাজকুমারী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া তাহাকে পাশে সরাইয়া দিলেন। চতুরিকা বড় প্রগল্‌ভা।

প্রশ্ন করিতে বিলম্ব হইতেছে; সৌরাষ্ট্রকুমারকে কতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা যায়? মহামন্ত্রী আর একবার গলা-ঝাড়া দিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রী: রাজকুমারী, কুমার-ভট্টারক নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, আপনার প্রশ্ন করুন।

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন। কালিদাসের সহিত তিনি ঠিক মুখোমুখি-ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন না, একটু পাশ ফিরিয়া ছিলেন। এখন মনোরম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে তিনি একবার কালিদাসের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তারপর আবার সম্মুখ দিকে চাহিয়া অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী: প্রথম প্রশ্ন হচ্চে—জগতে সব চেয়ে শক্তিমান কী?

সখীরা এতক্ষণ একদৃষ্টে রাজকুমারীর পানে চাহিয়াছিল, এখন যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিতবৎ একসঙ্গে কালিদাসের পানে মুণ্ড ফিরাইল।

কালিদাস কিন্তু ইত্যবসরে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন; চারিদিকে এত অহার্য বৈচিত্র্য ছড়ানো রহিয়াছে যে, চক্ষু বিভ্রান্ত হইলে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি কুমারীর প্রশ্ন করার ব্যাপারটা ভালরূপ অনুধাবন করিয়াছিলেন কি-না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। মহামন্ত্রী তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন ইহা সৌরাষ্ট্রদেশীয় রসিকতার একটা অঙ্গ। তিনি সসম্ভ্রমে প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া কালিদাসের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—

মহামন্ত্রী: কুমারীর প্রশ্ন হচ্চে, জগতে সব চেয়ে শক্তি-মান কী?

কালিদাসের চক্ষুযুগল এই সময় বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাবে ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল; হঠাৎ তাঁহার মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। ত্রাসবিস্ফারিত নেত্র ঊর্দ্ধে রাখিয়াই তিনি একটি বাহু পাশে বাড়াইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহাকে দুই হস্তে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আলিসার পানে তাকাইতে লাগিলেন।

ঊর্দ্ধে আলিসার উপর যে হাব্‌শী রক্ষীযুগলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়াই যে কালিদাসের ঈদৃশ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী উত্যক্ত হইয়া ভাবিলেন, সৌরাষ্ট্রদেশের রাজকীয় রসিকতা ক্রমশ চরমে উঠিতেছে। গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি বলিলেন—

মহামন্ত্রী:—প্রশ্নের উত্তর দিন কুমার!—

ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পাইল না; হাব্‌শী-যুগল ইত্যবসরে যুদ্ধাভিনয় শেষ করিয়া আবার শান্তভাবে বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালিদাস কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মহামন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিলেন। বৃদ্ধ কণ্ঠের ঘর্ম মুছিতে মুছিতে পুনশ্চ বলিলেন—

মহামন্ত্রী: এইবার প্রশ্নের উত্তর, কুমার—।

কিন্তু কালিদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বেই রাজকুমারী কথা কহিলেন; বীণার ঝঙ্কারের মত ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী: প্রথম প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেয়েছি।

সকলে অবাক। উত্তেজিত সখীর দল রাজকুমারীকে জাল করিয়া ঘিরিয়া ধরিল। চতুরিকা বলিয়া উঠিল—

চতুরিকা: অ্যাঁ—কী উত্তর পেলে?

কুমারীর গাল দুটি একটু অরুণাভ হইল। তিনি ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী: প্রশ্নের উত্তর হচ্চে—ভয়। কুমার অভিনয় দ্বারা যথার্থ উত্তর দিয়েছেন।

সখীগণ সশব্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া কালিদাসের দিকে ফিরিল।

কালিদাস মহামন্ত্রীর পানে চাহিয়া ঈষৎ বিহ্বলভাবে হাসিতেছেন, কোন্ দিক দিয়া কি হইয়া গেল, যেন ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রীও যেন কতকটা বোকা বনিয়া গিয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন।

রাজকুমারী কথা কহিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে একটু উদ্বেগ দেখা দিয়াছে; কি জানি কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিবেন কি না! কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর তেমনি সংযত ও আবেগহীন রহিল।

রাজকুমারী: এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে?

প্রশ্ন করিয়াই রাজকুমারী কালিদাসের দিকে একটি উৎকণ্ঠা-মিশ্র দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন।

কালিদাস এবার প্রস্তুত ছিলেন; প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মহামন্ত্রীর প্রতি কৌতুক-কটাক্ষ পাত করিয়া তর্জ্জনী তুলিলেন, যেন মহামন্ত্রীকে ইঙ্গিতে বলিতে চাহিলেন যে, এ প্রশ্নের সমাধান তো পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে! তার পর বিজয়দীপ্ত চক্ষে রাজকুমারীর দিকে ফিরিয়া দুইটি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন—

কালিদাস: দ্বন্দ্ব—দুই!

সখীরা একাগ্র দৃষ্টিতে কালিদাসের দিকে চাহিয়াছিল, এখন যন্ত্র-চালিতবৎ রাজকুমারীর পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

রাজকুমারীর চোখে চকিত আনন্দ খেলিয়া গেল; তিনি রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিলেন। চতুরিকা উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

চতুরিকা: কি হ'ল—ঠিক হয়েছে?

রাজকুমারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বোধ করি নিজের উদ্গত হৃদয়বৃত্তি সম্বরণ করিয়া লইলেন, তারপর ধীরস্বরে কহিলেন।

রাজকুমারী: কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন—দ্বন্দ্ব হয় দুয়ের মধ্যে।

সভাকক্ষের ভিতর দিয়া উত্তেজনার একটা ঝড় বহিয়া গেল। সখীরা

প্রায় সকলেই একসঙ্গে কলকূজন করিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ 'স্‌স্‌—' শব্দের শাসনে নীরব হইল ? উত্তেজনায় মৃগশিরা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল ; বনজ্যোৎস্না ভূলুণ্ঠিত বীণাটার উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাহার মর্মতন্ত্র হইতে যন্ত্রণার কাকুতি বাহির করিল ; বিদ্যুল্লতার নীবিবন্ধ খুলিয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ সেইদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সে ব্যাকুলভাবে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া সকলের পিছনে লুকাইল। রাজকুমারী সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীহারশুভ্র উর্ণাটি ভাল করিয়া নিজ দেহে জড়াইয়া লইলেন।

বুড়া মহামন্ত্রীর গায়েও বোধ হয় উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিলেন—

মহামন্ত্রী : ধন্য কুমার ! ধন্য কুমার ! আপনি দুটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন ! এবার শেষ প্রশ্ন ! মাত্র একটি প্রশ্ন বাকি—

এই সব উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে কালিদাস কিন্তু অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে একদিকে তাকাইয়া আগ্রহ সহকারে দেখিতেছিলেন। স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে শুক-সারী পক্ষী দুটি তাঁহার সকৌতুক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই রাজকুমারী যখন তৃতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিলেন তখন তাহা কালিদাসের কানে গেল কি-না সন্দেহ।

যিনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাঁহার কোনও উৎকণ্ঠাই নাই, কিন্তু রাজকুমারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল না। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না। কুমার যদি শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন অথচ রাজকুমারীর মনের পক্ষপাত প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে বড় লজ্জার কথা হইবে। কুমারী যথাসম্ভব স্থিরকণ্ঠে কথা বলিলেন ; তবু গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

রাজকুমারী : শেষ প্রশ্ন—পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট কি ?

যুবতীবৃন্দ যুগপৎ কালিদাসের পানে চক্ষু ফিরাইল।

কালিদাস ফিক্ করিয়া হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কথা নাই, চক্ষু সারী-শুকের উপর নিবদ্ধ। রাজকুমারী ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন—কালিদাস অন্যদিকে তাকাইয়া আছেন ; তাঁহার মুখে ক্ষণিক ক্ষোভের ছায়া পড়িল। পরক্ষণেই কালিদাস সমুচ্চ কলহাস্যে সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাস : দ্যাখো দ্যাখো—ঐ দ্যাখো—!

সকলেই একসঙ্গে তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া তাকাইলেন। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয় ; দণ্ডের উপর বসিয়া সারী-শুক অর্ধ-মুদিত চক্ষে পরস্পর চঞ্চু-চুম্বন করিতেছে ; তাহাদের কণ্ঠ হইতে গদ্‌গদ মৃদু কূজন নির্গত হইতেছে। যিনি অবিলম্বে লিখিবেন—'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াম্ স্বামনুবর্তমানঃ—' তিনি এই দেখিয়াই বিহ্বল আত্মবিস্মৃত !

রাজকুমারীর চক্ষে কিন্তু আনন্দের বিজলী খেলিয়া গেল। তিনি কালিদাসের পানে সভ্রূভঙ্গ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সলজ্জ রক্তিম মুখখানি নত করিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস হাসিতে হাসিতে রাজকুমারীর দিকে ফিরিতেছিলেন ; তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন, রাজকুমারী ধীরে ধীরে নতজানু হইতেছে। যুক্তকরে শির অবনমিত করিয়া কুমারী অর্দ্ধ স্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী : আর্য্যপুত্র শেষ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন ; পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট—প্রণয়।

ক্ষণকালের বিস্ময় বিমূঢ়তা কাটিয়া যেন শতছিন্ন হইয়া গেল। সখীরা আর সম্ভ্রম শালীনতার শাসন মানিল না ; চীৎকার হুড়াহুড়ি অঞ্চল-উত্তরীয় উৎক্ষেপে তাহাদের প্রমত্ত জয়োল্লাস একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইতেই চার-পাঁচজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিল। কয়েকজন মুঠি মুঠি লাজ লইয়া সকলের মাথার উপর বৃষ্টি করিতে লাগিল। একজন ঘন ঘন শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর হাত ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল ; অন্য কয়জন পরস্পর আঁচল ধরিয়া টানিয়া, কবরী খুলিয়া দিয়া কপট-কলহে হৃদয়াবেগ লাঘব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহামন্ত্রী কালিদাসের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—

মহামন্ত্রী : ধন্য কুমার ! ধন্য আপনার কুট-বুদ্ধি !—আমি মহারাজকে সংবাদ দিতে চললাম।

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বিস্রস্তকুন্তলা চতুরিকা বেদীর কিনারায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত নাড়িয়া উপরিস্থিত একজন হাব্‌শী রক্ষীকে ইসারা করিতেছিল ; মুখের সম্মুখে সম্পুটিত করপল্লব যুক্ত করিয়া জানাইতেছিল—শিঙা বাজাও, বিষাণ বাজাও—নগরীকে সংবাদ দাও রাজকুমারী পতি-বরণ করিয়াছেন !

হাব্‌শী হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া ঘন ঘন ঘাড় নাড়িল ; তারপর ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

সভাগৃহের বহিঃপ্রাচীরে বহু ঊর্দ্ধে একটি অলিন্দযুক্ত গবাক্ষ। গবাক্ষে হাব্‌শী-রক্ষীকে দেখা গেল। সে তূর্য্য মুখে তুলিয়া মন্দ্র-রবে শুভবার্তা ঘোষণা করিল।

কাট্।

রাজভবনের তোরণ-শীর্ষে মন্দিরাকৃতি ঘটিকাগৃহ ; ইহা রাজ্যের প্রধান মান-মন্দির। ঘটিকাগৃহের এক বাতায়নে দাঁড়াইয়া একজন প্রহরী উৎকর্ণভাবে দূরাগত তূর্য্য-ধ্বনি শুনিতেছে।

তূর্য্য-ধ্বনি বীয়্যহ হইলে প্রহরী একটি বাঁকা বিষাণ মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। বিষাণ হইতে যে শব্দ-তরঙ্গ নিঃসৃত হইল তাহা তূর্য্য-ধ্বনি অপেক্ষা গম্ভীরতর ও দূর-ব্যাপক।

কাট্।

নগর মধ্যে একটি উচ্চ জয়স্তম্ভ। স্তম্ভ চূড়ায় চারিজন বংশীবাদক চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া বংশীতে ফুৎকার দিতেছে, দিকে দিকে আনন্দবার্ত্তা বিঘোষিত হইতেছে।

স্তম্ভমূলে মদনোৎসব-প্রমত্ত নাগরিক-নাগরিকা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে ও বাহু আস্ফালন করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে।

কাট্।

সভাগৃহে সখীদের প্রমোদ বিহ্বলতা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েকটি প্রগল্‌ভা সখী ছুটিয়া গিয়া কালিদাসের দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া রাজকুমারীর পাশে দাঁড় করাইয়া দিল; তারপর সকলে মিলিয়া সনৃত্য ভঙ্গীতে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতে আরম্ভ করিল—

"ফাগুনের পূর্ণিমাতে
এ কি চাঁদের মেলা
নয়নের পিচ্‌কারিতে
সখি রঙের খেলা।—"

কাট্।

নগরোদ্যানের দৃশ্য। চারিদিকে নানা জাতীয় উৎসব চলিয়াছে। একজন বাজীকর দীর্ঘ বংশদণ্ডের শিখরে উঠিয়া চক্রবৎ ঘুরপাক খাইতেছে। অন্যত্র দুইজন অসি-যোদ্ধা অসিক্রীড়ার বিচিত্র কৌশল দেখাইয়া চমৎকৃত নাগরিকদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। মদন-মন্দির ঘিরিয়া একদল তরুণী নাগরিকা গরবা নৃত্য করিতেছে; তাহাদের কটি-ধৃত ধাতু-কলসের উপর অঙ্গুরীয়ের সমকালীন আঘাত নৃত্যের তাল রক্ষা করিতেছে—

"অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগাও অনঙ্গ
বুকের মাঝে বহাও সুখ-তরঙ্গ—"

কাট্।

নগরোদ্যানবেষ্টনকারী পথের উপর দিয়া এক সুসজ্জিত হস্তী চলিয়াছে, চারিদিকে বিপুল জনতা। হস্তী-পৃষ্ঠে আসীন ঘোষক চীৎকার করিয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বোধ করি রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সংক্রান্ত কোনও রাজকীয় বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু জনতার বিপুল আসরে কিছুই শুনা যাইতেছে না। ঘোটকের পশ্চাতে বসিয়া দ্বিতীয় এক পুরুষ মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চারিদিকে ছড়াইতেছে। নিয়ে সোনা কুড়াইবার হুড়াহুড়ি মারামারি।

ডিজল্‌ভ্।

রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে দীপান্বিতা নগরী। সৌধে সৌধে দীপমালা; গীতবাদ্যে, সুগন্ধি অগুরু ধূমে বাতাস আমোদিত।

সর্ব্বাঙ্গে দীপালঙ্কার পরিয়া রাজপুরী সখিপরিবৃতা প্রধানা নায়িকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাত্রি যত গভীর হইতেছে উৎসবের চাঞ্চল্য ততই মন্থর রসঘন হইয়া আসিতেছে; নায়ক-নায়িকার নিভৃত মিলনের আর বিলম্ব নাই।

নগরীর এক মদিরাগৃহের সম্মুখে একদল মশালহস্ত উৎসবকারী সৌরাষ্ট্রের প্রকৃত রাজকুমারকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল এবং প্রমত্ত রঙ্গ-কৌতুকের অঙ্কুশে বিঁধিয়া তাঁহাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সৌরাষ্ট্রকুমার দীর্ঘ বনপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র নগরে পৌঁছিয়াছেন; অঙ্গের বসন ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত, জঠরে জ্বলন্ত ক্ষুধা—তাঁহার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, কেহই তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল না।

সৌরাষ্ট্রকুমার: (উত্তপ্ত কণ্ঠে) আমি বল্‌ছি আমিই সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার!

এক ব্যক্তি: (মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া) তা তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছ—আমরাও শুনে আসছি, কিন্তু তার প্রমাণ কই বাছাধন?

রাজকুমার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, উদ্ধত স্বরে কহিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: প্রমাণ! প্রমাণ আবার কি?—দেখতে পাচ্ছ না আমি রাজকুমার?

বলিয়া তিনি বুক ফুলাইয়া গর্ব্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। সকলে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে একজন সান্ত্বনার সুরে বলিল—

দ্বিতীয় ব্যক্তি: আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার।—কিন্তু যার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হ'ল, সে তবে কে?

সৌরাষ্ট্রকুমার এবার একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন; ফেনায়িত মুখে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: সে—সে একটা কাঠুরে। চোর—প্রতারক—বাট্‌পাড়; আমার কাপড়-চোপড় ঘোড়া—সব চুরি ক'রে পালিয়েছে—

আবার উচ্চ হাস্যে তাঁহার কথা চাপা পড়িয়া গেল; রাজকুমার নিষ্ফল ক্রোধে দন্ত কিড়িমিড়ি করিতে লাগিলেন।—হাসি মন্দীভূত হইলে প্রথম ব্যক্তি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল—

এক ব্যক্তি: সত্যি কথা বলতে কি চাঁদবদন,

তোমাদের মধ্যে কাঠুরে যদি কেউ থাকে তো সে তিনি নয়—তুমি! বলি, ক'ঘড়া তালের রস চড়িয়েছ?

সকলে হাসিল। রাজকুমার দেখিলেন এখানে কিছু হইবে না; তিনি রূঢ়হস্তে ভিড় সরাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন।

সৌরাষ্ট্রকুমার: ছেড়ে দাও—সরে যাও। আমি দেখে নেব সেই কাঠুরেটাকে—শূলে দেব! কোথায় যাবে সে?—একবার তাকে দেখতে চাই!

তাঁহার কণ্ঠস্বর জনতার বাহিরে মিলাইয়া গেল। প্রথম ব্যক্তি নীরস মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

এক ব্যক্তি: কী আর দেখবে যাদু! তিনি এতক্ষণ রাজকুমারীকে নিয়ে বাসরশয্যায় শুয়েছেন।

আবার হাসির লহর ছুটিল।

ওয়াইপ্।

রাজ-ভবনভূমির মধ্যে একটি সরোবর। সরোবরের দর্পণে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

বাঁধানো ঘাটের পাশে মর্ম্মর বেদী; তাহার উপর কালিদাস ও রাজকন্যা পাশাপাশি বসিয়া আছেন। নব পরিণয়ের পীত সূত্র তাঁহাদের মণিবন্ধে জড়ানো রহিয়াছে। রাজকন্যার হাতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য নির্ম্মিত তীর—যাহা পরবর্ত্তী কালে কাজল লতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজকুমারী নতমুখে বসিয়া তীরটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন; কালিদাস মুগ্ধ উন্মন দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাঁদের পানে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ কোনও কথাবার্ত্তা নাই। তারপর কালিদাস একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

কালিদাস: কী সুন্দর চাঁদ। ঠিক যেন—ঠিক যেন—

যে উপমাটি খুঁজিতেছিলেন কালিদাস তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না? রাজকুমারী মুখখানি একটু তুলিয়া স্মিত সলজ্জ মুখে বলিলেন—

রাজকুমারী: ঠিক যেন—?

কালিদাস ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িলেন।

কালিদাস: জানি না—মনে আসছে, মুখে আসছে না—

রাজকুমারী ঈষৎ নিরাশ হইলেন, নব অনুরাগের আকাঙ্ক্ষায় যে সুমিষ্ট উপমাটি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা কালিদাসের কণ্ঠে আসিল না।

এই সময় সহসা একটি বিকট শব্দ শুনিয়া রাজকুমারী চমকিয়া উঠিলেন।

শব্দটি আসিল প্রাসাদ বেষ্টনকারী প্রাচীরের পরপার হইতে। প্রাচীরের বাহিরে রাজপথ গিয়াছে; সেই পথ বাহিয়া এক শ্রেণী ভারবাহ উষ্ট্র চলিয়াছিল। একটি উষ্ট্র বোধ করি প্রাচীরের উপর হইতে গলা বাড়াইয়া অদূরে নবদম্পতীকে দেখিতে পাইয়া সহসা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল।

ভয় পাইয়া রাজকুমারী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কালিদাস ভারি কৌতুক অনুভব করিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর শিরীষ-কোমল হস্তে একটু সস্নেহ চাপ দিয়া বলিলেন—

কালিদাস: ভয় নেই রাজকুমারী; ও একটা উট—যাকে সাধু ভাষায় বলে—উট্র!

সাধুভাষা বলিয়া কালিদাস উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু রাজকুমারীর মুখে সংশয়ের ছায়া পড়িল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারী: কি—কি বললেন আর্য্যপুত্র?

কালিদাস দেখিলেন ভুল হইয়াছে; তিনি তাড়াতাড়ি ভুল সংশোধন করিলেন—

কালিদাস: না না—উট্র নয় উট্র নয়—উষ্ট!

রাজকুমারীর মুখ শুকাইয়া গেল; শঙ্কিত সন্দেহে কালিদাসের পানে চাহিয়া থাকিয়া তিনি আপনার অবশে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী:—উট্র—উষ্ট—!

তারপর চকিতে তাঁহার মুখের মেঘ কাটিয়া গেল; কালিদাস আজ প্রথম হইতে যে-ভাবে আচরণ করিয়াছেন তাহা মনে পড়িয়া গেল। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাজকুমারী: ওঃ! আর্য্যপুত্র পরিহাস করছেন!—কী পরিহাস-প্রিয় আপনি!

কালিদাসও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি উত্তর দিলেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় তোরণের ঘটিকাগৃহ হইতে মধ্য রাত্রির প্রহর বাজিল। ক্ষণস্থায়ী রাগিণীর আলাপ বন্ধ হইলে কালিদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—

কালিদাস: ও কি?

রাজকুমারীর চোখে আবার বিস্ময়-মিশ্র সন্দেহ দেখা দিল। রাজপুরীতে প্রহর বাজে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ তাহাও জানেন না? না, ইহাও পরিহাস?

রাজকুমারী: মধ্যরাত্রির প্রহর বাজল।

কালিদাস: ওহো—! বুঝেছি। রাত দুপুর হয়েছে।—এবার চল, ভেতরে যাই।

কালিদাস অকুণ্ঠ সহজতায় রাজকুমারীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। রাজকুমারীর সংশয় আবার দূর হইল। এমন স্বচ্ছন্দ আভিজাত্য, এমন অনিন্দ্যকান্তি রাজপুত্র নহিলে কি সম্ভব?

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া শয়ন-ভবনের দিকে চলিলেন।

কাট্।

ক্রমশঃ

মহামন্ত্র

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মহামন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদের ধর্ম্মজীবনে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চৈতন্যভাগবতে এইরূপ উল্লেখ আছে—

"আপনি সবারে প্রভু কয়ে উপদেশে।
হরিনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা নিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥" চৈঃ ভাঃ, মধ্য ২৩।

সুতরাং ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদেশ। ইহা এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জপমন্ত্র। কিন্তু সমগ্র হিন্দু সমাজেরই এই মন্ত্রের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ ইহাকে শুধু মহামন্ত্র বলা হয় নাই, তারকব্রহ্ম নামও বলা হইতেছে (১)। তারকব্রহ্ম নাম বলিতে কিন্তু সাধারণ হিন্দুরা বুঝিত অন্য নাম। তাহা ছয় অক্ষর যুক্ত "ওঁ রামায় নমঃ" (২); এই নাম বত্রিশ অক্ষরের হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম নয়। কাশীতে যেমন ছয় অক্ষরের নাম মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে দেওয়া হয়, এখন নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সেইরূপ বত্রিশ অক্ষরের নামও শুনানো হয়। ক্রমে এই প্রথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাজা রামমোহন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই নূতন আচারপদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন (৩)। তাঁহার পর অনেকেই এই স্রোত ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মহামন্ত্রের বহুল প্রসার ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অবশ্যই ইহার নিগূঢ় কারণ আছে। সসঙ্কোচে আমরা তাহারই কিছু আলোচনা করিব। আমাদের আলোচনায় পাণ্ডিত্যের কোনো অবকাশ নাই।

কোনো সম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু জানিতে চেষ্টা করিলে সেই সম্প্রদায়ে প্রচলিত গ্রন্থাদি দেখিতে হয়। তাহা ছাড়াও দেখিতে হয় সেই সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও মহাজনগণের কাজ ও কথা। বিশেষতঃ "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" যে সম্প্রদায়ের আচার্য্যের আদর্শ, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মহামন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ইহা করিতেই হইবে। সকল সম্প্রদায়ই পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার ও অনুষ্ঠানকে সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন। আমাদের এই নানা মুনির দেশে এক সম্প্রদায়ের সদাচার অন্য সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা পায় না। কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

বাঙ্গালাদেশে গৌরাঙ্গপ্রভু এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। স্বয়ং রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যদেবের মুখবিনিঃসৃত হরেকৃষ্ণ নামাবলী জগৎবাসীকে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করুক" (৪) ইহা তাঁহারই গ্রন্থে আছে। তবে গৌরাঙ্গপ্রভু এই মহামন্ত্রের স্রষ্টা নহেন। তন্ত্র ও পুরাণে বহুকাল হইতে এই মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহার গ্রহণ পদ্ধতি ও উল্লেখ আছে। গৌরাঙ্গপ্রভু কিন্তু সে সব পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে পালন করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা জানা যায় না। আমরা তাহার কারণ অনুমান করিতে পারি মাত্র। বেদাচারে যাহাদের অধিকার নাই সেই স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুগণকে উদ্ধারের উপায় তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রত্যেক যুগাবতার সেই যুগের উপযুক্ত বিশেষ উপাসনা প্রচার করেন (৫)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া থাকেন এবং বলেন যে জীবকে নিস্তার করিতেই এই কৃপা-অবতার। পঞ্চতত্ত্বে মিলিয়া তিনি অবতীর্ণ হন (৬)।

---

(১) "নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥"—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

(২) ইহা একটি শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত্যুকালে মহাদেব প্রত্যেকের কর্ণে এই মন্ত্র দেন। তাহাতে মৃতব্যক্তি মোক্ষলাভ করে।

"ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে।
যে ভুঞ্জন্তি চ মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্নসংশয়ঃ॥"—পদ্মপুরাণ

(৩) "গোস্বামীর সহিত বিচার" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি, বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥
লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্ব, ৫।

(৫) "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃশ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥
উপাসনা বিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥"—ঐ ১০১।

(৬) "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"
—রূপগোস্বামীর কড়চা।

"পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
* * *
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
* * *

কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে এই মহামন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাক্। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর আকারে কলিসন্তরণ উপনিষদে ইহা প্রথমে দেখা যায়! যেহেতু ইহা উপনিষদ, সুতরাং বেদবাক্য এবং সর্ব্বপ্রাচীন—অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। দ্বাপরের শেষে নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন—কি করিয়া কলি সন্তরণ করা যায়। ব্রহ্মা বলেন, কলিকলুষ নাশের একমাত্র উপায়—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—এই নাম গ্রহণ, সর্ব্ব বেদের মধ্যে আর কোনো উপায় নির্দ্দিষ্ট নাই। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—এই নামগ্রহণের বিধি কি? ব্রহ্মা বলিলেন—এই নামগ্রহণে কোনো শুচি-অশুচি বিচার বা বিধি নাই, ইহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিবে এবং সাড়ে তিনকোটি নাম জপের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতেও উদ্ধার পাইবে (৭)।

সুতরাং দেখা গেল—গৌরাঙ্গপ্রভু দ্বারা প্রচারিত মহামন্ত্র কলিসন্তরণের অনুরূপ নয়। কলিসন্তরণ উপনিষদে হরেরাম প্রভৃতি আটটি নাম প্রথমে এবং হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি আটটি নাম পরে আছে। গৌরাঙ্গপ্রভু দ্বারা প্রচারিত মহামন্ত্রে হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রথমে—হরেরাম প্রভৃতি পরে বলা হয়। বুৎক্রমে বলিলে সকল মন্ত্রেরই শেষের চরণ আগে যায় এবং আগের চরণ শেষে আসে। কিন্তু ঋগ্বেদের অনুশাসন "বাক্য নিয়মাৎ" এই জৈমিনী সূত্রের সায়ন ভাষ্যতে আছে যে বেদমন্ত্র পাঠ কালে ক্রমভঙ্গ নিষেধ। গৌরাঙ্গপ্রভু এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি"। সুতরাং মহাপ্রভু আর কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রচারিত মহামন্ত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন।

একখানি তন্ত্রে ও একখানি পুরাণে এই বত্রিশ অক্ষর ষোল নামের বিবরণ পাওয়া যায়। দুইটিতেই প্রথমে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি আছে। তন্ত্রখানির কথাই আগে আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার নাম রাধাতন্ত্র। পার্ব্বতী শিবকে রাধাতন্ত্র প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহাতে বাসুদেবের সাধন রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরা দেবী বাসুদেবকে বলিতেছেন—পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য শক্তির সহিত সংযোগ কর ও ভোগযুক্ত হইয়া জপকর্ম্ম কর। দেবী তৎপরে দীক্ষার প্রথা ও মন্ত্র বলিলেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে; এই মন্ত্র দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ এই নাম না শুনিলে কর্ণশুদ্ধি হয় না। ইহার ঋষি বাসুদেব, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী। ষোলবর্ষ সময়ে কৌল গুরুর নিকট কৌল দীক্ষা লইয়া শিবোক্ত কৌল বিধি পালন করিবে, তাহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। প্রথমে ছন্দ পরে মন্ত্র শ্রবণের ব্যবস্থা বলিয়াছেন। তৎপরে তন্ত্রমতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে, তাহা শিবশক্তিজ্ঞাপক। যে দ্বিজ এই মন্ত্রের আদিতে ও শেষে প্রণব যুক্ত করিয়া দশবার জপ করিবেন, তিনি মহাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান হইবেন। শূদ্র বা শূদ্রাণীর নিকট এই মন্ত্র বা দীক্ষা লইলে সে শতলক্ষবর্ষ নরকগামী হয়। আর সেই গুরুশিষ্য উভয়ে মন্ত্রাক্ষর সমসংখ্যক (৩২টি?) ব্রাহ্মণ হত্যার পাপভাগী হয়। এই মন্ত্রটি সর্ব্বত্র বলা চলে, মোটেই গোপ্য নয়। এই মহাবিদ্যা শুচি অশুচি অবস্থায়, যাইতে যাইতে বসিয়া শুইয়া সর্ব্বদাই ধ্যান করা চলে। দেবী বাসুদেবকে বলিতেছেন—কিন্তু কুলাচাররত হইয়া আরাধনা কর, নতুবা তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। বাসুদেব তাহার পর রাধার সহিত কুলাচার ও কালিকা পূজা করিয়া কুণ্ডসিদ্ধি, যোনিসিদ্ধি ও স্বয়ম্ভুসিদ্ধি লাভ করেন (৮) ইত্যাদি।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
* * *
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত আদি, ৭ম পঃ

(৭) "ওঁ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণাংজগাম—কথং ভগবান—গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। সহোবাচ ব্রহ্মাসাধু পৃষ্ঠোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতি-রহস্যগোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলি সংসারং তরিষ্যতি। ভগবত আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেন নির্ধূত কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ প্রচ্ছন্ তন্নাম কিমিতি? সহোবাচ হিরণ্যগর্ভ :—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। ইতি ষোড়শনাম্নাং কলিকল্মষনাশনং নাতঃ পরোতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে। ইতি ষোড়শ-কলাবৃতস্য জীবস্যাবরণ বিনাশনং। পুনর্নারদ প্রপচ্ছ ভগবন্ কোঽস্য বিধিরিতি? তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং স্বরূপতাং সমীপতাং সাযুজ্যতামেতি। যদাস্য ষোড়শকাস্য সার্দ্ধত্রিকোটিং জপতি তদাব্রহ্মহত্যা তরতি।"—কলিসন্তরণ উপনিষদ।

(৮) রাধাতন্ত্রে বাসুদেবের উক্তি—

শৃণুমাতর্মহামায়ে বিশ্ববীজস্বরূপিণি।
হরিনামো মহামায়ে ক্রমংবদ সুরেশ্বরি॥

দেবীর উক্তি

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদং।
শৃণুচ্ছন্দঃ সুতশ্রেষ্ঠ হরিনাম্নঃ সদৈব হি॥
ছন্দোহি পরমংগুহ্যং মহৎপদমনব্যয়ং।
সর্ব্বশক্তিময়ং যন্ত্রং হরিনাম্নঃ তপোধন॥
হরিনাম্নোঽস্য মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃস্মৃতঃ।
গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা॥
মহাবিদ্যা সুসিদ্ধার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ॥ ২।৩২॥
শ্রুত্বাদ্বিজমুখাৎপুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন।
আদৌচ্ছন্দ সুতোমন্ত্রং শ্রুত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
দ্বাদশাভ্যন্তরে শ্রুত্বা কর্ণশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ২।৩৩॥

আমরা দেখিতেছি রাধাতন্ত্রের এই মত গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রচলিত নাই। তাঁহাদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি এই ষোল নাম কর্ণশুদ্ধি মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রথমে ও শেষে প্রণব সংযুক্ত করিয়া তাহা প্রদানের রীতি নাই। বৈষ্ণব সমাজে এমন কোনো নিয়ম নাই যে কোনো শূদ্রশ্রেণীর লোক বৈষ্ণব হওয়ার পর তিনি মন্ত্রদান করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণবেরা হোম করিয়া মন্ত্র দেন না, এজন্য ঋষি-ছন্দ-দেবতার কোনো প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণবেরা কুলাচার মানেন না, অষ্ট-সিদ্ধিও চান না। তবে ইদানীং বৈষ্ণব সমাজে অনেক বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ গোস্বামী নাম লইয়া মিশিতেছেন। তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদ আনিতেছেন এবং কর্ণশুদ্ধি মন্ত্র দিতে কখন কখন হোমও করেন। তবে প্রণব সংযুক্ত করিয়া স্ত্রী শূদ্রকে মন্ত্র দান করেন না।

একখানি পুরাণে এই হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোল নামের উল্লেখ আছে। তাহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পুরাণ বলিয়া ইহা ব্যাসদেবের লেখা বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডের নাম 'রাধা-হৃদয়।' লোমহর্ষণ ঋষিকে বেদব্যাস এই আখ্যান বলেন। কলিতে ব্রাহ্মণগণ তপস্যাভ্রষ্ট হইবে, শূদ্রেরা স্বধর্ম নষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার গ্রহণ করিবে; রাজা প্রজা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিবে (১।৫৩-৮৮)। এইরূপ বহু প্রকার বর্ণনার পর বৃকভানুর আরাধনায় রাধা কিভাবে আবির্ভূত হন তাহা বলা হইয়াছে। রাধাহৃদয় (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে) ও রাধাতন্ত্রে তাহার একই প্রকার বর্ণনা আছে; সাধনফলে গোপরাজ বৃকভানু একটি ডিম্ব পান; তাহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া রাধা (রক্তবর্ণা) অবির্ভূত হন। পত্নী কীর্ত্তিদার অনুরোধে সন্তান কামনায় বৃকভানু কাত্যায়নী আরাধনা করেন। এক শত বৎসর তপস্যার পর আকাশবাণী হইল, তুমি হরিনাম গ্রহণ কর। ক্রতুমুনি বৃষভানুকে হরিনাম প্রদান করিলেন ও নামজপ পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন (৬।৩৮-৫৭)। তাহা—হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষর-যুক্ত ষোল নাম। তাহা দিনে ১০৮ বার করিয়া প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় জপ করিতে হইবে। এই নাম সংকীর্ত্তনে তারকব্রহ্ম দর্শন হয়। মহাপাপীও পরমা মুক্তি লাভ করে (৬।১৮-৬০) ইত্যাদি(৯)। এক স্থানে আছে রাধা-কৃষ্ণ বলিতে হইবে, কৃষ্ণ-রাধা বলিলে কোটি জন্মের পুণ্য ক্ষয় হইবে(১০) (১৩।৭৬)।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আলোচ্য তিন খানি গ্রন্থের প্রধান স্থানে একই রকম বিচার প্রকরণ অবলম্বন করা হইয়াছে এবং তাহা একই ভাষায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে—এই নাম গ্রহণ ছাড়া "নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে," কলিসন্তরণ উপনিষদেও ঠিক

কর্ণশুদ্ধি বিনা পুত্র মহাবিদ্যামুপাস্য চ।
নারী বা পুরুষোবাপি তৎক্ষণান্নারকী ভবেৎ॥
ততস্তু ষোড়শে বর্ষে সংপ্রাপ্তে সুরবন্দিত।
মহাবিদ্যাং ততঃশুদ্ধাং নিত্যাং ব্রহ্মস্বরূপিণীং॥
শ্রুত্বা কুলমুখাৎ বিপ্রাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
কুর্য্যাৎকুলরহস্য যঃ শিবোক্তঞ্চ তপোধন।
বিদ্যাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ২।৩৬
* * * * *
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী।
হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিনী॥ ২।৪২
* * * *
আদ্যন্তে প্রণবং দত্বা যোজপেদ্দশধা দ্বিজঃ।
স ভবেৎ সুতবরাশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ॥ ২।৪৫
* * * *
হরিনামায় দীক্ষাং বা যদি শূদ্রমুখাৎ প্রিয়ে।
অকুলাদয়স্তু গৃহ্নিয়াৎ তস্য পাপফলং শৃণু।
শ্রুত্বা শূদ্রোঽপি শূদ্রাণ্যা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমং।
কোটিবর্ষাণ সমাদায় রৌরবং প্রতিগচ্ছতি॥ ২।৫০
অপিদাতৃ গৃহিত্রোর্ব্বাঞ্চয়োরেব সমং ফলং।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি প্রত্যক্ষরমিতীরিতং॥ ২।৫১
* * * *
প্রকটাখ্যং হরের্নাম সভায়াং যত্রতত্রবৈ।
মহাবিদ্যা সুতশ্রেষ্ঠ তদ্গুপ্তা ভবিষ্যতি॥ ৩।৩
প্রজপে দানিশং পুত্র মহাবিদ্যাং তপোধন।
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছং তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি॥ ৩।৪
* * * *
যঃ কুর্য্যাৎ সততং পুত্র তস্য সিদ্ধির্হি জায়তে।
কুলাচারং বিনা পুত্র তব সিদ্ধির্নজায়তে॥ ৩।৮ (রাধাতন্ত্র)

(৯) হরিনাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্ন জায়তে।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজন্ হরিনামানুকীর্ত্তনং॥
গৃহান্ হরিনামানি যথাক্রম বিনিন্দিত॥৬।৩৮
গ্রহণাদয়স্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপোপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥৬।৫৩
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম রাম রাম রাম রাম হরে হরে॥৬।৫৫
ইত্যষ্টশতকং নাম্না ত্রিকালকল্মষাপহং।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে॥৬।৫৬
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥৬।৫৭
নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা।
সুরাপি ব্রহ্মহা স্তেয়ী রোগী ভগ্ন ব্রতোঽশুচিঃ॥৬।৬৯
শাক্তো বা বৈষ্ণবোবাপি সৌরো বা শৈব এব বা।
গাণপত্যো লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ॥৬।৬৪
আমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য সংস্তূয় প্রণিপত্য চ ভূসুরং।
ভক্তিনম্রাত্মা মতিমান বৃকো মন্ত্রং জপন্ দ্বিজ॥৬।৬৭
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

(১০) কৃষ্ণরাধেতি যো ব্রূতে মোহাদজ্ঞানতোপিবা।
কোটি জন্মকৃতং পুণ্যং ক্ষণাদেব বিনশ্যতি॥১৩।৭৬
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

ঐ কথাই আছে—"নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে"। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে আছে—"হরিনাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্ন জায়তে," রাধাতন্ত্রে আছে—"কর্ণ শুদ্ধি বিনা পুত্র" ইত্যাদি। তথাপি এই তিনখানি এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নয়। অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কাছে নয়, হইতেও পারে না। তাঁহারা কলিসন্তরণ উপনিষদকে আমলই দেন না। কারণ হরে রাম রাম রাম লইয়া কলিসন্তরণে মহামন্ত্রের আরম্ভ। হরে রাম রাম রাম দিয়া মহামন্ত্র জপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অপরাধ গণ্য হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামের বৈষ্ণব সাধু জগন্নাথ দাসের সম্প্রদায়কে (কলিসন্তরণ উপনিষদ মতে) হরেরাম রাম রাম দিয়া আরম্ভ মহামন্ত্র জপ করার অপরাধে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি তাহাদের সঙ্গ করিলে ধর্ম্মনাশ হয় বলিয়াছিলেন(১১)। মহাপ্রভু কিন্তু রাধাতন্ত্রকে এতটা উপেক্ষা করেন নাই। ভাগবতও বলিয়াছেন, কলিতে তন্ত্রের প্রাধান্য হইবে(১২)। তবে মহাপ্রভু রাধাতন্ত্রের কুলাচার, মহামন্ত্রের কৌল ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনেক কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যাহা পারিয়াছেন তাহার অনেক অংশ ছয় গোস্বামীগণের গ্রন্থে আছে। রূপগোস্বামী স্বীকার করিয়াছেন যে—মথুরামণ্ডলের লোক পুরাণ ও আগমকে শ্রদ্ধা করেন (১৩)। পুরাণ বলিতে তিনি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিকে(১৪) এবং আগম বলিতে রাধাতন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র প্রভৃতিকে বুঝাইয়াছেন ইহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন চৈতন্য-চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধাতন্ত্রের রাধিকার কবচ, মন্ত্র, সহস্রনাম প্রভৃতির শ্লোক-গুলি পর্য্যন্ত প্রায় অবিকলভাবে রূপগোস্বামী তাঁহার "রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা" পুস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই মহামন্ত্র জপ্য—বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পড়িয়া আমাদের সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কারণ মহাপ্রভু এইরূপই উপদেশ দিয়াছেন। প্রবন্ধের প্রথমেই মহাপ্রভুর নিজমুখে ব্যক্ত শ্লোকটি বলিয়াছি। উহার পরেই সংকীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিতে গিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"দশে পাঁচে মিলি সবে দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিও সবে হাততালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
সঙ্কীর্ত্তন কহিলুঁ এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্র বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩

হরি ও রাম রাম, জয় কৃষ্ণ মুরারি বনমালী প্রভৃতি নামের কীর্ত্তনের বর্ণনাও বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু নিজে সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র জপ করিতেন। চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"সংখ্যা নাম লৈতে যে স্থানেতে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥

* * * *

পুনঃ সেই সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসীরে লঞা॥"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮

মহাপ্রভু এই মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া বাচিক (উচ্চ) জপও করিয়াছেন—"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্। হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন্ বিধিনা কীর্ত্তয়তো ভোঃ" (রঘুনাথদাসকৃত স্তবাবলী)॥ হরিদাস ঠাকুরও তাহা করিয়াছেন ঐরূপ সংখ্যা রাখিয়া—"উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে। আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে॥ তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ। গুঁফা হইল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১৪ অঃ)॥ সুতরাং সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন (উচ্চকণ্ঠে জপ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু বা হরিদাস ঠাকুর কেহই সর্ব্বদা সংখ্যা রাখিয়া উচ্চ জপ করিতেন না। প্রেমবিলাসে পাই—হরিদাস "লক্ষ হরিনাম মনে লক্ষ কানে শুনে। লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে (প্রেঃ বিঃ ২৪)। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মহামন্ত্র যাজন, ছয় গোস্বামীর যাজন, নরোত্তম ঠাকুরের, জগাই মাধাইএর ও প্রভু-পার্ষদগণের যাজন সমস্তই সংখ্যা রাখিয়া। সকলেই এই মহামন্ত্র জপ করিতেন। মহাপ্রভু প্রত্যেককেই অন্ততঃ লক্ষ নাম জপ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন —"প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে। প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥ সেজনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর। তথা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫)॥ প্রেম বিলাসেও ইহার উল্লেখ আছে—"শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমুখে আজ্ঞা করিল বৈষ্ণবে। লক্ষ নাম সংখ্যা করি অবশ্য করিবে" (প্রেঃ বিঃ ১৭)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শিষ্যকে এই মহামন্ত্রটি প্রথমে কর্ণশুদ্ধি মন্ত্ররূপে দেওয়া হয়। পরে অন্য সিদ্ধমন্ত্র দেওয়া হয়। কিন্তু শেষে মালার মন্ত্ররূপে আবার এই মহামন্ত্রই দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দীক্ষাগুরু

---

(১১) অতিবড়্যাদয়োঽপন্থে পরিত্যক্তাস্ত বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
—গৌরগণচন্দ্রিকা।

(১২) ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
—ভাগবত ১১।৫।৩১

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।

(১৩) মথুরামণ্ডলে লোকে গ্রন্থেষু বিবিধেষু চ।
পুরাণে চাগমাদৌ চ তন্ত্রজ্ঞেষু চ সাধুষু॥
—রূপগোস্বামী কৃত রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা।

(১৪) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়॥
—অগ্নিপুরাণে মহামন্ত্রের বচন।

ও শিক্ষাগুরু পৃথক ব্যক্তি থাকেন। মালার মন্ত্রদাতাকেই শিক্ষাগুরু বলা হয়। মনে হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শিক্ষাগুরুরই সম্মান বাড়িয়া যাইতেছে। এই মহামন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি যে অত্যন্ত অধিক ইহাই তাহার কারণ। ইহাতে তাঁহারা গৌর ভগবান প্রদত্ত মন্ত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার অধ্যাপক গোস্বামী এই মহামন্ত্র সংখ্যা না রাখিয়া কীর্ত্তন করিবার অনুকূলে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—"হরে কৃষ্ণেত্যাদি নামাত্মক মহামন্ত্র বীজাদি সংযুক্ত তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের গণভুক্ত নহে, তবে আচার্য্যগণের নির্দ্দেশ হেতুক ইহাতে পারিভাষিক মন্ত্রত্ব স্বীকার করিতে হয়"। তিনি আরও বলিয়াছেন—"হরে কৃষ্ণেত্যাদি মহামন্ত্রের হরিনামত্ব পুরস্কারেই জপ বিধান, মন্ত্রত্ব পুরস্কারে নহে—" (শ্রীশ্রীহরিনাম মহিমা)। .... এইরূপ উক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে (১৫)।

(১৫) ভাগবতে আছে যে সূত বলিয়াছেন—"ত এব বেদাদুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈ যথা। এবং চকার ভগবান ব্যাস কৃপণবৎসলঃ ॥১।৪।২৪॥ স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাখ্যানাং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥১।৪।২৫॥ ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ। দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত" ॥১।৪।২৯ ভাঃ। তত্ত্ব সন্দর্ভেও (ভবিষ্যপুরাণ বচন) আছে—"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং জন্মহা ভারতং স্মৃতং ॥১।১৩॥···মহাপ্রভু এ সমস্ত জানিয়াও যাহাকে মহামন্ত্র বলিয়া সকলেরই জন্য বলিয়াছেন, গোস্বামী কি তাহা অনাচার বলেন?

দুষ্টু গোপাল জাগো

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দুষ্টু গোপাল, কবে কোন্‌ক্ষণে মা তব নন্দরাণী,
যাদু করি' তোমা পাড়াইল ঘুম স্নেহ-চুম্বন দানি'।
সেইদিন থেকে ঘুমায়ে রয়েছ জাগিলে না যে গো আর,
যাদু করে ঘিরে মার যাদু আজ আগুলি' রেখেছে দ্বার।
নিখিল গোপাল, ডাকে তোমা আজ নিখিলের সব মা গো,
যশোদার যাদু ঠেলে ফেলে আজ—দুষ্টু গোপাল জাগো।

যমুনার ঘাটে কুম্ভ কাঁখেতে অঙ্গদোদুল নারী,
তব ভয়ে আর হুঁসিয়ার হয়ে চলে না তো সারি সারি।
ক্ষীর দধি নিয়ে ব্রজাঙ্গনারা নাহি আর সাবধানী,
ভাণ্ড ভাঙ্গার ভয়ে নাহি কারো চোখে আজ কানাকানি।
সব জাগরণে লেগেছে ভাঙ্গন, ডাকো আজ তারে মাগো,
কাঁদিছে রাখাল কাঁদে ধেনুপাল—দুষ্টু গোপাল জাগো।

তুমি র'লে ঘুমে এ বৃন্দাবনে দাপাদাপি গেছে চলি',
মানবহিয়ার সকল ছন্দ কে যেন দিয়াছে দলি'।
পথে ঘাটে আজ গোপাঙ্গনার নাহি সচকিতে চলা,
গমনের পথে নাহি জৌলুষ কৌতুকে কথা বলা।
ছন্দদুলালে ডাকিছে গোকুল নন্দযশোদা মাগো,
জীবনের পথ হ'ল সে অচল—দুষ্টু গোপাল জাগো।

পাড়ায় পাড়ায় তব বার্ত্তাতে নাহি আর আনাগোনা,
বৃন্দাবনেরে রাখে না সজাগ তব দুরন্তপনা।
কাজে তৎপর ছিল সবে তব উদ্দাম লীলা দেখি,
তোমার জ্বালায় নাহি ছিল ঘুম, তুমি আজ ঘুমে এ কি!
সারা গোকুলের আসে যে গো ঢুল্, ঘুম ভাঙ্গা আজ মাগো,
অচল জীবন করিতে সচল—দুষ্টু গোপাল জাগো।

দুষ্টু গোপাল, তুমি না জাগিলে পড়ে না যে তোমা মনে,
ঘরে ও বাহিরে মন উচাটন হয় না যে ক্ষণে ক্ষণে।
পায়ে পড়ি ও গো, মার যাদু ঠেলি' জাগো তুমি ঘরে ঘরে,
ভাঙ্গো এসে পুনঃ দধির ভাণ্ড বৃন্দাবনেরি পরে।
পুনঃ এসে তুমি করো দাপাদাপি আমাদের 'পরে রাগো,
ভাঙ্গো সব ভাঙ্গো গিরি ধরে টানো—দুষ্টু গোপাল জাগো!

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

সাতাশ

দিন কয়েক পর।

জ্যৈষ্ঠের শেষেই এবার বর্ষার ঘন ঘটা দেখা দিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি হয়—অনেকটা কাল-বৈশাখীর ধারায়। প্রচণ্ড রৌদ্রের পর অকস্মাৎ একদিন অপরাহ্ণে মেঘ জমিয়া ওঠে, খানিকটা প্রবল বর্ষণ হয়—বর্ষণের শেষে মেঘ কাটিয়া আবার আকাশে প্রখর সূর্য্য দেখা দেয়। একেবারে শেষ জ্যৈষ্ঠে ও আষাঢ়ের প্রথমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, অল্প-অল্প বৃষ্টি হয়—প্রচণ্ড গরমে ধরিত্রী যেন ভাপে সিদ্ধ হয়; চাষীরা বলে 'মিগের বাত'। মৃগশিরা নক্ষত্রে সাধারণত এই অবস্থা দেখা দেয়। এ সময় প্রবল বর্ষণ ভাল নয়। কিন্তু এবার মিগের বাতের পূর্ব্বেই জ্যৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহেই ঘন ঘটা করিয়া যেন বর্ষা নামিয়া আসিল। খাল ডোবা পুকুর প্রায় ভরিয়া উঠিল।

যতীন বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সাপের উপদ্রবে সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। চার হাত সাড়ে চার হাত লম্বা একটা সাপ সেদিন জানালা দিয়া সন সন করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সে আতঙ্কে লাফ দিয়া তক্তাপোষের উপর উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সাপ! সাপ!

অনিরুদ্ধ বাড়ীতে ছিল না। সাধারণত এ-সময়ে গ্রামের পুরুষেরা সকলেই মাঠে। পথে বা আশপাশেও কেহ নাই। যতীনের চীৎকারে ওদিক হইতে ছুটিয়া আসিল পদ্ম। তাহার হাতে কুকুর খেদানো হাত দুয়েক লম্বা একটা বাঁশের লাঠি।

—কই? কোথা সাপ? ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইয়া চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে সে প্রশ্ন করিল।

—ওই যে! আতঙ্কিত যতীন আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। যতীনের চীৎকারে এবং পদ্মের আগমনে সাপটা এককোণে গিয়া লম্বা মুখটা লইয়া একবার এপাশে একবার ওপাশে বাড়াইয়া ফিরিতেছে—তাহার লম্বা দ্বিধা বিভক্ত জিভটা আগুনের শিখার মত ঘন ঘন বাহির হইয়া আসিতেছে।

—অ মা গো! লাঠিখানার উপর ভর দিয়া পদ্ম একেবারে হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

যতীন বিরক্ত হইয়া বলিল—ওই যে!

পদ্ম উত্তর দিবে কি—হাসি তাহার বাড়িয়া গেল।

তক্তাপোষের উপর হইতেই যতীন হাত বাড়াইয়া বলিল—লাঠিটা দাও আমাকে। হাসতে হবে না। যখন ছোবল দেবে তখন হবে!

পদ্ম এবার গম্ভীর হইয়া তক্তাপোষের পায়ায় লাঠির আঘাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া বলিল—হেট! হেট! বেরো, বেরো!

সাপটা তবু যায় না। পদ্ম অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া—পাশ হইতে সাপটাকে তাড়া দিল। সাপটা এবার দ্রুততম গতিতে খোলা পথে দরজা দিয়া বাহির হইয়া পলাইল।

যতীন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাপরে!

পদ্ম আবার হাসিয়া আকুল হইল।

বিরক্ত হইয়া যতীন বলিল—হাসছ কেন—এমন ক'রে?

—ওই তোমার সাপ! আবার সেই হাসি।

—হ্যাঁ। কেন? ওটা কি দড়ি?

—দড়ি বই-কি। ওটা যে দাঁড়াস সাপ। ইঁদুর খেতে এসেছিল। আমি বলি—খরিস না আলান—কে জানে!

খরিস আলান—অর্থাৎ গোখরো কেউটেরও এখানে অভাব নাই। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই অনিরুদ্ধের উঠানে দুই দুইটা গোখরোর বাচ্চা পদ্মই মারিয়াছে। ওই সেই লাঠিটা দিয়াই তাড়া করিয়া মারিয়াছে। আজ অপরাহ্ণে অনিরুদ্ধ মারিল—প্রকাণ্ড এক গোখরো। বাড়ীর সামনে পথের উপর দিয়া সেটা চলিয়া যাইতেছিল। আড়াই হাত—তিন হাত লম্বা, ফণাটা প্রায় দুই হাতের তালুর যুক্ত পরিধির মত বিস্তৃত। যতীনের সম্মুখে বসিয়া অনিরুদ্ধ গুম হইয়া বসিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতেছিল। তারা নাপিত আজই তাহাকে সংবাদ দিয়াছে যে, তাহার উপর বাকী খাজনার যে নালিশ গোপনে দায়ের হইয়াছিল—সে

নালিশ ডিক্রী হইয়াছে—নীলামের দিনও নাকি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। সমস্তই এমন সুচারু গোপন তদ্বিরে হইয়াছে যে তাহার বিন্দু-বিসর্গও কেহ জানে না। তবে তারা নাপিতের কথা স্বতন্ত্র; তাহার চতুরতা অদ্ভুত। শ্রীহরিকে সে বহু সংবাদ সরবরাহ করে—মুখরোচক সংবাদ।

"কঙ্কনার বাবুদের বাড়ীর—অর্থাৎ এই গ্রামের জমিদার বাড়ীর আর বেশী দিন নাই।"—হাতীর খাওয়া কয়েত বেলের মত অবস্থা; বুঝলেন কি-না। আমার শালা বলছিল। বেবাক গহনা, সোনাদানা, রূপোর বাসন সব জংসনের মাড়োয়ারীর সিন্দুকে। কয়লার ব্যবসাদার মুখুজ্জে বাবুদের কাছে যাওয়া-আসা চলছে। শিব-কালীপুর বিক্রী হবে। তাই আপনার বৃদ্ধির তাড়া। তা আপনি নিয়ে নেন কেনে!

শ্রীহরি জমিদারত্বের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের কামনায় মনে মনে অধীর হইয়া ওঠে।

"জমাদার দারোগা দুজনেই এখন আপনার ওপর ভারী খুশী। বলছিল—ঘোষকে কিনতে বল। পাকা বাড়ী করুক ঘোষ। মানে, সেদিন যে আপনি কংগ্রেসের খবর দিয়েছিলেন—তাতেই আর কি! পুলিশ সায়েবও বলেছে—আপনাকে না কি নজরবন্দীর ওপর নজর রাখবার ভার দেবে। ইউনান বোডে—আপনাকে এবার সরকারী মেম্বর ক'রে দেবে।"

এবার শ্রীহরির সন্দেহ হয়।

তারা আবার বলে—কালই সব খবর পাবেন। জমাদার আসবে কাল—কিসের চাঁদার লেগে। তা ছাড়া—সেদিন আপনি খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন তো জমাদারকে। আপনি যদি বলতেন যে, জমাদার দুগ্‌গাকে গিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করতে গিয়েই সব মাটি করেছে—সব পালিয়েছে—তা হ'লে জমাদারের তো হয়ে গিয়েছিল!

শেষ পর্য্যন্ত তারাপদ অত্যন্ত মুখরোচক কথা আরম্ভ করে। "নজরবন্দী বাবুটি দু নৌকোয় পা দিয়েছে। ডুবল বলে'। বুঝলেন কি-না—একদিকে কামার বউ—আর একদিকে দুগ্‌গা।"

শ্রীহরি চঞ্চল হইয়া উঠিল, অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘৃণার সহিত বলিল—কামার বেটা কানা হয়েছে—না, মরেছে?

সযত্নে সন্তর্পণে ক্ষুরের টান দিয়া তারাপদ মৃদু স্বরে বলিল—বেঁচেও আছে, চোখও আছে, কিন্তু করবে কি বলুন? টাকা যে ভারী জিনিষ!

—টাকা? উত্তেজিত হইয়া শ্রীহরির ক্ষুরের ধার হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল—কত টাকা দেয়—ওই নজরবন্দী? কত টাকা আছে বেটার?

—তা, কলকাতার লোক। ভাল ঘরের ছেলে—

—কলকাতার লোকের আছে কি? বেটাদের পিটুলি গুলতে জমি নাই—আছে কেবল দালান বাড়ী। ইঁট আর কাঠ!

তারাপদ সায় দিয়া বলিল—তা আপনি ঠিক বলেছেন! চক্ষু মুদলেই কলকাতার লোকের অন্ধকার!

মৃদু হাসিয়া এবার শ্রীহরি বলিল—কামারের যদি টাকার এতই অভাব হয়ে থাকে তবে বলিস—টাকা আমরাও দিতে পারি!

—আপনার ওপরে ভারী রাগ বেটার।

রাগ? শ্রীহরি অট্ট হাসি হাসিয়া উঠিল। আমার ওপরে রাগ! দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাহার চেহারা পাল্টাইয়া গেল; ক্রোধে আক্রোশে তাহার সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তারাপদও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। দন্তহীন মুখে মাড়িতে মাড়িতে ঘর্ষণ করিয়া শ্রীহরি বলিল—গ্রা-ম ছাড়া করব আমি শালাকে। ডিক্রী হয়েছে—এইবার নীলেম। হারামজাদী কামারণীকে আমি ঝি রাখব। এই আমি ব'লে রাখলাম।

তারাপদ খবরটির মধ্যে মাত্র ডিক্রী ও নীলাম সম্ভাবনার খবরটি অনিরুদ্ধকে জানাইয়া গেছে।

অনিরুদ্ধ যতীনের কাছে বসিয়া আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সেই কথা বলিতেছিল। আদালতের পিওন হইতে আমলা-পেশকার বিচারককে পর্য্যন্ত সে নিষ্ঠুর অভিসম্পাৎ দিতেছিল। ঠিক এই সময় ওই গোখরো সাপটা পাশের জঙ্গল হইতে রাস্তা পার হইয়া এদিকের একটা জঙ্গলের মুখে আসিতেছিল। অনেক দিনের পুরানো সাপ—অনিরুদ্ধই তাহাকে বুড়া বলিত। তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে একটা পরিচয়ও ছিল। রাত্রে—কত দিন—বুড়ার পাশ দিয়া অনিরুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে—বুড়া পাশে একধারে—লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই অনিরুদ্ধ বার দুই হাতে তালি দিত—বুড়ো

থাকিস তো স'রে যা—বলিয়া চলিয়া যাইত। আজ অকস্মাৎ অকারণে অনিরুদ্ধ একটা লাঠি লইয়া গিয়া সাপটার মাথার উপর বসাইয়া দিল প্রচণ্ড এক আঘাত। সাপটার মাথাটা একেবারে ভাঙিয়া থেঁতো হইয়া গেল। নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সরীসৃপের সমস্ত দেহটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বার-বার আছাড় খাইল—কিন্তু মাথাটা ভাঙিয়া মাটিতে বসিয়া গিয়াছে। নিষ্পলক সাপের দৃষ্টিটাও মনে হইল সকরুণ।

অনেকক্ষণ পর সাপটার দেহ একেবারে স্থির হইয়া গেলে—অনিরুদ্ধ অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পদ্মের চোখে জল দেখা দিয়াছিল পূর্ব্বেই। লাঠির শব্দ এবং যতীনের আতঙ্কিত—সাপ! সাপ! রব শুনিয়া সে বাহিরে আসিয়াই পরিচিত সাপটার ওই অবস্থা দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিল।

কাঁদিয়া ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—অনথক সাপটাকে মেরে ফেললাম!

যতীন অবাক হইয়া গেল। ইহারা বলে কি?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ আবার বলিল—বিশ-পঁচিশ বছর এইখানে ছিল, কোন দিন অনিষ্ট করে নাই।

যতীন বলিল—বেশ করেছ মেরেছ। সাপকে কখনও বিশ্বাস নেই। বিশ-পঁচিশ বছর অনিষ্ট করে নাই—কিন্তু কাল করত।

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া রহিল।

যতীন বলিল—এখন জমি নীলেম হবে বলছ—তার ব্যবস্থা কর। একদিন আদালত থেকে সব জেনে শুনে এস। আর একটা দরখাস্ত করে দাও যে—এই রকম বেআইনী ব্যাপার করেছে কোর্টের লোকে।

সমগ্র শাসন-যন্ত্রটার উপরেই সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বিচার বিভাগে কেরাণি ও আমলাবর্গের অনাচারের কথা—সেখানে নাকি পয়সা ভিন্ন কেহ কথা কয় না, অর্থবলে সেখানে না কি অসত্য সত্য হইয়া ওঠে—এ সব সে শুনিয়াছিল—আজ প্রত্যক্ষ করিল।

কিছুক্ষণ পর অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দেখি! সে উঠিয়া মরা সাপটাকে লাঠির ডগায় তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। জাত সাপ, ব্রাহ্মণ, আগুন দিতে হইবে!

* * * *

একা অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধেই নয়, আরও কয়েক জনের বিরুদ্ধেই ডিক্রী এমনই গোপনে হইয়াছে। জগন ডাক্তার, পাতু মুচির বিরুদ্ধেও ডিক্রী হইয়াছে। আর হইয়াছে গদাই মণ্ডলের বিরুদ্ধে। গদাইয়ের জমির সার অংশটুকু বড় ভাল—সেটুকু শ্রীহরির জমির পাশেই। শ্রীহরি যখন ছিরু ছিল—তখন হইতেই সে অনেক চেষ্টা করিয়াছে—এইটুকুর জন্য। টাকা বেশী দিতে চাহিয়াছে, পরিবর্ত্তে অন্যত্র জমি দিতে চাহিয়াছে কিন্তু গদাই রাজী হয় নাই। ছিরু তাহার মহিষ দিয়া রাত্রে গদাইয়ের জমির কাঁচা ধান খাওয়াইয়াছে। জমির আলের মধ্যে লাঠি দিয়া ছিদ্র করিয়া জল বাহির করিয়া দিয়াছে, পুকুর হইতে শেওলা আনিয়া জমিতে লাগাইয়া দিয়াছে; অতি বৃষ্টির সময় কোদাল চালাইয়া জল ঢুকিবার এবং বাহির হইবার পথ কাটিয়া দিয়াছে—তবু গদাই দেয় নাই। আজ শ্রীহরি পথ পাইয়াছে। অবশ্য অধর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি তাহার আর নাই; তাহার ইচ্ছা—নীলামে উচিত মূল্যেই সে জমিটা কিনিবে। তাহা হইলেই গদাই বাকি খাজনা ও মামলা খরচের টাকাটা বাদে বাকিটা ফেরৎ পাইবে। নীলামেরও আর দেরি নাই। উকিল সংবাদ পাঠাইয়াছে শীঘ্রই নীলাম হইবে।

বৈঠকখানায় বসিয়া শ্রীহরি সেরেস্তার খাতাপত্রই দেখিতেছে। বৈঠকখানাটা শেষ হইয়াছে, ঘরখানি বেশ ভালই দাঁড়াইয়াছে, পাকা মেঝে, পাকা ঘরের মত পলেস্তারা ও চুনকাম করা, দরজা জানালাগুলি দামী—শ্রীহরি খরচ-করিয়াছে অনেক। তক্তাপোষের উপর সতরঞ্জি, তাহার উপর চাদর এবং একটা তাকিয়া; তাকিয়ায় হেলান দিয়া শ্রীহরি গুড়গুড়ির কাঠের নলে তামাক টানিতে টানিতে কাগজ দেখিতেছিল। দেবু ঘোষ চলিয়া যাওয়ায় শ্রীহরি খানিকটা অসুবিধায় পড়িয়াছে। দেবুকে সত্যই সে ভালবাসিত। কিন্তু তাই বলিয়া দেবুর হুকুম মানিয়া চলিতে সে পারে না। অনুরোধ করিয়া বলিলে দেবুর কথাটা সে বিবেচনা করিয়া দেখিত। গ্রামের লোকের অপকার সে করিতে চায় না। উপকারই করিতে চায়। এইতো স্ত্রীর শ্রাদ্ধে সে একটা পাকা ইন্দারা করাইয়া দিয়াছে, আবার ইচ্ছা আছে—চণ্ডীমণ্ডপটা বাঁধাইয়া দিবে, শিবের ও কালীর ঘর পাকা করিয়া দিবে; স্কুলের মেঝেটাও বাঁধাইয়া দিবে।

যদি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব—বা পত্তনী স্বত্ব ভগবানের কৃপায় সে পায় তবে গ্রামে হাট বসাইবে—স্নানের মজা দীঘিটা কাটাইবে। গ্রামের লোক বেইমান—প্রত্যেকটি লোক তাহার হিংসা করে, গোপনে অনিষ্ট কামনা করে—সে জানে—জানিয়াও এতগুলি সংকল্প মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। দেবুর ব্যবহারে—মানুষের উপর শেষ শ্রদ্ধাটুকুও তাহার চলিয়া গিয়াছে। তবুও সে তাহার সংকল্পের পরিবর্ত্তন করে নাই।

এই সময় কালু সেখ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শ্রীহরি আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া বসিল।—কি ? কি হ'ল ? চিঠির উত্তর দিয়েছেন ?

—আজ্ঞা, নায়েববাবু খুদ এসেছেন আমার সাথে।

শ্রীহরি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—কই? কোথায় তিনি ?

জমিদারের প্রৌঢ় নায়েব—সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দাওয়ায় উঠিয়া হাসিয়া বলিল—ঘোষ মশাই যে আসর পাকা ক'রে ফেললে গো!

—আসুন—আসুন—আসুন। শ্রীহরি সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

—এলাম। খুব গোপনে এসেছি। দরজাটা বন্ধ করে দিন।

শ্রীহরি দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—এই বাদলায়—একটুকুন চা করতে বলি ?

—না। এখুনি ফিরতে হবে আমাকে। কাজের কথা বলেই ফিরব।

শ্রীহরি নায়েবের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

—বিক্রী নয়। পত্তনি ক'রে দিতে পারি আমি। কিন্তু আমার কথা আগে বলে দাও। বস। এইখানে বস।

তাহার পর কথা আরম্ভ হইল মৃদুস্বরে।

কথা শেষ করিয়া—নায়েব উঠিল। শ্রীহরি বলিল—তা হ'লে বৃদ্ধির কাজটা সেরে দিন।

—অবিলম্বে। নায়েব ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

—কবে আসছেন বলুন। ঢোল দিয়ে দি গ্রামে।

নায়েব ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সে বোঝ তুমি। আপোষে বৃদ্ধি নিতে চাও—বেশী পাবে না। তার চেয়ে আমি বলি—পত্তনির কাজ সেরে তুমি পাঁচধারা কর। আইনে চার আনা তো পাবেই! আট আনার নজিরও আমরা হাইকোর্ট থেকে নিয়ে রেখেছি।

—তবু একবার আপোষে চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি!

—বেশ। আজই ঢোল দিয়ে রাখ। কাল আসব আমরা সন্ধ্যের সময়।

শ্রীহরি নায়েবের সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে খানিকটা আগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে কালুও চলিল।

আকাশের মেঘটা আজ অপরাহ্ন হইতেই যেন কাটিতে শুরু করিয়াছে। দিগন্তের কোলে টুকরা টুকরা নীল আকাশ দেখা দিয়াছে। সকলের চেয়ে বেশী পরিষ্কার হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম কোণটা। শেষ অপরাহ্নে মেঘমুক্ত দিগন্তে সূর্য্য দেখা দিল—বর্ষণসিক্ত পৃথিবী যেন হাসিয়া উঠিল।

জলে কাদায় পথ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সে জন্যও বটে—আর খানিকটা আত্মগোপনের জন্যও বটে, নায়েব চলিয়াছিল গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী একটি জন বিরল পথ ধরিয়া। পড়ো কতকগুলা ভিটার উপর দিয়া—পায়ে চলা পথ—চারিপাশে জঙ্গল। মাঠ পর্য্যন্ত অনেকটা পথ আসিয়া শ্রীহরি বিদায় লইল। বলিল—কালু আপনাকে দিয়ে আসুক কঙ্কনা পর্য্যন্ত।

—না—বলিয়া নায়েব ছাতাটি খুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি একটু বিস্মিত হইল। বাদলার পর এমন মিষ্ট রৌদ্রও ভদ্রলোকের কাছে অসহ্য। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—তা ভাল—ছাতাটা শুকিয়ে যাবে।

হাসিয়া নায়েব বলিল—না—ঘোষমশায়, আড়াল। ধবধবে পাকা মাথা—অনেক দূর চেনা যায়।

শ্রীহরি মনে মনে স্বীকার করিল—পাকা মাথা বটে।

ফিরিবার পথে খানিকটা আসিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। রক্তাভ আলোয় আকাশ হইতে পৃথিবীর কোল পর্য্যন্ত অপরূপ শোভায় কখন ভরিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গাঢ় রাঙা রঙ দ্রুত সঞ্চরণে পূর্ব্বাকাশ পর্য্যন্ত মেঘ স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া চলিয়াছে। মাঠের চষা ভিজা মাটিতে লাল আভা ধরিয়াছে; গাছে লাল রঙের আমেজ; খানায় ডোবায় সঞ্চিত জল গাঢ় লাল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহরি

কিন্তু সে জন্ম দাঁড়ায় নাই। তাহার চোখের দৃষ্টি—মুখ-ভঙ্গির মধ্যে মুহূর্তে ছিরুপাল অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে।

অদূরে একটা গাছের পাশে একটি মেয়ে এই রক্তসন্ধ্যার আভা মুখে মাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কতবার আলোয় অন্ধকারে তাহাকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু এত ভাল কখনও লাগে নাই। মেয়েটি দুর্গা। কিন্তু ছিরুর মুখে শুধু তো লালসাই নয়, দুরন্ত আক্রোশও ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দুর্গার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে কথা বলিতেছে—সে পুরুষ; পিছনের দিক হইতে তাহাকে চিনিতে এ অঞ্চলের কাহারও ভুল হইবার কথা নয়। সেই নজর-বন্দী ছেলেটি।

শ্রীহরি ডাকিল—কালু!

—জী!

এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া শ্রীহরি বলিল—বাড়ীতে বলব, এস।

আটাশ

কয়েকদিন বাদলার পর রোদ উঠিতেই যতীন খানিকটা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পদ্ম অবশ্য বারণ করিয়াছিল —জলো হ' (হাওয়া) খেতে মাঠে মাঠে যেয়ো না। আর জ্বর হ'লে আমি লারব।

যতীন হাসিয়া বলিয়াছিল—শিগ্‌গির ফিরে আসব।

পদ্ম তবু সন্তুষ্ট হয় নাই—বলিয়াছিল—তোমার মাকে আমি চিঠি নিকছি দাঁড়াও।

অনিরুদ্ধের পাত্তা নাই। সে বাহির হইয়াছে—দ্বিতীয় বার জমি বন্ধক দিয়া ঋণের সন্ধানে। কাবুলে চৌধুরীর কাছেই সে গিয়াছিল। তাহার কাছে কোন কথা সে গোপন করে নাই: চৌধুরীর ফাটল-সঙ্কুল কর্কশ পা দুইখানি ধরিয়া অকপটে সমস্ত স্বীকার করিয়াছে।—দোষ আমার বটে আজ্ঞে, লক্ষবার দোষ মানছি আমি। আপনার কাছে টাকা ধার নিয়ে খাজনা আমার সব্বাগ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু কপালের ফের চৌধুরী মশায়, এক গাছ কাটার মামলাতেই আমার সব্বনাশ হয়ে গেল। আর শ দেড়েক টাকা আপনি দ্যান। নইলে আপনার চরণ আমি ছাড়ছি না।

কাবুলে চৌধুরী শুধুই মহাজন নয়, সে লেখাপড়া জানা মাস্টার লোক—অঙ্কও সে যেমন ভাল জানে—সংস্কৃতও সে তেমনি ভাল করিয়া পড়িয়াছে—বিষয়বোধ এবং রসবোধ দুই তাহার আছে। শ্যাওলা-ধরা কালো পাহাড়ের মত দেহের অভ্যন্তরে—খনির অন্ধকারে কয়লা ও অতীত কালের প্রবাদের বিষময় হীরার মত বোধ দুইটি পাশাপাশি অবস্থান করে। চৌধুরী বলিল—আমার ক্ষতি না ক'রে তোর উপকার করতে আমার তো আপত্তি নাই অনিরুদ্ধ। পরকালে তোর গতি হবে—ইহলোকে আমার এখন কোথাও যাবারও দরকার নাই। থাক, চরণ ধ'রে থাক—আপত্তি নাই আমার। কিন্তু কোথাও যাবার দরকার পড়লেই টেনে ছাড়িয়ে নোব।

অনিরুদ্ধ বলিল—আমার দশ বিঘে জমির দাম আপনার —যাচাই ক'রে দেখুন আপনি—হাজার টাকার কম নয়। দেড়শো টাকা দিয়েছেন আর দেড়শো টাকা দ্যান; কিছু ক্ষেতি হবে না—চৌধুরী মাশায়!—নইলে আমি মারা যাব।

—মারা গেলে—আমি দুঃখ করব অনিরুদ্ধ—সত্যিই দুঃখ করব। লোক তুই সত্যিই ভাল, খারাপ ন'স। কিন্তু টাকা আর—উঁহু! বলিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চৌধুরী বেশ সহাস্য মুখে বলিল—আর একটি আধলা নয়।

অনেক হিসাব করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, জমি নিলেম হ'লে তো টাকাও আপনার যাবে!

চৌধুরী হাসিয়া শান্ত ভাবে বলিল—নিজের ভাবনা ভাবছিস—তাই ভাব অনিরুদ্ধ, আমার ভাবনা ভাবিস না। খেপে যাবি তুই।

চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া অনিরুদ্ধ এবার প্রশ্ন করিল—নীলেম ডাকবেন আপনি?

গম্ভীরভাবে চৌধুরী বলিল—নিশ্চয়!

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তারপর বলিল—আজ্ঞে তাতেও তো বাকি খাজনার টাকাটা আপনাকে দিতে হবে।

—জমিটা তাতে সদ্য সদ্য পাব। তোকে তাগাদা করা —তুই না দিলে—নালিশ মকদ্দমা করার ঝঞ্ঝাট থেকে বেঁচে যাব। শ্রীহরির সঙ্গে কথা আমার পাকা হয়ে গিয়েছে অনিরুদ্ধ, মিছে তুই আর চরণ ধ'রে থাকিস না। ছেড়ে দে।

অনিরুদ্ধ চৌধুরীর চরণ ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। নূতন মহাজনের সন্ধানে সে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া

বেড়াইল। অপরাহ্ন—কেন—সন্ধ্যা হয়—হয়, এখনও বাড়ী ফেরে নাই। যতীন বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে পদ্ম একা বসিয়া রহিল। মনে মনে সে অনিরুদ্ধকেই সকল বিপদের মূল স্থির করিয়া তাহাকেই দোষ দিতেছিল।

যে লোক এমন অনাচারী—যে অস্পৃশ্য মুচিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করে তাহার ভাগ্য এমন হইবে না তো হইবে কাহার? তাহারই পাপে সংসারের লক্ষ্মী বিদায় লইয়াছে, তাহারই পাপে—তাহার কোল খালি থাকিয়া গেল!

আজ আবার বুড়া সাপটাকে অনর্থক মারিয়া ফেলিল। সাপ তো সামান্য নয়, বিশেষ 'বহুকেলে' বুড়া সাপ! তাহার মনে হইল—ওই সাপটাই এতদিন তাহাদের জমিগুলি মাথায় করিয়া ধরিয়াছিল; জমিটা যাইবে বলিয়াই নিয়তির পরিহাসে অনিরুদ্ধ নিজেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

সে নিজের মনেই বেশ উঁচু গলায় বলিয়া উঠিল—মরুক, মরুক! মিন্‌সে মরুক!

সেই ওই ছেলের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী চলিয়া যাইবে। ছেলে কখনও তাহাকে ফেলিতে পারিবে না।

গ্রাম-প্রান্তে ওই গাছটির তলায় এমনি রক্ত সন্ধ্যার আলো মুখে মাখিয়া তখন দুর্গা দাঁড়াইয়াছিল। তাহার একটা ছাগল এই রোদ উঠিতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া মাঠের দিকে আসিয়াছে। সামনের মাঠের দিকে চাহিয়া সে খুঁজিতেছিল সেটা কোথায়? যতীন তাহাকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুর্গার মুখে প্রতিফলিত রক্তসন্ধ্যার আভা গাঢ়তর হইয়া উঠিল। সে এক মুখ হাসিয়া বলিল—বাবু!

—হ্যাঁ। যতীন হাসিয়া বলিল—তুমি তো আর যাও না, তাই খবর করতে এলাম। কেমন আছ?

মুখ নীচু করিয়া দুর্গা বলিল—আমরা ছোটনোক বাবু; আমরা—; অভিমানে দুর্গার ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

—শুনেছি আমি। অনিরুদ্ধ আমাকে বলেছে। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছোটলোক বলে ঘেন্না করি নাই কোন দিন! তোমার এনে দেওয়া জলে নেয়েছি, সেই জল খেয়েছি।

দুর্গা নত মুখেই চুপ করিয়া রহিল।

যতীন বলিল—সেদিন রাত্রের কথা আমি শুনেছি। পাতু আমাকে বলেছে। আমাদের দেশ না হলে অন্যদেশে তোমাকে সম্মান করত। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, মানে খাতির করি। সে হাসিয়া আবার বলিল—ওঃ—খুব বুদ্ধি তোমার। খুব ঠকিয়েছ জমাদারকে।

দুর্গা এবার মুখ তুলিল, চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল—সত্যিই যদি সেদিন আমাকে সাপে ডংশাতো বাবু—তাতেও আমার দুখ হ'ত না।

—আমার কিন্তু তাতে ভারী দুঃখ হ'ত দুর্গা।

—আপুনি কাঁদতেন?

—তা কাঁদতাম বই-কি।

দুর্গা আবার মুখ নত করিল, কোন উত্তর দিল না।

—যেয়ো তুমি দুর্গা। তুমি না গেলে সত্যিই ভাল লাগে না।

রক্ত-সন্ধ্যার আভার মধ্যে আজ আবার গ্রামখানি যতীনের চোখের সম্মুখে অপরূপ মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠিল। বাদ্‌লার পর রৌদ্রের উত্তাপ ও দীপ্তির আভাসে পাখীগুলি উল্লাসে অধীর এবং মুখর হইয়া উঠিয়াছে; একটা বাঁশঝাড়ের লম্বা বাঁকা বাঁশের মাথায় একদল বিচিত্রবর্ণ হরিয়াল যেন সভা করিয়া বসিয়াছে—গায়ের পালক ফুলাইয়া ঠোঁট দিয়া খুঁটিতেছে, কলকল করিয়া শব্দ করিতেছে, লাফ দিয়া এ উহার উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। চষা মাঠে সবুজের আমেজ দেখা দিয়াছে, ধানের বীজ চারাগুলি মৃদু বাতাসে ঢেউ তুলিয়া আন্দোলিত হইতেছে। জলসিক্ত ঠাণ্ডাবাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ। যতীন আবিষ্টের মত চলিয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া সে দেখিল—তাহারই তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছে দেবু ঘোষ।

দেবুই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—আসুন।

যতীন নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিল—কখন এলেন?

—অনেকক্ষণ।

—বসুন। আগে একটু চা তৈরি করি।

দেবু বলিল—আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। দেবুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর। যতীন তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেবুর চোখের দৃষ্টিতে চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে!

স্টোভ ধরাইতে ধরাইতেই যতীন প্রশ্ন করিল—বলুন?

—আমি শ্রীহরির সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছি জানেন তো ?

—শুনেছি।

—শ্রীহরি খাজনা বৃদ্ধি করতে চায় টাকায় ছ-আনা আট আনা।

—ছ আনা—আট আনা। আইনে যা পাবে তার এক কড়া কম নেবে না। আমি সব সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছি।

এবার হাসিয়া যতীন বলিল—কি করবেন এখন ?

—কি করব ? দেবনাথের চোখের দৃষ্টি ঝকমক করিয়া উঠিল।—দোব না বৃদ্ধি। শুধু বৃদ্ধি নয়—খাজনাও বন্ধ করব। ধর্ম্মঘট করব।

—পারবেন ? এই তো কিছুদিন আগে কংগ্রেস কমিটি করতে গিয়ে—

বাধা দিয়া দেবনাথ বলিল—কংগ্রেস না হোক, ধর্ম্মঘট হবে। আপনাকে একটুকুন সাহায্য করতে হবে।

—আমি কি সাহায্য করব বলুন ?

চিন্তা করিয়া দেবু বলিল—অবিশ্যি আপনি আর কি সাহায্য করবেন ? তবে দরকার মত পরামর্শ টরামর্শ দেবেন। এই আর কি !

চা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল, এক কাপ চা দেবুর সম্মুখে নামাইয়া দিয়া যতীন বলিল—আমার দ্বারা যা হবে—আমি করব।

দেবু বলিল—জানি। সেই জন্যেই তো এসেছি। না এলেও আপনি করতেন, সেও জানি। প্রথম কাজ আপনাকে করতে হবে—একবার দ্বারকা চৌধুরীকে ধরতে হবে। ওরাই ছিল—এককালে আমাদের জমিদার। ওদের বাড়ীতে পুরনো কাগজপত্র আছে। সেই কাগজগুলি যাতে জমিদারদের না দিয়ে আমাদের দেয়—তাই করতে হবে আপনাকে।

—বেশ বলব আমি তাঁকে।

—তা হ'লে আজ আমি উঠলাম। চায়ের কাপটি দাওয়ার উপর রক্ষিত বালতীর জলে ধুইয়া নামাইয়া দিয়া দেবনাথ চলিয়া গেল।

সংক্ষিপ্ত-ভাষী এই লোকটিকে যতীনের ভাল লাগিল। কথার আড়ম্বর নাই, চোখের দৃষ্টিতে আগুনের আভাস আছে, কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা আছে। বসিয়া বসিয়া সে অনেক কথা ভাবিতে লা[illegible] অন্ধকার হইয়া গেল। পদ্ম আসিয়া হ্যারি[illegible] বলিল—রাত্রে কি খাবে ?

—যা [illegible]

—[illegible] ?

—[illegible]

—ক'দিনই তো হয়ে [illegible] চারেক রুটি খাও না কেনে আজ ?

—তাই গড়।

—বেশ নোক যা হোক। আমি বললাম আর 'তাই গড়' বলে দিলে ! কি ভাবছ কি ?

—নাঃ ভাবিনি কিছু ?

—ভাবছ না কিছু ? পদ্ম চলিয়া গেল। যতীন স্পষ্ট বুঝিল যে সে রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। ভাবনার কথা তাহাকে না বলাতেই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। যতীন একটু হাসিল। পদ্ম অদ্ভুত।

পদ্ম রাগ করিয়া রুটি গড়িল না। নীরবে দুধ-মুড়িই নামাইয়া দিয়া বিছানা-ঝাড়িয়া মশারি ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। যতীন বলিল—রুটি কি হ'ল ?

পদ্ম উত্তর দিল না।

হাসিয়া যতীন আদর করিয়া বলিল—মা-মণি, রাগ করেছ বুঝি ?

পদ্ম উত্তর দিল না, চলিয়া গেল।

যতীন আবার হাসিল। মেয়েটির কি দারুণ অভিমান ! অনেক সাধ্যসাধনা না করিলে এ অভিমান আর ভাঙিবে না। অথবা তাহাকে পাল্টা রাগ করিতে হইবে। সময় সময় তাহার বিরক্তি জাগিয়া ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার তাহার মন খেলাঘরের মায়ের মত ওই মায়ের জন্য কাতর হইয়া পড়ে। খেলাঘর বই-কি !

খাওয়া শেষ করিয়া সে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। কয়েকদিনের বাদলার পর আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল।

অকস্মাৎ মনে হইল—কিসে বা কেহ যেন দরজা ঠেলিতেছে। সাপের ভয়ে সে সজাগ হইয়া কান পাতিয়া রহিল। হ্যাঁ দরজা ঠেলিতেছে। শুধু তাই নয়—নিবিষ্টভাবে কান পাতিয়া থাকার মধ্যে খস-খস শব্দও

যেন শোনা যাইতেছে। মানুষ! সে উঠিল। প্রশ্ন করিল —কে?

—আমি।

—কে?

—আমি।

যতীন এবার আলোটা বাড়াইয়া দিয়া—দরজা খুলিয়া দিল। লণ্ঠনের পরিপূর্ণ আলো মুক্ত দ্বার পথে গিয়া পড়িল আগন্তুকের উপর। যতীন স্তম্ভিত হইয়া গেল। সযত্ন পারিপাট্যে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে দুর্গা। মুখে তাহার সলজ্জ মৃদুহাসি।

—কি দুর্গা? এত রাত্রে? যতীন শঙ্কিত বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুর্গার মুখের হাসি অতি সন্তর্পণে যেন চোরের মত মিলাইয়া গেল। বিবর্ণ পাংশুমুখে সে যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন আবার রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল— কি? এত রাত্রে কি দরকার?

দুর্গার ঠোঁট দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল—পরক্ষণেই সে একরূপ ছুটিয়াই পলাইয়া গেল।

যতীন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ পর কে জানে—একটি মানুষ ছায়ার মত পথ দিয়া যাইতে যাইতে লাফ দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া—ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সে হাঁপাইতেছিল।

সবিস্ময়ে যতীন প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ?

—হ্যাঁ।

—এমন ক'রে এত রাত্রে? সারাদিন কোথায় ছিলে?

দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—শালা ছিরের নতুন বাগান আজ নির্ম্মূল করে দিয়েছি। কচি কচি কলমের চারা সব! সে হাসিল।

সমস্ত দিন ঋণের জন্য ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘুরিয়া ফিরিবার পথে শ্রীহরি ঘোষের নূতন কাটানো পুকুরের ধারে আসিয়া তাহার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। পুকুরের পাড়ে শ্রীহরি আম-লিচু গোলাপজাম প্রভৃতির কলমের চারা লাগাইয়া বাগান করিয়াছিল। অনিরুদ্ধের হাতে ছিল ছোট অথচ ধারালো একটা টাঙ্গি, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়া সে সেই টাঙ্গিটা দিয়া গাছগুলাকে কাটিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মরণের জয়

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঁধোনা বেঁধোনা তরণী তোমার
আজিকে এমন রাতে
স্রোতের মাঝারে ছুটিয়া চলুক্
উছল উজান সাথে।

নদীর বুকেতে নীরদ আঁচোল
মনের বুকেতে কামনার দোল
জীবনের বুকে জেগেছে পাগল
মরণের সংঘাতে।

বেঁধোনাকো আর তরণী তোমার
এমন বাদল রাতে।

বহু-যুগ ধরি বেয়েছ এ তরী
শুধু বহিবারে খেয়া
এপার ওপার করে বার-বার
শেষ হল দেওয়া-নেওয়া।

আর নয় আর শুধু করা পার
কড়ির হিসেব করোনাক আর
ঢেউয়ের বুকেতে নাচুক আবার—
আকাশেতে ডাকে দেয়া
বহুযুগ ধরি বেয়েছ তো তরী
শুধু বহিবারে খেয়া।

আজ ছেড়ে দাও হোক্ সে উধাও
তোমার তরণী-খানি
'নেই নেই ভয়—মরণের জয়'
বাতাসেতে বাজে বাণী
উতল সলিল বলে ছল্‌ছল্
চল্ ছুটে ওরে চল্ ছুটে চল্
ভরে নে তোদের মরমের তল্
মরণের শুধা ছানি
'নেই নেই ভয়-হবে আজ জয়'
বাতাসেতে বাজে বাণী।

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়

(২)

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

বংশ-পরিচয় ও জন্মস্থান

শূলপাণির বহু গ্রন্থেই এবং পরে পুষ্পিকায় "সাহুড়িয়ান শূলপাণি" এইরূপ আছে। নবদ্বীপে ১৫১৫ শকাব্দে লিখিত শূলপাণির "সম্বন্ধ-বিবেক" গ্রন্থের পুষ্পিকাতেও ঐরূপ লিখিত আছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শূলপাণি বঙ্গের রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজে শ্রোত্রিয়বংশজাত। কারণ রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই 'ডিংসাই', 'সাহুড়িয়ান' এবং 'কুশারি' প্রভৃতি কুলোপাধি প্রচলিত আছে। "ডিংসাই" শ্রোত্রিয়গণের ন্যায় "সাহুড়িয়ান" শ্রোত্রিয়গণও ভরদ্বাজ গোত্র। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয় বংশাবলী লিখিত না হওয়ায় শূলপাণির বংশধারা পাওয়া যায় না।

Buchanon-Hamilton সাহেব তাঁহার পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট জানিয়া একাধিকবার নানাস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে শূলপাণির বাড়ী ছিল "যশোরে"।

Sulpani a Brahmin of "Yesor." (Josaore)

(An Account of the Dist. of Dinajpur p. 87)

Sulpani a Brahmin of Yasor (Jessore, Rennell) in Bengal (Purnia, Patna, 1928, p. 180)

(Vide Martin's Eastern India II. 716 & III. 137)

এই উক্তি দৃঢ়সংস্কারমূলক। যশোহর অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে এখনও শূলপাণির বংশ আবিষ্কৃত হইতে পারে। এদেশে অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রবাদরূপে বলিতেন যে, শূলপাণি নবদ্বীপে বিবাহ করিয়া সেখানেই অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করেন। তিনি কোন গুরু পাপ করিয়া শেষ বয়সে ৺কাশীধামে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদও শুনা যায়।

এখন শূলপাণির পরিচয় সম্বন্ধে একটি নূতন কথা এই যে, তিনি নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ ছিলেন। স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩০৭ সালে তৎকৃত "সম্বন্ধ-নির্ণয়ে"র পরিশিষ্ট—বংশাবলী ও মেলপ্রকরণ—প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে সূচিপত্রের শেষ ॥৮০ পৃষ্ঠার ঠিক পরের পৃষ্ঠায় দুটীই পৃথক্ কবিতা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। "বঙ্গের প্রশংসা" শীর্ষক দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা উচিত।

ভারতে কাশী, কাঞ্চী, অবন্ত্যাদি অঙ্গ।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হল আজি বঙ্গ ॥
রঘুনন্দন, রঘুনাথ, আর শ্রীচৈতন্য।
পণ্ডিত বাসুদেব, গুরুত্ব-হেতু ধন্য।
রঘুনন্দন, হরিহরজ গঙ্গাদাস পৌত্র।
কাণাভট্ট, সাহুরী, শূলপাণি-দৌহিত্র॥
বাৎস্যে বৈদিক জগ, চৈতন্য পিতা।
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা ॥
ন্যায়, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ ॥
যদিও ষট্‌কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে অল্প।
তথাপি ব্রাহ্মণ্য না করিত বৃথা গল্প ॥
ময়ূর, কুল্লূকভট্ট, আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবি-শিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥
হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী, উমাপতি।
শরণ, জয়দেব, লক্ষ্মণ-সভাপতি ॥
পঞ্চ কান্যকুব্জে কবি সংখ্যা করা ভার।
চরিত কথায় রূপ-সনাতনে প্রচার ॥

রূপ-সনাতনের পদাবলী।

বলা বাহুল্য, এই "রূপ-সনাতন" রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী ভ্রাতৃযুগল নহেন। পরন্তু নুলো-পঞ্চাননের ন্যায় কোন অজ্ঞাত রাঢ়ীয় কুলকারিকাকার হইবেন। ইহা সম্ভবতঃ জোড়া নাম নহে, একজনেরই নাম। ভণিতাটি উল্লেখযোগ্য এবং অর্বাচীন নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় অন্য যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রায় অভ্রান্ত। সুতরাং উক্ত কবিতার লেখককে অজ্ঞ বা প্রতারক বলা যায় না। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি একচক্ষু ছিলেন—এজন্য তিনি কাণভট্ট শিরোমণি নামেও প্রথিত হন। সুতরাং উক্ত কবিতার মধ্যে "কাণাভট্ট সাহুরী শূলপাণি দৌহিত্র" এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায়, রঘুনাথ শিরোমণি শূলপাণির দৌহিত্র, যে শূলপাণি সাহুরী অর্থাৎ বঙ্গের সাহুড়িয়ান শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ।

এখানে চিন্তা করা আবশ্যক যে—উক্ত লেখকের সময়ে কোন স্থানে ঐরূপ প্রবাদও না থাকিলে তিনি নিজে কল্পনা করিয়া ঐরূপ একটা নূতন কথা লিখিতে পারেন না।

কিন্তু ঐরূপ প্রবাদের মূল কি? উহা কি সত্যই অমূলক ও কল্পিত? আশ্চর্য্যের বিষয়, "সম্বন্ধনির্ণয়"কার বহুবিজ্ঞ ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কোথা হইতে ঐ কবিতা পাইয়া গ্রন্থশেষে উহা মুদ্রিত করিয়াও রঘুনাথ শিরোমণির ঐরূপ পরিচয় বিষয়ে কোন আলোচনাই করেন নাই। পরে প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ রঘুনাথ শিরোমণির প্রসঙ্গে অন্য কেহও ঐ কথার কোন আলোচনা করেন নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে "রঘুনাথ শিরোমণি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আমি ঐ কথার আলোচনা করিয়া সেই প্রবন্ধটি এক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলেও সেই পত্রিকা সম্পাদক কি কারণে তাহা প্রকাশ করেন নাই, ইহাও

এপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমরা শূলপাণি ও রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে এই নূতন কথার সম্যক্ আলোচনার ভার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপর ন্যস্ত করিয়া অদ্য এ বিষয়ে এইমাত্র বলিয়া উপসংহার করিতেছি যে, আমাদিগের নির্দ্ধারিত শূলপাণি ও শিরোমণির কাল অনুসারে শিরোমণি, শূলপাণির দৌহিত্র হইতে পারেন।

শূলপাণির গ্রন্থাবলী

স্বর্গত রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে শূলপাণির ১৩খানা গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার যে সকল গ্রন্থের সংবাদ পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) অনুমরণ বিবেকঃ—ইহা ক্ষুদ্র গ্রন্থ (৪ পত্র মাত্র)। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার উল্লেখ করেন নাই। নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে ইহার প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি।

(২) একাদশী বিবেকঃ—

(৩) কালবিবেকঃ—অনাবিষ্কৃত। শূলপাণির "দুর্গোৎসব বিবেকে" ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা…"কালবিবেকে প্রপঞ্চিতমেতৎ"। শূলপাণির প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গের মহামান্য স্মার্ত্ত জীমূতবাহনের রচিত "কালবিবেক" পৃথক্ গ্রন্থ।

(৪) তিথি বিবেকঃ—ইহার উপর শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি রচিত "তাৎপর্য্যদীপিকা" নামক টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৫) দত্তক বিবেকঃ

(৬) দুর্গোৎসববিবেকঃ—সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদ্ এই মূল্যবান্ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন।

(৭) দুর্গোৎসবপ্রয়োগ বিবেকঃ—এখনও অনাবিষ্কৃত। শূলপাণির দুর্গোৎসব বিবেকে ইহার উল্লেখ আছে (পৃঃ ১২, ১৫)—"বিশেষস্তু দুর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেকানুসন্ধেয়ঃ"।

(৮) দোলযাত্রা বিবেকঃ কাশী হইতে ১৮১৪ শকে প্রকাশিত একটি সংগ্রহগ্রন্থে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে (পৃঃ ১৪২-৪৮)।

(৯) পর্ণনরদাহবিবেকঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থও (মাত্র ২ পত্র) চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাদ দিয়াছেন। আমার নিকটে উহার প্রতিলিপি আছে।

(১০) প্রতিষ্ঠা বিবেকঃ—এখনও অনাবিষ্কৃত। শূলপাণির দুর্গোৎসব বিবেক ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১১) প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ—এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ গোবিন্দদাস রচিত টীকাসহ বহু পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে এবং বঙ্গদেশে এখনও ইহার পঠন-পাঠন প্রচলিত। এই গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত এবং উদীচ্য রামকৃষ্ণ কৃত টীকাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(১২) রাসযাত্রা বিবেকঃ—অমুদ্রিত।

(১৩) ব্রতকাল বিবেকঃ—কাশীর সংগ্রহে মুদ্রিত—১২৪-৪১ পৃঃ।

(১৪) শুদ্ধি বিবেকঃ—অনাবিষ্কৃত। দুর্গোৎসব বিবেক ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১৫) শ্রাদ্ধবিবেকঃ—শূলপাণির পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্গে এখনও ইহার পঠন-পাঠন প্রচলিত। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি, হরিদাস তর্কাচার্য্য, হরিদাসপুত্র অচ্যুত চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দানন্দ, জগদীশ-পঞ্চানন, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার এবং সর্ব্বশেষে দায়ভাগের টীকাকার প্রখ্যাত-নামা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছেন। বঙ্গে তর্কালঙ্কারের উক্ত টীকারই পঠন-পাঠন প্রচলিত।

(১৬) সংক্রান্তি বিবেকঃ—কাশীর সংগ্রহে মুদ্রিত—১৪৯-৫৬ পৃঃ।

(১৭) সম্বন্ধবিবেকঃ—এই গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৮৬৩ শকাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংপাদক অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রবিমল চতুর্দ্ধুরীণ।

এই সমস্ত নিবন্ধ ব্যতীত শূলপাণি তিনখানি টীকাগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা"র 'দীপকলিকা' টীকা মুদ্রিত হইতেছে। শূলপাণির গোভিল টীকা ও ছন্দোগ পরিশিষ্ট টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। হরিদাস তর্কাচার্য্য শূলপাণির গোভিল টীকার সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকায় একস্থলে শূলপাণি-রচিত "ছন্দোগ পরিশিষ্ট" টীকার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। *

সম্প্রতি কলিকাতা হইতে শূলপাণি-রচিত "চতুরঙ্গ দীপিকা" নামে এক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। উহা পূর্ব্বোক্ত শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের রচিত হইতেও পারে।

প্রাচীনকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র চতুরঙ্গ ক্রীড়া বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল; প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সে বিষয়েও বিশেষ শিক্ষা ও অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এখন আর কাহারও সে ক্রীড়ার অবসর নাই। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গে ধর্ম্মরক্ষার জন্য মীমাংসক পণ্ডিতগণ স্মৃতি-শাস্ত্রেরও বহু সূক্ষ্ম বিচার ও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দীতে রাঢ় দেশে নানা গ্রন্থকার মহামীমাংসক ভবদেব ভট্ট ও "দায়ভাগ"কার জীমূতবাহনের নাম জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শূলপাণি হইতেই বঙ্গদেশে নব্য স্মৃতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং অভিনব পাণ্ডিত্য প্রভাবে তিনি শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী নবদ্বীপের মহামান্য স্মার্ত্ত শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণিও স্মৃতিশাস্ত্রে শূলপাণির পাণ্ডিত্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে তাঁহার "শ্রাদ্ধবিবেকে"র টীকার শেষে অসংকোচে সগৌরবে লিখিয়াছেন—

"সন্তোব চিন্তামণি কামধেনু-হেমাদ্রি-রত্নাকর-কল্পবৃক্ষাঃ।
তুষ্টেরলং তৎপ্রতিপাদিতার্থৈ স্তত্ত্বাববোধায়তু
শূলপাণিঃ॥"

ষোড়শ শতাব্দীর পরার্দ্ধে অতি বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নিজগ্রন্থে শূল-পাণির অনেক মতের প্রতিবাদ করিলেও—অনেক স্থলে তিনিও শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়স্তু এইরূপ উক্তির দ্বারা তাঁহার প্রতি গৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আর রঘুনন্দনের গুরু পূর্ব্বোক্ত শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি কিন্তু শূলপাণির প্রতি গুরুগৌরব প্রকাশ করিতেই উক্ত টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছেন—

"ব্যবস্থা দ্বৈধ-বিভ্রান্তি-সন্তান ছেদ হে তবে।
বিবুধ শ্রেষ্ঠ বন্দ্যায় নমঃ শ্রীশূলপাণয়ে॥"

শেষ

---

* অস্মল্লিখিত "হরিদাস তর্কাচার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃঃ ৫০। কোন টীকাকারের মতে "শ্রাদ্ধবিবেকে"র দর্শপ্রকরণে শূলপাণি স্বয়ং স্বরচিত গোভিল টীকার বরাত নিয়াছেন :—"পুনরুক্তিরেব লক্ষণাবীজমিতি তত্রৈব ব্যাখ্যাতম্" (চণ্ডী-চরণের ২য় সং, পৃঃ ২২৪-৫)। "তত্রৈবেতি গোভিল টীকায়াং ময়া ব্যাখ্যাতমিত্যর্থঃ" (জগদীশ রচিত টীকা, ৩৫ পত্র)॥ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধপ্রকরণে) লিখিয়াছেন (পৃঃ ৪৭৭)—"তেন মাতরঃ পঞ্চদশ ইতি ছান্দোগপরিশিষ্ট দীপিকায়াং শূলপাণিনা স্বয়মেব বিবৃতম্"।"



স্কুল-স্লেভ্

আলেয়া

মফঃস্বলের স্কুল-সংলগ্ন বোর্ডিং।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গার ঘণ্টা বাজে।

হোটেল সুপ্রারিন্টেন্ডেণ্ট সুরেনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে আবার পাশ ফিরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুমে আবার কখন তার চোখ দুটো বুজে যায় তা সে নিজেই জানতে পারে না।

"স্যর!"—জানালায় এসে একটী ছেলে ডাক দেয়।

"কে?"—সুরেন ঘুম জড়ান কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"আমি, জিওমেট্রি টা একটু বুঝিয়ে দেবেন?"

"দিচ্ছি, এস।" ব'লে সুরেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, তারপর দরজা খুলে দেয়।

একটা ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি দুটো সমকোণের সমান, এই কথাটাই তাকে আধ ঘণ্টা ধ'রে বোঝাতে হয়। তারপর ছেলেটী বুঝতে পেরেছে ব'লে বিদায় নেয়।

সুরেন মুখ হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে বোর্ডিং-এর হিসাব নিয়ে বসে। চাকরটা এক কাপ চা নিয়ে এসে সাম্নে রেখে বলে—"বাবু, আজ রাঁধবে কে?"

"কেন, ঠাকুর কোথায় গেল?" সুরেন জবাব দেয়।

"ঠাকুরের রাতে জ্বর হ'য়েছে, সে রাঁধতে পারবে না।"

"চল, দেখছি।" ব'লে সুরেন উঠে পড়ে। দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হ'য়ে হিসাব করবারও সে সময় পায় না।

"তোমার আবার কি হ'ল ঠাকুর?" সুরেন ঠাকুরের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে।

"কাল রাত্রে খুব জ্বর হ'য়েছিল, এখনও বোধ হয় আছে—" ঠাকুর জবাব দেয়।

"তা আমাদের রান্নার কি হবে? কোন রকমে দুটো ডাল-ভাত নামিয়ে দাও না?"

"না বাবু, সে পারব না, চাকরীর জন্ম ত জান দিতে পারি না।"—ব'লে ঠাকুর শুয়ে পড়ে।

সুরেন স্তব্ধ হ'য়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভাবে—পশ্চিমা নিরক্ষর বিহারী সে বলতে পারলে 'চাকরীর জন্মে জান দিতে পারি না'; কিন্তু সে নিজে এ কথাটা বলতে সাহস করে না। বিনা পয়সায় দুবেলা দুমুঠো খাওয়া আর থাকার বিনিময়ে এই যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, এর বিরুদ্ধে তার মন প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে; বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেণ্টের এত খাটুনি—এত দায়িত্ব তা সে কোন দিন জানত না; জানলে সে কখনই বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হবার কড়ারে এ মাস্টারির চাকরী গ্রহণ করত না। অনেক সময় তার মনে হ'য়েছে যে, সে এ চাকরী ছেড়ে দেবে, কিন্তু চাকরী ছাড়া দূরে থাক, কোন দিন তারও কথাটা উচ্চারণ করবার সাহস হয় না। চাকরী ছেড়ে দিয়ে সে কি করবে? তার বিধবা মা, অনূঢ়া বয়স্থা বোন, নাবালক ভায়েদের কথা মনে পড়ে। বাপের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব যে আজ তারই ...

"স্যর, আমি এবেলা রাঁধব?"

সুরেনের চিন্তায় বাধা পড়ে।

সে বলে—"তুমি পারবে কি অমল?"

"হ্যাঁ স্যর, পারব'খন।" ব'লে সে চলে যায়।

এ বেলার মত সুরেন একটা সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পায়। ঘরে এসে আবার সে হিসাব নিয়ে বসে, কিন্তু হিসাবে মন বসাতে পারে না। ঠাকুরের কথাটাই নানা ভাবে তার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে ... প্রতি মুহূর্তে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

তার আর হিসাব করা হয় না। সুরেন উঠে পড়ে আবার রান্নাঘরে এসে হাজির হয়। অমল সুরেনকে দেখতে পেয়ে বলে—"আপনি ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? আমি সব ঠিক ক'রে নেব।"

"ভাতের ফ্যান গালবে কি করে?" সুরেন জিজ্ঞাসা করে।

"সে পারব'খন স্যর, আমার অভ্যাস আছে।"

"নয়ত আমায় ডেকো, কেমন?"

"আচ্ছা, যদি দরকার বুঝি ডাকব'খন।"

সুরেন ঘরে ফিরে এসে দেখে এক ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সুরেন তাঁকে চিনতে পারে না। কোন

কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই তিনি বলেন—"আপনি নতুন এসেছেন, আমায় চেনেন না। আমি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার।"

"আপনার নাম ?" সুরেন জিজ্ঞাসা করে।

"নিবারণ চট্টোপাধ্যায়।" বলে তিনি মুখের নিবে যাওয়া বিড়ির টুকরোটায় দু-চার বার টান দিয়ে ধোঁয়া বার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন; শেষে সেটাকে ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন বিঁড়ি ধরান। বিঁড়িটা ভালভাবে ধরেছে কি-না মুখ থেকে নামিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলেন—"আমি এলুম হস্টেল একাউণ্টস্-এর য়্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্-টা কেমন ক'রে করতে হয় আপনাকে দেখিয়ে দেবার জন্য। য়্যাব্‌স্-ট্রাক্‌ট্-এর খাতাটা বার করুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সুরেন তাঁর নির্দেশ মত য়্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্ এর খাতাখানা নিয়ে তাঁরই পাশে এসে বসে। সঙ্কীর্ণ ছোট চৌকি, একধারে বিছানাটা গুটান, আর এক পাশে দুজনকে পাশাপাশি বসতে হয়। নিবারণবাবু খাতা খুলে কোথায় কোন্ জিনিস কি ভাবে পোস্টিং করতে হয় ব'লে যান, আর সুরেন সব কিছু বুঝতে পেরেছে—এমন ভাবে ঘাড় নেড়ে 'হুঁ' দিয়ে যায়। সুরেন কোন দিন বিঁড়ির গন্ধ সহ্য করতে পারে না; নিবারণবাবুর মুখের বিঁড়ির গন্ধ তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সে ওই গন্ধ হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্য না বুঝেও অনেক জিনিসে 'হুঁ' দিয়ে যায়; কিন্তু নিবারণ-বাবু ছাড়বার পাত্র নন। একই জিনিস দুবার-চারবার বুঝিয়েও যখন বোঝাবার চেষ্টা হ'তে তিনি নিবৃত্ত হলেন না—তখন সুরেন মরিয়া হ'য়ে ব'লে ওঠে—"আজ এই পর্য্যন্ত থাক, বাকিটা আর একদিন হবে।"

"রিটায়ার করেছি বলে কি আমার আর কোন কাজ নেই—একদিনের কাজ আপনাকে দুদিনে বোঝাতে হবে ?" বলে নিবারণবাবু সুরেনের মুখের পানে চেয়ে থাকেন।

নিবারণবাবুর কথার ঝাঁজে সুরেনের ভিতরটা গরম হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে জানে নিবারণবাবুও তার একজন মনিব। কাজেই ভিতরের উষ্ণভাব চাপা দিয়ে স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে সে বলে—"না, না, আপনার কাজ নেই, সেকথা আমি বলছি না। কাল রাত থেকে ঠাকুরের জ্বর হয়েছে—তাই আমাকে রান্নার তত্বাবধান করতে হচ্ছে।"

"রাত্রে জ্বর হয়েছে, তা সকালে দুটো ডাল-ভাত রেঁধে দিতে পারলে না ?"

"পারলে আর কই; বললুম, জবাব দিলে যে, সে চাকরীর জন্য জান দিতে পারে না।"

একটু নরম হ'য়ে নিবারণবাবু বলেন—"তা হ'লে আপনাকে বড় মুশকিলে পড়তে হয়েছে ত দেখছি। চাকর দুটো আছে ত ?"

"তা আছে, তবে রান্না ত আর তাদের দিয়ে হবে না।"

"তা কি আর হয়; আচ্ছা, এখন চলি।"—বলে নিবারণবাবু উঠে পড়েন।

স্নান করতে যাবার সময় সুরেন গোলমাল শুনে একবার খাবার ঘরে যায়। জন চারেক ছেলে খালি থালার সামনে বসে গোলমাল করছিল। সুরেনকে দেখে তারা বলে—"স্যর, আমাদের ভাত দিচ্ছে না অমল।"

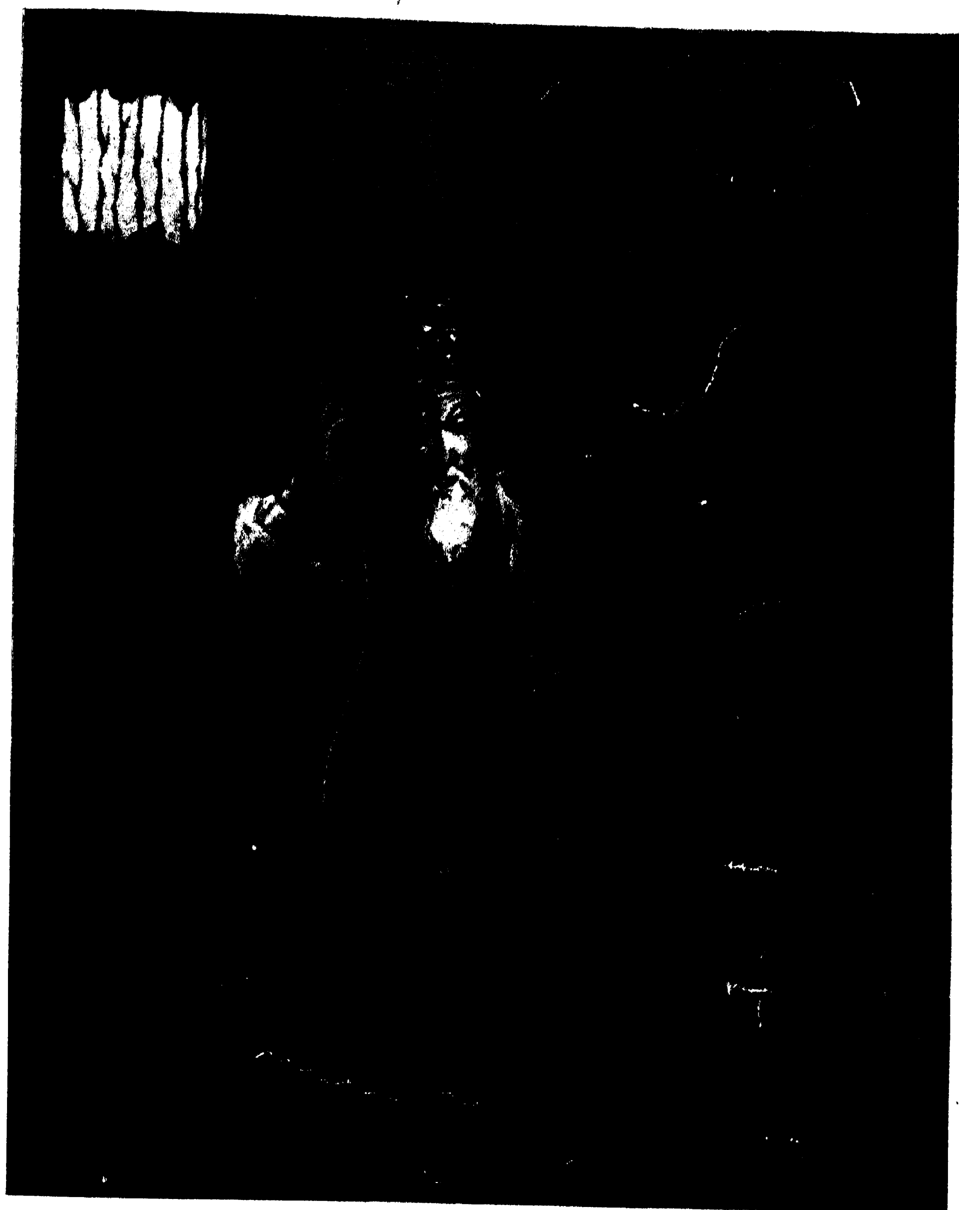
অমল কি একটা পরিবেশন করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে বলে—"ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে ওরা আসে নি স্যর, আমি একলা কত দিক সামলাব। এদের দেওয়া হয়ে গেলে তারপর ওদের আরম্ভ করব।"

"তুমি একলা পরিবেশন করছ অমল ? কেন, আর কেউ তোমায় সাহায্য করলে ত সুবিধে হ'ত।"

"কেউ না এলে কি করব স্যর ?"—বলে অমল আবার তার কাজে মন দেয়। ছেলেদের ভেতর হ'তে কেউ কোন কথা বলে না। সুরেন সকলের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে ঘর হ'তে বেরিয়ে আসে। তার কানে যায়, কে একজন বলে—"অমল, হাতা খুন্তি নিয়ে এই কাজই করিস, চেহারাটাও তোর মেদিনীপুরের বামুনদের মত ;·· মানাবে বেশ "

"তিরিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরির চেয়ে একাজ অনেক ভাল, বুঝলি ? একটার জায়গায় হাজারটা কেরানি মেলে, কিন্তু একটা রাঁধুনি বামুন সহজে মেলে না।" অমল জবাব দেয়।

সুরেন ছেলেদের ব্যবহারে মনে মনে শিউরে ওঠে। একটা ছেলের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কেমন ক'রে সবাই নির্লিপ্ত থাকে তা সে বুঝতে পারে না। ছাত্রজীবনেই যদি এতখানি স্বার্থপরতা—এতখানি শ্রমবিমুখতা ছেলেদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে, তা হ'লে সে ছেলেদের দ্বারা ভ



শিল্পী— শ্রীযুক্ত শৈলেন দাস

আলাপ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

দশের এবং দেশের কতটুকু উপকার হবে তা সহজে অনুমেয়।

প্রথম ঘণ্টা পড়িলে সুরেন অফিসে আসতে হেডমাষ্টার বলে—"আপনি থাকেন, চাকরটাকে দিয়ে ঘরগুলো ঝাঁট দিইয়ে রাখতে পারেন না ?"

"ঠাকুরের অসুখ, চাকরদুটো মোটে সময় পায় নি ; আর আপনিও ত ওদের ঝাঁট দেবার কথা বলে দিতে পারেন।" সুরেন জবাব দেয়।

হেডমাষ্টার সুরেনের দিকে একবার জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—"হোষ্টেলই শুধু চাকরের মাইনে দেয় না—স্কুল থেকেও একটা চাকরের মাইনে দেওয়া হয় ; ঘরদোরগুলোও পরিষ্কার রাখা দরকার ত ?"

"তাহ'লে সমস্ত ক্ষণ ঠাকুর চাকরের পেছনে লেগে থাকতে হয়"—ব'লে সুরেন অফিস ঘর হ'তে বেরিয়ে যায়।

টিফিনের ঘণ্টা পড়ে···সুরেন তার ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত সারা দিনটা আজ কেমন তার বেসুরো ঠেকছে। মানুষের ভেতরকার কদর্য্য নীচতার কথা ভেবে আজ সে বিচলিত হ'য়ে ওঠে।

সামনের জানালা দিয়ে সে দেখতে পায়—মাঠে এক জায়গায় এক বাদামভাজাওলা তার চেঙারি সাজিয়ে ব'সে···একটা একটা ক'রে সেখানে ছেলেদের ভীড় জমে ওঠে। সুরেন ভাবে তার নিজের তুলনায় ওই বাদামভাজাওলার জীবনও বেশী সুখের। সে কারও অধীন নয়···কারও নীচতার কাছে তাকে মাথা নোয়াতে হয় না। দিনান্তের সামান্য আয়ে সে সন্তুষ্ট···তাতেই তার দুবেলা দুটো শান্তির অন্ন জোটে।

আর সে শিক্ষিত, তবুও সংসারের যেটুকু একান্ত প্রয়োজন সেটুকুও সে তার উপার্জনের দ্বারা সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারে না। বি-এসসি পাশ ক'রে প্রত্যেক দিন কাগজের wanted pageটায় চোখ বুলান ছিল তার নিত্যকার অভ্যাস। তার ভবিষ্যত জীবনের যা কিছু আশা আকাঙ্খা, সমস্তই যেন তখন ওই পাতাটার মধ্যে নিহিত ছিল। যতদিন না পঁচিশ বছর বয়স পার হ'য়েছে ততদিন সে Government serviceএর স্বপ্ন দেখেছে। তারপর এমন একদিন এল যেদিন সে একটা নগন্য স্কুল-মাষ্টারি পেলেও নিজেকে ধন্য মনে করত। তখন শুধু বি-এসসি পাশ ক'রে চাকরী পাওয়া দুর্ঘট—হয় তার সঙ্গে Geography, নয় ত science-trained হওয়া চাই। সে ছেলে পড়িয়ে কোন রকমে যোগাড়যন্ত্র ক'রে Universityতে science-training নেবার জন্য ভর্তি হ'য়ে পড়ে। scienceএর training নেওয়ার পর সে কাগজ দেখে অনেক দরখাস্ত ক'রেছে···শেষে একদিন এই স্কুলের দরখাস্তখানাই তার কাজে লেগে যায়।

আফিস-ঘরে তখন অপর মাষ্টারদের পুরা দমে বৈঠক চলতে থাকে। বেয়ারা এসে সবাইকে এক কাপ ক'রে চা দিয়ে যায়। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার বেয়ারাকে উদ্দেশ ক'রে বলে—"নতুন মাষ্টার মশায়কে চা দিয়েছিস -"

"আজ্ঞে না ,তিনি চা খান না।" বেয়ারা জবাব দিয়ে চলে যায়।

"চা খায় না। চা খাওয়াটা ত একটা etiquette ; এ etiquette যে জানে না সে লোক বড় সুবিধের হতে পারে না। কি বলেন প্রমোদবাবু ?" ব'লে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার নিজের কথার নিজেই রসোপলব্ধি ক'রে হেসে ওঠে। প্রমোদবাবু কোন উত্তর দেয় না। প্রমোদবাবু Historyর teacher.. তিনি সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—"চিরকাল পড়িয়ে এলুম ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়ানি নিয়েছিল ; আর আজকালকার ইতিহাসে তা ৫৩লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষে এসে নেমেছে। যা ইচ্ছে লিখলেই হ'ল, নামের শেষে ত P.R.S., Ph. D. আছে, বাস।"

"আজকালকার বই লেখার কথা আর বলবেন না। যা তা লিখলেই হ'ল। আর তার মানে করতে আমাদের প্রাণ অন্ত হয়। আজকেই একটা পদ্য পড়িয়ে এলুম দধীচি ; তার শেষ লাইনে আছে—

'সাধু মহারাজ উঠ উঠ আজ দধীচি স'পিছে প্রাণ
ক্লেশে, যাগে, রণে, মেরুমরুবনে তার এ আত্মদান।'

'ক্লেশে, যাগে, রণে, মেরুমরু বনে' এর কি মানে করবেন বলুন দেখি ? একটু foot-note দেওয়া কি উচিত ছিল না ?" হেডপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করে।

"আপনি কি মানে করলেন?" হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করে।

"আমি ক্রুশে যীশুখৃষ্ট, রণে হাসান হোসেন, মরু বনে চীনের কনফিউসিয়স দধীচির মত আত্মদান ক'রেছে বলে ত বুঝিয়ে এলুম; কিন্তু যাগেও মনে হয় ওই রকম কেউ আত্মদান ক'রে থাকবে। আপনারা কেউ জানেন?" সবাইকে উদ্দেশ করে হেডপণ্ডিত প্রশ্ন করে।

অনেকেই কথাটা গোড়া হ'তে শোনে নি। কাজেই তারা হেডপণ্ডিতকে lineটা গোড়া হ'তে repeat করতে বলে। ইতিমধ্যে tiffin overএর ঘণ্টা পড়ে। সবাই যে যার ক্লাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। হেড-মাষ্টার বলেন—"সুরেন বাবু কোথায়? তাঁকে ত একদিনও tiffinএর সময় দেখতে পাই না।"

"তিনি নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন। হোষ্টেলে থাকায় ওইটুকু সুবিধা···সময় পেলেই বেশ একটু হাত-পা ছড়িয়ে গড়িয়ে নেওয়া যায়।" অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার জবাব দেয়।

সুরেন আফিস ঘরে ঢুকতেই হেডপণ্ডিত বলে—"এই যে সুরেনবাবু, আপনার কথাই হ'চ্ছিল।"

"তার জন্য ধন্যবাদ"—ব'লে সুরেন আলমারি থেকে নিজের পড়াবার বইখানা নিয়ে বেরিয়ে যায়। সবাই স্তব্ধ হ'য়ে তার যাওয়ার পথ পানে চেয়ে থাকে।

চারটায় স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজে···

সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহটাকে সুরেন নিজের বিছানায় লুটিয়ে দেয়। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'য়ে আসে। চাকর এসে ঘরে আলো দিয়ে যায়। সকাল হ'তে সারা দিনের মধ্যে তার খবরের কাগজখানা দেখবার সময় হয় না। শুয়ে পড়ে সে খবরের কাগজখানায় চোখ বোলাবার চেষ্টা করে। প্রথমেই সে কাগজের wanted pageটায় নজর দেয়। অধিকাংশ স্কুল-মাষ্টারির বিজ্ঞাপনে graduate teacher চায়, তার সঙ্গে science এবং geography দুটোরই training থাকা চাই; কিন্তু মাইনের দিক দিয়ে সেই পূর্বেকার ব্যবস্থাই বহাল আছে, শুধু qualificationই বেশী চাওয়া হ'য়েছে। মাইনে বেশী হোক আর নাই হোক, পয়সা খরচ ক'রে প্রত্যেক মাষ্টারকেই এই training নিতে হবে। না training নাও, পথ ছেড়ে দাও; ওই মাইনেতেই আর একজন trained teacher এসে উপস্থিত হবে। মাষ্টারদের জীবনই এই···শিক্ষার সংস্কারের নামে তার পিঠে বেপরোয়াভাবে বোঝার পরে বোঝা চাপান হ'চ্ছে। কিন্তু কেউ দেখে না—এরা যা পায় তাতে সত্যি এদের পেট ভরে কি না। তা ছাড়া মফঃস্বলের committee memberরা এক একটি মনিব বিশেষ—সুযোগ পেলে তাঁরা love of powerএর এক একটী জীবন্ত প্রতিমূর্তি হ'য়ে উঠেন। এই লাঞ্ছিত উপেক্ষিত মাষ্টাররাই হ'ল জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা—জাতির ভবিষ্যত-জীবনধারার পথ-পরিচালক। এম্নি আরও কিছু সুরেন চিন্তা ক'রে চলে—দৃষ্টি তার কাগজের পাতাতেই নিবদ্ধ থাকে।

হঠাৎ অমল এসে বলে—"সার, একটা explanation বলে দেবেন?"

"এস" সুরেন জবাব দেয়।

অমল তার ইংরাজী বইএর flaming tinmanএ দাগ দেওয়া একটা জায়গা দেখিয়ে দেয় Do you call his a pleasant life? I don't, we should call him a a school-slave, rather than a school-master. সুরেন যথাসম্ভব সহজ ভাষায় যখন তাকে explanation বুঝিয়ে দেয় তখন সে ব'লে ওঠে—"এ বাজে কথা সার, school-master school-slave হ'তেই পারে না। হাজার হোক, বাসন ঝালাইওলা ত, তার বুদ্ধি আর কত হবে?"

"কথাটা সে বল্লেও অমল, তার মুখ দিয়ে বলিয়েছে যে, সে একজন নাম-করা লেখক, তা জান ত?" সুরেন জবাব দেয়।

"আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না সার" ব'লে অমল চলে যায়।

সুরেন স্তব্ধ বিস্ময়ে নিজের জীবন হ'তেই ভাববার চেষ্টা করলে, কার কথা ঠিক—অমলের, না flaming tinmanএর?



গান্ধার শিল্পে বুদ্ধের জীবনী

(২)

শ্রীগুরুদাস সরকার

৮৩ ও ৮৩ এ. বি নং চিত্র অপলালের আনুগত্য স্বীকারের কাহিনী। নাগরাজ অপলাল গান্ধারে সুবাস্তু নদীর উৎপত্তি স্থলে বাস করিতেন। সুবাস্তুর বর্ত্তমান নাম "সোয়াৎ" (Swat)। নাগরাজের যে একেবারে দুষ্টবুদ্ধি ছিল না তাহা নহে। তিনি মধ্যে মধ্যে বন্যার জলে চারিদিকের পল্লী ও শস্যক্ষেত্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন, "বানভাসী"তে গ্রামবাসীদের কষ্টের আর সীমা থাকিত না। এই দুঃখ দূর করিবার জন্য বুদ্ধদেব তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার অনুচর বজ্রপাণি পর্ব্বত পার্শ্বে আঘাত করায় অপলাল এরূপ ভীত হইলেন যে তিনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বুদ্ধের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং যখন তখন বন্যা বহাইয়া জনসাধারণের বিপদ ঘটাইবেন না এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। অপলালের নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বুদ্ধদেব অপলালকে দ্বাদশ বৎসরে একবার করিয়া বন্যা উৎপাদন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চিত্রের কাহিনীটি একেবারেই স্থানীয় শ্রাবস্তী রাজগৃহ অথবা উরুবিল্ব হইতে আমদানি করা নয়। ৮৩নং চিত্রটি কতকাংশে অস্পষ্ট হইয়া গেলেও বুদ্ধদেব, অপলাল ও তাঁহার পত্নী এবং বজ্রপাণিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। নাগরাজ ও তাঁহার রাজ্ঞী উভয়েরই মস্তকের উপর সর্পফণা। অপলাল নতজানু হইয়া বুদ্ধের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পাদদেশের নিম্নভাগেই সুবাস্তু নদী। দৃশ্যটি যে পার্ব্বত্য প্রদেশের, তাহা পশ্চাদংশের বন্ধুরতার দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

৮৩নং ও ৮৩নং বি এই দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ক্ষোদিত চিত্রে পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ৮৩ নং এ চিত্রে বুদ্ধের পিছনেই বজ্রপাণি রহিয়াছেন। ৮৩নং বি চিত্রে দেখিতে পাই বজ্রপাণি পর্ব্বত গাত্রে আঘাত করিতেছেন। উভয় চিত্রেই দ্বিপত্নীক অপলাল তাঁহার দুই রাজ্ঞীসহ জল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। (এই বৃত্তার্দ্ধ দুইটির একটি যাদুঘরের গ্যালারীর পূর্ব্ব দেওয়ালে ও অপরটি পশ্চিম দেওয়ালে সংলগ্ন)।

৮৪ ও ৮৫নং মৃতা রমণীর সন্তানের চিত্র। কাহিনীটি এইরূপ —এক রাজার সর্ব্বকনিষ্ঠা রাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে তাঁহার সপত্নীগণ ষড়যন্ত্র করিয়া দৈবজ্ঞের দ্বারা এইরূপ প্রকাশ করায় যে গুর্ব্বিণী রাণী নিতান্ত অশুভ লক্ষণবিশিষ্টা এবং ইহাতে আশু বিপৎপাতের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। রাজা অমঙ্গল নিবারণের জন্য নিরপরাধা রাজ্ঞীকে জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিহেতু রাজ্ঞী মৃত্যুর পরও একটি জীবিত পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রটি পরে সুদায় নামে পরিচিত হয়। সে তিন বৎসর সমাধি মধ্যেই বাস করিয়া আর তিন বৎসর অরণ্যে বাস করিল এবং এই অরণ্য মধ্যেই ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিল। তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সঙ্গে স্থান দিলেন। ৮৪নং চিত্রে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত সমাধি প্রদর্শিত হইয়াছে। শিল্পীর পরিকল্পনায় এ স্থানটি পিশাচগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত! সমাধির মধ্যে এক পিশাচ মৃতা রমণীকে তাহার জানুদ্বয়ের উপর স্থাপন করিয়াছে এবং শিশু এই অবস্থাতেই গতপ্রাণ জননীর স্তন্য পান করিতেছে। চিত্রের ডাহিন দিকের অংশে দেখিতে পাই শিশুটি বুদ্ধের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; এখন সে একটু বড় হইয়াছে এবং হাঁটিতে চলিতে শিখিয়াছে। সমাধির ভিতর আর আবদ্ধ নহে। চিত্রকর এইরূপে সময়ের ব্যবধান বুঝাইয়াছেন! বুদ্ধ একক নহেন—তাঁহার সহিত বজ্রপাণিও আছেন। বজ্রপাণির মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে নগ্ন—দেহ বলিষ্ঠ ও পেশীবহুল। বদন শ্মশ্রুগুম্ফে আবৃত। তাঁহার মস্তক ও মুখাবয়ব গ্রীক মুদ্রায় জীউস্ (Zeus) দেবতার যে আকৃতি দেখা যায় তাহার সহিত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যযুক্ত। আরও দুইটি মূর্ত্তি বজ্রপাণির পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান; তাহার মধ্যে একটি বৌদ্ধ শ্রমণ এবং অপরটিকে, বেশভূষা দৃষ্টে রাজকুমার বা সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া মনে হয়।

৮৬নং চিত্র আনন্দকে আশ্বাস দানের চিত্র। একদা বুদ্ধদেব রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের একটি গুহায় যখন গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন মার গৃধ্ররূপ ধারণ করিয়া গুহাদ্বারে অবস্থিত বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে ভয় দেখাইয়াছিল; বুদ্ধ ধ্যানবলে ইহা জানিতে পারিয়া আনন্দকে তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত করেন। যতদূর বুঝা যায় ইহাই শিল্পীর বর্ণনার বিষয়। চিত্রে বুদ্ধদেব গুহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট, আর গুহার বাহিরে একজন শ্রমণ—ইনিই মনে হয় আনন্দ—বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতেছেন! বুদ্ধ যোগাসন ছাড়িয়া উঠেন নাই, গুহাপ্রাচীর ভেদ করিয়া নিজের ডাহিন হাতটি বাড়াইয়া প্রিয় শিষ্যের মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন আনন্দ বিষয়ক এই আখ্যায়িকাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

৮৭ ও ৮৮নং চিত্রের বিষয় শক্রের বুদ্ধ সন্দর্শনে আগমন। বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহ সান্নিধ্যে বেদিয়ক শৈলের ইন্দ্রশাল গুহায় বাস করিতেছিলেন সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র (শক্র) সঙ্গীতবিশারদ গন্ধর্ব্ব পঞ্চশিখের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎলাভের জন্য আগমন করেন। দেবরাজ দেখিলেন—শৈলশীর্ষ হইতে আলোক ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই অসামান্য প্রভায় মনে হইতেছে যেন পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে। বুদ্ধদেবকে গভীর ধ্যানমগ্ন দেখিয়া ইন্দ্র পঞ্চশিখকে বাদ্যোদ্যম সহকারে তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ নিযুক্ত করিলেন। পঞ্চশিখ বীণাবাদন করিয়া বুদ্ধের স্তবগান করিতে লাগিলেন এবং শক্রের আগমন জ্ঞাপন করিলেন। শক্র বুদ্ধ-সকাশে কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব তখনই তাঁহার প্রশ্নসমূহের সদুত্তর প্রদান করেন। তাহার পর শক্র সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতাসহকারে বুদ্ধের উপাসনা করিয়া স্বর্লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের "সক্ক-পঞ্‌হ-সুত্তন্ত" (শক্র প্রশ্ন সূত্রান্ত) অংশে ইন্দ্রের প্রশ্ন বিষয়ক এই আখ্যায়িকাটি প্রদত্ত হইয়াছে। ৮৮নং চিত্রে বুদ্ধদেব সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি যে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন তাহা মূর্ত্তির ধ্যান-মুদ্রা হইতেই সুস্পষ্টরূপে প্রকট। তাঁহার দেহ হইতে বিনির্গত প্রভারাশি অগ্নিশিখা-

সমূহের ন্যায় গুহাগাত্রে পরিব্যাপ্ত। স্থানটি যে অরণ্যসমাকুল তাহা চিত্রে নিহিত বৃক্ষাদি এবং বিবিধ পশুপক্ষী হইতে সহজেই বুঝা যায়। শক্রের শিরোভূষণের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দেবরাজ যুক্তকরে বুদ্ধ সান্নিধ্যে গমন করিতেছেন জনৈক অনুচর তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ডাহিন দিকে বীণাবাদক পঞ্চশিখ, ইহাঁর মূর্ত্তিটি খণ্ডিত হইলেও বীণার কিয়দংশ বিদ্যমান—দেবরাজের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছেন। আরও ছোট বড় অনেকগুলি দেবতা ভক্তিনম্রভাবে অগ্রসর হইতেছেন। বুদ্ধের শান্ত সমাহিত ভাব বন্যজন্তুগণের মধ্যেও যেন অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধের সিংহাসনের নিম্নভাগে কোটরে শায়িত একটি সিংহের ভঙ্গীতে এ ভাবটি যেন সুপরিস্ফুট গুহার উপরিভাগে দুইটি শাখামৃগ যেন প্রভু বুদ্ধেরই ন্যায় ধ্যানের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। সমগ্র দৃশ্যটিই যেন বুদ্ধের উপস্থিতিজনিত অলৌকিক প্রভাবে স্থৈর্য্য ও ধ্যানমগ্নতায় সমাচ্ছন্ন। ৮৭নং চিত্রটি পূর্ব্বোক্ত চিত্রেরই একটি ছোটো খাটো সংস্করণ। চিত্রের উচ্চাবচ ও অসমতল পৃষ্ঠভাগ গিরিপার্শ্ব সূচিত করিতেছে। গুহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধের নিকট যে তিনজন অগ্রসর হইতেছেন তাহার প্রথমটি বীণাবাদক গন্ধর্ব্ব পঞ্চশিখ, তৎপশ্চাৎ ইন্দ্র স্বয়ং এবং ইন্দ্রের ঠিক পিছনেই যে দেবীমূর্ত্তি তিনি সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণীই হইবেন।

[দর্শক এখান হইতে গান্ধার শিল্পগৃহের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গমন করিলে একটি কাচের আবরণযুক্ত আধারে শ্রাবস্তীর মহা প্রতিহার্য্যের চিত্র দেখিতে পাইবেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণের মতে বুদ্ধের জীবনের ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।]

৮৯নং হইতে ৯৬নং চিত্রে মহাপ্রতিহার্য্যের কাহিনী ক্ষোদিত হইয়াছে। রাজগৃহনগরে বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন তীর্থিক গুরু ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দৈবশক্তির দাবী করিতেন; ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের মধ্যে বুদ্ধ সকলের শীর্ষস্থানীয় হওয়ায় তাঁহাদের আর সেরূপ আদর রহিল না। তাঁহারা স্থির করিলেন যে সুযোগ উপস্থিত হইলেই বুদ্ধদেবকে "সিদ্ধাই"য়ের ("ঋদ্ধি—প্রতিহার্য্যে"র) প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিবেন এবং বুদ্ধকে পরাজিত করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ হইবেন। বুদ্ধ কোশল রাজ্যের শ্রাবস্তীপুরীতে গমন করিলে পর তাঁহাদের এ সুযোগ উপস্থিত হইল। তীর্থিকেরা কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট এই প্রতিযোগিতা বিষয়ে তাহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিলে অনুষ্ঠান কালে কি কি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে তাহা জানাইলে—প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় জানাইলেন এবং লোক হিতার্থে তাঁহাকে স্বমহিমা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধের সম্মতি গ্রহণ করিয়া প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী ও জেতবনের মধ্যস্থলে, কেবল প্রভু বুদ্ধের জন্য অতি বৃহদায়তন একটি প্রতিহার্য্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। তীর্থিকেরাও এইরূপ একটি মণ্ডপ নিজেদের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিযোগিতার প্রতীক্ষায় রহিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সপার্ষদ রাজা অনুচরাদি সঙ্গে লইয়া নিজ নির্ম্মিত মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থিকেরাও আসিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আসিল এক বিশাল জনপ্রবাহ। সকলে আপন আপন আসন পরিগ্রহ করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেই ভগবান বুদ্ধ ব্যোমপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি মণ্ডপে প্রবেশ করিতেই মনে হইতে লাগিল যেন প্রজ্বলিত অগ্নির ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র মণ্ডপ আলোকিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা-নিচয়ের পারম্পর্য্য বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (১)। সুবর্ণপ্রভ আলোকে নিখিল বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হইল (২)। গণ্ডক ও রত্নক নামক দুইজন মালাকর যথাক্রমে উত্তর কৌরব দ্বীপ হইতে একটি কর্ণিকার বৃক্ষ এবং গন্ধমাদন হইতে অশোক তরু আনয়ন করিয়া মণ্ডপের পশ্চাদ্দেশে রোপণ করিল (৩)। বুদ্ধ ভূতলে পদার্পণ করিতেই পৃথ্বীমণ্ডলে ছয় প্রকার বিভিন্ন কম্পন অনুভূত হইল এবং সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই গগন মণ্ডলে উদিত হইলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে বুদ্ধের মস্তকে পদ্মপুষ্প ও অন্যান্য কুসুমদাম বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দৈব ধূপের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল। বাদিত্রসমূহের স্পন্দনে এবং দিব্য বসনাদির বিচিত্র আন্দোলনে ত্রিদিব হইতে ভগবান বুদ্ধের গৌরব ঘোষিত হইল (৪)। বুদ্ধ আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার দেহ হইতে প্রভাপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কাঞ্চনাভ আলোকে মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল। তাহার পর শূন্যমার্গ অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেব একই কালে, দণ্ডায়মান, পাদক্ষেপ রত, উপবিষ্ট ও শায়িত এই চারি বিভিন্ন ভঙ্গীতে চারিদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ হইতে পর্য্যায়ক্রমে অগ্নিশিখা ও বারিধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তৎকালে সুরলোকবাসিগণ শক্র ও ব্রহ্মাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া বুদ্ধসকাশে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা ও তাঁহার সঙ্গীগণ বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া এবং তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। শক্র ও তাঁহার অনুচরগণও এইরূপে যথাবিধি প্রণাম ও পরিক্রমাদি সমাপন করিয়া বুদ্ধের বাম পার্শ্বভাগে স্ব স্ব আসনে সমাসীন হইলেন। হঠাৎ ভূপৃষ্ঠ হইতে একটি স্বর্ণময় সহস্রদল পদ্ম উত্থিত হইল; তাহার বৃন্তটি মণিরত্নাদিতে নির্ম্মিত। বুদ্ধ সেই পদ্মাসন অধিকার করিলেন। নন্দ ও উপানন্দ নামক নাগরাজদ্বয় বৃন্তটি ধরিয়া রহিল। বুদ্ধের নিজদেহের স্বয়ংসৃষ্ট অসংখ্য প্রতিকৃতি চারিদিকে বহুধা বিসৃত হইতে লাগিল; কতকগুলি ঊর্দ্ধগগন অতিক্রম করিয়া স্বর্গধামেও পঁহুছিয়া গেল। তাহার পর প্রসেনজিৎ বৌদ্ধমত বিরোধী ধর্ম্মনায়কদিগকে স্ব স্ব শক্তি প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। সেই সময় যক্ষ সেনাপতি পাঞ্চিক (Panchika) সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহাতে তীর্থিকেরা মিছা গোল বাধাইয়া বুদ্ধ ও সঙ্ঘকে আর অনর্থক দীর্ঘকাল উত্যক্ত করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা তখন আর পলাইবার পথ পাইল না। এইরূপে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইল। "প্রতিহার্য্য" (miracle) দর্শনেচ্ছু বিশাল জনসঙ্ঘের কল্যাণার্থ বুদ্ধ ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে বুদ্ধের ধর্ম্মজীবনের প্রথম ভাগে শ্রাবস্তীর এই লোকপ্রসিদ্ধ প্রতিহার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকোত্তর মহাপুরুষগণ তারুণ্যের মদগর্ব্ব একবার অতিক্রান্ত হইলে যে নিজ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কোনও প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইবেন তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। একখানি খরোষ্ঠী লিপিতে এই প্রতিহার্য্য সম্পর্কে বুদ্ধকে "জিনকুমার" অর্থাৎ তরুণবয়স্ক "জিন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ যে প্রতিযোগিতা বিষয়ক সর্ত্ত পালনে অসমর্থ হইয়াছিল, লিপিতে তাহারও উল্লেখ আছে।* (ক্রমশঃ)

* (স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের পরিচিতি অবলম্বনে)

স্বপ্ন-বিলাস

শ্রীগৌতম সেন

এতদিন পরে মাঝের ছোট বাড়ীটাকে যেন অকস্মাৎ বিদ্রূপ করিতেই পাশের দুই বড়-বাড়ী মাথা চাড়াইয়া উঠিল। একতলা বাড়ী তিনতলা হইল। দুই বাড়ীর বড়-বড় কথা, তীক্ষ্ণ হাসি, ছোট-বাড়ীর মাথা ডিঙাইয়া আনাগোনা করে। উহারাই আজ নিকট প্রতিবেশী। হয়তো এতদিন ঐ ক্ষুদ্র বাড়ীটা তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টিরোধ করিয়া দম্ভই প্রকাশ করিতেছিল, আজ তাহারা সেই ব্যবধান-দম্ভকে দলিত করিয়া আগ্‌বাড়াইয়া পরস্পর মিলিত হইল।

ছোটবাড়ীর বিজন আপন মনেই গজ্‌ গজ করিতে থাকে, 'বাড়ীটাকে অন্ধকার ক'রে ছাড়্‌লে। যেন ওরাই পৃথিবীর মালিক!' থাকিয়া থাকিয়া একটা অক্ষম রুদ্রতা তাহার বুকের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া আবার আপনিই থামিয়া যায়।

মাথার উপর সহসা কে যেন কলকণ্ঠে হাসিয়া ওঠে! বিজন চাহিয়া দেখে, বড় বাড়ীরই একটা মেয়ে।— সাম্‌নের বাড়ীর জানালা তো একটিও খোলা নাই! তবে?

নিজেদের অপ্রশস্ত আঙিনাটি ততোধিক অপরিচ্ছন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই পাশে ফালি-রোয়াকটিতে বৌদি একমনে তরকারি বলিয়া রাজ্যের জঙ্গল কুটিয়া চলিয়াছে। হয়তো তাই দেখিয়াই—

কিন্তু মেয়েটি তখন চলিয়া গিয়াছে। উঠানের মাথার ঐ অল্প ফাঁকটুকু বিজন যদি আজ এই দণ্ডে বুজাইয়া দিতে পারিত! কিন্তু কেনই বা দিবে? দীনতাকে ঢাকিয়া বেড়াইবার মত হীনতা যেন তাহার কোন দিন না আসে। গলা উঁচাইয়া বিজন বলিতে লাগিল—বৌদি, শাক-চচ্চড়ি অনেকেই খায়—তবে তেতলার ওপরে এর অনেক নাকি ইজ্জৎ!

বিন্দু না বুঝিয়া হাসে।

—লোক ঠকিয়ে আজো যারা বড়লোক হ'তে পারেনি, তাদের অপমান ভগবানের বুকে কেটে-কেটে লেখা হ'য়ে যাচ্ছে।

—চুপ্‌ চুপ্‌—বলিয়া বিন্দু একবার উপরের চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া আনিল। বিজন বড়লোকের নাম পর্য্যন্ত সহিতে পারিত না। তাই কথা না ঘাঁটাইয়া বিন্দু বলিল—সবাই তো সমান হয় না ঠাকুরপো!

—ও সব সমান, সব সমান। তোমাদের সঙ্গে একটা কথা বলেছে কোন দিন? মাথা ডিঙিয়ে আলাপ হ'লো কি না ওদের সঙ্গে! আমিও ব'লে রাখ্‌ছি বৌদি, তুমি দেখে নিও—

আর সে বলিতে পারে না। কি যে বলিতে গিয়া ঘোলাইয়া ফেলে, নিজেও তাহার সঙ্গতি খুঁজিয়া পায় না। হয়তো তার অর্থ ই হয় না।

বিন্দু মুখ তুলিল, ডাগর চোখ দুটি টল্‌ টল্‌ করিয়া উঠিয়াছে। বলে, তুমি রাজা হও ভাই!

বিজন 'তা কেন, ধ্যেৎ' বলিয়া উপরের চারিদিক একবার দেখিয়া লইল। দেখিল, উপরের জান্‌লাগুলি আবার কখন খুলিয়া গিয়াছে। দুই বাড়ীর অভিজাত-আলাপন! নীচেকার এই একতলা বাড়ীটার দিকে তাহারা ভুলিয়াও চায় না!

বিজন গলা চড়াইয়া দিল, ছাদে যাওয়া বন্ধ ক'রে দাও বৌদি, কেন যেচে আলাপ করা! কম্‌লি তো একটা হাবা, ও আবার ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে দেখে!

উপরের চোখ নীচে নামিল। মনে হইল, মেয়েটা যেন হাসিয়াই জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিল।

বিজন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বিন্দুর অতি কাছটিতে সরিয়া আসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌদি, আমরা তো অন্য কোথাও উঠে গেলে পারি।

—কেন উঠ্‌তে যাব ভাই! আমরা কি কারুর চেয়ে ছোট?

বিজনের খুব ভাল লাগিল। এমন করিয়া সে নিজেদের কোন দিন বিচার করিয়া দেখেনি। বিচার আজো যে সে কিছু করিয়াছে এমন নয়, তবু কথাটি ভাল লাগিল। কম্‌লি ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছিল, উপরে নাকি কলের গান হইতেছে।

বিজন হাঁকিল, কোথায় চলেছো ?

—ওপরে।

—না।

—ইস্ !

কথা বাড়িয়াই চলিত, কিন্তু বিন্দু আসিয়া কম্‌লিকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিল। বলিল, হ্যাংলাপনা কর্‌তে নেই, ওতে লোকে আঙুল দেখিয়ে হাসে।

কম্‌লি কি বুঝিল কে জানে। গজ্ গজ্ করিতে করিতে রান্নাঘরে গিয়া বসিল।

উপরের বাতাস গানের সুরে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পাশের ঘরে শাশুড়ী বাতের বেদনায় গোঁঙাইতেছেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিন্দু রান্নাঘরে আসিয়া ঢোকে। বিজন বলে মিথ্যা নয়—মোটর হাঁকাইয়া, মাটি কাঁপাইয়া, গলা ফাটাইয়া, নিরন্তর নিজেকেই জাহির করিবার চেষ্টা। রান্নাঘরে বিন্দুর চোখের সম্মুখে অসংখ্য মোটরের আনাগোনা চলিতে থাকে !

ছোট ভাই শোনে না, শাসনও মানে না। ছুটিয়া ছুটিয়া ঐ বড়-বাড়ীরই ছেলেদের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। তাহারা তাহাদের খেলা-ঘরে লইয়া যায়। সেখানে কত রং-বেরং-এর খেলনা, ছোট্ট মোটর, ছোট্ট সাইকেল। বলে, রোজই তাহাকে চড়িতে দেয়।—

বিজন চাহিয়া দেখে, তাহাদেরই লক্ষ আত্মীয় বড় ঘরের পাশে পাশে বাসা বাঁধিয়া উল্লাস করিতেছে ! এ যে যুগ-যুগান্তরের পাপ ! তাহার ভাই—শিশু ভাই, কতটুকুই বা বোঝে ! বৌদিকে ডাকিয়া বলে—গরীব কখন বড়লোক হয় না বৌদি ! ও জাতই আলাদা।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারে না। শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলে, বোধ হয়।

কম্‌লি ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। দাদাকে লুকাইয়া উপরে আসিয়া মুগ্ধনেত্রে সেই ঝক্ ঝকে বাড়ীটার দিকে চায়। সারি সারি রুদ্ধ জানালার ওধারে কি হইতেছে কে জানে ! হয়তো বসিয়া বসিয়া সারাদিন তাহারা কলের গানই শুনিতেছে ! রুদ্ধ জানালা খোলে, আবার বন্ধ হয়। তাহাদের মিলিত কণ্ঠের অস্ফুটব্যঞ্জনা ঐ কলের গানের মতই মধুর হইয়া কানে আসে। কম্‌লি যেন আর এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে।

বৌদি বলে—তুই কি করিস বল্ তো ছাদে ব'সে ব'সে ?

কি যে করে, কি বলিবে ? যদি ছুটিতে পাইত, তবে একবার ছুটিয়া দেখিয়া আসিত। কথা না-বলিবার অহঙ্কার তাহাদের নিজেদেরও তো কম নয় ! একজনকে তো প্রথম কথা বলিতেই হইবে !

বিন্দু হাসিয়া ছাদের দিকে তাকায়। বলে, তোর দাদাকে ব'লে কতকগুলো ফুলের টব আনিয়ে নে না ভাই ! ছাদে বেশ মানাবে।

কম্‌লি ইহার অর্থ করিতে পারে। পয়সা অভাবে বিয়েই না হয় হয়নি। বলিল, ধ্যেৎ—তা কেন, ছাদে বেশ হাওয়া।

বিন্দু টিপিয়া টিপিয়া হাসে। সে হাসিতে কম্‌লির সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে থাকে। কথা না বলিয়া সে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া দেয়।

—শোন্ শোন্, ও-বাড়ীর রমেনবাবুর তিনখানা মোটর।

কম্‌লি পলাইল না, হাসিতে চেষ্টা করিল কিন্তু চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। এই নির্লজ্জ-রসিকতার পরে পালানো চলে না বলিয়াই এমন করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। বৌদি কি তাহার ছাদে যাওয়ার শেষে এই অর্থই করিল ? সারা-মন তাহার ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া ওঠে।

এতটা হইবে বিন্দু ভাবে নাই। বলিল, ঠাট্টা বোঝ না ভাই ! নইলে, কোথায় রমেনবাবু আর কোথায় আমরা !

ইহার পর কম্‌লির ছাদে-বসা আরো সহজ হইয়া আসিল। বিন্দুও তাহার সহিত মাঝে মাঝে আসিয়া বসে। বলে, আঃ—বাঁচ্‌লাম। ঘর তো নয়, গুদামঘর !

মুক্ত নীলাকাশের মায়া-মোহ ! ভুলিয়া যায়, তাহার ছোট্ট ঘরকন্নার অসংখ্য বিশৃঙ্খলা ! ভুলিয়া যায়, ছাদের নীচে তাহার সেই অন্ধকার ঘরগুলি আলো করিয়া আছে—তাহারই স্বামী, পুত্র, দেবর !

বিজন ডাকে—বৌদি !

বিন্দু ব্যস্ত হইয়া আবার নীচে নামিয়া আসে।

সেদিন মা কম্‌লিকে ডাকিয়া বলিলেন—ছাদে ছাদে অত ঘুরিস্ নে মা ! বিজন বল্‌ছিলো—ওদের রমেনটা না কি চব্বিশ ঘণ্টা জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন? কে রমেন?—কম্‌লি নির্ব্বোধের মত মা-র মুখের দিকে চায়।

মা বলিলেন—কাজ কি মা! লোকে নিন্দে করবে বই তো নয়।

কিন্তু কম্‌লি ছাদে যাওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। বৌদিকে গিয়া বলিল—সত্যি বল্‌ছি বৌদি, আমি রমেনবাবুকে চোখেই দেখিনি।

--রমেনবাবুর তো ভারী অন্যায়। চুরি ক'রে কেবল নিজেই দেখেন!

কম্‌লি রাগিয়া-কাঁদিয়া অনর্থ করিল।

—বৌমা!—পাশের ঘর হইতে আহ্বান আসিল।

—পোড়ামুখীর যা মনে আছে করুক।

কম্‌লি সোজা ছাদের উপর উঠিয়া আসিল। কে সে রমেন, আর কেনই বা সে জান্‌লার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে, আজ সে দেখিবে। কিন্তু দেখিবার বাতায়নগুলি সব বন্ধ। রুদ্ধ-আক্রোশে কম্‌লি ছাদময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ ঐ রুদ্ধঘরের মায়া তাহাকে ভোলাইতে পারে না! বরং চোখে তাহার অপমানের জ্বালা, মনে তাহার গুম্‌রে-ওঠা কান্না!

—দিদি, কু!

কম্‌লি এদিক-ওদিক চায়। বড়-বাড়ীর জানালা সশব্দে বন্ধ হইয়া যায়। আবার খোলে, আবার বন্ধ হয়। আর প্রতিবারই তাহার পরিচিত স্বর 'কু' 'কু' করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে!

সুধীনের হাসি আর থামে না, হি হি হি হি ···

কম্‌লি উপরে চাহিয়াই চোখ নামায়। তাহার ভায়ের পাশে—ঐ কি তবে রমেনবাবু? কম্‌লি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। পা ওঠে না! মুখ ফুটাইবার কথা মনে হইতেই আপন মনে জিভ কাটিয়া বসে।

সেদিন সুধীনকে একা পাইয়া কম্‌লি সকল কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইল। ওদের বাড়ীতে কে-কে আছে, রমেনবাবুরা ক'ভাই, রমেনবাবু কি বলে—

সুধীন অনর্গল বকিয়া চলে। যেন দম দেওয়া একটি গ্রামোফোন। ও-বাড়ীর যত কথা সে এতদিন ধরিয়া জমাইয়া তুলিয়াছে, আজ প্রাণ খুলিয়া বলিতে পাইয়া তাহার খুশী আর ধরে না! বলে, তুমি চল না একদিন দিদি, আমি রমেনবাবুকে বল্‌বো, রমেনবাবু কিচ্ছু বল্‌বে না—খুব ভাল লোক।

—না, তোর রমেনবাবু খুব খারাপ লোক।

সুধীনের মন ভাঙিয়া পড়ে। তাহার দিদি কিচ্ছু জানে না, রমেনবাবু কখন খারাপ লোক হয়! বলে, হাঁ, তুমি তো ভারী জান!

সুধীনের আর কথা জমে না। সে ছুটিয়া আবার ও-বাড়ীতেই যাইতে চায়। কম্‌লি তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে, তুই যেন আবার বলিস্‌নে রমেনবাবুকে।

সুধীন মজা পাইয়া নাচিয়া ওঠে। ছুটিতে ছুটিতে বলে—বল্‌বোই তো—হাঁ, বল্‌বোই তো।

—কি রে, কি সুধীন? বলিতে বলিতে বিন্দু আসিয়া দাঁড়ায়।

—ঐ রমেনবাবুর কথা, জান, বৌদি—

কম্‌লির সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল সুধীনের উপর। বলিল—দাঁড়া, দাদা আসুক, তোর ও-বাড়ী যাওয়া বার্ করছি।

কথাটা বিন্দু স্বামীর কাণে অন্য ভাবে তুলিল। বলিল, ও-বাড়ীর রমেনবাবুর বোধ হয় কম্‌লিকে ভাল লেগেছে। একবার দেখো না চেষ্টা ক'রে।—অমন জামাই পাওয়া যে ভাগ্যের কথা।

গিরীন ক্লান্ত হইয়াই আসিয়াছিল। বিন্দুর কথা শুনিয়া চোখ বুজিল।

—তুমি যে চোখ বুজ্‌লে! ওগো শুন্‌ছো?

—হাঁ, শুন্‌ছি। তবে চেষ্টা আমি কিছু করতে পারবো না, শেষটা কি অপমানিত হ'ব?

কথা মিথ্যা নয়। বিন্দু এমন আভাস সত্যই কিছু পায়নি। তবু বলে—আমরা বুঝ্‌তে পারি গো, বুঝ্‌তে পারি; তুমি দেখে নিও, রমেনবাবু শোন্‌বামাত্র লাফিয়ে উঠ্‌বে।

গিরীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—কম্‌লি তা হ'লে বড়-ঘরেই জন্মাতো। ওদের বিধাতা-পুরুষ কেবল ওদেরই সৃষ্টি করেন।

—আর আমাদের বিধাতাপুরুষ কেবল আমাদের, নয়? বলিয়া বিন্দু হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়ে।

—সত্যিই তাই। আমাদের সঙ্গে ওদের কোন মিল

নেই—এমন কি চেহারাতেও নয়। এক-শিল্পীর হাতে এতখানি পার্থক্য হয় না বিন্দু! বলিতে বলিতে গিরীন অন্যমনস্ক হইয়া যায়।

বিন্দুও যে বোঝে না এমন নয়। সে তো নিয়তই দেখিতেছে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন, স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র পৃথিবী! পাশের পৃথিবী, রঙিন্ পৃথিবী—চোখ ঝলসাইয়া দেয়! সেখানে তাহাদের জন্য এতটুকু সম্ভাষণও অপেক্ষা করিয়া নাই! উহারা গরীবের বিস্ময়!

কম্‌লিকে ডাকিয়া বিন্দু অনেক কথাই জানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কম্‌লি নাকি বড় চাপা, কিছুই ভাঙে না। মা শুনিয়া বলিলেন, ভগবান মুখ তুলে চান—কম্‌লির কি আর সে ভাগ্য হবে!

কম্‌লি হাসে। সে সকল কথারই অর্থ তো বোঝে। কিন্তু কোন কথারই আজ যেন সে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছে না! শুধু কানাকানির রেশটুকু তাহার মনকে দোলাইতে থাকে।

মা ডাকিয়া বলিলেন, কি ক'রে বেড়াস্ মা! কত মেয়ের কত সাধ থাকে, কাপড়-জামার তো অভাব নেই। চুলটা হয়েছে দেখ, যেন কাকের বাসা! আয় বোস্ দেখি। বলিয়া তাঁহার রোগ-শীর্ণ দেহখানি সোজা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।

—তুমি উঠো না মা, আমি বৌদির কাছে—বলিতে বলিতে কম্‌লি ছুটিয়া পলায়। রাজ্যের লজ্জা আসিয়া আজ তাহাকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। রমেন যেন তাহার স্বপ্নে-পাওয়া রাজকুমার! আজ এইমাত্র সেই রাজকুমার তাহার কানে কানে বলিয়া গেল, তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি। তাহার সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া একটি গানের সুর প্রতি নিয়তই গুন্ গুন্ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

বিজন বলে—কম্‌লির তো আজকাল মাটিতে পা পড়ে না মা।

মা হাসেন। কম্‌লির সারা মুখখানি রাঙা হইয়া ওঠে। ইচ্ছা করে, তাহাদের একবার কোমল স্বরে শোনাইয়া দেয়, সে ওদের বাড়ীর মত হইবে না, সকলের সহিত যাচিয়া আলাপ করিবে, সকলকেই সে ভালবাসিবে। কিন্তু সেই অনুচ্চারিত কথা ব্যথার শতদল হইয়া তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে! মা বুঝিতে পারেন। বলেন, না, কম্‌লি আমার সেরকম হবে না। ও তো জানে, গরীব হওয়ার কি দুঃখ।

কম্‌লির চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। দুঃখে নয়, বেদনাতেও নয়; অকারণ আশা ও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা মিলিয়া তাহার ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে।

বিজন বলিতে ছাড়ে না। বলে, হাঁ, ও আমার জানা আছে, বাড়ীতে মোটর বাঁধা দেখ্‌লেই—

—যা-তা বলো না বল্‌ছি, ভাল হবে না। বলিয়া কম্‌লি কাঁদিয়া ফেলে।

চির-রুগ্না মাতা রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া সারাক্ষণ কম্‌লির মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন! ঐ মুখে আজ তিনি রাণীর সকল লক্ষণই মিলাইয়া পাইতেছেন! স্বপ্নের মত তাঁহার চোখে ভাসিয়া ওঠে—কম্‌লির সর্ব্ব-অঙ্গে মণিমুক্তার ঝল্‌মলানি! মা-র চোখ সজল হইয়া ওঠে। তিনি কি চোখে দেখিয়া যাইতে পারিবেন!

কম্‌লির এক-একটি দিন যেন এক-একটি বৎসরের মত দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে! তাহার বুক স্পন্দিত হইয়া ওঠে। ছাদে যাইতে লজ্জা করে, হয়তো রমেনবাবুর সঙ্গে চোখো-চোখিই হইয়া যাইবে। যাব না, যাব না—করিতে করিতেও কম্‌লি দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার ছাদে আসিয়া বসে।

বিন্দু কাণের কাছে সুর ধরে—'যমুনাতে আর যাব না'—

কম্‌লি আর রাগে না। বরং বলে—চল না বৌদি, ছাদে ব'সে আস্তে আস্তে গাইবে।

মার চোখে ঘুম নাই। গিরীনকে তাড়া দেন, গিরীন রাগিয়া ওঠে। বল, কোথায় কি—তোমরা যে সবাই খেপ্‌লে!

মার মুখ শুকাইয়া যায়। তবে কি রমেন কিছু বলিয়াছে! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন, রমেন কি বললে?

—রমেন আবার কি বল্‌বে? ও-সব বড়ঘরের আশা ছেড়ে দাও মা! আমি মুখ হাসাতে পার্‌বো না।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। গিরীন তবে এখনও বলেনি! হাসিয়া বলিলেন—ওরা বড়লোক, নিজে এসে কি বল্‌বে কিছু!

গিরীন কিছুই বুঝিতে পারে না, রমেন সম্বন্ধে ইহাদের এতখানি নিশ্চিন্ততা কিসে আসিল? জানালায় দাঁড়াইয়া

কম্‌লির দিকে যদি চাহিয়াই থাকে, তাতে কি? ভাবিতে ভাবিতে গিরীনের মাথার মধ্যে তাল পাকাইয়া যায়। বলে, কম্‌লিকে ছাদে যেতে বারণ ক'রো মা!

কম্‌লি আড়ালে দাঁড়াইয়া শোনে। বুকটা তাহার ছাৎ করিয়া ওঠে! রমেনবাবু যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এ যেন তাহার ধারণারও অতীত। কিন্তু একটা বোঝাপড়া না হইলেই বা চলিবে কেন? লোকে যে নিন্দা করিবে! তাহারা তো অত-শত বুঝিবে না। হয়তো একটা বিশ্রী—

কম্‌লির মুখ-চোখ রাঙা হইয়া ওঠে।

বিন্দু আসিয়া বলে—কিলো, আজ যে রাই ঘরের কোণে?

বিন্দুকে কম্‌লির আর লজ্জা করিবার কিছু ছিলো না। বরং নিজের তোলাপাড়া মনটাকে খোলসা করিবার জন্য বিন্দুকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তাহার দাদার কথা, তাহার মা-র কথা, তাহার নিজের কথা—

বিন্দু হাসিয়া বলে, 'ফুল ফুট্‌বে, সখি, ফুল ফুট্‌বে।'

আশ্চর্য্য এই বিন্দু! হাসিটি তাহার লাগিয়াই আছে। গিরীন বলে, তুমিই এই সংসারটাকে হাল্কা ক'রে রেখেছো, নইলে এতদিন গুম্‌রে গুম্‌রেই শেষ হ'য়ে যেতো। একদিকে যেমন অভাবের জট্ পাকাইয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে তেমনি এই লঘুচ্ছন্দা নারীটি হাসি, গানে, গল্পে, কৌতুকে সকলকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। ও যেন হাল্কা-হাওয়ার মত কাল-মেঘকে সরাইয়া চলিয়াছে।

বিন্দুর হাসি আর ধরে না। ছাদে আসিয়া কম্‌লিকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। বলিল—নীচে, কে এসেছে দেখ্‌বি চল্।

কম্‌লির বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। তবে কি, রমেনবাবু—

—আঃ, ছাড় না বৌদি, আমি যাব না বল্‌ছি, যাও—বলিয়া কম্‌লি ঠোঁট পাকাইয়া ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিল।

—ইস্, দেখিস্।

যাইতে আর হইল না। যাহাকে দেখাইবার জন্য এতখানি কসরৎ, সে নিজেই সুধীনের হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

বিন্দু বলিল, এসো ভাই, এসো।

কম্‌লি একবার চাহিয়াই চোখ নামাইয়া ফেলিল। অপরিচিতা হইলেও সে যে রমেনবাবুর বাড়ীরই কেউ, ইহা বুঝিতে কম্‌লির বিলম্ব হইল না। আর এই অকস্মাৎ আগমনের অন্তরালে যে-কথা অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা মনে করিতেও কম্‌লির সর্ব্বশরীর ঘামিয়া উঠিল।

সুধীন অনেকক্ষণ হইতে চুপ করিয়া আছে। যাহাকে আজ টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, সে যে তাহার বীণাদি—এই পরিচয়টা কি করিয়া এবং কতক্ষণে ইহাদের মধ্যে প্রচার করিয়া দিবে, তাহাই ভাবিয়া সে নিজের মনে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কিন্তু তাহার বীণাদি সমস্তই মাটি করিয়া দিল! সে নিজেই বলিয়া বসিল —আমি রমেনবাবুর বোন।

—জানি ভাই, সুধীন কি বল্‌তে আর কিছু বাকি রেখেছে। রাতদিন তোমাদের কথা! ঐ বুঝি টান্‌তে টান্‌তে এখন নিয়ে এলো? বলিয়া বিন্দু হাসিল।

বীণা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, চলুন না—আজ বায়স্কোপে যাই, খুব ভাল বই আছে।

বিন্দু মহামুশকিলে পড়িল। গিরীন এখনও বাড়ী আসেনি। অথচ আলাপের এই সুযোগ হারাইতেও তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। হয়তো রমেনবাবুই কৌশল করিয়া তাঁহার এই বোনটিকে পাঠাইয়া থাকিবেন। বলিল, বসো ভাই, আমি মাকে জিগ্‌গেস ক'রে আসি।

মা খুশী হইয়া মত দিলেন। অমনি সাজ-গোজের ধুম পড়িয়া গেল। যেখানে যাহা তাহাদের মূল্যবান সামগ্রী ছিল, সকলগুলি কম্‌লির গায়ে চাপাইয়া দিয়া তাহারা রমেনবাবুর মোটরে আসিয়া বসিল। সাজ দেখিয়া বীণা মুখ টিপিয়া হাসিল।

কম্‌লি সারা পথ আর মুখ তুলিতেই পারিল না। তাহার এত কাছে এবং একই মোটরে রমেনবাবু, ইহাই মনে করিয়া তাহার লজ্জার আর অন্ত ছিল না!

তারপর—বায়োস্কোপের সেই দীর্ঘ দুটি ঘণ্টা! বীণা তাহার বন্ধুদের লইয়া হাসি গল্পে মাতিয়া উঠিল। সহস্র কুতূহলী প্রশ্ন, ওরা কে? কোথায় থাকে?

বীণা কানে কানে কি বলে, তারপর আর তাহারা ফিরিয়াও চায় না! বীণা যেন এখানে আসিয়া, ইচ্ছা করিয়াই তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিল! এ কি তবে অনুগ্রহ? মুহূর্ত্তে বিন্দুর মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল! আর কম্‌লি? সে তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল!

হয়তো, পর্দ্দার নায়ক-নায়িকার সহিত তাহার ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে কুঁদিয়া কুঁদিয়া নিজের বুকের পর্দ্দায় আঁকিয়া লইতেছিল।

ছবি শেষ হইল। বীণা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন?

কম্‌লি একমুখ হাসিয়া বলিল, বেশ।

বিন্দু মরমে মরিয়া গেল! তাহার যেন মনে হইল, গরীবের মুখে এই খুশীর কথাটুকু শুনিবার জন্যই ইহারা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। নহিলে সঙ্গে আনিবার আর কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু কেন এসব কথা সে মনে করিতেছে? হয়তো নাও হইতে পারে। হয়তো, বড় মানুষের স্বভাবই এই!

বাড়ীতে বীণা নিজে আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। আবার আসবো—তোমরা কেন যাও না ভাই, ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়া গেলো। যে কাল মেঘ বিন্দু নিজেই ঘনাইয়া তুলিতেছিল, বীণার এই শেষ ব্যবহারটুকুতে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রহিল না। বরং না বুঝিয়া—মনে মনেও যাহা বলিয়াছে, তাহারই জন্য তার লজ্জার অবধি রহিল না।

পরদিন আবার বীণা আসিল। কম্‌লিকেও একদিন লইয়া গেল। কিন্তু পরস্পরের যাওয়া-আসা সহজ হইয়া আসিলেও কোথায় যেন এক পার্থক্য রহিয়াই গেল! কম্‌লির মনে হয়, বীণা যেন তাহাকে তাহাদের ঐশ্বর্য্য দেখাতেই লইয়া যায়। কিন্তু আজও তেমনি করিয়া রমেনবাবু তেতালার জানালা ধরিয়া দাঁড়ায়।—আজও সুধীন তেমনি করিয়া উঁহাদের বাড়ী ছুটিয়া যায়। ছুতানাতায় আজও কত খেলনা, খাবার সুধীন উপহার পাইতেছে।—তবে?

আশা-নিরাশার দোলায় কম্‌লির বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে থাকে। সুধীনকে ডাকিয়া চুপি চুপি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে। হয়তো রমেনবাবু এই বালককে দিয়া তাহার কাছে কিছু বলিয়া পাঠাইতেও পারে! এমনও তো কত হয়।

সুধীন বলে, কিছু বলেনি দিদি! হাঁ, সেদিন বল্‌ছিলো—আচ্ছা দিদি, তুমি কি লেবেনচুস্ খাও? আমি বললাম, দুর, তা কেন, দিদি যে বড়! সুধীন এই অসম্ভব কল্পনা স্মরণ করিয়া আপন বিজ্ঞতায় হাসিতেই লাগিল।

কম্‌লি মাত্র এইটুকু কথা—যেন সঞ্চয় করিয়াই আপন বুক ভরাইয়া তুলিল। রমেনবাবু নিশ্চয়—নইলে সুধীনকে এতখানি আদর করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে? কম্‌লি ডাকে, শোন্!

সুধীন আরও কাছে সরিয়া আসে।

—আমার কথা যেন কিছু বলিস না।

সুধীন ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া যায়।

সেদিন বৈকালে বীণা আসিতেই বিন্দু একেবারে কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল—কম্‌লিকে তোমরা নাও না ভাই!

বীণা প্রথমটা বুঝিতেই পারিল না। তারপর উচ্ছ্বসিত হাসিকে প্রাণপণে দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, দাদাকে বল্‌বো।

মা সেদিন কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা বীণাকে মিষ্টিমুখ করিয়াও যাইতে হইল।

বাড়ীতে পা দিয়াই বীণা যেন ফাটিয়া পড়িল। কিছুতেই হাসি আর থামিতে চায় না। তারপর রমেনও এক এক করিয়া সকল কথাই শোনে। সেও হাসে। আর ছোট বাড়ী—যাহারা এই হাসির খবর রাখে না, তাহারা সকলেই একটি মধুর সংবাদের আশায় দিনের পর দিন উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করে!

পরিবর্ত্তন কিছুই হয়নি। আকাশে সূর্য্য ওঠে—চাঁদ ওঠে—তারা ফোটে। বড়বাড়ীর হাসি, গল্প, গান—ছোটবাড়ীর বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। আজও বড়বাড়ীর জানালায় রমেন হাসিমুখে দাঁড়ায়। সুধীন তেমনিই মুঠা করিয়া খাবার লইয়া আসে। শুধু একটি কথা কম্‌লি কিছুতেই বুঝিতে পারে না, সেদিনকার প্রস্তাবের আজও কোন জবাব আসিল না কেন? বীণা কি তবে সেদিনকার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে—বড়লোক, হয়তো হইতেও পারে!

মা দুঃখ করিয়া বলেন—গিরীন কিছু বল্‌বে না, ওদেরই বা কি এত গরজ! এবার সত্যই বিন্দুর রাগ হইল। বড়লোককে উপেক্ষা করিবার মত অহঙ্কার আর যাহারই সাজুক, তাহাদের তো সাজে না! ক্ষমতার সীমা-রেখা টানিয়া টানিয়া যাহাদের পদে পদে চলিতে হয়, তাহাদের মুখে ওসব বড়কথা কেন? রাত্রে বিন্দু বেশ শক্ত করিয়াই গিরীনকে শোনাইয়া দিল। গিরীনের মত শক্ত লোকও আজ বিন্দুর দৃঢ়তার কাছে কেমন যেন শিথিল হইয়া গেল।

—হইবেও বা, শুধু তাহারই জন্য শেষ কথাটুকু রহিয়াই গিয়াছে। বড়লোক হইলেও সত্যিই আর কিছু নিজে আসিয়া বিবাহের কথা পাড়িতে পারে না। গিরীনের চোখেও আজ স্বপ্ন-বিলাস !— কম্‌লির রাঙা-পাড় সোনা হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

আবার চোখে-চোখে দেখা। কম্‌লির যেন মনে হইল, রমেনবাবু আজ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়াই চলিয়া গেলেন! বুকের ভিতর তাহার ছল্‌ছলাইয়া উঠিল। কিন্তু কি দুর্নিবার লজ্জা এই মেয়েমানুষের! সহজ করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতেও তাহাদের মরণ হয়! কম্‌লি তাহার নিজের লজ্জাকেই তিরস্কার করিতে করিতে ত্রস্তপদে নীচে নামিয়া আসিল।

পরদিনই গিরীন বড়বাড়ীর খবর আনিয়া দিল, রমেন বিবাহ করিবে না।

কেন করিবে না? পরে করিবে কি না? কোন প্রশ্নই কেহ করিতে সাহস করিল না। গিরীন অফিস হইতে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি এক কাপড়েই বাহির হইয়া গেল। তাহার জলখাবারের থালা লইয়া বিন্দু রান্নাঘরে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রশ্ন করিবার আর কি-ই বা ছিল? রমেন যেটুকু বলিয়াছে, শুনিবার ও শোনাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

মা ডাকিলেন, বৌমা! হয়তো তিনি এখনো আশা রাখেন।

বিন্দুর কোন কথাই কানে যাইতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, তাহারাই সকলে মিলিয়া জোর করিয়া তাহার স্বামীর মুখখানাকে পোড়াইয়া দিয়াছে!

কম্‌লিও একদিন সকল কথা বুঝিল। মুখ তাহারও তো কম পোড়ে নি! এ পোড়া-মুখ লইয়া এখন সে বাহির হইবে কি করিয়া? তাহার নামের সহিত যে ঐ রমেনবাবুর নামটা বিশ্রীভাবে এখ্‌নো জট্ পাকাইয়া আছে! এ যেন অবাধ মেলামেশার পর বিবাহে অসম্মতির কলঙ্ক তাহার আষ্টে-পৃষ্ঠে দাগিয়া দিয়া গেল!

সুধীন আস্তে আস্তে ডাকিল, দিদি!

কম্‌লির বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! বলিল, কি রে?

—রমেনবাবু বল্‌লে—

—চুপ, বলিয়াই কম্‌লি তাহার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। বুকের ভিতরটা তাহার কিছুতেই শান্ত হইতে চায় না! রমেন তাহাকে নিশ্চয়ই তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া পাঠাইয়াছে। আনন্দে সে যেন এখুনি কাঁদিয়া ফেলিবে। বলিল, কি বল্‌লে রে?

সুধীন কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল—রমেনবাবু তোমাকে ভাব্‌তে বারণ কর্‌লে দিদি। বল্‌লে, তোমার দিদির বিয়ের টাকা—আমি সব দেবো।

একমুহূর্ত্তে কম্‌লির চোখ দুটো ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বল্‌তে বলেছে?

সুধীন ভয় পাইয়া গেলো। ঢোক গিলিয়া বলিল, হাঁ।

ইহার পর আরও কিছুদিন কাটিল।

রমেনের কথাও একদিন সকলে ভুলিয়া গেল। আবার বিন্দুর মুখে হাসি ফুটিল, মা কথা বলিলেন। হাসি কৌতুকে আবার এই দুঃখীর ঘর পরিপূর্ণ খুশী লইয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কম্‌লি, ঐ বড়বাড়ীটার পানে আর যেন সোজা হইয়া চাহিতেই পারে না!—জোর করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়। ঐ বাড়ীখানা কি রাতারাতি একটা বড় ভূমিকম্পে পড়িয়া যায় না! ও কি তাহার জীবনে সাক্ষীস্বরূপ চিরকাল খাড়াই থাকিয়া যাইবে?

একটি মধুর প্রভাতে বড়বাড়ীতে সানাই বাজিয়া উঠিল।

ছোটবাড়ীর সকলেই একসঙ্গে চকিত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে। কম্‌লির বুকের স্পন্দন হয়তো থামিয়াই গিয়াছে। নহিলে আজিকার লজ্জায় তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল না কেন? শুষ্ক-সাদা মুখখানি—এতবার করিয়া এতদিন ধরিয়া পুড়িতেছে, তবুও তাহার বর্ণ ঘোচে না!

অনুমান সত্যই।— সুধীন লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া খবর দিল, রমেনবাবুর বিয়ে—আমার নেমন্তন্ন মা।

রমেনবাবুর বিয়ে! কম্‌লি একবার দিগন্তের পানে শুষ্ক-চোখ দুটি মেলিয়া ধরিতে গেলো, কিন্তু চোখ তুলিতেই দীর্ঘ বড়বাড়ীটা যেন আঘাত করিতেই তাহার চোখের উপর হুড়্‌মুড়্ করিয়া আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ কম্‌লি নিজের মধ্যেই চকিত হইয়া ওঠে। এ কি বিষ-চিন্তা, তাহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে? রমেনবাবুর বিয়ে—উৎসবের বাঁশী, তাহাতে তাহার কি? তখনি সুধীনকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে কম্‌লি জিজ্ঞাসা করিল—আমাদের নেমন্তন্ন কর্‌বে না?

—হাঁ, বীণাদি তো আস্‌বে সন্ধ্যের সময়।

বিন্দু অবাক হইয়া কম্‌লির মুখের দিকে চাহিল।

—বৌ দেখ্‌তে কিন্তু যেতে হবে বৌদি!—বলিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে—আজ অনেকদিন পরে, কম্‌লি আবার ছাদে যাইবার জন্য ছুটিল।

বার্লিনে অলিম্পিক

ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী

এক রাত্তিরে পার্টি ছিল ওরিয়েন্টাল সোসাইটে ভারতীয় অলিম্পিক দল এবং আগন্তুকদের সম্মানের জন্য, আমরা কয়েকজনে দল বেঁধে যাত্রা করলাম। দু নম্বর বাসে চড়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। পার্টিতে যাওয়া এই প্রথম, কাজেই চালচলন অনেক শেখা গেল। পার্টিতে সাধারণত কালো নৈশ-পোষাক পরে যাওয়াই রীতি কিংবা দেশী পোষাক। তবে এটা বে-সরকারী বলে তত কায়দাকানুন ছিল না। অনেকে অনেক রকম পোষাক পরে গিয়েছিল। ঢুকেই পোর্টার-এর কাছে টুপি ও ওভারকোট জমা দিতে হল। আমার মামুলি ধূসর রঙের পোষাক (একটাই সঙ্গে এনেছিলাম), টুপি নেই, ওভারকোটও নিয়ে বেরুইনি—কাজেই কিছু রাখতে হল না। দরজায় কর্ত্তা নিজে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এ পোষাকী হাসি অর্থাৎ মুখ-বিকৃতিটা দেখে আমার ছায়াচিত্রবিশেষের কথা মনে পড়ছিল। ভিতরে গৃহকর্ত্রীগণের ও অভ্যাগতদের অস্ফুট গুঞ্জন এবং আলাপ পরিচয়ের মধ্যে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম—অনেক রকমের লোকই এসেছে। এদেশীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং অস্মদ্দেশীয় হরেক রকমে একরকম মিলেছে ভাল। শাড়ীপরা দু-একজন ভারতীয় মহিলাও ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদের গ্লাসে সরবত খাওয়ার পরে—টেবিলে গিয়ে বসবার ডাক পড়ল সকলের। একদিকের বড় হলে—কয়েকটি বড় বড় টেবিল সাজান হয়েছে হলের এক কোনে কনসার্ট বাজছে—বেশ রীতিমত পার্টি। দেওয়ালে দেখলাম হিট্‌লার আর হিন্‌ডেনবার্গের বড় বড় অয়েল পেন্টিং টাঙান আছে এবং আশে পাশে লালের মাঝে স্বস্তিক চিহ্ন দেওয়া পতাকার অভাব নেই। একটা টেবিলে পাশাপাশি আমি আর শর্ম্মা বসে পড়লাম। আর এক বন্ধু তার অন্য এক প্রাদেশিক বন্ধুর সঙ্গে অন্য কোথায় বসেছিল। হাতল দেওয়া বড় কাঁচের পাত্রে সফেন সোনালি রংএর বিয়ার এল। আশেপাশে জার্ম্মান মহোদয় এবং কেতা-দুরস্ত ভারতীয় মণ্ডলীর মাঝে বসে বুঝলাম—এ সোমরস উদরস্থ না করে উপায় নেই। শর্ম্মা বললে, খেয়ে ফেল, বেশ লাগবে। সকলে পাত্র তুলে অভিবাদন করে পান শুরু করা গেল। সকলেই পাশের অপরিচিতের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে—পানপাত্র শেষ করে এনেছে, আমার তখনও অর্দ্ধেক বাকী। তেতো এবং ঝাঁঝাল বলে পাচনের কথাই মনে পড়ছিল। একটু একটু করে খেতে খেতে শর্ম্মার সঙ্গেই দু-একটা কথা বলছিলাম। খানিকক্ষণ এই রকম চলল, তারপর আমার সাম্‌নের জার্ম্মান ভদ্রলোকটি আমার নীরবতা দেখেই বোধ হয় আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। তাঁর পাশের খালি চেয়ারে আমাকে ডেকে নিয়ে জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোকের বেশ লম্বা চেহারা, দেখতে সুপুরুষ, মেজাজ নরম বলেই মনে হল। সিগারেটের পর সিগারেট ভস্মীভূত হতে লাগল, ভদ্রলোক দেখলাম সিগারেট খান না। মাঝে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতায় আমাদের কথা বন্ধ হয়েছিল। বক্তৃতায় ভারতবর্ষের সেকালের এবং একালের অনেক গুণগান হল। ভারতের বহু পুরাতন কীর্ত্তি-কলাপ, শিক্ষা-দীক্ষা, কলা-বিজ্ঞান এ সকলের জার্ম্মানরা কত আদর করে এ সমস্ত উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত হল। ভারতবর্ষ এবং জার্ম্মানীর সঙ্গে যে বহুদিন থেকে একটা শিক্ষার সাম্য আছে (cultural relation) সেটা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পেয়ে যেন তিনি ধন্য হয়ে গেছেন। শেষে বার বার খেলোয়াড়দের এবং অভ্যাগতদের আদর এবং আবাহনে আপ্যায়িত করলেন। তদুত্তরে খেলোয়াড়দের প্রতিনিধি লাহোরের একজন প্রফেসার জার্ম্মানীকে আরও বললেন—অলিম্পিক ভিলেজে বিভিন্ন দেশের যুবাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক ভাইএর মত ব্যবহার করে, কোন দ্বন্দ্ব কোলাহল নেই—চির-আনন্দময় শিশুদের খেলার মতই। সকল দেশের নেতা যদি এই অলিম্পিক মিলনের আন্তর্জাতিক প্রীতিবন্ধন থেকে একটু স্পোর্টিং স্পিরিট শিখতেন, তা হলে পৃথিবীর চেহারা বদলে যেত। বক্তৃতা শেষ হলে সদ্য-পরিচিত আমার জার্ম্মান বন্ধুটি বললেন—ভদ্রলোক ইংরেজীতে বেশ বক্তৃতা করেন ত! এর পরে একটু সঙ্গীতালাপ হল—পিয়ানোর সঙ্গে—আমাদের ভারতীয় উর্দ্দু এবং হিন্দিতে। গায়ক জার্ম্মানীতে ভ্রাম্যমান একটি ভারতীয় নর্ত্তকী দলভুক্ত। দলকর্ত্রী ভারতীয় মেয়ে, বম্বেবাসিনী। যৌবনে নাকি বিখ্যাত সুন্দরী সুগায়িকা এবং সুনর্ত্তকী ছিলেন, যৌবনের স্রোতের সঙ্গে পর পর দুইটী বিবাহের পর সংসার ত্যাগ করে ভারতের বাইরে ভারতীয় নৃত্যকলা দেখাতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আরো কয়েকটি ছোট মেয়ে আছে এবং বড় একটি বাদক এবং গায়কদল। চেহারা দেখে সুখী হতে পারিনি, তুলি দিয়ে রং বদলান যায়, কিন্তু যৌবনকে ফিরিয়ে আনা যায় না। নাচ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তবে শুনেছি অলিম্পিক কমপিটিসানে নাকি মেডেল পেয়েছেন।

গানের শেষে জার্ম্মান ভদ্রলোক বললেন—চল আমরা একটু নিরিবিলিতে গিয়ে ভাল করে গল্প করি। পাশের ঘরের এককোণে দুটো সোফাতে বসে আবার গল্প শুরু হল। কত কথাই হল। তাঁর পরিচয় পেলাম, ভারতবর্ষে অনেকদিন ছিলেন—ব্যবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় শহরই ঘুরেছেন। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, চাঁদিনী রাতের মোহ, বড়লোকদের ঐশ্বর্য্য, গরীবদের দুঃখ, আমাদের সমাজ, রাজনীতি, রাজকীয় শাসননীতি, বাঙ্গালীর বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই বাদ গেল না। ওদেশের কথাও কম হলো না; ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মানীর মতভেদ, হিটলারের অমানুষিক কার্য্য এবং ভদ্রলোকের নিজের জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি—কবে ফরাসী মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন এবং সে যুদ্ধের পরে বিয়ে করতে রাজী হয়নি, সেই দুঃখে ইনি আর বিয়েই করেননি—এখন বুঝেছেন বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে—

ইত্যাদি অনেক কথাই হল। আমরা দুজন এত অল্প সময়ের মধ্যে এত গল্প জমিয়েছিলাম দেখে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল—ও ভদ্রলোক কে, আর ওর সঙ্গে এত কি গল্প করছিলে? মাঝে মাঝে বোধ হয় এ রকম হয়; খুব শীঘ্রই ভাব জমে যায়, মেয়ের সঙ্গে হলে হয় প্রেম, আর ছেলের সঙ্গে হলে হয় বন্ধুত্ব। তবে কোন কোন মনীষীর মতে এ দুয়ের মধ্যেই নাকি যৌন প্রবৃত্তি আছে। থাক এ মনস্তত্ত্বের অবান্তর কথা। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক আমাকে তাঁর কার্ড দিলেন—দেখলাম বেশ উচ্চপদস্থ! জার্ম্মানীতে মেশিন ম্যানুফ্যাক্চারিং সিণ্ডিকেট আছে, তার কর্ত্তা। বললেন, তুমি যদি এখানে পড়তে আস আমাকে লিখো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম। পরে ঘরের ওদিকে সস্ত্রীক আমাদের কানাই গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা। এঁকে সেবাসদনে অনেকদিন দেখেছি। খদ্দর পরা, লম্বা মজবুত চেহারা, উঁচু কপাল, গৌরবর্ণ, কথায় বেশ তেজ আছে। এখানে চাকরী নিয়ে দেশ থেকে সস্ত্রীক এসেছেন। দেখে ভদ্রলোক খুব খুশী। বললেন, আমার বাড়ীতে যাবেন। আমরা বাসে এক সঙ্গে ফিরলাম, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না থাকলেও বেশ গল্প করতে করতে চললাম। তিনি ফোনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—কিন্তু যাওয়া হয়নি।

পরের দিন আর টিকিট ছিল না; কিন্তু আশা ছিল—হয়ত আবার ব্যাঙ্কে গেলে পেতে পারি; তাই সকালে নিয়ম মতো টোষ্ট চা খেয়ে আবার ব্যাঙ্কে রওনা দিলাম—দুজনে, আমি আর শর্ম্মা—গাড়োয়ার কালকের খরচের ব্যাপারের পর থেকে কেমন দমে গিয়েছিল আর ওর খেলার উপর তত আগ্রহ ছিল না—ও কাজের খোঁজে হাসপাতালে গেল। ব্যাঙ্কে পুরানো কায়দা অনুসারে আগে ঢুকেও কোন ফল হল না—স্যরি, নো টিকেট। তবে বহুভাষিণী ডান হাতে মোটা রূপার বালাপরা ভদ্র-মহিলাটি যিনি খবরটা দিচ্ছিলেন—অতি মোলায়েম করেই বললেন—কালকে ষ্টাডিয়াম আপিসে গিয়ে খোঁজ করে দেখলে হয়ত পেতে পার; তবে নয় নম্বর বাসে কিংবা ৭২ নম্বর ট্রামে যেয়ো, তা না হলে সেখানে পৌঁছতে পারবে না। আমরা তথাস্তু বলে বেরিয়ে পড়লাম, তবে আশা-ভরসা এক রকম ত্যাগ করেছি বললেই হয়। এবার কি করা যায়। ঠিক হল ঘুরে বেড়ান যাক—শহরটা ত দেখতে হবে। আবার গিয়ে উণ্টার-ডেন-লিণ্ডেনে পড়লাম এবং সাজান দোকান খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। কত রকমেরই পণ্যদ্রব্য রয়েছে—দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে—কিন্তু পকেটের পুঁজি দেখে ইচ্ছা দমন করতে হল। ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনের মত চোখে দেখেই অর্দ্ধেক কেনার সুখ অনুভবের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বড় রাস্তার আশে পাশে বড় বাড়ীর মধ্যে কতকগুলো দোকান ভরা গলি আছে—অনেকটা চাঁদনীর মত—তবে তার মত অন্ধকার, সরু আর অপরিষ্কার নয়—সেখানে হরেক রকমের পণ্যদ্রব্য সাজান আছে। সেখানে আমি একটা আড়াই মার্কের ক্যামেরা কিনলাম, আর বন্ধু শর্ম্মা গোটা চারেক টাই কিনল। আবার বড় রাস্তায় পড়লাম। বেলা দুটো বাজে—লাঞ্চের সময় হয়েছে—ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে—যেতে যেতে মিউজিয়ম পথে পড়ল—ক্ষুধার তাড়নায় দোকান খুঁজতে লাগলাম। কয়েকটা মোড় বেঁকে—একটা ছোট দেখে দোকানে ঢুকে পড়লাম।—সস্তার আশায়—কালকের খরচে আমাদের কেমন ব্যয়াতঙ্ক জন্মে গিয়েছিল। এ দোকানটা যেমন ছোট তেমনি অপরিষ্কার ও অন্ধকার। ঢুকেই ডান দিকে মদের বিরাট বন্দোবস্ত—এইটেই যেন আসল—খাওয়াটা উপরি—যেমন পাড়ার হোটেলের এক পাশে পানের দোকান থাকে। মদের টেবিল বা কাউণ্টারের পাশে চারটে কল থেকে মদ আসে—যে যেমন চায় তাকে তেমন দেওয়া হয়। দুটি বৃদ্ধা মোটা গোছের মহিলাই দোকান চালাচ্ছেন দেখলাম—পরে দেখেছিলাম একটি মলিনবসনা, রুগ্না কিশোরী-গোছের মেয়ে—উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিষ্কার করছে। আমরা দুটি কালো লোক—ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলাম। বাইরে রাস্তার ধারে বন্দোবস্ত থাকলেও—শত চক্ষুর সামনে বসে খেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু যে জায়গায় বসলাম—সেটা আবার জেণ্টল্মেন-এর পাশে—কাজেই জেণ্টল্মেনদের আনাগোনা ঘনঘনই চলতে লাগল। এক বুড়িকে ত ইংরেজী আর ইসারায় খাবার বাৎলে দেওয়া হল। রুটি বাসি—তার সঙ্গে সশেজ আলুসেদ্ধ আর Sance, তাই মোটা মোটা আধ ময়লা কাঁটা চামচে দিয়ে চালাতে লাগলাম—জলের বদলে ঝাঁঝাল সোডা ওয়াটার—এক বোতলেই দুজনের হল—এরা বললে মিনারেল ওয়াসার—বড় বেশী ঝাঁজ—নাকের মধ্যে দিয়ে উদ্গার উঠতে লাগল—যথাসম্ভব প্রাণপণে দমন করা গেল—ঢেকুর তোলা পাশ্চাত্য দেশে অসভ্যতা। পরে এল Kaffe অর্থাৎ Coffee. ভেবেছিলাম কফিটা অন্তত আরাম করে খাব। তাও বরাতে হল না। আমাদের রাস্তার ধারের দু বেঞ্চিওয়ালা রাস্তায় উনান জ্বালান চায়ের দোকানের মত—মোটা এবং বড় বাটীতে এল তেত কালো কফি, তার সঙ্গে এক রত্তি ভাঁড়ে একটু দুধ আর দু ডেলা চিনি—আর যে চাইব তা ভাষায় কুলাল না—আর বুড়িও ব্যস্তভাবে মদ পরিবেশন করতে লাগল। কাজেই হাসি দিয়ে তেতো ঘোলাটে কফিকে মিষ্ট করতে চেষ্টা করা গেল। হাসিটা এল দুধের পাত্রের ক্ষুদ্রতা দেখে—আমাদের দেশে মেলাতে যে ছোট ছোট খেল্নার ঘটী বাটি বিক্রয় হয় তার মত—মাপলে তাতে বোধ হয় দু ড্রামের বেশী ধরে না—কাজেই আমাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে দুধের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করতে দেরী হল না। বিল দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—উদ্দেশ্য কাইজারের প্রাসাদ। পথে দু-একটি ছবিও তোলা হল আমার ক্ষুদে ক্যামেরা দিয়ে। প্যালেসে জার্ম্মান যাত্রীদের সঙ্গে চলতে লাগলাম—অবশ্য দর্শনীর টিকিট কেটে।—এক একটা ঘরে গিয়ে গাইড তাদের বোঝাতে লাগল—ছুটকো ছাট্কা নাম আর বছর ছাড়া আর একবর্ণও বোধগম্য হল না। আমরা এগিয়ে গেলাম। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি—একজন গাইড ইংরেজীতে এক দল লোককে বোঝাচ্ছে—আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। গাইডটি বলে তোমরাও আমার দলে আসতে পার, তবে আমাকে এক মার্ক করে ফি দিতে হবে—তথাস্তু বলে লেগে পড়লাম। গাইড ত প্রত্যেক হলে গিয়ে বলতে লাগল—এটা অমুক রাজার বসবার ঘর—এ ছবিটা অমুকের আঁকা, এর দেওয়ালটা মার্ব্বেল পাথরের—এটাতে চামড়ার কাজ করা, এ ষ্টাচুটার

এই বিশেষত্ব, এই টেবিলে বসে কাইজার যুদ্ধের হুকুম দিয়েছিলেন—সবই ঐতিহাসিক তথ্য। আমি এর ফাঁকে একবার দলের লোকদের দেখে নিলাম। দলটি ছোট—তিনটি মেয়ে ও একটি পুরুষ। সকলেই আমেরিকান—কথার মধ্যে 'R'এর ভিতর 'ড়'এর প্রভাব দেখেই বোঝা গেল। ছেলেটি বেশ লম্বা ছিপ্ছিপে, একজন বৃদ্ধা, বোধ হয় মেয়েদের মা হবে। মেয়ে দুটি বোধ হয় বোন, মুখের ছাঁচটা যেন এক রকম—এবং দুজনেই বেশ পুরুষ্টু, এবং রংএর বাহুল্য ত আছেই। কথাবার্ত্তায় মনে হল—ইতিহাস কিছু দুরস্ত আছে। এঘর ওঘর দেখে—শেষ হল ডাইনিং রূমে এসে—সেখানে মস্ত সম্রাটী টেবিলে রূপার কাঁটা চামচে আর দামী কাঁচের পাত্র সাজান আছে—ফুলের এবং ঝাড় লণ্ঠনের বাহুল্য রাজকীয় কায়দাতেই। এখানে নাকি এখন অলিম্পিক রাজ-অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান হচ্ছে শোনা গেল। শেষে গাইড বাবাজি মাথা পিছু এক মার্ক পকেটস্থ করে বললেন, রাজপ্রাসাদের আর একটি অংশ আছে—সেখানে যেতে হলে—আবার দর্শনী লাগবে; আর যদি তোমরা বল আমিও যেতে পারি। আবার এক মার্ক খরচের ভয়ে আর তার সঙ্গ নিলাম না। একাই গেলাম—সেখানে একটি মিউজিয়মের মত করে সব রাজ-ঐশ্বর্য্য সাজান আছে দেখে চোখ ঝলসাতে লাগল। বেরুলাম যখন—সাড়ে তিনটে বেজে গিয়েছে, আর আকাশ মেঘে ভরে গেছে। খানিক দূর গিয়ে আবার বড় রাস্তার জনস্রোতে মিশলাম—এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। চারটের সময় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীমুখো রওনা হলাম। চেনা রাস্তায় মাইল খানেক গিয়ে উলওয়ার্থ-এর দোকান পেয়ে গেলাম। উলওয়ার্থ-এর সঙ্গে লণ্ডনেই পরিচয় সবারই হয়। এদের হচ্ছে তিন পেনি, আর ছ' পেনি দোকান। এখানে সব জিনিষ ওই দামে পাওয়া যায়—আমাদের "দো দো আনার" রাজকীয় সংস্করণ। উলওয়ার্থ আমেরিকান কোম্পানী, ইউরোপ-এর সব বড় শহরেই এদের দোকান আছে। হোয়াইট-ওয়ে-লেড্ল-র মত মস্ত দোকান—সব জিনিস পাওয়া যায়—আর দাম সস্তা বলে খুব ভিড়। বার্টেন-এ দোকানে যাবার উদ্দেশ্য আমার এক জোড়া বেড-স্লিপার কিনতে হবে—গুপ্ত সাহেব বলেছিল, উলওয়ার্থ-এ পাবেন এক মার্কে। খোঁজ করাতে একটি মেয়ে আমাকে মেয়েদের ডিপার্টমেণ্ট-এ নিয়ে গেল এবং আর একটি ইংরেজী-জানা মেয়েকে হাজির করল। বলল, ক নম্বরের জুতা পর? আমি বললাম, আট নম্বর—তা তোমাদের নম্বরে কি মিলবে? আমার জুতো দেখে—এক জোড়া বার করল। মনে হল ছোট, নম্বর ৪০—বললাম ৪১ হতে পারে বোধ হয়—৪১ খুঁজে পাওয়া গেল না। বললাম, তোমাদের ষ্টক-এ কি আর নেই? খুঁজে দেখ না। ইতিমধ্যে ভিড় জমে গেছে—দোকানের মেয়েদের—উদ্ধার করলেন একজন পুরুষ সেল্সম্যান; আবার পুরানো কথা আরম্ভ হল, বললাম—একবার ৪০ নম্বরটা ট্রাই করলে হত; বলল কোথায় ট্রাই করা যায়? সে আমাকে দোকানের এক পাশে একটা প্রাইভেট জায়গায় নিয়ে গেল—দরজা বন্ধ করে ট্রাই করলাম, দেখলাম চলতে পারে—কিনে ফেললাম। কিনে ঘুরে ঘুরে জিনিস দেখতে লাগলাম—একবার একটি অটোগ্রাফ করতে হল। একটা পকেট-চিরুণি কিনে বেরিয়ে পড়লাম। আবার দু নম্বর বাসে চড়ে বাঁধা রাস্তায় বাড়ী ফিরলাম। সন্ধ্যেটা হিন্দুস্থান হাউসেই কাট্ল—সেদিন বিকেলে ভারতীয় হকি দলের খেলার সমালোচনা করে। ডিনারের পর অবশ্য অভ্যাস মত ওয়াক্ এ মাইল করা হয়েছিল—সেই বড় রাস্তায়—ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

গান

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

তীর্থে এস, এস তীর্থে—
চিরদিনের স্রোতের তীরে,
ভাসাও তোমার দিঠির কুসুম
আমার দু'টি আঁখির নীরে।
স্বর্ণবরণ স্বপ্ন-আলোক—
আমার মনের সেই ধ্রুবলোক
অস্তাচলের কালো ছায়ায়
মিলায় মিশায় ধীরে ধীরে।—

তোমার স্মৃতির দীপান্বিতায়.
আমার আঁধার হ'বে উজল,
তোমার হাসি, সেই হাসিটি
কুসুমিত রাখ্বে ভূতল;
সেই তীর্থে আস্বে মরণ—
চিরশরণ দুঃখহরণ,
পাব তোমায় নীরবতায়—
সেই মরণে, সেই গভীরে।

বন্ধু

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চিঠি লিখিয়া জ্যোতিষ সে চিঠি বার-বার পড়িল; পড়িয়া খামে ভরিয়া ডাকিল—নিতাই···

ডাক শুনিয়া ভৃত্য নিতাই আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

খামে টিকিট আঁটিয়া জ্যোতিষ বলিল—এই চিঠিখানা এখনি ডাকে দিয়ে আয়। জরুরি চিঠি·· দেরী করিস্ নে।

—যাই। বলিয়া নিতাই চিঠি লইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই চলিয়া গেলে জ্যোতিষ চাহিল খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরের পানে। বেলা প্রায় নটা। আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল। পাশে কার বাড়ীতে রেডিয়োয় গান চলিয়াছে—

আমার মনের সাধ আজ মিটেছে মা,
তবু কেন ব্যথা বুকে···

একটা নিশ্বাস···জ্যোতিষ রোধ করিতে পারিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতিষ ভাবিল, চল্লিশ···প্রায় চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গেছে! এতদিন ধরিয়া মনে যেন যুদ্ধ চলিয়াছিল! যুদ্ধই! সে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে···কতবার মনে হইয়াছে, বসন্তর কাছে···

বসন্ত চৌধুরী! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িল। বসন্ত চৌধুরী···তখন কিশোর বয়স···হাসির জ্যোৎস্না মুখে মাখানো দু'চোখে মায়া-প্রদীপ জ্বলিতেছে··· প্রদীপের সে-আলোয় মন একেবারে আলো হইয়া আছে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, বসন্ত চৌধুরী আজ ইহলোকে নাই! ছ'মাস পূর্ব্বে ইহলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়া সে চলিয়া গেছে!

জ্যোতিষ আসিল ভিতর-মহলে। ডাকিল—ওগো··· শুনচো?

'ওগো' ওরফে সুরমা ছিল ঠাকুর-ঘরে—বলিল—কি?

জ্যোতিষ বলিল,—বসন্ত চৌধুরীর বরানগরে যে বাড়ী বাগান···সে বাড়ী-বাগান আমি কিনছি। ভূতনাথ মিত্তিরের কাছে বাঁধা আছে। ওঁরা খালাশ করতে পারছেন না··· পারবার সামর্থ্য নেই···ভূতনাথ মিত্তিরকে তাই চিঠি লিখলুম···

সুরমা কোনো জবাব দিল না।

জ্যোতিষ বলিল—কোর্ট থেকে বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ বেরিয়ে একবার বাড়ী-বাগান দেখে আসবো। কেমন অবস্থায় আছে···যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

সুরমা বলিল—না···

সুরমার স্বর গাঢ়।

জ্যোতিষ বলিল—আমি আগে দেখে আসি···তারপর তুমি না হয় এক-সময়·· কি বলো?

সুরমা কোনো জবাব দিল না।

জ্যোতিষ বলিল—অনেক দিন থেকে ভাবছিলুম! বাড়ী-বাগান বাঁধা·· উদ্ধার করবার শক্তি নেই···যার কাছে বন্ধক আছে·· সে রাখতে চাইছে না। তাই ভাবলুম···

কথা শেষ হইল না এবং কথা শেষ না করিয়াই জ্যোতিষ চলিয়া গেল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা···

জ্যোতিষ তখন থার্ড ক্লাশে পড়ে। ক্লাশে সে ছিল ভালো ছেলে। বরাবর ফার্ষ্ট হয়···স্কুলে তার আদর আর খাতিরের সীমা নাই! গ্রীষ্মের ছুটীর পর তার ক্লাশে আসিয়া ভর্ত্তি হইল বসন্ত চৌধুরী। মস্ত জমিদারের ছেলে। ওয়েলারের জুড়িতে চড়িয়া স্কুলে আসে—যেমন সুশ্রী চেহারা, বেশভূষায় তেমনি পারিপাট্যের সীমা নাই! জ্যোতিষ ক্লাশের ফার্ষ্ট-বয়। যাচিয়া বসন্ত তার সঙ্গে আসিয়া ভাব করিল। বলিল—আমি নতুন ভর্ত্তি হয়েছি·· অনেকখানি পিছিয়ে আছি, ভাই···দরকার হলে আমায় একটু একটু সাহায্য করো।

মনে গর্ব্ব বোধ করিয়া জ্যোতিষ বলিল—আচ্ছা···

বসন্তর ভর্ত্তি হইবার চারদিন পরের কথা।

ছুটীর আগে আকাশ ফাটিয়া প্রচণ্ড বর্ষা নামিয়াছে··· চারিটা বাজিয়া গেল, বৃষ্টি থামিতে চায় না! স্কুলের গাড়ী-বারান্দার নীচে ছেলেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···

গপ্‌গপ্‌ শব্দে বসন্ত চৌধুরীর জুড়ি আসিয়া গাড়ী-বারান্দার মধ্যে ঢুকিল।

জ্যোতিষকে ডাকিয়া বসন্ত বলিল—তোমার বাড়ী কোন্ দিকে?

জ্যোতিষ বলিল—মনোহর-পুকুরে।

বসন্ত বলিল—আমি থাকি বালিগঞ্জে, এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন।

একটু কুণ্ঠা···নিমেষের সঙ্কোচ! জ্যোতিষ বলিল—থাক্‌না বৃষ্টি ধরলে বাড়ী যাবো।

বসন্ত বলিল—এ-বৃষ্টি সন্ধ্যার আগে ধরবে না। এসো আমার সঙ্গে।

জ্যোতিষ আর 'না' বলিতে পারিল না। বসন্তর সঙ্গে তার জুড়িতে উঠিয়া বসিল। গপ্‌গপ্‌ শব্দে গাড়ী-বারান্দা ছাড়িয়া জুড়ি পথে বাহির হইল। পিছনে ছেলের-দল হাততালি দিয়া শিষ দিয়া বিপর্য্যয় কলরব তুলিল।

গাড়ী চলিয়াছে···বসন্ত বলিল—আমি এখানে নতুন এসেছি···চিরদিন দেশে থাকতুম···তুমি এইখানেই থাকো বরাবর, না?

জ্যোতিষ বলিল—হ্যাঁ।

বসন্ত বলিল—স্কুলের সেকেণ্ড টীচার কানাইবাবু—তিনি আমায় বাড়ীতে পড়ান্। তোমার কত সুখ্যাতি করছিলেন তিনি। তাঁর কাছে শুনেছি, নাইন্‌থ্ ক্লাশ থেকে বরাবর তুমি ফার্ষ্ট হয়ে আসছো।··শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আমরাও তো পড়াশুনা করি··কিন্তু ফার্ষ্ট হওয়া দূরের কথা··এত নীচে পড়ি···

গাড়ী এতক্ষণে প্রায় হাজরার মোড়ে আসিয়াছে···এবারে মনোহরপুকুরের রাস্তা! জ্যোতিষ যেন কাঁটা হইয়া আছে! বসন্ত চৌধুরী জমিদারের ছেলে··ফার্ষ্ট হয় বলিয়া জ্যোতিষের উপর বসন্তর এমন সম্ভ্রম! জ্যোতিষ গরীবের ছেলে···টিনের ছাদ-দেওয়া একতলা ঘরে জ্যোতিষের বাস···বাড়ী দেখিলে বসন্ত হয়তো ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিবে! শুধু কি বসন্ত! বসন্তর ঐ উর্দ্দি-পরা সহিস-কোচম্যান··তারা হয়তো মুখ টিপিয়া হাসিবে! ভাবিবে, ঐ টিনের ঘরে যার বাস···সে উঠিয়াছে জমিদার-বাবুর জুড়ি-গাড়ীতে···

মনোহর-পুকুরের রাস্তা···

কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে জ্যোতিষ বলিল—বাঁয়ে রাস্তা···

সহিসকে বসন্ত বলিয়া দিল—বাঁয়ে যাও···

বাঁয়ে মনোহর-পুকুর রোডে গাড়ী ঢুকিল···

জ্যোতিষের মনের মধ্যে যেন কামানের গাড়ী চলিতে লাগিল! এবার···

ভাবিল, বাড়ীর সামনে নামা হইবে না। বাড়ী ছাড়িয়া গাড়ীখানা খানিকটা আগাইয়া গেলে··মল্লিকদের সেই যে ফটকওয়ালা বড় বাড়ী··সেই বাড়ীর সামনে নামিবে। তারপর···

তাই করিল। টিনের ছাদ-দেওয়া নিজের জীর্ণ গৃহের সামনে দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া বুড়ী-মা···বুঝি, এ বৃষ্টিতে ছেলে কি করিয়া ফিরিবে ভাবিয়া ছেলের পথ চাহিয়া আছেন! জলের নিবিড় আবরণ ভেদ করিয়া মায়ের চোখে সে ব্যাকুল-দৃষ্টি জ্যোতিষের লক্ষ্য এড়াইল না।···

মল্লিকদের মস্ত বাড়ীর সামনে গাড়ী পৌছিবামাত্র জ্যোতিষ বলিল—এইখানে আমি নামবো···

বসন্ত হাঁকিল—রোখো···

গাড়ী থামিল। বসন্ত বলিল——ঐটে তোমাদের বাড়ী? ঐ থামওয়ালা···?

মিথ্যা কথা মুখে বাধিল। জ্যোতিশ বলিল—না। ওর পিছন-দিকে ··

বসন্ত বলিল—এতখানি এগিয়ে এসেছি! এখানে নামলে যেতে ভিজে যাবে। গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে বলি···

জ্যোতিষের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। জ্যোতিষ বলিল—না·· না·· ভিজবো না·· আমি ঠিক যাবো। গাড়ী ফেরাতে হবে না।

সহিস দরজা খুলিয়া দিল। জ্যোতিষ নামিল।

বসন্ত কহিল—ছাতা ধরে বাবুকে পৌছে দিয়ে এসো সহিস···

অত্যন্ত অসহিষ্ণু প্রতিবাদ তুলিয়া জ্যোতিষ বলিল—না···না···না···

সে স্বরে বসন্ত অবাক! সহিস হতভম্ব!

গাড়ী হইতে নামিয়া মল্লিকদের বাড়ীর পাশ ঘেঁষিয়া যে কম্পিয়া জ্যোতিষ চলিল···উৎকর্ণ···কখন শুনিবে, গপ্‌গপ্‌ শব্দে গাড়ী চলিয়াছে···

গাড়ী চলিল…

নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতিষ একবার ফিরিয়া চাহিল… তারপর নিশ্চিন্ত মন লইয়া চলিল নিজের গৃহের দিকে।…

পরের দিন বসন্ত বলিল—রোজ তুমি আমার গাড়ী করে বাড়ী ফিরবে…

আবার ?

জ্যোতিষ বলিল—না…হেঁটে যেতে বেশ খানিকটা এক্‌সারসাইজ হয় ভাই…

বসন্ত এ-কথার উপর আর কথা তুলিল না।

দুজনে ভাব হইল বেশ গভীর। জ্যোতিষ যেন বসন্তের আত্মীয়…সে-কথা বসন্ত নানাভাবে বলে শুনিয়া জ্যোতিষের বুকে যেন ঝড় বহিতে থাকে! কেবলি ভাবে, ক্লাশে লেখাপড়ায় তোমার চেয়ে বড় বলিয়া তাই তুমি আমাকে এমন করিয়া মাথায় তুলিতেছ…কিন্তু যদি শোনো, কত গরীব আমি…টিনের বাড়ীতে থাকি…কি করিয়া আমার দিন চলে…তাহা হইলে কোথায় থাকিবে তোমার ও মিষ্টবাণী, এ আদর, এমন খাতির!…

বসন্ত বলিল—তোমাকে দেখেই আমার এত ভালো লেগেছে! তারপর যখন শুনলুম, তুমিই ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, তখন যেচে তোমার সঙ্গে ভাব করলুম এসে।…তুমি হয়তো খুব অবাক হয়ে গেছ…না ? পাড়াগেঁয়ে ছেলে… জানা নেই, শোনা নেই…গায়ে পড়ে ভাব করতে এলো!

জ্যোতিষ বলিল—না, না…তা কেন!

ছুটীর পর পড়ার বই খুলিয়া পড়িতে বসিলে কতদিন অমন বইয়ের অক্ষর চোখের সামনে হইতে মুছিয়া যায়…বইয়ের পাতায় ফুটিয়া ওঠে বসন্তের সুকুমার শ্রী…পরিপাটী বেশভূষা… জুড়ি গাড়ী। পড়া ভুলিয়া জ্যোতিষ ভাবে, পয়সার দিক দিয়া বসন্তের চেয়ে বড় হইতে না পারি, তার সমানও যদি কোনোদিন হইতে পারি! কথামালার সেই কাংস-পাত্র রজত-পাত্রের গল্প মনে পড়ে। জ্যোতিষ ভাবে, এ বন্ধুত্ব ক'দিন!

মাসখানেক পরের কথা।

টিফিনের ছুটীর সময় বসন্ত বলিল—একটা কথা আছে…

—কি কথা ?

বসন্ত বলিল—আজ আমার জন্মদিন। রাত্রে আমাদের বাড়ী তোমার নেমন্তন্ন। মা বলে দেছেন…মাকে আমি তোমার কথা বলি কি না। আমি বলি, তুমি আমার বন্ধু…তোমাকে যেতে হবে।

জ্যোতিষের বুকে আবার সেই কাঁপন! সেখানে কি করিয়া যাইবে? কি বেশে? তার না আছে সাজ-পোষাক, না…

বসন্ত কহিল—চুপ করে রইলে যে, তুমি বলবে, পড়াশুনা…কিন্তু কাল তো ম্যাহমেডান পরবের জন্য ছুটী আছে।

জ্যোতিষ যেন অকূল সমুদ্রে প'ড়িয়াছে! যাইবার ইচ্ছা খুব…কিন্তু কি বেশে সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে! চারিদিকে ঐশ্বর্য্যের সমারোহ…তার মধ্যে দৈন্ত আর অভাবের কালী মাখিয়া সে কেমন করিয়া গিয়া দাঁড়াইবে!

'না' বলাও চলিল না। বসন্ত বলিল—ছাড়বো না। ছুটীর পর তোমার বাড়ীতে যাবো। গিয়ে তোমার মাকে আমি বলবো…বলবো, জ্যোতিষকে যেতে বলুন, মাসিমা…

মাসিমা! তার গরীব মাকে বসন্ত মাসিমা বলিতেছে! জ্যোতিষের বুকের মধ্যটা অশ্রুর বাষ্পে ভিজিয়া যেন গলিয়া যাইবে!

হাসিয়া জ্যোতিষ বলিল—বাড়ী গিয়ে মার কাছে নালিশ করতে হবে না বসন্ত… আমি যাবো।

ঠিক বলছো ?

—ঠিক বলছি।

—সাতটার মধ্যে…কেমন ?

—বেশ!…ভিড়-টিড় হবে না…আর যারা আসে আসুক…তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সেখানে শুধু তুমি আর আমি…বুঝলে!

নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া বসন্তের উপর সম্ভ্রম শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল অনেকখানি। বসন্ত বড় লোকের ছেলে…কিন্তু তাই বলিয়া এত বড় লোক, জ্যোতিষ তা কল্পনা করে নাই!…

এ সখ্য বাড়িয়া চলিল…বাড়িলেও এ সখ্য দুজনের এমন নিজস্ব রহিয়া গেল যে তার মধ্যে মা-বাপ ভাই-বোন… কাহারো এতটুকু স্পর্শ লাগিল না! বাড়ীতে কাহারো

আছে, তাদের মধ্যে কে রহিল···গেল···সে সংবাদ দুজনের কেহ জানে না! ইহার মধ্যে কার মা চলিয়া গেলেন··· কে পিতৃহীন হইল!···সে-সংবাদে যেন কাহারো কোনো প্রয়োজন নাই!···

এমনি করিয়া তিন বৎসর কাটিল···

তারপর পাশ করিয়া বসন্ত দেশের বাড়ীতে চলিয়া গেল·· জ্যোতিষ স্কলারশিপ লইয়া কলেজে গিয়া ঢুকিল···

কেহ কাহাকেও চিঠি লিখিয়া সংবাদ দিবে বা সংবাদ লইবে, তা'ও দুজনের কাহারো মনে হয় না। বাস্তব জীবনে কোনোদিন আসিয়া জ্যোতিষ দেখা দিয়া ছিল—বসন্তর যেন মনে পড়ে না! জ্যোতিষ কিন্তু বসন্তকে ভোলে নাই! মনে হয় যেন স্বপ্ন! তার মনে বসন্ত ঐশ্বর্য্যের রেখায় যেন স্বপ্ন আঁকিয়া গিয়াছে···জ্যোতিষ সে স্বপ্ন ছবিতে রঙ ফলায়···সে ছবিকে জীবন্ত করিতে চায়···

আরো পাঁচ বৎসর পরের কথা···

জ্যোতিষ ল' পাশ করিয়া হাইকোর্টে ঢুকিয়াছে।

একদিন ছুটীর পর হাইকোর্টের বাহিরে হঠাৎ পিছন হইতে কে তার পিঠে টোকা মারিল। বিস্ময়ে জ্যোতিষ ফিরিয়া চাহিল···

দেখিয়া চমকিয়া কহিল—বসন্ত···

হাসিয়া বসন্ত বলিল—তাই···

জ্যোতিষ বলিল—আশ্চর্য্য! মনে আছে আমায় আজো?

—নেই? ওকালতি করচো···খবরের কাগজে কেশের রিপোর্ট বেরোয়···দেখি।

জ্যোতিষ বলিল—বটে!

হাসিয়া বসন্ত বলিল—আছো কোথায়? সেই মনোহর-পুকুর রোডে?

জ্যোতিষ বলিল—না···আমি এখন ভবানীপুরে থাকি। হরিশ মুখার্জ্জি রোডে।···তুমি কলকাতায় আছো?

বসন্ত বলিল—না। তবে থাকবো। বালিগঞ্জে নয়, বরাহনগরে। বাবা মারা যাবার পর বালিগঞ্জের বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। এখানে আমার মামার অফিস আছে···শেয়ার-ব্রোকার্স···সেই অফিসে বেরুবো ঠিক করেছি!···

জ্যোতিষ বলিল—হুঁ···তাহলে দেখাশোনা হবে।

বসন্ত বলিল—বিয়ে করেছো?

জ্যোতিষ বলিল—না। তুমি?

বসন্ত বলিল—না। সময় মেলেনি। বিয়ের সব ঠিক··· বাবা মারা গেলেন···মাও তারপর চলে গেলেন···

একটা নিশ্বাস! বসন্ত বলিল—ও-সব কথা থাক··· তোমার ঠিকানা বলো। যাবো···এই সামনের রবিবারে···

জ্যোতিষ ঠিকানা বলিল।

এ তো মনোহরপুকুরের টিনের ছাদ-দেওয়া জীর্ণ ঘর নয় —এ-বাড়ীতে বসন্তকে কেন আনা চলিবে না?···

ট্রামে চড়িয়া জ্যোতিষ বাড়ী ফিরিল মনের কোণে এতদিন যে-কথা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া সে-কথা আবার কলরব সুরু করিয়া দিল! বসন্তর চেয়ে বড় না হই···সমান অন্ততঃ!

বসন্ত বিবাহ করে নাই···বিবাহের কথা স্থির হইয়া আছে···

প্রমিশিং উকিলের গৃহে ঘটকের আনাগোনা ছিল। তার উপর বহু কন্যাদায়গ্রস্ত সশরীরে আসিয়া বহু মিনতি নিবেদন করিতেন···

পরের দিন সকালে কামাখ্যাবাবু আসিয়া যেমন বলিলেন —কেন বাবা অমত করছো? আমার মেয়ে সুরমা সুশ্রী··· ডাগর···ম্যাট্রিক পাশ করেছে···আমি খরচ করবো··· কোষ্ঠীও মিলেছে।

জ্যোতিষ উকিল তখনি বলিল—পাঁচজনে যে-রকম ব্যস্ত করে তুলেছে···মক্কেলের ব্রীফ খুলে দুদণ্ড স্থির হয়ে দেখবো সে উপায় নেই। বেশ মশায়· আপনার মেয়েই···ফাষ্ট কাম্ ফাষ্ট সার্ভ···আপনি দিন ঠিক করুন···

সুরমা মেয়েটি ভালো। তবু জ্যোতিষ ভাবিতেছিল, আরো ভালো চাই! রঙ আর বিদ্যার দিক দিয়া বসন্তের স্ত্রীর চেয়ে সেরা হওয়া চাই···বসন্ত এখনো বিবাহ করে নাই। বিবাহের ব্যাপারে তার আগে অন্ততঃ···

বিবাহ হইয়া গেল। বসন্তকে নিমন্ত্রণ করিল। বসন্ত আসিয়া সুরমাকে দেখিল···দামী গহনা উপহার দিল···

তারপর বসন্ত প্রায় আসিয়া উদয় হয়···মোটরে চড়িয়া।

একদিন রবিবারে আসিয়া বলিল—আমার বরানগরের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে হবে বৌদি···

বৌদি সুরমা বলিল—আপনার বন্ধুকে বলুন···

বসন্ত বলিল—আপনার সাপোর্ট পেলে বলতে পারি।

সুরমা বলিল—আমার সাপোর্ট পাবেন। সত্যি, আপনি এত করে বলছেন, কেন যাবো না? তবে ভেবেছিলুম, একেবারে গিয়ে দম্পতী-যুগলকে অভ্যর্থনা করবো।

হাসিয়া বসন্ত বলিল—সে শুভদিন আগতপ্রায় বৌদি। তারিখ প্রতীক্ষা করুন।

তারিখের জন্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। সামনে শ্রাবণের এক সজল সন্ধ্যায় ওদিককার এক জমিদারের কন্যার সঙ্গে বসন্তের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইয়া গেল।

রূপসী বধূ। বধুর নাম সাবিত্রী।

জ্যোতিষের বুকে আঘাত লাগিল· বসন্ত জিতিয়া গেছে! বড় জমিদারের মেয়ে···তারপর সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল···রূপে সুরমার সামনে দাঁড়াইতে পারে না। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতিষ মক্কেলের ব্রীফ খুলিয়া বসিল।

সুরমা নিত্য তাগিদ দেয়—ওগো, বন্ধুকে আর বন্ধু-পত্নীকে একদিন নেমন্তন্ন করে আনো···

জ্যোতিষ বলিল—দাঁড়াও দুদিন আগে যাক···তাকে দেখি!

—দেখি··· মানে?

—জমিদারের মেয়ে···বন্ধুর মতে আর তাঁর মতে যদি না মেলে?

—কি যে বলো! হুঁঃ! বেশ, তুমি না বলো, আমি বলবো বসন্তবাবুকে।

বসন্ত আসিলে সুরমা বলিল—বৌকে নিয়ে একদিন আমাদের এখানে···

হাসিয়া বসন্ত বলিল—আসবো বৈ কি বৌদি! এর জন্ত নেমন্তন্ন করবেন! হায়রে!

—তবে?

বসন্ত বলিল—অর্থাৎ সাবিত্রী এখানে নেই। কাশীতে তার ঠাকুরমার খুব অসুখ···সে সেখানে গেছে কি না!

—ও···

চৈত্র-মাস। রবিবারের অপরাহ্ন। বাড়ীর উঠানে খানিকটা খোলা জায়গা···নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া জ্যোতিষ মাটী কোপাইতেছিল হঠাৎ সজ্জিত-বেশা এক তরুণী আসিয়া হাজির।

জ্যোতিষ চিনিল, সাবিত্রী।

হাতে-পায়ে কাদামাখা··· মালকোঁছা-বাঁধা কুলির বেশ··· অপ্রতিভ কণ্ঠে জ্যোতিষ বলিল—আসুন···

—বাগান তৈরী হচ্ছে?

—হ্যাঁ···

—দিদি কোথায়?

—আপনি বসবেন চলুন—আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।

একটা ঘরে ছিল ক'খানা কৌচ। সেই ঘরে আনিয়া সাবিত্রীকে বসাইয়া জ্যোতিষ বলিল—আমি ডেকে দিচ্ছি···

জ্যোতিষ ছুটিল ছাদে সুরমার কাছে। সুরমা গুল্ শুকাইতে দিয়াছিল···সেগুলা কুড়াইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে···

জ্যোতিষ আসিয়া বলিল—ওঠো, ওঠো···নিঃশব্দে সভ্য সাজগোজ করে বসবার ঘরে যাও। বসন্তর বৌ এসেছে···সাবিত্রী···

—সত্যি?

সুরমা যেন মাতিয়া উঠিল! জ্যোতিষ কহিল—এ. বেশে যেয়ো না···বড় লোকের মেয়ে···বড় লোকের স্ত্রী··· ভাববে, জানোয়ার!

স্বামীর কথায় যে-দৃষ্টিতে সুরমা চাহিল স্বামীর পানে··· সে-দৃষ্টিতে যেন আগুনের কণা!

সুরমা নামিয়া গেল।

মুখ-হাত ধুইয়া ফর্শা ধুতি পরিয়া জ্যোতিষ আসিয়া দেখা দিল···সাবিত্রী তখন উঠিবার উপক্রম করিয়াছে···

সুরমা বলিল—এক পেয়ালা চাও নয়?

মৃদু হাস্তে সাবিত্রী বলিল—আর এক-সময়ে হবে'খন। আবার আসবো। ··মানে,এসেছিলুম এই ভবানীপুরে আমার এক মামীমার অসুখ···তাঁকে দেখতে—তাই যাবার পথে ভাব করে গেলুম। যেয়ো দিদি আমাদের ওখানে, এখন আমি কোথাও আর যাবো না। এইখানেই থাকবো।

সাবিত্রী চলিয়া গেল···সুরমা সঙ্গে গেল তাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে।

টেবিলের উপর রেকাবিতে কাটা ফল···সন্দেশ-রসগোল্লা ···সাবিত্রী তার কোনোটা স্পর্শ করে নাই।

বাহিরে গাড়ীর শব্দ। সুরমা ফিরিল। ঘরে জ্যোতিষ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে···

সুরমাকে দেখিয়া জ্যোতিষ বলিল—কিছু মুখে দিলে না?

—না···

—হুঁ। জমিদারের মেয়ে···জমিদার···চাল দেখানো হলো।

সুরমা বলিল—না, না···সে-সব মোটে নয়! আজই এসেছে দেখা করতে। কাল সবে কাশী থেকে ফিরেছে···ঠাকুমা মারা গেছেন—তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকেছে। তাই···

জ্যোতিষ ফোঁশ্ করিয়া উঠিল—না, না, তুমি বোঝো না··এঁদের ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার বড় বেশী! এসেছিলেন আমাদের অনুগ্রহ করতে···চরিতার্থ করতে···অনুকম্পা!

সুরমা কোনো কথা বলিল না।

জ্যোতিষ বলিল—ট্রেণে যাবেন না তো যে ট্রেণ ফেল হবে! এক-পেয়ালা চা খাবার সময় হলো না!·· তুমি বোঝো না·· একে বলে, ধন-মদ···হুঁঃ···

তিন দিন পরের কথা···

জ্যোতিষ কোর্ট হইতে ফিরিবামাত্র একখানা চিঠি দেখাইয়া সুরমা বলিল—সাবিত্রী কাল যেতে বলেচে···অনেক করে। আমাদের দুজনকে! না গেলে মনে তার দুঃখ হবে! লিখেছে, কাল শনিবার তোমার কোর্ট নেই··· দুজনে ওখানে গিয়ে দুপুরবেলায় খাবো···তারপর সন্ধ্যায় সকলে মিলে সিনেমায় যাবো। গাড়ী পাঠাবে বেলা নটায়।

জ্যোতিষের মনে পড়িল তিনদিন আগেকার আচরণ··· এক পেয়ালা চা···তা মুখে দিবার সময় হয় নাই!

জ্যোতিষ বলিল—না···যাবো না···যাওয়া হবে না।

—হবে না কেন, শুনি?

জ্যোতিষ বলিল—সে-অহঙ্কার আমি ভুলবো না··· কোনো দিন না।

—অহঙ্কার!

—তাই সুরমা। তোমার সরল মন। তুমি গরীবের লজ্জা, গরীবের গ্লানি জানোনি কোনোদিন। যে মিষ্টি কথাকে তুমি অমায়িকতা বলে ভুল করো···আমি অভাব-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছি—সে মিষ্টি কথাকে আমি চিনতে পারি···সে হচ্ছে বেচারী গরীবের উপরে ধনীর অনুকম্পা!···

কথাটা বলিয়া জ্যোতিষ দাঁড়াইল না···বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। সুরমা দাঁড়াইয়া রহিল নিস্পন্দ···নিশ্চল··· যেন কাঠের পুতুল!

পরের দিন বেলা নটায় মোটর লইয়া বসন্ত আসিয়া হাজির···বসন্ত ব্রীফ লইয়া তার মধ্যে নিমগ্ন···

বসন্ত কহিল—বাঃ! নির্বিকার বসে ব্রীফ ওল্টাচ্ছ!

জ্যোতিষ চাহিল বসন্তের পানে! কহিল—কি করতে হবে?

—আমাদের ওখানে যাবার কথা···সাবিত্রী চিঠি দেছে বৌদিকে···

কোনোমতে নিঃশ্বাস চাপিয়া জ্যোতিষ বলিল—হুঁ··· কিন্তু যাওয়া হবে না।

—যাওয়া হবে না·· মানে?

—মানে, কাজ আছে। দিন-মজুরী করে আমায় খেতে হয় ভাই। একটি দিন যদি না খেটে আমোদ করতে যাই, তাহলে সেদিনের ভাগ্যে শূন্য! মানে, দুঃখ-অভাব···

বসন্ত শুনিল না···জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।

বরানগরে গঙ্গার তীরে বাড়ী বাগান···যেন ইন্দ্রপুরী!

ঘরে বসিয়া দু'জনে গল্প করিতেছে···

সাবিত্রী ডাকিল—বামুনদি···

বামুনদি আসিল। দেখিয়া সুরমা চমকিয়া উঠিল! কহিল—কাতু পিশি!

বামুনদি বলিল—সুরমা···

অর্থাৎ···

কাতু পিশি সুরমার সম্পর্কে পিশি। গরীব বিধবা··· কোনো কূলে কেহ নাই···লোকের বাড়ী পাচিকা-বৃত্তি করিয়া তার দিন কাটে।

জ্যোতিষের মনে হইল, পৃথিবীর বুকে যেন বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে···সে বজ্রাঘাতে পৃথিবী ভাঙ্গিয়া চুরমার!

সাবিত্রী বলিল—বটে! দিদির তুমি পিশিমা হও!

কাতু পিশি বলিল—একদিন ওকে আমি কোলে-পিঠে মানুষ করেছি। আমার বরাত···

জ্যোতিষের যেন কি হইয়া গেল! সে যেন জ্যোতিষ নয়! খাইতে বসিয়া ঝোলের বাটি হাত হইতে গেল ফস্কাইয়া···জামা-কাপড়ে ঝোল লাগিয়া যেন কী!

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল! বলিল—অন্য আসন এনে দি। আপনি ও জামা ছেড়ে ফেলুন···

অন্য আসন আসিল, বসন্তের জামা আসিল! জ্যোতিষ জামা বদলাইয়া আসনে বসিল···কিন্তু সে যেন সব স্বপ্ন! জ্যোতিষের সহিত তার কোনো সম্পর্ক নাই!

সিনেমায় যাওয়া হইল না। সাবিত্রী বসিয়া সুরমার সঙ্গে গল্প করিতেছিল···বসন্ত সে-গল্পে যোগ দিয়াছে···জ্যোতিষ আন-মনা···সাবিত্রী বলিল—আপনার কি হলো বলুন তো··· গুম্ হয়ে আছেন!

সুরমা বলিল—কি আবার! দিন-রাত মক্কেলের মকর্দ্দমার চিন্তা করেন! আমি যত বলি, যে ওগো, মামলা ছাড়া দুনিয়ায় আমরাও আছি, আমাদের পানে মাঝে মাঝে না হয় চেয়ে দেখলে!··

জ্যোতিষ যেন চেতনহারা পুতুলের মতো! বলিয়া বসিল, —না, আমায় তাড়াতাড়ি উঠতে হবে···তারানাথ চক্রবর্ত্তীর ওখানে জরুরি কনসালটেশন্···ব্রীফ সর হ'লো আমার কাছে···ওঃ···বেলা তিনটে বেজে গেছে!

বসন্ত বলিল—কিন্তু···

সাবিত্রী বলিল—বেশ, গাড়ী নিয়ে যান···কনসালটেশন্ সেরে আসুন।

সুরমা বলিল—শুনচো

—না · না···না এখনি যেতে হবে! আমোদ ঢের হয়েছে···আর নয়···

জ্যোতিষকে রাখা গেল না?

বসন্ত মোটর দিল এবং সুরমাকে লইয়া জ্যোতিষ সে মোটরে চড়িয়া বাড়ী ফিরিল।

তার পর কি মনে হইল···এ-বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক জ্যোতিষ কাটাইয়া দিল! বসন্ত কতবার আসিয়াছে··· বলিয়াছে···চলো না আমাদের ওখানে···সাবিত্রীর শরীর ভালো যাচ্ছে না···সে-বেচারী তাই আসতে পারে না— অনেক করে বলেছে···

জ্যোতিষ বলিল—মাপ করো বসন্ত···তুমি জানো না, আমার এ কি কৃচ্ছ্র সাধন চলেছে। এমন ব্যবসা···এতে যদি successful হতে চাই···তাহলে স্ত্রী নয়···পুত্র নয়···বন্ধু নয়···বান্ধব নয়···সমাজ নয়···সংসার নয়···

বসন্ত বলিল—শুধু গবেষণা?

—তাই।

—বেশ···

বসন্ত আর আসে নাই।

না আসিলেও জ্যোতিষ তাকে ভোলে নাই, নিমেষের জন্য নয়।

খবরের কাগজে পড়েছে বসন্ত চৌধুরীর নানা কীর্ত্তির সংবাদ। কোথায় কাপড়ের মিল খোলা হইতেছে···বসন্ত চৌধুরী তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। নব্য-বঙ্গ ইনসিওরেন্স কোম্পানি···বসন্ত চৌধুরী তার প্রাণ! সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি···তার সভাপতি বসন্ত চৌধুরী!

দেশের কাজে দশের কাজে বসন্ত চৌধুরীর কত নাম··· কি সুখ্যাতি! খবরের কাগজে এ-খবর পড়ে, আর জ্যোতিষ নিজের ওকালতি-ব্যবসাকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে! ল-রিপোর্টের পর রিপোর্ট পড়িয়া নজীর···বুদ্ধি-শাণানো পসার প্রতিপত্তি···টাকা করিয়াছে প্রচুর···আর এখন মনে হয়···বয়স হইয়াছে···পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম! তখনি ব্যাঙ্কের খাতা খোলে! ক্যাশ-ব্যালান্সের অঙ্ক দেখিয়া আরাম পায়! ভাবে মানুষ ইহার বেশী এক জন্মে আর কত করিবে! সেই টিনের ছাদ-ওয়ালা জীর্ণ ঘরের কথা মনে পড়ে···বসন্তের জুড়িতে চড়িয়া বৃষ্টির দিনে বুকের মধ্যে কেমন লজ্জার ছমছমানি···

আজ ভবানীপুরে সে মস্ত বাড়ী করিয়াছে···মোটর ··দাস-দাসী···জ্যোতিষ দত্ত এ্যাডভোকেট···নাম বলিলে লোকে বলে, হ্যাঁ···একজন কৃতী পুরুষ বটে!···

খবরের কাগজেই জ্যোতিষ পড়িয়াছে বসন্ত চৌধুরীর মৃত্যুর সংবাদ···সমারোহে তার শ্মশান-যাত্রা···

কতবার মনে হইয়াছে···সেই বসন্ত··শ্মশানে গিয়া একবার শেষ দেখা···

যাওয়া হয় নাই! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়াছে সাবিত্রীকে ···তার মনে প্রথম সেই আসা···এক-পেয়ালা চা মুখে দেয় নাই!·· সাবিত্রীর বাড়ীর পাচিকা সুরমার পিসি···

ঝোলের বাটি ফেলিয়া সেই বেকুব না…

সাবিত্রীর অহঙ্কার…না…না…না!

বেলা দুটায় জ্যোতিষ চলিল নিজের মোটরে চড়িয়া বরানগরে বাড়ী-বাগান দেখিতে…সঙ্গে ভূতনাথ মিত্তির। ভূতনাথের কাছে এ বাড়ী-বাগান বাঁধা আছে।

দেশের আর দশের কাজ করিতে গিয়া বসন্ত যে অনেক টাকা দেনা করিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ তার মৃত্যুর পরে প্রচার হইতে বিলম্ব ঘটে নাই!

সেই বাড়ী · সেই বাগান

সাবিত্রী নিজে আসিয়া দেখা করিল।

যেন রূপের কঙ্কাল!

সাবিত্রী বলিল—দিদি ভালো আছেন?

—হ্যাঁ…

—আপনি কিনছেন এ বাড়ী এ বাগান—এ আমার মস্ত সান্ত্বনা! নাহলে…

নিশ্বাসের বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

—একটু চা খাবেন?

—না। তাড়াতাড়ি দেখতে হবে। মানে, ওর সঙ্গে দাম সেট্‌ল্ করবার আগে শুধু একবার দেখা…

—ও…আমি দেখাচ্ছি…চলুন।

সাবিত্রী দেখাইতে আসিল…

বাড়ী; তার সঙ্গে বাগান…

সাবিত্রী বলিল—এ বাগান আমার তৈরী। এ সব গাছ নিজের হাতে পুঁতেছি, নিজের হাতে জল দিয়ে বড় করেছি।·· মালী ছিল · তাদের কখনো হাত দিতে দিইনি …এ-সব যেন আমার ছেলেমেয়ে…

জ্যোতিষ নিঃশব্দে দেখিতেছে…নিঃশব্দে সব কথা শুনিতেছে।

সাবিত্রী বলিল—ঐ বেড়া…আপনার বন্ধু নিজের হাতে বেড়া দিয়েছিলেন। আপনি সেই কোদাল নিয়ে মাটী কোপাতেন…বন্ধু ঠিক তাই করতেন…তাঁর স্মৃতিও…

সাবিত্রী অনেক কথা বলিল…জ্যোতিষ শুনিল…জবাব দিল না।

বাগান ঘুরিয়া আবার বাড়ীতে…

সাবিত্রী কহিল—বাড়ী ভালো আছে…সখ করে তৈরী করেছিলেন…ভালো মেটিরিয়েল্ দিয়ে…

জ্যোতিশ বলিল—আপনি কোথায় থাকবেন?

—জানি না। ভেবে দেখি নি। ভাববার শক্তি নেই, জ্যোতিষবাবু!…এ বাড়ী, এ বাগান…আমার কাছে এ-সব আজ…

আবার সেই নিশ্বাসের বাষ্প…এবার আরো ঘন, আরো পুঞ্জিত!

জ্যোতিষ কহিল—এ বাড়ী ছেড়ে যাবেন?

—উপায় কি। ছেড়ে যেতে হবেই তো!

—না · না…তা কেন? এ বাড়ী-বাগান…আমি এখনি এখানে থাকতে আসছি না তো! তা থাকলে চলবে না! তার মানে, আমরা যে-বাড়ীতে আছি সেইখানেই থাকবো।··এ বাড়ী-বাগান কিনছি…সখ! আপনি যেখানেই থাকুন, ভাড়া দিয়ে থাকবেন তো! তা সে ভাড়া দিয়ে এই বাড়ীতেই থাকুন না! আমার মালী-টালীরা তাহলে আপনার চোখের সামনে কাজ-কর্ম্মে অমনোযোগী হতে পারবে না!

সাবিত্রীর দু'চোখে জল…আর্ত্ত-কণ্ঠে সাবিত্রী কহিল—তা হয় না জ্যোতিষ বাবু…

জ্যোতিষ কহিল—কেন হবে না? আমি এ বাড়ী-বাগান এখন ভাড়া দেবো…ফেলে রাখবো না। সে ভাড়া না হয় আপনিই দেবেন!…বাড়ীর-বাগানে আপনার যেমন যত্ন হবে, অন্য ভাড়াটের তো তা হবে না…

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া গাঢ় কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল—আপনি মহৎ…

জ্যোতিষ বলিল—মহৎ নই!… সংসার করা ব্যবসাদারী! হ্যাঁ…সুরমা আজ আসতে পারলে না। কাল তাকে নিয়ে আসবো। এই ব্যবস্থা পাকা…এর নড়চড় হবে না…আপনাকে এখানে থাকতেই হবে।

বাড়ী ফিরিয়া সুরমাকে জ্যোতিষ বলিতেছিল—এমন মমতা হলো! কে বাইরের লোক ও বাড়ী কিনবে, উনি কোথায় থাকবেন?…ও বাড়ী বসন্তের স্মৃতিতে ভরে' আছে! কি-মমতা ও বাড়ী-বাগানে! ভাড়ার কথা বলে কৌশল করে' ওঁকে রাখতেই হবে…ও-বাড়ীতে…না হলে উনি পাগল হয়ে যাবেন · মরে যাবেন!…কাল তুমি ওখানে যাবে আমার সঙ্গে…এই ভাবেই ওকে বুঝিয়ো…না হলে মর্য্যাদায় আঘাত লাগবে…আমি ওঁকে অহঙ্কারী বলে মনে করতুম! ভুল—সে ভুলের জন্য বন্ধুকে চিরদিন পর করে রেখেছিলুম! এ-দুঃখ যাবার নয় সুরমা!

অরণ্যানী

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী

দুর্গম অরণ্য। চারিধারে পাহাড়গুলো ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ ভয়াবহ হ'য়ে যেন তারা প্রতিহিংসায় ব্যগ্র। ওপরে নীচে গায়ে অগণিত গাছ ঠেলাঠেলি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার সীমানা পাহাড়ের গায়ে অনধিকার প্রবেশ করেছে যেন। রাস্তার ধারে ধারে শীর্ণকায়া পাহাড়ী নদী কল কল শব্দে বয়ে যাচ্ছে নিয়ত। তাদের বঙ্কিম গতিভঙ্গি দুর্নিবার হয়ে উঠেছে।

দুর্গম অরণ্য ভেদ ক'রে পাহাড়ী রাস্তায় মোটর চলেছে আমাদের নিয়ে। ময়ূরভঞ্জের অরণ্য ছোটনাগপুর অঞ্চলের মত। তবে সেখানকার গাছগুলো আয়তনে ও দৈর্ঘ্যে এখানকার চেয়ে কিছু ছোট।

বড় রাস্তা থেকে যে রাস্তা গভীর জঙ্গলে নেমে গিয়েছে সেটা কাঁচা এবং অস্থায়ী। জঙ্গল থেকে কাঠ আনবার জন্যে টিম্বার কোম্পানী অস্থায়ীভাবে তৈরি করেছে। নদী পার হ'য়ে গাড়ী যখন কাঁচা রাস্তায় চলতে লাগল তখন জঙ্গলের ভীষণতা বাড়তে আরম্ভ করেছে। জঙ্গল সেখানে হয়েছে গভীর। পাহাড়ের গা দিয়ে ঘেঁষে চলেছে মোটর হর্ন বাজিয়ে। চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম জঙ্গলের ঘনত্ব এবং বিরাটত্ব। এখান থেকে চারদিকে কুড়ি মাইলের মধ্যে সমতলস্থানের অস্তিত্ব নাই। পাঁচ মাইলের মধ্যে জঙ্গলীদেরও বাস নাই। নির্জ্জন এবং জনমনুষ্য-বিবর্জ্জিত অঞ্চল।

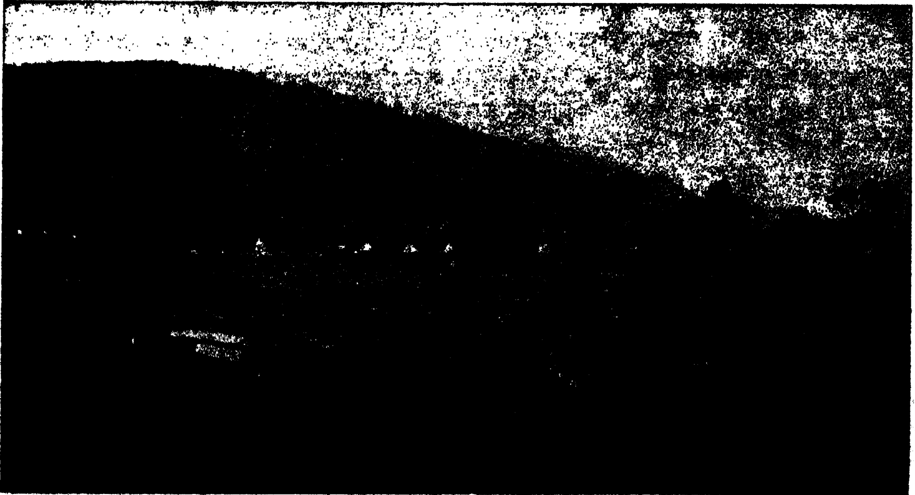
সূর্য্য তপন সবে উঠেছে। গাছের মাথায় মাথায়, পাহাড়ের চূড়ার মধুর আবেশে মত্ত আমরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চলেছি গভীর হ'তে গভীরতম অঞ্চলে।

মোটর থামল অরণ্যানীর এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। অল্পপরিসর স্থানের পাশ দিয়ে একটা নদী চলেছে বড় নদীর সঙ্গে মিশবার আশায়। সেখানে নেমে দাঁড়ালাম। চারদিক তাকিয়ে অরণ্যানীর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। শ্যামল পল্লীর মায়াবৃত বনানী ছেড়ে এসেছি অরণ্যানীর কন্দর প্রদেশে চিত্তবিনোদনের জন্য। অহেতুক অরণ্য-বিচরণ-সৌভাগ্য আমাদের ঘটে না। এ দিকের পার্ব্বত্য শোভা রমণীয়।

গাড়ী থেকে নেমে নদীর উপলখণ্ডের ওপর বসে হাতমুখ ধুতে লাগলাম বারবার। আর যারা ছিল তারাও তাই করতে লাগল। দেখতে দেখতে সকলেই যেন নদীর সঙ্গে খেলা জুড়ে দিল।

গাড়ীতে যে সব কুলি ছিল তারা ততক্ষণ ডিপোর কাঠ ব'য়ে মোটরে তুলছিল। বড় গাড়ী, কাঠ ওঠে যথেষ্ট। দু-তিন জন মিলে কাঠ ব'য়ে নিয়ে আসছে, আর নিজেদের মধ্যে গ্রাম্য ভাষায় কথা চালাচ্ছে।

আমরা হাতমুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। বেলা তখন সাতটা। সূর্য্যরশ্মি তখন একটু উপর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। চারদিক থেকে আর কোন শব্দ কানে আসে না। এধারে আর কেউ বড় আসে না। আমরা সবশুদ্ধ জন ছয়েক আছি। করাতিয়ারা মাইল খানেকের



বাদামপাহাড় ষ্টেশনের কাঠগুদাম

প্রান্তভাগ দিয়ে সূর্য্যরশ্মি এসে পড়ছিল রুক্ষ জঙ্গলী লতার পাতায় পাতায়। এত রাত্রি থাকতে আমরা বের হয়েছি সে জ্ঞান তখন ছিল না। অরণ্যানীর মধ্যে ছিল। এখন তাদের কাজ ওদিকে পড়েছে। এ ধারের কাঠগুলো রাস্তার ধারে ধারে সাজিয়ে রেখে তারা অরণ্যানীর আরও গভীরতম

অঞ্চলে চলে গিয়েছে। তাদের আড্ডা এখান থেকে মাইলখানেকের বেশীই হবে।

কি মনে ক'রে এদিক ওদিক করতে করতে একটু সরে পড়েছি বে-রাস্তায়। মহা মুশ্‌কিল! পথ খুঁজে বের করা শক্ত। কোথাও কোন



খাড়াইপাহাড়ের দৃশ্য

চিহ্ন নাই। ঘুরতে আরম্ভ করেছি। রাস্তা না পেয়ে ক্রমাগতই ঘুরে পাক খাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা কুলি এসে সামনে দাঁড়াতেই সামলে নিলাম। সে লোকটা আমাকে এতক্ষণ ধরে খুঁজছিল। এখানকার অবস্থা আমার জানা নাই। কোন্ দিকে যাওয়া উচিত, কোন্ দিক বিপদ-সঙ্কুল—এ সব ভাবিও নি এবং ভাষা দরকার পড়বে কি-না বুঝিওনি।

কুলিটা এসে বল্লে, আপনাকে খুঁজতে সবাই চারিদিকে ছুটেছে। এই জঙ্গলে খুঁজে বের করা সহজ নয়। কোন রাস্তা নাই, সীমানা নাই, আশ্রয় নাই; কেবল জঙ্গলের পর জঙ্গল, পাহাড়ের পর পাহাড়। আপনার দাদা ভয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া বিশেষ ক'রে এই অঞ্চলটা খুবই খারাপ। এখানে বাঘ, হাতী, বড় বড় সাপ এত বেশী আছে যে, জঙ্গলীরাও এখানে সাহস ক'রে থাকতে পারে না।

কুলিটার কথায় হাসতে লাগলাম। এই সামান্য জঙ্গলে যদি ভয় খাই তা হ'লে আমাদের জঙ্গলে বের হওয়াই উচিত নয়। নিজের মনকে সাহস দিয়ে এবং কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা না ক'রে গাড়ীর কাছে ফিরে এলাম কুলির সঙ্গে। অন্য কুলিরা তখনও কেউ কেউ ফিরে আসে নি। যারা চারদিক খুঁজে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে তারা এপাশে আমার প্রসঙ্গ নিয়ে নানা আলোচনা করছে! আমাকে আসতে দেখে দাদা যেন প্রাণ পেলেন। আমাকে মৃদু ভৎর্সনা ক'রে জঙ্গল সম্বন্ধে নানা কথা জানিয়ে দিলেন।

কুলিরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাদের দায়িত্ব অন্তত একজন পূরণ করেছে। আমাকে পেয়ে তারা মনের আনন্দে বিড়ি খাবার আয়োজন করতে লাগল।

আমি ফিরে এসে নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়ালাম। যেন কিছুই হয় নি। একজন কুলি একটা সরু শালের ডাল নিয়ে এল। ঠিক আঙ্গুলের মত সরু। টাঙ্গি দিয়ে সেটার মধ্যভাগে গর্ত্ত করতে লাগল। তারপর আর একটা ঐরকম সরু ডালের ডগা পরিষ্কার করে কেটে একটু সরু ক'রে অন্য কাঠিটার গর্ত্তে বসিয়ে দু হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগল ডালের হাড়িতে কাঁটা দেওয়ার মত। শায়িত ডালটার নীচে শুকনো একটা শালপাতায় ডাল দুটোর ঘর্ষণের জন্যে কাঠের গুঁড়ো পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে সেই গুঁড়ো কাঠের ভেতর থেকে অল্প অল্প ধোঁওয়া বের হ'তে লাগল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আগুনের রেখা দেখা দিল তার মধ্যে। অবস্থা বুঝে কুলিরা কাঁচা শালপাতায় জড়ানো তামাক-গুঁড়ো পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে টানতে লাগল। এই রকম করে তারা বিড়ি খায়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ধূমপানের আয়োজন দেখতে দেখতে মনটা অনেকটা শান্ত হ'ল। জঙ্গলের মধ্যে আগুন পাওয়া যায় না। সুতরাং কাঠে কাঠে ঘর্ষণ ক'রে আগুন বের করার কৌশলকে অবজ্ঞা করতে পারলাম না। একটা কুলিকে ব'লে সেই যন্ত্রশলাকা দুটি সংগ্রহ করলাম।

মোটরে কাঠ বোঝাই হয়ে গেল। আমরা দু'জন সামনের সীটে বসলাম। কুলিগুলো কাঠের ওপরে বসে আনন্দে গান ধরে দিল। মোটর চলতে শুরু করল।

সূর্য্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে ওপরের দিকে অবাধগতিতে। তার ছটায় ক্রমে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং ঘণ্টাখানেক পরে তা অসহ্য বোধ হতে লাগল। যেমন ক'রে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলেছিল, তেমনি ক'রে সেই গাড়ী আবার ফিরতে লাগল। রাস্তার ধারে ধারে দু-চারটে মরা শাল গাছ থেকে অল্প অল্প ধোঁওয়া বের হচ্ছিল। অনেক দিন আগে করাতিয়ারা এই শুক্‌নো গাছে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজের সুবিধা ক'রে নিয়েছিল। এখন তারা কাজ শেষ ক'রে চলে গিয়েছে। তাদের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে অর্দ্ধদগ্ধ শাল গাছগুলো। আশে পাশে করাতিয়াদের জীর্ণ অস্থায়ী কুঁড়েগুলো বিরাট নগ্নতা নিয়ে পড়ে আছে। ভাঙ্গা দু-চারটে হাঁড়ি, ছেঁড়া মাদুর ইতস্ততঃ পড়ে আছে।

মোটর ক্রমেই এগিয়ে আসছে। জঙ্গলের গভীরতা একে একে ক্ষীণ হয়ে আসছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, নীচে দিয়ে মন্থরগতিতে গাড়ী চলেছে। অস্পষ্ট আলোয় যেগুলো যাবার সময় ভালভাবে চোখে ধরেনি এবার সেগুলো মন দিয়ে দেখতে দেখতে চলেছি। পাহাড়ের উচ্চতা, রাস্তার সর্পিল গতিভঙ্গি, অরণ্যানীর নিবিড়তা আমায় মুগ্ধ করেছে। মধ্যে মধ্যে দু-একটা বনময়ুর, বনমুরগী, কোকিল পাশ দিয়ে চকিতে ডেকে চলে যায়। সমস্ত রাস্তা পাখীদের একটানা সুরের রেশ লেগেই আছে। তাদের পাখার ঝটপটি শব্দ, কর্কশ চীৎকার এবং ছুটাছুটির যেন অবকাশ নাই।

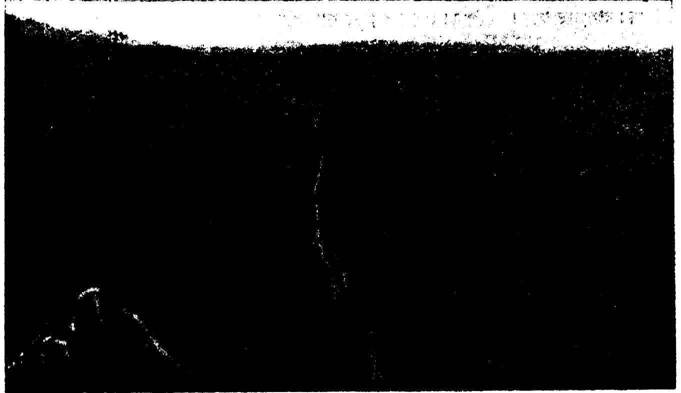
অবশেষে নদীর ধারে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সেই নদী, যেটা পার হ'য়ে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে ঢুকেছিলাম—যার পাশ দিয়ে বড় রাস্তা সমান্তরালভাবে চলেছে।

বাঁ দিকে একটা মোড় ফিরে নদীর সাঁকোর ওপর দিয়ে গাড়ী চলে গেল। মোটা মোটা শাল কাঠ দিয়ে সাঁকো তৈরী হয়েছে সাময়িকভাবে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ'লে সাঁকোর ওপর দিয়ে নদীর জল বয়ে যায়। কখনও বা সেই বড় বড় কাঠ স্রোতে ভেসে যায়, কখনও বা বিক্রম দেখিয়ে নদীর বুকে পড়ে থাকে। জল ক'মলে আবার ঠিক হয়ে যায়।

নদীর ধারে, সাঁকোর কাছে একটি ছোট গ্রাম। অরণ্যানীর নিত্য সহচর-সহচরীরা সেখানে বাস করে। গ্রামের পাশে বিঘা কয়েক চাষের জমি পড়ে আছে। তা ছাড়া, পাহাড়ের নীচে স্থানে স্থানে চাষ করবার মত জমি আছে। এ গ্রামের অধিবাসীরা সেই সব জমি চাষ ক'রে সংসার চালায়। কোন রকমে চাল ফুটিয়ে নেওয়া ভাত ছাড়া আর তারা কিছু খেতে পায় না। সকালে একবার, বিকালের দিকে একবার এবং রাত্রে ভাত ছাড়া আর তারা কিছু পাবার আশা রাখে না। জঙ্গলী ফল এদিকে কিছুই পাওয়া যায় না। এদিকের গাছে কোন ফলই দেখা যায় না। কেবলমাত্র, আমলা, বহেড়া, হরিতকি ছাড়া। জঙ্গলীরা সাধারণত কোল; কেউ কেউ উড়িয়া। গরু, ছাগল, মুরগী তাদের গৃহপালিত জন্তু। সুতরাং এদের মারফতই তারা যা-কিছু করিয়ে নিতে পারে এবং পায়—বাকী আকাশকুসুম মাত্র।

বড় রাস্তায় পড়তেই হঠাৎ চোখে পড়ল জনতার ভিড়। দলে দলে কোল রমণীরা দু-একজন পুরুষ সঙ্গে মাথায় ক'রে ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। পরণে রঙীন হাতে বোনা সাড়ী, মাথার চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ান। সদ্য স্নানাহার শেষ ক'রে উৎসবে চলেছে সারি সারি। এক একটা গানের কলি ধরে সুর ক'রে গাইতে গাইতে সদলে লীলায়িত ভঙ্গি ক'রে চলেছে। তাদের উৎসব হয় সপ্তাহে সোমবারে এ অঞ্চলের দিকে। বুধবার ও অঞ্চলের দিকে এবং শুক্রবার যশীপুরে। এই জায়গাটা তাদের বাজার, গঞ্জ এবং সব কিছু। ফলে সপ্তাহে তিন দিন কোল নরনারীর উৎসব চলে হাটের দিকে। হাটে তারা জিনিষ বিক্রী করে, কেনে এবং দুপুরের দিকে মদ খেয়ে আবার গুঞ্জন করতে করতে বাড়ী ফেরে। কারও সন্ধ্যা হয়, কারও রাত্রি হয় অনেকটা। কেউ আসে দশ মাইল দূর থেকে, কেউ আসে আরও বেশী দূর থেকে।

কোল রমণীদের হাটে যাওয়ার বিশেষত্ব আছে। এক ঝুড়ি ধান, চাল অথবা মহুয়া ফল নিয়ে বেশীর ভাগ হাটে যায়। কেউ কেউ কিছু গুড়, সরষের তেল, খোল, তরকারী, হাঁস, মুরগী এই সবও নিয়ে যায়। হাটে বিক্রী ক'রে তাই থেকে কাপড়, সোডা, চাল, নুন এই সব কেনে। হাটে ঠোঙার ক'রে সাজিয়ে রেখেছে এক পয়সার সোডা, নুন ইত্যাদি।



পার্ব্বত্য ঝরণা

মোটরের হর্নে উৎসব-মুখরা কোল রমণীদের চকিতা ক'রে আমরা বেশ আনন্দ উপভোগ করছিলাম। তারাও আমাদের নিয়ে হাসাহাসি কম করেনি। দলের পর দল চলেছে। বেলা যতই বেড়ে চলেছে, আমরা যতই যশীপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, দলের সংখ্যা ততই বাড়ছে। বেশ-পারিপাট্যে তারা কম ওস্তাদ নয়। স্বল্প বস্ত্রে দীর্ঘ তনুকে জড়িয়ে রেখেছে মধুর ছন্দে, লীলায়িত ভঙ্গীতে।

রাস্তায় তিন জায়গায় থামতে হ'ল। ছোট ছোট নদী এমনভাবে বেঁকে চলেছে এবং এত উঁচু নীচু যে মাঝে মাঝে মোটরের গতি রুদ্ধ করে আস্তে আস্তে নদীতে নামাতে হয়। মধ্যে এক জায়গায় নদীর জলের ধারে মস্ত বড় দাগ দেখা গেল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, হাতীতে ঐ রকম ক'রে গিয়েছে। হাতীরা নদীর জলে গড়াগড়ি দিয়ে জলক্রীড়া করে। জল অল্প, তাই গা গড়াগড়ি দিয়ে জলে কাদায় একাকার করেছে। এই জঙ্গলে হাতী, বাঘ, ভালুক খুব বেশী আছে। হাতী কচিৎ নীচে নামে। রাস্তার ধারে এক জায়গায় হাতীর "মল" দেখা গেল প্রচুর। দলবদ্ধভাবে থাকলে তারা বিশেষ ভয়ের কারণ নয়। কারণ দলে মত্ত হ'য়ে এদিক ওদিক তাকাবার সময় পায় না। দলভ্রষ্ট হাতী দেখলে সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়। এদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে একমাত্র উপায় পাহাড়ের গা ব'য়ে নীচে নেমে পড়া। এরা তাড়াতাড়ি নীচের দিকে বড় নামতে পারে না। রাস্তার ধারে এক জায়গায় জঙ্গল ভেঙে চুরমার হ'য়ে পড়ে আছে। দলবদ্ধ হাতীরা জলক্রীড়ার পর এখানে আনন্দোৎসব করেছে, এটা তারই পরিণাম।

বাসায় ফিরতে আর দেরী হ'ল না। অরণ্যানীর অঞ্চল পেরিয়ে শান্ত নীড়ে ফিরে এলাম। কাল রাত্রে এখানে এসেছি। আজ সকালে অরণ্যানীর অঞ্চল অতিক্রম ক'রে এলাম। রাস্তার রমণীরা যেন ফুরোয় না। গতিহারা পথের যেন অন্ত নাই। বাসায় বিশ্রাম করতে করতে ভাবছিলাম কালকের কথা। টাটানগর থেকে যে রাস্তা বাদামপাহাড়

গরুমহিষাণী গিয়েছে সেই রাস্তায় আমরা এসেছি। টাটানগর থেকে পথের বৈচিত্র্য মন্দ লাগল না। মাইল দুই যেতে না যেতেই ট্রেণ ক্রমশ পার্ব্বত্য পথে এগিয়ে আসতে লাগল। এই রাস্তা ঠিক ছোটনাগপুরের মতই অসমতল। এইখান থেকে উড়িষ্যার করদ-মিত্র রাজ্যের সূচনা হয়েছে।

পার্ব্বত্য পথের দৃশ্যাবলী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের। কোথাও অনুচ্চ পাহাড় বৃক্ষবিবর্জ্জিত, রুক্ষ। কোথাও গুল্মলতায় হরিৎবর্ণ, দুর্গম। প্রথমে কেবলই দেখা যায় স্লেট পাথর মাটি ফুঁড়ে বক্রগতিতে ত্রুভঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আশে পাশে ছোট ছোট স্লেট পাথরের পাহাড়। দূরে রুক্ষ গুল্মলতায়, শাল গাছে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

ট্রেণ চলেছে মন্থরগতিতে। এই লাইনের গতিপথ অল্প, মাত্র ষাট মাইল। পর পর কয়েকটা ষ্টেশন পার হ'য়ে ট্রেণ থামলো রায়রাংপুরে। এটা ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের একটা মহকুমা শহর। এখান থেকে বরাবর বারিপাদা পর্য্যন্ত বাস যাতায়াত করে। ষ্টেশনের চারধারে প্রচুর শাল কাঠ জমা করা রয়েছে দেখা গেল। ষ্টেশনের সামনেই সরকারী কর্ম্মচারীদের বাসা, আদালত। পাশে শহরের বস্তি, বাজার ইত্যাদি।

আবার ট্রেণ মন্থরগতিতে চলেছে। কয়েকটা ষ্টেশনের পর একটা বড় পাহাড়ের পাশ দিয়ে লাইন চলে গিয়েছে গরুমহিষাণী পর্য্যন্ত। সেখানকার পাহাড়ের গা থেকে "লৌহ-মৃত্তিকা" সংগ্রহ ক'রে ট্রেণ-যোগে ক্রমাগত টাটানগরে পাঠান হচ্ছে। এবার ট্রেণ এসে পৌছল বাদামপাহাড়ে; এই লাইনের শেষ সীমানায়। একটা বড় পাহাড়ের গায়ে এসে এ রেলপথ শেষ হ'ল। পাহাড়টি মাইলের পর মাইল চলে গিয়েছে বিভিন্ন পাহাড়ের যোগাযোগে। এটার উচ্চতা প্রায় হাজার ফিট। এই পাহাড়গুলির একটা বিশেষত্ব আছে। বাদামী রঙের মাটির সঙ্গে ছোট ছোট লৌহমিশ্রিত পাথরে এগুলি দেখতে বেশ লাগে।

পাহাড়ের ধারে ধারে ছোট ছোট লাইন পাতা রয়েছে। তার ওপর দিয়ে ক্রমাগত ত্রিশ-চল্লিশখানি গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছোট এঞ্জিনে, ধীর গতিতে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে সব পাথর সংগৃহীত হচ্ছে সেগুলি কুলিদের দিয়ে ঝুড়িতে বোঝাই ক'রে গাড়ীতে রাখা হয়। আর যে পাথরগুলি পাহাড়ের ওপর থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে সেগুলি অভিনব কৌশলে নীচে ছোট লাইনের গায়ে নামান হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে সোজা ডবল লাইন নেমে এসেছে ছোট লাইনের গায়ে। ঐ ডবল লাইনের একটিতে ছোট ছোট গাড়ীগুলি পাথর বোঝাই ক'রে নীচে নামছে, আর একটিতে খালি গাড়ীগুলি ওপরে উঠে যাচ্ছে। লাইন দুটি সমান্তরাল ব'লে নীচে থেকে ওপরে এবং ওপর নীচে থেকে গাড়ী কেমন ক'রে সাত শ ফিট ওঠা নামা করছে সেটা দেখবার জিনিস এবং সেটা চলে ইলেক্‌ট্রি কে। একটিকে যেমন নামান হচ্ছে, তারই সঙ্গে দড়ি বেঁধে অপরটিকে খাড়া তুলে নেওয়া হচ্ছে। দুই লাইনের গাড়ীর শেষপ্রান্তে দড়ি দিয়ে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। কৌশল অভিনব এবং চমৎকার। মালয়ের পেনাং টাউনে এই রকম এক শ্রেণীর ট্রেণ ইলেক্‌ট্রি কে পাহাড় থেকে নীচে নামে এবং সেই সূত্রে আর একখানি ওপরে ওঠে। সেখানে যাত্রী চলে আর এখানে পাথর নামে।

বাদামপাহাড়ের গায়ে মস্ত বড় কলোনী বসেছে টাটা কোম্পানীর। ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল থেকে লক্ষ লক্ষ কাঠের স্লীপার এনে এই ষ্টেশনে জমা করা হয়েছে। এদিককার ষ্টেশন থেকে মালের আয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়। যাত্রীর সংখ্যা সে তুলনায় অতি নগণ্য। এদিকেরও স্থায়ী বাসিন্দারা সব কোল, উড়িয়া খুব কম।

বাদামপাহাড়ে পৌছলাম রাত্রি সাড়ে ন'টায়। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। অদূরে বিরাট বাদামপাহাড়। ষ্টেশন জনশূন্যপ্রায়। গুটিকয়েক যাত্রী নেমে গেল। আমরা স্বল্পালোকে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়! এই জনবিরল পার্ব্বত্য অঞ্চলে নির্ব্বান্ধব এবং অসহায় অবস্থায় দাঁড়াতে বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। কিন্তু মিনিট কয়েক মধ্যেই মোটর হাঁকিয়ে দাদা এসে হাজির হলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা ক'রে আমাদের নিয়ে এলেন এই গভীর অরণ্যানী অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র শহরে। আমরা এখানে পৌছে বড়ই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হলেন দাদারা, বৌদিরা এবং ছেলেমেয়েরা। আমাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। বাঙ্গালী-বর্জ্জিত এবং সভ্যসমাজবহির্ভূত অরণ্যানী প্রদেশে বাঙ্গালী এবং বিশেষ ক'রে ভাই এবং ভাইবৌকে দেখতে পেয়ে কোন্ প্রবাসী না আনন্দ পায়?

চারিদিকের নিবিড় অরণ্যানী অঞ্চল যেন পাহাড়ে বাঁধা পড়ে রয়েছে। বড় বড় শাল গাছ পাহাড়ের সঙ্গে সমান তালে মাথা তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সর্ব্বত্র কাঠ আর কাঠ, পাহাড় আর পাহাড়। জঙ্গলে-পাহাড়ে কাঠে-কাঠে কোলাকুলি করছে প্রতিদিন। দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে গেল নির্ব্বিঘ্নে এই অরণ্যানী প্রদেশে।



ছুটি

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সুনীতি ভাবে সত্যই তাহার আর কিছুই করিবার নাই।

এই বিপুল বিশ্বের মাঝে নিরন্তর যে কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে সে স্রোতের গতি আর তাহার জীবন প্রবাহে নাই। স্রোতহীন, গতিহীন বদ্ধ জলাশয় তাহার জীবন।

কিন্তু কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনে ভবিষ্যতের এই সুখ স্বপ্নের কল্পনাই তো সে করিয়াছিল—ছেলেমেয়েরা মানুষ হইলে সংসারের বোঝা আর তাহার স্কন্ধে ভার হইয়া থাকিবে না। সংসার-সংগ্রামে ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিলে স্বামী সহাস্যে এই আশার বাণীই শুনাইয়াছিলেন—এখন কষ্ট করছো যাদের জন্য, ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে এর সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিয়ো।

সুনীতি ঝঙ্কার দিয়া উঠিত—এ জীবনে আর নয়। তেমন ভাগ্য কি আর করেছিলুম—তা হলে কি আর এ সংসারে আসি?

কিন্তু এ বিদ্রোহ ক্ষণিকের।

সুনীতির জীবনের চাকা সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটির ভিতর দিয়াই ঘুরিয়া চলিত। যেদিকে সে না দৃষ্টি দিবে সেইদিকেই গোলমাল।

সুনীতি না রাঁধিলে কর্ত্তার খাওয়া হইত না। পড়ার কাছে মাঝে মাঝে না থাকিলে ছেলেরা ফাঁকি দিত। মেয়েদের বেশভূষার দিকেও তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শুইয়াই কি ছাই নিস্তার আছে?—কাহার পা মশারীর বাহিরে গিয়াছে—মশারী ছিঁড়িয়া যাইবে ঠিক করিয়া না দিলে। কাহার সর্দ্দি হইল, তুলসীপাতা আর আদার রস খাওয়াইতে হইবে। এমনি সহস্রাধিক কাজ আর কাজ। একা সুনীতি আর কত দিক্ সামলাইবে?

এই সুনীতিরই একদিন কাজ ফুরাইল।

বিশ্ব সংসারে আর তাহার কিছুই করিবার নাই। আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার তাহার এই অখণ্ড অবকাশ। সংসার অকৃতজ্ঞ নয়, জীবনের এই গোধূলি বেলায় সংসার তাহাকে তাই সকল ঝঞ্ঝাট-ঝক্কি হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

ছেলেমেয়েরা মানুষ হইয়াছে—জাজ্জ্বল্যমান সংসার তাহার। মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়া তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করিতেছে। বিপুল হর্ষ-কোলাহলের মাঝে তাহারা হয়ত বাপের বাড়ি আসিল স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া—কয়েকদিন বাদে আবার চলিয়া গেল।

ছেলেরাও বড় হইয়াছে। কার্য্যক্ষম সব—কিছুই আর তাহাদের দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। পুত্রবধূরা—নাতি-নাতনীরা চোখের সামনে আনন্দ-কোলাহলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

কর্ত্তা পেন্‌সন্ লইয়া আবার একটি নূতন কাজ গ্রহণ করিয়াছেন—সংসারে আরও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন।

তাঁহাকে দেখা-শুনা করারও প্রয়োজন সুনীতির নাই। তদারক করিতে গেলে কর্ত্তা বাধা দেন—আর কেন? সারা জীবনটাই তো খেটে খেটে মলে—এইবার ছুটি নাও না। আমার জন্যে কোন ভাবনা নেই—আমার সব কাজ বৌমারাই করে দেন।

সুনীতির কণ্ঠে আর পূর্ব্বের বিদ্রোহ নাই। সত্যই তো তাহার এইবার ছুটি নেওয়ার সময় আসিয়াছে।

তবুও মাঝে মাঝে সুনীতি বলে—আমার তো কাজ ফুরিয়েছে এইবার ছুটি নেওয়ারই সময়, আর তোমার?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমাদের সুখেই আমার সুখ। এই কাজের মাঝেই আমি আনন্দ পাই। চুপ্‌চাপ্ কি বসে থাকা যায়?

ছাতাটি টানিয়া লইয়া চাকরকে তাড়া দিয়া কর্ত্তা বাহির হইয়া গেলেন। ছুটির দিন বাজারে নিজের যাওয়া প্রয়োজন। চাকর বাকর দিয়া বাজার-হাট করাইলে কি আর রুচি অনুসারে আহারের বিলাস ঘটে? তাই বাজারে নিজেই যান। দেখিয়া শুনিয়া বাজার-হাট করিলে অর্থ সাশ্রয় তো বটেই. উপরন্তু মনের মতন জিনিসপত্রও কেনা যায়।

কিন্তু কি আনিতে হইবে? কোন্ মাছ কাহার প্রিয়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য [illegible]

প্রয়োজন নাই। বৌমায়া এখন বড় হইয়াছেন, সংসারের সকল কাজ, সকল কর্ত্তব্যই এখন তাঁহাদের। সে ক্ষেত্রে সুনীতির কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এমন করিয়া আর সংসারের বোঝা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। সুনীতি কি শেষ অবধি পাগল হইয়া যাইবে ?

রন্ধনশালায় তাহার স্থান নাই, রোগীর কক্ষে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্যও আহ্বান নাই। এমন কি, যে স্বামী মুহূর্ত্ত মাত্র তাহাকে কাছে না পাইলে অস্থির হইয়া উঠিত, আহারে বিহারে, কাজে কর্ম্মে, জীবনের নিত্য প্রয়োজনের মাঝে যাহার স্থান ছিল অচ্ছেদ্য, আজ তিনিও তাহাকেই সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিয়াছেন! এ উপেক্ষা যে কত নির্ম্মম, কত নিষ্ঠুর, সুনীতি কেমন করিয়া সে কথা জানাইবে ?

আজ তাহার বিশ্রামের সময়—সংসারের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিতা সে!

সুনীতি তবে কি অবলম্বন করিয়া চলিবে এখন ?

সেদিন এক পুরাতন বান্ধবীর বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিল সুনীতি। সেখান হইতে সুনীতি তাহার নিষ্ক্রিয় জীবনের অবলম্বন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—ইহ-জীবনের কাজ তাহার শেষ হইয়াছে বটে ; কিন্তু পর-জীবনের জন্য এখনও যে তাহার কিছুই করা হয় নাই।

বাড়ি ফিরিয়াই স্বামীকে সে তাহার আবেদন জানাইল ; তেতলার ছাদের কোণে একান্ত নির্জ্জনে তাহার সাধনা-মন্দির করিয়া দিতে হইবে।—বেল-ফুলের বাড়ি সে দেখিয়া আসিয়াছে—কি চমৎকার ঠাকুর-ঘর।

তখুনি মিস্ত্রি ডাকা হইল। এ আর এমন কি কঠিন কাজ ? সংসার তাহার কাছে যে পরিমাণ ঋণী, তাহার তুলনায় সুনীতির এ দাবি এমন কিছুই নয়।

ছোট্ট ঘরখানিতে শ্বেত পাথরের মোজায়েক করা মেঝে —মাজিয়া ঘসিয়া চকচকে করিয়া তোলা হইল।

একটি নধর কান্তি শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহেরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইল। উৎসবের দিন বড় বড় পণ্ডিতেরা আসিয়া গুরু ভোজন আর দক্ষিণার সহিত সুনীতিকে দীক্ষা দিয়া গেলেন।

সুনীতিও সেইদিন হইতে সংসারের কাছে ছুটি লইয়া নিজের সংসার লইয়া মত্ত হইয়া উঠিল।

চাকর-বাকর দিয়া মেঝে পরিষ্কার হয় না, ঠাকুর ঘরে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। পুত্রবধূদেরও সেখানে যাইবার অধিকার নাই—সে কাজ সম্পূর্ণ সুনীতির নিজস্ব।

শত বার মেঝে পরিষ্কার করিয়াও আশ মিটে না। ঠাকুরের ভোগ পাচকের দ্বারা হয় না—পুত্রবধূদেরও দীক্ষা হয় নাই—সুনীতিকেই রাঁধিতে হয় তাহা।

সুনীতির কাজের আর অন্ত নাই।

সংসারের কিছুই আর দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুর, চাকর, পুত্রবধূরা থাকিতে ওখান হইতে সে ছুটি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের হাতে গড়া এই সংসার—এখানকার প্রতিটি কাজই যে তাহার একান্ত নিজস্ব। যে কাজটি না দেখিবে তাহারই ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। সুনীতির কর্ম্মহীন জীবন আবার কর্ম্মস্রোতে গতিমুখর হইয়া উঠিল।

ঠাকুরঘরে উৎসবের পর্ব্ব নিত্যই প্রায় লাগিয়া আছে। দোল, রাসলীলা, পূর্ণিমা উৎসব—সুনীতি ঘটা করিয়া ঠাকুরের পূজা করে—লোকজন খাওয়ানো—ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়—তাহার হিসাব-নিকাশ—বাজার-হাট করানো—এ সমস্ত কাজের ঝক্কি সুনীতির নিজস্ব, সংসারের অপর কাহারও ইহাতে কিছু করিবার নাই।

বড় ছেলে কর্ত্তার কাছে একদিন অভিযোগ জানাইয়াছিল, এত খরচ, মা যদি একটু বোঝেন!

কর্ত্তা নিরস্ত করাইয়া দিলেন—চুপ্ চুপ্, শুনতে পেলে এক্ষুণি একটা কাণ্ড করে বস্‌বেন। এক্‌থা আর কোন দিন মুখে এনো না। যা কিছু তোমাদের সব দেখ্‌ছো, সবই ওঁর দৌলতে—

বড় ছেলে লজ্জিত হইয়া উঠিল, না—না, সে কথা আমি বল্‌ছি না, অনেক বাজে লোক এসে ধর্ম্মের নামে ঠকিয়ে নিয়ে যায়—

অকস্মাৎ সুনীতি সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—সব কাজেই কি বাবা হিসেব-নিকেষ চলে ? সংসারে শুধু লাভের দিকে লোভ না করে একটু আধটু আবার অন্য দিকেও

তাকাতে হয়। ইহকালের এই ঠকার ভেতর দিয়েই যে পরকালের লাভ সঞ্চয় করা বাবা—

বড় ছেলে সুনীতিকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমায় তুমি ক্ষমা করো মা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ছোট ছেলে সেদিন আহারের সময় সুনীতিকে দেখিয়া বলিল, ঠাকুরঘর পেয়ে মা আমাদের ভুলেই গেছে, খাওয়াটা পর্য্যন্ত আমাদের আর দেখে না, আমাদের থেকে ওঁর ঠাকুরঘরই হ'ল বড়!

সুনীতির অন্তর যেন ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে—সত্যই কি তাহাই? কিন্তু কেন সে এমন হইয়াছে? কাহারা তাহাকে এই পথে ঠেলিয়া দিয়াছে?

কর্ত্তা বলিলেন, এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি। একেবারে কাজকর্ম্ম ছিল না—তারপর এমন কাজকর্ম্ম আরম্ভ ক'রে দিয়েছো যে, আমার তো সর্ব্বদাই ভয়, কখন আবার অসুখে পড়ো।

পুত্রের অভিযোগে তাহার চক্ষে অশ্রু আসিয়াছিল—স্বামীর অনুযোগে অন্তর কিন্তু তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

কণ্ঠস্বরে তীব্র উত্তাপের রেশ টানিয়া আনিয়া সুনীতি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—হ্যাঁ, ইহকাল গেছে তোমাদের সেবায়, পরকালটাও তা বলে নষ্ট করি! সংসারে তোমাদের তো আর কিছুই অভাব নেই—এখন আর আমাকে কি দরকার? এখন তো আমার ছুটি!

শেষের দিকে কণ্ঠস্বর বুঝি বা তাহার ধরিয়া আসিয়াছিল! কিন্তু সে কিসের জন্য, সে কথা কেহই বুঝিল না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিল না।

কর্ত্তা কেবল বলিলেন, ভালো কথা বললেও তুমি বুঝবে উল্টো। ঠাকুরঘরের কাজ কিছু বৌমাদের দিলেও তো হয়; তুমি একলা কি আর এখন এত কাজ সামলে উঠতে পারো?

—না, আমি তো কোন দিনই কাজের মানুষ ছিলুম না, সমস্ত কাজ বাইরের লোক্ এসে করে দিয়ে গেছে! সংসার এমনি অকৃতজ্ঞ বটে! আমার মরণও হয় না, তা হলে তোমরাও বাঁচ আমিও বাঁচি—এমনি করে তোমাদের বোঝা হয়ে আর কতদিন যে বেঁচে থাকতে হবে—

সুনীতির দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল—অশ্রু-আবেগে কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভালো-মানুষ স্বামী তাহার, ইহার কোন অর্থ ই বুঝিলেন না—সুনীতিকে সান্ত্বনা দিয়া শুধু কহিলেন, আমি কি তোমায় সেই কথা বলেছি—কি বুঝতে তুমি কি বুঝছো বলো তো—মিথ্যে মিথ্যে তুমি রাগ করছো। তোমারই ভালোর জন্যে তো—

সুনীতি তীব্রস্বরে কহিল, দোহাই তোমার, আমার এত ভালো আর করতে চেয়ো না, আমায় তোমরা শুধু একটু শান্তিতে থাকতে দাও—

কর্ত্তা নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সুনীতির দুই চক্ষু বহিয়া দর দর ধারায় অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

ঠাকুরঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া, ঠাকুরের ভোগ দিয়া, যাবতীয় কাজকর্ম্ম সারিয়া আহারাদি করিতে সুনীতির বেলা অনেক হইয়া যায়।

আবার সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সন্ধ্যারতির উদ্যোগ আয়োজন পর্ব্ব—সুনীতির কি আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ আছে? মালার পর মালা গাঁথিয়া ঠাকুর সাজানো হয়। পুষ্পসম্ভারে ছোট্ট বিগ্রহখানির মূর্ত্তি ভরিয়া ওঠে—তবুও সুনীতির মালা গাঁথার বিরাম নাই।

ছেলেরা ভয় পাইয়া গেল। পুত্রবধূদের অনুযোগ—এমন করিয়া শরীরের প্রতি অবহেলা করিলে শরীর আর কতদিন টিঁকিবে? কিন্তু সুনীতির সেদিকে লক্ষ্য নাই—তাই বলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

স্বামী তো ভয়ে আর সুনীতির ধারে-কাছে ঘেঁষেন না—যেরূপ তীক্ষ্ণ মেজাজ হইয়াছে তাহার—কোন কথাটি পর্য্যন্ত বলিবার উপায় নাই।

সুনীতির সেই এক কথা—ইহকাল গিয়াছে সংসারের সেবায়—জীবনের ছুটির বেলায় এইবার পরকালের পাথেয় সঞ্চয়—ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই!

কিন্তু সুনীতির ইহজীবনে পরজীবনের কাজ করিবার অধিকারও আর রহিল না। অতিরিক্ত অনিয়মের ফলে একদিন সে রোগশয্যায় আশ্রয় লইল।

সংসারের প্রবল উৎকণ্ঠা—গৃহকর্ত্রীর অসুখ।

ছেলেরা বড় বড় ডাক্তার আনিল—কর্ত্তা নাওয়া-খাওয়া [illegible]

করিলেন—ঠাকুর সেবার ভারও অতঃপর পুত্রবধূরাই গ্রহণ করিল।

ডাক্তার আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া শুনিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন—এ রোগ সারিবার নয়। কোনরূপ অনিয়ম, অত্যাচার, চিন্তা কিংবা কাজকর্ম্ম কিছুই আর চলিবে না। হার্টের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কখন যে বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। চিকিৎসা অপেক্ষা বিশ্রামেরই প্রয়োজন অধিক!

সেদিন হইতে সুনীতিকে সত্য সত্যই ছুটি লইতে হইল।

গৃহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘরখানি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ঔষধ-পত্রে, সেবা-শুশ্রূষায়, আদর-যত্নে ঘিরিয়া রাখা হইল সুনীতিকে!

যে জীবন একদিন সংসারের প্রতিটি কাজকর্ম্মের চাকায় নিরন্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, আজ আর তাহার কিছুই করিবার নাই। ইজি-চেয়ারে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহার স্বাধীনতাটুকু বিলুপ্ত হইয়াছে। পুত্রবধূরা, নার্স হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী ছেলেরা কর্ত্তা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ওঠেন—সাবধান, অমন করে নড়াচড়া করলে হার্টে আঘাত লাগ্‌তে পারে!

রোগশয্যায় শুইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সুনীতি দেখে নতুন পৃথিবীর রূপ।

প্রভাত হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে প্রভাত—এই কর্ম্মময় জগৎ কর্ম্মমুখরতায় চঞ্চল গতিছন্দে বহিয়া চলিয়াছে। স্রোতের পরিপূর্ণতায় এ নদীর ঢেউগুলি টলমল করিতেছে—এ জগতের সহিত সুনীতির আর কোন সম্পর্ক নাই।

তাহার জীবন-নদী হইতে জোয়ারের প্লাবন চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিপুল জলরাশির মাঝে খানিকটা চড়া পড়িয়া তাহাতে যেন ফাটল ধরিয়াছে।

সন্ধ্যার ধূসরতায় তাহার কারুণ্য দূরের কোথা হইতে ভাসিয়া আসা অস্ফুট শঙ্খনিনাদে বুঝি-বা তাহা জাগিয়া ওঠে!

সুনীতি চোখ মেলিয়া দেখে—গন্ধধূপের মৃদু সুবাসে ঘর আজি তাহার আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। তেতলার ঠাকুরঘর হইতে তাহার চাপা সুরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে!

নিশি শেষে আসিও বন্ধু

বন্দে আলী মিয়া

তৃতীয়ার চাঁদ নামিয়া এসেছে
দেবদারু ছায়াতলে
আমার শয়ন-শিয়রে আজিকে
তারকার দীপ জ্বলে,
ঘন আঁধারের কোমল পরশ
সারা দেহে লাগে মোর
আধ-ঘুম আর আধ-জাগরণে
হয়ে আসে নিশি ভোর।
তুমি এই বেলা এসো একবার
দাঁড়াও ক্ষণিক শিথানে আমার
আরক্ত নয়নে জাগিয়া উঠিবে তোমার মনের সাধ।
আজি নিশিশেষে আসিও বন্ধু জাগে তৃতীয়ার চাঁদ।

দূর নদীতটে 'পিউ-কাঁহা' বলি
কাঁদে চখী প্রিয়হারা
নিঝুম নিশীথ কেঁপে কেঁপে ওঠে
তৃণে তৃণে জাগে সাড়া।
পুবালি বাতাসে ঝরে মল্লিকা
মোর বাতায়নতলে
হের বাদলের ম্লান নভ সীমা
কাঁদে বরষার জলে;
আজ রাতে তুমি এসো একবার
তোমার লাগিয়া খুলে রাখি দ্বার
আজিকার নিশি আলো ছায়া মেশা সুন্দর নিরুপম
এসো তুমি হেথা পরাবো কণ্ঠে বেদনার মালা মম।

তাহার নষ্ট হইয়াছে ; প্রাচ্য ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তারের এবং নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধারের ইহাই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়। এতদ্ব্যতীত প্রশান্ত মহাসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিলে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকাকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ইন্দোচীন এবং তদুপরি সমগ্র ব্রহ্মদেশ জাপান যদি কুক্ষীগত করিতে পারে তাহা হইলে পেট্রোল, রবার, চাউল, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও কাঁচা মাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা সম্ভব। আর বর্ত্তমানে অর্থনীতিক প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও প্রলোভনের সামগ্রী কোন সাম্রাজ্যের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।

যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বেই জাপান যেমন অতর্কিত আক্রমণ শুরু করিয়াছে, নাৎসী ব্লিৎস্ক্রীগের ন্যায় তাহার আক্রমণও চলিয়াছে তেমনই বিদ্যুৎ-গতিতে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ওয়েক ও গুয়াম দ্বীপ, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, মালয়, হংকং একই সঙ্গে আক্রান্ত হইয়াছে, থাইল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি করিয়া জাপসৈন্য থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া চীন-ব্রহ্ম রাজপথের দিকে অগ্রসর। মালয়ে সংগ্রাম পরিচালনাকালে ৩৫,০০০ টনের বৃটিশ রণতরী 'প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্' ও ৩২,০০০ টনের ক্রুজার 'রিপাল্‌স্' সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। বৃটেনের নৌশক্তির পক্ষে এই ক্ষতি শুধু অপ্রত্যাশিত এবং প্রচণ্ড নহে, অদূর ভবিষ্যতে অপূরণীয় বলা চলে। অপর পক্ষে ২৯,০০০ টনের জাপানী যুদ্ধ জাহাজ 'হারুনা' লুজানের সন্নিকটে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে।

সানফ্রান্সিস্কো হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অথবা সিঙ্গাপুরের পথে মার্কিন নৌবাহিনীর অগ্রগতির পথ যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিঙ্গাপুরে বৃটিশ নৌবহরকে সাহায্য প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সাংহাই ইতিপূর্ব্বেই দখল হওয়ায় জাপান বর্ত্তমানে হংকং-এর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে প্রবলভাবে। হংকংএ বৃটিশ প্রাধান্য খর্ব্ব হইয়াছে, পরে সংবাদ পাওয়া গেল হংকং আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হিসাবে হংকংএর গুরুত্ব যথেষ্ট। হংকং বৃটিশের হস্তচ্যুত হইলে সিঙ্গাপুর যেমন অধিকতর বিপন্ন হইবে, সিঙ্গাপুরে যুদ্ধের ত জাপ নৌবহরও তেমনই পশ্চাদাক্রমণ হইতে আশঙ্কা-

শত্রু আসিবার পথে এই ভাবে অপেক্ষা দ্বারা শত্রুদিগকে ছলনার চেষ্টা—সঙ্গে কামান নাই—উহা দূর হইতে কামানের মত দেখাইতেছে

যুদ্ধের প্রারম্ভে জাপান যে অতর্কিত আক্রমণের প্রাথমিক সুবিধা লাভ করিয়াছে ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। বৃটেন ও আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যেই জাপান সুদীর্ঘ রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সানফ্রান্সিস্কো হইতে সিঙ্গাপুরের পথে হাওয়াই দ্বীপের গুরুত্ব যথেষ্ট। ২,৪২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মার্কিন জাহাজসকল পার্ল পোতাশ্রয়ে আসিয়া কয়লা গ্রহণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রধান নৌঘাঁটিকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্যেই জাপান পার্ল বন্দরে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ইহার পর সিঙ্গাপুরের পথে পড়ে ওয়েক ও গুয়াম দ্বীপ। প্রথম আক্রমণেই জাপান এই দুইটি দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিয়া উভয় অঞ্চলেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ফলে

শূন্য হইয়া নিরাপদ থাকিতে পারিবে। ফিলিপাইন, মালয় ও বোর্নিওতেও জাপান প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। লক্ষাধিক জাপসৈন্য ফিলিপাইনে অবতরণ করিয়াছে। মালয়ে জাপসৈন্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে, বৃটিশ সৈন্য পেনাং ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে। বৃটিশ বোর্নিওতেও জাপান সাফল্য লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ বোর্নিওতে জাপান প্রবল বোমা বর্ষণ করিয়াছে। বৃটিশ বোর্নিওর বিমান ঘাঁটিতেও আক্রমণ চলিয়াছে প্রবলভাবে। এই বিমান ঘাঁটি লাভ করিতে পারিলে জাপান এই স্থানের তৈলখনিও হস্তগত করিতে সক্ষম হইবে। টেনাসেরিম এবং রেঙ্গুনেও জাপান বোমারু-বিমান বোমা বর্ষণ করিয়াছে। জাপ স্থল-বাহিনীর চাপে বৃটিশসৈন্য ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট পর্য্যন্ত পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ

ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়াই আমরা বলিতে পারিতেছি যে, যুদ্ধ এখনও ভারতের বাহিরে। চট্টগ্রাম, আসাম, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানও আজ আর বিপদ-মুক্ত অঞ্চল নয়। তবে দক্ষিণ ব্রহ্মে সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাপান প্রথমে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিবে বলিয়া বোধ হয়। এই উদ্দেশ্যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষ করিয়া পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপের প্রতি জাপানের অবহিত হওয়া সম্ভব। এই স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে পারিলে যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত ভারতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সরবরাহ বন্ধ অথবা ব্যাহত করিবার জন্য কলিকাতা ও মাদ্রাজের বন্দরে বোমা বর্ষণ জাপানের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। তবে এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে জাপানের পক্ষে দুইটি বাধা বর্তমান। প্রথমতঃ, মালাক্কা প্রণালী দিয়া জাপ-রণতরী ভারত মহাসাগরে আনা বর্ত্তমানে তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সিঙ্গাপুরস্থ দূরপাল্লার কামান ইহাতে বাধা দিবে। সুন্দা প্রণালী দিয়া অতিকায় রণতরী চলাচল করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ পোর্টব্লেয়ারে ঘাঁটি স্থাপন করিলেও যদি নৌবহর সেখানে আনয়ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরের প্রাধান্য যতদিন থাকিবে ততদিন যে-কোন মুহূর্তে তাহাকে পুনরায় ঘাঁটি হারাইতে হইবে। কারণ, নৌশক্তির সাহায্য না পাইলে ভারতের নৌ ও বিমান-শক্তি এবং সিঙ্গাপুরের বিমান-শক্তির নিকট নৌ-শক্তিহীন অবস্থায় একমাত্র বিমান-শক্তিতে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরের এই যুদ্ধের সহিত ইয়োরোপের যুদ্ধের গতিও নির্ভরশীল বলিয়া আমরা ইয়োরোপের রণাঙ্গনের যুদ্ধপর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে উভয় যুদ্ধের ভাবী গতির কথা আলোচনা করিব।

বৃটেনে নব নির্ম্মিত ট্যাঙ্কের শ্রেণী

মধ্য ও নিকট-প্রাচী

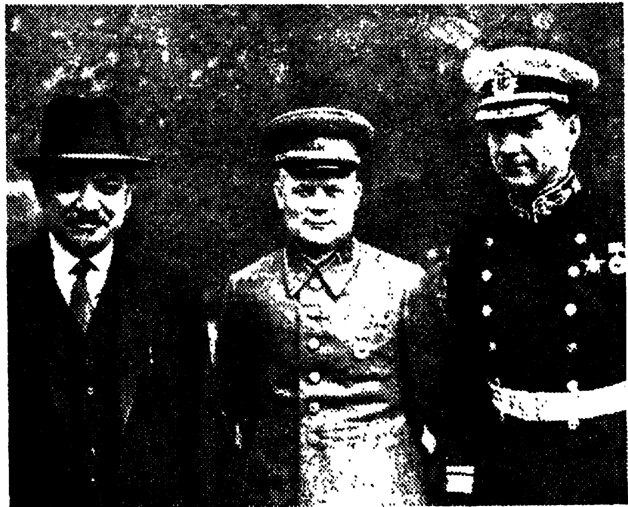
রুশিয়ার আবহ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রচণ্ড শীতে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে যথেষ্ট। নাৎসী সৈন্যগণ রুশিয়ার নিদারুণ শীত সহ্য করিতে অক্ষম হইলেও রুশ সৈন্যগণ ঐ শীত সহ্য করিতে অভ্যস্ত। ফলে শীতের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থা রুশিয়ার যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছে। অবরোধ ভাঙ্গিয়া রুশ বাহিনী বর্ত্তমানে প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে। লেলিনগ্রাড্ ও মস্কোর মধ্যে পুনরায় সংযোগস্থাপন সম্ভব হইয়াছে, কালিনিন পুনরধিকৃত হইয়াছে, জেনারেল টিমোসেঙ্কোর রণনৈপুণ্যে নাৎসীবাহিনী রষ্টোভ হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, জেনারেল ফন বোক্ স্বীয় বাহিনী লইয়া পিছনে সরিয়াছেন, প্রায় তিনশত গ্রাম রুশ বাহিনী এই অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। জার্মান বাহিনীর প্রবল চাপে রুশ সৈন্যগণ যখন গ্রামের পর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পিছনে সরিয়া গিয়াছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অগ্নিদগ্ধ করিয়া রুশবাহিনী যখন পশ্চাৎবর্ত্তী ঘাঁটিতে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, তখন জার্মানীর অত্যধিক সাফল্য সম্বন্ধে অনেকে নিঃসন্দেহ হইলেও আমরা যুদ্ধের এই ধরণের অবস্থাই শেষ পর্য্যন্ত ঘটিবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তেও আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠকদিগের নিকট আমাদের তথ্য ও সুযুক্তিপূর্ণ মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করি নাই। রুশ-যুদ্ধে জার্মানীর অত্যধিক সাফল্য সম্বন্ধে আমরা বরাবরই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি এবং হিটলারকে যে বাধ্য হইয়াই এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং তাঁহার হিসাবও যে এ ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক, তাহাও আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর একাধিক সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। কাহারও মতে জার্মানীর এই পশ্চাদপসরণ তাহার সামরিক কৌশলের অঙ্গ। কিন্তু এক সুবৃহৎ রণাঙ্গনে আক্রমণকারী বিরাট বাহিনীর পক্ষে পশ্চাদপসরণ যে কত দুরূহ ও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা কেন অসম্ভব সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 'ভারতবর্ষ'-এর পৌষ সংখ্যায় করা হইয়াছে—এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি জার্মানীর প্রধান সেনাপতি ফন ব্রাউচিৎস্‌কে অপসারিত করিয়া হিটলার নাৎসী সেনাবাহিনীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করাতে জার্মানীর দৌর্ব্বল্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কোন গুরুতর সমস্যার উদ্ভব অথবা দুর্ঘটনা না হইলে সহজে হাই-কমাণ্ডের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। গত

মহাযুদ্ধের সময় লুডেনডর্ফ ও হিণ্ডেনবুর্গের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া যে নাটকীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বর্ত্তমান যুদ্ধেও তাহার পুনরভিনয় হইবে কি না কে জানে! সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণকালে হিটলার যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও আর যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রদত্ত বক্তৃতার ন্যায় তেজোগর্ব্বিত বাক্যচ্ছটা নাই, শত্রুকে অচিরে পরাভূত করিবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নাই, আছে শত্রুর প্রবল বাধা দান ও প্রাকৃতিক বিপত্তির কথা, আছে সুদীর্ঘ সংগ্রামে আত্মত্যাগের বাণী। তবে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও যুদ্ধের লক্ষণ দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, রুশিয়া জিতিয়া গেল বা জার্মানীর পরাজিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তাহা হইলেও ভুল হইবে। নাৎসী সৈন্য বহু গ্রাম পরিত্যাগ ও পশ্চাদপসরণ করিলেও প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি দখলে রাখিতে তাহারা এখনও সবিশেষ যত্নবান। মস্কো এখনও অবরুদ্ধ আছে, লেনিনগ্রাডের অবরোধ এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই, সেবাস্তেপোলের দিকে জার্মানী এখনও প্রবল অভিযান পরিচালনা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, নাৎসী সেনাবাহিনীর উপর হিটলারের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ জার্মানীর প্রবল সংগ্রাম প্রচেষ্টার পূর্ব্বাভাস। আগামী বসন্তে সম্ভবতঃ নাৎসী বাহিনী রুশিয়ার সহিত পুনরায় চরম বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান শীতে দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী-বাহিনীকে হিটলার নিযুক্ত করিবেন কোন্ দিকে? আমরা জানি এক সুবৃহৎ যান্ত্রিক বাহিনীকে দীর্ঘকাল ধরিয়া কর্ম্ম-বিরত অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে বসাইয়া রাখা সহজ নহে। তদুপরি, এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর অপর একটি প্রবল আক্রমণ পরিচালনার পূর্ব্বে জার্মান-বাহিনী একবার দম লয়—সুবিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে সংযোগ ও সরবরাহ রক্ষার ব্যবস্থাদি করিবার জন্য তাহাকে কিছুদিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটাইতে হয়, কিন্তু সেই স্বল্পকালের অবসানে নাৎসীবাহিনী কোন্ দিকে তাহাদের অভিযান পরিচালনা করিবে?

হিটলারের পক্ষে বর্ত্তমানে তিনটি পথ উন্মুক্ত আছে। প্রথম, ককেসাসে অভিযান, দ্বিতীয়, ভূমধ্য সাগর ও তদঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার, এবং তৃতীয় উপায় হইতেছে তুরস্কের মধ্য দিয়া ইরান এবং ভারত অভিমুখে অভিযান।

তবে প্রথমটি অনুসরণ করা বর্ত্তমানে কঠিন এবং হিটলার সে প্রচেষ্টা করিবেন না বলিয়াই বোধ হয়। ককেসাস অভিমুখে শীতকালীন অভিযান পরিচালনায় বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর পৌষ সংখ্যায় করিয়াছি।

অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথ। ইহার যে-কোনটি বা উভয়টিই হিটলারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব। ভূমধ্যসাগরের জলবায়ু শীতকালে যুদ্ধ পরিচালনার আদৌ প্রতিকূল নহে। বহুপূর্ব্ব হইতেই নাৎসীবাহিনী ফ্রান্স ও স্পেনে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সিসিলি এবং ক্রীট দ্বীপেও নাৎসী সৈন্য অবস্থান করিতেছে। ভূমধ্যসাগরে ইটালী অধিকৃত দ্বীপগুলি তাহার স্বপক্ষে। উত্তর আফ্রিকাতেও জার্মান সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। জেনারেল রোমেল লিবিয়ায় প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিলেও বর্ত্তমানে বৃটিশবাহিনী তথায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিতেছে। ডের্না সহর ও বেনঘাজী অধিকৃত হইয়াছে, স্থানে স্থানে জার্মাণ সৈন্যগণ সমরোপকরণ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। সম্প্রতি জেনারেল রোমেলকে লিবিয়ায় সাহায্য করিবার নিমিত্ত জার্মান প্যাঞ্জার বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জার্মানী ফ্রান্সের নিকট তাহার নৌবহর ও আফ্রিকায় ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলি দাবী করিতে পারে। জার্মানী জানে সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ায় আমেরিকার পক্ষে বর্ত্তমানে বৃটেনকে পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হইবে না। একক বৃটেনের পক্ষেও ভূমধ্যসাগর, য়্যাটলাণ্টিক, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতিপত্তি রক্ষা করা দুরূহ। একদিকে যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেনের নৌবাহিনীর একাংশকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, তেমনই ইংলিশ প্রণালী ও বৃটেনের উপকূল রক্ষায় জন্য তাহার নৌবাহিনীর এক বিশেষ অংশকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কাজেই চারিটি সমুদ্রে এক সঙ্গে প্রাধান্য রক্ষা করা বৃটেনের পক্ষে কঠিন। সুতরাং এই অবসরে জার্মানী যদি আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল এবং ডাকার পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে এবং উত্তর-পূর্ব্বে মিশরের মধ্য দিয়া আলেকজান্দ্রিয়া এবং সুয়েজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সমগ্র



লণ্ডনে সোভিয়েট মিলিটারী মিশন, বামদিক হইতে—মেইস্কি, গোলিকভ ও খারলোমভ

ভূমধ্যসাগরকে সে নাৎসী হ্রদে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবে। ফলে প্রাচ্যগামী বৃটিশ জাহাজ সকলকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইবে এবং মধ্য পথে য়্যাটলান্টিকে জার্ম্মানীর সাবমেরিনের তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত, পূর্ব্ব দিকেও সে সহজেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসিতে সমর্থ হইবে।

জার্ম্মানীর তৃতীয় সম্ভাব্য অগ্রগতি—তুরস্কের মধ্য দিয়া ইরান ও ভারতাভিমুখে অভিযান। কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীর দিয়া জার্ম্মানীর এই অভিযানের সুবিধা অসুবিধার কথা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর অগ্রহায়ণ-



পাখা ওয়ালা জুতা—যে সকল বৈমানিকের বিমান নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের বিলম্বে প্রত্যাগমনের সঙ্কেত

সংখ্যাতেই আলোচনা করিয়াছি। শীতকালে ককেসাস্-অভিযান দুঃসাধ্য হইলেও তুরস্কের মধ্য দিয়া অতি সহজেই ককেসাসের দক্ষিণাঞ্চলে উপস্থিত হওয়া যায় এবং ইরান-সীমান্তে উপনীত হওয়াও বিশেষ সহজসাধ্য। তদুপরি জার্ম্মানীর সেবাস্তোপোল দখলের প্রয়াস হইতে বোঝা যায় যে, জার্ম্মানী কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েট প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী। সুতরাং এই তৃতীয় পথ অবলম্বনের ইচ্ছা যে হিটলার মনের গোপন কোণে পোষণ করিতেছেন, ইহা মনে করা অযৌক্তিক নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিটলার সম্ভবত প্রথম পরিকল্পনা বর্জ্জন করিয়া চলিবেন; কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের যে-কোনটি অথবা দুইটিই হিটলার একত্রে অনুসরণ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার

সম্প্রতি মিঃ চার্চিল ওয়াশিংটনে উড়িয়া গিয়াছেন, সঙ্গে গিয়াছেন লর্ড বিভারব্রুক, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনাণ্ট, আরও অনেক সমর-বিশেষজ্ঞ—উদ্দেশ্য বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই কর্ণধারের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলোচনা। ছয় মাস পূর্ব্বে মিঃ চার্চিল আর এক বার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেবার তিনি ছিলেন 'প্রিন্স অফ ওয়েল্স্' রণতরীতে। সেবার সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধে যে বিলি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছিল, সে সংবাদ আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠকদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। এবার 'প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্' নাই, আর আলোচনা হইবে প্রধানত য়্যাটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংগ্রাম সম্বন্ধে, সুতরাং এবার সাক্ষাতের স্থান ওয়াশিংটন। ছয় মাসের মধ্যে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী দুইবার রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করায় বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিঃ চার্চিল জানাইয়াছেন যে, চীন, রুশিয়া, ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ডোমিনিয়ন্-বর্গের সহিতও আলোচনা করা হইবে। এই আলোচনার সাফল্যের উপরে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গতি যথেষ্ট নির্ভরশীল।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপান ও রুশিয়ার সম্বন্ধ কিরূপ থাকিবে, ইহাই গুরুতর প্রশ্ন। জাপানের সহিত রুশিয়ার সম্পর্ক কোন দিনই সৌহার্দ্দ্য-পূর্ণ নয়। বর্ত্তমানে জাপান আবার বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, অথচ বৃটেন রুশিয়ার মিত্র। সুতরাং সহজভাবে দেখিতে গেলে রুশিয়ার সহিত জাপানের সম্পর্ক তিক্ততর হইবারই কথা। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক-সম্পর্কবিষয়ক প্রশ্নের এত সহজ সমাধান সম্ভব নয়। আমেরিকা এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান বার বার জানাইয়াছে যে, রুশিয়ার সহিত তাহার পূর্ব্ব সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ আছে। জাপান জানে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে চরম জয় পরাজয়ের জুয়া খেলায় সে যখন লিপ্ত থাকিবে, প্রতিবেশী প্রবল রাষ্ট্রের

জয়লব্ধ

শ্রীযামিনীমোহন কর

ধনপতি	...	...	জয়ন্তীপুরের শ্রেষ্ঠী
ইন্দিরা	...	...	" শ্রেষ্ঠীকন্যা
আত্রেয়ী, গায়ত্রী, বিশাখা		...	ইন্দিরার সখিগণ
কালকেতু	...	...	প্রসন্নগড়ের রাজা
বিজয়া	...	...	" রাণী
প্রদ্যুম্নকিশোর	...	...	" সেনাপতি
গজেন্দ্রনাথ	...	...	প্রদ্যুম্নকিশোরের বন্ধু
কৃষ্ণচন্দ্র	...	...	রাজার বয়স্য
রঞ্জন	...	...	রাজকবি

কঞ্চুকী, ঘাতক, নর্ত্তকীগণ, দৌবারিক ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইন্দিরার কক্ষের সম্মুখস্থ অলিন্দে বসে তাঁর সখীগণ—আত্রেয়ী, গায়ত্রী ও বিশাখা পুষ্পমাল্য রচনা করছেন ও গান গাইছেন।

গান

পুষ্পসায়ক দূত আগমনে মুকুলের দল ফুটিল।
অভিমানিনীর দুর্জ্জয় মান দখিন বাতাসে টুটিল॥
বকুল অশোক পুষ্পিতা আজি,
উৎকণ্ঠিতা ভরিয়াছে সাজি,
সৌরভে মাতি অলিকুল আসি রূপরস সব লুটিল॥
প্রবাসী প্রিয়ের আসার আশায়,
সারা রাতি বৃথা জাগিয়া কাটায়,
বিরহ-অনলে, দহিয়া কেবল, আঁখি জল ভাগে জুটিল॥

বিশাখা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) শুধু দহনই সার হবে। কেউ যে এসে তাতে বারি সিঞ্চন ক'রে অমৃতের প্রলেপ বুলিয়ে দেবে সে আশা তো দেখি না।

আত্রেয়ী। এই মন মাতানো বসন্ত একলা থাকলে কি রকম দুরন্ত মনে হয়।

গায়ত্রী। দখিন বাতাস খালি হাহুতাশই আনে। প্রিয়তমের সন্ধান তো কই মৃদুস্বরে কানে গুঞ্জন করে না।

বিশাখা। সমস্ত দোষ আমাদের সখির। বয়স হয়েছে, বাপের আদুরে একটী মাত্র মেয়ে, তায় আবার দেখতে রূপসী। কতশত পাণিপ্রার্থীরা আসছে, কিন্তু কি যে মাথায় ঢুকেছে, বলে—"বিয়ে করব না। ভগবানের চরণে দেহ মন প্রাণ সব অর্পণ করেছি।"

আত্রেয়ী। আহা, পতিও তো দেবতা। একটী রসিক সুন্দর যুবককে যদি তোমার হৃদয়-রাজ্যের ভগবান কর তো সব দিকই বজায় থাকে।

গায়ত্রী। আমাদেরও একটা হিল্লে হয়ে যায়। ওর জন্য আমরাও বিয়ে করতে পারছি না। কি যে বিশ্রী নিয়ম—ওঁর না বিয়ে হলে সখিদেরও বিয়ে হতে পারবে না।

বিশাখা। যা বলেছিস্। চুপ, সখি আসছে।

ইন্দিরার প্রবেশ

ইন্দিরা। কিলো, তোদের মালা গাঁথা শেষ হ'ল?

বিশাখা। এই হ'ল, কিন্তু শুধু মালা গেঁথে কি লাভ?

(গেয়ে)

ওলো সখি মোর সাজা গোজা হ'ল সার।
প্রিয়তম বিনা দিন কাটা হ'ল ভার॥
মালা গাঁথা মোর হ'ল যে বৃথায়,
যার গলে দেব সে সখি কোথায়,
বিফলে হাতেতে সূচ ফোটা হ'ল সার।
যার তরে মরি দেখা নাহি মেলে তার॥

আত্রেয়ী। (জানলা দিয়ে বাহিরে দেখে) সখি, তোমার বিদেশী বঁধু অথবা তার অগ্রদূত এসেছে।

ইন্দিরা। এখনও সেই ভগ্নদূত দাঁড়িয়ে আছে?

গায়ত্রী। তা আছে। সহজে নড়বে বলেও মনে হচ্ছে না।

বিশাখা। আহা বেচারা। সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় ত' পা ব্যথা করছে।

আত্রেয়ী। অত দরদ থাকে তো গিয়ে একটা আসন পেতে দে।

বিশাখা। তাই দেব মনে করছি।

(গেয়ে)

হৃদয় মাঝে তোমার তরে পাতব আসন হে অতিথি।
নয়নজলে ধোয়াব তব রাতুল চরণ হে অতিথি ॥
মনের গোপন বীণার তারে,
সুর ওঠে আজ বারে বারে,
সফল হবে তোমায় দিয়ে জীবন মরণ হে অতিথি ॥

ইন্দিরা। থাম্। যত সব অসভ্য গান—

বিশাখা। অসভ্য! কি বলছ সখি? প্রেম, ভালবাসা, আত্মদান—এর মধ্যে অসভ্যতা কোথায় পেলে?

তোমার কাল আঁখির তারা,
করল মোরে পাগল সারা
ছোঁয়াও হৃদে তোমার প্রেমের পরশ রতন হে অতিথি॥

ইন্দিরা। তুই থামবি, না আমি এখান থেকে চলে যাব?

বিশাখা গান বন্ধ করলেন

আত্রেয়ী। এই যে সমস্ত দিন নীরবে একদৃষ্টে জানলার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—সখি তোমার কি মনে করুণা জাগে না?

ইন্দিরা। না। ঐ রকম ভাবে চেয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্লীলতা, বর্ব্বরতা।

গায়ত্রী। প্রেম যদি অশ্লীলতা, বর্ব্বরতা হয়, তবে আর স্বর্গীয় কি রইল!

ইন্দিরা। এ নশ্বর প্রেম কামগন্ধময়। কামগন্ধহীন ভগবৎ-প্রেমই স্বর্গীয়।

বিশাখা। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি নারী আর পুরুষ। নশ্বর প্রেম তাঁরই অভিপ্রেত। সে প্রেমে কাম কতটুকু জানি না, কিন্তু সৃষ্টির যে উদ্দাম আবেগ, তার অবমাননা করা চলে না। সংসার তাতে রসাতলে যাবে।

ইন্দিরা। তোর এ তর্কের উত্তর আমি দেব না। এ সব কথার চিন্তাই তোদের মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে। আমি এরকম চিন্তাধারার পক্ষপাতী নয়। মন্দিরে চল্, আরতির সময় হ'ল।

আত্রেয়ী। তুমি চল, আমরা একটা মালা গাঁথা শেষ করে এখুনি যাচ্ছি।

বিশাখা। তুমি বল তো ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলি?

ইন্দিরা। না, কোন প্রয়োজন নেই। তা হ'লে সে মনে করবে যে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আর আলাপেরও একটা ছল খুঁজে পাবে।

গায়ত্রী। তুমি দেখছি পথিক-প্রবরের জন্য অনেক ভেবেছ। কিসে কি হতে পারে তা পর্য্যন্ত তোমার কণ্ঠস্থ।

ইন্দিরা। এটা রসিকতার কথা নয়। অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করাই আমার স্বভাব। ওর জন্য আমায় যে কি অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে তা আর কি বলব। উঠতে বসতে দেখি সে বাইরে দাঁড়িয়ে। ঘুমিয়ে মনে হয় যেন সে ঘরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার মৌন দৃষ্টি আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে। যেন একটা আতঙ্ক, বিভীষিকা। মন্দিরে আরতির পর চোখ বুজে প্রণাম করতে গিয়ে তার মূর্ত্তি দেখি। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আবার পড়ে যাই ঠিক তারই অর্থহীন দৃষ্টিপথে।

বিশাখা। এ কিন্তু একরকম পূর্ব্বরাগ।

ইন্দিরা। তুই থাম্। লোকে দেখলে কি বলবে একবার ভেবেছিস্। হয়ত আমার সম্বন্ধে পাঁচ রকম কুৎসা রটাবে। অথচ এর জন্য আমি দায়ী নয়। এ ব্যবহারকে নীচ, হীন ছাড়া আর কি বলব?

আত্রেয়ী। (জানলা দিয়ে বাহিরে উঁকি মেরে) আহা, বেচারা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দিরা। থাক্। সরে আয় এদিকে। বার বার ঐ ভাবে উঁকি মেরে দেখায় ও আরও প্রশ্রয় পায়।

গায়ত্রী। রাগ করছ কেন? হিংসা—

ইন্দিরা। এতে হিংসার কিছু নেই। আমার এরকম ব্যবহারে ঘৃণা হয়, রাগ হয়, একটু ভয়ও হয়। সে কাকে ভালবাসে, কেন এখানে আসে, সে সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ভয় করি লোকের মুখকে। দুর্নাম দিতে পারলে লোকে আর কিছু চায় না। আর লোকনিন্দা আগুনের মত চারি ধারে দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে। উপায় থাকলে আমি বলতুম—"মশাই, আপনার যার সঙ্গে যত ইচ্ছা প্রেম করুন, কেবল দয়া করে অধীনার জানলার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।"

বিশাখা। তুমি কি ওঁর পরিচয় জান?

ইন্দিরা। না, জানবার দরকারও দেখি না।

বিশাখা। উনি প্রসন্নগড়ের মহারাজা কালকেতুর সেনাপতি, নাম প্রদ্যুম্নকিশোর।

ইন্দিরা। বেশ। এ পরিচয় জেনে আমার লাভটা কি হ'ল আর না জানলে কি ক্ষতি হ'ত শুনি? সে যাই হোক, তুই পরিচয় জানলি কেমন ক'রে?

বিশাখা। আমাদের নায়েব মশায়ের ছোট ছেলেকে দিয়ে ওঁর বয়স্তের কাছ থেকে নাম ধাম জেনে নিয়েছি।

আত্রেয়ী। প্রদ্যুম্নকিশোরের নাম কে না জানে বল? তাঁর অদ্ভুত শৌর্য্য দেখে মহারাজা কালকেতু নিজের কণ্ঠের মালা স্বহস্তে তাঁর গলে পরিয়ে দিয়েছিলেন—যে মালা বংশপরম্পরায় রাজাদের কণ্ঠ বিভূষিত করেছে।

গায়ত্রী। শুনেছি শীঘ্রই তিনি দাক্ষিণাত্যে অনার্য্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবেন। যাবার আগে তিনি তোমার বাহুডোর—

ইন্দিরা। চুপ কর্। অসভ্যতারও একটা সীমা আছে। তোরাই দেখছি আমার দুর্নাম রটাবার জন্য—

বিশাখা। ছিঃ! ছিঃ! একথা তুমি মনে স্থান দিতে পারলে! জান, তোমার জন্য আমরা প্রত্যেকে জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

ইন্দিরা। তোরা রাগ করলি। আমি অকৃতজ্ঞ, তাই তোদের মনে অনর্থক কষ্ট দিলুম। তোরা আমায় ক্ষমা করিস্।

আত্রেয়ী। কি যে বল তুমি। তোমার কথায় কি আমরা রাগ করতে পারি।

নেপথ্যে মন্দিরের শাঁখ ঘণ্টাধ্বনি

ইন্দিরা। আরতির সময় হয়ে গেল। আমি যাই। তোরা আয়, আর দেরী করিস্ নি।

প্রস্থান

বিশাখা। সে যাই বল না কেন, সখির মনে কিন্তু ছোঁয়াচ লেগেছে। চোখ বুজে ঠাকুরের মূর্ত্তি ধ্যান করতে গিয়ে প্রদ্যুম্নকিশোরের মূর্ত্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

গায়ত্রী। সখি নিজের মন বুঝতে পারে না, কিন্তু অন্তর্যামী ঠিক ধরে ফেলেছেন ওর কিসের আবশ্যক। তাই তার একান্ত ভক্তিপূর্ণ অর্ঘে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়েছেন প্রদ্যুম্নকিশোরকে ভাবী বর রূপে পাঠিয়ে।

আত্রেয়ী। (জানলা দিয়ে বাইরে দেখে) এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আহা বেচারা!

বিশাখা। দাঁড়া, আমি গিয়ে ওর বয়স্তকে ডেকে আনছি।

গায়ত্রী। তার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে নাকি?

বিশাখা। অতি সামান্য। সেদিন বাগানে ফুল তুলছিলুম, দেখি সে বাইরে থেকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় মায়া হ'ল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"হ্যাঁগা, অমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কি চাও? কিছু হারিয়েছে কি?" সে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, তা হারিয়েছে, তবে ফিরে কি আর পাব। দেবী, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দেবে?" আমি ভ্রূকুটি করে বললুম—"দেখছ ফুল তুলছি, জল পাব কোথায়?" সে বেচারা লজ্জিত হয়ে বললে—"তা বটে।"

আত্রেয়ী। তারপর? জল দিলি?

বিশাখা। তা দিলুম বই-কি। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে জল আনলুম। এনে খেতে দিলুম।

গায়ত্রী। ওঃ বাবা। ব্যাপারটা তা হ'লে অনেক দূর গড়িয়েছে। হৃদয় হারানো, তৃষিত অন্তরে বারিসিঞ্চন—

আত্রেয়ী। আর কিছু—

বিশাখা। তারপর থেকে সে আসে যায়, রোজই দু-চারটে কথা হয়। তার কাছ থেকেই তো ঐ ভদ্রলোকের সব পরিচয় পেয়েছি।

গায়ত্রী। তোর তাঁর নামটী কি?

বিশাখা। আমার আবার কে হবে? যত সব বাজে কথা। তবে নামটা মন্দ নয়।

গায়ত্রী। কি নামটা শুনি?

বিশাখা। গজেন্দ্রনাথ।

আত্রেয়ী। চেহারাটা কি রকম। গজেন্দ্রের মত, না গজের মত?

বিশাখা। জানি না বাপু। এলেই দেখতে পাবে। আমি তাকে আনতে চললুম। খুব সাবধান, সখি যেন টের না পায়।

প্রস্থান

গায়ত্রী। আমার তো ভাই মাথা ঘুরছে। যদি সখি আমাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে—

আত্রেয়ী। প্রেম এবং প্রেমিক দু-ই আমার কাছে প্রিয়। যদিও এ প্রেমের মধ্যে আমাদের কোন স্বার্থ

নেই, তবুও প্রেমিককে সাহায্য করার মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে।

গায়ত্রী। তোর কি মনে হয় সখির বিয়ের ফুল ফুটবে?

আত্রেয়ী। দেখা যাক্। চেষ্টা তো আমরা করছি। চুপ, গজেন্দ্রকে নিয়ে ঐ বিশাখা আসছে।

গায়ত্রী। বিশাখাটা একান্ত বেহায়া। কি রকম হাসাহাসি করতে করতে আসছে দেখেছিস্। কেউ জানতে পারলে কি হবে বল্ তো।

বিশাখা ও পণ্যবিক্রেতারূপে গজেন্দ্রনাথের প্রবেশ

গজেন্দ্র। (হাত তুলে) জয়স্তু। মঙ্গল হোক।

আত্রেয়ী। দোকানীর মুখে সন্ন্যাসীর সম্ভাষণ শোভা পায় না। বিশাখা কি এটাও আপনাকে শিখিয়ে দেয় নি?

গজেন্দ্র তাঁর কাছে আমার পাঠ নেবার অনেক জিনিষ আছে।

গায়ত্রী। সে পাঠ সম্পূর্ণ করতে সমস্ত জীবনটাই লেগে যাবে।

বিশাখা। হে গজেন্দ্রনাথ, তোমার যা বলবার আছে আমার সখিদের কাছে বল। দেখি, যদি কোন উপায় আমরা বলে দিতে পারি।

গজেন্দ্র। দেবী, তার তো কোন উপায় নেই। আমার বন্ধু প্রসন্নগড়ের মহারাজা কালকেতুর সেনাপতি। তাঁর নাম প্রদ্যুম্নকিশোর। তিনি আপনাদের সখি শ্রেষ্ঠীকন্যা ইন্দিরা-দেবীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অথচ এপক্ষের হৃদয়ে কোনরূপ আঁচড় পর্য্যন্ত পড়েনি। একধারে আবেগ আকুলতা, আর এক ধারে নির্ব্বিকার তাচ্ছিল্য। আমি তাই এসেছি—মানে, বিশাখা দেবী দয়া করে আমাকে এনেছেন—ইন্দিরা দেবীর দরবারে বন্ধুবরের হয়ে ওকালতি করতে।

আত্রেয়ী। আমাদের সখি কথায় ভুলবে বলে তো মনে হয় না।

গজেন্দ্র। শুকনো কথায় না ভুলতে পারেন, কিন্তু ত্রিভুবনে এমন কোন নারী আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হন নি, যিনি নিজের রূপ গুণের প্রশংসায় ভোলেন না।

গায়ত্রী। আমাদের সখি তবে সৃষ্টিছাড়া। তোষামোদ এবং মিথ্যা কথায় তার মন জয় করা যায় না।

গজেন্দ্র। যত কঠিনহৃদয়া হোন না কেন, এই মণি-মাণিক্যখচিত অলঙ্কাররাশি দেখলে তাঁকে ভুলতে হবেই। স্বর্গের দেবীরা পর্য্যন্ত অলঙ্কারের জন্য ব্যাকুলা হন।

ঝুলির ভেতর থেকে একটী পেঁটরা বার করে খুললেন। তিন সখি ঘিরে দাঁড়িয়ে অলঙ্কারসমূহ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

আত্রেয়ী। অপূর্ব্ব!

গায়ত্রী। অতুলনীয়!

বিশাখা। কিন্তু তবুও ভয় হয়, সখি কি অলঙ্কারের মোহে পড়বে?

গজেন্দ্র। মোহে না পড়লেও মুগ্ধ যে হবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া, আমার হয়ে আপনারা যদি দু' চারটে কথা বলেন—

বিশাখা। চুপ, কে যেন আসছে।

ইন্দিরার প্রবেশ। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ গজেন্দ্রের দিকে চেয়ে কঠোর স্বরে

ইন্দিরা। এ কে? অন্তঃপুরে কি করতে এসেছে?

বিশাখা। একজন গরীব পণ্যবিক্রেতা—

ইন্দিরা। আমার হুকুম ছিল, কোন অচেনা ব্যক্তিকে আমার প্রাসাদে ঢুকতে দেবে না। তোমরা আমার আদেশ অমান্য করেছ।

বিশাখা। আমি ভেবেছিলুম—

গজেন্দ্র। দেবী, দোষ আমার, ওদের নয়। অপরাধের শাস্তি যদি দিতে চান তো আমায় দিন। আমার ক্রমাগত দরজায় ঘা দেওয়ার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উনি আমায় আসতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

ইন্দিরা। অতি নির্ব্বোধ, তাই তোমাকে এখানে এনেছে। উচিত ছিল প্রহরীর হস্তে সমর্পণ করা।

গজেন্দ্র। আপনার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি শুনে সামান্য কয়েকটি পণ্য দ্রব্য আপনার কাছে বিক্রয় অভিলাষে এসেছিলুম।

ইন্দিরা। আমার কোন জিনিষ কেনবার প্রয়োজন বা ইচ্ছা নেই। যাও, একে বাহিরে রেখে এস।

বিশাখা গজেন্দ্রের দিকে এগোতে তিনি মিনতি করতে লাগলেন

গজেন্দ্র। দেবী, বহু দূর থেকে পদব্রজে অনেক পথকষ্ট সহ্য ক'রে আপনার সমীপে এসেছি। আপনি কিছু না নেন ক্ষতি নেই, কিন্তু দয়া ক'রে একবার দেখুন। তাতেও আমার

অনেক কষ্ট লাঘব হবে, মনে করব আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আমার এ অনুরোধ অন্যথা করবেন না দেবী।

আত্রেয়ী। একবার দেখতে কি দোষ।

গায়ত্রী। আর দেখলেই যে নিতে হবে তারও তো কোন মানে নেই।

ইন্দিরা। না, না, প্রলোভন মাত্রই খারাপ। যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। যাও, আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।

বিশাখা। চল, ওঠ। শুনতে পাচ্ছ না!

গজেন্দ্র। যাচ্ছি। অপেক্ষা করুন। মারবেন না—

গজেন্দ্র উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন ও হাত থেকে পেঁটরা পড়ে গিয়ে মণি-মাণিক্য ঘরের মেজেতে ছড়িয়ে পড়ল। সখিরা চীৎকার করে উঠলেন, ইন্দিরা বিস্মিত শুম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

বিশাখা। আহা, লাগে নি তো?

গজেন্দ্র। না। আপনারা দয়া করে একটু আমায় সাহায্য করবেন কি? এগুলো তুলে ফেলি।

তিনসখি অলঙ্কারসমূহ তুলে পেঁটরায় ভরতে সাহায্য করতে লাগলেন। ইন্দিরা হতবিস্মিত হয়ে একদৃষ্টে মণিমাণিক্যের দিকে চেয়ে রইলেন

ইন্দিরা। সব পেয়েছ?

গজেন্দ্র। না, একটা কম পড়ছে। সেইটাই এর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান।

ইন্দিরা। (পা দিয়ে ঠেলে) এই তো পড়ে রয়েছে। নাও। এবার যাও।

গজেন্দ্র। আচ্ছা দেবী, এই পদ্মরাগমণিটী কি অপূর্ব্ব নয়? এরকম বৃহৎ এবং উজ্জ্বল মণি আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। যেন পৃথিবীর বুকের রক্ত দিয়ে রাঙানো, বসরাই গোলাপের রক্তচ্ছটায় তৈরী, বালিকাবধূর প্রথম প্রেম-বিনিময়ের লজ্জাবিজড়িত রক্তিম অধর।

গায়ত্রী। সখি আর কিছু না নাও, অন্তত এইটা কেন।

আত্রেয়ী। শুধু এইটা কেন, সবই কেনবার মত জিনিস। কেন ঐটা! যেন সমগ্র সাগরের জল জমাট বেঁধে ঐ নীল-মণি সৃজিত হয়েছে। যেন সমস্ত নভোতল ঐ মণির নীলাভের মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

ইন্দিরা। না, আর কিছু কেনবার দরকার নেই। এই পদ্মরাগমণির দাম কত?

আত্রেয়ী। (একান্তে) এত দূর থেকে এসেছে। সস্তা করে সব কিনে নাও না।

গায়ত্রী। আমার যদি সামর্থ্য থাকত, আমি কোনটা বাদ দিতুম না।

ইন্দিরা। তোরা চুপ কর্। অনর্থক লোভ দেখাচ্ছিস্। আমি আর কিছু কিনব না। এটাও কিনতুম না। নেহাৎ বেচারী, কষ্ট করে এতদূর থেকে এসেছে তাই। কই, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? এর কত দাম তাড়াতাড়ি বল।

গজেন্দ্র। দাম হিসেব করছিলুম। দেখুন, এর দাম—না, এত লোকের সামনে বলা চলবে না।

ইন্দিরা। এরা আমার সখি। যে কথা এদের সামনে বলা চলবে না, সে কথা না বলাই ভাল।

গজেন্দ্র। তা নয়, তবে বিশেষ কারণ না থাকলে এ অনুরোধ আমি করতুম না।

আত্রেয়ী। আমরা কি তোমার জিনিস কেড়ে নেব?

গায়ত্রী। না, ভাঙচি দেব?

বিশাখা। আয়, আমরা যাই।

ইন্দিরা। তোরা ততক্ষণ মন্দিরে যা। আরতির জোগাড় কর্। আমি এখুনি আসছি।

সখিদের প্রস্থান

এইবার বল, তোমার কি বলবার আছে। কি মূল্যে তুমি ওটা বিক্রয় করতে পার?

গজেন্দ্র। এই পদ্মরাগমণি অমূল্য, কিন্তু আপনার নিকট এর মূল্য নিতে আমি অক্ষম।

ইন্দিরা। কি বলছ! পাগলের প্রলাপ! বিনামূল্যে—

গজেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দিরা। হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট কথা কও। বাতুলতা কোরো না। ব্যঙ্গোক্তি করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তো এই মুহূর্ত্তে এ স্থান পরিত্যাগ কর, নহিলে বিপদ ঘটতে পারে।

গজেন্দ্র। আপনি অনর্থক রাগ করছেন দেবী। আমার সে উদ্দেশ্য মোটেই নয়। এরকম কথা আমি স্বপ্নেও ধারণা করতে পারি না।

ইন্দিরা। কিন্তু তোমার আচার ব্যবহার তো ব্যবসাদারের মত নয়।

গজেন্দ্র। কারণ, আমি ব্যবসাদার নই।

ইন্দিরা। তবে তুমি কি উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে আমার

অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ? এখুনি উত্তর দাও, নচেৎ প্রতিহারীকে ডেকে তোমাকে রাজপুরুষের হস্তে অর্পণ করব। এ অলঙ্কারসমূহ তোমার?

গজেন্দ্র। আমার বলাও চলে, অথচ আমার নয়।

ইন্দিরা। এ কথার অর্থ?

গজেন্দ্র। অর্থ অত্যন্ত সুপরিষ্কার। প্রদ্যুম্নকিশোরের বন্ধু আমি। তিনিই আপনার চরণে এই অযোগ্য উপহার অর্ঘ দেবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

ইন্দিরা। (রেগে উঠে দাঁড়িয়ে) কি! এতদুর স্পর্দ্ধা। আমার গৃহে আমাকেই লোক পাঠিয়ে অবমাননা। যাও, এখুনি আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও। যাও—যাও—

গজেন্দ্র। দেবী, দয়া করে একটা কথা শুনুন—

ইন্দিরা। (উত্তেজিতভাবে) না, না। এই হীন ব্যবহার—বিশাখা, দৌবারিক—

গজেন্দ্র। (নতজানু হয়ে) দেবী, ক্ষমা করুন। আমার বন্ধুর হয়ে আমি আপনার চরণে মিনতি করছি। রোষ সম্বরণ করুন। আমার বন্ধু দিগ্বিজয়ী বীর সৈনিক। আজ তাঁর কি দশা হয়েছে দেখলে আপনার মনে নিশ্চয়ই করুণার সঞ্চার হবে। তিনি আপনার জন্য মৃতপ্রায়। কণামাত্র কৃপা লাভ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। দাক্ষিণাত্যের রণ-প্রাঙ্গণে শীঘ্রই মহারাজ কালকেতুর সৈন্যাধ্যক্ষ রূপে চলে যাবেন, হয় ত' আর ফিরবেন না। হয় ত' ব্যর্থপ্রেমে হতাশ হয়ে স্বেচ্ছায় নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করবেন। আপনি দয়া করুন। তাঁকে প্রাণ দান করুন, বাঁচতে দিন।

ইন্দিরা। আমি কি করতে পারি?

বিশাখা ও দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। আমায় ডেকেছেন?

বিশাখা। সখি, আমায় ডাকছিলে?

ইন্দিরা। হ্যাঁ। (একটু ইতস্তত করে) না, না, কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যেতে পার। আমায় একলা থাকতে দাও। যাও, দুজনেই যাও।

উভয়ের প্রস্থান

(গজেন্দ্রের প্রতি) যাও, তুমিও যাও। ভবিষ্যতে তুমি অথবা তোমার বন্ধু আমার দৃষ্টিপথে আর এস না। এভাবে দিনরাত আমাকে বিরক্ত কোরো না। আর তোমার বন্ধুকে বোলো, হয় এই রোগের কোনো ওষুধ জোগাড় করতে, না হয়—

গজেন্দ্র। এর ঔষধ যাঁর কাছে আছে, যিনি আরোগ্য করতে পারেন তিনিই বিমুখ! দেবী, আমার বন্ধুকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিলেন। অপরাধ—সে বীর, মন প্রাণ ঢেলে আপনাকে ভালবেসেছে।

ইন্দিরা। তাতে আমার কি?

গজেন্দ্র। দেবী, ক্ষমা করবেন। আমার বন্ধু উন্মাদ, তাই এমন পাষাণ-হৃদয়ার চরণে নিজের অমূল্য প্রাণ-মন সমর্পণ করেছেন। কিন্তু উপায় নেই। প্রেমের বিচিত্র গতি! আমি চললুম।

পেটরায় সব গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন

স্মরণ রাখবেন যে তাঁর মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী।

ইন্দিরা। সে দায়িত্ব বহন করবার শক্তি আমার আছে।

গজেন্দ্র। এই শেষবার অনুরোধ করছি। শুধু একটী কথা, যা আমার বন্ধু জপমন্ত্রের ন্যায় রক্ষাকবচের মত নিজের মনের নিভৃততম কন্দরে সযত্নে লুকিয়ে রেখে রণক্ষেত্রে যেতে পারেন। দেবী, আমার বন্ধুর একমাত্র অপরাধ, তিনি আপনাকে ভালবেসেছেন। তার জন্য প্রায়শ্চিত্তও কম করছেন না। দিবারাত্রি অশান্তি, বিরহ ও নিরাশায় দগ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু কল্যাণী, ভালবাসা কি পাপ, অন্যায়?

ইন্দিরা। আর কিছু বলবার না থাকে তো এবার যেতে পার।

গজেন্দ্র। যাচ্ছি। যাবার আগে শুধু একটী কথা বলে যেতে চাই—এত নিষ্ঠুরতা, এত অহঙ্কার ভাল নয়। পবিত্র প্রেমের এ অবমাননা ভগবান সইবেন না। আপনারও এমন একদিন আসবে যেদিন দয়িতের জন্য আপনি বিরলে বসে চোখের জলে বক্ষ সিক্ত করবেন, কিন্তু সে দেখবে না, ফিরেও চাইবে না। সে দিন মনে পড়বে আজকের কথা। একজন বীর সৈনিকের মনপ্রাণ-ঢালা পবিত্র প্রেমের অর্ঘ কি নির্দ্দয়ভাবে আপনি পদদলিত করেছিলেন—

পেটরাসহ প্রস্থানোদ্যত

ইন্দিরা। (কি ভেবে) থাম। ক্ষণেক দাঁড়াও—

গজেন্দ্র ফিরে এল

তুমি যা বলছ, তা কি যথার্থই সব সত্য?

গজেন্দ্র। মিথ্যা বলে আমার কি লাভ বলুন। তাঁর হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

ইন্দিরা। যদি একটা কথায় তাঁর কোন উপকার হয়, আমি তাঁকে নিরাশ করব না।

গজেন্দ্র। ধন্যবাদ। ভগবান আপনাকে সুখী করবেন।

ইন্দিরার পায়ের কাছে পেঁটরা রাখলেন

এই সমস্ত মণিমাণিক্য আপনার চরণে ডালি দেবার জন্য তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।

ইন্দিরা। না, এসব আমি নিতে পারি না।

গজেন্দ্র। বেশ, আমি তাঁকে কি এইখানে আনব ?

ইন্দিরা। না। আরতির শেষে মন্দির যখন খালি হয়ে যাবে, সেইখানে গিয়ে তোমরা অপেক্ষা কোরো। আমার দেখা পাবে।

গজেন্দ্র। দেবী, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার এ দয়া ভগবান শতগুণ ক'রে ফিরিয়ে দেবেন।

ইন্দিরা। এবার যাও। আরতির দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিশাখার প্রবেশ

একে বাইরে রেখে এসে মন্দিরে আয়। আমি চল্লুম। দেরী করিস্‌নি। ইন্দিরার প্রস্থান

বিশাখা। কি ? কিছু এগোলো ?

গজেন্দ্র। (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দেখিয়ে) একটুখানি। উঃ, একেবারে গলা শুকিয়ে গেছে। কি কঠোর প্রাণ রে বাবা। কিছুতে আর ভিজতে চায় না। বকে বকে তবে সামান্য এক আঙুল এগিয়েছে। কিন্তু আমার তো তেষ্টায়—

বিশাখা। তোমার তো সব সময়ই তেষ্টা পায় দেখছি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই—"উঃ, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে।"

গজেন্দ্র। তুমি বোঝ না। তোমায় দেখলেই আমি যেন কি রকম হয়ে যাই। তোমার হাতের জল মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে। ধাতস্থ হয়ে উঠি।

বিশাখা। বেশ। এখন গতরটা নাড়। এখুনি আবার আমায় মন্দিরে যেতে হবে। উভয়ের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

চম্পাইনগর

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

জনার্দন শিবুচাঁদ মগ্ন আজি শঙ্করের ধ্যানে
মুগ্ধ নর ভক্ত হেরি ধন্য যেন চম্পাই নগর—
শঙ্কর শঙ্করী রাজে অন্তর ভরিয়া সবখানে
দানিবে না পুষ্পাঞ্জলি মনসারে চাঁদসদাগর।

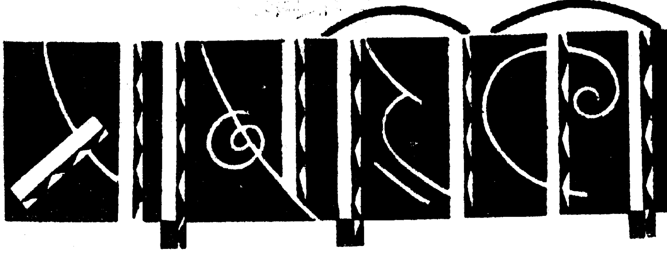
মর্ত্তের কমলবনে পদ্মা দেবী রোষে ওঠে ফুলে
'চাঁদ মোরে পূজিবে না ?' কাঁপে দেহ উদগ্র স্পর্দ্ধায়—
কহে দেবী 'সপ্ত পুত্র-বলি চাই মোর বেদী মূলে
ধ্বংসের ঘনান্ধকারে ডুবে যাক শাপের জ্বালায়।'

পূজিল না তবু চাঁদ—গেল ছয়, বাকী লখীন্দর
সরোষে গর্জিল দেবী—'ওরে চাঁদ, আজও পূজিলি না ?
বেহুলার সাথে তব তনয়ের মিলন-বাসর
মৃত্যুরে আনিবে ডাকি—ঝঙ্কারিয়া মরণের বীণা।'

মিলন-উৎসবশেষে বেজে ওঠে জীবনের বাঁশী
শিল্পীরাজ বিশ্বকর্ম্মা রচিয়াছে লোহার বাসর—
রূপময়ী বেহুলার রূপে হাসে সর্ব দেশবাসী
হিয়ার ব্যাকুল বনে প্রেয়সীরে লভে লখীন্দর।

সীমন্তিনী বধূ পাশে লখীন্দর ওঠে ফুকারিয়া
'বড় জ্বালা রে বেহুলা সর্পাঘাতে গেল মোর প্রাণ'—
প্রিয়তম বক্ষে সতী দামোদরে ভাসে ভেলা নিয়া
প্রথম মিলনরাত্রি, মিলনের হ'ল অবসান।

প্রেয়সীর সাধনায় লখীন্দর লভিল জীবন
বামহস্তে পদ্মারতি করে পুনঃ চাঁদ সদাগর—
জীবন আনন্দলোকে ফিরে এল সপ্ত হারাধন
বেহুলার প্রেমে ধন্য সতী-তীর্থ চম্পাইনগর।



কংগ্রেস ও যুদ্ধ—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, কংগ্রেস ইতিহাসে তাহার বিশেষত্ব অস্বীকার করিবার জো নাই। মহাত্মাজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। হিংসা-অহিংসা লইয়া মত-বিরোধই এই পদত্যাগের কারণ। অথচ পুনা-প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় নাই বা বোম্বাই-প্রস্তাবও নাকচ হয় নাই, তবু মহাত্মাজী পদত্যাগ করিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং মহাত্মাজী স্বীকার করিয়াছেন যে, বোম্বাই-প্রস্তাবে কংগ্রেস যে অহিংসার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে যুদ্ধে কংগ্রেসী সহযোগিতার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই এবং বোম্বাই-প্রস্তাবের অহিংসা তাঁহার অনুসৃত অহিংসা নহে—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির বেশীর ভাগ সদস্যই গান্ধীজীর অহিংসায় বিশ্বাস করেন না। পুনা-বৈঠকে স্বাধীনতার সর্ত্তে এই যুদ্ধে সাহায্য করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা সরকার গ্রহণ করিলেন না; সেই জন্যই বোম্বাই-প্রস্তাবের প্রয়োজন হয়। কংগ্রেস অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় এই যুদ্ধে এবং কোন যুদ্ধেই সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে—এই আশ্বাসে গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বৃটেনকে বিব্রত করিবেন না—এই অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। নেতৃবৃন্দের কেহ বা সত্যাগ্রহ করিয়া, কেহ বা করিবার পূর্ব্বেই কারারুদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠিল, নূতন পথের সন্ধান চলিতে লাগিল এবং বার্দোলীর বৈঠকে সেই সন্দেহ সেই প্রশ্নই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজী নেতৃত্ব ত্যাগের পরও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালাইবেন এবং একান্ত বিশ্বাসী ও অনুরাগীরা তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। কংগ্রেস গণ-আন্দোলন চালাইবে না, তবে ইতিমধ্যে কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীর যে আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়—বিমান আক্রমণের সময় জনরক্ষায় সাহায্য করা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, তাহা যথাসাধ্য নিবারণ করা তাহাদের অনভিপ্রেত নহে। যুদ্ধের সময় বড় বড় যন্ত্রশিল্প অচল হওয়া অনিবার্য্য; সে সময় জনগণের আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য কুটীর-শিল্পের বিশেষ উন্নতি-সাধন করিয়া গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর করিয়া গড়িয়া তোলার প্রয়োজন আছে। এই দিক দিয়া কংগ্রেস গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। কংগ্রেসের সহিত বৃটিশের আপোষ না হইলে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সংঘর্ষ বাঁচাইয়া জনরক্ষার ব্যবস্থা করা, কি গ্রাম-উন্নয়ন ও নূতন শিল্প ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন – কোনটাই বিনা বাধায় চলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রিসভা—

বহু আলোচনা ও গবেষণার পর বাঙ্গালার পুরাতন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং পুরাতন প্রধান-মন্ত্রী মৌলবী এ-কে-ফজলল হকের নেতৃত্বেই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। পুরাতন মন্ত্রিসভার আর একজন মাত্র মন্ত্রী নূতন মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছেন। বাকী আর কাহাকেও নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই। খাজা সার নাজিমুদ্দিন নিজে প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দলের সংখ্যাল্পতার জন্য বিফল হইয়াছে। নবাব মশারফ হোসেন, মিঃ এচ-এস-সুরাওয়ার্দ্দী, মিঃ তমিজুদ্দীন, সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী মল্লিক, মহারাজা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুত প্রসন্নদেব রায়কত প্রভৃতির সমর্থক দল না থাকায় তাঁহারা পুরাতন মন্ত্রী হইয়াও কেহই নূতন মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। যাঁহার একান্ত চেষ্টার ফলে প্রায় সকল দল সম্মিলিত হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন, সেই শ্রীযুত শরৎচন্দ্র

বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ব্বেই জাপানের সহিত সম্বন্ধ রাখার অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যাহা হউক,



মৌলবী এ-কে-ফজলল হক

তাঁহার দলের দুইজন যোগ্য ব্যক্তি নূতন মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে—



ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১) মৌলবী কাবুল কাসেম ফজলল হক—প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত—(২) ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অর্থসচিব (৩) ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর—কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (৪) শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু—স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (৫) খান বাহাদুর মহম্মদ আবদুল করিম—শিক্ষা, বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, (৬) শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজস্ব, বিচার ও আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (৭) খান বাহাদুর মৌলবী হাসেম আলি খাঁ-সমবায় ঋণ ও গ্রাম্য ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (৮) মৌলবী সামসুদ্দীন আহমদ-পথ ও পূর্ত্ত



শ্রীসন্তোষকুমার বসু

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (৯) শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ—বন ও আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

নূতন মন্ত্রীদের কাহারও কাহারও পরিচয় প্রদান আবশ্যক—প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি বহুদিন কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন, বহুবার মন্ত্রী হইয়াছেন এবং গত কয় বৎসর প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন। ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুরেরও পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তিনি মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং গত কয় বৎসর মন্ত্রিত্ব করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বর্গত স্যার আশুতোষের পুত্র বলিয়া শুধু নহেন, শিক্ষাব্রতী বলিয়া

সর্ব্বজনসমাদৃত। তিনি পর পর দুইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন এবং হিন্দুসভার অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় অতি যেরূপ অবহিত, তাহাতে তাঁহার উপর বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু যৌবনকাল হইতেই দেশসেবক। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও মেয়ররূপে তিনি জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের



শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিন্সিপাল ও সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ উকীল এবং জলপাইগুড়ী মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল করিম ত্রিপুরার খ্যাতনামা উকীল এবং খান বাহাদুর হাসেম আলি খাঁ বরিশাল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা—গত মন্ত্রিমণ্ডলীতে কিছু দিনের জন্য তিনি কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কাজেই দেখা যায়, নূতন মন্ত্রিসভা যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়াই গঠিত হইয়াছে। কাজেই তাঁহারা যে কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ, সন্তোষকুমার, প্রমথনাথ, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত তেজস্বী হিন্দু নেতারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় বাঙ্গালী হিন্দুদের মন হইতে সংশয়ের ভার দূরীভূত হইবে। আমরা এই



শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ

নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

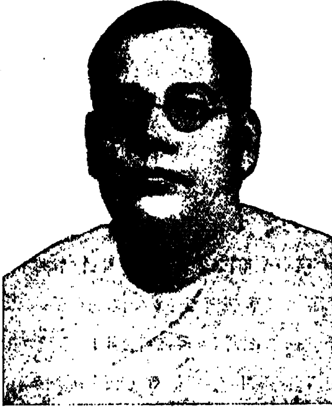
শত্রু আক্রমণ ও কাউন্সিলর—

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বৈঠকে জনৈক ইউরোপীয়ান সদস্য প্রশ্ন করেন—কর্পোরেশনের কোন্ কোন্ অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন? এই প্রশ্নে কোন কোন দেশীয় সদস্য খেপিয়া গিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন। 'ঠাকুরঘরে কে রে?—আমি কলা খাই না'—এই কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। প্রত্যাসন্ন নগর আক্রমণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া এই এই যে মনোভাব প্রদর্শিত হইল ইহাকে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না; অথচ এই সব ছেলেমানুষরাই কলিকাতার মত নগরীর হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক!

শরৎচন্দ্রের গ্রেপ্তার—

বাঙ্গালার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার পতনের পর প্রগতিশীল বিভিন্নদলের যোগাযোগে যখন বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ প্রায় পাকা, ঠিক সেই সময় ভারত সরকারের

নির্দ্দেশে বাঙ্গালার জননায়ক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে ভারতরক্ষা আইনের বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের গ্রেপ্তারে সমগ্র দেশবাসী হতবুদ্ধি এবং গ্রেপ্তারের কারণ জানিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র নাকি বৃটিশের বিরুদ্ধে জাপানের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! এ দেশের শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে অতীতেও এই ধরণের আচরণের হাস্যকর যুক্তি শুনিয়া আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; সুতরাং বর্ত্তমান ঘটনায় বেশী বিস্মিত হই নাই।



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

বাঙ্গালার শাসনতন্ত্র যখন অচল, সেই সময় শরৎচন্দ্রের ন্যায় জননায়ককে আমরা মন্ত্রিসভায় দেখিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু সরকার বিনা কারণে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের প্রগতিবাদীদের শক্তি আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; প্রত্যাসন্ন শত্রু আক্রমণে দেশবাসীর সহযোগিতা যাঁহাদের অপরিহার্য্য, তাঁহারা যে কেমন করিয়া জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করেন বুঝিতে পারি না।

কলিকাতায় নলকূপ—

সম্প্রতি কর্পোরেশনের এক সভায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শহরে নলকূপ বসানো সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে কর্পোরেশন হয় ত দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন, কিন্তু বিপদ এড়ানো সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ নলকূপ বসাইতেছেন, কর্পোরেশন শুধু কূপ বসাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রস্তাবিত আড়াই হাজার নলকূপের জায়গায় এ পর্য্যন্ত মাত্র ১৫৬৭টি কূপ খনন করা হইয়াছে। ১৮, ২১, ২৯ ও ৩১নং ওয়ার্ডে একটি করিয়া মোট চারিটি পরীক্ষামূলক কূপ খনন করা হইয়াছে। ৫,৭,২৪,২৫ এবং ২৬নং ওয়ার্ডে একটিও কূপ খনন করা হয় নাই। ২নং ওয়ার্ডে পরিকল্পিত ৩৮৩টির মধ্যে একটি এবং ২০নং ওয়ার্ডে পরিকল্পিত ৮৯টির মধ্যে ৩১টি এবং ২৯নং ওয়ার্ডে পরিকল্পিত ১১৭টির জায়গায় একটি মাত্র কূপ বসানো হইয়াছে! যে ১৫৬৭টি বসানো হইয়াছে তাহার মধ্যে ৬৩১টির জল পরীক্ষার জন্য লওয়া হইয়াছে ও ৪১৮টির জল সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র ২২৮টির জল পানীয়রূপে ব্যবহারযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে! প্রধানকর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়ের এই বিবৃতির মধ্যে একটা কথা যেন উঁকি মারিতেছে; সে হইতেছে এই যে, শহরে নলকূপ খননের দায়িত্ব সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের হাতে থাকায় কর্পোরেশন যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পরিকল্পিত কূপ খনন যাহাতে অচিরে সুসম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করাই কি কর্ত্তব্য নহে?

নাগরিকদের রক্ষার ব্যবস্থা—

কলিকাতা শহরে শত্রুর বিমান আক্রমণ হইলে কি করা হইবে ও বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের দুর্দ্দশা লাঘব করার উদ্দেশে কি ব্যবস্থা করা হইবে সেই সম্পর্কে সম্প্রতি কর্পোরেশনের একসভায় আলোচনা হয়। বিমান আক্রমণে সতর্কতা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মেয়র ও আটজন কাউন্সিলরকে লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে। সতর্কতা সম্বন্ধে সরকার ও কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তারা কি ভাবে কার্য্য করিবেন তাহা এই নলকূপ খনন, রাস্তাঘাট মেরামতের উদ্দেশ্যে দ্রুত যান-বাহিত দলগঠন, জল সরবরাহের নল ও বিদ্যুতের তার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সংস্কারের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রাদি মজুত রাখা, ময়লা নিষ্কাশনকারী জল সংস্কারের ব্যবস্থা, পাম্পিং-ষ্টেশন, জল-সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ছদ্মাবরণে আবৃতকরণ ও রক্ষণের ব্যবস্থা, ময়লা পরিষ্কার, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও জন সাধারণের স্বাস্থ্যবিধায়ক বিভাগ-

সমূহে নিযুক্ত লোকজনদের জন্য শহরের এলাকার বাহিরে সাময়িক বাসস্থান নির্ম্মাণ, ভূগর্ভে জলাধার নির্ম্মাণ, অগ্নি নির্ব্বাপনের সুবিধার জন্য পুষ্করিণীসমূহে সহজ গমনাগমনের ব্যবস্থা, বিমান আক্রমণে গৃহহারাদের জন্য বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা, মৃত নাগরিকদের সনাক্তকরণ ও শব সৎকারাদির ব্যবস্থা, জরুরী অবস্থার সময় মিউনিসিপাল মার্কেট ও প্রাইভেট বাজারগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্যাদি মজুত রাখা—এই সব উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারের সহিত যত মতভেদই থাকুক, নাগরিকদের স্বার্থের জন্য সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কাগজ প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি—

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কাগজের কল হইতে কাগজ ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ কাগজ ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। বর্ত্তমান বর্ষে ভারতে ৯ হাজার ৫ শত ৩১ টন কাগজ ব্যবহৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮ হাজার ১৩৬ টন কাগজ ভারতের বিভিন্ন কাগজের কল হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্টেশনারী দপ্তর ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ৭৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা মূল্যের কাগজ কিনিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দপ্তর কাগজ ক্রয় করিয়াছিল ৬১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার। যুদ্ধকার্য্যের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং ভারত সরকারকে বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে কালি, কলম এবং কাগজ কিনিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ভারত সরকার কাগজ কলম কালি ইত্যাদি দ্রব্যাদির জন্য ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে প্রতি মাসে ভারত সরকার তাহার বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ৬শত টাইপ-রাইটার কিনিতেছেন; যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ টাইপ-রাইটার ক্রয়ের পরিমাণ ছিল মাসিক ২ শত করিয়া।

ভাগলপুর—

নিখিলভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন এবার ভাগলপুরে হইয়া গিয়াছে। বিহার সরকার এই অধিবেশন সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে কোন দিক দিয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নাই। সম্মিলনের কয়দিন বাদেই মুসলমানদের ঈদ পর্ব্ব; কাজেই সরকার হইতে এই মামুলী যুক্তিই প্রদর্শিত হইল যে ঈদের মুখে হিন্দুমহাসভার বৈঠক হইলে সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি হইবে। মহাসভার উদ্যোক্তা ও স্বয়ং সভাপতির সহিত সরকারের চিঠি লেখালেখি চলিল, কিন্তু সরকারের অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাইয়া অগত্যা তাঁহারা ভাগলপুরেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তারিখে অধিবেশনের ঘোষণা করিলেন। সরকারের পক্ষ হইতেও তোড়জোড় চলিল, সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন হইল। ভাগলপুরগামী নেতৃবৃন্দকে রাস্তাতেই গ্রেপ্তার করা হইল। সভাপতি বীর সাভারকর ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ দলে দলে গ্রেফ্তার হইলেন। বাঙ্গালার নবগঠিত মন্ত্রিসভার অর্থসচিব ও হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও আটক করা হইল। সম্প্রতি বিহার সরকার এক প্রেস নোটে তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের উপর চুণকামের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার অধিবেশন যথানিয়মে পুলিশ ও সৈন্যগণের প্রহার উপেক্ষা করিয়াও সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহুলোক আহত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিহার সরকার এই ব্যাপারে যে চূড়ান্ত অদূরদর্শিতা, অবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এ দেশেও বিরল। বিহার সরকারের এই কার্য্যে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। তাহারা জানিল যে, সরকার ভয়ে ভয়ে ভবিষ্যতেও তাহাদের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইবেন। সরকারের কর্ত্তব্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণকে তাহাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া; কিন্তু সরকার যদি গুণ্ডার ভয়ে জনগণকে তাহাদের মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন তবে দেশে শান্তি বিরাজ করিবে কিসের জোরে?

জরুরী অবস্থা—

প্রত্যাসন্ন শত্রুর আক্রমণের ফলে সমগ্র বাঙ্গালায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। রেঙ্গুনে জাপানী বিমান আক্রমণে বাঙ্গালাকে তাহার গুরুতর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়ার স্বভাবতই প্রয়োজন আছে।

গত কয়েক মাস হইতে বাঙ্গালা সরকার জরুরী অবস্থার জন্য যে সকল আদেশ ও নির্দেশ দিয়া আসিতেছেন, অতঃপর সমগ্র প্রদেশেই তাহা কার্য্যকরী হইবে। জনসাধারণ অতিরিক্ত ভয়ে বিমূঢ় না হইয়া সেই সকল নির্দেশ শান্ত ও ধীরভাবে পালন করিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ সরকার মাঝে মাঝে যে সকল নির্দেশ ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন তাহা অনেকেরই সম্ভবত মনে নাই। তাঁহারা সেই সকল আদেশ একসঙ্গে এবং বার বার প্রচার করিলে বিষয়টা জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হইবে এবং কার্য্যকরীও হইবে।

বিক্রয় কর আইনের নিয়মাবলী—

বিক্রয়-কর-আইন অনুযায়ী চলিতে গিয়া ক্রেতাবিক্রেতা উভয়পক্ষই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতেছেন। আইনে সংবাদপত্রকে বাদ দিলেও এবং মাসিকপত্রকে সংবাদপত্রের সমস্ত নিয়মকানুন মানিতে হইলেও বিক্রয়-কর-আইনের সুবিধা হইতে মাসিক পত্রিকা বঞ্চিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে সেল ট্যাক্স কমিশনরের নিকট আবেদনে কোন ফল হয় নাই। আবেদনের উত্তরে মাসিকপত্রকে সেই সুবিধা দানের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে; সেল-ট্যাক্স-এর হিসাবাদি রাখিতে ব্যবসায়ীগণকে প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। আইনানুযায়ী অধিক সময় দিবার নিয়ম থাকিলেও সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে পূর্ব্ব মাসের হিসাব সম্পূর্ণ করিয়া ট্যাক্সের টাকা চালানসহ কালেকটরীতে জমা দিয়া সেই রসিদ আবার চালানসহ হিসাব সমেত ট্যাক্স-আপিসে জমা দিতে হয়। কালেকটরীতে টাকা জমা দিবার দুর্ভোগ ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিবেন। টাকা জমা দিতে হইলে একটি লোকের সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়, অথচ উহার রসিদ সঙ্গে সঙ্গেই মেলে না, তাহার জন্য দুই-তিন দিন ঘুরিতে হয়। সাধারণ ছুটি, রবিবার প্রভৃতি বাদ দিয়া ১৫ই তারিখ মধ্যে চালান ও রসিদসহ ট্যাক্স-আপিসে টাকা জমা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর এবং প্রায় অসম্ভব। এই সময় পরবর্ত্তী মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক এবং টাকা জমা লওয়ার ব্যবস্থা যদি ট্যাক্স আপিসেই হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে কতকটা দুর্ভোগ কমে। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করিবেন।

কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য—

কলিকাতা সহরকে শত্রুর বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সে জন্য বড় রাস্তার উপর যে সকল বাড়ী অবস্থিত, সেগুলির সম্মুখে বালির বস্তা সাজাইয়া ও প্রাচীর গাঁথিয়া বাড়ীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বিমান-আক্রমণ-রক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বহু গৃহস্বামী উক্ত নির্দ্দেশমত নিজ নিজ বাড়ীর সম্মুখে প্রাচীরও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে, কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ফুটপাথের উপর প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য গৃহস্বামীদিগের নিকট হইতে জমীর ভাড়া আদায় করিবেন। যে অভাব কোন ব্যক্তিবিশেষের নহে, ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতেছে, সেই অভাব পূরণের জন্য কেহ কোন কার্য্য করিলে কর্পোরেশনের পক্ষে ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে ভাড়া আদায় করা কিরূপ সঙ্গত হইবে, তাহা বিচারের বিষয়। আমরা আশা করি, কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী জমীদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় গত ২৮শে অগ্রহায়ণ মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রবাবু যে বংশের সন্তান, সেই বংশ নানাকারণে কলিকাতার সমাজে



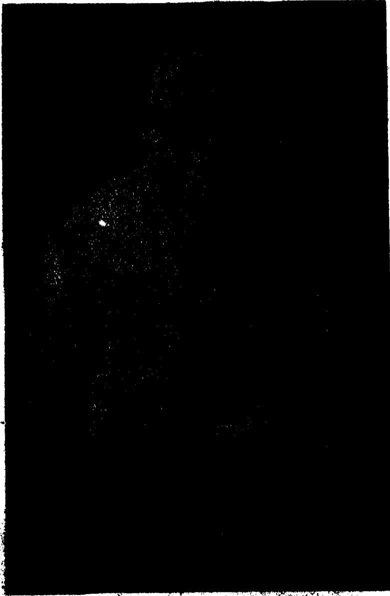
৺ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

সুপরিচিত। ভূপেন্দ্রবাবু নিজেও একজন সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার গৃহে ভারতের সকল প্রধান

সঙ্গীতজ্ঞ আদৃত হইতেন। ভূপেন্দ্রবাবুর গৃহে শতাধিক সঙ্গীতজ্ঞের তৈলচিত্র শোভিত আছে। তিনি বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলন ও নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

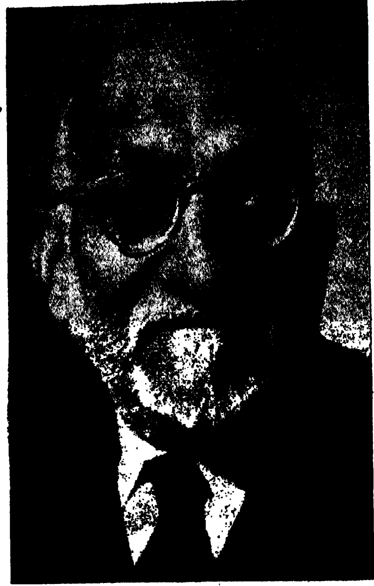
পাণিহাটীতে মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার পাণিহাটীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সারাজীবনের সঞ্চিত লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া পাণিহাটী গ্রামে নিজ পৈতৃক বসতবাটীতে একটি



গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি

দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি পাণিহাটী ক্লাবের তরুণ-কর্ম্মীদের চেষ্টায় এবং গোপালবাবুর সহধর্ম্মিণীর অর্থসাহায্যে গ্রামে গোপালবাবুর একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার উমাপ্রসন্ন বসু যাইয়া উক্ত মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, কলিকাতা ৫৯ বেন্টিক ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুত কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্ত্তিটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং গোপালবাবুর বহু অনুরাগী ভক্ত সে দিন উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।



সার আকবর হায়দারী
(ইনি সম্প্রতি বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রচার-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।)

পরলোকে প্রবীণ সাংবাদিক—

প্রবীণ মুসলিম সাংবাদিক মৌলবী নাজীর আহম্মদ চৌধুরী সাহেব সম্প্রতি মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল বিভিন্ন সংবাদপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বলিতে গেলে 'মোহম্মদী' 'আজাদ' যে জনসমাজে এতটা সুপরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে চৌধুরী সাহেবের নিরলস একনিষ্ঠ সেবা অংশত দায়ী—একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। মতান্তরের ফলে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়া আসিয়া "মদীনা" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার জীবন একনিষ্ঠ সংবাদপত্র সেবায় দ্বারা গৌরবান্বিত। আমরা তাঁহার আকস্মিক পরলোক-গমনে তাঁহার পরিজনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্র জয়ন্তী—

সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিল্পীবৃন্দ মিলিত হইয়া শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য অবনীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব করিয়াছেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত দেবী-



শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফটো—শ্রীপরিমল গোস্বামীর সৌজন্যে

প্রসাদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদানের পর শ্রীযুত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সময় ও স্থানোপযোগী একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। জয়ন্তী উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষকগণ বংশনির্ম্মিত, নানারূপ কারুকার্য্যখচিত একটি সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত একখানি প্রশস্তি দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের চেষ্টায় বড় দিনের ছুটিতে রেঙ্গুন সহরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছিল। এবারও উক্ত সম্মিলনের উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী এ বৎসরের উৎসবের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্য এবার উৎসব বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। আমরা আশা করি, শীঘ্রই বর্ত্তমান



অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী

রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং সকলেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



শ্রীমতী মানকুমারী বসু

(গতমাসে আমরা ইঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি।)

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর কাশীধামে মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনও কাশীতে হয় এবং মহামহোপাধ্যায়ই সেইবারেও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন; সেবার মূল সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবারে মূল সভাপতি ছিলেন প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি অসুস্থতার জন্য স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার লিখিত অভিভাষণ সভায় পঠিত হইয়াছিল। সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাস শাখায় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞান শাখায় ডঃ অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন শাখায় ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, শিল্পশাখায় শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বৃহত্তরবঙ্গ শাখায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মহিলা শাখায় শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, রবীন্দ্র স্মৃতিবাসরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শিশু সাহিত্যে

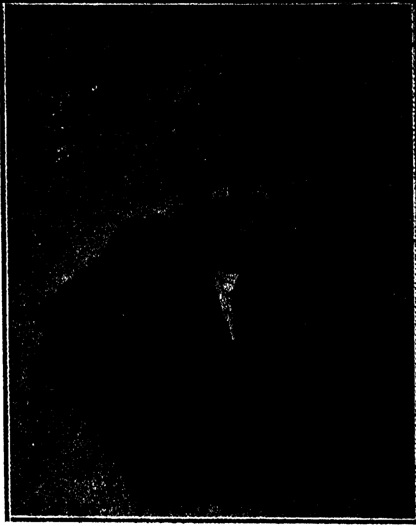


কাশীধামে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ফটো—ইভান এণ্ড কোং (কাশী)



কাশীধামে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—প্রতিনিধি ও সভাপতিবৃন্দ ফটো—ইভান এণ্ড কোং (কাশী)

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও সঙ্গীতশাখায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সভাপতি হইয়াছিলেন। হইতে দর্শক ও প্রতিনিধিরা অল্পসংখ্যকই উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার

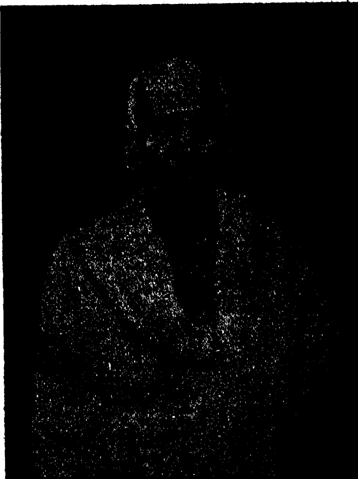


মূল সভাপতি—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



সম্মেলনের উদ্বোধনকারী মহারাজা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র নন্দী

সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, সুকবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মিলনের



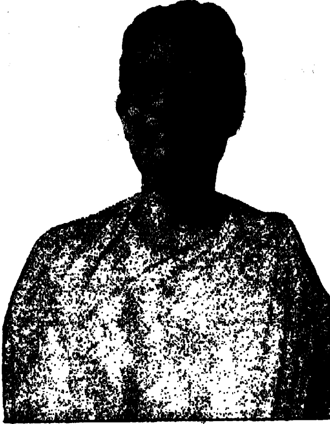
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ



মহিলা-শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

ইহাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন বাবু উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রত্যাসন্ন শত্রু আক্রমণের ভয়ে এবারে কলিকাতা সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত কয়জনের আপ্রাণ চেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত

সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বিশী। বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই সম্মিলনা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইতেছে ইহা আশার কথা। বৈষয়িক কারণে যাঁহারা স্বদেশ হইতে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে বৃহত্তর বঙ্গে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে স্বদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার এই ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। কাজেই আমরা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের স্থায়িত্ব ও অধিকতর প্রতিষ্ঠা কায়মনোবাক্যে কামনা করি।



রবীন্দ্র স্মৃতি বাসরের সভাপতি
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী



সঙ্গীত শাখার সভাপতি
শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী



১২। ইতিহাস শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন



বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডক্টর অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলোয়াড় তা প্রমাণিত হ'য়েছে—ইফতিকার চতুর্থ সেট আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পর পর দুটি গেম নিলেন কিন্তু



মিঃ পি আর দাশ
অল্ ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট

পরবর্ত্তী ছটি গেমে ইফতিকার ঘসের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'তে বাধ্য হ'য়েছেন। শেষ সেটে ঘসের সঙ্গে ইফতিকারের তুলনা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিলো।

গতবারের সিঙ্গলস, ডবলস ও মিক্সড্‌স-ডবলস বিজয়ী



ঘস মহম্মদ ও ইফতিকার আমেদ

সানী ক'লকাতায় এসেও অসুস্থতার জন্য প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রতে পারেননি। প্রেমপান্ধীর খেলা আমাদের



মিঃ এ-দে—(অল্ ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন ও সাউথ ক্লাবের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ)

আকৃষ্ট ক'রতে পারেনি। এঁর কাছে ঘসের পরাজয় একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয়। খেলা বড্ড 'স্লো'। তবে একটা জিনিষ সত্য সত্যই প্রশংসনীয় তিনি শেষ পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে খেলেন 'Nothing is lost to him'—অনেক অসম্ভব বল শেষ মুহূর্ত্তে তুলে দিয়ে তিনি দর্শকদের প্রশংসা লাভ ক'রেছেন। দিলীপের খেলা দেখে হতাশ হ'তে হ'য়েছে। জিমির খেলা উল্লেখযোগ্য; বিশেষত ডবলসে। ডবলসে তাঁর খেলা উচ্চ প্রশংসনীয়। পুরুষদের ডবলস ফাইনালে ভাল খেলেও সঙ্গীর দোষে ঘস ও ইফতিকারের কাছে পরাজিত হ'তে হ'য়েছে। সুমন্ত্র মিশ্র উপযুক্ত সহযোগিতা ক'রতে পারলে ডবলসে জয়লাভ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হ'তো না। তবে জিমি অত্যন্ত দুর্ব্বল। তৃতীয় সেটেই তাঁর দম ফুরিয়ে যায়। মহিলাদের সিঙ্গলসে বিজয়িনী হ'য়েছেন কুমারী উডব্রিজ ৬-৪, ৬-৪ গেমে শ্রীমতী কার্গেনকে পরাজিত ক'রে। এঁরাই আবার সহযোগিতা ক'রে ডবলস বিজয়িনী হন।

অন্যান্য বারের মত এবারও সাউথ ক্লাব পরিচালিত এই প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই সাফল্যের জন্য দে ভ্রাতৃদ্বয়, মিঃ মুখার্জ্জি ও মিঃ ফ্রেক এডোয়ার্ডসের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পুরুষদের সিঙ্গলস: ঘস মহম্মদ ৭-৫, [illegible], ২-৬, ৬-২ গেমে ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস: ঘস মহম্মদ ও ইফতিকার আমেদ ৬-৩, ৮-৬, ১-৬, ৬-২ গেমে জি মি মেটা ও সুমন্ত্র মিশ্রকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডবলস: কৃষ্ণপ্রসাদ ১-৬, ৬-১, ৬-৩ গেমে এল ক্রক এডওয়ার্ডসকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস: মিস এস উডব্রীজ ও মিসেস সি কার্গিন ৬-৪, ৬-৪ গেমে মিসেস এইচ বিসপ ও মিস মেটাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস: জি মি মেটা ও মিসেস কার্গিন ১০-৩, ৬-৪ গেমে দিলীপ বসু ও মিস কোনারকে পরাজিত করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক টেবিল টেনিস :

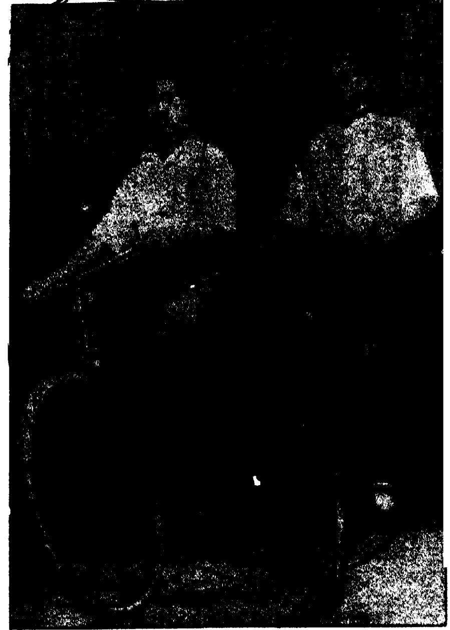
আন্তঃপ্রাদেশিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা প্রদেশ ৫-৪ গেমে বোম্বাই প্রদেশকে পরাজিত ক'রে ট্রফি বিজয়ী হয়েছে।

বেঙ্গল টেবল টেনিস :

বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাবোর্ণ টেবল টেনিস লীগে পি মিত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন কমল ব্যানার্জি এবং তৃতীয় স্থানে আছেন আর হোসেন।

সাইকেলে ভ্রমণ :

খাটুরা (২৪ পরগণা) আনন্দ সম্মিলন-এর সভ্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাল ও শ্রীযুক্ত জহরলাল নন্দী সাইকেল যোগে কলিকাতা হইতে রাঁচি যাত্রা করিয়া পুনরায় সাইকেল-যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।



মধুসূদন পাল ও জহরলাল নন্দী

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "হাউস-ফুল"—১৲
শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত "দুই দম্পতি"—২৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মন্দ থেকে ভাল"—॥৵৹
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত উপন্যাস "যে চিতা জ্বলছে বুকে"—২।৹
শ্রীরমাপতি দত্ত প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ"—৩৲
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "শুভশ্রী"—১৲
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "তুমি আর আমি"—১৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মুখর অতীত"—২৲
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "মজলিস"—১।৹
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রোমাঞ্চ-উপন্যাস "মোহনের জার্মানী অভিযান"—২৲
শ্রীরাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরী সম্পাদিত গল্প-সংগ্রহ "সাতডিঙা"—১॥৹
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাতজাগা"—১॥৹
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শেষ আশা"—১॥৹
পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী"—৭৲
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "কৃষ্ণদ্বীপের রাণী"—২৲
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী প্রণীত উপন্যাস "গোধূলি"—॥৹
শ্রীরণজিৎ সেন প্রণীত কবিতা পুস্তক "শতাব্দী"—॥৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "আমাদের বিশ্বকবি"—৶৹
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত "গল্পে চণ্ডী"—।৵৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত









ফাল্গুন—১৩৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ভবিষ্যৎ বিশ্ব-শৃঙ্খলায় ধর্মের স্থান

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর, এম-এ

পৃথিবীতে আমাদের চোখের সামনে নিত্য যে সকল পরিবর্তন ঘট্‌চে, তার হিসেব নিকেশ করা সহজ নয়। সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে এ সকল চিন্তা করলে যা অনেকেরই মনে পড়ে, আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাই প্রকাশ করতে চাই। আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধা হলেও চিন্তার প্রয়োজন যে আছে, সে কথা স্বীকার করতে বাধা হওয়া উচিত নয়।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বয়েস কত, তা ঠিক করে হয়ত বলা যাবে না। কিন্তু একথা ঠিক যে স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখ্‌লে বুঝা যায়—এর মধ্যে অহঙ্কার করবার মত আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। মানুষের শক্তি বেড়েছে, তার সঙ্গে লোভ বেড়েছে, অহঙ্কার বেড়েছে; জ্ঞান বেড়েছে কিন্তু তার সঙ্গে বর্বরতা বেড়েছে অপরিমিতভাবে। সুতরাং মানুষের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারময় বলেই মনে হয়। আমাদের জীবনেই দুটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ দেখতে হলো। প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছিল মহাসমর, দ্বিতীয়টির কিরূপ নামকরণ হবে, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কারণ দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ নিতান্তই ক্ষুদ্র বল্‌তে হবে। যতদূর বুঝা যায় তাতে এই যুদ্ধেই যুদ্ধের শেষ হবে না, আবার যুদ্ধ হবে এবং সে যুদ্ধ আরও শত গুণে প্রলয়ঙ্কর হবে। বোধ হচ্চে যেন এই বিংশ শতাব্দীর প্রভাস-ক্ষেত্রে সমস্ত যদুকুল নির্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নেই।

কিন্তু কেন? মানুষের মনোবৃত্তি এমন হচ্চে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, আমাদের যুগযুগান্ত সঞ্চিত শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির দিকে ধ্যান দিতে হবে। পৃথিবীতে যে সকল মহাজাতি বাস করে, তাদের প্রত্যেকের জীবনধারা কতকগুলি সুপরিচিত আদর্শ ও রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল আদর্শ ও রীতিনীতির সংক্ষিপ্ত নাম "ধর্ম"।

আমি জানি ধর্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে সকল অর্থের বিশ্লেষণে আমাদের কাজ নেই। আমরা ধর্ম বল্‌তে সাধারণভাবে এই বুঝি, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে' মানুষের মনে যে সকল ভাবরাশি বিকসিত হয়, তার সংক্ষিপ্ত নাম ধর্ম। পাপ-

পুণ্যের নিয়ামক ধর্ম, ইহলোক পরলোকের সংযোজক ধর্ম, সমাজের ভিত্তি ধর্ম, রাষ্ট্রবিধানের আস্তিক ব্যবস্থাপক ধর্ম—সুতরাং আমাদের অতীত ইতিহাসকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে "ধর্ম"। কাজেই বলা যেতে পারে যে পুরাতন জগতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও শক্তিশালী বন্ধন ছিল ধর্মের। সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, শিল্প বল—সমস্তই ধর্মের গগনবিসর্পী ছায়াতলে গড়ে উঠেছিল। একটু অনুধাবন করে' দেখলেই বুঝা যায় যে সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত সঙ্গীত ও শিল্প—ধর্মের আশে-পাশেই স্ফূর্ত্তিলাভ করেছিল। আমাদের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে ত কিছু বলবারই দরকার নেই; সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের কিরণেই তার পাপড়ি খোলে একটু একটু করে', তেমনি বাঙ্গালীর কাব্যলক্ষ্মী ঘোমটা খুলেছিল প্রথমে ধর্মেরই দিকে চেয়ে। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ ও সঙ্গীত গড়ে উঠেছিল ধর্মেরই প্রেরণায়। ইয়ুরোপের সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। আমাদের আলিপনা থেকে আরম্ভ করে' নানাবিধ চিত্র, ভাস্কর্য ও মন্দিরশিল্প জন্মলাভ করেছে, পুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ করেছে ধর্মের থেকেই। ইয়ুরোপের শিল্প সম্বন্ধেও ঐ একই উৎসের সন্ধান পাই। রাফায়েল বা মাইকেল এঞ্জেলো, মিউরিলো বা লিওনার্দো দা ভিন্সি, বটিচেলি বা টিশিয়ান···এদের সকলেরই প্রেরণা জুগিয়েছে ধর্ম। রাফায়েলের মাতৃমূর্ত্তি বা রোমের সিষ্টাইন্ চ্যাপেলএর ছাতে মাইকেল এঞ্জেলোর স্বর্গ-নরকের চিত্র—বর্তমান ইয়ুরোপীয় সভ্যতার চরম নিদর্শন বলে' মনে করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তিও এই ধর্মকেই আশ্রয় করে' সার্থকতা লাভ করতো। সমস্ত কর্ম, সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত বিধি—এই ধর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। খ্রীষ্টানরা ধর্মের জন্য হেলায় জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে যেতো, ভারতে সতী রমণীরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারতো।

মানুষের জীবনে একদিন ধর্মই ছিল সব চেয়ে বড়ো কথা, এখনও কোনও কোনও জাতির মধ্যে বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। কিন্তু আগেকার মত ততটা নেই বলেই মনে হয়। খ্রীষ্টানদের ইতিহাস দেখলে বুঝা যায় যে মধ্য যুগের ইতিহাস ধর্মের জন্য মানুষের রক্তে রঞ্জিত। রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাঙ্গাগড়াও এই ধর্মকে নিয়েই অনেক ক্ষেত্রে চলতো। এখন আর সভ্যদেশসমূহে মানুষ ধর্মের জন্য ক্ষিপ্ত হয় না। এখন আবার ক্ষিপ্ত হবার অন্য নানা কারণ জুটেছে; অর্থাৎ বিরোধ সমভাবেই চল্‌ছে। মানুষের মধ্যে রক্তারক্তির পালা তেমনই বা তার চেয়েও বেশী জোরে চলেছে। তবে মনের কম্পাশ ধর্মের উত্তরমেরু ছেড়ে ঘুরে গিয়েছে। এখন প্রভুত্ব, শক্তি, সাম্য প্রভৃতির কথাই বেশি করে' শুনতে পাওয়া যায়। মানুষ ধর্মের সাধনা ছেড়ে দিয়ে শক্তির সাধনার উপর জোর দিচ্চে বেশি। তার ফলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ঘোরতর সংঘর্ষ বেধে উঠেছে। শান্তির জন্যে সকলেই কামনা করে; কিন্তু মানুষের সেই শান্তি-কামনা বিরোধেই পরিণতি লাভ করছে। অশান্তি তার দুর্গন্ধ উষ্ণশ্বাসে মরুভূমির প্রেতমূর্ত্তি জাগিয়ে তুলেছে। সর্বত্রই হাহাকার পড়ে গিয়েছে। অন্ন নেই, অর্থ নেই, বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই—তথাপি যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি। মানুষের সভ্যতা যে শুধু কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গিয়েছে তা নয়, মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত, ক্ষিপ্ত, উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

অশান্তির দ্বারা শান্তিলাভ হবে, অনর্থের সৃষ্টি করে' অর্থ লাভ হবে, বিনাশের দ্বারা নবজীবন লাভ হবে, বন্ধনের দ্বারা মুক্তি আসবে—এইরূপ অসম্ভাব্য কল্পনা মানুষের মেরুমজ্জায় প্রবেশ করেছে, নয়তো এমনটি কখনও ঘটতে পারতো না। লোকে সন্ত্রস্ত হয়ে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করছে, এতদিনের সভ্যতার কি হলো পরিণাম? বর্বরতার নিম্নতম সীমায় পৌঁছে মানুষ ভাবছে···তবে এত দিন এত শতাব্দী কি বৃথায় গেল? এতদিন ধরে' মানুষ যে ধর্মের সেবা করলো তার ফল কি হলো? অনেকের মনেই এই প্রশ্নের উদয় হচ্চে যে আমরা ইতিহাসের প্রবাহে উলটো গতিতে চলেছি অর্থাৎ কবির কথায় 'অচল বলিয়া উচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।' অনেকে সেই জন্য চক্ষু রক্তবর্ণ করে' বলছেন যে ধর্মই এই দুর্গতির জন্য দায়ী। মানুষ 'ধর্ম ধর্ম' করে' উচ্ছন্ন গেছে। আর ধর্মকে আঁকড়ে ধরে' থাকলে চলবে না। Experiment হিসেবে ধর্মের যথেষ্ট যাচাই হয়ে গেছে···পরীক্ষায় টিকলো না। সুতরাং যতদিন ধর্মকে সমাজ থেকে বিদায় করা না যায়, ততদিন এই সব যুদ্ধ বিগ্রহের বিভীষিকা কিছুতেই দূর হবে না। ধর্ম মানুষের মনে ভয়ের জন্মদান করে' কেবল তাকে অলস, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন করে' রেখেছে। জগৎকে তার প্রকৃত মূল্য দিতে শিখায় নি। মানুষকে মানুষ করতে পারে নি। এই জন্য কোনও কোনও দেশে ধর্মকে নির্বাসিত করা রাষ্ট্রীয় বিধানের অন্তর্গত হয়েছে। যে ধর্মে মানুষকে মানুষের শত্রু করে, যে আধ্যাত্মিকতার আওতায় অন্ন-হীনের অন্ন হয় না, যে ভগবানের রাজত্বে কেবল বিলাসী ও পুরোহিতদের জয়জয়কার, সে ধর্ম বা সে ভগবানের কোনই প্রয়োজন নেই। এইরূপ একটা চিন্তার হাওয়া পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্চে। কেউ প্রকাশ্যভাবে, কেউ বা মনে মনে মানুষের ইতিহাস, মানুষের সভ্যতা, মানুষের ধর্মকে অভিসম্পাত করচে।

সুতরাং কথাটি ভেবে দেখ্‌বার প্রয়োজন আছে। সত্যই কি ধর্ম এই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী? ধর্মই কি আমাদের মানুষ হবার পথে কণ্টক দিয়েছে। এই কথা ধীরভাবে আলোচনা করতে হলে' প্রথমেই প্রধান প্রধান ধর্মগুলি এতকাল কি শিক্ষা দিয়েছে, তা চিন্তা করা প্রয়োজন। ধর্মের আদর্শ যদি হেয় হয়, ধর্ম যদি মানুষের মনকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে না পারে, তবে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ হতেই পারে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রত্যেক ধর্মই তার ভক্তদের কাছে যে আদর্শ উপস্থিত করে, সে আদর্শের কোনও দোষ নেই। প্রধান প্রধান ধর্মগুলির কথাই ধরা যাক্‌। হিন্দুধর্ম কি শিক্ষা দেয়? শিখায়—আত্মবৎ ব্যবহার। কঠোপনিষদে আছে:

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

খ্রীষ্টধর্ম বলেছে 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মতই ভালবাসবে'। কিন্তু তারও অনেক পূর্বে হিন্দুরা বলেছিলেন—সমস্ত প্রাণীকে নিজের সঙ্গে তুলনা করে' দয়া করবে। আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ। হিন্দুধর্ম বলে—সর্বং ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। সকল দ্রব্য ত্যাগ করে' সকলকে দিয়ে ভোগ করতে হয়। কিন্তু কাজের বেলায় কি দেখি? বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি। আমরা অসংখ্য জাতিভেদ করে' নিয়েছি, অসংখ্য দেবতা বানিয়ে নিয়েছি। ব্রাহ্মণ শূদ্রের কলহ, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের কলহ, শাক্ত বৈষ্ণবের কলহ, বৈদিক তান্ত্রিকের কলহ—এইরূপ কত কলহ আছে, তার সংখ্যা কে করবে? এমন কি আমরা দেবতাদের মধ্যেও ভেদবুদ্ধি ঢুকিয়েছি। শূদ্রের দেবতা ব্রাহ্মণের নমস্য নয়, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর পূজায় উচ্চশ্রেণীর যোগদান করা অনুচিত, এমন কত শত ভেদবুদ্ধি আমাদের অন্তর বিষিয়ে তুলেছে।

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণ শূদ্র কিছু নেই, মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই। হিংসার মত পাপ নেই। অহিংসা, সদাচার হচ্ছে সকল মানুষের ধর্ম। কিন্তু কোথায় গেল সে অহিংসা? বৌদ্ধ জাপান তার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য চীনাদের পদদলিত করতে চায়। এবারে আবার তারা হাত বাড়িয়েছে আমাদের দিকে। মানুষের জীবনের কোনও মূল্য এদের কাছে নেই। শক্তির গর্বে এই দুর্মদ জাতি বিশ্বনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এগিয়ে এসেছে।

খ্রীষ্টধর্মের নামে পৃথিবীর কোটী কোটী লোক শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অবনত হয়ে পড়তো। এই খ্রীষ্টধর্ম কি শিক্ষা দিয়ে এসেছে? কিংবা তারও পূর্বে ইহুদীদের ধর্মে কি শিখিয়েছে? শিখিয়েছে যে —সমস্ত মানুষ এক আদম থেকে জন্মেছে, কাজেই আমরা সব ভাই ভাই। ভগবান যখন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি পৃথিবীর চারকোণ হতে একটু একটু মাটী নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন—কেউ যাতে না বলতে পারে যে আদম ছিলেন অমুক দেশের লোক বা অমুক জাতির লোক। খ্রীষ্টানেরা আরও এগিয়ে গেল; তারা শিক্ষা দিল যে ভগবান সকলের পিতা এবং মানুষরা সব ভাই ভাই। কোথায় গেল সেই সৌভ্রাত্র? সে Brotherhood of man নেই, কাজেই Fatherhood এর আদ্যশ্রাদ্ধ হয়ে গেছে। যীশু খ্রীষ্ট প্রচারিত প্রেম ও শান্তি, তাঁরই মতো এখন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে ম্রিয়মান।

ইসলাম ধর্মও শান্তি কামনা করে। ইস্‌লাম শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্চে শান্তি। এই ধর্ম যে ভাবে সাম্যবাদ প্রচার করেছে, এরূপ প্রায় দেখা যায় না। রাজা এবং মুটে, ধনী এবং ভিক্ষুক—এর মধ্যে ইসলাম কোনও পার্থক্য স্বীকার করে না। খ্রীষ্টানদের সৌভ্রাত্র (Brotherhood of man) এই ইস্‌লাম ধর্মে যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়েচে, এমন আর কোথায়ও হয়েচে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এত সাম্যবাদ যেখানে, সেখানে এত বৈষম্য কেন? ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে যে সাম্যবাদ নিবদ্ধ, বাহিরের জগৎ তা থেকে বঞ্চিত হলো কেন?

বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম কথা—'সর্ব জীবে দয়া'—আর সব পরে। জাতিভেদ নেই, ধনী নির্ধন নেই, বড় ছোট নেই। ভগবানের এই প্রেমের সংসারে সব মানুষই সমান। সাম্যবাদের প্রধান শত্রু অহঙ্কার। বৈষ্ণবেরা অহঙ্কার, অভিমানকে আত্মাদরকে পরম অধর্ম বলে' মনে করেন। এঁদের বিনয়, নম্রতা, দৈন্য চিরপ্রসিদ্ধ।

পরোপকার বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র।

হইল ভারতভূমে মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করে করি পরোপকার॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

এই মূলমন্ত্র নিয়ে শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন সংসার মরুস্থানে প্রেমের ফুল ফোটাতে। কিন্তু সেবার অভাবে, দয়ার অনুশীলনের অভাবে সে ফুল শোলার ফুল হয়ে রয়েছে। শোভা আছে, গন্ধ নেই, সজীবতা নেই। প্রেমকে দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে যাঁরা পূজা করলেন, তাঁরা জগতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করতে পারলেন কই?

জৈনেরা অহিংসার প্রচারক। সর্বপ্রকার জীবহত্যা বর্জন করে' এঁরা এই তামসিক জগতে সাত্ত্বিকতার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন। জৈনেরা পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ালেন, ছারপোকার পক্ষে মানুষের রক্ত সুলভ করে' তুললেন। কিন্তু মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ত ঘুচাতে পারলেন না! নিজেরা ধনসঞ্চয় করলেন প্রচুর, কিন্তু তার ফলে যে বহু লোক নিরন্ন হয়ে পড়লো, তার কোনও প্রতীকার তাঁরা করে উঠতে পারলেন না।

যিনি যে ধর্মের উপাসক, তাঁর কাছে সে ধর্ম সত্য, চরম সত্য—সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? আমি হিন্দু, শত শত শতাব্দী ধরে' বটগাছের মত এই হিন্দুধর্ম তার শিকড় বিস্তার করে' সমাজকে বন্ধন করে' রেখেচে, আমার কাছে এই ধর্মের অপেক্ষা বড় সত্য কিছু নেই। সেইরূপ বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সকলেই নিজ নিজ ধর্মের গৌরব করেন এবং সকলেই নিজ ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। কিন্তু তাতে লাভ হলো কি?

পূর্ব্বেই বলেছি, মানবের সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা প্রধান স্তম্ভ 'ধর্ম'। আমরা দেখেছি যে সমস্ত ধর্মেই সুশিক্ষাই দেয়, কুশিক্ষা দেয় না। সমস্ত ধর্মের আদর্শই সাম্য, পবিত্রতা, উদারতা, অহিংসা। অথচ কাজের বেলায় সব অন্যরূপ অর্থাৎ উল্টা বুঝিলি রাম। ধর্ম যেখানে শিক্ষা দেয় অহিংসা, প্রেম, দয়া—মানুষ সেখানে দ্বেষ লোভ অভিমানের মন্দিরে নিত্য পূজা দিচ্ছে। পুরাতন বিশ্ব-শৃঙ্খলায় সাম্য আনতে পারে নি, শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার পরিমাণ কমাতে পারে নি। ধর্মের শিক্ষা ফলোপধায়িনী হলে যুদ্ধবিগ্রহ অসম্ভব হওয়া উচিত ছিল।

মানুষকে আবার নতুন করে' চিন্তা করতে হবে—অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথ থেকে কি করে' পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অনেকের মত এই যে—পৃথিবী থেকে যতদিন বৈষম্য দূর না হবে, ততদিন মানুষের শান্তি নেই। ততদিন মানুষ মারামারি কাটাকাটি করবেই। অতএব যেরূপেই হোক মানুষের মধ্য থেকে বৈষম্য দূর করে' সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তবেই হবে শান্তি। এ মত কতদূর সত্য তা বলা যায় না, তা বলা নিরাপদও নয়। তবে মানুষে মানুষে যে ভেদবুদ্ধি—তাকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে না আনতে পারলে যে শান্তি স্থাপিত হতে পারবে না, এ একরকম নিশ্চয় করেই বলা যায়।

মানুষের বৈষম্য দুই প্রকার: এক প্রকার স্বাভাবিক, আর এক প্রকার কৃত্রিম। মানুষ যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, আর্য অনার্য প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি ঘটিয়েছে এ সব কৃত্রিম অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করেছে। ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা—এ সব সম্বন্ধও মানুষ ইচ্ছা করে' প্রবর্তন করেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ সকল ভেদবুদ্ধি তুলে দিলেও এমন কতকগুলি পার্থক্য থাকে—যা অপসারণ করা যায় না, যথা সবল দুর্বল, নর নারী, বুদ্ধিমান নির্বোধ—এ সকল বৈষম্য স্বভাবজাত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে অপ্রাকৃত আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু অপ্রাকৃত কথাটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কৃত্রিম বা ইচ্ছাকৃত বললেই সঙ্গত হয়।

এই সব কৃত্রিম বৈষম্য দূর করবার জন্য ফরাসী বিদ্রোহে যে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল, তা সকলেই জানেন। ফরাসী দেশের সাধারণ লোক যখন দেখ্‌লে যে তাদের রক্ত শোষণ করে' ধনী ও রাজশক্তি ভোগৈশ্বর্য ও বিলাসের পরাকাষ্ঠা করছেন, তখনই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে রাজশক্তিকে ধ্বংস করলে এবং তার পর যখন দেখলে যে রাজশক্তির প্রধান স্তম্ভ হচ্চে ধনিকেরা, বড়লোকেরা—তখন তাদেরও নির্মূল করবার জন্যে গণতন্ত্র বদ্ধ-পরিকর হলো। এই সকল লোকের ধারণা যে একমাত্র ধ্বংসের দ্বারা (large scale destruction) সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। রাশিয়াও ১৯১৭ সালে সেই প্রথা অবলম্বন করেছিল। ধ্বংসের দ্বারা সমস্ত বৈষম্য দূর করে' সাম্য স্থাপন করাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ধ্বংসই গঠনের একমাত্র উপায় হতে পারে না। হাতের পাঁচটি আঙুল অসমান দেখে যদি কেউ চারিটি আঙুলের কতকাংশ কেটে ছোটটির সমান করে' দিতে চায়, তা হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হলো তা নয়। কিন্তু রাশিয়ায় যে রক্তের বন্যা বয়েছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবে তাতে সমস্ত জগৎ শিউরে উঠেছিল। সামাজিক সাম্য স্থাপনের মন্ত্র নিয়ে যারা বিদ্রোহ করলে, তাদের নাম হলো বলশেভিক। কারণ সংখ্যায় তারাই জিতে গেল। বলশেভিক কথাটির অর্থও তাই। এই বলশেভিক বিদ্রোহে রাশিয়ার জার, বড় লোক, ধনিক ত গেলই—কিন্তু তাতেও সকল সমস্যার সমাধান হলো না। কৃষক—যারা জমি চাষবাস করতো, তাদের সঙ্গেও লেগে গেল বিরোধ। এই বিরোধের উদ্দেশ্য যে, কেউ যে জমির অধিকারী থাকবে, তা হবে না। কারণ তা হলেই ত বৈষম্যের বীজ রয়ে গেল। এই আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের ফলে রাশিয়ায় কৃষক সম্প্রদায় প্রায় নির্মূল হলো। লেনিন্ বললেন—জমি থাকবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি, সবাই মিলেমিশে চাস করবে। ষ্টেট তার উপসত্ব গ্রহণ করবেন এবং যার যেমন দরকার সেই ভাবে তার অভাব মোচন করবে মাত্র।

ধর্ম থাক্‌লেই তার আওতায় নানা বৈষম্যের গুল্ম গজিয়ে ওঠে, মানুষের সহজাত সাম্য-বুদ্ধি বাধা-প্রাপ্ত হয়, কাজেই ধর্মে প্রয়োজন নেই—গির্জ্জা ভেঙ্গে ফেলো, পাদরীর দলকে নির্মূল করো—মোটামুটি রাশিয়ান সাম্যবাদের প্রকৃতি হলো এই। বলা বাহুল্য এরূপভাবে কোনও সমাজ বা রাজ্য চলতে পারে না। রাশিয়া আমাদের মতই কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু কেবল কৃষির দ্বারা কোনও জাতির ভরণপোষণ হয়ত চলতে পারে, অর্থাগম হয় না। তখন লেনিন তাঁর মতবাদ কিছু পরিবর্ত্তিত করলেন এবং নানা কলকারখানার পত্তনে সম্মতি

দিলেন। তখন জার্মাণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে কারিগর ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি আনিয়ে সব ব্যবস্থা করা হলো। ষ্টালিন্ এই বলশেভিক মতবাদকে আরও সময়োপযোগী বা মানান্‌সই করে' নিয়েছেন। কাজেই লেনিনের সরল সাম্যবাদের ন্যায়-মূলক ভিত্তি (logical foundation) কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছে বলে' মনে হয়।

কিন্তু এই সাম্যবাদ অল্পবিস্তর অন্য দেশে প্রবেশ করলেও অন্য সভ্য দেশ রাশিয়ার মতো এতটা এগিয়ে যেতে পারে নি। বর্ত্তমান জগতে কলকারখানার অভাবনীয় প্রসার হওয়াতে শ্রমিকেরাই হয়েছে বেশী প্রতিপত্তিশালী। পুরাতন জগতের ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার বিধিমত চেষ্টা থাকলেও এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এই শ্রমিক জগতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যক হয়েচে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা নূতন ভাবে দেখা দিচ্ছে। আগেকার বিধিবিধান ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ছে। কার্ল মার্ক্সের লেখায় এই দিকে বেশী করে' লোকের চেতনা জাগ্রত হয়েচে। কার্ল মার্ক্স ছিলেন জার্মাণ—সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি ইংলণ্ডে বসে স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত লিখেছেন। তাঁর লেখা শ্রমিকদের ও সাম্যবাদীদের হলো বেদ বা বাইবেল। কলকারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা দিন দিন যেরূপ বেড়ে চলেছে, তাতে সমস্ত দেশের অর্থনীতির পুরাতন সংস্কার টলমল করে' উঠেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এমন কোনও সমাজতন্ত্র ভবিষ্যতে হওয়া চাই, যাতে লোক অনাহারে থাকবে না। ক্ষুধার জ্বালাই সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। যত ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা সমাজে বাড়বে, ততই সে সমাজ বা রাজ্য বিপন্ন হবে। কারণ সমাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্র যদি এদিকে দৃষ্টি না দেয়, তবে ক্ষুধিতের দল নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করবার জন্য প্রস্তুত হবে। তার শক্তিকে তখন রোধ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এ নিশ্চিত। সুতরাং সমাজতন্ত্রকে নূতন করে' গড়তে হবে, নইলে সমাজ টিকবে না। আপাততঃ সমাজ সমীবৃক্ষের মত নিস্তব্ধ থাকলেও এর গর্ভে যে অগ্নি আছে, তার প্রজ্বলনে একদিন জগতে খাণ্ডবদাহনের পুনরায় অভিনয় হতে পারে।

আমাদের অবস্থা হয়েচে পার্সিউসের মতো—তিনি এক টুপী পরতেন যাতে রাক্ষসেরা তাঁকে দেখতে পেতো না। উপমাটি এক্ষেত্রে একটু উলটে নিতে হবে; আমরা রাক্ষসের মাথায় টুপী পরিয়েছি, তাকে সেইজন্য দেখেও আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু বস্তুতঃ যাঁরা এইরূপ অজ্ঞতাবিলাসী, তাঁদের কাছে জগতের ঘাত প্রতিঘাতের কোনই সাড়া নেই। জার্মাণীর সঙ্গে ইংরেজের কলহ কি? রাশিয়ার উপর জার্মাণীর এত রাগ কিসের? হিটলারের new order এর মানে কি? জাপান হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল কেন? এ সমস্ত প্রশ্নই আমাদের কাছে দুরবগাহ। বিশ্বমানবের চিত্ত-বৃত্তির নাড়ী টিপে তবে এই ব্যাধির নিদান পাওয়া যেতে পারে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে আধুনিক জগতের চিন্তাধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে বৈষম্যের বিষাক্ত বাতাসে মানুষের চিত্তবৃত্তি চঞ্চল করে তুলেছে। আগে বৈষম্য এতটা আত্মপ্রকাশ করে নি, করলেও লোকে অদৃষ্টের উপর, কর্মফলের উপর, ভগবানের উপর ভার দিয়ে সকল দুঃখ সহ্য করতো। কিন্তু ক্রমেই মানুষের মন আত্মশক্তির সন্ধান পেলো। লোক বুঝতে শিখলো—সর্বম্ পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখং। মুনি ঋষিদের অর্থে নয়, নূতন জগতের দেওয়া অর্থে। এ আত্মা পঞ্চভূতের বা বারোভূতের সমষ্টি আত্মা। আমি অসহায়, অক্ষম হতে পারি, কিন্তু পঞ্চভূত অর্থাৎ গণশক্তি তুচ্ছ করতে কেউ পারে না। ফরাসী-বিদ্রোহ গণশক্তিরূপ সুপ্ত সিংহকে প্রথম জাগিয়ে দিলে এবং সে নিজের মূর্ত্তি দেখে নিজেই চমকিত হলো। তার পর থেকে সর্বত্র এই গণশক্তির লীলাখেলাই জগতে চলছে। একটি প্রদীপকে ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সেই প্রদীপ যখন চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তখন তাকে নিভানো দায়।

গণশক্তি আপাততঃ বৈষম্যকে লক্ষ্য করেই সজাগ হয়ে উঠছে। যে সকল বৈষম্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক··· মানুষ ইচ্ছা করলেই দূর করতে পারে, তা না করে' চুপ করে' বসে থাকলে একদিন হঠাৎ দেখতে হবে যে আমাদের আহাম্মকের স্বর্গ ভেঙ্গে পড়ছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ বিশ্বশৃঙ্খলায় মানুষের সৃষ্ট বৈষম্যগুলিকে বিদায় করতেই হবে এবং তা করতে হলে আমাদের সংস্কারের পরিবর্তন করতে হবে, পুরাতন সংস্কারের জীর্ণ ভবন পরিত্যাগ করে নূতন আদর্শের বাসভবন গড়তে হবে।

ধর্ম সম্বন্ধেও নূতন করে চিন্তা করতে হবে। কারণ একথা ঠিক যে ধর্ম না হলে সমাজবন্ধন স্থায়ী হতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব প্রথম থেকেই এবং বরাবর সে সামাজিক জীব থাকবে। তা যদি হয় তবে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনও নূতন গঠন হতে পারবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের সে ধর্ম্ম কিরূপ হবে, তা বলা কঠিন। আবার ভগবান এই নূতন ধর্ম সংস্থাপন করতে অবতীর্ণ হবেন কি না, তা কেউ জানে না। তবে নব কলেবরে মানবধর্ম যে অনেকটা সংস্কার মুক্ত হয়ে উঠবে, তার সন্দেহ নেই। প্রত্যেক ধর্মে দুইটি দিক আছে, একটি বাহ্য অনুষ্ঠান, আর একটি আত্ম-সমর্পণ। বাহ্য অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবস্থিত হয়েছে। আত্মসমর্পণ প্রায় সকল ধর্মেই একরূপ। সসীম মানব চিরদিন অনন্ত শক্তিমান ভগবানের অনন্ত দয়ার উপর

নির্ভর করতে বাধ্য হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি···যা পুরোহিত ধর্মযাজক বা প্রচারকদের দ্বারা আদিষ্ট হয়েচে···তা কতদূর থাকবে তা বলা যায় না। সমস্ত দিকে মানুষ যখন বৈষম্য হতে মুক্ত হয়ে একটি বিরাট সমতল ক্ষেত্রে এসে মিলিত হবে, তখন তাদের মন্দির, গির্জা, আখড়া, মসজিদ প্রভৃতি কি ভাবে টিকে থাকবে তা বলা কঠিন। এইমাত্র বলা যেতে পারে—যখন মানুষে মানুষে ভেদ বুদ্ধি থাকবে না, তখন যা কিছু ব্যবধান সৃষ্টি করে' মাঝে এসে দাঁড়াবে, তাই নূতন বিশ্বশৃঙ্খলার অনুযায়ী করে' বদলে নিতে হবে। থাকবে শুধু তাই—যা সমগ্র বিশ্বমানবকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করে দেবে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে এক অখণ্ড, অবাধ, অমোঘ সাম্যের সৌভ্রাত্রের, প্রেমের সম্বন্ধ গণশক্তির মুদ্রাঙ্কিত করে দেবে।

শোক-শেল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বিবাহের পরদিন তুলেছিলে ফটো দুইজনে
আশার উষার স্বপ্নে ঢুলু ঢুলু চারিটি নয়নে
চেয়ে আছ, ঝুলিতেছে ফোটোখানি দেওয়ালের গায়
যত বার চাহিয়াছি তার পানে সকাল সন্ধ্যায়
ঢালিয়াছে তৃপ্তিরস তুষ্টিসুধা এ দগ্ধ অন্তরে
আজি ওর প্রতিবিম্ব মোর অশ্রু সলিলে সন্তরে,
শেল হয়ে বিঁধে বক্ষ শূল হ'য়ে বিঁধে এ নয়ন
ভাবি শুধু ক'দিনের স্বপ্নময় ও মধুমিলন।
কি করিব ? রাখিব কি ও ফটোরে দৃষ্টির বাহিরে ?
মন হ'তে মুছে ফেলি কি করিয়া ওই ছবিটিরে,
হিয়ার যে অঙ্গীভূত। যেথা আছে সেথা উহা থাক
যা হেরিয়া আজি প্রাণ বেদনায় হ'য়ে যায় খাক,
কালি তা সান্ত্বনা দিবে। যা হেরিয়া জীবন সফল
করিয়াছি এতদিন, তাই মোর হইবে সম্বল।

কালিও হিংসার পাত্র এ সমাজে ছিলাম সবার,
আজিকে কৃপার পাত্র, নয়নে বহিয়া কৃপাভার।
সবে চাহে মোর পানে, পথের কাঙালও দীনতর
নহে মোর চেয়ে আজি, সেও আজি মোর চেয়ে বড়,
চিরবৈরী যেইজন সেও আজি টেনে লয় কোলে
পথের পথিক আজি আহা ব'লে দূরে যায় চ'লে।

ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দিয়া নিরাশ্রয়ে বিতরি' আশ্রয়
রোগীরে ঔষধ দিয়া পথ্য দিয়া, দিয়া অনাময়,
নিরাশেরে আশা দিয়া নিরুৎসাহে বিতরি উৎসাহ,
মানুষ জানায় কৃপা জুড়ায় সে করুণার দাহ।
আমারে কি দিবে লোকে ? কী বা দিবে এ শূন্য ঝুলিতে
আমার ত চাহিবার কিছু নাই, এ শোক ভুলিতে।
হয়েছি কৃপার পাত্র, শূন্য পাত্র ভরিতে আমার
অশ্রু ছাড়া কিছু নাই, কিছু নাই দিবার নিবার।
নিরাশ্রয় অভাগারে কৃপা, তাও অবলম্বহারা
কৃপাপ্রকাশের আর কিছু নাই 'আহা' বলা ছাড়া।

ক্লান্ত দেহে নিশাকালে সুপ্তি ঘোরে রই অভিভূত
প্রত্যেক প্রভাতে পুন তব শোক হয় নবীভূত,
নিশীথে সুস্বপ্ন দেখি—হেসে হেসে কহিতেছ কথা
প্রভাত নূতন করি হরি' তোমা প্রাণে দেয় ব্যথা।
মহাশোকও ক্লান্ত হয়ে ঢুলে পড়ে গভীর নিশীথে
বিশ্রাম লভিয়া জাগে নব বলে হৃদয় দহিতে।
দৃষ্টি অন্তরালে থাকে গৃহভরা যেই চিহ্নগুলি
প্রভাত জাগায় সবি পুন তারা তুলে যে আকুলি'।
আঁধার লুকায় যাহা, আলোক প্রকাশ করে তায়,
চন্দ্রমা লুকায় রাত্রে, রবি প্রাতে আবার জাগায়।
হ'তে হবে তুমি-হারা এ বিশ্বের পুন সম্মুখীন
জীবধর্ম পালনের আয়োজন পুন সারা দিন
করিতে হইবে হায়—পুন তার হবে প্রয়োজন।
সহস্রের কৃপাদৃষ্টি—হয়ে তপ্ত সহস্রকিরণ
আবার দহিবে মোরে, এ চিন্তায় বেড়ে যায় দাহ
তেয়াগিতে শয্যা বন্ধু আর বৎস হয় না উৎসাহ।
জেগে দেখি ঝলমল করে অশ্রু তৃণপত্র গায়ে,
আর্ত্তনাদ শুনি পুন এ প্রভাতে কুলায়ে কুলায়ে।

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

(১৯)

বৈঠকখানায় ঘরজোড়া ফরাস পাতা। সেকালের আমলের দু-একটা ভাল দামী জিনিস যা আছে রত্নময়ী বাহির করিয়াছেল। পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ী চাহিয়া চিন্তিয়া দুখানা মখমলের আসন। একটা রূপার পানের ডিবা, গোটা কতক তাকিয়াও পাওয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ক্ষীরের চন্দ্রপুলি, নারিকেল সন্দেশ, ছানার বরফি—তাহাও তৈয়ারী হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে মেয়ে দেখিতে আসিলে কৌতূহলী পাড়ার মেয়েরা ভিড় করিয়া আসে। পাশের ঘরে তাহারা নানারূপ টিকাটিপ্পনি সমেত মন্তব্য করিতেছে। মালতী আজ সকাল সকাল আসিয়াছে। সে আসিয়া নীহারকে সাজাইয়াছিল। খোলা চুলের একদিকে নীল ফিতা বাঁধিয়াছে। বিনয়ের আনা সেই নীল শাড়িখানা আজকালকার ধরণে সুশ্রী করিয়া পরাইয়াছে। চার পাঁচ বাড়ী হইতে ধার করিয়া আনা ভারি ভারি গয়নার স্তূপ হইতে মোটে দুগাছি করিয়া চুড়ি আর একটি আংটি পরাইয়াছে। গলায় নিজের সরু চেন হারটি খুলিয়া পরাইয়াছে। পায়ে আলতা দিয়া সে ভাবিতেছিল, মাথায় অন্তত একটা গোলাপ ফুল দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এতগুলি অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ চক্ষুর সম্মুখে মাথায় ফুল পরানো যে একটা উৎকট রসিকতার মতই দেখাইবে তাহা বুঝিয়া সে চেষ্টা করে নাই। তা ছাড়া, ফুল পাওয়াই বা যাইবে কেমন করিয়া। এখানে খোঁজ করিলে দু-দশ ভরি মরা সোনার গহনা, জবড়জঙ্গ ভারি বেনারসি শাড়ি মিলিতে পারে। লেশ এবং ফিতার প্রত্যক্ষ প্রলাপ সমেত জরি দেওয়া মখমলের জামাও হয়তো পাওয়া যায়। চন্দ্রপুলির ছাঁচ, মোচার কাঁদি—সেও পাওয়া যায়। কিন্তু ফুল! সে বস্তু পাওয়া অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব। এখানে বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনযাত্রার সকল পথ এবং সকল প্রণালী আগাগোড়া নিরেট করিয়া গাঁথা। ফাঁকির চাষ একেবারেই নাই।

তাহার সাজানোর খুঁত ধরিয়া ইতিমধ্যে রায়-গৃহিণী মন্তব্য পেশ করিয়াছেন—ও মা, এ আবার কেমন কনে সাজান গা! পায়ে দু'গাছা মল নেই, হাত দু'খানা খালি ঢন ঢন করছে। বেশ একটি বেনারসি শাড়ি পরিয়ে, মোটা তাবিজ আর অমৃতি-পাকের মল কগাছা পরিয়ে দিলে কেমন মানাত!

নরুর মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আজকাল ঐরকমই বিবিয়ানা ঢং উঠেছে ঠাকুরঝি। আজকালকার মেয়েরা ঐ রকম করেই সাজে। তুমি আমি সেকেলে মানুষ কি বুঝি!

ইতিমধ্যে বহির্দ্বারে একজোড়া গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল। বরপক্ষের লোকেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কৌতূহলী মেয়ের দল, যাহারা এতক্ষণ কাপড় গয়নার নিকট বসিয়া নানারূপ সমালোচনা করিতেছিল, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। আড়াল হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতে ছাড়িল না। তখন ঘরে কেহ আর ছিল না। কেবল নীহার চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আর মালতী তাহার সাজসজ্জার আর যেটুকু বাকী ছিল শেষ করিয়া দিতেছিল। বিনয় যাইতে যাইতে সেই ঘরের দুয়ারের কাছে একবার দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, বা-রে নীহার, তোকে তো খাসা মানিয়েছে!

নীহার তাহার সলজ্জ হাসিমুখ তুলিয়া বলিল, যাও!

মালতীর সহিতও বিনয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল। বিনয় সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুমি বুঝি সাজিয়ে দিয়েছ। বাঃ ভারি চমৎকার হয়েছে। ভাগ্যে হারুর মা কিংবা নিস্তার পিসীর হাতে বেচারা নীহার পড়ে নি। কাল যে বইটা এনেছিলুম, সেটা বেশ ভালো লেগেছে তো?

মালতীর কেমন লজ্জা করিতেছিল জবাব দিতে। তাহার সঙ্গে একটা মধুর আনন্দ। মাথা নীচু করিয়া কোনক্রমে বলিল, হ্যাঁ, কাল অনেক রাত্রি অবধি জেগে বইটা শেষ করে ফেলেচি। খুব ভালো লেগেছে।

বিনয়ের আর দাঁড়াইবার অবসর ছিল না। বাইরে বরপক্ষীয়েরা আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য সমাদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে। সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গরুর গাড়ীর গরু দুইটাকে তখন খুলিয়া দেওয়া

হইয়াছে। দুইজন ভদ্রলোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন। একজনের কালো রং; পুরু ঠোঁটে অত্যধিক পান খাওয়ার ছোপ তেল চবচবে সিঁথি। গায়ে একটা রঙীন শার্টের উপর চায়না কোট। তিনি পাত্রের বড়দাদা। আর একজন বরের বন্ধু। পাত্রের দাদাকে দেখিয়া বিনয়ের মন বিগড়াইয়া গেল। সারা মুখে এমন একটা স্থূল নির্ব্বুদ্ধিতার ছাপ। ইহাকে দেখিয়াই যদি ইহার ভাইয়ের বিষয়ে ধারণা করিতে হয় তাহা হইলেই তো হইয়াছে! মনের ভাব যাই হউক তাঁহাদের ভদ্রতা করিয়া সে বৈঠকখানায় বসাইল।

পাত্রের দাদা বিশ্বরঞ্জনবাবু ঠোঁট দু'টার একপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—কি রাস্তা মোশায় আপনাদের ছাশের! সেই বেলা দশটাতে মুখে দু'টি দিয়েই গো-গাড়ীতে উঠেছি। এসে পৌছাতে বেলা কাবার হয়ে গেল। এক কল্কে তামুক খাওয়াতে পারেন মোশায়? হেঁ হেঁ, না ওসব পাট নেই এখেনে?

বিনয় চাকরকে তামাক সাজিতে বলিয়া তাঁহাদের জল খাওয়ানো প্রভৃতি অতিথি-পরিচর্য্যার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিল। কিন্তু মনটা তাহার একমুহূর্ত্তেই বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। কোন কাজে তেমন উৎসাহ আর খুঁজিয়া পাইল না।

মেয়েরা আড়াল হইতে নানারকম সমালোচনা, আলোচনা এবং মন্তব্য করিতে লাগিল। তাহাদের মুখর রসনার একটুও বিরাম রহিল না।

সরলা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, বরের দাদা যেমন, দেখে মনে হয় বরের বর্ণও বোধ হয় আবলুস কাঠের মত কালো হবে। নয় লো?

বিমলা বলিল, মাগো, আর কথাবার্ত্তার ছিরি কেমন কেমন দেখেচো। একেবারে চাষাড়ে! লেখাপড়া জানে না বোধ হয়।

হারুর মা বলিলেন, আর নেকাপড়া? বোধ হয় পাশ টাশ কিছুই নয়। একটা পাশ হ'লেও কি আর অমনি হেঁদ্রো কথা হয়।

ক্ষান্ত পিসী কহিলেন, তা বাছা, যেমন টাকা ঢালবে, তেমনই তো পাত্র পাবে। এখনই ফেল তিন-চার হাজার টাকা, তিনটে পাশ ছেলে পাবে। কিন্তু টাকা পাবে কোথা? সবই তো জানি। সওয়ারী হঠ্ করে গেল মারা। বিনয় এই সবে একটু চাকরিতে ঢুকেছে। যেন-তেন-প্রকারেণ বোনকে পার করতে পারলে বাঁচে। কথায় বলে, ফেল কড়ি, মাখ তেল। কড়ি নাই তো আর কি হবে।

রত্নময়ী এখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানে সকলেরই আলোচনার স্রোত খরতর বহিতেছিল। এখন তিনি কি একটা কাজে এই ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সবাই চুপ হইয়া গেল।

ক্ষান্তপিসী চোখ দুইটা যথাসম্ভব সজল করিয়া করুণ সুরে বলিলেন, আহা তা হোক বৌমা, ভগবানের কৃপায় এখন মেয়ে পছন্দ হয়ে দু'হাত ভালোয় ভালোয় এক হয়ে গেলে যে বাঁচি। বলে শুভকাজে অনেক ভাঙ্‌চি। এখানে যদি হয়, মেয়ে রাজার হালে থাকবে। খাওয়া পরার দুঃখ কখনো জানবে না।

রত্নময়ী সবিনয়ে কহিলেন, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে তাই হোক। আমিও ভাবনা চিন্তার হাত থেকে খালাস পাই। আচ্ছা পিসী, পাঁচটা তিরিশ মিনিট পর্য্যন্ত তো বারবেলা। তারপরেই তা হলে মেয়ে দেখাবার বন্দোবস্ত হোক। এর আগে ভালো সময় নেই আর।

২০

বিনয় যখন দ্রুতপদে দুই সখীর নিকট হইতে বহির্বাটিতে চলিয়া গেল অতিথিদের আপ্যায়ন করিবার জন্য, তখন মালতীর মনটি আকাশের স্বর্ণগোধূলির মতই এক নিমেষে রাঙিয়া উঠিল। চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের মাঝে একটি আলোক রেখার মত তাহার মন জ্বলিয়া উঠিল। নীহারের মনটাও উচ্চ সপ্তকে বাঁধা ছিল। তাহার জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে আশায়, স্বপ্নে, কল্পনায় সারা মন তাহার দুলিতে লাগিল। ঘরে সেকালের আমলের একটা বড় পুরাতন আয়না টাঙ্গানো ছিল। সেই দিকে চাহিয়া আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে সুন্দর। নীলবসনা ক্ষীণ কটি, তন্বী, সুবেশা যে মেয়েটির প্রতিকৃতি ঐ আয়নায় পড়িয়াছে সে কি সে নিজে, না আর কেউ? অল্পক্ষণ পরেই আবার বিনয় ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নীহার আমার সঙ্গে আয়।

উঠিতে নীহারের পা কাঁপিতেছিল। শঙ্কিত পদক্ষেপে সে দাদার সহিত বৈঠকখানায় ঢুকিল। মালতীও

কৌতূহলী হইয়া পাশের যে ঘরে মেয়েরা জটলা করিতেছিল সেই ঘরে গেল। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

নীহার চোখ তুলিয়া চায় নাই, চাহিলে বোধ করি তার স্বপ্নভঙ্গ হইত। নতমুখে বসিয়াছিল। বরের সেই বন্ধুটি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, কি পড়েন? হাতের লেখা কেমন? পশমের টিয়াপাখী বুনিতে জানেন কি না? মেয়েকে একবার হাঁটাইয়া দেখান হইল তাহার চলনভঙ্গী কেমন এবং সে খোঁড়া কি-না। চুল বাঁধা ছিল এবং রঙীণ কাপড় পরাণো ছিল বলিয়া আর একবার সাদা কাপড় পরিয়া এবং চুল খুলিয়া দেখান হইল। তাহার পর জলযোগান্তে পাত্রের দাদা রায় দিলেন, মেয়ে পছন্দ হইয়াছে। মেয়েরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যে যে বাড়ী হইতে গয়না কাপড় আসিয়াছিল তাঁহারা ফর্দ্দ মিলাইয়া জিনিসপত্র গোছাতে তৎপর হইলেন। মালতীরও আর থাকা চলে না। তাই সেও বাড়ী আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

আসিবার সময় ঠাট্টা করিয়া নীহারকে বলিল—কেমন, আমি বলিনি, তোকে দেখে বুঝি আবার কেউ অপছন্দ ক'রে ফিরে যেতে পারে! এবারে ভোজ খেতে কবে আসব বল?

নীহার কোন জবাব দিল না। এখন হইতেই একটা অনির্দ্দেশ্য করুণতায় তাহার মনটি বিষাদভারাক্রা হইয়া পড়িয়াছে।

২১

বরপক্ষের লোকেরা চলিয়া গেছেন। অতুল আর বিনয় দুই ভাই পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে, রত্নময়ী ছেলেদের খাবার কাছে বসিয়া আছেন। আজ খাওয়ার কিছু বিশেষ রকম আয়োজন হইয়াছে। অতুলের মহা স্ফূর্ত্তি। গত একবছর হইতে পড়াশোনার বালাই না থাকাতে এবং স্কুল যাইবার উপদ্রব ঘুচিয়া যাওয়াতে সে মহোৎসাহে খাদ্যচর্চ্চা এবং পাড়া-গাঁয়ের নিষ্কর্ম্মা ছেলেদের আনুষঙ্গিক আরও যে সব চর্চ্চা তাহা পুরামাত্রায় করিয়া চলিয়াছিল। মাছের মুড়োটা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে বলিল, ইঃ মজুমদার পুকুরের মাছ না হয়ে যায় না। শালারা রেতের বেলায় মজুমদারদের লুকিয়ে ধরে, আর সকালে বিক্রি করে। সব বেটা শালাদের আমি চিনি। বিনয় অন্যমনস্ক হইয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবিতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিল—অতুল! বড়দাদা আর মা সামনে বসে আছেন, তাঁদের সামনে কি তুই এমনই ভাষাতেই কথা বলিস?

অতুল কোন জবাব না দিয়া নিরাপত্তিভরে মাছের মুড়া চিবাইতে লাগিল। রত্নময়ী সখেদে বলিলেন, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, এইবারে ওর একটা হিল্লে কর্ বাবা। হয় সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যা, নয়তো এখানেই একটা কিছু ব্যবস্থা কর্।

বিনয় বলিল, আমি কালই ওকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসব। পড়ার যা খরচ মাসে মাসে পাঠাব।

অতুল মুখের একপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিল, কালই ভর্ত্তি করে দিয়ে আসব বললেই হ'ল কি-না। আমি আর পড়লে তো। ঐ আমার সঙ্গে যত সব বোকা গাধা ছেলেরা পড়ত, তারা শুদ্ধ ক্লাসে উঠে গেছে আর আমি পড়ে রয়েছি, আমার লজ্জা করে না? কেন, আমাকে স্কুলের নাম কাটিয়েছিলে, টাকা বাঁচাতে চেয়েছিলে তাই টাকা বাঁচাও। আমি আর ওমুখো হচ্ছিনে!

খাইতে খাইতে ভাতের গ্রাস বিনয়ের গলায় আটকাইয়া যাইতেছিল। সত্যই তো অতুলের অভিযোগ যে মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য। তাহাকে উচ্চশিক্ষার সুবিধা দিতে পরিবারের সকলকে বঞ্চিত করিতে হইয়াছে। মায়ের গায়ের গয়না নাই। বোনকে ভালো জায়গায় বিবাহ দিবার সংস্থান গিয়াছে, ছোট ভাইকে পড়া ছাড়ানো হইয়াছে। সেই বিনয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিগ্রী এত চরম দুঃখের মূল্যে সে কিনিয়াছে তাহা কি কাজে লাগিয়াছে তাহার? পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি। ম্যানেজার স্পষ্টই বলিলেন, একজন থার্ড ক্লাশ বা সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলে যতটুকু ইংরেজী জানে ততটুকু জানিলেই হইবে। তার বেশি প্রয়োজন নাই।

মুখে সে কোন ক্রমে বলিল—আচ্ছা, এখানকার স্কুলে যদি পড়তে না চাস আমি না হয় সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যাব। তারপরে একরকম করে চলে যাবে।

রত্নময়ী পরম হৃষ্ট হইয়া সায় দিলেন। অতুল গোঁজমুখে উঠিয়া গেল। তখন বিনয় আস্তে আস্তে কথা পাড়িল। বলিল—মা, আমার ইচ্ছা নয় যে নীহারের ওখানে সম্বন্ধ হয়। ও ধরণের অশিক্ষিত পরিবার আর ঐ পাত্র আমার পছন্দ নয়।

রত্নময়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। বলিলেন, কিন্তু

জানিস মেয়ের বয়স কত হ'ল? লোকের কাছে যতই চেপে রাখি, এই ফাগুনে সতেরোয় পা দিলে যে! ঘরে-বাইরে আমার মুখ দেখাবার জো নাই। ভয়ে আর লজ্জায় ভাবনায় কাঠ হয়ে রয়েছি। না না, তুই অমত করিস নে। কেন, পাত্র মন্দ কি হ'ল? খাওয়া-পরার মোটামুটি কষ্ট নেই। কেন তুই নিজেই তো বলিস, আজকাল লেখাপড়ায় আছে কি? না না বিনয়, তুই অমত করিস নে। তাছাড়া ওরা নগদ পণ নেবে না বলেছে। সবশুদ্ধ মোটে চার-পাঁচ শো টাকা যোগাড় করতে পারলেই কোনরকম করে দায় উদ্ধার হয়ে যাবে। আমার গোট্ ছড়াটা এখনও বাকী আছে, ভাঙ্গিয়ে দু-চারখানা হাল্কা কনে-গয়না গড়াতে দোব।

বিনয় মাকে ঠিক বুঝাইতে পারে না যে, চাকরির জন্যও নয় কিংবা খাওয়া-পরার অভাবের জন্যও নয়, ঐ অশিক্ষিত পরিবারের একটা স্থূল বর্ব্বরতার ছাপ কথায় বার্ত্তায় হাবে ভাবে এমন করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল বরের দাদার মধ্যে যে বিনয়ের সমস্ত শরীর মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। সে ঠিক কথায় বোঝানো যায় না, তবু ···

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রত্নময়ী ভীত হইয়া কথা পাল্টাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ রে, তোর চাকরির মাইনে কত হ'ল? কোন্ অফিসে চাকরি? ··· সেই যোগীনবাবুই করে দিলে বুঝি। লোকটি ভারি ভালো লোক দেখচি। হবে না কেন, ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু ···

বাড়ীতে আসিয়াই নীহারকে কনে দেখিতে আসিবার আয়োজনে মা ও ছেলে উভয়েই বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ চাকরির বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এখন মায়ের উৎসাহ ও আনন্দ-দীপ্ত মুখের সম্মুখে সত্য কথাটা বলিতে বিনয়ের বাধিতে লাগিল। একটু ইতস্তত করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, আপাতত পঞ্চাশ করে পাচ্ছি, পরে আরও বাড়বে। না, বাবার বন্ধু সেই যোগীনবাবু এখন চেঞ্জে গেছেন, তিনি ফিরে এলে দেখি আরও যদি কিছু ভালো জোগাড় করতে পারি। আপাতত অন্য একটা অফিসে ঢুকেচি।

মোটে পঞ্চাশের কথা শুনিয়া রত্নময়ী কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়াছিলেন। পরে যে আরও ভাল নিশ্চয়ই হইবে, কেবল যোগীনবাবু ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা, তাহাও একনিমেষে বুঝিতে পারিয়া এতক্ষণে আবার উৎফুল্ল হইলেন। বলিলেন, ও, তাই বল্। তিনি ফিরে এ'লে কোন্ না একশো দেড়শো টাকার চাকরি একটা নিশ্চয়ই হবে। এ আমি নিশ্চয় বলে রাখচি।

নীহারের বিবাহের কথা রত্নময়ী আর তুলিলেন না। বিনয়ও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে মনে বুঝিল, মা একপ্রকার মনস্থির করিয়াছেন। কম টাকায় হইবে। একটা মানসিক রুচিবিলাসকে প্রাধান্য দিয়া এই সস্তার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া ষোল সতের বছরের কুমারী মেয়েকে লইয়া পল্লীসমাজে বাস করিবার মত মনের জোর বা ধৈর্য্য কোনটাই তাঁহার নাই।

২২

অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিবে। এখন শুধু কালো আকাশে অগণ্য নক্ষত্র। মালতী তাহার বিছানায় জাগিয়া শুইয়াছিল। সংসারের কলকোলাহল স্তব্ধ। পাশের বিছানায় ছোট ভাইটা ঘুমাইয়া গেছে। ছোটমার কাছে বিরক্ত করে, কাঁদে, রাত্রে তাঁহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলিয়া সে মালতীর কাছেই থাকে। জীর্ণ অর্দ্ধ-মলিন বিছানায় শুইয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া মালতী কিন্তু যাহা ভাবিতেছিল তাহা আকাশ-কুসুমের কথা। সে ভাবনার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই, অর্থ নাই। কেবল একটা সুমধুর কল্পনার রসে সারা মন নিমজ্জিত হইয়া থাকে সে ভাবনায়। যে পৃথিবীতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে থাকে, তাহারা তাহাকে আদর দেয় নাই, শ্রদ্ধা দেয় নাই। কেবল সমালোচনা করিয়াছে, বকিয়াছে, গঞ্জনা দিয়াছে। তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু এত ছোট এত কুশ্রী আবেষ্টনে যে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। মাথা তুলিয়া কোথাও কোন আলো চোখে পড়ে না। অন্ধকার। দিন হইতে দিনান্ত কাটিয়া যায়, তবু সূর্য্যের বিমল রশ্মি একবারও চোখে পড়ে না। বিনয়কে দেখিয়া, তাহার সশ্রদ্ধ এবং সস্নেহ ব্যবহারে সেই আলোর একটুখানি ছটা আজ যেন তাহার অস্তিত্বের উপর পড়িয়াছে। যেখানে ছিল কেবলই অন্ধকার সেখানে সুখ দুঃখ আনন্দবিহ্বল স্পর্শকাতর নারীচিত্ত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। তবু এ ভাবনা এখন তাহার চিত্তের খুব সঙ্গোপন কোণে আছে। নিজেও

হয় তো ঠিক বুঝিতে পারে না, তবুও অন্ধকার রাত্রির অতলতার দিকে নিদ্রাহীন চোখে চাহিলেই যাঁহার কথা মনে পড়িয়া যায় তাঁহার সঙ্গে মালতীর পরিচয় অল্প। তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের ভক্তি উজাড় করিয়া দিলেও তাহার তৃপ্তি হয় না। আজ সন্ধ্যাবেলার কথাগুলাই সে উলটাইয়া পালটাইয়া বারংবার ভাবিতেছিল। কত অসঙ্কোচে আপনার লোকের মত তিনি আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, যে বইটা তোমার জন্য আনিয়াছি তাহা তোমার ভালো লাগিয়াছে তো ?—কেমন করিয়া কখন তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে মালতী বই পড়িতে ভালবাসে। লোকে হয়তো তাঁকেও কত কথা শোনাইয়া দেয়। কিন্তু মিথ্যা কোন সঙ্কোচ তাঁহাতে নাই। এমনই নানা অস্পষ্ট অথচ তুচ্ছ তবুও মধুর চিন্তায় মালতীর কত রাত না ঘুমাইয়া কাটিয়া গেল। তাহার পর কোন এক সময় অধিক রাত্রিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ শেষ রাত্রিতে উঠিল, মালতীর ক্ষুদ্র শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন-পথে আলোর দু-একটি ক্ষীণ রশ্মি আসিয়া পড়িল। তাহার নিদ্রামগ্ন সুপ্ত মুখের উপরেও হয় তো সে আলোর আভা পড়িল। তখন আর মালতীকে পাড়াগাঁয়ের সংমা-লাঞ্ছিত তুচ্ছ জীবনের দীনতা আবৃত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বাস্তব জীবনকে দূরে পরিহার করিয়া স্বপ্নে তাহার মন ঠিক ঐ স্বপ্নের মতই অলীক অথচ মধুর-মদির কোন ভাবরাজ্যের সীমায় গিয়া উত্তীর্ণ হইল।

২৩

পরের দিন ভোরেই বিনয় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নতুন চাকরি, অন্তত একদিন আগে গিয়াও ঠিকঠাক করা প্রয়োজন।

বেলা সাড়ে দশটায় ট্রেন, কিন্তু গরুর গাড়ীতে অনেকটা পথ যাইতে হয় বলিয়া সকাল সকাল প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। নিজের স্যুটকেসটায় যে দুএকখানা কাপড় আনিয়াছিল তাহাই গুছাইয়া লইতেছে, এমন সময় নীহারের পরিবর্ত্তে মালতী চায়ের পেয়ালা লইয়া ঢুকিল। তাহার হাত হইতে পেয়ালাটা লইয়া বিনয় বলিল, আজ খুব ভোরেই এসেছ যে! আমি চলে যাব নীহারের মুখে শুনেছিলে বুঝি ?

মালতী নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা ধুতি ভাঁজ করিয়া স্যুটকেসে রাখিতে রাখিতে বিনয় বলিল, তুমি যখনই আমাদের বাড়ীতে এস তখনই দেখি সর্ব্বদাই ব্যস্ত সশঙ্কিত হয়ে রয়েচ ; কেন, তোমার ছোটমা একটুক্ষণের জন্যও কোথাও বেড়াতে গেলে খুব বকেন বুঝি ?

মালতী তথাপি নিরুত্তরেই রহিল।

তখন বিনয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, কিন্তু মালতী, তুমি এর জন্যে মনে কোন দুঃখ কোরো না। বাইরের থেকে যে আমরা বাধাবিঘ্ন পাই তাতে সময়ে সময়ে মনে খুব আঘাত লাগলেও সেটাতে যে শুধু অবিমিশ্র খারাপ ফলই হয় তা তুমি মনে কোরো না। এর থেকে অনেক ভালোও হয়। স্যর জগদীশচন্দ্র বোসের নাম শুনেছ তো ? খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এই সেদিন মারা গেলেন। তিনি তাঁর এক বাণীতে একবার বলেছিলেন, আজ পর্য্যন্ত উদ্ভিদের চেতনা নিয়ে যত পরীক্ষা তিনি করেছেন প্রায় সর্ব্বত্রই দেখেছেন বাইরের থেকে একটা আঘাত পেলেই তাদের জীবনীক্রিয়া সমুত্থত হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে আঘাত পাওয়ার খুব একটা দাম আছে। এ নইলে জীবনের বড় জিনিসগুলোকে ঠিক ফুটিয়ে তোলা যায় না।

আমার যখনই দুঃখ কষ্টে খুব মুষড়ে পড়বার মত অবস্থা হয় আমি ওইটে মনে করি। আমার মনে হয়, তুমিও সম্ভবত মনে মনে তাই জান। তাই তোমার জীবনের অনেক বাধা সত্বেও দেখেছি, জ্ঞানের উপর তোমার তৃষ্ণা আছে। সমস্ত ব্যবহারে বেশ একটা ন্যায়নিষ্ঠ জোর আছে। দেখে খুব আনন্দ হয়।

কথা বলিতে বলিতে চায়ের পেয়ালা শেষ হইয়া গেল। এতক্ষণে বিনয়ের একটু লজ্জা করিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল, ইহার আগে মালতীর সহিত সে দুই-একটা ছাড়া কখনও কথা বলে নাই। আজ হঠাৎ একসঙ্গে এত গুরু-গভীর কথা বলায় সে হয় তো মনে করিতেছে বিনয়ের বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস আছে। তাই হাসিয়া সে ঠাট্টার সুরে কহিল, মালতী, তুমি বুঝি আমার অভ্যেস জান না ? সকাল বেলায় এই এক পেয়ালা চায়ে আমার কিছু হয় না। নীহারকে বলে দিও, আমাকে আর এক পেয়ালা চা যেন পাঠিয়ে দেয়। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে আবার বার হতে হবে। কি জানি, ট্রেন সময় মত ধরতে পারব

কি-না। যা আমাদের দেশের রাস্তা! আবার হয় তো আসব তোমার সইয়ের বিয়েতে।

মালতী বিনয়ের শূন্য পেয়ালাটা হাত বাড়াইয়া লইয়া দুই-এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। তাহার পর পেয়ালাটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বিনয়কে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আপনাকে যাবার আগে প্রণাম করতে এসেছিলাম।

বলিয়া আবার পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার মিনিট পাঁচেক পর নীহার আর এক পেয়ালা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। হাসিয়া বলিল—এত চা খেতে পার তুমি!

বিনয় আজ কৌতূহলী হইয়া নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার তরুণ মন একটা অনাগত সুখস্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। চাহিয়া বিনয়ের নিঃশ্বাস পড়িল। হায় রে বাঙ্গালীর মেয়ে! তাহার মন নির্ভরতার অটলতায়, নিষ্ঠায় ও সহিষ্ণুতায় অনন্যা। কিন্তু তবুও কিছুর যেন অভাব আছে। বুঝিতে পারিল, নীহার স্বপ্ন দেখিতেছে। একদিন খুব শীঘ্রই রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঐ অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত স্থূলরুচিসম্পন্ন পরিবারে নীহারের পরাধীন জীবনযাত্রা বিনয় যেন চোখের সামনে এখন হইতেই দেখিতে পাইল। আনন্দ নাই, আলো নাই, উচ্চভাব বলিয়া কোথাও কিছু নাই। কেবল আছে হীন দাম্ভের মধ্য দিয়া মানবাত্মার চরম অপমান। তবুও বলিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালীর দুঃস্থ ঘরের মেয়ে সে। সস্তায় বিবাহ হইতেছে। বয়স তাহার প্রায় ষোল ছাড়ায়। এ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে টাকার জন্য আবার যদি বিবাহ দীর্ঘ দিন পিছাইয়া যায়, তখন আর ঘরে পরে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

নীহার আবদারের সুরে বলিল, যাবার সময় কি অত ভাবছ দাদা? এবার আমার জন্যে কি কি বই আনবে বললে না?

বিনয় কোন উত্তর দিতে পারিল না। একবার মনে হইল বলে—'আর বই পড়িসনে নীহার। যে জীবনের মধ্যে যাচ্ছিস, সেখানে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের স্থান নেই। কবিতা সেখানে চলবে না। এবার সেই রকম করে মনকে প্রস্তুত কর।'

কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছোট স্যুটকেসটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথা ছিল অতুল সঙ্গে যাইবে। কিন্তু যাইবার সময়ে সে কোথায় যে লুকাইয়া রহিল কাহারও সাধ্য হইল না খুঁজিয়া বাহির করে।

(ক্রমশঃ)

পরিচয়

শ্রীসুধাংশু রায়চৌধুরী

বন্ধু চাহিয়াছ তুমি মোর পরিচয়?
তোমার আমার মাঝে বিচ্ছেদ আসিল বুঝি তাই হয় ভয়?
আমি যদি মৌন থাকি পৃথিবীর মত
তোমার জীবন-স্বর্গে জ্বলিবো কি আকাশের
তারা হ'য়ে শত?
ঘন কুয়াশার মাঝে দেখিয়াছ মোরে
অথবা আমারে তুমি দেখিয়াছ আধ-ঘুমঘোরে।
বাস্তবে দেখনি বুঝি দেখেছ স্বপনে
তাই সন্দেহ বশে মোর লাগি ভাঙ্গ গড় গোপনীয় মনে।

চেয়েছিলে একদিন জীবনের বিনিময়ে জীবন কিনিতে
তখন পারোনি বন্ধু আমারে চিনিতে;
ছাই মেখে অভিনয় আমাদের প্রেম
কতজনে ভালোবেসে কত হারালেম।
দেখেছ কি আধুনিক সমাজের বিবসনা রূপ?
চেনো নাই আজো তুমি আমার স্বরূপ।
ঝড় ওঠে প্রতিদিন মোর গৃহে কামনার ভরি।
জান বন্ধু এ জীবনে শান্তি নাই,
অশান্তির আগুনেতে তিলে তিলে মরি।

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত দ্বিতীয় লিপি

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ্-ডি

প্রত্নজগতের ভাগ্যবিধাতা নিরতিশয় কৃপণ ও দুষ্টবুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত। বঙ্গের বর্ম্ম বংশের ইতিহাস উদ্ধারকামী হতভাগ্যগণের সহিত তিনি যে কি নিদারুণ রকম পরিহাস করিতেছেন এবং লুকোচুরি খেলিতেছেন, ১৩৪০-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় ৬০৯ পৃষ্ঠায় সামল বর্ম্মের বজ্রযোগিনী তাম্রশাসন সম্পাদন করিবার সময় তাহার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু সময় সময় যে বিধাতার অতন্দ্র নয়নে তন্দ্রাজড়িমা ভর করিয়া তাঁহারও হস্তমুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দেয়, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় আজ পাওয়া যাইবে।

দাক্ষিণাত্যের চোল-সম্রাট রাজেন্দ্র চোল প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী নৌবহর ছিল এবং দক্ষিণ ভারতময় বিস্তৃত হইয়া তাঁহার রাজ্য ব্রহ্মদেশ, মলয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, নিকোবার দ্বীপ ইত্যাদিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মান্দ্রাজের ৯৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, আর্কট জেলার পলুর নামক স্থানের অদূরস্থ তিরুমলয় পর্ব্বতশীর্ষে রাজেন্দ্র চোলের ত্রয়োদশ* সম্বৎসরে উৎকীর্ণ একখানা শিলালিপিতে রাজেন্দ্র চোলের বিজয় কাহিনী তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি পূর্ব্বভারত বিজয়ে অগ্রসর হইয়া উড়িষ্যা ও তাহার উত্তর-পশ্চিমস্থ দক্ষিণ কোশল জয় করিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি দণ্ডভুক্তি অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার ধর্ম্মপাল নামক রাজাকে এবং দক্ষিণ রাঢ়ে বা হুগলী জেলায় রণশূর নামক রাজাকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বঙ্গাল দেশ, যেখানে ঝড়বৃষ্টির আর বিরাম নাই, তথাকার রাজা গোবিন্দচন্দ্র যুদ্ধে পরাভূত হইয়া হস্তী হইতে নামিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উত্তর রাঢ়ে মহীপালকে পরাজিত করিয়া তিনি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেশে ফিরিয়া গঙ্গাবিজয়ী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র তিরুমলয় শিলালিপির এই উল্লেখ হইতেই ঐতিহাসিক মহলে এতকাল পরিচিত ছিলেন। 'শব্দপ্রদীপ' নামক একখানা প্রাচীন গ্রন্থেও গোবিন্দচন্দ্র নামক বাঙ্গালার রাজার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু খোদ বাঙ্গালা দেশে গোবিন্দচন্দ্রের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন এতদিন পাওয়া যায় নাই। কাজেই ঐতিহাসিকগণের নিকট গোবিন্দচন্দ্রের অস্তিত্ব এযাবৎ অনেকটা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল।

প্রায় দেড় বছর আগে ঢাকা মিউজিয়মের অবৈতনিক সংগ্রাহক পরমস্নেহভাজন শ্রীমান গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণাস্থ কুলকুড়ি গ্রামের গুহ পরিবারে রক্ষিত একখানা মূর্ত্তির সংবাদ আমাকে প্রদান করে। অনতিবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হাতের লেখা পুথি সংগ্রাহক শ্রীমান মুকুন্দবিহারী দাস পুথি খোঁজা উপলক্ষে কুলকুড়ি যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ মূর্ত্তিখানি পরীক্ষা করিয়া ১৯৪১ সনের ২রা মে তারিখের (১৯শে বৈশাখ—১৩৪৮) পত্রসহ ঐ মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ লিপির দুইখানি ছাপ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।



গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সম্বৎসরের লিপিযুক্ত কুলকুড়ির সূর্য্য-মূর্ত্তি

* ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষের ৭৬৯ পৃষ্ঠার ৪নং পাদটীকায় লিখিয়াছেন দ্বাদশ। ইহা অনবধানতাজনিত ভুল বলিয়াই মনে হয়।

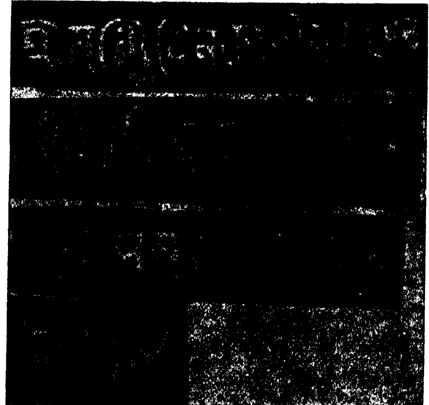
অস্পষ্ট ছাপ হইতেও অনায়াসেই পড়িতে পারিলাম যে লিপিখানি গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সম্বৎসরের। বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের নিজ রাজ্য সীমানার অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত এই লিপিতে তাঁহার নাম পাইয়া পরম পুলকিত হইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারকে কলিকাতায় এই আবিষ্কারবার্ত্তা লিখিয়া জানাইলাম এবং একখানি ছাপ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। উত্তরে ডক্টর মজুমদার আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে জানাইলেন যে বিক্রমপুরে অনতিকাল পূর্ব্বে আর একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে গোবিন্দচন্দ্রের ত্রয়োবিংশতি সম্বৎসরের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, —এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে বাহির হইতেছে। জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষ হস্তগত হইলে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই লিপির আবিষ্কর্ত্তা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং প্রবন্ধের লেখক পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার।

কুলকুড়ির মূর্ত্তিখানি সম্প্রতি কুলকুড়ির উদারহৃদয় গুহভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ঢাকা মিউজিয়মে দান করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের অমূল্য উপাদান-লিপিসম্বলিত এই মূর্ত্তিখানি সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য এক চিত্রশালায় দান করিয়া গুহভ্রাতৃচতুষ্টয় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রত্নবিধাতা তাঁহাদের কল্যাণ করুন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় একই সময়ে গোবিন্দচন্দ্রের দুইখানি লিপির আবিষ্কার ডক্টর মজুমদার মরুভূমির আকাশের মুষলধারে বর্ষণের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। কান্তকবির ভাব ও ভাষায় সর্ব্বদাই মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রত্ন সম্পদই হয়ত কৃপণ বিধাতা একদিন বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু আমরা সারা জীবন আঁকুপাঁকু করিয়াই গেলাম—অনেক সমস্যারই সমাধান মিলিল না। বিধাতাকে আর একটু অকৃপণ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা—আশা করি স্বার্থপরতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কুলকুড়ির মূর্ত্তিখানি নাতিবৃহৎ, উচ্চতায় ফুট তিনেক মাত্র। মূর্ত্তিখানি সাধারণ সূর্য্যমূর্ত্তি, উপরে কৃত্তিমুখ এবং ফোণশীর্ষ। মূল মূর্ত্তির দুই ধারে লতাবৃত্তের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রাকৃতিতে একাদশ আদিত্য উৎকীর্ণ। দ্বাদশ বৃত্তটির অভ্যন্তরে, দক্ষিণ হস্তে সনাল পদ্মধারী একটি দণ্ডায়মান শ্মশ্রুল পুরুষ মূর্ত্তি। সূর্য্য মূর্ত্তির দক্ষিণে সূর্য্যরথে থাকিয়া লোকের সুকৃতি-দুষ্কৃতি লিখনে রত দোয়াত-কলম হস্তে শ্মশ্রুল পিঙ্গল মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া; বামে দণ্ড ও খড়্গধারী দণ্ডী। দণ্ডীও পিঙ্গল মূর্ত্তি এবং মূল সূর্য্য মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি দুই স্ত্রী মূর্ত্তি—সূর্য্যের দুই স্ত্রী সুরেণু বা দ্যৌ এবং ছায়া—দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও মৃত্তিকার প্রতীক। পাদপীঠের একেবারে প্রান্তে উষা ও প্রত্যুষা আকর্ণ গুণপূরিত ধনু দ্বারা সূর্য্য-কিরণরূপী বাণসমূহ দিগদিগন্তে নিক্ষেপ করিতেছে। দণ্ডী ও পিঙ্গলের মস্তকসংলগ্ন দুই অশ্বারোহিণী স্ত্রী-মূর্ত্তি উষা ও প্রত্যুষার মতই শর নিক্ষেপে রত। এই অশ্বারোহিণী স্ত্রী মূর্ত্তি দুইটি এই মূর্ত্তির নূতন অঙ্গ, অন্য কোন সূর্য্য মূর্ত্তিতে এই অশ্বারোহিণী শরনিক্ষেপরতা স্ত্রী মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সূর্য্যের পদ্মাসনের নীচে অর্দ্ধশরীরী অরুণ নাগরজ্জু-সংযত সপ্তাশ্ব পরিচালনা করিতেছেন, সর্ব্ব নিম্নে সূর্য্যরথের এক চক্র স্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ।*

রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁহার বঙ্গবিজয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। কাজেই দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে এই অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা সঙ্গতরূপেই ধরা যায়। ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রাজেন্দ্র চোলের দ্বাদশ রাজ্যাঙ্ক। সমরাভিযানগুলি সাধারণতঃ বিজয়াদশমীর পরে আরব্ধ হইয়া সারা শীতকাল ধরিয়া চলিত। বঙ্গাল দেশে ঝড়বৃষ্টির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, পৌষ-মাঘের বৃষ্টি রাজেন্দ্র চোল সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশে আসিয়া পাইয়াছিলেন। যাহা হউক গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্র চোলের সজ্বর্ষ ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অথবা ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকিবে। এই ১০২৩-২৪এর দুই ধারে গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল বিস্তৃত এই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কাজেই এই বর্ত্তমান ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মূর্ত্তিখানির বয়স প্রায় ৯১৮ বৎসর হইয়াছে। বঙ্গের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে এই মূর্ত্তিখানি নানা সমস্যা উত্থাপন করিবে সন্দেহ নাই। সেই সমস্যা মীমাংসার স্থান ইহা নহে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার সম্পাদিত লিপিখানি গোবিন্দচন্দ্রের ২২ কি ২৩ সম্বৎসরের। এককের অঙ্কটি স্পষ্ট নহে। মূর্ত্তিখানি বিক্রমপুরেই আছে, কিন্তু আমি অদ্যাবধি স্বয়ং যাইয়া দেখিয়া আসিবার অবসর করিতে পারি নাই। অধ্যাপক সরকারের মূল্যবান প্রবন্ধটি



গোবিন্দচন্দ্রের কুলকুড়ি লিপি

যৌবনোচিত উৎসাহ ও বাগ্‌বাহুল্যে পরিপূর্ণ। বয়সের সহিত এই সমুজ্জ্বল-সম্ভাবনা-ভবিষ্য উৎসাহী যুবকের বাক্‌সংযম এবং হুঁসিয়ার হইয়া

* সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃততর বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত Iconography পুস্তকে সূর্য্যমূর্ত্তির অধ্যায় অনুগ্রহ পাঠ করিবেন।

কথা বলার অভ্যাস আপনি আসিবে, তজ্জন্য বন্ধুবর হরেকৃষ্ণবাবু অনর্থক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয় সম্যক আয়ত্ত না করিয়া অনেক কথা বলিতে গেলে যে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে, এই সত্য প্রত্যেকেরই ঠেকিয়া শিখিতে হয়, হিতৈষীরও সমালোচনা এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বলিয়া ভুল হইতে পারে।

আমরা লিপিখানি সম্পাদন মাত্র করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

লিপিটি সূর্য্য মূর্ত্তির পাদপীঠের চারিটি স্থানে একটি মাত্র ছত্রে অঙ্কিত। ব্লকের সুবিধার জন্য চারিটি অংশ নীচে নীচে সাজান হইল। মূর্ত্তির প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন অংশগুলির অবস্থান দৃষ্ট হইবে।

লিপি

শ্রীতক্ষি (১) দিন কারীন্ (২) ভট্টারক [ঃ]
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব পা
দীয় সম্বত্ ১২ ফাল্গুন
দিনে ১৯

টীকা। (১) তক্ষি শব্দটি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং বিস্ময়াবহ। দ্বিতীয় অক্ষরটি সুলিখিত নহে। মনে হয় খনৎকার প্রথমে ত খুঁড়িয়াছিল; তাহার পরে সংশোধন করিয়া ক্ষ করিয়াছে। এই শব্দটি সাধারণ অভিধানে প্রাপ্তব্য নহে। মনিয়ার-উইলিয়মসের বৃহৎকায় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে তক্মন্ শব্দটির অর্থ লিখিয়াছে—Name of a disease, accompanied by Skin eruption,—এক রকম রোগ, যাহার সহিত চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকে। অথর্ব্ব বেদে ১ম, ৪র্থ—৬ষ্ঠ, ৯ম, ১১শ ১৯শ খণ্ডে এই তক্মন্ হইতে রক্ষা পাইবার মন্ত্র লিখিত আছে। সূর্য্য কুষ্ঠরোগ নাশন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। চর্ম্মরোগযুক্ত তক্ম অনুরূপ কোন রোগই হইবে। সম্ভবতঃ সেই রোগনাশন মূর্ত্তিকেই "তক্ষি" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

(২) দিনকারিন্ পঠিতব্য।

হ্লাদিনী

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

যেন মরালি চলে, রাঙা চরণতলে
কত অশোক কুসুম, ফুটি হরষে ঢলে
ঢল ঢল ঢল ঢল সুকোমল।

কভু ত্বরিতগামী—যায় থমকে থামি,
বাঁকা নয়নে চাহে—ওই এলো কি নামি
মেঘদল ছল ছল ধরাতল।

হাতে কেতকী কেয়ূর, বলে নাচ তো ময়ূর
নাচ পেখম তুলে, বাজে চরণ-নূপুর
ঝমু ঝুম্ ঝমু ঝুম্, আসে ঘুম।

এলো খোঁপার ফুলে, দোলন-চাঁপাটি দুলে,
ঠোঁটে হাসির ছটা—ধরে মরম খুলে
টল টল্ টল টল্ নিরমল।

টিপ কপালে জ্বলে, মালা দুলিছে গলে,
কাঁপে সুচারু চুচুক, আঁটা কাঁচুলি তলে
থর থর থর থর মনোহর।

গৃহপালিত টিয়ায়, বলে উড়িবি কি আয়,
ওঠে খেয়াল কত—তার চপল হিয়ায়
সারাখন অকারণ অবারণ।

যদি চাঁদিনী নিশা—তবে হারালে দিশা,
দুটি ডাগর চোখে, ভাসে কিসের তৃষা
বেয়াকুল বেয়াকুল, নাহি তুল।

কভু মানের ছলে—তার মিনতি গলে,
রাঙা কুপিত কপোল, ভাসে নয়নজলে
যেন হায় কেহ নাই, অসহায়।

যত রঙিন আশা খোঁজে তনুতে ভাষা,
যেন কদম-কেশর কত ফুটিছে খাসা
হরষায় ভরসায় বরষায়।

বুঝি মধুপ এসে ছুঁয়ে গিয়াছে হেসে,
হৃদি-সরসী জলে তাই উঠেছে ভেসে
টলমল টলমল শতদল!

কালিদাস

৪

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অবরোধের সরোবর তীর হইতে কালিদাস ও রাজকুমারী যখন হাত ধরাধরি করিয়া শয়নমন্দিরের পানে চলিয়াছেন, ঠিক সেই সময় প্রাসাদের এক বহিঃকক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের অভিনয় চলিতেছিল। বক্রী পাপগ্রহের ন্যায় সৌরাষ্ট্রকুমার বক্রগতিতে কুন্তলরাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

দীপোৎসব তখনও শেষ হয় নাই; সেই দীপের আলোকে কক্ষের মধ্যস্থলে চারিটি ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিলেন—সৌরাষ্ট্রকুমার, মহামন্ত্রী, পুস্তপাল মহাশয় এবং স্বয়ং কুন্তলরাজ। সৌরাষ্ট্রকুমারের বেশবাস পূর্ব্ববৎ, তিনি সংহত ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; মহামন্ত্রীর মনের ভাব মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই; পুস্তপাল মহাশয় যে বিপন্ন ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। স্বয়ং কুন্তলরাজও যেন কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি স্বল্পভাষী দৃঢ়শরীর পুরুষ—বয়স অনুমান পঞ্চাশ; মাথার চুল ও গুম্ফ পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার চোখের স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি বর্ত্তমানে আকস্মিক বিপৎপাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তপাল মহাশয়ের প্রাণে ভয় ঢুকিয়াছে, হয় তো এই অনর্থের জন্য তাঁহাকেই দায়ী করা হইবে। তিনি করুণ স্বরে আপত্তি করিতেছেন—

পুস্তপাল: কিন্তু মহারাজ, এ যে—এ যে একেবারেই অসম্ভব! এই লোকটা—অর্থাৎ ইনি—, এও কি সম্ভব!

প্রতিবাদে সৌরাষ্ট্রকুমার একটি অন্তর্গূঢ় গর্জ্জন ছাড়িলেন। ক্রমাগত চীৎকার করিয়া তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল, শরীরও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তবু দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি পুস্তপালের নাসিকার অনতিদূরে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: (দন্ত খিঁচাইয়া) সম্ভব! এই দ্যাখো সৌরাষ্ট্রের মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী।—সম্ভব।

পুস্তপাল মহাশয় মুষ্টির সান্নিধ্য হইতে নাসিকা দ্রুত অপসারিত করিয়া দেখিলেন, তর্জ্জনীতে সত্যই একটি মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী রহিয়াছে। তিনি বার দুই তিন চক্ষু মিটমিট করিলেন

পুস্তপাল: কিন্তু—কিন্তু—আপনি যদি সত্যিই—, আপনার সহচর কই?

সৌরাষ্ট্রকুমার: বলছি না, সহচরদের ফেলে আমি এগিয়ে আসছিলুম, তোমাদের জঙ্গলে এক বাটপাড়—

কুন্তলরাজ বাধা দিয়া বলিলেন—

কুন্তলরাজ: দেখি অঙ্গুরীয়; সৌরাষ্ট্রের মুদ্রা আমি চিনতে পারব।

সৌরাষ্ট্রকুমার অঙ্গুরীয় খুলিয়া রাজার হাতে দিলেন। দেখা গেল, তর্জ্জনীর মূলে নিত্য অঙ্গুরীয় পরিধানের চক্রচিহ্ন রহিয়াছে। এ ব্যক্তি যে অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া পাইয়া বা চুরি করিয়া পরিধান করিয়াছে তাহা নয়।

রাজা মুদ্রাটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া শেষে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন; অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

কুন্তলরাজ: হুঁ—মুদ্রা সৌরাষ্ট্রেরই বটে।—

সৌরাষ্ট্রকুমার অঙ্গুরীয় পুনশ্চ পরিধান করিতে করিতে চারিদিকে বিজয়দীপ্ত চক্ষু ঘুরাইতে লাগিলেন। পুস্তপাল মহাশয়ের মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল

মহামন্ত্রী মৃদু গলা-ঝাড়া দিলেন।

মহামন্ত্রী: ইনি যদি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজই হন—তা হলেও তো এখন আর—

কুন্তলরাজ: কোনও উপায় নেই।—সে-ব্যক্তি যে-ই হোক, অগ্নি সাক্ষী করে আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে—

মহামন্ত্রী: তা ছাড়া, রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা ছিল, চণ্ডাল হোক পামর হোক, যে-কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে—

সৌরাষ্ট্রকুমার বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িলেন।

সৌরাষ্ট্রকুমার: ভষ্ম হোক প্রশ্ন, আর তার উত্তর। কুন্তলরাজ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই না। আমি চাই—বিচার। যে-চোর আমার অশ্ব আর বস্ত্রাদি চুরি করেছে সে আপনার জামাতাই হোক, আর—

মহামন্ত্রী: ধীরে কুমার, সংযম হারাবেন না—

সৌরাষ্ট্রকুমার: আমি বিচার চাই। কুন্তলরাজ্যের সীমানায় এই চুরি হয়েছে, তস্করকে শূলে দেওয়া হোক। আর, তা যদি না হয়, সৌরাষ্ট্র দেশ নির্ব্বীর্য্য নয়—একথা স্মরণ রাখবেন।

কুন্তলরাজ এই স্পর্দ্ধিত উক্তি গলাধঃকরণ করিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ আরক্ত হইলেও এই ব্যক্তি যে সত্যই রাজপুত্র, সে প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল। তিনি সংযত স্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজ : এ বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান না ক'রে কিছুই হ'তে পারে না। আপনার অভিযোগ যদি সত্য হয়—

রাজা মহামন্ত্রীর পানে ফিরিলেন, চতুর মহামন্ত্রী রাজার প্রতি একটি গোপন কটাক্ষপাত করিয়া পরম আপ্যায়নের ভঙ্গীতে যুবরাজের দিকে ফিরিলেন—

মহামন্ত্রী : নিশ্চয় নিশ্চয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।—কিন্তু শ্রীমন্, আপনি আজ রাত্রিটা রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করুন—রাত্রির মধ্য যাম অতীত হয়েছে—

মহামন্ত্রী পুস্তপালের পেটে গোপনে কনুইয়ের এক গুঁতা মারিলেন

পুস্তপাল : হাঁ হাঁ—কুমার ভট্টারক, আর কালক্ষয় করবেন না—সারা দিন অভুক্ত আছেন—ক্লান্তিও কম হয় নি—আসুন কুমার—এই দিকে—এই যে বিশ্রান্তি গৃহ—

ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর যুবরাজের পক্ষে প্রলোভন প্রবল হইলেও তিনি সহজে নরম হইবার লোক নয়। তিনি বলিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: আমি বিচার চাই, ন্যায়দণ্ড চাই, নইলে—

মহামন্ত্রী : অবশ্য অবশ্য—সে তো আছেই। উপস্থিত আপনার বস্ত্রাদি ত্যাগ করা প্রয়োজন—

পুস্তপাল : ওদিকে ময়ুর-মাংস, মাধ্বী, মাহিষ-দধি, দ্রাক্ষাসব—সমস্তই প্রস্তুত রয়েছে কুমার। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না—

মহামন্ত্রী : আসুন কুমার—অশুভস্য কালহরণম্—

সৌরাষ্ট্রকুমার : কিন্তু—প্রতিবিধান যদি না পাই—

তিনি আর লোভ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, মহামন্ত্রী ও পুস্তপালের সাদর আহ্বানের অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্রান্তি গৃহের অভিমুখে চলিলেন

কুন্তলরাজ উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন

কাট।

ইত্যবসরে রাজকুমারী ও কালিদাস শয়নকক্ষে উপনীত হইয়াছেন। সখী কিঙ্করীরাও বিদায় লইয়াছে; আড়ি পাতিয়া বর-বধূকে বিরক্ত করিবার বিধি যদিচ সেকালেও ছিল, কিন্তু আজিকার দিনব্যাপী মাতামাতির পর সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাছাড়া বসন্তোৎসবের রাত্রে নিজস্ব সঙ্গমোৎকণ্ঠাও অনেকেরই ছিল

নির্জ্জন সুবৃহৎ শয়নকক্ষটি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। যূথী ও মল্লী মিলিয়া পালঙ্কের শুভ্র আস্তরণ রচনা করিয়াছে। পালঙ্কের চারি কোণে দীপদণ্ডের মাথায় সুরভি বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে

প্রাচীর-গাত্রে হর-পার্ব্বতী, রাম-জানকী প্রভৃতি আদর্শ দম্পতির মিথুন চিত্র। একটি স্থান পর্দ্দায় আবৃত; পর্দ্দার উপর রাজহংসের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে; হংসের চঞ্চুতে সনাল পদ্মকোরক

রাজকুমারী কালিদাসকে লইয়া পর্দ্দার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; কালিদাসের দিকে মৃদু হাসিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন। দেখা গেল, প্রাচীর-গাত্রে একটি কুলঙ্গী রহিয়াছে; কুলঙ্গীর থাকে থাকে অগণিত পুঁথি থরে থরে সাজানো।

কালিদাসের দৃষ্টি মুগ্ধ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পুঁথির প্রতি এই গ্রামীণ যুবকের একটি অহেতুক আকর্ষণ ছিল; তিনি একবার রাজকুমারীর দিকে, একবার পুঁথিগুলির দিকে হর্ষোৎফুল্ল মুখে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তারপর সন্তর্পণে একখানি পুঁথি হস্তে তুলিয়া পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

পুঁথির মলাটের লিখন কালিদাস পড়িতে পারিলেন কি-না তিনিই জানেন; মলাটের উপর লেখা ছিল—

মৃচ্ছকটিকম্

কালিদাস : কত পুঁথি!—তুমি সব পড়েছ?

রাজকুমারী গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া সায় দিলেন।

কালিদাসের মুখ একটু ম্লান হইল। তিনি হাতের পুঁথিটির দিকে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়া সেটি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

কালিদাস : আমি একটিও পড়িনি। যদি পড়তে পারতুম, আজকের চাঁদ কিসের মত সুন্দর হয় তো বলতে পারতুম—

আবার রাজকুমারীর মুখ শুকাইল

রাজকুমারী : কিন্তু—না না, পরিহাস করবেন না, আর্য্যপুত্র! আপনি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ—

কালিদাসের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল

কালিদাস : কিন্তু আমি তো রাজপুত্তুর নই!

রাজকুমারীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল

রাজকুমারী : রাজপুত্র নয়! তবে—কে আপনি?

কালিদাস : আমি কালিদাস।—বনের মধ্যে কাঠ কাটছিলুম—এমন সময়—

রাজকুমারী বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী : কাঠ কাটছিলে! কাঠুরে! তুমি তবে সত্যিই বর্ণপরিচয়হীন মূর্খ!

সরল ভাবে কালিদাস ঘাড় নাড়িলেন

কালিদাস : হাঁ—আমি লেখাপড়া জানি না।—যখনই কোনও সুন্দর জিনিস দেখি, ইচ্ছে করে তার বাখান করি। কিন্তু পারি না—

রাজকুমারী আর শুনিলেন না; ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া দুই চক্ষু সজোরে মুদিত করিয়া যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর টলিতে টলিতে পালঙ্কের পাশে গিয়া নতজানু হইয়া শয্যার পুষ্পাস্তরণের মধ্যে মুখ গুঁজিলেন। প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ উন্মথিত হইয়া উঠিল

কালিদাস কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর ঈষৎ সঙ্কোচে রাজকুমারীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন

রাজকুমারী জানিতে পারিলেন, কালিদাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি সহসা মুখ তুলিয়া তীব্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন—

রাজকুমারী: *তুমি রাজপুত্র সেজে এখানে কি করে এলে?*

কুমারীর স্ফুরিতাধর মুখখানি দেখিয়া কালিদাস শঙ্কা ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধেও মুখখানি কী সুন্দর—ঠিক যেন—ঠিক যেন—। তিনি ক্রোধ দেখিতে পাইলেন না, সৌন্দর্য্যই দেখিলেন। উপরন্তু ভারি মজার কাহিনীটা রাজকুমারীকে শুনাইতে হইবে। কালিদাসের মুখে হাসি ফুটিল। তিনি আস্তেব্যস্তে শয্যাপাশে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন—

কালিদাস: সে ভারি মজার গল্প। শুনবে?—তবে বলি শোনো—

কাট্।

রাজপ্রাসাদের বিশ্রান্তিগৃহে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ এক খট্বার উপর পৃষ্ঠে বহু উপাধান দিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সবেমাত্র বিপুল পান-ভোজন শেষ করিয়াছেন; খট্বার নিকটে একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর এখনও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পড়িয়া আছে। যুবরাজের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতেছে, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। একটি কিঙ্করী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে।

পুস্তপাল মহাশয় স্ফটিকপাত্রে দ্রাক্ষাসব ভরিয়া যুবরাজের সম্মুখে ধরিলেন। যুবরাজ এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং জড়িতস্বরে কহিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: বিচার ··· জামাতাই হোক আর বিমাতাই হোক—শূলে দেওয়া চাই ··· নচেৎ—

তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার নাসিকা হঠাৎ ঘর্ঘর শব্দ করিয়া উঠিল

পুস্তপাল কিঙ্করীকে ইঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া জানাইলেন—আরও জোরে পাখা চালাও। তারপর কতক নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশব্দ বিড়াল-গতিতে দ্বারের পানে চলিলেন

দ্বারের ঠিক বাহিরেই কুন্তলরাজ ও মহামন্ত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুস্তপালকে আসিতে দেখিয়া যুগপৎ ভ্রূ দ্বারা প্রশ্ন করিলেন। পুস্তপালও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিলেন যে যুবরাজ নিদ্রিত।

তিনজনে একত্র হইলে মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা আরম্ভ হইল

কুন্তলরাজ: আজ রাত্রির মত নিশ্চিন্ত। কিন্তু—তারপর?

মহামন্ত্রী: উভয় সঙ্কট। এক, রাজ-জামাতাকে শূলে দিতে হয়—নচেৎ—

কুন্তলরাজ: সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ—

তিন জনে পরস্পর চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন

মহামন্ত্রী: যদি যুদ্ধ হয়, সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় আমাদের কোনও আশা নেই—

কুন্তলরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন

কুন্তলরাজ: অর্থাৎ—রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে—

তিনজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। সহসা ঘরের ভিতর হইতে সৌরাষ্ট্রকুমারের কণ্ঠস্বর আসিল; তিনি নিদ্রাবশে বিকৃত কণ্ঠে বলিতেছেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: প্রতিশোধ—শূল—

পুস্তপাল গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, যুবরাজ ঘুমন্ত পাশ ফিরিতেছেন; পুস্তপাল কিঙ্করীকে জোরে পাখা চালাইবার ইসারা করিলেন। যুবরাজের গলার মধ্যে বাকি কথাগুলা অস্পষ্ট রহিয়া গেল—

সৌরাষ্ট্রকুমার: চোরের দণ্ড—শূল দণ্ড!

তিনজন পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন। কুন্তলরাজ এতক্ষণ লৌহবলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইবার তিনি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। উদ্গত বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠে রোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কুন্তলরাজ: আমার কন্যা—

তাঁহার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল

মহামন্ত্রী ও পুস্তপাল অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। মহামন্ত্রীর মুখ দুরূহ-দ্রুত চিন্তায় ভ্রূকুটি কুটিল হইয়া উঠিল। একটা কিছু উপায় বাহির করিতেই হইবে—করিতেই হইবে—

তিনি সহসা রাজার দিকে ফিরিলেন; তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া রাজা ও পুস্তপাল সাগ্রহে আরও কাছাকাছি হইয়া দাঁড়াইলেন

মহামন্ত্রী: রাজ-জামাতার প্রাণরক্ষার এক উপায় আছে—

তিনি সচকিতে বিশ্রান্তি গৃহের দিকে তাকাইলেন, তারপর গলা আরও খাটো করিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রী: আজ রাত্রেই তাঁকে চুপি চুপি রাজ্য থেকে—

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি এমন ভাবে হস্তটি সঞ্চালন করিলেন যাহাতে বুঝা যায় যে তিনি রাজ-জামাতাকে বহু দূরে প্রেরণ করিতে চাহেন; রাজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন; তারপর অস্ফুট স্বরে বলিলেন

কুন্তলরাজ: কিন্তু—বিবাহের রাত্রেই আমার কন্যা—

মহামন্ত্রী: অন্তত রাজকন্যা বিধবা তো হবেন না।

উভয়ে কিছুক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে পরস্পর চাহিয়া রহিলেন ; তারপর রাজা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন

কাট্।

শয়ন-মন্দিরে কালিদাস গল্প বলা শেষ করিতেছেন। রাজকুমারী তেমনি শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া আছেন ; ক্ষোভে হতাশায় তাঁহার চোখে যে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে, তাহা কালিদাস দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে কাহিনী শেষ করিলেন

কালিদাস : তারপর এখানেও সকলে আমাকে সৌরাটের যুবরাজ বলে ভুল করলে—ভারি মজা হল—না ?

রাজকুমারী বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

রাজকুমারী : মজা—! হা অদৃষ্ট ! আমার ললাটে বিধি এই লিখেছিলেন ! একটা কাঠুরের সঙ্গে—তাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তুমি মূর্খ—মূর্খ ! পৃথিবীতে যা আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি, তুমি তাই—

রাজকুমারী আবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন। হাস্যরত বালকের গণ্ডে অকস্মাৎ চপেটাঘাত করিলে তাহার মুখভাব যেরূপ হয় কালিদাসেরও সেইরূপ হইল। কোথায় কি ভাবে তিনি কোন্ অপরাধ করিয়াছেন, কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না

রাজকুমারীর স্কন্ধ ও অংস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে ; কালিদাস ব্যথিত স্বরে বলিলেন

কালিদাস : রাজকুমারী, তুমি আমার ওপর রাগ করলে ? কিন্তু আমি তো কোনও দোষ করিনি ! রাজকুমারী—

তিনি সঙ্কোচভরে কুমারীর স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে কুপিতা সর্পীর মত রাজকুমারী তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন

রাজকুমারী : ছুঁয়ো না ! কোন্ স্পর্দ্ধায় তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর ?—মূর্খ, নিরক্ষর গ্রামীণ !

প্রত্যেকটি শব্দ নিষ্ঠুর কশাঘাতের মত কালিদাসের মুখে পড়িল। এই সময় দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া রাজকুমারী জ্বলন্ত চক্ষু সেদিকে ফিরাইয়াই বলিয়া উঠিলেন

রাজকুমারী : ওঃ ! পিতা !

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে রাজা আসিতেছিলেন, কুমারী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িলেন ; জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন

রাজকুমারী : রাজাধিরাজ, আমাকে রক্ষা করুন—এই নিরক্ষর গ্রামীণের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন—

রাজা বুঝিলেন কুমারীও সত্য কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি কন্যার মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া কঠোর চক্ষে কালিদাসের পানে চাহিলেন

কুন্তলরাজ : হুঁ।—এদিকে এস।

কালিদাস কুণ্ঠিত পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ক্ষণকাল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কঠিন স্বরে কহিলেন—

কুন্তলরাজ : তুমি শঠতা করে কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছ !

কালিদাস : শঠতা !

রাজার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ মিশিল

কুন্তলরাজ : প্রিয়দর্শন বালক, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল ? তুমি চুরি করতে গেলে কেন ?

পাণ্ডুর মুখে কালিদাস চাহিয়া রহিলেন ; ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—

কালিদাস : চুরি ! কিন্তু আমি তো চুরি করিনি

কুন্তলরাজ : করেছ। শুধু তাই নয়, আমার রাজ্যের সর্ব্বনাশ করতে বসেছ, কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। এস আমার সঙ্গে !

কন্যার দিকে হেঁট হইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজ : কন্যা, অধীর হয়ো না। তুমি রাজ-দুহিতা—বিদুষী। ধৈর্য্য হারাইও না !

কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া রাজা কালিদাসকে সংক্ষিপ্ত আদেশ করিলেন

কুন্তলরাজ : এস।

রাজা ফিরিয়া চলিলেন ; কালিদাস তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অনুবর্ত্তী হইলেন। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া কালিদাস একবার ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী তেমনি নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন ; তাঁহার ক্ষোভ-বিধ্বস্ত মুখখানি বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে

ডিজল্‌ভ্।

আকাশে চন্দ্র পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তোরণের দীপগুলি কতক নিবিয়া গিয়াছে, কতক নিব-নিব। নগরীর শব্দগুঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে

তিনটি অশ্ব তোরণ-সম্মুখে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। দুই পার্শ্বের দুটি অশ্বের পৃষ্ঠে দুইজন রক্ষী ; মধ্যে কালিদাস। কালিদাসের দুই হস্ত পৃথক-ভাবে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ; প্রত্যেক রক্ষী একটি করিয়া রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া আছে

প্রধান রক্ষী মস্তক সঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিল। তখন তিনটি অশ্ব একসঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সম্মিলিত ক্ষুরধ্বনি চন্দ্রালোকিত নিশীথের মৌন তন্দ্রা ক্ষণেকের জন্য সচকিত করিয়া তুলিল।

ওয়াইপ্।

নিবিড় বনের উপান্ত। অশোকস্তম্ভের ন্যায় একটি স্তম্ভ এই নির্জনে

দাঁড়াইয়া কুন্তলরাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ করিতেছে। অস্তমান চন্দ্রের দূরপ্রসারী ছায়া ভূমির উপর কৃষ্ণ সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে।

অশ্বারোহী তিনটি অশ্ব স্তম্ভের পাশে ছায়ারেখার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। রক্ষী দুইজন কালিদাসের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল; প্রধান রক্ষী নিঃশব্দে কালিদাসকে অশ্ব হইতে নামিবার ইঙ্গিত করিল। কালিদাস নামিলেন। প্রধান রক্ষী সম্মুখের অরণ্যানীর দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল

রক্ষী : যাও, আর কখনও এ রাজ্যে পদার্পণ ক'রো না। মনে রেখো কুন্তলরাজ্যে প্রবেশ করলেই তোমার শূলদণ্ড—

কালিদাস বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া স্খলিত পদে বনের দিকে চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, রক্ষীরা স্থিরভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া, শূন্যপৃষ্ঠ অশ্বটিকে মধ্যে লইয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে মন্থর গতিতে ফিরিয়া চলিল

ফেড্ আউট।

ফেড্ ইন্।

প্রভাত। বনের পাতায় পাতায় সোনালি সূর্য্যকিরণ লাগিয়াছে। মাকড়শা'র জালে শিশিরবিন্দু এখনও শুকাইয়া যায় নাই। পাখীর কলধ্বনি ও বানরের কিচিমিচিতে বনস্থলী পূর্ণ।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ; তাহার স্থূল মূলগুলি স্থানে স্থানে মাটির গোপনতা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ একটি মূলের উপর মাথা রাখিয়া কালিদাস উপুড় হইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহার শয়নের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, রাত্রে অন্ধকারে যেখানে হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছেন, সেইখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

একটি বানর-শিশু এই সময় এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের কোল ঘেঁষিয়া বসিল এবং একটি বৃক্ষচ্যুত ফল তুলিয়া লইয়া সেটিকে পরম যত্নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঘুমন্ত কালিদাসের অঙ্গে উষ্ণ স্পর্শ লাগিতেই তিনি একটি হাত দিয়া বানর-শিশুটিকে জড়াইয়া লইলেন। বানর-শিশু এই আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত ছিল না; হঠাৎ ভয় পাইয়া কালিদাসের হাতে এক কামড় দিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। কালিদাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এক হাতে ভর দিয়া কালিদাস ক্লান্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। বেশবাস ছিন্ন, অঙ্গ ধূলিমলিন; চোখের কোণে ও গণ্ডে অশ্রুর চিহ্ন শুকাইয়া আছে। দেহ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তবু তিনি চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তারপর দীর্ঘ একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া শ্লথচরণে চলিতে আরম্ভ করিলেন

ডিজল্‌ভ্।

মরুভূমির অগ্নিবর্ষী দ্বিপ্রহর। বালুকণা উড়িয়া আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। এই তপ্ত বালুঝটিকার ভিতর দিয়া উদ্ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্তের মত কালিদাস চলিয়াছেন। তাঁহার মুখে চোখে কোন্ এক দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষা জ্বলিতেছে; বহিঃপ্রকৃতির প্রচণ্ডতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই।

বালু-কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া একটি ভগ্ন দেবায়তনের বহিঃপ্রাচীর দেখা গেল। কালিদাস সেইদিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন; প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলেন।

প্রাচীর ধরিয়া কোনও ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণকাল ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। তারপর চোখ খুলিয়া দেখিলেন তিনি যেস্থানে বাহুর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন উহা একটি বিরাট মূর্ত্তির উরুস্থল। কালিদাস ঊর্দ্ধে চাহিলেন; প্রাচীরে খোদিত বিশাল শঙ্কর-মূর্ত্তি যেন এই বহ্নি-শ্মশানে তপস্যা-রত। কালিদাস নতজানু হইয়া মূর্ত্তির পদমূলে মাথা রাখিলেন; তারপর গলদশ্রুচক্ষু দেবতার মুখের পানে তুলিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন

কালিদাস : দেবতা, বিদ্যা দাও!

ডিজল্‌ভ্।

দিগন্তহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত হইতেছে। কালিদাস একাকী সেইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বলিতেছেন—

কালিদাস : সূর্য্যদেব, তুমি জগতের অন্ধকার দূর কর —আমার মনের অন্ধকার দূর করে দাও। বিদ্যা দাও!

ডিজল্‌ভ্।

মহাকালের মন্দির। কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আকাশে চূড়া তুলিয়াছে; চূড়ার স্বর্ণ-ত্রিশূল দিনান্তের অস্তরাগ অঙ্গে মাখিয়া জ্বলিতেছে। সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা ঘোর রবে বাজিতেছে। মন্দির অঙ্গনে লোকারণ্য। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জোড়হস্তে তদ্গতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

আরতি শেষ হইলে সকলে অঙ্গনের উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণত হইল প্রাঙ্গণের এক কোণে এক বৃদ্ধ প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুক্তকরে মন্দিরের পানে চাহিয়া প্রার্থনা করিল

বৃদ্ধ : মহাকাল, আয়ু দাও!

অনতিদূরে একটি নারী নতজানু অবস্থায় মন্দির উদ্দেশ করিয়া কহিল

নারী : মহাকাল, পুত্র দাও—

বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণধারী এক সৈনিক উঠিয়া দাঁড়াইল

সৈনিক : মহাকাল, বিজয় দাও—

বিনতভুবনবিজয়ীনয়না একটি নবযুবতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—

যুবতী : মহাকাল, মনোমত পতি দাও—

দীনবেশী শীর্ণমুখ কালিদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাস : মহাকাল, বিদ্যা দাও!

ডিজলভ্।

পাতা-ঝরা একটি কানন। নিষ্পত্র বৃক্ষশাখাগুলি আকাশে জাল রচনা করিয়াছে। নির্বিঘ্ন আলোক বনতলের কুণ্ঠিত লজ্জা হরণ করিয়া লইয়া ভূ-লুণ্ঠিত শুষ্ক পল্লবের মধ্যে সকৌতুক ক্রীড়া করিতেছে।

একটি আট-নয় বছরের গৌরাঙ্গী বালিকা এই বনভূমির উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, কণ্ঠে কুন্তলে বাহুতে শ্বেত পুষ্পের আভরণ। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পিছনে তাকাইতেছে, আবার নাচিতে নাচিতে আগে চলিয়াছে

বালিকা: নীল সরসী জলে সিত কমলদলে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

লাস্যচপলচরণে বালিকা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল; তাহার গানের ধ্বনিও ক্ষীণ হইয়া আসিল।

কাট্।

বনের অন্য অংশ। কালিদাস মোহগ্রস্তের মত বালিকার সঙ্গীতধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ বিশীর্ণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট; এক দুরন্ত উৎকণ্ঠা তাঁহাকে ঐ অশরীরী সঙ্গীতের পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে

কাট্।

বালিকা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

বালিকা: হিম তুষার গলা আমি নির্ঝরিণী
মোর নূপুর বাজে রুম্ রিণ্‌কি ঝিণি
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

উপলবঙ্কিমগতি একটি শীর্ণ জলধারা লঙ্ঘন করিয়া বালিকা নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল

তাহার গানের রেশ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই কালিদাসকে আসিতে দেখা গেল। ব্যগ্রচক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে তিনি আসিতেছেন। কোথায় গেল সে সঙ্গীতময়ী? জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, তারপর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া চলিতে লাগিলেন

কাট্।

বালিকা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছে। দূর পশ্চাৎপটে একটি কমলপূর্ণ সরোবর; বালিকা সেইদিকে চলিয়াছে

বালিকা। যেথা মরাল চাহে—ফিরি ফিরি
যেথা কপোত গাহে—ধীরি ধীরি—
তীর বনে—নিরজনে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

বালিকা দূরে চলিয়া গিয়াছে; কালিদাস তাহাকে দেখিতে পাইয়া উন্মাদের মত তাহার পশ্চাতে চলিয়াছেন। সরোবরের ঘাটে দাঁড়াইয়া বালিকা একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল; তারপর মৃদু হাসিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল।

কালিদাস যখন ঘাটে পৌঁছিলেন তখন বালিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে একদল কমল বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন বালিকা এইমাত্র জলে ডুব দিয়া ঐখানে অদৃশ্য হইয়াছে। ঘাটের নিম্নতম সোপানে দাঁড়াইয়া কালিদাস পাগলের মত জলের পানে চাহিলেন—

কালিদাস: কোথায় গেলে? দেবি, তুমি কোথায় গেলে?

বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল

চঞ্চল পদ্মগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন

কালিদাস: দেবি, শুনেছি তুমি পদ্মবনে থাকো—আমাকে দয়া কর, বিদ্যা দাও—নইলে—নইলে—

কালিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া ঘাটের উপর পড়িয়া গেলেন

ডিজলভ্।

মূর্চ্ছিত কালিদাস অনুভব করিলেন, সরোবরের স্বচ্ছ জলতলে তিনি শুইয়া আছেন; দিক্-আলো-করা এক পূর্ণযৌবনবতী দেবীমূর্ত্তি শুচিস্মিত হাস্যে তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন

দেবী: কালিদাস!

কালিদাসের ভাবাতুর নেত্র নিমীলিত; তিনি যুক্তকরে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন

কালিদাস: মা!

দেবী: তুমি আমার বরপুত্র, তোমার কাব্য জগতে অমর হয়ে থাকবে। বারাণসী যাও, সেখানে আচার্য্য পাবে। ওঠ বৎস।

কালিদাস হর্ষোৎফুল্ল মুখে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল উচ্চারিত হইল

কালিদাস: মা মা মা—

দেবী অবনত হইয়া কালিদাসের শিরশ্চুম্বন করিলেন। তারপর অপূর্ব্ব সুন্দর জ্যোতিরুৎসবের মধ্যে দেবী-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফেড্ আউট্।

মধ্য বিরাম ক্রমশঃ

জাপ-যুদ্ধ ও ভারতের শিল্প-বাণিজ্য

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থা আরও কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে, কারণ তখন হইতে পরস্পরে বাণিজ্যের আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে ; এমন কি এই সকল দেশের শিল্প ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত মূলধন ও আমানত টাকা একেবারে জমাইয়া (freeze) দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ উহাতে প্রাণশক্তি নাই বা আর কার্য্যকরী নহে। সহজ বাঙ্গলায় ইহা 'বাজেয়াপ্ত' করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন দ্বারা অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও আজ ভারতবাসী জাপানের সহিত যুদ্ধরত। সুতরাং জাপানের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। জার্ম্মাণী, ইটালী ও তাহাদের সহকারী এবং অধিকৃত দেশগুলিও আমাদের শত্রুপর্য্যায়ভুক্ত ; তাহাদের সহিত সমস্ত কারবার বন্ধ হইয়াছে ; এই সকল কারণে আজ ভারত-বাণিজ্যের অতি গুরুতর অবস্থা। ভারতের অধিকাংশই কাঁচা মাল, সুতরাং বিক্রীত না হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া পড়ে।

এতদিন ইউরোপে যুদ্ধ চলিলেও জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মাল ক্রয় বিক্রয়ে জাপানের স্থান বরাবরই দ্বিতীয় ছিল এবং তাহার তুলার প্রয়োজনের অনুপাতে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করিয়া আসিতেছে। ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৫-২৬ সালে জাপানের কাঁচা তুলার আমদানী ছিল যথাক্রমে ৪২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা ও ৪১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা। ইদানীং ইহা অনেক হ্রাস পাইয়াছে, কারণ আমদানী শুল্কের হার বৃদ্ধি করার ফলে জাপানী কার্পাস দ্রব্যাদি ভারতে কম আমদানী হওয়ায় এবং ইংরাজের মাল জাপান অপেক্ষা কম শুল্কে ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করায় জাপান ভারতীয় তুলা কম লইতে থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে জাপান মাত্র ১০ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকার ভারতীয় তুলা আমদানী করিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে জাপান প্রচুর লোহা আমদানী করিতেছিল। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা গড়ে বৎসরে ১৯ লক্ষ টাকার লোহা লইত, ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১ কোটী ৬২ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। অপর বড় রপ্তানীর মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি, তাহাও ৪৬ লক্ষ টাকা পরিমাণ। সর্ব্বসাকুল্যে ভারত হইতে জাপানে মোট আমদানীর পরিমাণ ১৪ কোটী টাকা।

জাপান হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১৯ কোটী টাকা, তন্মধ্যে তুলাজাত দ্রব্যাদি প্রধান বা আট কোটী টাকা। কৃত্রিম রেশম প্রতি বৎসর চার কোটী হইতে দুই কোটী টাকা আসে ; পশমী বস্ত্র ৭০ লক্ষ (কথনও কথনও দেড় কোটী টাকা) এবং কাচ দ্রব্যাদি ৬০ হইতে ৬৫ লক্ষ টাকা। বাঙ্গলার একটী প্রধান সম্পদ রেশম ; এক সময় এক কোটী টাকার অধিক মূল্যের মাল এক বৎসরে রপ্তানী হইয়াছে, আজ আর রপ্তানি ত নাইই, উপরন্তু নানা স্থান হইতে উহা আমদানি করা হয়। জাপানের অংশ কমিয়া গিয়া ৭৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে ; তাহা না হইলে দেড় হইতে দুই কোটী টাকা ছিল। অন্যান্য বহু মাল, বিশেষতঃ সস্তার মাল মাত্রেই জাপানের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। অনেক দরিদ্রের সখ মিটাইবার, এমন কি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিবার ভার জাপান লইয়াছিল। আজ তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে ; খেলনা, রবারের জিনিষ, প্রসাধনের সামগ্রী, সাইকেল, গ্রামোফোন প্রভৃতি অধিকাংশ জাপান ভারতে আনিয়া হাজির করিত। কষ্ট যে অনেকের হয় নাই তাহা কেহ বলিবে না, কিন্তু এই দুঃখের ও নিরাশার মধ্যে কিছু আশার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই যুদ্ধ কতদিন চলিবে বলা যায় না। সুতরাং এই অবকাশে কিছু গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইতেছে, এখন কর্ম্মতৎপর হইয়া অগ্রসর হইলে হয়ত কতক পরিমাণ সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

এক কৃত্রিম রেশমজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা ছাড়া ভারতে জাপান হইতে আনীত আর কোনও বস্তু তৈয়ারী করা বর্ত্তমানে মোটেই কঠিন নহে। প্রায় সমস্ত মাল মশলা দেশের মধ্যেই পাওয়া যায়, সুতরাং সে দিক দিয়া অসুবিধা নাই। যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, তাহার কিছু অভাব ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি যুদ্ধ অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে কতক কতক যন্ত্রাদি যে এখানেই তৈয়ারী হইয়া যাইবে তাহা এখন এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। সকল দেশ হইতে আনীত সকল বস্তুই যে দেশের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে বা তাহা করা সম্ভব, একথা কেহ বলিবে না ; কিন্তু প্রধান কয়েকটা জাপানী আমদানির যে তালিকা দিয়াছি, তাহা এ দেশে হওয়া সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। বরং বলা যায়, কাচ, রবার, কার্পাস বস্ত্রাদি, মোজা গেঞ্জি, প্রসাধন সামগ্রী, সাইকেল, দিয়াশলাই, কাগজ প্রভৃতি এ দেশে তৈয়ারী হইতেছে এবং জাপানের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে।

কৃত্রিম রেশম শিল্প এতদিন যে গড়িয়া উঠে নাই, তাহা অনেকটা কলঙ্কের কথা। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প গড়িয়া তুলিতে যে কত প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় তাহা অনেকেই জানেন না। ভারতে কাচ শিল্পের সূচনায় জাপানী করিতকর্ম্মা (expert) আনা হইয়াছিল। পাছে ভারতে এই শিল্প গড়িয়া উঠে, সে কারণে তাহারা ইহার মোটেই সহায়তা করে নাই ; অপরপক্ষে অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কৃত্রিম রেশম শিল্প এখন যে সকল দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে, তাহার মধ্যে জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও ইটালী প্রধান। প্রথম প্রথম এই কার্য্যে যে লোক দরকার, তাহা পাইতে অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। যন্ত্রপাতি পাইতে আরও কষ্ট হইয়াছে, অনেক আসে নাই। যে দামে বিদেশীরা এখানে কৃত্রিম রেশম বিক্রয় করে, তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একপ্রকার দুঃসাধ্য

ব্যাপার। এখন ত নয়ই, যুদ্ধের পরেও এদেশে এই শিল্প গড়িয়া তুলিতে প্রথমে কতকটা রক্ষণশুল্কের প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

যাহাই হউক, জাপান হইতে আনীত দ্রব্যাদি সম্পর্কে শিল্প গড়িয়া উঠিলে যে দেশের নানা দিক দিয়া মঙ্গল হইবে তাহা নহে, সেই যে শৈশব হইতে জাপানী খেলনা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া জাতীয়তায় বনিয়াদ দুর্ব্বল করিয়া রাখি, সেই লজ্জার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া বাঁচিতে পারিব।

আমাদের প্রধান ক্ষতি তুলা উৎপাদনকারী চাষী ও তুলা ব্যবসায়ীদের। প্রথম কথা, যদি আমরা নিজেদের শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে এক্ষতি সহ্য করা লাভেরই হইবে। তাহা ছাড়া দেশের কলগুলিতে অধিক পরিমাণ দেশী তুলা ব্যবহৃত হইতেছে এবং সকলেই চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ভারতে ছোট আঁশের তুলার পরিবর্ত্তে দীর্ঘতন্তুতুলা অধিক পারমাণে উৎপাদন করিতে পারা যায়। এ দিক দিয়া কতক সুবিধা হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

শেষ কথা, যুদ্ধান্তে আমরা জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকিতে পারিব কি না? যদি শিল্প দৃঢ়ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ও সময় পায়, তখন ওদিকে চিন্তার কোনও কারণ নাই। দেশের মালমশলা, দেশের কারখানায় দেশী মজুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দেশেই বিক্রীত হইলে, কেন সস্তায় দেওয়া যাইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি তাহাতেও না হয়, তখন শুল্কের চাপ দিয়া আমদানি হ্রাস করা সম্ভব হইয়া পড়িবে। এত দিন জাপানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভারত-সরকার, তথা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, জাপানের অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধ শেষে বিজিত জাপানকে সেই পরিমাণ সহানুভূতি বা সহৃদয়তা দেখাই-বার প্রয়োজন হইবে না; বরং যে ভারতবাসী তাহার সাম্রাজ্য রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এবং ধনজন দিয়া সহায়তা করিতেছে তাহার দিকে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা প্রকাশ করিতে কৃপণতা করিবে না। এই সকল সম্মিলিত চেষ্টার ফলে যুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষ জাপানের গ্রাস হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

একই ঢাকে বাজে দুইয়েরই বাজনা তাই—

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

ধনীর গৃহের মাংস ও রুটী, পড়েছে পথের 'পরে—
সখের পালিত কুকুরেরা তাই করিতেছে মাতামাতি।
ভুখারী ক্ষুধায় বেদনা জানায়, তাহারই দুধার ধরে—
শতধা ছিন্ন, অশ্রু-সিক্ত, মলিন বসন পাতি॥

মত্ত কুকুর মাতামাতি করে মনিবের মহিমায়;
তাহাদের পানে চাহিয়া ভুখারী, নীরবে চলিল পথে—
করুণার কণা তাহার ভাগ্যে জুটিল না তবু হায়।
বাঁচার আশায় মরণোন্মুখ, চলিল সে কোনমতে॥

অভিশাপ দিয়ে অভিমান করে, অবিচার রেখে ঢাকা,
ভুখারী বন্ধু! মরিয়া কেবল প্রতিকার চাই ভাই;
আবাহন আর বিসর্জ্জনের মাঝেতে বাঁচিয়া থাকা।
একই কাঠি, আর একই ঢাকে বাজে, দুইয়েরই বাজনা তাই।



জঙ্গম

বনফুল

চতুর্থ অধ্যায়

১

সাহিত্যিক জীবন! ইহার নাম সাহিত্যিক জীবন? 'সংস্কারক' আপিসের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া 'প্রুফ' সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর মনে মনে নিজের সাহিত্যিক জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা অনুভব করিল তাহা গৌরবজনক নহে। সাহিত্যিক মানে কেরাণী? সাধারণ কেরাণীর মতো সে-ও তো দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়া পরের ফরমাশ অনুযায়ী কলম পিষিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল! গোটা দুই বাজে উপন্যাস, চলনসই কয়েকটা গল্প এবং চানাচুর-মার্কা কয়েকটা কবিতা লেখা ছাড়া আর কি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সে! ভাল লেখা দূরে থাক, ভাল বই পড়িবারই তো অবসর পায় নাই। চাকরি বজায় রাখিতেই সমস্ত শক্তি ও সময় চলিয়া যাইতেছে। 'সংস্কারক'-সম্পাদকের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের রুচি অনুযায়ী লেখা নির্ব্বাচন করিতে এবং সেই দুর্ব্বল রচনাগুলিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করিয়া মাসের ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশ করিতেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, নিঃসন্তান সম্পাদক মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় নিলয়কুমারকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাহার যে-কোন রচনাকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-মর্য্যাদা দিয়া ছাপিতে হয়, তাহার বন্ধুদের অন্তসারশূন্য সাহিত্যিক-চালিয়াতি নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইহাই তাহার বর্ত্তমান চাকরি এবং ইহাই তাহার সাহিত্য-চর্চ্চা। অথচ এই চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কত কৌশল, কত প্রচেষ্টা। ডাক্তার মুখার্জির সুপারিশে প্রুফ-রীডার হইয়া মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সে 'সংস্কারক' আপিসে ঢুকিয়াছিল, তাহার পর এই দুই বৎসরের মধ্যে নিজের দক্ষতাগুণেই হউক বা ডাক্তার মুখার্জির গোপন সুপারিশবলেই হউক তাহার পদোন্নতি ঘটিয়াছে। সে এখন প্রুফ-রীডার নয়, সহকারী-সম্পাদক। দুই বৎসর পূর্ব্বে হীরালাল মজুমদারের সহকারী হইবার কল্পনা তাহার পক্ষে কল্পনা-বিলাস হইত, কিন্তু এখন সেই সহকারী-পদ পাইয়া সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে—কিছু হইল না, কিছু হইল না, সময়টা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। মনে হইতেছে, অহরহ মনে হইতেছে, কিন্তু চাকরি ছাড়িবার উপায় নাই। কলিকাতা শহরে অর্থই একমাত্র বল। মাস শেষ হইলে অন্ততপক্ষে দেড়শত টাকা চাইই। চাকরি ছাড়া চলিবে না, বরং চাকরিটা যাহাতে আরও পাকা হয় সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিতেছে। আপিসে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, নিলয়কুমারের বন্ধু। অনেকে বলেন নিলয়কুমারের চর। মামার আপিসের সমস্ত হালচালের সম্পূর্ণ খবর রাখিবার জন্যই নাকি নিলয়বাবু চণ্ডীচরণবাবুকে আপিসে ঢুকাইয়াছেন। তিনি আপিসে আসিয়াই একটি দল পাকাইয়াছেন। দলটি শঙ্করকে শত্রু-পক্ষীয় বলিয়া মনে করে। মনে করে শঙ্কর হীরালালবাবুর গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্করের আশঙ্কা, এই চণ্ডীচরণবাবুর চক্রান্তেই হয় তো তাহার একদিন চাকরি যাইবে। কারণ, কাগজে-কলমে হীরালালবাবু মালিক হইলেও আসল মালিক নিলয়কুমার। তাই নিলয়-কুমারকে তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্কর ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার জন্য মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু বাহিরে ব্যগ্র হইতেছে। আজই তো সমস্ত দিন ধরিয়া সে সদ্য-বিবাহিত নিলয়কুমারের জন্য সস্তায় একটি বাড়ি ঠিক করিয়া আসিল। নিলয়কুমার নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া মাতুলের বাড়িতে থাকিতে চান না। এতদিন মাতুলের কাছেই ছিলেন কিন্তু বিবাহ করিবামাত্র তাঁহার আত্মসম্মান-বোধ সম্ভবত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অন্য বাসায় উঠিয়া যাইতে চান, হীরালালবাবুও নাকি ইহাতে মত দিয়াছেন। চণ্ডীচরণবাবু ও নিলয়বাবু নিজেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভদ্রপল্লীতে সস্তায় বাড়ি আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না, আজ শঙ্কর বাড়িটা খুঁজিয়া দিয়া চণ্ডীচরণ দস্তিদারের উপর টেক্কা দিয়াছে। নিলয়কুমার এবং তৎপত্নী

রেণুকা যদি সুপ্রসন্ন থাকেন শঙ্করের চাকরি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হীরালালবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, নিজে কিছু দেখিতে পারেন না। নিলয়কুমার আপিস-ডিরেক্টার-হিসাবে মোটা মাসোহারা লইয়া আপিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইঁহাকে সন্তুষ্ট না করিলে চাকরি থাকিবে না।

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্ত্তা শুনিলে দিগগজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোন শাঁস নাই। শঙ্কর ইহা জানে কিন্তু ভুলিয়া কখনও তাহা প্রকাশ করে না, বরং আচার ব্যবহারে এমন একটা সশ্রদ্ধ ভাব দেখায় যে, সে যেন নিলয়কুমারের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। বাড়ি খুঁজিয়া দিয়া শঙ্কর তাঁহাকে আজ আরও খুশি করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রেণুকা দেবীর একটি অতি-সাধারণ কবিতার এমন উচ্ছ্বসিত অনর্গল প্রশংসা করিয়াছে যে, নিজের আচরণে সে নিজেই বিস্ময়বোধ করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের দলের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে এ কি করিতেছে। ইহাই কি সাহিত্য-চর্চ্চা? সহসা তাহার মন আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা মনে হইল বিবাহ করিয়া এমনভাবে জড়াইয়া না পড়িলে হয় তো তাহার এ অধঃপতন ঘটিত না, অতিশয় যুক্তিহীনভাবে সহসা অমিয়ার উপর রাগ হইল, আবার তখনই মনে হইল—না না, সে বেচারীর দোষ কি। তাহাকে সে-ই তো নিজে যাচিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহ করিয়া সম্ভবত তাহারই প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সমস্ত চিত্রটা মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, হাওড়ার পুল খোলা, রাত্রেই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবে। সঙ্গীরা সবাই মাতাল, একজন রাস্তায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একজন মাঝির ঘুম ভাঙ্গাইল, বেশী পয়সার লোভে সে তাহাদের গঙ্গাপার করিয়া দিতে রাজিও হইল, কিন্তু গঙ্গার এমন অবস্থা যে ডিঙ্গি তীর পর্য্যন্ত আসিতে পারে না। শঙ্কর সঙ্গীদের প্রত্যেককে কাঁধে করিয়া নৌকায় তুলিল। গঙ্গার জলে বিষ্ঠা ভাসিতেছে, চতুর্দ্দিকে কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা। সমস্ত অতিক্রম করিয়া শঙ্কর সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল; হুহু করিয়া একটা হাওয়া উঠিয়াছে, ওপারে কলিকাতা শহরের আলো-আঁধারির রহস্য, রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছে, হুইস্কির নেশাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নৃত্যপরা তন্বীর যৌবন-মাদকতায় কল্পনা আবিষ্ট—মেয়েটার নামটা কি ছিল—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু মনে করিতে পারিল না।

"উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে'র পর ইঞ্চি তিনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কোন কবিতা টবিতা থাকে তো দিন।"

প্রিণ্টার শীতলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্কর রেণুকা দেবীর কবিতাটা দিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। এ ধরণের কবিতা তো প্রতি মাসেই ছাপিতে হয়, রেণুকা দেবীরটা ছাপিতেই বা দোষ কি? ছাপিলে তাহার লাভ বই ক্ষতি নাই। ছন্দ মিল সবই তো ঠিক আছে, ভাবটিও বেশ উদাস-করা উদাস-করা গোছের। মন্দ কি? শীতলবাবু চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর নিজের আচরণে নিজেই অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

২

'ক্ষত্রিয়' অবশ্য এখনও জীবিত আছে।

কিন্তু কোন ক্রমে। কোন আয় তো হয়ই না, মাঘের পত্রিকা চৈত্রে বাহির হয়, তা-ও ভাল লেখা জোটে না। ক্ষত্রিয়ের পুরাতন দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হিরণদা ইরিগেশন বিভাগে বড় চাকরি করিতেছেন, জ্যোতির্ম্ময়বাবু একটা ইংরেজী দৈনিক-পত্রিকার সাব-এডিটার, সুরেন সোম শিক্ষকতা উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ম্মে অবসর লইয়া দেশে গিয়াছেন, সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটা ভারী ওজনের উদ্ভট গোছের প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; ছবি রায় একাধিকবার প্রেমে পড়িয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া, ক্রমবর্দ্ধমান পরিবার লইয়া একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; পরিচিত কেহ তাহাকে দেখিলেই সরিয়া পড়ে, কারণ দেখা হইলেই সে ধার চায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে সাহিত্য-চর্চ্চা ত্যাগ করে নাই, শুষ্ক রুক্ষ কেশভার ও উদভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া সে শঙ্করের কাছে মাঝে মাঝে আসে এবং শেলী, ব্রাউনিং, কীট্‌স্‌ আওড়াইয়া, কাঁদিয়া, উচ্ছ্বসিত হইয়া শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তোলে।

মাঝে মাঝে রোমাণ্টিক ধরণের প্রবন্ধ বা কবিতাও লিখিয়া আনে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার জন্য। ক্ষত্রিয় পত্রিকার আরও তুইজন লেখক জুটিয়াছেন, একজন ডাক্তার মুখার্জি এবং আর একজন লোকনাথ ঘোষাল। ডাক্তার মুখার্জির এমন কলমের জোর আছে তাহা শঙ্কর ইতিপূর্ব্বে জানিত না। লোকনাথ ঘোষাল লোকটিও অদ্ভুতপ্রকৃতির। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক শঙ্কর আর দেখে নাই। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান, সাহিত্য ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু জানিতে চান না। বেহারের এক পল্লীগ্রামে তিনি স্কুল-মাস্টারি করেন এবং মাস্টারি করিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে তাহা সাহিত্য-সাধনায় ব্যয় করেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ঠুন্‌কো সৌখিন ব্যাপার নয়, জীবনের মর্ম্মমূলে সে সাধনা রস-পরিবেশন করে, আলো-বাতাসের মতো তাহা তাঁহার নিকট সত্য ও প্রয়োজনীয়। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক-রূপে লোকনাথবাবুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছে। আলাপ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মুখার্জি এবং লোকনাথবাবুর লেখায় 'ক্ষত্রিয়' সত্যই সমৃদ্ধ। শঙ্করের আশা, তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সত্যই একদা আদর্শ সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হইবে, তাই এত অসুবিধার মধ্যেও সে 'ক্ষত্রিয়'কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখনও সে আদর্শ বহু দূরে, এখনও কেবল নিন্দা এবং গালাগালি দিয়াই কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে হয়। গালাগালির বিষয়ও সেই এক, প্রতিভাহীন বামনদের স্পর্দ্ধিত চন্দ্র-লোলুপতা। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মুখার্জি দিল্লী হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, শঙ্কর তাহাই পড়িতেছিল। ডাক্তার মুখার্জি আজকাল দিল্লীতে, কারণ তাঁহার একমাত্র পুত্র দিল্লীতেই চাকরি করেন।

ডাক্তার মুখার্জি লিখিতেছেন—

শঙ্কর,

আধুনিক লেখকদের ওপর তুমি চটেছ। আমি তোমার চেয়ে বেশীদিন বাংলা দেশে বাস করেছি, আমি তোমার চেয়ে বেশী দেখেছি, তাই চটবার কারণ পাচ্ছি না।

সেকালে রবিবাবুর নাম করলে টিল খেতে হ'ত। আমাদের প্রাণ বাঁচান দায় ছিল। রবিবাবুর ছন্দ নেই, মিল নেই, গাম্ভীর্য্য নেই, ভাষার মাধুর্য্য নেই—এই রকম কত দোষ যে দেখতে পেয়েছিল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা—তা বলবার নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশ্ন-পত্রে রবিবাবুর ভাষাকে চেস্ট বাংলায় রূপান্তরিত করবার জন্যে নম্বর দেওয়া হত।

এখন সেদিন গেছে। এখন রবিবাবু নাকচ হয়েছেন পিচের গন্ধ আর পেট্রোলের গন্ধ কবিতায় ঢোকান নি বলে'!

সেকালে টিকি আর তিলকের মধ্যে ম্যাগ্‌নেটিজম্‌ আর ইলেকট্রিসিটি, বিধবার অলঙ্কারের স্বর্ণে উত্তেজক তাড়িত এবং শূদ্রের চোখের দুষ্ট ম্যাগ্‌নেটিজম্‌ নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ বেরুত। এর জন্যে অনেকেরই ফিজিক্স পড়বার দরকার হয়নি, এমন কি যাঁরা ফিজিক্স চর্চ্চা করতেন তাঁরাও ওই রকম বক্তৃতা দিতেন কেউ কেউ।

সেকালে গল্প বেরুত—ডাকাতরা বৃক্ষকোটরে প্রবেশ করলে, আর ডিটেকটিভ 'মাইক্রস্‌কোপ' লাগিয়ে তাদের ধরে ফেললে।

একালে ইলেকট্রিসিটির বদলে এসেছে ফ্রয়েডিজম্‌ আর সাইকলজি। এখন মা চুমু খেলে বেবির মুখ লাল হয়ে ওঠে, মামা ভাগ্‌নির রিপ্রেশন তাড়াবার জন্যে বক্তৃতা করে। সেকালে যাঁরা মামী কাকীকে কাশী পাঠাতেন তাঁদের কাব্যের একমাত্র বিষয় ছিল সতীত্ব। একালে সতীত্ব নেই। যুবারা সেক্সের বিজ্ঞাপন পড়া (অনেক সময় আবার সেটা কন্টিনেন্টাল নভেল বা সিনেমার মারফত) আর রতিবিলাস খাওয়ার অবসরে রাস্তায় মেয়েদের হাত ধরে' নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ঘুমন্ত মুঠোয় টাকা গুঁজে দিয়ে চলে আসছে। সেকালের প্রব্‌লেম ছিল 'ক' 'খ'-জানা মেয়ের হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা। এখনকার প্রব্‌লেম হয়েছে লেবার-এর দুঃখ। যেখানে ভিক্ষা পেলেই পেট ভরে' খেতে পাওয়া যায়, যেখানে অতি অধমেরও কাকা দাদা প্রভৃতি আশ্রয়স্থল আছে—সেখানকার লেবার প্রব্‌লেম কি মর্ম্মান্তিক!

এক খামচা লঙ্কাবাটা বা একটা পেঁয়াজ দিয়ে যারা একথালা ভাত খায়, তাদের পাড়ায় যেতে হয় ডিমের খোলা মাড়িয়ে! গিয়ে দেখতে হয় দরমার দেওয়ালে খবরের কাগজের ওয়াল পেপার আর বালিশের তলায়—দি ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'।

সেকাল আর একাল পাশাপাশি বসিয়ে দেখ, ইউক্লিডের ফোর্থ থিয়োরেমের মতো মিলে যাবে।

এখনকার অধঃপতনে দুঃখ বা রাগ হতে গেলে প্রি-সাপোজ করতে হয় যে, এর আগে এক সময় এর চেয়ে ভাল কিছু ছিল।

সেকালে দেখেছিলুম একজন মহাত্মা ভদ্র কুলবধূর নাম ক'রে কেচ্ছা করলেন, আর চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়ে গেল। শেষে তাঁর জেল হল। কিন্তু যে দিন জেল থেকে বেরুলেন, কলেজের ছেলেরা মাথায় করে তাঁকে নিয়ে এল। একালে দেখি সিবিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভ্‌মেণ্টএ দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে, নিজেদের ডিফেণ্ড করছে না। জেলে গিয়ে কিন্তু মালিশের তেল বা পানের চুন কম হ'লে আকাশ-ফাটা আর্ত্তনাদ করছে, আর হরলিক্‌স্ মিল্ক না পেলে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করছে। সেকালের সাহিত্য বা পলিটিক্স যা ছিল একালেও ঠিক তাই আছে, বাইরের চেহারাটায় একটু অদল-বদল হয়েছে মাত্র। দাণ্ডী-মার্চ বা সল্ট-রেড-এর সাবলাইম রিডিকুলাস কারুর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করল না। বিহার ভূমিকম্প কারুর কাব্যের খোরাক জোগাল না! এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখি—সিরাজ এবং ইংরেজ যখন বঙ্গদেশের বুকে সমুদ্রমন্থন করছিল তখন বই বেরিয়েছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত। কি আর বলি, তোমরা সবাই ভাল। ইতি

শুভার্থী
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার মুখার্জির পত্রখানা পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার ঠিক এইরূপ সে এতদিন দেখে নাই। আধুনিক-নামা এই অপদার্থ লোকগুলার সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীই যেন বদলাইয়া গেল। ইহারা যে এই পরাধীন দেশের সনাতন মনোবৃত্তিরই নব-রূপ, তাহা এতদিন তাহার ধারণাতে আসে নাই। সহসা তাহার মনে হইল, সে কি নিজেও তাহাদেরই দলভুক্ত নয়, না হয় তাহার ধরণটা একটু ভিন্ন রকমের। সে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় উহাদের রচনাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ কি সত্যই সাহিত্যিক ব্যঙ্গ? তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি নাই? আধুনিক লেখকদের হঠাৎ-জনপ্রিয়তা কি তাহার চিত্তকে ঈর্ষ্যা-ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই? এই ঈর্ষ্যা এবং এই ঈর্ষ্যা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মহত্ত্বের অভিনয় করা—কি পরাধীন জাতির মজ্জাগত প্রবৃত্তি নয়? যে পরাধীনতার প্রকোপে এই আধুনিকেরা নকল-নবীশ সেই পরাধীনতার প্রকোপে সে-ও ঈর্ষ্যা-ক্লিষ্ট নকল-সংস্কারক। কিন্তু না, না··· সহসা শঙ্করের যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। নিজেকে এতটা হীন সে ভাবিতে পারিল না। ঈর্ষ্যা? ঈর্ষ্যার জন্যই সে এত সব করিয়াছে? আর একটা কথা তাহার মনে হইল। উহাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতে তো তাহার বাধে নাই। একই হোটেলে একই ধরণের আহার্য্য ও মদ্য সেবন করিয়া একই বারবনিতার বাড়িতে রাত্রি কাটাইতে তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই; এমন কি যাহাদের সঙ্গে এই সূত্রে বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে তাহার উগ্রতাটা যেন অনেকটা কম হইয়া আসিয়াছে। মানসিক শুচিতাই যদি তাহার ব্যঙ্গের কারণ হইত, তাহা হইলে সে ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতে পারিত কি? কিন্তু না না, কোথায় যেন ভুল হইতেছে—সাহিত্যিক বিরোধের সহিত সামাজিক প্রীতি-অপ্রীতির কোন সম্পর্ক নাই। তাহার নিকটতম বন্ধুর রচিত সাহিত্যও তাহার বিচারের মানদণ্ডে হীন হইতে পারে এবং তাহা লইয়া নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে স্বস্তি পাইল এবং পুনরায় মনোযোগ-সহকারে প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকারই প্রুফ সে দেখিতেছিল। ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—ন'টা বাজিয়া গিয়াছে; একটু পরেই আপিসের জন্য উঠিতে হইবে। একজন বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একটা চিঠি দিয়া গেল। শৈলর চিঠি, শৈল ডাকিয়াছে।

৩

আপিসে ভন্টু আসিয়া হাজির।

"এখনও 'প্রুফ' লদকাচ্ছিস? ওঠ্।"

"কেন, কি করতে হবে?"

"লবস্টারিং।"

"সে আবার কি?"

"লবস্টার মানে জানিস্ না? গলদা চিংড়ি, ইটিং আপিসে ঢুকব আজ, এখন না কিনলে তো পাওয়াই যাবে না, ওঠ্।"

"এটা শেষ করে দি থাম, মেশিন না হ'লে বসে থাকবে, তা ছাড়া এখন আমার ঢের কাজ বাকী—বাজারে যাবার সময় নেই, ব'স।"

ভন্টু মুখ সূচালো করিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইল এবং চেয়ার টানিয়া বসিল।

"হঠাৎ গলদা-চিংড়ি খাবার সখ কেন?"

"বিয়ে ক'রে সিংকিং আপিস খুলছি।"

"অর্থাৎ?

"দরাঞ্চে ব্যাপার।"

"কি রকম?"

"বিড্‌ডিকারের নাকে লব্‌স্টার ফ্রাইং গন্ধ এন্‌টারিং আপিস খুলেছে।"

শঙ্কর কোন মন্তব্য না করিয়া স্মিতমুখে প্রুফই দেখিতে লাগিল। ভন্টু বলিয়া চলিল, "বুঝতে পারলি না তো? পারবার কথাও নয়, বুঝিয়ে বলি তা হলে শোন। আমার মাইনে যদিও একটু বেড়েছে—কিন্তু চাল বাড়াইনি আমি, বিড্‌ডিকারকে সেই সাবেক চালে নৌকোর হালটিতে বসিয়ে রেখেছি। প্রাচীন কলাইয়ের ডাল, পোস্ত আর মৌরলা মাছের বাসি টক, প্লাস একটা জাবদা গোছের ভেজিটেবলের তরকারি—এই মামুলি ফরমুলা চলছিল; এমন সময় হঠাৎ একদিন বিড্‌ডিকারের নাকে চিংড়িমাছ ভাজা গন্ধ ঢুকল—"

"পাশের বাড়ী থেকে?"

"না, দোতলা থেকে। বিড্‌ডিকার দোতলায় উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলে ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ইন্দুমতী স্টোভে লবস্টার ফ্রাই করছে। তা-ও মাত্র দু'টি—একটি বোধ হয় নিজের জন্যে, আর একটি আমার জন্যে।"

শঙ্কর হাসিয়া ভন্টুর পানে চাহিয়া আবার প্রুফে মন দিল।

ভন্টু বলিল—"বোঝ, ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝে দেখ ব্যাপারটা!"

"এতে আর বোঝবার কি আছে?"

"ঝি-কে দিয়ে লুকিয়ে চিংড়ি মাছ আনিয়ে গোপনে ইটিং আপিস খুলছে—বোঝবার কিচ্ছু নেই?"

"যাঃ।"

"তুই দেখছি বিড্‌ডিকারেরও এক কাঠি ওপরে গেলি। বিড্‌ডিকারও প্রথমে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল—"

শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

"বিড্‌ডিকারের যা স্বভাব, দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। বলছে, ও বড়লোকের মেয়ে, যা-তা জিনিস কি রোজ রোজ মুখে রোচে বেচারীর, তোমারই কিপ্‌টেমির জন্যে এসব হচ্ছে, আজ বেশী ক'রে গলদা চিংড়ি আনাও, সবাই মিলে খাওয়া যাক।"

একটু থামিয়া ভন্টু পুনরায় বলিল, "বোঝ!"

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল।

"এখনও ধার শোধ ক'রে উঠতে পারি নি, দাদার আবার জ্বর হচ্ছে, ডাক্তাররা বলছে ফের্ চেঞ্জে পাঠাতে—"

শঙ্কর আবার হাসিল।

"মুচকি মুচকি হাসছিস যে বড়? মরীয়া হয়ে উঠেছি আজ, লবস্টারের চরম করে ছাড়ব আমি—ওঠ্—"

"আমি এখন উঠতে পারব না, অনেক কাজ বাকী আছে আমার।" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, "চণ্ডীচরণ দস্তিদার শ্যেনচক্ষু মেলে চেয়ে আছে, কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।"

ভন্টু মুখ সূচালো করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"তা হলে রাত্রে যেও এবং ওইখানেই ইটিং আপিস খুলো। ক'টি লবস্টার খাবে তুমি?"

"গোটা চারেক—"

"বলিস কি রে—"

ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল।

"চললাম, মৃন্ময়কেও বলে যাই। ক্যাওলকে নিয়ে কিন্তু মহামুশকিলে পড়েছি ভাই; ও আপিসের কাজ একদম্ কিচ্ছু করে না, অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে খালি। এমন থকবকিয়ে গেল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।"

"কেন, কি করে?"

"কিচ্ছু করে না। কিছু বললেই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে লুকিং আপিস খোলে খালি। ও কি রে, তুই আবার আংটি লদকালি কবে? দেখি দেখি, এ যে দামী খুজ্‌লু দেখছি।"

"আমার নয়, অপরের।"

"ফের মোল্লা জুটিয়েচিস নাকি?"

"না।"

"আমি চললাম। আর দেরি করলে পাওয়া যাবে না—"

ভন্টু চলিয়া গেল।

আংটির কথা উঠিতে শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল, কুমার পলাশকান্তি আজ যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে একটি গল্প লিখিয়া দিতে হইবে। এই জমিদার-পুত্রটির সাহিত্য-বাই চাগিয়াছে। নিজের কোন প্রতিভা নাই, অপরের দ্বারা গল্প লিখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করেন এবং ভাল কাগজে ভাল লোক দিয়া ভাল সমালোচনা লিখাইয়া লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলা বাহুল্য, সবই টাকার জোরে। এই দামী হীরার আংটিটা তাঁহারই। শঙ্কর সখ করিয়া আঙ্গুলে পরিয়াছিল, তিনি আর খুলিয়া লন নাই। বলিয়াছিলেন—ব্যস্ত কি, বেশ মানাইয়াছে, থাক্ না, পরে লইলেই হইবে। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদককে বিশেষত 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার উগ্র সমালোচককে—খুশী করিয়া রাখিতে তিনি ব্যগ্র। একটি গল্প লিখিয়া দিবার জন্য তিনি শঙ্করকে দুই শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। একটি উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারিলে হাজার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুমার পলাশকান্তি লক্ষ্মীর দৌলতে সরস্বতীর দরবারেও আসর জমাইতে চাহেন। এককালে রেসের সখ ছিল, এখন সাহিত্যের সখ হইয়াছে।

ভন্টু চলিয়া যাইবার পর শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ প্রুফ দেখিল, কিন্তু হঠাৎ একটা 'ফোন' আসাতে তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইল।

ফোনে চুনচুন বলিল, "আসবেন একবার? যদি আপনার অসুবিধে না হয়, আমি মনুমেণ্টের কাছে থাকব।"

শঙ্করের মনে হইল—অবিলম্বে যাওয়া দরকার। ড্রয়ার টানিয়া আপিসেরই কয়েকটা টাকা সে পকেটে পুরিয়া লইল এবং অতিশয় উত্তেজনাভরে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল আরও দুই স্থানে যাইতে হইবে। প্রথম শৈলর বাসায়, দ্বিতীয় আসমি-দারজির পিতা নিবারণ-বাবুর কাছে। কুমার পলাশকান্তি যদিও আজ যাইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে আজ যাওয়া হইবে না, সময় নাই। চুনচুন, শৈল এবং নিবারণবাবু সারিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিতে এমনিই অনেক রাত হইয়া যাইবে।

অমিরার মুখখানা মনে একবার উঁকি দিয়া গেল। পথে হঠাৎ পলাশকান্তিরই সহিত দেখা। তিনি তাঁহার মূল্যবান মোটরখানি নিঃশব্দে থামাইয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইলেন। কুমার পলাশকান্তি (বন্ধু ও পারিষদবর্গ তাঁহাকে আদর করিয়া 'কুমার' বলিয়া ডাকেন, সত্যই তিনি রাজপুত্র নহেন) এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা এবং সেই ধরণের দীপ্তি বিদ্যমান—যাহার মূল কারণ প্রতিভা নহে, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং অভিজাত-সমাজ-সঙ্গ। প্রিয়দর্শন ব্যক্তি তিনি।

"শঙ্করবাবু, আমার কাছেই যাচ্ছেন না কি?"

"না, জরুরি দরকারে আর এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আপনার কাছে কাল যাব।"

"আমার গল্পের কত দূর?"

"অর্দ্ধেকের ওপর হয়ে গেছে।"

আচম্বিতে শঙ্করের মুখ দিয়া মিথ্যাই বাহির হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তকাল নীরবতার পর পলাশকান্তি বলিলেন, "আজ কাগজ পড়েছেন?"

"না।"

"অচিনবাবুর দশ বছর জেল হয়ে গেল। আজ রায় বেরিয়েছে—"

সংবাদটার জন্য শঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সহসা তাহার মনে বহুদিন আগেকার একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিল। অচিন-বাবুর সহিত সে একবার ওই বৃদ্ধ ম্যানেজারটার নিকট গিয়াছিল টাকার চেষ্টায়। অচিনবাবু বলিয়াছিলেন যে, বুড়াকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনায়াসেই হাজার খানেক টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে, বেশী সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুদ পর্য্যন্ত লাগিবে না। তিনি টাকা দিতে রাজি হইয়া-ছিলেন কিন্তু পরিবর্ত্তে যে প্রস্তাবে শঙ্করকে রাজি হইতে বলিয়াছিলেন তাহা শঙ্কর পারে নাই।

পলাশকান্তি বলিলেন, "সমস্ত ডিটেল্‌স্ আজ কাগজে বেরিয়েছে, পড়ে দেখবেন; উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ওই ম্যানেজারটা সাংঘাতিক লোক ছিল মশাই। আর সব চেয়ে মজার খবর হচ্ছে এই যে, লোকটা অনেকদিন থেকে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল কিন্তু তবু তার কামনা মরে নি—"

শঙ্করের নিকট ইহা নূতন খবর নহে। তবু সে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "তাই না কি?"

"এই যে কাগজে বেরিয়েছে দেখুন না, সৌদামিনী আর তার মেয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, কাগজটা আপনি রাখুন, আমার পড়া হয়ে গেছে—"

শঙ্কর কাগজখানা লইয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত খবরই বাহির হইয়াছে। অচিনবাবু বৃদ্ধ ম্যানেজারকে যে চিঠিখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া খগেশ্বর অচিনবাবুর কন্যাকেই ভুলাইয়া আনিয়া ম্যানেজারের কবলে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া অচিনবাবু ম্যানেজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পলাশকান্তি বলিলেন, "আমার এ গাড়িখানা অচিনবাবুই কিনে দিয়েছিলেন, তখন কে জানত যে ভদ্রলোক এমন ধারা—"

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, "ভদ্রলোকের 'ওয়ারিশ' কেউ নেই ?"

"না, অথচ টাকার কুমীর। একটা উইল নাকি ক'রে গেছেন, এখনও তা কোর্টের জিম্মায়—"

"ও।"

"এ রকম নরপিশাচ দেখা যায় না মশাই, কত মেয়ের যে সর্ব্বনাশ করেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। কাগজে একটা ফর্দ্দ দিয়েছে দেখেছেন ? সি. আই. ডি. বেচারাদেরও কম খাটতে হয় নি—লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।"

একটু থামিয়া পলাশকান্তি পুনরায় বলিলেন, "এতে হয় তো উপন্যাসের খোরাকও পাবেন আপনি। এই নিয়েই একটা উপন্যাস লিখে দিন না আমাকে, দেবেন ? বেশ সাইকলজিকাল গোছের একটা—"

"আচ্ছা পড়ে দেখব। এখন একটু তাড়া আছে, চলি।"

"আচ্ছা।"

কাগজটা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর পলাশকান্তির নিকট বিদায় লইল। অচিনবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু! কতটুকুই বা তাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল ? লোকটার জীবনে যে এত জটিলতা এবং তাহার পরিণতি যে শেষ পর্য্যন্ত জেলে—তাহাই বা কে জানিত। সহসা শঙ্করের মনে হইল কাহার সহিতই বা তাহার এতদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পরিচয় আছে ? কাহার জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য সে জানে, এমন কি নিজের বিষয়েও তাহার জ্ঞান কতটুকু ? এই প্রসঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে যদিও তাহার মনের মধ্যে একটা নারীমাংসলোলুপ পশু বাস করে—কিন্তু কই, সে দিন ম্যানেজারের প্রস্তাবে সে তো সম্মত হইতে পারে নাই। পশুটার মাংসলোলুপতা হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল কি করিয়া ? ... অচিনবাবুর সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। রিণির জন্মদিনে মিষ্টিদিদি আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। কোথায় রিনি! তাহার ডাক্তার-স্বামীকে লইয়া সে হয় তো সুখেই আছে। শঙ্করের কথা হয় তো তাহার মনেই পড়ে না। কোথায় রিণি, কোথায় অচিনবাবু, কোথায় মিষ্টিদিদি। জীবনে একদিন যাহারা কত বড় ছিল, আজ তাহাদের কথা মনেও পড়ে না। বেলার মুখখানিও মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিল—গ্রীবা বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীভরা হাসি হাসিতেছে। একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখে না। ক্রমশঃ

ছায়া

শ্রীগোপাল ভৌমিক

ধূসর সন্ধ্যার ছায়া প্রলম্বিত আকাশের গায়ে,
বিস্মৃতির মত শান্তি নেমে আসে কানন-প্রচ্ছায়ে ;
তবু সুপ্তি ভঙ্গ হয় নীড়-লব্ধ ডানার ঝাপটে—
সমুদ্র-ফেনারা কাঁপে প্রত্যাহত বালুকার তটে।

স্বপ্ন-বিহঙ্গেরা এসে হানা দেয় মনের আকাশে,
বিগত বসন্ত-দিন ভীরু-ম্লান স্মৃতির সুবাসে
আবার উন্মনা হয় ; অন্ধ জলে জাগে কলোচ্ছাস—
কুয়াসার বাষ্প চিরে' দেখা দেয় সূর্য্যের বিভাস।

স্ফীতবক্ষে মুগ্ধনেত্রে তুমি যেন মূর্তি নিরুপমা—
তোমাতে পেয়েছে রূপ এ বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সুষমা ;
হৃদয়-সমুদ্র-তীরে সুগোপনে হে স্বপ্ন-বাসিনী—
কম্পিত বীণার তারে বাজাও কি অপূর্ব্ব রাগিণী !

সঙ্গীত-সুধার স্রোতে ভেসে যাই অজ্ঞাতে কোথায়—
ধূলি-জীর্ণ এ পৃথিবী বিনিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে যায়।
অনন্ত-চেতনা-লব্ধ জেগে থাকি তুমি আর আমি—
আর থাকে স্বপ্ন-পাখী, মুছে' যায় ক্ষুদ্র দিন-যামি !

ভারতের পুণ্যতীর্থ (৩)

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএচ-ডি, ডি-লিট

রাজপুতানা

অম্বর—জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। জয়পুর হইতে অম্বর যাইবার পথে পাহাড় ও জঙ্গলের দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে কতকগুলি সুন্দর মন্দির আছে; তন্মধ্যে শ্রীজগৎ শরোমঞ্জি এবং অম্বিকেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য। শিলা দেবীর মন্দিরটী খুব ছোট, কিন্তু বহু প্রাচীন। এখানে কালীর উদ্দেশ্যে প্রত্যহ একটী ছাগ বলি দেওয়া হয়।

ভৈনস্রোরগড়—উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত ভৈনস্রোরগড় হইতে তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বে বরোল্লিতে কয়েকটী সুন্দর মন্দির আছে। ঘটেশ্বরের মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। গণেশ ও নারদের মন্দির, অষ্টমাতার মন্দির, ত্রিমূর্ত্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে একটী কুণ্ড আছে এবং উহা মন্দির বেষ্টিত। একটি মন্দিরে অন্তিম-শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে।

ভীনমল—যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত হিন্দুদের একটি পুণ্য তীর্থ। এখানকার একটি মন্দিরে চামুণ্ডা দেবীর মূর্ত্তি আছে।

বিজোলিয়া—উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রধান নগর। বিজোলিয়ার প্রাচীন নাম বিন্ধ্যাবল্লী। উপরমল নামে মালভূমির উপর ইহা অবস্থিত। এখানে তিনটী শিবের মন্দির এবং পাঁচটি পার্শ্বনাথের মন্দির আছে। এখানকার একটি শিলালিপি হইতে আজমীরের চৌহানদের বংশপরিচয় পাওয়া যায় এবং অপর একটি শিলালিপিতে উন্নথশিখর পুরণ নামক একটি জৈন কবিতা লিপিবদ্ধ করা আছে।

কুণ্ডিয়ান—উদয়পুর সহর হইতে ৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বনস নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দির এবং মাতৃকুণ্ডিয়ান নামে একটি সুন্দর দহ আছে। কথিত আছে ইহার জলে স্নান করিয়া পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। মে মাসে এখানে একটী মেলা বসে এবং বহুযাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা দহের জলে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হয়।

নাথদ্বার—উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত বনস নদীর তীরস্থ একটি নগর। উদয়পুর সহর হইতে ৩০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে এবং মাওলি ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। এখানে বৈষ্ণবদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দিরে কৃষ্ণের একটী মূর্ত্তি আছে। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মূর্ত্তিটী বল্লভাচার্য্য মথুরার একটি মন্দিরে স্থাপন করেন এবং ১৫১৯ সালে ইহাকে গোবর্দ্ধনে লইয়া যান। প্রায় ১৫০ বৎসর পরে যখন আওরঙ্গজেব কৃষ্ণপূজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন তখন বল্লভাচার্য্যের বংশধরগণ বিগ্রহমূর্ত্তিসহ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতানার আসেন। ১৬৭১ সালে রাণা রাজসিং তাঁহাদের তিনজনকে মেবারে আহ্বান করেন। রাণা দ্বারকানাথের পূজার জন্য অসোতিয়া গ্রামটি এবং শ্রীনাথজীর পূজার জন্য সিয়ার গ্রামটি দান করেন। নাথদ্বার সহরটি সিয়ার গ্রামের দক্ষিণে নির্ম্মিত।

পুরনগর—ইহা পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। ইহা বরগুজার রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

পুষ্কর—আজমীর হইতে ইহা ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার সাবিত্রীগিরি সুপরিচিত এবং হিন্দুদের নিকট ইহা পরম পবিত্র। এখানে অনেক মন্দির আছে। পুষ্কর নামে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদটি পবিত্র এবং ইহার জল হিন্দুরা স্পর্শ করে। আজমীর হইতে পুষ্কর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য পথটি সুন্দর এবং ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর।

উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ, কাশ্মীর

মারতাণ্ড—ইসলামাবাদ হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার সূর্য্যের মন্দির চিত্তাকর্ষক। অষ্টম শতাব্দীতে ললিতাদিত্য ইহা নির্ম্মাণ করেন। কলহনের সময়ে সিকান্দার বিগ্রহমূর্ত্তিকে ধ্বংস করেন। মন্দিরটি ৮৪টি স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পয়েচ—শ্রীনগর হইতে ১৯ মাইল দূরে এই গ্রামটি ঝেলাম নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণে একটী প্রাচীন মন্দির আছে।

অমরনাথ—ইসলামাবাদ হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। হিমালয়ের একটি গুহায় একটি সুপ্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে। অমরগঙ্গার[১] পার্শ্ব দিয়া গুহা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে যাত্রীরা মারতাণ্ড হইতে এখানে আসে।

সরদা (সরদি)—সতীর মস্তক এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা একটি পুণ্যতীর্থ। কামরাজের নিকটবর্ত্তী কিসেনগঙ্গা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। শাণ্ডিল্য মুনি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য গৌড়ের একজন রাজাকে হত্যা করিলে বাঙ্গালীরা সরদার মন্দির দর্শনের ছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং বিষ্ণু-মূর্ত্তিটিকে পরিহাস কেশরের মূর্ত্তি মনে করিয়া ধ্বংস করে।

দাক্ষিণাত্য মালভূমি, মধ্যভারত

মধ্যভারতের দর্শনীয় স্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—অজয়গড়, অমরকণ্টক, বাথ, বারো, বারওয়ানি, ভোজপুর, চান্দেরি, দতিয়া, ধমনার, গোয়ালিয়র, গিয়ারাসপুর, খজরাও, মণ্ডু, নাগোদ, নারোদ, নারওয়ার, অরছা, পাথারি, রেওয়া, সাঁচী, সোনাগিরি, উদয়গিরি, উদয়পুর এবং উজ্জয়িনী।

মধ্যভারতে হিন্দুদের অনেক কারুকার্য্যমণ্ডিত স্তম্ভ আছে। ইহা ব্যতীত অনেক স্তূপ, চৈত্য ও বিহার আছে। সাঁচীর স্তূপ বিশেষ

১। সিন্ধুনদীর একটি শাখা।

উল্লেখযোগ্য। গিয়ারাসপুরের মন্দির ও উদয়পুরের মন্দিরও উল্লেখযোগ্য অজয়গড়, বারো, ভোজপুর, গোয়ালিয়র, অরছা, সোনাগিরি, দতিয়া প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলির কারুকার্য্য অতি সুন্দর।

অমরকণ্টক—রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। সাহডোল ষ্টেশন হইতে স্থলপথে ইহা ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান। ইহার উপকণ্ঠে এগারটি স্থানে যাত্রীদের প্রায়ই সমাগম হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান, কপিলধরের জলপ্রপাত এবং শোনমুণ্ডা[1]। এখানে একটি সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দিরটি কর্ণদেও চেদি নির্ম্মাণ করেন।

খজরাও—ছতারপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ছতারপুর সহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মধ্যযুগের অনেক মন্দির আছে। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর বিবরণ হইতে জানা যায় যে এখানে কতকগুলি সঙ্ঘারাম (বিহার) এবং প্রায় দশটি মন্দির ছিল। হুয়েন সাং এবং আইবিন বটুটা এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আইবিন বটুটার মতে এখানে একটি বড় হ্রদ ছিল এবং তাহার চারিদিকে দেবতার মন্দির ছিল। এখানে যোগীদের সমাগম হইত এবং মুসলমানেরা ইন্দ্রজাল শিখিবার জন্য তাঁহাদের নিকট যাইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিকান্দার লোদী এখানকার অনেক মন্দির ধ্বংস করেন।

এখানকার মন্দিরগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব্ব। প্রত্যেক দিকেই কতকগুলি মন্দির আছে, তাহাদের মধ্যে একটি বড় এবং অপরগুলি ছোট। পশ্চিমদিকে শৈব ও বৈষ্ণব মন্দির, উত্তর দিকে সমস্তই বৈষ্ণব মন্দির এবং দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে সমস্তই জৈন মন্দির অবস্থিত। চৌনসৎ যোগিনীর মন্দির পশ্চিমদিকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির বলিয়া পরিচিত। কন্দর্য্য মহাদেবের মন্দির, রামচন্দ্র অথবা লক্ষ্মণজীর মন্দির, বিশ্বনাথের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

উত্তর দিকের একটি বড় মন্দির বিষ্ণুর অবতার বামনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এই দিকের অধিকাংশ মন্দিরই ছোট। বড় মন্দিরটির নিকটে কতকগুলি সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঘন্টায়ের মন্দির। জিননাথের মন্দির চিত্তাকর্ষক।

খজরাও হইতে অনতিদূরে কুরারনাল গ্রামে কুনওয়ারনাথের একটী সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

পূর্ব্বউপকূলস্থ সমতলক্ষেত্র, মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত

অনন্তপুর—ত্রিভাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভানদ্রমে ইহা অবস্থিত। এখানে পদ্মনাথের সুবিখ্যাত মন্দির আছে। চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ এই স্থানটী পরিদর্শন করেন।

কাঞ্জিভেরাম—এই স্থানটী খুব প্রাচীন। ইহা দুইভাগে বিভক্ত—শিবকাঞ্চি এবং বিষ্ণুকাঞ্চি। শিবকাঞ্চির মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিষ্ণুকাঞ্চির মন্দির পরে নির্ম্মিত। এখানে শৈবধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক সময় এখানে ১০৮টী শিবমন্দির এবং ১৭টী বিষ্ণুমন্দির ছিল। কামাক্ষী মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া পরিচিত। কৈলাসনাথের মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বরের একটী মূর্ত্তি আছে।

কচ্ছপেশ্বরের মন্দিরে বিষ্ণুর অবতার কূর্ম্মের একটী মূর্ত্তি আছে। এখানে অনেক বিষ্ণু মন্দির আছে। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দিরে বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখা যায়। জৈনকাঞ্চিতে বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিদাম্বরম্—দক্ষিণ ভারতের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহার উত্তরে ভেলার নদী, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে কোলরুন নদী এবং পশ্চিমে ভেরানুন সরোবর। এখানকার নটরাজ মন্দির দেখিবার জন্য ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে যাত্রীরা আসে। চিদামবরম্ মন্দিরে চারিটী প্রাঙ্গণ, এক হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট একটী হলঘর, একটী নাচঘর, শিবের মন্দির এবং শিবগঙ্গা নামে একটী সরোবর অবস্থিত। ইহা ব্যতীত অষ্ট দিকপালের মূর্ত্তি আছে।

জম্বুকেশ্বর—ত্রিচিনপলি হইতে দুইমাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত। জম্বুকেশ্বর মন্দিরে যে মণ্ডপ আছে তাহাতে অনেক খোদিত কারুকার্য্য আছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে শিব, তাহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কুম্ভকোনম্—কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। কুম্ভেশ্বর দেবতার নাম হইতে এই নগরের নাম হইয়াছে। কুম্ভেশ্বরের মন্দিরটী সুবিখ্যাত। এই মন্দিরে একটী জলাশয় এবং একটী গোপুর আছে। এখানে বিষ্ণু, পার্ব্বতী প্রভৃতির কয়েকটী প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা যায়। সারঙ্গপাণি, নাগেশ্বর ও রামস্বামীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ—এখানে দুইটী প্রধান মন্দির আছে; একটী ট্রিপ্লিকেনে পার্থসারথীর মন্দির, অপরটী মাইলাপুরে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। পার্থসারথীর মন্দিরটী বহু পুরাতন। প্রত্যেক মন্দিরে তোরণ, মণ্ডপ এবং জলাশয় আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটী বড় রথ আছে। রথযাত্রার দিন রথটীকে উত্তমরূপে সাজান হয় এবং দেবতার মূর্ত্তিটীকে রথের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়। মাদ্রাজের পাঁচ মাইল উত্তরে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে; উহার নাম তিরুবোত্রিয়ুর।

মাদুরা—দক্ষিণ ভারতে যতগুলি মন্দির আছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মাদুরার মন্দির। মীনাক্ষীর মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মীনাক্ষী দেবী স্বর্ণনির্ম্মিত। দেবীর চক্ষু দুইটী মাছের চক্ষুর মত বলিয়া ইহার নাম হইতেছে মীনাক্ষী। মীনাক্ষী ও লক্ষ্মী অভিন্ন। প্রতিদিন এই মন্দিরে যাত্রীদের বিপুল সমাগম হয়। মীনাক্ষী মন্দিরের দ্বারমণ্ডপকে অষ্টশক্তি মণ্ডপ বলা হয়; কারণ এই স্থানে আটটী শক্তির মূর্ত্তি আছে। এখানে একটী শিব মন্দির আছে। উহার উপরিভাগ স্বর্ণনির্ম্মিত। দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত পতাকাদণ্ড আছে। এখানে

১। এখান হইতে শোন নদীর উৎপত্তি।

কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত একটি বিষ্ণু মন্দির আছে। মাদুরা ষ্টেশন হইতে এই মন্দিরটী দেখা যায়।

মহাবলিপুরম্—মাদ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে এবং চিঙ্গেলপুট হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ইহা সমুদ্রতটে অবস্থিত। ইহাকে বলা হয় সপ্তম প্যাগোডার দেশ। বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুহার মধ্যে পৌরাণিক যুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

পক্ষীতীর্থ—চিঙ্গেলপুট জেলার অন্তর্গত একটি বড় গ্রামে এই তীর্থটি অবস্থিত। প্রত্যহ বেলা দশটার সময় দুইটী পক্ষী আসিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে একটি মন্দিরে বসে এবং পূজার দ্রব্য গ্রহণ করে। কথিত আছে এই দুইটি পক্ষী বহুকাল হইতে প্রত্যহ উক্ত সময়ে এখানে আসে এবং দেবতার ভোগ খাইয়া উড়িয়া যায়। ইহাদিগকে দেখিতে কতকটা বাজ পক্ষীর মত।

রামেশ্বরম্—ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই দ্বীপটি অতীব সুন্দর। রামনাথ স্বামীর মন্দির দেখিবার জন্য বহু দেশ-দেশান্তর হইতে যাত্রীরা আসে। এই মন্দিরটি সুদীর্ঘ। সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও অসংখ্য স্তম্ভ দ্বারা ইহা শোভিত। রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, পার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার সম্মুখে একটি বড় নন্দী-বৃষের মূর্ত্তি আছে।

সীমাচলম্—ওয়ালটেয়ার হইতে প্রায় নয় মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এখানে পর্ব্বতের উপরে একটি সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দিরটি বরাহ নরসিংহ স্বামীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। হিন্দুযাত্রীরা প্রায়ই এখানে সমবেত হয়।

শ্রীরঙ্গম্—ত্রিচিনপলি হইতে তিন মাইল উত্তরে একটি দ্বীপ। কাবেরী নদীর দুইটি শাখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহা অবস্থিত। এখানকার মন্দিরটী দ্বীপের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত। একাদশী দেবীর অসুর-বিজয়ের স্মৃতিকল্পে এখানে বৈকুণ্ঠ একাদশী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে রঙ্গনাথের মূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুর দশাবতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি নায়ক রাজাদের কীর্ত্তি।

শ্রীকলহস্তী—ইহার অপর একটি নাম শ্রীপুরম্। এই স্থানটি বায়ুর মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। দুইটি পর্ব্বত ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতের উপরে দুর্গাম্বার মন্দির এবং দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতের উপরে কল্পেশ্বরের মন্দির আছে। কল্প পর্ব্বতের পশ্চিমে কলহস্তেশ্বরের মন্দির অবস্থিত।

শ্রীশৈলম্—কৃষ্ণা নদীর তীরে ঋষভগিরির উপরে মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটি খুব পুরাতন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধেরা ইহাকে পবিত্র মনে করে। কথিত আছে শিবের বৃষ ঋষভ এখানে তপস্যা করিয়াছিল এবং উহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শিব পার্ব্বতীসহ মল্লিকার্জ্জুন ও বৃংহরম্বার মূর্ত্তিরূপে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তাঞ্জোর—এই স্থানটি খুব প্রাচীন। এখানে বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরটি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২৭০ ফুট। ইহাতে অনেক খোদিত কারুকার্য্য আছে। ইহার সীমানার মধ্যে গণপতির মন্দির। ইহার সম্মুখে একটি বড় প্রস্তরের বৃষমূর্ত্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি বড় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি। ইহার সীমানার মধ্যে একটি যাদুঘর আছে এবং উহাতে মহারাষ্ট্র ও নায়ক রাজাদের বহু প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত আছে।

তিরুপতি—তিরুপতির মন্দির পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। ইহা মেরুপর্ব্বতের একটি অংশ। এখানে বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। উহা ভেন্কটেস্ পেরুমল নামে সুপরিচিত। বরাহ অবতারে বিষ্ণু তিরুপতি পর্ব্বতের দেবতা ছিলেন। নিম্ন তিরুপতি গোবিন্দরাজ পেরুমলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানে সাতটি পর্ব্বত আছে। এইগুলি আদিশেষ নামক সর্পের দেহস্বরূপ। সাতটি সর্ব্বত সর্পের সাতটি মস্তকস্বরূপ। এই স্থানটি একটি পুণ্যতীর্থ এবং প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি পল্লব, চোড়, পাণ্ড্য এবং নায়ক রাজাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিলেও চলে। ইহাদের স্থাপত্যরীতি অভিন্ন। (ক্রমশঃ)

বকুল ও গোলাপ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বকুল ঝরিয়া পড়ি ধূলিতে লুটায়—
গোলাপ তাহারে দেখি মৃদু মৃদু হাসে
রূঢ় করে মালাকর উৎপাটিয়া তা'য়
বিদ্ধ করি বদ্ধ করে সূচী সূত্র পাশে।



সঙ্গীত

কথা ঃ—সুজাতা দেবী বি-এ, বি-টি

সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

যদি জীবন-পথে প্রভু তুমি
থাক চির দূর।
মোরে দিয়ে যেও সকল কাজে
তোমার প্রাণের সুর ॥
ক্লান্তি শেষে সাঁঝের বেলায়—
আকাশ-ছাওয়া তারার মেলায়—
হেরবো তোমার আঁখির আভাস
ওগো ও সুদূর ॥

যদি আঁধার-পথে তোমায় কভু
হারাই প্রিয়তম,
বারেক আসি' উজল ক'রো
নয়ন-প্রদীপ মম।
আনন্দেরই সাগর-দোলায়
দুলিয়ে দিও সেদিন আমায়,
সকল ব্যথা ভুলিয়ে—ক'রো
জীবন মধুর ॥

॥

সরা সণ্‌া II { রা রা পা | মপা মজ্ঞা -া I জ্ঞমা মপা -া | -া পধা পমা I
য০ দি০ জী ব ন্ প০ থে০ ০ প্র০ ভু০ ০ ০ তু০ মি

I পা পা -ধা | -ণা ণর্ঁা র্সা I ণা -ধণা -পদা | -মপা (-া -া) } I
থা ক ০ ০ চি০ র দূ ০ ০ ০ ০ ০ র্ ০ ০

I পা মা I পা পর্সা -ণর্সণা | ধা পা -া I পধা মপা -জ্ঞা | মা মপা -া I
মো রে দি য়ে০ ০ ০ ০ যে ও ০ স০ ক০ ল্ কা জে০ ০

I সা সরা ণ্‌া | সা সগা -া I গমা -া -া | -া গমা -াস II
তো মা০ র্ প্রা ণে০ র্ সু ০ ০ ০ র্

-া -া II পা্‌ -া মা | মধপা মজ্ঞা -মা I পা পর্সা -া | র্সর্রা র্সর্রা -র্মজ্ঞা I
০ ০ ক্লা ন্ তি শে০০ ষে০ ০ সাঁ ঝে০ র্ বে০ লা০ ০ য়্

I র্রা সর্রা সর্া | স র্না সর্া -না I পা পদা মা | পদা দর্সা -া I
আ কা॰ শ্ ছাও য়া ॰ তা রা॰ র্ মে॰ লা॰ য়্

I সর্া -র্রা সর্া | ণধা ণা -া I ণা ণধা -সর্ণা | ধা পা -া I
হে র্ বো তো॰ মা র্ আঁ খি॰ ॰র্ আ ভা স্

I সা রা পা | পা -মা মধপা I মজ্ঞা -মজ্ঞা মা | -া গমা -াস II
ও গো ॰ ও ॰ সু॰॰ দূ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র্

সা সা II সা সা -া রা | সরসা ণ্দা -ণ্া I সা সজ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I
য দি আঁ ধা॰ র্ প॰॰ থে॰ ॰ তো মা॰ য়্ ক ভু ॰

I জ্ঞা রা -জ্ঞা | -মা পা দপা I মপমা জ্ঞা -া | -মজ্ঞা -রা -সা I
হা রা ॰ ই প্রি য় ত॰ ম ॰ ॰ ॰ ॰

I পা পণা -া | ধা ণা -া I ণসর্া ণসর্া -া | ণ সর্ণা ধা -পা I
বা রে॰ ক্ আ সি ॰ উ॰ জ॰ ল্ ক' ॰ রো ॰

I পা পসর্ণা -সর্ণা | ধা পা -জ্ঞা I জ্ঞমা মপা -া | -া -া -া I
ন য়॰ ॰ন্ প্র দী প্ ম॰ ম॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা পর্রা -া | র্রা র্রা -া I র্রা র্রা -া | সর্র্া -ধণা -পধা I
আ ন॰ ন্ দে রি ॰ সা গ র্ দো॰ ॰॰ ॰॰

I সর্া -া -র্রা | -র্জ্ঞা জ্ঞর্রা -সর্া I সর্া র্রা র্সর্া | ণধা -ণা -া I
লা ॰ ॰ ॰ ॰ য়্ ডু লি য়ে দি॰ ও ॰

I পা ধা -মা | পা -ণধা -না I সর্া -া -া | -া -া -া I
সে দি ন্ আ ॰॰ ॰ মা ॰ ॰ ॰ ॰ য়্

I সর্া সর্া -র্রা | র্ধা ণা -া I ধা ধসর্া সর্ণা | ধা পা -া I
স ক ল্ ব্য থা ॰ ভু লি য়ে ক' রো ॰

I সা রা পা | পা -মা মধপা I মজ্ঞা -মজ্ঞা মা | -া গমা -াস II II
জী ব ॰ ন ॰ ম॰॰ ধু॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র্

জয়লব্ধ

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সখিদের নৃত্য-গীত। ইন্দিরা মূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানে মগ্ন

গীত

নয়নো মেঁ বসো মেরে নন্দদুলাল।
গোপীগণ চিত চোর ব্রজধাম লাল॥
কিশোরী কঙ্কন কিঙ্কিনী ধুন,
চরণ নূপুর রুণুঝুনু সুন।
বাজাওত বান্‌সরী শ্যামলিয়া লাল।
নয়নো মেঁ বসো মেরে নন্দদুলাল॥
কলপ পলক সম মিলন মে মান।
পলক কলপ সোচে বিরহী পরাণ॥
রাধিকা অমল কমল চরণ,
নটবর মোহন করলি শরণ,
দীন ভকতে রাখো হৃদয়কে লাল।
নয়নো মেঁ বসো মেরে নন্দদুলাল॥

নৃত্য গীতের পর ইন্দিরা উঠে আরতি করলে। ইন্দিরার ও সখিদের আরতি-নৃত্য। সমাপ্ত হলে পর—

ইন্দিরা। সখি বিশাখা, আজ ধ্যানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হ'ল। যেন আমার ইষ্টদেব মদনমোহন রাধিকা-বল্লভ আমার সামনে এসে হেসে বললেন—"আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" তারপর মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। কিন্তু সখি, আমার তো কোন কামনা নেই।

বিশাখা। সখি, অনেক সময় মনের কথা নিজের কাছেও গোপন থাকে। যেদিন সিদ্ধিলাভ হয় সেদিন অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে, সত্যিই তো এই আমার একান্ত অভিলাষ ছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য এতদিন নিজেও জানতে পারি নি। তোমার হৃদয়ের নিভৃততম অন্তরে অতি গোপনে যে অভিলাষ বাসা বেঁধেছে সে আজ অস্পষ্ট, সুপ্ত। কিন্তু একদিন সে মাথা নাড়া দিয়ে জাগবে—

আত্রেয়ী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন সেদিন তোমার শীঘ্রই আসে।

গায়ত্রী। নিজেকে নিজে তোমায় যেন আর বঞ্চিত করতে না হয়। সখি, নারীজন্মের সার্থকতা নিজেকে নিঃশেষে দান ক'রে। সেই দানের মধ্যেই আসল পাওয়া।

ইন্দিরা। আঃ, সব সময়েই তোরা আবোল-তাবোল বকিস্। চল্, দরিদ্রনারায়ণের সেবার আয়োজন করবি চল্।

সকলের প্রস্থান। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। পরে প্রদ্যুম্নকিশোর ও গজেন্দ্রনাথের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। কতদিন থেকে এই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করছি গজেন্দ্র, তা তো তুমি জান।

গজেন্দ্র। ধৈর্য্য, বন্ধু, ধৈর্য্য। এখুনি তোমার হৃদয়-প্রতিমা, প্রেম-অধিষ্ঠাত্রী নয়নসম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন।

প্রদ্যুম্ন। আমার আঁধার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠবে। এক মুহূর্ত্তের দেখা, সেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে। একটী কথা, তাই আমার বেদ, গীতা, ইষ্টমন্ত্র সম মূল্যবান হয়ে থাকবে। (গজেন্দ্রকে আলিঙ্গন ক'রে) ভাই, তোমার এ অমূল্য প্রচেষ্টার কোন মূল্যই তো আমি দিতে পারব না।

গজেন্দ্র। দিয়েছ তো বন্ধু। যেদিন আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছ, সেইদিনই তো সকল মূল্য আমি পেয়েছি। রাজ-রোষ হতে এই অতি নগণ্য ব্যক্তিকে তুমি যেদিন রক্ষা করেছিলে, দরিদ্র একজন পথের ভিখারীকে আশ্রয় দান করে নিজের বন্ধু বলে সম্মানিত করেছিলে সেইদিনই তো সকল মূল্য দিয়েছ। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য পালন মূল্য অথবা কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নয়।

প্রদ্যুম্ন। ধন্য বন্ধু, তোমার প্রীতি আমার জীবনের এ যে কত বড় সম্পদ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সকল গোপন ব্যথা তোমার কাছে নিশ্চিন্ত মনে প্রকাশ করে প্রাণের বোঝা লাঘব করতে পারি। কিন্তু বন্ধু, এখনও তিনি আসছেন না কেন?

গজেন্দ্র। চিরকাল রণক্ষেত্র নিয়েই রইলে, রমণীর হৃদয় অথবা তাদের কার্য্যপ্রণালী তো বুঝলে না। যত বিরূপাই হোক না কেন, প্রত্যেক নারী পুরুষের সামনে বার হবার আগে যতখানি সম্ভব সাজগোজ করে থাকে। পুরুষকে জয় করা নারীর একটা নেশা।

প্রদ্যুম্ন। চুপ কর; তাঁর সম্বন্ধে তোমার এ যুক্তি খাটে না।

গজেন্দ্র। আর একটা কথা মনে রাখবে। প্রেমিকা যখন নিজ ইপ্সিত পুরুষের সম্মুখে আসে তখন তার বেশ-বিন্যাসের অন্ত থাকে না। প্রেম আছে কি-না জানবার এ একটা বিশেষ লক্ষণ।

প্রদ্যুম্ন। তিনি যে দয়া করে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হয়েছেন এই আমার পরম ভাগ্য।

গজেন্দ্র। ঐ পদশব্দ। আমি যাই। তোমরা বিরলে সাক্ষাৎ কর। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে অনেক অসুবিধা।

গজেন্দ্রর প্রস্থান। প্রদ্যুম্ন একদৃষ্টে মন্দিরের দ্বারের দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশাখাসহ ইন্দিরার প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। (উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদনের ভঙ্গী ক'রে) দেবী, অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ইন্দিরা। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষায় বসিয়ে রাখার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ব্যস্ত ছিলুম।

প্রদ্যুম্ন। আপনার উদার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, একথা কে না জানে।

ইন্দিরা। আপনার কি বলবার আছে বলুন। আমি শুনতে প্রস্তুত।

প্রদ্যুম্ন। বলব? কিন্তু—

বিশাখার দিকে চাইলেন

ইন্দিরা। ও আমার প্রিয় সখি। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার যা বলবার আছে ওর সামনে বলতে পারেন।

প্রদ্যুম্ন। সব কথা সকলের সামনে বলা যায় না। অপরিচিতার সামনে—

ইন্দিরা। আমিও আপনার অপরিচিতা।

প্রদ্যুম্ন। একজন অপরিচিতাই জীবনে সবচেয়ে সুপরিচিতা, সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠে। দুটী প্রাণ যে বন্ধনে বাঁধা পড়ে তাতে গোপন কিছুই থাকে না।

ইন্দিরা। ধীরে—বড় দ্রুত তালে এগিয়ে যাচ্ছেন। দুটী প্রাণ কাদের এবং কি বন্ধনে বাঁধা পড়েছে তা জানবার আগ্রহ আমার নেই। তবে এরকম একটা সম্বন্ধ ধরে নেওয়ার মধ্যে ধৃষ্টতা যথেষ্ট আছে।

প্রদ্যুম্ন। আমার প্রাণ অত্যন্ত চঞ্চল। তার উদ্দাম গতিবেগ ধরে রাখতে পারছি না। যদি কোন অন্যায় কথা অথবা আচরণে আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তার জন্য আমি নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তথাকরণ

ইন্দিরা। ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনি আমায় অপরাধী করবেন না।

প্রদ্যুম্ন উঠে দাঁড়ালেন

আমি শুধু এই কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে নির্জন মন্দিরে নিশীথ রাত্রে একা দেখা করা কি আমার পক্ষে শোভন অথবা সঙ্গত?

প্রদ্যুম্ন। আপনি উচিত কথাই বলেছেন। এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম, কারণ আমার প্রার্থনা অসঙ্গত। কিন্তু তবু দেবী, আমি নিভৃতে আপনাকে দু'টী কথা বলতে চাই। কালই প্রত্যূষে আমি দাক্ষিণাত্যের রণাঙ্গনে চলে যাব। হয়ত আর ফিরব না। যাবার আগে আমার প্রাণের গোপনতম কথা আপনাকে বলে যেতে চাই। হয়ত আমার এ প্রার্থনা আপনার প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু দেবী, আমার জীবনে সেটা যে কত বড় তৃপ্তি, কত বড় আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এ অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বিশাখা। সখি, আমি যাই। বিশেষ প্রয়োজন—

ইন্দিরা। কিন্তু বিশাখা— বিশাখার প্রস্থান

চলে গেল!

প্রদ্যুম্ন। দেবী, অনুমতি হয় তো আমার বক্তব্য—

ইন্দিরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করুন। আমি একলা এভাবে বেশীক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। এই নিভৃত আলাপই যথেষ্ট অপরাধ। তার ওপর লোকনিন্দা। যদি কেউ ঘুণাক্ষরে আমার এই অন্যায় আচরণের কথা জানতে পারে তো লোকসমাজে মুখ দেখানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। বলুন, কি আপনার বলবার আছে বলুন।

প্রদ্যুম্ন। দেবী, আমি সৈনিক। তরবারি চালনায় নিপুণতা থাকতে পারে কিন্তু ভাষার ওপর কোন অধিকারই আমার নেই। আমার এতকালের নীরব প্রার্থনাই আমার একমাত্র ভাষা। এতে যদি আমার মনের কথা স্পষ্ট না হয়ে থাকে, এখনও যদি ভাষার প্রয়োজন হয়, শুনুন দেবী—আমি আপনাকে ভালবাসি!

ইন্দিরা। (বিদ্রূপ সহ) ভালবাসা! এর কি অর্থ, কি মূল্য—

প্রদ্যুম্ন। এই স্বর্গ!

ইন্দিরা। স্বর্গ! তা হবে। আর কিছু! ভালবাসা। পুরুষের ভালবাসা। হে বীর, পুরুষ কখনও ভালবাসতে জানে, পারে? যে সর্ব্বত্যাগ নারী করতে পারে, পুরুষ তা কোন-দিন পেরেছে? আজন্ম যে পিতা-মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে লালিতাপালিতা, একটী মন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে স্বামীর সঙ্গে জীবন-পথে নারী অগ্রসর হয়! পুরুষ তা পারে? লোক নিন্দা, সমাজ ভয়, ধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল সমস্ত হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়ে নারী অনির্দ্দিষ্ট পিছল পথে প্রেমিকের হাত ধরে যখন গৃহত্যাগ করে, হোক সে পাপ, হোক সে অন্যায়, কিন্তু প্রেমের সে মহিমময় ত্যাগ, পুরুষ পারে? অথচ কামলিপ্সা চরিতার্থের পর পুরুষ পদাঘাতে তাকে পথের ধূলির ওপর ফেলে রেখে চলে যায়। পুরুষের প্রেম—পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুসম চঞ্চল। তাদের কাছে ভালবাসা একটা গালভরা মিষ্ট নাম মাত্র। মন-প্রাণ তারা চায় না, তারা চায় দেহ।

প্রদ্যুম্ন। পুরুষের প্রতি এ অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ দেবী। অন্যায় দোষারোপ। স্বীকার করছি, এ শ্রেণীর পুরুষ আছে, কিন্তু সকলেই মিথ্যাবাদী, শঠ, লম্পট নয়। ভালো-মন্দে মিশ্রিত জগত। ইতিহাসে কত ত্যাগ, যুদ্ধ, আত্মবলিদান রমণীর জন্য পুরুষ করেছে, সে দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। নারীর এক ফোঁটা চোখের জল রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, একটা হাসির ঝিলিক প্রলয়ের সৃষ্টি করেছে, নয়নের ভ্রূকুটি অগ্নি-কাণ্ডের লোলজিহ্বায়, প্রচণ্ড উত্তাপে, ধ্বংসের তাণ্ডবনৃত্য করেছে। তবুও নারীর চোখের জল, হাসির ঝিলিক, নয়নের ভ্রূকুটি যুগে যুগে পুরুষকে ভুলিয়েছে, কাব্যে গীত হয়েছে, ভগবানের সৃষ্টির অপূর্ব্ব নিদর্শন বলে গণ্য হয়েছে।

ইন্দিরা। আর কিছু বলবার আছে?

প্রদ্যুম্ন। না। হৃদয় চূর্ণ হয়ে গেলেও আমাদের স্তব্ধ হতে হয় যেখানে প্রেমের বিনিময়ে লাভ করি বিদ্রূপ, অবজ্ঞা।

ইন্দিরা। কার দোষে? অজানা, অচেনা এক পুরুষ, নিভৃতে যদি কোন নারীকে ছলে ডেকে এনে প্রেম-নিবেদন করে, সে নারীর উচিত কি সেই প্রেমের স্রোতে ভেসে যাওয়া? নিজের হাতের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিজে দগ্ধ হয়ে পরকে দোষ দিতে চান? এর জন্য দায়ী আমি নয়।

প্রদ্যুম্ন। না দেবী, দোষ আমারই। আপনার শিশুর মত নির্ম্মল পবিত্র মনে কোন দাগ পড়ে নাই। আমার দুঃখ আমি একাই সইব। কিন্তু সত্যিই কি এ বুকভরা ভালবাসার কোন প্রতিদান নেই? দেবী, বল, তোমার পিতৃ-আজ্ঞা পেলে—

ইন্দিরা। না, বিবাহ আমি করতে পারব না। আপনাকেও নয়, অপর কাউকেও নয়। বিবাহের জন্য নারীর অভাব নাই। আরও সুন্দর, আরও কোমলস্বভাবা—

প্রদ্যুম্ন। ও কথায় এখন আর কোন লাভ নেই। এখন আর কোন নারীর পানে কখনও ফিরে তাকাতে পারবো না। বিদায়— প্রস্থানোদ্যত

ইন্দিরা। বিদায়, ভগবান আপনাকে সুখী করুন।

প্রদ্যুম্ন। সুখ! এ বিদ্রূপ, এ রহস্যের কি প্রয়োজন ছিল? মৃতকে পদাঘাত করা চরম নিষ্ঠুরতা। সত্যই কি দেবী, আমার কোন আশা নেই? হোক মিথ্যা, কিন্তু তোমার আশার বাণী রণক্ষেত্রে আমার রক্ষাকবচ হবে। বল দেবী, তোমাকে পাওয়া কি একেবারে অসম্ভব?

ইন্দিরা। সম্ভব হতে পারে শুধু এক সর্ত্তে।

প্রদ্যুম্ন। কি সর্ত্ত দেবী বল। যত কঠিন, যত নির্ম্মম হোক না কেন, আমি তা পালন করতে প্রস্তুত।

ইন্দিরা। আজ হতে এক বৎসর কাল যে মুখে আমার প্রতি প্রেম-নিবেদন করেছেন, সেই মুখ হতে যদি অন্য কোন বাক্য নিঃসরণ না হয় তবেই বুঝব—এ প্রেম শুধু মুখের কথা নয়, প্রাণের প্রেরণা।

প্রদ্যুম্ন। যদিও অতীব নিষ্ঠুর এই সর্ত্ত, তবুও তাই হবে দেবী। বিদায়—

ইন্দিরা। কিন্তু এই মৌনব্রতের কারণ, পৃথিবীতে কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানাতে পারবেন না। বিদায়—

কথা না বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে প্রদ্যুম্ন চলে গেলেন। ইন্দিরার বিপরীত দিকে প্রস্থান। কিছুক্ষণ পরে ধীরে গজেন্দ্রর প্রবেশ

গজেন্দ্র। (এদিক ওদিক চেয়ে) তাই তো! বন্ধুবর গেল কোথায়? এদের ইন্দিরা দেবীকেও তো দেখছি না। ব্যাপারটা যে রীতিমত ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। না! ভাবিয়ে তুললে দেখছি—

বিশাখার প্রবেশ

বিশাখা। সখি—(গজেন্দ্রকে দেখে) আঁা তুমি। এখানে কি করছ?

গজেন্দ্র। আমি বন্ধুবরের খোঁজে এসেছি। বাইরে উদ্যানে অপেক্ষা ক'রে ক'রে আসে না দেখে তার খোঁজ করতে নিজেই এলুম। এসে দেখি সে নিখোঁজ।

বিশাখা। এ তো ভারী মুস্কিলের কথা। আমিও তো ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি। তোমার বন্ধু প্রদ্যুম্নকিশোর কি এক কথা বলবেন ঠিক করেছেন—যা আমার সামনে বলা যায় না। অগত্যা আমি ধীরে ধীরে সরে পড়লুম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সখি আসে না দেখে আমিই এলুম।

গজেন্দ্র। তাই তো, ব্যাপারটা কি কিছু বুঝতে পারছ?

বিশাখা। উঁহু। একেবারেই না।

গজেন্দ্র। প্রেমঘটিত—এটা তো পরিষ্কার?

বিশাখা। এ অবধি তো পরিষ্কার। কিন্তু তাঁরা গেলেন কোথায়। এইখানেই তো বিষম ধাঁধা।

গজেন্দ্র। হয় ত তারা নিজের নিজের বাড়ী চলে গেছেন।

বিশাখা। তা যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের না বলে—

গজেন্দ্র। সেইটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, কথা কাটাকাটি, রাগ, অবশেষে উভয়ের বিপরীত দিকে বেগে প্রস্থান। ঝোঁকের মাথায় আমাদের কথা ভুলে গেছেন।

বিশাখা। হুঁ, হতে পারে বই কি! আবার এও তো হতে পারে, পরস্পরের হৃদয়-বিনিময়, সোহাগ-ভরা কথাবার্ত্তা, পরে প্রেমের নেশায় মত্ত হয়ে ভবিষ্যৎ বিরহে কাতর দুটী প্রাণীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিপরীত দিকে ধীর পদবিক্ষেপে প্রস্থান। প্রেমের ঝোঁকে আর বিরহের কাতরতায় আমাদের কথা মনেই পড়ে নি।

গজেন্দ্র। নিশ্চয়ই। এও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। বিশাখা, আমি একটা কথা বলব বলব মনে করছিলুম—

বিশাখা। কি কথা। বলেই ফেল। মনে পুষে রেখে কষ্ট পাওয়ার কি প্রয়োজন।

গজেন্দ্র। সে কথাটা—না থাক্।

বিশাখা। কেন? কি হ'ল?

গজেন্দ্র। তোমার সামনে বলতে ভারী লজ্জা করছে।

বিশাখা। তবে আমি চলে যাই, আড়ালে একলা বোলো।

গজেন্দ্র। কিন্তু তোমাকেই যে শোনাতে হবে। একলা তো মনে মনে আমি সে কথা সব সময়ই বলছি।

বিশাখা। এক কাজ কর। আমার দিকে পিছন করে অথবা চোখ বুজে বলে ফেল।

গজেন্দ্র। (পিছন ফিরে) আমি তোমায়—, না একটু জল না খেলে হবে না। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিশাখা। বেশ। আমার সঙ্গে চল, এক জালা জল খাইয়ে দিই। [উভয়ের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

এ কি খেলা তুমি খেলিছ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আলোছায়ারূপে এ কি খেলা তুমি
খেলিতেছ মোর মাঝেতে,
একবার মোরে উজলি দাঁড়াও
আর বার ঢাকো লাজেতে।
হেরিয়া তোমার মুরতি মোহন
মুদে আসে মোর দুইটী নয়ন,
তারপরই দেখি: আবরণ, এ কি!
কোথা হতে তোমা ঢেকেছে!
ডুবেছে আলোক; হৃদয়ে আমার
গহন তিমির নেমেছে।

কত আর বলো সহা যায়, নাথ,
গভীর তিমির রজনী!
তিমিরের কূলে ভিড়িবে না কভু
সোনার প্রভাত-তরণী?
যে-প্রভাত মোর চির-নির্ম্মল,
হবে গো শুভ্র, চির-উজ্জ্বল—
যে লগন মোর হবে গো অশেষ,
শেষ আর যার হবে না!
তব মুখ হেরিতে হেরিতে
হারাব সকল চেতনা!



ইঙ্গুদি-পিঙ্গল কুণ্ডল

মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক অলংকারগুলির শ্রেষ্ঠ রত্ন। একখানি অতি প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধারে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে শকুন্তলা পতিগৃহে গমনের সময় এই অতুলনীয় কর্ণাভরণ

ইঙ্গুদি-পিঙ্গল-কুণ্ডল

ব্যবহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহারই একমাত্র আটমোষ্ট আলট্রামডার্ণ আপটু-ডেট ফ্যাসান্।

আপনার প্রিয়জনকে

পরিয়ে দেখুন

বয়স বারো বছর কমে যাবে।

বিজ্ঞাপনের এইটুকু পড়িতে পড়িতে পাঠক থামিল। পাঠকের বয়স হইয়াছে অর্থাৎ নবীন যুবক নহে, তবে পিতৃ-অর্জিত জমিদারী আছে, তাই অন্ন চিন্তা নাই বলিয়া অন্য চিন্তায় মাথা ঘামায়। যথা-গৃহিণীর সৌন্দর্য রক্ষণ ও বর্দ্ধন। কারণ, বয়স তো একা তাহারই বাড়ে নাই, গৃহিণীরও কোন্ পঁয়ত্রিশ না হইবে। তবু কিন্তু এখনও স্বামী-স্ত্রীর সখ হয়—আবার তাহারা পূর্ব্বের বয়স ফিরিয়া পায়, আর এখনকার ছেলেদের মত একবার হাত ধরাধরি করিয়া পার্কে সিনেমায় ঘুরিয়া আসে। অবশ্য এ কথাটা নটবর মনেই রাখিয়াছে, জানে গৃহিণী শুনিলেও হাসিবেন। তবু তাহার গৃহিণী শ্রীমতী নলিনীবালা দাসীকে কিন্তু একটা সেকেলে আপনারা ভাবিতেছেন মোটেই তা নয়, কারণ তাহার পিতা ছিলেন সংস্কারি-দপ্তরে মোটা মাহিয়ানার কর্ত্তা। তাহার একমাত্র ভ্রাতাও বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার। শুধু এক টাকার দৌলতেই নটবর নলিনীকে লাভ করিয়াছে—নতুবা, নলিনী এখনও মাঝে মাঝে খোঁটা দেন্—নতুবা এতদিন কোনও আই-সি-এস ম্যাজিষ্ট্রেটের গিন্নি হইয়া ইত্যাদি। নটবর গৃহিণীর মনের ক্ষোভ মিটাইতে বিন্দুমাত্র কসুর করে না। গহনা-পত্রে, কাপড়-চোপড়ে, এমন কি টমটম আছে—সে সত্ত্বেও সাত হাজার টাকার একখানা গাড়ীও কিনিয়াছে। আজিও এই ইঙ্গুদি-পিঙ্গল-কুণ্ডলের বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া নটবর তাহার পুষ্ট গোঁফে হাত বুলাইয়া কাগজখানি পার্শ্বচর কামাখ্যাকে আগাইয়া দিয়া বলিল, ব্যাপারটা কি বোঝ ?

কামাখ্যা কাগজখানি তীর্যকভাবে ধরিয়া নির্যাসটুকু গ্রহণ করিলেন, তারপর বলিলেন—লোকের রুচি সব এখন ওল্ড্ এলিমেণ্টের দিকে যাচ্ছে কিনা, তাই স্যাকরারাও খুঁজে খুঁজে মহেন্-জো-দড়ো-হরাপ্পার নিদর্শন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তবে শকুন্তলার ব্যাপারটা আমার মনে হয় গাঁজা। কারণ মহামুণি কণ্ব ছিলেন ঋষি। তিনি তাঁর মেয়েকে এই সব গহনা দিয়ে সাজাবেন, পাবেন কোথায় ?

নটবর বাধা দিল—তার রাজা-রাজড়া শিষ্যও ছিলতো কত। আর শকুন্তলার বিয়েটাই বলতে গেলে হল কণ্বের অনুপস্থিতিতে। সে সময় ধরো কণ্ব যদি কোনো যজমান বাড়ী গিয়ে ঐ কুণ্ডল প্রণামী পেয়ে থাকেন। কিন্তু সে সব অবান্তর কথা থাক্। আসল কথা এতে নাকি বয়স বারো বছর কমে যাবে। ধরো তোমার যে মেয়েটির বিয়ে বিয়ে করে কান ঝালা-পালা করছ, তার বয়স কত—এই ষোলো তো ? তাকে পরালে সে তবে চার বছরের খুকী হয়ে যাবে ? যত গাঁজা এই খানে, শকুন্তলায় নয়, এই খানে।

কামাখ্যা বলিল—আদতে কিন্তু গাঁজা ওর কোথাও নেই, সব গিনি সোনা, সরকারেরা গিনি সোনার কাজ ছাড়া করে না। ও সব বয়সের উত্তর ওর ভাষার মধ্যেই আছে। দেখুন না, যেখানে মহেন্-জো-দড়ো হরপ্পার কথা বলছে, সেখানে দিব্যি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষা চালাতে চালাতে এসে ঐ বয়সের যায়গাতেই একেবারে বীরবলী চাল চেলেছে। ঐখানেই কেরামতি—বিজ্ঞাপন লেখাও একটা আর্ট বুঝলেন কিনা।

নটবর অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—তবে ওরা কি বোঝাতে চায় ?

কামাখ্যা বলিল—বোঝাতে চায়, 'আপনার', 'প্রিয়জনকে',

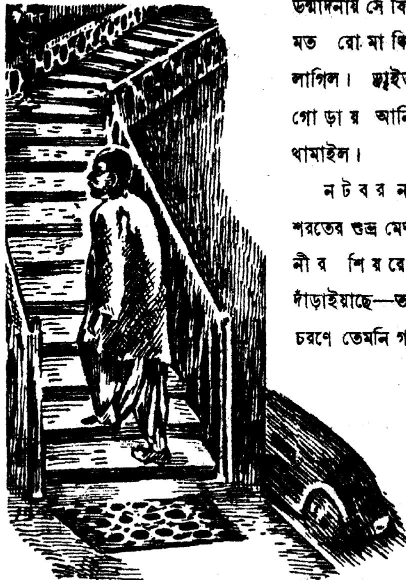
আর 'পরিয়ে দেখুনের' মধ্যে যেমন প আর ন এর অনুপ্রাস, আবার বয়স, বারো, বছর আর যাবে—এর মধ্যে যেমন বএর একটা অনুপ্রাস যায়া—বিশেষ রূপে রীরবলী ভাষায় যে শ্রী ফুটেছে, ঐ কুণ্ডল পরলেও বয়স কম দেখিয়ে দেখিয়ে এমন একটা ইকুই-লিব্রিয়ামে এসে টাল খেয়ে দাঁড়াবে যে ঠিক তেমনি সুশ্রী দেখাবে —অর্থাৎ।

অর্থাৎটা আর বলা হইল না, কামাখ্যার বাড়ী হইতে চাকর ডাকিতে আসিল; কামাখ্যার মেয়েকে আর এক যায়গা হইতে দেখিতে আসিয়াছে, অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল। নটবর খবরের কাগজটা মুড়িয়া লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল, কামাখ্যার বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। কাগজটা খুলিয়া আর একবার বিজ্ঞাপনটা পড়িল—চমৎকার লিখিয়াছে—আটমোষ্ট্‌ আলট্রা-মডার্ণ, আপ-টুডেট ফ্যাসান্‌।

সকাল হইতে বৃষ্টি চলিতেছে, তাই দ্বিপ্রহরের গড়াগড়ি সারিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নটবর উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল—ইঙ্গুদি-পিঙ্গল-কুণ্ডল কিনিতে হইবে। গৃহিণীকে বলিল—একটু বাহিরে ঘুরিতে যাইতেছে। একে টিপি টিপি বর্ষা, তায় আবার ব্ল্যাক-আউটে পথের আলো নিবাইয়া দিয়াছে—গৃহিণী তাই টমটমের বদলে মোটর নিতে বলিয়া দিলেন।

কলিকাতার রূপ যেন চেনা যায় না। যেন কোন অতীত দিনের ঐতিহাসিক শহর, ইহার পথে পথে অজানা বিপদ, অজ্ঞেয় ষড়যন্ত্র, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত কালো কুৎসিৎ পথ, দুইধারে বিপনিশ্রেণীও হীনপ্রভ। আতংকে মানুষের চেহারাও যেন বদলাইয়া গিয়াছে। নটবর গাড়ী হইতে দোকানে প্রবেশ করিয়া কুণ্ডল কিনিয়া আসিয়া ত্বরিতে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিয়া পথের বীভৎসতার কথা ভুলিয়া গেল। বিজ্ঞাপনে নেহাৎ মিথ্যা লেখে নাই। মাত্র পঁচাশি টাকায় এমন চমৎকার কর্ণাভরণ হইতে পারিবে ভরসা করে নাই, কিন্তু সত্য সত্যই মাত্র পঁচাশিতেই শেষে তাহাকে দোকানে জিনিবটি দিয়াছে। নলিনীকে উহা পরাইলে কেমন মানাইবে ভাবিতে ভাবিতে নটবর তন্ময় হইয়া গেল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নগরীর রাজপথ ব্ল্যাক-আউটে মসীলিপ্ত, কোনও গবাক্ষপথে উজ্জ্বল আলো নাই। এই বিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারে শ্রাবণের মেঘ-মেদুর সন্ধ্যায় দীপহীন গৃহে প্রিয়া-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহার চারুকর্ণে স্বহস্তে এই নব-আভরণ মণিকুণ্ডল উপহার দেওয়ার চমৎকার চিন্তা নটবরের অন্তরে রস সঞ্চার করিল। চক্ষু নিমীলিত করিয়া সেই সুরভিত অন্ধকার ও কোমল মধুর স্পর্শের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কুণ্ডল পরাইয়া যখন দীপ প্রজ্বলিত করিবে তখন প্রিয়ার মুখে কি ছবি ফুটিয়া উঠিবে—তাহারই উন্মাদনায় সে বিকচ কদম্বের মত রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ড্রাইভার দুয়ার গোড়ায় আনিয়া গাড়ী থামাইল।



মেঘ ভাসিয়া চলিল—

নটবর নামিল—যেন শরতের শুভ্র মেঘ শ্যাম বনানীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার লঘু চরণে তেমনি গতি, তাহার শ্বেত পরিচ্ছদে তেমনি জ্যোতি, স্বল্প আলোকে মনে হইল—যেন অন্ধকার বনচ্ছায়ে একটি কুরুবক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

মেঘ ভাসিয়া চলিল—নটবরের মনে হইল যেন সত্যই সে হাওয়ায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এই সজল ব্যাকুল বায়, এই দাদুরি ডাকা শ্রাবণ সন্ধ্যায় কেন যে টিপি টিপি বর্ষা নামিয়াছে, যদি বা বর্ষা নামিল—কেন যে পথে আজ আলো নাই, সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া যেন অভিসার যাত্রা সুরু হইয়াছে। অভিসার—হ্যাঁ নটবরও অভিসারে চলিয়াছে, তাই বুঝি এক পা চলিতে দুই পা থামে। মনে হয় চাকর-বাকর এই অন্ধকারে এমন চুপি চুপি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে দেখিয়া চোর ভাবিবে না তো? চোর? সত্যই তো চোর, নলিনীর মন চুরি করিবার জন্তই আজ তার এই অভিসার। সিঁড়ির মুখে একটা তারের পাপোষে বাধা পাইল, মনে হইল—সেটা যেন নূতন দেখিতেছে—এ পথ যে সত্যই নূতন। শ্যাম নটবর নিত্য এই পথে যাতায়াত করে, কিন্তু কদম্ব মূলে আজ বুঝি এই প্রথম, তাই সবই নূতন লাগিতেছে। সিঁড়ির মোড়ে একটি পিতলের টবে পাতাবাহার, মনে হইল বুঝি মানিনী কলসী পথে রাখিয়া গিয়াছে—সে যে তারে প্রতীক্ষায় আছে। নটবর আর সিঁড়িতে দাঁড়াইল না। সোজা

বিজলে উঠিয়া গেল। অন্ধকারের যাদু তাহার মনে ক্রিয়া করিতে লাগিল।

এ বাড়ীটি নলিনীর ফরমায়েস মত তাহার দাদা ব্যারিষ্টার ডাটের বাড়ীর অনুকরণে তৈরী। কেবল বাহিরের দিকে দুধারেই মায়েব গোমস্তাদের জন্ম পৃথক পৃথক কয়েকখানি বাড়তি ঘর আছে। নটবর বিলাত-ফেরৎ, শ্যালক ও তাহার ভগিনীর রুচি জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ বাড়ী করাইয়াছে।

বারান্দায় অদূরে কালো ঢাকনার মধ্যে আলো জ্বলিতেছিল—তাহাতে সব স্পষ্ট দেখা না গেলেও নটবর বুঝিতে পারিল, তাহার শয়ন কক্ষের দ্বার ঈষন্মুক্ত এবং সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—অন্ধকার ঘরে নলিনী খাটের উপর শুইয়া আছে। খোলা জানালা দিয়া আকাশের যেটুকু আলো আসিতেছিল তাহাতেই বুঝা গেল—ছেলেটি কাছে নাই, বোধ হয় ঝি দুধ খাওয়াইতে নিয়া গিয়াছে—অচিরে আসিয়া পড়িবে। এই সুবর্ণ সুযোগ—সুবর্ণ কুণ্ডল উপহার দিবার। নটবর শয্যাপার্শ্বে ধীরে উপবেশন করিল এবং সযত্নে পত্নীর কর্ণাভরণ খুলিয়া লইয়া নূতন দুইটি পরাইয়া নলিনীকে কুণ্ডলিনী করিয়া দিল। আলোক জ্বালিবার উদ্যোগে উঠিবার পূর্বে বিশেষ কারণে নটবরের নীচু



পি. কে. জিরো ডাবল্ ও থি, লাইন

মুখখানি আর একটু ঝুঁকিয়া পড়িতেই কুণ্ডলিনীর গণ্ডে তাহার গুম্ফরাজি স্পর্শ করিল এবং তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত সটান উঠিয়া বসিলেন। কুণ্ডলিনীর সেই আকস্মিক উত্থানে নটবরের নাসিকায় নিদারুণ আঘাত লাগিল। সে নাসিকা ঘসিতে ঘসিতে আনুনাসিক স্বরে উচ্চারণ করিলেন—'নাঁকটা যে গেঁল'। এমন আঘাতের আশংকা থাকিলে বুঝি জয়দেবের পদও ভাসিয়া যাইত। নটবরেরও রসভঙ্গ হইল।

কুণ্ডলিনী ঝটিতি খাট হইতে নামিয়া আলো জ্বালিয়া দিলেন এবং দেখিতে পাইলেন—এক বিরাট পুরুষ তাহার খাটে বসিয়া নাসিকা মর্দ্দন করিতেছে। তাহার পরিধানে ভদ্রলোকের স্যুট নাই, তাহার আদ্দির পাঞ্জাবীর দীর্ঘ ঝুল খাট ছাড়াইয়া মেজে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে। ঢাকনার ফাঁকের অল্প আলোকেও বুঝিলেন—এ তাহার স্বামী মিষ্টার ডাট নহেন, অন্য ব্যক্তি। আর অন্য ব্যক্তি যে কে, ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার রাত্রি, তাতে বর্ষা—এমন সুযোগ বুঝিয়া আসিয়া কান হইতে গহনা কাহারা খুলিয়া নেয় তাহা বুঝিতে আর একদণ্ডও বিলম্ব হইল না; চকিতা চকিতে বাহিরে আসিয়া পূর্বে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তারপর চীৎকার করিয়া গগন মস্তকে তুলিলেন।

নটবর ঘরের মধ্যে নাসিকার যন্ত্রণায় কাতর ছিল, কিন্তু সেই ভয়ার্ত চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিল ইহা শ্রাবণ শর্বরীর কেকারব বা মেঘগর্জন নহে, নারীকণ্ঠে ভয়ার্ত্ত চীৎকার করিতেছে। নলিনী যে ভুল বুঝিয়া ভয় পাইয়াছে ইহাতে নটবরের হাসি পাইল, কিন্তু রঙ্গ করিতে যাইয়া একবাড়ী লোকের সামনে হাস্যাস্পদ হওয়াও বোকামী। তাই সে উঠিয়া দুয়ার খুলিতে গেল। কিন্তু দুয়ার বাহির হইতে বন্ধ এবং বাহিরে সমবেত জনতা নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছে।

ঘরে ঢাকনা ঢাকা যে আলোক জ্বলিতেছিল তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া নটবর বুঝিতে পারিল—এটা তাহার ঘর নয়, ইহার আসবাবপত্র—ঘড়ি, পাখা, আলমারি, পালঙ্ক সর্বত্র অপরিচয়ের চিহ্ন। দেওয়ালের ছবি আবছা অন্ধকারে চেনা গেল না—কিন্তু তাহার শয়ন কক্ষে শয্যাশিয়রে লম্বিত শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের বিরাট আলেখ্যের মত বড় ছবির আভাস একটাও পাওয়া গেল না। শ্যামা মাকে না দেখিতে পাইলেও অলক্ষ্যে নটবর তাঁহাকেই স্মরণ করিল, আর স্মরণ করিল নলিনীকে—যিনি সকাল সন্ধ্যা ভক্তিভরে শ্যামাপদে প্রণতি জানান বলিয়া এখনও সে কৌতুক করিতে ছাড়ে না। নিজের অজ্ঞাতে তাহার বক্ষভেদ করিয়া নাসাপথে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। তারপর নিজে বাহির হইবার জন্য পথ খুঁজিতে লাগিল।

দরজার বাহিরে যিনি ছুট কট করিতেছিলেন তিনিই এই গৃহের কর্ত্রী, নাম নলিনী নয় লীলা, স্বামী ডাকেন লেলী। তাহার হাঁক-

ডাকে খুন্তি হাতে পাচক, খোন্তা হাতে মালি, আর চাকর বনমালি, চাকরাণী সৌদামিনী—সকলেই আসিয়া জড় হইল। কিন্তু ঘরের ভিতর ডাকাত রহিয়াছে শুনিয়া কেহ সাহস করিয়া দরজায় হাত দিল না। বনমালি বুঝি একবার বলিয়াছিল—লাঠি সোটা নিয়ে সবাই মিলে ব্যাটাকে—। আর বলিতে হইল না, উত্তর-দেশবাসী ঠাকুর বিক্রম দেখাইয়া বলিল—ডাকাতের হাতে ছোরা আছে, রিভলবার আছে—কিমতি ভিতরি যিব? ছোরা রিভলবারের নাম শুনিয়া সৌদামিনী মূর্চ্ছা গেল।

নেলী যাইয়া ফোন ধরিলেন—হ্যালো, পি-কে, ডাবল ও থ্রি নাইন্—হ্যাঁ, কে—নলিনী দি? হাঁ দেখ ভাই, তোমার কর্ত্তাকে একবার পাঠাবে জলদি করে? ভারি মুস্কিল—আমাদের ঘরে ডাকাত পড়েছে? তবে কৌশলে ঘরের ভিতরই বন্দী করা গেছে—এখন কি করা যায়? ঠাকুর-জামাই যদি একবারটি আসেন। এ্যাঁ, কি বললে—তোমার দাদা? তিনি তো এখনও ফেরেন নি, কি বলছ, ঠাকুর-জামাইও বেরিয়েছেন—গাড়ী নিয়ে? কি করি এখন?—পুলিসে বলব? আচ্ছা তাই বল্‌ছি। তুমি ছাড়ো, পুলিস ডাকি।

"হ্যাঁ, পুলিসই ডাকো—না হলে এসব ড্রাইভার সায়েস্তা হবে না,"—বগলে একটা কাগজের পুঁটলি নিয়ে ব্যারিষ্টার ডাট তার পত্নীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আবার ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমিই তো সব আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছ। আজ ক্লাব থেকে বেরিয়ে গাড়ী নিয়ে দোকানে গেছি দুটো জিনিস কিন্‌তে—বেরিয়ে দেখি—ব্যাটা গাড়ী নিয়ে ভেগেছে। এই টিপ টিপে বর্ষা, তায় ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার। শেষে ভিজে ভিজে ট্রামে ফিরতে হল।

ড্রাইভারকে জাহান্নামে পাঠাইবার ভরসা দিয়া নেলী ডাকাতের কথা বলিলেন। ডাট গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পরমুহূর্ত্তেই আস্তিন গুটাইয়া পাশের ঘরে যাইয়া সুটকেশ হইতে টর্চ ও রিভলবার বাহির করিয়া শয়ন কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সাহেব ঘরে ফিরিতেই বনমালীর বুদ্ধি খুলিয়াছিল—সে তাই ছুটিয়া পাহারাওয়ালা ডাকিতে গিয়াছিল। পাহারাওয়ালা আসিলে ডাট সদলবলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া টর্চের ফোকাস ফেলিলেন। সে আলোকে বিছানার উপর লীলার কর্ণচ্যুত হীরকের দুল দু'টি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল—ডাট গর্জ্জিয়া উঠিলেন, —বাক্স ভেঙ্গে গহনা বের করছে। টর্চ ঘুরাইয়া ঘরের চতুর্দ্দিক দেখা হইল—সব জিনিষ যথাযথ আছে, কিন্তু ডাকাত নাই। খাটের তলা, আলমারির পিছন, আলনার অন্ধকার তন্ন তন্ন করিয়া হাতড়ান হইল—ডাকাত নাই। তবে কি ব্যাটা যাদু জানে?

শয়ন কক্ষের সম্মুখে পথের উপর যে ঝুলবারান্দা আছে, সেদিক অন্ধকার, সেখানে কাহারও নজর পড়ে নাই, অবশেষে ডাকাতকে সেখানে পাওয়া গেল। সে নীচে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সময় পাহারাওয়ালা তাহাকে টানিয়া আলোকের নীচে আনিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলিল, আমি চোর ডাকাত কিছুই নই, বাড়ী ভুলে—

সকলে এককণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিল—বাড়ী ভুলে? কিন্তু তাহার মধ্যেই লীলা তাহার স্বামীর বাহু আকর্ষণ করিয়া কানে কানে কহিলেন—চিনতে পারো নি? ও যে ঠাকুর-জামাই, আমাদের নটবরবাবু গো। পরিষ্কার আলোকে উভয়ে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিলেন।



আমি চোর ডাকাত কিছু নই—

কর্ত্তার ইঙ্গিতে ঘর হইতে অন্য সকলে বাহির হইয়া গেলে ডাকাত মনে কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—আমি পথের অন্ধকারে ভুল করে অপরের গাড়ীতে চড়ে অপরিচিত বাড়ীতে এসে পড়েছি। ডাকাত আবার মাথা নীচু করিয়া রহিল।

এবার লীলা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, গাড়ী না হয় ভুল করলেন, বাড়ীও না হয় ভুল করলেন, তাই বলে অপরের নারীও ভুল করলেন? বসুন, ডাকি নলিনী-দি'কে, দেখে যান তাঁর কর্ত্তার কাণ্ড! আর আপনার চাকর বরোয়ানও এসে পড়ুন বলে—তারাও দেখবে এসে ডাকাত ধরা পড়েছে।

মিষ্টার ডাট বলিলেন—ও, তবে আমার গাড়ী বুঝি অন্ধকারে তোমায় নিয়েই চলে এসেছে—আর তোমার গাড়ীটা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ছাখো তো ব্ল্যাক-আউটে কি মুস্কিল—

নলিনী নয়, তখনও লীলাই বলিলেন—কিন্তু মুস্কিলের আসান হল আমারই। ছাখনা, নটবরবাবুর সখ আছে—বলিয়া কর্ণের কুণ্ডল স্বামীকে দেখাইলেন। ড্রেসিং টেব্‌লের বড় আয়নায় তাহার নূতন কর্ণাভরণ জ্বল জ্বল করিতেছে দেখা গেল।

ডাকাত এতক্ষণ অবনত মস্তকে বসিয়া ছিল, এইবার অপাঙ্গে একবার দেখিয়া লইল—লীলার বয়স সত্য সত্যই বারো বৎসর কম দেখাইতেছে কিনা।

নিরভিমানী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গর্ব্বের কিছু নাহি রে,
প্রতিদ্বন্দ্বী নহ, রহ, সব—
প্রতিযোগিতার বাহিরে।
যাহারা পেয়েছে ধন, জন, মান,
অকপটে দাও সবে সম্মান,
অর্থ যে মহাসৌধ গড়েছে
বিস্ময়ে দেখ চাহিরে।

বন্দনা কর ছুটে হে,
যে পথেই হোক যা-করেই হোক
মন্দিরে যারা জুটেছে।
যখন যেখানে দেখিবে যে আলো
ভাবো হোমাগ্নি, বাস তারে ভাল
প্রসারী ফুলের মর্য্যাদা দাও
যেখানে যে ফুল ফুটেছে।

সমাদর কর তাদেরো,
উল্কা হলেও রবি শশী ভাবে
সীমা রাখে না ক সাধেরও।
দুরাকাঙ্ক্ষার পথের পথিক,
দাবী চেয়ে বেয়াদবীই অধিক,
তবুও যেন কি শোভা আছে সেই
ছোট ছোট অপরাধেরও।

যতই থাকো না আড়ালে,
ভেব না তোমার বিকালো না ছবি
বৃথায় সময় হারালে।
আছে একজন প্রসন্ন আঁখি
চলে না যেথায় দর্প ও ফাঁকি,
সাগরগহ্বরে যে মুকুতা থাকে
তার যে গরব বাড়ালে।

কোনও ফল নাই রাথাতে,
গ'লে যাবে সব কাল-তরঙ্গ
রসাঞ্জনের আঘাতে।
থাকিবার যাহা রয়ে যাবে তাই
বিনাশ তাহার কোন কালে নাই,
কোনো ডাক্ কোনো জাঁক চাহি না ক
সে সুধা-উৎস জাগাতে।



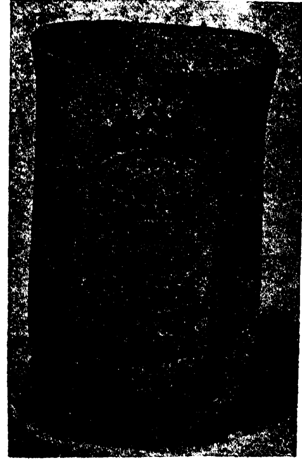
কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কালাজ্বরের চিকিৎসায় বিভ্রাট

কালাজ্বর চিকিৎসায় এণ্টিমনি ধাতুঘটিত ঔষধের প্রচলনের পূর্ব্বে ডাক্তাররা নানাভাবে রোগের উপশমের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়াতে কুইনাইনঘটিত ঔষধ ব্যবহারের সুফল জানাই ছিল। সুতরাং কালাজ্বরেও ইহা সুফল দিতে পারে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে ডাক্তারেরা কালাজ্বরে খুব বেশী মাত্রায় কুইনাইন দিতেন; কিন্তু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে কালাজ্বরে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। আমাদের রক্তের শ্বেত কণিকায় নানা রোগের বিষ দমন করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, সেইজন্য শ্বেত কণিকার সংখ্যা বাড়াইবার নানা উপায় অবলম্বন করিয়া কালাজ্বর দমনের চেষ্টাও করা হইয়াছে। উপক্ষার ঘটিত (alkaloid) ঔষধ দ্বারা রোগ দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। রোগীকে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বল দিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য কোন কোন চিকিৎসক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া টিকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং পারদঘটিত ঔষধও প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করিলেন। আবার কেহ কেহ পচন-নিবারক ঔষধও ইনজেক্‌সন করিলেন। সকলেই একরকম অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কেহ রোগের মূলে আঘাত করিতে পারিলেন না।

রোগ নিরাময়ে পারদঘটিত ও অপরাপর ধাতব ঔষধের প্রচলন ভারতবর্ষে ও ইসলামীয় সভ্যতাশ্রিত দেশসমূহে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। ইউরোপে ধাতব ঔষধের ব্যবহার প্রবর্তন করেন—ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত পারসেলসাস। সম্ভবত তিনি প্রাচ্য দেশ হইতে এই বিদ্যা অর্জ্জন করেন। বিশেষ করিয়া এণ্টিমনি ধাতুর রোগ নিরাময় করিবার গুণের উল্লেখ ইউরোপে প্রথমে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। পাশ্চাত্য দেশে তখন এণ্টিমনি-ধাতুনির্ম্মিত সুরাপাত্র ব্যবহার হইত। ঐসব পাত্রে সুরা ঢালিলে উহার সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় টারটার এমেটিক (Tartar emetic বা Potassium antimony tartrate) নামে এক যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী হইত। ইহা তখন ঔষধ হিসাবে নানা রোগে বেশ সুফল দিয়াছিল। ক্রমে ঔষধের উদ্দেশ্যে এই পাত্রের এমন আদর হয় যে, গির্জ্জার সন্ন্যাসীরা নিজেদের শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য এণ্টিমনি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে যথেচ্ছভাবে সুরাপান করিতে লাগিলেন। এই সুরাপাত্রের অপব্যবহারের ফলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানা রোগ দেখা দিল এবং অনেক সন্ন্যাসী মারা গেলেন। এণ্টিমনি-পাত্রের চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল। এই



এণ্টিমনি ধাতু নির্ম্মিত সুরাপাত্র

সুরাপাত্রের গায়ে জার্মান ভাষায় লেখা আছে যে, তুমি এক আশ্চর্য্য পাত্র এবং তোমার সর্ব্বরোগহারী ক্ষমতা আছে। এণ্টিমনির লাটিন নাম ছিল ষ্টিবিয়াম। কিন্তু সাধুঘাতী বলিয়া ইহার নূতন নাম হইল antimonk বা সাধুশত্রু। ইহার অপভ্রংশ antimony এখন ঐ ধাতুর সর্ব্বজন-পরিচিত নাম। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সুরাপাত্রের

(ভাদ্রমাসে প্রকাশিতের পর)

প্রচলন ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহার অপব্যবহারজনিত কুফল দেখিয়া পারিস (ফ্রান্স) ও হাইডেলবার্গের (জার্মানী) চিকিৎসকমণ্ডলী আইন করিয়া ইহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন। এই এণ্টিমনি ধাতুঘটিত ঔষধ বিংশ শতাব্দীতে আবার কালাজ্বরের চিকিৎসায় অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বর্ত্তমান যুগে এণ্টিমনি-সম্বলিত টারটার এমেটিক প্রথম ব্যবহার করেন ব্রেজিলের (দক্ষিণ আমেরিকায়) ডাক্তার ভায়ানা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। কালাজ্বরের বীজাণু লাইশম্যানিয়া কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া কোন কোন রোগীর গাত্রচর্ম্ম বীজাণুর আশ্রয়স্থল হয় এবং পরিশেষে চর্ম্মে স্ফোটক হয়। এই জাতীয় রোগে ভায়ানা টারটার এমেটিক ইনজেক্‌সন করিয়া আশাতীত সুফল পাইলেন; ইহার পর অনুরূপ চিকিৎসার খবর পাওয়া গেল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভূমধ্য সাগরস্থ সিসিলি দ্বীপের ডাক্তার ক্রিস্টিনা ও ক্যারোনিয়া কর্ত্তৃক কালাজ্বরের চিকিৎসায়। আমাদের দেশে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে কর্ণেল রজারস প্রথমে বিশুদ্ধভাবে টারটার এমেটিক প্রস্তুত করেন এবং শিরার ভিতরে ইনজেকসন করিয়া কালাজ্বরের কয়েকটি রোগীর চিকিৎসায় সুফল লাভ করেন। তিনি বলেন যে যদিও তাহার চিকিৎসা প্রণালীর বিবরণ কিছু পরে প্রকাশিত হয়, তথাপি ইহা তাহার স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত এবং তিনি তাঁহার পূর্ববর্ত্তী ইতালীয় ও ব্রেজিলদেশীয় ডাক্তারদের চিকিৎসার বিষয় অবগত ছিলেন না। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, এই ঔষধ যদিও কালাজ্বরে ফলপ্রসূ হইতেছে তথাপি ইহার প্রয়োগে মাত্রাধিক্য হইলে জীবনরক্ষার পরিবর্ত্তে জীবননাশের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। কর্ণেল রজারস নিজেই লিখিয়াছেন—

"ইনজেকসন করিবার জন্য যে টারটার এমেটিক প্রয়োজন, তাহা বেশী দিন বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখা প্রায় অসম্ভব। বাঙ্গালার গরম হাওয়ায় ইহাতে অতি শীঘ্রই বাতাসের অসংখ্য বীজাণু সংক্রমিত হয় এবং তজ্জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়া শীঘ্রই ঔষধ বিষাক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জলমধ্যে দ্রব ঔষধ আর দ্রব অবস্থায় থাকে না, পাত্রের তলদেশে ছাকানি পড়ে। নির্বায়ু ও বীজাণুমুক্ত পাত্রে যখন ঔষধকে শোধিত করা হইত তখনও ঔষধ পরিপূর্ণ-ভাবে শোধন করা অসম্ভব ছিল। কলিকাতার গরম হাওয়ায় তখনকার দিনের শোধন যন্ত্রের রবারের নল প্রায়ই সচ্ছিদ্র হইয়া পড়িত এবং বায়ুস্থিত বীজাণুর সংক্রমণের উপায় সহজ হইয়া যাইত। সেইজন্য অনেক সময় সদ্য-প্রস্তুত ঔষধ ইনজেকসন করিলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিষক্রিয়ায় রোগী মারা যাইত।"

রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা ছাড়া টারটার এমেটিক ইনজেকসনের ফলে যে সমস্ত জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হয় তাহার বিবরণ কলিকাতাস্থ স্কুল-অফ-ট্রপিক্যাল-মেডিসিনের অধ্যাপক নেপিয়ার দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে কাশি, বমি, নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের অন্য দোষ, মূত্রাশয়ের বৃদ্ধি, পেটের গণ্ডগোল, গাঁটে গাঁটে বেদনা, গাত্রময় স্ফোটক, হৃদযন্ত্রের অতি শ্লথগতি, আকস্মিক জ্বর বৃদ্ধি—এই সব প্রায়ই রোগীদের মধ্যে দেখা যাইত।

এই সব উপসর্গ ও বিষক্রিয়ার ফলে টারটার এমেটিকের ব্যবহার অতি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ডাঃ সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী টারটার এমেটিকের বদলে সোডিয়াম এণ্টিমনাইল টারট্রেট প্রস্তুত করেন এবং উহা ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাকৃত সুফল পান। ডাঃ উপেন্দ্রনাথের নূতন যৌগিক পদার্থটির সঙ্গে আগেরটির তফাৎ এই যে, টারটার এমেটিকে এণ্টিমনির সঙ্গে যে পটাশিয়াম ধাতুর যৌগিক মিশ্রণ আছে সেই পটাশিয়ামের স্থলে তিনি সোডিয়ামের মিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন। এই সোডিয়াম এণ্টিমনাইল টারট্রেট তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটারীতে অতি-সামান্য আয়োজন অবলম্বন করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ডাক্তারেরা এই ঔষধ প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়াতে আসামের কালাজ্বর চিকিৎসায় এই ঔষধের প্রচলন হয়। তখনকার আসামের ডিরেক্টার-অফ পাবলিক-হেলথ মেজর মুরিসনের বার্ষিক বিবরণীতে লেখা আছে—

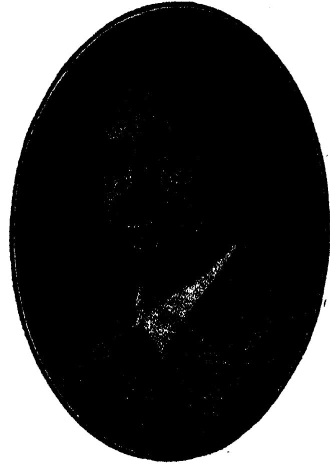
"১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আসামে টারটার এমেটিক দিয়া কালাজ্বরের চিকিৎসা আরম্ভ হয়, প্রথমে অল্প কয়েকটি রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়; পরে আরো রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। বেশী রোগীকে ইনজেকসন-

করিবার পর অতি শীঘ্রই দেখা গেল যে ঔষধের প্রয়োগের সঙ্গে চিকিৎসা প্রায়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া ওঠে। টারটার এমেটিকের বদলে তখন সোডিয়াম এন্টিমনাইল টারট্রেট প্রচলন করা হইল, ইহা নিরাপদ প্রমাণ হইল ও চিকিৎসায় সন্তোষজনক ফল দিয়াছিল; কিন্তু ইহারও দোষ বাহির হইল—বহুদিন যাবৎ এই ঔষধ ইনজেকসন না করিলে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি ইনজেকসনের পর আশাতীতভাবে সবল ও সুস্থ হইত বলিয়া রোগীদের নিয়মিতভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রে আসিবার গরজ হইত না। যদিও কালাজ্বরের ন্যায় মহামারীর বীজাণু সংক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক রোগীকে আইনের বলে চিকিৎসাকেন্দ্রে আনিতে বাধ্য করা যাইত, তাহা হইলেও এই বিধান কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার বাধা ছিল। তাহাদের রোগ নির্ম্মূল করিবার জন্য পীড়াপীড়ি 'জুলুম' বলিয়া লোকের মনে অশান্তভাবের সৃষ্টি করিত। এই বাধার জন্য আপাতরোগমুক্ত এবং সুস্থ ও সবল বহুলোক কালাজ্বরের বিষ শরীরে পুষিয়া রাখিয়া এই ভীষণ রোগকে আসামের এলাকা হইতে বাহির করিবার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ম্যাজিক লণ্ঠন-সংযোগে বক্তৃতাও প্রচারপত্র দ্বারা লোককে এই বিষয়ে সাবধান করা হইলে পর অবস্থা কতকটা আশাপ্রদ হয়। কিন্তু এই বিঘ্ন দূর করিতে হইলে এমন ঔষধের প্রয়োজন—যাহা অন্তত সোডিয়াম এন্টিমনাইল টারট্রেটের মত সুফলপ্রসূ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শক্তিশালী হইবে যে অল্পদিনেই কালাজ্বরের বিষ সমূলে দমন করিতে পারিবে।

উপেন্দ্রনাথ কালাজ্বরের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বুঝিলেন যে বহু লোকের আরোগ্যের জন্য চিকিৎসার উপায় উন্নত করিতে হইবে। স্বল্পকালে কালাজ্বরের সমস্ত বীজ মারিয়া ফেলিবে—এমন শক্তিশালী এবং দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধের প্রয়োজন তিনি গভীরভাবে অনুভব করিলেন। উপেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সবিশেষ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর গবেষণা

উপেন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিবার তখন কোন লোক ছিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। যখন তিনি এই কাজ আরম্ভ করেন তখন তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ঔষধ-বিজ্ঞানের শিক্ষক। ছাব্বিশ বৎসর আগে বর্ত্তমান সময়ের সুসজ্জিত গবেষণাগার তাঁহার ছিল না, রাত্রিতে আলোর জন্য গবেষণাগারে কেরোসিন



স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

তেলের বাতি জ্বালাইতে হইত এবং তাঁহার কাজের ঘরে জল এবং জলাধারের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। উপেন্দ্রনাথের গবেষণার মূলে ছিল তাহার রসায়ন জ্ঞান;* ইহার উপরে ছিল তাঁহার একাগ্র সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম। অধ্যাপনা ও হাসপাতালের কাজ করিয়া যতটুকু অবসর পাইতেন তাহা সম্পূর্ণভাবে তিনি গবেষণাকার্য্যে ব্যয় করিতেন। বহুদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন।

প্লিমার ও ব্রাই নামে দুই ইংরেজ ডাক্তার অতি সূক্ষ্মভাবে এন্টিমনি ধাতু চূর্ণ করিয়া ঘুমরোগে ইনজেকশন করিয়া খুব ভাল ফল পাইয়াছিলেন। কালাজ্বরের কোন কোন উপসর্গের সহিত পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘুমরোগের উপসর্গের মিলের সূত্র ধরিয়া উপেন্দ্রনাথ কালাজ্বরের অনুরূপ চিকিৎসার আয়োজন করিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে তাহার প্রথম প্রবন্ধ

* ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার ও বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল লেখকের নিকট রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার রসায়নজ্ঞান বর্ত্তমান গবেষণায় প্রচুর কাজে আসিয়াছিল।

প্রকাশিত হয়। প্রথমে বিশুদ্ধ এন্টিমনি ধাতু চূর্ণ করিয়া ক্যাম্পবেল হাসপাতালে কয়েকটি রোগীকে প্রয়োগ করিলেন। ইহাদের চিকিৎসায় সুফল পাইলেন। বিশদভাবে এই ঔষধ শরীরের ভিতর গিয়া কিরূপে কার্য্য করে তাহা দেখিবার জন্য ইঁদুর লইয়া পরে পরীক্ষা করেন। ইঁদুরের শরীরে কালাজ্বরের বীজ ইনজেকশন করিয়া উহাকে কালাজ্বরের রোগী তৈয়ারী করেন। ইঁদুরের প্লীহার মধ্যে কালাজ্বরের বীজগুলি আশ্রয় লাভ করিয়া বাড়িয়া ওঠে; এই সময় এন্টিমনি ইনজেকশন করিয়া আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কি রকমে বীজদুষ্ট রক্তকণা আবার পুরাতন সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসে তাহা তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করেন। এন্টিমনির সাহায্যে কালাজ্বরের বীজমারণ ক্রিয়ার একটি ফটোগ্রাফ (অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তোলা হইয়াছে) নীচে দেওয়া হইল। 'A' চিহ্নিত রক্তকণা কালাজ্বরের বীজাণুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া



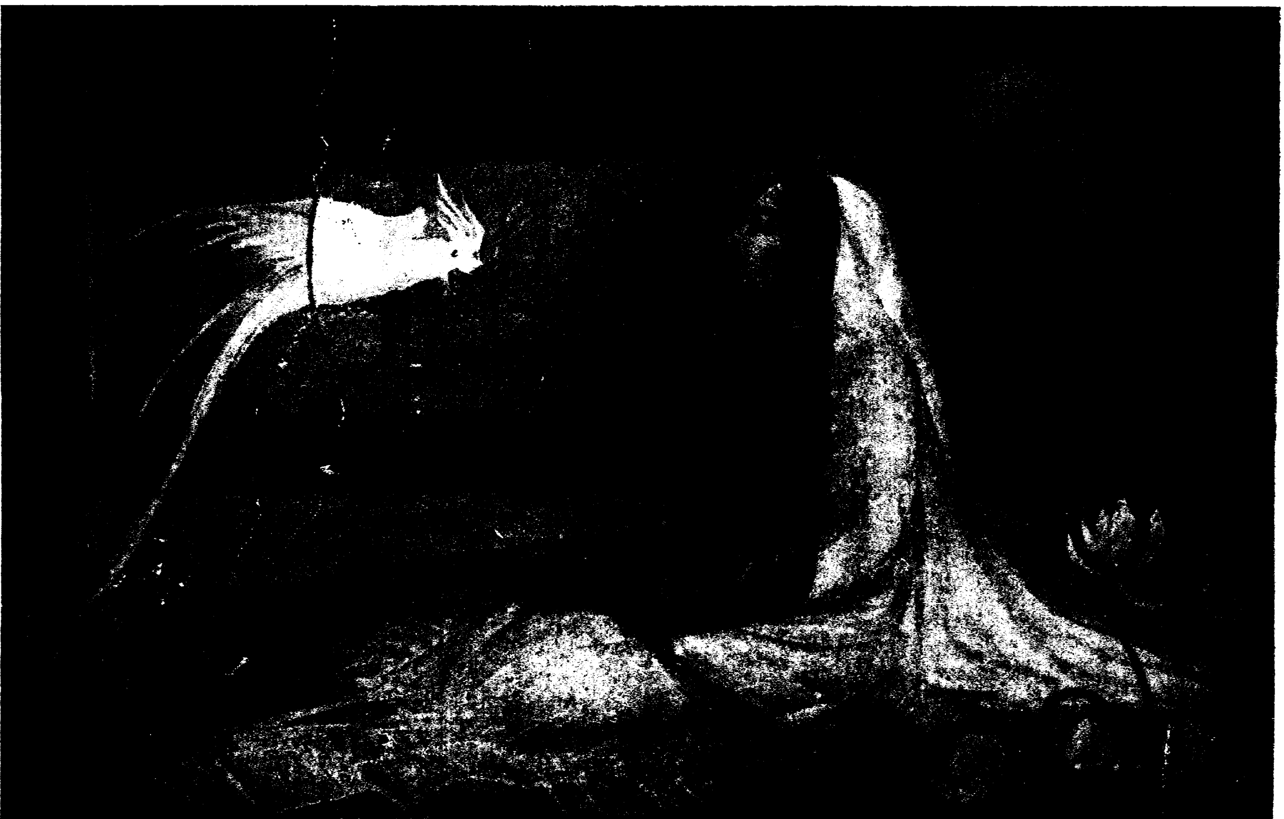
ইঁদুরের প্লীহার ভিতরে কালাজ্বরের বীজাণুদুষ্ট রক্তকণা এন্টিমনিচূর্ণ সংযোগে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা উপরের চিত্রে দেখান হইতেছে।
A—বীজাণুদুষ্ট রক্তকণা, B—এন্টিমনিচূর্ণ সংঘাতের পর রক্তকণার পরিবর্ত্তন, C—বীজাণু বিচ্ছিন্ন রক্তকণা সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে

গিয়াছে, 'B' চিহ্নিতস্থানে এন্টিমনির সংযোগে রক্তকণার পুনরুদ্ধার দেখা যাইতেছে, বিচ্ছিন্ন বিন্দু একত্রীভূত হইয়াছে। 'C' চিহ্নিতস্থানে বীজাণুটি রক্তকণা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। সমস্ত বীজাণুও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এন্টিমনি যে কালাজ্বরের বীজাণুর শত্রু, তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল। এন্টিমনিঘটিত ঔষধ যে কালাজ্বরের চিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দিবে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া গেল, কিন্তু এন্টিমনির প্রয়োগপ্রণালী নির্ণয় করা গবেষণার প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

কণা-অনুকণায় চূর্ণ ধাতু তখন বাজারে বিক্রয় হইত না। এন্টিমনি ধাতু চূর্ণ করিয়া ইনজেকশন করিবার প্রণালী ও যন্ত্রপাতি সবই উপেন্দ্রনাথকে তৈয়ারী করিতে হইয়াছিল। বিদেশী বৈজ্ঞানিকের কৌশল পরিবর্দ্ধিত করিয়া তিনি তাহার নিজস্ব প্রস্তুতপ্রণালী ঠিক করেন। চূর্ণ এন্টিমনির ইন্‌জেকশন তিন-চারিটি করিলেই রোগ ভাল হইয়া যাইত; কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী জটিল হওয়ায় অনেক রোগীকে একসঙ্গে চিকিৎসা করা সাধ্যাতীত ছিল। যদিও এইবার সময় সংক্ষেপ হইল, তথাপি আড়ম্বরের বাহুল্যের জন্য ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার করা সম্ভব হইল না।

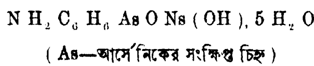
এন্টিমনির প্রয়োগপ্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য উপেন্দ্রনাথ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলয়ডাল (Coloidal) এন্টিমনি প্রস্তুত করিলেন; এন্টিমনিকে চূর্ণ করিয়া ক্লোরোফর্মে দ্রব করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এন্টিমনিকে চূর্ণ করিয়া উহাকে দ্রব অবস্থায় আনিতে উপেন্দ্রনাথকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এন্টিমনির এই নূতন প্রকরণ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের প্রস্তুত পদার্থের তুলনায় বেশীদিন বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিত। কিন্তু ইহাও প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহার ব্যবহারও ব্যাপক করা গেল না, পরন্তু কেবলমাত্র এন্টিমনি ধাতু-চূর্ণ ইনজেকসনের তুলনায় ইহার ইনজেকসন বেশী বার করিতে হইত এবং দ্রব ঔষধ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যাইত না।

এক্ষণে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কি প্রণালীতে গবেষণা করিয়া কালাজ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ ইউরিয়া-ষ্টিবামাইন (urea stibamine) আবিষ্কার করেন তাহার বিবরণ দিতেছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই প্রণালীর গবেষণায় প্রথম পথপ্রদর্শক বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক এর্‌লিক



শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মিত্র | মনের কথা | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

(Ehrlich)। তিনিই প্রথমে চিন্তা করেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন-প্রকারের যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে যাহা রোগের বীজাণুকে সম্পূর্ণভাবে মারিয়া ফেলিতে সক্ষম হইতে পারে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধ রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া (বর্ত্তমানে সাদা ইঁদুর ও খরগোস প্রভৃতির উপর প্রথম পরীক্ষা হয় এবং তৎপর হতাশ ও মরণোন্মুখ রোগীর উপরে প্রয়োগ করিয়া গুণাগুণ নির্দ্ধারিত হয়) প্রথমে বীজাণুর উপর উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। পরে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া যাহাতে ঔষধ রোগীর উপর কোন কুফল না দেয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া এরলিক ও তাঁহার জাপানী সহযোগী হাটা উপদংশ রোগের অব্যর্থ ঔষধ সালভারসান (Salvarsan) আবিষ্কার করেন। ৬০৬টি পরীক্ষার পরে এই ঔষধ আবিষ্কার হওয়ায় ইহার চলতি নাম হয় ৬০৬। এরলিক একই প্রণালীতে গবেষণা করিয়া আফ্রিকার ঘুমরোগের ঔষধ এটক্সিল (atoxyl) আবিষ্কার করেন। ইহা একটি আর্সেনিক ঘটিত জৈব যৌগিক পদার্থ। ইহার রাসায়নিক রূপ নীচে দেওয়া হইল



$$NH_2C_6H_4AsONa(OH),5H_2O$$

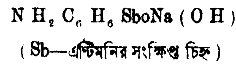
(As—আর্সেনিকের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন)

এরলিকের এই আবিষ্কার হইতে ডাঃ ব্রহ্মচারী তাঁহার গবেষণার সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যদি এটক্সিলের সদৃশ এমন একটি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা যায় যাহাতে আর্সেনিক ধাতুর পরিবর্ত্তে এন্টিমনি ধাতুর মিশ্রণ হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত যৌগিক পদার্থ কালাজ্বরের চিকিৎসা খুব ভাল ফল দিবে। তাহার এই ধারণার মূলে দুইটি কারণ ছিল।

(১) বিখ্যাত চিকিৎসক ম্যানসন দেখাইয়াছিলেন যে, ঘুমরোগের বীজাণু ও কালাজ্বরের বীজাণু অনেকাংশে সদৃশ এবং

(২) এন্টিমনি প্রয়োগে কালাজ্বরের বীজাণুর নিশ্চিত নাশ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি উক্ত এন্টিমনি-ঘটিত যৌগিক পদার্থ আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন। রাসায়নিকের দিক দিয়া দেখিলে এই যৌগিক পদার্থ একটি অসম্ভব সৃষ্টি নয় (ক), কারণ রাসায়নিকের মতে আর্সেনিক ও এন্টিমনি একই পর্য্যায়ভুক্ত মৌলিক পদার্থ এবং উভয় হইতে একই প্রকারের যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

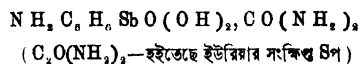
এই বিষয়ে গবেষণার সময়ে উপেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড এসোসিয়েশনের (ভারতীয় গবেষণা সাহায্য সমিতি) নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য পান। ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্বে এই এসোসিয়েশন চালিত হয় এবং তাহাদের প্রদত্ত টাকা এই সমিতি কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্য কল্পে বিতরিত হয়। এই সময় উপেন্দ্রনাথ এটক্সিল জাতীয় এন্টিমনিঘটিত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। ইহার নাম প্যারা-ষ্টিবানিলিক এসিড। এই এসিডের সোডিয়াম-লবণের রাসায়নিক রূপ নীচে দেওয়া হইল।



$$NH_2C_6H_4SbO_3Na(OH)$$

(Sb—এন্টিমনির সংক্ষিপ্ত চিহ্ন)

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, আর্সেনিকের ('As'এর) স্থান এন্টিমনি (Sb) দখল করিয়া আছে। বিভিন্ন উপাদানের যোগসূত্রে এটক্সিলের ন্যায়। যখন প্যারাষ্টিবানিলিক এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ঘটিত লবণ মাংসপেশীর ভিতরে ইনজেকশন করা হইল তখন দেখা গেল যে, কালাজ্বরের উপশম বেশ ভালভাবেই হয়, কিন্তু রোগী বিষম যন্ত্রণা পায়। সেই জন্য ডাঃ ব্রহ্মচারী আবার চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই ঔষধ ইনজেকশন করিবার পর যন্ত্রণা নিবারণ না করিতে পারিলে ইহার প্রচলন সহজ হইবে না। তিনি নানা উপায়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন যাহাতে নূতন ঔষধ প্রয়োগে রোগীর কোন যন্ত্রণা বোধ না হয় ; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপায় তাহাকে হতাশ করিয়াছে। পরে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ইউরিয়া (খ) নামক এক জৈবপদার্থের বাহ্যজ্ঞান লোপ করিবার শক্তি আছে এবং অনেক যন্ত্রণাদায়ক ঔষধে ইহাকে মিশ্রিত করিয়া ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন কুইনিন ইউরিয়া। কুইনিনের পরিবর্ত্তে কুইনিন-ইউরিয়া ইনজেকশন করিলে সাধারণ কুইনিনের অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া নিবারণ করা সম্ভব। এই সূত্রে জ্ঞানলোপকারী ইউরিয়ার সহযোগে উপেন্দ্রনাথ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্যারাষ্টিবানিলিক এসিডের সহিত ইউরিয়ার মিশ্রণ করিয়া এক যৌগিক লবণ তৈয়ারী করেন। ইহাই বর্ত্তমানে ইউরিয়া ষ্টিবামাইন নামে পৃথিবীময় কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার রাসায়নিক রূপ নীচে দেওয়া হইল।



$$NH_2C_6H_4SbO(OH)_2,CO(NH_2)_2$$

($CO(NH_2)_2$—হইতেছে ইউরিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ)

পূর্ব্বে লিখিত জার্মানীর সালভারসান যাহা ৬০৬ নামে পরিচিত এবং বর্ত্তমানে নিউমোনিয়ার ঔষধ ৬৯৩ (ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত)-এর নামকরণের প্রথা অনুযায়ী ইউরিয়া ষ্টিবামাইনের নম্বরও অনুরূপ কয়েকশতের ঘরে দাঁড়াইত। উপেন্দ্রনাথের এই আবিষ্কারের মূলে যে তাঁহার রসায়নশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি ছিল তাহা বিশদভাবে বলিতে হইবে না। পাঁচ বৎসর অক্লান্ত

(ক) পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষকে বিশ্লেষণ করিয়া রাসায়নিকেরা ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। এই মৌলিক পদার্থের গুণ বিচার করিয়া রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ গুণের পর্য্যায়সূত্রে ৯২টি পদার্থকে আটটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীভাগের পঞ্চম শ্রেণীতে এন্টিমনি ও আর্সেনিক এই দুইটি ধাতুর স্থান। সেই জন্য যখন আর্সেনিকের সঙ্গে যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী সম্ভব হইয়াছে তখন তুল্যগুণ-বিশিষ্ট এন্টিমনির সহযোগে অনুরূপ পদার্থ প্রস্তুত করিতে কোন বাধা হইবে না।

(খ) ইউরিয়া নরমূত্রে বর্ত্তমান। ইহা বর্ত্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা সম্ভব। প্রাণীবিশেষের মূত্র ব্যতিরেকে অন্য দুই পদার্থের সহযোগে ইউরিয়ার প্রস্তুত প্রণালী রসায়ন জগতে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল।

পরিশ্রম করিবার পর তাঁহার গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই গবেষণার পূর্ণবিবরণ উপেন্দ্রনাথের পুস্তক—'কালাজ্বর ও ইহার চিকিৎসা' (Kala-azar and its treatment)-এ বর্ণিত হইয়াছে।

ইউরিয়া ষ্টিবামাইন সহযোগে চিকিৎসা উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ক্যাম্বেল হাসপাতালে আরম্ভ করেন।

এইখানে ফল ভাল দেখা গেলে অন্য ডাক্তারেরা ইহার প্রয়োগ শুরু করেন। মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে চিকিৎসায় দেখা গেল যে, অতি সামান্য ঔষধ ইনজেক্‌সনে তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগী একেবারে নির্দ্দোষ আরোগ্য লাভ করিতেছে। আসামে কালাজ্বরের ব্যাপক চিকিৎসা কেন্দ্রে এই ইনজেক্‌সন ব্যবহার করিয়া ইহার অব্যর্থ গুণ প্রমাণিত হইল। কোন সাময়িক পীড়া বা বেদনা বা অতিরিক্ত উপসর্গ কিছুই এই ইনজেক্‌সনে পাওয়া গেল না। আসামের কালা-জ্বরের চিকিৎসার প্রধান ব্যবস্থাপক ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের মেজর শর্ট ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত বলিয়া প্রচার করিলেন।

বর্ত্তমানে ইউরিয়া স্টিবামাইন দ্বারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে তিন সপ্তাহ থাকিলেই যথেষ্ট। ঔষধের মোট খরচ ১৷৷০ (সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের দরে ১গ্রাম ১টাকায় মোট ১৷৷০ গ্রাম দরকার) ও হাসপাতালের পথ্যের ব্যয় ১০৷৷০ টাকা এই দুই মিলাইয়া ১২ টাকায় রোগী নীরোগ হইতে পারে। সোডিয়াম এন্টিমনাইল টারট্রেট ৫ গ্রাম দরকার হইত এবং অন্তত তিনমাসব্যাপী চিকিৎসা করিতে হইত। ঔষধের দাম যদিও দশ পয়সা হইত, পথ্যের জন্য তিনমাসে ৪৫ টাকা খরচ হইত এবং মোট খরচ ইউরিয়া স্টিবামাইনের তুলনায় অনেক বেশী হইত। ইহা ছাড়া ঘরে চিকিৎসা করিলে ডাক্তারের ভিজিট দিতে হইত। অল্প সময়ে নীরোগ হইতেছে বলিয়া ইউরিয়া স্টিবামাইন কুলিমজুরদের পক্ষে ভগবানের বরস্বরূপ। তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা শীঘ্র ফিরিয়া আসাতে দরিদ্র পরিবারসমূহের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে।

কেহ কেহ উপেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সাধনার খ্যাতিকে তুচ্ছ করিবার জন্য বলেন যে, তিনি ইউরিয়া স্টিবামাইন পেটেণ্ট করিয়া ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা সত্য নহে। আজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে উপাদানগুলির পরিমাণ সকলেই জানে এবং তুল্যগুণ-বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ এখন বাজারে বিক্রয় হইতেছে। ঔষধটির মূল উপাদানগুলির যোগসূত্র (constitution) বাহির করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। যখন উপেন্দ্রনাথ ইহা প্রস্তুত করেন, তখন ইহার গুণ পরীক্ষাটাই ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কেহ কেহ মনে করেন, জার্মানীর নিউস্টিবোশান ইউরিয়াস্টিবামাইন হইতে ভাল। কিন্তু আসামের স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ব্যাপক প্রতিশোধক হিসাবে তুলনামূলক পরীক্ষার ফলে ইউরিয়া স্টিবামাইন এখনও শ্রেষ্ঠ। এই ইনজেকসন স্টিবামাইনের সহিত পাশাপাশি পরীক্ষা করিয়া আসামে ইহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাসপাতালে ভর্ত্তি না হইলে এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব নয়, প্রতিদিন ইনজেকসন প্রয়োজন। এই ইনজেকসন সস্তা ও অতিশীঘ্র কাজ হয় বলিয়া ইহার প্রচলন খুব বেশী। চীন, গ্রীস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও অন্য ঔষধ পরীক্ষার পর এখন ইউরিয়া স্টিবামাইনই ব্যবহৃত হয়। কালাজ্বরের অন্যান্য ঔষধ যদি সমগুণবিশিষ্ট স্বীকৃতও হয় তাহা হইলেও ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না যে, কালাজ্বরের চিকিৎসার প্রথম পথ দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। আজ তাঁহার গবেষণার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া আসিতেছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কালাজ্বর রোগীর সংখ্যা গণনা করা হইতেছে, এই সময় ইউরিয়া-স্টিবামাইনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আসামের স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১০ বৎসরে সোয়া তিন লক্ষের উপর রোগী বাঁচিয়া উঠিয়াছে। ১৯২৫-১৯৩৬—এই ১১ বৎসরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৬৩৬৫ হইতে ৭৫৫-তে নামিয়া গিয়াছিল। মোট রোগীর সংখ্যা ৬০৯৪০ হইতে ১০৫০৭-তে নামিয়াছিল। এখন আরও কমিয়া গিয়াছে। কালাজ্বরের মড়ক কমিয়া যাওয়ায় এবং লোক অতি অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইবার ফলে অনেক সুস্থ লোক আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। 'বর্দ্ধমান জ্বরের' মড়কের পর আজ বর্দ্ধমান বিভাগ হৃতস্বাস্থ্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অনুমান করা যায় যে, ইউরিয়া স্টিবামাইন সেই সময় আবিষ্কৃত হইলে আজ সেই অঞ্চল সুন্দর শ্যামল থাকিত।

বাঙ্গালার পাট-চাষীর বিপদ

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বাঙ্গালা দেশের পাট ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য পাটের বস্তার অতিরিক্ত চাহিদার ফলেও পাটের দরের কোন উন্নতি হয় নাই। কারণ জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ইউরোপের অধিকাংশ দেশ অধিকৃত হইবার ফলে ইউরোপে পাটের বিক্রয়-কেন্দ্রগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমেরিকা, বৃটিশ ডোমিনিয়নসমূহ প্রভৃতি যে সব দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক অব্যাহত রহিয়াছে, তাহারাও জাহাজে স্থানের অসুবিধার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী পাট ক্রয় করিতে পারিতেছে না। এদিকে মিলওয়ালারা চট ও বস্তার দর এমন ভাবে বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন যে, আমেরিকায় চটের উর্দ্ধতম মূল্য বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু দেশ পাটের বস্তার বদলে অন্যান্য আঁশ হইতে বস্তা তৈয়ারির চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশ হইতে পাট আমদানি না করিয়া নিজ নিজ দেশে পাট অথবা পাটের পরিবর্ত্তে অপর আঁশ উৎপাদন করিবার জন্য দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মাঞ্চুরিয়া, ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড প্রভৃতি দেশে এবং ইউরোপের জার্ম্মানী ও বুলগেরিয়ায় চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহাদের প্রায় সর্ব্বত্রই গবর্নমেণ্ট এই চেষ্টায় অর্থসাহায্যের দ্বারা উৎসাহ দান করিতেছেন।

আমেরিকায় কিছুদিন যাবৎ পাটের বস্তার পরিবর্ত্তে ফসল চালানের জন্য কাপড়ের বস্তার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কাপড়ের বস্তা ক্রয় করিতে প্রথমটা বেশী টাকা লাগে বটে, কিন্তু উহা চটের বস্তা অপেক্ষা অধিক দিন টিঁকে বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহার ব্যয় কমই পড়ে। আমেরিকায় একটি পুরানো কাপড়ের বস্তার ব্যবসায়ও গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতবর্ষেই সম্প্রতি পাটের সহিত পরিত্যক্ত তুলা মিশাইয়া এক প্রকার ক্যানভাস তৈয়ারি হইয়াছে, উহার নাম বারলাপ। আমেরিকায় এই বারলাপের ব্যবহার খুব বেশী বাড়িয়াছে। সম্প্রতি সেখানে চটের ন্যায় বারলাপেরও উর্দ্ধতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকায় চটের যে উর্দ্ধতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কলিকাতায় বাজারে চটের দর উহাকেও ছাড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করায় আমেরিকান গবর্নমেণ্ট ভারত সরকারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অষ্ট্রেলিয়ান গবর্নমেণ্টও তাঁহাদের অসুবিধার কথা জানান। ফলে ভারত সরকার চটকলসমূহের প্রতিনিধিদের দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান। ইঁহারা ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, বাঙ্গালা সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বেশী কড়াকড়ি না করিলে আমেরিকা যাহাতে প্রয়োজনীয় চট তাহার নির্দ্দিষ্ট দরের মধ্যেই পাইতে পারে, তাঁহারা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। কলিকাতার চটকলওয়ালারা আমেরিকার সুবিধা দেখিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের লাভ কমাইলেন না। পাট চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া পাটের মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বাঙ্গালা সরকারকে চাপিয়া ধরিলেন এবং সফলও হইলেন। আগামী বৎসর দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষ হইবে এই সিদ্ধান্ত অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের দরের উর্দ্ধগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাটের দর কমিলেও পাট রপ্তানি বাড়ে নাই, ইহার প্রধান কারণ—জাহাজের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা প্রভৃতি দেশে চটকল নাই বলিলেই চলে; ইহাদিগকে তৈরি চট ও বস্তা কলিকাতা অথবা ডাণ্ডী হইতে আমদানি করিতে হয়। নিজেদের দেশে যে আঁশ উৎপন্ন হয় না, যাহার জন্য অপর দেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়, সেই আঁশ হইতে চট ও বস্তা তৈরির জন্য বড় বড় মিল প্রতিষ্ঠা করিতে দ্বিধা করা স্বাভাবিক। এই কারণেই সম্প্রতি পাটের পরিবর্ত্তে অপর আঁশের সন্ধানের চেষ্টা খুব বেশী বাড়িয়াছে এবং সফল হওয়া মাত্র সেই সব দেশে ঐ আঁশ হইতে বস্তা তৈরির জন্য মিল প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

আর্জ্জেনটিনে সামান্য পরিমাণে পাট, শণ এবং ফর্মিও নামক এক-প্রকার আঁশের চাষ হইত। এই চাষ বাড়াইবার জন্য তথাকার কৃষি-বিভাগের অধীনে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। আর্জ্জেনটিন বার্ষিক প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার পাট ক্রয় করিত; ঐ পরিমাণ পাট ও শণ নিজের দেশে উৎপন্ন করা এই নূতন বিভাগের উদ্দেশ্য। এই বিভাগ চাহে—দেশে পাট উৎপন্ন করিয়া সেই পাট হইতে দেশেই বস্তা তৈরি করা, যাহাতে বস্তার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়। এই নূতন বিভাগ খোলার অল্প কয়েক দিন পরেই বুয়েনস আয়ার্সের এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, আর্জ্জেন্টিনের উত্তরাঞ্চলে জনৈক কৃষক পাট অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর এক প্রকার আঁশ আবিষ্কার করিয়াছে। আড়াই একর জমিতে এই আঁশ তিন টন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে।

পাটের পরিবর্ত্তে শণ, সিসল, ফ্ল্যাক্স, ওসনাবুর্গ প্রভৃতি ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। শণের দ্বারা দড়ি ভালই হয়, কিন্তু বস্তা এখনও তেমন সুবিধাজনক হয় নাই। সিসলের ব্যবহার বাড়িতেছে। মেক্সিকো এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় সিসল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। সিসল ও টোয়াইন সূতা এবং দড়ি তৈরিতেই বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। মেক্সিকো হইতে আমেরিকায় সিসল চালান আরম্ভ হইয়াছে, কানাডাও আজকাল অধিক পরিমাণে সিসল ক্রয় করিতেছে। ফেল্ট প্রস্তুত করিবার জন্য কানাডা পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বারলাপ আমদানি করিত। জাহাজে স্থানের অভাবে বারলাপ চালান কমিয়া যাওয়ায় কানাডা গবর্নমেণ্ট সিসল আমদানিতে উৎসাহ দিতেছেন এবং উহার জন্য আমদানি শুল্ক কমাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব আফ্রিকায় উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা এবং কেনিয়াতে সিসলের চাষ বাড়িয়া বার্ষিক প্রায় ১ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ইহার সমস্ত ক্রয় করিয়া আমেরিকায় চালান দিতেছেন।

আমেরিকা পাটের পরিবর্ত্তে অপর আঁশ পাইলেই তাহা ক্রয় করিতেছে ইহা জানা যায়। বারলাপ এবং সিসল ছাড়া ম্যানিলার শনেরও

আমেরিকা এক বড় ক্রেতা। জাপানও অবশ্য ম্যানিলা শণ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীলণ্ডও উহা ক্রয় করিয়া থাকে। ম্যানিলার শণ প্রধানত দড়ি তৈরিতেই ব্যবহৃত হয়। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় শণের চাষের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছে।

ওসনাবুর্গ ব্যবহারেও আমেরিকা উৎসাহ দান করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ৭৯ লক্ষ ওসনাবুর্গে তৈরি বালির বস্তার অর্ডার দিয়াছেন। এই বস্তার চাহিদাও আমেরিকায় বাড়তির দিকে।

শণের চাষ বহু দেশে পুর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। তিসি জাতীয় একপ্রকার গাছের আঁসকে ফ্ল্যাক্স বলা হয়। পেরুতে ফ্ল্যাক্সের চাষ সফল হইয়াছে। বীজ মারফৎ একপ্রকার পোকা ফ্ল্যাক্সের গাছে ছড়াইয়া পড়িয়া অধিকাংশ গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিত। ডঃ মাক্সেটের গবেষণার ফলে এই অসুবিধা দুর করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্ল্যাক্সের চাষ এখন অনেক সহজ ও লাভজনক হইয়া উঠিতেছে। নিউজীলণ্ড এবং টাসমেনিয়াতে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাক্সের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। নিউজীলণ্ড সরকার জানাইয়াছে যে, আগামী বৎসর ২৫ হাজার একর জমিতে ফ্ল্যাক্স বোনা হইবে এবং যাহারা নিজ নিজ জমিতে ফ্ল্যাক্স চাষ করিবে তাহাদিগকে নানাবিধ সাহায্য দেওয়া হইবে। অষ্ট্রেলিয়াতেও ফ্ল্যাক্সের চাষ বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে উহা চাষ হইত, যুদ্ধের পর উহার চতুর্গুণ জমিতে চাষ আরম্ভ হয়। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর উহারও দ্বিগুণ জমিতে ফ্ল্যাক্স বোনা হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই চাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতেছেন। দক্ষিণ ভিক্টোরিয়া এবং টাসমেনিয়াতে ফ্ল্যাক্সের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নিউজীলণ্ডে ফ্ল্যাক্সের গাঁইট বাঁধিবার জন্য ১০টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং টাসমেনিয়ার হ্যাগলি শহরে একটি বিরাট ফ্ল্যাক্সের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দমকলের ব্যবহারের জন্য জলের নল, জলের ব্যাগের ক্যানভাস, রেলের মালগাড়ীর ঢাকনি প্রভৃতির জন্যই প্রধানত ফ্ল্যাক্স ব্যবহৃত হইতেছে। তবে ফ্ল্যাক্সের উৎপাদন ব্যয় পাট অপেক্ষা অধিক পড়ে এবং চট ও বস্তা অপেক্ষা ভাল কাজে উহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ফ্ল্যাক্স যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থায় পাটের ক্ষতি করিতে পারিবে না।

জার্মানী এবং বোহেমিয়া মোরাভিয়াতে ফ্ল্যাক্স এবং শনের চাষ খুব বাড়িতেছে।

ফ্ল্যাক্স, সিসল, ওসনাবুর্গ প্রভৃতি হইতে পাটের তত বেশী ভয় নাই—যতটা আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বুলগেরিয়া ও ব্রেজিলে পাট চাষের সাফল্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বিয়ার ফিকে নামক আঁশ আবিষ্কারে।

ব্রেজিলের আমাজোন উপত্যকায় পাটের চাষ সফল হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে একদল জাপানী উপনিবেশিক সেখানে পাট উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর হইতে ব্রেজিলে পাটের চাষ দ্রুত বাড়ানো হইতেছে। ব্রেজিল সরকার পাট চাষীগণকে বিনামূল্যে পাটের বীজ সরবরাহ করিতেছেন। ব্রেজিল হইতে লোক আসিয়া আমাদের দেশের পাট চাষের পদ্ধতিও ভাল করিয়া শিখিয়া গিয়াছে। ব্রেজিলে উৎপন্ন পাট আর কয়েক বৎসর পরে আমেরিকার বহু স্থানে রপ্তানি হইবে এই আশঙ্কা আদৌ অমূলক নহে। ব্রেজিলে একটি চটকলও কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বুলগেরিয়াতেও পাটের চাষ সফল হইয়াছে। এখানে সরকারী তত্ত্বাবধানে পাট চাষ হইতেছে এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রতি একর জমিতে প্রায় ২২ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। বুলগেরিয়ায় ব্যাপকভাবে পাট চাষের জন্য গবর্ণমেণ্ট এবার বাজেটে বহু টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

পাটের দ্বিতীয় বিপদ কলম্বিয়ার ফিকে নামক আঁশ হইতে দেখা দিয়াছে। ফ্ল্যাক্স, সিসল, ওসনাবুর্গ প্রভৃতির চাষের ব্যয় পাট অপেক্ষা অধিক, কাজেই যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ঐ বিপদ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ফিকে চাষ স্বল্পব্যয়সাধ্য। এইদিকে চাষ আরম্ভ হইবার পর কলম্বিয়ায় পাট আমদানি বন্ধ হইয়াছে। পাঁচ বৎসরেই ফিকে চাষ এত বাড়িয়াছে যে, শীঘ্রই কলম্বিয়ার কফি ব্যবসায়ীদের জন্য বস্তা সরবরাহ করিবার পর রপ্তানি করিবার উপযুক্ত ফিকে উদ্বৃত্ত থাকিবে। ব্রেজিল হইতে একটি অর্থনৈতিক মিশন আসিয়া কলম্বিয়ার ফিকে চাষ দেখিয়া গিয়াছে। ব্রেজিল যদি ফিকে ক্রয় আরম্ভ করে তাহা হইলে ব্রেজিলেও পাট রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইবে। পাট উৎপাদনও ঐ সঙ্গে বাড়াইতে পারিলে ব্রেজিলে পাটের ও ফিকের বস্তার ব্যবসায় জাঁকিয়া উঠিবে এবং বাঙ্গালার পাটের প্রভূত ক্ষতি হইবে। ফিকের বস্তার ব্যয়ও খুব কম পড়িতেছে। কলম্বিয়ার কফি ব্যবসায়ীরা চটের বস্তার বদলে ফিকের বস্তা ব্যবহার করিবার ফলে তাহাদের বার্ষিক দশ লক্ষ ডলার বাঁচিয়া যাইতেছে। এই ফিকে ব্যাপকভাবে চাষ আরম্ভ হইলে বাঙ্গালার পাটের ভয়ানক ক্ষতি হইবে। কারণ আমেরিকা ফিকে ধরিলে পশ্চিম গোলার্দ্ধে পাটের সর্ব্বপ্রধান বিক্রয়-কেন্দ্র হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইবে।

বাঙ্গলার পাট চাষীকে বাঁচাইতে হইলে এদেশের সমগ্র পাটশিল্পকে সংগঠন করা দরকার। শুধু চাষের জমির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিলে বা পাটের দর বাঁধিয়া দিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। চটকলগুলি কি পরিমাণে লাভ করে তাহা উহারা কখনও সরকারকে বা জনসাধারণকে জানিতে দেয় না। আইন করিয়া উহা তাহাদিগকে বলিতে বাধ্য করা আবশ্যক। তাহা হইলে কাঁচা পাটের মূল্যের তুলনায় চট ও বস্তা তৈরি করিতে কত ব্যয় পড়ে জানা যাইবে। উৎপাদন ব্যয় সঠিকভাবে জানিতে পারিলে চট ও বস্তার মূল্য এমনভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পাটের পরিবর্ত্তে অপর আঁশ উৎপন্ন করিয়া উহা হইতে বস্তা তৈরি লাভজনক না হইতে পারে। এজন্য পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ, পাট বিক্রয়, চট ও বস্তা উৎপাদন এবং চট ও বস্তা রপ্তানী সকল দিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ফাটকা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন নয়, কিন্তু পাট বিক্রয় ও কারখানাগুলিকে অতি লাভ সম্বন্ধে সংযত রাখা অনেক দুরূহ। সরকারী হস্তক্ষেপ ভিন্ন এই সমস্যার স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর নহে।

মন আর মুখ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

বাহির দরজার কড়া-নাড়ার শব্দ উঠিল অতি অসময়ে। পরিচিত শব্দ। একমাত্র পুলকেশের হাতেই দরজার লোহার কড়া এই বিশেষ রকমের আওয়াজে বাজিয়া ওঠে। অথচ স্বামীর বাড়ী ফেরার সময় এখন নয়। শনিবারেও অফিস হইতে যে লোকের সন্ধ্যা সাতটার আগে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না, তাহারই হাতে কড়া বাজিবে এই বেলা তিনটায়! ললিতা তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

শুইয়া আছে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া। ঘুম আসিতেছে না। সকালবেলার কলহের বিশ্রী স্মৃতি তাহার চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছে! আশ্চর্য! স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করা আজকাল যেন ললিতার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব কাহারও মধ্যে নাই। দারিদ্র্য কি মানুষকে এত নিচে টানিয়া আনে!

কিন্তু বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ ক্রমশ তুমুল হইয়া উঠিতেছে। ললিতাকে উঠিতেই হইল। তাড়াতাড়ি আসিয়া অতি সন্তর্পণে খিল খুলিয়া কবাট একটু ফাঁক করিয়া দেখিল। দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের প্রচুরতায় সে বুঝি টলিয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরিয়া সে হাঁ করিয়া রহিল। স্বামী ফিরিয়াছে আজ বেলা তিনটায়, বিস্ময় সে জন্ম নহে।—

পুলকেশের এ কি মোহন সজ্জা! গায়ে সোনালি রেশমের পাতলা পান্‌জাবি, বুকে ছোট ছোট সোনার বোতাম। পরণে সরু নক্‌সি-পাড় মিহি ধুতি, তাহার ভূলুণ্ঠিত কোঁচার ফাঁকে দেখা যায় নূতন, দামী তুইপাটি নিউকাট্ জুতা চক্‌চক করিতেছে। বাঁ হাতের কব্‌জিতে বাঁধা সোনার ঘড়ি। স্বামীর চুলকাটার যে ধরণটি ললিতা বিশেষ করিয়া পছন্দ করে, পুলকেশের মাথার চুল তেমনই করিয়া কাটা। কোথায় গিয়াছে তাহার দারিদ্র্যরুক্ষ মূর্তি! কে জানিত এত রূপ স্বামীর! কে জানিত পুলকেশের এমন রুচিজ্ঞান!

সকাল সাড়ে-নয়টায় যে লোক রুক্ষ চেহারায়, মলিন বেশে, ছেঁড়া চটি পায়ে অফিস-এ বাহির হইয়া গেল—স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিতে করিতে, সেই লোক ফিরিয়া আসিল এই বেলা তিনটার অসময়ে—এমন অসংগত মনোহর বেশে, এমন আশ্চর্য ঘটনা ললিতা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে!

স্বামী কি আজ একটা পরশ-পাথর কুড়াইয়া পাইয়াছে? সে কি লটারির টাকা পাইয়াছে? হঠাৎ কি তিরিশ টাকার কেরাণী পুলকেশ আজ অফিসের বড়বাবুর পদটি পাইয়া বসিয়াছে?

ললিতা স্তম্ভিত হইয়া—অনড় হইয়া—কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাপা হাসিতে পুলকেশের মুখ উজ্জ্বল। বিবাহ রাত্রির পরে স্বামীর মুখে এমন উজ্জ্বলতা ললিতা আজ দেখিল এই পাঁচ বৎসর বাদে। স্ত্রীর হাতখানি ধরিয়া স্বামী মিষ্টি করিয়া বলিল—চলো, দাঁড়িয়েই থাকবে এখানে? ঘরে যেতে হবে না?

হাতের ছোট-বড় কাগজের বাক্‌সগুলি মেজেতে রাখিয়া পুলক বলিল, একটুও দেরি নয়, কলতলায় যাও, গা ধু'য়ে এসো চট্ ক'রে।—দাঁড়াও, সাবান নিয়ে যাও।

তাকের উপরের বাথ্ সোপ-এর অবশেষটুকুর পানে চাহিতে চাহিতে ললিতা পরম উৎসাহে হাত বাড়াইল—স্বামীর হাতের দামী সাবানের সুদৃশ্য আধারের দিকে।

কাগজের বাক্‌সগুলিতে কি আছে, ললিতা তাহা অনুমান করিতে পারিল। প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলিতেই পুলক বলিল, কোনো কথা নয়। তাড়াতাড়ি, লক্ষ্মীটি, চট্ ক'রে।

আজিকারই সকালবেলার লজ্জাকর বিবাদের কথাটি মনে পড়িয়া গা ধুইতে ললিতার দেরী হইয়া যাইতে লাগিল। বিবাদ আজ চরম হইয়া উঠিয়াছিল। কি মুখরা ললিতা—কি অভদ্র! স্বামীর দারিদ্র্যকে নির্মমভাবে খোঁচা দিয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে সে নিজেই। জানে সে, তিরিশ টাকা মাহিনায় সংসার চালাইয়া তাহার জন্য পাঁচ রকম সুখের আর বিলাসিতার ব্যবস্থা করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব; অথচ সেই সকল কথা তুলিয়াই কত আঘাত দিয়াছে সে আজ পুলকেশের প্রাণে। এখন গিয়া স্বামীকে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? সাবানের রাশি রাশি শুভ্র-ঘন-সুরভি ফেনা কি পারিবে তাহার মুখ হইতে হৃদয়হীনতার কালিমা মুছিয়া দিতে?

সদ্যস্নাতা ললিতা ঘরে আসিল লজ্জারক্ত আননে। পুলক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! স্বাগতম্!

ইতিমধ্যে কাগজের বাক্‌সের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ছেঁড়া মাদুরের উপর যে বহুমূল্য আভরণের প্রাচুর্য তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা দেখিয়া ললিতার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

এতো দেয়—এত তিক্ততার মাঝেও পুলকেশ ভুলিয়া যায় নাই, কোন্ জিনিস—কেমন জিনিস—ললিতার পছন্দ। ঠিক তাহার মনের মত জিনিসগুলিই স্বামী কিনিয়া আনিয়াছে! এই স্বামীকেই কি-না সে বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরিয়া প্রতিদিন—প্রতিক্ষণে বাক্যের শরে-শরে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। ললিতার দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

—তাড়াতাড়ি প'রে ফেল ওসব—পুলক বলিল, দেরি কোরো না।

দ্বিতীয় কক্ষ তাহাদের নাই। ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি তবে বাইরে যাও।

পুলকেশ উঠিল। এক পা বাড়াইয়াই আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, হাসিয়া বলিল, না, যাবো না বাইরে। দেখবো আমি এখানে ব'সে ব'সে, কেমন ক'রে শীতের পীড়নে রিক্ত-শুষ্ক সর্বহারা তরু মুঞ্জরিয়া ওঠে বসন্তের নব আভরণে।—হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল—কবিত্ব ক'রে ফেললাম, নয়? নাও, তুমি পরো সব, আমি দেখবো।

সত্যই পুলকেশ আবার বসিয়া পড়িল। তাহার ব্যথিত, পুলকিত, প্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে ললিতার ললিত তনু হইয়া উঠিল বিমোহন—অপরূপ।

পুলকেশ আগাইয়া আসিল। কোন্ গোপনতার অন্তরাল হইতে বাহির করিয়া লইল রাঙা টকটকে এক ভেলভেট-জড়িত সুদৃশ্য আধার। তাহা খুলিয়া নিজের হাতে সে ললিতার কণ্ঠে জড়াইয়া দিল মণি-কুসুমের মালিকা, কানে তাহার দুলাইয়া দিল সোনার মণিকুণ্ডল, মণিবন্ধে কাঞ্চন-কংকণ, ভুজে কনকের ফণিলতা।

ঝরঝর করিয়া ললিতার দুই চোখ ছাপিয়া অশ্রু বহিল।

তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া পুলক বলিল, না-না-না, আজ শুধু হাসি। পিছনে প'ড়ে আছে অশ্রুর সাগর, সেদিকে আজ চাইব না; সামনে রয়েছে অন্ধকার; তার কথা ভাব্‌বো না আজ। আজকের আলোর দ্বীপে দাঁড়িয়ে আমরা দু'জনে কেবল হাস্‌বো—শুধু হাস্‌বো ললিতা। ··· আবার কবিত্ব ক'রে ফেল্‌লাম যে! হ্যাঁ, তুমি তৈরি হ'য়ে নাও, আমি গাড়ি ডেকে আনি।

মোটর গাড়ি ছুটিয়াছে। আজিকার দিনে হাতের কাছে যাহা পাইয়াছে, সেই গাড়িখানিই পুলক ভাড়া করিয়া আনে নাই। দেখিয়া-শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে অতি আধুনিক ধরণের সুশ্রী একখানি ঝকঝকে গাড়ি। সেই গাড়ি ছুটিয়াছে গংগার ধারের রাস্তা ধরিয়া—অকূরন্ত গতিতে।

কোন্ দিকে চালাইতে হইবে গাড়ি?—ড্রাইভার নির্দেশ চাহিল।

—যে দিকে খুশি।—পুলকেশ আদেশ দিল।

গাড়ি ধরিল গড়ের মাঠের রাস্তা। ড্রাইভার জানে, অনির্দেশের যাত্রী যাহারা, তাহাদের গাড়ি কোন্ পথে চালাইতে হয়।

ললিতার আতংক হইল। এ কি রোখ চাপিয়াছে স্বামীর মাথায়? কত টাকা সে পাইয়াছে যে এমন করিয়া উড়াইয়া দিতেছে? একটু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পেলে টাকা, তা তো বললে না!

—এখন নয় লক্ষ্মীটি; জান্‌বার সময় ঢের পাবে।—পুলক বলিল, এ আনন্দ স্রোতের অবাধ গতিকে চাইনে আজ বাধা দিতে একটা কাহিনীর অবতারণা ক'রে।

—কত টাকা পেয়েছ?—ললিতার প্রশ্নে সংকোচ।

তাহাকে বুকের আরও কাছে টানিয়া পুলক বলিল, অনেক টাকা। এক দিনে তা ফুরিয়ে যাবে না। কিন্তু ওকথা আর নয়। যে কথা তুমি জান্‌বেই, তা নিয়ে এত জিজ্ঞাসা কেন? টাকার কথা এখন নয়, লক্ষ্মী, আমার লিলি।

লিলি! লিলি! কতদিন—কতদিন পরে পুলক আজ তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেছে। দীনতার খরচাপে পুলকেশের লিলি গিয়াছিল শুকাইয়া—বুঝি বা মরিয়া, আজ এক নিমেষে কোন্ মায়াদণ্ডের পরশে সেই লিলি উঠিয়াছে বাঁচিয়া—উঠিয়াছে সরস হইয়া—সুন্দর হইয়া—নবীন জীবনে সংজীবিত হইয়া।

গভীর সুখে লিলি পুলকেশের বুকে মাথা রাখিল।

ঢাকুরিয়া ঝিলের জলের ধারে বসিয়া আছে পুলকেশ আর ললিতা। ললিতার মুখে উচ্ছ্বসিত হাসির ঝরণা। ভবিষ্যতের হাজার রঙিণ কল্পনা তাহার মুখে, হাতের আঙুল দিয়া ছক কাটিতেছে জলের গায়ে। ঘাসের ডগা ছিঁড়িয়া-ছিঁড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিতেছে পুলকেশ।

মুড়ি-ওআলা হাঁকিয়া যাইতেছে। সে ডাকে সংবিত পাইয়া ললিতা বলিল, ডাকো না লোকটাকে, মুড়ি কেনা যাক।

—মুড়ি!—পুলক বলিল, মুড়ি ফেলে এসেছি সেই এঁদো গলির ছাদফুটো ঘরে। আজকের জলযোগ চৌরংগির সাহেবী হোটেল-এ।

কথাটা শুনিয়াই ললিতার নাক কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।—না! সে ভারি—হ্যাঁ!

অগত্যা তাহাদের গাড়ি থামিল গিয়া সুসজ্জিত, বিরাট এক দেশী খাবারের দোকানের সামনে। দোকানের ভদ্রবেশী কর্মচারী

স্বাগত জানাইল। দুইজনে ভিতরে ঢুকিয়া নামিল গিয়া সজ্জিত প্রাংগণে, এক কোণে পাম্ গাছে আড়াল-করা দুইখানি আসনে বসিল মুখামুখি। মাঝখানে রহিল ছোট এক গ্রেনাইট পাথরের টেবিল।

আধ ঘণ্টা পরে দুই জনকে দেখা গেল নিউ মার্কেট-এ। ললিতা বাছিয়া-বাছিয়া মনের মত ফুল কিনিতেছে। পুলকের কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সে বলিল, ফুলের গয়নার অর্ডার দাও না।

অর্ডার দেওয়া হইল ফুলের গহনার। রাত নয়টার সময় লওয়া হইবে।

সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে দুইজনে বসিল আসিয়া প্রথম শ্রেণীর এক চিত্রগৃহের বক্স্-এ। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে যতক্ষণ আলো ছিল, তাহার অবকাশে নিচের প্রেক্ষাগৃহের শত দৃষ্টি ললিতাকে সরমে রাঙাইয়া তুলিল—গরবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল তাহার মুখ। এ রক্তি, এ ঔজ্জ্বল্য আর অভিনন্দন সে আজ উপহার পাইয়াছে সারা বিকাল পথে-পথে—মাঠে—ঝিলের ধারে—মার্কেট-এ —সর্বত্র।

বিরামের সময় ললিতার হাতে সুগন্ধি সুস্বাদু হিমানী পানীয়ের সুদৃশ্য পাত্র তুলিয়া দিয়া পুলকেশ বলিল, আমি একটা কাজ সেরে আসছি, এক্ষুণি।

সে ফিরিয়া আসিতে ললিতা জানিতে চাহিল, কোথায় গিয়েছিলে?

—ফোন ক'রে এলাম একটা হোটেল-এ।

—হোটেল-এ!

—ভয় নেই।—পুলক হাসিতে-হাসিতে বলিল, দেশী হোটেল, ভাত-তরকারির।

মুখ ভার করিয়া ললিতা বলিল, হোটেলে ব'সে ভাত খেতে হবে?

—পয়সা-হোটেল নয়।—পুলক কহিল—একদিন রাতের খরচ দশ টাকা। থাকবও আজ রাত সেখানেই।

গাড়ি যখন শহরের প্রাসাদোপম এক আলোকোজ্জ্বল হোটেলের দরজায় আসিয়া থামিল, রাত তখন সাড়ে নয়টা।

উর্দি-আঁটা ভৃত্য তাহাদের ঘর দেখাইয়া দিল।

সুসজ্জিত কক্ষ। স্প্রিং-এর গদি-আঁটা সুন্দর পর্যংকে ধবধবে শাদা বিছানা পাতা। দুই দিকে ড্রেসিং টেবিল, আর লেখার টেবিল। উপরে বিজলি-পাখা, চারু আধারে বিদ্যুৎ বাতি, কোণে ছোট্ট তেপায়ার উপর ফুল-সাজানো ভাস, মেজেতে গালিচা পাতা। [illegible] সাজানো আলমারি। দেখিয়া ললিতা মুগ্ধ হইয়া গেল। পাশের দেয়ালে সংলগ্ন সরু লম্বা কবাট খুলিয়া দেখিল, বাথরুম।

বেয়ারা আসিয়া মাঝখানে টেবিল পাতিয়া দিল। পরিচ্ছন্ন পরিবেশকের হাতে খাদ্য আসিল। খাওয়ার শেষে আবার টেবিল আর থালাবাটি সব অদৃশ্য হইল।

ললিতা পুলকেশকে ফুলের সাজে সাজাইল, বলিল, আজ আমাদের সুখের দিনের ফুলশয্যা।

পুলকেশ ললিতাকে সাজাইল ফুলের গহনায়; কহিল, জীবনে কয়েকটি ঘণ্টাও তোমায় আনন্দ দিতে পারলাম, তোমার মুখে তৃপ্তির ছায়া দেখলাম। এর পরে আবারও যদি আসে দুঃখের ঝড়, আমি তাতে আর দুঃখ পাবো না।

তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। হাত তাহার কাঁপিতেছে।

ললিতার চোখে আসিল জল। পুলক তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিল, না-না, ভু'লে গেছি; দুঃখের কথা আজ নয়।

নীল বাতির রহস্যময়তায় দুইজনের বরদেহ এলাইয়া পড়িল সুখশয্যার কোমল অংকে।

কিন্তু ঘুম আসিতে চাহে না। বিবাহের পাঁচ বছর পরে আজ বুঝি নূতন করিয়া তাহাদের ফুলশয্যা। দারিদ্র্যের ঘূর্ণাবর্তে দু'জনে বুঝি এতকাল হারাইয়া ফেলিয়াছিল দুইজনাকে; আজ এতদিন পরে পাইল সন্ধান। তাই কথা তাহাদের আর ফুরাইতে চাহে না। বুকের অন্ধ গুহায় কথা ছিল এতদিন রুদ্ধ হইয়া, আজ মুক্তির আলো পাইয়া অজস্রতায় উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে। ঘুমাইতে আজ চাহে না তাহারা। এমন রজনী কি ঘুমাইয়া কাটান যায়? আজিকার মধুযামিনী কাটিয়া যাক জাগ্রত স্বপ্নের বিহ্বলতায়।

ললিতার কথা মাঝে মাঝে বাধিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার মনে জাগিতেছে, এত টাকা স্বামী হঠাৎ পাইল কোথায়? শেষে জিজ্ঞাসা না করিয়া আর থাকিতে পারিল না, —বলো না, কোথায় পেলে এত টাকা?

—কোথায় পেলাম?—পুলকেশ চুপ করিয়াই রহিল আবার। উত্তর দিতে তাহার দেরী হইতে লাগিল।—একান্তই শুনবে? আচ্ছা বল্‌ছি।

—বলো।—ললিতার কণ্ঠে মিনতি।

—নিতান্তই শুনতে হবে?—পুলকেশের কণ্ঠে দেখা দিল অসামান্য গাম্ভীর্য।—না শুনলেই ভালো হোত।

—না, বলো।—ললিতা বিস্মিত হইল। কি এমন কারণ, যাহা বলিতে স্বামীর এত দ্বিধা!

স্বামী বলিল, চুরি করেছি।

উত্তরে একবিন্দু তরলতা নাই। তাই ললিতা হাসিয়া উঠিতে পারিল না। স্বামীর কণ্ঠে তো পরিহাসের কিছুমাত্র পরিচয় নাই। এমন কঠিন গম্ভীরতায় লোকে কি মিথ্যা কথা বলিতে পারে?

—বলো না সত্যি ক'রে।—ললিতার অনুনয়ে বাজে এক ফোঁটা কম্পন।

—মিথ্যা কথা বলিনি ললিতা। পুলকেশের কথায় পাষাণের দৃঢ়তা, ইচ্ছে হয়, এর জন্যে তুমি আমায় ঘৃণা করতে পারো।

ললিতা স্তব্ধ হইয়া রহিল। এ কথা কি তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

পুলকেশ বলিল—তুমিই তো আজ পরামর্শ দিয়েছিলে ললিতা, আমায় চুরি করতে—আজ সকালে অফিস যাবার সময়। মনে নেই বলেছিলে, 'আর কোনো উপায় না থাকে, চুরি করতে পারো না?'

তাই স্বামী চুরি করিয়াছে! ললিতা উঠিয়া বসিল।

পুলকেশ নড়িলও না। বলিল, অফিস যেতে ভাবলাম, সত্যিই তো আমি চোরের অধম। চোরের ঘরেও সোনাদানা থাকে, তার স্ত্রী সোনার গয়না পরে, আর আমি সাধু হ'য়ে কি-না একখানা গয়না দিতে পারিনে তোমার গায়ে, একখানা ভালো কাপড় তোমায় দেখাতে অবধি পারিনে, পেটভরে দু'বেলা দুটি খেতে দিতেও বুঝি পারিনে। ভাবলাম, কাজ কি এমন সাধুতায়? তার চেয়ে চুরি করাই ভালো; ললিতা আমায় ভালো উপদেশই দিয়েছে। ··· তারপর কি করলাম জানো?

ললিতা জানিতে চাহিল না। তাহার নিশ্বাসও বুঝি রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পুলকেশ বলিল, জানো তো, ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট-এ কাজ করি। ক্যাশ ভেঙে আজ চুরি করলাম। বেশ কয়েক হাজার টাকা।

ললিতা নিচে নামিয়া দাঁড়াইল।

পুলকেশ আবেগের সহিত বলিল, তুমি যেয়ো না লিলি। আজ তুমি আমার পাশে থাকো। কাল তো আর তোমায় পাবো না। এতক্ষণে হয়তো আমাদের বাসায় পুলিশের খানা-তল্লাস হয়ে গেছে। রাত থাকতে থাকতে আমার পালিয়ে যেতে হবে। পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারবো না, পারবো না আমি জেল খাটতে। ··· রাত তো শেষ হ'য়ে এলো, আর খানিক তুমি থাকো আমার পাশে।

উঠিয়া বসিয়া পুলকেশ ললিতাকে নিজের দিকে টানিল। ললিতা আসিল না; জোর করিয়া নিজকে ছাড়াইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

পুলকেশের বুক ভেদিয়া বাহির হইয়া আসিল দীর্ঘশ্বাস। সে বলিল, তোমারি পরামর্শে কাজ ক'রে শেষে তোমারি কাছে ঘৃণা পেতে হবে, এ কথা জানলে আমি এ কাজ করতাম না ললিতা। আমার নিজের পরামর্শ ছিল এর চেয়ে ভালো। আত্মহত্যা করতে পারতাম। কিন্তু থাক্, আমার ভাবনা আমি ভাববো। এত বড়ো পৃথিবীতে আমার জন্ত এতটুকু জায়গার অভাব হবে না। তোমার জন্যে রেখে গেলাম ওই বালিশের তলায়। চুরি ক'রে যা এনেছি, তার সামান্যই খরচ হয়েছে আজ। বাকি সব টাকা রেখে গেলাম তোমার জন্যে। তুমি ভবিষ্যতে দুঃখ পাবে না, এই আমার শান্তি।

বালিশের তলা হইতে টাকার থলিটি লইয়া সে সামনে রাখিল।

ললিতা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর নিজের গলা হইতে হার খুলিয়া লইল, খুলিয়া লইল কানের গহনা, টানিয়া লইল চুড়ি-আর্মলেট। সব গহনা জড়ো করিয়া বিছানার উপর রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, এগুলো তুমি ফিরিয়ে দাও, বিক্রী করে দাও। সব টাকা তুমি ফেরত দাও তোমার অফিসে।

পুলকেশ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তাতে হয়তো জেল ঠেকানো যাবে, কিন্তু চাকরি করা এখানে আর চলবে না।

—না চলুক, আর কোথাও জুটিয়ে নিও। ললিতার চোখে জল দেখা দিল।—চাকরি না জোটে, যা-হোক কিছু কোরো। কত লোক তো খবরের কাগজ ফেরি ক'রে—

—অভ্যেস নেই যে লিলি।—পুলকেশের মুখে দেখা দিল দুঃখের হাসি; বলিল, আর, গয়নাগুলো না হয় ফেরত দিলাম; কিন্তু কাপড়খানার যে পাট ভাঙা হ'য়ে গেছে, তারো দাম যে আশী টাকা। তা ছাড়া, যে টাকা আর কিছুতেই ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না, তাও তো তিনশ'র কম নয়।

অশ্রুপ্লাবিত নিরুপায় দৃষ্টিতে ললিতা কতক্ষণ নিচের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, আমি জানিনে। যেমন ক'রে হোক ও-টাকা তোমায় ফেরত দিতে হবে।

—বাঃ! মজা মন্দ নয়!—পুলকেশ পরুষকণ্ঠে বলিল—চুরি করতে বললে তুমি, আর এখন উল্টো সুর গাইছও তুমি!

ললিতা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, আমায় ক্ষমা করো। ও কথা ব'লে ব'লে আর আমায় শাস্তি দিও না। আমায় মেরে ফেল ··· ওগো, ও টাকা তুমি ফিরিয়ে দাও যেমন ক'রে পারো, ফিরিয়ে দাও।

মানুষ আর ইচ্ছা করিয়া কত সহিতে পারে? পুলকেশও আর পারিল না, একেবারে হো-হো করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। স্বামী কি পাগল হইয়া গেল না কি!

—তুমি পাগল হয়েছ লিলি?—পুলকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল—চুরি করতে যাবো কেন আমি? আর তুমিই কি আমায় সত্যি-সত্যি চুরি করতে বলতে পারো?

ললিতার দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আর সে শুনিতে চাহে না। কোথা হইতে কেমন করিয়া টাকা আসিল, সে জানিতে চাহে না। শুধু এইটুকু জানিয়াই সে পরম নিশ্চিন্ত যে তাহার স্বামী চুরি করে নাই, করিতে পারে না।

এত ভোগাইয়া শেষে পুলকেশ আসল কথাটা বলিল—তাহার পরলোকগত পিতা যে ব্যবসায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ কিনিয়া অবশেষে ব্যবসা ফেল পড়িতে নিঃস্ব হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহাই আবার কোন্ ভাগ্যবলে এতদিন পরে আজ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাহারই লভ্যাংশ সে আজ পাইয়াছে।



তাঞ্জোর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

চিদম্বরম হ'তে তাঞ্জোর ৬৭ মাইল। কিন্তু এই অল্প দূর অনেকগুলি বসতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তাই চিদম্বরম হ'তে বোট এক্সপ্রেসে তাঞ্জোর পৌছাতে লাগে তিন ঘণ্টা। পথে পড়ে শিয়ালী, মায়াবরম, কুম্ভকোনম প্রভৃতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। রেলপথের উভয় দিকে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে বরষার জলে পূর্ণ ক্ষুদ্র নদী। রবির কিরণে চক্‌চকে—হাসি-মুখ সবুজ ধান-ক্ষেতে সাদা বক্‌। আলের পরে তাল গাছের শুকনো ডালে মাছরাঙা। আর যেখানে একটু উচ্চ ভূমিতে কুটীর বা অট্টালিকার সমষ্টি, সেখানে মাদ্রাজী-ধরণের মন্দির। এরা সকলে মিলে রেলগাড়ির মন্থরগতিকে সরস করে।

মন্দির-গঠনের বিশেষত্বে মনের চমক ভাঙ্গে। কারণ ধানের ক্ষেত, ভরা নদী, বক ও মাছরাঙা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের বরষার বাঙ্গালা। মাঠের মাঝে মাঝে আরও একটা বিভিন্নতার সঙ্কেত আছে। অন্ধ্র এবং মাদ্রাজে ধানের ক্ষেতে কৃষক-নারী মালকোঁচা বেঁধে দাঁড়িয়ে, কোমর নীচু ক'রে কাজ করে। তাদের সাড়ি রঙিণ, দেহ রৌদ্র-দগ্ধ, মাথায় নারিকেল তৈল-মসৃণ ঘন চুল, বিচিত্র তেলেঙ্গী পণ্ড কবরী। ইংরেজী ইউ অক্ষরকে উল্টে দিলে যেমন হয়—ধান্য-ক্ষেত্রের শ্রমিক-নারীর আকার সেই রকম। দক্ষিণে নারীর মর্য্যাদা প্রচুর এবং সে মর্য্যাদা অর্জ্জিত। ভূটান, সিকিম প্রভৃতি পাহাড়ী দেশের বলিষ্ঠ স্ত্রীলোক পরিশ্রমী এবং কর্ম্মঠ। কিন্তু তাদের পুরুষরা অপেক্ষাকৃত অলস। মাদ্রাজের পুরুষ অনলস।

বাঙ্গালার এবং দক্ষিণের গ্রামে ও মাঠে মানুষের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করলে একটা সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। উভয় প্রদেশেরই অধিবাসী দরিদ্র। দারিদ্র্যের অনটনে এদের গায়ে কাপড় নাই, পায়ে জুতা নাই, কোমরের কাপড়ও অতি মলিন। কিন্তু স্বাচ্ছল্যের দিনে স্বল্প-বিলাসিতার সুস্বপ্নকে বাস্তব করবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালী কৃষক ও শ্রমিকের প্রকৃতি-গত। একথা তার আচরণে বোঝা যায়। পশ্চিমে বিলাসিতার দুরাকাঙ্ক্ষা আরও অধিক। হিন্দু অপেক্ষা সম-শ্রেণীর মুসলমানের ভাল কাপড়, ভাল খাওয়ার অভিলাষ বেশী। কিন্তু দক্ষিণে মিতাহার এবং অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ জীবনের আদর্শ। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা, কৃষক সকলেই নিজ নিজ অবস্থার তুলনায় সুলভ পোষাক ব্যবহার করে। নগ্ন-পদ, থান-ফাঁড়া লুঙ্গি কোটিদেশে বাঁধা, গায়ে চাদর বা হাত-কাটা শার্ট—জাতীয় পোষাক। শহরে অনেকের পায়ে মাদ্রাজী চপ্পল থাকে, কিন্তু গ্রামে বা ক্ষুদ্র শহরে অনাবৃত চরণ, সাধারণ। তবে কেউ কেউ খড়ম পায়ে



অশ্বশাস্ত্রের এক পৃষ্ঠা

লুঙ্গির উপর শার্ট, নেকটাই ও কোট পরে। সে বিচিত্রতা ক্রমে লুপ্ত হ'চ্চে। মাদ্রাজ শহরের বাইরে এ কৌতুক দর্শন-দুর্লভ।

এই বস্ত্র-দীনতার একটা প্রধান কারণ আছে। আমার মনে হয়, প্রাচীন দ্রাবিড়, সোনা এবং মণি মুক্তায় দেহ-সজ্জা করত। দেশ গরম অথচ অস্বাস্থ্যকর নয়। দেহ-চর্চ্চায়-পুষ্ট,

সকল, সুদৃঢ়, উন্নত মাংস-পেশী অনাবরণে সুদৃশ্য। তার উপর কালো দেহে স্বর্ণালঙ্কার—আর্ট বা রুচির দিক্ থেকে নেহাৎ নিন্দার নয়। যখন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বাড়লো—আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে যাঁরা এলেন আর যাঁরা তাঁদের জাতে মিশে গেলেন—এঁরা উভয়েই ঐ পোষাককে আরও সরল ক'রে, পৈতা ঝুলিয়ে, গায়ে ভস্মরাগ মেখে, দ্রাবিড় মনোবৃত্তির পরোক্ষে আনুগত্য করলেন। কাজেই নগ্ন-পদ, নগ্ন-দেহ দেহ-সজ্জার আদর্শে পরিণত হ'ল। তারপর দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা। শৈব-ব্রাহ্মণ ও শৈব-রাজন্য, কপালে ভস্ম মেখে, মুখে বম্ বম্ ধ্বনি ক'রে বিলাস-বিমুখ মনোভাব দেশে জাগিয়ে তুলেছিল। পরে বৈরাগ্য প্রচার করলেন যোগীবর শঙ্কর, অবশেষে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। দাক্ষিণে বহু স্বামীজী তামিল ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়েছেন, দেব-জীবন যাপন করেছেন। তাই ধর্ম্ম-সাহিত্য, কাব্য-গ্রন্থ, রস-রচনা প্রভৃতিতে তামিল সংস্কৃতি সুস্পষ্ট। এ সম্পদের আংশিক অধিকারী তেলেগু। তেলেগু কবিতা অতি মধুর। আমি ভাব-মাধুর্য্যের কথা বলছি। শব্দ আমাদের কর্ণে কঠোর। কিন্তু মাদ্রাজের কোন না কোন কবি নিশ্চয় বলেছেন—

আ মরি তামিল ভাষা।

নিশ্চয়ই দক্ষিণের জন-সাধারণ বাঙ্গালা শুনে কৌতুক বোধ করে। ইষ্টক বেশ অস্ত্র, কিন্তু প্রতি-ক্ষিপ্ত লোষ্ট্র অপ্রিয়। একথা বঙ্গভাষা-ভাষী রঙ্গ-প্রিয় বঙ্গবাসী অবিদিত নয়।

ট্রেনে এক কৃত-বিদ্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে একথার আলোচনা হ'ল। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের তরুণী কন্যা আলোচনায় যোগ দিলেন। বুঝলাম গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ বাঙ্গালার কবিতা-সম্পদের নমুনা সরবরাহ করেছে মাদ্রাজে। সেখানে ইংরেজী গীতাঞ্জলি কলেজের পাঠ্য-পুস্তক। একটি তামিল কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করলেন ব্রাহ্মণ। তার ভাব-সম্পদ আমাদের বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ। মোট কথা, ভাষায় প্রাদেশিকতা সত্ত্বেও সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একতার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য প্রণম্য। কারণ হিমালয় হ'তে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি হিন্দুর দৈনিক জীবন নিয়ন্ত্রণ ক'রে ঋষিদের রচনা। জীবনের উৎস এক—তাই ভাষার পার্থক্য হিন্দুর সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে না।

তাঞ্জোরের পথে কুম্ভকানামের দেব-দেউলের ১১৬ ফুট উচ্চ গোপুরম বহু দূর থে'কে দৃষ্টিগোচর হয়। কুম্ভকোনম ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের অনিবার্য্য ফলে স্পর্শ-দোষ, দৃষ্টি-দোষ প্রভৃতি দূষণীয় অপকর্ম্ম—ব্রাহ্মণেতর অধিবাসীর জীবন তিক্ত করেছিল। পরিণামে অচ্ছুতেরা দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। তারা খৃষ্টীয় সাম্যতার ফলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সম্ভ্রমের সঙ্গে বাস করে। প্রায় প্রত্যেকে বালিকা বিদ্যালয়ে যায়। সেণ্ট জোশেফ হাই স্কুল মিশনারীদের বড় বালিকা বিদ্যালয়। নদীর ধারে প্রকাণ্ড কলেজ—ছেলেরা নৌকায় বাচ্ খেলে।

একদিন কুম্ভকোনম সংস্কৃত ও তামিল সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। এখনও কুম্ভকোনমে পণ্ডিতের অভাব নাই। এক পুস্তকাগারে বহু প্রাচীন পুঁথি আছে। প্রাচীন সংস্কৃত এবং তামিল গ্রন্থ অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবারের তৈজসের অংশ। কিন্তু অনুশীলনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। সমগ্র ভারতে অন্নের জন্য—আসল কথা, নবীন আদর্শে স্বচ্ছন্দ জীবন অতিবাহিত করবার আকাঙ্ক্ষায়—ব্রাহ্মণকে নানা কর্ম্মে উদরান্ন অনুসন্ধান করতে হয়। একদিন তার সংস্কৃতি দারিদ্র্যকে সম্ভ্রান্ত করত। এখন গুণরাশিনাশী দারিদ্র্য তার সংস্কৃতিকে হীন প্রতিপন্ন করে, নিরন্ন পাণ্ডিত্যকে হাস্যাস্পদ করে। কাজেই পুঁথি প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণা-ভূমি মাত্র। তার মহা অবদান কেউ যাচঞা করে না।

কুম্ভের ভাঙ্গা কোনের কণা মাত্র চিরস্মরণীয় করবার জন্য প্রাচীনেরা এ তীর্থের নাম রেখেছিলেন—কুম্ভ-কোনম। এর সন্নিকটে মায়াবরম। কুম্ভ অবশ্য শ্রীবিষ্ণুর অমৃত কুম্ভ—যার কণা মাত্র মায়াময় নশ্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আনন্দ-ময় অমর-প্রাণের সন্ধান দিতে পারে। এ তীর্থের প্রধান বিগ্রহ অনন্ত-শয়নে নারায়ণ। তরঙ্গায়িত অনন্ত সাগর। তাতে শেষ-শয্যা। নাগরাজ অনন্ত ফণা বিস্তার ক'রে যোগ-নিদ্রায় সুপ্ত, অনাদি, নির্ব্বিকার, চির-জাগ্রতকে বহন করছে। এ পরিকল্পনা অতি গভীর।

সংসার চঞ্চল, সচল মাত্র মায়ার তরঙ্গ—অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্ত-লীলা। কিন্তু নারায়ণ সে তরঙ্গ-হিল্লোলে অবিচলিত। তিনি তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, নাচন-কোঁদন, সৃজন প্রলয়ের অতীত। সাগরের ঢেউ তাঁর সৃষ্টি—অনন্ত অব্যক্ত প্রকৃতির অতি সামান্য প্রকাশ। সংসার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। তার বিক্ষোভ স্থিরতায় বিকার ঘটায়। সে বিকার আবার অন্যত্র বিকারের কারণ হয়। তাই অনন্ত-শয্যা কারণ-সাগরে।

কারণ-সাগরের চাঞ্চল্য কর্ম্মের পরিণাম ঘটায়। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া জগতের ধারা। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন রবির কিরণ-তরঙ্গ এক কারণ। অবশ্য আদি কারণ নয়। কিরণ-রশ্মি মুহূর্ত্তে ১,৮৬,০০০ মাইল ব্যোম-তরঙ্গের পিঠে চড়ে ছুটছে। কোটি কোটি কিরণ ছটা, কোটি কোটি উদ্ভিদে প্রাণ-সঞ্চার করছে। অতএব কিরণের এক পরিণাম প্রাণ। সেই উদ্ভিদ-প্রাণ আবার কারণ। অসংখ্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী,নর, বানরের ব্যক্ত প্রাণের উদ্ভিদ পুষ্টির হেতু। জীব ও মানবের প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির হিল্লোল তুলছে জীবের ইচ্ছা-শক্তি কর্ম্ম-প্রসূ। অসংখ্য বাসনা অলক্ষে এই কারণ-সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে সুন্দর ও কুৎসিত রূপ লাভ করছে। কত ভাঙ্গা গড়ার কারণ-রূপে ইচ্ছা-শক্তি এবং জড় অনু-পরমাণুর কৃত-কর্ম্ম নিজের বোনা জালে নিজেকে বজ্র-বাঁধনে বাঁধছে। এ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের লীলা প্রতি কলায়, প্রতি যুগে, প্রতি কল্পে চলেছে। সৃষ্টির প্রতীক, ব্রহ্মার রাত্রে তার ক্ষণিক কর্ম্ম-বিরতি।

> এবং ব্রহ্মাদিনস্থৈব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ
> সন্ধ্যাঞ্চ সমাধি প্রাপ্য শেতে নারায়ণোঽব্যয়ঃ।

কিন্তু সে নিদ্রাও ক্ষণিক নিদ্রা। সে নিদ্রা ভাঙ্গলে, ক্ষণিক স্তব্ধ কারণ-সাগর আবার চঞ্চল হয়, সৃষ্টি-কাতর হয়, ক্রিয়মান হয়। সেই রাত্রি শেষে আবার কর্ম্ম-ফল-রূপ কারণে-অবশ ভূত-সকল প্রকাশিত হয়। তাদের প্রকাশ মায়া-তরঙ্গে হিল্লোল তোলে।

> ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
> রাত্র্যাঽগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।

আমার মনে হয়, চিরাচরিত তরঙ্গের হিল্লোলে হিল্লোলে সামঞ্জস্য হয়। সে সাম্যও ক্ষণিক। যেমন সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার ঠিক্ মাঝের নিশ্চল অবস্থা। সমুদ্রের কূলে অতিথি ঢেউ আছড়ে পড়ে। বালির বাঁধ তাকে প্রতিরোধ করে। সে ফিরে যায়। যাবার মুখে তার ফেরবার স্রোত আগত নবীন স্রোতকে প্রতিরোধ করে। সাগরকূলের তরঙ্গ-লীলা ক্ষণিক স্তব্ধ হয়, কিন্তু তাদের অন্তরে পোষা বিক্ষোভ শান্ত হয় না। আগত জল চায় কূল স্পর্শ করতে। প্রত্যাগত বারি-রাশির প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। দূর সাগরের অন্ধ তরঙ্গের শক্তি বিরত শক্তিকে সঞ্জীবিত করে। আবার বিক্ষোভ ঘটে—কর্ম্মে কর্ম্মে, স্বার্থে স্বার্থে সংগ্রাম বাধে। জোয়ার-ভাঁটার সাম্যকে চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি আবার ভেঙ্গে দেয়। সাগরের নিদ্রা ভাঙ্গে। নিষ্কর্ম্মতার, কর্ম্ম-বিরতির কল্প ক্ষয় হয়।

তাই ব্রহ্মার নবীন কল্পের উষালোকে অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত চরাচরের পুনরাবর্ত্তন। প্রতি কল্পের শেষে, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ সকাম কর্ম্ম-বাসনা জোট বাঁধে। প্রত্যাহৃত কামনা-পুঞ্জ—কারণ-সাগরের নাগরাজের ফণা, সহস্র ফণা, অনন্ত-সঙ্কর্ষণ। সকল ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নাগ-রাজের নিজের অন্তরে সংগৃহীত। দংশনের জন্য উদ্যত নয়। কাজের প্রেরণাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে অঙ্গে সংগ্রহ ক'রে রেখেছে। কারণ-সলিলে নাগের বাসা। কিন্তু নারায়ণ তার উপরে। সে তাঁকে মাত্র বহন করছে—কিন্তু মায়ায়-গড়া নাগের দেহ—মায়ার খেলার



বৃষ

বাসনার মোহ, ত্যাগ-শক্তি তার নাই। হিংসার বীজ তরঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত। তরঙ্গায়িত সাগরের বিষাক্ত অম্বুরাশি, নানা কর্ম্মে, অপকর্ম্মে পরিণত হ'চ্চে। গহন এই কর্ম্মের গতি।

আব্রহ্ম-ভূবন, অনন্ত সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। এ আবর্ত্তনে জীবন-মরণ সৃজন-পালন-লয়ের চক্র-খেলা। কোটি কোটি সূর্য্য-চন্দ্রের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় সংসার চক্রে। তার ক্ষণিক জ্যোতিতে জীব মুগ্ধ হয়, তার চাকচিক্যে আত্ম-বিস্মৃত হয়। মায়া-চক্রের রূপ, অরূপের অনন্ত-জ্যোতি হ'তে জীবকে ভুলিয়ে রাখে। সে মায়া-পাখীর পাখার রঙে ভুলে গিয়ে—দেহের মাঝের অচিন-পাখীর সাক্ষাৎ পায় না। ব্লু-বার্ড ধরতে পারে না। তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেওয়ালীর

পোকার মত মায়ার আলোর চারিদিকে ঘোরে। নির্বিকার, নিরঞ্জন, মণি-গাঁথা-সূত্রের মত, সর্ব্ব[illegible]ামমান-বায়ুর আধার অম্বরের মত, অনন্ত-শয়নে না[illegible]ায়ণ। [illegible]বশ্ব তাঁকে দেখে না—কারণ-তরঙ্গে ভেসে বেড়ায়। কভু কাঁদে, কভু হাসে, কভু হাবুডুবু খায়। মায়া-পয়োধিকে প্রলয়-পয়োধি বলে চিনতে পারে না। শীতল ভাবিয়া তার জল পান করে। শেষে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে।

এই সত্যকে রূপক-ভাবে দেখাবার জন্য অনন্ত-শয়নে নারায়ণের মূর্ত্তি পরিকল্পিত হয়েছে—এই আমার উপলব্ধি। যদি তরঙ্গ এত প্রবল, কল্পে কল্পে যদি সেই তরঙ্গেই ভাসতে হয়, তবে মুক্তির কি উপায় নাই? আছে বলেই শান্ত, আশার-প্রদীপের মত শায়িত বিষ্ণু-বিগ্রহের পরিকল্পনা। তাই তাঁর পূজার ব্যবস্থা। মুক্তির পথই পরম পথ। সে পথে শঙ্কাহীন বীরের মত চললে—ঢেউ এড়িয়ে চলা যায়, সাপের ফণার উপর বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায়। কালীয় দমন নিত্য সম্ভব—বাসনা বাসুকীর ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে অধিষ্ঠিত করলে।

চক্ষে ঠুলি বেঁধে রেখেছে গুণময়ী মায়া।
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দু'রত্যয়া
মাং যেঽভিজানন্তি মায়ামেতাং তরন্তি তে।
ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য।

যে সকল ব্যক্তি তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁকেই ভজনা করে, কেবল তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।

যার মাত্র লক্ষ্য—বিষ্ণুর চরণ, তার নয়ন-পথে পড়বে বিজয়-লক্ষ্মী। তিনি তাঁর পদ-সেবা-নিরত। সকল সম্পদ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, লক্ষ্মীরূপে তাঁর শ্রীচরণে। সে সম্পদ মুক্তির সম্পদ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

কৌন্তেয়, আমায় পেলে আর পুনর্জ্জন্ম থাকে না—বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। দেব-যাজী দেব-লোকে যায়, আবার ফিরে আসে। কিন্তু যে তাঁকে আশ্রয় করে—একমাত্র সচ্চিদানন্দের ধ্যান করে—সে কারণ-পয়োধির পরপারে পৌঁছে।

সেই পরম পথ—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতি।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

অব্যক্ত, অক্ষয় বলে যাঁকে শ্রুতি-স্মৃতি নির্দ্দেশ করেছেন তিনিই পরম গতি। সেখানে পৌঁছলে আর ফিরে আস্‌তে হয় না, সে ধাম পরম ধাম। ক্ষীরোদ-সাগর, কারণ-সাগর, সাত সমুদ্রের পরপারে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌-যাজী মাং নমস্কুরু—এই ভক্তিতত্ত্বকে ফোটাবার আয়োজন—পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত। অক্ষরে লেখা সঙ্কেত দিয়ে জ্ঞানবানকে সত্য বুঝানো যায়। কিন্তু শিল্পের সাহচর্য্যে পুঁতুল গড়ে এবং ছবি এঁকে সত্যকে মূর্ত্ত করা শিক্ষার সহজ উপায়।

কুম্ভকোনের টেপাকুল্লম সরোবর অতি বৃহৎ। বালি পাথরে গাঁথা। মাঘ-মাসে কুম্ভমেলায় বহু লোক এখানে স্নান করে। পুকুরের পাড়ে নবগ্রহের নামে উৎসর্গ-করা নয়টি মণ্ডপ আছে। কুম্ভ-গঙ্গায় স্নান করলে গ্রহ-বৈগুণ্য লোপ পায়। অবশিষ্ট পাপ ক্ষয় হয় শ্রীবিষ্ণু পূজায়।

কুম্ভকোনম মন্দির সুদৃশ্য এবং সুগঠিত। দ্রাবিড় শিল্পের পূর্ণ নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়।

তাঞ্জোর ষ্টেশনের উপর যাত্রী-নিবাস আছে। প্রকাণ্ড সাজানো ঘর। সাজ-সরঞ্জাম মনোরম—ধবধবে বিছানা, টেবিল, চেয়ার, বিজলী পাখা, বিদ্যুতের আলো। রিটায়ারিং রুমের মেট্রন, মিসেস ভাজ বর্ষীয়সী। একদিন কলিকাতার সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল। কাজেই হিন্দী বল্‌তে পারেন। প্রথম দর্শনেই আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করলেন। হোটেল হ'তে খানসামা ডেকে, ব্রাহ্মণ-হোটেল থেকে পরিচয় এনে, আমাদের চাকরকে বারান্দায় স্থান দিয়ে যখন শ্রীমতী ভাজ আমার স্ত্রীকে তীর্থ দর্শনের টিপ্‌স্‌ দিতে আরম্ভ করলেন, তখন মনটা একটু ওর-নাম-কি হ'ল। কিন্তু বুঝলাম, বেচারা সব জানেন।

মিসেস ভাজের দুটা সংবাদ আমাদের উত্তেজিত করলে। গোপুরমের উত্তর বিমানে উপর্য্যুপরি চারটি প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। প্রথমটি চোল-বীর, তার উপরেরটি নায়ক, তার উপর মহারাষ্ট্র এবং তদুপরি এক য়ুরোপীয়। বলা বাহুল্য, দেব দর্শনের পূর্ব্বে আমরা মন্দিরে প্রবেশ ক'রেই তাদের দেখলাম। শুনলাম ছ'শ-সাতশ বৎসর পূর্ব্বে সোমবর্ম্ম নামক এক স্থাপত্য-শিল্পী, যোগ-বলে তাঞ্জোরের ভাবী-কালের ইতিহাসের ধারা পরিদর্শন ক'রে এই কয়টি মূর্ত্তি গড়েছিল। য়ুরোপীয়টি প্রাচীন পোষাক-পরা। কেউ কেউ বলে—সে সময় ওলন্দাজ

বণিকেরা দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্যের জন্য আসত। কেউ বলে ভিনিসের মার্কোপোলো যখন ভারতবর্ষে আসে, তার মূর্ত্তি সোমবর্ম্মা রাজাদেশে গড়েছিলেন। ব্যাপারটা কিন্তু চিত্তাকর্ষক ও রহস্য-ময়।

তারপর মিসেস ভাজের ফেভারিট—নন্দী। এ উচ্চে ১২ ফিট, আর লম্বায় ১০½ ফিট। প্রস্থে ৮¼ ফিট। অতি সুশ্রী, গম্ভীর—অতি ধীর-মূর্ত্তি। কমনীয়তায় এই পাথরের ষাঁড়ের কাছে অনেক পুরুষ পরাজিত হয়।

ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দী অবধি তাঞ্জোরে হিন্দু-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। চোল, চের, পাণ্ড্য, নায়েক প্রভৃতি রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু একদিন এখানে মন্দির লুটের সম্ভাবনা ছিল—তাই বৃহদেশ্বর শিবের মন্দির দুর্গ মধ্যে অবস্থিত। উচ্চ দুর্গ—পরিখার চারিদিকে গড়—তাতে আজিও কাবেরীর জল প্রবাহিত। সেতু পার হয়ে তোরণ-দ্বারে পৌছতে হয়। প্রথম গোপুরম হতে দ্বিতীয় গোপুরম অবধি আরও পথ। পূর্ব্বে সেখানে প্রহরী থাকত—এখন দেবতার অর্ঘ্যের জন্য ফুল-ওয়ালী ফুল আর নারিকেল বিক্রয় করে; যুগ্ম গোপুরমের পরে পাথর দিয়ে বাঁধানো খোলা প্রাঙ্গণ। তার মাঝে উচ্চ চাতালে নন্দী আছে। তার পর মন্দির।

সৌন্দর্য্যে তাঞ্জোরের মন্দির গোপুরমের বিমান হতে শ্রেষ্ঠ। মন্দিরের গড়নও বিভিন্ন। মাথার গোলক একখণ্ড পাথরের। ইহা ২৫।৷০ ফিট চৌকা। ওজনে ৮০ টন্! যে স্থল থেকে ঐ পাথরখানি কেটে আনা হ'য়েছিল, সেস্থলে একটি পুকুরের মত গহ্বর হ'য়েছে। এর নাম সরপ্পইলাম।

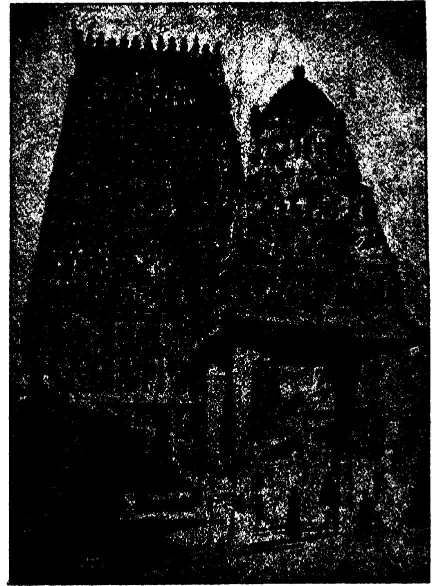
বৃহদেশ্বর লিঙ্গও উচ্চে প্রায় দশ ফিট। নিচে থেকে পূজা করা যায়—কিন্তু মাথায় জল দিতে হ'লে দ্বিতলে উঠ্‌তে হয়। পরিক্রমার পথ অন্ধকার।

শিব-মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পার্ব্বতীর মন্দির।

আমার মনে হয় ঐ বৃহৎ প্রস্তরকে লিঙ্গরূপে পূজা করার জন্যই তাকে ঘিরে মন্দির রচিত হয়েছিল। মন্দির রচিত হবার পর শিব-প্রতিষ্ঠা হয় নি। কারণ, গর্ভমন্দিরের দরজা দিয়ে শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। বৃহদেশ্বর-মহিমা নামক পুস্তকে নাকি উক্ত আছে যে এ মূর্ত্তি রাজা করিকাল চোল নর্ম্মদা হতে এনেছিলেন। ঠিক মন্দিরের পাশেই এক প্রাসাদের ভগ্নাংশ আছে। তাতে পাথর দিয়ে গাঁথা এক পুষ্করিণী আছে। এর জল বিমল নয়।

মন্দিরের সৌন্দর্য্য কথায় বর্ণনা করবার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা। এক কথায়, সে মন্দির অপরূপ। এর বিমান চৌদ্দতলা—২১৬ ফুট উঁচু। পোস্তা ৯০ বর্গফুট। আঁট সাঁট চেহারা। ৯৪১ বৎসর জল, ঝড়, ভূমিকম্প এ মন্দিরের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ভাবীকালের কথা শ্রীবিষ্ণুর লীলা-বিলাস অভিলাষে। বিমানে শ্রীবিষ্ণু এবং মহাদেবের বহু মূর্ত্তি আছে—সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। সুখ দুঃখের মত এরাও যমজ ভাই।

ওদেশে কার্ত্তিকের নাম সুব্রহ্মণ্য। প্রাঙ্গণের উত্তর-



কুম্ভকোনমে একটি রাস্তা—বিশাল বিষ্ণুমন্দিরের মণ্ডপ ও চূড়া

পশ্চিম দিকে সুব্রহ্মণ্য মন্দির। এ মন্দির পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নায়ক রাজারা নির্ম্মাণ করেছিলেন। এর নিখুঁত কারুকার্য্য বহুক্ষণ দেখেও আশা মেটে না। এর কাজ সূক্ষ্ম—মনে হয় যেন সম্প্রতি শিল্পীর হাত হ'তে রূপ পেয়েছে।

বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সময়ের অভাবে মন্দিরের পাষাণ অঙ্গে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠ করতে পারলাম না। খুব পুরাতন একখানি লিপি—রাজা রাজচোলার—অর্থাৎ ইংরেজী একাদশ শতাব্দীর। শেষ লিপি মহারাজ দ্বিতীয় সর্ব্বজী নামক মহারাষ্ট্র

ভূপতির। ইনি এক জার্মান মিশনরী Rev. Schwartz-এর নিকট শিক্ষা পেয়েছিলেন। ইনি প্রথম হিন্দু রাজা ইংরেজী ভাষা শিখেছিলেন। এই দ্রাবিড় ভূপতি দেব-নাগরী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অবশেষে ইংরেজের সঙ্গে মিতালি ক'রে রাজ্য-ভার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৮০০ সাল অবধি তাঞ্জোরে হিন্দু রাজত্ব ছিল। মাত্র শহরটি তখনও হিন্দুরাজ্য রহিল।

যেদিন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঞ্জোর রাজ্য হস্তগত করলেন, বিলাতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরিত হ'ল।

"তাঞ্জোর রাজ্য আমাদের অধীনে এসেছে। ইহা অর্জ্জন করতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে একটিও সৈন্যের প্রাণ দিতে হয়নি, একটি টাকাও ব্যয় করতে হয়নি।"

অলমতিবিস্তরেণ। প্রাচীন রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে মনে হয়—

পতন-অভ্যুত্থান বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিবা রাত্রি।

তাঞ্জোর প্রাসাদও অপূর্ব্ব। এক দিকে নায়ক রাজাদের দরবার হল। এতে রোমক ও ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন বিদ্যমান। অন্য চাতালে মহারাষ্ট্রদের দরবার গৃহ। এর গঠন ভারতীয়-সারাসানিক—আগ্রা দিল্লীর অনুরূপ। ইসলামের অনুশাসনে মুসলমান বাদসাহেরা মূর্ত্তি গঠন করতেন না, হিন্দু রাজারা নিজেদের মূর্ত্তি দিয়ে দরবার দেওয়াল সাজিয়েছিলেন। বহু প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে বিদ্যমান। কিন্তু যাদের দেখিনি তাদের প্রতিকৃতি অবিকল কিনা এ সম্বন্ধে আলোচনা ধৃষ্টতা।

তাঞ্জোর প্রাসাদের সারস্বত পুস্তকালয় এক অপূর্ব্ব সংগ্রহ। ভারতে কোথাও এত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। নায়ক এবং মহারাষ্ট্র ভূপতিরা বহু পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। হিন্দু রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হ'ত। কিন্তু এক রাজবংশের পরাজয়ের পর, আগত রাজবংশ পুঁথি-শালায় অগ্নি-সংযোগ করত না এবং মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করত না। ভারতের সংস্কৃতি এবং আদর্শ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বিধর্ম্মীর মন্দির বা উপাস্য ভাঙ্গার বিরোধী। হিন্দুরা এ বিষয়ে উদার। তাই এ পুস্তকালয় আজিও বিদ্যমান। শেষ ভূপতি সর্ব্বজী ১৮২০ সাল হতে দশ বৎসর উত্তর ভারতে তীর্থ করেছিলেন। সে সময়ও অনেক পুঁথি সংগৃহীত হ'য়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, সকল বিষয়ের গ্রন্থ এখানে বিদ্যমান। তাদের চিত্রকলা-শিল্প অনুশীলনযোগ্য।

লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ অতি যত্নে আগন্তুককে পুঁথি দেখান। একখানি গ্রন্থ অশ্বশাস্ত্র সম্বন্ধে। তার অশ্বের চিত্র বড় মনোরম। আর একখানি পুঁথি—রঘুনাথ বিজয়ম। রাম-রঘুমণির বিজয়বার্ত্তা এ নয়। নায়ক রাজা রঘুনাথের কীর্ত্তি। লেখিকা তাঁর গণিকা—রামভদ্রম্বা!

তাঞ্জোর পরিষ্কার শহর। গান বাজনার যথেষ্ট আদর এ দেশে। ধাতু-শিল্পী এখনও বিস্তর আছে। তামার থালে রূপার কোফ্‌গিরি কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। কিন্তু বহু দর ক'রে দ্রব্য কিনেও শেষে মনে হয়, ঠকে গেছি। দর কষাকষির প্রথা ভারতে সর্ব্বত্র। তবে কাশ্মীর শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তাই ও প্রদেশের দোকানদারের দর হাঁকতে চক্ষু-লজ্জা হয় না।

তাঞ্জোর থেকে বাস যায়—কুম্ভকোনম প্রভৃতি স্থানে। কিন্তু শহরের মধ্যে ঘুরতে হয় পদব্রজে কিম্বা ঝট্‌কায়। যাত্রীর জন্য চোলট্রি অর্থাৎ ধর্ম্মশালা আছে। ব্রাহ্মণের হোটেলে ভাত, তরকারি পাওয়া যায়। কিন্তু লুচি, রুটি, পুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা এমন কি কচুরি, জিলাপি ইত্যাদি অনুরূপ কিছু মেলে না। কলা এবং নারিকেল প্রচুর। আমও সারা বৎসর পাওয়া যায়। কিন্তু তারা উচ্চশ্রেণীর নয়।

তাঞ্জোর প্রাসাদের এক দিকে আট-তলা এক অট্টালিকা আছে। রাণীরা পূর্ব্বে সেখানে বসে বৃদ্ধেশ্বর মন্দির দেখতেন। সে হাওয়া-ঘর এখন জীর্ণ। তাঞ্জোরে দমকল থাকলে বোধ হয় সে বিমান, আগুন দেখা প্রহরীর চৌকি হবে।

মিউনিসিপালিটি এক প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ দখল করেছে। সেখানে শহর-পিতারা পরস্পরকে গালাগালি দেয় কি-না জানবার উপায় নাই, কারণ তামিল ভাষার কল্লোল আমার শব্দ-উপলব্ধি প্রবৃত্তির ভিন্ন-মুখ।

মোট কথা, এদেশে দেখবার, বোঝবার, শেখবার মাল-মসলা প্রচুর। তাই শহর পরিত্যাগ করবার সময় দীর্ঘনিশ্বাস অনিবার্য্য।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ

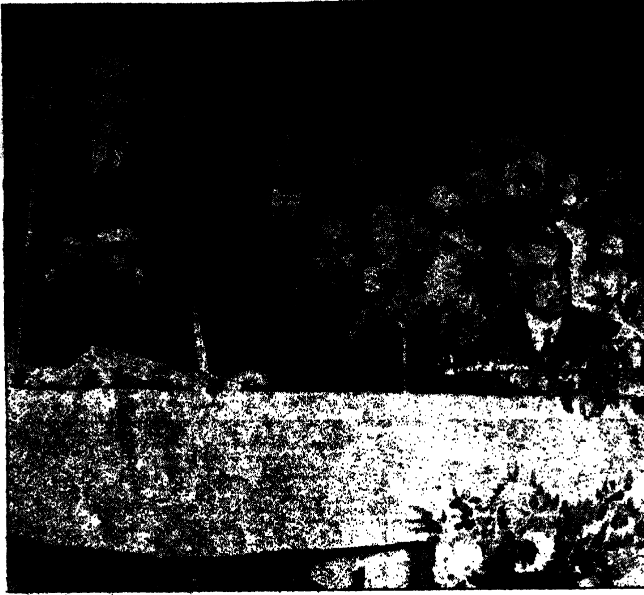
শ্রীবিজয়গোপাল গাঙ্গুলী

সমগ্র ভারতের সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী মেডিকেল কলেজ, সারা বাঙ্গালার গৌরবোজ্জ্বল কীর্ত্তি, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব বিগত ডিসেম্বর মাসে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই বিস্তৃত দেশে চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়ের অভাবদৃষ্টে, কয়েকজন ব্যথিতচিত্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি 'ক্যালকাটা স্কুল অফ্ মেডিসিন' নাম দিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ঐ স্কুলটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের উদ্দেশ্যে রায় ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে এবং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের সম্পাদকত্বে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা হইত, ছাত্রদের তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত, হাসপাতালে হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য ছাত্রদের মেয়ো হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত। স্কুলটি প্রথম স্থাপিত হয় ১৬১নং পুরাতন বৈঠকখানা বাজার রোডে; অতঃপর যথাক্রমে ১৫৫ এবং ১২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে উহা লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্কুলটি উঠিয়া আসে ২৯৮নং আপার সার্কুলার রোডে। এই শেষোক্ত স্থানে ১৪টি বেড লইয়া একটি ছোট হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়, ছাত্রসংখ্যা ৫২০তে দাঁড়ায় এবং অধ্যয়নের কাল ১ বৎসর বাড়াইয়া ৪বৎসরের জন্য নির্ধারিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে বেলগেছিয়ায় বর্ত্তমানে যেস্থানে কলেজ অবস্থিত সেস্থানে—বারো বিঘা জমি খরিদ করিয়া ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি একতলা হাসপাতাল নির্ম্মিত হয়। প্রিন্স্ আলবার্ট ভিক্টরের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে যে ভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়—সেই চাঁদার তহবিল হইতে ১৮ হাজার টাকা পাওয়া যায় এবং হাসপাতালটির "এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল" নামকরণ করা হয়; ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৩৬টি বেড লইয়া এ হাসপাতালের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উপরিউক্ত স্কুলটি এখানে উঠিয়া আসে।

অতঃপর মহানুভব ব্যক্তিগণের দানে ও গভর্ণমেণ্টের এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে সাহায্য পাইয়া, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করে। দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মাণিকলাল শীল ও রামাচরণ ধর, দেবপ্রসন্ন ঘোষ, পোস্তার রাণী কস্তুরীমঞ্জরী প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণের দানে পুষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি কমিটি হইতে ৯



সার নীলরতন সরকার কর্ত্তৃক সিলভার জুবিলী হলের ভিত্তি স্থাপন—প্রিন্সিপাল ডাঃ এম-এন-বসু, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি দণ্ডায়মান



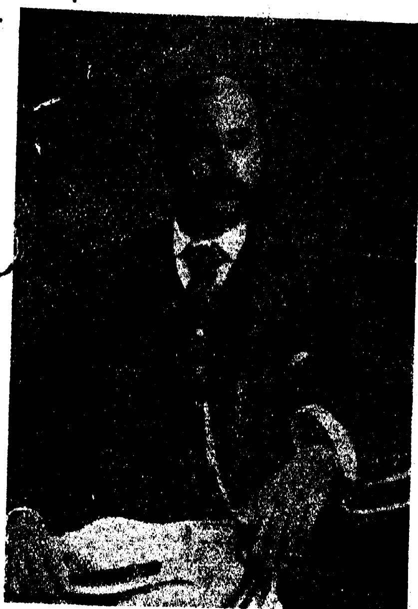
সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক উৎসবের উদ্বোধন—পার্শ্বে ভাইস-চ্যান্সেলার সার আজিজল হক ও অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ উপবিষ্ট

হাজার টাকা পাওয়া যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসিয়া মহামান্য সম্রাট দম্পতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন। এ সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মহাত্মাগণের মহানুভবতায় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ব্লক নির্ম্মিত হয় এবং ছাত্র সংখ্যা ছয় শতে দাঁড়ায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বেলগেছিয়ার হাসপাতাল ও বিদ্যালয়—যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে কয়েকটি সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট আর্থিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হন। এ সময় বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল, সার শঙ্করনায়ার, সার পার্ডি লিউকস্, কর্ণেল এডওয়ার্ডস, সার এস, পি (পরে লর্ড) সিংহ, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ



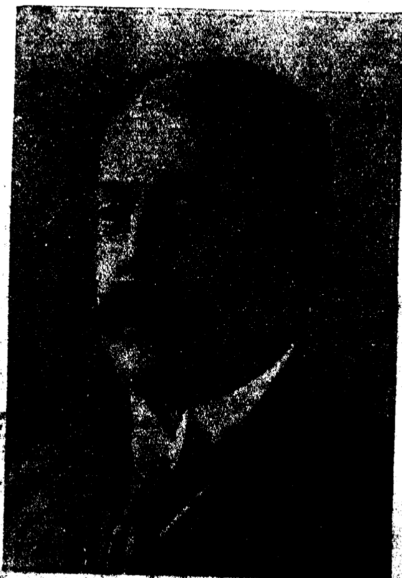
পরিকল্পিত সিলভার জুবিলী হলের চিত্র


কলেজের প্রাণস্বরূপ, প্রথম সেক্রেটারী
ডাক্তার ৺রাধাগোবিন্দ কর

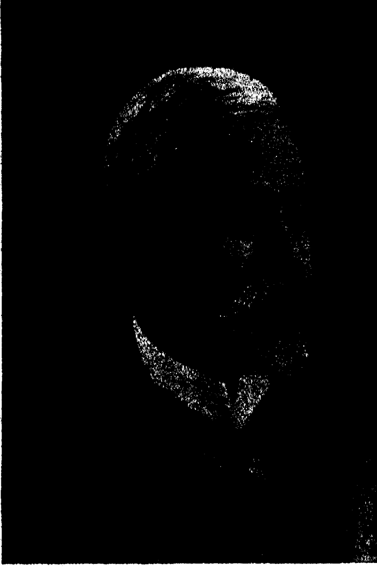
করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সুরেশ-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার এম, এন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলেজের


ডাক্তার ৺সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি-আই-ই, (বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটীর প্রথম সভাপতি—১৯১৬-২১)

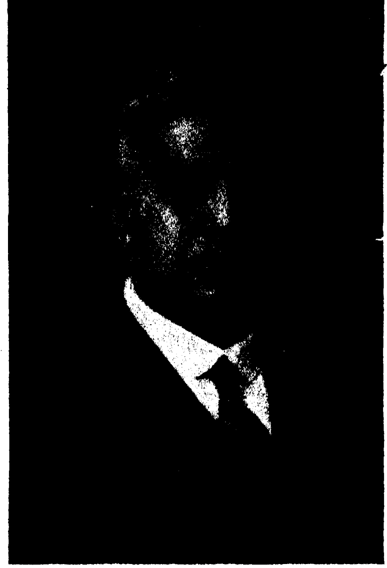

রায় বাহাদুর ডাক্তার ৺লালমাধব মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই,
(কলিকাতা মেডিকেল স্কুল সোসাইটীর প্রথম সভাপতি)


ডাঃ ৺এম এন বন্দ্যোপাধ্যায়, সি-আই-ই
(প্রথম প্রিন্সিপাল—১৯১৬-৪১)

বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল ডাক্তার এম্ এন বসু মহোদয়গণ ইহার উন্নতিকল্পে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। সাধারণের তরফ হইতে আড়াই লক্ষ টাকা তুলিবার সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা দানে স্বীকৃত হন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে বার্ষিক ৩০ হাজার



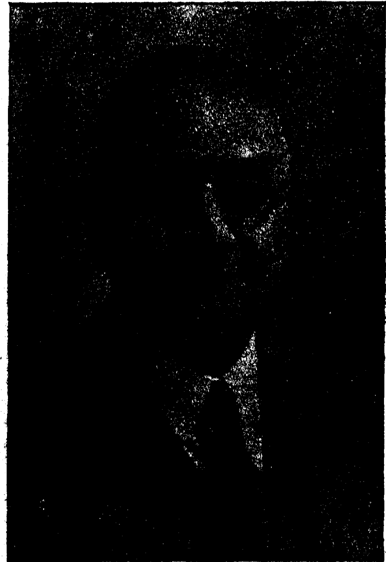
৺ভুপেন্দ্রনাথ বসু (সকল কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী)



ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, কেটি,
(বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটীর সভাপতি ১৯২১-৪১)



ডাক্তার সার ৺কেদারনাথ দাস, কেটি, সি-আই-ই
(প্রিন্সিপাল ১৯২২-৩৬)



ডাক্তার শ্রীযুত এম-এন-বসু (প্রিন্সিপাল ১৯৩৬ হইতে)

ও ১০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিলে গভর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া স্বীকার করা হয়।

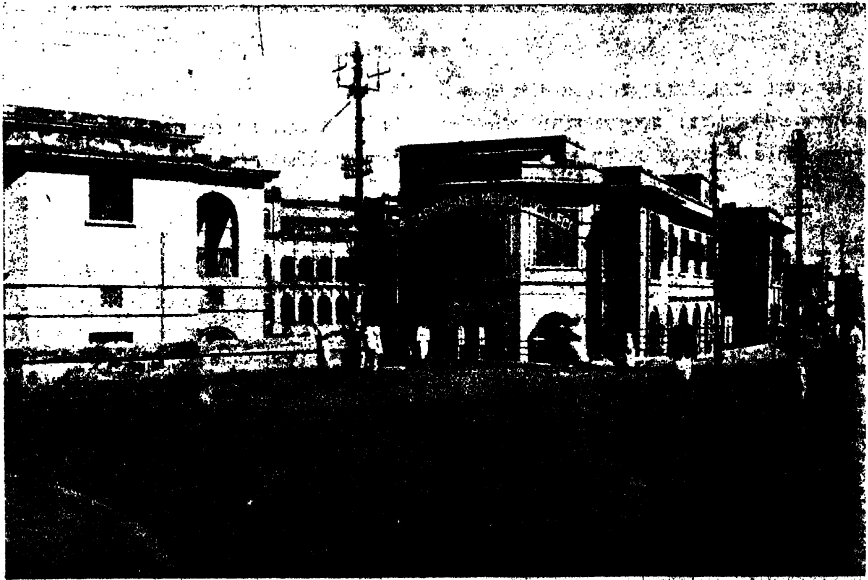
বহু চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ সমুদয় সর্ত্ত পালন করেন। সার রাসবিহারী ঘোষ ও সার তারকনাথ পালিত প্রত্যেকে যথাক্রমে ৫০ হাজার, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ২৫ হাজার, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ১০ হাজার, কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় ৬ হাজার এবং সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা হিসাবে অর্থ সাহায্য দেন। রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় আউট-ডোর ডিসপেনসারী নির্ম্মাণের জন্য ৭০ হাজার টাকা দেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'প্রিলিমিনারি'-এম-বি'র পঠন-পাঠনের অনুমোদন পাওয়া যায়। ঐ বৎসর ৫ই জুলাই তারিখে লর্ড কারমাইকেল "বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজের" দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯১৭ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে প্রাথমিক ও শেষ এম-বি পরীক্ষা শিক্ষা দেবার অনুমতি লাভ করা যায়। লর্ড কারমাইকেলের সাহায্য ব্যতিরেকে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না বলিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলেজের নাম 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ' করা হয়।

বহু ব্যক্তির দানে প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে, ভারতের বহু মনীবী ও জননায়কের দিকট হইতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতি অভিবাদন ও শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের মহানুভবতা, দূরদর্শিতা ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আজ বিরাট জনকল্যাণের আধারস্বরূপ হইয়াছে। যে সকল মহাপ্রাণ কর্ম্মযোগী এই প্রতিষ্ঠানের প্রেরণা দিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। রায় ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার এম এন বন্দ্যোপাধ্যায়, সার কৈলাসচন্দ্র বসু, সার কেদারনাথ দাস, ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী এবং জীবিতগণের মধ্যে সার নীলরতন সরকার, কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল ডাঃ এম এন বসু, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বিখ্যাত চিকিৎসকগণ এবং জননেতাগণের মধ্যে পরলোকগত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এবং সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সহায়করূপে চিরকালই সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বিরাজ করিবেন।

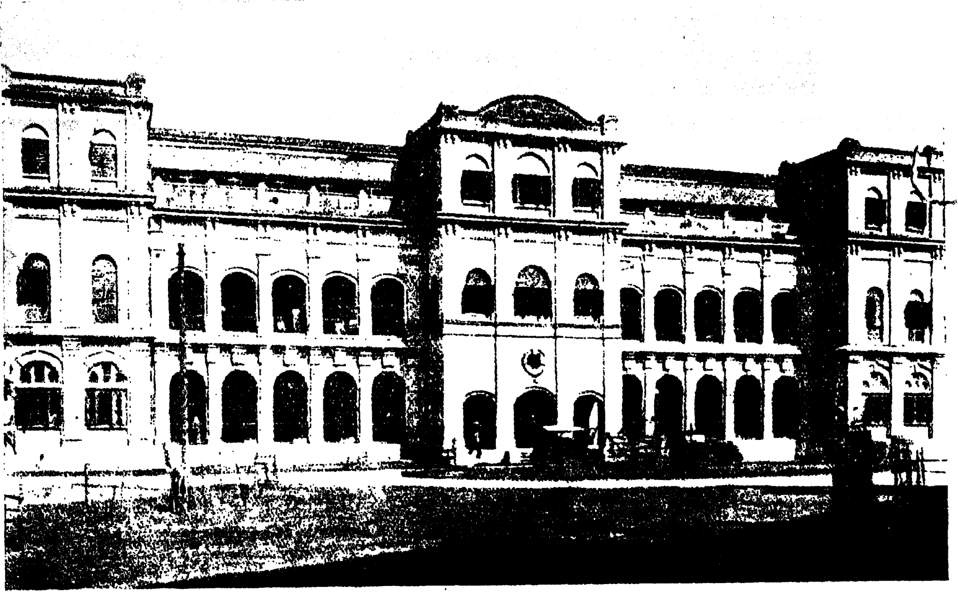
রজত জয়ন্তী উপলক্ষে চিকিৎসাবিদ্যা ও উহার সমস্যামূলক একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। বহু দর্শনযোগ্য শিক্ষণীয় বস্তুর সমাবেশে প্রদর্শনীটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন, ট্রপিক্যাল স্কুল, হাই জিন ইনষ্টিটিউট এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করেন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার সার রামলিঙ্গ রেড্ডি মহোদয় এই উপলক্ষে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা, অধ্যাপনা ও গবেষণা সম্পর্কে বহু তথ্যমূলক আলোচনা করেন।



কলেজের প্রধান প্রবেশ পথ

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয়। চিকিৎসক-শিরোমণি সার নীলরতন সরকার মহোদয় দেশের শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পোন্নতির কাজে যোগদান না করিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অসম্ভব। পরিশেষে রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে জুবিলী হলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,



এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল

উদ্দেশ্যে যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া একটি মানপত্র তাঁহাকে প্রদান করা হয়। ময়ুরভঞ্জের মহারাণী পারিতোষিক বিতরণ সভায় নেত্রীত্ব প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের মায়েরা, বোনেরা, দেশের আমরা আশা করি দেশের লোকের বদান্যতায় উহার নির্ম্মাণ কার্য্য অচিরেই শেষ হইবে এবং রোগ নিবারণকল্পে এই প্রতিষ্ঠান ভারতে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া একদিন বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিবে।

প্রশান্ত মহাসাগর

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রশান্ত মহাসাগরের এক সীমান্তে যেমন জাপান রয়েছে, তেমন অন্য সীমান্তে রয়েছে আমেরিকা, এ দুয়ের মাঝে যে সব ছোট বড় দ্বীপ রয়েছে তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আছে—বিশেষত নৌ-যুদ্ধের উপযোগিতার দিক থেকে। ছোট বড় যতগুলি দ্বীপ আছে তার বেশীর ভাগই ব্রিটিশের। তারপর আর সবাই—যেমন হল্যাণ্ড, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র। এসব বাদ দিলেও অষ্ট্রেলিয়ার ও নিউজিল্যাণ্ডের সংরক্ষণের আওতায় কতগুলো ছোটখাট দ্বীপ আছে। পৃথিবীর প্রায় সব ব্যাপারেই যেমন ব্রিটিশ একটা বিশেষ অংশ নেয়, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ বাঁটোয়ারা ব্যাপারেও ব্রিটিশ তেমন একটা বিশেষ অংশ নিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ জাতির বহু দুঃসাহসী নাবিক এই প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্যাচ্ছন্ন দ্বীপ-সমূহকে আবিষ্কার করেছে। কেউ যদি আজ এমন প্রশ্ন তোলে যে, এই সব দুঃসাহসী নাবিকদের পেছনে কোন রাজনৈতিক শক্তি সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করেছে কিনা—তাহলে অবশ্যই মনে নানা সন্দেহ ওঠে। কেন এবং কি কারণে এই নিরীহ দ্বীপবাসীদের সম্বন্ধে তাঁদের মনে ঔৎসুক্য ঠাঁই পেল? বৃথাই অমন জীবন-মরণ-পণ করা ঔৎসুক্য মনে জাগে না। হয়ত কোথায়ও স্বার্থের গন্ধ নিশ্চয়ই থাকবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্বার্থ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু বাইরে প্রচার যে একদল দুঃসাহসী নাবিক কোন 'অসীমের মায়ায়' বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল, তাই এসব নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার হয়েছে। এই সব মন-ভুলানো প্রচারের পেছনে কি আছে তা সহজেই অনুমেয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয় নাবিক Magellan, Mendana de Neyra এবং Quiros প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সম্বন্ধে কৌতূহলী

হয়ে ওঠেন। তার ফলে তাঁরা গোটা কয়েক দ্বীপ পরিদর্শন করতে সক্ষম হন। কিন্তু বিশেষ লাভবান হবার মত কিছু না পেয়েই বোধ হয় এরা আর এ সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেননি। তাহলেও একেবারে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়নি। যাই হোক, তার পরের শতাব্দীতে ওলন্দাজ নাবিকেরা প্রশান্ত মহাসাগরে যাতায়াত সুরু করল এবং তারা চেষ্টা করল—যাতে পর্তুগীজদের তাড়িয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা যায়। তারা ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের প্রভাব সীমাবদ্ধ করে নিজেদের স্বার্থের ছাউনি ফেলতে সুরু করলে। কিছুদিনের মধ্যেই সুমাত্রা, জাভা, বর্ণিও এবং সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপে এই ওলন্দাজ নাবিকেরা ব্যবসায় বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করল। এই পত্তন হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান; ওলন্দাজদের একজন ক্ষমতাশালী নাবিক ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি নূতন দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম হচ্ছে Abel Tasman. অষ্ট্রেলিয়া, টাস্‌মানিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড, টোঙ্গা এবং ফিজি দ্বীপ-পুঞ্জের উত্তরাংশ ইনিই আবিষ্কার করেন। তারপর আর বড় একটা কোন নাবিকই প্রশান্ত মহাসাগরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান নি। যাই হোক অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার নূতন করে এ বিষয় অনুসন্ধান চলতে লাগল। এবারে দুই দল নাবিক দুই রাজশক্তিকে পেছনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাল সবার জন্যই সৌভাগ্য সঞ্চয় করে না। ফরাসী জাতির জন্যও কাল-দেবতা তেমন কিছু সৌভাগ্য সঞ্চয় করেন নি। কিন্তু যাদের প্রতি কাল-দেবতার অনুগ্রহ ছিল তারা পেয়ে গেল—ব্রিটিশজাতি পেয়ে গেল অনেক জিনিষ। তাই আমরা দেখতে পাই ফরাসী নাবিকদের বিশেষ ভাগ্য-বিপর্য্যয়। অন্যদিকে আবার ব্রিটিশ নাবিকদের বিশেষ অনুকুল আবহাওয়ায় সৌভাগ্যের উদয়। ফরাসী নাবিকদের মধ্যে একমাত্র De Bougainville ছাড়া আর কেউই দেশে ফিরে যাননি।

De Bougainville গোটা কয়েক দ্বীপ পরিদর্শন করতে সমর্থ হন। ইনি স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ, সলোমন, সোসাইটি, নিউ হেব্রিডিস্—এই কটা মাত্র পরিদর্শন করেন ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হন। ফরাসী নাবিকদের অভিযান এইখানে এসেই থেমে যায়। তারপর আর বিশেষ কোন চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এবারে ব্রিটিশ নাবিকেরা খুব উঠে পড়ে লেগে গেল।

১৭৬৪-৬৬ খৃষ্টাব্দে Byron গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন। Captain Carteret ১৭৬৬-৬৯ খৃষ্টাব্দে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, স্যাণ্টাক্রুজ, নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়র্ল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। Wallis ১৭৬৬-৬৮ খৃষ্টাব্দে তেহিতি, ওয়ালিস্ দ্বীপপুঞ্জ ও লো-উপদ্বীপ পরিদর্শন করেন। Captain Cook ১৭৬৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনবার সমুদ্র অভিযান চালান। তার ফলে তিনি পরিদর্শন করতে সক্ষম হন এই সব বিভিন্ন দ্বীপগুলি—কুক, লয়াল্‌টি, স্যাভেজ, হাউইয়ান, ফিজি, নিউ হেব্রিডিস্, নিউ ক্যালিডোনিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া।

ক্যাপটেন কুক একটু সত্যিই দুঃসাহসী প্রকৃতির ছিলেন। কেননা তিনিই বোধ হয় একমাত্র নাবিক—যিনি প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমস্ত দ্বীপের ঘূর্ণাবর্ত্তন-কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। তাঁর এই দুঃসাহসিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ জাতিকে প্রশান্ত মহাসাগরে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করেছে। ক্যাপটেন কুকের রাজনৈতিক অধিকারবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। তার চেয়ে আরো প্রখর ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যে, এই সব দ্বীপে অধিকারের জন্য ব্রিটিশ জাতিকে একদিন সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। তাই কোন দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব মনে না রেখে তিনি ব্রিটিশ জাতির পতাকা উত্তোলন করতে সুরু করলেন এবং বৃক্ষের গাত্রে নানা প্রকার চিহ্ন রাখতে সুরু করলেন। এটা নীতির দিক থেকে যে কত বড় অপরাধ তা বলে বোঝাবার নয়। কেননা যে দ্বীপে এই রাজনৈতিক অধিকারের চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছিল সে দ্বীপের অধিবাসীরা কেউই এ সম্বন্ধে কিছু জানত না। অথবা এর অন্তর্নিহিত যে উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধে এই দ্বীপবাসীদের তেমন কোন জ্ঞান ছিল না। এই রাজনৈতিক অধিকারের চিহ্নই যে একদিন তাদের সর্ব্বনাশ করবে, একি তারা জানত?

প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়ে রাজনীতিকে অর্থনীতির অনুসরণ করতে হয়। ব্রিটিশ রাজনীতিকেও তাই করতে হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্যায়। ব্রিটিশ সরকার এই সব দুঃসাহসী নাবিক ও ব্যবসাদার সম্প্রদায়কে নানা অসুবিধা থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তাছাড়া এই সব দ্বীপ যে কোন দিন মানুষের ব্যবহার-উপযোগী হতে পারে এমন ধারণা প্রথমে বোধ হয় ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ছিলনা। তাই অপরাধীদের বসতির জন্য ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ার বোটানি বে স্থির হয়। যাই হোক আরো কিছু দিন এই অবস্থায় চলল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক নূতন সমস্যা দেখা দিল—খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়।

এবারে পালা সুরু হল ধর্ম্মপ্রচারকদের। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদের অভিযান সুরু হয় প্রশান্ত মহাসাগরে। লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি প্রথম তেহিতিতে তাদের প্রচারকার্য্য সুরু করে। এর পর আরো অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে প্রচারকার্য্য চালাতে থাকে। এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদ যে কিছু না হয়েছে এমন নয়। কেননা আমরা দেখতে পাই যে, পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই নানা মতবাদ নিয়ে তাদের প্রচারকার্য্য চালিয়েছে। এখানে সহজে এ কথাটা কল্পনা করা যেতে পারে যে, সব সম্প্রদায়ই চেষ্টা করছে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে, কাজেই কিছু সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচারকার্য্যের ফলে রোমের পোপ Gregory XVI কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং তিনিও একটি ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারক দল নিযুক্ত করেন। আমরা এক কথায় বলতে পারি যে, প্রশান্ত মহাসাগরে নাবিক অভিযানের পর সুরু হল ধর্ম্মপ্রচারকদের অভিযান। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের অভিমত, ধর্ম্মপ্রচারকরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে সভ্যতার আলোক এনেছেন। এই অভিমত কতখানি সত্য তা বলা কঠিন। তবে মনে হয় ব্যক্তি-বিশেষের সৎবৃত্তিতে একটা কার্য্যকরী শুভ-কামনার সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদের একটা বিশেষ কৌশল তাঁদের সামাজিক মনোভাব। এই সামাজিক মনোভাবের ফলেই তাঁরা জনসাধারণের নিকট নিজেদের প্রতিষ্ঠার পত্তন করেন। এই ধর্ম্মপ্রচারকদের কার্য্যসিদ্ধিই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন

করা একটা পন্থা মাত্র। সত্যি মানবিকতার পন্থা অবলম্বন করে পাশ্চাত্য ধর্ম্মপ্রচারকরা প্রাচ্যের যেমন করেছে সমাজের ভিত্তি শিথিল, তেমন করেছে দাস-মনোবৃত্তির গোড়াপত্তন। এইরূপ শুভানুধ্যায়ী একদল ধর্ম্ম-প্রচারক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে অবতরণ করেন। এদের মধ্যে Pritchardএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি তেহিতি দ্বীপে কুড়ি বছর কাল কাটান। এর পরে James Chalmers, Dr. George Brown, Dr L Fison প্রমুখ ধর্ম্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন দ্বীপে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্য আসেন। মানবিকতার দিক থেকে উপরি-উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকদের কিছু কিছু দান যে না আছে এমন নয়। এদের সমবেত চেষ্টায় দ্বীপবাসীদের মধ্যে মানুষ-বলি, শিশুহত্যা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর হয়েছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দ্বীপবাসী খৃষ্টধর্ম্মেও দীক্ষিত হয়েছিল।

আমরা যদি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্যবিস্তারের কাহিনী খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে, এই ধর্ম্মপ্রচারকদের তথাকথিত মানবিকতা ও সহিষ্ণু কর্ম্মকুশলতাই সাম্রাজ্যের আদি বনিয়াদ। এরা ধর্ম্মপ্রচার করে পাশ্চাত্য শোষণনীতির অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে; 'আমাদের কিছু ভাল না ওদের সব ভাল'—এমন মনোভাবের সৃষ্টি করে। এই হেয় মানসিক অবনতির পর বণিকসম্প্রদায় আসে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যবসায় করতে।

আমরা পূর্ব্বে দেখেছি কি কি অবস্থার মধ্য দিয়ে এই প্রশান্ত মহাসাগরে পাশ্চাত্য জাতিগুলি তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছে। এ যাবৎ দুটো শক্তির ক্রিয়া প্রবল ছিল। একটি নাবিকবৃত্তি, আর একটি ধর্ম্মযাজকবৃত্তি। এই দুই শক্তির পরে তৃতীয় শক্তি বণিকবৃত্তি কি ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে তার কিছু আলোচনার প্রয়োজন। যে কষ্ট-দুঃখ সহ্য করে এর পূর্ব্ববর্ত্তীদের চলতে হয়েছে, বণিক সম্প্রদায়ের কিন্তু তা হল না। তারা ধর্ম্মযাজকদের প্রচারের সুবিধাটা পেলে। অপেক্ষাকৃত সহযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তারা ব্যবসায়কার্য্য চালাতে সুরু করলে। সুযোগ হাতে পেয়ে তারা কি রকম ভাবে অত্যাচার সুরু করলে তা নীচের কথা কয়টিতে বোঝা যাবে।

"Unscrupulous colonizers seized lands and forced the natives into service on the plantations ; and an extensive trade in "kanakas" or native labours was inaugurated, in which the ships of various nations participated." শুধু এইটুকু করেই বণিকসম্প্রদায় সন্তুষ্ট থাকেনি। দ্বীপবাসীদের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে চরম দুর্ভাগ্য এসেছে। কেননা তারা যেমন ছিল দুর্নীতিপরায়ণ তেমন ছিল অসংযমী—তার ফলে সমস্ত দ্বীপবাসীরা রোগে এবং অন্যান্য দুর্দ্দশায় ভুগতে লাগল। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা প্রথমে মনে করেছিলেন যে তাঁরা শুধু দাস-ব্যবসায় ও অন্যান্য দুর্নীতিপূর্ণ কার্য্যাবলীর প্রতিই লক্ষ্য রাখবেন। তাছাড়া সমুদ্রপথটা যাতে সুগম হয় তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তা হয়ে উঠল না। কারণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে উপনিবেশিকদের ভীড় দ্বীপে এত বেশী হয়ে পড়ল যে, একটা কার্য্যকরী সংরক্ষণ-নীতি না গ্রহণ করলে আর চলে না। তাই আপাতত ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা তাঁদের ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন। সাদা কথায় এমনি মনে হয় যে, ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসীদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তাঁদের মূল ঔপনিবেশিক নীতি পরিবর্ত্তন করেন। আসলে ব্যাপারটি কি তাই? ব্রিটিশ বণিকেরা যখন প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যবসা-কার্য্য নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিল, তখন অন্য সব জাতিগুলি নিশ্চয়ই বসেছিল না। তারা যথাসম্ভব ব্যবসা চালাতে সুরু করলে। ব্রিটিশ বণিকেরা বিপদ বুঝতে পারলে এবং তাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হচ্ছে এ কথাটা লণ্ডনে পৌঁছে দিলে। তাছাড়া এদিকে অন্যান্য রাষ্ট্র বসে নেই, তারাও যথাসম্ভব দ্বীপ দখলের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে পড়ল।

১৮৫২ থেকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা ও বণিকেরা হাউইদ্বীপপুঞ্জে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা সামোয়া দ্বীপের প্যাগো-প্যাগো স্থানটির অধিকার পায়। কেন না এই স্থানটি তারা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ব্যবসা-কার্য্যের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করে এসেছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মার্কুইস্ দ্বীপের ওপর ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নিউ ক্যালিডোনিয়া দ্বীপের ওপর অভিভাবক-প্রভুত্ব স্থাপন করে। এর কিছুদিন পরেই ফরাসী এবং ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থল হয়ে ওঠে নিউ হেব্রিডিস। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন একেবারে প্রকট হয়ে পড়ল তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী রাজনীতিকেরা মিলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থির করলে যে, ও দ্বীপের এলাকা নিরপেক্ষ থাক। ফরাসী এবং ব্রিটিশ জাতির মধ্যে এমন সৌখ্যভাব স্থাপিত হবার পর আবার এক সমস্যার উদ্ভব হলো—সে জার্ম্মানীকে নিয়ে। ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর বণিক-সমিতি শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ব্যবসায় চালাতে সুরু করল। এখানে আমাদের একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যের চারিটি প্রধান জাতির বাণিজ্য-স্বার্থ একে অন্যকে দাবিয়ে রেখে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তারিখের জার্ম্মান-সামোয়া চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানী ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার পেলে, আর সামোয়ার স্বাধীনতা মেনে নিলে। জার্ম্মান-সামোয়ার চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানী সালুয়াফাটা নামক একটি বন্দর পেলে শুধু বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার জন্য। সম্ভবত এই প্রথম পত্তন—জার্ম্মানীর ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে। যাই হোক জার্ম্মানী বসে নেই, ইতিমধ্যেই ক্যারোলাইনা, মার্শাল, নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে রীতিমত জার্ম্মান অর্থ ও স্বার্থ যুগপৎ কাজ করতে লাগল।

যখন প্রশান্ত মহাসাগরে এই সব স্বার্থের খেলা চলছে, তখন জার্ম্মানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন বিসমার্ক। তিনি নিজে এই সব উপনিবেশ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু যখন দেখলেন যে দেশের অর্থ ও স্বার্থ দুটোই উপনিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়েছে—তখন আর কি করেন। বাধ্য হয়েই তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হলেন। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপ

উনত্রিশ

ক্রোধে আক্রোশে শ্রীহরি পাগল হইয়া উঠিল। তাহার সখের বাগান। ওই বাগানটির মধ্যে শ্রীহরির অন্তরাত্মা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছিল। অতীত দিনের চাষী ছিরুর সৃষ্টির নেশার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের আভিজাত্যকামী শ্রীহরি ঘোষের কল্পনা মিশিয়া ওই বাগান রচিত হইয়াছিল—তরি-তরকারীর গাছ ও ফলমূলের মূল্যবান কলমের চারার সমন্বয়ে দুই-চারিটা ফুলের গাছও ছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল—গাছগুলি বেশ একটু বড় হইলেই—কতকগুলি গাছের গোঁড়া বাঁধাইয়া বসিবার বেদী তৈয়ারী করাইবে। একটি ছোটখাটো সৌখিন ঘরের কল্পনাও ছিল। ঘরের কোলে খানিকটা বাঁধানো চত্বর—চত্বর হইতে নামিয়া যাইবে একটি বাঁধানো ঘাট; সেই কল্পনায় কাঁচা ঘাটটির দুইপাশে দুইটা কনক চাঁপার গাছ, গোটা কয়েক বকুল ফুলের চারাও সে পুঁতিয়াছিল। অশ্বত্থমা যেমন পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি আক্রোশে পাণ্ডবশিশুগুলিকে হত্যা করিয়াছিল—তেমনি ভাবেই অনিরুদ্ধ গাছগুলিকে নির্ম্মম আক্রোশে কাটিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীহরি প্রতিহিংসায় ক্রোধোন্মত্ত ভীমের মত ভয়ঙ্কর হইয়া আপনার মাথার চুল ছিঁড়িয়া অধীর অস্থির হইয়া উঠিল।

থানায় খবর দেওয়া হইয়াছিল। তদন্ত একটা হইয়া গেল। শ্রীহরির সন্দেহ অনেককে। দেবু ঘোষ সদ্য সদ্য বিবাদ করিয়া তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে। শুধু ত্যাগ করিয়াছে নয়—তাহার বিরুদ্ধে প্রজা-ধর্ম্মঘট বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে।

অনিরুদ্ধ তাহার চিরশত্রু।

পাতুও তাহার শত্রু। একটা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য মুচি—সেও তাহার সহিত শত্রুতা করিতে সাহস করে।

জগন ঘোষ ডাক্তার, অক্ষম দরিদ্র দাম্ভিক লোকটা—চিরদিন তাহাকে খাটো করিতে চায়।

আর ওই অজাতশত্রু—বালক—ওই নজরবন্দীটা। ও লোকটা আছেই। এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। হাতে-কলমে এ কাজ যেই করিয়া থাক—যোগাযোগে যাহারাই থাক—সর্ব্বপ্রথমে আছে ওই ছেলেটা, কাঁটাগাছের কাঁটা নিঃশেষ করিতে গেলে—কাঁটা ভাঙিয়া করা যায় না, শাখাপ্রশাখা কাটিলেও আবার গজায়, গোড়া হইতে কাটিলেও আবার জন্মায়, মাটির ভিতরে থাকে যে মূল—সে মূলের গায়ে কাঁটা থাকে না, অথচ সকল কাঁটা তাহারই সৃষ্টি। ওই ছেলেটা সেই কাঁটা!

পুলিশ সকলকেই ডাকিয়া অনেক জেরা করিল, কথার লাঞ্ছনা অনেক হইল। অনিরুদ্ধ, পাতু, দেবু ঘোষের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। প্রত্যেকের বাড়ীতেই কুড়ুল কাটারি লইয়া বেশ করিয়া দেখিল; কিন্তু যতীনকে একটা কথা বলিতেও পুলিশের সাহস হইল না। দেবু ঘোষ, অনিরুদ্ধ ও পাতু মুচীকে আসামী করিয়া ফৌজদারি মামলা দায়ের করিতে পরামর্শ দিয়া জমাদার বিদায় লইল।

শ্রীহরি মামলা দায়ের করিতে না করিল না, কিন্তু মামলা দায়ের করিয়া তাহার ক্ষোভ একবিন্দু মিটিল না। ইহাদের সাজা কল্পনা করিয়াও তৃপ্তি পাইল না। শাখা-প্রশাখা কাটিয়া কাঁটা কবে শেষ হয়? মূল থাকিলে নূতন কাণ্ড, নূতন শাখা গজায়, ফুল হয়, ফল হয়; ফলের বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মায়।

*

সেদিন সকাল হইতেই বাদলাটা কাটিয়া গিয়াছিল। আষাঢ়ে কর্কটক্রান্তি সমীপবর্ত্তী সূর্য্য একেবারে মাথার উপর প্রখরতম দীপ্তি লইয়া উঠিয়াছে। ভিজা মাটির উপর রৌদ্রের দারুণ উত্তাপে যেন তাপ উঠিতেছে। সখের বাগানটির দুর্দ্দশার দুঃখের উপর প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তাপে শ্রীহরির মনেও এমনি গুমোটের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পথের কাঁটা নির্ম্মূল করিবার উপায়ের কথাই সে ভাবিতেছিল। ছিরু পাল হইলে সে—অন্ধকারে গোপনে—ওই সব কয়জনকেই সাজা দিতে পারিত; শেষ করিয়া দিবার ক্ষমতা উন্মত্ততা ছিরুর ছিল। কিন্তু শ্রীহরি পালের বিবেচনা তাহাকে বাধা দিতেছে। আইন-আদালত, মান-সম্ভ্রম, অনেক যুক্তিতর্কই সে তুলিতেছে। কত দৃষ্টান্ত সে হাজির করিল।

শিবকৃষ্ণবাবু জমিদার গ্রাম পোড়াইয়া প্রজা শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজে সে সময় ছিলেন কলিকাতায়। একবার নয়—তিন-তিনবার গ্রামখানা পোড়াইয়াছিলেন। শ্রীহরিও তাহা পারে। শ্রীহরির ঘর টিনের।

নন্দলাল সিংহ—কৃত্তিবাস ঘোষকে খুন করাইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস ছিল অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রজা। নন্দলালবাবুর ডাকাতের

দল ছিল। ডাকাতির সম্পদে তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। শুধু নন্দলালবাবু কেন? এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমিদারেরই তো এই প্রবাদ আছে। বাড়ীর চারিপাশে প্রাচীন কালের ডাকাতদের বংশধরগণের বসতি আজও রহিয়াছে। সেকালে তাহারা ছিল ডাকাত, তারপর তাহারা হইয়াছিল লাঠিয়াল, এখন তাহারা চাষী। শ্রীহরির কালু সেখ আছে।

আগুন লাগাইলে দেবু ঘোষের ঘর পুড়িবে, অনিরুদ্ধ গৃহহীন হইবে, পাতুর ঘরের চালের তালপাতাগুলা পুড়িয়া যাইবে, কিন্তু যতীন?

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল—জমিদারের নায়েব। শ্রীহরি আশ্বস্ত হইল—সে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসাইয়া বলিল—এর প্রতিবিধান করতেই হবে চাটুজ্জে মশায়, নইলে গ্রাম ছেড়ে আমাকে কাশী যেতে হবে।

নায়েব হাসিয়া বলিল—কাশী যাবে? কেন? ক'টা গাছ কাটার দুঃখে? রাম! রাম! রাম! তোমার কাটাগাছ আবার গজাবে ঘোষ—ভাবছ কেন তুমি? গায়ের চাদরখানার আবরণের ভিতর হইতে সে একটা কাগজের পোঁটলা বাহির করিল। একখানা কাগজের ভাঁজ খুলিয়া শ্রীহরির সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিল—এই দেখ।

শ্রীহরি দেখিল—দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধ কর্ম্মকারের জোত নীলাম হইয়াছে, নীলাম খরিদ্দার স্বয়ং জমিদার, আদালত অনিরুদ্ধের জোত জমিদারের অনুকূলে দখল দিবার অনুমতি দিয়াছে।

নায়েব আর একখানা কাগজ খুলিল—এ-খানা জগন ঘোষের জমি দখলের হুকুমনামা।

তৃতীয়খানা পাতু মুচীর চাকরাণ জমির উচ্ছেদপত্র।

অপরখানা—গদাই পালের।

নায়েব হাসিয়া বলিল—আদালতের লোক কঙ্কনার কাছারীতে বসে আছে। এখন দখল নেবার ব্যবস্থা কর। আর ওদিকের খবরও পাকা। এইবার একজন পাকা কর্ম্মচারী বাহাল কর—নইলে সামলাতে পারবে না তুমি। মন্ত্রী না হ'লে রাজ্য চলে না ঘোষ। দাবা খেলা জান? মন্ত্রী হ'ল প্রধান বল। রাজা তো বসে থাকবে, ভোগ করবে। মন্ত্রী দুধে জ্বাল দেবে, সর পড়বে, রাজার মুখে তুলে দেবে।

শ্রীহরি নায়েবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আপনি আসুন চাটুজ্জে মশায়—

—না। হাসিয়া নায়েব বলিল—না। পুরনো বাড়ী আমার, ভাঙনের সময়। এ সময় আমার আসাটা ভাল হবে না ঘোষ। তা ছাড়া, এ সময় ও বাড়ী থেকে আমারও পাওনার সময়। আমি আমার জামাইকে দেব তোমাকে। দেবু-টেবু—

—দেবু? দেবু ঘোষকে আমি দূর ক'রে দিয়েছি চাটুজ্জে মশায়। সে এখন গ্রামের লোককে উস্কে ধর্ম্মঘট করাবার উদ্যুগ করছে। শ্রীহরি সাপের মতই গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেইদিন অপরাহ্ণেই মাঠে ঢোলের শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোক ছুটিয়া বাহির হইয়া দেখিল—মাঠের এখানে ওখানে—লালপতাকা পুঁতিয়া ঢোলসহরৎ করিয়া জমিদারের লোক জমি দখল করিতেছে, সঙ্গে আদালতের কর্ম্মচারী; শ্রীহরিও কালু শেখকে সঙ্গে করিয়া হাজির আছে।

বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েরা কাঁদিতেছে। নিকটতম প্রিয়জনের মৃত্যুতে যেমন করিয়া কাঁদে তেমনি করিয়া কাঁদিতেছে। পুরুষেরা স্তব্ধ বিষণ্ণ মুখে সকলে একস্থানে জুটিয়া বসিয়া আছে। যতীনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার ভিতরটা যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। আদর্শের অবমাননায় নয়, বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির ক্ষোভে নয়, তাহার আজিকার দুঃখ-জ্বালা আত্মীয়তুল্য অন্তরঙ্গ মানুষ কয়টির প্রতি অত্যাচারের জন্য; এ দুঃখ এ জ্বালা অনিরুদ্ধ পাতু জগনের দুঃখ জ্বালার ভাগ।

দেবু ঘোষ বলিল—উপায় আমি এক্ষুণি করতে পারি। কিন্তু আমি হয়েছি বে-হাত।

যতীন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিল।

দেবু বলিল—নীলেম রদের মামলা করলে নীলেম রদ হবেই। কিন্তু আমার যা কিছু সম্বল ছিল—আমি লোককে ধার দিয়ে বসে আছি। হাত আমার খালি। টাকা তো চাই।

—কত টাকা?

—টাকা অনেক। মামলার খরচ আছে, তারপর ধরুন এক মাসের মধ্যেই ডিক্রীর টাকা সমস্ত কোর্টে দাখিল করতে হবে। অনিরুদ্ধের ধরুন একশো পঞ্চান্ন টাকা, ডাক্তারের দুশোর ওপর, গদাইয়ের বোধ হয় সোত্তর কিম্বা আশী, আর পাতুর অবশ্য দাবী নাই—কাজ করে না ব'লে চাকরাণ উচ্ছেদের মামলা। কিন্তু পাতুর মামলাতেই খরচা বেশী। পাতুকে মামলা করতে হবে—জমি আমাকে রায়তী স্বত্বে দেওয়া হোক—চাকরাণের কাজের যা দাম—সেই খাজনা ধার্য্য করা হোক। এতেই বুঝুন কেনে—কত টাকা দরকার।

দাখিল করিতে হইবে পাঁচশো টাকা। তাহার উপর মামলা খরচ। সকলেই আপন আপন সামর্থ্য হিসাব করিয়া কেবল একটা করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল।

দেবু বলিল—ডাক্তার, এক কাজ কর। নীলেম রদের মামলা দায়ের ক'রে বল—শ্রীহরির বাড়ী আমি চিকিৎসা করি—চিকিৎসার পাওনা থেকে খাজনার চেক দেওয়ার কথা ছিল—

জগন বাধা দিয়া বলিল—সে ছোটলোকী আমি করতে পারব না। তাতে আমার জমি ফিরুক, আর নাই ফিরুক।

যতীন প্রশ্ন করিল—এখনো মামলা দায়ের করতে কত লাগবে বলুন। বাকী টাকা তো আজই লাগছে না। একমাস পরে লাগবে, সে ব্যবস্থা পরে হবে।

দেবু হিসাব করিয়া বলিল—গোটা চল্লিশেক ধরুন।

—চল্লিশ টাকা ?

—কে কি দিতে পারবেন বলুন ?

জগন বলিল—আমার টাকা আমি দোব। মনে-মনে সে কয়েকটা বাসন বিক্রীর ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। কিন্তু অপর সকলেই চুপ করিয়া রহিল। বর্ষার খাদ্য হিসাবে কিছু কিছু ধান ছাড়া কাহারও কিছু নাই। পাতুর তাও নাই। মজলিসটা স্তব্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে যতীন বলিল—আচ্ছা, আমাকে এখানে কেউ বিশ্বাস ক'রে চল্লিশটা টাকা ধার দেবে না ?

কেহ কোন উত্তর দিল না।

বর্ষার গুমোটে ভরা অন্ধকার রাত্রি। পল্লবঘন জঙ্গল সম্মুখে জমাট অন্ধকারের মধ্যে থম থম করিতেছে। জঙ্গলের ভিতরে অসংখ্য পতঙ্গ ও সরীসৃপের শব্দ। ইহারই মধ্যে মানুষ কয়টি দিশাহারার মত বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর দেবু বলিল—দেখ চেষ্টা ক'রে, তারপর যা হয় হবে। আজ রাত অনেক হ'ল।

সে মনে মনে স্থির করিল, তাহার নিজের জমি বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিবে। ভুল তো তাহারই। সেই তো ছিরুকে শ্রীহরি করিয়াছে। অনিরুদ্ধ, জগন, পাতুকে শাসন করিয়া গ্রাম্য শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সে নিজেই তো এই গোপন নীলামের ব্যবস্থা করিয়াছে। দায়িত্ব তো তাহারই। উঠিবার কথা বলিয়াও সে-ই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সকলে চলিয়া গেল, অনিরুদ্ধ বাড়ীর মধ্যে গেল, যতীন বলিল—আর কিছু বলবেন দেববাবু ?

—বলব ? একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দেবু বলিল—অন্যায় পথে ন্যায় করা যায় না যতীনবাবু।

যতীন হাসিল। দেবু আর কিছু না বলিয়া আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল।

•

যতীনের রুটি গড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া—অনিরুদ্ধের ভাত বাড়িয়া পদ্ম বসিয়া ছিল। জমি নীলাম হইয়া যাওয়ার জন্য তাহারও দুঃখের সীমা ছিল না, সেও আজ শোকার্তের মত কাঁদিয়াছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাহার মনে সে চিন্তা ছিল না। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—প্রত্যেক লোকটির উপর। তোদের জমি গিয়াছে তো ওই দুধের ছেলে করিবে কি ? রোগা শরীর—তাহার উপর এ কি অত্যাচার ? আবার যদি অসুখ হয় তো কি হইবে ?

অনিরুদ্ধ বাড়ীর ভিতরে আসিতেই সে বলিল—আচ্ছা বিবেচনা যা হোক তোমাদের। রোগা মানুষ নিয়ে—

অনিরুদ্ধ কথা না শুনিয়া গোয়াল ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল। পদ্ম বিরক্তিভরে বলিল—দিয়েছি, দিয়েছি, মোষকে খেতে দিয়েছি।

অনিরুদ্ধ উত্তর দিল না। পদ্ম এবার যতীনের ঘরের দুয়ারে আসিয়া বলিল—বলি আর খাবে কখন ?

দেবুও তখন চলিয়া গিয়াছে। যতীন একাই বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল—যাই।

পদ্ম গজগজ করিতে করিতে ঠাঁই করিয়া দিয়া জল আনিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখিল, অনিরুদ্ধ মহিষ দুইটাকে লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—ওই—এত রাতে মোষ নিয়ে—

অনিরুদ্ধ হিংস্র জানোয়ারের মত চাপা গর্জ্জন করিয়া বলিল—চোপ। সে মহিষ দুইটাকে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল। গভীর আক্রোশে অক্ষমের উপযোগী প্রতিশোধ লইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। এই রাত্রির অন্ধকারে সে মহিষ দুইটাকে দিয়া শ্রীহরির বীজ ধানের চারা খাওয়াইয়া নষ্ট করিবে।

পদ্ম কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধের প্রতি অভিমান আজকাল তাহার বড় হয় না। কিন্তু আজ সে রাগ না করিয়া পারিল না। তাহাকে কিছু না বলিয়াই না খাইয়া চলিয়া যাওয়ায় আজ সে আঘাত অনুভব করিল। নিজের ভাতগুলা সে মহিষের ডাবায় ফেলিয়া দিল। অনিরুদ্ধের ভাত ঢাকা দিয়া রাখিল। পদ্ম বেশ জানে, অনিরুদ্ধ রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া রাত্রিতেই আবার ফিরিবে। শুইয়াও তাহার ঘুম আসিল না। অনিরুদ্ধের ফিরিবার শব্দের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

খুট! খুট! ঝুন! ঝুন!

দরজায় শব্দ হইতেছে। পদ্ম ধড়মড় করিয়া উঠিল। নিঃশব্দে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। যতীনের গলার শব্দে সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—কে ?

—আমি বাবু।

—কে? দুর্গা?

—হ্যাঁ। দরজাটা একবার খোলেন?

পদ্মের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার বাড়ীর মধ্যে এই ব্যাভিচার? চোখ দুইটা অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিল, পূর্ব্বে তাহার মূর্চ্ছার ব্যারামের সময় মাথার মধ্যে যে যন্ত্রণা হইত সেই যন্ত্রণায় সে অধীর হইয়া উঠিল। সে দ্রুত উপরে উঠিয়া গিয়া তাহার শিয়রে যে দা খানা থাকিত সেইখানা লইয়া ফিরিল।

*

যতীন দুয়ার খুলিয়া দিল। সে আজ দুর্গাকে কঠোরতম কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই দুয়ার খুলিল। মনের মধ্যে এতটুকু করুণাও তাহার আজ ছিল না। দুয়ার খুলিয়া দিয়া সে কঠোর দৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চাহিল। দুর্গা তাহার সে দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়াও কিন্তু ভয় পাইল না। কেবল অপরাধীর মত একটু হাসিল। যতীন দেখিল—এ দুর্গা গত রাত্রির সে দুর্গা নয়। তাহার চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত, কাপড় আধ-ময়লা দেহের কোথাও এককণা প্রসাধনচিহ্ন নাই; চোখের দৃষ্টিতে বিনয় আছে, মিনতি আছে, কিন্তু লজ্জা নাই।

দুর্গা বলিল—আমার কিছু টাকা আছে বাবু, তাই—

—টাকা?

—দাদা বলছিল—আপুনি টাকা ধারের লেগে বলছিলেন—ছিরু পালের সঙ্গে মামলা করবেন।

যতীনের মনে পড়িল। সে অবাক হইয়া দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা সবিনয়ে বলিল—বাবু!

—এ্যাঁ?

—আপুনি এখন লেন। আবার আমাকে দেবেন।

যতীন এবার দুই হাত পাতিয়া বলিল—দাও।

দুর্গা আঁচল উজাড় করিয়া টাকাগুলি ঢালিয়া দিল। ঢালিয়া দিয়াই সে চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিল। কিন্তু দুয়ার হইতেই চমকিয়া উঠিয়া পিছাইয়া আসিয়া শঙ্কিত স্বরে যতীনকে বলিল—নোক!

—লোক?

—বাইয়ে রাস্তায় নোক দাঁড়িয়ে আছে।

যতীন অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল—কে?

কঠিন কর্কশ স্বরে উত্তর হইল—তোর বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ক্ষিপ্রগতিতে যতীনকে অতিক্রম করিয়া দরজাটা ছড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—কালু শেখ!

—কালু শেখ তো ভয় কি?

ওদিকে কালু শেখ দরজায় সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিল—খোল্—শালা দরজা খোল্! মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ! খোল্—দরজা খোল্।

যতীন ঘরের চারিদিক সন্ধান করিয়া দেখিল—কোথাও আত্মরক্ষা করিবার মত একটুকরা কাঠ পর্য্যন্ত নাই।

—ভাঙ দরজা ভাঙ!

এ কণ্ঠস্বর শ্রীহরির।

—খোল্ দরজা খোল। এ দিকের দরজায় পদ্ম ডাকিল।

মুহূর্ত্তে যতীন দরজা খুলিয়া দিল। খুলিয়াই সে সভয়ে বিস্ময়ে পিছাইয়া আসিল। অসম্বৃতবাসা পদ্ম—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি চোখে—হাতে তাহার শাণিত দা। দাখানা ঘরের আলোতে ঝকমক করিয়া উঠিল।

ওদিকে বাহিরের দরজায় আঘাতের উপর আঘাত পড়িতেছে। কয়েকটা আঘাতের পরই দরজাটা ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। বাহিরে আলো হাতে শ্রীহরি—সঙ্গে কালু।

পদ্ম মুহূর্ত্তে দাখানা আন্দোলিত করিয়া পাগলের মত বলিয়া উঠিল—আয়! আয়! আয়!

সভয়ে শ্রীহরি পিছাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কালুও লাফ দিয়া দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। ওই সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে—আন্দোলিত দায়ের সম্মুখে প্রবেশ করা অসাধ্য—অসম্ভব! তাহা ছাড়াও পদ্মের ওই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অসম্বৃত বাস—অর্দ্ধ নগ্ন মূর্ত্তির মধ্যে এমন কিছু ছিল—যাহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না।

যতীন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পদ্মের এই অর্দ্ধোন্মাদ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। উন্মত্ত আবেগে সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অর্দ্ধনগ্ন দেহ। চোখ দুইটা অস্বাভাবিক দীপ্ত, সে চোখের দৃষ্টির মধ্যে চেতনা পর্য্যন্ত নাই। যতীন বেশ বুঝিল যে এখন সামান্য মাত্র স্পর্শে সে পড়িয়া যাইবে, কিন্তু তবু পদ্মের সম্মুখে এখন যাওয়া অসম্ভব। তাহার বিচার নাই, বিবেচনা নাই—সম্মুখে যাহাকে পাইবে তাহাকেই সে হত্যা করিয়া বসিবে; আত্মরক্ষার প্রেরণা পর্য্যন্ত তাহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—আত্মরক্ষার উপযোগী বর্ম্মাচ্ছাদিত কৌশলী শত্রুর সম্মুখেও সে এক পা পিছু হটিবে না। সম্মুখের শত্রু—কালু শেখ ও শ্রীহরি ঘোষ চলিয়া গিয়াছে, তবু তাহার দাখানা লইয়া শূন্যে আঘাত হানার বিরাম নাই।

সহসা সম্মুখের উন্মুক্ত দরজাটা বাতাসে দুলিয়া খানিকটা সরিয়া আসিল—পদ্মের হাতের দাখানা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে

দরজার কাঠে গভীর হইয়া বসিয়া গেল; পদ্ম আর সে দাখানা তুলিতে পারিল না। সেই মুহূর্ত্তেই যতীন অগ্রসর হইয়া পদ্মকে ধরিয়া ফেলিল। পদ্মের দেহখানা কাঠের মত ভারী শক্ত। যতীন ডাকিল—মামণি—মামণি!

পদ্ম উত্তর দিল না। যতীন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল—তাহার সংজ্ঞা নাই, চোখের দৃষ্টি স্থির, দাঁতে দাঁতে সাঁড়াশির মত লাগিয়া গিয়াছে। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—দুর্গা! দুর্গা! জল! জল!

*

জমাদার দারোগা দুজনেই শ্রীহরিকে বলিল—কাজটা অন্যায় করেছ ঘোষ। দরজা ভাঙতে যাওয়া তোমার উচিত হয় নাই। বরং শেকল দিয়ে বন্ধ করে আমাদের যদি খবর দিতে তো ঠিক হ'ত!

শ্রীহরি কথাটা বুঝিল।

দারোগা বলিল—চেপে যাও ব্যাপারটা। তবে আমরা রিপোর্ট করছি। ছোকরাকে এখান থেকে সরিয়েও দেবে এটা ঠিক। কিন্তু—বড় সুযোগটা হাতছাড়া করলে হে!

সমস্ত গ্রামময়ই ব্যাপারটা লইয়া জটলা চলিতেছিল। পথে ঘাটে পুরুষ স্ত্রীলোক সকল মজলিসেই ওই কথা লইয়া আলোচনা।

শুধু দেবী ঘোষ বলিল—আমি বিশ্বাস করি না।

জগন ডাক্তার পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—ঘি আর আগুন, বিশ্বাস কর না বললেই হ'ল?

হরেন ঘোষাল বলিল—ভ্রষ্ট যোগী! This is the reason—যার জন্যে এসব successful হ'ল না!

দেবু ঘোষ তবুও বলিল—না।

আর বিশ্বাস করিল না—অনিরুদ্ধ। সে মহিষ লইয়া বীজ খাওয়াইতে গিয়া উদাস উদভ্রান্ত অন্তরে সমস্ত রাত্রি মহিষের পিঠে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ভাবিয়াছে—সে কি করিবে? অবশেষে মহিষ দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে নিজের সেই চার বিঘা জমির ভিজা মাটির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোর বেলায় ঘুম ভাঙিয়া যখন সে মহিষ দুইটার সন্ধান করিল—তখন সে দুইটাকে আর পাওয়া গেল না।

সে দুইটা তাহার অনেক পূর্ব্বেই রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই পূর্ণ উদর লইয়া বিশ্রামের প্রয়োজনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

অনিরুদ্ধ গ্রামে ঢুকিতেই তারা নাপিত তাহাকে প্রশ্ন করিল—রাত্রে ছিলি কোথা?

—কেনে?

—আগে তাই বল্ না কেনে শুনি?

—গিয়েছিলাম মরতে।

—মরতে গিয়েছিলি তো ফিরলি কেনে?

—হ'ল না মরণ।

তারা সবিস্তারে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বলিল—গাঁয়ে গেলেই শুনবি সব।

অনিরুদ্ধ বলিল—উ আমি বিশ্বাস করি না।

তারা বলিল—বিশ্বাস করবি—যখন জাতে পতিত করবে, তখন। ঘোষ সেই উদ্যুগ করছে। তামাম নবশাখার মজলিস করবে চণ্ডীমণ্ডপে।

অনিরুদ্ধ হাসিল—সমুদ্রে পেতেছি সয্যা শিশিরে কি ভয়। ওরে—আমি গাঁ থেকে উঠে চলে যাব। গাঁ থেকে উঠে চলে যাব।

কথাটা তাহার হঠাৎ মনে হইয়া গেল। গ্রাম সমাজ সে সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

তারা প্রশ্ন করিল—কোথা যাবি?—

—জংশনে! জংশনে! এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া অনিরুদ্ধ বলিল—জংশনে। পঞ্চায়েৎ নাই, জমিদার নাই, গমস্তা নাই,—বাস্—ওই জংশনেই সে যাইবে। পিতৃপুরুষের বৃত্তি গিয়াছে, মাটি গিয়াছে—কিসের জন্য সে এখানে পড়িয়া থাকিবে?

তারা মুখরোচক সংবাদটা গ্রাম গ্রামান্তরে দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

প্রাচ্যের রণাঙ্গন

বহু বিক্ষোভ এবং রক্তপাত, অগ্রগমন এবং পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়া সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ বর্ত্তমানে অষ্টম সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াছে। সামরিক নীতি এবং রণ-কৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে যে পক্ষ যতখানি কৃতিত্বের অধিকারী হউক না কেন, মোটের উপর যুদ্ধের গতি যে মিত্রশক্তির অনুকূলে নহে ইহা আর অস্পষ্ট নাই। মালয়ে সিঙ্গাপুর অভিমুখে অগ্রসরমান জাপ-বাহিনী প্রচুর রণসম্ভার ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্ত যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। পেনাং, ইপো, কুয়াণ্টান, কুয়ালালামপুর—প্রত্যেক স্থানে বৃটিশ-বাহিনী শত্রুপক্ষের প্রবল চাপে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মালাক্কার দক্ষিণে মুয়াম নদী অতিক্রম করিয়া জাপ-বাহিনী সিঙ্গাপুর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী বাটু পাহাৎ অধিকার করিয়াছে। আয়ের হিতাম হইতে কুলাং পর্যন্ত ত্রিশ মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে বর্ত্তমানে বৃটিশ-বাহিনী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে।

জাপ-বাহিনীর মুয়াম নদী অতিক্রমের যে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বর্ত্তমানে উন্নত প্রণালীর যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে ভৌগলিক বাধা যে বিশেষ কার্যকরী নয় ইহা কাহারও অজানা নাই। রুশিয়ার বিস্তৃত রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্ত যে বহু নদী ভাসমান সেতুর সাহায্যে অতি অল্প সময়েই অতিক্রম করিয়াছে ইহাও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু রয়টার প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা মুয়াম নদী পার হইয়াছে নৌকার সাহায্যে! সংবাদটির গুরুত্ব অস্বীকারের উপায় নাই। মালাক্কা প্রণালীর বৃটিশ রণতরীকে উপেক্ষান্তে জাপসৈন্ত যখন ভাসমান সেতুর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া মুয়াম নদীতে খেয়াপার হইল তখন মালাক্কা প্রণালীতেও যে জাপ নৌবহরের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা আরম্ভ হইয়াছে অথবা বৃটিশ নৌবহরকে যে প্রভুত্ব রক্ষায় সাফল্যজনক বাধা প্রদানে জাপান সক্ষম হইয়াছে এই ধারণা অযৌক্তিক নহে। সম্প্রতি আবার সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণে বঙ্গোপসাগরে মিত্রপক্ষের বাণিজ্য

জাহাজ সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। সংবাদটিতে আশু চাঞ্চল্যের বিশেষ কোন কারণ না থাকিতে পারে, গত মহাযুদ্ধে 'এমডেন'ও বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল ইহাও সত্য, তবুও জাপ সাবমেরিন যে বঙ্গোপসাগরেও তৎপর হইবার এবং ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের জলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধেও মিত্রশক্তি উপযুক্ত সমরোপকরণ এবং সৈন্য সংখ্যার অভাবে প্রবল বাধা দান সত্বেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইতেছে। ট্যাভয়ের বিমান ঘাঁটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, মৌলমেন-এ প্রবল বোমা বর্ষিত হইয়াছে, জাপ-বাহিনী সাঁড়াশির আকারে মৌলমেনের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সচেষ্ট। রেঙ্গুনেও যথেষ্ট বোমা বর্ষিত হইয়াছে। জাপান জানে, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, রেঙ্গুন দখল তাহার একান্ত প্রয়োজন। রেঙ্গুন হস্তগত করিতে পারিলে শুধু যে রেঙ্গুন-সিঙ্গাপুরের জলপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতেই সে সক্ষম হইবে তাহাই নহে, চীনের যুদ্ধেও তাহার জয়লাভের পথ প্রশস্ততর হইবে। বহির্জগত হইতে চীনকে সাহায্য প্রেরণের একমাত্র পথ বর্তমানে চীন-ব্রহ্ম রাজপথ। রেঙ্গুন অধিকার করিতে পারিলে উক্ত পথে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করা জাপানের পক্ষে যথেষ্ট সহজ হইবে। দূরদর্শী চিয়াং-কাই-শেক বহু পূর্বেই এই ধরণের বিপদের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া চীনের সহিত তিব্বতের সংযোগ

হইতে অষ্ট্রেলিয়ার দূরত্ব দুই হাজার মাইলেরও কম। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন নৌঘাঁটি ও বন্দর ডারউইন, সিড্‌নি, মেলবোর্ন, হোর্বার্ট, ব্রিসবেন ইত্যাদির মধ্যে ডারউইন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম ঘাঁটি। কিন্তু প্রাচ্যের বৃহত্তম ঘাঁটি সিঙ্গাপুর এই সকল বিভিন্ন ঘাঁটির প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ। আবার নিউ গিনি হইতে ডারউইনের দূরত্ব অতি অল্প। সুতরাং জাপবাহিনী যদি সিঙ্গাপুর অবরোধ করিতে পারে এবং নিউ গিনিতে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অভূতপূর্ব সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য।

সম্প্রতি জেনারেল ওয়াভেলের উপর সুদূর প্রাচ্যের সংগ্রামের সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং চীন, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের সংগ্রামের ভার প্রদান করা হইয়াছে মার্শাল চিয়াং-কাই শেকের হাতে। চীন ও মার্কিন-বাহিনী একযোগে থ্যাইল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে, বৃটিশ-বিমান হইতে ব্যাঙ্ককে বোমা বর্ষিত হইয়াছে, মালয় এবং ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য বহু চীনা সৈন্য আনীত হইয়াছে। কিন্তু অভাব রহিয়াছে সমরোপকরণের। যুদ্ধরত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা বার বার বিমান ও ট্যাঙ্কের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছে, সমর সমালোচক য়্যানালিষ্ট সেদিনও বলিয়াছেন, উপযুক্ত সংখ্যক বিমান এবং সমরোপকরণ থাকিলে মালয়ের যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হইত। কিন্তু সে অভাব আজও মিটে নাই। অনুপযুক্ত সমরোপকরণ ও সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতার কারণস্বরূপ জানান



অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর দিকের মানচিত্র

সাধনার্থে অপর একটি নূতন পথ নির্মাণ করাইতেছেন, কিন্তু তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

এদিকে বোর্নিওর পূর্ব উপকূলে বালিক পাপানে জাপসৈন্য অবতরণ করিয়াছে। নিউ গিনি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জেও বহু জাপসৈন্য অবতরণ করিয়াছে। রাবাউলের সহিত যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের চাপে অষ্ট্রেলিয়া-বাহিনী কর্ত্তৃক "জে" পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিয়েতা জাপানের হস্তগত, সোলোমন ও বুকা দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী পথেও জাপ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া যে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন ইহা অস্বীকার করা চলে না। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা ও প্রবল প্রতি-আক্রমণের উপর দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। সিঙ্গাপুর

হইয়াছে যে, বিভিন্ন রণক্ষেত্রে একই সময়ে মাল প্রেরণের প্রয়োজন থাকায় যথোপযুক্ত রণ-সম্ভার সুদূর প্রাচ্যে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। বৃটিশ পার্লামেণ্টেও সুদূর প্রাচীর যুদ্ধের অবস্থায় যথেষ্ট অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। এদিকে মালয় ও পার্ল পোতাশ্রয়ের যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থার জন্য উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের শৈথিল্য ও অবহেলাকেই দায়ী করা হইয়াছে। আবার কয়েকদিন পূর্বে কর্নেল নক্স জানাইয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষা আট্‌লাণ্টিকের গুরুত্বই অধিক এবং হিটলারই প্রধান শত্রু। নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করিতে পারিলেই জাপান আপনি পরাজিত হইবে। মোটের উপর সব জড়াইয়া প্রাচ্যের সংগ্রাম এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রাচ্য রণাঙ্গনের ভার প্রদান করা হইল জেনারেল ওয়াভেলের

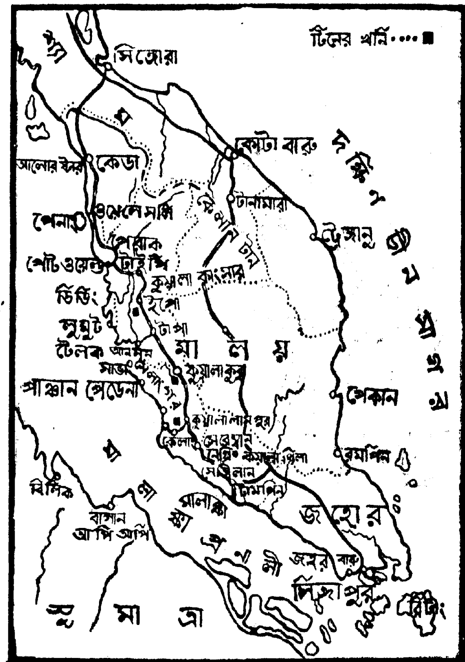
হস্তে। ওয়াভেলের দক্ষতা ও রণনৈপুণ্যে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নাই, কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে রণনৈপুণ্য প্রধান হইলেও যুদ্ধজয়ের একমাত্র উপায় নহে। তাহার জন্য প্রয়োজন অসংখ্য সৈন্য, প্রচুর রণসম্ভার, প্রভৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং বিভিন্ন অংশের শৃঙ্খলা এবং যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু জেনারেল ওয়াভেল এখনও সে সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পান নাই। তাহার উপর কর্ণেল নক্সের ঘোষণায় প্রশান্ত মহাসাগরের গুরুত্ব উপেক্ষিত হইয়াছে। ফলে অনেকের মনে এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, ওয়াশিংটনে মিত্রশক্তির সমরনায়কগণের আলোচনায় আটলান্টিকের যুদ্ধে গুরুত্ব আরোপ-কারী দলই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছেন। চুংকিং-এর সরকারী সংবাদপত্রে পর্যন্ত সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকার অবলম্বিত ব্যবস্থায় ক্ষোভের অভিব্যক্তি হইয়াছে। উক্ত পত্রের মতে আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরে বৃটেন ও আমেরিকা স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করার নীতি অনুসরণের ফলে শেষ পর্যন্ত হিটলার পরাজিত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচ্যে জাপানের হস্ত হইতে মিত্রশক্তি ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বজায় রাখিতে পারিবেন কি-না সন্দেহ। জার্মানীকে পরাজিত করিতে হইলে এক বিরাট স্থলবাহিনীর প্রয়োজন; কিন্তু জাপানকে পরাস্ত করার নিমিত্ত অতখানি শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োগের কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু এখন যদি জাপানকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি অধিকারের ও সেখানে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ প্রদান করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে জাপানকে দূরীভূত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য হইবে এবং হিটলারকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যেরূপ জল স্থল ও বিমান বাহিনীর বিরাট সন্নিবেশের প্রয়োজন, সুদূর প্রাচীতেও জাপানকে পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে সেইরূপ বিশাল বাহিনী ও সমরসম্ভারের প্রয়োজন হইবে। এইরূপ অবস্থায় মিত্রশক্তিকে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে দুইটি ব্যাপক যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন অনুভব করিতে হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বর্তমান অবস্থায় চীনের মতামতকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়, মিঃ কার্টিনও চীনের মতের উপর গুরুত্ব প্রদানে ইচ্ছুক। চীন যদি জাপানের কুক্ষীগত হইয়া পড়ে অথবা চীন স্বতন্ত্রভাবে জাপানের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করে তাহা হইলে শুধু যে জাপান অসম্ভব শক্তিশালী হইয়া উঠিবে তাহা নহে, প্রশান্ত মহাসাগরে রুশিয়ার যোগদানের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইবে। অপরপক্ষে, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপানের হাতে আসিলে বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরেও জাপ নৌবহরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন কি লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া মধ্য প্রাচীর সহিত রুশিয়ার যোগাযোগকেও সে বিপন্ন করিতে পারিবে।

বর্তমান যুদ্ধের গতি ও তাহার অবস্থা এবং যুদ্ধের এতাদৃশ অবস্থায় তাহার সুদূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিলাম, কিন্তু জাপানের শক্তিকে কিভাবে সাফল্যের সহিত বাধা প্রদান করা যাইতে পারে এবং জাপ ভবিষ্য যুদ্ধের গতি কোন্ পথে পরিচালিত হইবে সে সম্বন্ধে এখনও আমরা কোন ইঙ্গিত করি নাই। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর যে-কোন রণাঙ্গনের যুদ্ধকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে ভুল হইবে; স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বর্তমান যুদ্ধ অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠালাভ এবং আদর্শবাদের যুদ্ধ এবং সেইজন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ গতিপথ বিচ্ছিন্নভাবে নির্দেশ করা শুধু অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক নয়, ভ্রমাত্মকও বটে। সুতরাং আমরা প্রথমে পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উভয় রণাঙ্গনের যুদ্ধের গতি ও তাহাদের ঐক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

রুশ-নাৎসী সংগ্রাম

রুশ-জার্মান যুদ্ধের গতি যে পরিবর্তিত হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কালিনিন পূর্বেই অধিকৃত হইয়াছে, তাহার পর দক্ষিণে কালুগা এবং পশ্চিমে মোঝাইস্ক রুশবাহিনী নাৎসী কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে মস্কোর ৬০ মাইলের মধ্যে আর একটিও জার্মান সৈন্য নাই। মোঝাইস্ক হস্তচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো অবরোধের শেষ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল। মস্কো জয়ের শেষ আশা বিলীন হইয়া গেল। ষ্ট্যালিন পূর্বেই বলিয়াছিলেন, নেপোলিয় মস্কোকে দেখিয়াছিলেন ধূমোদ্গারী ভস্মস্তূপরূপে, আর হিটলারকে মস্কোর আলোকচিত্র দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। জার্মানীর অতিরিক্ত দ্রুত সাফল্য দর্শনে বিহ্বল জনসাধারণের অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ইহা ষ্ট্যালিনের শূন্য দম্ভোক্তি অথবা অতিরিক্ত আশার অভিব্যক্তি; কিন্তু আজ আর ষ্ট্যালিনের উক্তিতে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রতি ঘণ্টায় রুশবাহিনী বিচ্যুত গ্রামসমূহ পুনরুদ্ধার করিতেছে, রিজেভ ও ভেলিকিলুকির মধ্যে রেলপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রুশসৈন্য রিজেভ পরিবেষ্টন করিয়াছে, স্মোলেনস্কে তাহারা প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতেছে, ভলদাই এলাকায় জার্মান সেনাপতি আর্নষ্ট কনরাড, স্বীয় বাহিনী সহ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, মস্কো-রিগা রেলপথ ও লেনিনগ্রাড, উক্রেন রেলপথে লালফৌজ বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। রুশ-

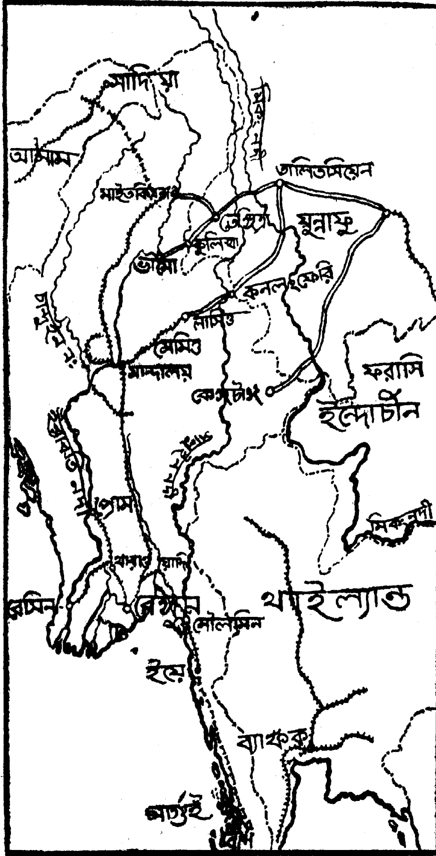


মালয়ের যুদ্ধক্ষেত্র

জার্মান যুদ্ধ-প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষ'-এর গত মাঘ সংখ্যায় জার্মানীর দৌর্বল্যের উল্লেখ আমরা করিয়াছি; বর্তমানে আমরা জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় এবং রুশিয়ার বিজয়লাভের কারণ কিঞ্চিৎ বিশদভাবে আলোচনা করিব।

রণনীতি ও সমরকৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানীর দাবী আদৌ উপেক্ষার নহে। কিন্তু তবু রুশিয়া নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে কেমন করিয়া? সৈন্য, রণসম্ভার, বিমান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি উপকরণে জার্মানী শুধু যে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তির অন্যতম তাহাই নহে, অন্যান্য যুযুধান শক্তির তুলনায় তাহার সামরিক শক্তির প্রাচুর্য যথেষ্ট। কিন্তু তবু রুশিয়ার বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ অভিযানে যথেষ্ট প্রাথমিক সাফল্য লাভ করার পরেও তাহার এই ক্রম-পরাজয়ে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক সময়ে সৈন্য ও সমরোপকরণই বিজয় লাভের পক্ষে যথেষ্ট

নহে, যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত আরও কিছুর প্রয়োজন। কিন্তু তাহা কি? নাৎসী সমরশক্তিকে এক বিরাট জটিল যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যন্ত্র যত বিশাল ও শক্তিশালী হউক না কেন, তাহার প্রতি অংশের সহিত অপর অংশের কার্যকরী সহযোগ থাকা অত্যাবশুক। ফ্যাসিস্ত ইটালী বিফল হইল ঠিক এই কারণে, সহযোগের অভাবে। কিন্তু জার্মানীর নাৎসী-যন্ত্রে রুশিয়া আঘাত হানিয়া বিকল করিল কোন্ শক্তিতে? রুশিয়ার আদর্শই এই সাফল্যের কারণ। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমরনীতিতে তাহার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। অর্থনীতির দিক দিয়া দেশের প্রতি ব্যক্তির সমান আর্থিক অধিকার সে



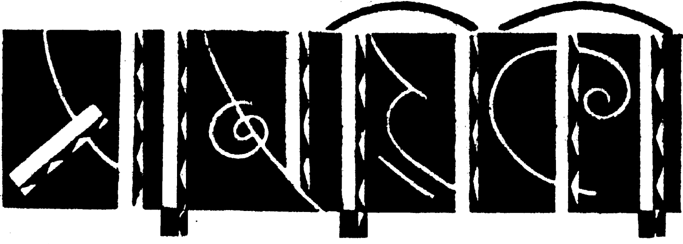
উত্তর ব্রহ্ম

অস্বীকার করে না, রাজনীতির ক্ষেত্রে সে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমরনীতির দিকেও সে প্রত্যেকের অস্ত্রধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে নাই। তাহারই ফলে আজ সে নাৎসী-বিরোধী যুদ্ধকে গণযুদ্ধে (People's war) পরিবর্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। রুশিয়ার প্রত্যেক অধিবাসী জানে যে, তাহার দেশ এবং তাহার স্বাতন্ত্র্য আজ বিপন্ন, তাহার যুদ্ধ আজ আত্মরক্ষার সংগ্রাম। নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে অপর যে দেশটি সাফল্যের সহিত আজও আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহাও এই গণযুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করায়। সার্দ্ধ চারি বৎসর ধরিয়া জাপশক্তির বিরুদ্ধে চীন আজিও এই গণ-যুদ্ধ এবং গরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দ্বারা আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ অভিযানকে বাধা প্রদানের নিমিত্ত এই গরিলা যুদ্ধেরই প্রয়োজন।

জাপ-পরাজয়ের সম্ভাব্য উপায়

জার্মানী এবং জাপানের বিরুদ্ধে রুশিয়া এবং চীন যে রণপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে, সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে জাপানের আক্রমণ সাফল্যজনকভাবে প্রতিরুদ্ধ করার নিমিত্ত মিত্রশক্তির পক্ষেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বনই বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের ধারণা। ১৯১৮ সালের রণ-বিজ্ঞান ১৯৪২ সালে অচল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান সংগ্রাম স্থিতি-যুদ্ধ (war of position) নহে, ইহা গতির যুদ্ধ (Dynamic or war of force) ; সংহত শক্তিতে অতর্কিতে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ ইহার বিশেষত্ব, এবং এই আক্রমণকে সাফল্যজনক ভাবে বাধা প্রদানের উপায় শত্রুবাহিনীর সংহতি, ঐক্য এবং যোগাযোগ বিনষ্ট করিয়া তাহার আক্রমণ বেগ প্রশমিত এবং শেষ চূড়ান্ত আঘাত হানা, এবং তজ্জন্য সংগ্রামকে গণযুদ্ধে পরিণত করাই প্রয়োজন। মিত্রশক্তির যথেষ্ট সমরোপকরণ সুদূর প্রাচীতে নাই সত্য, কিন্তু গরিলা যুদ্ধে প্রচুর ও অতি উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদির বিশেষ আবশ্যক করে না। গরিলা যোদ্ধৃগণের প্রয়োজন আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি, অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি। স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর মরণজয়ী এই শহীদের দল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে শত্রুপক্ষের অগ্রগতির পথে এবং পশ্চাতে শত্রুবাহিনীর বিভিন্ন যোগাযোগ কেন্দ্রের পথে গোপনে অবস্থান করে। জনসাধারণের সাহায্য ও তাহাদের প্রদত্ত সংবাদের উপর তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশকে অকলঙ্ক স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করে তাহারাই, ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট লজ্জাজনক জবাবদিহি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহারাই আপন শোণিতে কঠিন মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া সেইস্থানে স্বীয় স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করে। কিন্তু মালয় বা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা প্রশ্ন ওঠে—সেখানকার গরিলা বাহিনী প্রেরণা লাভ করিবে কোথা হইতে? রুশিয়া অথবা চীনের শহীদ দল জানে—নাৎসী জার্মান এবং জাপানই তাহার স্বাধীনতা রক্ষার পথে একমাত্র বাধা এবং সেই শত্রুকে জীবনের বিনিময়েও তাহারা জন্মভূমি হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু মালয় বা ব্রহ্মদেশে এই অনুপ্রেরণা প্রদানের ভার বৃটিশ সরকারের হাতে। দেশীয় লোকদের মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের দ্বারা গরিলা বাহিনী গঠিত হইলে জাপ অভিযান বাধা পাইতে বাধ্য। চীনা সৈন্য দ্বারা গঠিত গরিলা বাহিনী চীনদেশের বাহিরে প্রয়োজনানুরূপ কার্যকরী হইতে পারে না। কারণ, জন্মভূমি রক্ষার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও আরও এক বিরাট বাধা হইতেছে ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব। আক্রান্ত দেশের অধিবাসী দেশের বিভিন্ন পথ ঘাট, নদী, অরণ্য, পার্বত্য পথ, দেশের প্রতি অণু পরমাণুর সহিত যেরূপ পরিচিত, ভিন্ন দেশের বাহিনী সেরূপ অভিজ্ঞ হইতে পারে না। দেশীয় লোক যত সহজে আক্রান্ত অঞ্চলের অধিবাসীর বিশ্বাস, সহানুভূতি, আন্তরিকতা এবং সাহায্য লাভ করিতে পারিবে, বৈদেশিকগণের নিকট তাহা অতটা সহজলভ্য হইবে না। কিন্তু এই দেশীয় গরিলা বাহিনী সৃষ্টি করিতে হইলে বৃটিশ সরকারের প্রয়োজন তাহাদের মনে দেশাত্মবোধের জাগরণ আনায়ন, মুক্তির আদর্শের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদান, ইহাদের প্রতি বিশ্বাস, দরদ এবং সহানুভূতির দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধেও জাপানকে প্রকৃত গণ-যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আর একবার আমরা সুদূর প্রাচীতে চীন-জাপান যুদ্ধের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইতে দেখিব।

২৮-১-৪২



সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

গত ২৯শে জানুয়ারী দিল্লী হইতে সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে আদেশ জারি হইয়াছে, তাহা নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ আদেশ অনুসারে বহু সংবাদপত্র তাঁহাদের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মাসিকপত্র সম্বন্ধে ঐ আদেশের মধ্যে স্বতন্ত্র কিছু ব্যবস্থা না করায় আমাদিগকেও দারুণ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। যে ভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তদনুসারে ৮ আনা মূল্যের মাসিক পত্র সর্ব্বসমেত ১২৮ পৃষ্ঠার অধিক দিতে পারিবে না—মলাট, বিজ্ঞাপন, ছবি প্রভৃতিও ঐ ১২৮ পৃষ্ঠার মধ্যেই দিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে 'সি' শ্রেণীর কাগজের এক পৃষ্ঠা ২শত বর্গ ইঞ্চি বা তাহার কম হইবে। কিন্তু এদেশের মাসিক পত্রগুলির আকার যেরূপ ছোট (৭৫ বর্গ ইঞ্চি), তাহাতে তাহাদের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণী স্থির করিয়া পত্রের মূল্য স্থির করিলে শোভন হইত। কোন্ কাগজে ছাপিলে সেই পত্রিকা এই আইনের আমলে পড়িবে, তাহাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই। 'নিউজ প্রিণ্ট' বলিতে কি বুঝায় কোথাও তাহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহার সহিত মাসিকপত্রগুলির কোন সম্বন্ধ আছে কি-না, তাহা জানিবার জন্য নয়া দিল্লীতে তার করিয়াও আমরা কোন উত্তর পাই নাই। অগত্যা আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র আকার ছোট করিতে বাধ্য হইলাম। যদি 'ভারতবর্ষ' এই আইনের আমলে না পড়ে, তাহা হইলে আমরা পরে কাগজের আকার বড় করিবার ব্যবস্থা করিব। সহসা এই ভাবের অস্পষ্ট আদেশ জারির ফলে আমরা যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছি, আশা করি পাঠকবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

যুদ্ধ ও কংগ্রেসের দায়িত্ব—

কংগ্রেস যখন গঠনমূলক কাজের কথা বলিতেন তখন একদল লোক কেবল চরকা ও সুতা কাটাকেই গঠনমূলক কাজ মনে করিয়া হয় উপেক্ষা করিতেন, নয় ত বিদ্রূপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শত্রু যখন ভারতের দ্বারে তখনও কংগ্রেস সেই গঠনমূলক কাজের কথাই আর একবার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। মহাত্মাজীও 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন, 'কংগ্রেসের সম্মুখে বর্ত্তমানে একটি প্রশ্ন রহিয়াছে, প্রশ্নটি এই যে—সে শান্তিসেনা হইবে কি-না? শান্তির সময় সে অশান্তি কতটা দূর করিতে পারে তাহা দ্বারাই তাহার উপযোগিতার পরিমাপ হইবে; জীবিকা-হীন ক্ষুধার্ত্তের জন্য যদি সে লোককে রক্ষা করিতে না পারে, বা কি ভাবে উপদ্রব প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা হারাইতে হইবে। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতীতের মূলধন ভাঙ্গাইয়া বেশীদিন টিকিতে পারে না। মূলধন খাটাইয়া তাহা বাড়াইবার জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হয়। কংগ্রেসেরও জনসেবা দ্বারা মূলধন বাড়াইবার সময় এবং সুযোগ আসিয়াছে; সুতরাং কেহ যেন আর এ সময় নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন না থাকেন। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ করিতে অগ্রণী বলিয়া কংগ্রেস বহুদিনের সাধনায় এতটা জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অভীষ্টলাভের সর্ব্বোত্তম দ্রুত এবং যোগ্যতম উপায় —গোড়া হইতে শক্তি গড়িয়া তোলা। এই ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার মুহূর্ত্তে আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে পল্লীতে ফিরিবার আহ্বান। সে আহ্বান এতদিন শুধু মুখেই প্রচারিত হইত, তাহার আবশ্যকতা আজ সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হইতেছে এবং দায়ে পড়িয়াই হোক, প্রয়োজনের তাগিদেই হোক, দলে দলে লোক পল্লীর দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছে। শিল্পোন্নতি ও গঠন কার্য্য সফল করার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। পণ্যোৎপাদন এক স্থানে নিবদ্ধ না রাখিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সুযোগের সূত্র ধরিয়াই প্রত্যেক গ্রামকে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। মহাত্মাজীর উক্তির পুনরুক্তি করিয়া আমরাও প্রশ্ন করিতে চাই—প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীকে আজ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী—

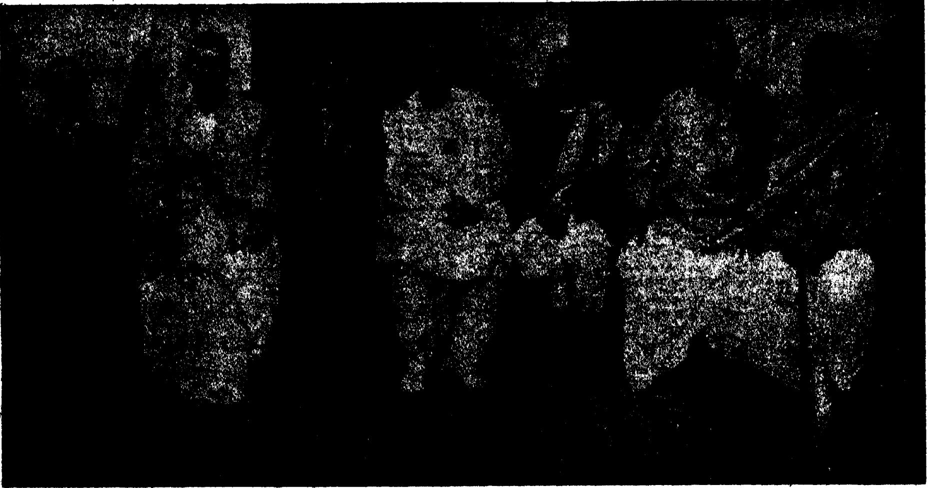
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু শিক্ষা-ব্রতী, জননায়ক, রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। স্বয়ং মহাত্মাজীও উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ও সহায়কদিগকে এবং বিশেষ করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। পণ্ডিতজীর জীবনব্যাপী সাধনা যে সকল বিভিন্নখাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাহারই অন্যতম। এত বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং দেশের এতবড় গৌরবস্থল এক রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী ছাড়া আর একটিও নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আরও বিস্তৃতিলাভ করুক, অশীতিপর মালব্যজী শতায়ু হইয়া আপনার কর্ম্মকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করুন এবং তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনের কীর্ত্তিকলাপ দেশবাসী ও জাতির আদর্শ হোক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

নারী শিক্ষা সমিতি—

কলিকাতা ২৯৪।৩ আপার সার্কুলার রোডের নারী শিক্ষা সমিতি বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। ১৯৪০-৪১ সালে সমিতির যে ২২ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, তাহার কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গত আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু উক্ত সমিতির অবৈতনিক সম্পাদিকা। পল্লীগ্রামে যাহাতে বালিকারা সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারে, পুরস্ত্রী ও বিধবাগণ যাহাতে প্রয়োজন মত শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতি কাজের দ্বারা ও শিল্প চর্চ্চার দ্বারা জীবনোপায় করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। সমিতি বিদ্যাসাগর বাণীভবন নামে যে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তথায় হিন্দু বিধবাগণকে তাহাদের আচার পদ্ধতি অনুসারে বিনা ব্যয়ে ৪ বৎসর রাখিয়া যাবতীয় শিল্পকার্য্য ও মধ্য ইংরাজি মান পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া নানারূপে সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বাণী ভবনের কলিকাতা আশ্রমে সকল বিধবাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া গত ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে বাণীভবনের একটি শাখা খোলা হইয়াছে। সেখানেও বহু বিধবাকে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট, হুগলী জেলা বোর্ড প্রভৃতির সাহায্যলাভ করিয়া সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। সমিতির দ্বারা যে বাঙ্গালার বহু নিরাশ্রয়া হিন্দু বিধবা স্বাবলম্বী হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালার ধনী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের সাহায্য ব্যতীত এই সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ সম্ভব হইবে না।

বঙ্গীয় মিউনিসিপাল সম্মিলন—

গত ১০ই ও ১১ই জানুয়ারী হুগলী জেলায় রিষড়া গ্রামে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় গৃহে বঙ্গীয় মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের সপ্তম বার্ষিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় সভার উদ্বোধন করিয়াছেন এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানের মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রিষড়া-কোন্নগর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এই সম্মিলনের সকল প্রকার উদ্যোগ আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের এই বার্ষিক মিলন সভার দ্বারা প্রকৃতই উপকার হইয়া থাকে।



রিষড়ায় বঙ্গীয় মিউনিসিপাল সম্মেলন—(বামদিক হইতে) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন সেক্রেটারী মিঃ নুরুন্নবী চৌধুরী, বালীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, বেহালার চেয়ারম্যান শ্রীযুত বীরেন রায়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, কোন্নগর-রিষড়ার চেয়ারম্যান শ্রীনরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও খুলনার চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর এম-কে ঘোষ

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের গতি—

প্রাক্তন মন্ত্রীমণ্ডল বাঙ্গালার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল জনসাধারণের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও পাস করাইবেন জেদ ধরিয়াছিলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে চাকা ঘুরিয়া গেল, মন্ত্রীমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গিয়া নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ায় নূতন মন্ত্রীদের চেষ্টায় বহুনিন্দিত বিলটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে জানিয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিলাম। প্রকাশ যে, নূতন মন্ত্রীমণ্ডল মাধ্যমিক শিক্ষার একটি নূতন বিল প্রণয়ন করিবেন। আমরা বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলকে এইজন্য সাধুবাদ দিতেছি।

বাঁকুড়ায় সাংবাদিক সম্মিলন—

বাঁকুড়া মেদিনীপুর সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে আগামী মার্চ্চ মাসে বাঁকুড়া সহরে একটি নিখিলবঙ্গ সাংবাদিক সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছে। সে জন্য দুইটি জেলার সাংবাদিকগণকে লইয়া একটি ওয়ার্কিং



বাঁকুড়া মেদিনীপুরের সাংবাদিক সমিতির সদস্যগণ

কমিটী গঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক ফণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী কমিটির সভাপতি ও শ্রীযুত সদানন্দ সান্যাল সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে 'ডি-লিট' উপাধি দানে সম্মানিত করা হইয়াছে। ইহা শুধু তর্কভূষণ মহাশয়ের নহে, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের পক্ষে গৌরবের কথা। তর্কভূষণ মহাশয় বহুবর্ষ কাল কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব বর্দ্ধন করুন, আমরা শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

বর্ত্তমান যুদ্ধে চায়ের প্রভাব—

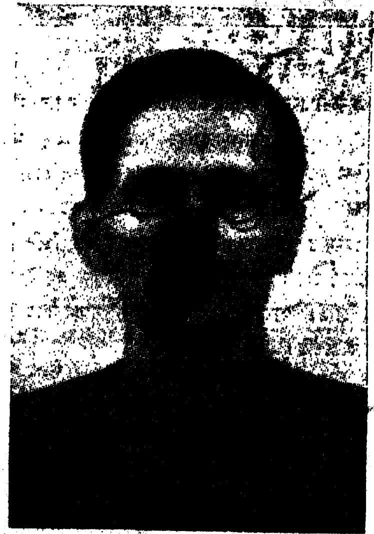
বর্ত্তমান যুদ্ধে বিলাতের জনসাধারণের জীবনে চায়ের প্রভাব সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড দুইজন বিখ্যাত মনীষীর যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। ব্রিটিশ খাদ্য-বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্‌টন্ চায়ের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'ব্রিটেনে এখন চা কেবল একটি পানীয় মাত্র নয়, তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস—মনের উপরও চায়ের ক্রিয়া অসাধারণ।' বিলাতের সুবিখ্যাত চিকিৎসক এন্টনি ওয়েমাথের বর্ণনাটি আরও চমৎকার! তিনি এক দুর্য্যোগ রজনীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—'নাৎসি-বিমানের বর্ধর শব্দে বোমা বর্ষণের বিকৃত ধ্বনিতে যখন চারদিক আচ্ছন্ন, তখন আমাদের ঘরের জানালায় নতুন লাগানো খড়খড়িগুলো উড়ে গেছে দেখা গেল। হঠাৎ আমার এক মেয়ে বললে যে এখন একপেয়ালা চা খেলে নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে কথাটা আমাদের খুব ভাল লাগল, আমরা সানন্দে সায় দিয়ে চা তৈরী করতে লেগে গেলাম। এর আগে চা খেতে এত ভাল লাগেনি, আর চা খেয়ে এতখানি জোরও আর কখনো পাইনি।'—মন্তব্য দুইটি বেশ প্রাসঙ্গিক এবং উপভোগ্য নয় কি? কলিকাতার এ-আর-পি'র কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাদের প্রচার ব্যাপারে বিলাতের এই নজীরটি গ্রহণ করিতে পারেন।

ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—

গত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্থানে ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে বিধানবাবু ৩৯ ভোট ও অধুনা নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ৩৬ ভোট পাইয়াছিলেন। বিধানবাবু যোগ্য ব্যক্তি, তিনি ইহার পূর্ব্বেও কলিকাতার মেয়র ছিলেন। তিনি অল্ডারম্যানরূপে কলিকাতাবাসীদের সুখসুবিধা বিধানে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় দিবেন—ইহা সকলেই আশা করেন। আমরা তাঁহার নির্ব্বাচন সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

অখিল ভারত হিন্দু যুব সম্মিলন—

গত ২৭শে ডিসেম্বর ভাগলপুরে কলিকাতার ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অখিল ভারত হিন্দু যুব সম্মিলনের ষষ্ঠ



ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ অধিবেশনে আগামী বর্ষের কার্য্য চালাইবার জন্য ডাক্তার সন্তোষকুমারকে সভাপতি করিয়া একদল কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচি

হইয়াছেন। শ্রীযুত জি, জগন্নাথ ও এন-নন্দী সাধারণ সম্পাদক, শ্রীযুত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন ও শ্রীযুত পি-এম-শোকদার যুগ্ম সম্পাদক এবং কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য মনীষীদের সহিত বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত



ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

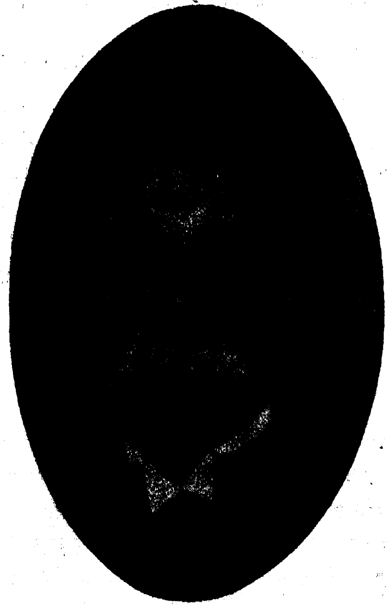
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও ডি-এল উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। ইহা শুধু শ্যামাপ্রসাদবাবুর পক্ষে নহে, হিন্দু মাত্রেরই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। শ্যামাপ্রসাদবাবু শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য নহেন, তাঁহার কর্ম্মশক্তি, দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের জন্য আজ সমগ্র ভারতে সর্ব্বজনমান্য হইয়াছেন। হিন্দু মহাসভার জন্য তিনি সম্প্রতি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্যও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই উপাধিদান উপযুক্তই হইয়াছে। আমরা শ্যামাপ্রসাদবাবুর এই সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ছাত্রসমাজ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ—

বাঙ্গালার ছাত্রফেডারেশনের পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্মারকলিপি প্রেরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটে ভারতের ছাত্র-সম্প্রদায়ের কঠোর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের সদ্যত সিদ্ধান্তকে নিন্দা করিয়াছেন। সর্ব্বমানবের এই দারুণ দুর্দ্দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের নির্দ্দেশে যদি ছাত্রগণ শহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আশ্রয় লইতে থাকেন, তাহা হইলে দেশের যুবকশক্তির উপর কাহারও আস্থা থাকিবে না এবং জাতির যুবকবৃন্দকে এই কলঙ্ক মাথানীচু করিয়া চিরকাল বহন করিতে হইবে। সেইজন্য স্কুল কলেজ অবিলম্বে নিয়মিতভাবে খুলিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণ হইতে উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য হোষ্টেল ও বোর্ডিং-গুলি সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত না করিবার জন্য, হঠাৎ বিপন্ন শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং ছাত্রদের যুদ্ধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করা হইয়াছে। বাঙ্গালার ছাত্রসম্প্রদায়ের এই বলিষ্ঠ মনোভাব এবং সঙ্কটের মুখোমুখি সোজা হইয়া দাঁড়াইবার এই মনুষ্যোচিত সিদ্ধান্ত আমরা প্রশংসা করি এবং আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও বাঙ্গালা সরকার এই আবেদন অস্বীকার করিবেন না।

পরলোকে মোহাম্মদ ইয়াসিন—

বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট জননায়ক ও একনিষ্ঠ কংগ্রেস-সেবক মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল তিয়াত্তর বৎসর। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটির সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং কয়েকবার চেয়ারম্যানও



মহম্মদ ইয়াসিন

নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায় তাঁহার ঐকান্তিক জাতীয়তার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি

প্রভৃত ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন। মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের জন্য তিনি পদত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-গণের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—

গত ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার রাত্রি ৮টা ২০ মিনিটের সময় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে কাশীধামে



মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

স্বর্গারোহণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। যশোহর জেলার তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়সেই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং পাবনার দর্শনটোলের অধ্যাপক হইয়া ১৪ বৎসর তথায় বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই তিনি ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুবৃহৎ পাঁচ খণ্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাশীবাসের বাসনা বলবতী হওয়ায় চারি বৎসর পরেই তিনি ঐ চাকরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ আগ্রহে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে 'সুবোধ বসু মল্লিক অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়া তিনি সরল বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা 'ন্যায়-পরিচয়' পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার নিরভিমান, অমায়িক ব্যবহার সকলকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চিন্তা ও গবেষণা করিয়া সর্ব্বত্র নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় সকলকে বিস্মিত করিত। ভগবৎবিশ্বাস ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহার চরিত্রকে লোকোত্তর করিয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা আক্রমণ ও নববিধান—

প্রত্যাসন্ন শত্রু আক্রমণে আজ সমগ্র কলিকাতা শহর সন্ত্রস্ত, আর ঠিক এই সময়েই সরকার একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে জানাইয়াছেন যে, শত্রু বিমানের আক্রমণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা সেই মৃত্যুসংবাদ অবগত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে—অন্ততঃ নিকটবর্ত্তী থানায়—জানাইতে হইবে। ইহার অন্যথায় কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই ভোগ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য—শত্রু আক্রমণে মৃত ব্যক্তির সংবাদ সরকারের নিকট তাড়াতাড়ি পৌঁছানর ব্যবস্থা করা ; কিন্তু ইহার ফলে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে জনগণের আতঙ্কের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, শত্রু আক্রমণের সময় প্রত্যেকেই যখন আপন আপন ধনপ্রাণ বাঁচাইবার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত, তখন আত্মীয়বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিলেও যথাসময়ে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা অনেকের পক্ষে সহজ ও সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। অথচ এজন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিনা অপরাধেই অনেককে তাহা ভোগ করিতে হইবে। আপদকালে জনগণের অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা এই আদেশের রদবদল হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

অষ্ট্রেলিয়ার উদারতা—

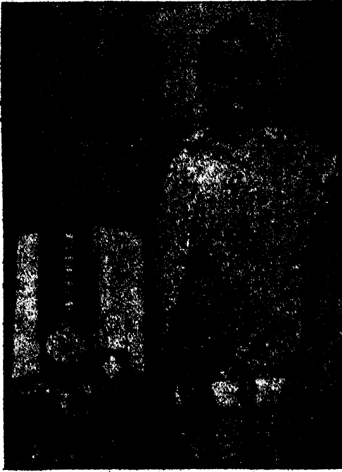
অষ্ট্রেলিয়ায় এশিয়াবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে মিত্রশক্তির এশিয়াবাসী পর্য্যুদস্ত প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়ায় বাধ্য হইয়া দেশত্যাগকারী প্রজাদের অষ্ট্রেলিয়া প্রবেশের অন্তরায় তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। মানবতার এই আহ্বানে আজ অষ্ট্রেলিয়াবাসী যে সাড়া দিল, যুদ্ধশেষে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে আরও মহত্তর আদর্শের খাতিরে কি সেই সাড়া পাওয়া যাইবে না ?

পরলোকে ডিউক অফ্ কনট্—

গত ১৬ই জানুয়ারী ডিউক অফ কনট সারের বাগ্‌শট্ পার্কে স্বীয় বাসভবনে বিরানব্বই বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় পুত্র এবং সর্ব্বশেষ জীবিত সন্তান। ১৮৫০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি বহু স্থানে বিশেষ করিয়া ভারতে ও মিশরে নানা যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। পাঁচ বৎসরকাল তিনি কানাডার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে ভারতে আসেন, তখন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছিল। তিনি "সৈনিক রাজপুত্র" নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন।

কুমারী বাসনা চৌধুরী—

১৯১৪ সালে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শ্রীযুক্ত বি এন



কুমারী বাসনা চৌধুরী

চৌধুরীর কন্যা কুমারী বাসনা চৌধুরী একটি রৌপ্য নির্ম্মিত সেতার পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

রেঙ্গুনে হতাহতের সংখ্যা—

জাপানী বিমান আক্রমণের প্রথমেই রেঙ্গুনে দুই হাজারের উপর নরনারী হতাহত হইয়াছে বলিয়া সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। নিহতের সংখ্যাই হাজারের উপর। এবারের মহাযুদ্ধে হয় ত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক লোক একবারের বিমান আক্রমণে হতাহত হয় নাই। বিশেষত স্থলপথের আক্রমণের পূর্ব্বে কেবল একবারের বোমাবর্ষণে এত অধিক সংখ্যক প্রাণহানির দৃষ্টান্ত বিরল। রেঙ্গুনের নিষ্ঠুর শিক্ষা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

কালীঘাটে দর্শনী আদায় বন্ধ—

কালীঘাট মন্দিরের দর্শনী আদায় লইয়া হাইকোর্টে যে মামলার আপীল চলিতেছে, তাহাতে বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি খোন্দকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আপীলের শুনানী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে মন্দিরের দর্শনী আদায় বন্ধ থাকিবে। কালীঘাটের মন্দিরে ও মন্দির দ্বারে দীর্ঘকাল ধরিয়া এক পয়সা ও এক আনা করিয়া যে দর্শনী আদায় হইয়া আসিতেছিল এই নির্দ্দেশ বলে যাত্রীদের আপাতত তাহা দিতে হইবে না। বিচারপতিদ্বয় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিগ্রহের সেবা বা পূজা কিছুরই ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহারা দর্শনী আদায় বন্ধ রাখার ঐরূপ নির্দ্দেশ দিতেছেন। যাঁহারা কালীঘাটের কালীমন্দিরে পূজা দিতে যান অথবা বিগ্রহ দর্শনে উপস্থিত হন, তাঁহারা হাইকোর্টের এই নির্দ্দেশ স্মরণ রাখিবেন। বাধ্যতামূলক দর্শনী আদায় বন্ধ হইলেও—পূজার্থীর স্বেচ্ছায় সানন্দে দেয় প্রণামীর অভাব হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

কংগ্রেস কমিটী ও রবীন্দ্রনাথ—

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে গভীর শোক এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন সাধনের চেষ্টা, তাঁহার অনন্যসাধারণ মণীষা ও প্রতিভা, তাঁহার ধ্যান ও সাধনা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে তাঁহার অতুলনীয় দান, তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও দেশসেবা ইত্যাদি প্রস্তাবটির মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং জাতীয় মহাসভার পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অর্থ—সমগ্র ভারতেরই শ্রদ্ধাঞ্জলি। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী আরও বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী"কে রক্ষা করা এবং তাহার পুষ্টিবিধান ভারতের পক্ষে একটি মহৎ কর্ত্তব্য। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্মান এখানে এবং ইহা পূর্ণ হইবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিক্রয় কর—

বাঙ্গালার বিক্রয় কর হইতে সংবাদপত্রগুলিকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মাসিকপত্রগুলিকে রেহাই দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে পত্রিকা পরিচালনা লাভজনক ব্যবসা নয়, বিশেষত বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য অসম্ভব বেশী হওয়ায় পত্রিকা চালানোই প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই ট্যাক্স চাপানো যে গুরুতর অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যে দেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা বারর উপরে আজও ওঠে নাই, সেই দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচারের একটি উৎকৃষ্ট অবলম্বন মাসিকপত্রিকা। সরকারের পক্ষে এই সকল পত্রিকার বহুল প্রচারের উৎসাহ দেওয়াই উচিত ছিল, তাহা ত হয় নাই; উপরন্তু জনশিক্ষা বিস্তারের এই সকল উপায়গুলিকে করভারে সঙ্কুচিত করিয়া সরকার শিক্ষা বিস্তারেই বাধা সৃষ্টি করিতে উদ্যত। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির পক্ষ হইতে এই বিষয়টি বাঙ্গালা

গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানান হইয়াছিল এবং তিনি এ বিষয়ে সুবিচার করিবার আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীঅশোককুমার সরকার—


শ্রীঅশোককুমার সরকার

কলিকাতা ৫৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের এটর্নী শ্রীযুত অনিলকুমার সরকারের পুত্র শ্রীযুত অশোককুমার সরকার সম্প্রতি এটর্নী পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী হইয়াছেন। অশোককুমার লণ্ডনস্থ ভূতপূর্ব্ব হাই-কমিশনার সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের দৌহিত্র।

শোক সংবাদ—

২৪ পরগণা জেলার পানিহাটীনিবাসী চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় ৫৯ বৎসর বয়সে গত ৮ই জানুয়ারী দ্বারভাঙ্গায় পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজসরকারে বড় চাকরী করিতেন। গ্রামের প্রতি ও গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁহার


৺চারুচন্দ্র মিত্র

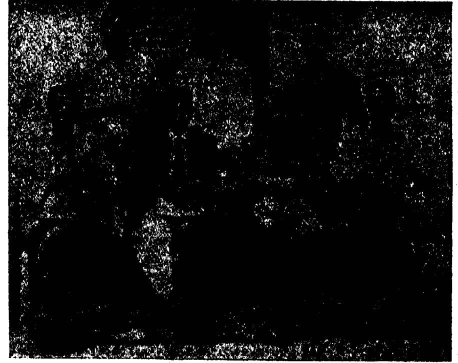
সহানুভূতির জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। গ্রামের সকল সদনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচন—

কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর নির্ব্বাচনে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। নিয়োগী মহাশয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য দীর্ঘকাল ছিলেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তিনি সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সত্যটাই আর একবার প্রমাণিত হইল যে, মানুষ যোগ্যতারই পরিচয় চায়, কোন বিশেষদলের চাকৃত্তিকে বরণ করে না।

নূতন ডি-এস-সি—

অধ্যাপক শ্রীযুত মোহিনীমোহন ঘোষ গণিত বিষয়ক পদার্থ-বিজ্ঞানের মৌখিক গবেষণার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস-সি উপাধি


২৪ পরগণার এ-আর-পি শিক্ষাদাতাদল

লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল পুরস্কার পাইয়াছিলেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনস্থ ইনিষ্টিটিউট অব্ ফিজিক্সের সদস্য হইয়াছিলেন।

বৃটিশের মনোভাব—

যুদ্ধের অবস্থা দৃষ্টে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রতি যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনকার মত চাপা পড়িল। কমন্স সভায় তিনদিন ধরিয়া বিতর্কের যে আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে সদস্যগণ স্পষ্ট করিয়া নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই বিতর্কের গোড়ায় মিঃ চার্চিল দেড় ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা দিয়া সমগ্র অবস্থাটা প্রকাশ করেন। কি কারণে পূর্ব্ব এশিয়ায় পরাজয় ঘটিতেছে, কোথায় গলদ এবং এই গলদের মূল কি ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া সমস্ত দোষত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী করিয়াছেন। মাত্র একটি ভোট ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই অনাস্থা জ্ঞাপন করেন নাই। আজিকার এই সঙ্কটের অবস্থায় বৃটিশজাতি মিঃ চার্চিলকে হাত ছাড়া করিতে পারেন না, কেন না, এ দুর্দ্দিনে মিঃ চার্চিল ছাড়া এ গুরু দায়িত্ব বোধহয় আর কেহই বহন করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং রক্ষণশীল বৃটেন রক্ষণশীল চার্চিলকেই মানিয়া লইয়াছে। নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বেতকায় জাতির আবাস; সুতরাং সে দেশের যে সকল সৈন্য ও সমরোপকরণ সাম্রাজ্য রক্ষায় স্থানান্তরিত, আজ এই দুই দেশের দ্বারে যখন জাপানী অভিযান সমুপস্থিত তখন বৃটেন তাহাদিগকে নিজেদের সৈন্য ও সমরোপকরণ দেশরক্ষা-

নিয়োগের অনুমতি দিয়াছেন। অথচ তাঁহার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের নামটা পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই—যদিচ ভারতের দ্বারেও আক্রমণ প্রত্যাসন্ন, আর ভারতীয় বহু সৈন্যই আজ ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত! প্রত্যেকটি মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার উপরই এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে এবং প্রত্যেকটি মানুষের সহযোগিতা পাইতে হইলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ জনগণের অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডল ইহা স্বীকার করিতে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহাদের রক্ষণশীল দৃষ্টি একান্তভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকেই সীমাবদ্ধ। তাঁহারা যুদ্ধের জয়-পরাজয়ই কেবল চিন্তা করিতেছেন কিন্তু জয়ের পিছনে কি আদর্শ এবং পরাজয়ের মধ্যেই বা কি কারণ, তাহা ইঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। জাপানের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গতই মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, রুশিয়ার দক্ষিণে রোষ্টভের দিকে জার্মানীর অগ্রগতির ফলে ককেশাস অঞ্চলের প্রভূত তৈল সম্পদ, ইরাক, ইরাণ ও সিরিয়া ইত্যাদি বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং অন্যদিকে সেনাপতি রোমেল লিবিয়ার মরুভূমি দিয়া মিশর ও সুয়েজখাল আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। সুতরাং জাপানের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানকে ঘায়েল করিবার উপযুক্ত সৈন্য ও সমরোপকরণ সমাবেশ করা সম্ভব হয় নাই। এ যুক্তি যে আদৌ বিচারসহ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এই যুদ্ধ নির্ভর করে রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তির উপর এবং এই সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে সৈন্য, উপকরণ, কলকারখানা, কাঁচা মাল, শ্রমিক ও জনসাধারণকে এক বিরাট কর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। মিঃ চেম্বারলেনও ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, মিঃ চার্চিলও পারিতেছেন না। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলি সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের



কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান করিতে অগ্রসর—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা



শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
ইনি এবার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কাশী অধিবেশনে শিল্প শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছেন

ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে নাই এবং আজও পারিতেছে না। যদি তাহা সম্ভব হইত তাহা হইলে আজ এতদিনের চেষ্টায় ভারত রক্ষায় ভারতেই অন্তত এককোটি সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত, কাঁচা মালেরও অভাব এখানে নাই। যদি গোড়া হইতেই ভারতকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হইত, তবে এখানে লক্ষ লক্ষ সৈন্য এবং সেই বিশাল বাহিনীর উপযোগী যাবতীয় যুদ্ধ সম্ভার তৈয়ারি হইতে পারিত; অন্তত অবস্থাটা এত শোচনীয় হইত না। রুশিয়ায় বিশ কোটি লোকের বাস, আর এই যুদ্ধে তাহারা নব্বাই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিল, পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এক কোটি সৈন্য খুব বেশী হইত না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সম্মানার্হ সঙ্গীরূপে স্বীকার করিয়া লইলে একমাত্র লিবিয়ার মরুভূমিতে জয়লাভ করিতে গিয়া আজ আমাদের অবস্থা এইরূপ হইত না। ভারত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বৃটিশ তাহা চাহেন না। তাঁহারা অবশ্য বিজয় কামনা করেন অন্তরের সঙ্গেই—কিন্তু তাহার অন্তরায় দূর করিতে করিতে তাহাদের রক্ষণশীলতা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানের অগ্রগতি বর্ত্তমানে চলিবে বটে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত হইয়াও তাঁহারা যখন তাল সামলাইয়া লইবেন তখন জাপানের নির্ম্মম পরাজয় ঘটিবে।



ভারতবর্ষ

চৈত্র—১৩৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি,

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পষ্টতম নিদর্শন—ইহার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অম্লান দীপ্তি ও অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অপ্রতিহত অগ্রগতি। বাস্তবিকই তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনের সমাপ্তি-সূচক রচনাগুলির মধ্যেও নব নব প্রকাশ-ভঙ্গী ও প্রেরণা আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে। এই বিষয়ে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সহিত তুলনায়ও শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন্, ব্রাউনিং—তাঁহাদের শেষ জীবনের রচনায় একটা ম্লানিমা, অভ্যস্তের বৈশিষ্ট্যহীন পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। তাঁহাদের শেষ কাব্যের উপর বার্দ্ধক্যের বলিরেখা প্রসারিত হইয়াছে—ভাবের শীর্ণতা, রসের দৈন্য ও কল্পনার জড়তার চিহ্ন তাহাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা শেষ পর্য্যন্ত তাহার সতেজ নবীনতা ও সাবলীল স্ফূর্ত্তি হারায় নাই। অবশ্য উৎকর্ষের তারতম্য-ভেদ আছে—ষাট বৎসরের কাব্য-সাধনার মধ্যে প্রতিভার জোয়ার-ভাঁটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মোটের উপর যে বিশেষত্ব আমাদিগকে চমৎকৃত করে, তাহা হইতেছে কবির চিত্তের সরসতা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নূতনকে আবাহন ও বরণ করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হন নাই—নূতন নূতন সংশয়-মূলক পরীক্ষার দুর্গম পথ তাঁহাকে দুঃসাহসিকতায় প্রণোদিত করিয়াছে। যে পথে চরম সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে, সেই পথ ধরিয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারের প্রলোভন তিনি হেলায় ত্যাগ করিয়াছেন। কবিত্বের মূল উৎস কোথায় তাহার আবিষ্কারের আগ্রহাতিশয্যে তিনি নানা বিরল-পদ-চিহ্ন নির্জ্জন বনপথে তাঁহার কল্পনাকে অভিসার-যাত্রায় পাঠাইয়াছেন। ইহার ফল হয় ত সব সময় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই। তথাপি এই যে পরীক্ষা-মূলক মনোবৃত্তি, এই যে দুঃসাধ্য-বরণের প্রচেষ্টা, নব উন্মেষের তৃপ্তিহীন অভীপ্সা কবিজীবনেও এত বিরল যে ইহা আমাদের সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক্ করে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের গদ্য-কবিতার কাব্যসংগ্রহগুলি বিশেষভাবে তাঁহার এই মানস-প্রবণতার উদাহরণ। পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ-সপ্তক (১৯৩৩) ও শ্যামলী (১৯৩৬)—এই তিনখানি গ্রন্থেই তাঁহার গদ্য-কবিতার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা সমন্বয়-সাধন, গদ্যের শিথিল, অযত্ন-বিন্যস্ত রূপের মধ্যে পদ্য-সুরভির সঞ্চার—কবির আকস্মিক খেয়াল নহে; দীর্ঘ দিনের পরীক্ষার পরিণতি। কাব্যের ছন্দোবদ্ধ, দৃঢ়পিনদ্ধ রূপের মধ্যে চিন্তাধারার ছন্দানুগামী একটা সহজ, সরল প্রবাহ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি কিছুদিন হইতেই অনুভব করিতেছিলেন। চিরপ্রথাগত ছন্দের অপরিবর্ত্তনীয়

রেখা-বিন্যাসের পরিবর্ত্তে ঝঙ্কার লীলা-চপল, স্বচ্ছন্দ-গতি, অনিয়মিত হ্রস্ব-দীর্ঘের সমাবেশে বিচিত্র ভাব-প্রবাহের প্রত্যেকটি বাঁকের সহিত সমান্তরাল এক নূতন স্বাধীনতা তাঁহার কাম্য হইয়া উঠিতেছিল। 'বলাকা'য় প্রথম এই ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্ত্তন—কবির চিন্তার মৌলিকতা ও প্রসার যেন ইহার মধ্যে তাহার অপরিহার্য্য কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখানেও কবি ছন্দগঠনকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলেন নাই—অন্তঃমিল ও ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ (rhythm) অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া'য় (১৯২৯) ছন্দ-কৌলীন্য তাহার পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—অনিয়মিত ছন্দাংশের সহিত সাবেক প্রথার সম্পূর্ণাঙ্গ ছন্দ নিজ নিজ সুর মিলাইয়াছে। তার পরে 'পুনশ্চ'-তে (১৯৩২) এই নবরীতি যথারীতি ঘোষণার সহিত কাব্য-সিংহাসনে উন্নীত হইয়াছে। ইহাতে কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি ছন্দ-বিন্যাস—উভয় দিক দিয়াই পুরাতন ধারার সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এখন কবি ছন্দ-গুঞ্জনের অস্পষ্ট মোহাবেশ হইতে নিজেকে সবলে মুক্ত করিয়াছেন; ছন্দের কণ্ঠরোধের পর তাহার অশরীরী প্রেতাত্মাকেও তাঁহার কাব্যাঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেন নাই। এইরূপে তিনি সঙ্গীতের আবেশ-মুক্ত, নিজ বক্তব্য বিষয়ের গৌরবের উপর নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান, নিরাভরণ পৌরুষের প্রতীক এক অভিনব জাতীয় কবিতাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে কবি নিজ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথম 'পুনশ্চ'-এর ভূমিকায় তিনি তাঁহার এই নূতন আদর্শ সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট অক্ষর না রেখে ··· বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি-না" ইহাই তাঁহার পরীক্ষাধীন বিষয়। তা ছাড়া, "পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাকে দূর করে গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরণ স্বাভাবিক" করাও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাঁহার 'পুনশ্চ' ও 'শেষ-সপ্তক"-এ কয়েকটি কবিতাতেও তিনি এই নূতন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 'পুনশ্চ'-এর প্রথম কবিতা 'কোপাই'-এ তিনি কোপাই নদীর "জলে-স্থলে, তরলে-শ্যামলে" গ্রন্থিবদ্ধ গতিচ্ছন্দে, তাঁহার নব-প্রবর্ত্তিত কাব্যছন্দের প্রতীক আবিষ্কার করিয়াছেন। "ভাষার গান" ও "ভাষার গৃহস্থালী" এখানে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সান্নিধ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই নব-রীতির বিশেষ দুরূহতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। মোহাবেশের বিনা সাহায্যে হৃদয় জয় করা কঠোর সাধনা ও ছন্দগত সূক্ষ্ম স্বভাব-বোধের উপর নির্ভর করে।

"একে অধিকার যে করবে
তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।"

"নূতন কাল" কবিতাতে যে বাহিরের প্রেরণায় তিনি এই নূতন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত মিলে—ভাবী কালের ইচ্ছা ও রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অন্তঃপুরবাসিনী কাব্য-সুন্দরীকে তিনি পথিক-বধূর ধূলি-ধূসর বেশ পরাইয়াছেন। "শেষ সপ্তক"-এর ২০, ২৪, ও ২৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি এই নূতন কাব্যাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। নবযুগের কবি "কঠিন-চিত্ত, উদাসীনের" গান গাহিবেন; কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপটি যেন একটি কারুকার্য্যখচিত পেয়ালার মত; ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সাধারণ মৃত্তিকা-পাত্রেও রস-পরিবেশনের কোন বাধা হইবে না। নিয়মিত ছন্দ টবের গাছ—"আভিজাত্যের সুশাসনে" সংযত তাহার হৃদয়াবেগ; ছন্দহীন কাব্য মৃত্তিকা-রোপিত, যথেচ্ছবিস্তৃত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে ভরপুর আরণ্যক তরু। এইরূপ নানা যুক্তি-তর্ক-উপমার সাহায্যে কবি তাঁহার নূতন পরীক্ষামূলক সৃষ্টির সমর্থন ও উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

২

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয় ও আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা ঠিক নূতন ব্যাপার নহে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (১৮০০ খৃঃ অঃ) ইংরেজ মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই প্রশ্নের উত্থাপন করেন ও কবিতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গদ্যরীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হন। এই সূত্রে যে আলোচনার উদ্ভব হয় তাহাতে গদ্যের নিত্য-ব্যবহার্য্য ভাষা কি পরিমাণে কবিতায় প্রয়োগ করা সম্ভব ও কবিতায় ছন্দ অবশ্য-প্রয়োজনীয় কি না ইত্যাদি প্রশ্নের খুব সূক্ষ্ম ও জটিল বিচার হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনার ফলে মূলত যে সমস্ত সাহিত্যিক সত্য প্রায় সর্ব্ব-স্বীকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। (১) গদ্যের ভাষা ও কথোপকথনের স্বাভাবিক রীতি ও শব্দ-বিন্যাস-পর্য্যায় (*idiom* and *order of words*) কবি-কল্পনার দ্বারা অভিষিক্ত হইলে কবিতায় স্থান পাইতে পারে; আবার বিষয়োপযোগী ও কল্পনা-গৌরবের দ্বারা সমর্থিত হইলে কবিতার ভাষার রাজোচিত ঐশ্বর্য্যও ভাব-প্রকাশের সঙ্গত উপায়। (২) ছন্দ কাব্যের কেবল বাহ্য সৌষ্ঠব ও আভরণ নহে। ইহার সহিত কবিতার একটা নিগূঢ়, মর্ম্মগত ঐক্য আছে, ইহা কাব্যের আত্মার অপরিহার্য্য বহিঃপ্রকাশ। কবিতার যাদু এই ছন্দের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, ছন্দের সুর-ঝঙ্কার, গতিচ্ছন্দ ও ধ্বনি-সাম্যের সহায়তায় ইহার চরম আবেদনটি মনের মধ্যে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হয়। ছন্দের আধারে সুরক্ষিত হইলে কাব্য-সৌরভ ঘনীভূত নির্য্যাসের স্থায়িত্ব লাভ করে; ছন্দের রূপটি অস্পষ্ট ও অনিরূপিত হইলে ইহা বায়ু-তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত পুষ্প-গন্ধের ন্যায় জমাট বাঁধিবার অবসর পায় না। সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপলক্ষ্মীর ন্যায় কবিতা ভাব-ছন্দ-সুষমার অপরূপ ঐক্যে যুগপৎ কবিচিত্তে প্রতিভাসিত হইয়া ওঠে। ছন্দ ভাবের সহিত একটা পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র নহে, ইহার সহজাত রূপ ও আকৃতি। ছন্দের অঙ্গ-জ্যোতি-বেষ্টিত হইয়াই কাব্যসুন্দরী মানস-লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, গদ্য-পদ্যের এই প্রকৃতি-বিশ্লেষণের ফলে উভয়ের সীমা-রেখা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-ধারণা গুরুতররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান যুগে উহাদের

মধ্যে শ্রেণী-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। পূর্ব্বে উহাদের মধ্যে মৌলিক, চিরন্তন প্রভেদের যে পাষাণ প্রাচীর মাথা তুলিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে একটা অপসরণ-ক্ষম গাছ-পালার ভঙ্গুর বেড়াই উঁহাদের পারস্পরিক সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। একটু সামান্য প্রেরণাতেই এই সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতিবেশীর রাজ্যে পদক্ষেপ করা যায়। সময় সময় দুঃসাহসী গদ্য-কবিতার উন্মাদনা ও সুর-ঝঙ্কার আত্মসাৎ করিবার জন্য বেড়ার অপর দিকে হস্ত প্রসারিত করে। সে যেমন কাব্য-বীণার উঁচু সুরে নিজের একতারাটি বাঁধিয়া লয়, অমনি অলক্ষিতভাবে অসম ছন্দের একটা নৃত্যহিল্লোল তাহার প্রতি অঙ্গে সঞ্চারিত হয়। তাহার স্বভাব শান্ত পদক্ষেপে একটা দূরশ্রুত নূপুর-নিক্কণের অনুরূপ ধ্বনি বাজিয়া ওঠে। আবার অপর দিকে কবিতাও দীর্ঘ আকাশ-বিহারে ক্লান্ত-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় গদ্যের নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিয়া হ্রস্ব, অনিয়মিত তালের খঞ্জন-নৃত্যের অনুকরণ করে।

আকাশ-বিহারিণীর এই পক্ষ-সঙ্কোচের নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে। ক্লান্তি, কৌতূহল, বৈচিত্র্য-স্পৃহা প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি প্রবৃত্তি কবি-মনকে প্রভাবিত করিয়া তাহাকে এই গদ্য-পথের পথিক করে। কিন্তু ইহা ব্যতীত তিনটি আদর্শগত প্রেরণা মুখ্যত কবিতার গদ্যাভিমুখিতার হেতুরূপে গণ্য হইতে পারে।(১) ভাবের দোলার গতিবেগের উপরই ছন্দের পক্ষ বিস্তারের মাত্রা নির্ভর-করে। যেখানে কবি-চিত্ত মৃদুমন্দ ভাব-কম্পনে দোলায়িত, যেখানে কল্পনা অর্দ্ধ-জাগ্রত-ভাবে শিথিল মুষ্টিতে তাহার বিষয়কে ধারণ করে, যেখানে কাব্যরসধারা সংহতি হারাইয়া কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিন্দুরূপে ক্ষরিত হয় সেখানে ছন্দ ও তাহার কাব্যসুলভ নৃত্যভঙ্গী সংযত করিয়া বালুকা-প্রান্তশায়ী শীর্ণগতি নদীর ন্যায় গদ্যের উত্তেজনাহীন পদক্ষেপ অবলম্বন করে।(২) পক্ষান্তরে যেখানে আবেগ অতিশয় তীব্র ও মর্ম্মভেদী, সেখানে ভাবের দুঃসহ উত্তাপই ছন্দ ও ভাষার লীলায়িত বিস্তারকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের মধ্যে গদ্যের নিরাকরণ তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টবাদিত্বের সঞ্চার করে। উদাহরণস্বরূপ ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি কবিতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়—

A slumber did my spirit seal
I had no human fears ;
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years.

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ছন্দ একেবারে বর্জ্জিত হয় নাই ; ইহা কথ্যরীতির সহজ ধারা অঙ্গীভূত করিয়া তাহার সাহায্যেই তীব্রতম মনোবেদনাকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। (৩) তৃতীয়ত. কবির গণতান্ত্রিক বিবেক অতিমাত্রায় জাগ্রত হইয়া তাঁহার মনে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে তাঁহার কাব্যচর্চ্চা সুলভ কল্পনা-বিলাস মাত্র, পৃথিবীর বেদনার সহিত ইহার নাড়ীর কোন যোগ নাই। সুতরাং কবিতার সমস্ত কারু-কার্য্যখচিত বৈচিত্র্য পরিহার করিয়া তিনি কথ্য ভাষার অলঙ্কার-বর্জ্জিত রিক্ততাকে বরণ করেন ও এই উপায়ে জনসাধারণের চিত্তের সহিত নিজের নিবিড় সংযোগ সাধনে প্রয়াসী হন। কাব্য-ধর্ম্মী গদ্যের উদাহরণ পাই ডি-কোয়েনসির রচনায় ও গদ্যধর্ম্মী কাব্যের প্রধান উদাহরণ আমেরিকান কবি হুইটম্যানের Leaves of Grass-এ। ইহা ছাড়া মোটামুটি আবেগ-প্রধান গদ্য-রচনায় খণ্ডিত ছন্দের একটা ঝঙ্কার ও ধ্বনি-প্রবাহ শোনা যায়। পক্ষান্তরে, বিতর্কমূলক কাব্য রচনাতে, যেমন ব্রাউনিং-এর কবিতা ও ড্রাইডেন, পোপের ব্যঙ্গাত্মক কাব্যে কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দরীতির অনুবর্ত্তন প্রাধান্য লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতাগুলিতে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোনটি সুপরিস্ফুট তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার ন্যায় ছন্দ-যাদুকর যে ছন্দের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন না, ইহা ধারণাতীত। তথাপি নূতন পরীক্ষার কৌতূহল তাঁহার সমস্ত কবি-জীবনের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া প্রবল হইয়াছিল। কোন কোন সম্রাট যেমন তাঁহার অতি বিশ্বস্ত অমাত্যের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হইয়া তাঁহার সহায়তা ছাড়াই রাজ্যশাসনে প্রয়াসী হন, তেমনি আমাদের ছন্দ-সম্রাটও বোধ হয় অনুরূপকারণে ছন্দ-নিরপেক্ষ হইয়া নিজ সহজ শক্তি পরীক্ষা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। কবিতার প্রাণের গোপন রহস্য কি ছন্দের সোনার কৌটার মধ্যে, কি কবির নিজ অনুভূতিতে, ইহাই নিঃশেষে পরীক্ষা করিবার জন্যই তিনি উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। আত্মশক্তিতে অতি-প্রত্যয় হেতু মহাকবিরা এরূপ বিপৎসঙ্কুল পথে মাঝে মধ্যে পদার্পণ করিয়া থাকেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনে হইয়াছিল যে, কবি-কল্পনার ব্যতিরেকে কেবল রিক্ত বিবৃতির দ্বারা পাঠকের চিত্তে ভাবোদ্রেক করা সম্ভব। সেই জন্য তিনি তাঁহার Simon Lee-তে আশা করিয়াছেন যে, তাঁহার গল্পের পাদ-পূরণ পাঠকই করিয়া লইবে। তাঁহার এ আশা পূর্ণ হয় নাই—কবির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অধিকাংশ পাঠকের বোধ-শক্তির অতীত। ইহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ-জীবনের অনেক কাব্য, বিশেষত 'নবজাতক'-এ গণতান্ত্রিক কবির আবির্ভাবের প্রত্যাশা করিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, পরাধীন, জীবন-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত, হৃত-সর্ব্বস্ব জাতির সমস্ত হৃদয়-বেদনা, সমস্ত অপরিস্ফুট আশা আকাঙ্ক্ষা ও করুণ দিবা-স্বপ্ন তিনি নিজ কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। ব্যাকুল উন্মুখতার সহিত তিনি এই নব কবির অরুণোদয়ের প্রতীক্ষমান ছিলেন, যিনি সত্য সত্যই "মূঢ়, মূক কণ্ঠে" ভাষা দিতে পারিবেন, যিনি সহস্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বাগদেবীর চরণে মন্ত্র-অর্ঘ্য প্রদান করিবেন, তাঁহার গদ্য-কবিতা হয়ত এই অনাগত কবির জন্য পথ-নির্দ্দেশক ইঙ্গিত-কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত নাও হইতে পারে।

৩

এবার রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশ্লেষণ করিয়া উপরের সাধারণ মন্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণের চেষ্টা হইতে পারে। (১) রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গদ্য-কবিতায় সুরের লঘুতা ও কল্পনার অর্দ্ধ-সক্রিয়, স্তিমিতভাব পরিস্ফুট। বিশেষত. আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতাগুলি এই লক্ষণাক্রান্ত। কতকগুলি কবিতা মনের একটি ক্ষণিক আবেগ ও আকস্মিক খেয়ালকে ছন্দ-বন্ধনে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে।(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় লেখকের কল্পনা খুব উঁচুসুরে বাঁধা—ইহার cosmic range বা বিশ্বব্যাপী প্রসার দার্শনিকতার উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত কবিতাতে কবি বিশ্ব-প্রকৃতি, সৃষ্টিরহস্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির অমোঘ-নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ কক্ষাবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—সৌর জগতের বিশাল পটভূমিকার উপর তাঁহার কল্পনার আলোক বিক্ষিপ্ত

হইয়াছে।(৩) তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাতে লেখকের সমগ্র কাব্যের চিরন্তন সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে—প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ লীলা ও গতির মধ্যে তিনি তাঁহার সত্তাকে ডুবাইয়াছেন—মানব-জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমারদ্ধতা ও আসক্তি-লিপ্ত মোহাবেশকে চির-চঞ্চল বিশ্ব-জীবন-প্রবাহের নির্ঝর-ধারায় স্নান করাইয়া তিনি পূত ও নির্মল করিয়াছেন। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে কতকগুলিতে কোন একটা দিন কবির বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রূপান্তরিত, ও অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্যের শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া অসীমের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। ২৫শে বৈশাখে রচিত কতকগুলি কবিতাতে কবি নিজ জীবনকে বিভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন—ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও সমস্ত খণ্ডিত প্রচেষ্টা ও অসম্পূর্ণ প্রবণতার মধ্য দিয়া ইহার অখণ্ড মূর্ত্তিটি, ইহার ধ্যান-রূপটি ফুটাইতে চাহিয়াছেন।(৪) কয়েকটি প্রেম কবিতাও এই শিথিল, ছন্দ-বন্ধনহীন রূপে প্রেমের চিরন্তন রহস্যটি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।(৫) কয়েকটি কবিতায় সাধারণভাবে আর্ট ও জীবন-সমস্যার উপর কবির প্রগাঢ় চিন্তাশীলতাই কবিতার প্রেরণা জাগাইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত সারসঙ্কলন হইতে আমরা গদ্য-কবিতাতেও কবির বিষয়-বৈচিত্র্য ও কল্পনার বহুমুখীনতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

এই শ্রেণী-বিভাগ হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলি ছাড়া বাকী সমস্তগুলিই বিষয় ও ভাব-প্রেরণায় সনাতন ছন্দোবদ্ধ কবিতার অনুরূপ। আখ্যায়িকাও ক্ষণিক, লঘু মনোভাবাত্মক কবিতাগুলি সম্বন্ধেই নূতন গদ্যরীতি প্রয়োগের সার্থকতা আছে; কাজেই এই রীতির সাফল্য ইহাদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে বিবেচ্য। 'পুনশ্চ'-তে অপরাধী, ছেলেটা. সহযাত্রী. শেষ চিঠি, (৫) বালক, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি. ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে ও প্রথম পূজা; 'শেষ সপ্তক'-এ 'রঘু ডাকাত', নেহাল সিং-এর আত্মদান, ও 'শ্যামলী'তে, কণি, দুর্বোধ, 'অমৃত' ও 'বঞ্চিত'—এই গুলি মূলত ফাঁকে ফাঁকে কাব্যরস-মেশানো গল্প বিবৃতি। 'শ্যামলী'তে 'বিদায়-বরণ' ও 'হারানো মন' মেঘখণ্ডের মত লঘু, ভাসমান মুহূর্ত্তের ভাব-ঝলকের প্রতিচ্ছবি।

আখ্যায়িকা কবিতাগুলির আকর্ষণ বহুবিধ। 'অপরাধী'তে বিল্টুর দুষ্টুমির মধ্যে যে একটি স্নেহযোগ্য, ভারমুক্ত মনের ছাপ আছে, তাহার মিথ্যা-ভাষণে যে চিত্তাকর্ষক সরসতার পরিচয় মিলে তাহাই কবিতাটির মূল সুর। ইহার রস ঠিক কাব্যমূলক নহে, চরিত্রসৃষ্টি-মূলক। 'ছেলেটা' কবিতায় আর একটি দুষ্ট বালকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার দুষ্টুমির মধ্যে দুঃসাহসিকতা, নূতন অভিজ্ঞতা আহরণের কৌতূহল, প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রবণতার মিশ্রণ আছে। এই বালক কবিতায় রস পায় না, কিন্তু ইহার জন্য কবিতাই দায়ী, কেন না, সাধারণ কবিতায় প্রাণিজগতের কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য-কথা স্থান লাভ করে নাই। 'বালক'-এ আর একটি দুষ্ট বালক তাহার দৌরাত্ম্যের অবাধ স্বাধীনতা ও প্রয়োজনহীন আনন্দের চরিতার্থতার দ্বারা গ্রামের সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরই স্বত্বাধিকার-মূলক আইনের অপরিচিত এক নূতন দাবীর সৃষ্টি করিয়াছে। অকস্মাৎ এই গল্পের কাঠামোর মধ্যে কবি নিজ বাল্যজীবনের বহিঃ-প্রতিরুদ্ধ, মানস-চঞ্চলতার প্রগাঢ়, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি ভরিয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে কাব্যোৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। 'শেষ সপ্তক'-এ ৩২ ও ৩৩ সংখ্যক কবিতা যথাক্রমে রঘু ডাকাতের পরোপকার প্রণোদিত ডাকাতি ও নেহাল সিংহ নামক শিখ বালকের আত্মোৎসর্গের কাহিনী। এই গল্পগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত চড়া সুরের ভাব উন্নততর ছন্দ-কৌশলের দাবী করে; গদ্য-ছন্দের শিথিল, এলায়িত ভঙ্গীর মধ্যে. ইহাদের তীব্রতর ভাবপ্রবাহ যেন বাঁকে বাঁকে খণ্ডিত ও প্রতিহত হয়। বিশেষত নেহাল সিংহের মৃত্যুবরণ কবির 'কথা ও কাহিনীর' দৃপ্ত-পৌরুষব্যঞ্জক, উদাত্ত-ছন্দোবদ্ধ অনুরূপ কাহিনী-গুলির কথা অনিবার্য্যভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই তুলনায় গদ্য কবিতার অনুপযোগিতা তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে।

'শেষ চিঠি', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া' ও 'সাধারণ মেয়ে' (পুনশ্চ); 'কণি' ও 'অমৃত' (শ্যামলী) প্রেম-কাহিনী। ইহাদের মধ্যে ভাবাবেগ ও কবিত্বের স্পর্শ তীব্রতর হওয়াই প্রত্যাশিত। কিন্তু তথাপি অনাবশ্যক তথ্যপুঞ্জের ভারে ইহাদের রসধারা নিতান্ত ক্ষীণ ও মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। 'শেষ চিঠি'র অন্তর্নিহিত করুণ রসটি অবান্তরের বাধায় ফুটিতে পারে নাই। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' ছিন্ন তথ্যের বাহুল্যে প্রায় অন্বর্থনামা হইয়া উঠিয়াছে। 'ক্যামেলিয়া'তেও অতি-বিস্তৃত ঘটনার পশ্চাদ্ধারন করিতে করিতে কবিতা গলদঘর্ম্ম হইয়াছে—সংঘটনের স্রোতো-তাড়িত হইয়া কোথাও জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই। 'সাধারণ মেয়ে'তে ঔপন্যাসিকের প্রতি নায়িকার আবেদনের নূতনত্ব কিছু বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে, যদিও কবিতাটিতে কাব্যরসের তাদৃশ স্ফুরণ নাই। 'শ্যামলী'র 'কণি' ও 'অমৃত' এই দুইটি কবিতাতে গল্পের আকর্ষণের সঙ্গে কাব্যরসের মোটামুটি সন্তোষজনক সমন্বয় হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতাগুলির সম্বন্ধে এইবার সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে। কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও নিগূঢ় সৌন্দর্য্য-বোধ রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন, অক্ষয় সম্পদ। তিনি গদ্য, পদ্য ও গদ্য-কবিতা যাহাই লিখুন না কেন, তাঁহার মৌলিক কবিত্বশক্তি স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ ও অর্দ্ধ-স্বচ্ছ সমস্তবিধি আবরণের মধ্য দিয়াই ভাস্বর। সুতরাং গদ্য-কবিতার মধ্যেও উচ্চাঙ্গের কাব্য-গুণোপেত পংক্তি, বর্ণনা ও ভাবের নিদর্শন অনায়াসে মিলে। তথাপি ইহাদের আঙ্গিক রূপের (technique) অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না। অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিতে ইহাদিগকে বিন্যস্ত না করিয়া ছন্মবেশ-বর্জ্জিত গদ্যের রূপে ইহাদের কি ক্ষতি হইত বুঝা যায় না। পংক্তিগুলির বিচ্ছেদ রেখা কোন ছন্দবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; মনে হয় যেন নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক পতন ও বিরামই ইহাদের দৈর্ঘ্য নিরূপিত করিয়াছে। ইহারা কোনরূপ ছন্দের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ দ্বারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় নাই—প্রতি পংক্তি নিজ সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ লইয়া নিঃসঙ্গ, এককভাবে দণ্ডায়মান। অবশ্য অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে গেলে কিছুকাল পরে ছন্দের একটা অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে জাগিয়া ওঠে—কিন্তু সেটা হয়ত অভ্যাস-প্রণোদিত আত্ম-প্রতারণা। চোখের দৃষ্টি হয়ত অজ্ঞাতসারে কানকে প্রভাবিত করে—চক্ষু-মরীচিকা শ্রুতি-বিভ্রম জন্মায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে আমরা রস একপ্রকারের পাই তাহা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু এই

রস খাঁটি কবিতার রসের মত গাঢ় ও আবেশময় নহে। ইহা আমাদের চিত্তকে একটা গভীর, ছিদ্রহীন অনুভূতি দ্বারা আচ্ছন্ন করে না; মনের চারিদিকে একটা অবান্তর-বর্জ্জিত, সুর ও ভাবের ইন্দ্রজাল-রচিত সৌন্দর্য্য-পরিবেশ গড়িয়া তোলে না। আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাস হইয়া এই কবিতার রস উপভোগ করি না; বাস্তব জগতের সমস্ত বিক্ষেপের সহিত জড়াইয়া আলস্য-জৃম্ভনের সহিত আস্বাদন করি মাত্র। কবি লিখিতে লিখিতে যে হাই তুলিয়াছেন, তাহার ছোঁয়াচ অনিবার্য্যভাবে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

ছন্দের বাঁধ ভাঙ্গার আর একটি ফল দাঁড়াইয়াছে যে, অনাবশ্যকের আবর্জ্জনা-স্তূপকে ঠেকাইয়া রাখার কোন উপায়ান্তর আবিষ্কৃত হয় নাই। ছন্দের কঠোর সংযম চিন্তা ও ভাব-ধারার মধ্যে ঐক্য-সংহতির সৃষ্টি করে—কবিতাকে বাহুল্য-বর্জ্জিত সৌন্দর্য্য ও গঠন-লালিত্যে রূপায়িত করিয়া তোলে। গদ্য কবিতাতে গদ্যোচিত তথ্যপ্রধান মনোভাব লেখককে অতি-পল্লবিত মুখরতা ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা-বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে। কাব্য-নদী সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত না হইয়া নানা অগভীর শাখা-পথে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার কলধ্বনি ও গতিবেগ হারাইয়াছে। তর্ক, উদাহরণ, জীবনচরিতের অতিরিক্ত তথ্য-সন্নিবেশ, অসংহত, বিচ্ছিন্ন চিন্তা ইত্যাদি গদ্যরীতির অসঙ্কুচিত প্রয়োগ কবিতার মধ্যে একটা বিসদৃশ অসঙ্গতির ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। কবিতার অতি-বিস্তৃত ও সীমা-রেখাহীন প্রাঙ্গণে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অপ্রাসঙ্গিক, পথিক চিন্তা ও কল্পনার দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহাদের সমবেত কণ্ঠের কোলাহলে যে একটা অস্পষ্ট সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধকে তৃপ্তি দিতে পারে না। গদ্য-মনোভাবের অতি-প্রাধান্যের প্রমাণ স্বরূপ 'অপরাধী' কবিতায় অবিবেচনার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত, পণ্ডিতের আসনে কালীর ভূষা লাগাইবার অপরাধে অভিযুক্ত বালকের প্রতি হেডমাষ্টারের কঠোর শাস্তিদানের গল্পটা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যা-প্রবৃত্তি আর যাহারই নিদর্শন হউক, কাব্য-মনোবৃত্তির নহে। কালীর দাগ যে কেবল পণ্ডিতের পরিচ্ছদেই লাগিয়াছে তাহা নহে, কাব্য-সরস্বতীর অমল শ্বেত বসনও এই কলঙ্ক-চিহ্নে অঙ্কিত হইয়াছে।

কবির পক্ষ হইতে তাঁহার অনুসৃত রীতির সমর্থনে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথম, কবিতার সঙ্গে ছন্দের মিলন এত দীর্ঘকাল-ব্যাপী যে আমরা উহাকে প্রায় নিত্য সম্বন্ধের পর্য্যায়েই ফেলিতে অভ্যস্ত। ইহার ব্যতিক্রম আমাদের স্বাধীন সৌন্দর্য্য-বোধ অপেক্ষা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারকেই অধিক পীড়া দেয়। সুতরাং অপরিচিতের প্রতি সঙ্কোচই পাঠকের অতৃপ্তির প্রধান হেতু। যেমন অনেকে চিনির মিষ্টত্বের লোভেই চা-এর প্রতি আকৃষ্ট হন, তেমনি অনেক পাঠকের কাব্যানুরাগ মুখ্যত ছন্দ-ঝঙ্কারের জন্যই। এরূপ ক্ষেত্রে ছন্দ-মোহ হইতে মুক্তি তাহাদের প্রকৃত কাব্যরুচির পরীক্ষা। সুতরাং কবি অতিরিক্ত শর্করা-প্রীতির প্রতিষেধক স্বরূপই ছন্দহীন কবিতা পাঠক-সমাজকে উপহার দিয়াছেন। ইহার উত্তর অবশ্য গদ্য কবিতার আকর্ষণী শক্তির উপরই নির্ভর করে—ছন্দ-ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তে কবি যাহা দিতেছেন তাহা পাঠকের নিকট তুল্যরূপ উপভোগ্য কি না। এই সম্পর্কে আরও প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ছন্দের ধ্বনি-প্রবাহ (rhythm) যদি কবিতার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় না হয়, তবে ছন্দের পংক্তি-বিভাগের অনুকরণ করার যুক্তিযুক্ততা কোথায়? চোখের দাবী মিটাইবার ব্যপদেশে কানকে ফাঁকি দিবার এই কৌশল কেন? রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ত খাঁটি গদ্যের ধ্বনি-লেশহীন কাঠিন্যকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম। তাঁহার "বনবীথি" কাব্যের কয়েকটি কবিতায় তাঁহার কল্পনাধারা গদ্য ও পদ্য এই উভয়বিধ বাহনকেই অবলম্বন করিয়াছে—এবং ইহাদের মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য-নিরূপণে আমাদের বিচারবুদ্ধি রীতিমত সংশয়-পীড়িত হয়। তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তেও গদ্যের বিশিষ্ট-আকারহীন পাত্র কবিতারসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নিছক কাব্যরস-পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ছন্দের সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

কবির স্বপক্ষে যে দ্বিতীয় যুক্তি অবতারণা করা যাইতে পারে, তাহা এই যে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে এই নূতন ধরণের কবিতা উৎকর্ষে চির-প্রথাগত ছন্দ-কবিতার সমকক্ষ হইবে। তিনি গদ্যের মধ্য দিয়া স্বল্পতম (minimum) কাব্য-রস সরবরাহ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইহার বেশী দাবী করা অনুচিত। অবশ্য এই নূতন কবিতা সম্বন্ধে কবি যেখানে যেখানে নিজ মতের আভাস দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও তিনি ইহার আপেক্ষিক অপকর্ষ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহার অভিনবত্বের উপরই জোর দিয়াছেন ও এই অভিনবত্ব যে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের হেতু ও তীব্রতর জীবন-স্পন্দনের নিদর্শন তাহা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গদ্যরূপের ভিতর দিয়া ভাবী যুগের কবির নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইবে। প্রত্যাশিত ছন্দ-রূপের অভাবের জন্য পাঠকের যে ক্ষোভ তাহা কারুকার্য্যখচিত পেয়ালার পরিবর্ত্তে মৃৎপাত্রে মিষ্ট রস পরিবেশনের জন্য—তাহাতে রসের কোন তারতম্য হয় না। ছন্দোহীন কবিতার মধ্যে আরণ্যক তরুর উচ্ছ্বসিত, সংযম-বন্ধন-হীন প্রাণ-সম্পদের সারূপ্য। তারপর এই জাতীয় কবিতায় বহিঃছন্দের অভাব পূরণ করিতে হইবে বক্তব্য বিষয়ের স্বাভাবিক ছন্দের উত্থান-পতনের নিয়ন্ত্রণ-কৌশলে—অলক্ষ্য, সহজ ছন্দের অন্তঃ-প্রবাহই বিভিন্ন পংক্তিগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠ ও ঋজু করিয়া রাখিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিতাগুলির মধ্যে কবি-প্রত্যাশিত এই নূতন আদর্শ রূপ ধরিয়া ওঠে নাই। সাধারণ কবিতার সহিত গদ্য কবিতার পার্থক্য প্রাণরসের অতি-প্রাচুর্য্যে নহে, ইহার শীর্ণতর ধারায়, অবান্তরের জঞ্জাল-স্তূপ ঠেলিয়া ইহার বালুকা-রুদ্ধ, স্রোতোহীন গতি-চেষ্টায়। অন্তঃছন্দের নিগূঢ় গতিও শ্রুতি-গোচর হইয়া ওঠে না। আখ্যায়িকা-জাতীয় একটিমাত্র কবিতায় "পুনশ্চ"-এর 'প্রথম পূজা'য় ভূমিকম্পের করাল ভয়াবহ বিপর্য্যয়টি এই গদ্য ছন্দে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার কারণ এই যে, ইহার ছন্দবিধ্বংসী তাণ্ডব নৃত্যছন্দের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির মধ্যে ফুটিয়া ওঠে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য লোকের কথ্য-ভাষা তাঁহার কবিতার ধমনীতে নূতন ওজস্বিতা ও নব-রক্ত-সঞ্চার করিবে। কিন্তু প্রধানত ইহা তাঁহার কবিতার পায়ে বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ও স্থূল দ্বিধাজড়িত প্রকাশ ভঙ্গীর শৃঙ্খলা জড়াইয়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাও তাঁহার আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই—ইহা বলা যাইতে পারে। ক্রমশঃ

সত্যভাষণ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত আসে যখন পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় তাহাদের হৃদয়ের পাত্র একেবারে পূর্ণ হইয়া ওঠে এবং সেই বিহ্বল মুহূর্ত্তে তাহারা সে ভালবাসায় আতিশয্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। অকারণ স্বার্থত্যাগ, অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, নানারূপ আত্মনিপীড়ন প্রভৃতি নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়াই প্রায় সে আতিশয্য প্রকাশ পায়—আর সেই জন্যই অনেক সময়ে তাহারা সাধ করিয়া ডাকিয়া আনে দুঃখ!

আমাদের ললিত আর কল্যাণীর জীবনেও সেদিন এম্‌নি একটি মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল।

সেদিন পূর্ণিমা, ললিত অফিসের ফেরত একটা রজনীগন্ধার তোড়া কিনিয়া আনিয়াছিল। সেই তোড়াটি ছিল পাশে একটি গেলাসে সাজানো; ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিল স্বামী আর স্ত্রী, পাশাপাশি—নিবিড়ভাবে। ললিত তখনই সাবান দিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার মৃদু সৌরভ কল্যাণীর প্রসাধনের গন্ধ ও রজনীগন্ধার গন্ধের সহিত মিশিয়া কেমন একটা মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, দুজনেরই চোখে নামিয়াছে স্বপ্নের ছায়া। ছোট বাড়ী, অন্য ভাড়াটে নাই, আছে এক ঝি, সে নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ!

সহসা কল্যাণী ললিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, জীবনে যে এত সুখ আছে, বাস্তবিক তা কখনো ভাবিনি। উঃ, বিয়ের সময় কি কান্নাটাই কেঁদেছিলুম; সাহসে কুলোয়নি তাই, নইলে হয়ত আত্মহত্যাই ক'রে বসতুম!

সজোরে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ললিত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন রাণু, আমাকে কি তোমার আগে পছন্দ হয়নি?

কল্যাণী খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি তোমার বুদ্ধি গো। তোমাকে আগে দেখলুম কোথায় যে পছন্দ হবে!

তা বটে। ললিত তাহার খোঁপার মধ্যে মুখটা গুঁজিয়া কহিল, তবে? তা হ'লে এর আগে আর কাউকে পছন্দ হয়েছিল বলো!

কল্যাণী সুখের আবেগে হাতটা উল্টা দিকে ঘুরাইয়া ললিতের গলাটা জড়াইয়া রাখিয়াই তাহার বুকে এলাইয়া পড়িয়া কহিল, বা-রে ছেলে! আমার গোপন কথাটা বুঝি ফাঁকি দিয়ে বার ক'রে নিতে চাও? ··· তোমার কীর্ত্তি আগে না শুনে আমি কিছু ভাঙছি না!

তাহার পর আব্‌দারের হাসি হাসিয়া কহিল, সত্যি বল না গো, তুমি আমাকে বিয়ে করার আগে ক'জনকে ভালবেসেছিলে? ··· কথাটা মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমাকে দেখলেই সব ভুলে যাই ব'লে কোন দিনই জিজ্ঞাসা করা হয় না—

ললিত জবাব দিল, হ্যাঁ, আগে জিজ্ঞাসা করলেই বলতুম কি-না! ··· তবে এখন বলতে পারি। আর কোন বাধা নেই!

কৌতুকহাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া কল্যাণী কহিল, বল না তবে। তিনজন, চারজন, না আরও বেশী?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল, সে বরাত ক'রে এসেছি কি না! মোটে একটি, আমারই দিদির ননদ। পাটনা থেকে এসে আমাদের বাড়ীতে মাস দুই প্রায় ছিল। জমেছিল বেশ। একই বাড়ীতে চিঠি লেখালেখি চলত হরদম। ওরা যখন চলে যায়—আমি মাকে বলেছিলুম—ওকে না পেলে আমি বিয়েই করব না। সেও না-কি সেখানে আমার দিদিকে বলেছিল যে আমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

তারপর?

ললিত হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি, যেমন হয়ে থাকে। সে-ও এখন দিব্যি স্বামী-পুত্তুর নিয়ে ঘরকন্না করছে—আর আমি তোমাকে এই বুকে জড়িয়ে ধরে আছি!

কল্যাণী কহিল, তাই বটে। ঐ রকমই তখন মনে হয়। আমারও ঠিক বিয়ের আগে দাদার এক বন্ধুকে দেখে মনে হয়েছিল যে ওকে না পেলে বাঁচব না। মনে মনে সাবিত্রীর মত প্রতিজ্ঞা করবার চেষ্টা করতুম যে ঐ আমার স্বামী, 'অন্যপতি নাই!'

একটু থামিয়া আবার কহিল, ইস্‌—কি এঁচোড়ে-পাকাই ছিলুম তখন। কত রকম নাটক যে করতুম মনে মনে, তার ঠিক নেই। ··· সে ছোঁড়াও তেম্‌নি, সবে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে তখন—পড়াশুনো সব ছেড়ে শুধু আমাকে দেখবার জন্যে বাড়ীর চার পাশে ঘুরে বেড়াতো, তেমনি হ'লো, ফার্ষ্ট ইয়ারেই দু'বার ফেল!··· এখন শুনছি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে কোথায় চাকরি করছে।

দু'জনেই খানিকটা হাসিয়া উঠিল। তাহার পর মিনিট কয়েক একেবারে চুপচাপ, দুজনেই মনে মনে কি ভাবিতেছিল। কল্যাণী একটু পরে ললিতের গলাটা ছাড়িয়া দিয়া তাহারই কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, ছেলেবেলায় মানুষ যেন কি এক রকম থাকে। না?

ললিত অন্যমনস্কভাবে কহিল, হ্যাঁ। সেইজন্যেই ত ছেলে-মানুষী বলে—

আবার কিছুক্ষণের জন্য দুজনে চুপ করিল। আবেগের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেছে—এখন তাহার পরের শান্ত অবস্থা।

তাহারা যে চুপ করিয়া আছে, অকস্মাৎ মিনিট দশেক পরে দুজনেই একসঙ্গে তাহা বুঝিতে পারিল। ললিত একটু শব্দ করিয়াই হাই তুলিল; কল্যাণী কহিল, বাতাস একদম নেই, তা দেখেছ? দুপুর বেলা অত ঝড় দিচ্ছিল, এখন সব বন্ধ! কেমন যেন গরম বোধ হচ্ছে, না?

ললিত কল্যাণীর চুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল চালাইয়া কহিল, তোমার মাথা ঘামে ভিজে উঠেছে যে! ··· টেবিল ফ্যানটা এনে খুলে দিলে না কেন?

থাক্‌ গে। আর উঠতে ভাল লাগ্‌ছে না।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল, তোমার এই সামনের শুক্রবার কিসের ছুটি আছে বলছিলে?

এম্‌নিই দুই-একটা খুচরা আলাপ চলিল। কোথা দিয়া কেমন করিয়া সামান্য একটু সঙ্কোচের সুর যেন কথাবার্ত্তার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; অথচ তাহারা সে কারণটা তখন ভাবিতেও প্রস্তুত নয়।

আরও মিনিট কতক পরে ললিত কহিল, চলো, খেয়ে দেয়ে নিই—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কল্যাণী উঠিয়া পড়িল, কিন্তু জবাব দিল, কি ভাগ্যি! রোজ বারোটার আগে খেতে চাও না! আজ ঐ ভয়ে আমি ঝিকে আগে খাইয়ে দিয়েছি, নইলে সে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়!

ললিত কিছু না কহিয়া তোড়াটা লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরের দিন সকালে ললিত আহারে বসিয়াছে, কল্যাণী একটা পাখা লইয়া কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল—হ্যাঁগা, আমাকে একবার পাটনায় নিয়ে যাবে?

বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, পাটনায়? এত দেশ থাকতে পাটনা যাবার সখ্ হ'লো কেন হঠাৎ?

মাথা নীচু করিয়া কল্যাণী কহিল, এমনিই—। না হয় একবার সে মেয়েটিকে দেখে আসতুম!

আরও বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, মেয়ে? কোন্ মেয়ে?

তোমার দিদির সেই ননদ—

ওহো! ললিত-হাসিয়া কহিল, কি তোমার বুদ্ধি। সেও বুঝি পাটনায় থাকে? তার বিয়ে হয়নি? শ্বশুরবাড়ী নেই?

কল্যাণী কহিল, তার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

কই মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে ললিত কহিল, ঐ দিকেই কোথায়—দারভাঙ্গা না মতিহারী—ঠিক জানি না।

কল্যাণী চুপ করিল। ললিতও তখনকার মত কথাটা ভুলিয়া গেল। কিন্তু অফিসের নির্জ্জন অবসরে কথাটা মনে পড়িতেই কল্যাণীর প্রশ্নের আড়ালে যে একটু ঈর্ষার সুর আছে সেটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ললিত কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করিল—কল্যাণীর মধ্যেও নীচতা আছে, ছি!

সে বাড়ী ফিরিল একটু গম্ভীর মুখে। কল্যাণী আসিয়া পাখাটা খুলিয়া দিল, অভ্যাসমত হাত হইতে জামা ও গেঞ্জি লইল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল না। একটা কি যেন ঠাট্টার চেষ্টা করিয়া পরক্ষণেই সংসারের কথা পাড়িল, ওগো, ঝি বলছে দেশে যাবে আসছে মাসে—

—তাই ত। তা ও-ই একটা লোক দিয়ে যেতে পারবে না?

কল্যাণী কহিল, বলছে ত পারবে না। কি যে হবে, মুশকিল!

সেদিনও চাঁদ উঠিল। কিন্তু তাহারা ছাদে গেল না। ললিত ঘরেই একটা বই লইয়া শুইয়া পড়িল। কল্যাণীর রান্নাঘরের কাজ সকাল করিয়াই সারা হইয়া যায়, সে-ও একটা কি সেলাই লইয়া ললিতেরই কাছে আসিয়া বসিল। কালকের মতই পাশাপাশি, কিন্তু সে আবেগ আজ আর যেন নাই। কল্যাণী দুই-একটা কথা কহিল, ললিত বই পড়িতে পড়িতেই উত্তর দিল। এমনি করিয়াই অবশেষে এক সময়ে আহারের সময় হইল।

পরের দিনও এই ভাবে কাটিয়া গেল। সেদিন দুজনেই সহজ হইবার চেষ্টা করিল, রসিকতার চেষ্টাও চলিল—কিন্তু কোথায় যেন বারবার তাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিজেদের মনের কাছেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, সব আর ঠিক আগের মত অনায়াসে চলিতেছে না। জীবনের যন্ত্রে কোথায় একটা বেসুরা তার কে যোগ করিয়া দিয়াছে—

দুজনেরই রাগ হইল। একটা সহজ কথা, সহজভাবে স্বীকার করিবার উপায় নাই! সে ত কত দিনকার কথা, তাহার পর কত ঘটনা ঘটিয়া গেছে—সেকথা আজ মনেও নাই। কথা উঠিল তাই, নহিলে নিজেদেরই মনে পড়িত কি-না সন্দেহ।

অভিমান ললিতেরই বেশী, কারণ তাহার মনে সঙ্কোচ থাকিলেও সে তাহা স্বীকার করে নাই। কল্যাণীই নীচতা প্রকাশ করিয়াছে—অকারণে। তাহার এত ভালবাসার পরও এমন একটা তুচ্ছ সন্দেহ সে করিতে পারিল, আশ্চর্য্য!

কল্যাণীও অভিমান ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল না। নিজের দোষও বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকেও সে ভুল বুঝিল। তাহাকে সে মনে করিল—অভিমান সব কিছু তাহারই প্রকাশ করিবার কথা—বেদনা বা অপমান বোধ করিবার কারণ ঘটিয়াছে কেবলমাত্র তাহারই!

এমনিভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিবার পর সঙ্কোচ বা অভিমান যখন মনোমালিন্যের রূপ ধরিতে চলিয়াছে, তখন সহসা একদিন সন্ধ্যার পর ললিত যেন ফাটিয়া পড়িল। কল্যাণী রান্নাঘরে তখন রান্না করিতেছে, সেইখানে আসিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কহিল, তুমি আমার দেরাজের কাগজপত্র ঘেঁটেছিলে কেন?

কল্যাণী যেন চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে কহিল, কে বললে?

ললিত কঠিনভাবেই জবাব দিল, কে বললে সেটা ত বড় কথা নয়। কেন হাত দিয়েছিলে সেইটাই জিজ্ঞাসা করছি—

কল্যাণী কড়ায় কি একটা নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল, আমার একটা দরকারী চিঠি খুঁজে পাচ্ছিলুম না তাই—মনে করেছিলুম তোমার কাগজপত্রের মধ্যে থাকতে পারে।

মিছে কথা।

ললিত বলিল, তুমি আমার পুরোনো চিঠির বাণ্ডিল খুলে পড়তে গিয়েছিলে—

কল্যাণী সহসা যেন আগুনের মতই জ্বলিয়া উঠিল। ফিরিয়া বসিয়া কহিল, বেশ করেছি। কি করবে তুমি তার জন্যে, মারবে?

ললিত বলিল, মারব না। কিন্তু তুমি কত নীচ তাই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এতদিন তোমায় ভুল বুঝেছিলুম।

—আমি নীচ? কল্যাণী চেঁচাইয়া উঠিল, আর তুমি কি? তুমি আমার দাদার কাছে গিয়ে তার এ্যালবাম দেখতে চাওনি? ভেবেছ আমি কিছু জানি না, না?

সহসা একটা কড়া জবাব যেন ললিতের মুখের কাছ হইতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া গেল। সে বার দুই অন্য কি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলিয়া ফেলিল, বাঃ, এরই মধ্যে গোয়েন্দাগিরিও শুরু হয়ে গেছে বুঝি? বেশ, বেশ, বরং পুলিশে দরখাস্ত ক'রে দিও—ভাল চাকরি মিলবে!

সে আর দাঁড়াইল না, আবার উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল। কল্যাণীও সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে রাত্রে দুজনের কাহারও খাওয়া হইল না।

ব্যাপারটার কদর্য্যতায় ললিত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মস্তিষ্কে যতই সে ভাবিতে লাগিল—ততই বুঝিল যে অপরাধ তাহারও কম নয়, অথচ সে-ই প্রথম কল্যাণীকে গালি-গালাজ করিয়াছে। তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না, সে পরের দিন নিজেই উপযাচক হইয়া কল্যাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিবাদটা মিটাইয়া লইল।

ইহার পর আবার সহজ জীবনযাত্রা শুরু হইল। সহজ, স্বচ্ছন্দ নয়। কিছুতেই যেন ঠিক আগের মত প্রাণের পাত্র কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া ওঠে না, আগের মত সহজে মেলা যায় না। কোথায় যেন একটা আট্‌কায়,।

মাসখানেক পরে সহসা ললিত একটা ট্যুইশন্ লইল। এই কাজটায় আগে সে বন্ধুবান্ধবদের বহু অনুরোধেও রাজী হয় নাই। কল্যাণী অনুযোগ করিল, অফিসের খাটুনি—তার উপর আবার ছেলে পড়ালে শরীর কতদিন টিক্‌বে?

ললিত কহিল, বেশী খাটুনি হবে না, ছেলেটা ভালো আছে। টাকাটাও কম নয়, দেখি না চেষ্টা ক'রে—

কল্যাণী কথা কহিল না। ইহা যে সন্ধ্যার নীরব অবসর অন্যত্র কাটাইবারই উপলক্ষ মাত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। কিন্তু তাহার দিন কাটাইবার উপায় কি? ছেলেমেয়ে নাই, কাজও বেশী নয়—একা এই বাড়ীতে রাত্রি দশটা অবধি কিছুতেই যেন কাটে না। এক এক দিন তাহার অসহ্য বোধ হয়, বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসে—

অবশেষে একদিন রাত্রে ললিতের কাছে কথাটা না পাড়িয়া পারিল না। কহিল, আমাদের ত নীচের তলায় ঘরটা কোন কাজেই আসে না, ওটার জন্য একটা ভাল ভাড়াটে দেখ না—ছোট সংসার—শুধু স্বামী-স্ত্রী, এমন পাওয়া যায় না?

বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, তা যায়। কিন্তু এইটুকু বাড়ীর মধ্যে আবার কতকগুলো অচেনা লোক এসে ঢুকলে কি এখানে বাস করতে পারবে। না না, সে বড় অশান্তি হবে—

কল্যাণী কহিল, কিন্তু একা একা আমার এই বাড়ীতে কি ক'রে কাটে বলো দেখি? এমন ক'রে আমি যে আর পারি না।

ললিত বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুদিন পরে কল্যাণীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল—এমন ক'রে আমিও আর পারি না। রাত অবধি বাইরে বাইরে ঘোরা আমার কিছুতে সহ্য হয় না।... আমাকে তুমি ডেকে নাও না রাণী আবার—

অশ্রু ছলছল চোখে কল্যাণী কহিল, আমিই কি তা হ'লে তোমাকে তাড়িয়েছি?

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া ললিত কহিল—না না, দোষ আমারও কম নয়। কিন্তু কি তুচ্ছ কারণে হঠাৎ আমাদের সুখের বাসা ভাঙ্গল ভেবে দেখ দিকি রাণী, কি থেকে কি হ'লো।

কল্যাণী তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া কহিল, সত্যি, কেন যে মরতে ও কথাগুলো বল্‌তে গিয়েছিলুম তা জানি না। ওগুলো কি একেবারে ভোলা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়।

জোর করিয়া কল্যাণীর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া ললিত কহিল, কিন্তু তার আগে একটা কথা আজ তুমি বিশ্বাস করো রাণু, সেদিনকার সেই কথাটা আমার আগাগোড়া বানানো, ঝোঁকের মাথায় একেবারে মিছে কথা বলেছিলুম।

কল্যাণী ললিতের বুকের মধ্যেই চমকিয়া উঠিল। তাহার সজল চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, উঃ, একদম ফাঁকা ব্যাপার নিয়ে দুজনে কি কষ্টই পেলুম।... তুমিও যদি সেদিন আমার দাদার কাছে এ্যালবাম দেখতে না চেয়ে খোলাখুলি কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ত জানতে পারতে যে দাদার কোন বন্ধুর সঙ্গেই আমার পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না, ভালবাসা ত দূরের কথা।... কথাটা ঝোঁকের মাথায় তখনি-তখনি বানানো।

ললিত জোরে হাসিয়া উঠিয়া কল্যাণীকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল, কল্যাণীও হাসি-অশ্রু-মাখানো মুখে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মাথা রাখিল।

এমনি ভাবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত দুজনে বসিয়া বসিয়া অনেক দিন পরে সহজভাবে অনেক গল্প করিল। তাহারা প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল তাহাদের মন হইতে সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে, আজ আবার তাহারা পরস্পরের কাছে আগেকার মতই সহজ। কিন্তু তবু তাহারা দুজনেই মনে মনে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, পরস্পরের এই সত্যকার সত্যভাষণটা দুজনের কেহই আজ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না।

গান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আমি তোমার আশায় থাকি।
হে সুন্দর! তাই নিশিদিন তোমায় আমি ডাকি॥
প্রথম যেদিন স্বপ্নে আমি, তোমার দেখা পেলাম স্বামী।
সেদিন থেকে নামটি তোমার বুকটি জুড়ে রাখি॥

তোমার আলো জ্বালো জ্বালো, আমার প্রাণের মাঝে;
তাইতে আমার কাটবে আঁধার, এই জীবনের সাঁঝে।
এস এস এস নামি, অন্তরেতে অন্তর্যামী,
(আমি) তোমার ছবি দিবসযামী মনের পটে আঁকি॥

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

২৪

পরলা হইতে বিনয় কাজে ভর্ত্তি হইল। প্রথমটায় যা ভাবিয়াছিল, কাজ তাহার চেয়ে অনেক বেশি। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। যেদিন কাজের ভিড় থাকে সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত যে কেনাবেচা চলে। আর তাহাকেও হিসাবপত্র ঠিক দিতে হয়। বসিয়া থাকিতে থাকিতে পিঠের শির দাঁড়াগুলা কন্‌কন্ করিয়া ওঠে। তাহার উপর জায়গাটা এমন অস্বাস্থ্যকর স্থানে। দিনের বেলাতেও ভালো করিয়া আলো ঢোকে না। একটু খোলা হাওয়া কি আকাশের নীল রং চোখে দেখিবার উপায় নাই, অনুভব করিবার যো নাই। এই বন্দীনিবাস, এখানেই কি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটিয়া যাইবে? আর অন্য কোন পথ নাই, আর কোন উপায় নাই? এ প্রশ্ন কত শতবার ব্যাকুলভাবে তাহার মনে আনাগোনা করিতে থাকে, কিন্তু কোনই উত্তর পায় না। প্রথম মাস কাজ করিবার পর ম্যানেজার তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার মাইনে পঞ্চাশ ক'রে হ'ল বিনয়বাবু আসচে মাস থেকে। কাজ আপনার খুব ভালো, তিনমাস অপেক্ষা করবার হেতু দেখিনে। এই মাস থেকেই পাকা ক'রে বাহাল হ'লেন। কিন্তু এ শুভসংবাদে যতটা খুশী হওয়া উচিত [illegible] তাহা হইতে পারিল না। কেবল সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে একবার বাড়ী যাইবার জন্য। সেই তাহাদের খড়ের ঘর, সকাল বেলাকার শিশিরমণ্ডিত সেই প্রভাত, যেন কতদিন দেখে নাই। কত যুগ যুগান্ত হইয়া গেল। বৈশাখের পাঁচই নীহারের বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, আর দিন পনেরো কোনক্রমে কাটাইয়া ম্যানেজারকে বলিয়া তখন একসপ্তাহের জন্য অন্তত ছুটি লইবে। এখন হইতে বিনয় তীর্থের কাকের মত দিন গুণিতে লাগিল। সেদিন অফিস হইতে ফিরিবার পথে অভ্যাসমত যোগীনবাবুর বাসার সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় বিনয় দেখিল গেটের কাছে খান দুই মোটর দাঁড়াইয়া আছে। চাকরবাকরেরা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; খবর লইয়া জানিল, তিনি চেঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পরের দিন সকালে সে যোগীনবাবুর বাড়ীতে দেখা করিতে গেল। চাপরাসী বলিল, বাবুর শরীর ভাল নাই। ডাক্তারেরা বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছেন।

সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিনয় মনে করিল তাহাদের সেই পুরাণ মেসে একবার বেড়াইয়া আসে। নিজেকে এত একলা লাগে। জীবনে কোন অর্থ নাই যেন, নাই কোন উদ্দেশ্য। খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘড়ি ধরিয়া সেই সাড়ে দশটার সময় কাজে যাওয়া, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই অন্ধকার কক্ষে কলের মত কাজ করিয়া যাওয়া।

পুরাণ মেসটায় পুরাণ বন্ধুদের সঙ্গে সেই সব গল্প গুজব—রুশ সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব, সে সব মনে হয় কোন আর এক জন্মের কথা। তাহার সেই সাবেক দিনের পুরাণো মেসে খরচ অনেক বেশি পড়ে বলিয়া বহু দিন হইল সে মেসটা ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন সেখানে পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে কে কে আছে সেখানে, তাহাও বিনয় ঠিক জানে না। তবু আজ অনেক দিন পর সেখানে চলিল।

শুধু শরদিন্দু ছিল সেখানে। আর সবাই কেহ বাড়ী গেছে, কেহ মেস ছাড়িয়া দিয়াছে। শরদিন্দু বিনয়কে দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল! আরে বিনয় যে! কোথায় আছ, কি করছ এখন? তোমার যে আজকাল আর দেখাই পাওয়া যায় না হে?

বিনয় একটু ম্লান হাসিয়া চেয়ারটায় বসিল। শরদিন্দু আগেকার দিনের মত চা অর্ডার দিল, পান আনিতে বলিল। পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিল। সামনেই টেবিলের উপর পড়িয়াছিল সেইদিনকার খবরের কাগজখানা। একটা পাতা খুলিয়া মোটা মোটা হেড্ লাইনগুলার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, দেখেচ একবার মজাটা? শ্রী আর পদ্ম নিয়ে কত ব্যাখ্যা, কত মারামারি, কত মনোমালিন্যই না চলছে! ক্রমশ দেশের সবারই কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যাচ্ছে নাকি? এত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে যে এত কথা উঠ্‌তে পারে, কোন দিন ভাবি নি।

বিনয় অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের নীল ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, এত অবাক লাগে, আশ্চর্য্য আমাদের জীবনটা! কোথাও যেন কোন সঙ্গতি নেই, অর্থও নেই। আমার নিজের কথাটাই ধর। তেইশ বছর বয়সেই সমস্ত জীবনটা আমার কাছে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে একটা কাজ জোগাড় করেছি। সমস্তদিন একটা ঘেঁষাঘেঁষি অন্ধকার গলির মধ্যে একটা অফিসে দিনের বেলায় ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বেলে দোকানের কেরাণিগিরি করতে হয়। আর আমার মত দেশের কত ছেলে, কত শিক্ষিত তরুণ এই সুখস্বর্গটুকু পাবার জন্যেই লালায়িত। তারপরেও যদি শুনতে হয়—শ্রী আর পদ্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্ন হবে কেন, তাই নিয়ে তুমুল উত্তেজনা, বিবাদ বিসম্বাদ, তা হ'লে হাসি পায় নাকি? জীবনের এই দৃশ্যত অসঙ্গতি দেখে হাসি আর কান্না দু-ই পায়। জানিনে কোন্‌টে বেশি।

শরদিন্দু উত্তেজিত হইয়া বলিল, নিশ্চয়! এ ব্যাপারটা কেমন জান? ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন আগুন নেভাবার চেষ্টা না ক'রে যদি সেই দাহ্যমান গৃহের দুই অধিবাসী তুমুল তর্ক করতে বসে, দেয়ালের ছবিগুলো এমনভাবে টাঙানো হবে, না ঐ রকম ভাবে হবে, কোন একটা ছবির বিশেষ গূঢ় তাৎপর্য্য এই হবে, না অন্যবিধ হবে। সেই ঝগড়া যেমন—পাগলের আত্মহত্যা ও তাই। কিন্তু বিনয়, ছেড়ে দাও তুমি ও চাকরি! তোমার মত ছেলেরাও যদি জীবনের সমস্ত দিনরাত্রিগুলো উৎসর্গ ক'রে দেয় ঐ কেরাণিগিরির বেদীমূলে, তা হ'লে আর বাকী থাকে কি?

বিনয় আর একটা সিগারেট লইয়া বলিল, উৎসর্গ ক'রে দিচ্ছি

হবে। এমনি ক'রেই আমার মত অনেকে উৎসর্গ হয়ে গেছে। না হ'লে আমাদের মা খেতে পাবে না, বোনের বিয়ে হবে না, ভাইকে লেখাপড়া শেখানো যাবে না। এতদিন যা কিছু শিখেছি, চিন্তা করেছি, আদর্শ বলে মেনেছি, জীবন দিয়ে পূজা করেছি—সমস্ত একীভূত হয়ে মর্মান্তিক রোদনে মাথা খুঁড়ে মরছে পঁয়ত্রিশ টাকা কিম্বা পঞ্চাশ টাকার চাকরি খুঁজে পেতে। বুঝেছি? আপাতত আমার অফিসের বেলা হচ্ছে, উঠি। আর কারো সঙ্গে দেখা হ'ল না। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে তবু মনে হয় কোন এক বিস্মৃত অতীতে ফিরে গেছি। সে যেন আর এক জন্মের কাহিনী। তবু জানি একবছর আগেও এই চেয়ারে বসে এই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা ভেবেছি। সে জীবনের সঙ্গে নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবু কত ভাল লাগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে। সে কি বুঝতে পার শরদিন্দু?

২৫

ভোরের বেলায় সানাই বাজিতেছিল। উৎসবের সুরের সঙ্গে বিষাদ মধুর ভাব সঞ্চারিত করিয়া সানাই বাজিতেছে। আজ নীহারের গায়ে হলুদ, কা'ল বিবাহ। ভোরের বেলায় আকাশে তখনও শুকতারা, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে। বাঙ্গালী মেয়ের কাছে বিয়ের দিন চিররহস্যময়। চিরনূতনতা ও আনন্দ-উদ্বেগ মিশানো। ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার মনে কত রকম বিচিত্র ভাবনা আনাগোনা করিতেছিল। বেলা হইলে নতুন কাপড় পড়িয়া নূতন মাদুরে বসিয়া মেয়েরা তাহার গায়ে হলুদ মাখাইল। রত্নময়ী বিধবা, তাই তিনি যতদূর সম্ভব এ ব্যাপার হইতে দূরে দূরে রহিলেন। বরের বাড়ী হইতে নাপিতে ক্ষীরমুঠোর কড়ি, বরের গায়ে ছোঁয়ানো হলুদ ও সাদাসিধা সামান্য তত্ত্ব আনিয়াছিল। রত্নময়ী অনেক চেষ্টা করিয়াও বিশেষ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আর ঘরেও ছিল না কিছু। বিনয় বি-এ পাশ করিতে করিতে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্বল একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই বর-পক্ষকে যাহা দিবার কথা তাহার সবটাও তিনি জুটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ করি সেই কারণেই বরের বাড়ী হইতে তাচ্ছিল্য করিয়া তত্ত্ব আসিয়াছিল। একখানা সাদা মিলের শাড়ি ও একটা রঙিন ডুরে। তত্ত্ব দেখিয়া বর্ষিয়সীরা মুখ টেপাটেপি করিয়া হাসিলেন। তরুণীরা মুখ ফুটিয়া নিন্দা করিলেন—ওমা, আজকাল কাপড়ের দামই বা কি, একটা জর্জ্জিয়েট কি একটা মান্দ্রাজী শাড়ি দিলেই পারত। আজকাল ত ওসব কাপড়ের দাম জলের দাম বললেই হয়।

তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি বলিলেন, ক্ষেপেচো তোমরা, ওসব হ'ল গিয়ে চাষাভুষোর গাঁ। ওরা কখনও ওসব কাপড়ের নাম শুনেচে, না চোখে দেখেচে যে দেবে!

প্রাঙ্গণের একধারে খোলায় খই দিবার আয়োজন হইয়াছিল, নূতন খোলায় সিঁদুর দিয়া নূতন উনুনে চড়াইয়া এয়োরা তাহাতে ধান দিতে লাগিলেন। মালতী ছোটমাকে অনেক বলিয়া কহিয়া আজিকার দিনের মত ছুটি লইয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া উৎসুক চিত্তে এই সব স্ত্রী-আচার দেখিতেছিল।

কে একজন মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফিস ফিস করিয়া অথচ মালতীকে শোনাইয়া বলিল, দেখছিস কেমন আদেখ্‌লার মত চেয়ে আছে। বয়স হয়েছে, তবু বাপে বিয়ে দেবার গা করে না। সময়ে বিয়ে হ'লে এতদিন দু ছেলের মা হ'ত।

মালতী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল। উঠানের বাইরে খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে একটা বাতাবি নেবুর গাছ, নেবু ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই দিকটায় লোকজন বড় নাই, এইখানে আসিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চোখে তাহার জল আসিতেছিল, কিন্তু জোর করিয়া নিজেকে সে সংবরণ করিয়া লইল। ছি, ছি! এই সব মেয়েদের নির্লজ্জ উক্তিতে চোখে তাহার জল আসিবে, সে কি এতই হীন, এত নীচ! নেবু গাছের আড়ালে খস খস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া সে দেখিল, বিনয়ের ছোট ভাই অতুল লুকাইয়া বিড়ি টানিতেছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমটায় অতুল চমকাইয়া উঠিল, তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বিড়িতে আর এক টান দিয়া কহিল, এখানে কেন ভাই, মাইরি সত্যি ক'রে বল না?

নিমেষে মালতীর মুখ পাংশু বিবর্ণ হইয়া গেল। এই অতুল! তাহার এত অধঃপতন হইয়াছে। যে বিনয়কে সে দেবতার মত ভক্তি করে, এ তাহারই ছোট ভাই! সকালবেলাকার এত আলো, ঐ উৎসব কোলাহল তাহার কাছে ছায়াছবির মত অলীক বোধ হইতে লাগিল। টলিতে টলিতে দ্রুতপদে সে নিজের বাড়ীতে পালাইয়া গেল। আর বিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়া গেল না। সন্ধ্যাবেলায় মালতী আসিবে কি না ভাবিতেছিল, আর যাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু তথাপি এক প্রলোভন নিরন্তর তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। সেখানে গেলে কোথাও কোন কারণে হয় ত বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইবে। তিনি কাজে খুবই ব্যস্ত, কে জানে, সময়মত চা পাইয়াছেন কি-না।

রান্নাঘরে বসিয়া রুটি বেলিতে বেলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই কথা তাহার মনে আসিতেছিল। কেন যে এ সব মনে পড়ে, মালতী কিছুতেই তার নিশানা পায় না।

এমন সময় নীহার নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মাথার এলো খোঁপায় কাজললতা গোঁজা। পরণে লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি। মুখে তখনও কনে চন্দন মুছিয়া যায় নাই। আসিয়াই মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সই, তুই পালিয়ে এলি কেন? আজকের দিনেও কি ভাই, আমার উপর রাগ করতে হয়? কালকের দিনটি মোটে, তারপরেই ত কত দূরে চলে যাব, পর হয়ে যাব। তখন যতখুশী রেগে থাকিস।

নীহারের কণ্ঠস্বরে এমন একটি করুণতা ছিল যে, মালতীর সমস্ত মন গলিয়া গেল। সে কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার মধ্যে আবেগ এবং অভিমানের একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল, একজন ইচ্ছা করিলেই যেন সমস্ত অন্যায়, সকল অসম্মান হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছা করিতেছে না, নির্লিপ্ত হইয়া দূরে বসিয়া আছে, একান্ত পরের মত।

নীহার বলিল, সারাদিন আশা করেছিলাম তুই নিশ্চয় আসবি। দাদাও বলছিল তোর কথা। দাদা বলছিল, লোকে বলে ক'লকাতা ক'লকাতা। কিন্তু ক'লকাতা শহরে দু'দিন থাকলেই হাঁফ ধরে যায়। রাতদিন তখন ইচ্ছা করে, কখন ছুটি পাব, কখন বাড়ী যাব। এখানকার এই একটু ফাঁকা আকাশ, সবুজ মাঠ, পাখীর ডাকের জন্যে সারা মন উতলা হয়ে ওঠে।

ঝুটি বেলিতে বেলিতে মালতীর হাত আর চলে না, থামিয়া আসে। শুধু কি পাখীর ডাক আর নীল আকাশের হাতছানি বিনয়ের মনকে টানে? তাহার সহিত মিশিয়া থাকে না আর একটি ভক্তিমুগ্ধ হৃদয়ের নিঃশব্দ পূজাঞ্জলি!

মালতী বলিল, আমাকে মাপ কর্ ভাই। হঠাৎ অমন ক'রে চলে আসা ঠিক হয় নি। আর এক দিন বলব তোকে সব কথা, আজ আর কিছু শুনতে চাসনে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ্, জীবনে দুঃখ অনাদর অনেক পেয়েছি, তাই আজ আর লাগে না। কিন্তু অপমান এখন সহ্য করতে পারিনে। মনে হয় এ আঘাত যেন আমাকে পার হয়ে আর কাউকে লাগল। বিয়ের সময় নিশ্চয় থাকব। কিছু ভাবিস নে।

নীহার দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া আসিল। বিশেষ কিছু সে জানিল না। বুঝিতে পারিল, কোন কারণে সইয়ের মনে খুব কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে কারণ যে কি তাহা জানিবার উপায় নাই।

২৬

বিয়ের দিনে বিনয় তখন আসর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। তাহার ছুটি মোটে পাঁচ দিনের। এই কয়েক দিন শহরের সেই বন্দীজীবন ও চাকরির টেবিলে হাত পা টাটাইয়া সারাদিন বসিয়া থাকার পর এ কাজ এত ভাল লাগিতেছিল। আর একজনের সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আরবারে যাইবার সময় সেই সলজ্জ সঙ্কুচিত প্রণাম মনে পড়ে। কিন্তু মালতীকে আর এ বাড়ীতে দেখা যায় না।

বিনয় ব্যথিতচিত্তে ভাবে, বাঙ্গালীর ঘরের যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। অনূঢ়া মেয়েকে অনেক গঞ্জনা ও শাসনের মধ্যে থাকিতে হয়। তাহার উপর মালতীর সৎমা বিনাকারণেও কর্কশ ব্যবহার করেন। বোধ হয় সে বেচারা বাড়ীর বাহির হইবারই হুকুম পায় না। এখানে আসিবে কেমন করিয়া? বিনয় যেখানে ফুলের তোড়া বাঁধিতেছিল, নীহার আসিয়া সেখানে চুপ করিয়া বসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয়ের মনটা করুণায় ছল ছল করিয়া উঠিল। বেচারা, নূতন জীবনের পথে কাল হইতে কত দূরেই না সরিয়া যাইবে! সেখানে ব্যথা পাক, ক্লেশ পাক, লাঞ্ছনা পাক—নিঃশব্দে সমস্তই সহ্য করিতে হইবে। প্রতিকার জানাইবার উপায় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত মা বাবা ভাই বোন লইয়া যে সংসারের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিল-আজ সেখান হইতে অকস্মাৎ কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে। মেয়েদের জীবনে নিঃশব্দে যে কত বড় করুণতম ব্যাপার ঘটিয়া যায় কেহ তাহার খোঁজ করে না। হয় ত মনেও পড়ে না। নীহারের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলিল, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?

—সইয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলুম দাদা। কি জানি, তার মনে কি কষ্ট হয়েছে, ভারি দুঃখিত দেখলাম যেন। তার জন্তে বড় কষ্ট হয়। ভারি অভিমানী। সহজে কাউকে কিছু বলতে চায় না, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পায়।

ফুলের তোড়াগুলা শেষ করিয়া বিনয় আসর সাজাইবার জন্ত কাগজের ফুল কাটিতে লাগিল। মালতীর কথায় সহসা কিছু বলিতে তাহার সাহস হইল না। ও সম্বন্ধে মনের ভাব যেন কেবল করুণার তটরেখা বাহিয়া না, আরও অনেকদূর ছাড়াইয়া গেছে। আগাগোড়া সমস্তটা আর একবার ভাবিয়া না দেখা অবধি কিছুই বলা যায় না।

নীহার হঠাৎ বলিল, আচ্ছা দাদা তোমার বন্ধুদের মধ্যে বেশ শিক্ষিত আর ভাল কি কেউ নেই যে, গরীবের মেয়ে হ'লেও সইকে বিয়ে করে? টাকাকড়ি না চেয়েও।

বিনয় ঠাট্টা করিয়া বলিল, বাস্ রে—আগে নিজের বিয়েখানাই ভাল ক'রে আয়ত্ত কর্, তারপর সইয়ের কথা ভাববি।

নীহার অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু বিনয়ের মনে একটা আন্দোলন, একটা অনুভূতি জাগাইয়া দিয়া গেল। একটি নিঃশব্দ অভিমানিনী অত্যাচারিত হৃদয়কে নির্ভরতা কি দেওয়া যায় না? এ প্রশ্ন তাহার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল।

২৭

ঢোল কাঁসি বাজাইয়া অত্যন্ত সমারোহ করিয়া বর আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা ধরণের কাজে আজ বিনয়ের হাঁপ ফেলিবারও অবসর ছিল না, তবুও সে সজ্জিত আসরের মাঝে সমাগত প্রবীণ মণ্ডলীর মাঝে বরকে সভাস্থ দেখিয়া আসিয়া কেমন একটা অবসাদের ভারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। আর কোন কাজেই তাহার হাত পা উঠিতে চাহিল না। এই কি আর কয়েকঘণ্টা পর নীহারের স্বামী হইবে? ছেলেটির নাম ভবতারণ। তাহার মাথায় তেল চক্চকে টেরি। গায়ে একটা সবুজ শার্টের উপর চায়না কোট। মুখের ভাবে একটা স্থূল নির্ব্বুদ্ধিতার ছাপ। চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেছে। বরের দাদা ভবরঞ্জনবাবু জনান্তিকে বিনয়কে শুনাইয়া শুনাইয়া এক বন্ধুকে বলিতেছিলেন, আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, শুধু হাতে মেয়ের সম্বন্ধ করবার বড়াই রাখে এমন জানলে মোশাই কোন্ শালা এ পথ দিয়ে হাঁটে! ভদ্রলোকের এক কথা। মরদ কি বাত! নইলে কি আজ আর ভাইয়ের বিয়ে দিতে এ গাঁয়ে আসি। সুখজোড়ার ভবরঞ্জন বোস একবার যখন কথা দিয়েছে, তখন সে কথার আর নড়ন চড়ন নেই, ব্যস! কুলোয় ডালায় করে দু'টো ছেলে-ভুলোন সামগ্রী দিয়ে মোশাই ব্যাটারা কাজ সেরেছে। ছোটলোকপনার কথা আর ব'লবেন না। ইচ্ছে করে ···

বিনয় সেখান হইতে সরিয়া গেল। নীল আকাশের চন্দ্রাতপে অসংখ্য অগণ্য তারা জ্বলিতেছে, তারার আলো স্পন্দিত হইতেছে। এই তারাভরা অসীম আকাশের নীচে এখনই বিবাহের মন্ত্রপূত পুণ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। তাহার পর কি? তাহার পর সমস্তই কি ঐ বিরাট নক্ষত্রলোকের মত একটা পরিপূর্ণ সঙ্গীতের মত দিব্যসুরে বাজিয়া উঠিবে? না না, তা নয়। সংসারে যেদিকে চাওয়া যায়, কোথাও ঐ নক্ষত্রজগতের অনাহত সুর জীবনবীণায় বাজে না। সেখানে পদে পদে বর্ব্বরতা, নীচতা, অসহ্য দুঃখ। ছন্দ নাই, সঙ্গীত নাই। স্নেহময়ী বড় আদরের ছোট বোনটির জীবনের পুণ্যতম শুভ লগ্নে এসব অশুভ ভাবনা কেন বারংবার মনে আসে? বিনয় জোর করিয়া ভুলিতে চাহিল, কিন্তু অন্ধকারের নিকষ পটে আঁকা আগুনের রেখার মত নীহারের ভাবী জীবনের অবসাদ এবং

অসম্মান, ক্লেশ এবং নিরানন্দ শুধু উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তখন সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আপনাকে আপনই বলিল, আমি মিছে ভাবছি। বাঙ্গালী ঘরের বেশির ভাগ মেয়ের জীবনই ত এই। তারা সহ্য করবার বল পায় তাদের চিরযুগসঞ্চিত আদর্শবাদ আর সহিষ্ণুতার গুণ দিয়ে। ভগবান দুঃখ যখন দেন তখন সইবার শক্তিও দেন। তা ছাড়া, আমি কেনই বা এত ভাবছি। নীহার হয় ত তার ভাবী জীবনকে মোটেই কষ্টকর মনে করবে না। স্বামী যেমনই হোক, হিন্দু মেয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিচার ত করে না। তাদের বাঁচায় তাদের বহুজন্মসঞ্চিত মনের আদর্শ পূজা। নীহার সেই বাঙ্গালীর মেয়ে। তার মনে পূজারিণী পূজা করবার আয়োজন নিয়ে বসে রয়েছে। দেবতাকে সে গ্রহণ করবে। তাঁকে বিচার কিংবা বিশ্লেষণ করবে না।

ভিতর বাড়ী হইতে ঘন ঘন শাঁখ ও উলুধ্বনির শব্দ আসিতে লাগিল। বিনয় মনে মনে অদৃশ্য জীবনদেবতাকে প্রণাম করিল। সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

২৮

বেলা তখন পাঁচটা বাজে, বাইরের আকাশে সূর্য্যাস্তের রাঙা রং হয় ত চারিদিকে আবীর ছড়াইয়া দিয়াছে, হয় ত এতক্ষণ শান্ত গ্রাম্য পথে ধূলা উড়াইয়া চারণ শেষে গাভীদল গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। বিনয়ের কল্পনার চোখে কত দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিতেছে, সে নিজে কিন্তু অন্ধকার দোকানঘরে বিজলী বাতি জ্বালাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাতার পর পাতা অর্ডারের নকল ও ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব লিখিয়া চলিয়াছে। মন বিদ্রোহী হোক, দেহ শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়ুক, কলের কাঁটার মত তাহার হাত লিখিয়া চলিয়াছে, সে লেখাতেও কোথাও এতটুকু ভুলচুক নাই। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাড়ে সাতটা বাজিল। এতক্ষণে এ বিভাগের অফিস বন্ধ হইল, কলমটা রাখিয়া বিনয় সোজা হইয়া চেয়ারে বসিল। মনে মনে তাহার শ্রান্তির ভার আজ আরও বেশি করিয়াই ঘনাইয়া আসিয়াছে। এ দোকানে কাজ করিতে যত খারাপই লাগুক, এতদিন মনে একটা আশা ছিল, যোগীনবাবু ভাল হইয়া চেষ্টা-চরিত্র করিলে হয় ত একটা ভাল কাজ যোগাড় হইবে শেষ অবধি। আজ সে আশাও ভাঙ্গিয়াছে। সকালের দিকে দারোয়ানের নিকট অনেক সুপারিশ করিয়া যোগীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশাধিকার মিলিয়াছিল। তিনি অন্ধকার ঘরে একটা আরাম কেদারায় শুইয়াছিলেন, বিনয় ঢুকিয়া প্রথমে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন করিল, যোগীনবাবু কহিলেন, আর ভাল থাকা! এই দেখ না ডাক্তার আর চেঞ্জ নিয়ে এই তিন মাসে আমার বারো হাজারের উপর খরচ হয়ে গেল। ব্যাটারা যেন ছিনে জোঁক। রক্ত চুষতে পারলে আর কিছু চায় না। কোন বেটা বলে সিমলে যান, কেউ বলে কার্সিয়াং, কেউ বলে গ্যারো পাহাড়। কেউ-বা আবার বলে, এদেশে কিছু হবে না। যান সুইজারল্যাণ্ডে একটা ছোটখাট কটেজ কিনে নিয়েই হোক, বা তৈরী করে হোক বাস করুন। তাদের আর কি, বললেই হ'ল। এক একবার মোটর হাঁকিয়ে আসবে বত্রিশ টাকা, চৌবট্টি টাকা ভিজিট নেবে—আর এক একটি মূল্যবান পরামর্শ দেবে। মাঝে থেকে আমার প্রাণটি গেল।

বিনয় লজ্জায় ঘামিয়া উঠিয়াছিল। কি করিয়া এখন বলা যায় এঁকে কথাটা। অবশেষে একথা সেকথার পর প্রায় মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, আজ্ঞে খবর বেরিয়েছে, আমি অনার্স পাইনি বটে, তবে ডিসটিংশনে বি-এ পাশ করেছি।

যোগীনবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কহিলেন, আরে রেখে দাও, আজকাল বি-এ পাশের মূল্য কি? আমার মেজ ছেলেটা তিনবার আই-এ ফেল্ করলে, আমি দিলুম তাকে বিজনেসে ঢুকিয়ে। এখন সে অমন কত গণ্ডা বি-এ, এম-এ চাকর রাখছে।

বিনয়ের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। কি বলিবে সে। জীবনে কখনও অপমান গায়ে না মাখিয়া চাটুবাণী শোনাইয়া খোসামোদ করিতে শেখে নাই। কেমন করিয়া এই দাম্ভিক বর্বরকে মিথ্যা খোশামোদ করিবে। মুখ নীচু করিয়া তথাপি মৃদুস্বরে সে কোন মতে বলিল, আজ্ঞে বাবা নেই, আপনাকেই বাবার মত মনে করি। আপনি বলেছিলেন, বি-এ পাশ করতে তাই ···

যোগীনবাবু কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, যখন বলেছিলাম তখন আলাদা কথা ছিল। এখন আমি নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে কাজ-কর্ম্ম থেকে একরকম রিটায়ার করেছি বললেই হয়। আর তুমিও বেশ লোক, দেখতেই পাচ্ছ আমার অবস্থা। আর দারোয়ান ব্যাটাও হয়েছে তেমনি হারামজাদা, যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাদের আমার মেজছেলের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে ডাক্তার বারবার বলে দিয়েছে। ব্যাটা ছাতুখোরের মাথায় সে কথাটা আর ঢোকে না। তুমি শোননি বোধ হয়, ডাক্তারের হুকুম মত আমার একসঙ্গে পোনের মিনিটের বেশি কারো সঙ্গে কথা কওয়া বারণ।

ইহার পরে বিনয় আর সেখানে দাঁড়ায় নাই। একটি আনম্র সুন্দর নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাত পা সোজা করিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। কলিকাতার রাজপথে তখন বরফওয়ালা বরফ ফিরি করিতেছে, ফুলের মালা ফেরি হইতেছে। খোলা দোতালা বাসে দিনান্ত রম্য গ্রীষ্মের বাতাসে কত যাত্রী হাস্য-গল্পের স্রোতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

আহিরিটোলার একখানা মেসে যে ঘরটায় বিনয় থাকিত, সে ঘরখানা বড়। সে ছাড়া আরও দু'জনের খাট পাতা আছে। একজন অফিসে কেরাণিগিরি করেন, ভূপতি মুখুয্যে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। তক্তাপোষের পাশে একটা ছোট জলচৌকির উপর তাঁহার কোশাকুশি, একখানি কম্বলের আসন, আহ্নিকের সমস্ত সরঞ্জাম সাজানো। তামাক খাওয়ার টিকে আর গুলে তাঁহার অংশের মেঝেটা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত। ভদ্রলোক যতক্ষণ ঘরখানায় থাকেন, কল্কে বদলাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খান। না খাইয়া থাকিতে পারেন না। আর একটা খাটে বিনোদ বক্সী থাকে। সে একটা ইন্সিওরেন্সের দালাল। তামাক খায় না, সস্তা দামের সিগ্রেট এবং এক পয়সা পেয়ালা মুখচিহ্নিবিহীন ভাঁড়ে চা অজস্র পান করে। সাপ্তাহিক কাগজে ফুটবলের খবর দেখা এদের মধ্যে। এক পয়সা দামের হইতে শুরু করিয়া নানা প্রাণের

সাপ্তাহিক কাগজে তাহার টিনের স্যুটকেসটার উপরিভাগ বোঝাই হইয়া আছে। বিনয় যখন ঘরে ঢুকিল তখন মুখুয্যে মশায় আহ্নিক করিতেছেন এবং বক্সী তাহার সিগারেটে আগুন ধরাইয়া সবেমাত্র টান দিয়াছে। জামাটা খুলিয়া দেয়ালে টাঙানো একটা পেরেকে ঝুলাইয়া দিয়া বিনয় বিছানায় শুইয়া পড়িল। এই সময়টা তাহার এত অবসাদ লাগে। বিছানা হইতে উঠিয়া এক গ্লাস জল অবধি গড়াইয়া খাইবার সামর্থ্য থাকে না।

বিনোদ সিগারেট খাইতে খাইতে সোল্লাসে কহিল, ইস্‌র্পিংটিন্‌-এর খেলার কায়দাটা একবার দেখলেন বিনয়বাবু? চমৎকার! সায়েবদের হাজার হোক—ব্রেণ আছে।

বিনয় কহিল, সম্ভবত আছে। ওরা তো আমাদের মত ঝিঙে-চচ্চড়ি আর চুনো মাছ খেয়ে দু'বেলা কাটায় না।

মুখুয্যে মশায়ের হাতের মালাটা ঘন ঘন চলিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল কি একটা বলিবার জন্ম তিনি যেন অতিশয় উত্তেজিত হইয়া শীঘ্র আহ্নিকটা সারিয়া ফেলিতে চাহেন।

মিনিট পাঁচেক পর গড় হইয়া প্রণাম করিয়া পূজাহ্নিক সমাপনান্তে হাতের হরিনামের মালাটা ঝোলার ভিতর পুরিয়া পেরেকে টাঙাইয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন, কি বললেন বিনয়বাবু, ঐ ম্লেচ্ছ ব্যাটারা গোখাদক ব্যাটারা ওদের রয়েছে ব্রেণ! দু'টি বেলা ব্যাটাদের শূয়োরের মাংস নইলে মুখে রোচে না, রাধাকৃষ্ণ বল! রাধামাধব, তুমিই ভরসা। হে দীনদয়াল গৌরাঙ্গ।

বিনোদ বক্সী বলিল, আর কাঁচকলা এবং আলো চাল খেয়ে আমাদের স্বর্গে যাবার সিঁড়ি রাতারাতি তৈরী হয়ে উঠ্‌ছে, না মুখুয্যে মশায়? যত ব্রেণ আমাদেরই।

তখন বিনোদের সঙ্গে মুখুয্যে মশায়ের তুমুল তর্ক ঘনাইয়া উঠিল। বিনয় চুপ করিয়া শুইয়াছিল। মানুষে কেন যে উত্তেজিত হইয়া তর্ক করে, কেন একটা মত জোর গলায় প্রতিপন্ন করিতে চায়। কি উৎসাহ লইয়া এসব করে, তাহার মানে বিনয় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সমস্ত জগতটা তাহার কাছে একটা অবসাদগ্রস্ত জরাজীর্ণ ভাবের মত বোধ হইতেছিল। এখানে যে ফুটবল টিমের কথা লইয়াও কেহ উচ্ছ্বসিত আলোচনা করে, মাংস খাওয়া ভালো, না আলো চাল খাওয়া প্রশস্ত, তাহা লইয়াও অনেকে আলোচনা এবং তর্ক করিতে পারে, এ ব্যাপারটাই যেন হাস্যকর। ক্রমশ

কবি-কথা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্বসী

১০

সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরেজী সাহিত্যে সমান অধিকার আছে—বাছিয়া বাছিয়া এমন পণ্ডিতকেই ঠাকুর-বাড়ীর ছেলেদের শিক্ষকতার জন্ম সাদরে বরণ করা হইত। অন্যান্ত ছেলেরা গৃহশিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লইলেও বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কিন্তু তাহাতে সহজে আকৃষ্ট হইতে চাহে না। বিশেষত, ডালহৌসী পাহাড় হইতে ফিরিবার পর—এই অদ্ভুত বালকের মনোবৃত্তি এবং পাঠে বিতৃষ্ণা অভিভাবকদিগকে সত্য সত্যই চিন্তিত করিয়া তোলে। কোন প্রকারে তাঁহারা জানিতে পারিলেন, বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা ও মামুলী শিক্ষাপ্রণালী রবির একান্ত অবাঞ্ছিত; যোগ্য গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বরং তাঁহার পড়াশুনা সম্ভব হইতে পারে। ফলে রবির জন্ম যে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মিষ্টভাষী শিক্ষকটি অতঃপর মনোনীত হইলেন—তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যেমন অসামান্ত, শিক্ষাদানের নৈপুণ্যও তেমনি প্রশংসিত। ইনিই জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

বাল্যসঙ্গিনীর সহিত পড়াশুনা সম্বন্ধে সংলাপের কয়েক দিন পরেই এই নূতন পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুর-বাড়ীতে আসিয়া রবির অধ্যয়নের চার্জ্জ গ্রহণ করিলেন। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ও এই সময় রবিকে শকুন্তলা পড়াইতেছিলেন; শকুন্তলার স্ফুলর শব্দঝঙ্কার ও রসমাধুর্য্য বালক-কবির অন্তর আকৃষ্ট করিলেও শিক্ষকের ব্যাখ্যায় ছাত্রের অন্তরের ক্ষুধার উপশম হইত না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইতেন, তাহাতেও বালকের আগ্রহ চরিতার্থ হইত না। তিনি তখন নিজেই দুরূহ শ্লোকগুলির মনগড়া সহজ অর্থ খাড়া করিয়া কাব্যের রস উপভোগ করিতে প্রয়াস পাইতেন।

এই অবস্থায় আর একজন বিদ্বান পণ্ডিত ইংরেজী-সাহিত্য পড়াইতে আসিতেছেন শুনিয়া কবি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। শকুন্তলার পাঠ পড়াইয়া রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইবার পরেই দেখা দিলেন নূতন পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ইনি আবার সুবিখ্যাত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কৃতী পুত্র—সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার পাণ্ডিত্য অসামান্ত।

গুরু শিষ্যে চোখোচোখী হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিমুখে নূতন ছাত্রকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি নাকি এই বয়সে কবিতা লিখতে শিখেছ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রবির চোখ দুটি সহসা বড় হইয়া উঠিল; ঝাঁ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—নর্ম্মাল স্কুলের কথা; গোবিন্দবাবুও একদা তাঁহাকে ঠিক এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার কালো মুখখানার উপর তখন অবিশ্বাসের একটা ছায়া গাঢ় হইয়া ফুটিয়াছিল, আর এই প্রশ্ন-কর্তাটির প্রসন্ন-সুন্দর মুখখানি যেন প্রত্যয়ের আলোক-পাতে ঝলমল করিতেছে। সেদিন বালকের বুকখানি ভয়ে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিয়াছিল, আজ সেখান হইতে সঙ্কোচের আবরণ সরিয়া গিয়াছে, চিত্তের উচিতা সাহসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে রবি ধীরে ধীরে তাঁহার পুস্তকের স্তূপের ভিতর হইতে বাঁধানো খাতাখানি বাহির করিয়া আগাইয়া দিলেন।

খাতাখানি খুলিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রসন্ন দৃষ্টিপথে সরু সরু সুশ্রী অক্ষরে লেখা যে কবিতাটি বাহির হইয়া পড়িল, তিনি নিজেই তাহা আবৃত্তির ভঙ্গিতে পাঠ করিলেন :

প্রথম আষাঢ়ে রামগিরি হতে বহি বিরহের বাণী
গিয়েছিল দূত নীল ঘন মেঘ সে কথা সবাই জানি।
প্রথম আষাঢ়ে জোড়াসাঁকো হতে মিলনের দূত চলে
পীত-বাস পরা নব রবিকর প্রভাত-গগন তলে।

কবিতাটি পড়িয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হর্ষোৎফুল্ল মুখে কহিলেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত!

নূতন শিক্ষকের মুখে কবিতার এরূপ সুখ্যাতি শুনিয়া বালক-কবির সুন্দর মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সহাস্যে তিনি কহিয়া উঠিলেন—কবিতার চেয়ে আপনার আবৃত্তি হয়েছে অনেক ভালো, এইজন্যেই কবিতার রূপটিও বদলে গেছে।

শিষ্যের কথা গুরুর মনেও দোলা দিল বোধ হয়; প্রসন্নমুখে তিনি কহিলেন—না হে, কবিতা ভাল না হলে আবৃত্তিও ভাল হয় না। ভাল কবিতা যে লিখতে পারে—তার আবৃত্তি আরও ভাল হয়, এটা স্বাভাবিক। বেশ, এবার তুমিই এটা আবৃত্তি কর ত, দেখা যাক—কেমন শোনায়।

খাতাটি লইয়া কবি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজেরই পরিকল্পিত সুরে কবিতাটি পড়িলেন। শিক্ষক চমৎকৃত, মুগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—অপূর্ব্ব! আমি কবিতাটি আবৃত্তি করেছি, কিন্তু তুমি যেন একখানি গান গাইলে। আর কেউ হ'লে আমি যে ভাবে পড়েছি—সে তারই নকল করে আমাকে খুশী করতে চাইত, কিন্তু তুমি তার ধার দিয়েও যাওনি। তোমার বয়সের ছেলের পক্ষে এটুকু খুবই প্রশংসার কথা। প্রতিভার এ একটা মস্ত লক্ষণ; যাঁরা প্রতিভাবান, ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা নিজের চেষ্টায় নতুন রাস্তা তৈরি করে নেন। তোমার শক্তি আছে, এ শক্তি সহজাত, ইচ্ছা করলে পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে শিক্ষার সাধনা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে চলে—কালে তুমি মহাশক্তিধর হবে, প্রতিভার বরপুত্র বলে লোকে তোমার সুখ্যাতি করবে।

ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এত বড় আশার কথা শুনিয়া বালকের মনের মধ্যে কি হইতেছিল কে জানে, কিন্তু তাঁহার মুখে উৎসাহের কোন চিহ্ন দেখা গেল না; জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রদ্ধাভাজন এই শিক্ষকটির পানে চাহিয়া তিনি মৃদুস্বরে শুধু কহিলেন—কিন্তু স্কুল ছেড়েছি ব'লে লোকের মুখে এখন আমার নিন্দা আর ধরে না, সকলেই ঠিক করে রেখেছে—আমার কিছু হবে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—আমি তা জানি, কিন্তু তুমি এজন্যে দুঃখ ক'র না। লোকে তলিয়ে কিছু দেখে না, বাইরেটা দেখেই মনে মনে একটা ধারণা পাকা ক'রে ফেলে। আমি কিন্তু সে লোক নই, এক নজরেই তোমার ভিতরটা সব দেখে নিয়েছি, তাছাড়া অনেক খবরও আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে তোমাকে ভাল ক'রে চেনবার জন্যে। যাক, তোমার মন আর রুচির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি তোমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করব।

এই সময় ঠাকুর-বাড়ীর জনৈক পরিচারক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানা বাঁধানো বই। সেখানি শিক্ষক মহাশয়ের সুমুখে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। বালকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, নূতন শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশেই বইখানি তাঁহার টেবিলে আসিয়াছে।

সহাস্যে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—কি বই এখানি বল ত?

বইয়ের বাঁধানো মলাটেই স্বর্ণাক্ষরে নামটি লেখা ছিল। বালক উত্তর দিলেন—ম্যাকবেথ।

—এর গ্রন্থকারের নাম জান?

—শেক্সপীয়র। বিলাতের একজন মহাকবি।

—তুমি এ বই পড়েছ?

—পড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কারুর সাহায্য পাইনি বলে বুঝতে পারিনি। বুঝিয়ে নিতে গিয়ে বকুনি খেয়েছি। বড়রা বলেন—এ বই পড়বার বয়স এখনও আমার হয়নি।

—বুঝতে এখন ইচ্ছা করে?

—খুব। নিজের বিদ্যেয় যেটুকু বুঝতে পেরেছিলুম, আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

ছাত্রের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া শিক্ষক মহাশয় দৃঢ়স্বরে কহিলেন—ভাল কথা। এই বইখানাকেই তা হ'লে তোমার পাঠ্য করা গেল। আর অধ্যাপনা তোমার পিতাঠাকুরের ধারাতেই চলবে, কি বল?

বিস্ময়ানন্দে বালকের মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু এ সম্বন্ধে মনে যে প্রশ্ন জাগিল, মুখ দিয়া তাহা বাহির হইল না। শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি বালকের মুখেই নিবদ্ধ ছিল, হাসিয়া তিনি কহিলেন—ভাবছ বুঝি আমি কি ক'রে এ খবর পেয়েছি? আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে হে! রোগী দেখতে এলে বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন তার হাড়হদ্দ সব জেনে তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, ছাত্রের সম্বন্ধেও শিক্ষককে তেমনি সবজান্তা হতে হয়—বুঝেছ? তার কি প্রয়োজন, কি ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে উৎসাহ তার বাড়বে—এগুলো শিক্ষকের জানা চাই। তাই শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের উভয়েরই সহযোগিতার দরকার। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার ঝোঁক এখন কবিতা রচনার দিকে। আমি এতে বাধা দেব না, বরং এ ব্যাপারে আমার কাছ থাকে তুমি উৎসাহই পাবে। এমনভাবে আমি তোমাকে ইংরেজী সাহিত্য পড়াবো—যাতে তোমার মনে বিরক্তি আসবে না, বরং আনন্দ আর কৌতূহল তাতে আরও জাগ্রত হবে।

কোন শিক্ষকের মুখে এ পর্য্যন্ত বালক-কবি শিক্ষা সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট ও উদার নির্দ্দেশ শুনিবার সুযোগ পান নাই। সকলেই গম্ভীর মুখে শক্ত শক্ত উপদেশ দিয়াছেন, পাঠে অবহেলার প্রসঙ্গ তুলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এমন সরলভাবে মনের কথা কেহ খুলিয়া বলেন নাই—বালকের মনের খবর লইবার কোন চেষ্টাও কেহ করেন নাই। এই অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ ছেলেটি যে প্রচলিত পদ্ধতিকে দুই চক্ষু বুজাইয়া কিছুতেই মানিয়া লইবে না—এই বয়সেই প্রত্যেক জিনিসটি নিজের বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে ইচ্ছুক, শিক্ষকমহাশয়দের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। বালকের রহস্যময় হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন এই প্রথম জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—আমি এই ম্যাকবেথ নাটকখানির এক একটি পৃষ্ঠা

আবৃত্তি ক'রে তোমাকে বাঙ্গালায় তার অর্থ বুঝিয়ে দেব, তুমি ছন্দে তার অনুবাদ ক'রে খাতায় লিখবে। কেমন, আমার এ যুক্তিটা কি রকম মনে হয়?

উচ্ছ্বসিত উল্লাসে বালক-কবি উত্তর দিলেন—চমৎকার! এতে আমার ভারি উৎসাহ হচ্ছে। আপনি পড়া শুরু করুন, আমি খাতা নিয়ে বসি।

উদাত্ত কণ্ঠে ম্যাকবেথের প্রথম দৃশ্যটি ইংরেজীতে আবৃত্তির পর শিক্ষক মহাশয় সরল বাঙ্গালায় তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, ছাত্রও সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে তাহার অনুবাদ করিয়া শিক্ষকের প্রশংসা-ভাজন হইলেন।

শিক্ষক মহাশয়ের প্রস্থানের পরেও ছাত্রের পাঠোৎসাহ হ্রাস পায় নাই, দেহে ও মনে কিছুমাত্র ক্লান্তি আসে নাই; অনুবাদের সংশোধিত অংশগুলিকে নূতন উদ্যমে নূতন ভাবে ছন্দোবদ্ধ করিতে গভীরভাবেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সঙ্গিনীটি মাথার বেণীটি দোলাইয়া এবং উচ্ছ্বসিত হাসির ধারা অতি কষ্টে চাপিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঠিক পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষুর কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি কবির খাতায় নিবদ্ধ। শেষ ছন্দটি শেষ করিয়া কবি মুখখানি তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় কলহাস্যে ঘরখানি মুখরিত করিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল—আজ যে ছেলের পড়ায় ভারি চাড় দেখছি, একটা মানুষ যে এসে দাঁড়িয়েছে—সেদিকে হুঁসটি পর্য্যন্ত নেই! হ'ল কি শুনি?

বালক-কবির মুখে এখন আর হাসি ধরে না; সদ্য-সমাপ্ত লেখাটির পৃষ্ঠায় বালিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বরচিত এবং সঙ্গিনীর অতি পরিচিত একটি কবিতা মধুর স্বরে বিচিত্র ভঙ্গিতে পড়িয়া প্রশ্নটির উত্তর দিলেন—

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি আজ ভালবাসা পেলে
আঁধার হৃদয়ে কি আলোক জ্বলে।

হাসির গমকে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া বালিকা কহিল—বা-রে ছেলে, তোমার পদ্যের কমলার কথাগুলো বলে আমাকে তাক্ লাগিয়ে দেবে ভেবেছ? আমিও জবাব দিতে জানি, শুনবে—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল,
পারে না পুরিতে তারা বিশাল মানুষ হৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

কবিতাটি বালক-কবির অনুরূপ ভঙ্গি ও সুরে আবৃত্তি করিয়া হাসিমুখে বালিকা কহিল—কেমন? মানুষকে ত জানলে, কিন্তু মানুষের মন কি চায় সেটি কে জানাবে মশাই? কেমন মিলিয়ে দিলুম বল—তোমারই পদ্য চুরি ক'রে! একেই বলে গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো। কেমন লাগল?

মুগ্ধদৃষ্টিতে সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া সহাস্যে কবি কহিলেন—ভাল ত লাগলই, মানুষটির মনেও লেগে রইল।

উত্তরটি শুনিয়া বালিকা বোধ হয় খুশীই হইল। পরক্ষণে চঞ্চল দৃষ্টি তাহার খাতাটির উপর মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—পড়তে বসে মেলা পদ্য লিখে ফেলেছ যে! মাষ্টারটি তা হ'লে মনের মতন হয়েছে বল? পড়তে বসে পদ্য লিখিয়ে গেলেন!

বালিকার মুখের চাপা হাসি এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বালকের মনে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল; ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার কৌতুকোজ্জ্বল ভঙ্গিটি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, এর গোড়া হচ্ছ তুমি!

ফিক করিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—গোড়া? গাছের গুঁড়িকে ত গোড়া বলে, আমি ত মানুষ—খুদে একটি মেয়ে।

—তা হ'লেও তুমি সহজ মেয়ে নও, গাছের গুঁড়ি যত বড়ই হোক, তার বুদ্ধি কতটুকু! আর তুমি যে কত বড় চালাক, তোমার মুখের হাসি আর চোখের চাউনি দেখেই বুঝিছি।

—কি বুঝেছ শুনি?

—সেদিন পড়াশোনার ব্যাপারে বাবার কাছে পড়ার যে সব কথা তোমাকে বলিছি, আজকের এই নতুন পণ্ডিতটিকে তুমি সব বলে দিয়েছ। নইলে তিনি আমার মনের খবর পেলেন কি ক'রে?

—তা হ'লে ওঁর পড়ানো তোমার মনে ধরেছে বল? তাই এখনও ওঠবার নামটি নেই!

—আমার অনুমানটি তা হ'লে সত্যি? পাছে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বওয়াটে হই—বাড়ীশুদ্ধ সবার নিন্দে কুড়ই, তাই তুমি—

খপ করিয়া সঙ্গীর মুখখানি কোমল করপল্লবে আবৃত করিয়া বালিকা শাসনের ভঙ্গিতে কহিল—চুপ, এ নিয়ে আর কথা নয়। ফল খাওয়া নিয়েই যেখানে মতলব, ভাল ফলটি পেলেই ত ল্যাটা চুকে গেল। কোথা থেকে ফলটি এলো, কোন্ গাছের ফল, কে পাড়লে—এ সব খবরে কি দরকার বাপু! হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনেছ—আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল?

আগ্রহের স্বরে বালক প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছিল আবার?

বালিকা উত্তর দিল মুখখান রীতিমত গম্ভীর করিয়া—গাড়ী উল্টে গিয়েছিল, হাত পা মাথা ভেঙ্গে যেত সব; ভাগ্যিস্ ঘোড়াটা ভাল ছিল, তাই রক্ষে! হৈ হৈ করে ছুটো পুলিশ এলো ছুটে!

মুখে আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বিচিত্র স্বরে বালক কহিলেন—য়্যাঁ! পুলিস এসেছিল ছুটে! ধরে নি ত?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমাদের ধরতে নয়, গাড়ীখানাকে ধ'রে তুলতে।

মুখখানা এবার প্রসন্ন করিয়া বালক কহিলেন—বাঁচলুম। আমার দিদিকেও একবার পুলিসে ধরতে এসেছিল।

দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বালিকা কহিল—ওমা, সে কি?

বালক-কবি গল্প বলার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন—তোমার মতন বয়সে আমার দিদিও স্কুলে পড়তে যেতেন। সেদিন দিদি পেশোয়াজ পরে পাল্কী চেপে পড়তে যাচ্ছিলেন। তাঁর গায়ের রঙ ত দেখেছ, পুলিস ভাবলে কোন ইংরেজের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে; অমনি তারা জোর ক'রে পাল্কী থামালে।

সভয়ে বালিকা কহিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ! দিদি তখন কি করলেন?

গম্ভীর মুখে কবি কহিলেন—সেইটিই ত ভারি মজার! অন্ত মেয়ে হ'লে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠত, কেঁদে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধিয়ে বসত, দিদি কিন্তু ভয় পাবার মেয়েই নয়, মুখখানা তুলে চোখ দুটো বড় ক'রে যেই বললেন—'জানো আমি কে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাত্নী'—তখন পুলিস একেবারে থ, পাল্কী ছেড়ে দিয়ে মাপ চেয়ে দে ছুট!

বালিকার মুখেও হাসি ফুটিল, কহিল—ভাগ্যিস্ দিদির কথা বললে, জানা রইল; এর পর কোন দিন ইস্কুলের পথে পুলিস যদি আমাদের গাড়ী ধরে, আমি অমনি চোখ দুটো পাকিয়ে বলবো—জানো আমি কোন্ বাড়ীর মেয়ে, আর আমার খেলার সাথী কে? প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি—মস্ত বড় কবি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মুখেই হাসির লহর ছুটিল। হাসিতে হাসিতে বালিকা কহিল—আজ যখন এত তোমার স্ফূর্ত্তি, মনের মতন মাষ্টার পেয়েছ, তখন একখানা গান শুনিয়ে দাও না।

সহাস্তে বালক কহিল—গাড়ী উলটাবার পর গান ভাল লাগবে? আচ্ছা তা হ'লে গান একটা ধরি, শোনো—

বালক-কবি স্নেহের সুরে সকৌতুকে গান ধরিলেন:

হায়রে হায়—সা রে গা মা পা ধা নি সা!
(আমার) গাড়ীর হ'লো উল্টো মতি
কোথায় হবে আমার গতি—
খুঁজে আমি পাই না দিশা!
সারে গামা পাধা নিসা।

গানের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের উচ্ছ্বসিত হাসির গমকে পাঠাগারটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

১১

আরও কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বালক-কবির 'ম্যাকবেথ' পড়া এবং ছন্দে তাহার অনুবাদ সারা হইয়া গিয়াছে। ম্যাকবেথের পর আরও কয়েকখানি ইংরেজী সাহিত্যের বই বালক এইভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর ইংরেজী বই পড়িতে বালকের বাধে না, বিরক্তিও লাগে না। বিদেশী ভাষার সাহায্যেও যে বিচিত্র রস-আস্বাদন করিতে পারা যায়, বালক-কবি এখন ভালভাবেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সময় কবি-বালকের মনের উপর আরও দুইটি জিনিস আশ্চর্য্য রকমের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের একটি হইতেছে 'বঙ্গদর্শন' নামে মাসিকপত্র পড়া, অন্যটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মত কবিতা লিখিয়া লোকের প্রশংসালাভ করা। 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইয়া বাড়ীতে আসিলে তখন কাড়াকাড়ি কাণ্ড পড়িয়া যায়, ছোট-বড় সবারই লক্ষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের দিকে। বিপুল আগ্রহে প্রত্যেকেই কাগজখানির প্রতীক্ষা করিতে থাকে। বাড়ীর মেয়ে-মহলেও বঙ্গদর্শনের আদরের অন্ত নাই। বালক-কবি মেয়েদের এই আগ্রহটুকেই সুযোগ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এক সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের আগ্রহ চরিতার্থ করিতে বালকের উপরই ভার পড়িয়াছে বঙ্গদর্শন পড়িয়া সকলকে শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিবার। বালকের আবৃত্তির প্রশংসা সকলের মুখে, সুতরাং পাঠকরূপে বঙ্গদর্শন পাঠের অবাধ সুযোগটি অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটিতে রীতিমত এক অন্তরায় দেখা দিয়াছে এবং তাহাতে বালক-কবির ভবিষ্যতে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মত বড় কবি হইবার আশা ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। যেহেতু, জ্যোতি দাদার স্ত্রী বালকের বৌঠাকুরাণীর মনোরঞ্জনের জন্ম যাবতীয় ফাই-ফরমাস খাটিয়াও কবিতার ব্যাপারে কিছুতেই তাঁহার প্রশংসাটুকু আদায় করিতে পারেন নাই। বালক-কবির যে সকল কবিতা পড়িয়া একবাক্যে সকলেই সুখ্যাতি করিয়া থাকেন, বৌঠাকুরাণীর কানে তাহার কোনটিই ভাল লাগে নাই; অধিকতর যত্নসহকারে যতবারই কবি নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি বিকৃত করিয়া উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলিয়াছেন—যত চেষ্টাই কর না কেন, কস্মিনকালেও তুমি বিহারীবাবুর মতন কবিতা লিখতে পারবে না।

বৌঠাকুরাণীর এই কথাগুলি বালকের বুকে যেন তীরের ফলার মত বিঁধিয়াছে; মনের কষ্ট মনে চাপিয়া, অভিমানে সুন্দর মুখখানি অন্ধকার করিয়া বালক বৌঠাকুরাণীর সহিত আড়ি দিয়াছেন। এদিন আর তেতলায় বৌঠাকুরাণীর মহলের ত্রিসীমানায় যান নাই, দোতালায় সেই রেলিং-দেওয়া বারান্দাটিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। এই নির্জ্জন স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সঙ্গিনীটি সেখানে আসিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিল, ভ্রূভঙ্গি করিয়া ধমক দিয়া কহিল—আচ্ছা ছেলে ত তুমি, এখানে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ, আর তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা বাড়ী মাত করে বেড়াচ্ছি আমি! অ-মা, মুখখানা যে বর্ষার আকাশের মতন কালো হয়ে উঠেছে, দুঃখুটা কিসের শুনি?

বালিকার আবির্ভাবেই কবি-বালকের মুখের উপরের আবরণটি যেন পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। চোখ দুটি বড় এবং কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কবি কহিলেন—তেতালায় আর যাব না, আমার এই বারান্দাই ভাল।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আবার কেঁচে গণ্ডূষ করবার সাধ হয়েছে নাকি? গরাদেগুলোকে নিয়ে গুরুমশাইগিরি শুরু হবে?

সঙ্গিনীর কথাগুলি বুঝি বালকের মনে সাড়া দিল না, তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিমান এবার গুমরিয়া উঠিল। মনের কথা অবাধে ব্যক্ত করিবার এবং বিপুল উচ্ছ্বাস সাগ্রহে উপভোগ করিবার এমন সহনশীলা পাত্রী ত আর ঠাকুরবাড়ীতে দুটি নাই, কাজেই ভাবের আবেগে বালক তাঁহার হৃদয়-দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিলেন:

বৌঠাকুরাণীর কথাগুলো তুমিও ত শুনেছ, বলতে পার—কোন দিন তিনি আমার কোন লেখাকে ভাল বলেছেন? যত যত্ন করেই লিখি—আর মস্ত আশা নিয়ে তাঁকে পড়ে শুনাই, তাঁর মুখে সেই এক কথা—কিছু হয় নি, কবি তুমি কোন দিন হতে পারবে না। তুমিই বল—এতে কষ্ট হয় না?

মৃদুস্বরে বালিকা কহিল—নাই বা তিনি ভাল বললেন, তাতে কি হয়েছে; তাঁর নিন্দে তুমি গায়ে না মাখলেই ত পার!

মুখখানি ম্লান করিয়া বালক বলিলেন—তা কি কখন পারা যায়? ম্যাকবেথের ব্যাখ্যা শুনে কবিতায় তার যে অনুবাদ করেছিলুম, পণ্ডিত মশাই পড়ে কত সুখ্যাতি করলেন। নিজেই খুশী হয়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

বাড়ীতে। কত বড় পণ্ডিত তিনি জান ত, তাঁরই লেখা প্রথম ভাগে—জল পড়ে, পাতা নড়ে—প'ড়ে আমরা ভাষা শিখিছি। তিনি আমার অনুবাদ পড়ে আর হস্তাক্ষর দেখে পীঠ চাপড়ে কত সুখ্যাতি করলেন, কত আশীর্ব্বাদ করলেন, আশার কথা শুনিয়ে—আদর ক'রে খাবার খাইয়ে বিদায় দিলেন। আর—

বালকের মুখের কথা এখানে সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, বাণী আর বাহির হইল না। সাথীর ব্যথার কারণটি বুঝিয়া বালিকাই রুদ্ধ পথটি খুলিয়া দিল, কহিল—আর বৌঠান ঐ খাতা দেখে কি বললেন?

মুখখানা ভার করিয়া বালক উত্তর দিলেন—বরাবর যা ব'লে এসেছেন, তাই ;—কিছু হয়নি, ছেলেমানুষ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি চুমকুড়ি দিয়েছেন—পোষা পাখীর মুখে কথা শুনলে আমরা যেমন ক'রে তাকে চুমকুড়ি দিই। বল ত, এতে কষ্ট হয় না?

বালিকা কহিল—তবে নাকি বৌঠাকুরাণী তোমার হাতের লেখাটার সুখ্যাতি করেছেন?

বালক উত্তর দিল—সেটাও মন খুলে করেন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার হস্তাক্ষরের সুখ্যাতি করেছেন শুনে বললেন—'হ্যা, এটা আমি মানি। তবে এ সুখ্যাতির বেশীর ভাগটুকু আমারই পাওনা। কেন না, কট্‌কী জাঁতিতে সরু সরু করে সুপুরি কাটতে আমি শিখিয়েছিলুম বলেই তোমার হাত দিয়ে এমন সরু সরু লেখা বেরিয়েছে।'—সুখ্যাতির বহরটা শুনলে ত?

সদাহাস্যময়ী বালিকাটি এতক্ষণ জোর করিয়া তাহার মুখের হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না; বালকের কথাগুলি ফুরাইতেই তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন হাসির ধারা ফোয়ারার মত সবেগে উছলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের মুখখানি বিরক্তির ভারে বিকৃত হইয়া পড়িল। ব্যথাহতের মত বালক সঙ্গিনীর মুখের পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—আমি ভেবেছিলুম, আমার মনের কষ্ট তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছ, তোমার প্রাণেও বেজেছে। কিন্তু এখন বুঝেছি—আমার ধারণা ভুল, তাই হেসে ফেটে পড়ছ।

তথাপি বালিকার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল না; হাস্যোজ্জ্বলমুখেই সে সকৌতুকে কহিল—ভুল তুমি গোড়া থেকেই ক'রে আসছ। কবিতায় তোমার কমলা নীরোদ বিজয় এদের মনের কথা লিখেছ, আর সদা সর্ব্বদা যাকে চোখে দেখ—সেই বৌঠাকুরাণীর মনের কথা তুমি মোটেই ধরতে পারনি, তাই মনে মনে কষ্ট পাচ্ছ। তোমার কষ্ট দেখে আমি নিজে বৌঠাকুরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—দেওরটির উপর এ আপনার কোন্ স্পেশ্যাল টান বলুন ত? বেচারীর কোন লেখাটি আপনি একটি বারও ভাল বললেন না? তার মুখখানা দেখে আপনার কষ্ট হয় না?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বালক কহিলেন—আমার জন্যে এমন ক'রে তুমি তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলে?

মুখখানা শক্ত করিয়া বালিকা কহিল—কেন চাইব না? আমার মনে কষ্ট হয় নি বুঝি? কিন্তু বৌঠাকরুণ আমার কথা শুনে যা বললেন, তাতেই মুখখানা আমার নিচু হয়ে গেল; বুঝলুম—তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, আর সেটা কেন চেপে রেখেছেন তাঁর মনের ভিতরে।

বালক-কবি দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গিনীর মুখখানি যেন আনন্দে উদ্ভাসিত; বুঝিলেন, যাহাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে দুর্ব্বার অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা নিরর্থক; বালিকা তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে বালিকার দিকে তিনি শুধু গভীরভাবে চাহিয়া রহিলেন।

বালিকা কহিল—বৌঠাকুরাণী আমার কথার উত্তরে ছোট একটি গল্প বলেছেন,সেটি তোমারও শোনা উচিত, তা হ'লে তোমার কষ্ট মুছে যাবে, আর এমন ক'রে মন-মরা হয়ে থাকতে হবে না। গল্পটি বলছি শোন:

কাশীতে এক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর খুব নামডাক। তাঁর ছেলে আবার তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত হয়। কাশীর রাজা বেছে বেছে তাকেই সভাপণ্ডিত করেন। লোকের মুখে তার সুখ্যাতি আর ধরে না। কিন্তু এমনি সেই ছেলের অদৃষ্ট যে বাড়ীতে বাপের কাছে একটি দিনও সে কোন ভাল ব্যবহার পেত না। সে যে কাশীর সেরা পণ্ডিত—রাজা পর্য্যন্ত তাকে মানেন, একথা তার বাবা কিছুতেই মানতে চাইতেন না। ছেলের কথা উঠলেই তিনি তাকে মূর্খ বলে উপেক্ষা করতেন। ছেলের কাজে একটু কিছু খুঁত পেলেই মুখ বেঁকিয়ে বলতেন—মূর্খের অশেষ দোষ, গলদ ত হবেই। ছেলের সামনে তিনি স্পষ্ট করেই জানাতে চাইতেন—তাঁর ছেলে একটি গণ্ডমূর্খ। ক্রমে হ'ল কি, ছেলের মন একেবারে বিষিয়ে উঠল। একদিন ছেলের বন্ধুদের সামনেই তিনি কথায় কথায় ছেলেকে মূর্খ বলে ধমক দিলেন; ছেলের বন্ধুরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। পণ্ডিত-ছেলের ধৈর্য্যও সেদিন ভেঙ্গে গেল। সে ঠিক করল—এরকম দুর্ম্মুখ বাপকে সে খুন করে গায়ের জ্বালা মেটাবে। গভীর রাতে একখানা অস্ত্র হাতে ক'রে সে বাপের ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে রইল চোরের মতন—বাপ ঘর থেকে বেরুলেই তাঁকে খুন করবে। একটু পরেই সে শুনতে পেলে—মা বলছেন তার বাবাকে—'বাইরে চেয়ে দেখ, চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোতে চারদিক যেন হাসছে।' কথাটার উত্তরে তার বাপ বললেন—'কি দরকার বাইরে চাইবার, আমাদের বাড়ীতে যে চাঁদ আছে, দিনরাত সে আলো ছড়াচ্ছে।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন—'কার কথা বলছ? আমাদের বাড়ীতে আবার চাঁদ এল কোথা থেকে?'

বাপ উত্তর দিলেন—'কেন, আমাদের ছেলে; সারা দেশের ভিতরে এত বড় চাঁদ আর আছে?'

মা বললেন—'বল কি, কিন্তু ছেলের সুখ্যাতি ত তোমার মুখে কোন দিন শুনিনি, তুমি ত তার নামই রেখেছ মূর্খ! তবে?'

বাপ উত্তরে বললেন—'দেশশুদ্ধ সবাই জানে আমার ছেলে মস্ত বিদ্বান, তার অনেক গুণ, তাই তারা প্রাণ খুলে তার সুখ্যাতি করে; আর তাতেই আমার বুকখানা ভরে যায় আনন্দে। তুমি কি বলতে চাও—বাপ হয়ে আমিও তার সুখ্যাতি করব বাইরের লোকের মতন? তা হ'লে বাইরের লোক মুখ টিপে হাসবে, আর আমার ছেলে তাতে লজ্জা পাবে। আমি যে তাকে সবার সামনে মূর্খ বলি—আর ছেলে মুখটি বুজে তাই শোনে, এতে লোকের শ্রদ্ধাই বাড়ে তার ওপরে—খ্যাতির রাস্তাটি তার আরও বেড়ে যায়, বুঝলে?'

ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে বাপের কথাগুলি সব কান পেতে শুনল—তার উপর বাপের সত্যিকার কি মনোভাব সেটি বুঝে সে তখন সুড় সুড় করে নিজের ঘরে ফিরে গেল; তারপর

হাতের অস্ত্রখানি ফেলে দিয়ে হাত দুখানি জোড় করে বাপের উদ্দেশে বলল—'সত্যই আমি মূর্খ আর অজ্ঞান, আজ পেয়েছি জ্ঞানের আলো, আমাকে ক্ষমা করুন বাবা।'

নিবিষ্ট মনে কবি-বালক গল্পটি শুনিতেছিলেন; শেষ হইলে বালিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌঠাকরুণ এই গল্পটি তোমাকে বলেছেন, সত্যি?

মুখে এক ঝলক হাসি আনিয়া বালিকা কহিল—বা-রে, আমি কি তোমার মতন কবি যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বাঁধবো! তা ছাড়া, তুমি কি মনে কর—বৌঠাকরুণের নাম ক'রে আমি তোমাকে মিছে কথা বলব? বেশ ত, জিজ্ঞাসা ক'রে এস না তাঁকে।

মনের সমস্ত বিক্ষোভ ও অভিমান নিমেষের মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া কবি কহিলেন—না, আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না, আমি বুঝিছি। তাঁর গল্পের ঐ বিদ্বান-মূর্খ ছেলেটির মতন আমিও জোড়হাত ক'রে বলছি—'বৌঠাকুরুণ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি।'

বালিকার মুখখানিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরিয়া গেল; বিজ্ঞের মত মুখখানির এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া সে কহিল—দেখলে ত বৌঠাকুরুণের কেমন বুদ্ধি! তুমি যে তাঁর কথায় মানে বসেছ, সেটা বুঝতে পেরে একটা গল্প শুনিয়ে তোমার মানটি কেমন এক লহমায় ভেঙ্গে দিলেন! সত্যি বলছি, বৌঠান মুখে নিন্দা করলেও তোমার লেখা তিনি যত্ন করে পড়েন, তোমার লেখা পড়তে ভাল বাসেন।

সহাস্যে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি করে জানলে?

বালিকা উত্তর দিল—তাঁর গল্প থেকেই ত জানা গেছে। তা ছাড়া, দাদাবাবুর নাটকে তুমি নাকি একখানি গান বেঁধে দিয়েছ; বৌঠান দাদাবাবুর কাছে তার যে কত সুখ্যাতি করলেন যদি শুনতে!

কবির মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন—ভারি আশ্চর্য্য ত! তা হ'লে আসল ব্যাপারটা বলি শোন—সেদিন সন্ধ্যের পর রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় আমাকে 'শকুন্তলা' পড়াচ্ছিলেন, আমার মন কিন্তু তখন পাশের ঘরে গিয়েছে, কেন না জ্যোতিদাদা তাঁর নতুন লেখা 'সরোজিনী' নাটকখানা পড়ে তাঁর বন্ধুদের শোনাচ্ছিলেন। পণ্ডিত মশায়ের শকুন্তলার চেয়ে সরোজিনীই আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল। একটা জায়গায় হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল, সামনে যে পণ্ডিত মশাই বসে আছেন আর শকুন্তলার শ্লোক পড়ছেন—সেকথা ভুলে গিয়ে সটান চলে গেলাম দাদার ঘরে। জানি ত জ্যোতিদাদার কাছে কোন সঙ্কোচই আমার নেই, স্পষ্ট ক'রে বললুম—'দাদা, ওজায়গাটায় গান একখানা না দিলে কিছুতেই জোর হবে না।' কথাটা জ্যোতিদাদার মনে লাগল, বললেন—'সত্যি, গান এখানে একটা বসালে ভালই হয় বটে, কিন্তু আর ত সময় নেই?' আমার মনটা অমনি দুলে উঠল, যখনই গানের কথা মনে জাগে—সঙ্গে সঙ্গে একটা গানও মনের ভেতর রচে উঠেছিল, জোর গলায় দাদাকে বললুম—'গান আমি বেঁধে দিচ্ছি দাদা!' বলেই দাদার সামনে বসে তখনই সেই গানখানা বেঁধে দিলুম। দাদার নাটকে চিতায় ঝাঁপ দেবার আগে রাজপুতমেয়েদের গদ্যে যে লম্বা উচ্ছ্বাস একটা ছিল, সেখানে আমার বাঁধা গানখানা তাদের মুখ দিয়ে বেরুল—'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।' দাদার তখন কি আহ্লাদ, আমার পীঠ চাপড়ে বললেন—খাসা হয়েছে। অমনি হারমনিয়ম নিয়ে গানের সুর করতে বসে গেলেন, আমাকে সেই সুরে গাইতে হ'ল। দাদার বন্ধুরা পর্য্যন্ত বাহবা দিলেন। কিন্তু বৌঠান গানের কথা শুনে বললেন—আরে ছি! এ কি গান হয়েছে! নাটকখানা একেবারে মাটি হয়ে গেছে।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমি কিন্তু নিজের কানে শুনিছি, বৌঠান দাদাকে বলছেন—'রবির এই গানখানার জন্যে তোমার নাটকখানার শ্রী ফুটে উঠেছে।'

কবি হাত দুখানি জোড় করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—সত্যিই আমি তাঁকে বুঝতে পারিনি, আমরা লোকের বাইরেটা দেখি, ভিতরটার দিকে চাইতে ভুলে যাই। তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছ, নতুন শিক্ষা একটা পেয়েছি; এখান থেকেই তাই বৌঠানকে নমস্কার করছি।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ঋগ্বেদের নারী-ঋষি

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার নারী-কবিরা যাঁদের উচ্চ আদর্শে সমধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সেই ঋগ্বেদের নারী-ঋষিরা শুধু ভারত-জননীর কেন—জননী বসুন্ধরার প্রাচীনতম উজ্জ্বল রত্ন। ঋগ্বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ; সুতরাং ঋগ্বেদের নারী-ঋষিরা জগতের প্রাচীনতম বিদুষী রমণী, সত্যদ্রষ্টা নারী। বেদে ছাড়া জগতের অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থে সত্যদ্রষ্টা হিসাবে নারী-ঋষিদের বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। সেই কত হাজার বছর আগে ভারত-জননী এমন কন্যারত্ন লাভ করেছিলেন, যাঁদের বিচ্ছুরিত কিরণধারা আজও জগতের শীর্ষদেশ আলোকিত করে আছে, যাঁদের গৌরবে সমগ্র জগতের ভূত ও বর্তমান্ নারী-সমাজ গৌরব-বিমণ্ডিত, যাঁদের পদরজস্পর্শে যুগযুগান্তর ধরে আমরা, ভারতীয় সন্তানেরা, ধন্য হ'বার অপূর্ব সৌভাগ্য লাভ করেছি।

ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলো বা সূক্তস্থ কবিতা (ঋক্) কোনও না কোনও ঋষির কৃত। এ ঋষিদের মধ্যে ২৭জন নারী-ঋষির নাম উল্লিখিত আছে। যথা, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা ইত্যাদি। এখানে দুটী প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। প্রথমতঃ, ঘোষা, গোধা, প্রভৃতি সত্যিকার কবির নাম কিনা। দ্বিতীয়তঃ, যথোক্ত ঋক্ বা সূক্ত সত্যি তাঁদের কৃত কিনা।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ স্বীকার করতে হয় যে, সাতাশ জনের মধ্যে সকলেই সত্যিকার নারী-ঋষি ছিলেন—এ জোর করে বলা যায় না। হয়ত বা শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা প্রভৃতি গুণব্যঞ্জক এবং রাত্রি, সূর্যা, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়মূলক বা দেবীদের নামগুলো সত্যিকার ঋষিদের নাম নয়। কিন্তু এঁদের কথা বাদ দিলেও এমন অনেক নারী ঋষি আছেন, যাঁদের সত্যিকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। শৌনক ঋষি তাঁর বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে এ নারী ঋষিদের কথা বলেছেন। তিনি তাঁদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—১। যাঁরা সূক্ত রচনা করেছেন। এ শ্রেণীতে আছেন ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষৎ, নিষৎ, ব্রহ্মজায়া জুহু, অগস্ত্যের ভগিনী এবং অদিতি।

২। যাঁরা অন্য ঋষি বা দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথনাদি করেছেন—এ শ্রেণীতে আছেন ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদী, যমী এবং শাশ্বতী নারী।

৩। যাঁরা নিজেদের কার্য্যাদি সম্পর্কে গান করেছেন। এ শ্রেণীতে আছেন শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাচ্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি এবং সূর্যা সাবিত্রী। এর থেকে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে নারী ঋষিরা সত্যই সত্যদ্রষ্টা ঋষিই ছিলেন।

এ ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে যার থেকে দেখা যায় যে বৈদিক যুগে উচ্চ নারীশিক্ষা সমাজের অঙ্গীভূত ছিল। বৈদিক যুগের নারীদের উচ্চশিক্ষা, অনুকূল স্বাধীনতা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্মাননা প্রভৃতি সব দিক থেকে দেখলে সহজেই মনে হয়—ঐ যুগের নারীদের মধ্যে সত্য-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন না—এ বললেই সত্যের অবমাননা করা হয়।

পুত্রকন্যার যেখানে সমান অধিকার, পতি পত্নীর যেখানে সম্পূর্ণ সমান দাবী দাওয়া, জননী যে সময়ে যে সমাজে পিতার চেয়েও অধিক সম্মানের অধিকারিণী, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ভাবে ভাষায়, চিন্তায় কাজে, নির্মল কৈশোরের আনন্দোপভোগে বা যৌবনের কর্মপ্রেরণায়, প্রৌঢ়ত্বের বিচক্ষণতায় বা বার্দ্ধক্যের চিন্তাকুশলতায় যেখানে নারীরা পুরুষদের সম্পূর্ণভাবে সমকক্ষ—সে সমাজে পুরুষ সত্যদ্রষ্টার পাশাপাশি নারী সত্যদ্রষ্টা ঋষি থাকবেন এ একেবারেই অনিবার্য। ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা প্রভৃতির মত মহামহীয়সী সত্যদ্রষ্টা নারী-ঋষি ঐ সমাজের—বৈদিক সমাজের—সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির পূর্ণ দ্যোতক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এ বলা যায় যে কোন্ ঋচ্ বা সূক্ত ঠিক ঠিক কার রচনা—সে নারী-ঋষি বা পুরুষ-ঋষির—সে বিষয়ে সর্বানুক্রমণী, বৃহদ্দেবতা, ঋগ্বেদের ভাষ্য প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে বিশিষ্টতর প্রমাণ পাওয়ার উপায় নেই। যদি ঘোষা, গোধা প্রভৃতি নারী-ঋষিদের রচনা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পুরুষ ঋষিদের বিষয়েও সে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে কিছু তর্ক চলতে পারেনা; পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিই নারীদের ঋষিত্ব বিষয়ে প্রমাণ।

বর্তমান্ প্রবন্ধে নারী ঋষিরা নারীদের সম্পর্কে—নিজেদের মনস্তত্ত্ব, ভাবধারণা প্রভৃতি সম্পর্কে যা বলেছেন, তারি কিছু বলবো।

নারী ঋষিদের সূক্ত ও কবিতায় তাঁদের মনস্তত্ত্ব ও অভিমত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পারিবারিক মঙ্গল; পতি ও সন্তানের শুভানুধ্যান; হৃদয়ের দেবতার জন্য পরম দেবতার চেয়েও বেশী যত্ন, ভালবাসা, উৎকণ্ঠা, আত্মভোলা বিভোর আকুলি-বিকুলি, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—এ সমস্ত নারী ঋষিদের রচনায় বিশেষ উপজীব্য। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষার নারী-কবিদের মত প্রাচীনতম কবিরা ও হৃদয়কে তুলে ধরেছেন সব কিছুর উপরে, খুঁটি-নাটি করে' তৎসম্বন্ধে বহু বিষয় খুঁজে খুঁজে অস্থির হয়ে উঠেছেন, নিজেরা সে বিষয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং জগৎকেও জানিয়ে ধন্য করেছেন। নারী-জীবনের বহুল ও বিচিত্র গতি তাঁদের সুনিপুণ তুলিতে নিখুঁত অঙ্কিত হয়েছে। অঙ্কিত চিত্রে আমরা দেখতে পাই—১। বিবাহোৎকণ্ঠিতা বাক্ষা কুমারী (ঘোষা); ২। সদ্যোবধূ (সূর্যা); ৩। ভক্তিপ্রাণা প্রেমবিহ্বলা পত্নী (শাশ্বতী); ৪। ঈর্ষ্যান্বিতা পত্নী (ইন্দ্রাণী); ৫। ভোগকামা নারী (রোমশা ও লোপামুদ্রা); ৬। পতি-পরিত্যক্তা নারী (অপালা); ৭। আনন্দোদ্বেলিতা গৃহিণী (বিশ্ববারা) ৮। সন্তান-গৌরবিণী জননী, (অগস্ত্যের ভগিনী, অদিতি ও ইন্দ্রমাতা), প্রভৃতি। এ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীরা স্ব স্ব কামনা যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত করেছেন—সব কামনারই মূলীভূত তত্ত্ব পারিবারিক প্রেম।

কুমারী

বিবাহোৎকণ্ঠিতা কুমারীর একটি সুন্দর চিত্র আমরা ঘোষার সূক্তে অঙ্কিত দেখতে পাই। প্রিয়ের সহিত মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নারী জীবনের শাশ্বত ধর্ম। এ ধর্ম একেবারে দূরে চিরকাল কুমারী প্রাণের আবেদন জানান ত্র্যম্বকের কাছে। যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে তিনি বলেন—আমি চাইনা পিতৃ-কুলে থাকতে; পিতৃকুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কাঁকুড়ের মত হোক্, পিতৃকুলের সঙ্গে বোঁটার সম্পর্ক আমার, কিন্তু পেতে চাই অবলম্বন হিসাবে শ্বশুরকুলকে, কাঁকুড় যেমন অবলম্বনরূপে গ্রহণ করে মাটী; অর্থাৎ কাঁকুড় যেমন বোঁটার সাহায্যে জননীর সঙ্গে—লতার সঙ্গে—সম্পর্ক রক্ষা করে মাত্র, থাকে মাটীতে, ঠিক সেই মত কুমারীও পিতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে চান্, কিন্তু থাকতে চান পতিকুলে। এ তীব্র উৎকণ্ঠামূলক প্রাণের আকৃতি সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ঘোষার সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০. ৩৯-৪০)। তিনি আবার ছিলেন ব্যাধিগ্রস্তা; তাই বিশেষ করে স্বর্বৈদ্য অশ্বী দেবতাদ্বয়ের কাছে তাঁর নিবেদন, আর কিছুর জন্য নয়—জীবনের আর কোনও আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্তির জন্য নয়, তাঁর প্রার্থনা রোগমুক্তি ও পতিপ্রাপ্তির জন্য। বৈরাগ্য সাধন তাঁর জীবনের কাম্য নয়, জাগতিক সুখ দুঃখে আত্মাহুতি দিয়ে যথাসম্ভব সুখ প্রাপ্তিই তাঁর বাসনা; জীবনকে অজানায় ভাসিয়ে না দিয়ে সুচেনা পথে হাল ধরে' তিনি সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী একমাত্র সাথী নিয়ে অগ্রসর হতে চান। তিনি চান—প্রিয়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজের হাসির মাত্রা ভরপুর করতে; কুমারীর একেলা অপেক্ষাকৃত শান্তিময় অথচ বৈচিত্র্যহীন জীবন পথ ছেড়ে গৃহিণীর সুখদুঃখময় সুবিচিত্র জীবন পথ আশ্রয় করতে। প্রিয়কে সন্তুষ্ট করার নানাবিধ উপায়ও তিনি দেবতাদ্বয়ের থেকে জানতে চান।

পত্নী

একদিকে কুমারী জীবনের একটা বিশিষ্ট চিত্র ঘোষার সূক্তে যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্তে ও ঋকে পত্নী জীবনের কয়েকটি সুন্দর চিত্রণও আমরা পাই। বিশ্ববারার সূক্তে স্নেহশীলা পত্নীর হৃদয়গত ভাব সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। অগ্নি দেবতার কাছে তিনি প্রাণের নিবেদন জানাচ্ছেন—সুখময় সাংসারিক জীবন কামনা করে' (ঋগ্বেদ, ৫. ২৮)। পতি ও সন্তানের মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সম্পাদন-রূপ ব্রতে আত্মনিয়োগ ও তদ্বিষয়ে সফলতা—তাঁর একমাত্র ধ্যানবস্তু।

অপালার সূক্তে (ঋগ্বেদ ৮. ৮০) দেখতে পাই—নারী পতির দোষ গ্রহণে সম্পূর্ণ নারাজ। পতি সামান্য অজুহাতে, পত্নীর অসুখের অজুহাতে, তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন; তবু পত্নীর অভিমান নেই, ক্রোধ নেই—বরং পতিকে ফিরে পাওয়ার জন্য সে কি আকুল ক্রন্দনাতুরতা, কঠোর তপস্যা; তাঁকে পাওয়ার জন্য ইন্দ্রদেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় জীবনপণ সাধ্য সাধনা। ইন্দ্রদেবতার কল্যাণে তিনি চান শারীরিক বৈকল্য থেকে অব্যাহতি পেতে, যাতে তিনি পুনরায় পতির মনোরঞ্জনে সমর্থা হন।

রোমশার কবিতায় দেখতে পাই (১. ১২৬. ৭), পতি তাঁর প্রতি বিরূপ, অথচ তিনি চান, তাঁর সৌন্দর্য দিয়ে পতিটীকে বশে রাখতে; তাই নারীজনসুলভ লজ্জা বিসর্জন দিয়েও তিনি নিজের মুখেই নিজের সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা (ঋগ্বেদ ১. ১৭৯. ১-২) রতির শরণাপন্ন হয়েছেন স্বামীর ভালবাসা অক্ষুণ্ণ, অটুট রাখবার বাসনায়। বৃদ্ধ পতির শৈথিল্যে তিনি ম্রিয়মাণা; জীবন এক এক দিন করে অন্তিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, উপভোগের কাল যে কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। স্বামীর উপেক্ষায় নিজের আসক্তি, প্রাণভরা সাধ অকূলে ভেসে যাবে কেন? পতির উপেক্ষা সত্ত্বেও প্রাণ যে সুখের বিষয়ে নিরাশ হতে চায় না। কঠোর শ্রম যে সারা জীবন ধরেই চল্‌লো, কিন্তু বেলা যে ফুরিয়ে' এলো, জীবনটা উপভোগের সময় কি আর হবেই না?

লোপামুদ্রার মত ইন্দ্রাণীও (ঋগ্বেদ, ১০. ৮৬. ১৬-১৭) জীবনের ধর্ম, প্রাণের ধর্ম,—যৌবমাত্রেরই ধর্ম—উপেক্ষা করতে চান না। জীবনের সমস্ত মধু তিনি আকণ্ঠভরে পরিপূর্ণ ভাবে পান করতে চান; তাই তিনি

লোপামুদ্রার মত নিজের সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ নিজেই স্বামীর কাছে বিবৃত করছেন। নারী-জীবনের বিষম জ্বালা, সব চেয়ে বড় জ্বালা—অন্য নারীর প্রতি স্বামীর আসক্তি। নারী সব সহ্য করতে পারেন, এটা কিছুতেই পারেন না। ইন্দ্রাণীর একটি সূক্তে দেখতে পাই (ঋগ্বেদ ১০. ১৪৫) স্বামীর প্রিয়পাত্রী সপত্নী থেকে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নারী ঝাঁড়ফুঁক, যাদুমন্ত্র পাঠ, গুল্মোৎপাটন, প্রভৃতি সব কিছুতে উঠে পড়ে লেগে যান—জীবনের আর সব কিছু ছেড়ে। ভাগ বাটোয়ারা অন্য জায়গায় সম্ভবপর ; কিন্তু নারীর পক্ষে স্বামীকে নিয়ে অন্য নারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করা চলে না।

শুধু অন্য নারীর সঙ্গে কেন, অন্য কোনও পুরুষও বন্ধুত্বের ফাঁদে পতিকে আবদ্ধ করে নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে—এও নারী সহ্য করতে পারে না। ইন্দ্রাণীর আর একটি সূক্তে আমরা দেখতে পাই (ঋগ্বেদ ১০. ৮৬) পুরুষ-বন্ধুর প্রতি পতিকে বিরূপ করার জন্য পত্নী কত ছলা কলার আশ্রয় নিচ্ছেন। পতি, এমন কি, পুরুষ-বন্ধুর প্রতিও আসক্ত থাকবেন—এতেও পত্নীর জীবনে যেন অনেকটা স্থান খালি পড়ে যায়। পত্নী তাঁর পতিকে বোঝাচ্ছেন যে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসশীল হয়ে, বন্ধুর উপর নির্ভয় করে' থাকায় সাংসারিক বিষয়ে তাঁর মূঢ়তা সূচিত হচ্ছে, কেবল তিনি নিরর্থক নিজের ন্যায্য অধিকার থেকে প্রবঞ্চিত হচ্ছেন। পতি এতে কর্ণপাত করেন না। বিক্ষুব্ধা পত্নী তখন অন্য অস্ত্রের আশ্রয় নিলেন। পতির কাছে তিনি বলেন—কি অবোধ তুমি! এ বন্ধু যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক, তাও কি এখনো বোঝনি? আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য ; ও যে আমার সর্বনাশ করতে চায়, তাও কি তোমার চোখে পড়ে না? ইত্যাদি। কিন্তু স্বামী এতেও কর্ণপাত করলেন না। পত্নী তখন মরিয়া হয়ে শেষ অস্ত্ররূপে স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা স্বামীকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন ; কাকুতি-মিনতি, প্রলোভন, অপবাদ প্রভৃতি যত কিছুতে কাজ হাসিল হয়, একে একে সব করা হলো।

নারীঋষি শাশ্বতী শাশ্বত নারী (ঋগ্বেদ ৮. ১. ৩৪)। হৃদয়-সরোবরের কূল ছাপিয়ে স্নেহ নীর তাঁর উপ্‌ছে পড়্‌ছে। জীবন-নদী তাঁর ব্যগ্র আকুল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হয়ে কোটি কোটি করে প্রাণের ধনকে জড়িয়ে ধরছে। তাঁর স্বামী তাঁর অযোগ্য ; স্বকীয় দোষে তিনি রোগ-গ্রস্ত। কিন্তু শাশ্বতী নিজের তপস্যার জোরে তাঁকে করেন রোগমুক্ত, স্বামীর দোষের জন্য কিছুমাত্র মনে ক্ষোভ না রেখে। এতেই তাঁর চরম আনন্দ। ক্ষমাশীলা ভারতীয় নারীর প্রকৃত রূপ পরিব্যক্ত হয়েছে শাশ্বতীতে।

জননী

জননীরূপে নারী জগতের পরম কল্যাণদায়িনী। জননীত্ব নারী-জীবনের চরম সার্থকতা। জননী সন্তানের গৌরব-কাহিনী শুনে' আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান ; সন্তানের শুভকামনায় ধ্যানমগ্না অগস্ত্যের ভগিনীর চিত্র (ঋগ্বেদ, ১০. ৬০. ৬) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ইন্দ্রমাতা ইন্দ্রের গৌরব-বর্ণনে তৎপর হয়ে মুহুর্মুহুঃ আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়্‌ছেন (ঋগ্বেদ, ৪. ১৮ ; ১০. ১৫৩)। শ্রেষ্ঠ সন্তানের জননীত্ব নারী-জীবনের চরম কাম্য।

বিবিধ

পারিবারিক জীবনের কতিপয় চিত্র ব্যতীত নারীজীবনের আরও কয়েকটি চিত্র নারী-ঋষিদের সূক্তে আমাদের চোখে পড়ে। ভক্তি শ্রদ্ধা নারীর অন্তরের জিনিষ ; ও তো ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। তাই প্রেমময়ী নারী ভক্তিশ্রদ্ধারও অধীশ্বরী। গোধা (ঋগ্বেদ, ১০. ১৩৪. ৬-৭) ইন্দ্রকে দেবতারূপে আশ্রয় করে' তাঁকে ভক্তিপূত অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন। ইন্দ্রই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। বিলাসিনী নারী (ঋগ্বেদ, ১০. ১০), দূতী (ঋগ্বেদ, ১০, ১০৮) প্রভৃতি চরিত্রও খুব সুন্দর ঋগ্বেদে নারী-ঋষিরা অঙ্কিত করেছেন।

পতি ও পুত্রের গুণপনা কীর্ত্তনে নারীরা এত মুখর যে তাঁরা সাধারণতঃ নিজেদের ও সগোত্রাদের কথা একেবারে ভুলে যান। ঋগ্বেদে নারী-ঋষির কবিতায় দেখ্‌তে পাই (১০-৯৫-১৫)—শুধু তাই নয়—তাঁরা মেয়েদের কীর্ত্তিকলাপ ও গুণপনা কেবল উপেক্ষা করেই খুসী নন, বরং প্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের গুরুতর নিন্দা করেন। উর্বশীর মতে তাঁর সগোত্রাদের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব সম্ভবপর নয়। সত্যি, নারী অন্য নারীর প্রশংসা বিষয়ে অত্যন্ত কৃপণ—বিশেষতঃ, পুরুষের কাছে ; তার চেয়েও বেশী, স্বীয় প্রেমিকের কাছে। প্রেমিকের কাছে বল্‌তে গিয়ে উর্বশী সব নারীর হৃদয়ই ঘৃণ্য বস্তু বলে ঘোষণা করে দিলেন।

সেই যে কত সহস্র বছর আগে সত্যদ্রষ্টা নারী-ঋষিরা নারী জীবনের সমস্যা ও সমাধানমূলক অভ্রান্ত সত্য অকপটে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে গেছেন, তা' চিরকাল সত্য বলেই জগজ্জন মেনে নিয়েছে, আবহমানকাল ধ্রুব সত্য বলে সকলে মেনে নেবে। ঈদৃশ নারী-ঋষিদের সন্ততি—ভারতবাসী মাত্রই ধন্য।

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্‌ইন্

ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

কুন্তল রাজপুরীতে রাজকুমারীর মহল। একটি কক্ষে রাজকুমারী ভূমির উপর অজিনাসনে বসিয়া আছেন ; তাঁহার সম্মুখে নিম্ন কাষ্ঠাসনের উপর একটি উন্মুক্ত পুঁথি। রাজকুমারী তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন।

পাঁচ বৎসরে রাজকুমারীর দেহলাবণ্যের অতি অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার দেহে শুভ্র শুভ্র কার্পাসবস্ত্র, কেশ একটিমাত্র বেণীতে আবদ্ধ, ললাটে আয়তির চিহ্ন কেবল একটি কস্তুরীর টিপ—অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে। চুলের ঈষৎ রুক্ষতায়, চোখের কোলে ছায়ার নিবিড়তায়, দেহের অল্প কৃশতায় তাঁহার রূপ যেন বাহুল্যবর্জ্জন করিয়া নিকষিত হইয়া উঠিয়াছে—বর্ষার অন্তে স্বচ্ছসলিলা শরতের স্রোতস্বিনীর মত।

পুঁথি পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে প্রবল ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল ; তিনি কম্পিতকণ্ঠে কাব্যের শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিলেন—

রাজকুমারী। "মাভূদ্ এবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ॥"

গবাক্ষপথে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি বাহিরে প্রেরণ করিয়া রাজকুমারী ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। দেখা গেল পুঁথির মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

মেঘদূতম্—কালিদাস বিরচিতম্

পুঁথির উপর হাত রাখিয়া রাজকুমারী উন্মনা হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু পুঁথির উপর ফিরিয়া আসিল। কালিদাসের নামের উপর ললাট নত করিয়া তিনি শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিলেন।

রাজকুমারী। ধন্য কবি!—

নামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের ভাব আবার উন্মনা হইল ; তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী। কালিদাস! কে তিনি?

তাঁহার অধর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন

রাজকুমারী। না না ··· সে তো মূর্খ ছিল—

তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিলেন। পরে দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল, দ্বারের চৌকাঠে হাত রাখিয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া রাজকন্যা বলিয়া উঠিলেন

রাজকুমারী। পিতা!

কুন্তলরাজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কুমারী আসন ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন

রাজকুমারী। আসুন আর্য্য।

রাজা হাত তুলিয়া কন্যাকে নিবৃত্ত করিলেন

কুন্তলরাজ। বোসো বোসো বৎসে—

রাজা আসিয়া কন্যার নিকটে দ্বিতীয় অজিনে আসন গ্রহণ করিলেন। সহজভাবে বলিলেন

কুন্তলরাজ। কী পড়ছিলে?

রাজকুমারী ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুঁথিটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন

রাজকুমারী। কিছু নয় পিতা।—একটি নতুন কাব্য—মেঘদূত।

রাজা প্রীতভাবে ঘাড় নাড়িলেন। সেকালে পিতাপুত্রীতে কাব্য আলোচনা, এমন কি আদিরসঘটিত কাব্যের আলোচনা, কেহ দূষণীয় মনে করিতেন না; আদিরসের প্রতি তাঁহাদের সম্ভ্রম ছিল।

কুন্তলরাজ। মেঘদূত—বিরহী যক্ষ আর বিরহিনী যক্ষপত্নী! আমি পড়েছি। সুন্দর কাব্য!

রাজকুমারী পিতার দিকে উদ্দীপ্ত চক্ষু ফিরাইলেন; যে কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার মন আষাঢ়ের মেঘের মতই দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার এইটুকু প্রশংসা তাঁহার মনঃপূত হইল না

রাজকুমারী। সুন্দর কী বলছেন, পিতা—অপূর্ব্ব। ভাষায় এর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আমি বারবার পড়েছি, তবু আবার পড়তে ইচ্ছা করে—

কুন্তলরাজ কন্যার উৎসাহ দেখিয়া স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িলেন

কুন্তলরাজ। সত্যিই অপূর্ব্ব।—কাব্যজগতে এক নূতন সৃষ্টি।—(কন্যার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া) তুমি যে কাব্যশাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছো, এতে আমার মনে একটু শান্তি হচ্চে—

রাজকুমারীর চোখের দীপ্তি নিবিয়া গেল; তিনি মুখ নত করিলেন। রাজা একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—

কুন্তলরাজ: পাঁচ বছর হয়ে গেল ··· সেই রাত্রে চুপি চুপি তাকে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছিলুম, তারপর কিছুই জানি না। গোপনে গোপনে কত খোঁজ করিয়েছি—

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন, কিন্তু পিতার প্রতি না চাহিয়াই ধীরকণ্ঠে বলিলেন

রাজকুমারী: প্রয়োজন কি পিতা! আমি তো বেশ আছি—ভালই আছি—

রাজা স্থির ভাবে ঘাড় নাড়িলেন

কুন্তলরাজ। না বৎসে। ভালই যদি থাকবেতো মাঝে মাঝে তোমার চোখে জল দেখি কেন? এই তো এখনই—

রাজকুমারী। ও কিছু না পিতা। পড়তে পড়তে—

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল

কুন্তলরাজ। মা, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি এখনও তাকে ভুলতে পারনি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন) আমিও পারিনি।—কি জানি. কী ছিল তার সেই সরল সুকুমার মুখে! যদি তাকে পাই, ফিরিয়ে নিয়ে আসি—

রাজকুমারী সহসা পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া উঠিলেন, রুদ্ধ স্বরে বলিলেন

রাজকুমারী। না না পিতা—সে মূর্খ—নিরক্ষর—!

রাজা বুঝিলেন কন্যার মনে প্রেম ও অভিমানে কী দ্বন্দ্ব চলিতেছে; তিনি শান্ত স্বরে বলিলেন

কুন্তলরাজ। সে তোমার স্বামী।

কাট্

রেবা নদীর বুকের উপর দিয়া একটি মধ্যমাকৃতি মহাজনী নৌকা পালের ভরে তর-তর করিয়া চলিয়াছে। পাশে রেবার তীরে মালব রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী মহানগরী তাহার অসংখ্য ঘাট মন্দির সৌধ লইয়া দ্বিপ্রহরের প্রদীপ্ত আলোকে ঝলমল করিয়া জ্বলিতেছে। নগরীর সীমান্তে শষ্প-হরিত প্রান্তর; মাঝে মাঝে দুই-একটি কুটির; জলের কিনারায় সৈকতলীন হংসমিথুন—

নৌকার ছাদের উপর পালের ছায়ায় একটি পুরুষ বসিয়া যন্ত্র সহযোগে গান করিতেছেন। পরিধানে অতি সাধারণ শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়; ললাটে শ্বেত চন্দনের তিলক। পাঁচ বৎসরে তাঁহার বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই, তেমনি সরল হাসিটি মুখে লাগিয়া আছে; কিন্তু তবু মনে হয় এ-ব্যক্তি সে-ব্যক্তি নয়—অন্তর্লোকে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস যে-যন্ত্রটি বাজাইয়া গান করিতেছেন উহা সম্ভবত নাবিকদের কাহারও স্বরচিত সম্পত্তি—একটি বক্রাকৃতি তুম্বের শূন্যগর্ভ খোলসের উপর তিনটি তার চড়ানো। কালিদাস তাহারই সাহায্যে অলসকণ্ঠে গাহিতেছেন; নৌকার মাঝি হাল ধরিয়া পিছনে বসিয়া আছে এবং মাথাটি গানের তালে তালে আন্দোলিত করিতেছে। নৌকার অন্যান্য নাবিকেরা বোধ করি নিম্নে আহারাদি সম্পন্ন করিতেছে।

কালিদাস। আমার মন-তরণী ভাস্‌ল দরিয়ায়
মরি হায় মরি হায় রে।
দখিন বায়ে রূপলহরে, চলছে তরী পালের ভরে
কিনার ডাকে কলস্বরে, আয় রে তরি আয়।
মরি হায় মরি হায় রে!
কোন্ ঘাটেতে পথিক-বধূ, আছেরে পথ চেয়ে
সেই কিনারে বৈঠা তুলে, ভিড়াস তরী, নেয়ে—
যেথা কমল চোখে সজল হাসি, 'অঝোর ঝরি যায়।
—মরি হায় মরি হায় রে॥

গান শেষ হইলে কালিদাস যন্ত্রটি নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া বসিলেন; অমনি উজ্জয়িনীর রবিকরোজ্জ্বল দৃশ্যটি তাঁহার বিস্ময়োৎফুল্ল দৃষ্টি টানিয়া লইল—তিনি মুগ্ধ চক্ষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর কতক আত্মগত ভাবে বলিলেন

কালিদাস। বাঃ—কী চমৎকার নগরী! যেন আমার কল্পলোকের অলকাপুরী—

কবি মাঝির দিকে মুখ ফিরাইলেন

কালিদাস। ভাই মাঝি, এটা কোন্ রাজ্য?

মাঝি একবার তীরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল

মাঝি। ঠাকুর, এটা অবন্তী রাজ্য; আমরা এখন উজ্জয়িনীর সামনে নিয়ে যাচ্ছি—

কালিদাস। (তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া) অবন্তী! উজ্জয়িনী! এতদিন শুধু কল্পনাই করেছি!—এর পর?

মাঝি। এর পরই কুন্তলরাজ্য।

কালিদাসের মুগ্ধ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল; তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন

কালিদাস। কুন্তলরাজ্য?

মাঝি। হ্যাঁ? কিন্তু কুন্তলরাজ্য অবন্তীর কাছে লাগে না।—এখানকার রাজা বিক্রমাদিত্য একজন মহাবীর; হিঙ্গুভোজী হূণদের উনিই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন—ভারী তেজী রাজা। শুনেছি নাকি পণ্ডিতদেরও খুঁব আদর করেন—

মাঝি যতক্ষণ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় দিতেছিল কালিদাস ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; মাঝি থামিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন

কালিদাস। ভাই, আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও।

মাঝি ঈষৎ বিস্ময়ে মুখ তুলিল

মাঝি। এইখানেই?—

কালিদাসের দৃষ্টি রেবার তীরভূমি চুম্বন করিয়া চলিয়াছিল; তিনি মাঝির দিকে না ফিরিয়াই বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন

কালিদাস। হ্যাঁ—এইখানেই। আমার কাছে সব রাজ্যই তো সমান। এই উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে রেবার তীরে কুটির বেঁধে আমি থাকব।

মাঝি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল

মাঝি। তা বেশ, আপনার যা ইচ্ছে ঠাকুর।—ওরে ওরে পাল নামা—

মাঝি হালের মুখ ফিরাইয়া ধরিল

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

উজ্জয়িনীর সীমান্তে রেবার উপকূল। তীরভূমি ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে। তীরে দূরে দূরে দু-একটি উপবন বেষ্টিত কুটির। যাহারা ফুলের চাষ করে তাহাদের নগরের বাহিরেই সুবিধা, তাই মালাকরেরা এই দিকেই পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছে।

জলের কিনারা দিয়া যে হাঁটা-পথ গিয়াছে, সেই পথে মালিনী নগরের দিকে চলিয়াছিল। তাহার বিশেষ তাড়া ছিল না, সূর্য্যাস্তের এখনও বিলম্ব আছে। বাঁ হাতের মণিবন্ধ হইতে ফুলের সাজি ঝুলিতেছে, ডান হাতে সূচী ও সূত্রের সাহায্যে মালা গড়িয়া উঠিতেছে; মালিনী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

মালিনীর বয়স ষোল-সতেরো বছর—শ্যামকান্তি পল্লবিতা লতার মত; মনে ও দেহে দু-একটি কুঁড়ি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। (মালব দেশের মালিনীদের যৌবন যেমন বিলম্বে আসে, তেমনি বিলম্বে যায়)। মালিনী দেখিতে ছোটখাট, চঞ্চলা, হাস্যময়ী; চুলগুলি চিক্কণ করিয়া বাঁধা। পরিধানে বাসন্তী রঙ, শাড়ী, কাছা দিয়া খাটো করিয়া পরা; ঊর্দ্ধাঙ্গে বাসন্তী-রঙ, আঙরাখা আঁট হইয়া গায়ে বসিয়াছে।

মালিনী চলিতে চলিতে মালা গাঁথিতেছে, তাহার চক্ষু তাহাতেই নিবদ্ধ। যে গানটি তাহার ঈষদুর্দ্ধ অধর হইতে নিঃসৃত হইতেছে তাহাও বেশী দূরে যাইতেছে না, ফুলের চারিপাশে ভ্রমরের মত মালিনীকেই ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

মালিনী। মালা গাঁথব না আর চাঁপায়।
ওরে দেখলে আমার নয়ন ভরে', অশ্রু কেন ছাপায়।
মালা গাঁথব না আর চাঁপায়॥
ও যে বুকে লাগায় দোলা, প্রাণ করে উতলা
মোর মরমবীণার তারগুলিরে কাঁপায়।
মালা গাঁথব না আর চাঁপায়॥

মালিনীর চরণ ভঙ্গীতে একটু নৃত্যের সংস্পর্শ ছিল; গানের শেষে সে এক পাক ঘুরিয়া চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি, হঠাৎ একটা নূতন কুটির কোথা হইতে আসিল? সাতদিন আগেও তো কিছু ছিল না!

নদীতীর হইতে পঞ্চাশ হাত ব্যবধানে উঁচু জমির উপর সত্যই একটি নূতন কুটির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট পাহাড়ী বেত্রের উপর মাটির প্রলেপ দিয়া দেয়াল; উপরে কুশের ছাউনি। সম্মুখের খানিকটা স্থানে ছিটা বেড়ার বেষ্টনী; তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বেদিকা।

কুটির সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার প্রসাধন ও অঙ্গশোভা এখনও বাকি আছে। স্বয়ং গৃহস্বামী অধুনা এই কার্য্যে ব্যাপৃত। এক হাতে পিটুলি-পূর্ণ ভাঁড় ও অন্য হাতে দাঁতনের মত একটি তুলি লইয়া তিনি অভিনিবেশ সহকারে গৃহদ্বারের উপর শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিত্রলেখায় প্রবৃত্ত।

দূর হইতে দেখিয়া মালিনী কৌতূহলবশে সেই দিকে অগ্রসর হইল। পা টিপিয়া কালিদাসের পিছনে গিয়া উপস্থিত হইল; কালিদাস চিত্র রচনায় এতই নিমগ্ন যে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

চিত্র বিদ্যায় কবির পটুত্ব কিছু কম। দ্বারের একটি কবাটে তিনি যে শঙ্খটি আঁকিয়াছেন তাহা যে শঙ্খই এমন কথা জোর করিয়া বলা শক্ত, কুণ্ডলায়িত বিষধর সর্পও হইতে পারে। এই জন্য কবি তাহার নিম্নে স্পষ্টাক্ষরে চিত্রপরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন—"শঙ্খ"। উপস্থিত যে চক্রটি আঁকিতেছেন তাহাও আশানুরূপ আকার গ্রহণ করিতেছে না। সুদর্শন চক্র গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কবির হস্তে উহা ডিম্বের আকৃতি ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তা ছাড়া তুলিটাও ভদ্র ব্যবহার করিতেছে না; অতর্কিতে কবির মুখে চোখে রঙ, ছিটাইয়া দিতেছে।

কালিদাস শেষে উত্ত্যক্ত হইয়া তুলির দ্বারা চক্রের মাঝখানে একটা খোঁচা দিলেন। তুলির রঙ, অমনি ধারায় মত গড়াইয়া পড়িল। মালিনী এতক্ষণ কালিদাসের পিছনে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল, এখন খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চমকিয়া কালিদাস ফিরিলেন। হাতের তুলিটা কেমন একভাবে ছিটকাইয়া উঠিয়া মালিনীর মুখ চোখে রঙ, ছিটাইয়া দিল।

মালিনী মুখখানি একবার কুঞ্চিত করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল

মালিনী। কেমন মানুষ গা তুমি? আমার মুখেও চিত্তির আঁকবে নাকি?

কালিদাস অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন

কালিদাস। দেখতে পাইনি—ভারি অন্যায় হয়েছে।—তা—এ চুন নয়, পিটুলি গোলা—তোমার মুখের কোনও ক্ষতি হবে না—বরং—বেশ দেখাচ্ছে—

মালিনীর মুখে শ্বেত বিন্দুগুলি তিলকের মত ফুটিয়া উঠিয়া সত্যই সুন্দর দেখাইতেছিল; সে স্মিতমুখে এই কান্তিমান তরুণ ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল; লোকটি দেখিতেও ভাল, কথাও বলে বেশ মিষ্ট।

মালিনী। তুমি নতুন এসেছ—না? সাত দিন আগেও এ পথে গেছি, তোমার কুঁড়েঘর তো ছিল না!

কালিদাস। না, এই তো ক'দিন হ'ল এসেছি।

(সগর্ব্বে গৃহের পানে তাকাইয়া) নিজের হাতে ঘর তৈরি করেছি ! কেমন, চমৎকার হয়নি ?

মালিনী। বেশ হয়েছে !—ওটা কি হচ্ছিল ?

মালিনীর তর্জ্জনীনির্দ্দেশ অনুসরণে দ্বারের শঙ্খচক্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কালিদাস লজ্জিত হইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—

কালিদাস। মঙ্গলচিহ্ন আঁকছিলুম। তা ঐ হয়েছে।

বলিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন। মালিনীও হাসিল। ফুলের মালা সাজির মধ্যে রাখিয়া সর্ব্বসুদ্ধ কালিদাসের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল—

মালিনী। তুমি সাজি ধর, আমি এঁকে দিচ্ছি। আল্‌পনা দেওয়া কি পুরুষের কাজ !

ভাঁড় হাতে লইয়া মালিনী দ্বারের নিকটে গেল

কালিদাস পুলকিত হইয়া উঠিলেন

কালিদাস। তুমি এঁকে দেবে !—বাঃ, তা হ'লে তো কথাই নাই !—আমরা পুরুষেরা শুধু মোটা কাজ করতে পারি, সূক্ষ্ম কাজ মেয়েরা না হ'লে হয় না—

মালিনী হাস্যমুখে স্বজাতির এই প্রশংসা আত্মসাৎ করিয়া আল্পনা অঙ্কনে মন দিল ; পূর্ব্বের অঙ্কন মুছিয়া দক্ষহস্তে নূতন করিয়া শঙ্খ আঁকিতে লাগিল। কালিদাস সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ও দেখিতে লাগিলেন।

কালিদাস। ভাল কথা, তুমি কে তা তো বললে না ?

মালিনী ভ্রূভঙ্গ করিয়া একবার ঘাড় ফিরাইল ; তারপর আবার আল্পনায় মন দিয়া বলিল

মালিনী। ফুলের সাজি দেখে বুঝলে না ?—মালিনী।

কালিদাস। ও, তা বটে। কিন্তু তোমার একটা নাম আছে তো ?

মালিনী মুখ না ফিরাইয়াই মাথা নাড়িল

মালিনী। না, সবাই আমাকে মালিনী ব'লে ডাকে। —আমার কেউ নেই কি-না।—গুরুবারে গুরুবারে আমি রাজবাড়ীতে যাই, রাণী ভানুমতীকে ফুল যোগাতে। রাণী ভানুমতী আমাকে খু—ব ভালবাসেন।—সবাই আমাকে ভালবাসে।—আমার কেউ নেই কি-না—

কালিদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুনিতেছিলেন ; হঠাৎ মালিনী মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল

মালিনী। তুমি কে ?

কালিদাস একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—

কালিদাস। আমার নাম কালিদাস।

মালিনী পরিতুষ্ট ভাবে ঘাড় নাড়িল

মালিনী। বেশ নাম।—তুমি কি কাজ কর ?

কালিদাস একটু চিন্তা করিলেন

কালিদাস। কাজ ? আমিও মালা গাঁথি—

উজ্জ্বল চক্ষে মালিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল

মালিনী। ও মা সত্যি !—কিন্তু—কিন্তু তোমার গলায় পৈতে রয়েছে ; তুমি তো মালাকর নও !

কালিদাস মৃদু হাসিলেন

কালিদাস। আমি—কথার মালাকর।—কবি।

চিবুকে একটি অঙ্গুলি ঠেকাইয়া মালিনী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ; তারপর সন্দেহভাবে বলিল

মালিনী। কবি ! তুমি গান বাঁধতে পার ?

কালিদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। মালিনীর চক্ষু বিস্ময়ে আরও বর্ত্তুলাকার হইল

মালিনী। তবে, তবে তুমি এখানে কুঁড়ে-ঘর বেঁধেছ যে ! রাজসভায় যাও না কেন ? রাজা কবিদের ভালবাসেন ; তাদের সোনাদানা দেন, থাকবার বাড়ী দেন—

কালিদাসের মুখে ঈষৎ তিক্ততার আভাস খেলিয়া গেল ; তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন

কালিদাস। রাজারাণীর সোনাদানা আমার দরকার নেই ; নিজের হাতে তৈরি এই কুঁড়েই আমার অট্টালিকা—

মালিনী একটুক্ষণ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল ; তারপর আবার আল্পনা দিতে দিতে সদয় কণ্ঠে বলিল—

মালিনী। বুঝেছি ; তুমি রাজারাণীদের সঙ্গে কখনও মেশোনি কি না, তাই ভয় করছে। ভয় পেও না ; ওরা খুব ভাল লোক হয়। আমার রাণী ভানুমতী—খুব ভাল লোক—আর কী সুন্দর ! চোখ ফেরানো যায় না—

কালিদাস মৃদু হাসিলেন

কালিদাস। তুমিও তো ভাল লোক ; জানাশোনা নেই, তবু আমার কত কাজ ক'রে দিচ্ছ। আর দেখতেও সুন্দর—যেন প্রতিমাটি। তবে তোমাকে ফেলে রাজরাণীর পিছনে ছোটবার দরকার কি ?

আহ্লাদে বিগলিত হইয়া মালিনী কবির দিকে ফিরিল ; মুখেচোখে সলজ্জ আনন্দ ; কিন্তু তাহা গোপন করিবার চেষ্টা নাই

মালিনী। আমি সুন্দর ! যাঃ—! (হাসিয়া উঠিল) তুমি কবি কি না, তাই মিছিমিছি বলছ।—এবার দ্যাখো দেখি, কেমন আল্‌পনা হয়েছে।

কবি সহজ কৃতজ্ঞতায় বলিলেন

কালিদাস। ভাল হয়েছে, এমনটিই তো হওয়া উচিত। নারীই গৃহের রূপ দিতে পারে ; সে গৃহদেবতা।

মালিনী মাথা হেলাইয়া কিছুক্ষণ কবির পানে চাহিয়া রহিল ; এধরণের কথাবার্ত্তার সহিত সে পরিচিত নয়। পরে একটু হাসিল

মালিনী। তোমার কথার মানে বুঝেছি। শুনতে হেঁয়ালির মত লাগে, কিন্তু ভাবলে মানে পাওয়া যায়।—আচ্ছা, সব কবিই কি হেঁয়ালির ছন্দে কথা বলেন ?

কালিদাস হাসিয়া উঠিলেন

কালিদাস। স—ব।

ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব রেবার পরপারে অস্তচূড়া স্পর্শ করিয়াছিলেন ; এখন নগর হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। মালিনী চকিতে দিগন্তের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল

মালিনী। ওমা, কি হবে ! সূয্যি যে পাটে বস্‌লেন !—আজকেই আমি মরেছি ; রাণীমার ফুল যোগান দিতে দেরী হয়ে যাবে।—দাও দাও, আমি চললুম—

কালিদাসের হাতে ভাঁড় ধরাইয়া দিয়া ও সাজিটি প্রায় কাড়িয়া লইয়া মালিনী ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে একবার পিছু ফিরিয়া বলিল

মালিনী। আবার এসে ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব।

কালিদাস স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবে বলিলেন

কালিদাস। মালিনী! যেন সাক্ষাৎ মালিনী ছন্দ!—চপল-চরণ-ছন্দা—নন্দিনী—পুষ্পগন্ধা—

ডিজল্‌ভ্‌

অবন্তীর বিশাল রাজপুরী; প্রাকারবেষ্টিত একটি নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিস্তৃত বিহারভূমির উপর কুঞ্জবাটিকা উপবন, মধ্যে মধ্যে এক একটি অট্টালিকা; কোনটি মন্ত্রগৃহ, কোনটি শস্ত্রাগার, কোনটি যন্ত্র ভবন—এইরূপ আরও অনেক।

পুরভূমির সর্ব্ব পশ্চাতে মহাদেবী ভানুমতীর অবরোধ—নগরের ভিতর ক্ষুদ্র নগর। অবরোধের ভূভাগ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; প্রাচীরের কোল ঘেঁষিয়া সঙ্কীর্ণ পরিখা। এখানে প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার; তাহাও এত সঙ্কীর্ণ যে দুইজন পাশাপাশি প্রবেশ করিতে পারে না।

[যে-সময়ের কাহিনী সে-সময়ে রাজপুরীর মহিলাদের প্রাকার-পরিখার অন্তরালে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশে হূণ বর্ব্বরদের উৎপাত হইয়াছিল, সেই সময় পুরস্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষার মানসে "হূণহরিণকেশরী" মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অবরোধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারপর হূণ উৎপাত দূর হইয়াছিল; কিন্তু প্রথা একবার গড়িয়া উঠিলে সহজে ভাঙিতে চায় না। অবরোধ ও তৎসংক্রান্ত বিধি রহিয়া গিয়াছিল।]

একজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। রক্ষীর বয়স কম, উনিশ-কুড়ি; কিন্তু ভারী যোয়ান। হাতের লৌহশূল অবহেলাভরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে দ্বারের সম্মুখে পদচারণ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই। দ্বারপথে অবরোধের প্রাসাদ-ভূমির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাহিরে বকুল তমাল পিয়াল শোভিত মুক্ত ভূমি জনশূন্য। সন্ধ্যা সমাগত।

দূরে মালিনীকে আসিতে দেখিয়া রক্ষী থমকিয়া দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর একটু গদগদ হাসি তাহার মুখে দেখা দিল। মালিনীর প্রতি তাহার মনে যে বেশ প্রীতির ভাব আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মালিনী কিন্তু তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাড়াতাড়ি দ্বার প্রবেশের উদ্যোগ করিল। রক্ষী এজন্য প্রস্তুত ছিল (মালিনীর অবজ্ঞা তাহার পক্ষে নূতন নয়); তাহার বল্লম অর্গলের মত পড়িয়া মালিনীর পথ রোধ করিয়া দিল।

চমকিয়া মালিনী অধীর রুষ্ট মুখে রক্ষীর পানে তাকাইল

মালিনী। কি হচ্ছে!—পথ ছেড়ে দাও।

মালিনীর ভ্রূকুটি দেখিয়া রক্ষী থাবড়াইয়া গেল। সে নূতন প্রেম করিতে শিখিতেছে, এখনও আনাড়ী; অথচ একটু রসিকতা না করিয়াও মালিনীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাই বোকার মত হাসিয়া বলিল

রক্ষী। বিনা প্রশ্নে তোমাকে রাণীর মহলে ঢুকতে দিই কি বলে? কঞ্চুকী মশাইয়ের হুকুম—

মালিনী। ঢের হয়েছে, এবার বল্লম নামাও। আমার দেরি হয়ে গেছে—

রক্ষী। কঞ্চুকী মশায়ের হুকুম—পুরুষ ঢুকতে দেবে না। এখন তুমি যে মেয়ের ছদ্মবেশে পুরুষ নও—

মালিনী। আবার!—আচ্ছা বেশ, রঙ্গই কর তা হ'লে।

মালিনী অদূরস্থ বেদীর আকারের ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর সাজি কোলে লইয়া বসিল, আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া নীরস কণ্ঠে বলিল

মালিনী। আমার কি! রাণীমা'র এতক্ষণ চুল-বাঁধা গা-ধোয়া হয়ে গেছে—ফুল আর মালার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছেন। বেশ তো, বসে থাকুন। যত দেরি হবে ততই তাঁর রাগ বাড়বে। তা আমি কি করব?—আমাকে যখন তলব হবে, আমি বল্‌ব—

রক্ষী এবার রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। ত্বরিতে দ্বার হইতে বল্লম সরাইয়া মিনতির কণ্ঠে বলিল

রক্ষী। না না, মালিনী, আমি কি তোমাকে আট্‌কেছি? আমি একটু—ইয়ে—রঙ্গ করছিলুম। নাও—তুমি ভেতরে যাও—

মালিনী উঠিল না; মুখ কঠিন করিয়া বলিল

মালিনী। আগে নিজের হাতে কান মলো।

রক্ষীর বয়স অল্প, তাহার কান দুটি রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল

রক্ষী। আচ্ছা, এই নাও—মল্‌ছি।—কিন্তু এ শুধু তোমাকে—ইয়ে—ভালবাসি বলে—

মালিনী ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; গ্রীবার একটি লীলায়িত ভঙ্গী করিয়া বলিল

মালিনী। উঃ—! ভালবাসা!

সহসা গম্ভীর হইয়া মালিনী প্রশ্ন করিল

মালিনী। জানো, নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে? সে গৃহদেবতা। জানো?

রক্ষী অবোধের মত ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ঘাড় চুলকাইল

রক্ষী। কই, না তো।

মালিনী। তবে তুমি কিচ্ছু জানো না।

মালিনী সদর্পে দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া ভিতরে অন্তর্হিত হইয়া গেল

ডিজল্‌ভ্‌

ক্রমশঃ

রিক্ত

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার বি-এ

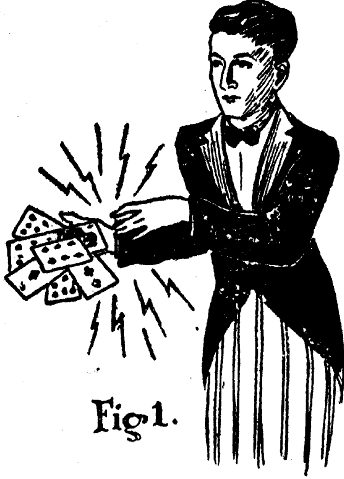
সম্মুখে কুহেলীঘেরা অজানার ডাকে
যেতে হবে সহসা তোমাকে;
শিথিলিত বন্ধগুলি একে একে পড়েছে তো খুলি,
তৃণাস্তীর্ণ কবরের বুকে ঘুমাইছে সুখে—
একক যাত্রী, কেন তবে বৃথা আর মুঠি আঁকড়ি?

কর্ম্ম হয়ে এল অবসান ফুরাইল জীবনের গান,
বিনিঃশেষ বুকের সুরভী
হায় অবসানে বাজে করুণ পূরবী—
সম্মুখেতে যবনিকা ফেলে কৃষ্ণছায়া,
কেন তবে বৃথা এই পৃথিবীর মায়া।

তাসের খেলা

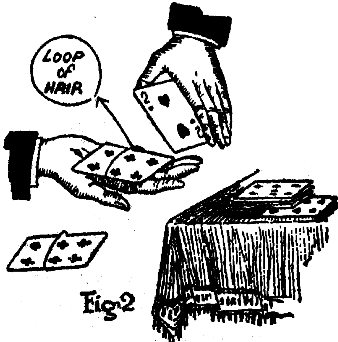
যাদুকর পি-সি-সরকার

এবারে আমি দুইটি তাসের খেলা শিখাইব যাহা খুবই চমকপ্রদ। বহু বিশিষ্ট চতুর লোক, এমন কি বৈজ্ঞানিকদিগকেও, এই খেলা দুইটি দ্বারা আমি বহুবার জব্দ করিয়াছি। প্রথম খেলাটির নাম 'সম্মোহিত তাস' বা "Mesmerised cards." ইহা যে-কোন লোকের তাস চাহিয়া লইয়া তখনই দেখান যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, অপরের তাস দ্বারা করা হয়



তাসগুলি হাতের উপর আটকাইয়া গিয়াছে

বলিয়াই এই খেলাটি আরও বিস্ময়কর হয়। দর্শকদের নিকট হইতে সাধারণ এক প্যাকেট তাস চাহিয়া লইবার পর যাদুকর তাহা হইতে যে-কোন দশ-বারখানি তাস বাছিয়া লইয়া পুনরায় দর্শকদের হাতে সেগুলি পরীক্ষা করিতে দেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে,



সূত্রগ্রন্থির মধ্যে তাসগুলি সাজাইবার উপায়

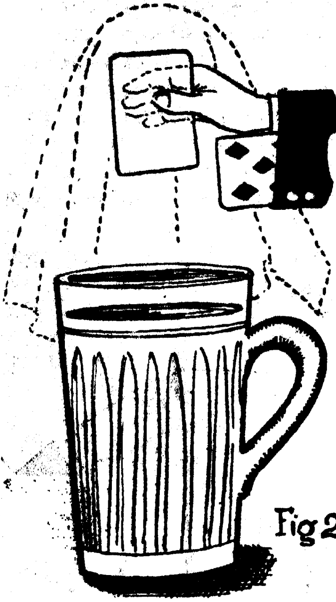
ঐ তাসের মধ্যে কোনরূপ তার, স্প্রীং, চুম্বক বা আটা কিছুই লাগান নাই তাহাই ভালরূপে পরীক্ষা করাইয়া লওয়া। এইবার যাদুকর তাসগুলিকে তাঁহার ডান হাতের তলাতে একটি একটি করিয়া সাজাইবেন। তারপর বামহস্ত দ্বারা কয়েকবার হিপনোটিজমের 'পাশ' দিবার পর আস্তে আস্তে হাতটিকে উপুড় করিতে থাকিবেন। (চিত্র দেখুন)। কি আশ্চর্য্য! তাসগুলি যেন সম্মোহিত হইয়াই যাদুকরের হাতের সঙ্গে আটকাইয়া আছে, উহা মাটীতে পড়িতেছে না। যাদুকর তখন দর্শকদিগকে বুঝাইতেছেন যে, প্রত্যেক জীবদেহে একপ্রকার বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি বিদ্যমান (Animal magnetism); তিনি তাঁহার সেই জৈব আকর্ষণী ক্ষমতা দ্বারাই তাঁহার হস্তস্থিত তাসগুলি আটকাইয়া রাখিয়াছেন। দর্শকগণ যাদুকরের এই অত্যদ্ভুত সম্মোহন-ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ পৃথিবীতে এরূপ শক্তিশালী সম্মোহন বিদ্যাবিদ্ কমই আছেন যিনি মুহূর্ত্তে অচেতন পদার্থকে সম্মোহিত করিতে সক্ষম। যাদুকর তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য তাসকে সম্মোহন করিবার খেলাটি ভালরূপে দেখাইবার জন্য দর্শকদের মধ্যে চলিয়া যান এবং পুনঃ পুনঃ হাত এদিক ওদিক করিয়া উল্টাইয়া তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। বাস্তবিকই কোনরূপ চুম্বক বা আটার সাহায্য না লইয়া হাতের তালুতে মুহূর্ত্তে অতগুলি সাধারণ তাস আটকাইয়া রাখা বিস্ময়কর নহে কি? আমি কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ীতে আরও অনেক বিলাত-ফেরত বড় বড় ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মুখে তাঁহাদের তাস দ্বারা এই খেলা দেখাইয়াছিলাম। তাঁহারা ইহার যে কৌশল আবিষ্কার (?) করিয়াছিলেন তাহা এখানে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।



তাসটী কাচের জাগে ডুবাইয়া রাখা হইতেছে

একজন বলিলেন, আমার হাতে শক্তিশালী চুম্বক (powerful magnet) লুকায়িত আছে এবং তাসগুলিতে, কোন কৌশলে লোহের চূর্ণ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অপর একজন বলিলেন, আমার আংটির সঙ্গে 'ইলেক্ট্রো ম্যাগ্নেট (Electro-Magnet) যন্ত্রের সংযোগ রহিয়াছে ইত্যাদি। বিজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদিগের কথায় আমি প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলাম। এইবার আমার বৈজ্ঞানিক প্রণালীটি বর্ণনা করিতেছি। আমার পকেটে একটি চুলের ফাঁস (loop of hair) তৈয়ারী করা থাকিত। একটি লম্বা চুলের দুই প্রান্ত মিলাইয়া গাঁট দিলেই ফাঁস তৈয়ার হইল। এইবার ঐ ফাঁসটার মধ্যে ডান হাতের আঙ্গুলগুলি গলাইয়া লইতে হয়। বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ। পরবর্ত্তী চিত্রে তাহা সঠিক বুঝাইয়া দেওয়া

হইয়াছে। হাতের ঐ লুপটির মধ্যে প্রথমত একটি তাস গলাইয়া দিতে হয়—যেমন চিত্রে চিড়াতনের ছয় দেওয়া হইয়াছে। বাকী তাসগুলি একে একে ইহার নীচে (ফুলের মত করিয়া) চারিদিকে সাজাইয়া দিতে হয়। এইবার যাদুকর ইচ্ছা করিলেই তাঁহার হাত উপুড় করিতে পারেন, তাসগুলি তখন মাটীতে পড়িবে না। খেলা দেখান শেষ হইলে যাদুকর হাতের আঙুলগুলি একটু শক্ত করিয়া নীচের দিকে চাপ দিতেই—চুলটী ছিঁড়িয়া যাইবে এবং সব গুলি তাস মেঝের উপর পড়িবে। যাদুকর তাসগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া দর্শকদিগকে ফেরত দিবেন এবং চুলটি মেঝের কার্পেটের উপরই পড়িয়া রহিল উহা কেহই লক্ষ্য করিবে না। খেলাটি খুবই সহজ কিন্তু খুবই আশ্চর্য্যজনক। আমি নিজে এইটি খুব দেখাই। ইহা আরও নানারূপে করা চলে—তবে অপরের তাস দ্বারা করিতে গেলে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়।



দর্শকদের তাসের সহিত কৌশলে কৃত্রিম তাসটী বদলাইবার উপায়

এইবার অপর একটি তাসের খেলা শিখাইব ইহার নাম 'দ্রবমান তাস' বা Dissolving Card. ইহাতে একটি কাচের জগপূর্ণ জলে একটি বা দুইটি তাস ডুবাইয়া দেওয়া মাত্র তাহা সেখানে জল হইয়া যাইবে। অথচ দর্শকদের প্রদত্ত তাস দ্বারাই খেলাটি দেখান হইবে।

যাদুকর এক প্যাকেট তাস আনিয়া দর্শকদিগকে তাহা উত্তমরূপে 'সাফল' করিতে দেন এবং উহা হইতে যে কোন একটা বাছিয়া লইতে বলেন। তাসটি বাছিয়া লইবার পর দর্শকগণ উহা যাদুকরের হাতে ফেরত দেন। যাদুকর তখন একটি সাধারণ বড় রুমাল অথবা তোয়ালে দ্বারা সেটিকে ঢাকিয়া দর্শকদের হাতে ধরিতে দেন। তারপর এক জগপূর্ণ জল আনা হয় এবং দর্শকদিগকে দেখান হয় যে উহাতে কোনই কৌশল করা নাই। বলা বাহুল্য, জগটি কাচের তৈয়ারী এবং তাহা না হইলে এই খেলা ভাল জমে না। এইবার রুমালশুদ্ধ ঐ তাসটি প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী জগের জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রুমালখানি ফেলিয়া দিতে হয়। দর্শকগণ তখন দেখিবেন যে, জগের মধ্যে তাসটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

এইবার খেলাটির কৌশল প্রকাশ করা যাউক। যাদুকর পূর্ব্ব হইতেই একটি 'কৃত্রিম তাস' প্রস্তুত করিয়া হাতের আস্তিনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। উহা তাসের সমান আকৃতির এবং মধ্যে কোন ফোঁটা বা ছবি নাই। স্বচ্ছ অভ্র খণ্ড বা সেলুলয়েড খণ্ডকে তাসের আকৃতিতে কাটিয়া উহা প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর দর্শকগণ যে কোন একটি তাস বাছিয়া প্রদর্শকের হাতে দিলে তিনি কৌশলে উহা বদলাইয়া ফেলেন। পরবর্ত্তী চিত্রে দেখান হইয়াছে কি ভাবে দর্শকদের তাস (রুহিতনের পাঁচ) টিকে আস্তিনের মধ্যে চালাইয়া দিয়া রুমালের নীচে স্বচ্ছ তাসটিকে আনা হইয়াছে। এখন বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ। কাচের জগস্থ জলের মধ্যে ঐ স্বচ্ছ তাসটি ডুবাইয়া দিলে উহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইবে। তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারাও ঐ তাসের অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। রুমালখানি সরাইয়া লইবামাত্র দর্শকগণের মন ঐ রুমালের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে রুমালে কিছুই নাই তখন খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়েন। খেলাটি সহজ অথচ খুবই চমকপ্রদ।

খেলা দেখাইবার পর যাদুকর যেন ঐ স্বচ্ছ তাসটিকে পুনরায় তুলিয়া রাখিতে ভুল না করেন। স্বচ্ছ জলের মধ্যে মিশিয়া থাকে বলিয়া উহা আনিতে প্রায়ই ভুল হইবার সম্ভাবনা। ঢাকাতে উয়ারীর কোন বিশিষ্ট বড়লোকের বাড়ীতে আমি বহুদিন পূর্ব্বে (কলেজে পাঠ্যাবস্থায়) এই খেলাটি দেখাইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলাম। কিন্তু খেলার শেষে ঐ কৃত্রিম তাসটি তুলিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একঘণ্টা পরে বাড়ীর চাকর আসিয়া গৃহকর্ত্তার নিকট ঐটি ফেরত দেয় ও বলে যে, ঐ অদ্ভুত বস্তুটি যাদুকরের ব্যবহৃত কাচের জগে পাইয়াছে। ইহাতে খেলাটির কৌশল সম্ভবত তাঁহাদের নিকট প্রকাশই পাইয়াছিল, কারণ গৃহকর্ত্তা ঐটি হাতে লইয়া প্রচুর হাসিয়াছিলেন।

এভাকুয়েশান

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

কলিকাতা সহরের একটি ফ্ল্যাট্ সিষ্টেমের বাড়ীতে একটি বিবাহিতা তরুণী, তরুণীর নাম রাণী। রাণী নূতন দেখিয়া-আসা ফিল্মের গানের সুর খুব আস্তে আস্তে গাহিতেছে, আর ঘরের আর্সিচায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে; ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে চারদিক চাহিয়া দেখিয়া বুকের ভেতর হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল এবং সেটি খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিল—

রাণী। "তোমাকে অঘ্রাণ মাসের শেষে আন্‌বার কথা ছিল, কিন্তু কবে যে তোমায় আন্‌বেন তাত' আজও বুঝতেই পাচ্ছি না।" আহা আমিই যেন পাচ্ছি।

পুনরায় চিঠি পড়িতে লাগিল—

সামনে বড়দিন আসছে আমাদের বড় দিনের সেই সব প্ল্যান্‌গুলো তোমার মনে আছে ত'। শীগ্‌গির আসা চাই।

নিশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানি মুড়িয়া আবার বুকের মধ্যে রাখিল—

আমার ইচ্ছেতেই যেন যাওয়া, নিজের কিছু বল্‌বার মুরোদ নেই, আর আমায় লেখা হ'য়েছে তুমি শিগ্‌গির এস। সত্যি কবে যে মা পাঠাবে—আর ভাল লাগে না।

রাণীর বোন আনি দৌড়িয়া আসিয়া—

আনি। দিদি ভাই, দিদি ভাই—আমায় সেই থিয়েটারের নোতুন গানটা শিখিয়ে দাওনা ভাই।

রাণী। তুই গা-না।

আনি। না, তুমি গাও আমি শুনে গাইব।

রাণী। এতবার শুনেও ঐ গানটা আর তুলতে পারলি না।

আনি। তুমি আর একবার গাও ঠিক তুলে নোব।

রাণী। আজ যা গাইলুম, আর কিন্তু গাইব না।

আজি মন পিয়ালায় ভরা মধু পিয় পিয় ওগো ও হিয়ার বঁধু
তরুণ পীতম লাগি মধুর মদির হাসি
উছলি উঠিল ভাসি ফেনিল অধরে আজি চুম বঁধু।
তোমারে নিতে হৃদয়ে সুখে মদন দহে অনল বুকে
যৌবন পুলকে চাহে দিতে বাহুর ফঁাদে মিশাইতে হিয়ার মধু॥

আনি নীচে জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে—

আনি। দিদি—দিদি, থাম্ থাম্, বাবা আস্‌ছে। এখুনি বল্‌বেন ঘরের কাজকর্ম্ম কিছু নেই কেবল গান।

রাণীর পিতা রঞ্জনবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে—

রঞ্জন। হ্যাঁরে রাণী, এখানে আবার আলোটা কে জোর করে দিলে, তোরা সব্বনাশ না করে ছাড়বি না দেখছি।

রঞ্জনবাবুর ঘর

রঞ্জনবাবু দুহাতে কতকগুলি বাজারের পোঁটলা পুঁটুলি লইয়া গলদঘর্ম্ম অবস্থায় ঘরে ঢুকিলেন—তাঁহার পিছনে রাণী ছুটিয়া আসিল; তিনি কতকগুলি পোঁটলা রাণীর হাতে দিলেন, আর কতকগুলি মেঝেয় রাখিতে রাখিতে কন্যাকে বলিলেন

রঞ্জন। ওগো! শুনছ। রাণী ওরা কোথায় গেল রে?

রঞ্জনবাবুর রান্নাঘর; রঞ্জনবাবুর ওগো ওরফে সাবিত্রী দেবী তাঁর কতকগুলি ছেলে মেয়েকে খাওয়াতে খুব ব্যস্ত—সেই জন্য ডাক শুনে রান্নাঘর থেকেই উত্তর দিলেন—

সাবিত্রী। এসেই চ্যাঁচাচ্ছ কেন; যা বলবে বল না।

রঞ্জনবাবুর ঘর।

রঞ্জন। চ্যাঁচাচ্ছি কি সাধে, আগে এসে শুনে যাও।

রান্না ঘর।

সাবিত্রী। এখন আমার শোনবার সময় নেই, পরে শুনব এখন, তুমি আগে হাত পা ধোও।

রঞ্জনবাবুর ঘর।

রঞ্জন। হাত পা আর নেই—সে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। তুমি একবার শুনবে···না কি?

রান্না ঘর।

সাবিত্রী। আঃ কি যে চেঁচাও, বলছি একটু বাদে যাচ্ছি।

রঞ্জনবাবুর ঘর।

রঞ্জন। আর একটু বাদে শোনবার সময় পাবে কিনা তাই দেখ—

রাণী, যা মা শীগ্‌গির সব গুছিয়ে ফেল, দেরী করিস্ নি।

রাণী। কি গোছাব বাবা?

রঞ্জন। আঃ তোরা কেউ কিছুই যদি না পারিস্, আমি একা ক দিক সামলাই—ওগো শুনছ—

সবিস্ময়ে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া রাণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

আঃ এ যে এখনো আসে না, ওগো—

রঞ্জনবাবুর ওগো ওরফে সাবিত্রী দেবী এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলেন, স্বামীর চীৎকারে ব্রস্তভাবে এই সময় ঘরে ঢুকিলেন—

সাবিত্রী। আঃ চ্যাঁচাও কেন, কি বলছ বল।

রঞ্জন। বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু—জীবন বিপদ, কালই কোলকাতা ছেড়ে পালাতে হ'বে।

সাবিত্রী। তার মানে—

রঞ্জন। মানে আবার কি, বাঁচ্‌তে হ'লে পালাতে হ'বে।

সাবিত্রী। আফিসের ক্যাস ট্যাস্ ভেঙেছ নাকি?

রঞ্জন। না না, তার চেয়েও বিপদ, বোমা—বোমা।

সাবিত্রী রঞ্জনবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া—

সাবিত্রী। বুড়ো বয়সে ওদলে আবার কেন গেলে গো?

রঞ্জন। আরে আমি নই, আমি নই।

সাবিত্রী। তবে কে?

রঞ্জন। জাপান।

সাবিত্রী। জাপান বোমা করেছে, তবে তুমি ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

রঞ্জন। বলে চ্যাঁচাচ্ছ কেন; কোথায় বোম ফেলেছে জান?

সাবিত্রী। আমার জানবার দরকার? আমাদের বাড়ীতে 'ত' আর ফেলেনি।

রঞ্জন। আর ফেল্‌তে দেরীই বা কি—এই দেখ বিকেলের টেলিগ্রাফ—বর্ম্মায় বোম, ওঃ এর মানে বোঝ—

সাবিত্রী। আমার ওতে কি দরকার?

রঞ্জন। দরকার নেই—তার মানে—বর্ম্মায় বোম মানে কলিকাতায় বোম, বুঝলে—ওরে বাপ্‌রে বাপ্—কোলকাতায় বোমা পড়বে—উঃ উঃ আমার বুক কেমন করছে, মাথা ঘুরছে—ওগো ধর ধর আমায়, নাঃ আর না,···পালাতে হ'বে।

সাবিত্রী রঞ্জনকে ধরিয়া বিছানায় বসাইতে বসাইতে—

সাবিত্রী। আচ্ছা তুমি একটু ঠাণ্ডা হ'ও, সবটাতেই তোমার বাড়াবাড়ি, আজই 'ত' আর বোমা পড়ছে না।

ডিজলভ্। ফেড ইন।

আর একটি ফ্ল্যাট বাটীর অংশ বিশেষে বাড়ীর কর্ত্তা জগন্নাথবাবু সেইমাত্র অফিস হইতে ফিরিবার সময় কতকগুলি বাজারের পোঁটলা ও একখানি বৈকালিক টেলিগ্রাফ হাতে করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। কর্ত্তার আসিবার শব্দ পাইয়া গৃহিণী অন্নাকালী দেবী রান্নাঘর হইতে তরকারির খুন্তি হাতে করিয়াই কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত—

জগন্নাথ। আঃ একটুতেই তুমি মহা ব্যস্ত, আজই ত' আর বোমা পড়ছে না।

অন্নাকালী। নাঃ বোমা পড়ছে কিনা তার তুমি খোঁজ রাখ? ও বাড়ীর পিসীমা বলে গেলেন যে—

জগন্নাথ। তোমার মাথা বলেছে—যত সব—

জগন্নাথ পোঁটলাগুলি দুমদাম করিয়া নামাইয়া রাখিলেন—

অন্নাকালী। তুমি কোন্ খোঁজটা রাখ যে এটা রাখবে? সেদিন ছোট ছেলেটা রাত্তিরে কাঁদছে, বল্লুম, দেখ ত' কি হ'চ্ছে, তার কিছুই দেখলে না।

জগন্নাথ। হুঁ ছেলেমানুষ করা থেকে বাড়ীর সব কাজ সেরে এবার থেকে অফিস যাবো।

অন্নাকালী। আহা কথার ছিরি দেখ, সংসারটা কি সব আমি দেখতে পারি, খোঁজ খবরটাও ত' লোকে নেয়।

জগন্নাথ। হ্যাঁ খোঁজ-খবরের ঠেলাতেই ত' এই বয়েসে

এখনও এই সকাল ৯টা থেকে রাত্তির ৯টা অবধি ঘানি ঘুরিয়ে আসছি—তাও আবার বেঙ্গল টাইম!

আন্নাকালী। হ্যাঁ, আর আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছ। আমিও ত' মানুষ। যে ধারে না চাইব সেইধারেই সব নষ্ট, এই যে একটা বিপদ্ তার কোন খোঁজ তুমি রাখ?

জগন্নাথ। কি বিপদ্ তাই বল?

আন্নাকালী। যাওনা ও বাড়ীর পিসীমার কাছে গিয়ে শুনে এসনা, ও বাড়ীর নন্টু ঠাকুরপোর কাছে টেলিগ্রাফ এসেছে।

জগন্নাথ। টেলিগ্রাফ আসে নি খপরের কাগজে বেরিয়েছে, এই সে কাগজ আমার কাছেও রয়েছে।

আন্নাকালী। তোমার কাছে আছে ছাই, থাক্‌লে আর তুমি ও কথা বলতে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে ঝি আসিয়া গিন্নীর সম্মুখে দাঁড়াইল—

আন্নাকালী। আঃ মলো ঢং করে কেঁদে মরছিস্ কেন? সেই ত' বিকেল পাঁচটায় বেরিয়েছিলে আর এই বাড়ী ঢুকলি। আর ঢং করে ফোঁস ফোঁস করতে হ'বেনা।

ঝি। মা আমি দ্যাশে যাবো।

আন্নাকালী। আহা আমার রঙের রাধা! একটু আঁচ সইতে পারেন না, পথেও হাগ্‌বেন আর চোখও রাঙাবেন।

জগন্নাথ। আঃ থামো না।

ঝি। মা আপুনি আমার মা আছেন, আপুনার বাক্যিতে আমরা রাগ করতে লারব, আমার মাইনেটি দিয়ে দ্যান, আমি কালই দ্যাশে যাব।

আন্নাকালী। আ মলো, দ্যাশে যাবি কেন বল?

ঝি। আমার গিরামের সব নোকজন দ্যাশে যাচ্ছে; তারা বল্লে কোলকাতায় বোমা পড়বে, আর গোরারা সব তল্লাট ছেয়ে ফেলবে লড়ুই করবার লেগে। তাই বল্লে—পেঁচোর মা আর চাকুরিতে কাজ লাই দ্যাশে চল, হ্যাঁই মা আপনার পায়ে ধরি, আমার মাইনেটি দিয়ে দ্যান, আমি থাক্‌তে লারব বটে।

জগন্নাথ। ওরে থাম, থাম্, তোকে বেছে বেছে কেউ বোমা মারবে না, আর ধরে নিয়ে যাবার বয়েসও তোর নেই।

আন্নাকালীর পা জড়াইয়া ধরিয়া—

ঝি। দোহাই মা আপুনাগোর, আমার মাইনাটি দ্যান, আমি থাকলে ভয়েই মরে যাব। হেথাকে লিশ্চয় বোমা পড়বে।

জগন্নাথ। আরে বাপু, আর বোমা বোমা করে মাথা খারাপ করিস্ নি। যত সব বাজে ঝামেলা।

আন্নাকালী। তোমার সবটাতেই অনাছিষ্টি। শহর সুদ্ধু লোক বলছে বোমা পড়বে। আর উনি বড় মন্দো, কেবল ঠিক করেছেন বোমা পড়বে না।

ঝি। না মা না, লিয্যাস বোমা পড়বেন, আমার মাইনেটি দ্যা দ্যান মা।

জগন্নাথ। বাড়ী যাবি ত' কাজ করবে কে? এখন চলে গেলে এক পয়সা মাইনে পাবি না। যত কিছু না বলি—সব মাথায় উঠে বসেছে—গেল যা—।

আন্নাকালী। দেখ সবটাতে লোককে অত দুরছাই কোর না। হ্যাঁ বাড়ী যাবি। আমরাও কাশী চল্লে যাচ্ছি।

খাবার ঘরের দিকে কান্নার শব্দ শুনিয়া—

পেঁচোর মা দেখ ত' আবার হাবুলটা কাঁদছে কেন।

ঝি। মা কাল মাইনে পাব?

আন্নাকালী। হ্যাঁ হ্যাঁ পাবি, যা।

ঝি আস্তে আস্তে চলিয়া গেল—

জগন্নাথ। বাঃ একেবারে যাব বলে ঠিক করেই ফেলেছ।

আন্নাকালী। না তোমার আশায় বসে আছি।

জগন্নাথ। নাঃ আমার আশায় বসে ত' নেই, কিন্তু ছেলেদের স্কুল কলেজ আছে, বৌমাকে আন্‌তে হবে, ক্ষেন্তির সাত মাস, তাকেও আনা দরকার এসব ভেবে দেখেছ।

আন্নাকালী। সব ভেবে দেখেছি; ছেলেরা বাঁচলে তবে ত' লেখাপড়া, আর ক্ষেন্তিকে এবারে আনব না, আর বেয়াই তোমার মতন হুঁসো নয় যে বৌমাকে কোলকাতায় রাখবে।

রঞ্জনবাবুর বাটীর ঘর।

রঞ্জন। হ্যাঁ বেয়ান ত' আর তোমার মতন নয় যে এই হাঙ্গামায় বৌ ছেলে নিয়ে কোলকাতায় থাকবে, যত সব—

সাবিত্রী। তবে কি ওঁরাও কোলকাতায় থাক্‌বেন না।

রঞ্জন রাস্তার দিকে চাহিয়া—

রঞ্জন। কেউই কোলকাতায় থাকবে না।

রাস্তায় যে কয়খানি বাড়ী সামনাসামি দেখা যায় তাহাদের সব গুলিতেই গাড়ী করিয়া মাল এবং মানুষ সমান অনুপাতে তোলা হইতেছে এবং রাস্তা দিয়া মোট ঘাট লইয়া লোক পলাইতেছে—তাহা দেখাইয়া—

ঐ দেখ কি রকম লোক পালাচ্ছে। আর এখানে থাকা চলে? সনৎবাবুরা কাল গেছে, অজয়রা কাল যাবে। এখন হরির নাম করে আজকের রাতটা কাটলে বাঁচি।

রঞ্জনবাবুর বাটীর অপর ঘরে রাণী—

রাণী। বাবা অঘ্রাণ মাস আর শেষ হ'তে চায় না। কিন্তু এ'বার মাস ত' শেষ হবে আজ বাদ কাল; তবে কৈ এখনও ত' শ্যামবাজার থেকে মা কিছু খবর দিলেন না। কি যে ভাবেন এঁরা? কার্ত্তিক মাসে যেতে নেই, অঘ্রাণ মাসের প্রথমে মা বল্লে বাড়ীতে সব অসুখ—থাক, আবার অঘ্রাণ মাসের শেষেও ত' ওদের কোন পাত্তা নেই।

ডিজ্‌লভ। ফেড ইন।

জগন্নাথবাবুর বড় ছেলে যতীনের ঘর

যতীন। বাবা—বাবা—শালার অঘ্রাণ মাস আর কাটে না। আশ্বিন মাসে পুজোর পর গেছেন, তা আমার আর নামই নেই। উঃ যা শীত পড়েছে—কবে যে আসবেন দয়া করে তা জানি না। কালকের মধ্যে যদি না আসে ত—

যতীনের ছোট বোন হাসি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া—

হাসি। দাদা—দাদা, আমরা সব কাল কাশী যাব

যতীন। কাশী কে যাবে?

হাসি। তুমি কিছু শোননি বুঝি ?

যতীন। কি, শুনব কি ?

হাসি। আমার যুঁই ফুল বলছিল, ঠাকমা বলছিল।

যতীন। আরে কি বলছিল তাই বল্না ছাই।

হাসি। মাও বলছিল—কাল পরশুর মধ্যে নিশ্চয়ই এখানে বোমা পড়বে।

যতীন। তোদের মুণ্ডু পড়বে।

রঞ্জনবাবুর বাটী, রাণীর ঘরের সুমুখের বারান্দা

রাণী। তোর মুণ্ডু পড়বে।

ঠাকুর। হ দিদিমণি তোতে গোড় পড়িচি, বাবুমানেক' বলিকি মোতে তঙ্কাটি দিয়া দিয়। মোতে বড় ডর মারুচি।

রাণী। মা ত' বলেছে এখন যে যাবে তাকে একপয়সা মাইনে দেবে না। আমি কি করব বল।

ঠাকুর। না দিব ত' কন্অ কিয়া যিব। মিদনাপুর বাটরে হাঁটিকি চলি যিব। দিদিমণি তোতে গোড় পড়িচি, তু টিকে বলি দিও।

রাণী। আমি ত' বলে দোব, তুমি ত' দিব্যি বাড়ী যাবে, তারপর রাঁধবার জন্যে আমার শ্যামবাজার যাওয়াটাও বন্ধ হোক্। দোহাই বাবা-ঠাকুর আমি চলে গেলে তুমি যেও।

রাণীর ছোট ভাই অসিত লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া

অসিত। দিদি—দিদি আমরা কাল মধুপুর যাচ্ছি।

ঠাকুর। জয় মহাপ্রভু—বাবুমানে এঠি না রহিলে মোতে ত' তঙ্কা মিলিব, ঘর যিব। জয় মহাপ্রভু।

বলিতে বলিতে ঠাকুর চলিয়া গেল—

অসিত। তুমি বুঝি জান না? বাবা আজ অফিসে খপর পেয়েছে, কাল পরশুর মধ্যে কোলকাতায় বোমা পড়বে।

রাণী। আমায় ত' আর নিয়ে যাবে না। আমি ত' শ্যামবাজার চলে যাব। রেবা ও কমলার প্রবেশ

রাণী। হঠাৎ এসেই একেবারে মার খোঁজ ?

রেবা। আমরা আজই চলে যাচ্ছি ভাই।

রাণী। কাল কিছু বল্লি না, আজ হঠাৎ কোথায় চল্লি ?

কমলা। ভাই ওঁরও বড় ভয় হয়েছে, আর সবাই বলছে কলকাতায় মিলিটারি এরিয়া হবে আজকালের মধ্যে, তাই আমরা দেওঘর যাচ্ছি।

রাণী। তোমার ওঁকেও সঙ্গে নিয়, তা না হ'লে মিলিটারীতে ওঁকে ধরে নিয়ে না যায়।

কমলা। সে কথা সত্যি ভাই, তাই বাবা শুধু এখানে এখন থাকবেন। ও আমাদের সঙ্গে যাবে।

রাণী। রেবা, তোরা কোথায় যাচ্ছিস্ ?

রেবা। আমরা ভাই ফরিদপুরে মাসীর বাড়ী যাচ্ছি।

কমলা। রেবা আয়—জ্যেঠাইমা বোধহয় রান্নাঘরে আছেন ; রাণী, তোরা কোথায় যাবি ভাই ?

রাণী। স্বর্গে।

বাড়ী থেকে বোমা, বোমা—তাতে আবার বাড়ীর বৌমা আসবে না শুনে বিরক্ত হ'য়ে যতীন রাস্তায় বেরুল ; সাম্নেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা—সে কতকগুলি ষ্টেশনারী জিনিস কিনে ফিরছে. রাস্তায় যতীনকে দেখেই

বন্ধু। আরে কে যতীন যে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস্ ?

যতীন। স্বর্গে।

বন্ধু। হ্যাঁ হে এখন ত' খুব লম্বাই চওড়াই করছ—যখন বোম্ পড়বে তখন বুঝবে।

যতীন। বোমা-তত্ত্ব তোকে ব্যাখ্যা কর্ত্তে হবে না। তুই তোর কাজে যা।

সে বন্ধু একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, যতীন বলিতে লাগিল—

আচ্ছা কলকাতার লোকগুলো বোমা বোমা করেই ক্ষেপ্‌বে। রথীনদের বাড়ী একবার ঘুরে আসি, ও নিশ্চয়ই থাকবে।

রথীনদের বাড়ীতে সমস্ত মোটঘাট বাঁধাবাঁধি চলছে. রথীন একটা চাকরকে নিয়ে সোৎসাহে বিছানাটায় দড়ি বাঁধছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে যতীন হাঁক দিলে—রথে, রথে—

রথীন সেই অবস্থায় ঘর থেকে হাঁক দিলে—

ওরে বাইরের ঘরে বস, আমি যাচ্ছি।

যতীন রাস্তায় দাঁড়িয়েই হাঁক দিল—

আমি রোয়াকে বসেছি, তুই আয়।

রথীন চাকরকে বিছানা বাঁধিতে বলিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাহিরে আসিল—

যতীন। কিরে, ধুলোয় ধুসর নন্দকিশোর হ'য়ে এলি যে ?

রথীন। কি করব ভাই, আজই সব বাড়ীর লোক নিয়ে নবদ্বীপে রাখতে চল্লুম। তোরা কবে যাচ্ছিস্ ?

যতীন। দেখা যাক্, আসি আজ।

যতীন হন্ হন্ করিয়া রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে—

নাঃ কলকাতার লোকগুলোর মাথাই খারাপ হ'য়েছে, ভবানীপুর যাব না। তার চেয়ে মেট্রোয় "মাতাহরি" দেখে আসা যাক্।

যতীন বাস আসিতে দেখিয়া একখানি বাসের মধ্যে উঠিয়া পড়িল ; বাসের মধ্যে উঠিয়া শুনিল সেখানেও রীতিমত এভাকুয়েশান ও বোমার আবির্ভাবের মুখরোচক গল্প চলিয়াছে।

১ম যাত্রী। আজকের ফাইন্যাল টেলিগ্রাফের যা খপর, তাতে কোলকাতায় আর এক মিনিট থাকাও নিরাপদ নয়।

২য় যাত্রী। আজকালের মধ্যে কোলকাতা নিশ্চয়ই বোম হ'বে।

নিম্নস্বরে—

৩য় যাত্রী। আমি যা আজ খপর পেলুম, তাতে জানা গেছে—ডিগবয় একেবারে বোম করে উড়িয়ে দিয়েছে।

১ম যাত্রী। সে'ত' হবেই, টোকিও-রেডিও কাল স্পষ্টই বলেছে তোমরা সব ভাগ, আমরা দু'এক দিনের মধ্যেই কোলকাতায় যাচ্ছি।

যতীন। আপনি কি টোকিও-রেডিও শুনেছিলেন।

১ম যাত্রী। নাঃ, আমার এক বন্ধুর শালা শুনেছিল।

যতীন। ওঃ।

৪র্থ যাত্রী। এখন যাই বলুন মশাই, রেঙ্গুনে ঘাঁটি না হ'লে কিছু হ'বে না।

২য় যাত্রী। না না মশাই তার দরকারই নেই, ওদের এমন প্লেন আছে, যাতে করে ওরা মালয় থেকে সিধে কোলকাতায় এসে ছুবার বোম করে যেতে পারে।

যতীন। যত সব পাগল।

বলিয়া বাস হইতে নামিয়া বিরক্তভাবে আর একখানি ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া বসিল, সেখানেও পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী লোকের মধ্যে বোমার আলোচনা চলিতেছে—।

১ম যাত্রী। আরে হ' আমি কাল হাখ্ছি চিটাগাঙ্ মেল আস্বার পারে নাই। সেহানে খুব বোম পড়ছে।

২য় যাত্রী। 'হ' আমি কাল রাঙা ভাইগোর কাছে শোনবার পাইছি, চিটাগাঙেরে জব্বর লড়াই হইচে। এক গাড়ী গোরা আসছে হাত-পা ভাঙা। হাহ কোলকাতাতে কাল পরশু বোমা পড়া লাগব।

যতীন। মশাইদের বাড়ী কোথা।

যাত্রীদ্বয়। ঢাকা জিলায়।

যতীন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া

যতীন। আমি শুনলুম ঢাকাটাই বোম ফেলে উড়িয়ে দিয়েছে।

বলিয়া নামিয়া পড়িল।

যতীন পুনরায় বাসে না চড়িয়া চৌরঙ্গী ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল—মোড়ের মাথায় টেলিগ্রাফ হাঁকিতেছে—

টেলিগ্রাফ হকার। বাবু কোলকাতামে এমারজেন্সী হোল, বড় গোলমাল খপর, বড় গোলমাল হল।

যতীনের কাছে আসিয়া—

বাবু কোলকাতামে বোম গিরবে, বড় গোলমাল খপর—একঠো লি-জিয়ে—।

যতীন। বাবা তোমাদের কোম্পানী কত মাইনে দ্যায়।

হকার। নেহি বাবু হামলোকতা মাহিনা নেহি মিল্তা।

যতীন। তোমরাই গভর্ণমেণ্টের এভাকুয়েশান প্রচারক।

যতীন খানিকটা হন্ হন্ করিয়া যাইয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে চাপিয়া ভবানীপুরের দিকে যাইতে বলিল। ট্যাক্সি খানিকটা যাইয়া একটি সাইকেলচারীকে চাপা দিতে দিতে বাঁচাইয়া বলিল—

ট্যাক্সিড্রাইভার। দেখিয়ে বাবু, কলকাতাকো আঁধার মে গাড়ী চালানে কিয়া মুস্কিলকো বাৎ হ্যায়। বাবুজী কোলকাতামে কব বোম গিরেগা।

যতীন। হামরা আবি খপর নেহি মিলা।

ড্রাইভার। হামারা গাড়ীমে বহুৎ সায়েব লোক চড়তেহেঁ —উসি ওয়াস্তে হাম ত পছন্ লিয়া দু চারো দিন বাদ জরুর বোমা গিরেগা। হাম ত উসিওয়াস্তে কাল সামকো লেড়কা-জানানা সব গাঁওমে ভেজা।

যতীন। তুম্ লোক ত শিখ হ্যায়, এৎনা ডর কাহে।

ড্রাইভার। আরে বাবু বোমসে ত সব কৈ ডরতে হেঁ।

যতীন বিরক্ত হইয়া…

যতীন। না ট্যাক্সিতে উঠেও নিস্কৃতি নেই! নেবে পড়ি।

এই সময় দেখিল সামনেই শ্বশুর বাড়ী; যতীন তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিকে দাঁড় করাইয়া নামিয়া পড়িল।

ডিজলভ্। ফেড ইন।

রঞ্জনবাবুর বাটী, রাণীর শোবার ঘর, রাণী ঘরে বসে একটা মাফ্লার বুনছে আর সন্ত ফিল্মে দেখে-আসা গান গাইছে—

কেন এলে মোর ঘরে আগে না বলিয়া
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া

যতীন আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল এবং নিজের মনেই বলিল—

যতীন। আরে বাবা, পথ বোমায় ভুলিয়ে দিচ্ছে!

রাণী গাহিয়া চলিল—

তোমার লাগিয়া আজ
পরিনি মিলন সাজ
বিরহ শয়নে ছিনু আঁখি জল ঢলিয়া
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া।

যতীন। উঁ হুঁ, মা বলছিল, বাবা শ্যামবাজা পাঠিয়েছেন তুমিও আমাদের সঙ্গে মধুপুর যাবে।

যতীনের পড়ার ঘর; যতীন উঠিয়া কয়েকবার ঘরে পায়চারি করিল—

যতীন। নাঃ পড়া আজ থাক, তার চেয়ে রাণীকে একখানা চিঠি লিখি।

রাণীকে চিঠি লিখিবার কাগজ কলম লইয়া বসিতেই ঘরে চাকর ঢুকিল

চাকর। বাবু—

যতীন চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া

যতীন। বল বাবা, বোমার কি খপর বল। পালাবে?

চাকর। দাদাবাবু আমার জরুর বহুৎ বেমার হুয়া।

যতীন। তোমার জরুর বেমার নেই, আর গরুর ও বেমার নেই। আছে বোমার বেমার।

চাকর। নেহি বাবু দেশ ত' যানে হোগা। বাবুকা বোলকে হামারা রূপেয়া দেলায় দিযিয়ে।

যতীন। কাহে, মাড়ুয়া লোক ত' বহুৎ পলোয়ান্—বাঙালীবাবু লোক বহুৎ ডরতা হ্যায়—তব্ মাড়ুয়া সব কোলকাতাসে ভাগ্তা কাহে। ঠারো হিঁয়া পর।

চাকর। নেহি নেহি হুজুর, হিঁঞা পর কোন ঠারেগা—আভি সব কৈ বোঁলতে—বোম গিরেগা হিঁঞা পর।

যতীন। আরে বাবা, বোম গিরনেসেভি তুম্লোককা গোবর ভরা মাথামে নেহি গিরেগা।

ডিজলভ্। ফেড ইন।

রঞ্জনবাবুর বাড়ী রাণীর ছোট ছোট দুই ভাই বোন রাণীকে বোমার কথা বলতে বলতে আসছে

রঞ্জন। আচ্ছা দিদি, বলত' বোমা আগে কোথায় পড়বে?

রাণী। তোর মাথায়, কেবল বোমা আর বোমা, কালকের অঙ্কগুলো করেছিস্।

রঞ্জন। বারে স্কুল তো উঠে যাচ্ছে।

রাণী। তোমার মাথা হচ্ছে। যা শিগ্গীর অঙ্ক কষ্গে যা, ফস্তি তুই কি করছিস্।

ফন্তি। বারে আমি কি কলব। দাদা বল্লে আর পল্‌তে হবে না; কাল আমাদেল বাড়ীতে বোমা পলবে—তাই কখন পলবে জান্‌তে এলুম ত'।

রাণী। কেন তোর জেনে লাভটি কি ?

ফন্তি। বা রে, মেজদি বল্লে তখন আমরা সব টেবিলের তলায় ঢুকে বসব না ?

রাণী। উঃ কি জ্বালাতন, যাঃ পড়গে যা।

ফন্তি দৌড়াইয়া পালাইল, রাণীর পার্শ্বের বাড়ীর দুই বান্ধবী কমলা ও রেবা আসিয়া উপস্থিত হইল।

কমলা। হ্যাঁ রে রাণী জেঠাইমা কোথায় ?

এই সময় নীচের তলায় রাণীর ছোট ভাই রন্তু একটি ঠোঙা ফুঁ দিয়া ফাটাইল

রাণী। বাবা গো বোমা

বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল

যতীন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—

রাণী। কে কে

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

অসিত পাশের ঘর হইতে—

অসিত। দিদি, কি হল কি হল

বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

যতীন। আঃ চ্যাচাও কেন, তোমারও কি বোমা-ফবিয়া রোগ ধরেছে।

রাণী। তুমি যে এসেছ 'তা' জানব কি করে।

অসিত ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যতীন—

অসিত। ওঃ জামাইবাবু, আপনি এত রাত্তিরে ?

যতীন। জামাইরা রাত্তিরে আসবে না ত কি দিনে আসবে রে শালা।

অসিত। আচ্ছা জামাইবাবু, আমি শুনলুম যে আজ দশ বারখানা এরোপ্লেনে জাপানীরা এসে কোলকাতা এঁকে নিয়ে গেছে—আর তারা বলে গেছে, কাল পরশু নাগাদ রাত্রিতে বোমা ফেলবে।

যতীন। উঃ এখানেও বোমা—।

অসিত। সত্যি জামাইবাবু ?

যতীন। হ্যাঁ হ্যাঁ সব সত্যি।

অসিত। আমি বল্লে মা কিছুতেই বিশ্বাস করে না ; যাই আপনার কাছে মাকে ধরে নিয়ে আসি।

অসিত দৌড়াইল, যতীন আশ্বস্তভাবে রাণীর কাছে বিছানায় বসিল—

যতীন। উঃ রাণু, সব বোমা বোমা করে ত মাথা খারাপ করে দিলে।

রাণী। হ্যাঁ আমরা সব ত মধুপুর চল্লুম।

যতীন। হা ভগবান্, সাম্নে এমন বড়দিনটাই মাটী করে দিলে। বেটা নাক-খ্যাঁদারা যদি বড়দিনটা বাদ লড়াই করতিস্—কি এমন তোদের বুদ্ধ রাগ করত।

রাণী। তোমরা কোথায় যাচ্ছ।

যতীন। যমালয়।

রাণী। আঃ কি যে বল, সত্যি কোথায় যাবে বল না ?

যতীন। শুনছি শেষ সম্বল কাশী।

রাণী। তুমিও যাবে ?

যতীন। কর্ত্তাদের আদেশ ত তাই—ল পরীক্ষা না দিলেও চলবে, বাড়ীর খপরদারী করতে কাশী থাকতে হ'বে।

রাণী। তবে আমাকেও কাশী নিয়ে চল না।

যতীন। সে স্থলেও কর্ত্তৃপক্ষের মন্তব্য এই যে—আমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ, অতএব ছেলের হাতে মোয়ারূপ তোমাকে দেখলেই মেড়োরা কেড়ে নেবে। অতএব তুমি সাবালক দলের সঙ্গে মধুপুরে মধু আহরণে যাও। চুলোয় যাক্‌গে সব, আজকের রাতটা ত' মক্ষিকারাণীর কাছ থেকে মধু আহরণ করে বোমা তাপে তপ্ত প্রাণ শীতল করি।

যতীন রাণীকে আকর্ষণ করে যেই নিজের দিকে এনেছে এই সময় অসিত ঘরে ঢুকিল

অসিত। জামাইবাবু, মাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

যতীন। উঃ একেই বলে বোমা পড়া।

যতীনের শাশুড়ী সাবিত্রী রেকাবে খাবার ও গেলাসে জল লইয়া ঘরে ঢুকিলেন ; যতীন তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করলে—

সাবিত্রী। বেঁচে থাক, তোমার মা কি কাশী যাচ্ছেন।

যতীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাবিত্রী। আর বাবা, যে ভয় কোলকাতায় ধরিয়ে দিচ্ছে। আজ আবার শুনছি না কি বোমার ভয়ে গয়না দলিল সব লুকোতে বল্ছে, উনি ত বলছিলেন গয়নাগুলো ব্যাঙ্কে দিয়ে আসবেন। আমি ত বলেছি প্রাণ থাকতে তা দোব না। তুমি জল খেয়ে নাও, বাবা, মাকে বলে এসেছ ত।

যতীন। আজ্ঞে না।

সাবিত্রী। তবে তুমি আর বোস না, জল খেয়েই চলে যাও, রাস্তায় যা অন্ধকার কোলের মানুষ দেখা যায় না।

যতীন। আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

রাণীর দিকে ইসারা করিয়া বলিল—বল আজ আর অন্ধকারে কি করে যাবে, কিন্তু রাণী ইসারায় জানাল যে তা সে পারবে না—

সাবিত্রী। নাও বাবা তুমি খেয়ে নাও রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

যতীন বিরক্তভাবে একটি রসগোল্লা মুখে দিয়াই জল খাইল

সাবিত্রী। তুমি যে কিছুই খেলে না,আর একটা খাও।

যতীন। আজ্ঞে পেটভার আছে।

অসিত। মা জিজ্ঞেসা কর জামাইবাবুকে।

সাবিত্রী। দিনরাত্রি বোমা বোমা শুনে শুনে পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছে। কেবলই সব বলছে বোমা পড়বে।

এই সময় অসিত হাঁচিল

সাবিত্রী। সবটাতেই তোদের বিপত্তি—এই সময় হাঁচ্‌লি, মা দুর্গার দয়ায় রাতটা কাটলে হয়। যতীন এস বাবা তুমি আর রাত কর না।

যতীন বিষণ্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল

ডিজল্‌ভ্। ফেড ইন।

বেলা একটার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বুকিং অফিসে বিরাট্ ভীড়, হাতীবাগানের মোড় হইতে বুকিং অফিস পর্য্যন্ত সার দিয়া লোক রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছে এবং মাঝে মাঝে জোর ঠেলাঠেলি চলিয়াছে—জগন্নাথবাবুও সেই ভীড়ের মধ্যে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—

জগন্নাথ। বোমার ভয়ে পালাতে গিয়ে প্রাণটা এখানেই

যাবে। বেটা মেড়োর বংশে বাত্তি দিতে আর কোলকাতায় কেউ থাক্‌বে না। সব বেটা ভাগছে।

জনৈক বিহারী। ভাগেগা নেহি ত জান দেগা কোন?

জগন্নাথ। বাবা, টিকিট কাটনেমে ত' জান চলা যায়।

এই সময় ভীড় হইতে একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিল, তাহার কে গাঁট কাটিয়া সব টাকা চুরি করিয়াছে, তখন আবার সকলে ভীড়ের মধ্যে যে যাহার পকেট চাপিয়া ধরিতে লাগিল—

জগন্নাথ। উঃ টিকিট কাটা কি ঝকমারিরে বাবা।

ডিজল্‌ভ্‌। ফেড ইন।

রঞ্জনবাবুর বাটীর সমুখের রাস্তায় দুখানি ঘোড়ার গাড়ী আর একটি রিক্‌সা আসিয়াছে, মাল গণিয়া তোলা হইতেছে এবং এক জিনিসই প্রায় তিনবার করিয়া কর্ত্তা গুণিতেছেন, আর হাঁক ডাক করিতেছেন—

রঞ্জন। আঃ তোমাদের আর হবে না, এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—পথি নারী বিবর্জ্জিতা।

সাবিত্রী। কে তোমায় নিয়ে যেতে বলেছে। একা চলে গেলেই পারতে। এক হাতে সমস্ত সংসার একদিন চালাতে হ'লে বুঝতে।

রঞ্জন। সবটাতেই তোমার রাগ, ওরে এই রাণী, এই অসে, তোরা সব গাড়ীতে উঠবি কি না বল।

তাহারা সকলে একে একে গাড়ীতে উঠিল—

রঞ্জন। ওরে বাবা মুটে, সব ঠিকসে তুলেছিস্‌ ত'।

মুটে। হাঁ হুজুর।

রঞ্জনবাবু দুর্গা দুর্গা বলিয়া গাড়ীতে ওঠা মাত্রই মনে পড়িল বাইরের ঘর হইতে বেতের ভাঙা মোড়াটা আনা হয় নাই; অমনি গাড়ী থামাইতে বলিয়া দৌড়াইলেন। মোড়া আনিয়া যেমন গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন অমনি গাড়ীর দরজায় মাথা ঠুকিল, আবার গাড়ী হইতে নামিয়া একটু দাঁড়াইলেন—

রঞ্জন। নাঃ একটা না একটা বিপদ্‌ আছেই আছে, জয় মা দুর্গা—দুর্গা, গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব।

ডিজলভ্‌। ফেড ইন।

জগন্নাথবাবুর বাড়ীর দোরগোড়া, সেখানেও দুখানি ঘোড়ার গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে, জগন্নাথ আর যতীন বিরক্তভাবে মাল গুণিতেছেন, আন্নাকালী নিজে গাড়ীর ভেতরে সব জিনিস ভাল করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছেন—

আন্নাকালী। ওরে যতীন, ওপরে বড় ধামাটা উঠেছে ত'।

জগন্নাথ। সব উঠেছে, এখন তুমি উঠে বস।

আন্নাকালী। ওটা বল্লেই ত' আর তোমার মতন আমার ওঠা হয় না, চারধারে নজর রাখতে হ'বে দুর্গা, দুর্গা।

আন্নাকালী গাড়ীতে উঠলেন এবং হাতজোড় করে চোখ বুজে নমস্কার করিতে লাগিলেন, জগন্নাথবাবু সেই গাড়ীতে উঠিলেন এবং উঠতেই গাড়ী চলিল। গাড়ী একটু যাবার পরই জগন্নাথবাবুর নজর পড়িল তাঁর এক ছোট ছেলে রাস্তায় দৌড়াইতেছে, গাড়োয়ানকে বলিলেন—

জগন্নাথ। এই রোকো রোকো।

গাড়ী থামিল; জগন্নাথবাবু ছেলেটিকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া এক চড় মারিলেন; ছেলে কাঁদিতে লাগিল—

আন্নাকালী। আঃ ছেলেদের তুমি মার কেন বল দিকি, চুপ কর চুপ কর, হাওড়ায় তোকে চকোলেট কিনে দোব।

জগন্নাথ। তোমার এই চারধারে নজর রাখা—ছেলেটাই পড়ে রইল, চল্লে—হুঁস্‌ নেই।

আন্না। দেখ, যাওয়ার সময় বাজে বোক না, চুপ কর।

ডিজলভ্‌। ফেড্‌ ইন।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে কুলিগুলি তাঁহার সমস্ত মোট দেখিয়া দশটাকা চাহিল—

কুলি। বাবু ঈ সব মোট লেনেসে দশ রূপেয়া সে কম্‌তি নেহি হোগা।

যতীন হাওড়া ষ্টেশনের ভিড় দেখিয়া

যতীন। উঃ কোলকাতাতে আর এভাকুয়েশান নোটীশ দরকার হোল না, সবই ত' পালাল দেখছি।

কুলি। বাবু বোল্‌দিজিয়ে—উধার গাড়ী আগিয়া।

জগন্নাথ। আরে দশরূপেয়া কভি হোনে সক্‌তা, হামরা যেৎনা মাল হায়, সব মাল্‌মে দো দো আনা মিলেগা।

কুলিরা শুনিয়া অন্য গাড়ীর কাছে চলিয়া গেল

আন্নাকালী। ওরে যতীন, কুলি ডাক না, গাড়ী যে চলে যাবে।

যতীন আবার গোটা চার কুলি ধরে আনলে তারা মোট দেখিয়া—

কুলি। বাবু ঈ বার রূপেয়া লাগে গা।

আন্নাকালী। ওরে বাবা, যা লাগেগা তা লাগেগা, হাম্‌রা ঠিক করে গাড়ীতে চড়িয়ে দিলে বক্‌শিস্‌ মিলেগা চল্‌।

কুলি। জি মায়ি, হাম একদম ঠিকসে চড়ায় দেগা।

জগন্নাথবাবু করুণ চোখে একবার যতীনের দিকে তাকাইল

কুলিরা সোৎসাহে মোট নামাইতে লাগিল—

হাওড়া ষ্টেশনের ৪নং প্ল্যাটফরমের গেট। রঞ্জনবাবু স্ত্রীকন্যা পুত্রদের নিয়ে গেটে ঢোকবার অনেক চেষ্টা করে ভিড়ে কোন রকমে ঢুকতে না পেরে ভিড়ের ঠেলায় ঠেলায় বাইরে এসে পড়েছেন—

রঞ্জন। এই বেটা কুলি, তুম্‌ লোক বোলা হায় চৌদ রূপেয়া লেগা—হামরা গাড়ীমে তুলেগা আবি গেট পাশ করনে নেহি সক্‌থা—তুমলোককা এক দাম্‌ড়ি হাম নেহি দেগা।

কুলি। আরে বাবু হামলোক কি করে বলিয়ে।

রঞ্জন। তুম্‌ করে না ত' হাম্‌ কি জানে, আভি গাড়ী ছুটে গা।

২য় কুলি। আরে বাবু ইঁহা হাম্‌লা করনে কিয়া হোগা, চলিয়ে জোরসে আভি তো ফাষ্ট ঘন্টি হুয়া।

রঞ্জন। চলো তব—

জোরে ভীড়ের মধ্যে গিন্নীর ও ছেলেদের হাত ধরিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কুলিরা ভিড়ের মধ্যে আগাইয়া গেল, এই সময় একজন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইলেন। তাঁর গয়নার বাক্স যে পোর্টম্যানে ছিল তা কুলিরা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে—

রঞ্জন। কাঁদছেন কেন মশাই।

ভদ্রলোক। আর মশাই, কুলি বেটা আমার যে পোর্টমানে সর্ব্বস্ব ছিল তাই নিয়ে সরে পড়েছে।

রঞ্জনবাবু ইহা শুনিয়া পড়ি ত' মরি অবস্থায় জামাটামা ছিঁড়িয়া ছেলেদের লইয়া প্ল্যাটফরমে ঢুকিয়া পড়িলেন, কিন্তু রাণী সেই ভিড়ে ঢুকিতে পারিল না। চাপে আবার বাইরে ছিটকাইয়া পড়িল

রাণী। বাবা বাবা—

দুইবার ডাকিল, রঞ্জনবাবু তাহা না শুনিয়াই মুটেদের সঙ্গে দৌড়াইলেন; হাওড়া ষ্টেশনে ডেরাডুন এক্সপ্রেসের গাড়ীতে উঠিয়া সমস্ত জিনিস একবার মিলাইয়া ফের মিলাইতে মিলাইতে

অন্নাকালী। ওগো সব্বনাশ হ'য়েছে।

জগন্নাথ। সব্বনাশ ত' তোমার হয়েই আছে, কি হল?

আন্নাকালী। আমি ভুলে মরতে সব্বনাশ করেছি।

জগন্নাথ। সব সময়েই গোলমাল, কি হ'ল বল না?

আন্নাকালী। বাবা যতি, তুই একবার গিয়ে নিয়ে আয় না।

যতীন। কি আনব বল?

আন্নাকালী। ছড়া-তেঁতুলের হাঁড়িটাই ফেলে এসেছি।

জগন্নাথ। তোমার ছড়া-তেঁতুলের জন্যে ওর টিকিট নষ্ট হবে।

আন্নাকালী। দেখ তুমি সবটাতেই চেঁচিও না বল্‌ছি, তোমার ছাইয়ের টিকিটের জন্যে আমার ছড়া-তেঁতুলের হাঁড়ি যাবে না ত'। যা বাবা যতীন, তুই টপ্‌ করে যা।

যতীন। গাড়ী ত' এখুনি ছাড়বে।

আন্নাকালী। তবে তুই আজ বাড়ী যা, কাল যাস্‌।

যতীন। আমি তাহ'লে বড়দিন বাদ যাব।

আন্নাকালী। তাই যাস্‌। কিন্তু লক্ষ্মী বাবা, আমার হাঁড়িটা ভাল করে রাখবি, ভাত খাওয়া কাপড়ে ছুঁস্‌নি।

এই সময় গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা দিল, যতীন নামিয়া পড়িল। দিল্লী এক্সপ্রেসের একখানি ভিড়পূর্ণ গাড়ীতে কুলিরা ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া কোন রকমে সব চাপাইয়া দিলে সাবিত্রী দেখিলেন যে রাণী আসে নাই

সাবিত্রী। ওগো সব্বনাশ হ'য়েছে, রাণী কৈ?

রঞ্জন। অ্যাঁ, রাণী নেই।

হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে রাণী দাঁড়াইয়া আছে, দুজন গুণ্ডা—

১ম গুণ্ডা। নসে শালা দেখ্‌ না রে, এটা ভাল আছে।

২য়। নারে শালা, কাছে কেউ আছে মনে লিচ্ছে।

গুণ্ডা। তোর শালা সবতাতেই ঐ রকম, দেখ্‌ না রে।

এই সময় মধ্যে মধ্যে দু একটি প্যাসেঞ্জার হাঁচিয়া কাসিয়া রাণীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে; কেউ বা রাণীকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্যমনস্ক হইয়া ধাক্কা খাইতেছে, একটি গাঁটকাটা তার সঙ্গীকে লইয়া ঘোরা ফেরা করিতেছে এবং কি করিয়া লইবে সেই সুযোগ খুঁজিতেছে, গুণ্ডা দুটি দু একবার শিষ্‌ দিয়া এধার ওধার ঘুরিল, দুটি ভাবুক যুবক পুঁটলি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রাণীর রূপসুধা পান করিতেছে, রাণী একদৃষ্টে চাহিয়া আছে প্ল্যাটফরমের দিকে—ভাবটা এইরূপ যে বাবা আসিয়া তাহাকে এখনি লইয়া যাইবে; এই সময় যতীন পাশের গেট দিয়া জনতার সহিত আসিয়া দূর হইতে রাণীকে লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিল এবং যুবক দুটিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল—

যতীন। আসুন না ভাব করিয়ে দিচ্ছি, দূরে দাঁড়িয়ে চোখ খারাপ করবেন না।

যুবক দুটি। ওরে পেঁচো, ট্রেণ ছাড়বার সময় হ'ল যে—

তাহারা দৌড়াইল; যতীন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, গুণ্ডা দুটি পলাইল, গাঁটকাটা সরিল, রাণী পেছন ফিরিয়া দেখিল যতীন—

রাণী। উঃ বাঁচলুম।

যতীন। কোন ভাগ্যবানের জন্যে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে?

রাণী। বাবা ভেতরে ঢুকে গেছেন সব নিয়ে। আমি ঢুকতে পারিনি, চল না রেখে আসবে।

যতীন। ও-কে, সে গুড়ে বালি—আমি বরং বলে আসি—তুমি বড়দিনে আমার কাছে রইলে—ও-কে, কি বল।

রাণী। ও-কে—

যতীন পাশের গেটে কুলিকে একটা টাকা দিয়া ঢুকিয়া দৌড়াইল

রঞ্জনবাবু মেয়ে না আসায় আর কোন গত্যন্তর নাই দেখিয়া এবং এই সময় গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা হওয়ায় তাড়াতাড়ি যেই নামিতে গেলেন গিন্নীটি তৎক্ষণাৎ রঞ্জনবাবুকে ধরিতে এলেন; এমন সময় গাড়ীতে একটি ছেলে বেলুনে ফুঁ দিতেছিল সেটি দড়াম করিয়া ফাটিয়া গেল। গিন্নী বাপ্‌রে বলিয়া পড়িয়া গেলেন, কর্ত্তা সেই টানে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গিন্নীর ঘাড়ের উপর পড়িলেন, এমন সময় যতীন ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে মুখ বাড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল—

যতীন। মাকে বোলো, আমার কাছে তোমার দিদি রইল—বড়দিন বাদ মধুপুর যাব।

গাড়ী আস্তে আস্তে প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল। যতীন প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে রাণীকে সঙ্গে নিলে

যতীন। জয় বাবা জাপানী বোমার জয়।

রাণী। ধ্যুৎ সে কি, তার চেয়ে আমার জয় দাও, আমি ভিড়ে ঢুকিনি বলেই তো পেলে।

যতীন। জাপানী বোমার কল্যাণে একেবারে বাবা মার বন্ধনমুক্ত এখন বড়দিনের আনন্দটা ত' করে নিই, তারপর যত পারে বড়দিন বাদ বোমা পড়ুক।

দুজনে হাসিতে হাসিতে ট্যাক্সিতে উঠিল

ফেড্‌ আউট্‌

জঙ্গম

বনফুল

৪

ট্রাম হইতে নামিয়াই শঙ্কর দেখিতে পাইল চুনচুন মাঠে ঘাসের উপর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চুনচুনকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন সে অব্যবস্থিত ছিল ততদিনই সে চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই। কিন্তু 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি হওয়া মাত্র সে মিসেস স্যানিয়ালের দৃষ্টি এড়াইয়া চুনচুনের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। কলিকাতা শহর এবং বর্ত্তমান যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্যাণে তাহা অসম্ভব হয় নাই। চুনচুনের অবস্থা এখনও ঠিক পূর্ব্ববৎ। এখনও সে ঠিক আগের মতই মিসেস স্যানিয়ালের নিষ্পাপ গৃহস্থালীতে মিসেস স্যানিয়ালের উপদেশাবলী, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়ের অনুকম্পা, মিসেস স্যানিয়ালের বৃদ্ধ দেবর পীতাম্বরবাবুর নিষ্পলক দৃষ্টি সহ্য করিয়া নীরবে বাস করিতেছে, এতটুকু বিদ্রোহ করে নাই। আজকাল শঙ্করের সহিত তাহার সম্পর্ক অনেকটা গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের ন্যায়। শঙ্কর তাহাকে বই দেয়, সে তাহা পড়িয়া ফেরত দেয়। ফেরত দিবার সময় পঠিত পুস্তক লইয়া হয় তো মাঝে মাঝে আলোচনাও হয়। এই আলোচনার মধ্যে একজন গ্রন্থকার অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনায়াসে ইহা এতদিনে তাহাদের ব্যক্তিগত আশা-আশঙ্কা-আকুতিময় আলাপে পরিণত হইতে পারিত, শঙ্করের সেদিকে প্রবণতাও যে কিছু কম তাহা নহে, কিন্তু চুনচুন মেয়েটি সত্যই অদ্ভুত। সে কোনদিন কোন আচরণ দ্বারা ইহার সম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দেয় নাই। একটা সুন্দর শুভ্র ফুলে খানিকটা কালী ঢালিয়া দিবার চেষ্টা যেমন সুস্থ সহজ মানুষ করে না, তেমনই শঙ্করও চুনচুনের সহিত কোনদিন প্রেমালাপ করিবার চেষ্টা করে নাই। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুনও তাহাদের সম্পর্কটাকে বোধহয় এই একই মনোভাব লইয়া দেখে—যদিও কি যে তাহার মনোভাব তাহা শঙ্কর বুঝিতে পারে না। ইহার অস্বাভাবিকতা, ইহার রহস্যময়তা তাহাকে অনুসন্ধিৎসু করে, কিন্তু বাহিরে শঙ্কর শোভন সংযত ভাবটা বজায় না রাখিয়া পারে না। তাহার মনে হয় এই দুর্ভেদ্য আবরণ একদিন স্বাভাবিক নিয়মে খসিয়া পড়িবেই, কিন্তু কি করিয়া কখন কাহার জন্য যে পড়িবে তাহা তাহার কল্পনাতীত। শঙ্কর যখনই চুনচুনের সহিত দেখা করিতে আসে সঙ্গে করিয়া কিছু টাকা আনে। চুনচুনের ফোন আসিলেই তাহার মনে হয়, নিশ্চয়ই সে কোন বিপদে পড়িয়াছে, মিসেস স্যানিয়াল হয় তো তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিম্বা হয় তো নিজেই সে উত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারেই সে গিয়া হতাশ হয়। স্মিত নম্র হাসি হাসিয়া চুনচুন বই ফেরত দেয়, কিম্বা হয় তো কোন দুর্ব্বোধ্য অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করে—কিম্বা অমনি একটা কিছু। নাটকীয় কোন কিছু ঘটে না। অথচ শঙ্করের মনে হয় ভিতরে ভিতরে মেয়েটি না জানি কোন রহস্যময় লোকের অধিবাসিনী, সঙ্গোপনে কি যেন ভাবিতেছে, কিন্তু এসবের কোন বাহ্যিক প্রমাণ শঙ্কর কোনদিন পায় নাই। কালো রং, ছিপছিপে গড়ন, স্বপ্নময় চোখ, এতদিন আলাপ, মেয়েটি শঙ্করকে কল্পনায় আকৃষ্ট করিতেছে, অথচ কাছে আসিলে ইহার সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মোহ যেন ফুরাইয়া যায়।

"কি খবর ?"

"খবর আছে একটা, আমি কলেজে ভর্ত্তি হব, কোন্ কলেজ ভাল বলুন দিকি, বেথুন না ডায়োসেশন ?"

শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

"এতদিন পরে হঠাৎ কলেজে পড়ার সখ ?"

"সখ অনেকদিন থেকেই ছিল, খরচ জুটছিল না।"

"এখন জুটল কোথা থেকে ?"

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে—অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইল—চুনচুন বলিল, "পীতাম্বরবাবু দেবেন।"

"পীতাম্বরবাবু ? হঠাৎ তাঁর এত দয়া।"

চুনচুন একথার জবাব দিল না। ক্ষণকাল নীরবতার পর পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কোন কলেজটা ভাল বলুন না।"

"তা পীতাম্বরবাবুই ঠিক করে দেবেন না ?"

"পীতাম্বরবাবু নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানেন না. তিনি আমাকেই ঠিক করতে বলেছেন।"

"মিসেস স্যানিয়াল তো আছেন।"

"তিনি বেথুন কলেজের পক্ষপাতী। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, বেথুন কলেজে যদি আমার আপত্তি থাকে তা হলে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।"

"ও।"

ক্ষণকাল নীরবতার পর চুনচুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কলেজটা ভাল ?"

"এখন ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নিয়ে কাল বলব।"

"বেশ। চলুন, অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।"

"এ কথাটুকু ফোনে বললেই পারতে।"

"আপনি অবসর দিলেন কই, আপনাকে আসতে বলে তখনি ভাবলাম—ফোনেই জিগ্যেস করি, কিন্তু আপনি তখন কেটে দিয়েছেন !"

উভয়েই নীরবে পাশাপাশি খানিকক্ষণ হাঁটিল। চুনচুন একটু পরে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনি কাজ ক্ষতি করে এসেছেন বুঝি, আমি—"

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল। অকৃত্রিম কুণ্ঠাভরে চুনচুন যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

নীরবে খানিকক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "চোখের বালি কেমন লাগছে ?"

"খুব ভাল লাগছে না।"

"লাগছে না ?"

"আমি বুঝতে পারছি না বোধহয়।"

সহসা শঙ্করের মনে হইল হয় তো ইহার রসবোধ নাই এবং সেই জন্যই বোধহয় ইহার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না। হয় তো—

হর্ণ দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল। শঙ্করের চিন্তাধারা ভিন্ন পথ ধরিল।

"চল তোমাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দি।"

"চলুন।"

ট্যাক্সিতে উভয়ে চড়িয়া বসিল।

৫

শঙ্কর যখন শৈলর বাসায় পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ড্রইং রুমে ঢুকিতেই মিষ্টার এল. কে. বোসের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন। শঙ্করকে দেখিয়া থামিলেন এবং ফেলটের টুপিটি মাথা হইতে ঈষৎ আলগা করিয়া শঙ্করকে অভিবাদন করত হাসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ পথ ভুলে না কি?"

শঙ্কর একটু মৃদু হাসিল।

"বহুদিন আপনার দেখা নেই, আগে যা-ও বা আসতেন, খ্যাতিলাভ করার পর থেকে তো একেবারে বর্জ্জন করেছেন আমাদের। আজ হঠাৎ কি মনে করে?"

"শৈল ডেকে পাঠিয়েছে।"

"সো সিলি অব হার! আপনার মতো 'বিজি' লোককে ডেকে পাঠানো!"

শঙ্কর পুনরায় হাসিল, মিষ্টার বোসও হাসিলেন। তাহার পর পকেট হইতে চামড়ার সিগার কেস বাহির করিয়া শঙ্করের সামনে সেটি খুলিয়া ধরিলেন, "আমরা আর বেশী দিন এখানে নেই, বদলির খবর এসেছে।"

"কোথা যাচ্ছেন?"

"এলাহাবাদ।"

শঙ্কর একটি সিগার তুলিয়া লইল, মিষ্টার বোস একটি চকচকে সিগারেট লাইটার বাহির করিয়া সেটি ধরাইয়া দিলেন, নিজেও একটি ধরাইলেন। "এক্সকিউজ মি, আমাকে বেরুতে হচ্ছে; ক্লাবে ব্রিজ টুর্ণামেণ্টে জয়েন করেছি, আজ আমার খেলার দিন, উইলসনের সঙ্গে খেলতে হবে, সে সোজা লোক নয়, সুতরাং একটু—"

অর্থপূর্ণ একটা মুচকি হাসি হাসিয়া মিষ্টার বোস অসম্পূর্ণ বাক্যটাকে পূর্ণতা দান করিলেন। তাহার পর দাঁতে সিগারটা চাপিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অন্তরঙ্গের মতো আন্তরিক সহৃদয়তার সহিতই প্রশ্ন করিলেন, "শুধু খ্যাতিই হচ্ছে, না পকেটেও কিছু আসছে? হ্বাট্ ইজ্ হোয়াট ম্যাটার্স ইন্ দি লং রান্ ইউ নো—"

শঙ্কর কিছু না বলিয়া আর একটু হাসিল। মিষ্টার বোস হাত-ঘড়ি দেখিলেন। তাহার পর ঘরের কোণে গিয়া ছড়ি রাখিবার র‍্যাক হইতে একটি ছড়ি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "হেঁটেই যাওয়া যাক—", শঙ্করের পানে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বিশেষ কোন ভঙ্গী-ভরে গেলেন না—কিন্তু তবু শঙ্করের মনে এই অনুভূতিটুকু জাগাইয়া দিয়া গেলেন যে, তিনি পদব্রজে ক্লাবে গমন করিয়া একটা অসাধ্য সাধনই বুঝি বা করিলেন। শঙ্করের কেন এরূপ মনে হইল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয় ত বলিতে পারিত না, কিন্তু তাহার মনে হইল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া নীচে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। নীচের দালানে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্ বিমর্ষভাবে জ্বলিতেছে, চতুর্দ্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং বলিল মাঈজী উপরে আছেন। উপরে উঠিতে উঠিতে তাহার নিজেরই কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল, সত্যই অনেকদিন সে শৈলর কাছে আসে নাই। শৈলর কথা আজকাল তাহার মনেই পড়ে না।

শৈল দালানেই ছিল, পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। কোন প্রশ্ন করিল না।

"তুই এ সব কি করছিস?"

শৈল তবু উত্তর দিল না। কাঁচি দিয়া কি একটা কাটিতেছিল, নীরবে তাহাই কাটিতে লাগিল।

শৈল দালানে ছোটখাটো একটি দরজির দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল যেন। কাঁচি, কল, ফিতা, ফ্রিল, ছিট, প্যাটার্ন—চতুর্দ্দিকে ছড়ানো। শঙ্কর নিকটের চেয়ারটায় বসিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল। সবই ছোট ছেলের জামা, একেবারে শিশুর গায়ের।

"এত জামা করছিস কার জন্যে, তোর দায়ের ক'টা ছেলে মেয়ে—"

"কেন, দাই ছাড়া আর কারও ছেলে মেয়ে হ'তে নেই?"

শঙ্কর লক্ষ্য করিল—যদিও পা-কল, তবু শৈল হাত দিয়া ঘুরাইয়া শেলাই করিতেছে; আরও লক্ষ্য করিল শৈলর মুখে একটা পাণ্ডুর সুন্দর শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতৃত্বের পূর্ব্বাভাস। শঙ্কর বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শৈলও নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

"হঠাৎ আজ ডেকে পাঠিয়েছিস কেন?"

শৈল কিছু বলিল না, সেলাই থামাইয়া উঠিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে ঘর হইতে একটা খাতা আনিয়া বলিল—"এই নাও।"

"কি এ?"

শঙ্কর খাতাখানা চিনিতে পারিয়াছিল, তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

"তোমার কবিতার খাতাখানা, ফিরিয়ে দিলুম।"

শঙ্কর খাতাখানা হাতে লইয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, কি যে বলিবে সহসা ভাবিয়া পাইল না। শৈল আবার কলে আসিয়া বসিল এবং নীরবে সেলাই করিতে লাগিল। শঙ্কর শৈলর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল শৈল যেন বড় বেশী ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরি, পান্নার দুলটা আলোকবিদ্ধ একবিন্দু রক্তের মতো কাঁপিতেছে।

"এতদিন পরে খাতাখানা ফিরিয়ে দেবার মানে?"

"ও খাতা রাখবার আর আমার অধিকার নেই।"

শৈল কল ছাড়িয়া আবার উঠিল এবং ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। পরমুহূর্ত্তেই কপাটটা একটু খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল, "আর আমার কিছু বলবার নেই শঙ্করদা, তুমি আর তোমার সময় নষ্ট ক'রে বসে থেকো না, তোমার অনেক কাজ, আমার শরীরটা ভাল নেই, একটু শুই আমি, বড় ক্লান্ত লাগছে।"

আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। শৈল তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। সেই শৈল। একবার তাহার মনে হইল শৈলকে ডাকে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল ডাকিয়া কি হইবে। দুই-চারিটা মৌখিক মিষ্ট বচনে আর কতকাল তাহাকে ভুলাইবে সে? এ ভণ্ডামির প্রয়োজনই বা কি!

শঙ্কর উঠিয়া নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কাগজ পোড়ার গন্ধ পাইয়া শৈল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেখিল কবিতার খাতাখানা সিগারের আগুনে পুড়িতেছে। অন্যমনস্ক শঙ্কর খাতাখানার উপর জ্বলন্ত সিগারটা নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৬

মৃন্ময়ের বাসায় থাকিবার সময় আসমি-দারজির পিতা নিবারণবাবুর সহিত শঙ্করের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহার ফলে নিবারণবাবু যেন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভন্টুর ব্যবহারে নিবারণবাবু মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আহত হইয়াছিলেন তিনি ভন্টুর অন্তর্দ্ধানে। সেই হইতে ভন্টু আর নিবারণবাবুর বাসায় পদার্পণ করে নাই। ভন্টুর লজ্জা করিত।

প্রতিবেশী হিসাবে কিছুদিন বাস করিয়া শঙ্কর ভন্টুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে নিবারণবাবু শুধু আকৃষ্ট নয়, বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্কর মুকুজ্যে মশায়ের স্নেহভাজন, শঙ্কর নিজে চাকরি না লইয়া মৃন্ময়কে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, শঙ্কর বিখ্যাত একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, সর্ব্বোপরি সে ইচ্ছা করিলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে—এই সকল ধারণা থাকাতে নিবারণবাবু শঙ্করের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল কোনরূপ বিপদে পড়িলে শঙ্করের কথাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার চিররুগ্ন স্ত্রীর কি সেবাটাই না শঙ্করবাবু করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার স্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত বাঁচেন নাই, কিন্তু লোকটির যে পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন তাহা কোন দিন ভুলিবার নয়।

শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিবারণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আসুন শঙ্করবাবু, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি, দোকানে বেরুইনি এখনও।"

গলির মধ্যে নিবারণবাবুর চায়ের দোকানটি এখনও ঠিক আছে, প্রত্যহ তিনি সেখানে গিয়া বসেন।

"কেন, ব্যাপার কি?"

"আসমির খোঁজ পাওয়া গেছে, মুকুজ্যে মশাই ধুবড়ি থেকে এই চিঠি লিখেছেন দেখুন।"

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া পড়িয়া দেখিল। অনেক অনুসন্ধানের পর মুকুজ্যে মশাই ধুবড়িতে আসমি এবং মাষ্টারকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আই-বি-ডিপার্টমেণ্টের একজন পরিচিত পদস্থ কর্ম্মচারীর সহায়তায় এ কার্য্য সফল হইয়াছে। মুকুজ্যে মশাই কেবল তাহাদের আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের দুই-জনের বিবাহও দিয়াছেন। লিখিয়াছেন—এক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন; পাছে নিবারণবাবু কোনরূপ আপত্তি তোলেন তাই তাঁহাকে একথা জানানো হয় নাই। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, মাষ্টারের একটি চাকরিও তিনি চা-বাগানে জুটাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পরিচিত একটি ম্যানেজারের সহিত দেখা হইয়া যায়, তিনি অবিলম্বে মাষ্টারকে তাঁহার অধীনে ভরতি করিয়া লইয়াছেন, মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। নিবারণবাবু যেন বিবাহ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ না হন, কপিলবাবু (অর্থাৎ মাষ্টার) কুলীন না হইলেও তাঁহার স্বজাতি এবং মোটের উপর লোক মন্দ নয়। মানুষ দেবতা নয়, তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করিতে হইবে বই কি। শঙ্কর পত্রখানি পাঠ করিয়া নিবারণবাবুকে ফেরত দিল।

"বুঝলেন, ক'দিন থেকে আমার ডান চোখের ওপর পাতাটা ক্রমাগত নাচছিল।"

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভালই তো হয়েছে?"

"ভাল! একে ভাল বলেন আপনি! ওই নচ্ছারটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে, একথা ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে মশাই!"

"যাক, সে তো যা হবার হয়ে গেছে, এইবার তাদের আসতে লিখুন।"

"আসতে লিখব? আমি? নিবারণ শর্ম্মা সে বান্দাই নয়। ওদের আর মুখদর্শন করব না আমি—"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "বুঝলেন, মুখ-দর্শন করব না। ওই কালসাপকে আবার নেমন্তন্ন!"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

"যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এখন আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি তাই বলুন, তাদের কোন খবর পেলেন?"

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল।

"না, এখনও তারা খবর দেয় নি আমি খোঁজ করব কাল।"

"করবেন দয়া করে' একটু। মেয়েটার একটা গতি করে' আমি সোজা কাশী চলে যাই মশাই, আর পারি না।"

যে পাত্রটি সেদিন দারজিকে দেখিয়া গিয়াছিল—(শঙ্করই তাহাকে জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল) সে দারজিকে পছন্দ করে নাই। শঙ্কর ইহা জানিত, কিন্তু রূঢ় সত্যটা সে বলিতে পারিল না।

"আচ্ছা, আমি উঠি এখন, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

"কাল খবরটা নেবেন?"

"নেব।"

"মাঝে একদিন আর এক ছোকরা দেখে গেল, তার পছন্দ হয় নি।"

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিবারণবাবু বলিলেন, "পছন্দ হলেও তার সঙ্গে আমি দিতুম না, ঠোঁটে ধবল, তিনকুলে কেউ নেই।"

"ও তাই না কি?"

"আর বলেন কেন। যত ব্যাটা কদর্য্য লোফার শ্বশুরের মাথায় কাঁটাল ভাঙবার চেষ্টায় আছে।"

শঙ্কর একটু হাসিল।

"আমি আজ যাই, তাড়া আছে।"

"আসুন, আপনার নানা কাজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।"

"আচ্ছা।" শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা হইতে শুনিতে পাইল নিবারণবাবু বলিয়া উঠিলেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

ক্রমশঃ

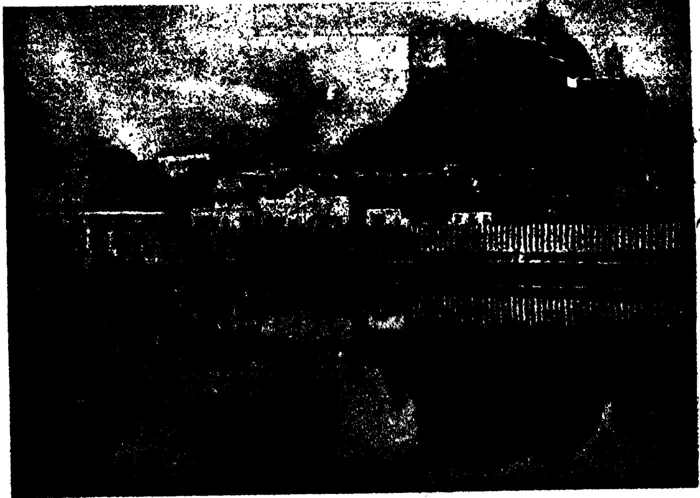
শ্রীরঙ্গম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

দেশ পর্য্যটনে অকিঞ্চনতা দূর হয়। ভ্রাম্যমান বিদেশী, ভারতের সর্ব্বত্র সম্মানিত। সে শ্রদ্ধার মর্ম্ম ভারতবাসী উপলব্ধি করে। সে বোঝে সৌজন্য কৃষ্টির সঙ্কেত। কিন্তু এই সহজ সৌজন্যে বিদেশী ভারতবাসীর মজ্জাগত দাসত্বের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্য ভূ-পর্য্যটকের মস্তিষ্ক বিকৃতির একটা কারণ—সাতফুট লম্বা পাঞ্জাবীর ভদ্রতার কুর্নিস এবং মাঠের ধারে বিনয়ী কৃষকের সেলাম। নিজের দেশে গ্রাম্য পুরোহিত ভিকারের গৃহেও যার নিমন্ত্রণ হয় না, এমন শ্বেতাঙ্গ হঠাৎ প্রাচ্যে এসে অভিনন্দিত হয়। এ সৌভাগ্য অতি-মাত্রায় তার দম্ভ বাড়ায়। তাই ইংরেজী ভ্রমণবৃত্তান্ত অপ্রাকৃত, মিথ্যার বনিয়াদে রচা আবর্জ্জনা সাহিত্য।

বলছিলাম, বিদেশীর প্রতি সৌজন্যের কথা। মাদ্রাজ প্রদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসী আতিথ্যের আপ্যায়নে আমাদের তুষ্ট করেছিল। ভাষার বিরাট পার্থক্যের ঝঞ্ঝাটে এ আতিথেয়তা মনোরম। বড় বড় শহরে গাড়োয়ান, কুলি সর্দ্দার প্রভৃতি ইংরেজী কথা বোঝে। কিন্তু গ্রামে, বিশেষ তীর্থস্থানে, যখন তামিল বা তেলেগুর সঙ্গে হিন্দী ও বাঙলার লাঠিবাজি চলে, তখন অকস্মাৎ একজন ভদ্রলোক কিম্বা ভদ্রমহিলা হাসি-মুখে নমস্কার ক'রে পাশে এসে দাঁড়ায় এবং পথিকের মনোভাব মাতৃভাষা-ভাষীর মনের মধ্যে সমাহিত করে। তারপর বিদেশীকে নানা সুপরামর্শ দেয়। তার ফলে মেজাজ এবং অর্থ নষ্টের আশঙ্কা ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের কর্ম্মচারীদের সৌজন্য উল্লেখযোগ্য। তাদের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীরা যখন মন্দিরের স্থাপত্য, বিগ্রহ এবং গাইড্ সম্বন্ধে সদুপদেশ দেয়, তখন আত্মম্ভরিতা আহত হয় বটে কিন্তু তীর্থ দর্শন সরস হয়।

তাঞ্জোর হতে ত্রিচীনপল্লী মাত্র একত্রিশ মাইল। কিন্তু প্যাসেঞ্জার ট্রেণ এই অল্পদূর আড়াই ঘণ্টায় যায়। যে ট্রেণে উঠ্‌লাম, তার প্রত্যেক অপরিসর কক্ষে এক এক খানি বেঞ্চ। একদিকে বারান্দা।



ত্রিচীন পল্লী—পার্ব্বত্য মন্দির

ত্রিচীনপল্লী মালভূমি। একঘেয়ে সমতল ভূমিতে ভ্রমণের পর, শৈলের টুকরাগুলা দৃষ্টি-সুখকর।

এ শহরের প্রাচীন সংস্কৃত নাম ছিল ত্রিশূলপল্লী। কোন দিক্ দিয়ে কণ্ঠ, তালু এবং জিহ্বার কোন্ খেয়ালের বশে এমন বিকট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হল, সে গবেষণা ভাষা-তাত্ত্বিকের শিরঃপীড়ার কারণ হ'তে পারে। কিন্তু যাত্রীর পক্ষে বিশেষ সুখের কথা—ত্রিচীনপল্লীর আদরের নাম ত্রিচী।

ত্রিচী প্রাচীন ও আধুনিক। এর পাহাড়ের উপর গণপতির বিচিত্র মন্দির, জম্বুকেশ্বরের অতি সুন্দর পীঠ-স্থান, শুভ্র-তোয়া কাবেরী নদী প্রভৃতি পুরাকাল হতে প্রসিদ্ধ। ত্রিচীর রেল কোম্পানীর প্রকাণ্ড কারখানা, এর বিজলী ঘর, সেণ্ট জোসেফ কলেজ, কাবেরীর পোল আধুনিক এবং প্রণিধানযোগ্য। এই আধুনিকতার অনুগ্রহে এখানে বহু ট্যাক্সি আছে। তার সঙ্গে অবশ্য ঝটকা ও রিকসা বিদ্যমান।

ষ্টেশন বড় এবং সুগঠিত। আটটি প্ল্যাটফরম সুড়ঙ্গ পথে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। দিল্লীর রেলের পুল বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ত্রিচীতে গোটা কতক সিঁড়ি দিয়ে পাতালে নেমে আলোকিত পথে গন্তব্য স্থানে যাওয়া রোমাণ্টিক এবং নবীন। তবে হঠাৎ বিজলী-প্রবাহ বন্ধ হলে হৃদয়-প্রবাহের কি অবস্থা হয়, তা বোঝবার অবসর ঘটেনি।

রিটায়ারিং রুমে যাবার জন্য যখন চওড়া মার্ব্বেল সোপানের চাতালে দাঁড়ালাম—জনকতক ট্যাক্সিওয়ালা এলো। তার পর তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। শ্রীরঙ্গম সাতমাইল দূরে। গণপতির মন্দির, জম্বুকেশ্বর, শ্রীরঙ্গম—অবশ্য পথে কলেজ, বাজার, গজেন্দ্র-মোক্ষ ঘাট প্রভৃতি দেখিয়ে আনবে, ভাল মোটর গাড়ি, মোট ভাড়া সাড়ে সাত টাকা। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে সাত টাকা। পরে নিলাম হ'তে হ'তে, শেষ দর হ'ল—তিন টাকা। আমরা একদিকে মাথা নাড়লাম অর্থাৎ মাদ্রাজী অসম্মতি।

মার্ব্বেল মেঝে, প্রশস্ত বারান্দা, সুসজ্জিত বিরাম কক্ষ—ভাড়া দুজনের দৈনিক চার টাকা। স্নানাদি ক'রে যখন চা-পান করছি, কাটা দরজার উপর দিয়ে একজন ট্যাক্সিওয়ালা উঁকি মারলে।

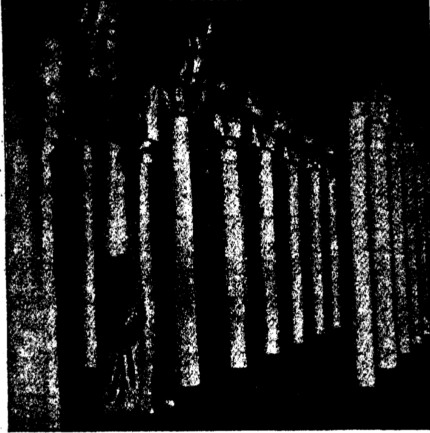
—হোয়াট্ ?

—টু এইট মাষ্টার। নাইট কেয়ার। গুড্ অষ্টিন।

মনে হল জুয়াচুরি করছি। কিন্তু যার মাল সে যদি লুটিয়ে দেয়, আমার কি। যাত্রার শেষে আট আনা বকশিশ পেয়ে বেচারা খুব হাসলে। বুঝলাম ওরা দাঁত মাজে।

ষ্টেশনের সম্মুখে সুন্দর পথ, মাঝে মাঝে ফুলের বাগান, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। শহরে প্রবেশ করবার মুখে এক প্রকাণ্ড এলুমিনিয়মের এরোপ্লেনের প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে। তার নিচে মাদ্রাজ গবর্ণরের যুদ্ধে সাহায্যদান করবার আহ্বান। এ রকম হাওয়া-জাহাজ দেখিয়ে মহাসমরে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে অন্যান্য শহরেও।

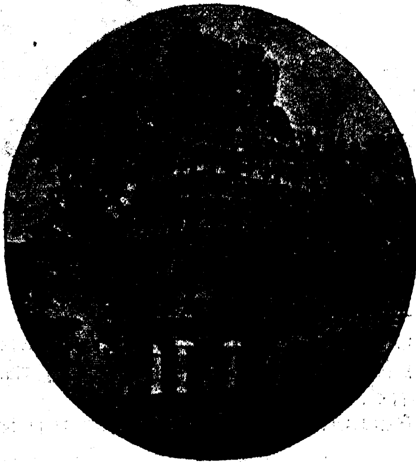
গণেশের মন্দির ২৭৩ ফুট উচ্চ শৈলশিখরে। পাশে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। সিমাচলমে যেমন পাথরের সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠতে হয় তেমনি ৪০০ সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। তবে এ সোপানাবলীর উপর



শ্রীরঙ্গম—চমৎকার বারান্দা

ছাদ আছে। স্থাপত্য হিসাবে এও বিস্ময়কর। আধুনিক ঢক্কা-নিনাদী পূর্ত্ত-বিভাগ কি বলে জানি না।

মন্দিরের গায়ের কারুকার্য্য মনোরম। সিদ্ধিদাতার মূর্ত্তি বৃহৎ। হাতীর মুখে মানুষের দেহ, সুতরাং আর্ট হিসাবে তার উৎকর্ষ-অপকর্ষের মাপকাটি নাই। আমি গণপতি মূর্ত্তির ঠিক্ তাৎপর্য্য বুঝি না। সিদ্ধিদাতা ভগবানকে স্মরণ করে গণেশ মূর্ত্তির পদতলে মাথা নত করি। কিন্তু ঠিক কি উদ্দেশ্যে ঋষির পরিকল্পনা মূর্ত্ত হ'য়ে গণেশরূপে ফুটে উঠেছিল, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না। মূর্খ বুঝতে পারে না এটা, পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ



মন্দির—জম্বুকেশ্বরম্

হতে পারেনা। পৌরাণিক রূপের ঠিক্ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল ক্ষেত্রে হৃদয়ঙ্গম হয়না।

গণেশমন্দিরে যাওয়ার পথে হর-পার্ব্বতীর মন্দির অতি সুন্দর কারু-কার্য্যসম্বলিত। রূপার নন্দী বৃষরাজ শিল্পগরিমা প্রচার করছে। ওঠবার পথে আরও গুহা আছে। শিলালিপি হ'তে বুঝা যায় গুণাস্তর নামে এক রাজা এই শৈল-মন্দির স্থাপন করেছিলেন। ইনি পল্লব-রাজ-বংশীয়।

বলা বাহুল্য, শৈল-শিখর হতে ত্রিচীর সৌন্দর্য্য সম্পদ দৃষ্টিপথে কুহক সৃষ্টি করে। এই শহর এবং শ্রীরঙ্গমের মাঝে কাবেরী নদীর ব্যবধান। নবীন যুগের গির্জ্জা, কলেজ, কারখানা, ষ্টেসন, ইংরেজ পল্লী প্রভৃতির দৃশ্য মনোরম। প্রাচীন যুগের শ্রীরঙ্গম এবং জম্বুকেশ্বর মন্দিরের শোভা তাদের সঙ্গে মিশে মনে নানা ভাব তোলে। আর ভাবীকালের ভারতবর্ষের যারা আশা, এমন সব লোককে বন্ধ করবার কারাগারও ঐ শহরে গোল্ডেন রকের পদ-প্রান্তে। গোল্ডেন রক ১০০ ফিট উঁচু পাহাড়—ইংরেজের বসতি। তখন ত্রিচীর জেলে ছিলেন জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম ভরসা শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচার্য্য মহাশয়। আপাতত ব্রিটিশ-রাজের বন্দীরূপে ত্রিচীর কারাবাসী, বাঙ্গালা দেশের আদরের জন-নায়ক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র। শ্রীরঙ্গের এ রঙ্গ তাঁরই লীলা।

জম্বুকেশ্বরের মন্দির খুব প্রাচীন নয়। কিন্তু তার গঠন ও শিল্প-ভঙ্গীতে দক্ষিণ ভারতের শিল্পীর যশ অপ্রতিহত। বাইরে টেপাকুলম। তার মাঝে শ্রীমহাদেবের এক লীলামণ্ডপ।

প্রথম গোপুরম, পরে এক অনাবৃত প্রাঙ্গণ। তারপর আবার গোপুরম। গোপুরমে স্তরে স্তরে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শকের মনে নানা রসের স্মৃতি জাগায়। এই গোপুরমের পর বিস্তৃত দালান, থামের গায়ে কারুকার্য্য, চারিদিকে দেবদেবীর ছোট ছোট মন্দির। এদের মধ্যে দ্রষ্টব্য হর-পার্ব্বতীমণ্ডপ। অপরূপ সুন্দর বৃষারূঢ় পার্ব্বতী-পরমেশ্বর—প্রকৃতি-পুরুষের প্রতীক। আর আছে নবগ্রহ মূর্ত্তি। কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে এক মন্দিরে।

অবশ্য এ মন্দিরের প্রধান উপাস্য দেবতা শিব। চিদম্বরমে তাঁর ব্যোম-মূর্ত্তির আরাধনা হয়। এখানে হয় অপমূর্ত্তির। ক্ষিতিরূপে রামেশ্বরে, তেজরূপে তিরুপতিতে এবং কলহস্তীতে মরুতরূপে তিনি পূজিত হন।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম—সৃষ্টির উপকরণ। এদের সংযোগে বিশ্ব। কিন্তু খণ্ড ও অখণ্ডভাবে তাঁরা সকলে তারই বিকাশ। সারা বিশ্বের মাঝে তিনি আপনাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

এ বচনকে আমাদের কবি ললিত ছন্দে বুঝাইয়াছেন—

হে বিশ্ব-ভুবনরাজ, এ বিশ্ব-ভুবনে
আপনারে সবচেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র জল কণাটুকু, ক্ষণিক শিশির
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

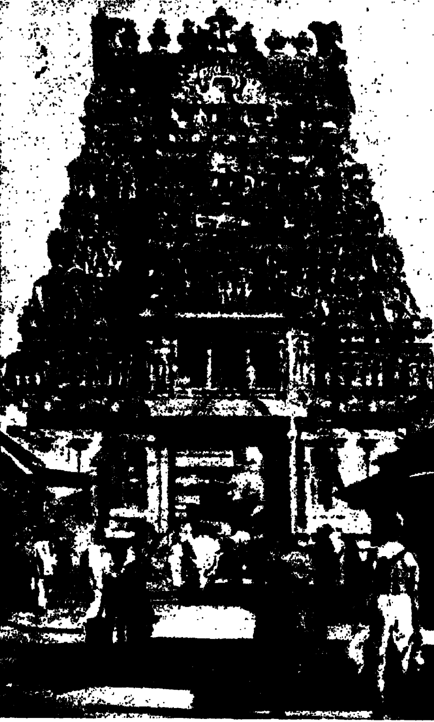
এই ক্ষুদ্র ক্ষণিক শিশিরের মাঝেও বিশ্ব-ভুবন-রাজের আসন এবং ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ—তাঁর প্রকৃতি।

মহাদেব পরব্রহ্মের অষ্ট প্রকৃতির জলরূপ খণ্ড প্রকৃতির দর্শনে, স্পর্শনে, ধ্যানে ভগবানের উপলব্ধি সম্ভব। মা বিরাজেন সর্ব্ব-ঘটে, সাধকের পক্ষে এ সত্য উপলব্ধি সহজ। আর্য্য-দ্রাবিড় মহাত্মারা জম্বুকেশ্বর তীর্থের পরিকল্পনা করেছিলেন এ তত্ত্বের বনিয়াদে।

প্রধান মন্দিরে শিব-লিঙ্গ স্থাপিত। কিন্তু সেখানে জলের গোপন উৎস আছে। সর্ব্বদা গর্ভ-মন্দির জলে প্লাবিত। দর্শন করতে জলের উপর দাঁড়িয়ে জল-রূপী শিবের মাথায় জল দিতে হয়।

ত্রিচী পার্ব্বত্য দেশ। ঠিক ঐ স্থলে জলের ফোয়ারা দেখে, সেখানে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে, পল্লব-রাজা ভক্ত-প্রাণের পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দু-মন্দির পরিভ্রমণ করলে আর একটা কথা মনে হয়। হিন্দু উপাসক পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একথা শুনলে যে সাম্প্রদায়িক লবুতার চিত্র মনে ওঠে, সে চিত্র মিথ্যা। এ-মন্দির শৈব। শ্রীরঙ্গেশ্বরের মন্দির বৈষ্ণব। ত্রিচী শৈলের গণেশ মন্দির গাণপত্য। পার্ব্বতী তান্ত্রিক



রঙ্গনাথের মন্দির—শ্রীরঙ্গম্

দেবী। নব-গ্রহ বা সূর্য্য সৌরদের উপাস্য। প্রত্যেক মন্দিরে প্রধান উপাস্য-রূপে ভগবানের এক মূর্ত্তি। কিন্তু অন্য মূর্ত্তিও পূজিত হয়। এমন কি, ইলোরা, এলিফেন্টা প্রভৃতি গুহায় বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখেছি এবং বৌদ্ধ চীনাদের মন্দিরে কোয়াঙ-য়ুন বা লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করেছি। ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের শিক্ষা—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।

সশ্রদ্ধ হয়ে আমার যে ভক্ত আমার যে কোনো রূপে আমায় অর্চ্চনা করতে চায়, আমি তার সেই রূপ সম্বন্ধেই অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি।

হিন্দুশাস্ত্র সকল উপাসনাকে তাঁহারই উপাসনা বলে নির্দ্দেশ করেছে। কাজেই কোনও পূজাপদ্ধতির উপর তাহার হিংসা নাই, কারণ এক অনন্ত অনাদি ঈশ্বরের মধ্যেই সকল দেবতা খণ্ডভাবে আছেন। তাঁরা পরমেশ্বরের এক এক উপাধি মাত্র। অর্জ্জুন চাক্ষুষ দেখেছিলেন—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।

হে দেব আমি আপনার দেহের মধ্যে সমস্ত দেবতাগণ এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত সৃষ্টিসঙ্ঘ দেখছি। আপনার দেহ মধ্যে কমলাসন ব্রহ্মা রুদ্র সকল সমস্ত ঋষিমণ্ডল এবং বাসুকি প্রভৃতি উরগগণকে দর্শন করছি।

এর পর আর দেবতাদিগকে পরব্রহ্ম হতে পৃথক কিম্বা ব্রহ্মা বা রুদ্রকে বিষ্ণু হতে বিভিন্ন বলা চলে না। এক ঈশ্বরকে, তাঁর খণ্ড বিভূতি স্মরণ ক'রে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। তাই অসহিষ্ণুতা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী।

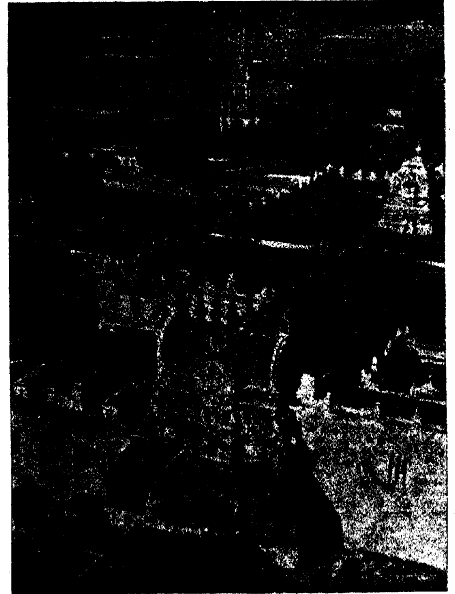
আমাদের স্বদেশ-প্রাণ, ভক্ত রবীন্দ্রনাথের তাই গর্ব্বের উচ্ছ্বাস—

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর
তপোবন-তরুছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্ব চরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অনন্ত অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

তাই বিশ্ব-কবির উচ্চাশা—

সব কোলাহলে সারা দিনমান
শুনি অনাদি অনন্ত গান।

কাবেরীর সেতু সুগঠিত। পরপারে গজেন্দ্র-মোক্ষ ঘাট। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে গজেন্দ্র-মোক্ষ বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে অতি



শিলাস্তূপ হইতে ত্রিচিনপল্লীর দৃশ্য—সেণ্ট যোশেফ কলেজের চূড়া

সুন্দর কয়টি স্তোত্র আছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-মাত্রেই সেগুলি শুনেছেন। সে কাহিনীকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য এই ঘাটের নাম গজেন্দ্র-মোক্ষ।

অবশ্য মহাভারতে বর্ণিত ঘাট পাহাড়ের উপর। গজেন্দ্র-মোক্ষ ঘাটের প্রাচীরের উপর অনন্ত শয়নে শায়িত নারায়ণের মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীরঙ্গম মন্দির সাত মহল্লা। এ মন্দির আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হিন্দু মন্দির। প্রথম গোপুরম অসম্পূর্ণ। তার এবং দ্বিতীয় গোপুরমের মধ্যে বাজার আছে, ব্রাহ্মণদের বাসস্থান আছে। আসল মন্দিরপ্রাঙ্গণ দ্বিতীয় গোপুরম পারে। এখানে মন্দির-ভূমির আরম্ভ একথা বিবেচনা করলে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দির নিশ্চয় আয়তনে বড়। কিন্তু সে তর্ক নিরর্থক।

শ্রীরঙ্গম মন্দিরের কারু-কার্য্য নয়ন মুগ্ধ করে। পরিখার পর পরিখা স্মরণ করিয়ে দেয় দুর্গ-স্থাপত্য। সাত মহলের ভিতর অনন্ত-শয্যায় শয়ান নারায়ণ-মূর্ত্তি। গর্ভমন্দিরের প্রবেশ-পথের স্তম্ভে এবং প্রাচীর-গাত্রে খোদিত দেবদেবীর মূর্ত্তি নিঁখুত।

মন্দিরের বাইরে প্রকাণ্ড গরুড় মূর্ত্তি। ভক্তি তার মুখশ্রী পবিত্র করেছে। শিল্পী নিজে ভক্ত না হ'লে এ মুখ গড়তে পারতেন না। মন্দিরের উপর সোনার চূড়া, সুবর্ণ কলস। সোনার ধ্বজস্তম্ভ, কে জানে কত অর্থ ব্যয় ক'রে রাজারা এই প্রকাণ্ড মন্দির গড়েছিলেন।

ষষ্ঠ পরিখার মাঝে একদিকে স্বচ্ছ জলের টেপাকুল্লম। তার ধার দিয়ে মন্দিরের একদিকে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে পৌছিলাম। নাট-মন্দিরে কতকগুলি ছাত্র সংস্কৃত পড়ছিল। রামচন্দ্রের মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ভদ্রলোক গ্র্যাজুয়েট। তিনি টোলের ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষা দেন।

—কিন্তু সংস্কৃত শিখিয়ে কি হবে? আর সংস্কৃত শিখতেও চায় না আজকাল কেউ।—বললেন ভদ্রলোক হতাশভাবে।

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম—কেন? প্রাচীন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার জন্ম।

ম্লান-হাসি হেসে ব্রাহ্মণ বললেন—কিন্তু সে চেষ্টায় নিজের গৃহে সাঁঝে সকালে তৈলাভাবে প্রদীপ জ্বলে না। বি-এ পাশ করবার পর যদি সরকারী কাজ নিতাম, অন্তত থেতে পরতে পেতাম।

অর্থের দিক থেকে দেখলে সত্যই পৌরহিত্যে অনশন অনিবার্য্য। কিন্তু এর একটা মহৎ দিক আছে। আমাদের নবীন শিক্ষার ফলে দৃষ্টির যে ভঙ্গি জন্মে, তাতে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা হাসিমুখে বহন করবার সৎসাহস জাগিয়ে তোলা অসম্ভব। আমাদের দিক থেকে এ ব্যাপারটা আলোচনার বিষয়। যখন অপরের সঙ্গে তুলনায় আমরা স্বপক্ষে বল, বীর্য্য, সম্পদ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতার কথা বলতে পারি না, তখন বেদ-বেদান্ত, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রবাহে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করি। কিন্তু যারা প্রাচীন দীপের নির্ব্বাণোন্মুখ শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন—তাঁদের জন্য আমরা কতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করি? স্বার্থের কথা বাদ দিলেও পণ্ডিত মহাশয়দের প্রাপ্য শ্রদ্ধাশু সম্মানটুকু দিতেও আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। তাঁদের কাছে বিলাতী শিক্ষার প্রাধান্য জাহির করি—আচারে, ব্যবহারে, বচনে এবং রসহীন নির্ব্বোধ পরিহাসে। আর দাস-মনোবৃত্তি নিয়ে পাশ্চাত্যদের কাছে, যে বেদ-বেদান্ত বুঝি না এবং যারা একান্ত অপরিচিত, তাঁদের দোহাই দিয়ে লজ্জা নিবারণ করি।

মন্দির-পরিখার মধ্যে হাজার থামের এক দালান আছে। কতকগুলি স্তম্ভ লম্ফমান ঘোটকের আকারের। অতি মনোরম স্থাপত্য শিল্প। একজন শ্রীরঙ্গমবাসী ব্রাহ্মণ বললেন, মাদুরার হাজার থামের দালানে পূর্ণ সহস্র থাম নাই। কিছু কম আছে। এখানকার হাজার থাম গণনা করে নিন।

গণনা অবশ্য করলাম না, যেহেতু ভদ্রলোকের এক কথা। কিন্তু মাদুরার গর্ব্বিত অধিবাসীরাও ভদ্রলোক। দক্ষিণ আমেরিকার ভদ্রলোকদের মতে প্রাচীন মেক্সিকোর মায়াবাসীদের যুক্তনের কিকেন-ইজ্জার সূর্য্য-মন্দিরেও হাজারটি ভাঙ্গা থামের অংশ বিদ্যমান।*

শ্রীরঙ্গম মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরের ধারে এক কক্ষে মিউজিয়ম আছে। মন্দির দেখে, দিকে দিকে শ্রেষ্ঠ কারিকরের শিল্প পরিচয় লাভ করবার পর, আর হাত-পা ভাঙ্গা প্রাচীন মূর্ত্তি দেখবার দম থাকে না। এখানে কতকগুলি অতি সুদৃশ্য হাতির দাঁতের পুতুল আছে।

বলা বাহুল্য ভূ-পর্য্যটকের মত ঘুরে প্রাচীন শিল্প-সম্পদ দেখলে, কেবল আক্ষেপ বাড়ে। বহুদিন, বহুবার, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করলে তবে তাদের বিশাল সৌন্দর্য্যে হৃদয় প্রসারিত হয়। তবে ঘরে বসে ছবি দেখার চেয়ে দেশ ঘুরে চোখের দেখা দেখলেও মনে যে আনন্দ হয়, তার স্মৃতির নেশা চিরদিন মনে আনন্দের লহর তোলে।

* The World's Greatest Wonders—৩৭২ পৃঃ এ মন্দিরের চিত্র থাকে। পুস্তকখানি Statesman Home Library প্রকাশিত।

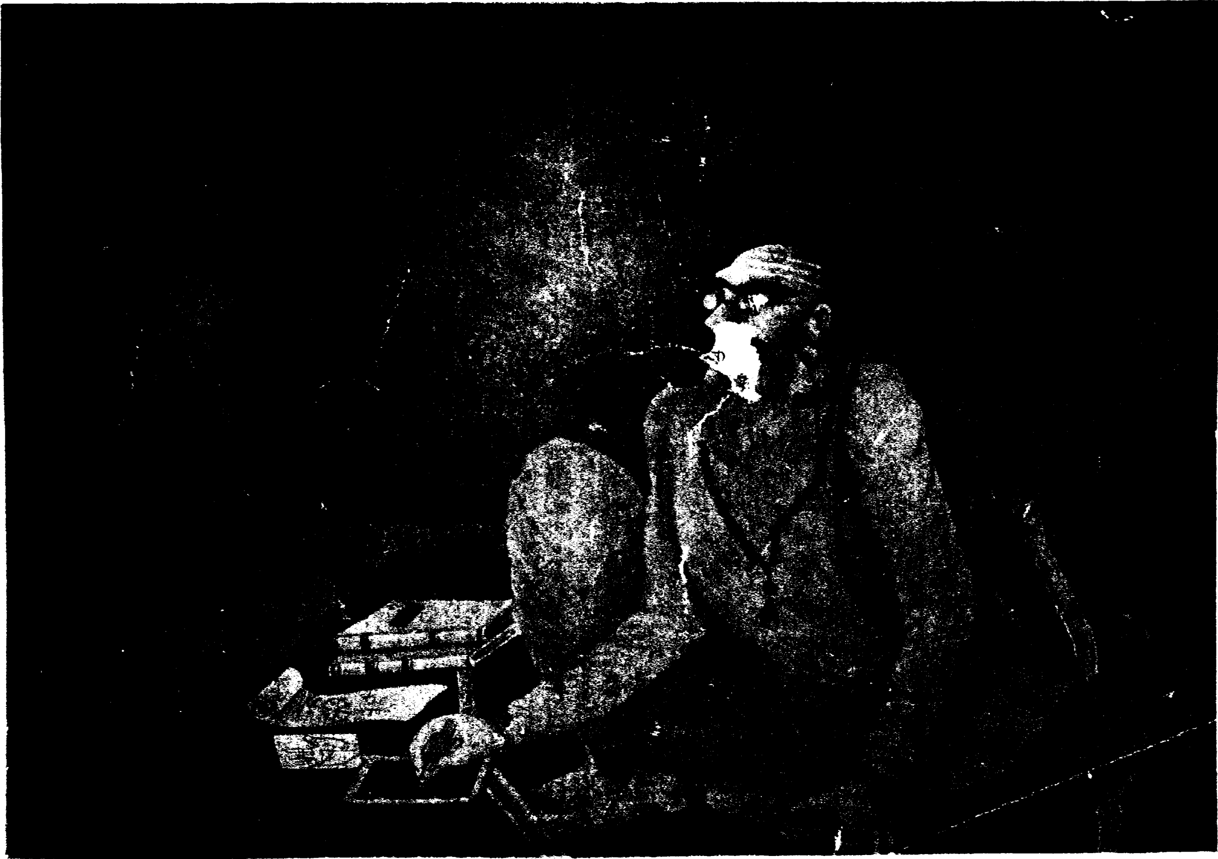
জীবন-পথে

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

অনুপমদের বাড়ীতে সুহৃদের প্রতিদিন আসা চাই-ই। হয় সন্ধ্যেবেলা অফিসের ফেরত, না-হয় সকালবেলা চা খাবার সময়ে। ও আসে যতটা বন্ধুত্বের টানে, তার চেয়ে বেশি নিজের প্রয়োজনে। বাসায় যতটুকু কম থাকতে পারে ততটুকুই ওর পক্ষে আরাম। শিয়ালদার মোড়ের কাছে মধ্যবিত্তবস্তির মধ্যে একটি দোতলা বাড়ী—ছোট্ট হোটেল। ছোট্ট আয়োজন তার। নাম কিন্তু ছোট নয়—কলকাতা পান্থনিবাস। অনেক বছর এইখানে তার কাটল—সেই ছাত্র অবস্থা থেকে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাসা না বদলে শুধু ঘরখানা বদল করেছে। যখন ছাত্র ছিল একসঙ্গে একঘরে তিনজন থাকত। সেই ঘরখানিই নাকি বাড়ীর সবচেয়ে সেরা। দক্ষিণ দিকে ছিল একটি জানলা, কিন্তু তার মধ্যে আলো আসবার উপায় ছিল না। সামনের চারতলা বাড়ীটা বেঢপ হয়ে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তবে দুটি বাড়ীর মাঝখানের সরু গলি দিয়ে যখন তখন ছুটে আসত শহরের দুরন্ত হাওয়া, আর তার সঙ্গে গলির নীচেকার খোলা ড্রেণের পচা গন্ধ। সহৃদয় বন্ধুরা বলাবলি করত, আরে এই আমাদের মলয় অনিল। এবার বেশি মাইনের চাকরি হবার পরই সে-ঘর থেকে বিদায় নিলে, মুখে বললে—এখন সাবালক হয়েছি, একটু একলা একলা থাকতে চাই। উঠে এল ছাদের সিঁড়ির নীচেয় কাঠের আড়াল দিয়ে-ঘেরা লম্বাটে ঘরখানিতে। হোটেলের কর্তা বললেন, এ ঘরে কি আপনি থাকবেন? আলো নেই, হাওয়া নেই, শুধু পূব দিকে একটা জানলা।

সুহৃৎ জবাব দিলে, আলো হাওয়া না থাক, নির্জনতা আছে তো। এখন বড় হয়েছি, জানেন তো প্রেমপত্র মাঝে মাঝে লিখতে হয়। আমরা বাঙালি, চিঠির মধ্যে দিয়েই আমাদের প্রেম। একখানা একানে ঘর না পেলে কি ও কাজ করা যায়?

কর্তা বললেন, বেশ, আপনি অনেক দিনের লোক। আপনার জন্যে সবই করতে হবে—অবশ্য যতটুকু পারব। ও ঘরে



শিল্পী—শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্ত

ভবিষ্যৎ বক্তা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আমাদের ঠাকুরটা শুত। ওকে নীচেয় একতলায় জায়গা ক'রে দেব'খন। তবে সীটরেণ্টটা যা দিচ্ছিলেন, তাই দেবেন।

—বলেন কি? সাত টাকা সীট-রেণ্ট দিতে পারব না বলেই তো এখানে আশ্রয় নিচ্ছি। পাঁচ টাকা ক'রে দেব। আমার ছোট ভাইকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছি, তার খরচ যোগাবার জন্তে টাকার বড় দরকার, বুঝলেন? ঘর বদল করার যথার্থ কারণ শেষকালে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কিন্তু ঘরে শুধু রাত্রে শোয়ার কাজটাই চলত। ওর অন্য সময় কাটত অফিসে, না-হয় কর্পোরেশনের তৈরি কোন পার্কে কিংবা অনুপমদের বাড়ীতে। অনুপম ওর অনেকদিনের বন্ধু। সংসারে ওই একমাত্র লোক যার কাছে গিয়ে সুহৃৎ দুদণ্ড শান্তি পায়। ওর স্ত্রী সবিতাও খুব ভাল লোক। সুহৃদকে খুব যত্ন করে। ওরা যেন ওর পর নয়—একান্ত আত্মীয়, আপন লোক। তাই সবিতার ফাই-ফরমাজ খাটতে সুহৃদের মোটেই দ্বিধা হয় না। সবিতা বড়লোকের মেয়ে—বড়লোকের স্ত্রী। অনুপম কর্পোরেশনের বড় ইঞ্জিনিয়র। কিন্তু কারো মনে অহংকার নেই।

আজ সকালে উঠেই সুহৃৎ সোজা এসে হাজির হয় ওদের বসবার ঘরে। সোফায় বসে ওরা চা খাচ্ছিল। ও ঢুকতেই তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, আজ এত দেরি কেন?

অভ্যাস মত কোন্ থেকে ছোট সোফাটা টেনে নিয়ে ও জবাব দেয়—শরীরটা ভাল নেই, কাল যা ভিজেছি!

—কেন, কোথায় গেছলেন? সবিতা বললে।

—ছোট ভায়ের মেসে। হঠাৎ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে—মাইনে নাকি এবার কিছু আগে দিতে হবে। তা না হ'লে পরীক্ষা দিতে দেবে না। তাই জিজ্ঞেস করতে গেছলুম, কবে চাই। দেখা হ'ল না। কলেজের থিয়েটার, ভায়া তাই নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। রাস্তায় নেবে বৃষ্টি এল। পকেটে পয়সা ছিল না। সারা রাস্তা ভিজতে ভিজতে এলুম। কড়া করে এক কাপ চা দিন দেখি। সকালে উঠে দেখছি শরীরটা মেজমেজ করছে।

—চায়ে আদা দিয়ে আনব? সবিতা জিজ্ঞাসা করলে।

—তা হ'লে তো খুব ভাল হয়।

—ওর সঙ্গে ডিম দিয়ে দুখানা রুটি মচমচে করে ভেজে আন; সর্দির মুখে ভাল লাগবে—অনুপম বললে।

—না, না, অত কষ্ট করবেন না, বৌদি। শুধু এক কাপ চা নিয়ে আসুন—সুহৃৎ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন। আমি এই এলুম বলে—সবিতা ছুটে বেরিয়ে যায়।

—কাল আমিও খুব ভিজেছি—অনুপম সোফায় গাটা এলিয়ে দিয়ে বললে।

—কেন, তোমার এ দুর্গতি কেন? সুহৃৎ জিজ্ঞাসা করলে।

—আর বল কেন সুহৃৎ! চাকরি করি—বেশ, টাকা যেমন পাই প্রাণপণে কাজও করি। কিন্তু পরের বাড়ীতে মশাই-মশাই করতে যাব কেন? কর্পোরেশন কি কারো পৈতৃক সম্পত্তি?

—কি হ'ল তোমার—হঠাৎ মেজাজ এমন গরম যে?

—গরম হবে না? আমাদের এক কর্তার মেয়ের বিয়ে। দু'দিন ইঙ্গিতে বললেন আমি যেন ওঁর বাড়ী গিয়ে সময়মত এষ্টিমেটটা ঠিক ক'রে দিয়ে আসি। ভুজিবেই এড়িয়ে গেলুম। কাল একেবারে বাড়ী থেকে ফোন; যেতে হ'ল। গাড়ীটা খারাপ হয়েছে, সারতে দিয়েছি। ট্যাক্সি ক'রে গেলুম। ফেরবার সময় একবার বললেন না, গাড়ী ক'রে বাড়ী পৌছে দিই। রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করছি, এমন সময় বৃষ্টি নাবল। দরকারের সময়ে ট্যাক্সি পেলুম না। শেষে ট্রামে ক'রে বাড়ী ফিরলুম।

—তা, চাকরি করতে গেলে অমন বেগার খাটতে হয়।

—বেশ তো, বেগার খাটতে হয়, কর্পোরেশনের জন্তে খাটব। কারুর ব্যক্তিগত কাজ ক'রে খোসামোদ করব কেন? দিশী লোকের হাতে ক্ষমতা এলে এমনিই হয়—পাবলিক ইনষ্টিটিউশনকে মনে করে পারিবারিক কারবার। যাই বল, আমাদের তো পাঁচশো মনিবের মন যোগাতে যোগাতে প্রাণান্ত হ'ল। আবার সেই বাদশাহী আমল যেন ফিরে আসছে।

—প্রথম প্রথম অমন একটু গোলযোগ হবেই। জানো না, রোগের পর শুকনো হাড়ে মাংস লাগলে যেখানে সেখানে তা বেঢপ হয়ে ওঠে। সুহৃদের প্রকৃতি এই রকম—জগতের কোন জিনিসের বিরুদ্ধে সহজে ওর মন অভিযোগে গর্জে ওঠে না। জীবনের সব-কিছু অসঙ্গতি, সব-কিছু অবিচারের সমাধান ও ব্যক্তিগত ত্যাগের পথে খুঁজতে থাকে। তাই কোথাও নিজের অধিকার ক্ষুন্ন হতে দেখলে ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। ওর নিজের যতটুকু কর্তব্য সেটুকু ও করে যাবে। সংসারে অপর পক্ষেরও কর্তব্য আছে, তাদের পক্ষে সে কর্তব্য পালন না করা অন্যায়—এ বিচারের দায়িত্ব সুহৃৎ নিজের মাথায় তুলে নিতে চায় না।

—তুমি বুঝবে না, সুহৃৎ। অনুপমের কণ্ঠ রুক্ষ হয়ে ওঠে, বলে: কর্পোরেশনে কাজ না করলে বুঝবে না, এ আমাদের কত বড় ব্যর্থতা। চোখের সামনে যখন দেখি অবস্থার সুযোগে গরীবের দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলা চলছে, তখন চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি না—মাথায় রক্ত ফুটতে থাকে। অথচ যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া গেছল তা দিয়ে কত বড় কাজ না করা যেত। হয়ত সারা শহরটাকে নতুন ক'রে ভেঙে গড়া চলত। তাই আজ চারিদিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি সুহৃৎ, অতগুলো মহাপ্রাণ ছেলে কি মিথ্যে বিশ্বাসের মোহে দেশের মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গেল তাদের বুকের পাঁজরগুলো?

ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল। অনুপম চুপ করলে; সুহৃৎ কোন জবাব দিলে না। তার মুখে শুধু স্পষ্ট হয়ে উঠল করুণ গর্বের এক টুকরো দীপ্তি।

কিছুক্ষণ পরে চাকরের হাতে খাবার ও চার সরঞ্জাম নিয়ে সবিতা ঘরে ঢুকল। সুহৃৎ বললে, বৌদি, এত আয়োজন কেন?

—আচ্ছা, থামুন, আপনাকে আর মিথ্যে ভদ্রতা দেখাতে হবে না। সামান্য দু টুকরো রুটি ডিম দিয়ে ভেজে এনেছি, সঙ্গে আছে ঝাল দিয়ে মটর ভাজা। হ্যাঁ, আজ কিন্তু আমাকে সেই ডিজাইনটা এঁকে দিতেই হবে, সুহৃৎবাবু।

—ডিজাইন আবার কিসের? কাঁথার বুঝি?

—হ্যাঁ। সুহৃৎ জবাব দেয়।

সবিতা অনুপমের প্রশ্নের দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে বলে, খোকা খবর এনেছে, আর মাত্র সাত-আট দিন আছে একজিবিসন শুরু হবার। এর মধ্যে শেষ করতে হবে। মাসিমা

আবার কদিনের জন্য বাইরে যাবেন। কাজটা তাঁর যাবার আগেই করে ফেলতে চাই, বুঝলেন?

—বেশ তো, কাপড়চোপড় যা দেবার দিন। বাসায় নিয়ে যাব। কাল সকালে নিয়ে আসব এখানে আসবার সময়। আজ বেশিক্ষণ আপনাদের কাছে বসতে পারব না। কাল ভায়াকে চিঠি লিখে এসেছি, বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এসে যদি আমায় দেখতে না পেয়ে ফিরে যায়, তা হ'লে বড় মুশকিল বাঁধাবে। তার যা মেজাজ—দেখেননি তো কখনো?

—তবে আজ থাক, কাল সকালে করে দেবেন। আপনাকে আর ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটলী বেঁধে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে না।

—না, না, তাতে কি হয়েছে! প্যাকেটটা নিয়ে আসুন, যাবার সময় হাতে ক'রে নিয়ে যাব।

অনুপম বলে—বুড়ী, দু ছেলের মা, তবু এখনো ছেলেমানুষি!

—তুমি থাম বাপু। ইঞ্জিনিয়র মানুষ, ইটকাঠলোহা নিয়ে সারাদিন কাজ কর, শিল্পের কি বুঝবে তুমি?

—না, ক্রটি মার্জনা করবেন। আপনাদের শিল্প বুঝতে চাইনে।

—তা বুঝবে কেন, বিলিতি একটুকরো কলের তৈরি সেলাই-এর কাজ দেখলে এখুনি লাফিয়ে বলে উঠতে, বাঃ, কি অদ্ভুত। সাহেব তোমরা। সবিতা রাগের ভান করে উঠে পড়ে।

—আরে, না, না, যেও না। যাচ্ছ? তা হ'লে থাক! যে কথাটা কাল সুহৃদকে বলতে বলেছিলে তা আর বলব না।

—কি কথা? যেতে যেতে সবিতা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—সেই যে সেই মাসিমার কথা।

—যাও, তোমার যত আজগবী গল্প। মাসিমা পিসিমার কথা আমি কিছু বুঝি না। সবিতা ঘর থেকে চলে যায়।

অনুপম সিগ্রেট-দান থেকে দুটি সিগ্রেট তুলে নিলে। একটি সুহৃদকে দিয়ে অপরটি দুবার এদিকে ওদিকে টেবিলের ওপর ঠুকে ঠোঁটের মধ্যে অপলকা ধরে জ্বালালে। তারপর বললে, শোন সুহৃৎ, তোমাকে কয়েকদিন থেকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি, বলা হয় নি। মানে, বলবার তেমন সুযোগ পাই নি। আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়।

—আত্মীয়তা এখন নেই নাকি? অনুপমের কথা বলার ধরণে সুহৃৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, এখন ব্যাপারটা অনুমান ক'রে হাল্কা হাসিতে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চায়।

—না, না, আরো ঘন আত্মীয়তা। খুলেই বলি, ওর মাসিমার মেয়ে রুণুকে তুমি বিয়ে কর ওর খুব ইচ্ছে। তুমি সংসারী হ'লে আমিও খুশী হব। রুণু সত্যিকার ভাল মেয়ে তুমি জান।

সুহৃৎ চুপ ক'রে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

—কি, চুপ ক'রে রইলে যে? আপত্তির কারণ কি?

—তুমি সব জান অনুপম। বিয়ে আমার সাজে না।

—কেন, তাই জানতে চাই। ঐটি ছাড়া তোমার সবই জানি।

—আমার মাথায় মস্ত বোঝা। বাড়ীতে মা আছেন, টাকা পাঠাতে হয়। এখানে ছোটভাই কারমাইকেলে পড়ে। যা মাইনে পাই, তাতে এসব খরচ মিটিয়ে নিজের বাসাভাড়া দেওয়া মাঝে মাঝে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

—জানি, তোমার বাবা তোমার সৎমা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন। তোমার দিকে একবার ফিরেও তাকান নি। অথচ তাদের বোঝা তোমাকে বইতে হবে। ডোণ্ট বি সিলি, সুহৃৎ। আমার শালীর জন্যে ওকালতি করছি মনে কর না, সকলের কথা তুমি ভেবে মরবে, অথচ তোমার নিজের কথা একটুও ভাববে না? গত বছর তোমার নিজের টাকা দিয়ে সৎ বোনের বিয়ে দিলে না?

—হ্যাঁ, তার ধার এখনো কিছু আছে।

—বাঃ! তাদের পুঁজি রইল ব্যাঙ্কে জমা, আর তুমি সারাদিন খেটে খেটে তাদের জন্যে উপায় করে মরবে! থাক একটা অন্ধকার কাঠের বেড়া-দেওয়া গর্তে। খাও যা, তা দিয়ে কোন মানুষ প্রাণ বাঁচাতে পারে কি-না জানি না। অথচ তোমার বলতে সংসারে কে আছে! আশ্চর্য, তোমার শরীর, তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার আনন্দ—এ সবের দিকে কারো নজর নেই। এমন ক'রে ধুঁকতে ধুঁকতে কতদিন চালাবে সুহৃৎ? এর শেষ পরিণতি কি জান? যক্ষ্মা বা নার্ভাস ব্রেকডাউন। ভাল কথা, তোমার ভাইকে বল না, টিউশন ক'রে পড়ুক।

—না, ভাই। বরাবর সুখে মানুষ হয়েছে, অত কষ্ট ওর সহ্য হবে না।

—আর তুমি তো বরাবর টিউশন করে পড়ে এসেছ—তখন তোমার বাবা যদিও বেঁচে ছিলেন। বেশ, কষ্ট না করতে পারে, পড়া ছেড়ে দিক। তুমি ওর একটা চাকরি যোগাড় করে দাও।

—বাবার ইচ্ছে ছিল ওকে ডাক্তারি পড়ান। আমার জীবন এমনি করেই কাটবে অনুপম। অনেকদিন তো কেটে গেল—আর কটা বছরই বা বাকি?

—যত বাজে সেন্টিমেন্টালিজম্। তোমাদের জীবনধারার আদর্শ আমি বুঝতে পারি না।

—এই তো সত্যিকার জীবন! নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারাই তো সব চেয়ে বড় কথা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ কথাই আমিও ত বলতে যাচ্ছিলুম। তোমাদের ঐ এক বড় বড় কথার আওতায় নিজেদের মেরে ফেলার সাধনা। কোথায় ঐ নিঃশেষে নিজেকে লোপ করে দেবার কাজ চলছে বল ত! সব জায়গায় এক চেষ্টা—নিজেকে সম্পূর্ণ করে পাবার—নিজেকে চরমভাবে উপলব্ধি করবার—নিজের মধ্যে যত-কিছু সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ বিকাশের অবিরাম চেষ্টা। সেদিনে রেস কোর্সের ধারে একটা কাজের ইনসপেকশনে গেছলুম। ভীষণ রোদ্দুর, দাঁড়িয়ে কাজ দেখতে দেখতে বড় কষ্ট হতে লাগল। এসে দাঁড়ালুম একটা সেগুন গাছের তলায়। রেস কোর্সের মাঠ পার হয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া এসে লাগছিল গাছের পাতায় পাতায়। ভাবলুম, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে গাছগুলো আমার মত কত পথচারীকে না ছায়া আর আশ্রয় দেয়। হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়ল, দেখতে পেলুম রাস্তার দু সারি গাছে সেগুনের ফুল ফুটেছে। ছোট ছোট ক্রিমন ফুল শাদা গোছায় ভর্তি। অবাক হয়ে গেলুম। জীবনের একটা মস্ত বড় সত্য উপলব্ধি করলুম। আত্মীয়ের ওপর কর্তব্য বল, পরোপকার বল—সবই জীবনের গৌণ লক্ষ্য। মুখ্য চেষ্টা হচ্ছে ঐ সেগুনের দলের মত ফুলে ফুলে নিজেদের ভিতরের সত্তাকে পূর্ণরূপ দেওয়া—তাতেই আমাদের চরম সার্থকতা।

সুহৃৎ নিজের সম্বন্ধে কারো সঙ্গে বেশি আলোচনা করতে

লজ্জা পায়—নিজের মধ্যে নিজেকেও লুকিয়ে রাখতে ভালবাসে। তাই বন্ধুর কথায় বাধা দিয়ে বলে, আজ তোমার কি হ'ল অনু ?

—কিছুই হয় নি। না, না, আজ তোমাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে দেব না। ওর উত্তেজনা আবার বেড়ে যায়। এর আগে অনেকবার তোমার সঙ্গে এ আলোচনা করেছি। বিশেষ কিছু মতামত প্রকাশ কর নি। আজ স্পষ্ট ক'রে জবাব দাও, কেন তোমার এই কৃচ্ছ্র সাধন ?

—কি আর জবাব দেব ভাই ? বাড়ীর বড় ছেলে হওয়ার অনেক দায়।

—কোন দায়িত্ব নেই যদি নিজে তিলে তিলে মারা পড়ি। অত দায়িত্বের কথা বলছ ? ধর, আজ তোমার একটা সাংঘাতিক অসুখ হল তখন ওদের উপায় হবে কি ?

—অত কথা ভেবে কাজ করতে গেলে সংসারে চলে না।

—এই তো! অনুপম উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে: যেই অসুবিধে দেখ অমনি পিছিয়ে যাও। অত কথা ভেবে কাজ করা চলে না—কেন চলবে না ? যারা নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না—তাদের চলে। আজ স্পষ্ট করে তোমাকে বলি সুহৃৎ, তোমাদের এ আত্মত্যাগ নয়—আত্মবঞ্চনা। নিজেকে তিল তিল ক'রে মেরে সংসারের কোন উপকারে আসা যায় না।

বৈঠকখানা রোডের মোড়ে ঢুকেই সুহৃৎ তাড়াতাড়ি পা চালায়। দেরি হয়ে গেছে অনেক, হয়ত ছোট ভাই এসে ফিরে গেছে। কিংবা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। গেলেই অনুযোগ করবে; বলবে, আমাকে আসতে বলে ভোর বেলা কোথায় অন্তর্দ্ধান করেছিলে দাদা ? না, না, যদি ফিরে যায়, বড়ই মুশ্‌কিলে পড়ব। তা হ'লে আবার বিকেলে ওদের হোষ্টেলে যেতে হবে। সেই খালের ধারে ওদের হোষ্টেল। সারাদিন অফিসে খেটে আর এতটা পথ রোজ রোজ হাঁটতে ভাল লাগে না। আজ সকালে না বেরুলেই হ'ত—ও ভাবে। না বেরুলেও চলে না! একা একা অন্ধকূপ ঘরে কতক্ষণ থাকা যায়! দম যে বন্ধ হয়ে আসে। তবু অনুপমদের বাড়ীতে গিয়ে একটা আনন্দোজ্জ্বল জায়গায় দুদণ্ড নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচতে পারি। সত্যি, অনুপম আজ যে কথাগুলো বলছিল তা নিতান্ত মিথ্যে নয়। ভাল লাগে না এই নিঃসঙ্গ একাকী দারিদ্র্যের জীবন। কথাটা মনে উঠতেই সুহৃৎ হেসে ফেলে, হ্যাঁ, নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনই বটে!

আরে, আরে, দপ্তরীটা আজ আবার খেপেছে। ছেলেটাকে মারধর করছে নিশ্চয়ই—না হ'লে অত সোরগোল কিসের। পা থামিয়ে সুহৃৎ রাস্তা থেকে উঁকি মেরে দেখে। কলকাতা পান্থশালার পাশের বাড়ীতে একতলায় একটি ঘর নিয়ে থাকে দপ্তরী আর তার ছেলে। ছেলেটা কাজের লোক—তা না হ'লে পাঁচ-ছ জন কারিগর নিয়ত খাটছে কেমন ক'রে ? বাপটা তো মাতাল, উড়নচড়ে—ফূর্তি ক'রে দিন কাটায়। ও বলে, আহা চৌধুরীসাহেব, ছেলেটার হাত ধরে অত টানাহেঁচড়া চেঁচামেচি করছ কেন ? হ'ল কি ?

—দেখুন না বাবু! খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম। এখন বলে টাকা দেব না। টাকাগুলো সব লুকিয়ে রেখেছে।

—কি অন্যায় দেখ তো ? সুহৃদের মুখে আজ ফুটে ওঠে বিদ্রূপের হাসি, বলে: কোথাও গান শুনতে যাবার বরাত আছে নাকি চৌধুরীসাহেব ?

—না না হুজুর, ওসব বদখেয়ালী আমি ছেড়ে দিয়েছি। এক কাবুলির কাছে দেনা ক'রে দেশে টাকা পাঠিয়েছিলুম। সে এখন টাকা চাইছে। তা বেটা বলে কি-না, তাকে ডেকে নিয়ে এস, আমি নিজে হাতে টাকা দেব। বেটা হয়ে বাপকে এত অবিশ্বাস! দিন কাল কি হ'ল হুজুর ?

বাসায় ফিরে সুহৃৎ শুনলে তার খোঁজে কেউ আসে নি। মনে মনে বললে—আচ্ছা, এখন না আসুক, বিকেলে আসবেই। হোটেলের ঠাকুরকে ডেকে বললে, আজ আর ভাত খাব না ঠাকুর। শরীরটা ভাল নেই। একটু সুজি আর এক কাপ গরম দুধ দিতে পারবে ?

ঠাকুর বললে, আচ্ছা দেব। জ্বর হয়েছে নাকি বাবু ?

—না, জ্বর নয়, সর্দির ভাব। কিছু ভাল লাগছে না।

কিন্তু যথাসময়ে অফিসে যাবার জন্যে জামাকাপড় পরে রান্নাঘরে নেমে দেখে, সুজিও হয় নি—দুধও কেউ কিনে আনে নি। বলে, কিছুই করনি, সে কি ঠাকুর ?

ঠাকুর জবাব দেয়, কি করবো বলুন। নন্টুটা দুধ আনতে বাজারে গেছে কখন তার ঠিক নেই। এখনো ফেরে নি। আমি একলা মানুষ, ভাত, ডাল, তরকারি রান্না। আজ আবার মাছ এসেছে। নটার মধ্যে সব তৈরি চাই। কোন্ হাতে করি বলুন ? ঠাকুর নিজের ত্রুটি অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

—থাক, হয় নি যখন আর কি হবে ? তা দুটি ভাতই দাও, খেয়ে যাই। মনে মনে সুহৃৎ ভাবে, অভিযোগ করে লাভ কি!

—একটু বসুন না, সুজি ক'রে দিচ্ছি।

—না, মোটে সময় নেই। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সুহৃৎ জবাব দেয়: তুমি ভাতই দাও।

—শরীর খারাপ হয়েছে, ভাত খাবেন ? অনেকদিনের পুরোন ঠাকুর, আত্মীয়ের মত মায়া দেখায়।

কথাটা শুনে সুহৃদের হাসি পায়। মনে মনে ব্যঙ্গ করে বলে, লোকটার মায়া আছে বটে। প্রকাশ্যে বলে, না ঠাকুর, ভাতই দাও।

অফিসে সুহৃদের কিছুতেই কাজে মন বসে না। ঘুরে ফিরে নানা চিন্তা মাথার মধ্যে গজ গজ ক'রে ওঠে। অনুপম বড় সিরিয়স প্রকৃতির ছেলে—জীবন নিয়ে নিয়ত ভাবে। দেশ, সমাজ, জাতির বড় বড় দুশ্চিন্তাগুলো যেন ওর একচেটে। প্রত্যহই সুহৃৎ ওর মুখে কত না কথা শোনে। একদিন ও ছিল অনুপমের মত সিরিয়াস। ওর ইচ্ছে হত, সারা দুনিয়াকে নিজের হাতে নিজের মত ক'রে গড়বে—এর যত সমস্যা ভেবে ভেবে তাদের সব মীমাংসা আবিষ্কার করবে। কিন্তু আজকাল ওসব ছেড়ে দিয়েছে। কিছুই ওর ভাল লাগে না। আগে অফিসে যত কাজই থাকুক, বাড়ী ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দিত। আজ বই-এর নাম শুনলে মন বিদ্রোহ করে ওঠে। মনের আর দোষ কি ? সুহৃৎ ভাবে, পাশ করার পর একটি একটি করে দশটি বছর কেটে গেল—আগাগোড়া চলেছে তার এই জীবন-সংগ্রাম—একটানা এর গতি। গরীবের আবার এত ভাববিলাস কেন ?

বেশ আছি আজকাল। বই পড়লেই নানা চিন্তা উঠবে, তারপর মাথায় সারাদেহের রক্ত জমবে, রাত্তিরে ঘুম হবে না। তার চেয়ে এ বেশ—অফিসে কাজ, বাড়ীতে খাওয়া আর ঘুম—কোন দুশ্চিন্তা নেই বাবা! হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত করে তোলে মা আর ছোট ভাই হঠাৎ টাকা চেয়ে। তা ওরা বুঝদার খুব, টাকা পাঠিয়ে দিলেই সন্তুষ্ট, আবার কিছুদিন চুপচাপ। এই নির্ব্বিবাদ, নিশ্চিন্ত জীবনধারা মন্দ কি? সুহৃৎ হঠাৎ নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে। আজ ও কিছুতেই অনুপমের কথাগুলো ভুলতে পারছে না। ওর অবচেতন মনের তলে তলে তার কথাগুলো কেবলই চাকের চারপাশে বোলতার মত ঘুরে ওকে নাড়া দিয়ে চলেছে।

অনুপম কথাগুলো যে ভাবেই বলুক তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। আজ কেন্দ্রচ্যুত—শুধু অবসাদ, শুধু চলার জন্যেই চলা ছাড়া তাতে আর কিছু নেই। অনেক দিন হ'ল ভিতরের তাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মানবের জীবনে নিজের জন্যে কিছু যে কামনা করতে হয়, কিছু যে পাবার জন্যে চেষ্টা করতে হয়, আজ ও যেন তা ভুলে গেছে। সংসারে ওর সত্যিকার আপন বলতে কে আছে—কে ওকে চায়? সে কথা না ভাবাই ভাল। অসুখ করলেও কলকাতায় পড়ে থাকে, বাড়ী যায় না—পাছে কেউ কিছু মনে করে। কেন ওর এই নিজেকে তিল তিল ক'রে মারা—নিজেকে বঞ্চিত ক'রে কি পরমার্থ লাভ হচ্ছে? ওর মনে আপনা থেকে প্রশ্ন আসে, ত্যাগের পুণ্য? পরলোকের কাজ? হায়, ইহলোকের নিশ্চিত সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে তীর্থের কাকের মত আশা করে চেয়ে থাকব পরলোকের অন্ধকারে, কি সুখ আছে তার দিকে? আগে বাড়ী গেলে পাড়ার লোকে বলত বটে, আহা, কি ছেলে, মা ভাইবোনের জন্যে কত ত্যাগ! আজকাল আর কেউ বলে না। একটানা ত্যাগ দেখতে দেখতে ওটা তাদের চোখে স্বাভাবিক অধিকার হয়ে গেছে। ও দেখে এখন আর কেউ বিস্মিত হয় না। না হোক, ঐ ফাঁকা সামাজিক সম্মানের আমি প্রত্যাশী নই। তবে কিসের প্রত্যাশী? কেন এই কৃচ্ছ্র সাধন? অনুপমের সকালের প্রশ্ন এবার সুহৃৎ নিজেকে নিজে করে বসে। ওর শিরায় শিরায় একটা গভীর অবসাদের কঠিন আবরণ চঞ্চল রক্তস্রোতকে যেন ক্ষীণতম করে ফেলেছে। না থাক, এত ভাবতে ভাল লাগে না। ও মনে মনে বলে, দিব্যি ছিলুম, আজ অনুপমদের বাড়ীতে গিয়েই যত বিপদ শুরু হল। আমাকে সংসারী করবার খেয়াল ওর মাথায় হঠাৎ কেন এল?

সুহৃৎ হিসাবের সংখ্যায় ভরা কাগজের ওপর জোর ক'রে কলম চালায়—এবার কাজে ও মন দিয়েছে, আর বাজে ভাবনা ভাববে না। আঃ, গায়ে কি আলিস্যি লাগল। গাঁটে গাঁটে যেন ব্যথা। দাঁতগুলো ভীষণ সড়সড় করছে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ও আবিষ্কার করলে, হিসেব লেখা বন্ধ ক'রে আবার ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। সবিতার মাসিমার মেয়ে মাত্র একটি, তার অনেক গুণ। এই বিয়ের প্রস্তাব আজ কিছু নতুন নয়, আগেও অনেকবার সবিতা আর অনুপম ইঙ্গিতে অনুরোধ করেছে। কলকাতার বাড়ীখানি হয়ত যৌতুক হিসেবে পাওয়া যাবে। অনুপমের প্রস্তাবে রাজি হলে মন্দ হয় না। বয়স তো ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিয়ে করতে হ'লে এর পর আর মেয়ে পাওয়া যাবে না।—ঠিক মেয়ে পাওয়া যাবে না, তা নয়। বাংলা দেশে আবার বিয়ের কনের অভাব! ষাট বছরে পৌঁছতে এখনো সুহৃদের অনেক দেরি। ও মনে মনে হিসেব ক'রে বলে। কিন্তু এর পর আর বিয়ে করা ওর পক্ষে শোভা পাবে না। না, থাক, বহুদিন এমনি করেই কেটে গেল—জীবনের আর কটা দিনই বা বাকি? গরীবের আবার সংসার পাতা! তাদের আবার সুখ! অসীম আকাশে দুর্দৈবের মধ্যে সাথীহীন নিঃসম্বল প্রাণীর একটানা সংগ্রাম—এর একটা সার্থকতা আছে বই কি! একলা এসেছি, একলাই জীবনের ভার বয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 'একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।' সুহৃদের আদর্শবাদী হৃদয়ে আবার ফিরে আসে আগেকার দৃঢ়তা।

এই তো দুনিয়া। সংসারে দুটি বিভিন্ন শক্তির ধারা অবিরল বয়ে চলেছে। তাদের যোগাযোগেই জীবজগতের গতি আজো অব্যাহত—সৃষ্টি আজো সজীব। অনুপমের দাদার দল বুকের পাঁজর দিয়ে অধিকার সংগ্রহ করে যায়—আর তা ভোগ করে তারাই, যারা কোন দিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কণামাত্র শক্তি ব্যয় করে নি। দপ্তরীর ছেলেটা রাত জেগে খেটে খেটে পয়সা উপায় করে, দপ্তরী তা খরচ করে লালসার তৃপ্তির জন্যে। সুহৃদকেও খাটতে হবে তার বাবা বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জীবন-যাত্রার পথ সুগম করে তোলার জন্যে। সবাই যদি ভোগ করতে চায়, জগতে তা হ'লে হানাহানির শেষ থাকে না যে। না, না, যার যা ধর্ম, তা নির্ব্বিবাদে মেনে নেওয়ার মধ্যেই পাওয়া যায় সার্থকতা—আর তা না করলেই আসে ব্যর্থতা। অদৃষ্ট আমাকে যে কাজের পরিধির মধ্যে টেনে এনেছে তার বাইরে যাবার জন্যে বিদ্রোহ করা ভুল। তাতে কোন দিন সুখী হতে পারব না। সুহৃৎ একটা খুশীর নিঃশ্বাস ফেলে; ভাবে, এতক্ষণ বাদে একটা মীমাংসা পেয়েছে যাহোক। সারাদিন আজ ওর ভেবে ভেবেই কাটল!

সন্ধ্যেবেলা সুহৃৎ যখন বাড়ী ফিরে এল তখন তার জ্বর আসবার উপক্রম হয়েছে। গা বেশ শীত শীত করছে। ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর একখানা চিঠি দিলে। দেশ থেকে এসেছে। খামখানা ছিঁড়ে সুহৃৎ পড়ে ফেলে, মা লিখছেন, রথযাত্রা খুব কাছে। বোনের শ্বশুরবাড়ীতে তত্ত্ব করতে হবে। অবিলম্বে যেন কিছু টাকা পাঠায়। আর আগামী রবিবারে সুহৃৎ যদি দেশে আসে তো খুব ভাল হয়, অনেক দিন তিনি ছেলেকে দেখেন নি। আসবার সময় সঙ্গে করে যেন এক টুকরি আম কিনে নিয়ে আসে।

মা আর ছেলে দুজনে মিলে আমাকে টাকা চেয়ে চেয়ে পাগল করে তুলবে দেখছি। সুহৃৎ আপনমনে হেসে ওঠে। এই কলকাতা পান্থনিবাস যদি টাকার টাকশাল হ'ত, তা হ'লেও বা কিছু টাকা চুরি করে পাঠাতে পারতুম। পোষ্ট অফিসে যে টাকা জমা আছে তা থেকে মেডিকেল কলেজের দেনা শোধ ক'রে আবার বোনের শ্বশুরবাড়ীতে সেলামি পাঠানো চলবে না। শেষে ধার করতেই হবে। জামা খুলে সুহৃৎ বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে ওঠে। আজই টাকার একটা ব্যবস্থা না করলে ওর মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। ছোঁড়া কলেজের থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত—বিকেলেও এল না। সুহৃৎ জনে

মনে বলে, আমিই যাই, টাকার কথাও হবে—সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু ওষুধও ওর কাছ থেকে চেয়ে খেতে পারব। জ্বর তো হয়েছে, এখানে ওষুধ কিনতে গেলেই এখুনি টাকা বার করতে হবে। নিজের জন্যে কিছু খরচ করতে ওর হাত যেন কাঁপে। তাছাড়া, জ্বর বেশি হলে অফিস কামাই হবে—কাল আবার বৃহস্পতিবার। না গেলে বড়বাবু মিষ্টিমিষ্টি টিটকিরি দেবেন। জীবনে সব দিক বাঁচিয়ে না চললে ওর উপায় নেই।

সুনীলের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল—ভিতরে কারা যেন হল্লা করছে। সুহৃৎ দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা খুলে অল্প একটু ফাঁক করে সুনীল মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে?—দাদা? তুমি এমন অসময়ে? দাঁড়াও আমি বাইরে যাচ্ছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সুনীল দুটো মোড়া নিয়ে বাইরে এল। বললে, চল, ঐ খোলা ছাদটায় গিয়ে বসি।

—কেন রে, ভেতরে এত হল্লা কিসের? টেবিলের ওপর যেন ছুচিমটে বোতল দেখলুম। সুহৃদের জ্বর তখন বেশ হয়েছে—মোড়ায় বসে আস্তে আস্তে ও ভাইকে জিজ্ঞেস করলে।

—কেন, আপনার সন্দেহ হচ্ছে? নিমেষে সুনীলের স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে; বলে, এটা কলেজের হোস্টেল—কলকাতা পান্থনিবাস নয়—এখানে ঘরে নেশার আসর জমাবার উপায় নেই দাদা। ও ভিনোর বোতল। বন্ধুরা এসেছে, থিয়েটারের রিহার্সল হচ্ছে। তাই লিমনেডেয় বদলে ভিনো আনিয়ে দিয়েছি।

—থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত বলে বুঝি আজ আমার ওখানে যেতে পারিস নি? বোতলের কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে সুহৃৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তাই ত্রুটি স্বীকার করার ছলে এবার তার গলার স্বর মিষ্টি করে ও সুনীলকে জিজ্ঞাসা করলে।

—না, তোমার ওখানে যাই না, জান তো।

—কেন রে? একটু বিস্ময়ের সঙ্গে সুহৃৎ জিজ্ঞাসা করে।

—যা বাড়ীতে থাক তুমি, যেতে ভয় হয়। শহরের যত এপিডেমিকের জার্মসে ওর চারিদিক ভর্তি।

সুহৃদের মনে ক্ষোভ জমে ওঠে, কার জন্যে ওর এই দুর্দশা! যাক্, এখন ওসব ভেবে মেজাজ খারাপ করবে না। মন থেকে ক্ষোভ মুছে দেবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি ও টাকার প্রসঙ্গ শুরু করে বলে, টাকার কথা লিখেছিলি তুই। তা হঠাৎ এত টাকার দরকার হ'ল কেন?

—কেন, চিঠিতেই তো সব কারণ লিখেছিলুম, বিশ্বাস করনি বুঝি? তাই খোঁজ নিতে এসেছ?

—না রে সুনু, অতটাকা দু-তিনদিনের মধ্যে যোগাড় করতে পারব না—সময় থাকতে আমাকে জানাস নি কেন? মা আবার আজ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিছু কম দিলে চলবে?

—চললে কি আর তোমার কাছে বেশি করে টাকা চেয়ে পাঠাতুম? তখন তো আমি বলেছিলুম তোমাকে, ডাক্তারি পড়তে আসব না, অনেক খরচ, সামলাতে পারবে না তুমি। তুমি জিদ ধরলে, বললে, পড়তেই হবে তোকে।

বটে! সুহৃদের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সুনীলকে সাহায্য করার জন্যে ওর যে কি কষ্টে দিন যাচ্ছে তার জন্যে কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নেই। রাগে ওর ভিতরটা পুড়ে যায়। বলে ওঠে, তুই নিজে টাকার যোগাড় করবার চেষ্টা করিস। আমি আর তোদের কারুকে টাকা দিতে পারব না। আমার রক্ত দিয়ে উপায় করা টাকায় বীয়ার খাওয়ানো হচ্ছে বন্ধুদের—লজ্জা করে না? রাগের তাপে ওর স্বর বেধে যায়।

রাস্তায় নেমে সুহৃৎ একখানা বাসে উঠল। আসবার সময় পয়সা বাঁচাবার জন্যে হেঁটে এসেছে। কিন্তু এখন আর হাঁটার শক্তি তার নেই। চারিদিকে কিছুই তার লক্ষ্য হচ্ছে না—ওর মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। কারুকে এতটুকু ও আর সাহায্য করবে না—যত সব অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, শয়তানের দল। বলে কি-না বন্ধুদের ভিনো আনিয়ে দিয়েছি! ভিনোর বোতল আর বীয়ারের গন্ধ ও যেন জানে না। না খেয়ে না পরে আমি টাকা পাঠাচ্ছি, আর ওদের চলেছে ফূর্তি!—নিষ্ঠুর এই জীবনের পরিমণ্ডল। আদর্শবাদিতার অন্ধ মোহে ও বোকার মত আর নিজেকে বঞ্চনা করবে না। এবার অভ্যস্ত জীবনের গতি ও বদলাবেই বদলাবে। সুহৃৎ দৃঢ়সঙ্কল্পে নিজের মন বাঁধে।

শিয়ালদার মোড়ে নেমে বাসার জন্যে ওকে বেশ একটু হেঁটে যেতে হয়। ও বুঝতে পারে জ্বর ক্রমশই বাড়ছে। হাতপায়ের গাঁটে গাঁটে ভীষণ ব্যথা, হাড়ে হাড়ে যেন মরচে ধরেছে। মাথাটার মধ্যে কে যেন রাজ্যের ধুনুরি ডেকে এনে ভিড় জমিয়েছে। দৈহিক তাপের স্পর্শে ওর সঙ্কল্পের উত্তাপ ক্রমশই বেড়ে যায়। নিজের মনে ও নিজেকে বলে, দোব না, কিছুতেই আর দোব না।

—বাবু, আজ এত দেরিতে বাসায় ফিরছেন?

মানুষের গলা শুনে অন্যমনস্ক সুহৃৎ চমকে ওঠে। চেয়ে দেখে দপ্তরীর সেই ছেলেটা কথা বলছে।

—হ্যাঁ, এমনি একটু দেরী হয়ে গেল। হাতে তোর ওটা কি রে? সুহৃৎ ভাবে, নিশ্চয়ই ওর কোন কাজ আছে, নইলে হঠাৎ আমার দেরি করে বাসায় ফেরার জন্যে ওর অত ভাবনা কেন?

—এজ্ঞে, একখানা চিঠি বাবু। দেশ থেকে এসেছে। মার ব্যায়রাম ছিল। পড়ে বলুন না কি লিখেছে।

—কেন, তুই লেখাপড়া জানিস না?

—কবে আর শিখলুম বাবু। সেই এতটুকু বাচ্চা যখন, তখন থেকে তো কাজ করছি। নইলে কি আর ঘরের কেউ খেতে পেত!

—তোর বাপটা বুঝি চিরকাল বদমায়েশি ক'রেই কাটালে?

—এজ্ঞে দেখুন না, আজ সেই টাকাগুলো নিয়ে বেরিয়েছে, সারাদিন দেখা নেই। রাতেও বাসায় ফিরবে না নিশ্চয়ই।

—সকালে টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছিস? তবে তখন এত চেঁচামেচি করছিলি কেন?

—কি করি বলুন হুজুর। মার অসুখ, তেনারে পাঠাবার জন্যে টাকাগুলো লুকিয়ে তুলে রেখেছিলুম। তা বলে কি জানেন, আমি মার খাব কাবুলির হাতে, তবু টাকা থাকতে তুই দিবি না? মনে করলুম, সত্যি বুঝি বা। দিলুম। টাকা নিয়ে বাবা তো চলে গেল, বিকেলবেলা এই চিঠিখানা এসে হাজির। নিশ্চয়ই টাকা পাঠাবার কথা লিখেছে। দেখি, আজ সারারাত খেটে কুণ্ডুবাবুদের কাজটা কাল সকালে তুলে দিয়ে আসব। যদি ওঁনারা কিছু টাকা দেন তবেই টাকা পাঠানো হবে।

—তা বাপটাকে ধরে মার দিতে পারিস না একদিন?

—না বাবু, ওঁনার কাম উনি করুন—আমরা কি আর করব। পড়ুন না একবার চিঠিখানা।

সুহৃৎ চিঠিখানা পড়া শেষ করে যখন নিজের ঘরে এসে পৌঁছল, তখন হাত-পা শিথিল হয়ে এসেছে। অতিকষ্টে সুইচটা টিপে আলোটা জ্বেলে বিছানাটা পেতে নিলে। ওর মনে আর কারো উপর রাগ নেই। ও ভাবে, ছেলেটা ঠিক কথা বলেছে, ওঁনার কাম উনি করুন, আমাদের কর্তব্য আমরা করি। ঠিক ঠিক। যার যা ধর্ম, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুখ কি পাওয়া যায়? আমরা জীবনে বঞ্চিতের দল—চিরকাল বঞ্চিত হয়েই থাকব। সুনীলরা ভোগীর দল ভোগ করবে। সূর্যের চারিদিকে এই যে পৃথিবী ঘুরে মরছে—এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওর গতি থেমে যাবে, তাপ নিবে আসবে। মা ভায়ের জন্যে খেটে খেটে একদিন আমাদেরও এই বারের খেলা সাঙ্গ হবে—সেদিন অজানিতের নিঃশব্দ অন্ধকারে আমরা দলটি হব হারা। উঃ, মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। সুইচটা খট করে নিবিয়ে দিয়ে সুহৃৎ বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

পিক্‌নিক্

শ্রীজনরঞ্জন রায়

নিখিলেশ ভারতীয় সৈনিক বিভাগে ওড়া জাহাজের কাজ শিখিতেছে। সঙ্গীদের গ্রুপ ফটো, সৈনিক কায়দায় অভিবাদন, হাওয়া রাজ্যের বিভীষিকা ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় দৃশ্য ও কাহিনী দেখাইয়া শুনাইয়া সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিতেছে। নিখিলেশ জোয়ান ছোকরা। এখনও বিবাহ হয় নাই। হাত পা শক্ত শক্ত। চেহারা নেপালী ধরণের। নাকটা মোটা ও বড়। খাড়া খাড়া চুল। গোঁফ চীনাদের মতো। গলার স্বর এবার সৈনিকদের মতো কাঁসার আওয়াজের ন্যায় করিয়াছে। কিন্তু দেখা গেল আর সে ঢোক গিলিয়া কথা বলে না। চোখ পিট্‌পিট্‌ করাটাও গিয়াছে। আড়ষ্টভাব নাই। খুব মিশুক হইয়া পড়িয়াছে। লোকে বলিল, সৈনিক-বৃত্তি গাধাকেও মানুষ করে। স্বারীর সঙ্গে তাহার খুব গল্প জমে।

স্বারী নিখিলেশের বাল্যবন্ধু ও কলেজের সহপাঠী মোহিতের ভগ্নী সরোজিনী। সে কলিকাতার একটি মেয়ে-কলেজে পড়ে। আপাতত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ আছে।

স্বারী বলিল—আপনাদের তো চমৎকার জীবন ···

স্বারীদের বাড়ি কলিকাতার নিকট একটি গ্রামে। তাহাদের পুকুর পাড়ে আজ প্রীতিভোজ। মোহিতের প্রথম ছেলে হওয়ার টেলিগ্রাফ আসিয়াছে এলাহাবাদে শ্বশুরের নিকট হইতে। তাই গ্রামের বন্ধুদের লইয়া খাওয়া-দাওয়া হইতেছে। স্বারীও আসিয়াছে। নিখিলেশও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। সে সব কাজে লাটাইয়ের মত ঘুরিতেছে। স্বারীও উপগ্রহের মত তাহার সঙ্গে পাক্ খাইতেছে। ফাউলকারিটা স্বারীই রাঁধিল, বাকী সব ঠাকুররা রাঁধিতেছে। স্বারী বলিল—আসুন না, পুকুরপাড়ে লনের উপরে গিয়া বসা যাক।···আচ্ছা, যুদ্ধ শেষ হলে যখন ফিরবেন তখন আপনি মস্ত একটা লোক, কত পদক ষ্টার আপনার ঝুলবে! এই বলিয়া স্বারী লা-টারে-রা-রা বলিয়া একটা ইংরেজী গৎ গাহিয়া বিলাতী-ধরণের একটা নাচের মহড়া দিয়া ফেলিল।

নিখিলেশ আধ-শোয়া ভঙ্গীতে তাহার দিকে চাহিয়া শিস্ দিতে দিতে পা ঠুকিয়া তাল দিতেছিল। ওদিকে বন্ধুর দল লম্বা বারান্দায় ব্রীজ খেলায় মশগুল্। আর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে চা, সিগারেট।

পুকুরপাড়ে খেজুর গাছ কামাইতে আসিয়াছে। স্বারী ঐ লোকটার দিকে তাকাইয়া আছে, যে গাছ কামাইতেছে। গাছের সঙ্গে অবলীলাক্রমে সে কোমরটাকে বাঁধিল। তারপর লাফাইয়া লাফাইয়া গাছে উঠিল···গাছ কামাইল···হাঁড়া বাঁধিল···আবার নিঃশব্দে নামিয়া গেল। কি ডেয়ারীং দুঃসাহসী লোকটা—স্বারী মনে মনে বলিল।

নিখিলেশের পাশে কল্‌কে জবার গাছটা ফুলে ফুলে লাল। রাধা-পদ্মটা এত বড় যে ডালটা নুইয়া পড়িয়াছে। মরসুমী বিচিত্র কত ফুলই কেয়ারিতে কেয়ারিতে ফুটিয়া আছে। দূরে ঐ মন্দিরের চূড়াটা বনের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া দেখা দিতেছে। শীতের ঘোলাটে বৈকালিক আকাশ। নিখিলেশের কাছে এগুলো সব ভুয়ো ··· তামাসা ··· বাজে, কোনোটার যেন প্রাণ নাই। তবে স্বারীর?—প্রাণের আবেগে যেন সে উচ্ছ্বসিত ··· বাঁধ ছাপাইয়া পড়িতেছে!

হঠাৎ পাক্ দিয়া দাঁড়াইয়া স্বারী বলিল—আনন্দে বিভোর হয়ে থাকা মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ ··· পারেন আমাকে নিয়ে এখুনি ইলোপ ক'রে পালাতে? নিখিলেশ বলিল—তার মানে? স্বারী দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁটটা কামড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মানে, দুজনে হাওয়া জাহাজে চলে যাবো একদম করাচীর পথে···এরোপ্লেনে ফুলশয্যা···ভেসে চলবো আকাশে··· কোথায় কে জানে! তারপর বলিল—পারেন এই খেজুর গাছটায় উঠতে? নিখিল জোরের সঙ্গে বলিল—না। স্বারী বলিল—ভীরু কাওয়ার্ড···এই আমি উঠছি। এই বলিয়া সে একখানা মৈ গাছে লাগাইয়া তাহা দিয়া টক্‌টক্ করিয়া উপরে উঠিয়া নিজের আঁচল দিয়া নিজেকে গাছের সঙ্গে বাঁধিল। তারপর পা দিয়া মৈখানা ফেলিয়া দিল নিখিলেশের মাথায়। দারুণ আঘাত পাইয়া নিখিলেশ চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বারীও গাছের উপর হইতে চীৎকার করিতেছিল—কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ড!

শব্দ শুনিয়া বন্ধুবান্ধবের দল দৌড়াইয়া আসিল। ব্যাপারটা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই সকলে চাঁদা করিয়া নিখিলেশকে উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিল। সকলের মুখেই এক কথা—কাওয়ার্ড কাওয়ার্ড···একটি লেডিকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নাও!

ভাগলপুরের স্মৃতি

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভাগলপুর অধিবেশনের উদ্যোগের সংবাদ পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে মহাসভা নির্দ্দেশ দিলেন যে, বিহার সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও মহাসভার অধিবেশন বিহারে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই তীর্থদর্শনের জন্য ভাগলপুরে বহু হিন্দু নেতা সমবেত হইবেন, সংবাদ পাইলাম। মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আবার মহাসভার কর্ম্মী হিসাবে এই অধিবেশনে যোগদান করাও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল।

হাওড়ায় আসিয়া দেখিলাম, ষ্টেশনে ভিড়ের অন্ত নাই—মানুষ, বাক্স, পেটরা প্রভৃতিতে ঠেসাঠেসি, গাদাগাদি। জনতার অধিকাংশই বিমান আক্রমণে শঙ্কিত হইয়া নিরাপদ স্থানের আশায় ছুটিয়াছে। তাহার উপর আবার হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের ভীড়।

বাঙ্গালার অন্যতম বিশিষ্ট হিন্দু নেতা শ্রীযুত এন. সি. চ্যাটার্জ্জী, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে গাড়ীতে উঠিলাম। পথে কোলগাঁও ষ্টেশনে শ্রীযুত এন. সি. চ্যাটার্জ্জী, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীযুত বি. জি. খাপার্দে প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন। আমরা সকলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, 'হিন্দু মহাসভাকি জয়' প্রভৃতি ধ্বনিতে পুলিশের ঐরূপ কার্য্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলাম।

আমাদের গাড়ী ভাগলপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলাম ষ্টেশনটিতে পুলিশ, সিভিকগার্ড ও সামরিক অশ্বারোহী পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে। আমরা ষ্টেশনে অপেক্ষমান জনতাকে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ দিলে জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। পুলিশ আসিয়া সকলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

ভাগলপুরে গিয়া শুনিলাম যে, আমাদের নির্ব্বাচিত সভাপতি জননায়ক বীর সাভারকার পূর্ব্বদিন রাত্রে গয়া ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আরও সংবাদ পাইলাম যে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার গঙ্গানন্দ সিং, ডাঃ বরদারাজলু নাইডু, শ্রীযুত ভি. জি. দেশপাণ্ডে, শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী, শ্রীযুত সত্যনারায়ণপ্রসাদ, শ্রীযুত নর্ম্মদা শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতিকে এবং বহু স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে মহাসভার কয়েকজন কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবক পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিবেশন করিবার চেষ্টা করেন। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিতে উদ্যত হইলে পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ভাই পরমানন্দ ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করিয়া পুনরায় অধিবেশন করিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ষ্টেশনে পৌঁছিবার কয়েক মিনিট পরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার প্রতিবাদে দুইটি জনসভা হয় এবং সভা দুইটির সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। লাজপৎ রায় পার্কে প্রবেশকামী স্বেচ্ছাসেবকদিগের কয়েকটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই দিবসে সকাল হইতেই গ্রেপ্তারপর্ব্ব চলিতে থাকে। শ্রীযুত লালনারায়ণ দত্ত, গঙ্গাপ্রসাদ গুপ্ত, বোধানারা মিশ্র, গণপৎ রায় প্রভৃতিকে লইয়া পুলিশ প্রায় এক সহস্র লোক গ্রেপ্তার করে। ভাগলপুর হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া আমাদিগের কয়েকজনকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই দিনে পুলিশের কর্ম্মতৎপরতা যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় এবং পুলিশ যত্রতত্র লাঠি চালনা করিতে থাকে।

পরদিন প্রাতে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, হিন্দু জাগরণ আন্দোলনে নিবেদিত-প্রাণ ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কোলগাঁও ষ্টেশনে আটক করা হয় এবং তাঁহার সহযাত্রী মহাসভার অধিবেশনে যোগদানকামী শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, রায়বাহাদুর গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, মেজর পি. বর্দ্ধন প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই দিন সভাপতি বীর সাভারকারের অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপে শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ নারায়ণ সিং লাজপত রায় পার্কের সন্নিহিত এক রাস্তার মোড়ে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করেন এবং এই জনসমাবেশকে মহাসভার যথারীতি অধিবেশন বলিয়া ঘোষণা করেন। পুলিশ আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয় এবং শ্রীযুত সিংকে লইয়া ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে।

অপরাহ্নে আরও কয়েকটি স্থানে সভার অনুষ্ঠানের বৃথা চেষ্টা করা হয়। পূর্ব্বদিনের ন্যায় এইদিনেও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ শোভাযাত্রা করিয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং পুলিশ আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার জন্য লেখককেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং অজ্ঞাত কারণে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই দিবসে বিহার সরকার স্যর গোকুলচাঁদ নারাং, শ্রীযুত



হিন্দু-মহাসভার নেতা—শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অর্জ্জুন দেব, লছমীনারায়ণ শাস্ত্রী, রায় মহেন্দ্রনাথ, শ্রীযুত আর. এন. দেশপাণ্ডে, শ্রীযুত পট্টবর্দ্ধন, রায় বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না প্রভৃতি বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে।

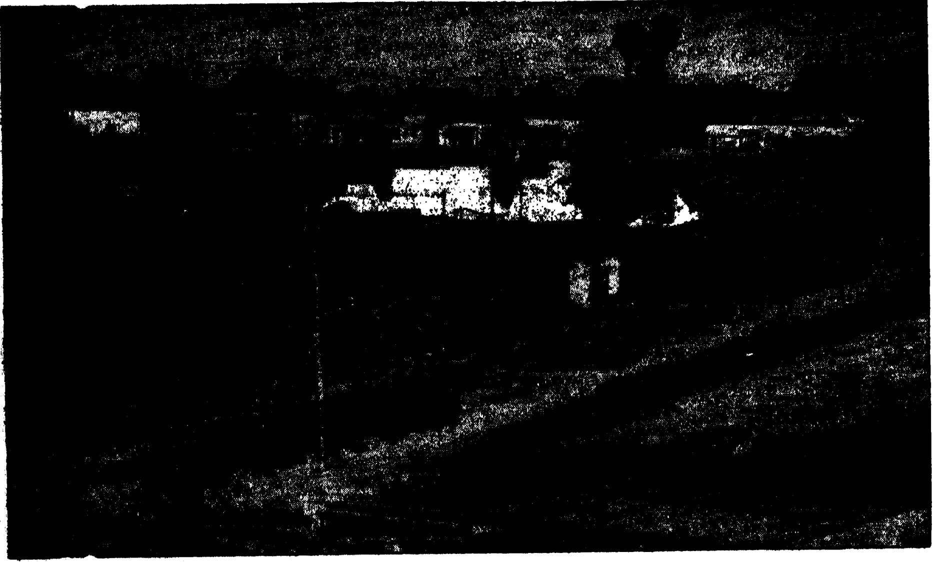
২৬শে ডিসেম্বর পুনরায় আইন অমান্য করিয়া মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ সভা ভঙ্গ করিয়া দেয় ও এই দিবসের অধিবেশনের নির্ব্বাচিত ডিক্টেটর শ্রীযুত লালনারায়ণ দত্তকে গ্রেপ্তার করে। সকালে কয়েকটি শোভাযাত্রা বাহির হইলে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার না করিয়া শোভাযাত্রাকারীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পূর্ব্ববর্ত্তী দিবসগুলি অপেক্ষা এই দিবসে পুলিশ লাজপত রায় পার্কের সম্মুখে অধিকতর ব্যাপক স্থান লইয়া পাহারা দেয়।

এইরূপে সরকারের শাসনদণ্ড ভোগ করিয়া হিন্দুমহাসভাপন্থীগণ ২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

সমাপনের পর প্রতিনিধিরা আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন উদ্দেশ্যে ভাগলপুর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল বহু মহাসভা-নেতা ও কর্ম্মী তখনও জেলে আটক রহিলেন।

ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র হিন্দু-মহাসভাই ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে উন্মুখ। ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়াও কেন যে বিহার সরকার আমলাতান্ত্রিক জিদের বশবর্ত্তী হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্বৈরাচারী করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, অথচ বৃটিশের সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগিতাকামী হিন্দু মহাসভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইল; বিহার সরকারের এরূপ হিন্দু মহাসভা-ভীতিই বা কেন?

কারণ—হিন্দু মহাসভার আপন ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া আপন সম্প্রদায়-ভুক্ত সকল সমাজের সহিত মিলিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। যে হিন্দুজাতি বহুকাল হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ভেদাভেদ লইয়া মত্ত ছিল, আজ সেই হিন্দুজাতি হিন্দু মহাসভাকে আশ্রয় করিয়া একত্রিত হইতে যাইতেছে। জাতির পর জাতি ধূমকেতুর ন্যায় উদিত



ভাগলপুর—লাজপৎ রায় পার্ক—এখানে হিন্দু-মহাসভা সম্মিলন হইয়াছিল

শাসন চালনায় বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন তাহা কে বলিতে পারে? অথচ বিরুদ্ধ সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়াও মহাসভা-সভাপতি মহাসভাপন্থী সকলের নিকট বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিতে আবেদন করিয়াছিলেন। সহযোগিতাকামী এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটীর বার্ষিক সম্মেলন অকারণে বন্ধ করিয়া দিয়া বিহার সরকার খুবই অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অধিবেশন হইয়া যে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়াছে, সেই হিন্দুজাতির আজ জাগিবার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। ক্রমাগত একটানা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া হিন্দুসমাজের জীবনস্রোত আজ আত্মবিকাশসাধনে উন্মুখ হইয়াছে। আপন বিকাশের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিলে মনে হয় 'তাহার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।' বস্তুত আজ যদি ত্রিশ কোটি হিন্দু একত্রিত হইয়া একযোগে অন্যায়ের প্রতিকারে অগ্রসর হয় তাহা হইলে এমন শক্তি নাই যে তাহাকে প্রতিহত করে।

আজ এলে তাই ধরার ধূলায়—

বন্দে আলী মিয়া

দূর্ নভতলে তুমি ছিলে যেন একটি স্বপনতারা
তব পানে মোর কামনা-কমল চেয়েছিলো ঘুমহারা,
এই ধরণীর আলো আর গান বেদনার আঁখি জল
জানি মিছে নয়—পরশে তাহার হবে তুমি চঞ্চল।
জানি একদিন টুটিবে স্বপন
নিঃশেষ হবে মধু আয়োজন
আজ এলে তাই ধরার ধূলায় আমার পাতার ঘরে
তোমার পরশে আমার ভুবন ক্ষণে ক্ষণে শিহরে।

ক্ষণে ক্ষণে আজ জাগে কম্পন শিহরায় তনু মন
তুমি পরায়েছ আমার চক্ষে কামনার অঞ্জন।
রাতের শিশির ধরা দেয় তাই কুসুমের মধুবুকে
মাধবী নিশায় ঘুমায় চকোর মনের গহন সুখে;
তুমি যেন রাণী একটি স্বপন
তোমারে যে হিয়া যাচে অনুখন
ধরা দাও মোরে হে নিরুপমা আমার বক্ষমাঝে
তোমা ঘেরি মোর কামনা-বাঁশরী শিঞ্জিনি যেন বাজে।

সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

প্রাচীন গুপ্তরাজগণের কালনির্ণয় ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের প্রধান অবলম্বন ঐ বংশের মুদ্রা ও লেখপ্রভৃতিতে ব্যবহৃত গুপ্তাব্দের তারিখসমূহ। গুপ্তসংবতের আদি বর্ষ নিরূপণ লইয়া ভারতীয় ইতিহাস চর্চ্চার প্রথম যুগে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। সে বিতর্কের আজিও সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ ভারতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত স্বীকার করেন, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান মনীষী মহাপ্রাজ্ঞ অল-বীরূণী তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে গুপ্তসংবতের আরম্ভ কাল সম্পর্কে অভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অল-বীরূণী বলিয়াছেন যে শকাব্দের ২৪১ বৎসর পরে গুপ্তাব্দের আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং শকাব্দ ২৪২ = গুপ্তাব্দ ১ = খ্রীষ্টাব্দ ৩২০-২১। (১) এই সূত্র হইতে গুপ্তরাজগণের লেখমালার সাহায্যে পণ্ডিতেরা গণিয়া স্থির করিয়াছেন, যে গুপ্তাব্দের প্রথম বর্ষ খ্রীষ্টীয় ৩২০ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইয়া ৩২১ সনের ১৩ই মার্চ্চ শেষ হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐতিহাসিকগণ এই ৩২০ খ্রীষ্টাব্দকে গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের বৎসর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এদিকে মুদ্রাদি হইতে জানা যায়, যে গুপ্তবংশের চতুর্থ নরপতি কুমারগুপ্তের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ৪১৪ অব্দে। সুতরাং ৩২০ হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের আরম্ভ ও শেষ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের আরম্ভ কোন কোন তারিখে হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা স্থিররূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সমস্যা সম্পর্কে আমি কিছু নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মথুরায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহার তারিখ গুপ্তাব্দের ৬১তম বৎসর। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ঐ লিপিখানি "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" পত্রের ২১শ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর ঐ লিপির ২য়-৪র্থ পংক্তিতে তারিখের অংশের নিম্নরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন:— "শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য বিজয়রাজ্য-সংবৎস[রে]......[গুপ্ত]-কালানুবর্ত্তমান-সংবৎসরে এক ষষ্ঠে ৬১"। এই স্থলে "গুপ্ত" শব্দটী তিনি শিলালিপিতে পড়িতে পারেন নাই; অনুমান করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। অধিকন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে উদ্ধৃত অংশের যে স্থানে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-সংবৎসর অর্থাৎ রাজত্বের প্রথমবর্ষ হইতে গণিত বর্ষাঙ্কের উল্লেখ ছিল, সে অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; উহা একেবারেই পড়িতে পারা যায় না। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর তাঁহার প্রবন্ধের সহিত যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হইতে দেখা যায় যে ঐ অংশের পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে, "রাজ্য-সংবৎস" এবং "কালানুবর্ত্তমান" এই দুই অংশের মধ্যে পাঁচটী অক্ষরের স্থান আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম অক্ষরটী অর্থাৎ "সংবৎস"-এর পরবর্ত্তী অক্ষরটী "রে", তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্থ অক্ষরটী একটী পরিষ্কার "মে"। তৃতীয় অক্ষরটী সামান্য একটু মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু উহাকে "চ" পড়িতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় অক্ষরটীকে প্রথম দৃষ্টিতে "স" মনে হয়; কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিলে বোঝা যায় যে উহা "প"; তবে অক্ষরটির দক্ষিণ দিকের নিম্নাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আবার এই অক্ষরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় পঞ্চম অক্ষরটী। ইহা দেখিতে অনেকটা "ছ"-র মত; কিন্তু ইহার নিম্নাংশ মুছিয়া গিয়াছে। লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জানেন, যে গুপ্তলিপিতে এই অক্ষরের মূল্য ৫। অতএব আমার বিবেচনায় মথুরালিপির পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের পাঠ:—"শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য বিজয়-রাজ্য-সংবৎসরে পংচমে ৫ কালানুবর্ত্তমান-সংবৎসরে একষষ্ঠে (= এক-ষষ্টিতমে) ৬১"। দেখা যাইতেছে, যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পঞ্চমবর্ষ = গুপ্তাব্দ ৬১ = খ্রীষ্টাব্দ ৩৮০-৮১। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ৩৭৬ অব্দে সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনলাভ পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সমুদ্রগুপ্ত কোন তারিখ হইতে খ্রীষ্টীয় ৩৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে অপর একটী সমস্যার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কিছুকাল পূর্ব্বে "দেবী-চন্দ্রগুপ্ত" নামক একখানি সংস্কৃত নাটকের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কাহিনী হইতে জানা যায়, যে সমুদ্র-গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামগুপ্ত পিতৃসিংহাসন লাভ করেন; কিছুকাল পরে রাম গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং ভ্রাতার মহিষী ধ্রুব দেবীর

(১) একসময়ে পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের সুবিস্তৃত অঞ্চলে গুপ্তসংবতের ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। আসামের রাজা হর্জ্জরবর্ম্মার তেজপুর লিপির তারিখ গুপ্তবর্ষ ৫১০। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ভূতিবর্ম্মার বড়গঙ্গা লিপি প্রকাশ করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪৮); এই লিপির তারিখ গুপ্তবর্ষ ২৪৪। ভট্টশালী মহাশয় তারিখটী ২৩৪ পাঠ করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় উহা ঠিক নহে; কারণ মধ্যের অঙ্কটী স্পষ্টতঃই একটী দন্ত্য-স আকারের ৪০; উহা ৩০ পড়া যাইতে পারে না। কর্ণাটের কদম্ববংশীয় রাজা কাকুস্থবর্ম্মার হালসী লিপির তারিখটীকেও আমরা অন্যত্র গুপ্তাব্দের তারিখরূপে গ্রহণ করিয়াছি। [এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধেয় ভট্টশালী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বড়গঙ্গা লিপির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে "যাজিন্" স্থলে "যাজিন [ঃ *]" পাঠ হইবে; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে "অশ্বমেধ-যাজিন্ শ্রীভূতিবর্ম্মা" কোনক্রমেই সম্ভব নহে। আবার তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে তিনি যাহা "মা বিষয়ামাত্য আর্য্যগুণস্য" পাঠ করিয়াছেন, উহা প্রকৃত পক্ষে "শ্রীবিষয়ামাত্য শর্ম্মগুণস্য" হইতে পারে। গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে গোবিন্দচন্দ্রের কুলকুড়ি লিপির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তিনি "তস্মিদিনকারীন্ ভট্টারকঃ" পাঠ করিয়াছেন এবং "দিনকারীন্" শব্দটীকে "দিনকারিন্" রূপে শুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে "দিনকারিন্ ভট্টারকঃ" নিতান্তই হাস্যকর। সূর্য্য অর্থে "দিনকারিন্" শিষ্ট প্রয়োগ নহে; উহাকে সুপ্রযোগ মানিলেও কথাটী "দিনকারি-ভট্টারকঃ" অথবা "দিনকারী ভট্টারকঃ" হইতে পারে কোন-ক্রমেই "দিনকারিন্ ভট্টারকঃ" সিদ্ধ হয় না। আবার তিনি "তস্মি" শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাও ব্যাকরণ এবং অভিধান বিরোধী। যাহা হউক প্রকৃত পক্ষে ঐ অংশের পাঠ "লস্মিদিন-কারীত-ভট্টার [কঃ *] (= লক্ষ্মীদীন-কারিত-ভট্টারকঃ)", অর্থাৎ লক্ষ্মীদীন নামক ব্যক্তির দ্বারা তৈরী করানো ভট্টারক (= সূর্য্য = সূর্য্যমূর্ত্তি)। এই নামটীর সহিত হিন্দুস্থানীদিগের "রামদীন" প্রভৃতি নাম তুলনীয়; তবে উহার শেষাংশের সহিত সংস্কৃত "দত্ত" = প্রাকৃত "দিন্ন" শব্দের সংস্রব থাকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত পাঠ সম্পর্কে এই লিপির "ন"-সমূহ এবং "সম্বৎ" ও "ফাল্গুন" শব্দের "ৎ" ও "ল" [লক্ষণীয়।]

পাণিগ্রহণ করেন। নবম শতাব্দী ও তাহার পরবর্ত্তী যুগের লিপি-প্রভৃতিতে এই রামগুপ্ত সম্পর্কিত কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (২) এই জন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক ঐ কাহিনীটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গুপ্তবংশের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে রামগুপ্তের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার উপযুক্ত প্রমাণাভাবে রামগুপ্তের কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, যে "মুদ্রারাক্ষস" প্রভৃতি তথাকথিত সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকে অনেক আজগুবি এবং অনৈতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়; সেজন্য নাটকাদি বা ঐ জাতীয় কোন গ্রন্থকে অন্য প্রমাণাভাবে ইতিহাসের অভ্রান্ত উপাদান মনে করা যায় না। এমন কি, "বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত" প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিতকথাতেও অনেক ভুল এবং ইতিহাস-বিরোধী বিবরণ স্থান পাইয়াছে। বিশেষতঃ গুপ্তবংশীয় রাজগণের বহুসংখ্যক লিপির কোনটীতেই রামগুপ্ত সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নাই। সুতরাং নির্ভর-যোগ্য প্রমাণাভাবে রামগুপ্ত কাহিনীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন নহে। পরবর্ত্তী কালের লিপিপ্রভৃতিতে রামগুপ্ত সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, উহা দেবী-চন্দ্রগুপ্ত নাটকের কাহিনীর উপর নির্ভরশীল বলা চলে; সুতরাং এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অধিক নহে। (৩) যাহা হউক আমি এই শেষোক্ত ঐতিহাসিকগণের মত সমর্থন করি। আমার বিবেচনায় সমসাময়িক লিপি বা মুদ্রা হইতে রামগুপ্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। (৪) শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর একবার মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে মুদ্রায় উল্লিখিত "কাচ" এবং রামগুপ্ত অভিন্ন; কিন্তু প্রমাণাভাবে কোন ঐতিহাসিকই তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের রাজ্যাবসান অনুমান করিতে আমি আপাততঃ কোনই অসুবিধা দেখিতেছি না।

কিন্তু কোন তারিখে সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন? ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ ৩৩০ কিংবা ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ গণনা করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে নালন্দা ও গয়াতে সমুদ্রগুপ্তের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাদের তারিখ যথাক্রমে গুপ্তাব্দের পঞ্চম এবং নবম বর্ষ। অবশ্য এই দলিল দুইখানি জাল; সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই লিপিদুইখানি জাল করা হইয়াছিল। কিন্তু গয়া লিপির সহিত যে শীলমোহরটী সংযুক্ত আছে, উহাকে কৃত্রিম মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনুমান করা যাইতে পারে, যে সমুদ্রগুপ্তের দুইখানি আসল দলিল নষ্ট হইয়া গেলে উহাদের অধিকারিগণ প্রদত্ত ভূমিতে নিজেদের অধিকার অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত দলিল দুইখানি জাল করাইয়াছিলেন। আসল দলিলের শীলমোহর পরে জাল গয়াশাসনে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সমুদ্রগুপ্তের ২০০।২৫০ বৎসর পরে যাহারা দলিল জাল করাইয়াছিল, তাহাদের বিশ্বাস ছিল, যে এই গুপ্ত নরপতি গুপ্ত-সংবতের পঞ্চমবর্ষের পূর্ব্বে সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। ইহাও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে যে-দুইখানি তাম্রশাসন নষ্ট হওয়ায় ঐ দুইখানি জাল শাসন লিখিত হইয়াছিল, সেই আসল দলিলের তারিখও গুপ্তাব্দের পঞ্চম এবং নবম বৎসর ছিল। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে সম্ভবতঃ এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রথমবর্ষ হইতেই গুপ্ত সংবতের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হইতে নহে। সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এইরূপ অনুমান একেবারে অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে স্বীকার্য্য এই যে ইহাতে সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত—এই তিন পুরুষের রাজত্বকাল কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কুমার গুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনপুরুষের রাজত্ব দাঁড়ায় ১৩৫ বৎসর। ইতিহাসে সাধারণতঃ তিনপুরুষের এত দীর্ঘকালের রাজত্ব দেখা যায় না। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, যে ঐতিহাসিকগণ এই তিনজন গুপ্ত-বংশীয় নরপতির রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য ১২০ বা ১২৫ বৎসর একরূপ স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন; উহা ১৩৫ বৎসর হইতে খুব বেশী কম নহে।

(২) হর্ষচরিতে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা রামগুপ্ত-কাহিনীর সহিত অভিন্ন নহে।

(৩) "দেবী-চন্দ্রগুপ্ত" রচয়িতা বিশাখ দত্তের আবির্ভাবকাল অজ্ঞাত। Jacobi এবং Kieth নবম শতাব্দীতে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে চাহেন (Kieth, Sanskrit Drama, p. 204)। আমারও মনে হয়, বিশাখ দত্ত বাণভট্ট এবং মাঘের পরবর্ত্তী; তবে তিনি অষ্টম শতাব্দীর লোকও হইতে পারেন। ষ্টেনকোনো তাঁহাকে পঞ্চম শতাব্দীতে স্থান দিয়াছেন; কিন্তু তাহা সম্ভব মনে হয় না।

(৪) "ঐতিহাসিক" নাটক হইতে কিরূপে ইতিহাস বিকৃত হইয়া উঠে, বাংলা দেশে তাহার একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। স্কুলসমূহের পাঠ্য অনেক ইতিহাস গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সহিত গ্রীকরাজ সেলিউকসের কন্যা হেলেনের বিবাহের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিগণের উত্তর-পত্রেও বহুবার হেলেনের উল্লেখ দেখিয়াছি। কিন্তু এই হেলেন ঐতিহাসিক চরিত্র নহে; সুপ্রসিদ্ধ "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের রচয়িতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কবিকল্পনা হইতেই উহার উৎপত্তি।

সূর্য্যস্তুতি

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বন্দি তোমারে তমসা-তরণ হে তপন তাপময়!
নিবিড় আঁধার করি' বিদীর্ণ, অমল কিরণ করি' বিকীর্ণ,
অপার নিরাশা সমান আকাশে আশা-আনন্দময়!
দিকে দিকে দিকে জাগিল জীবন, দৃপ্ত মুখর প্রাণ।
মানব জাগিল শঙ্কা-মলিন, পশুকুল জাগে নিদ্রাবিলীন,
নয়নে ভাতিল বনপ্রান্তর পর্ব্বত মহীয়ান।
আলোক আলোক শুভ্র আলোক শুচি আর প্রাণময়।
ক্লিন্ন মলিন সবি স'রে যায়, শীর্ণ অবশ উৎসাহ পায়,
জড় আলস্য, তন্দ্রা পালায়, শৈত্যের পরাজয়।
নম নম তেজ, নমি নম প্রাণ, নম তাপ প্রাণমূল।
শিরায় শোণিতে অগ্নি উছল, মনের গহনে শিখাচঞ্চল,
নয়ন দীপ্ত, হস্ত ব্যস্ত, চরণ গতি-ব্যাকুল।
ওগো আদি তাপ সলিলের মাঝে, প্রথম প্রাণের প্রাণ!
তুমি জাগাইলে জীবের জগৎ, তব কৃপা লভে ক্ষুদ্র, বৃহৎ,
তৃণে ও মানবে করিছ সবল, অপার শক্তিমান।
জয় জয় ওগো ব্যোম অধিরাজ, বিশ্ববিজয়ী জয়,
তোমার প্রতাপে দগ্ধ আকাশ, তব তাপে ধরা ছাড়ে নিঃশ্বাস,
চন্দ্রতারকা ভয়ে স'রে যায়, রাত্রির ঘটে লয়।
জয় জয় ওগো ব্যোম-অধিরাজ, বিশ্ববিজয়ী জয়।
বন্দী তোমারে তমসা-তারণ, হে তপন তাপময়।

জয়লব্ধ

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

ইন্দিরার প্রাসাদ। বিশাখা, আত্রেয়ী ও গায়ত্রী গল্প করছেন

আত্রেয়ী। সখির মেজাজটা আজকাল যেন সব সময়েই গরম। অথচ আগে তার কি মধুর স্বভাব ছিল।

গায়ত্রী। আনমনা। কতদিন দেখেছি কাজ করতে করতে চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে। ডাকলে চমক ভেঙ্গে লজ্জিত হয়েছে। পুজোর কাজে পর্য্যন্ত আজকাল ভুল করছে।

বিশাখা। প্রদ্যুম্নর সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পর থেকেই এই মনোভাব।

আত্রেয়ী। তবে কি সখির কঠোর মনে দাগ পড়েছে—

গায়ত্রী। ভগবানের চরণে যে মন নিবদ্ধ করে রেখেছিল, তা কি আজ প্রদ্যুম্নর পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

বিশাখা। তাইত মনে হয়। সব সময়েই যেন কি ভাবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস, চোখের জল কত সময় আমি দেখে ফেলেছি। ও কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছে, কখনও রেগে উঠেছে। ভোলবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। যখন অবসাদ আসে, তখন ভেঙ্গে পড়ে। ঐ সখি আসছে—

ইন্দিরার প্রবেশ

ইন্দিরা। তোরা এখানে? আমি তোদের উদ্যানে খোঁজ করছিলুম—

বিশাখা। কেন, তুমিই ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে বললে।

ইন্দিরা। (বসে) আজ যেন ভয়ানক গরম পড়েছে মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী। পাখা এনে হাওয়া করব?

ইন্দিরা। না, তার চেয়ে বিশাখা একটা গান গা।

বিশাখা। যথা অভিরুচি।

(গান)

বাঁশরী বাজে মনের মাঝে ব্যাকুল সাঁঝে তিমিরতলে।
ফিরালে যারে বিরহ ভারে ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥
তোমার তরে বরণডালা,
যতনে গাঁথা বকুল মালা,
নিলে না তুলে কোন্ সে ভুলে দলিলে মন চরণতলে॥
আজকে মিছে চাইছ পিছে ফোটে না ফুল শুকনো ডালে।
সেদিন সে যে গিছল কেঁদে কওনি কথা বিদায়কালে॥
ছিন্ন হলে বীণার তারে,
সুর যে আর ওঠে না রে,
নিভান আলো সকল কালো ভাসতে হবে নয়নজলে॥

ইন্দিরা। (নিজ মনে) যে যায় সে কি আর ফেরে। (হঠাৎ চমকে উঠে) না, না। হ্যাঁরে তোদের না রাধাশ্যামের জন্যে কাপড় জামা তৈরী করতে বলেছিলুম। তোরা আজকাল বড় ফাঁকি দিচ্ছিস।

গায়ত্রী। আর সামান্য বাকী আছে। দু-একদিন লাগবে।

বিশাখা। সেলাই, মালাগাঁথা, নৈবেদ্য-সাজান—এসব কার তরে? কেন? একাজের মধ্যে কতটুকু পুণ্যফল আমরা পাই? অন্তর্যামী তো শুধু আমাদের কাজ দেখে বিচার করবেন না, দেখবেন আমাদের মন। সেখানে কাজের বেগার ছাড়া আর তো কোন ভাবই নেই। সখি, এভাবে নিজেকে ঠকিয়ে কি লাভ?

ইন্দিরা। কি বলছিস্ তুই?

বিশাখা। এ বয়সে যতই বৈরাগ্য ভাব প্রকাশ করা যাক্ না কেন, মনের অন্তরতম দেশে প্রেম ভালবাসার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে। তাকে মিথ্যে বলে উপহাস করা চলবে না।

ইন্দিরা। ছিঃ ছিঃ, তোরা মনকে পবিত্র করতে পারলি না।

বিশাখা। না সখি, তোমার মন রাখবার জন্য নির্জ্জলা মিথ্যাকথা বলতে পারলুম না। (জানালা দিয়ে বাইরে দেখিয়ে) ঐ দেখ, ধরণীতে নেমেছে বসন্ত। নবকিশলয় কি মনোরম সাজে গাছকে সজ্জিত করেছে। ফোটা ফুলের চারিধারে অলিরা গুঞ্জন করছে। দখিন মলয় সমীরণে পাখীরা আনন্দে গান গাইছে। এ বসন্ত এ যৌবন যেন আহ্বান করে জীবদের বলছে—"ওরে, এ শুধু দু'দিনের বই ত নয়।" এ কি প্রকৃতির বিধাতার অভিপ্রেত নয়, আদেশ নয়? শুধু কি শীতের শীতল উত্তাপহীন মৃতপ্রায় জীবনই একমাত্র সার বস্তু। ধর্ম্মচিন্তা, উপাসনা, সন্ন্যাস সব ভালো? কিন্তু যেখানে প্রাণে পূর্ণ মাত্রা ভোগের লালসা রয়েছে সেখানে মৌখিক সংযম, লোক-দেখানো সন্ন্যাসের কোন মূল্য নাই। আমি অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির মানুষ। সহজ কথা যা আমার মনে জাগে, স্পষ্ট ভাষায় তাই তোমায় জানালুম।

ইন্দিরা। চুপ কর, বিশাখা চুপ কর। (নেপথ্যে গীত ধ্বনি)

আত্রেয়ী। কে গায়? চমৎকার গলা তো?

গায়ত্রী। তাকে ডেকে আনব?

ইন্দিরা। না। কোন অচেনা লোককে প্রাসাদে আনবেনা।

(সকলে স্তব্ধ হয়ে গান শুনতে লাগল)

কাজল আঁখিতে বাদল নেমেছে আঁধারে ঘিরেছে ধরণী।
কাল বৈশাখীর তুফানের মাঝে অকূলে হারাল তরণী॥
সোনার স্বপন ভেঙ্গে গেছে হায়,
দেবতা ভাবিয়া পুজেছিনু যায়,
হৃদয়বিহীন পুতুল কেবল জীবন চিতার অরণি।
ভেঙ্গে গেছে ভুল, শুকায়েছে ফুল এল না তো বিস্মরণী॥
বিরহ-মিলন জীবন-মরণ জানি সব জানি মিছে গো।
ছিঁড়িয়া শিকল যেতে চাই আগে মন পড়ে রয় পিছে গো॥
বালির উপরে বেঁধে মোর ঘর,
চেয়েছিনু তারে করিতে অমর,
সকলি বিফলে জোয়ারের জলে দিয়াছে ভাসায়ে আরণী।
আশা ভালবাসা গেছে চুকে সব গৃহহীনা আমি ঘরণী॥

ইন্দিরা। (আপন মনে) অপূর্ব্ব সঙ্গীত। বেদনায় ভরা গান যেন মনের আকুলতা—(কঠোর স্বরে) বিশাখা, যে এই গান গাইছে তাকে অবিলম্বে এইখানে নিয়ে এস। আমার প্রাসাদ তলে এই বিরহপূর্ণ গান—ছিঃ ছিঃ লোকে কি মনে করবে! যাও! (বিশাখার প্রস্থান)

আত্রেয়ী। হয় ত' কোন বৈরাগী পথ দিয়ে গেয়ে যাচ্ছে।

ইন্দিরা। ঐ দেখ, আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। (জানলা দিয়ে দেখালেন) পথ দিয়ে আপন মনে গেয়ে চলে গেলে সমস্ত গানটা আমরা শুনতে পেতুম না। (একজন সন্ন্যাসী সহ বিশাখার প্রবেশ)

ইন্দিরা। কে তুমি? কি চাও?

সন্ন্যাসী। (শুষ্ক শ্মশ্রু অপসারণ করে) আমি গজেন্দ্র।

বিশাখা। গজেন্দ্র!

গজেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্দিরা। ও! তুমি! কি কারণে এই ছদ্মবেশে বৈরাগী সেজে আমার প্রাসাদের বাতায়ন তলে গান গাইছিলে জানতে পারি কি?

গজেন্দ্র। ভিক্ষার আশায়।

ইন্দিরা। ভিক্ষা! তোমার বন্ধু কি তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন?

না, তা'র আর খেতে দেবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমার কাছে আসার কারণ কি?

গজেন্দ্র। আমার বন্ধু সেনাপতি প্রদ্যুম্ন আজ কারারুদ্ধ।

ইন্দিরা। সেনাপতি বন্দী! কারণ?

গজেন্দ্র। এবারকার যুদ্ধে তিনি সেনাপতিত্ব করেন নি। এখান থেকে গিয়ে অবধি তিনি একটী কথাও মুখ থেকে বার করেন নি। একেবারে মূক হয়ে রয়েছেন। চিকিৎসকদের মত যে, এ ব্যাধি নয়, তিনি ইচ্ছা করে মূক সেজেছেন। মহারাজ তাঁকে কাপুরুষ বলে অপমান ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। তাতেও সে বীর কথা ক'ন নি। অথচ তিনি ত অপমান সহ্য করবার লোক ন'ন। এ যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি বটে কিন্তু সে রণনৈপুণ্য আমরা দেখাতে পারি নি। ফলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। মহারাজ কালকেতু তাই আদেশ করেছেন—"হয় এক মাসের মধ্যে যুদ্ধে না যাওয়ার সন্তোষজনক কারণ দেখাও, নচেৎ এক মাস পরে প্রাণদণ্ড হবে।" সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এসেছি।

ইন্দিরা। (বিচলিত স্বরে) আমি কি করতে পারি?

গজেন্দ্র। এখানে আসার আগে তিনি দিব্য সহজ মানুষের মত কথা কয়েছেন—

ইন্দিরা। এবং এখন তিনি মূক হয়ে গেছেন। তা আমার দোষ—

গজেন্দ্র। দেবী, আমি তো তা বলি নি। আপনার প্রাণে যদি বিন্দু-মাত্র দয়া থাকত—কিন্তু না, সে কথা বলা বৃথা।

ইন্দিরা। আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়া থাকলে কি করা উচিত হ'ত?

গজেন্দ্র। গিয়ে তাঁকে মৌনভাব ত্যাগ করতে অনুরোধ করা।

গায়ত্রী। সখি, সেখানে যাবেই বা কি করে?

ইন্দিরা। আমি অনুরোধ করতেই বা যাব কেন? আর সে অনুরোধের মূল্যই বা কি?

গজেন্দ্র। এই কি আপনার প্রাণের কথা!

ইন্দিরা। তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

গজেন্দ্র। বন্ধুর দুঃখ না দেখতে পেরে আমি নিজেই এসেছি।

ইন্দিরা। আর কিছু বলবার না থাকে, তো এইবার যেতে পার।

গজেন্দ্র। যাচ্ছি, কিন্তু এ নিষ্ঠুরতার পরিণাম— [প্রস্থান

ইন্দিরা। এরা কেন বার বার আমাকে জ্বালাতন করতে আসে।

গলাটা ধরে উঠল

নেপথ্যে। মা, ইন্দিরা—

ইন্দিরা। ঐ বাবা আসছেন। (শ্রেষ্ঠী ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি। আজ সকাল থেকে তোমায় দেখতে পাইনি কেন মা?

ইন্দিরা। একটু বেলা অবধি শুয়েছিলুন বাবা। রাতে ঘুম হয় নি।

ধনপতি। কেন মা? তোমার শরীর খারাপ হয় নি তো?

ইন্দিরা। না বাবা।

বিশাখা। সখির শরীর আজকাল খুবই খারাপ যাচ্ছে।

আত্রেয়ী। প্রায়ই ভোরে উঠতে পারে না, অথচ আগে আমাদের সকলের আগে উঠত'।

গায়ত্রী। এমন কি এক আধ দিন মন্দিরে আরতি পর্য্যন্ত করতে যেতে পারে না।

ধনপতি। তাই তো মা, ভয়ানক ভাবিয়ে তুললে। তোমার এত শরীর খারাপ অথচ আমি পাঁচ কাজে ব্যস্ত থেকে কোন খবরই নিতে পারি না। আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতেন তা হ'লে কি—

ইন্দিরা। না বাবা, সত্যিই আমি ভাল আছি। সখিরা স্নেহবশত তিলকে তাল করে তুলেছে। তুমি কি যেন বলতে এসেছিলে?

ধনপতি। হ্যাঁ। বলতে এসে আসল কথাটা ভুলেই গিছলুম। একটু আগে মহারাজ কালকেতুর কাছ থেকে একজন দূত এসেছিল নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে। মহারাজ লিখেছেন যে দাক্ষিণাত্যের সমরে তিনি জয়লাভ করেছেন। সেই বিজয়-উৎসবে তিনি আমার উপস্থিতি চান।

ইন্দিরা। মহারাজা কালকেতু! তিনিই কি প্রসন্নগড়ের রাজা?

ধনপতি। হ্যাঁ মা। যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রয়োজন হ'লে তিনি আমার কাছ থেকে টাকা ধার নেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। আমায় বিলক্ষণ খাতির করেন। আমি যাব কথা দিয়েছি।

ইন্দিরা। আমিও যাব বাবা—

ধনপতি। কিন্তু প্রসন্নগড় যে এখান থেকে অনেক দূর মা।

ইন্দিরা। তা হোক, আমি যাব।

ধনপতি। তুমি ছেলেমানুষ। পথকষ্ট কি সহ্য করতে পারবে?

ইন্দিরা। আমার কোন কষ্ট হবে না। হ'লেও সহ্য করতে পারব।

ধনপতি। একে তোমার শরীর খারাপ—

ইন্দিরা। বায়ুপরিবর্ত্তনে শরীর সারবে। নতুন জায়গায় মনটাও ভাল থাকবে।

ধনপতি। তা বটে—

ইন্দিরা। চুপ করে থেক' না বাবা। বল, নিয়ে যাবে?

ধনপতি। তুমি যখন জেদ ধরেছ মা, তখন কি আর ছাড়বে, না আমিই তোমায় ক্ষুণ্ণ করতে পারব। বেশ, তুমিও চল। কালই যাত্রা করব। ব্যবস্থা করে ফেল। সঙ্গে এদের একজনকে নিও। বিদেশ যাত্রা, একলা তোমার অসুবিধা হতে পারে। আচ্ছা মা, আমি এখন চলি, আরও অনেক কাজকর্ম্ম আছে। কাল যাত্রা করতে হলে আজই সব শেষ করে ফেলা উচিত। [ধনপতির প্রস্থান

আত্রেয়ী। কালই তোমার যাওয়া স্থির?

ইন্দিরা। বাবা যখন কথা দিয়েছেন তখন যেতেই হবে।

গায়ত্রী। তোমার নিজের কি যাবার কোন রকম ইচ্ছা নেই?

ইন্দিরা। আমার হঠাৎ রাজসাক্ষাতের ইচ্ছা কেন হতে যাবে?

বিশাখা। রাজসাক্ষাতে গেলে তাঁর সেনাপতিরও সাক্ষাৎ মিলতে পারে।

ইন্দিরা। তাতে আমার লাভ?

বিশাখা। তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর।

ইন্দিরা। যা, যা, অসভ্যতা করিস নি। চল, কি কি নিয়ে যাব তোরা গুছিয়ে দিবি চল্। [সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রসন্নগড়ের রাজপ্রাসাদ। নাচঘর। একধার দিয়ে একটা সিঁড়ি দোতালায় উঠে গেছে। রাজবিদূষক কৃষ্ণচন্দ্র ও কঞ্চুকী কথা কইছে

কঞ্চুকী। (একটা জানলা খুলতে খুলতে) কখনও তো তোমাকে কোন কাজ করতে দেখলুম না। শুধু খাচ্ছ আর ঝিমোচ্ছ।

কৃষ্ণচন্দ্র। লীলাখেলা দ্বাপরে দেখিয়েছি, এখন বিশ্রাম নিচ্ছি।

কঞ্চুকী। সোজা কথা তোমায় আমি কখনও কইতে শুনিনি। সব সময়েই হেঁয়ালী অথবা অর্থহীন কথা।

কৃষ্ণচন্দ্র। এই বাঁকা কথা শোনবার জন্যই ত মহারাজ পয়সা দিয়ে আমাকে রাজদরবারে সাদরে গ্রহণ করেছেন। সেনাপতি, মন্ত্রী সব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর বয়স্য দিব্য আরামে বসে বসে ঢোলে।

খাতাহাতে রাজকবি রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। আসতে পারি?

কৃষ্ণচন্দ্র। নিশ্চয়ই পারেন। আপত্তি করবার এখানে কে আছে?

কঞ্চুকী। বড্ড বাজে বক বাপু।

কৃষ্ণচন্দ্র। এই বকুনি থেমে গেলেই চাকরি যাবে। প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট করে বাড়ীথেকে বকুনি শিখে এসে এখানে আওড়াতুম। এখন এটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। লোকে যে আমাকে বোকা, নিরেট, গাধা ইত্যাদি নামে সম্ভাষণ করে, সামনে না হ'লেও আড়ালে, তা বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। কিন্তু হে রাজকবি রঞ্জন, আমরা দু'জনেই চাকর। আমি একটা বয়স্য, বিদূষক, ভাঁড়, আর তুমি রাজার কবি—বিদ্বান, বুদ্ধিমান। সত্যি বল ত' কার চাকরি ভাল। আমায় ডাকতে পাঠিয়ে

রাজা পথ চেয়ে অপেক্ষা করেন কখন আমি আসব। আর তোমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজ-দর্শনাভিলাষে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কোন রাজ-কার্য্যে, উৎসবে অথবা বিশ্রামে আমি ছাড়া রাজার চলে না। আর তোমাকে বছরে একদিন কি দু'দিন দু-একটা কবিতা শোনাবার জন্যে ডাকেন। খাওয়া, দাওয়া, স্ফূর্ত্তি, আমোদ সবেতেই আমি পার্শ্বচর—

কঞ্চুকী। বিদ্বান বা মানীরা পার্শ্বচর হওয়ার জন্যে লালায়িত নন।

কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু রাজপ্রসাদ লাভের জন্য সকলেই ব্যগ্র। উদ্দেশ্য এক, পথ বিভিন্ন। শুধু মানের ছালা নিয়ে পেট ভরে না।

রঞ্জন। মহারাজ কোথায়?

কৃষ্ণচন্দ্র। মন্দিরে। মহারাণী বাঙলার মেয়ে। কথায় কথায় ওঁদের দেশে ভক্তিস্রোত বয়ে যায়। তাই তাঁর মনোরঞ্জনার্থ মহারাজ রোজ সন্ধ্যায় একবার করে মন্দিরে যান। সেখানে গিয়ে চোখ বুজে ধ্যান করেন, না ঘুমোন—বলা শক্ত।

কঞ্চুকী। নাস্তিকতার জন্যে তোমার জিভ কেটে নেওয়া উচিত।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমরা বললে তাই হ'ত বটে, কিন্তু আমি বিদূষক, বোকা, সুতরাং আমার সাতখুন মাফ।

রঞ্জন। সত্য কথা বলেছ কৃষ্ণচন্দ্র। রহস্যের আড়ালে রূঢ় সত্য এবং নীতি কথা তোমরাই শেখাতে পার। বিদূষক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভুল। তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান।

কৃষ্ণচন্দ্র। ঐসব বলে চাকরীটি খেয়ে দিওনা বাবা। মহারাজ হেসে বলেন, "কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার এজীবনে আর বুদ্ধি হবে না।" তুমি গিয়ে বল যে আমি বুদ্ধিমান—ব্যস্।

রঞ্জন। আচ্ছা কৃষ্ণচন্দ্র, সংসারে সব চেয়ে ভাল কাজ কি?

কৃষ্ণচন্দ্র। মরে যাওয়া। তা হ'লে এই খোশামোদ, রাজরোষ, ভয়, পেটের চিন্তা, গৃহিণীর কটু ভাব, সব থেকে নিষ্কৃতি মেলে।

রঞ্জন। একেবারে খাঁটি কথা।

কঞ্চুকী। তোমাদের কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝি না। সাধারণের সঙ্গে মেলে না। তোমরা হয় খুব বোকা, না হয় খুব বুদ্ধিমান। (প্রস্থান)

রঞ্জন। যুদ্ধের খবর কি?

কৃষ্ণচন্দ্র। কিছু খবরই রাখ না। যুদ্ধজয় তো বহুদিন হয়ে গেছে।

রঞ্জন। আমি একটা কাব্য রচনায় এত ব্যস্ত ছিলুম যে কোন খবরই রাখতে পারিনি।

কৃষ্ণচন্দ্র। হাতে বুঝি তোমার কাব্য?

রঞ্জন! হ্যাঁ, মহারাজকে শোনাতে এসেছি।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি। দোতালা থেকে রাজা ও রাণী নামছেন)

কৃষ্ণচন্দ্র। মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (হেসে) কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার বুদ্ধি কোন দিন হবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে না।

রাজা। কতদিন না বলেছি, আমরা উভয়ে একসঙ্গে এলে মহারাণীর জয় হোক বলবে। নারীর সম্মান—

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে মহারাজের জয়েই তো মহারাণীর জয়।

রাণী। (হেসে) কৃষ্ণচন্দ্র বোকা হ'লে কি হবে, বুদ্ধি আছে।

(রাজা ও রাণী উভয়ের উচ্চ হাস্য)

কৃষ্ণচন্দ্র। আপনাদের দয়ায় আমি তো ঠিক বোকা নই!

রাজা। না, ঠিক নয় তবে বেঠিক। (আবার হাস্য)

(রঞ্জনকে দেখে) কে? কবি না? কি সমাচার বল।

রঞ্জন। আপনি ন্যায় এবং দর্শন মীমাংসা নিয়ে যে কাব্য লিখতে বলেছিলেন তা লিখে এনেছি।

রাজা। না, না, আজ ওসব থাক। বড় নীরস। তার চেয়ে কবি একটা আদিরসের কিছু লেখ না।

রঞ্জন। চেষ্টা করব।

কৃষ্ণচন্দ্র। একটা বেশ কাঁচা-উঁচু গলায় আপনার কাব্য আনবেন।

রাজা। কি কৃষ্ণচন্দ্র, হঠাৎ একথা কেন?

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে, যাতে রস না গড়িয়ে পড়ে যায়—

(রাজা ও রাণীর হাস্য)

রঞ্জন। আমি তবে এখন যাই মহারাজ?

রাজা। আচ্ছা এস, শীগ্‌গিরই আদিরসের একটা কাব্য লিখে এনো।

রঞ্জন। মহারাজের জয় হোক। (অভিবাদন করে প্রস্থান)

রাজা। কবি আমাদের ভারী ভালমানুষ।

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে, ভালমানুষের আর এক নাম হ'ল বোকা।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদন করে) মহারাজ, জয়ন্তীপুর থেকে শ্রেষ্ঠী ধনপতি ও তাঁর কন্যা এসেছেন

রাজা। সসম্মানে তাঁদের এখানে নিয়ে এস।

(অভিবাদনান্তে দূতের প্রস্থান)

রাণী। শ্রেষ্ঠী ধনপতি! কই, আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

রাজা। রাজকার্য্যে অনেক সময় ওঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছি, তাই আমার এই বিজয়োৎসবে ওঁকে নিমন্ত্রণ। কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি যাও। নাচ গানের সব—

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে, সব প্রস্তুত। এখুনি তাঁদের নিয়ে আসছি। [প্রস্থান

(শ্রেষ্ঠী ধনপতি ও ইন্দিরার প্রবেশ ও অভিবাদন)

ধনপতি। মহারাজ ও মহারাণীর জয় হোক।

রাজা। আসুন, আসুন। আমার সৌভাগ্য, আপনারা এসেছেন।

ধনপতি। মহারাজের নিমন্ত্রণ, অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

রাজা। বসুন।

ধনপতি। এটি আমার একমাত্র সন্তান, নাম ইন্দিরা।

রাণী। ইন্দিরা, এস আমার কাছে বস।

(ধনপতি ও ইন্দিরা আসন গ্রহণ করলেন)

রাজা। তারপর, পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

ধনপতি। আজ্ঞে না।

রাণী। তুমি এই প্রথম এদিকে এলে বুঝি?

ইন্দিরা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাণী। সঙ্গে আর কেউ এসেছে?

ইন্দিরা। আমার একজন সখি। বাইরে অপেক্ষা করছে।

রাণী। পথশ্রান্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! দৌবারিক—

(দৌবারিকের প্রবেশ ও অভিবাদন)

তোমার সখির নাম কি ইন্দিরা?

ইন্দিরা। বিশাখা।

রাণী। বিশাখা নাম্নী এঁর সখি বাইরে আছেন, অবিলম্বে তাঁকে এঁদের জন্যে নির্দিষ্ট অতিথিভবনে নিয়ে যাও।

(অভিবাদনান্তে দৌবারিকের প্রস্থান)

(ইন্দিরাকে) তোমার এখানে কোন অসুবিধা হলে জানাতে কুণ্ঠিত হোয়ো না। তুমি আমার অতিথি।

(কৃষ্ণচন্দ্র সহ নর্ত্তকীদের প্রবেশ)

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমাদের তূণে সব চেয়ে তীক্ষ্ণ যা অস্ত্র আছে তার পরিচয় চাই। মধুর সঙ্গত, লীলায়িত ভঙ্গিমা, অধরের হাসি, নয়নের বিদ্যুৎ—

রাজা। কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি কি আজকাল কবিতা লিখছ?

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে না। কিন্তু মনটা যেন কি রকম কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নাও, এবার তোমরা আরম্ভ কর। একটা বর্ষার গান ধর। কি বলেন মহারাজ?

রাজা। বেশ তো। এসব ভার তো সম্পূর্ণরূপে তোমার ওপরই ছেড়ে দেওয়া আছে। শ্রেষ্ঠী কি বলেন?

ধনপতি। নিশ্চয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। নাও, আর দেরী কোরো না।

নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত

চটুল চরণে নূপুর বাজায়ে নাচিছে বরষা রাণি।
ঝড়ের হাওয়ায় খুলিয়া যেতেছে মেঘের ঘোমটাখানি॥
পরিয়া নয়নে কাজল,
উড়ায়ে সুনীল আঁচল,
রিণি ঝিনি সুরে ধরার বুকেতে ছন্দ দিতেছে আনি॥
গুরুগম্ভীর ডমরু বাজিছে বাতাস গাহিছে গান।
সবুজ বসনে সাজিয়া বনানী হরষিছে মন প্রাণ॥
রৌদ্র মেঘের ছায়া,
সৃজন করিছে মায়া,
দগ্ধ হৃদয়া ধরণীর তরে এনেছে আশার বাণী॥

রাজা। অপূর্ব্ব! ধনপতি কি বলেন?

ধনপতি। চমৎকার। বহুদিন এরূপ উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীত উপভোগের সৌভাগ্য হয় নি।

রাজা। কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার প্রশংসা করতে হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। আজ্ঞে, আপনার প্রশংসার জোরেই তো এখনও টি'কে আছি, নইলে আর পাঁচজনের হিংসায় এতদিনে কুপোকাৎ হয়ে যেতুম।

রাজা। (হেসে) তোমার মুখে সময় উপযোগী রসিকতা লেগেই আছে (নর্ত্তকীদের প্রতি) তোমরা এবার যেতে পার।

কৃষ্ণচন্দ্র। (হাত জোড় করে) মহারাজ, আজ্ঞা দেন তো আমিও যাই। এখন সময় উপযোগী কিছু রস সঞ্চয় করতে হবে। তৃষ্ণাও লেগেছে, খিদেও পেয়েছে।

রাজা। (হেসে) বেশ, যাও। [কৃষ্ণচন্দ্র ও নর্ত্তকীদের প্রস্থান

মহারাণী। তুমি আর ইন্দিরা গল্প কর। আমি শ্রেষ্ঠীকে নিয়ে কতকগুলি আবশ্যকীয় রাজকার্য্য সেরে ফেলি।

রাণী। হয় ত পথকষ্টে উনি শ্রান্ত—

ধনপতি। না মহারাণী, আমি মোটেই শ্রান্ত নই। মহারাজের কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। [মহারাজ ও ধনপতির প্রস্থান

রাণী। আজকে তুমি বিশ্রাম কর। কাল রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাবার বন্দোবস্ত করব। তোমার ভালই লাগবে।

ইন্দিরা। স্বয়ং মহারাণীর সান্নিধ্য লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে। আপনার আশ্রয়ে যে ক'টা দিন থাকতে পাব, তা জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরবের হবে। সেই দিনগুলি আমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(বেগে গজেন্দ্রর প্রবেশ)

গজেন্দ্র। মহারাণী, প্রদ্যুম্নকিশোর অনশন ব্রত আরম্ভ করেছেন। আজ তিন দিন তিনি অনাহারে রয়েছেন। আপনি তাঁকে রক্ষা করুন।

(ভাবের আবেগে গজেন্দ্র এতক্ষণ ইন্দিরাকে লক্ষ্য করেন নি।
এইবার উভয় উভয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন)

গজেন্দ্র। আপনি!

ইন্দিরা। হ্যাঁ আমি। এসেছি।

রাণী। এ কি! ইন্দিরা, তুমি গজেন্দ্রকে চেন নাকি?

ইন্দিরা। হ্যাঁ। দু'বার এর পূর্ব্বে দেখা হয়েছে।

গজেন্দ্র। মহারাণী, ইনি ইচ্ছা করলে প্রদ্যুম্নকিশোরকে কথা কওয়াতে পারেন।

রাণী। কি বলছ গজেন্দ্র? শ্রেষ্ঠী কন্যা ইন্দিরা?

গজেন্দ্র। হ্যাঁ মহারাণী। ইনি ইচ্ছা করলে পারবেন।

রাণী। এ যা বলছে তা কি সত্যই সম্ভব? তুমি প্রদ্যুম্নকিশোরকে কথা কওয়াতে পারবে?

ইন্দিরা। তা বলতে পারি না মহারাণী। তবে একমাত্র আমিই এ মৌনাবলম্বনের কারণ জানি।

রাণী। এ যে অদ্ভুত রহস্য। গজেন্দ্র, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। [গজেন্দ্রর প্রস্থান

ইন্দিরা, আমায় সব খুলে বল। যদি সত্যই এ ব্যাধি তুমি আরোগ্য করতে পার তবে মহারাজকে সে শুভ সংবাদ আমি এখুনি জানাব। প্রদ্যুম্নকে আমরা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ করি। তার এ দুঃখ ভোগ আমাদের পক্ষেও খুব ক্লেশকর। আজ যে সে রাজ-রোষে পতিত হয়ে কারারুদ্ধ রয়েছে, তার কারণ তার এই মৌনতার জন্য এবার যুদ্ধে সে যেতে পারে নি। জয় আমাদের হয়েছে বটে কিন্তু ক্ষতিও বিস্তর হয়েছে যা প্রদ্যুম্নের মত সুযোগ্য সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালনায় হ'ত না। তাই মহারাজ ক্রোধে আদেশ করেছেন, এক মাসের মধ্যে নিজমুখে এই স্বেচ্ছাকৃত মৌনাবলম্বনের কারণ প্রকাশ না করলে একমাস পরে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এ আদেশে আমরা কেউ সুখী নই। তুমি যদি কথা কওয়াতে পার তো আমরা সকলেই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। প্রকৃত ঘটনা আমার কাছে লুকিও না।

ইন্দিরা। আপনার কাছে বলব, কারণ আপনি নারী। আমার মনের কথা বুঝতে পারবেন। আপনাদের সেনাপতি আমাদের দেশে গিয়ে আমার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে প্রেম-নিবেদন করেছিলেন। আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। আমি গর্ব্বভরে সেই বুকভরা প্রেম উপেক্ষা করে বলেছিলুম পুরুষের প্রেম শুধু নারীকে ভোগ করবার, বঞ্চিত করবার একটা আবরণ মাত্র। যদি সত্যই আমায় ভালবাসেন তো আজ হতে এক বৎসর কাল যে মুখে আমাকে প্রেম-নিবেদন করেছেন সে মুখ থেকে কোন কথা নির্গত হবে না এবং সমস্ত জীবন এই মৌনাবলম্বনের কারণ পৃথিবীতে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। তিনি তখনি তাতে স্বীকৃত হ'ন। এ ব্যাধি আমারই সৃষ্টি, কিন্তু এখনও তো এক বৎসর পূর্ণ হয় নি। মনে হয় অনুরোধ করলে হয় ত'—

রাণী। বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখ। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, এত নির্দ্দয় হতে পারলে! সে তো কোন হীন প্রস্তাব করে নি। তার কাতর অনুরোধ পায়ে ঠেলে, উৎকল্পনা চরিতার্থের জন্য একজন বীর-শ্রেষ্ঠকে এত কষ্ট দিতে তোমার মনটা কেঁদে উঠল না। মুখর জগতে নীরব হয়ে থাকা যে কত বড় শাস্তি তা তুমি বুঝলে না! আজ নির্দ্দোষী শুধু তোমার জন্যই রাজরোষে পতিত!

ইন্দিরা। আমি দোষী। যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছি তার ক্ষমা নেই। পবিত্র প্রেমের নির্ম্মল অর্ঘ্যে আমি চরণাঘাত করেছি, সেই পাপ শত গুণ হয়ে আজ আমার বুকে বাজছে।

রাণী। (ঈষৎ ভেবে) ইন্দিরা, তুমি প্রদ্যুম্নকে ভালবাস?

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেঁদে ফেললেন।
রাণী তাকে বুকে টেনে নিলেন

বুঝেছি বোন, আমায় আর কিছু বলতে হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি মহারাজকে সব কথা গুছিয়ে বলি। [রাণীর প্রস্থান

(ইন্দিরা চুপ করে বসে আছেন এমন সময় বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। সখি, তুমি এখনও এইখানে বসে! আমি তোমার ঘর গুছিয়ে রেখে কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। শেষে নিজেই এলুম। চল—

ইন্দিরা। তুই যা।

(গজেন্দ্রর প্রবেশ)

গজেন্দ্র। দেবী, আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। আপনি যে এত পথকষ্ট স্বীকার করে এসেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বন্ধু আজ রাজরোষে কারারুদ্ধ। তিন দিন থেকে অনশন ব্রত অবলম্বন করেছেন। অনুনয় বিনয় কিছুতেই তাঁকে কথা কওয়াতে পারা যায় নি। একমাসের মধ্যে কথা না কইলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। অথচ একমাস প্রায় শেষ হতে চলল। আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই তিনি কথা কইবেন।

ইন্দিরা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। যদি ভগবান দয়া করেন—এখন তোমরা যাও। এখনই মহারাজ আসবেন।

বিশাখা। তুমি বেশী দেরী কোরো না। [বিশাখা ও গজেন্দ্রর প্রস্থান

ইন্দিরা। জানি না কথা কওয়াতে পারব কি না। ইষ্টদেব, আমার সহায় হোন। আমার পাপের জন্য একজন নির্দ্দোষ পুরুষশ্রেষ্ঠ শাস্তি ভোগ করছে—

(রাজা ও রাণীর প্রবেশ)

রাজা। মহারাণীর মুখে সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হলুম। চিকিৎসকেরা ঠিকই বলেছিল। প্রদ্যুম্নের মৌনাবলম্বন ব্যাধি নয়—স্বেচ্ছাকৃত। তোমার খামখেয়ালের জন্য আমার যে কত ক্ষতি হয়েছে তা জান? এ যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন যোগ দিতে পারে নি, কথাও বলতে পারে নি, কারণও জানাতে পারে নি, তাই আজ সে রাজরোষে অনর্থক কারাদণ্ড ভোগ করছে।

ইন্দিরা। মহারাজ—

রাজা। রাণী বলছেন, তুমি নাকি প্রদ্যুম্নকে কথা কওয়াতে পারবে। কিন্তু যদি অকৃতকার্য্য হও, তবে তোমারও প্রাণদণ্ড হবে।

ইন্দিরা। সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব।

রাজা। উত্তম। চেষ্টা করে দেখ।

ইন্দিরা। (কম্পিত কণ্ঠে) মহারাণী, একটী প্রার্থনা!

রাণী। অসঙ্কোচে বল'।

রাজা। যদি ভয় পাও, বল। ফেরবার পথ এখনও খোলা আছে।

ইন্দিরা। না মহারাজ, শাস্তির জন্য আমি ভীত নই।

রাজা। তবে?

ইন্দিরা। সকলের সামনে কারাগৃহে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব অথবা শোভন হবে না।

রাণী। সে কথা সত্য।

রাজা। নিভৃতে সাক্ষাতের করবার অনুমতি দিলে যদি সুবিধা হয়—

ইন্দিরা। কিন্তু কারাগৃহে—

রাণী। বেশ, রাজপ্রাসাদের যে-কোন কক্ষে তুমি প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দেখা করতে পার। মহারাজ, অনুমতি দিন।

রাজা। উত্তম, তাই হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন, যদি সফলকাম হতে না পার তবে কাল প্রাতে ঘাতকের হস্তে তোমার জীবনলীলা শেষ হবে। তুমিও ওরই মত মূক, নীরব হবে—চিরদিনের মত—

রাজা ও রাণীর প্রস্থান। ইন্দিরা পুত্তলিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন

(ক্রমশঃ)

কমলারাণীর দীঘি

জসীমউদ্‌দীন

কমলারাণীর দীঘি ছিল এইখানে
ছোট ঢেউগুলি গলাগলি ধরি ছুটিত তটের পানে।
আধেক কলসী জলেতে ডুবায়ে পল্লীবধূর দল
কমলারাণীর কাহিনী স্মরিতে আঁখি হ'ত ছল ছল।
আজ সেই দীঘি শুকায়েছে, এর কর্দ্দমাক্ত বুকে
কঠিন পায়ের আঘাত হানিয়া গরুগুলি ঘাস টুকে।
জলহীন এই শুষ্ক দেশের তৃষিত জলের তরে,
কোন্ সে নৃপের পরাণ উঠিল করুণার জলে ভ'রে।
সে করুণা ধারা মাটির পাত্রে ভরিয়া দেখার তরে
সাগর দীঘির মহা কল্পনা জাগিল মনের ঘরে।
লক্ষ কোদালী হইল পাগল কঠিন মাটিরে খুঁড়ি,
উঠিল না হায় কল-জল-ধারা গহন পাতাল ফুঁড়ি।
দাও জল দাও কাঁদে শিশু মা'র শুষ্ক কণ্ঠ ধরি
ঘরে ঘরে কাঁদে শূন্যকলসী বাতাসে বক্ষ ভরি।
লক্ষ কোদালী আরো জোরে চলে কঠিন মাটির থেকে
শুষ্ক বালুর ধূলি উড়ে যায় উপহাস যেন হেঁকে।

* * * *

"কোথায় রয়েছ ভাট ব্রাহ্মণ কোথায় গণক দল
জলদী করিয়া গুণে দেখ কেন দীঘিতে ওঠে না জল?
আকাশ হইতে গুণিয়া দেখিও শত-তারা আঁখি দিয়া
পাতালে গুণিও বাসুকি-ফণার মণি-দীপ জ্বালাইয়া।
ঈশানে গুণিও ঈশানী গলের নর-মুণ্ডের সনে
দক্ষিণে গণো, শাহ্ মাল্দার সেথা সুন্দর বনে।"
আকাশ গণিল পাতাল গণিল, গণিল দশটি দিক
দীঘিতে কেন যে জল ওঠে না ক বলিতে নারিল ঠিক।
নিশির শয়নে জোড়মন্দিরে স্বপন দেখিছে রাণী
কে যেন আসিয়া শুনাইল তারে বড় নিদারুণ বাণী।
"সাগর দীঘিতে তুমি যদি রাণী! দিতে পার প্রাণ দান
পাতাল হইতে শত-ধারা মেলি জাগিবে জলের বান।"
স্বপন দেখিয়া জাগিল যে রাণী, পুবের গগন-গায়
রক্ত মেলিয়া দাঁড়াইল রবি সুদূরের কিনারায়।

"শোন শোন ওহে পরাণের পতি ছাড় গো আমার মায়া
উড়ে চ'লে যায় আকাশের পাখী প'ড়ে রয় শুধু ছায়া।"

পেটরা খুলিয়া তুলে নিল রাণী অষ্ট অলঙ্কার
রাসমণ্ডল শাড়ীর লহরে দেহটি জড়াল তার।
কৌটা খুলিয়া সিঁদুর তুলিয়া পরিল কপাল ভরি
দুর্গা প্রতিমা সাজিল বুঝি বা দশমীর বাঁশী স্মরি।
ধীরে ধীরে রাণী দাঁড়াইল আসি সাগর দীঘির মাঝে
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী দাঁড়ায়ে তটের কাছে।
পাতাল হইতে শতধারা মেলি নাচিয়া আসিল জল
রাণীর দুখানা চরণে পড়িয়া হেসে ওঠে খল খল।
খাড়ু জলে রাণী খুলিয়া ফেলিল পায়ের নূপুর তার
কোমর জলেতে ছিঁড়িল যে রাণী কোমরে চন্দ্রহার।
বুক জলে রাণী কণ্ঠ হইতে গজমতি হার খুলে
কোলের ছেলেটি ডগধর কোথা দেখে রাণী আঁখি তুলে।
গলাজলে রাণী খোঁপা হ'তে তার ভাসাল চাঁপার ফুল
চারিধার হ'তে কল জলধারা ভরিল দীঘির কূল।
সেই ধারা সনে মিশে গেল রাণী আর আসিল না ফিরে
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী আকাশ বাতাস ঘিরে।

* *
* *

কমলারাণীর এই সেই দীঘি, কার অভিশাপে আজ
খুলিয়া ফেলেছে অঙ্গ হইতে জল-কুমুদীর সাজ।
পাড়ে পাড়ে আজ আছাড়ি পড়ে না চঞ্চল ঢেউদল
পল্লীবধূর কলসীর ঘায়ে দোলে না ইহার জল।
কমলারাণীর কাহিনী এখন নাহিক কাহারো মনে
রাখালের বাঁশী হয় না করুণ নিশীথ উদাস বনে।
শুধু এই গাঁর নূতন বধূরে বরিয়া আনিতে ঘরে
পল্লীবাসীরা বরণ কুলাটি রেখে যায় এর পরে।
গভীর রাত্রে সেই কুলাখানি মাথায় করিয়া নাকি
আলেয়ার মত কে এক রূপসী হেসে ওঠে থাকি থাকি।

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিশ

দিন কয়েক—বোধ হয় দশ বারো-দিন পর।

অকস্মাৎ দুইটা ঘটনা প্রায় একসঙ্গেই ঘটিয়া গেল। প্রথম ঘটনাটা ঘটিল সকালেই—পুলিশ আসিয়া অনিরুদ্ধ, পাতু মুচী ও দেবু ঘোষকে গ্রেপ্তার করিল। শ্রীহরি ঘোষের বাগানের গাছগুলি এই কয়জনেই কাটিয়াছে এ বিষয়ে পুলিশ নিঃসন্দেহ হইয়াছে।

দশ-বারো দিনের মধ্যে ঘটিয়াও গিয়াছে অনেক। দেবু ঘোষ নীলাম রদের মামলা দায়ের করিয়া আসিয়াছে। দুর্গার টাকাগুলি যতীন দেবুর হাতে দিয়াছে, সে টাকাতেই অবশ্য সব সঙ্কুলান হয় নাই—বাকী টাকা দেবু নিজে দিয়াছে। এখনও মামলায় লাগিবে অনেক—প্রায় পাঁচশো টাকা। দেবু স্থির করিয়াছে সে নিজের সম্পত্তি বাঁধা দিয়া ঐ টাকা জোগাড় করিবে। অবশ্য সেও সকলের কাছে একটা করিয়া খত লিখিয়া লইবে। যতীনকেই সে ভার দিয়াছে, আপনি যেমন ক'রে বলবেন—ঠিক তেমনি ক'রে লিখে নোব আমি।

যতীন বলিয়াছিল—আমার ওপর ভরসা করবেন না দেবু-বাবু, কাল যদি আমাকে সরিয়ে দেয় এখান থেকে—তবে আপনার কি হবে সে কথা ভেবে দেখুন।

হাসিয়া দেবু বলিয়াছিল—চল্লিশ টাকাও তো দুর্গার কম নয় যতীনবাবু। সে যদি চল্লিশ টাকা দিতে পারে—টাকাটা যাওয়া তার যদি সহ্য হয়—আমারও না হয় ও টাকাটা যাবে।

যতীন, দেবুর কাছে দুর্গার কথা গোপন করে নাই।

মামলাগুলি দায়ের করিয়া দেবু ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল। তাহার জমিটুকু ভাল, ঋণ পাইতে বেগ পাইবার কথা নয়, কিন্তু শ্রীহরি ঘোষের চেষ্টারও অন্ত ছিল না, সেই জন্য পাকা কথাবার্ত্তাও কয়েকস্থানে কাঁচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া দেবুর কাজ তো ওই একটি নয়—পাঠশালার কাজ এবং সকলের চেয়ে বড় কাজ তাহার খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটের আন্দোলন। দশটা-তিনটা পাঠশালার কাজ করিয়া যেটুকু সময় থাকে—সে সময়টুকু গ্রামের লোকদের লইয়া ওই আলোচনাতেই কাটিয়া যায়, কেবল গ্রামের লোকই নয়—এ গ্রামের জমি-ভোগকারী প্রজা ছড়াইয়া আছে পাঁচখানা গ্রামে। সে সব গ্রামেও দেবু যাওয়া-আসা করিতেছে। এ ক্ষেত্রেও আলোচনায় আজ যাহা স্থির হয়—কাল তাহা ওলোট পালট হইয়া যায়।

দ্বারকা চৌধুরী দেবুকে নিষেধ করিয়াছে—ও কাজে হাত দিয়ো না বাবা দেবু, ও হবে না।

—কেনে?

হাসিয়া চৌধুরী বলিয়াছে, গায়ে জোর না থাকলে যেমন লড়াই করা যায় না, তেমনি অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লে ধর্ম্মঘট করা চলে না।

দেবুর প্রশ্নে চৌধুরী হাসিয়াছিল—চৌধুরীর যুক্তিতে দেবুও হাসিল, বলিল—আমরা খাজনা দোব না, তাতে স্বচ্ছল অবস্থার কি দরকার?

—আজ খাজনা দেবে না, কিন্তু একদিন তো লাগবে! নালিশ ক'রে আদালতে ডিক্রী হ'লে কি করবে?

কি করিবে সে কথা এই প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধকে বলিতে দেবুর রুচি হইল না। সে কথা দ্বারকা চৌধুরীর বোধশক্তির নিকট অবিশ্বাস্য, ধারণার অতীত। পল্লীগ্রামের চাষীগৃহস্থের ছেলে হইলেও দেবুর কল্পনা অনেক। সে কি করিবে?—সমস্ত গ্রামের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মঘট করিবে। কিস্তির পর কিস্তি বৎসরের পর বৎসর। জমিদার নালিশ করিবে—করুক। ডিক্রী হইবে হোক। নীলামে ঐ জমি ডাকিতে একটি লোকও যাইবে না। জমিদার-পক্ষ যদি খাস-ডাকে কিনিতে চায়, কিনুক। কিন্তু তারপর? এই বিস্তীর্ণ জমি চাষ করিবে কে? গ্রামের একটি লোকও জমি চাষ করিবে না। সমস্ত জমি পড়িয়া ধূ ধূ করিবে। কল্পনা করিতে করিতে দেবু উত্তেজিত হইয়া ওঠে; মনের মধ্যে একটা অপরিসীম শক্তি অনুভব করে। এ তাহাকে করিতেই হইবে। এ তাহার প্রায়শ্চিত্ত। ছিরুপালকে সে-ই শ্রীহরি ঘোষ করিয়া তুলিয়াছে। হিংস্র বর্ব্বরকে সে-ই কৌশল শিক্ষা দিয়াছে, শক্তির বেদীতে সে-ই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার কল্পনা ছিল অনেক। ছিরুকে মানুষ করিয়া তুলিবে, ছিরুর অর্থশক্তির কল্যাণে গ্রামখানিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে, গ্রাম্য শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে—তাহার কল্পনা ছিল অনেক। আজ সে তাহার ভুল বুঝিয়াছে, সে ভুলকে তাহার সংশোধন করিতেই হইবে। আবার সে নূতন কল্পনা আরম্ভ করিয়াছে। সে কল্পনাও অনেক। ধর্ম্মঘট করিয়া ছিরুকে আঘাত দিতে হইবে। ছিরুর আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে সেজন্য মনে মনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের কল্পনা করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডে এবার তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। তাহার নূতন কল্পনা, পুরাতন কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশ বিশাল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে কথা দ্বারকা চৌধুরীকে বলিয়া কি হইবে? এ সব কল্পনা দ্বারকা চৌধুরীর কল্পনার, ধারণার অতীত। স্বপ্নঘোরে মানুষ যেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, দেবুও তেমনিভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এই কল্পনার প্রেরণাতেই সে চৌধুরীর কাছে গিয়াছিল। তাহার বক্তব্য ছিল, চৌধুরীদের জমিদারী আমলের কাগজপত্রগুলি তাহাকে দিতে হইবে।

দ্বারকা চৌধুরী নির্বিরোধী মানুষ; ভদ্র প্রকৃতির সহৃদয় ব্যক্তি, ইহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। দশজনের উপকার করিবার একটা প্রবৃত্তিও তাহার আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা চৌধুরী হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—ওইটি আমাকে মাফ করো বাবা দেবু।

দেবু চমকিয়া উঠিল। মাফ করিতে হইবে? চৌধুরীর কাছে এমন কথা সে প্রত্যাশা করে নাই। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি দেবেন না কাগজ?

—বললাম যে বাবা, আমাকে মাফ করো।

—কেনে?

চৌধুরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—জমিদারের কাগজ, জমিদারের বিপক্ষে কি দিতে পারি?

চৌধুরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দেবু প্রশ্ন করিল—ছিরু আপনাকে কত টাকা দেবে চৌধুরী মশায়?

—টাকা? ভ্রু তুলিয়া চৌধুরী দেবুর মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর বলিল—এক পয়সাও না।

—তবে?

—সে তুমি বুঝবে না দেবু। তবে এটা জেনে রাখ, ছিরুকে কাগজ আমি দোব না।

দেবু আরও খানিকটা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চৌধুরীর মানসিকতা অদ্ভুত। তাহারা এককালে জমিদার ছিল—এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তাই সে প্রজাপক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবে না। অপরপক্ষে জমিদারের সঙ্গে যোগ দিয়া প্রজাদের অনিষ্টকর কিছু করিতেও তাহার বিবেকবুদ্ধিতে বাধিতেছে। সে স্থির করিয়াছে, তাহার সহিত জমিদারের বিরোধ স্বতন্ত্রভাবে আদালতেই নিস্পত্তি হইবে। দেবুকে যেমন চৌধুরী বুঝিতে পারে না, চৌধুরীকেও তেমনি দেবু বুঝিতে পারে না। দেবু ও চৌধুরী সামাজিক হিসাবে জাতিতে এক, তবুও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

* * * *

আষাঢ় মাসে 'রথযাত্রা' একটা প্রধান উৎসব। পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রাই প্রধান রথযাত্রা হইলেও বাংলার পল্লীর প্রায় গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র আকারে এ উৎসব হইয়া থাকে। সমগ্র হিন্দুর সমাজে এটি একটি পর্ব্বদিন। এ দিনে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। প্রতি ঘরেই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা-ভোগ হইয়া থাকে। প্রতি দেবতারই রথযাত্রার একটা পর্ব্বপূজা আছে। যাহাদের ঘরে বিগ্রহ কি শিলামূর্ত্তি আছে তাহাদের ঘরে অল্পস্বল্প উৎসবও হয়। কাঠের ছোট-বড় রথ টানে; কাঠের রথের অভাবে বাঁশ কাঠ দিয়া রথ তৈয়ারী করিয়া কাপড় ও কাগজ দিয়া মুড়িয়া রথ টানা হয়। দু-দশখানা গ্রাম অন্তর এক একখানা গ্রামে, উৎসবের সমারোহ যেখানে বেশী, সেখানে ছোটখাটো মেলা বসে, আশপাশের লোকজন ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া আসে। কাগজের ফুল, তালপাতার বাঁশী, দুম-পটকা বাজী, দুই-চারিটা মনিহারীর জিনিস বিক্রয় হয়। খাবারের মধ্যে তেলেভাজা-পাঁপর, বেগুনি, ফুলুরী ইত্যাদি।

দ্বারকা চৌধুরীদের বাড়ীতে রথের উৎসব অনেক দিনের। তাহাদের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঠাকুরের কাঠের রথ আছে। পাঁচচূড়া-বিশিষ্ট মাঝারি আকারের রথ। আগে মেলাটা বেশ বড়ই হইত। সে আমলে এই মেলায় অনেক দূর হইতে লোক আসিত—লাঙলের জন্য বাবলা কাঠ, বাবুই ঘাসের দড়ি, দরজা, জানালা ও ঘর কাঠামোর জন্য লোহার গজাল ও অন্যান্য সামগ্রী কিনিতে। কিন্তু এখন আর সে সব জিনিস বেচা-কেনা উঠিয়া গিয়াছে। তবুও লোকজন আসে। এই সুযোগ লইয়া দেবু ঘোষ একটি মজলিস ডাকিয়াছিল। শিবকালীপুরে ভিন্নগ্রামের যে সব লোক জমি রাখে তাহাদের লইয়াই মজলিস। এই মজলিসেই ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটার চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ হইবে।

ওদিকে শ্রীহরিও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। সেও এই সুযোগে পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বসিয়াছে। অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে সামাজিক পঞ্চায়েৎ। চণ্ডীমণ্ডপেই সে পঞ্চায়েতের আসর করিয়াছে। আসরের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা তাহার নব-উপলব্ধ আভিজাত্যের পরিচয় প্রচার করিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া সতরঞ্চির উপর ধপধপে চাদর পাতা, চারিধারে কতকগুলি বালিশ, চণ্ডীমণ্ডপের চালের কাঠ হইতে ঝুলানো একটা দড়িতে একটা পেট্রোম্যাক্স আলো চণ্ডীমণ্ডপটাকে যেন দিন করিয়া রাখিয়াছে। একপাশে তামাকের বন্দোবস্ত। পল্লীর প্রচলিত প্রথামত কাঠের ধূনি নয়, জমিদারবাড়ীর রীতি অনুসরণে তামাক দেশলাই ও টিকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীহরি জানে—তাহাদের সমাজের পক্ষে এ সব বাহুল্য। সাধারণত সতরঞ্চি ও হ্যারিকেনের আলো হইলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীহরির নিজের মর্য্যাদা তো আছে।

দেবুদের মজলিস বসিবার কথা জগন ডাক্তারের ওখানে। গোটা কয়েক মাদুর, দুইটা হ্যারিকেনের আলো লইয়া মজলিসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেবু ডাক্তারের দাওয়ায় আগন্তুকদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টি ছিল অদূরবর্ত্তী আলোকোদ্ভাসিত চণ্ডীমণ্ডপের উপর। নিজেকে সে ধিক্কার দিতেছিল। ছিরুকে শ্রীহরিতে পরিণত সে-ই করিয়াছে। তাহার কল্পনা ছিল অনেক; কিন্তু এত বড় ভুল আর হয় না। ইহার জন্য সে না-করিয়াছে কি? শ্রীহরিকে ধীরে ধীরে সংযমের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিবার কল্পনায় সে শ্রীহরির পাপকেও অনুমোদন করিয়াছে। জমাদারের সঙ্গে শ্রীহরি মদ খাইয়াছে, সে নিজে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ইহার জন্য অনেক প্রায়শ্চিত্তই তাহাকে করিতে হইবে। চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসের ঐ সমস্ত সরঞ্জাম শ্রীহরির স্ত্রীর শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া সে-ই কিনিয়া দিয়াছে।

মহাগ্রামের শিবুদাস শিবকালীপুরের একজন বিশিষ্ট জোতদার; সে আসিয়া দেবুদের মজলিসে বসিল। সে হাসিয়া বলিল—তোমাদের মজলিস কিন্তু টিম টিম করছে দেবু। শ্রীহরির মজলিসের আলোর জৌলুষ কি!

জগন মাতব্বরের মত গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল, এ সভায় সভাপতি সে-ই হইবে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। সে কোন কথাই বলিল না। অভ্যাসমত শিবু দাসের এই আলোক-প্রীতির জন্য তাহার প্রতি একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অনিরুদ্ধ হুকা আগাইয়া দিতেছিল—সেও কথা বলিল না, তাহাদের মজলিস লইয়া রহস্য করায় সে দুঃখিত হইল। পাতু তামাক সাজিতেছিল—সেও দুঃখিত হইল। কেবল দেবু হাসিল।

হরেন ঘোষাল কোন মজলিসেই যোগ দেয় নাই, টর্চ হাতে সে দুইটা মজলিসের মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং আপন মনেই উচ্ছ্বাসভরে আবৃত্তি করিতেছিল—একটা স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা।

শিবুর মন্তব্যে আপন মনেই সে শিবুকে বলিল—কাওয়ার্ড!

শিবু দাস যাহাই বলুক—আলোকে সমারোহে মজলিসটি যতই হীনপ্রভ হউক, দেবুদের আসরই জমিয়া উঠিল।

বাংলার প্রজা-সমাজে ধর্ম্মঘট নূতন নয়। পুরানো জিনিস। ইহার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ তাহারা অনুভব করে। কিন্তু তবু ধর্ম্মঘট সচরাচর হয় না, তাহার কারণ ধর্ম্মঘট করিবার মত সাধারণ একটি উপলক্ষের অভাব। আর অভাব হয়

দিবার লোকের। এ ক্ষেত্রে সে দুইটির কোনটিরই অভাব হয় নাই; খাজনাবৃদ্ধির মত সাধারণ উপলক্ষ আর হয় না, আইন যাহাই বলুক—তাহাদের মনে হয়, এতবড় অন্যায় দাবী আর হয় না; শস্যের মূল্যবৃদ্ধির যুক্তি, অপরাপর যুক্তি মানিতে মন তার-স্বরে অস্বীকার করে। শস্য তাহার নিজস্ব বস্তু, তাহার মূল্য বাড়ে তাহাতে অপরে কেন তাহার ভাগ পাইবে—সে কথা কিছুতেই তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহার উপর এবার দেবু যখন প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ তুলিল—'দিব না' বলিয়া দৃঢ়ভঙ্গিতে দাঁড়াইল—তখন সকলেই তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সুরে সুর মিলাইল। দেবুর ডাকের মধ্যে সত্যই কিছু আছে। আরও একটা শক্তি এ-ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছে, সে শক্তির উৎস ওই যতীন। রাজবন্দীর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। লোকে তাহাদের ভয়ও করে, কিন্তু ভয়ঙ্করের মোহ সংসারে দুর্নিবার। রাজবন্দীর ভয়ঙ্করত্বকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেবু ঘোষ—তাই তাহারা দেবু ঘোষের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করিল না।

ওই মজলিসেই ধর্মঘট পাকা হইয়া গেল।

* * * *

চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে শ্রীহরি রুদ্ধরোষে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। অল্প কয়েকজন লোক আশে-পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছিল।

প্রৌঢ় হরিশ মোড়ল বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি—সে শ্রীহরির মজলিসেই আসিয়াছিল; সে বলিল—কলিকালে একপো ধম্ম; সেও থাকবে না কলির শেষে। কলির এইবার শেষ হয়ে এল।

শ্রীহরির কাকা ভবেশ সায় দিল—তা বই-কি, হরিনাম সত্য।

অতঃপর আলোচনা আরম্ভ হইল—পূর্ব্বে কোন সামাজিক মজলিসে এই চণ্ডীমণ্ডপেই কত লোক আসিয়াছিল। কোন ক্ষুদ্র অপরাধে কাহার কত বড় শাস্তি হইয়াছিল। আর আজ? এই এত বড় ব্যাভিচারের অপরাধ সমাজে অবাধে চলিয়াছে—অথচ তাহার প্রতিবিধানকল্পে—এই মজলিসে আসা কেহ প্রয়োজনই বোধ করিল না!

হরিশ বলিল—আবার একটা ফলার দিয়ে ডেকো, দেখবে কাচ্চা-বাচ্চা এসে সব জুটে বসবে।

শ্রীহরি এতক্ষণে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—আচ্ছা, তা হ'লে ওঠা যাক, কি বলেন?

রুদ্ধ রোষেই শ্রীহরি উঠিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালেই সে জমিদারের নায়েবকে সঙ্গে করিয়া জংশন হইয়া চলিয়া গেল সদরে।

দুই দিন পর। আকাশ ভাঙিয়া গত রাত্রি হইতে বর্ষা নামিয়াছে। রাত্রির জলেই চাষের জমিতে 'কাড়ান' লাগিয়া গেছে। মাঠ ভরিয়া জল থৈ-থৈ করিতেছে। দুরন্ত বর্ষণের মধ্যেও চাষীরা কোদাল হাতে আপন আপন জমিতে জল বাঁধিতে ব্যস্ত। গ্রামের প্রত্যেকটি চাষী মাঠে। কেবল অনিরুদ্ধ পাতু গদাই বসিয়া একস্থানে জটলা করিতেছিল। জটলা নয়, রুদ্ধ বেদনায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের জমি নীলাম হইয়া গেছে। আজিকার এই আকাশ ভাঙা বর্ষায় এ যে কি দুঃখ—কি যে ক্ষোভ—সে প্রকাশ করিবার ভাষা তাহাদের নাই। সময়ে সময়ে ডাক ছাড়িয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।

যতীনও বসিয়াছিল স্তব্ধ হইয়া। আষাঢ়ের বর্ষণ দেখিতেছিল। এই দুর্যোগের মধ্যে জমাদার দারোগা দুইজন কনেষ্টবল ও জন চারেক চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীন তাহাদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ওরে বাপরে! এই বর্ষায়!

সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ফেলিল, নিশ্চয় কিছু ঘটিয়াছে। হয় তো বা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। ধর্ম্মঘটের সহিত তাহার যোগাযোগের সূত্র আবিষ্কারে এই জমাদারটির ব্যগ্রতার কথা তাহার অবিদিত নয়।

দারোগা হাসিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিল—সাহেব নিজে এসেছেন। বসে আছেন থানায়।

যতীন দেখিল—পরোয়ানাটিতে তাহাকে অবিলম্বে পরোয়ানা-বাহীর সঙ্গে সদরে যাইবার আদেশ হইয়াছে। কাগজখানার প্রতি আর একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কিন্তু সহসা সে শুনিল, কে বলিতেছে—আমি কি করলাম?

চোখ তুলিয়া যতীন দেখিল—জমাদার অনিরুদ্ধ ও পাতুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পাতু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিতেছে—আমি কি করলাম?

অনিরুদ্ধ স্থির নির্ব্বাক।

জমাদার তাহাদের কনেষ্টবলের জিম্মায় রাখিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দেবু ঘোষকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিল। দেবু যতীনকে দেখিয়া হাসিল। যতীন জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপার দারোগাবাবু?

দারোগাবাবু গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাইয়া বলিল—শ্রীহরি ঘোষের বাগান দলবদ্ধ হয়ে লুঠ করা এবং গাছপালা কাটার জন্যে।

অনিরুদ্ধ মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দারোগাকে বলিল—আমি! আমি! আমি! একা আমি গাছ কেটেছি—টাঙি দিয়ে। এরা ছিল না, জানে না—কিছুই জানে না। ওদিকে আপনি ছেড়ে দিন।

সে কৈফিয়ৎ শুনিবার কথা পুলিশের নয়। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা অনুযায়ী তাহারা তিনজনকেই হাতে হাতকড়া দিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া গেল। যতীন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে অনেক কথাই ভাবিতেছিল। দারোগাবাবুটি দারোগা হইলেও মিষ্ট প্রকৃতির লোক। দারোগা বলিল—নিজের অবস্থা ভেবে কাজ করতে হয় যতীনবাবু। কাজটা আপনি ভাল করলেন না।

যতীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দারোগার দিকে চাহিল।

দারোগা আবার বলিল—লোকগুলোকে খেপিয়ে তুলে ওদের হাতে দড়ি দিলেন। আপনাকেও এখান থেকে সরতে হচ্ছে। পরের অবস্থাটা ভেবে দেখুন।

যতীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনাদের ধারণা এ সব আমি করিয়েছি?

হাসিয়া দারোগা বলিল—আমাদের ধারণার কথা বাদ দিন। আপনিই বলুন না—বুকে হাত দিয়ে।

—কোন দিন কোন কাজে আমি এদের উত্তেজিত করিনি দারোগাবাবু।

দারোগা হাসিল—তারপর সে অনিরুদ্ধের করেক্ত গাছ

কাটায় কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর আসা হইতে এই সে-দিনের নীলাম রদের পরামর্শ—এমন কি দুর্গার টাকা দেওয়ার কথা পর্য্যন্ত বলিয়া বলিল—এর পরও আপনি এই কথা বলবেন ?

সংবাদগুলি দারোগা জানে দেখিয়া যতীন আশ্চর্য্য হইল না ; কিন্তু দারোগা এই ঘটনাগুলিকে সাজাইয়া এমন ভাবে এগুলিকে কার্য্যের কারণ হিসাবে চিত্রিত করিল যে—সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এমনভাবে সে কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই। অথচ দারোগার হিসাবটাও অস্বীকার করা যায় না।

দারোগা বলিল—অন্ত কোন লোক হলে তার কথায় ওরা এত জোর পেত না, তাদের কথা ওরা বিশ্বাসই করত না। কিন্তু আপনারা আশ্চর্য্য জাত। কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য্য আপনাদের ওপর ওদের বিশ্বাস। নিজেরা আপনারা অন্যায় করেন না, কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পান না—আপনারা আন্দামানে যান, হাসিমুখে ফাঁসীকাঠে ওঠেন—ওইটাই আপনাদের মারাত্মক মোহ। আমাদেরই মধ্যে মধ্যে ভক্তি জেগে ওঠে—বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিল।

যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—দারোগার কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাই যদি হয়—দারোগার কথাই যদি সত্য হয়—তবে সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলায় স্কুলে সে প্রাইজের সঙ্গে একখানি ছোট ছেলেদের নাটক পাইয়াছিল। নাটকখানা বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া ছাদের উপর কাপড় টাঙাইয়া অভিনয়ও করিয়াছে। ভক্তিমূলক নাটক। একটি ভক্তিমান ছোট ছেলে মাটির ঠাকুর লইয়া খেলা ধুলা করিয়া পূজা করিত। সেই খেলার পূজা—অকৃত্রিম ভক্তি ও নিষ্ঠায় একদা অকস্মাৎ সত্য হইয়া উঠিল—মাটির পুতুল সত্য দেবতা হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এও যদি তাই হইয়া থাকে—যদি তাহারই সাহচর্য্যে তাহারই প্রীতিতে প্রেমে এই মাটির পুতুলের মত অচেতন মানুষ-গুলির চেতনা হইয়া থাকে—তবে সত্যই সে ধন্য হইয়া গিয়াছে।

দারোগা বলিল—তা হ'লে যতীনবাবু, উঠুন।

যতীন বলিল—আমি যাব না দারোগাবাবু। নিয়ে যেতে হয় আমাকে হুকুম অমান্যের জন্যে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলুন।

জোড়হাত করিয়া দারোগা বলিল—সাহেব তো থানায় চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছেন যতীন বাবু—গরীবকে কেন কষ্ট দেবেন ? আমি তো আপনাকে য়্যারেষ্ট করতে পারব না। ভগ্নদূতের মত আমাকে এই দুর্য্যোগে ফিরে যেতে হবে—আবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে আমাকেই আসতে হবে। তা ছাড়া, আপোষেই যান আর য়্যারেষ্ট হয়েই যান—যেতে তো হবেই আপনাকে।

দারোগার কথার ভঙ্গিতে যতীন হাসিয়া ফেলিল। সে আর প্রতিবাদ করিল না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে জিনিস-পত্র গুছাইবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। জিনিস-পত্রগুলি থরে থরে গুছানোই আছে। সযত্ন পরিচর্য্যা ও ব্যবস্থার সমস্ত হাতের কাছেই রহিয়াছে। তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত একাগ্রতা—একটা অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটার দীপ্তিতে—উত্তাপে আকস্মিক গাঢ় নিদ্রাভঙ্গের মত মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া গেল। চোখের সম্মুখে প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটার মত দপ করিয়া জলিয়া উঠিল পদ্মের মূর্ত্তি।

জিনিসপত্রে সে হাত দিল না, সে ভিতরের দিকের দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—মা-মণি !

পদ্ম অসাড় পঙ্গুর মত বসিয়া নীরবে কেবল কাঁদিতেছিল। মুখ ভাসিয়া চোখের জল টপ টপ করিয়া বুকের কাপড়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। এমন অজস্র ধারায় অশ্রু যতীন বুঝি আর দেখে নাই। তাহাকে যেদিন গ্রেপ্তার করিয়া আনে সেদিন তাহার নিজের মা কাঁদেন নাই। যতীনের মনে হইল—তাঁহার সেই অবরুদ্ধ অশ্রু এই পাতানো মায়ের চোখ দিয়া এতকাল পরে আজ ঝরিয়া পড়িতেছে। সে আবার ডাকিল—মা-মণি !

পদ্ম কথা বলিতে পারিল না, তাহার চোখের জল বাড়িয়া গেল। যতীন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ পিছনে পদশব্দ শুনিয়া সে পিছন ফিরিয়া দেখিল—দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুর্গা অদ্ভুত। সে হাসিয়া বলিল—আপনি চললেন বাবু ?

হাসিয়া যতীন বলিল—হ্যাঁ, চললাম দুর্গা।

—মনে থাকবে তো বাবু আমাদিগে ?

—মনে থাকবে না ? চিরদিন মনে থাকবে।

দুর্গা পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইল।

যতীন আবার পদ্মকে ডাকিল—মা-মণি !

* * * *

যতীন আশঙ্কা করিয়াছিল অনেক, পদ্ম হয় তো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। মূর্চ্ছা-ব্যাধিগ্রস্তা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে—এইটাই তাহার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু পদ্ম তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া কেবলই কাঁদিল।

যাইবার সময় যতীনের অকস্মাৎ মনে হইল পদ্মের বর্ত্তমান অবস্থার কথা। অনিরুদ্ধ জেল হাজতে, সেও চলিয়া যাইতেছে—পদ্মের কি হইবে ? কিন্তু ওদিকে আর সময় ছিল না, থানা হইতে পুনরায় একজন কনেষ্টবল অসহিষ্ণু সাহেবের তাগিদ লইয়া আসিয়াছে। যতীন আপনাকে দৃঢ় করিল ; ঈশ্বরে তাহার বিশ্বাস নাই, ঈশ্বরের হাতে নয়, পদ্মের নিজের হাতেই পদ্মকে সমর্পণ করিয়া সে রওনা হইল। শুধু বলিল—মা-মণি, যেদিন ছাড়া পাব, ছেড়ে তো দেবেই একদিন, তোমার কাছে আসব।

অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে পদ্ম একটু ম্লান হাসিল।

গ্রামের মধ্যে খবরটা ইহারই মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ওই বর্ষা-বাদলের মধ্যেও প্রায় সকলেই আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল। যতীন ম্লান মুখে হাসিয়া বিদায় লইল।

আকাশভাঙা বর্ষণের জলে—চারিদিক জলে থৈ থৈ করিতেছে, পায়ের নীচে জলসিক্ত জমির মাটি মাখনের মত নরম—সেই মাটি হইতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে বীজধানের জমিতে সবুজ সতেজ ধানের চারা চাপ বাঁধিয়া সবুজ গালিচার মত মাঠভরা জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। বাতাসে ধানের বীজ গাছগুলি দুলিতেছে—যেন অদৃশ্য লক্ষ্মীদেবতা আকাশ-লোক হইতে নামিয়া আসিয়া কোমল চরণপাতে পৃথিবীর বুকে আসন পাতিয়া বসিতেছেন। যতীনের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—এই বিস্তীর্ণ মাঠ সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিবে—ধীরে ধীরে হেমন্তে স্বর্ণ-বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া রাশি রাশি ফসলে ঘর দুয়ার ভরিয়া দিবে।

পরমুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল—তারপর ?

তাহার মনে পড়িল অনিরুদ্ধের সংসারের ছবি।

শিবকালীপুরের বহুলোকের ঘরই সে দেখিয়াছে, জীর্ণ ঘর, রিক্ত অঙ্গন, মানুষগুলির অভাব-ক্লিষ্ট মুখ, শীর্ণকায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ শিশুর দল।

তবু সে হতাশ হইল না।

তাহার মনে পড়িল দেবু ঘোষকে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত চাষীর ছেলে —তাহার কণ্ঠে সে কি ডাক! তাহার চোখে সে কি দীপ্তিময় দৃষ্টি!

মনে পড়িল—অনিরুদ্ধের আজিকার মূর্ত্তি। লোকটা মত্তপ ছিল, মদ ছাড়িয়াছে। আজ পুলিশের হাত হইতে নিরপরাধকে বাঁচাইতে নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করিয়াছে। মাটির পুতুলের মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠিত না হউন—উঁকি মারিয়াছেন। উঁকি যখন মারিয়াছেন—তখন একদিন তাঁহাকে জাগিতেই হইবে।

(ক্রমশঃ)

পিগমেলিয়ন

শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ

সে বললে—'এবার দেখেশুনে একটা বিয়ে কর'।

কুমার বাহাদুর হাসলেন।

আত্মীয়স্বজন, কন্যার পিতার দল নিরাশ না হয়ে উপদেশ দিলেন —'রাজা হয়ে জন্মেছ, বিবাহ তো তোমাদেরই মানায়। এবার ঘর-সংসার পাতো বাবাজি।'

কুমার বাহাদুরের সুশ্রী প্রদীপ্ত মুখখানায় ফুটে উঠলো ব্যঙ্গ হাসি, রূঢ়, শাণিত; উত্তর দিলেন দৃঢ়কণ্ঠে—'বিয়ে তো সবাই করে। শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া দিন খরচ করবার মালমসল্লা আমার যথেষ্ট আছে।'

তারা নিস্তব্ধ হয়ে রইল, কারণ বাক্যব্যয় করাটা যখন বৃথা।

কুমার বাহাদুর জন্মেছিলেন উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে। জ্ঞানের শেষ স্তর তিনি দেখে আসবেন। বিলাসের মাঝে নিজেকে দিলেন না এলিয়ে, পড়ে রইলেন তেতালার একটা ছোট কক্ষে, আর দিনের পর দিন পুস্তকের স্তূপ জমা হয়ে উঠল তাঁর চারিধারে—ঠিক যেন চশারের ক্যাণ্টারবারি গল্পের 'ক্লার্ক'। সাধারণের জীবনের সঙ্গে তিনি পারিলেন না নিজেকে মিলিয়ে নিতে। অসামাজিক হ'য়ে থাকাটাই হ'ল তাঁর কাছে 'এরিষ্টোক্রাসি'।

ব্রতে তিনি নামলেন। নারী-সাহচর্য্য তিনি করবেন না; জগতে দেখাবেন একটা আদর্শ, পশু তো সবাই হতে পারে, তিনি বাস করবেন শুধু যুক্তির জগতে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ করবেন রক্তমাংস। কী রোমান্টিক কল্পনা: ভাবতেই কুমারের গায়ের চুল দাঁড়িয়ে ওঠে।

দার্শনিকদের নিয়ে তিনি উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন; হেগেল, বেন্থাম, মিল, চারবাক, হব্‌স্, লক্, এপিকেরাস, এ্যারিষ্টটল, প্লেতো, শঙ্করাচার্য্য, গড়্‌ডুইন, টলষ্টয়, ফ্রয়েড, নীৎশে, স্পেন্সার, ডারুইন, রুশো, মার্কস্: বাদ তিনি কাউকে দিলেন না। জগতের সমস্ত অতীত বর্ত্তমান দর্শনের মাথাগুলো তিনি চিবাতে লাগলেন বুভুক্ষুর মত। বুভুক্ষা আর মিটতে চায় না, তিনি চান আরো···আরো···। ওদিকে ট্রান্সেণ্ডেণ্টেলিজম, ন্যাচুরেলিজম, নেসিটেরেনিয়েজম, মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ—সমস্ত একত্রে জটলা হয়ে মস্তকে তার খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে। বড় বড় মাথার চাপে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব যে মরতে বসেছে সে খেয়ালটা তাঁর হ'ল না।

দার্শনিক কাণ্টকে তাঁর খুব ভাল লাগে। তিনি ভাবেন: জগৎটা তো একটা idea। সুতরাং ওটাকে বাদ দিয়ে অনায়াসে তিনি বাঁচতে পারেন।

অনেক নিস্তব্ধ গভীর রাতে ক্লান্তিতে যখন মাথাটা অবশ হয়ে আসে তিনি ভাবেন: পৃথিবীতে কত নক্ষত্র জ্বলেছিলো, কত অস্ত গেছে, কে রাখে তার খোঁজ? মানুষের পর মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এসে থেমে আছে ক'জনই বা। কুমারের ক্লান্ত আঁখি-পল্লব বুজে আসে। স্বপ্ন তিনি দেখেন: কালো মিশমিশে বিষাক্ত সর্পের উদ্যত ফণা তাঁকে দংশন করছে, যে সাপ আমাদের মত ইভকে প্রলোভিত করেছিল। কুমার বাহাদুর লাফিয়ে ওঠেন; আবার চলে পড়াশুনো। সেই বিরাট একঘেয়েমি।

পলিটিক্স তাঁর মন্দ লাগে না। তিনি বলেন: খাঁটি মানুষের পলিটিক্সের দরকার হয় না। হেলেনের যুগকে তিনি ভাবেন আদর্শ সভ্যতা এবং সৌন্দর্য্যের যুগ। তিনি বলেন—গ্রীক ছাড়া আবার সভ্যতা কি? আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য আমরা ইংরেজ হচ্ছি, গ্রীক হ'তে ভুলে গেছি।

দিন গড়াচ্ছে। কুমারের চুল দু-একটি পাক ধরে ধরে পক্ক চুনো-কুমড়ো হয়ে গেছে। কপালে রেখার স্পষ্ট দাগ পড়ে গেছে; শরীরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে আসছে। চশমা দিয়েও সব জিনিস ধোঁয়াটে লাগে। আর কত কাল, কত দিন: তিক্ততায় কুমারের হৃদয় ভরে' ওঠে: জীবনের ভাল মন্দ তো তিনি কোন দিন দেখলেন না, বুঝলেন না; পৃথিবীর দিকে তো একবার তিনি তাকিয়ে দেখেন নি। বাহাদুর শক্ত হয়ে বসেন: সায়াহ্ন তো হয়ে গেছে, সন্ধ্যার তো দেরি নাই, পথ তো আর একটু। টেনিসনের "Crossing the Bar" কবিতাটি তাঁর মনে পড়ে,—

'Sunset and evening star
And one clear call for me···'

সবাই বললে—'আর কত কাল? এবার একটু বিশ্রাম নাও।' 'বিশ্রাম'! কুমার হেসে বললেন,—'বিশ্রামের দিন তো এগিয়ে আসছে। চরম বিশ্রাম।'

কুমার আবার নতুন উদ্যমে জ্ঞানের রাজ্য আক্রমণ করলেন। কিন্তু মাথা ঘোরে কেন? এত ঘুমোতে ইচ্ছে করে। দূর ছাই! এ্যারিষ্টটল তো মোটে একঘণ্টা ঘুমোতেন।

কুমার বাহাদুর বাড়ির বড় নন্দন, তার পরে আরও তিনটি ভাই এবং চারটি ভগিনী আছে। বড় বাড়ি, হৈ চৈ লেগেই আছে, কিন্তু কুমার বাহাদুরকে এই হর্ম্যবিলাসে কেউ টানত না, এমন কি আনন্দের এককণাও তাঁর নিস্তব্ধ নির্জ্জন তেতালার প্রকোষ্ঠে পৌঁছিত না। বাড়িশুদ্ধ সকলে এ কক্ষখানাকে একঘরে করে রেখেছে।

কিন্তু কর্ণিকা এ নিয়ম মেনে নিল না। কর্ণিকা মেয়েটি বেশ জীবন্ত, বেথুন কলেজের ছাত্রী। মেজে ঘষে দেহখানাকে চমৎকার সে গড়ে তুলেছে। বন্ধুর দল বলে কর্ণিকার মত প্রসাধন কেউ করতে পারে না। সে বলে প্রসাধনকে তোমরা যতই কৃত্রিমতা বলে ব্যঙ্গ করো না কেন, সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করতে ও জিনিসটার ভারি প্রয়োজন। ঋষিকন্যা শকুন্তলাও একথা জানতেন। ভাগ্যিস কবি পোপ বেঁচে নেই, নইলে নিশ্চয়ই তিনি কর্ণিকার প্রসাধনের বিরুদ্ধে এক তীব্র ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করতেন। কর্ণিকা হচ্ছে আসর জমানো মেয়ে, এত মজার মজার গল্প সে জানে যে, কথা-সরিৎসাগরের লেখকও হার মেনে যায়। বাহাদুর পরিবারের নিষেধকে সে গ্রাহ্যের মধ্যে নিলে না, বললে—তোরা অত ভয় করিস্ কেন? আমার তো হাসিই আসে। ও তো মানুষ, ভূত নয়। সে কুমারের কক্ষে এসে প্রবেশ করল। প্রতিবেশী-কন্যার সাহসে পরিবারের সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইল। সবচেয়ে বিস্মিত হ'ল সে, যার কক্ষে কর্ণিকা প্রবেশ করল। বিস্মিত কুমারের পায়ে প্রণাম করে বললে—'দাদু, আমি কর্ণিকা। তোমার বোনের নাতনী মিনুর সাথে বেথুনে পড়ি।'

কুমার বাহাদুর হাত দিয়ে কর্ণিকাকে বসতে ইসারা করলেন। কর্ণিকার মুখে কথার খৈ ফুটল, কুমার বললেন দু-একটা কথা, টুকরা টুকরা। কর্ণিকা শুধায়—'আচ্ছা, অত পড়াশুনা ক'রে কি হবে?'

কুমারের মুখে ক্ষীণ হাসি খেলে গেল, বললেন,—'নাতনী আনন্দ ক'রেই বা লাভ কোথায়?'

'বারে! একটু আনন্দ করবে না? পৃথিবীতে কি শুধু কাঁদতেই এসেছ?' কর্ণিকা স্মিতহাস্যে বললে।

'আনন্দ জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার। জ্ঞানের মাঝে ডুবে থাকলে নিউটন, এরিষ্টটল আনন্দ পেতেন, আবার নেপোলিয়ন পেয়েছেন রাজ্য জয়ে।'

'নিউটন, নেপোলিয়ন বাদ দিয়ে তোমার নিজের কাছেই একবার প্রশ্ন ক'রে দেখো না তুমি কি পেয়েছ। সমস্ত জীবনপাত করে ব্রাউনিং-এর গ্রামেরিয়ন তো হয়েছিলেন তোতা পাখী'—কর্ণিকা একটু হেসে আবার বললে—'চলো না গো দাদুভাই, একটু বেড়িয়ে আসি। তোমায় আমি দেখাব বই-এর সুশ্রী অক্ষরের চেয়ে অনেক ভাল জিনিস।'

তাঁর এতদিনকার সাধনাকে মেয়েটি এমনি উপেক্ষার চোখে দেখছে, কুমার রুক্ষ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—এখন তুমি যেতে পার।'

'রেগে গেলে নাকি?' কর্ণিকা হেসে ফেটে পড়ল—'আমাদের মত ইতরজনদের তোমার কুবেরের ভাণ্ডার হতে এমনি ক'রে বঞ্চিত করো না। জেনো, জোর ক'রে আদায় ক'রে নিতে আমি জানি।

এবার কুমার বাহাদুর লাগলেন এষ্ট্রোনমি নিয়ে, প্রাণপণে লেগে গেলেন, অবসাদকে জয় করা তাঁর চাই-ই। একদিন কথার মাঝে কর্ণিকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—'আচ্ছা দাদুভাই, তুমি বিয়ে করো নি কেন? বিয়ে করাটা কি পাপ? তোমার বই পত্রগুলো কি সেকথা বলে?'

কুমার কর্ণিকার দিকে তাকালেন, কেমন হাসি হাসি কর্ণিকার চোখ দুটো, দেহ থেকে উপছে পড়ছে যৌবনের প্রাচুর্য্য, যেন ঝর্ণা আপনার আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে চলছে। যত সব আবর্জ্জনা চিন্তা! এ দুর্ব্বলতা কেন? কেন? কেন রে? কুমারের মুখের রেখাগুলো আরও কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

'বলো না গো দাদুভাই'—কুমারের দেহে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে কর্ণিকা বললে—'বল না গো, বিয়ে কেন করোনি? বার্ণাড শ পাগলাটার কথাই বুঝি সত্যি ক'রে ধরে নিয়েছ যে, বিয়ে মানে আইনত বেশ্যাবৃত্তি? সত্যি তা নয় গো।'

আশ্চর্য্য এ মেয়েটির স্পর্শ; যা ধরবে সোনা হয়ে ফলে উঠবে। কুমার বাহাদুর দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, অনেকদিনকার বারুদ-স্তূপে আগুন লেগেছে। রক্তগুলো তাঁর নাচছে আটলান্টিক সাগরের উদ্দাম ঢেউ-এর মত। বৃদ্ধবয়সে কি কুমারের যৌবন ফিরে এল রাজা যযাতির মত? কুমার উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর পা দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে, কর্ণিকার দিকে তাকাতে তার লজ্জা হচ্ছে কেন?…দূর ছাই!…রাবিশ…ডাউন! ডাউন! কর্ণিকা তাঁর নাতনীর সমবয়সী, হায় রে! কুমার মেঝেতে বসে লুটিয়ে পড়লেন।

'কি হ'ল?' কর্ণিকা কুমারকে দাঁড়াতে সাহায্য ক'রে ভৎর্সনার স্বরে বললে—'বুড়ো হাড়ে আর কত সইবে? সমস্ত জীবন ভ'রে তো এই করলে, এবার একটু বিশ্রাম নাও। ঐ রাবিশ-এর স্তূপগুলাকে কাল আমি যদি রাস্তায় না ফেলে দি…'

বাধা দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে কুমার বললে—'আমায় একটু একা থাকতে দাও। আমি বড় ক্লান্ত।'

কীটের মাথা! মানুষের কি সাধ্য যে সে জয় করবে রক্তমাংস? সামান্য একটু যুক্তি দিয়ে অতবড় পশুত্বকে সে উড়িয়ে দেবে?

অনেক কাল পরে কুমার আজ একটু বাইরে বেড়িয়ে এলেন। পরিবারের সকলে স্তম্ভিত—অসূর্য্যম্পশ্যা বাইরে! সূর্য্য পশ্চিমে উঠছে না তো?

পরের দিন ভোরের প্রথম আলোর দিকে তাকিয়ে কুমারের মনে হ'ল দিনটি কি চমৎকার! কুমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, চিরুণিখানা মাথায় তুলে ধরলেন; হঠাৎ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই চমকে উঠলেন: এই কি সে? সেদিনের সে রূপ কোথা গেল? হারিয়ে গেছে, লষ্ট, লষ্ট, ইউরেকা লষ্ট। বাহাদুর অনুভব করলেন, ডান বুকটায় তার অসম্ভব বেদনা।

এই না কি হ'ল তার প্রবৃত্তির সমাধিস্থাপন? কুমারের পা দুটো কাঁপছে, চোখ দুটো হয়ে গেছে খুনীর মত হিংস্র ঘোলাটে। পুস্তকের স্তূপগুলো হাসছে। কুমার একখানি বই-এর মলাটে দেশলাই জ্বালিয়ে দিলেন। চোখে জ্বলছে তাঁর বন্য প্রতিহিংসা, মুখে কুটিল হাসি।

আগুন দেখে বাড়ির সবাই ছুটে এল, ছেলে মেয়ে, দাস দাসী। বইগুলা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, আর কুমার চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন, চোখের জল তখনও তাঁর গণ্ড হ'তে শুকিয়ে যায়নি।

পিগমেলিয়নকে ভিনাসদেবী কৃপা করলেন না; সে ভেঙে ফেলল গেলেসিয়ার ষ্ট্যাচু।

প্রাণশক্তি *

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)

মন-প্রাণ-দেহ এই তিন তত্ত্বের দ্বারা আজ আমাদের ব্যষ্টিগত সত্তা গঠিত। কিন্তু চিরদিন এরূপ ছিল না। সৃষ্টির আদিতে ছিল কেবল জড়পিণ্ড। তারপর তাহাতে প্রাণসঞ্চার হইল। তারপর প্রাণবস্তু জড়ে হইল মনের অধিষ্ঠান, বুদ্ধির স্ফুরণ। ক্রমশঃ মানবের আবির্ভাব ঘটিল। অতঃপর অভিব্যক্তির নিয়মে মনোমধ্যে জাগ্রত হইবে সুপ্ত দিব্য মানস। মনের কাজ পুরুষকে ভেদে অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা। এই ভেদই নানা বিকারের, সুখ-দুঃখাদি নানা দ্বয়ী অনুভূতির জনক। দিব্যমানস হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে মনের অহমিকা। আবার দিব্য মানস উদিত হইলে মোহ ও অজ্ঞানের অবসান, চরম সত্যের উপলব্ধি।

সাধারণতঃ আমরা মনকে জানি বস্তু-ভাব-ঘটনাদির দ্রষ্টা বলিয়া, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুমন্তা বলিয়া। কিন্তু তাহা পুরা সত্য নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে মনকে সৃজন কার্য্যে ব্যাপৃত সত্তাও—creative cosmic agency—বলা যায়! কেন না জড়পিণ্ড ও জড়শক্তি দুইয়ের পশ্চাতেই মন অবচেতনভাবে কাজ করিতেছে। পদার্থবিদ্যা আজ জানিয়েছে যে জড়পদার্থ জড়-শক্তিরই প্রকাশ, তাহার স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা নাই। অদূর ভবিষ্যতে ইহাও স্বীকৃত হইতে বাধ্য যে জড়শক্তিও প্রকৃতির আদি সংকল্পের শক্তিরূপে প্রকাশ মাত্র। জড়জগতের পশ্চাতে তাহা হইলে নিহিত রহিয়াছে এই মানসিক সংকল্প—Will। তবে আমরা যে মনকে চিনি তাহা ত একটা স্বাধীন মূল তত্ত্ব নয়। তাহা দিব্য-মানসেরই তমসাচ্ছন্ন রূপ, দিব্যমানস সদাই প্রচ্ছন্নভাবে তাহার পশ্চাতে বিদ্যমান। অতএব সৎ-এর যথার্থ সৃজনী শক্তি হইল—মন নয়, তাহার সূক্ষ্মতর শুদ্ধতর দিব্যস্বরূপ। এই দিব্যবৃত্তিই সৃষ্ট জগতে শৃঙ্খলা বিধান করিতেছে, অন্ধ জড়শক্তিকে যথাবিহিত পথে চালাইতেছে। এমন কি, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, যে বীজ হইতে যে গাছটী অঙ্কুরিত হওয়া উচিত, তাহার অবধি ব্যবস্থা করিতেছে। ইহার অভাবে বিশ্ব হইত একটা আকস্মিক অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খল ব্যাপার—chaos.

সৃষ্টি অর্থে অখণ্ড একের বহু নামরূপে প্রকাশ। ভেদের উপর এই বহুর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বহুর মধ্যে অনুস্যূত সেই অবিভক্ত এক ব্রহ্ম। গীতার ভাষায় দৃশ্যমান ভূতগ্রাম সূত্রে মণিগণা ইব. ব্রহ্মরূপ সূত্রে গ্রথিত, ব্রহ্ম দ্বারা বিধৃত। এক ও বহু, বিদ্যা ও অবিদ্যা, একই সত্যের দুই পিঠ। মন ভেদের অন্ধকারে অবস্থিত, অতিমানস অভেদের আলোকে সমুজ্জ্বল। তথাপি উভয়ই সত্য। অন্ধকার হইতে আলোকে, ভেদজ্ঞান হইতে একত্ববোধে, মন হইতে অতিমানসে উত্তরণ অভিব্যক্তির গতি। সবের মূলে ভগবানের সংকল্প, তাঁহার লীলা। বহু নামরূপে লীলার পূর্ণতার জন্যই জড়ে প্রাণশক্তির জাগরণ, মনের অধিষ্ঠান। মনের সহিত, তথা দেহ-প্রাণের সহিত, জড়িত রহিয়াছে অতিমানস, যাহাকে শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন, origin and ruler of the other three অর্থাৎ তিন স্থূলতত্ত্বের মূল, তাহাদের নিয়ন্তা ও অনুমন্তা। প্রাণভূমি, মনোভূমি আমাদের চরম গন্তব্য স্থান নয়, ঊর্দ্ধগতির পথে ধাপমাত্র। ইহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তবে বিজ্ঞানভূমিতে প্রবেশ, ভেদ ও অজ্ঞানের পর্য্যবসান।

তাহা হইলে দেখা যাক, প্রাণ কি। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে মন অতিমানসের নিম্নতর তমসাচ্ছন্ন স্বরূপমাত্র। অতিমানসই আপন দ্বয়ী রূপ কল্পনা করিয়া আপনার নিম্নতর সত্তার উদ্ভব করিয়াছে, ভেদে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের কার্য্যচালনার জন্য। কিন্তু স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই কার্য্যের নিয়মন করিতেছে। উপনিষদের ভাষায়, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম কবি মনীষী পরিভূ হইয়া শাশ্বত কাল অর্থ-সমূহকে যথাতথ্য আপনার মধ্যে বিন্যস্ত করিতেছেন। প্রাণ হইল মনের প্রকাশ বিশিষ্ট শক্তিরূপে—a specialisation of force. তেমনই জড়পদার্থ হইল প্রাণমনের খেলার নিশ্চেতন আধার। সচ্চিদানন্দ হইতে জড়ে অবতরণ ঘটিয়াছিল অতিমানস, মানস ও প্রাণের মধ্য দিয়া। জড় হইতে ব্রহ্মে আরোহণও ঘটিবে ঐ একই পথে, প্রাণভূমি, মনোভূমি ও বিজ্ঞানভূমি উত্তীর্ণ হইয়া।

প্রাণের প্রভব কোথায়, তাহা সূচিত হইল। এখন দেখিতে হইবে কেন, এই প্রভবের কারণ কি? শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, By what necessity, divine or undivine, of the truth and illusion, does it come into being? দিব্য বা অদিব্য, সত্যের বা অসত্যের, কোন প্রয়োজনে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে? আবহমান কাল কত লোক বলিয়া আসিতেছে যে জীবন অলীক, স্বপ্নবৎ ও সকল অনর্থের মূল। কিন্তু একথা কি সত্য! অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার নিজের উপর বা আপন নির্ম্মম মায়া দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বের উপর, এই দারুণ বোঝা হেলায় চাপাইয়াছেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে! বরং ইহা বিশ্বসনীয় এবং বোধগম্য যে দেশকালের সসীমতার মাঝে তাঁহারই চিদানন্দ প্রাণশক্তি রূপে কোটী কোটী আধারে স্ফুরিত হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে জড়পদার্থকে ভিত্তি করিয়া প্রাণশক্তি যে ভাবে কাজ করিতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বোঝা যায় যে এই শক্তি মূলতঃ বিশ্বশক্তিরই একটা রূপ। শক্তির প্রকাশ হইতেছে অবিরাম গতিতে, কখন সামনের দিকে—কখন পিছনের দিকে, কখন গঠন, কখন ক্ষয়, আবার পুনর্গঠন, আবার পুনঃ ক্ষয়, এইরূপে। জন্ম-মৃত্যু শব্দের কোন বিশেষ অর্থ নাই, কারণ মৃত্যু বলিলে বস্তুতঃ জীবনেরই একটা ক্রিয়া বোঝায়—death has no reality except as a process of life. ভাঙ্গা-গড়া ত অনবরত চলিতেছে, ভাঙ্গাটা অকস্মাৎ ঘটিলেই তাহাকে বলি মৃত্যু। দেহ গেলেও তাহার মধ্যে অধিষ্ঠিত প্রাণ ত গেল না! প্রাণ আবার নূতন আধারে প্রবেশের উদ্যোগ করিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, one form of life is broken up to serve as material for other forms of life—একটা আধার ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহার উপকরণ দিয়া নূতন আধার সৃষ্ট হইতেছে। জীববিদ্যার অনুশীলনে আমরা ইহার বিস্তর উদাহরণ পাই। মরণের একটা পুরাণো নাম পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কিন্তু দেহের

* শ্রীঅরবিন্দের মহাগ্রন্থ Life Divine-এর প্রথম খণ্ডের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের মূল কথা

উপকরণ পঞ্চভূতে লীন হইলে পঞ্চভূত ত বসিয়া থাকে না, নতুন দেহ গড়িয়া তোলে।

এই একই প্রাকৃতিক নিয়মের বশে, দেহ-সংশ্লিষ্ট যে মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তাহাও দেহান্তের পর অপর দেহ, স্থূল বা সূক্ষ্ম, পরিগ্রহ করে। সবই রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয় না কিছুই। জড়বিজ্ঞানও বলে যে জগতে বস্তু অক্ষয়, সামর্থ্য অক্ষয়। ইহাদের রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু বিনাশ নাই।

মোটের উপর বলা যায় যে এক অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী জীবনীশক্তি আছে গতিশীল, যাহা জগতের সকল নামরূপের সৃজন করিতেছে। এই শক্তি অনন্ত ও অবিনাশী। জগৎ চলিয়া গেলেও ইহা থাকিবে এবং নব জগৎ গড়িয়া তুলিবে। উর্দ্ধতন কোন শক্তি ইহার গতি-রোধ না করিলে ইহা চিরদিন নব নব জগৎ সৃজন করিতে থাকিবে। এই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত শক্তিই প্রাণরূপে আকাশে, মাটিতে, উদ্ভিদে ও প্রাণীতে অধিষ্ঠিত। মাটি আপন রস জোগাইয়াও আকাশ প্রাণবায়ু জোগাইয়া উদ্ভিদের পোষণ করিতেছে। উদ্ভিদ প্রাণীকে খোরাক সরবরাহ করিতেছে। গাছপালা খাইয়া, নয়ত গাছপালাভোজী প্রাণীর মাংস খাইয়া, প্রাণিকুল জীবন ধারণ করিতেছে। সবই বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত এক প্রাণশক্তির খেলা।

এ সকল কথা বিশ্বাস করিবার প্রধান অন্তরায় আমাদের প্রাচীন সংস্কারসমূহ। আগেকার কালে লোকে উদ্ভিদকে জীব বলিয়া মানিত না। ভাবিত যে যাহার গতি নাই, যে শ্বাস প্রশ্বাস লয় না, তাহাকে প্রাণবস্তু বলিব কিরূপে! আজ এ সংস্কার ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, কেন না উদ্ভিদবিদ্যা প্রমাণ করিয়াছে যে বৃক্ষদেহও প্রাণিদেহের মত জীবকোষ দ্বারা গঠিত; প্রাণীর মত গাছগাছড়ারও আকাশের অক্সিজেন দেহে টানিয়া লইতে হয়, গাছগাছড়া মাত্রেরই গতি না থাকিলেও বৃদ্ধি আছে, আবার এমন সব সূক্ষ্মদেহ উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের গতিবিধিও আছে। কাজেই গাছগাছড়াও প্রাণবস্তু জীব। বাকী রহিল মৃত্তিকা প্রস্তরাদি, লৌহ সুবর্ণাদি, বায়ুসলিলাদি জড়বস্তু। ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নাই, নড়ন-চড়ন চলাফেরা নাই, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে শ্বাসগ্রহণ বা স্পন্দন না থাকিলেই প্রাণ নাই, এ কথা ত বলা যায় না। গুটিপোকার কোনটাই নাই, কিন্তু সে নিশ্চয়ই জীবন্ত। মানুষেরও এরূপ অবস্থা আমাদের জানা আছে যখন সে স্পন্দনহীন, তাহার শ্বাস রুদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া সে মরিয়া গিয়াছে কেহ বলে না। ইহা অপেক্ষা কোন বলবত্তর প্রমাণ চাই জড় পদার্থকে প্রাণহীন বলিবার। ভূবিদ্যা হইতে আমরা জানি যে এই জড়পদার্থের মধ্যেই একদিন আদিম জীব-কণার উদ্ভব হইয়াছিল। জীবন-শক্তি কিন্তু বাহির হইতে আসে নাই। আদিম যুগের জলকাদার মধ্যেই প্রসুপ্ত ছিল সেই শক্তি, আবেষ্টন প্রভাবে জাগিয়া উঠিল মাত্র। জলের মত যৌগিক পদার্থ দুটী মৌলিক পদার্থকণার সম্মিলনে উদ্ভূত হয়। জলের মধ্যস্থ হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মধ্যে একটা বিশিষ্ট বন্ধন বা আকর্ষণ আছেই। এই আকর্ষণের সহিত চেতনার কোন সম্বন্ধ নাই কি? তারপর এই হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন উভয় পরমাণুর মধ্যেই ত বিদ্যুৎকণার আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিয়াছে। ইহার সহিতও কি চেতনার কোন সংস্রব নাই! এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবের রাগ-বিরাগের, likes and dislikes-এর তুলনা করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশবসুর পরীক্ষা হইতে আমরা জানিয়াছিলাম যে প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় শ্রেণীর জীবের দেহই আঘাতের ফলে অনেকটা একই রকমের প্রতিঘাত দ্বারা সাড়া দেয়। তিনি এতদূর বলিয়াছিলেন যে জড়পদার্থের বেলাতেও কতকটা সেইরূপ আঘাতের প্রতিঘাত তাঁহার যন্ত্রে ধরা পড়ে। তবে এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে, পণ্ডিতমণ্ডলী সবাই জড়পদার্থ সম্বন্ধে আচার্য্য বসুর পরীক্ষার ফল এখনও গ্রহণ করেন নাই। তবে ইহা আশা করা যায় যে যন্ত্রের আরও উন্নতি হইলে সন্তোষজনক ফল অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, Could instruments of the right nature and sufficient delicacy be invented, more points of similarity between the metal and plant life could be discovered.

যাহা হউক, আপাততঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে এখনও এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাতে বিশেষ আসে যায় না। ভৌতিক ও অতিভৌতিক বিদ্যার গবেষণার বিষয় ও ধারা স্বতন্ত্র। উপরন্তু ভারতবর্ষে অতিভৌতিক বিষয় সাধনা ও উপলব্ধির বস্তু। ভৌতিক বিদ্যা অতিভৌতিকের উপর হুকুম চালাইতে পারে না। ঋষিগণ জড়ে ব্রহ্মের চিৎশক্তি দেখিয়াছিলেন, আজও সাধক দেখিতে পান। ইহাতে অবিশ্বসনীয় কিছু নাই। বরং যে নিয়মানুসারে উদ্ভিদে, গুটিপোকাতে, সমাধিস্থ পুরুষে, শ্বাসপ্রশ্বাস নড়াচড়া না থাকিলেও প্রাণের অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হয়, লৌহ বা প্রস্তর সম্বন্ধে সে নিয়ম প্রযুজ্য না হইবে কেন! প্রকৃতির বিধান সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এরূপ নয় যে একটা ব্যাপক নিয়ম হঠাৎ একস্থানে গিয়া থামিয়া যাইতে পারে। Experiment প্রয়োগে বাধা পাইয়া যদি আমরা দমিয়া না যাই, তবে অনুসন্ধান করিতে করিতে একদিন নিশ্চয়ই দেখিব যে নিয়মে কোথাও ফাঁক নাই, উদ্ভিদ ও ধাতুর মধ্যে সত্য কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিদ্যুৎ-কণার আকর্ষণ-বিকর্ষণে জড় পরমাণু গঠিত। যদি তাই হয়, তবে প্রাণের স্পন্দন নাই বলা কিরূপে চলিবে! প্রাণশক্তি সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, তবে কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন, রূপভেদ আছে মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, Only its forms and organisings differ. উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে একটা অচল সীমারেখা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

ঘাত-প্রতিঘাত, শ্বাস-প্রশ্বাস, নড়ন-চড়ন, এ সবই প্রাণের বাহ্য প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কোন উদ্ভিদের অঙ্গে হঠাৎ আঘাত করিয়া দেখা গেল যে উদ্ভিদের প্রাণ তাহাতে সাড়া দিল স্পন্দনরূপে, কম্পনরূপে। কিন্তু উদ্ভিদের জীবনে ত সর্ব্বক্ষণই ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, আবেষ্টনকে সে ক্রমাগত সাড়া দিতেছে, শুধু স্পন্দনরূপে নয়, ক্রমাগত বলিতেছে, "আমি বাঁচিব আমি বাড়িব, এই আমার সংকল্প।" শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে বলিতেছেন indicative of a submental, a vital-physical organisation of consciousness-force hidden in the form of being—প্রচ্ছন্ন, অবমানস, দেহ ও প্রাণগত চেতনার নিদর্শন।

তাহা হইলে ব্যাপার এই যে—যেমন সমগ্র বিশ্বে একটী অবিরাম চলশক্তি, সূক্ষ্ম স্থূল নানা রূপে প্রকট হইতেছে, তেমনই প্রত্যেক ভূতদেহে (প্রাণীর বা উদ্ভিদের বা জড়ের) সেই একই অবিরাম শক্তি, সঙ্কিত ও চঞ্চল দুই অবস্থায়

রহিয়াছে। এই উভয় শক্তির পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আমাদের চক্ষে প্রাণের খেলা বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই প্রাণ-পরাক্রম (Life-Energy), ইহার পশ্চাতে প্রাণশক্তি (Life-Force)। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় Mind-Energy, Life-Energy, Material Energy are different dynamisms of one World-Force—মানস পরাক্রম, প্রাণ-পরাক্রম, ভূত পরাক্রম সবই এক বিশ্বশক্তির ক্রিয়া।

প্রাণকে দেহ-মন হইতে স্বতন্ত্র একটা শক্তি বলিয়া দেখিলে অত্যন্ত ভুল করা হয়। যখন কোন দেহ মৃতপ্রায় দেখায়, তখনও তাহার মধ্যে প্রাণশক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে—potential অবস্থায় অর্থাৎ তাহার পুনরায় প্রকট সক্রিয় হইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন যে কখন কখন মৃত প্রাণীর পুনরুজ্জীবন করা যায় এবং ইহা সম্ভব এই জন্য যে আমরা যাহাকে প্রাণ বলি তাহা জড় দেহের মধ্যেই ছিল—সুপ্ত অসাড় ছিল এই মাত্র। মূর্চ্ছা সম্মোহন সমাধি ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য এই যে—cataleptic অবস্থায় জীবনের বাহ্য ক্রিয়া বন্ধ থাকিলেও মন সজাগ, শুধু দেহের উপর তাহার কোন এক্তিয়ার নাই। সমাধি অবস্থায় দৈহিক ও বাহ্য মানসিক উভয় ক্রিয়াই বন্ধ। প্রাণের বাহ্য প্রকাশ সমস্তই অবচেতনাতে ডুবিয়াছে, অন্তঃপুরুষ প্রচেতন অবস্থায় উঠিয়া গিয়াছে। মোট কথা, এই জাতীয় সকল অবস্থাতেই বাহ্য ক্রিয়াশীল প্রাণশক্তির বাহিরে প্রকাশ মাত্র বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু অন্তরতম প্রদেশে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

এমন অবস্থা কিন্তু আসে যখন ভাঙ্গা দেহে জীবনী শক্তিকে আর ধরিয়া রাখা যায় না। মাথা কাটিয়া ফেলিলে, হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ হইলে, সে আধারে আর প্রাণের ক্রিয়া চলিবে কিরূপে! তেমনই যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জরাজীর্ণ অচল হইয়া যায়, তখনও প্রাণক্রিয়া স্বতঃ বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ হইলে তখন দেহের মৃত্যু ঘটিল, আর তাহার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। দেহস্থ বিশ্বশক্তি তখন গড়ার কাজ ছাড়িয়া ভাঙ্গার কাজে ব্যাপৃত হইল।

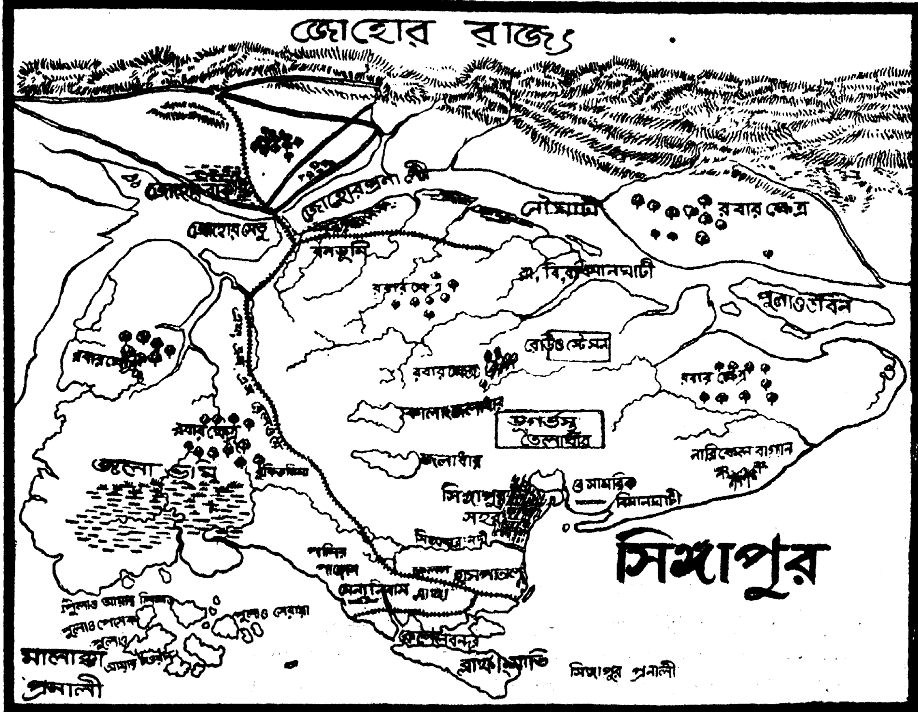
প্রাণ তাহা হইলে বিশ্বশক্তির সক্রিয় রূপ। তাহার মধ্যে মূলতঃ সর্বদা অনুস্যূত রহিয়াছে মানসিক চেতনা ও স্নায়বিক জীবনী শক্তি। বিশ্বশক্তি ঘাত-প্রতিঘাতের খেলাতে প্রকট হইয়া বিভিন্ন নাম রূপ গড়িয়া তোলে, রক্ষণ করে, বিনাশ করে। All this is the play of Life. যেখানে এই খেলা বাহির হইতে বোঝা যায় সেইখানে ইহা সুস্পষ্ট। প্রাণী ও উদ্ভিদে সহজে দেখা যায়, তাই তাহাদিগকে প্রাণবস্তু বলি। জড়ে বাহির হইতে কিছু বোঝা যায় না, তাই তাহা প্রাণহীন। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পান-ভোজন, নড়ন-চড়ন, এ সব যে প্রাণবস্তের থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। একথা একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করা যাক। প্রাণী যে আঘাতের প্রতিঘাত করে তাহা সচেতন। উদ্ভিদেরও যে সাড়া আছে তাহা নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, তাহার যে nervous sensation আছে তাহাও আমরা দেখিতে পাই। প্রাণীর মত তাহার রাগ বিরাগ জাগৃতি সুষুপ্তি ইত্যাদি রহিয়াছে। নাই শুধু মানসিক চেতনা। তাহার অনুভূতি আদি সবই অবচেতন। তাই তাহার অনুভূতি বা সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের জাগৃতি দেখিতে পাই না। লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচ অবচেতন, তাহার পশ্চাতে মানসিক চেতনা নাই। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, it is quite possible that there is a more rudimentary life operation of the subconscious sense-mind in the metal, although there is no bodily agitation corresponding to the nervous response—ইহা খুবই সম্ভব যে জড় ধাতুর মধ্যে অবচেতন মানসের আরও নিম্ন প্রকারের কোন প্রাণক্রিয়া চলিতেছে, যদিচ সে দেহস্পন্দন দ্বারা কোন সাড়া দিতেছে না। দেহে প্রাণ থাকিলেই যে গতি বা স্পন্দন দেখা যাইবে এমন ত কোন কথা নাই!

দেহে চেতনা অবচেতন হওয়া বা অবচেতনা চেতন হওয়ার ঠিক অর্থ কি? কি হয়? শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন—The real difference lies in the absorption of the conscious energy in part of its work, its more or less exclusive concentration—যথার্থ প্রভেদ এই যে তখন মানুষের সচেতন শক্তি মনোনিবেশের কার্য্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন কিছু লিখি, তখন লেখার কাজটা করে অবচেতন মানস, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা হয় অজ্ঞাতে, মন জাগ্রত থাকে, নিবিষ্ট থাকে, লেখার কাজের পশ্চাতে যে চিন্তা চলিতেছে তাহার মধ্যে। মানুষ পুরাপুরি অবচেতনাতে ডুব মারিতে পারে, অথচ তাহার মন সজাগ থাকে, নিদ্রার সময়। যৌগিক সমাধিতে মানুষ উঠিয়া যায় প্রচেতনাতে, অথচ সে দেহমধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে অন্তস্তল মন লইয়া।

বিশ্বশক্তি জড়ে নিদ্রামগ্ন, উদ্ভিদে অর্দ্ধ সুপ্ত, প্রাণীতে জাগ্রত। প্রত্যেক আধারে সে বিভিন্ন প্রকারে প্রাণশক্তিরূপে কাজ করিতেছে। জড়ের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে চাঞ্চল্য, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, তাহাকে প্রাণহীন বলিলে কোন অর্থ হয় না। আকর্ষণ-বিকর্ষণ রাগ-বিরাগেরই রূপান্তর, সংকল্পের খেলা, প্রকৃতিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই বিশ্বশক্তি মূলতঃ সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তি। ব্যষ্টিগত প্রাণ তবে কি? Life is a scale of the universal Energy in which the transition from inconscience to consciousness is managed. জগতের ক্রমপরিণতি আলোচনা করিলে আমরা একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। প্রাণ-শক্তি কিছু বাহির হইতে আসে নাই। তথাকথিত প্রাণহীন জড়ের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই যে উদ্ভব বা জাগরণ ইহাকে শ্রীঅরবিন্দ primary and necessary movement বলিতেছেন—জগতের অভিব্যক্তিতে প্রথম ও অবশ্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়া যাত্রারম্ভ। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে বিস্তর জটিল দার্শনিক কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ এই প্রবন্ধে আনিয়াছি, কিয়দংশ বাদ দিয়াছি।

পরমাণু হইতে মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই প্রাণশক্তির প্রকাশ। তবে সে প্রকাশের তিনটী স্বতন্ত্র ধাপ দেখা যায়। প্রথম, জড়বস্তু—অবচেতন অবস্থা, যন্ত্রবৎ। দ্বিতীয়, উদ্ভিদ—ঘাতের প্রতিঘাত পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও অবমানস, যদিচ চেতনা উন্মুখ। তৃতীয়, প্রাণী যেখানে সচেতন মানস জাগ্রত হইয়াছে—mentally perceptible sensation * * becomes the basis for the development of sense mind and intelligence, মনোবৃত্তির গোড়া পত্তন হইতেছে। দ্বিতীয় অবস্থাতে উদ্ভিদেই আমরা শুদ্ধ প্রাণের কাজ খুব স্পষ্ট দেখিতে পাই, একদিকে জড় অপরদিকে মানস উভয় হইতেই বিভিন্ন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কথায়, the same Pranic energy is present in all forms down to the atom—মানব হইতে অণু পর্য্যন্ত একই প্রাণপরাক্রম কাজ করিতেছে।

মণ্ডিত করিবার জন্ত আবশ্যক প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের হস্তে অস্ত্রপ্রদান। কিন্তু শত্রুকে পরাজিত করিবার এই একমাত্র উপায় গ্রহণ করিতে হইলে বর্তমান বৃটিশ মন্ত্রিসভার মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজন। বৃটেন ও ভারতের বিপদ আজ অভিন্ন, ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা একাধিকবার উক্ত মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত পন্থা গ্রহণের জন্য বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করিলেও উহা যে অরণ্যে রোদনমাত্র তাহা আমরা জানি। কারণ বর্তমান বৃটিশ মন্ত্রিসভা উটপাখীর ন্যায় বালুগর্ভে মস্তক প্রবেশ যে, ভারতে দশলক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া ভারতে যে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ হইয়াছে ইহা বলা যায় না। চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে যোগ দিয়াছে দশলক্ষ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেখানে লোক সংগ্রহ করা সম্ভব, ত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কেহ যুদ্ধে যোগদান করে নাই। মিঃ ক্লেমেণ্ট ডেভিস্‌ও এই প্রশ্নই করিয়াছেন—কোন্ স্বার্থের খাতিরে আজ ভারতবাসী বৃটেনের পক্ষে যোগ দিবে? ভারতবাসীকে আজ বুঝান দরকার যে, এ যুদ্ধ তাহাদেরই যুদ্ধ; ভারতের আত্মরক্ষার যুদ্ধ, ইহা বিশ্বগণতন্ত্রের সমর্থনে বিশ্বফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম। জাপান বা জার্মাণী শুধু বৃটেনের



সিঙ্গাপুর

করাইয়া বিপন্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে উৎসুক। কিন্তু কমন্স সভায় সভ্যগণের ভারত সম্পর্কে আলোচনা ও একাধিক পত্রিকায় মন্ত্রিসভার বর্তমান মনোভাব সম্বন্ধে মন্তব্য হইতে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। মিঃ হোর বেলিশা, ভার্নন বার্টলেট, ষ্টোক্‌স্ প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সভ্যগণ মন্ত্রিমণ্ডলীর মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই উল্লেখ করিয়াছেন। স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশে ব্যবস্থা অবলম্বনের আর সময় নাই, কিন্তু ভারতের পক্ষে এখনও সময় আছে। স্যার জর্জ সুষ্টার জানাইয়াছেন শত্রু নয়, সমগ্র পৃথিবীর গণতন্ত্রের শত্রু। এই ফ্যাসিস্তবাদ ধ্বংস করিবার জন্য বৃটেন ও সোভিয়েটের সহিত ভারতেরও সহযোগিতা করা আবশ্যক। বৃটেনের জনসাধারণও যখন এই মনোভাবই ব্যক্ত করিতেছে তখন বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী এখনও সময় থাকিতে যদি সারা ভারতবাসীকে মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা কার্যকরীভাবে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হন তাহা হইলে সশস্ত্র অগণিত ভারতবাসীর প্রতিরোধের সম্মুখে জাপ-অভিযান চরম পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। ২. ৩. ৪২



ভারতবর্ষের পৃষ্ঠা হ্রাস—

কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি ও ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংবাদপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গত মাস হইতে আমরা ভারতবর্ষের পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমাইতে বাধ্য হইয়াছি। তথাপি এই 'চৈত্র' মাসের কাগজ দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পৃষ্ঠা কম হইলেও আমরা পাঠকদিগের জন্য অধিক পরিমাণে পঠিতব্য বিষয় প্রদানের চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। পূর্ব্বে 'স্মলপাইকা' অক্ষরে এক পৃষ্ঠায় মাত্র ৩৬ লাইন পঠিতব্য ছাপা হইত—এখন সে স্থানে 'লংপ্রাইমার' অক্ষরে ৫০ লাইন ছাপা হইতেছে। লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানও কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'বর্জাইস' অক্ষরও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। ফলে পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমিলেও 'পঠিতব্য' বিষয়ের পরিমাণ আমরা কম হইতে দিই নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতির ফলেই আমরা যে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পূর্ব্ব ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি, পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

স্যর আজিজুলের নূতন সম্মান লাভ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার স্যর মোহাম্মদ আজিজুল হক সাহেব লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় শীঘ্রই তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানজনক সাহিত্যাচার্য্য (ডক্টর অফ্ লিটারেচার্স) উপাধি প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই একটি বিশেষ সভায় তাঁহাকে সম্মানিত করা হইবে স্থির হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এই সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

পণ্ডিত মালব্যজীর স্ত্রী-বিয়োগ—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর পত্নী মাসাধিক পূর্ব্বে আগুনে পুড়িয়া শয্যাগত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগতা হইয়াছেন। পণ্ডিত মালব্যজীর এই অতিবৃদ্ধবয়সে পত্নীর এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক। আমরা পণ্ডিতজীর এই শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

যুদ্ধ ও কয়লা—

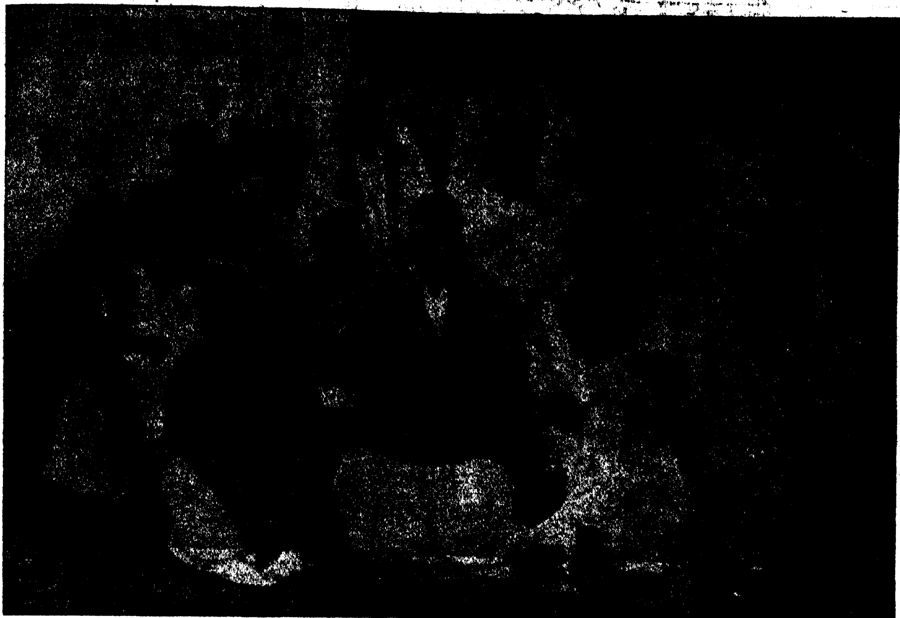
শত্রু আক্রমণের ভয়ে কলিকাতা শহরের অবস্থা যে দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে আজ আর তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সকল অব্যবস্থা শহরের অধিবাসীদের অবস্থা আরও কষ্টকর করিয়া তুলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের সকল চেষ্টা ভবিষ্যতে জনরক্ষার দিকে নিবদ্ধ, অন্যদিকে ইতিমধ্যেই অবস্থা এরূপ দাঁড়াইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে রক্ষা করিবার মত 'জন' শহরে থাকিবে কি-না সন্দেহ। খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকার যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন সেই মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। কয়লার মূল্য [illegible] বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু একটুকরা কয়লা, তাও আবার কমে কয়লা পাওয়া যায় না। ডাক্তারখানায় ঔষধপত্র কিনিতে গেলে যা-তা দর হাঁকিয়া বসে এবং ক্যাশমেমো দিতে অস্বীকার করে। সরকার যদি বিপদ আসিবার আগেই এরূপ অক্ষম হইয়া পড়েন যে, কোনও আদেশ বা নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত আদেশ ও নির্দ্দেশ দেওয়ার সার্থকতা কি? কয়লার খনি কলিকাতা হইতে এমন কিছু দূর নহে যে, এখনই কলিকাতায় কয়লা সরবরাহ বন্ধ করিতে হইবে। কলিকাতার খাদ্যদ্রব্যও এমন সকল স্থান হইতে আমদানি হয় যে সমস্ত স্থানের সহিত কলিকাতার যোগাযোগের পথ বন্ধ হইয়া যায় নাই। এই দুঃসময়ে ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, লোককে যে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে সেকথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু লোকের মনে এই ধারণা হইতে দেওয়া উচিৎ নয় যে সরকারী অক্ষমতা তাহাদের ক্লেশবৃদ্ধির কারণ।

বর্ত্তমানের সুযোগ গ্রহণ—

শত্রু ভারতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত, অথচ আত্মরক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ভারতের হয় নাই। সময়থাকিতে কর্ত্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইলে আজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র দশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ঢক্কা নিনাদে তাহা প্রচার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হইত না। বর্ত্তমান যুদ্ধের গতিভঙ্গির সঙ্গে গত মহাযুদ্ধের গতিভঙ্গির কোনই তুলনা হয় না। অথচ আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের মনোভাবকে ১৯১৪-১৮তেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কংগ্রেস ত যুদ্ধে যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক অধিকার দিবার সর্ত্তে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই আপৎকালে এইভাবে অলস নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকিয়া দেশ অন্য কোন শত্রুকে অধিকার করিবার সুযোগ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষও ভাল করিবেন না, ভারতবাসীও বুদ্ধিমানের মত আচরণ করিতেছেন না। রাজনৈতিক অধিকার আমরা চাই এবং পাইবও; কিন্তু ইতিমধ্যে যে সুযোগ আসিয়াছে—রণ-নৈপুণ্য অর্জ্জন করিবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ বর্ত্তমানে গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে আফশোষ করিতে হইবে। সুদীর্ঘকাল ভারতবাসী যুদ্ধবিদ্যার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারে নাই, দেশের শাসন ব্যবস্থাই তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু সেই ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ আজ সমুপস্থিত। ভারতবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে এ সুযোগ গ্রহণ করিলে দেশের কল্যাণই সাধিত হইবে বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর না করুন, ভারত যদি শত্রু হস্তেই বিপন্ন হয় তাহা হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা সেদিনে ভারতবাসীর কাজে আসিবে।

পূর্ণিয়ায় কেদার-জয়ন্তী—

গত ৪ঠা ফাল্গুন বঙ্গসাহিত্যজগতের দাদামহাশয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অশীতিতম জন্মোৎসব তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থান পূর্ণিয়ায় সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ণিয়াবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা গণ্য নগণ্য সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া কেদারনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। বাহির হইতে গিয়াছিলেন "বনফুল", শ্রীসজনীকান্ত দাস, বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি কবি নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "প্রভাতী" সম্পাদক শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, "উত্তরা" সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভাগলপুর শাখার প্রতিনিধি শ্রী[illegible]

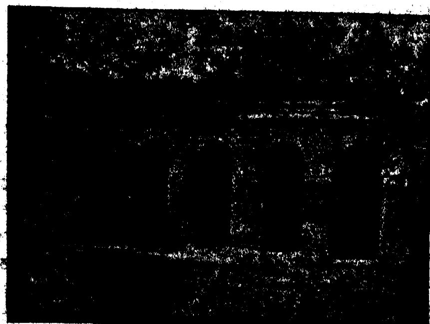


পূর্ণিয়ায় কেদার-জয়ন্তী উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ ফটো—ক্যালকাটা ষ্টুডিও, ভাট্টা

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন. শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাকে পত্রযোগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছিলেন। "বনফুল", শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, গল্প-লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও আয়ুর্ব্বেদ-সোপান উপহার দেন। পূর্ণিয়াবাসীরাও গড়গড়া, রূপার দোয়াত কলম, আসন, ভাল একটি প্রদীপাধার প্রভৃতি অনেক উপহার দ্রব্য সভাস্থলে উপস্থিত করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়া শহর হইতে তিনটি, রংপুর ছাত্র সমিতি হইতে একটি, শান্তি নিকেতন 'সাহিত্যিকা' হইতে একটি, ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে একটি—এই ছয়টি মানপত্র তাঁহাকে সভাস্থলে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া 'বনফুল' এবং সজনীবাবু প্রত্যেকে স্বরচিত কবিতা-প্রশস্তি পাঠ করিয়া দাদামহাশয়কে প্রণাম করেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথের পত্রটিও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। সাহিত্যিক কেদারনাথের পরিচয় অনাবশ্যক, কিন্তু স্নেহময়, নিষ্কলঙ্ক, অজাতশত্রু, অনাড়ম্বর, জ্ঞানবৃদ্ধ রসিক দাদামহাশয়কে চিনিবার সৌভাগ্য অনেকের হয় তো হয় নাই। যাঁহাদের হয় নাই তাঁহারা সত্যই একটা বড় জিনিস হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কেদারনাথ তীর্থের মতই শুভ্র সুন্দর আমাদের দাদামহাশয়। তাঁহাকে প্রণাম করিলে জীবন ধন্য ও আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে দাদামহাশয় একটি অভিভাষণে মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। অভিভাষণটি চমৎকার হইয়াছিল। পূর্ণিয়াবাসী বাঙ্গালীগণ এই উৎসবের আয়োজন করিয়া একটি চারু কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন, এজন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীযুক্ত সুহাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সহৃদয় আতিথেয়তা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

দক্ষিণেশ্বরে উৎসব—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দক্ষিণেশ্বর বাবাঠাকুরতলায় কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-ভিটায় তাঁহার অশীতিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে পৌরহিত্য করেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপতলে দক্ষিণেশ্বর-আড়িয়াদহ গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত সুধী ও কলিকাতার কতিপয় সাহিত্যিক এই উৎসবে যোগদান করিয়া কেদারনাথের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের পর শ্রীকানাইলাল পাকড়াশী গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে প্রশস্তি পাঠ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলে পর কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যোপাধ্যায় শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতির প্রেরিত কবিতা পঠিত হয়। পরে কেদারনাথ, রামানন্দ



দক্ষিণেশ্বরে কেদারনাথের বাসগৃহ ফটো—প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে কেদার-জয়ন্তী উৎসব ফটো— নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরিত লেখা সভায় পঠিত হয়। শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারনাথের সাহিত্য সাধনার প্রেরণা ও তাঁহার রচিত প্রথম গল্প কালী ঘরামী সম্বন্ধে গল্পাকারে কিছু বলেন। শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী বাঙ্গালা সাহিত্যে কেদারনাথের দান সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু কেদারনাথ সম্বন্ধে বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা এবং শ্রীসুবোধকুমার রায় কেদারনাথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় কেদারনাথের সাহিত্য সাধনা, সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধের ফলে যে নবযুগের সূচনা দেখা দিয়াছে তাহার আলোচনা করেন। কেদারনাথ রসিকজনচিত্তে রস পরিবেশন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জাতি ও সমাজের নিখুঁত চিত্র সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অভিনব ভাবে ফুটাইয়া গিয়াছেন। কেদার জয়ন্তীতে পঠিত সমুদয় রচনাবলী দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর উদ্যোগীরা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহার একখণ্ড কেদারনাথকে উপহার পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে তাহার দ্বিতল গৃহটি 'কেদারনাথ হল' নামে অভিহিত হইবে।

বিক্রয়কর আইন ও পাঞ্জাব সরকার—

পাঞ্জাবে দেড় মাসেরও অধিককাল বিক্রয় কর আইনের বিরুদ্ধে লাহোরের ব্যবসায়ীরা হরতাল ও সত্যাগ্রহ চালাইয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি উভয় পক্ষের চেষ্টায় এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান হইল। বেপারীমণ্ডল সত্যাগ্রহ ও হরতাল তুলিয়া লইয়াছেন, অপর পক্ষে সরকারও সত্যাগ্রহীদের কারামুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা হইতে এই কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, অতঃপর এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটিল। তবে যে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, এই ব্যবস্থায় তাহা সাময়িকভাবে বন্ধ রহিল। এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাব সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিলেন তাহাতে তাঁহাদের গৌরববৃদ্ধি হইল বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু দেখিতে পাইতেছি না। কেন না, বেপরোয়া বল-প্রয়োগের দ্বারা বিক্রয়-কর বিরোধী আন্দোলন দমন করিতে গিয়া সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল পাঞ্জাব নহে, সমগ্র ভারতে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত যে সরকারের সুমতি হইয়াছে তাহা মন্দের ভাল বলিয়াই আমরা মনে করিব।

সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ—

ডক্টর শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, পিএচ-ডি মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীত হইলাম। তিনি শুধু নিজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত নহেন, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে এবং সকলেই আশা করেন, তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালকেই বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সম্পাদকের কার্য্য করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত সমিতির সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, ডক্টর দত্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ সময়ে

ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, পিএচ্-ডি

তিনি সমিতির কার্য্যধারা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ ইতিহাস ও সংস্কৃতে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

চিয়াং কাইশেকের দান—

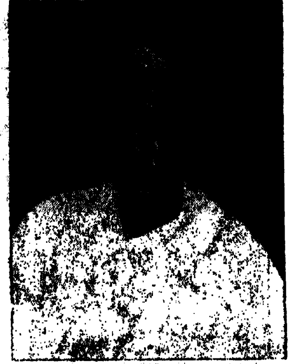
মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মার্শাল কবির পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথকে উক্ত সাহায্য পাঠাইয়া লিখিয়াছেন—রবীন্দ্র-প্রতিভার গুণমুগ্ধ ভক্তের সামান্য দান-হিসাবে যেন এই অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কোন কাজে ব্যয় করা হয়। শুধু ইহাই নহে, মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেক শান্তিনিকেতনের চীনা-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিবার জন্য আরও ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দান আজিকার দিনে নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন ও ভারত উভয়েই আজ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ফ্যাসিস্ত শক্তির সম্মুখীন। সুতরাং এই দান দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী স্থাপনে সত্যকার সাহায্য করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। দাতা শতং জীবতু—এই কথাই আজ আমরা বলি এবং সেই সঙ্গে এই কথাও বলিতে চাই যে, ভগবান তাঁহার জীবনস্বপ্ন সফল করুন।

পাটনায় বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পাটনা সায়েন্স কলেজ ভবনে প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুত সরোজকুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভায় ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রঙ্গীণ হালদার প্রমুখ বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমিতির স্থায়ী সভাপতি অধ্যাপক রমাপতি গুপ্ত কর্ত্তৃক অভ্যর্থনার পর শ্রীযুত রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী সমিতির বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। সভাপতি সরোজবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে নূতন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। অপরাহ্নে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি চা-চক্রের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং প্রিন্সিপাল কামতা প্রসাদ সকলকে আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত গণেশচন্দ্র শিরোমণি—

গত ২৪শে মাঘ ২৪পরগণা এড়িয়াদহ নিবাসী পণ্ডিত গণেশচন্দ্র শিরোমণি ৯৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা সুরতী বাগানের প্রসিদ্ধ শিরোমণি বংশের সন্তান। আজীবন তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এরূপ অনাড়ম্বর সরল লোক ক্রমেই দুর্লভ হইতেছেন।



পণ্ডিত গণেশচন্দ্র শিরোমণি

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট—

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইয়াছে। তাহাতে চলতি সালে সত্তর কোটি এবং আগামী বৎসরে সাতচল্লিশ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য যে দেশের আত্মরক্ষার ব্যয় প্রতিদিন প্রায় তেত্রিশ লক্ষে উঠিয়াছে, তাহাদের বাজেটে এই বিপুল ঘাটতির সম্ভাবনায় অবাক হইবার কিছু নাই। কিন্তু দেশরক্ষার এই বিরাট ব্যয় কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া সঙ্কুলান হইবে, তাহাই আসল সমস্যা। ভারতের অর্থসচিব স্যর জেরেমি রেইসম্যান তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থসচিবদের পন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং যেখানে যত রকম ট্যাক্স বৃদ্ধির সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে তাহাদের প্রায় সবগুলিরই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ১৯৪১-৪২ সালে দেশরক্ষা খাতে সংশোধিত হিসাব দাঁড়াইয়াছে ১০২ কোটি টাকা।



পাটনায় বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলন—চেয়ারে (বাম হইতে দক্ষিণে)—রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্নেহময় ঘোষ, পি-এন-দে, রমাপতি গুপ্ত, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, অধ্যক্ষ কামতা প্রসাদ, এস-পি-প্রসাদ, রায় বাহাদুর কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ দত্ত

পরের বৎসর এই ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৩৩ কোটি টাকা। ইহার উপর আবার অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে যে মোট অর্থব্যয় হইতেছে ইহা তাহার একটি অংশমাত্র। সুতরাং এই বিপুল অর্থের সঙ্কুলান করিতে হইলে যে ছোটখাট আয়ের পরিবর্ত্তে যেখানে



স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতা মোহম্মদ আলি পার্কে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তৃতা ফটো—তারক দাস

মোটা টাকার সম্ভাবনা আছে সেখানেই হাত দিতে হয়। তাই তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন—(১) তুলা, পেট্রল ও লবণের উপর ব্যতীত বর্ত্তমান আমদানি শুল্কের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে সারচার্জ্জ ধরা হইবে। (২) পেট্রল ট্যাক্স শতকরা ২৫৲ টাকা হারে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। (৩) যাহাদের বার্ষিক আয় এক হাজার টাকা হইতে দুই হাজার টাকা তাহাদের আয়ের প্রথম ৭৫০৲ টাকা বাদ দিয়া বাকী আয়ের উপর টাকা প্রতি দুই পয়সা হারে ট্যাক্স ধার্য্য হইবে। (৪) আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ শতকরা ৩৩ হইতে ৫০ টাকা করা হইবে। (৫) খামের দাম পাঁচ পয়সা হইতে ছয় পয়সা হইবে। (৬) সাধারণ তারের মাশুল দশ আনার স্থলে বার আনা এবং জরুরী তারের হার পাঁচসিকা হইতে দেড়টাকা করা হইবে।

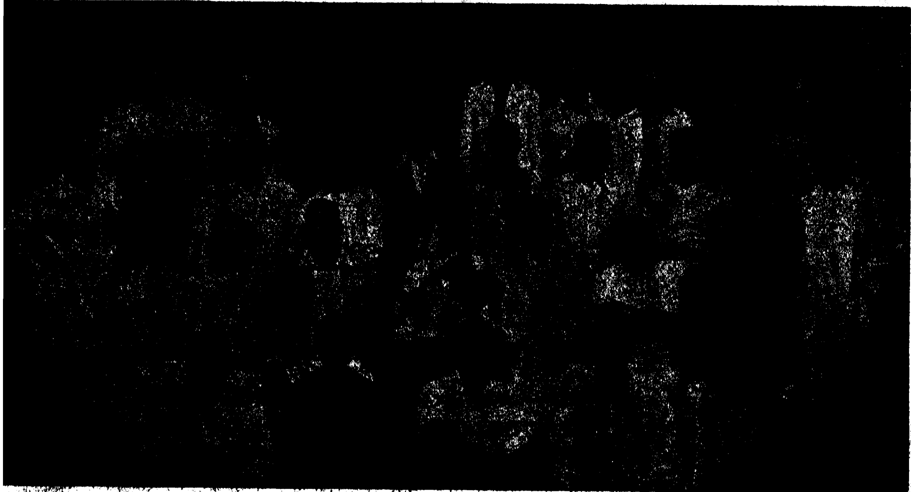
অর্থসচিব মহাশয় আশা করেন, এই সকল করবৃদ্ধিতে সরকারের তহবিলে মোট বার কোটি টাকা আয় হইবে, তাহার পরও যে ৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি থাকিয়া যায় তাহা ঋণ করিয়া পূরণ করা হইবে। তবু ভাগ্য, অর্থসচিব মহাশয় দেশের নরনারীর বর্দ্ধিত করভার প্রপীড়িত স্কন্ধে আরও করভার না চাপাইয়া ঋণ করিয়া ঘাটতি মিটাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

বোম্বায়ে সরস্বতী পূজা—

বোম্বাই সহরের হর্ণবি রোডস্থ সীতারাম বিল্ডিংসে যে 'বেঙ্গল লজ' নামক বাঙ্গালী সমিতি আছে, তাহার সভ্যগণ এবার সমারোহের সহিত সরস্বতী পূজা উৎসব করিয়াছিলেন। আমরা এই সঙ্গে তাহার ছবি প্রকাশ করিলাম। স্থানীয় শ্রীযুত গৌরমোহন নাথ, ষড়ভুজ নাগ, শশাঙ্ক মিত্র, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চরিত্রভূষণ রুদ্র, সরোজাক্ষ চন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বোম্বায়ে বাঙ্গালীদের খেলাধুলা—

বোম্বাই প্যারেলের শ্রীকৃষ্ণনিবাসস্থ বেঙ্গল ক্লাবের বার্ষিক খেলা-ধুলা গত ২৫শে জানুয়ারী সেণ্ট জেভিয়ার্স জিমখানা মাঠে সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ও পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতায় শ্রীমান দেবব্রত মজুমদার ও কুমারী উমা মৈত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই অনুষ্ঠান বিশেষ স্মরণীয়।



বোম্বাইয়ে বেঙ্গল লজে বাঙ্গালীদের সরস্বতী পূজা উৎসব



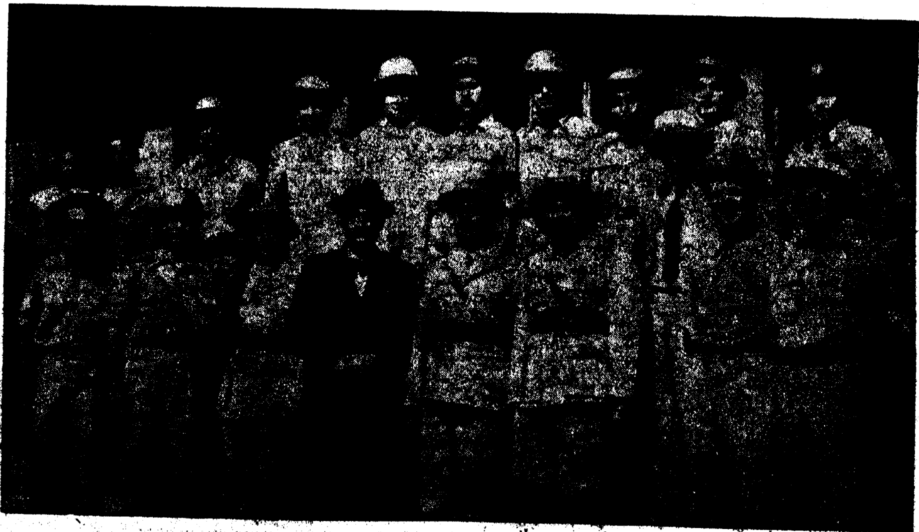
বোম্বাই প্যারেলে বেঙ্গল ক্লাবে বাৎসরিক খেলায় যোগদানকারী খেলোয়াড়গণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন—

এবারের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার বাঙ্গালার গবর্ণর স্যর জন হার্বার্ট এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এ বৎসর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে অনারারি ডক্টর অফ ল, শ্রীযুক্তসতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা সুরমা মিত্রকে পি-এইচ ডি এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দুনাথ রায়কে ডি-এস্‌সি উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসরের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন বিখ্যাত মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহিলা-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী পাইয়াছেন ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। এ বৎসর ৩০ জনেরও অধিক মহিলাসহ মোট ৫,৪১২ জন গ্রাজুয়েট ডিগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৫৬৩জন এম-এ, ১১২জন এম্-এস্-সি, ২,৮২৫জন বি-এ, ৩২০জন বি-কম্, ৭৭৫জন বি-এস-সি, ২৭০জন বি-টি, ৩০০জন বি-এল্, ১৫০জন এম্-বি, ২৭জন ডি-পি-এইচ, ৪৯জন বি-ই, বি-মেট—৩ এবং ১৮জন কথ্য ইংরেজীতে ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। ভাইসচান্সেলার স্যর মোহাম্মদ আজিজুল হক তাঁহার ভাষণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য জোর দেন এবং সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট দেশে সৎ-শিক্ষার প্রচার যে সম্ভব নহে তাহাও স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করেন।

সস্ত্রীক চীন-নেতার ভারত আগমন—

ভারতের বড়লাটের অতিথি হিসাবে চীনের জননেতা মার্শাল চিয়াং কাইশেক সম্প্রতি সস্ত্রীক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনের স্বাধীনতা গ্রাস করিবার জন্য গত পাঁচ বৎসর কাল যে লোকক্ষয়কর যুদ্ধে ব্যাপৃত, মার্শাল চিয়াং অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই প্রবল শত্রুর সাম্রাজ্য-লিপ্সাকে বাধা দিয়া আসিতেছেন। অপরপক্ষে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়াছে। এমন সময় মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের ভারত আগমনের গুরুত্ব অনেক। তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। চীন ও ভারতের মধ্যে মিত্রতা পূর্ব্ব হইতেই ছিল এবং উভয়েই অতিপুরাতন সভ্যতার ধারক ও বাহক। ভারত বহু পূর্বেই তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে, চীনও হারাইতে বসিয়াছে। এমন সময় এই দুই দেশের মধ্যে একটা সত্যকার মৈত্রী স্থাপিত হইলে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।



কলিকাতা শ্যামপুকুর এলাকার এ-আর-পি কর্মীবৃন্দ—মধ্যে ডাক্তার পি-কে চট্টোপাধ্যায় ফটো—তারক দাস

দেবেন্দ্রনাথ হেমলতা স্বর্ণপদক—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবেন্দ্রনাথ হেমলতা স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। এম-এ ও এম-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহার স্বাস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তাঁহাকে এই পদক প্রদান করা হয়। পূর্ণেন্দু শিক্ষায় যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই বক্তৃতা প্রদানেও সুদক্ষ। ইতিপূর্ব্বে তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সম্মান লাভ করিয়াছেন। আমরা শ্রীমানের জীবনে সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।



শ্রীমান পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাঙ্গালার আয়-ব্যয়ের হিসাব—

বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে সেদিন অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব পেশ করিয়াছেন। সেই হিসাবে দেখা যায় যে, বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে এবং গত বৎসরে ৯০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব হিসাবে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ঘাটতির বরাদ্দ ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ অনেকটা কম পড়িয়াছে, কারণ বরাদ্দের অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ ২৮ লক্ষ কম ও ব্যয়ের পরিমাণও ৪০ লক্ষ কম হইয়াছে। রাজস্ব হিসাবের বাহিরে ৭৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল কম-ইস্যু হওয়ায় বৎসর শেষে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং চলতি বৎসরে প্রাথমিক বাজেট-বৎসরের প্রথমে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার যে তহবিল বরাদ্দ ছিল, তাহা সংশোধিত বাজেটে কমিয়া ১ কোটি ১০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। চলতি বৎসরের প্রাথমিক বাজেটে রাজস্ব হিসাবে আয়ের বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে আয়ের পরিমাণ ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৯৪ লক্ষ অধিক হইবে—এরূপ বরাদ্দ হইয়াছে। আয়করের প্রাপ্য অংশ প্রাথমিক বরাদ্দের অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যাইবে। বিক্রয় কর হইতে ২৫ লক্ষ, পেট্রল ট্যাক্স হইতে দুই লক্ষ ও কাঁচা পাট বিক্রয় কর হইতে আট লক্ষ চলতি বৎসরে আদায় হইবে। এই টাকা প্রাথমিক বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কারণ এই ট্যাক্সগুলি বাজেটের পরে আদায় করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। গত বৎসর যে পাট ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া এ বৎসর ৩৬ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাকে বাড়তি আয়ও বলা চলে না, ইহা সরকারী সম্পত্তির নগদ টাকার রূপান্তর মাত্র। কলিকাতা ট্রাষ্টের সহিত একটা পুরাণ হিসাব নিষ্পত্তির ফলে ৬ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং আবগারী বিভাগের আয়ও ৭ লক্ষ অধিক হইবে। অপর পক্ষে পাট রপ্তানি শুল্কের আয় ২০ লক্ষ কম হইবে এবং ভূমি রাজস্বের আয়ও ৬ লক্ষ কম হইবে—এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। চলতি সালে বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও ঝড়ের দরুণ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য সরকারকে নানাভাবে ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে হইয়াছে। জনরক্ষা (এ. আর. পি) ব্যবস্থাদির



কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল প্রভৃতি

আগামী বর্ষে আনুমানিক ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। চলতি বৎসরে ১ কোটি ৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে দরুণ প্রাথমিক বাজেটে মাত্র ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে চলতি সালে এই বাবদে ৭৮ লক্ষ

টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা বিনা সুদে ঋণ পাওয়া গিয়াছে। চলতি সালের শেষ মাসে ট্রেজারী বিল ইস্যু করিয়াও ১ কোটি টাকা ঋণ করা হইবে। এই ১ কোটি ৭৫ লক্ষ

উল্লেখযোগ্য। কুইনিনের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য শিল্প বিভাগে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার অধিক বরাদ্দ হইয়াছে। নূতন ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপনের জন্য সাড়ে তিন লক্ষ, জেল বিভাগে আড়াই লক্ষ, সাধারণ শাসন কার্য্যে



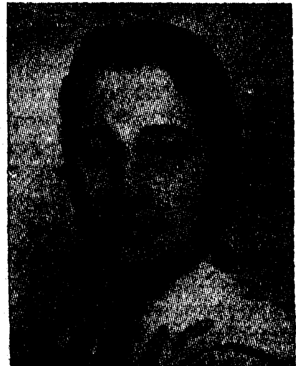
১০ই জানুয়ারী রিষড়ায় নিখিলবঙ্গ মিউনিসিপাল সম্মিলনে সমবেত মিউনিসিপাল কমিশনারবৃন্দ

ঋণের টাকা ধরিয়া চলতি সালের শেষে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা তহবিলে থাকিবে। আলোচ্য সালে রাজস্ব হিসাবে আয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ১৫০ কোটি ৭০ লক্ষ এবং ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ—ঘাটতির পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ। ডেট ডিপজিট বিভাগের ৬৯ লক্ষ উদ্বৃত্ত সহ বৎসর শেষে তহবিল দাঁড়াইবে ৭৯ লক্ষ টাকা। বিক্রয়-কর, পেট্রল-ট্যাক্স ও কাঁচা-পাট-বিক্রয়-কর হইতে আগামী সালে চলতি সাল অপেক্ষা ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে এবং আয়করের অংশও বর্ত্তমান সাল অপেক্ষা ২৬ লক্ষ টাকা অধিক হইবে এইরূপ বরাদ্দ হইয়াছে। পাট রপ্তানি শুল্কের আয় ৩৫ লক্ষ টাকা কম ধরা হইয়াছে। পাট বিক্রয় করিয়া যে টাকা এ বৎসর পাওয়া গিয়াছিল, আগামী সালে সে রকম কিছু পাওয়া যাইবে না। অন্যান্য কয়েকটি দফায়ও আয় হ্রাসের সম্ভাবনা হইয়াছে। চলতি সালের তুলনায় আগামী সালে মোট ৪৪ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে। চলতি সালে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার্ত্তদের জন্য যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, আগামী বাজেটে সে জায়গায় মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সুতরাং আসলে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার। ইহার মধ্যে জনরক্ষার বাবদেই চলতি সাল অপেক্ষা আগামী সালে ৪৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে অর্থাৎ আগামী সালে এই বাবদে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। শিক্ষা বাবদ ছয় লক্ষ টাকা অধিক বরাদ্দ হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য জেলা শিক্ষা বোর্ডগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা চলিতেছে! সরকারের সিদ্ধান্ত স্থির না হওয়ায় বাজেটে পূর্ব্বেকার বরাদ্দই ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার রাখা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়ও ছয় লক্ষ টাকা অধিক বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার মধ্যে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ৬০ হাজার টাকার বরাদ্দটি

পৌনে দুই লক্ষ এবং পোর্ট ও পাইলট সার্ভিসের জন্যে পৌনে দুই লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। প্রত্যাসন্ন শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায় দেশের শিল্প বাণিজ্যে সবদিক দিয়াই একটা বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এবং সত্য সত্যই যদি কিছু বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে আনুমানিক আয়ের অনেক কিছুই কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। তখন বাঙ্গালা সরকারকে এক বিরাট অর্থ সঙ্কটের মধ্যে পড়িতে হইবে।

মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব—

সৈয়দা ফাতেমা সাদেক এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবী ভাষায় যোগ্যতার সহিত এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় মহিলা এই সম্মানের অধিকারিণী হন নাই। সম্প্রতি ইনি কলিকাতার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে আরবী ভাষার অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইসলামীয়া কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও ইসলামীয়া সংস্কৃতির অধ্যাপক খলিলুর রহমান



সৈয়দা ফাতেমা সাদেক

সাহেবের কন্যা ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সাদেক সাহেবের পত্নী। ইঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবী আফিয়া খাতুন সাহেবাও ছিলেন শিক্ষাব্রতিনী, চট্টগ্রাম মোস্লেম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী।

রাণী শ্যামমোহিনী চৌধুরাণী—

দিনাজপুর হরিপুরের জমীদার রাজর্ষি ৺যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরীর মাতা রাণী শ্যামমোহিনী চৌধুরাণী গত ৮ই মাঘ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক-



রাণী ৺শ্যামমোহিনী চৌধুরাণী

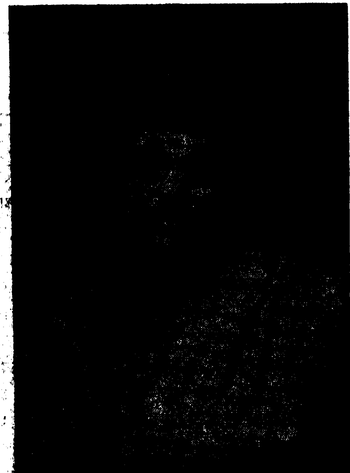
গমন করিয়াছেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নানা বিষয়ে বহু অর্থ দান করিতেন। উত্তরবঙ্গে বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের পতন—

একদা বৃটিশ ফিল্ডমার্শাল লর্ড রবার্টস্ বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাস একদিন সিঙ্গাপুরে মীমাংসিত হইবে। সেই সিঙ্গাপুরের পতন হইল। গত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ এডমিরাল্ লর্ড জেলিকো সিঙ্গাপুর নৌঘাটি নির্ম্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন এবং ১৯২২ সালে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বৃটিশ সরকার নৌঘাঁটি নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওয়াশিংটন বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই (১৯২২ সালে) অ্যাংলো-জাপ মিত্রতা ছিন্ন হয়। ঘাঁটি তৈয়ারি করিতে প্রায় পনর বৎসর লাগিয়াছে। এই ঘাঁটি তৈয়ারি করিতে সবশুদ্ধ পাঁচ কোটি পাউণ্ড ব্যয়িত হয়, আর প্রতি বৎসর ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দরকার হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব নানা দিক দিয়াই অত্যন্ত বেশী। ঘাঁটির প্রধান কাজ যুদ্ধরত অর্থাৎ জাহাজের মেরামত, কয়লা ও রসদাদির যোগান এবং যুদ্ধের সময় জাহাজের জন্য অস্ত্রাদি সরবরাহ করা। জাহাজ মেরামতের দুইটি ডক, একটি ভাসমান আর একটি গ্রেভিং। সিঙ্গাপুরকে যতটা সম্ভব সুরক্ষিত করার চেষ্টা হইয়াছিল পুরাতন যুদ্ধনীতির দিক দিয়া, কিন্তু এবারের যুদ্ধ সে নীতির কাছ দিয়াও যায় না। তাই জলপথে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করিয়া জয় করা অসম্ভব ব্যাপার হইলেও সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অতি সহজেই জাপানী সৈন্য গভীর রাত্রিতে নৌকাযোগে সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করে এবং প্রায় ম্যাল্কম সেখানকার প্রধান সামরিক কর্ত্তা বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করেন। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেন, সিঙ্গাপুর জয় করিতে হইলে উত্তর দিক হইতে মালয় অধিকার করিয়া স্থলপথে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। থাইল্যাণ্ড ও মালয় সম্বন্ধে বৃটেন নিশ্চিন্ত ছিল, তাই স্থলপথে আক্রমণ সে কোনদিন সম্ভব মনে করে নাই। চারি হাজার মাইল দূর জাপান হইতে হংকং ও ম্যানিলার ঘাঁটি পার হইয়া জাপান কোনদিন মালয়ে সৈন্য নামাইতে পারিবে, ইহার সম্ভাবনা-কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু তাহাই কার্য্যত সম্ভব হইল। হংকং প্রায় জাপানের দখলে, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড জাপানের করায়ত্ত। জাপান মালয়ে শুধু সৈন্যই নামায় নাই, উত্তর মালয় ও সেখানকার বিমান ঘাঁটিও আয়ত্তাধীন করে; পেনাং হস্তগত হয় এবং তারপর, দ্রুত সিঙ্গাপুরের দিকে ধাবমান হয়। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' ও 'রিপালস্' ডুবীর পর জলপথেও জাপানের রাস্তা প্রায় পরিষ্কার হইয়াই গিয়াছিল।

ভারতের প্রতিনিধি—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ভারতের সম্মতি না লইয়াই বৃটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ যখন প্রথমাঙ্ক শেষ হইতে চলিয়াছে ঠিক সেই সময় বৃটিশ উপনিবেশগুলিকে সমর পরিষদ ও প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কিত সমর সভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশগুলিকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ভারতকেও ঠিক সেই অধিকারই প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকার যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অর্থহীন। ভারত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করে নাই, সুতরাং যাহারা সেই অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাদের সহিত সমানাধিকারত্বের দাবী ভারতের হইতেই পারে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতের কাম্য নহে, পায়ও নাই। সুতরাং কাগজে কলমে ভারতকে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়ায় ভারতের কোন সত্যকার কল্যাণ সাধিত হইবে না। ভারতের শাসন-যন্ত্র জনমতানুসারে পরিচালিত হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-



বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নব নির্ব্বাচিত ডেপুটি স্পিকার
সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী

পরিষদের একটা রূপ ভারতেও আছে বটে, কিন্তু শাসন পরিচালনে সে পরিষদের এতটুকু কর্ত্তৃত্ব নাই। ভারতের শাসন পরিচালিত হয় বৃটিশ

উপনিষদ আলোচনা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

প্রাচীন উপনিষদে পরাবিদ্যাকে বা দার্শনিক জ্ঞানকে মুক্তির উপায় স্বরূপ ততটা মূল্য দেওয়া হ'ত না, যতটা হ'ত নিছক জ্ঞান হিসাবে। তার কারণ ছিল দুইটি। প্রথম, সেকালে জন্মান্তরবাদ তখন পূর্ণ এবং সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়নি, তখন মাত্র ভাসা ভাসা আকারে তা বর্দ্ধিত হচ্ছে মাত্র। কাজেই জন্মান্তরবাদে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগে না। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, জ্ঞানকে নিছক জ্ঞান হিসাবেই তাঁরা তারিফ করতেন, তার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করতেন না। নিছক জ্ঞানপিপাসাই তাঁদের কাছে সব থেকে বড় জিনিস ছিল। বিত্তকে তাঁরা ত্যাগ করতেন বা ভোগ-ঐশ্বর্য্যকে আমল দিতেন না, তার কারণ এ নয় যে, তা সকল যন্ত্রণার মূল ; তার কারণ এই যে, তা যে আনন্দ দেয় তা মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এর পেছনে আনন্দের বিষয়ের গুণ-হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ আছে। আনন্দের জিনিস অনেক ; কিন্তু তারা যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দের গুণ-হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ আছে। যেমন তাস খেলার থেকে বই পড়ার আনন্দ বেশী, যেমন সুস্বাদ খাদ্য থেকে যে আনন্দ, সুন্দর সঙ্গীতের আনন্দ তার থেকে উচ্চতর। বিষয় ভোগের আনন্দ হ'তে পরাবিদ্যা আহরণের আনন্দই তাঁদের কাছে মধুরতর ঠেকত। বিষয়-ভোগে বা আনন্দ-উপলব্ধি করতে তাঁরা পরাঙ্মুখ ছিলেন না, আনন্দের বস্তুনির্দ্ধারণে তাঁদের পক্ষপাতিত্ব ছিল মাত্র।

পরবর্ত্তীকালে প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মনেই যে নিরাশ মনোভাব জেগেছিল, বাস্তবিক বলতে সে মনোভাবের কোন আভাসই আমরা প্রাচীন উপনিষদগুলিতে পাই না। এ বিষয়ে সকলেরই প্রায় ঐকমত্য ছিল যে, ইহজীবন দুঃখের, জন্ম মানে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ —অতএব মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, পুনর্জ্জন্ম হতে অব্যাহতি চাই। এক চার্ব্বাক দর্শন ছাড়া অন্য সকল দর্শনই এই মনোভাবকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন, এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন ও এ মনোভাবের প্রভাবকে পরিবর্জ্জন করতে সক্ষম হয় নি। এই মনোভাবকে কিন্তু প্রাচীন উপনিষদের ত্রিসীমানার কোন স্থানেই খুঁজে পাই না। সেখানে তার পরিবর্ত্তে আমরা বরং পাই, একটা আনন্দভোগের এবং ইহজীবনের মধ্যেই আনন্দের অনুভূতির সম্ভাবনার নির্দ্দেশ। এই উৎফুল্ল মনোভাব, জলে, স্থলে, আকাশে, সর্ব্বত্রই মধুর আস্বাদ পায়। এই মনোভাব সুখানুভূতিকে এড়িয়ে চলতে বলে না, তাকে গ্রহণ করতে বলে। এই মনোভাব বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস অবলম্বন করতে আদেশ করে না, নানা কাজের মধ্যে, নানা রসের আস্বাদের মধ্যে দীর্ঘতম জীবনের কামনা করতে মানুষকে শিক্ষা দেয়।

ঈশ উপনিষদ বলেন, "ইহজীবনে কর্ম্ম ক'রে ক'রে একশত বৎসর জীবন ধারণ করতে ইচ্ছা করা উচিত।(১) আর বলেন যে, "যে মানুষরা আত্মহত্যা করে তারা মৃত্যুর পর ঘন অন্ধকার বেষ্টিত এক অসুরের দেশে যায়।"(২) তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন, "ব্রহ্ম হ'লেন রসস্বরূপ, তিনি রস প্রাপ্ত ক'রে আনন্দের আস্বাদন পান। এই পৃথিবীতে কেই-বা নিশ্বাস ফেলত, কেই-বা প্রাণধারণ করতে চাইত—যদি এই আকাশ থেকে আনন্দ না ঝরত?"(৩)

এই তৈত্তিরীয় উপনিষদেই [illegible] উপদেশ দেন যে, অন্নকে পরিবর্জন করা উচিত নয়, তাই আমাদের ব্রতী হওয়া উচিত। বাস্তব সম্পদকেও তাঁরা পরিবর্জন করার প্রয়োজনীয়তা কোনদিনই অনুভব করতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ সপ্তম অধ্যায়ে বলেন "মানুষ সুখের আশাতেই কাজ করে, সুখ যদি না পেত তা হ'লে ত মানুষ কাজ করতে চাইত না।"(৪) তাঁরা সুখকে যে এড়িয়ে যেতে চাইতেন তা নয়। যা সুখদ যা মানুষকে রসাস্বাদ করায়, সন্ন্যাসপন্থীর যেমন তার উপর একটি প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্বেষভাব আছে, প্রাচীন উপনিষদে আমরা তা পাই না। সুখপ্রদ জিনিসের প্রতি অনাসক্তি তাঁদের ছিল না। তবে তাঁরা সুখপ্রদ জিনিষকেও বাছাই ক'রে নিতেন। যা অল্প সুখ দেবে, ক্ষণিক সুখ দেবে তাকে ত্যাগ ক'রে যা অনন্ত অসীম সুখের সন্ধান দেবে তার প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশী। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করবার চেষ্টা হয়েছে বেশী। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন, "যা ভূমা যা অনন্ত, তাই আসল সুখের সন্ধান দিতে জানে ; অল্পেতে ত সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ।"(৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাস্তব পৃথিবীর যা কিছু তার সবতাতেই মধুর আস্বাদ পান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাই, "এই পৃথিবী সর্ব্বজীবের কাছে মধু স্বরূপ এবং এই পৃথিবীর সমুদয় জীব মধু স্বরূপ।"(৬) এই উপনিষদেরই চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানকে পরম আনন্দের আস্বাদ দানকারী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্রহ্মের আনন্দের এই সম্পর্কে একটি বিস্তারিত পরিমাপ দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপত বলতে গেলে এই বলা হয়েছে যে, একটি সর্ব্ববিষয়ে সুখী মানুষের যত আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ তার কোটি কোটি গুণ বেশী এবং এই ব্রহ্মের আনন্দের কণিকামাত্র লাভ ক'রেই আমরা [illegible] আনন্দে পরিপ্লুত হই।(৭) এই উপনিষদের অন্যত্রই আমরা সেই সর্ব্বজন-পরিচিত বর্ণনাটি পাই যা আকাশে বাতাসে নদীতে সর্ব্বত্র মধুর ছড়াছড়ি পায় "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্ব ওষধীঃ মধু নক্ত মুত্তোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতামধুমান্নো বনস্পতি মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ সর্ব্বাশ্চ মধুমতীঃ।"(৮)

সন্ন্যাসবাদীদের মত কিন্তু এ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। বৈরাগ্যকে উদ্রেক করবার স্বপক্ষে যত-কিছু যুক্তি সম্ভব, তা তাঁরা গ্রহণ করেন এবং সেই যুক্তির বলে মোটামুটি এই আদর্শ প্রচার করেন যে, বিষয়ভোগ হতে ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট রাখাই আমাদের জীবনের পরমার্থ। সন্ন্যাসবাদী উপনিষদগুলিও ঠিক এই কথাই আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করে। এদের সংখ্যাও বিশেষ কম নয়। সর্ব্বমোট এই নয়খানি সন্ন্যাসবাদী উপনিষদ আছে: জাবাল, ভিক্ষুক, সন্ন্যাস, অধ্যাত্ম, কুণ্ডিকা, আত্মা, অবধূত, যাজ্ঞবল্ক্য, মুক্তিক। বলা বাহুল্য, এইটিই তাদের অপ্রাচীনতার লক্ষণ।

সন্ন্যাসবাদী উপনিষদগুলি শুধু ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, বৈরাগ্যবোধকেও সম্যক পরিমাণ উদ্রেক করবার ইচ্ছায়, নিজ দেহ এবং নারীজাতির প্রতি একান্ত বিদ্বেষ বপন করতে প্রয়াস করেছে। মানুষের দেহ সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়ভোগের উপায়স্বরূপ। কাজেই ইন্দ্রিয়-ভোগ থেকে বিরত করতে হ'লে দেহের ওপর ঘৃণা জাগানর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেইরূপ অপর পক্ষে, নারীর আকর্ষণ মানুষকে পারিবারিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং ভোগ সুখের প্রতি আকৃষ্ট করে। কাজেই সেই একই মনোভাব প্রণোদিত মানুষরা নারীর হীনতম ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে, যাতে আকর্ষণের গ্রন্থি শিথিল হয়ে গিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের বিতৃষ্ণা আসে। এইবার তার কিছু উদাহরণ দেবার প্রয়োজন হবে।

মৈত্রেয়ী উপনিষদ বলেন যে, আমাদের এই শরীরের উৎপত্তি অতি জঘন্য কর্ম্ম হতে. এই শরীর চেতনাহীন জড়, অস্থিমাংস আর চর্ম্ম দিয়ে তা নির্ম্মিত এবং বহু আবর্জ্জনার দ্বারা তা পরিপূর্ণ।(৯) বলা বাহুল্য, এ বর্ণনা একপেশে নিশ্চয়ই। সেইরূপ নারীজাতি এবং নারীদেহের উপরও তাদের কি অপরিসীম ঘৃণা। নারী পুরুষ জাতির কাছে প্রবল আকর্ষণের

বস্তু, কাজেই তাকে সর্ব্বস্থানে দূরে রেখে চলতে হবে ! নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ বলেন : কোন নারীর সহিত কথা কইতে নাই, পূর্ব্বে দেখা কোন নারীকে স্মরণ করতে নাই, তাদের সম্বন্ধে সকল আলোচনা বর্জ্জন করা উচিত এবং লিখিত আকারেও তাদের দেখতে নাই।"(১০) কেন এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া হয়েছে, "নারীকে দেখলে মানুষ উন্মত্ত হয়, মদ্যপান করলেও মানুষ উন্মত্ত হয়। সেই কারণ দৃষ্টিবিষ নারীকে দূরে থেকেই বর্জ্জন করবে।" অন্যত্র এক উপনিষদ এই উপদেশেরই স্বপক্ষে আরও কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন। এই উপনিষদ বলেন, "যার স্ত্রী তারই ভোগে ইচ্ছা জন্মায়, যার স্ত্রী নাই তার ত ভোগের বিষয় নাই। কাজেই স্ত্রীকে ত্যাগ করলে সমগ্র জগৎকে ত্যাগ করা হয় এবং জগৎ ত্যাগ করলেই সুখী হওয়া যায়।"(১১)

এই মনোভাবই নারীকে নরকের দ্বার বলে বর্ণনা ক'রে তৃপ্তি পেয়ে থাকে। নারীর দেহ সম্বন্ধেই বা তাঁদের বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে কি বিতৃষ্ণা উৎপাদক কৃত্রিম বর্ণনা ! এই উপনিষদই বলেন : "মাংস স্নায়ু অস্থি ইত্যাদি গ্রথিত নারীদেহের কিই বা শোভন। ত্বক মাংস রক্ত জল এবং বাষ্পরূপে পৃথক ক'রে তাকে দেখ, তাতে কি কিছু সৌন্দর্য্য পাও ? তা হ'লে কেন মিথ্যা মুগ্ধ হও ? ... কেশ ও কজ্জল ধারিণীরূপে তারা নয়নে ভাল লাগলেও দুস্পৃশ্য। নারী দুষ্কর্ম্মের অগ্নিশিখা-স্বরূপ, নরকে তৃণের মত পোড়ানই তাদের কাজ।" (১২) এর থেকে ঘৃণিততর বর্ণনা আর কি হতে পারে ?

যাতে মানুষ সুখ পায়, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করাকেই অনেকে বাহাদুরী মনে করেন। তার কারণ এই যে, যা সুখদ, তার প্রতি মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, তা থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন রাখা কষ্টকর কাজ। যা দুঃসাধ্য যা কষ্টকর, তাই করার প্রতি একটা আকর্ষণও অনেকের থাকে। এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়েই মানুষ কৃচ্ছ্র সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কৃচ্ছ্র সাধন এমনি দোষের জিনিষ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন জ্ঞান আহরণের জন্য অনেক সময় অনেক বৈজ্ঞানিক নানা দুর্গম স্থানে গমন করেন এবং জীবনকে বিপদাপন্ন করেন। সেখানে এই দুঃখ ভোগের সার্থকতা দুঃখ ভোগের কারণেই নয়, তার সার্থকতা অন্য যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তার দ্বারা। কৃচ্ছ্র সাধন এমনি নিরর্থক ভাবেই কখনও বাঞ্ছনীয় জিনিস হয় না, তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন গৌণ। সন্ন্যাসবাদীর কাছে কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধনের সার্থকতা কৃচ্ছ্র সাধনের জন্যই, তার দ্বারা আর কোন মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার উপর তা নির্ভর করে না।

উপরে আমরা দেখিয়েছি যে সন্ন্যাসপন্থীদের নিকট মানবদেহ এবং তথা নারীজাতি উভয়েই অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু। মানুষের মনের বাসস্থানরূপে এবং মনের একমাত্র কার্য্য করবার যন্ত্ররূপে যে তা প্রয়োজনীয় এবং তার একটা সার্থকতা আছে, সে কথা এঁদের চোখে পড়ে না। প্রাচীন উপনিষদগুলির দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। সেখানে দেহের উপর ঘৃণা নাই বরং আছে পরম শ্রদ্ধা, এই কারণে যে দেহ হ'ল আত্মার আবাসভূমি, দেহের মধ্যে মন বাস করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন, "আমি অমৃতের আধার যেন হই। আমার শরীর ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন করতে সক্ষম। আমার জিহ্বা মধুমত্তমা। আমি যেন কর্ণের দ্বারা অনেক কিছু শুনতে পাই। আমার মস্তিষ্ক হ'ল ব্রহ্মের কোষ স্বরূপ, তা মেধায় পরিপূর্ণ।" (১৩) দেহের প্রয়োজনীয়তা, দেহের সার্থকতা, দেহের জন্য এমন উদ্দণ্ড উল্লাস পরবর্ত্তী উপনিষদে, বিশেষ ক'রে সন্ন্যাসপন্থী উপনিষদে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে প্রাচীন উপনিষদে নারী-বিবর্জ্জনের কোন প্রশ্নই ওঠে না ; নারীকে তার সহজ স্বাভাবিক স্থান দিতে কোন কুণ্ঠা সেখানে পরিলক্ষিত হয় না। এখানে নারী কোথাও গৃহিণীরূপে, কোথাও বা দার্শনিক পণ্ডিতরূপে দেখা দেন। (১৪) যেখানে নারী গৃহিণীরূপে দেখা দেন, সেখানেও তাঁর মন কেবলমাত্র বাস্তবজীবন নিয়ে পরিব্যাপ্ত নয়, পরাজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সে স্থলেও দার্শনিক পণ্ডিতের মতই তীব্র, এবং সুযোগ ও সুবিধা হলে তিনি স্বামীর নিকট দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন। যেখানে নারী দার্শনিক বেশে অবির্ভূত হন, সেখানে তিনি গৃহকোণে লুক্কায়িত থাকেন না, প্রত্যক্ষ রাজসভায় পুরুষের সহিত সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে বাদানুবাদ করেন, তিনি তখন নারী কি পুরুষ এ প্রশ্নই জাগে না। পণ্ডিতের বা জ্ঞানপিপাসুর দরবারে, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

পরবর্ত্তীকালের অপ্রাচীন উপনিষদগুলি সাধারণত যে দলে সব থেকে বেশী গিয়ে পড়ে, তাদের প্রধান লক্ষণ হ'ল সাম্প্রদায়িক মত-পরিপোষণ। যখন এ উপনিষদগুলি রচিত, তখন একথা খুবই নিশ্চিত যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু ধর্ম্ম অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম তখন বহুল প্রচার লাভ করেছে। ফলে, যে সকল পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবী প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাদের প্রতি সম্প্রদায়ের বিভাগ অনুসারে ভক্তি এবং সেই বিশেষ দেবদেবীর গুণকীর্ত্তনই, তখন ভারতের ধর্ম্মের এবং তথা দার্শনিক চিন্তাধারাকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রভাবযুক্ত করেছিল। সেই কারণেই তখন মুক্তির পথ আর জ্ঞানমার্গে নির্দ্ধারিত হয় নি, নূতন মত ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই হ'ল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এই কালের প্রধান দেবতা হ'লেন বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। সেই কারণেই বোধ হয় বেশী সংখ্যক ভক্তিমূলক উপনিষদই হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, না হয় শৈব সম্প্রদায়ের মতের পরিপোষক। এ ছাড়া, অন্য ছোট দেবতারাও স্থান পেয়েছেন, যেমন—ব্রহ্মা, শক্তি, সূর্য্য ইত্যাদি। এদের মূল মন্ত্র হল জ্ঞানমার্গকে পরিবর্জ্জন ক'রে ভক্তিমার্গের প্রতিষ্ঠা করা। এইখানেই প্রাচীন উপনিষদের সহিত তাদের গভীরতম অমিল। প্রাচীন উপনিষদে আমরা দেখেছি, বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞের কর্ম্মমার্গ পরিবর্জ্জন ক'রে জ্ঞানমার্গ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় ষড়দর্শন সেই জ্ঞানমার্গকেই স্বীকার করে নেন। কিন্তু এখানে জ্ঞানপিপাসাকে আমূল উৎপাটন ক'রে সাম্প্রদায়িক দেবদেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনই মুক্তির উপায় বা জীবনের পুরুষার্থ ব'লে পরিগৃহীত হয়েছিল। ত্রিপদ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদ এ বিষয় এদের যা সাধারণ নীতি তা সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে "ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কখনও লাভ করা যায় না। সেই জন্য তুমিও সমস্ত উপায় পরিত্যাগ করে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। ভক্তিতিষ্ঠ হও। ভক্তির দ্বারা সমস্ত বিষয় সিদ্ধিলাভ করা যায়।" এখন আমরা এই দলের উপনিষদগুলির শ্রেণী-বিভাগ করব।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিপোষক উপনিষদ হ'ল এইগুলি : নারায়ণ, নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপিনী, নৃসিংহোত্তরতাপিনী, সুবাল, মন্ত্রিকা, সর্ব্বসার, যোগতত্ত্ব, আত্মপ্রবোধ, নারদ পরিব্রাজক, ত্রিশিখী, গোপাল-পূর্ব্বতাপিনী, গোপালোত্তরতাপিনী, কৃষ্ণ, বরাহ, দত্তাত্রেয়, গরুড়, কলিসংতরণ, ব্রহ্মবিন্দু, সীতা, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণ, রামপূর্ব্বতাপিনী, রামোত্তর-তাপিনী, বাসুদেব, মুদ্গল, মহ, পরমহংস, পরিব্রাজক, তারাসার। তালিকা এইভাবে অতিশয় দীর্ঘ। বলা বাহুল্য, নারায়ণ এবং তাঁর বিভিন্ন অবতার এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের মহিমা-কীর্ত্তনই এই উপনিষদগুলির উদ্দেশ্য। প্রাচীনত্বার কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

এইরূপ শৈব সম্প্রদায়ের উপনিষদগুলির তালিকাও বিশেষ ক্ষুদ্র নয়। অথর্ব, শিব, কালাগ্নি, নিরালম্ব, শুকরহস্য, দক্ষিণা মূর্ত্তি, শরভ, স্কন্দ, শাণ্ডিল্য, পাশুপতব্রহ্ম, রুদ্রহৃদয়, ভস্মজাবাল, পঞ্চব্রহ্ম, জাবালী, কৈবল্য— এরা হ'ল এই সম্প্রদায়ের উপনিষদ। তাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

অন্য দেবদেবী সম্পর্কিত যে সকল সাম্প্রদায়িক উপনিষদ আছে তাদের সংখ্যা তুলনায় অল্প। ব্রহ্মার বিষয় আমরা পাই পাশুপত ব্রহ্ম উপনিষদ। শক্তির সম্বন্ধে আমরা পাই অন্নপূর্ণা বৃহচ, ত্রিপুরতাপিনী, দেবী ও

ত্রিপুরা উপনিষদ। সূর্য্য সম্বন্ধেও তিনখানি উপনিষদ আমরা পাই : সূর্য্য, অক্ষি, সাবিত্রী। হয়গ্রীব দেবতাটির উপরেও এই নামে একটি উপনিষদ আছে।

পৌরাণিক হিন্দু যুগের যেমন মোটামুটি সকল প্রধান দেবতার উপরেই আমরা উপনিষদ রচিত হয়েছে দেখ্‌তে পাই, তেমনি সমসাময়িক তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতিকে অবলম্বন ক'রে ও সমর্থন ক'রেও কতকগুলি উপনিষদ রচিত হয়েছিল। তাদের সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে না, কেবল নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে : অক্ষমালিকা, ভাবনা, সৌভাগ্যলক্ষ্মী ও সরস্বতী রহস্য।

উপরের তালিকাগুলিই প্রায় সমস্ত উপনিষদগুলিকে আশ্রয় দিতে সমর্থ। তবু কয়েকটি বাদ পড়ে যায়। তাদের এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই, যাকে অবলম্বন ক'রে কোন বিশেষ-শ্রেণীর মধ্যে তাদের স্থাপন করা যায়। এই হিসাবে তারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জিনিস নয়, তবুও তারা যে অপ্রাচীন তার অনেক আভ্যন্তরীণ প্রমাণ তাদের মধ্যে বর্ত্তমান আমরা দেখ্‌তে পাই। এই মিশ্র তালিকায় এসে পড়ে এই কয়খানি উপনিষদ—বজ্রসূচিকা, একাক্ষরম্, পরব্রহ্ম, কঠরুদ্র। এই তালিকার মধ্যেই মৈত্রায়ণী উপনিষদকেও ফেলা যায়। মোটামুটি ধরতে গেলে সকল অপ্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে এইখানিই যেন শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন উপনিষদের মূল চিন্তাধারাগুলিকে বেশ সুসংনিবদ্ধভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

সকল উপনিষদগুলির মধ্যে দুটি প্রধান শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়—প্রাচীন এবং অপ্রাচীন। প্রাচীন উপনিষদগুলিই আসল উপনিষদ। মোটামুটি যে উপনিষদগুলির উপর শঙ্কর ভাষ্য লিখেছেন, সেগুলি প্রধানতই প্রাচীন, তবে তাদের সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে তাদের মধ্যে কঠ ও শ্বেতাশ্বতর তুলনায় অপ্রাচীন এবং সেই কারণে তাদের কথার মূল্য আমাদের কাছে তুলনায় কম হবে।

---

(১) কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ ॥—ঈশ ২

(২) অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥—ঈশ ৩

(৩) রসো বৈ সঃ॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি॥ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ॥ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ তৈত্তিরীয়, ২।৭

(৪) —ছান্দোগ্য, ৭॥২২॥১

(৫) যো বৈ ভূমাতৎসুখংনাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি॥ —ছান্দোগ্য ৭॥২৩॥১

(৬) বৃহদারণ্যক, ২।৫॥১

(৭) বৃহদারণ্যক, ৪॥৩॥৩২-৩৩

(৮) বৃহদারণ্যক, ৬।৩।৬

(৯) শরীর মিদং মৈথুনাদেবোদ্ভূতং সংবিদপেতং নিরয় এব মূত্রদ্বারেণ নিষ্ক্রান্তমস্থিভিশ্চিতং মাংসেনাভিলিপ্তং চর্ম্মণাবদ্ধং বিন্মূত্রবাত পিত্ত কফ মজ্জামেদো বসাভিরন্যৈশ্চ মলৈর্বহুভিঃ পরিপূর্ণম্ ॥—মৈত্রেয়ী, ৩

(১০) ন সংভাসেৎ স্ত্রিয়ং কাংচিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাং চ ন স্মরেৎ। কথাং চ বর্জ্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি ॥—নারদ পরিব্রাজক, ॥৩-৪

(১১) যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃস্ত্রীকস্য কঃ ভোগভুঃ॥ স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ —মহোপনিষদ্ ৩।৪৮

(১২) মাংস পাঞ্চালি কায়ান্ত যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে। স্নায়্যস্থি শালিন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কিমিব শোভনম্॥ ত্বঙমাংসরক্ত বাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে। সমালোকয় রমাং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি ॥৩৯-৪০॥ কেশ কজ্জলধারিণ্যো দুস্পর্শা লোচন প্রিয়াঃ। দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরম্ — [illegible] ৪৪

(১৩) অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্॥ শরীরং মে বিচর্ষণম্॥ জিহ্বা মে মধুমত্তমা॥ কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্॥ ব্রহ্মণঃ কোপোঽসি মেধয়াপিহিতঃ—তৈত্তিরীয় ॥১॥৪॥১

(১৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদের গার্গী বাচক্নবি ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রিয়া পত্নী মৈত্রেয়ীর নাম এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে পড়ে।

মানব-প্রেমিক

শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি কাঁদিছো বসি' জনহীন একেলা প্রান্তরে
চক্ষে বহে জল,
বিগত-দিনের ক্রটি পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি
ঝরে অবিরল!

হে মানব, উঠে এসো, ধরো হাত, বক্ষে লও তুলি'
প্রজ্বলিত পুন দীপখানি,
যে-গান ভুলিয়া গেছো কভু তাহা হয়নি বিস্মৃত
কোনো সুর কোনো ছন্দবাণী।

অতীত অতীত শুধু, অতীতের ক্রটি কিছু নয়,
বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ বাস্তব,
হে মানব, ভবিষ্যৎ আনে শুধু আশার বারতা—
দুখান্তের বার্ত্তা অভিনব।

যা' কিছু ক'রেছো ভুল, যাহা কিছু হ'লো না সফল,
যে-সাধনা র'য়ে গেল পিছে,
তাহার বেদনা লাগি' নিশি নিশি রুদ্ধ করি' দ্বার
কেন ভ্রান্ত কাঁদো বলো মিছে!

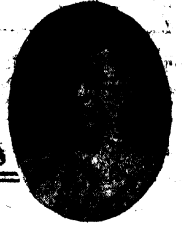
মানুষের ভালবাসা ধরণীর এই ধূলিদেহে
মৃত্তিকার মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদে,
মানুষের ভগবান মানুষেরই বেদনার লাগি'
সকরুণ স্নেহে প্রেমে বাঁধে।

নিভৃতে গহীন মনে কভু বা নিশীথ রাতে
বারবার শয়নের ছলে
পরের চোখের জলে বেদনায় বিদীর্ণ অন্তরে
যদি ভেসে থাকো আঁখিজলে,

তব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোথা? মুছে গেছে যাহা কিছু গ্লানি,
হে প্রণম্য, হে প্রেম-যাজ্ঞিক,
তোমারে রাখিবে মনে জন্ম হ'তে জন্মান্তরে সবে
হে মহান মানব-প্রেমিক!







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রণজি ক্রিকেট ঃ

মহীশূর ঃ ৬৮ ও ১৫৭

বোম্বাই ঃ ৫০৬ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল এক ইনিংস ও ২৮১ রানে মহীশূর দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে দুইবার বিজয়ী হয়েছিল। মহীশূর দলের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৮ রানে শেষ হয়। খোটের বল মারাত্মক হয়েছিল। তিনি ১৯ ওভার বল দিয়ে ৮টা মেডেন এবং ১৯ রানে ৬টা উইকেট পান। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৫০৬ রান উঠলে বোম্বাই ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। কে সি ইব্রাহিম দলের সর্ব্বোচ্চ ১১৭ রান করেন। এম মিস্ত্রীর ৯৩ রান এম মন্ত্রীর ৬৫ রান এবং কে রঙ্গনেকারের ৬০ রান উল্লেখযোগ্য।

মহীশূর দলের দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠে ১৫৭। বি ফ্রাঙ্ক দলের সর্ব্বোচ্চ ৬১ রান করেন। খোটের বোলিং এবারও মারাত্মক হয়েছিল। ৪০ রানে তিনি ৫টা উইকেট পান।

মহীশূর ঃ ৩০৭ ও ২০৮

বাঙ্গালা ঃ ২৭৯ ও ২১৯

মহীশূর ১৭ রানে বিজয়ী হ'য়েছে।

রণজি ট্রফির সেমিফাইনালে মহীশূর ও বাঙ্গালার খেলা ইডেন গার্ডেনে সুরু হয়। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। চারদিক খেলার উপযুক্ত উইকেটের অবস্থা নয়। দর্শক সমাগম খুব বেশী হয়নি। মহীশূর টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নামে। তাদের প্রথম ইনিংসে রান ওঠে ৩০৭। রান বেশ দ্রুত উঠেছে; সময় লেগেছে ২৭৯ মিনিট। দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেছেন রামদেব নট আউট ১০৫; পার্থসারথি ও গুরুদাচর উভয়েই ৪৬ রান ক'রেছেন। একমাত্র রামচন্দ্র ছাড়া বাঙ্গলার আর কোন বোলার সুবিধা ক'রতে পারেন নি। রামচন্দ্র ৫২ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছেন। দেবের উইকেট কিপিং খুব ভাল হ'য়েছে। দিনের শেষে বাঙ্গলা কোন উইকেট না হারিয়ে ৬ রান ক'রে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাঙ্গলার ৭টা উইকেট পড়ে গিয়েছে মাত্র ৪৭ রানে। ব্যাটসম্যান অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন ক'রে খেলাতে এই অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে। অষ্টম উইকেটে পুরী এসে খেলার গতি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি উইকেটের চতুর্দ্দিকে অদ্ভুতভাবে পিটিয়ে খেলে বোলারদের বিপর্য্যস্ত করেন। এদিকে রামচন্দ্রও বেশ পিটিয়ে খেলছেন। অষ্টম উইকেটে ১০১ উঠেছে। পুরী ৫৮ রান ক'রে আউট হ'য়েছেন। বাঙ্গলার ইনিংস শেষ হ'ল ২৭৯ রানে। রামচন্দ্র মাত্র তিন রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পেলেন না। ওবেদ আলির একটু ধীরভাবে খেলা উচিত ছিল। সাম্পসনের ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। গুরুদাচর ৩৯ রানে চারটে উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে মহীশূরের ৬ উইকেট মাত্র ৬৬ রানে পড়ে যায়। ৭ উইকেটও একই রান সংখ্যায় পড়তো; রাম দেব কোন রান করবার একটা সুযোগ দিয়েছেন। আবার এক রান ক'রে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছেন। দুটোর ভেতর একটা ক্যাচ ধরতে পারলে খেলার অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াতো। রাম দেব শেষ পর্য্যন্ত ৫৭ রান ক'রেছেন। মহীশূরের ইনিংস শেষ হ'য়েছে ২০৮ রানে। দলের শেষ খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক ৪৮ ক'রেছেন।

দিনের শেষে বাঙ্গালার ৪ উইকেটে ১২৫ রান হ'য়েছে। কে ভট্টাচার্য্য ৫৭ ক'রে নট আউট আছেন।

চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। আর ১১২ রান ক'রতে পারলে বাঙ্গালা জিতবে। কমল ও দেব যথাক্রমে ৬৩ ও ৩৮ ক'রে আউট হ'য়েছেন। পুরী আবার সেই পিটিয়ে খেলতে সুরু ক'রেছেন। কিন্তু অপর দিক থেকে মুস্তাফী সাম্পসন বা ওবেদ আলি কারো সহযোগিতা পাননি। ওবেদ আলি তার ওভারের খেলতে গিয়ে গুরুদাচরের হাতে ধরা দিলেন। ঐ শেষ বলটা যদি খেলবার চেষ্টা না ক'রে শুধু আটকাতে পারতেন তাহ'লে বাঙ্গালার জয়লাভের খুব আশা ছিলো। পুরী নট আউট রইলেন ৪২ রান ক'রে। গুরুদাচর ৬৮ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েছেন।

বোম্বাই ঃ—২৫৭ ও ১৮৪ (৩ উইকেট)

উত্তর ভারত ঃ—২১১ ও ২২৫

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অপর সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দল ৭ উইকেটে উত্তর ভারত দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে। উত্তর ভারত দলের এ পরাজয় খুব বেশী অগৌরবের নয়। তারা প্রবলভাবে বিপক্ষ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে খেলেছিল। বোম্বাই দলের খেলোয়াড়রা প্রথম ইনিংসের খেলায় উত্তর ভারত দলের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। ফলে নামকরা বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের কেউই অধিক রান করতে সক্ষম হননি। উত্তর ভারত দলের প্রথম ইনিংসের ২১১ রানে রামপ্রকাশের ৯৩ রান দলের সর্ব্বোচ্চ। তারাপোরেওয়ালার ৪ রানে ৩টি উইকেট পাওয়া উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই দলের প্রথম



ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৪৯

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনা

শ্রীসরোজকুমার দাস এম-এ, পি-আর্-এস্, পিএচ্-ডি (লণ্ডন)

মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থের তুলনায় সে এক অসমাপিকা সৃষ্টি। মানুষ তাহার সকল বেদনা ও কামনা, আকূতি ও আপ্তির মধ্য দিয়াই নিরন্তর আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সেজন্য প্রত্যেক মানুষ এক একটি ব্যক্তি অর্থাৎ এক অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তরূপ। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, মানুষের সকল চিন্তা ও কর্ম্ম, সকল দৃষ্টি ও সৃষ্টির মধ্যে এই অব্যক্ত শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে। কোন বিশেষ দেশে বা কালে, কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ইহার স্বরূপ ব্যক্ত হয় না বলিয়াই এই শক্তি অপরিমিত ও অপরিমেয়। আমাদের সকল প্রয়োজন ও আয়োজনের হিসাবে ইহার কোনও উল্লেখ পাই না—এই জন্যই বস্তুতান্ত্রিক তর্কে ইহা অবজ্ঞাত হইলেও দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহাকে অস্বীকার করা চলে না। ইহার কারণ এই যে, অন্য সকল প্রয়োজন ও কাম্য বস্তুর বাহির হইতে পরিমাণ করা যায়, কিন্তু মানুষের জীবনে এমন একটি মুখ্য প্রয়োজন সক্রিয়, অন্তর্দৃষ্টিতে যাহার অনুভূতি হয় কিন্তু অনুমান বা পরিমাণ হয় না। ইহাই মানুষের ধর্ম্ম। মহাভারতকার এই নিগূঢ় সত্যটির ইঙ্গিত ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্রের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।"

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও ধর্ম্মের তথ্য

ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাহিত হইলেও ধর্ম্মের তথ্য বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংহিতা, ধর্ম্মাচার ও অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই জীবনব্যাপী প্রকাশের মূলে অভাবের তাড়না বা প্রবৃত্তির প্রেরণা নাই—আছে কেবল এক স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, যাহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত ও পরিতৃপ্ত। এই আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে প্রয়াস তাহাকেই আমরা সংক্ষেপে "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিতে পারি। বস্তুতঃ পক্ষে ধর্ম্মই মানুষের স্বভাব, তাহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা, তাহার অন্বর্থ পরিচয়। রাজার ধর্ম্ম যেমন রাজত্ব, মহতের ধর্ম্ম যেমন মহত্ত্ব, তেমনই মানুষের ধর্ম্ম ধর্ম্মই—তাহার নামান্তরের প্রয়োজন হয় না। এই যে স্বাভাবিক হওয়া বা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা, ইহার মধ্যেই ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। গীতা-ভাষ্যের অষ্টম অধ্যায়ে স্বভাবের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য বলেন—"দেহকে অতিক্রম করিয়া অন্তরাত্মারূপে পরিকল্পিত ও পরমার্থ ব্রহ্ম বস্তুতে যাহার পরিসমাপ্তি তাহাই স্বভাব, তাহাই অধ্যাত্ম বা আত্মনিষ্ঠ।" *

* "আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং

মানুষের সকল চাওয়া ও পাওয়া এই স্ব-ভাবের আকর্ষণে অনুপ্রাণিত এবং ইহার মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার স্ব-ভাব অর্থাৎ অধ্যাত্মপদ লাভ করে। তাই উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, মানুষ সকল কামনার মধ্যে আত্মাকেই কামনা করে, সেজন্য সকল কামনার বস্তু তাহার প্রিয় হয়। কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিতে মানুষ আনন্দলাভ করে, কারণ তখন সে তাহার বৃহত্তর, পূর্ণতর স্ব-রূপ বা স্ব-ভাবের আস্বাদ পায়। ইহার অর্থ এই নয় যে, কেবলই কামনার অন্তহীন সোপান অতিক্রম করিয়া মানুষকে সেই আপ্ত-কাম নিত্য-তৃপ্ত আত্মস্বরূপে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, যাহা আপন মহিমায় আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত (স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি)। যদি তাহাই মানুষের সম্বন্ধে একান্ত সত্য হইত, তবে গ্রীক্ পুরাণের ট্যাণ্টালাসের মতই মানব-জীবন বিধাতার এক নিদারুণ পরিহাসে পর্য্যবসিত হইত। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে স্বতই এই উপলব্ধি হয় যে গতি ও বিরতি, ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি, অতৃপ্তি ও পর্য্যাপ্তি ন্যায়-শাস্ত্রের স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ অগ্রাহ্য করিয়া একই সঙ্গে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ধর্ম্মই ন্যায়শাস্ত্রাতিগ জীবনবেদের মূলমন্ত্র ও নিয়ামক এবং সকল ধর্ম্মসাধনা এই স্ব-ভাবে বা স্ব-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধনা। অথচ দেখিতে পাই সকল ধর্ম্মসাধনার লক্ষ্যগত স্বরূপ একই—মুক্তি। অধিকাংশ স্থলেই মুক্তিকে বাসনা কামনার অতীত এক চাঞ্চল্য-বিহীন, পরিতৃপ্ত, সমাহিত অবস্থারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মানুষ মুক্তি চায় অর্থাৎ অভাবের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-ভাবের অর্থাৎ আপ্তকাম আত্মার স্বাধিকারে স্থির প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চায়। যে স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের বন্ধন রচিত হয় সেই স্বার্থবোধ সম্পূর্ণ হয় মুক্তির উৎকেন্দ্রিক গতিতে। ধর্ম্ম এই স্ব-ভাবাভিমুখী গতি ও স্বাভাবিকী অবস্থা।

মনুস্মৃতিতে ধর্ম্মের লক্ষণ চতুর্বিধ উক্ত হইয়াছে—বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। ধর্ম্মের এই লক্ষণ চতুষ্টয় অনুভূতিমূলক ও অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ এই দুইভাবে দেখা যায়। কিন্তু স্বরূপত ধর্ম্ম এক পরিপূর্ণ অনুভূতি—একাধারে সম্যগ্‌দর্শন, অখণ্ড হৃদয়াবেগ এবং সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা। তদুপরি তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এক মূলগত ঐক্য থাকাতে ধর্ম্মের এই পরিপূর্ণ অনুভূতি সার্থকতা লাভ করে। এই অখণ্ড-মণ্ডলাকার রূপই ধর্ম্মের প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিগত অঙ্গাঙ্গিভাবের ব্যত্যয় ঘটিলেই ধর্ম্মের বিকৃতি। ধর্ম্মের এই বিকৃত ভগ্নাংশগুলি সামগ্রী-হিসাবে ব্যবহার করিয়া ধর্ম্মের সেই সমগ্রানুভূতি বা সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভ করা যায় না। তথাপি মানুষ যুগে যুগে এই বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলির সংমিশ্রণে বা সমন্বয়ে ধর্ম্মের স্বরূপ-সন্ধান করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম মানুষের জীবনে সেই জৈব প্রেরণা, সেই অখণ্ড রসানুভূতি যাহা রসায়ন শাস্ত্রানুমোদিত কোনও প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে নিজরূপ প্রকাশ করে না।

ধর্ম্মের দুই রূপ

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্মসাধনের প্রকার বা প্রণালী-ভেদ থাকিলেও ধর্ম্মের তত্ত্ব এক সার্ব্বভৌমিক, শাশ্বত বা সনাতন ভিত্তির উপর স্থাপিত। স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেরণাতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং ইহার স্বাভাবিক পরিণতি ব্রহ্ম-তত্ত্বে। একদিকে যেমন ধর্ম্মতত্ত্বের বা ব্রহ্মবিদ্যার নিরবচ্ছিন্ন দেশকালাতীত রূপ দেখিতে পাই, অপর দিকে বিশিষ্ট দেশ ও কালের মধ্যে এই ব্রহ্ম-বিদ্যার এক ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিক তাহার প্রকাশ যে বিশিষ্ট দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না—ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু সনাতন-পন্থীগণ "সনাতন" কথাটির অপব্যাখ্যা করিয়া স্বতোবিরোধিতা ও ধর্ম্মান্ধতার ভ্রমে পতিত হন। অথচ "সনাতন কাহাকে বলে" তাহা এক প্রাচীন ঋষি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—"সনাতনমেনমা-হুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।" অর্থাৎ "ইহাকেই বলা হইয়াছে সনাতন কিন্তু অদ্যই ইহা নব জীবনে সঞ্জীবিত।"† অপর দিকে আধুনিকতাবাদীরাও এই একদেশদর্শিতার জন্য চিত্তবিভ্রম ঘটিয়া থাকে। যেহেতু কোনও মতবাদ বা সাধন-প্রণালী প্রাচীনকালে বা কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রচলিত ছিল অতএব ইহা এ যুগে চলিবে না কারণ ইহা "মডার্ণ" নয়। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় এই চিন্তা বা সাধনার ধারা বর্ত্তমান কালোপযোগী তবেই তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে দ্বিধা করি না। সত্যের সন্ধানে সর্ব্বপ্রধান বস্তু সঙ্গতি এবং এই সঙ্গতি এই দুই ক্ষেত্রেই অবজ্ঞাত হয়। বর্ত্তমান কালোপযোগী বলিয়া সত্যের যে স্বাতন্ত্র্য থাকিবে, শাশ্বত বা চিরকালীন বলিয়া সত্যের ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রকাশের সহিত ইহার সাধর্ম্ম্যও থাকিবে। এই আধুনিকতার অপদেবতা যখন মানুষের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে তাহার সত্যদৃষ্টি পদে পদে প্রতিহত ও লাঞ্ছিত হয়। অতএব মৃত পিতার সহিত জীবন্ত আকারগত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যেরূপ উভয়ের সম্বন্ধে একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়, সেরূপ যুগধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তন সম্পর্কে এই তথ্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। সাধারণত বিবর্ত্তন ত্রিপক্ষাত্মক—সাম্য, বৈষম্য ও সংহতি বা সমন্বয়। সাম্যাবস্থায় যাহা অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট থাকে, বিবর্ত্তনমুখে তাহাই ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়। বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মতে এই পদ্ধতির অভিব্যক্তি "বিবর্ত্তন" নামের অপব্যবহার মাত্র। যে বিবর্ত্তনে কেবলই আবর্ত্তন আছে কিন্তু উদ্বর্ত্তন নাই, ভূতপূর্ব্বের সমাবেশ আছে কিন্তু অপূর্ব্ব বা অভূতপূর্ব্বের সৃষ্টিস্বীকার নাই তাহা বিবর্ত্তনবাদের ছায়ামাত্র। এই নীতি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তনে একদিকে যেমন ভিন্ন-জাতীয় ব্রহ্মবিদ্যার এক মূলগত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সাদৃশ্য রহিয়াছে, তেমনই ইহার বিভিন্ন স্তরে এক একটি অপূর্ব্ব প্রকাশ।

ভয় হইতে অভয়লোকপ্রাপ্তি—ধর্ম্মসাধনার ক্রমবিকাশ

মানুষের যে ধর্ম্মসাধনা বাহ্যক্রিয়া-কলাপ, পূজার্চ্চনা, বলি নৈবেদ্য, স্তুতি আরাধনাতেই পরিসমাপ্ত, তাহা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পরিপন্থী ও মানবাত্মার পারমার্থিক কল্যাণসাধনে অসমর্থ, ইহাই শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থিরবিশ্বাস। যে অজ্ঞান সকল

বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে "অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে"—ভগবদ্‌গীতা-ভাষ্য, অষ্টম অধ্যায়, তৃতীয় শ্লোক।

† আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মেদিনীপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-সভার বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।

অনর্থের মূল, তাহার অত্যাচার সমূলে বিনাশ করিতে হইলে মানুষ যে অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী, তাহার জ্ঞানই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। মানবসভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় হইতেই ভয়প্রণোদিত স্তব ও আরাধনা, প্রশস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে এবং ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে প্রথম সোপান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কেহ বলিলেন যে জগতে ভয় হইতেই দেবতাদের সৃষ্টি। যথা Lucretius—"It was fear that first made Gods in the world." কেহ বা বলিলেন—"Fear is the mother of all morals" অর্থাৎ "ভয়ই সকল পাপ-পুণ্য-জ্ঞানের প্রসূতি।" ঋগ্বেদের সংহিতাভাগ এই ভাবের স্তবস্তুতি প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। কোথাও অগ্নি, কোথাও বায়ু, কোথাও ইন্দ্র, কোথাও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ভয়ার্ত্ত উপাসক কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। এই ভয়-শাসিত রাজ্যের পরিধি যতই বিস্তৃত হউক, ইহার একটি অবধি আছে এবং সেই সীমানির্দ্দেশ-কল্পে উপনিষদের ঋষি বলিলেন—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

অর্থাৎ "যিনি উদ্যতবজ্র ভয়াভিভবকারী মহদ্ভয়, তাঁহারই ভয়ে অগ্নি দাহ করিতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে তৎপর।" অতএব আপাতদৃষ্টিতে যাহা দ্বৈতশাসন, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহার অদ্বৈতরূপ প্রকাশিত। এই জন্যই ঈশোপনিষদের মর্ম্মস্থল হইতে এই সত্যধর্ম্মাশ্রয় অদ্বৈততত্ত্ব সূর্য্যোপাসনাপ্রসঙ্গে প্রচারিত হইল:

"পূষন্নেকর্ষে যমসূর্য্যপ্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"।

"হে জগতের পোষক, হে একচারী, হে সংযমনকারী, হে প্রজাপতি-তনয় সূর্য্য, তোমার তেজ সংবরণ কর ও তোমার রশ্মিসমূহ সংহত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহাই আমি দেখি। ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, তিনিই আমি।" ইহারই ব্যাখ্যাক্রমে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"কিঞ্চ, ন তু অহং ত্বাং ভৃত্যবদ্‌যাচে" "অধিকন্তু হে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আমি তোমার সমীপে ভৃত্যের ন্যায় এই প্রার্থনা করিতেছি না।" এই উক্তিটি সামান্য হইলেও ইহার ব্যঞ্জনা অসামান্য। মানুষের ধর্ম্ম যে তাহার গভীরতম সত্য, তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহার পূর্ণপ্রকাশের অকুণ্ঠিত বাণী তাহা এই উক্তিই সপ্রমাণ করে। মানুষের এই বোধ যখন জাগ্রত হয় তখন সে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে স্ব-ভাবের মহিমায়, ভয়ের নৈরাজ্য হইতে আত্মার স্বারাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে এই স্বাধিকার-বোধ, এই আত্মস্বরূপ-প্রতিষ্ঠা, এই অভয়লোকপ্রাপ্তি এক যুগসন্ধির সূচনা করে। যদিও এক্ষেত্রে বলা হইয়াছে—"Fear of the Lord is the beginning of all wisdom"—একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বিশ্বেশ্বরের এই রুদ্ররূপধ্যান প্রজ্ঞানের উপক্রমণিকামাত্র, তাহার উপসংহার হইতেই পারে না।

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতি

এই স্বাধীন স্ব-ভাবনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তিই যে ধর্ম্মতত্ত্বের একমাত্র উৎস ও উপজীব্য তাহা শঙ্করাচার্য্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম তাহাই যাহার শ্রুতিবাক্যে উৎপত্তি, বিচারে যাহার পরিপুষ্টি ও অনুভূতিতে যাহার পরিসমাপ্তি। আমরা বুঝিতেছি ধর্ম্ম তাহাই মানা-গোণাতে যাহার উৎপত্তি, মাথায় টিকিট-মারাতে যাহার পরিপুষ্টি ও মাথা-ভাঙ্গাতে যাহার পরম ও চরম পরিণতি। কেবল ইহাই নয়, উৎপত্তি ও পরিণতির মধ্যবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম কি করিয়া রক্ষা করা যায়, এই গবেষণায় প্রাণপাত করাই মানুষের ধর্ম্ম। বস্তুত, ধর্ম্মের বিকার এইখানেই। ধর্ম্মকে যখন রক্ষক মনে না করিয়া তাহাকে আমার রক্ষণীয় বস্তু মনে করি এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাণপাত করি, তখনই আমরা স্বরচিত মায়াজালে আবদ্ধ হই। অথচ আমাদের দেশেই এই সত্য বারংবার প্রচারিত হইয়াছে যে, "ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন", "ধর্ম্ম রক্ষা করিলেই আমরা সুরক্ষিত," "ধর্ম্মের স্বল্পাংশও মানুষকে মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করে"! ধর্ম্মকে রক্ষণীয় বস্তু মনে করিয়া মানুষ যে কি নিদারুণ প্রাণহানি ও অধর্ম্মাচরণ করিতেছে তাহা ইতিহাসের পাতায় উপহাসেরই ভূমিকায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই জন্যই বর্ত্তমান চিন্তাজগতের অন্যতম মণীষী হোয়াইট্‌হেড (Whitehead) বলেন—"ধর্ম্ম মানুষের আদিম বর্ব্বরতার অন্তিম আশ্রয়" (Religion is the last refuge of human savagery.") তাঁহার মতে, "জগতের ইতিহাসে ধর্ম্মের প্রথম সোপান আচার ও অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় সোপান হৃদয়বৃত্তি, তৃতীয় সোপান বিশ্বাস ও মতবাদ এবং শেষ সোপান যুক্তিমূলক প্রজ্ঞান।" সেজন্য অনেকেরই ধারণা যে, আমরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক্ হইতে এখনও বর্ব্বর-যুগে রহিয়াছি। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে শক্তিকে উপরের দিকে রাখিলে সে উন্নতির চরম শিখরে উত্তীর্ণ করে সেই শক্তিকে নিম্নাভিমুখী করিলে তাহা অবনতির শেষসীমায় লইয়া যায়। লাটিন ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—"Corruptio optimi pessima" অর্থাৎ যাহা মানুষের পক্ষে শুভঙ্কর, তাহা বিকৃত হইলে ভয়ঙ্কর অনিষ্টসাধন করে। আমরা বিভিন্ন মতবাদ যতই আশ্রয় করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের স্বীকার করিতেই হয় যে, বিচারই মানুষের ধর্ম্ম। অতএব মানুষ যখন অন্তরের স্থলে অনুষ্ঠানের, নীতির পরিবর্ত্তে রীতির, বিচারের স্থানে সংস্কারের উপর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে, এমন কোন সভা বা মহাসভা, অখিল বা নিখিল কন্‌ফারেন্স কংগ্রেস নাই যাহা সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারে।

ধর্ম্ম ও ভেদবুদ্ধি

সকল ধর্ম্মবিকারের মূলকারণ এই যে, মানুষের জন্মগত সংস্কার ও সহজাত ভেদবুদ্ধি মরিয়াও মরিতে চায় না। এই ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া আমরা স্বাভিমানেরই উপাসনা করি—সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। স্বদেশ, স্বসমাজ বা স্বজাতি যতই মহৎ হউক, মানুষের আত্মা বা স্বভাব তদপেক্ষা মহত্তর। এই জাতীয় অভিমানকেই Dr. L. P. Jacks 'institutional selfishness' অর্থাৎ "অনুষ্ঠানতন্ত্র স্বার্থপরতা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মাশ্রিত সাধনার এই বৈশিষ্ট্য যে-কোনও শ্রেণীরই ভেদবুদ্ধিকে সে প্রশ্রয় দেয় না। ধর্ম্ম যাহাতে ভেদবুদ্ধির করায়ত্ত না হইয়া শুভবুদ্ধিরই শরণ লয়

সেজন্য উপনিষদের ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন : "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" এই প্রার্থনা যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে এখনও সত্য হইয়া ওঠে নাই তাহার নিদর্শন প্রতিপদেই পাইতেছি। সেই জন্যই সমস্ত ব্যর্থ সাধনার ভারে অভিভূত হইয়া কখনও অদৃষ্টকেই দোষ দিতেছি, কখনও বা তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করিতেছি, কখনও বা বিধাতার বিরুদ্ধে পক্ষপাত দোষেরই অভিযোগ করিতেছি। অথচ একদিন ধীরোদাত্ত কণ্ঠে সত্যদর্শী ঋষি এই মন্ত্রই প্রচার করিয়াছিলেন : "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" অর্থাৎ "যিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোপরিস্থিত ও স্বয়ম্ভু, তিনি শাশ্বতকাল হইতে যথাযথভাবে সকলই বিধান করিতেছেন।" জার্মান্ দার্শনিক-কবি শীলারের অনুরূপ একটি উক্তিতে এই দৃষ্টিভঙ্গীরই আভাস পাই —Die Welt geschichte ist das Weltgericht. অর্থাৎ "The history of the world is the judgement of the world." এই ঊর্দ্ধমুখী দৃষ্টিই ধর্মের দৃষ্টি—সত্য ও শুভদৃষ্টি।

এই বিশ্বব্যাপী দুঃখদুর্গতির দিনে বিশ্বের দেবতার উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রার্থনাই নিবেদিত হউক—

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"!

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাদেবী ভানুমতীর মহল। প্রসাধন-কক্ষের একটি শিঙার-বেদিকার উপর অপরূপ রূপবতী প্রগাঢ়-যৌবনা রাণী অর্দ্ধশয়ানভাবে অবস্থান করিতেছেন। চারি-পাঁচটি কিঙ্করী তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে। একজন ভানুমতীর আলুলায়িত কুন্তল দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত করিতেছে। দ্বিতীয়া পদপ্রান্তে নতজানু বসিয়া লাক্ষারসে চরণপ্রান্ত রঞ্জিত করিতেছে। অবশিষ্ট কিঙ্করীরা প্রসাধনদ্রব্য হাতে লইয়া সাহায্য করিতেছে।

দ্রুত ব্যস্তপদে মালিনী প্রবেশ করিল; বাক্যব্যয় না করিয়া ভানুমতীর দেহ পুষ্পাভরণে সাজাইতে লাগিয়া গেল। রাণী মদালসনেত্র মালিনীর দিকে ফিরাইয়া একটু হাসিলেন।

ভানুমতী : আমার কচি মালিনী মেয়ের আজ এত দেরি যে!

মালিনী ক্ষিপ্রহস্তে ভানুমতীর মৃণাল-ভুজে ফুলের অঙ্গদ বাঁধিতে বাঁধিতে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল

মালিনী : কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলুম—দেরি হয়ে গেল রাণি-মা। ফুল নিয়ে রেবার ধার দিয়ে আসছি, চোখ তুলে দেখি—ওমা, এক কবি! বল তো রাণি-মা, অবাক কাণ্ড না?

রাণী অধরপ্রান্ত একটু কুঞ্চিত করিলেন

ভানুমতী : এ আর অবাক কাণ্ড কী! মহারাজের প্রসাদে উজ্জয়িনীতে এত কবি জুটেছে যে বর্ষাকালে ইন্দ্রগোপ কীটও এত জন্মায় না।

মালিনী : ওমা না গো না, এ তোমার ন্যাড়ামাথা নাকলম্বা চিম্‌সে কবি নয়।—কি বলব তোমায় রাণি-মা, চেহারা যেন ঠিক—কুমার কার্ত্তিক! গায়ের রঙ্ ডালিম ফেটে পড়ছে—কী নাক, কী চোখ! বয়স কতই বা হবে? বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ।

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া ভানুমতী মালিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন।

ভানুমতী : হুঁ?

মালিনী উৎসাহভরে বলিয়া চলিল

মালিনী : হ্যাঁ গো রাণিমা। বললে বিশ্বাস করবে না, এত সুন্দর কবি আমি জন্মে দেখিনি।—রেবার পাড়ে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছে, সেইখানেই থাকবে। (সহসা হাসিয়া উঠিয়া) দরজায় আল্‌পনা দিচ্ছিল—কিবা আল্‌পনার ছিরি! হাত থেকে পিটুলির ভাঁড় কেড়ে নিয়ে আমি আল্‌পনা এঁকে দিলুম। তাই না এত দেরী হ'ল। কবির নাম—কালিদাস। বেশ মিষ্টি নাম, না? আর তেমনি মিষ্টি কি কথা—কথা শুনলে কান জড়িয়ে যায়—

ভানুমতী মন দিয়া শুনিতেছিলেন; তাঁহার মুখের গূঢ় হাসি গভীর হইতেছিল। মালিনী থামিতেই তিনি ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

ভানুমতী : সত্যি?—রেবার ধারে খাসা কবি কুড়িয়ে পেয়েছিস তো! তা—কি বল্‌লে তোর কবিটি? কানের কাছে ভোমরার মত গুনগুন ক'রে গান শুনিয়েছে বুঝি?

মালিনী রাণীর কথার ব্যঙ্গার্থ বুঝিল না; সে এখনও অতশত বুঝিতে শেখে নাই, সরলভাবে বলিল

মালিনী : না রাণি-মা, গান করেনি, শুধু কথা কয়েছে।—কিন্তু কী মিষ্টি কথা, ঠিক যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে—

ভানুমতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া কিঙ্করীদের মুখের পানে চাহিলেন; তাহারাও মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। রাণী অলসহস্তে মালিনীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া তাহার কচি মুখখানি দেখিলেন, তারপর তরল কৌতুকের স্বরে বলিলেন

ভানুমতী : আমার মালিনী-কুঁড়িটি এতদিনে সত্যিই ফুটবে-ফুটবে করছে—ভোমরাও ঠিক এসে জুটেছে। দেখিস মালিনী, তুই যেমন ভালমানুষ, তোর কবি-ভোমরা সব মধুটুকু শুষে নিয়ে উড়ে না পালায়—

কিঙ্করীরা হাসিতে লাগিল। মালিনী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া সকলের মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। রাণী হাসিতে

হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মালিনীর দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন, স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন

ভানুমতী : বোকা মেয়ে ! এখনও ঘুম ভাঙেনি।—ভয় নেই, একদিন ঘুম ভাঙবে ; হঠাৎ সব বুঝতে পারবি।—তোর কবি বুঝি ঘুম ভাঙাতেই এসেছে !

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

প্রভাত। কালিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণ। বেদীর উপর কবি বসিয়া আছেন ; সম্মুখে মৃত্তিকার মসীপাত্র, খাগের কলম ও একতাড়া তালপত্র। কবি রচনায় নিমগ্ন ; কিন্তু যত না রচনা করিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন তাহার দশগুণ। ললাট চিন্তা-চিহ্নিত। কোথাও যেন আটকাইয়া গিয়াছে। কবি কয়েকবার মুখে বিড়্‌বিড়্ করিতে করিতে করাগ্রে গণনা করিলেন ; তারপর অন্যমনস্কভাবে লেখনী মসীপাত্রে ডুবাইলেন। কিন্তু মনে মনে যাহা গড়িয়াছিলেন তাহা মনঃপূত হইল না, তিনি আবার কলম রাখিয়া দিলেন। তালপত্রে একটি অসমাপ্ত শ্লোক লেখা ছিল ; তালপত্রটি তুলিয়া লইয়া জানুর উপর রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—যেন উহার ধ্বনি হইতে পরবর্ত্তী অলিখিত পংক্তির ইঙ্গিত ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন

কালিদাস :—অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা—ভবানী !

শেষ শব্দটি তিনি সংশয়সঙ্কুল কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—'ভবানী' শব্দটি পত্রে লেখা ছিল না, কবি পাদপূরণের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন

কালিদাস : উঁহু—ভবানী চলবে না ; এখনও তো দেবী ভবানী হননি। কৃশাঙ্গী—? উঁহু··· মৃগাক্ষী··· উঁহু উঁহু—

কবির ভাবাবিষ্ট চক্ষু এদিক ওদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে গিয়া সহসা রুদ্ধ হইল ; কবি ভাবতন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। প্রাঙ্গণের দ্বার-পথে হাসিতে হাসিতে মালিনী প্রবেশ করিতেছে। সদ্যঃস্নাতা ; হাতে তাম্রের থালিতে একরাশ ফুল ; মাথার সিক্ত চুলগুলি বুকে-অংসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের শিশিরবিন্দুর মত চৌদিকে আনন্দের রশ্মি বিকীরণ করিতে করিতে মালিনী কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস চকিত বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। এ কি ! এ যে গিরিকন্যারই মর্ত্ত্য-প্রতিমূর্ত্তি ! যে শব্দটির অভাবে তাঁহার শ্লোক এবং কাব্যের প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইতেছে না সেই শব্দটি বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত তাঁহার মস্তিষ্কে জ্বলিয়া উঠিল।

ত্বরিতে লেখনী মুষ্টিতে ধরিয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেকালে মুষ্টিতে লেখনী ধরিয়া লিখিবার রীতি ছিল। খস্ খস্ করিয়া তালপত্রের উপর কলম চলিতে লাগিল।

ফুলের থালি হাতে মালিনী বেদীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কবি অন্যদিনের মত তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন না, মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। মালিনীর হাসিভরা মুখখানি ম্লান হইয়া গেল ; অভিমানে চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। কবি ব্যগ্রভাবে লিখিয়া চলিলেন, যেন মুহূর্ত্তের জন্য অন্যদিকে মন দিলেই শব্দগুলা মস্তিষ্কের পিঞ্জর খুলিয়া উড়িয়া যাইবে। মালিনী ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় বলিল

মালিনী : এত কাজ—আমার পানে চোখ তুলে চাইবারও সময় নেই ! বেশ !—

কালিদাস মুখ না তুলিয়াই চাপা সুরে বলিলেন

কালিদাস : স্‌স্‌স্—একটু দেরী কর··· এটা শেষ ক'রে ফেলি··· (লিখিতে লিখিতে) · নিয়মিত ··· পরি ···

মুখে অসমাপ্ত কথা মিলাইয়া গেল, কবি লিখিয়া চলিলেন। ক্রমে লেখা শেষ হইল। লেখার নীচে কলমের একটি সাড়ম্বর আঁচড় টানিয়া কালিদাস হাস্যোজ্জ্বল মুখে মালিনীর পানে চাহিলেন

কালিদাস : ব্যাস্—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ !—

মালিনী মুখভার করিয়া রহিল ; কালিদাস সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন

কালিদাস : একটা শব্দ কিছুতেই মাথায় আসছিল না ; তোমাকে দেখেই মনে পড়ে গেল—তোমার ঐ কালো কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দেখে—

মালিনীর পক্ষে আর অভিমান করিয়া থাকা সম্ভব হইল না ; কৌতূহলী দীপ্ত চোখে সে কালিদাসের পানে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল

মালিনী : কী কথা ?—বল না !

কালিদাস : কথাটি হচ্চে—সুকেশী। তোমার সুন্দর ভিজে চুলগুলি দেখে মনে পড়ে গেল।

মালিনী বেদীর একপাশে বসিয়া পড়িল। কৌতূহলের সীমা নাই। হাত হইতে পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া সে এক অঞ্জলি ফুল কবির কোলের উপর ঢালিয়া দিল ; তারপর লেখনী মসীপাত্র তালপত্রের উপর ফুল দিতে লাগিল। দুই চারিটি ফুল ছড়াইয়া দিতে দিতে বলিল

মালিনী : কিসের গান লিখছ বল না ? শিবের গীত বুঝি ?

কালিদাস : হ্যাঁ। শিব আর পার্ব্বতীর গল্প। শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর তখনও বিয়ে হয়নি। শিব তপস্যা করছেন—কঠিন তপস্যা ; আর গিরিকন্যা উমা রোজ এসে তাঁর সেবা করেন—ফুল সমিধ আহরণ করে এনে দেন, পূজার জন্যে বেদী মার্জ্জন করে দেন।—তারপর এইসব কাজ ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন শিবের ললাটে—চন্দ্রের কিরণের তলায় বসে ক্লান্তি দূর করেন—শুনবে শেষ শ্লোকটা—

মালিনী অবহিত চিত্তে শুনিতেছিল ; কেবল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িল। কালিদাস তালপত্র তুলিয়া লইয়া পড়িলেন

কালিদাস : অবচিত বলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।

কিছুক্ষণ দুই জনেই নীরব। কালিদাস ধীরে ধীরে তালপত্রটি নামাইয়া রাখিলেন, মালিনীর দিকে মৃদু সস্নেহ হাসিয়া বলিলেন

কালিদাস : এ ছন্দের নাম জানো ?

মালিনী : না। কী ?

কালিদাস : মালিনী ছন্দ—তোমার নামের ছন্দ।—প্রত্যেক সর্গের শেষে একটি করে তোমার নামের ছন্দের শ্লোক লিখব ঠিক করেছি। আমার কাব্য যদি বেঁচে থাকে মালিনীর নামও কেউ ভুলবে না ; আমার কাব্যে তোমার নাম গাঁথা থাকবে।

মালিনীর মুখ লজ্জায় আনন্দে গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালিদাস হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরম বিলাসভরে আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে অঙ্গন-বেষ্টনীর বাহিরে রেবার তীরে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার হাস্য-আলস্য-ভরা মুখে সহসা ভাবান্তর দেখা গেল।

রেবার তীররেখা ধরিয়া একশ্রেণী উট চলিয়াছে। আর একদিনের কথা কালিদাসের মনে পড়িয়া গেল—পূর্ণিমার নিথর রাত্রি, জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাজোদ্যান, পার্শ্বে ফুটযৌবনা রাজকুমারী, প্রাকার বেষ্টনীর পরপারে এক সারি উট চলিয়াছে ; তারপর…

স্মৃতির বেদনা কালিদাসের মুখে করুণ ছায়াপাত করিল। মালিনী ঊর্দ্ধমুখী হইয়া কালিদাসের পানে চাহিয়া ছিল, সে তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। ঈষৎ বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সে প্রাঙ্গণ-বেষ্টনীর ওপারে দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু দেখিতে পাইল না। তখন সেও বেদীর উপর উঠিতে উঠিতে বলিল

মালিনী : কি দেখছ ?

কালিদাস উত্তর দিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। মালিনী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া দেখিল—উটের সারি। সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল

মালিনী : আ কপাল—উট। আমি বলি, না জানি ! (কবির দিকে ফিরিয়া) বলি হ্যাঁগা কবি, উট দেখে র ভয় হ'ল নাকি ?

কালিদাস ম্লান হাসিলেন

কালিদাস : ভয় নয় মালিনী, দুঃখ হ'ল। ঐ উটের সঙ্গে একটা বড় দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

কালিদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। মালিনী সপ্রশ্ননেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু কবি আর কিছু বলিলেন না

ডিজল্ভ্।

অবন্তীর রাজসভা। কুন্তল রাজসভার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এ আরও বৃহৎ ব্যাপার। উপরন্তু অবরোধের মহিলাগণের জন্য প্রাচীরগাত্রে প্রেক্ষামঞ্চের ব্যবস্থা আছে।

মধ্যাহ্ন কাল। প্রধান বেদিকার উপর মহারাজ বিক্রমাদিত্য আসীন। পঞ্চত্রিংশ বৎসরের দৃপ্তকায় পুরুষ ; দণ্ডমুকুটাদির আড়ম্বর নাই, তিনি বেদীর মার্জ্জিত কুট্টিমের উপর কেবল মাত্র একটি স্থূল উপাধান আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধশয়ান ছিলেন। চারিপাশে কয়েকটি অন্তরঙ্গ সভাসদ নিকটে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। বরাহমিহির ও অমরসিংহ একত্র বসিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছিলেন। একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিত চিকুর কবি দন্তহীন মুখ রোমন্থনের ভঙ্গীতে নাড়িতে নাড়িতে একাগ্র মনে শ্লোক রচনা করিতেছিলেন। প্রবীণ মহামন্ত্রী একপাশে বসিয়া পারাবতপুচ্ছের সাহায্যে কর্ণকুহর কণ্ডূয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার অনতিদূর পশ্চাতে স্থূলকায় বিদূষক চিৎ হইয়া উদর উদ্ঘাটিত করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল।

মহারাজের শিয়রের কাছে বসিয়া এক তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী যুবতী একমনে তাম্বুল রচনা করিয়া সোনার থালে রাখিতেছিলেন। আর একটি যবনী সুন্দরী শীতল ফলাম্লরসের ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া চিত্রার্পিতার মত একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরের আলস্য সকলকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। মহারাজ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ একটা রসের কথা পর্য্যন্ত বলিতেছিল না। সভাটা যেন নিতান্ত ম্যাজার হইয়াই শেষ পর্য্যন্ত ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বরাহমিহির ও অমরসিংহের মৃদু জল্পনা ঝিল্লিগুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল।

বরাহমিহির প্রকাণ্ড একটি হাই তুলিয়া হস্তদ্বারা উহা চাপা দিলেন ; তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন

বরাহমিহির : রবি এবার মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন।—

বিক্রমাদিত্য একটু উৎসুকভাবে সেইদিকে তাকাইলেন

বিক্রমাদিত্য। কী বললেন মিহির ভট্ট ?

বরাহমিহির : আমি বলছিলাম মহারাজ যে, রবি এবার মকররাশিতে গিয়ে ঢুকবেন।

মহারাজ আবার উপাধানে হেলান দিয়া বসিলেন ; ব্যঙ্গ-বঙ্কিম মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : হুঁ—ঢুকবেন তো এত দেরী করছেন কেন ? তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেই পারেন। আমার তো এই আলস্য আর নৈষ্কর্ম্ম্য অসহ্য হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে কেউ যেন কিছু করছে না, কেবল বসে বসে ঝিমচ্ছে ! ইচ্ছে করে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে আবার যুদ্ধযাত্রা করি। তবু তো একটা কিছু করা হবে।

মহামন্ত্রী কর্ণকণ্ডূয়নে ক্ষণকাল বিরতি দিয়া মিটি-মিটি হাস্য করিলেন, গূঢ় পরিহাসের কণ্ঠে বলিলেন

মহামন্ত্রী : কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন মহারাজ ?—শত্রু তো একটিও অবশিষ্ট নেই।

বিরক্তি সত্ত্বেও মহারাজের মুখে হাসি ফুটিল

বিক্রমাদিত্য : তাও বটে। বড় ভুল হয়ে গেছে, মন্ত্রি। সবগুলো শত্রুকে একেবারে বিনাশ ক'রে ফেলা উচিত হয়নি। অন্তত দু-একটাকে এই রকম দুর্দ্দিনের জন্য রাখা উচিত ছিল।

এই সময় রচনা-রত কবি গলার মধ্যে ঘড়্-ঘড়্ শব্দ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন ; তাঁহার রচনা শেষ হইয়াছে। রাজা তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন

বিক্রমাদিত্য : কী, হয়েছে কবি, আপনি ওরকম করছেন কেন ? হাতে ওটা কি ?

গলা পরিষ্কার করিয়া কবি বলিলেন

কবি : শ্লোক, মহারাজ। আপনার একটি প্রশস্তি রচনা করেছি—

বিক্রমাদিত্য নিরুপায়ভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন ; তারপর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : হুঁ। বেশ, পড়ুন—শুনি।

মহারাজের প্রশস্তি-পাঠ হইতেছে, সুতরাং অন্য সকলেও সেদিকে মন দিল। কবি শ্লোক পাঠ করিলেন

কবি : শত্রূণাং অস্থিমুণ্ডানাং শুভ্রতাং উপহাসন্তী
হে রাজন্ তে যশোভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ।

সকলে অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল অমরসিংহ
ভ্রূকুটি করিয়া কবির দিকে তাকাইলেন বোধ হয়
শব্দপ্রয়োগে কিছু ভুল হইয়া থাকিবে

এই জাতীয় শুষ্ক কবিত্বহীন প্রশস্তি শুনিতে শুনিতে রাজার কর্ণজ্বর উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তবু কবির প্রাণে আঘাত দিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না! অথচ সাধুবাদ করাও চলে না। রাজা বিপন্নভাবে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী এইসময় তাম্বুলপূর্ণ থালি রাজার সম্মুখে ধরিল।
রাজা চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন ; মৃদুস্বরে বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : মদনমঞ্জরী, তুমিই এই কবিতার বিচারক হও। একে কবিতা বলা চলে ? কিম্বা—মোটকথা, কবিকে পান দেওয়া যেতে পারে কি না ?

মদনমঞ্জরী অতি অল্প হাস্য করিল, তাহার অধর একটু নড়িল

মদনমঞ্জরী : পারে মহারাজ।—কারণ কবিতা যেমনই হোক, তাতে আপনার গুণগান করা হয়েছে—

মহারাজ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; তারপর একটি পান লইয়া
মুখে পুরিতে পুরিতে বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : (মৃদুস্বরে) ভাল, তোমার বিচারই শিরোধার্য্য। (উচ্চঃস্বরে) তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী, কবিকে তাম্বূল উপহার দাও, তাঁর কবিতা শুনে আমরা প্রীত হয়েছি।

মদনমঞ্জরী উঠিয়া গিয়া তাম্বুলের থালি কবির সম্মুখে ধরিল। কবি
লুব্ধ-হস্তে একটি পান তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিলেন।
বিক্রমাদিত্য সদয়কণ্ঠে বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : কবি, আজ আপনার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে ; এবার গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

কবি : জয়স্তু মহারাজ—

কবি রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিক্রমাদিত্য আর একবার
উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে কহিলেন

বিক্রমাদিত্য : বয়স্যটি কোথায়, কেউ বলতে পার ?

মহামন্ত্রী পশ্চাদ্দিকে একটি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন

মহামন্ত্রী : এই যে এখানে মহারাজ, অকাতরে ঘুমচ্ছে।

মহারাজা আবার উঠিয়া বসিলেন

বিক্রমাদিত্য : ঘুমচ্ছে। আমরা সকলে জেগে আছি—অন্ততঃ জেগে থাকবার চেষ্টা করছি—আর পাষণ্ড ঘুমচ্ছে।—তুলে দাও মন্ত্রী।—

আদেশ পাইবামাত্র মন্ত্রী নিজের পারাবত পুচ্ছটি বিদূষকের নাসারন্ধ্রে
প্রবিষ্ট করাইয়া পাক দিলেন। বিদূষক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল

বিদূষক : আরে রে মন্ত্রি-শাবক! মহারাজ, আপনার এই অল্পায়ু অস্থিচর্ম্মসার মন্ত্রীটা আমার নাকে বিষ প্রয়োগ করেছে।

মন্ত্রীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পূর্ব্ববৎ কানে কাঠি দিতেছেন ; রাজা
গম্ভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : বয়স্য, রাজসভায় তুমি ঘুমচ্ছিলে ?

বিদূষক কটমট করিয়া মন্ত্রীর পানে তাকাইল

বিদূষক : কে বলে ঘুমচ্ছিলাম—কোন্ উচ্চিংড়ে বলে ? মহারাজ, আমি মনে মনে আপনার প্রশস্তি রচনা করছিলাম!

মহারাজের অধর-কোণে একটু হাসি দেখা দিল।
তিনি পুনশ্চ গম্ভীর হইয়া বলিলেন

বিক্রমাদিত্য : প্রশস্তি রচনা করছিলে ? বটে! ভাল—শোনাও তোমার প্রশস্তি। কিন্তু মনে থাকে যেন, যে প্রশস্তি আমরা এখনি শুনেছি, তার চেয়ে যদি ভাল না হয়—তোমাকে শূলে যেতে হবে।

বিদূষক : তথাস্তু।

বিদূষক আসিয়া মহারাজের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিল

বিদূষক : শ্রূয়তাং মহারাজ—

তাম্বূলং যৎ চর্ব্বয়ামি সর্ব্বং তে রিপু মুণ্ডবঃ

পিক্ ত্যাজামি পুচুৎ কৃত্বা তদেব শত্রুশোণিতম্।

প্রকৃত ভাষায় অস্যার্থ হচ্চে—আমরা যে পান খাই, তা সর্ব্বৈব মহারাজের শত্রুদের মুণ্ড ; আর পুচ্ করে যে পিক্ ফেলি তা নিছক শত্রুশোণিত!

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই বিদূষক সুবর্ণ থালি হইতে
এক খাম্‌চা পান তুলিয়া মুখে পুরিল এবং সাড়ম্বরে চিবাইতে লাগিল

মহারাজ হাসিলেন। অন্য সকলেও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

কালিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের বেষ্টনীতে লতা
উঠিয়াছে। লতায় ফুল ধরিয়াছে

কালিদাস গৃহে নাই। মালিনী পরম স্নেহভরে আঁচল দিয়া কবির বেদিকাটি মুছিয়া দিতেছে। মার্জ্জন শেষ হইলে সে কুটীরে প্রবেশ করিয়া কবির পুঁথি লেখনী মসীপাত্র লইয়া আসিল ; সযত্নে সেগুলি বেদীর উপর সাজাইয়া রাখিল। তারপর ফুল দিয়া বেদীর চারিপাশ সাজাইল। অবশেষে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণদ্বারের পানে উৎসুক নেত্রে তাকাইল

মালিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকে না যে, সে মরিয়াছে।

প্রাঙ্গণদ্বার দিয়া কালিদাস স্মিতমুখে সিক্ত-বস্ত্র নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে প্রবেশ করিলেন। তিনি পুজা ও স্নানের জন্য রেবার তীরে গিয়াছিলেন

মালিনী : আসা হ'ল ? বাবাঃ, পুজো আর স্নান যেন শেষই হয় না।—নাও, বোসো। কি হচ্ছিল এতক্ষণ ?

কালিদাস ভালমানুষটির মত বেদীর উপর বসিলেন ; মৃদু হাসিয়া বলিলেন

কালিদাস : পুজো আর স্নান।

মালিনী কবির হাত হইতে সিক্ত বস্ত্রটি লইয়া নিজের কাঁধের উপর
ফেলিল ; তারপর এক রেকাবি ফল লইয়া কালিদাসের
কোলের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল

মালিনী : আচ্ছা, এবার এগুলো মুখে দেওয়া হোক—

কালিদাস ফলগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন

কালিদাস : এ কোথা থেকে এল ?

মালিনী : এল কোথাও থেকে। সে খোঁজে তোমার দরকার ?

কালিদাস : (মৃদুহাস্যে) আমার ভাণ্ডারে তো যত দূর মনে পড়ছে—

মালিনী : চারটি আতপ চাল আর দুটি ঝিঙে ছাড়া কিছু নেই।—আচ্ছা, খাবার সামিগ্রি ঘরে এনে রাখতে মনে না থাকে, আমাকে বল না কেন?—দুপুরবেলা না হয় দুটি ভাত ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে—বামুন মানুষের কথাই আলাদা, কিন্তু সকালে স্নান-আহ্নিক ক'রে কিছু মুখে দিতে হয় না? দুটো বাতাসা কি একছড়া কলাও ঘরে রাখতে নেই?

কালিদাস : ভুল হয়ে যায় মালিনী।

মালিনী : ভুল—সব তাতেই ভুল। এমন মানুষও দেখিনি কখনও—খাবার কথা ভুল হয়ে যায়!

কালিদাস : ঐ তো মালিনী, কবি জাতটাই ঐরকম। পৃথিবীতে যে-কাজ সবচেয়ে দরকারি তাতেই তাদের ভুল হয়ে যায়। আমার এক তুমিই ভরসা।

অনির্ব্বচনীয় প্রীতিতে মালিনীর মুখ ভরিয়া উঠিল। তবু সে তিরস্কারের ভঙ্গীতেই বলিল

মালিনী : আচ্ছা হয়েছে, এবার খাওয়া হোক।—মনে থাকে যেন, গল্প যে-পর্য্যন্ত শুনেছি তার পর থেকে পড়ে শোনাতে হবে—

মালিনী সিক্তবস্ত্রটি বেড়ার উপর শুকাইতে দিতে গেল। কালিদাস প্রীতমুখে আহারে মন দিলেন

ওয়াইপ্।

ক্রমশঃ

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিতে বাঙ্গালীর দান

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম. এ.

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা ইহার গদ্যরীতির অভাব। প্রত্যেক ভাষারই প্রাচীন সাহিত্য পদ্যছন্দে রচিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। অন্যান্য উন্নতিশীল ভাষার গদ্যসাহিত্য তাহাদের পদ্যের সহিত সমান প্রাচীনত্ব দাবী না করিলেও অতিশয় প্রাচীন এবং সেই সকল ভাষাভাষী লোকদিগের দ্বারাই তাহাদের সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। বাহিরের অপর ভাষাভাষী কোন জাতির নিকট সেই সকল ভাষাকে আপনাদের গদ্যরীতির জন্য ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যভঙ্গীর ইতিহাস তাহাদের ইতিহাসের অনুরূপ নহে। ইহার গদ্যরীতির প্রচলন একে তো অত্যন্ত আধুনিক, তাহার উপর আবার বৈদেশিক ঋণের বোঝা ইহার স্কন্ধে এতই গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে যে, ইহার আর মাথা তুলিবার উপায় নাই। ইহার স্বকীয়ত্ব তাই অনেকাংশেই হারাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিতে আজ বৈদেশিক জনকত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়।

ইংরাজদিগের অধিকারের পূর্ব্বে রচিত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় না হইলেও পর্য্যাপ্ত নহে। দুই একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র, দুই একখানি কড়চা অথবা সহজিয়া পুঁথি বা পুরাণের সামান্য সামান্য গদ্যাংশ—ইহা লইয়াই আমাদের প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি। দুই একজন পর্ত্তুগীজও আমাদের বাঙ্গালা ভাষা রোমান হরপে মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে এখন তাহা আবিষ্কৃত হইতেছে এবং যতই আবিষ্কৃত হইতেছে, আমাদের ঋণের বোঝাও ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু গদ্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি দেখা দিল ইংরাজ অধিকারের পর। সিভিলিয়ান সাহেবদিগকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহার সহিত খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রচেষ্টা মিলিত হইয়া শুভ ফল প্রসব করে। উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সেই সময় বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের কর্ণধার হইয়া বসেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার সাহায্যে গ্রন্থের পর গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই সময় হইতেই উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ আলোচনা করিলেই দেখা যায়, যে, সেই সকল গ্রন্থ যদিও বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের গদ্য-রীতিকে খাঁটি বাঙ্গালা গদ্য বলা চলে না। একদিকে সংস্কৃত, আর্‌বী এবং ফারসী শব্দাড়ম্বর—অন্যদিকে ইউরোপীয় বাক্য-গঠন-রীতি সেই সকল গ্রন্থের ভাষা ও বাক্যগঠন রীতিকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত, আড়ষ্ট এবং অদ্ভুত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুইটি প্রচেষ্টা একত্রে মিলিত হইয়া গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। দুইটি প্রচেষ্টার একটি ছিল সিভিলিয়ান সাহেবদিগকে ভারতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা, অপরটি ছিল খৃষ্টান পাদ্রীদের বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার ঐকান্তিক প্রয়াস। সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশ বলা চলে না। উহাকে কৃত্রিম-কারণ সম্ভূত এবং হঠাৎ-প্রসূত কৃত্রিম বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

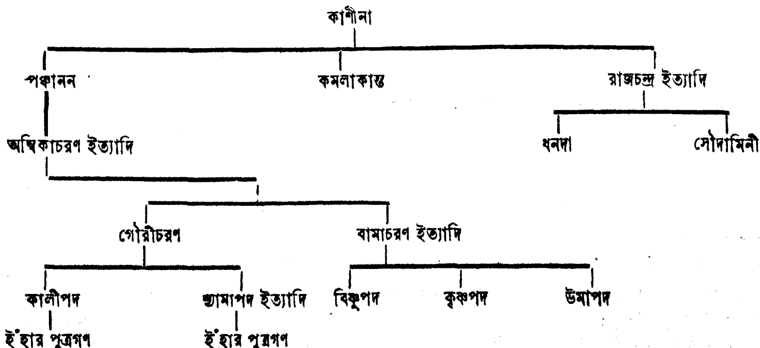
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তৎকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা গদ্য-সাহিত্যে তাঁহাদের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না কেন? তাহার উত্তরে এই কথাই বলা চলে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চেষ্টায় শ্রীরামপুরের প্রেস হইতেই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। কাজেই সেই মুদ্রিত পুস্তকের ভাষা এবং বাক্য-গঠন রীতিকেই আদর্শ করিয়া যে তৎকালে অপর সকলে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমাদের দেশে সত্য সত্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন ছিল না। সুতরাং তৎকালের পণ্ডিতেরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৃত্রিম বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকেই খাঁটি বলিয়া ভাবিতে এবং তাহাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু এইখানে আসিয়া আর একটি কথাও আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পর্য্যাপ্ত

পরিমাণ গদ্য-সাহিত্য আমাদের দেশে হয় তো ছিল না, কিন্তু একেবারেই যে ছিল না, এমন কোনও কথা নাই এবং এমন মনে করিবারও কোনও হেতু নাই। লোকে কথা কহিবার সময় গদ্যেই কথা কহিত—পদ্যে নহে, এবং কবিত্বশক্তিতে বঞ্চিত কোনও পণ্ডিত লোকের যে কখনও গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজন হয় নাই—তাহাই বা মনে করিবার কারণ কি? এমনও তো হইতে পারে, যে, কোনও পণ্ডিতলোক হয় তো তাঁহার দেশবাসীকে অনেক তথ্য জানাইতে চাহিয়াছিলেন, অথচ কবিত্ব শক্তিতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে গদ্য-ভাষাতেই পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। রাজধানীর বাহিরে নিভৃত পল্লীগ্রামে স্বজনশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া গ্রন্থ রচনার ফলে তাঁহার রচনায় হয় তো বৈদেশিক শব্দ বা বাক্য-গঠন-রীতি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যদি তেমন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই গ্রন্থের গদ্য ভাষাকেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির স্বাভাবিক ভাষা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন লোকেরা তাঁহাদের মাতৃভাষার গদ্যরীতিকে কতখানি রূপ দিতে পারিয়াছিলেন, তেমন গ্রন্থ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এখানে আমাদিগকে অনেকগুলি "হয় তো"র আশ্রয় লইতে হইল—এখন কথা হইতেছে যে সত্যই তেমন কোন অনুমানের কারণ আছে কি না? অনুমানের যথেষ্টই কারণ আছে। কিছুদিন যাবৎ এইদিকে আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম। সম্প্রতি এমন দুই একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথি এবং পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহাতে এই অনুমানই বেশ দৃঢ় হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, সংস্কৃত ভাষার যুগ ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে এবং প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির অনুবাদ অথবা মর্ম্মানুবাদ না করিলে অজ্ঞতার ফলে পরবর্ত্তী বংশধরদিগের মধ্য হইতে অনেক আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতি লোপ পাইয়া যাইবে। সেই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা "প্রায়শ্চিত্ত-বিধি", "অশৌচ বিধি" প্রভৃতি বিবিধ বিষয় লইয়া বাংলা ভাষায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, এবং অনুসন্ধান করিলে তেমন গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

প্রথমেই যে পুঁথিখানির আমরা পরিচয় দিতেছি, তাহার আকার ১৫½"×৩½" ইঞ্চি। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছয় লাইন করিয়া অক্ষর আছে। পুঁথিখানি "অশৌচ বিধি" লইয়া রচিত এবং এগারো পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার রচনাকাল লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা প্রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময়েই রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থশেষে লিখিত আছে,—"শ্রীরাজচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চ।" বংশ-তালিকায় দেখা যায়:—



কাজেই রাজচন্দ্রের পর বেশ কয়েকপুরুষ চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যে, পুঁথিখানি লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। আইন করিয়া লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতী-দাহ প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পুঁথিখানিতে সতী-দাহের উল্লেখ আছে। যেমন,—

"অতঃপর সহমরণের ব্যবস্থা করিতেছি॥ সহমৃতা স্ত্রীর ত্র্যাহাশৌচ যদ্যপি হয় তথাপি স্বামির পুর্ণাশৌচ হয়॥ স্বামিপিণ্ডের তুল্যকালে তার পিণ্ড দিবেক॥ অনুমৃতার বিশেষ স্বামির অশৌচের মধ্যে যদি অনুমরণ করে তবে স্বামির অশৌচ হয়॥ কিন্তু যে দিবসে অনুমরণ করে সেই দিবস হইতে তিনি (তিন) দিবসের মধে (মধ্যে) পুরক পিণ্ড দিবেক। স্বামির অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করিবেক। পতিকে আলিঙ্গন করিয়া যে স্ত্রী মরে তাহাকে সহমৃতার ব্যবহার করিবেক। যে স্ত্রী পতিমরণানন্তর দুই চারি দিবস ব্যতিরেকে পাদুকাদি লইয়া মরে তাহাকে অনুমৃতার ব্যবস্থা করিবেক॥"

পুঁথিখানির ত্রুটি অল্প নহে। একই শব্দের বানান বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকার লেখা হইয়াছে। কতকগুলিতে কেবলমাত্র ভুল বানানই লেখা হইয়াছে। স্থানে স্থানে শব্দের অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে। কোথাও বা আবার একটি শব্দকেই ভুলক্রমে অনাবশ্যকভাবে উপর্য্যুপরি দুইবার লেখা হইয়াছে। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা অবশ্য হস্ত-লিখিত পুঁথির এই সকল সামান্য ত্রুটি ক্ষমা করিতে পারি।

কতকগুলি ভুল বানানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।—পূর্য্যন্ত=পর্য্যন্ত, ব্যাবস্থা=ব্যবস্থা, জ্ঞাতো=জ্ঞাত, শপিণ্ডবর্গের=সপিণ্ডবর্গের, পুত্র=পুত্র, স্বামি=স্বামী, পর্শ=স্পর্শ, আগামি=আগামী, স্নেহবসে=স্নেহবশে, সবদাহন=শবদাহন, শুদ্রের=শূদ্রের, দিবশ=দিবস, অহোরাত্রাসৌচ অহোরাত্রাশৌচ, পিতৃবংস=পিতৃবংশ, ক্রিয়াধিকারি=ক্রিয়াধিকারী, মুহুর্ত্ত, মূহুর্ত্ত=মুহূর্ত্ত, জেষ্ঠ=জ্যেষ্ঠ, বিবাহীতা=বিবাহিতা ইত্যাদি।

অনেকেই বর্ত্তমানে "সম্পূর্ণ" স্থলে "সংপূর্ণ" লেখার পক্ষপাতী। ইহাতেও একস্থলে "সংপূর্ণ" শব্দটি আছে।

ক্রিয়ার পূর্ব্বে "না" ব্যবহার তৎকালের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব ইহাতেও দৃষ্ট হয়। বাক্য শেষ করিবার সময় লেখক বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কারণ প্রায় সকল বাক্যই "হয়", "করিবেক", "দিবেক" ইত্যাদি দ্বারা শেষ হইয়াছে।

তৎকাল-প্রচলিত বাক্য-গঠন-রীতি এবং স্থানে স্থানে স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার,—এই উভয় প্রকার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল:—

(ক) অপর সপিণ্ডান্তর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত তিন দিবস অশৌচ হয় দশম পুরুষানন্তর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী অশৌচ হয়। বর্ত্তমান দিবশ আগামী দিবস রাত্রিসহিতে দ্বাদশ প্রহরে নাম পক্ষিণী। ইহা জানিবে সর্ব্বত্র॥

(খ) শূদ্রের বিশেষ করিতেছি। জন্মাশৌচের অনন্তর ছয় মাসের মধ্যে দন্তহীন বালকমরণে তবে পিতামাতার সপিণ্ডবর্গের সকলের তিন দিন অশৌচ হয়॥ এহার মধ্যে দন্ত হইয়া থাকে পঞ্চ দিবস অশৌচ হয়।

অপর ছয়মাসের অনন্তর দুই বৎসরের মধ্যে চূড়াহীন বালক শূদ্রের মরে তবে পঞ্চ দিবস অশৌচ হয়।

(গ) অপর জন্ম দিবস হৈতে দুই বৎসরের মধ্যে যদি কন্যা মরণে তবে শকলের স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়।

(ঘ) যে স্ত্রী পুত্র প্রসব হয় সেই স্ত্রীর বিংশতি দিবস অশৌচ হয় স্ত্রী সর্ব্বদা মাসাশৌচ হয়।

(ঙ) অতঃপর অগ্নিযোগ্যের ব্যবস্থা করিতেছি॥ দুই বৎসর সমাপ্তি নাইলে যদি বালক মরে মৃত্তিকা দিয়া রাখিবেক। তাহার অগ্নিক্রিয়া প্রেতঃক্রিয়া না করিবেক।

(চ) যাথে হইতে গুরু অশৌচ হয় তাথে হইতে সে অশৌচ লঘু হয়।

(ছ) লঘু অশৌচ মানিবেক নাই।

(জ) সংপুর্ণ মরণাশৌচের দশম দিবসে কিম্বা রাত্রি শেষে পিতামাতা স্বামি মরণ হয় তবে পুত্রের স্ত্রীর স্বথীয় অশৌচ হয়।

(ঝ) পিতামাতার মরণে বিবাহিতার কন্যার তিন দিবস অশৌচ হয়।

(ঞ) খণ্ডাশৌচ কালোত্তর জ্ঞাত হইলে অশৌচ না হয়।

(ট) কিম্বা ব্রাহ্মণজাতি হইয়া যে চর্ম্মাদি নির্ম্মান করে পরর হিংসা করে কিম্বা বুদ্ধিপুর্ব্বক স্বেচ্ছাথে মরিব বলিয়া ব্যাঘ্রাদি শস্ত্রাদি জলাদিতে যে মরে আত্মহত্যা প্রাণবধজনক ঔষধাদি যে দেই ব্রাহ্মণের অপরাধ করিয়া ব্রাহ্মণের হাতে যে মরে কিম্বা মহাপাতকী যে হয় কিম্বা আত্মহত্যা করিয়া যে মরে এহান্দিগের অশৌচ নাক্রি দাহাদিক্রিয়া না করিবেক॥

(ঠ) অপর শুদ্রের মরণে দশ দিবশের মধ্যে যদি তার ঘরে ব্রাহ্মণ রোদন করে তবে তিন দিব অশৌচ হয় স্নানানন্তর রোদনে অহোরাত্রাসৌচ হয়।

(ড) যেবাক যন্মিল সেবাক যদি অশৌচে মরে তবে পিতামাতার অশৌচকাল পর্য্যন্ত অস্পর্শ্য দোষ হয়।

(ঢ) যে পুরুষের পিতামাতা মরে তার এক বৎসর পর্য্যন্ত দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম না হয়।

(ণ) যদি পুত্র নিকটে নাথে তবে অন্য কর্ত্তা দুই এক পিণ্ড দিয়া থাকে ইহার মধ্যে যদি পুত্র অইশে তথাপি অন্য কর্ত্তা দশ পিণ্ড দিবেক॥ পুত্র না দিবেক॥

(ত) অতঃ পর্ণানবদাহেব্ ব্যবস্থা করিতেছি॥ • ॥ যদি অস্থিপ্রাপ্তি না হয় তবে পর্ণ্য দাহ করিবেক। ইহাতে শরপত্রের পুতলী করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পলাসপত্র দিবেক তদনন্তর উর্ণ্যাসূত্রে বেষ্টন করিয়া যবের পিঠালিতে লেপন করিবেক॥ তাহার শর্বাঙ্গে পলাসপত্র দিবার ক্রম শিরে ৪০ চল্লিসপত্র মুখে ১০ বক্ষস্থলে ৩০ উদরে ২০ বামবাহুতে ৫০ দক্ষিণ উরুতে ৩০ পদাঙ্গুলে ৫ পঞ্চ পঞ্চ করিয়া দশ পত্রানি ইতি বিশেষঃ। এবং ৩৬০ তিনিষত ষাটি পত্র দিবেক।

ইহার পরে যে পুঁথিখানির কথা লিখিতেছি, তাহার আকারও পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানির অনুরূপ—কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছয় লাইনের স্থলে আট লাইন করিয়া অক্ষর আছে। গ্রন্থখানি "গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত" সংক্রান্ত। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই, যদিও এই পুঁথিখানি পূর্ব্বের পুঁথিখানির সহিত একই সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তবে পুঁথিখানির বয়স যে অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানিরই সমান, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ দেখি না।

"গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত" বিষয়ক পুঁথিখানি "অশৌচ-বিধি" সংক্রান্ত পুঁথিখানির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। সকল বাক্যই কেবল "হয়" এবং "করিবেক" দিয়া শেষ হয় নাই। ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :—

"অথ গোবধপ্রায়শ্চিত্ত নির্ণয়ঃ। বধ দুই প্রকার হয় সাক্ষাদ্বধ অপালন বধ। সাক্ষাদ্বধ দুই প্রকার। জ্ঞানকৃত সাক্ষাদ্ব(ধ) অজ্ঞানকৃত সাক্ষাদ্বধ। জ্ঞানকৃ (ত) সাক্ষাদ্বধ কলিকালে হিন্দুর নাক্রি॥ • ॥ অত প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিনে মুণ্ডনাদি ব্যবস্থা করিতেছি। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে সশিখ মণ্ডন (মুণ্ডন) করিবেক। এবং প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিনে উপবাস করিবেক॥ যৎকিঞ্চিৎ ঘৃতভোজন পূর্বদিনে করিবে। পূর্ব্ব দিনে মুণ্ডন না করে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এবং দক্ষিণা দ্বিগুণ দিবেক। এবং সধবা স্ত্রী গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করে তবে পূর্বদিনে মুণ্ডন না করিবেক॥ বিধবা স্ত্রী যদি গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করে তবে কেশের অগ্রের দুই অঙ্গুলি পরিমৃত ছেদ্দন করিবেন।"

অনর্থক বানানের দ্বিত্ব পরিহার করিবার প্রয়াসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই পুঁথিখানিতে পূর্ব্ব হইতেই সেই নিয়ম বহুস্থানে প্রচলিত দেখা যায়। "পূর্ব", "ধর্ম", "সর্বত্র", "চর্মনির্মোচন" প্রভৃতি বানানের দৃষ্টান্ত এই পুঁথিখানিতে বিরল নহে।

বানান ভুল এই পুঁথিখানিতেও কিছু কিছু দেখা যায়—তবে পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানির ন্যায় প্রচুর নহে। যেমন,—পরিমৃত = পরিমিত, কতৃক = কর্তৃক, শাড়ে = সাড়ে, ক্ষুদার্থ = ক্ষুধার্থ, বিক্ষাদিভঙ্গে = বৃক্ষাদিভঙ্গে, জেথানে = যেথানে, জানাজায় = জানা যায়, মুর্চ্ছা = মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় লেখকের অজ্ঞাতে কোথাও কোথাও বাংলার সহিত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। যেমন :—

(১) সর্বমত্র স্ত্রীশূদ্রবালবৃদ্ধে প্রায়শ্চিত্ত করিলে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। একস্য উভয় ধর্ম থাকিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

(২) সর্বত্র স্ত্রীশূদ্রবালবৃদ্ধের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তঃ।

(৩) একাধিক গরুর একদা অপালন বধ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক দক্ষিণা দ্বিগুণ দিবেক। তত্রাপি বহুকতৃকে প্রত্যেকং দ্বিপাদং।

(৪) স্ত্রীশূদ্রবালবৃদ্ধার্দ্ধং।

(৫) এবং অদাত্ম্যদাহেপদোনধে ধেনু চতুষ্টয়ং উৎসর্গ করিবেক।

সাধু ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় চল্‌তি কথার ব্যবহার এই গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ :—

(১) একপাদের খাট প্রায়শ্চিত্ত করিবেক নাক্রি।

(২) এবং প্রথ (ম) মাসের কিম্বা দ্বিতীয় মাসের গর্ভ সহিত গাই গরু বধ করিলে পাচ পোয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

(৩) এবং বড় দুদালা (দুধওয়ালা) গাই গরু বধ করিলে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

(৪) এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা অত্যন্ত কৃশা অত্যন্ত রোগা গরু বধ করিলে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

(৫) সেকালে সেথানে না থাকেন তাহা(তে) যদি গরু পুড়িয়া মরিয়া থাকে তবে অপালন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। এবং বাধা গরু যদি ঘরপোড়াতে মরে তবে সেথানে যদি না থাকে তবে বন্ধন নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

(৬) এবং গরু মুষক মোষ যে জাতি করে কিম্বা যে জাতি মুষক মোষ করায় তাকে খোঁড়া গরু বিক্রয়াদি করিবে না।

গ্রন্থখানির ভাষা এবং বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা এই পুঁথির আলোচনা শেষ করিব :—

(ক) অতঃপর ধেনু মুল্য ব্যবস্থা করিতেছি॥ ধেনু মুল্য দরিদ্রের এক কাহন মধ্যমবর্ত্তি লোকের তিনি কাঁহন। উত্তমের পাচ কাহন॥

(খ) তিনি বৎসরের পর গরুটী যুবা হয়।

(গ) তাহার ভক্ষণার্থের কালে যদি গরুর রোধ করিয়া থাকে তাহাতে ক্ষুদার্থ হইয়া গরু যদি মরে তার প্রজাপত্যের একপোয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

(ঘ) চ্ছানাবহনের কালে কিম্বা অন্যকালে দণ্ডাদি প্রহার করে কিম্বা না করে তাহাতে মুর্চ্ছা হইয়া যদি ভূমিতে পড়ে তাহার পর আপুনি উঠিয়া গমন যাসভক্ষণ জলাদিপাণ অপদি করে তবে প্রায়শ্চিত্ত না করিবেক।

(ঙ) এখানে সকল জাতির সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। স্ত্রী-শূদ্রাদির অনুগ্রহ নাস্তি॥

(চ) এবং ব্রাহ্মণ বধ যদি জ্ঞানত করে তবে ব্রাহ্মণ ১৮০ ধেনু উৎসর্গ করিবেক। দক্ষিণা গো শত দিবেক।

পুঁথিগুলির অনুসন্ধানের সময় কয়েকখানি পত্রও আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। দুই একখানি পত্রে সালের উল্লেখ থাকায় আমাদের সুবিধা হইয়াছে—কিন্তু সকলগুলিতেই সালের উল্লেখ নাই।

প্রথম পত্রখানি "অশৌচবিধি" পুঁথির লেখক শ্রীরাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত—লেখক তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। পত্রখানি এইরূপ :—

"শ্রীরাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভায়া রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবে সম্বন্ধের বিষয় লি(খি)য়াছ ভালই ১০০ এক সত টাকা দিতে হইবেক আপনাদের বিয়য় সকলি অবগত আছ যদ্যপি আর কিছু কম করিতে পার তবে বড়ই উত্তম হয় নতুবা ঐ স্থীর করিবে দূর হয় গণা বিলক্ষণ করিবে কন্যাটী কিরূপ তাহা লিখিবে

ইতি তাং ২৩ জৈষ্ঠ :— শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য :—

পুনশ্চ :—কন্যাটী আপনে চাক্ষুস করিয়া স্থীর করিবে কিরূপ ব্রাহ্মণ তাহা জানিবে দূর হইল টাকা দিতে হইবেক ইহাতেই কিছু মনোদুঃখ হয় জানিবে বাটীস্থ সকলে ভাল আছেন জানিবে।"

দ্বিতীয় পত্রখানি "গোবধ প্রায়শ্চিত্তের" ব্যবস্থা চাহিয়া লিখিত হইয়াছিল। নিম্নে পত্রখানি দেওয়া হইল :—

"আজ্ঞাকারি শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণঃ নমস্কারা নিবেদন মিদং—শূদ্রের একটি য়েঁড়ে গরু আন্দাজি আট বৎসরের সেটি শূদ্রকৃত অপালনে বধ হইআছে পাঁচ বৎসর নয়মাস প্রায়শ্চিত্ত করে না—এক্ষণে সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্ধত হইয়াছে বর্শে বর্শে ভাগহারে দিতে হইবে কিনা তাহা মহাশয়রা লিখিবেন—কিন্তু আমরা এখানে ভাগ হারে প্রায়শ্চিত্ত ব্যাবস্থা দীয়াছি। অতএব আপনারা শাস্ত্রানুসারে ব্যাবস্থা এই জবানবন্দিতে দিবেন জ্ঞাতো কারণ লিখিলাম ইতি—

ইং পত্রে শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রণাম জানিবেন আমরা ভাগহারে ২০ কাহন ৪ চারপোন ব্যাবস্থা দীয়াছি জ্ঞাতো কারণ নিবেদন করিলাম ইতি—"

পত্রখানি "পুজনীয় শ্রীযুত ভবাণীশঙ্কর তর্কশিরোমণি ঠাকুরদাদা—তথা শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন ন্যায়ালঙ্কার খুড়া মহাশএষু—"মহাশয়দ্বয়কে লিখিত।

তৃতীয় পত্রখানি "উত্তরাধিকার" বিষয়-সংক্রান্ত এবং ঐ বিষয়ের একখানি পুঁথির সহিত পাওয়া গিয়াছে। পত্রখানি কৌতূহলোদ্দীপক—

"মহামহিম শ্রীযুত ব্রাহ্মণপণ্ডিত।—

মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীরামরতন চক্রবর্ত্তিকস্য।—

দরখাস্ত পত্র মিদং কার্য্যন্‌ ঞ্চঃ আগে।—

আমার সশুর ৺রামনন্নান মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতা ৺দর্পনারায়ন মুখোপাধ্যায় তাঁহার এক পুত্র আমার ঐ সশুর আর কন্যা তিন আমার সশুর বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার পিতার ৺ প্রাপ্তী হয় তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার ঐ পুত্র আপন পিতার * * * বিধায় জমিদিগরের মালিকান হইয়া কর্ত্তব্যরূপে ভোগদখল করিতেছিলেন তদ্দ পর কিছু দিবষ বাদে তাঁহার ৺প্রাপ্তী হয় তাঁহার পুত্র বিহিন মাত্র এক কন্যা অবিবাহিতা ছিল তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার ঐ কন্যার বিবাহ আমার সহিত হইয়াছে এক্ষণে আমার সাধুড়ি কর্ত্তব্যরূপে ঐ মাল আমাল জমি জেরাত ভোগদখল করিতেছেন এক্ষণে আমার সাধুড়ি জমি জেরাতের ও মাল আমালের দান বিক্রয়ের সর্ব্বাধিকারি হৈতে পারেন কি না আর আমাকে ঐ সকল মাল আমাল জমি জেরাত দান করিলে মঞ্জুর হৈতে পারে কিনা এহার শাস্ত্রানুসার বিধিমতে বেবস্তা দিতে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতী—

সন ১২৩২ সাল ৪ পৌষ।"

পরিশেষে ইহাই আমরা বলিতে চাহিতেছি, যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের চেষ্টায় এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের উদ্যমে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা একমাত্র তাঁহাদিগকেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে অথবা তাঁহাদের প্রচেষ্টাকেই একমাত্র কার্য্যকরী প্রচেষ্টা বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। তাঁহাদের প্রচেষ্টার মূলে ছিল কৃত্রিমতা—এবং সেই কৃত্রিম প্রচেষ্টা যে জন্মিবামাত্র সাফল্যলাভ করিল—কোন্ যুক্তিতে আমরা ইহা মানিয়া লইতে পারি? তাঁহাদের পূর্ব্বে যদি অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা অতখানি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেন না। আমাদের বক্তব্য এই, যে, আভ্যন্তরীণ কারণে বাঙ্গালীদের দ্বারাই কার্য্যকরী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতগণই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্ব হইতে গদ্য-রীতির অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সেই অভাব পূর্ণ না করিয়া তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াও ছিলেন না। গদ্য-রীতির সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহারা স্ব স্ব চেষ্টায় যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দেশব্যাপক হইতে পারে নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হইবার পক্ষে ইহাই ছিল তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরায়। সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণকে অথবা খৃষ্টান পাদ্রীদিগকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরিয়া লইবার পূর্ব্বে এখনও আমাদিগকে আরও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

রজনীগন্ধা

শ্রীবীণা দে

প্রিয়ার প্রেম কোমল অতি
গোপন সে যে তোমারি সম সখী!
সুবাসে তব—তাহারি স্মৃতি
তোমার মাঝে তারেই আমি দেখি।
কলিকা তব—বালিকা রূপে
তাহারি কথা স্মরণে দেয় আনি—
ঘোম্‌টা ঢাকা—কথাটি চুপে
প্রকাশ ব্যথা করিছে কানাকানি।
সহসা এক মাধবী রাতে
চমকি দেখি ঘোম্‌টা গেছে খসি'

হাতটী রাখি আমার হাতে
দেখিছে সখী পলক-হীনা বসি।
তোমারি সম শুভ্রজ্যোতি
কান্ত, কম, পেলব, সুকুমার,
রাখিয়া প্রেম-সুরভি-স্মৃতি
শান্ত, নম, ঝরিল তনু তার!
প্রিয়ার সেই কোমল আঁখি
তোমারে দেখি পড়িছে মনে আজ—
মিনতি—এসো বুকেতে সখী
আমারে ঢাকি যখন হবে সাঁঝ।

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

(২৯)

পূজার সময় দোকানের ভীড় চতুর্গুণ হয়। সে সময় ছুটী পাওয়া অসম্ভব। পূজা মিটিলে বিনয়ের দিন পনেরোর ছুটি মিলিল। বাড়ী আসিলে মা কাঁদিয়া বলিলেন, বাবা মেয়েটাকে সেই যে বিয়ের পর নিয়ে গেছে আর একবারও আসতে দেয় নাই। তুই একবার নিজে যা।

বিনয় এতদিন যে কলিকাতায় ছিল, সে যেন আর একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগত। সেখানে বোনের কথা ভাইয়ের মনে পড়িবার অবকাশ নাই। কাজের রুটিনে বাঁধা দিনটা যন্ত্রচালিতের মত কাটিয়া যায়। বাড়ীতে আসিয়া হঠাৎ মনে পড়িল তাহার বোন আছে। সে বেচারা একদিন গুরুজন পদে প্রণাম করিয়া অশ্রুসিক্ত চোখে কোথায় কোন নূতন সংসারে কত জটিলতার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। আর তার খবর লওয়া হয় নাই।

মাকে বলিল, আচ্ছা আমি যাব। তার আগে ওদের একখানা চিঠি লিখে দেখ, নীহারকে এখন পাঠাবে কি না।

তার পর অতুলের দিকে নজর পড়িল। স্কুলে সে যায় না, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। মুখে একটা কদর্য্য ছাপ পড়িয়াছে। সারাদিন বাড়ীতে তাহাকে বড় একটা পাওয়াই যায় না।

সকাল বেলায় বিছানা হইতে উঠিতে বিনয়ের ইচ্ছা হইতেছিল না। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু আলস্যের একটা মধুর অবসাদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আছে। পাশের ঘরে মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। ঠিকা ঝিয়ের সঙ্গে কি যেন একটা ব্যাপার লইয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া আলোচনা করিতেছেন। প্রথমটায় সে অত মনোযোগ দেয় নাই।

এখানকার ভোর বেলাকার শিশিরে ভেজা বাতাস, পাখীর গান তাহার উপবাসী মনকে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু কয়েকটা কথা কানে যাইতেই সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ঝি বলিতেছে, সন্ধ্যেবেলায় ছুঁড়িটা একা ঘরে ছিল। ঠিক সময় বুঝে তোমাদের ছোটবাবু যেয়ে হাজির।

ভয় পেয়ে কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠতেই মা মাগী উপর থেকে নেমে এ'লেন। তেনার আবার বাতের শরীর, সন্ধ্যে না হ'তেই উপরে যাওয়া চাই।

তারপরে সে যা গালমন্দ দিতে লাগলো মালতী দিদি-ঠাকরুণকে—শক্ত মেয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলো। কোন জবাব দিলে না, কিছু বল্লে না। খানিকক্ষণ পরে বাপ এসে আরও খোয়ার করলে। মাথাটা ধরে দেওয়ালে দিলে ঘসে। তোমাদের অতুলবাবু তখন কোনদিকে পালিয়েছে। মালতী দিদি ধন্যি মেয়ে। বাপকে বললে, বাবা দোজপক্ষে হোক তেজপক্ষে হোক, যেখানে পাও আমার বিয়ে দিয়ে দাও। তোমরা যেখানে বিনে পয়সায় পাও দিয়ে দাও, আমি কথাটি ক'ব না। শুনছি নাকি ওপাড়ার বিপিনের সঙ্গে ওনার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। মা চোখে আঁচল দিয়া কহিলেন, আমার অতুল সোনার ছেলে। ঐ ডাইনি ওকে অমন করেছে। যেখানে পাক মেয়েটাকে উচ্ছুগ্গু করে দি'ক। বিপনে মন্দ পাত্তর কি। বেটাছেলের আবার বয়স। হ'লেই বা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। দেখায় আরও কম। কিন্তু হেই মা সন্ন, এসব কথা যেন আর পাঁচ কান করিসনে। তাহলে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

স্বর্ণ ঝি কণ্ঠে মধু ঢালিয়া বলিল, না মা, এসব কথায় গরীব দুঃখী আমরা, আমাদের কাজ কি বলো? কাল সন্ধ্যেয় ওদের গাই দোয়াতে গিয়ে পড়েছিলাম, যা দেখনু, তাই তোমাকে বলছি। আর কি কাউকে বলতে পারি। জিভ্ আমার খসে যাবে না তাহ'লে?

বিনয়ের চোখের সামনে সকালবেলাকার আকাশ আলোশূন্য বাতাসশূন্য বিভীষিকার মত বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর সে বিছানা হইতে উঠিল। এই জীবনের স্বপ্নই কি সে দেখিয়াছিল যখন প্রথম কলেজে পড়ে? জ্ঞানের রাজ্যে, সাহিত্যের অনন্ত-ভাবলোকে প্রথম বিচরণ ক'রে? অতুলের অধঃপতনের জন্য নিজেকেই তাহার দায়ী মনে হইল। তাহাদের মত দরিদ্র পরিবারের পক্ষে কলিকাতার হোষ্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়িবার অর্থ বিনয়কে যোগান দিতেই তাহার লেখাপড়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। অতুলের মত চঞ্চল অল্পবয়সী ছেলে, মাথার উপর বাপ নাই। পাড়াগাঁয়ে শিক্ষিত ভদ্র সঙ্গ নাই, সাহচর্য্য নাই। এখানে যে তাহার কর্ম্মহীন অলস জীবন ঐ রকম করিয়া গড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তাহার খোঁজ লইতে মা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, প্রথমে গ্রাহ্য করলিনে, এখন আর অতুল অতুল করে কি হবে? সে আর এখন আমার বশ নয়। কিন্তু যা হবার তা-ই হোল, এইবারে একটি বিয়ে থা কর দিকি। তোর বিয়ে না হ'লে তো আর কিছু অতুলের বিয়ে হতে পারে না।

বিনয় শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, মা তুমি কি বলচ কি? আমাদের এই অবস্থায় তুমি আমাদের বিয়ে দিতে চাও?

রত্নময়ী অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, কেন দোষের কথাটা কি বললাম শুনি? ক'লকাতায় চাকরি করে, তৈরী ছেলে। কতলোকে মেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে ব'সে আছে। দিতে পারলে বর্ত্তে যায়। সিধু ঠাকুরপো একটি সম্বন্ধ এনেছিলো, তার শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ে বাড়ী। মেয়ের বাপ গয়না গাঁটি ছাড়া হাজার টাকা পণ দিতে চায়। আমি যদি আজ রাজী হই তারা কাল বলেনা।

বিনয় একটু রাগিয়া কহিল, মা তুমি যদি ক্ষেপে যাও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুদ্ধ পাগল হতে পারবনা! ওসব কথা এখন তুলোনা।

রত্নময়ী বলিলেন, তবে বাছা তোমাকে পষ্টো কথাই বলি; এতদিন আশায় আশায় ছিলাম তুমি বড় চাকরি করবে, সংসারের

দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখচি মাসে দশটা পনেরোটা টাকা, তা'ও সবমাসে পাঠাতে পারছনা। এদিকে পুঁজি পাটা যা ছিলো তোমাকে পড়াতে তার সবই গেছে। এখন কিছু টাকা দরকার। অতুলটাকে অমন করে আর তো বসিয়ে রাখা যায়না। সিধুঠাকুরপো বলছিলো, একটা কাপড়ের দোকান করে দিলে লাভ আছে। কিছু মূলধন নিয়ে ব'সতে হবে। টাকা চাই।

বিনয় আহত হইয়া বলিল, তোমার সংসারে টাকার দরকার, তাই আমাকে বেচে টাকা করতে চাও। কিন্তু তারপরের দায়িত্বের কথাটা ভাবছনা কেন? শুধু কেনাবেচার কথাই তো নয়। এই সংসার চালাতে পারছিনে, তুমি সাধ করে আরও বোঝা বাড়াতে চাইছ। না মা, অত বড় বুকের পাটা আমার নাই।

রত্নময়ী তীব্র হইয়া বলিলেন, তোমরা আজকালের ছেলে, বাপমায়ের কথাটা কানে তোলনা। ছেলের বিয়ে দেব, এতে কেনাবেচার কথাই বা আসে কেন, বুকের পাটা থাকার কথাই বা আসে কেন? দুনিয়া শুদ্ধ লোক ছেলের বিয়ে দিচ্ছেনা? যা ভালো বোঝ তাই কর বাছা। আমার কপালে যদি সুখই থাকবে তবে এমন হবে কেন।

হায় বিনয়। এত শীঘ্রই তাহার আসল মূল্যটা সংসারের কাছে যাচাই হইয়া গেল। এই সেদিনও, যখন তাহার চাকরি হয় নাই অথচ খুব বড় একটা কিছু হইবার আশাটা খুব ফলাও করিয়া সকলের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে ছিলো, তখন বিনয় বাড়ী আসিলেই পুকুরে জাল ফেলিয়া বড়মাছের সন্ধান হইত, গোয়ালা-বাড়ীতে খবর পাঠাইয়া ছানা দই আনানো হইত। মায়ের গলার স্বরে আদরের আভাস বাজিয়া উঠিত। আজ আর তাহার সে মূল্য নাই। কষ্টি পাথরে যাচাই হইয়া আসল দাম যা তাহা ধরা পড়িয়াছে। আর ফাঁকি চলিবেনা।

সমস্ত দিনটা যে কেমন করিয়া কাটাইবে তাহা বিনয় খুঁজিয়া পাইতেছেনা! কলিকাতায় ভূতের মত খাটুনি। চিন্তার অবকাশ নাই। একটা দিন কখন আরম্ভ হয় কখন শেষ হয় টেরও পায়না। এখানে কাজ নাই, সঙ্গী নাই। কাহার সঙ্গে মিশিবে?

অকালবৃদ্ধ হইয়া গেছে সব। যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া ও অবসরকালে পরনিন্দা এবং ইহার কথা ওর কাছে—আর তার কথা এর কাছে লাগাইয়া একটি দল পাকানো ছাড়া আর কাহারও কোন কাজ নাই! অভ্যাসমত সকালবেলায় একটা খবরের কাগজ সমস্ত গ্রাম খুঁজিয়াও কাহারও কাছে মিলিলনা।

যতীন জ্যেঠা চোখ কপালে তুলিয়া বিধিমত অবাক হইয়া বলিলেন, রোজ চারটে করে পয়সা জলে ফেলে থানকতক কাগজ কিনে কি হবে হে? তার চেয়ে চার পয়সার একপাই করে দুধ রোজ নিলে খেয়ে বাঁচব। যত সব লক্ষ্মীছাড়া বুদ্ধি। আর তোমাকে কি বলব শশী, তোমার বাপও ছিলো ঠিক অমনিধারা ভণ্ডুলে। নইলে বুঝে চললে আজ আর তোমাদের ভাবনা কি? এই দেখনা দু'শো টাকা নিয়ে আমি তেজারতি ফেঁদেছিলাম, বল্লেনা পেত্যয় যাবে বাবাজী—আজ দু'টি হাজার টাকা হাতে করেচি।

বিনয় প্রশ্ন করিল, আপনার তেজারতির নিয়ম কি রকম? এত শীগগীর এমন করে টাকা বেড়ে গেল, আশ্চর্য্য তো? টাকায় ক'পয়সা করে সুদ নে'ন?

যতীনজ্যেঠা তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, শুধু সুদ কত বল্লেই হোল? আদায় করতে হবেনা? হেঁ হেঁ, বাবা তোমাদের দ্বারা সেটি হচ্ছেনা। পারবে আদায় করতে আমি যেমন করে আদায় করি? এই দেখনা, দুটি ভাত মুখে দিয়েই বেরুলাম। কারু চালের লাউ কুমড়ো ছিঁড়ে নিয়ে এলাম, কেউ যদি হাতে পায়ে পড়ে দু'পয়সা সুদ না দিতে পারলে তার গোলার চাবি হাত করলাম। এরকম শক্ত না হ'লে আজকালকার দিনে দু'পয়সা হাতে করা যায়?

বিনয়ের ভারি মজা লাগিতেছিল শুনিতে; সে বলিল, জানেন জ্যেঠা, আজকাল গভর্ণমেণ্ট আইন করে আপনাদের ঐ সব চড়া হারের সুদ নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। এ নিয়ে কত আন্দোলন হচ্ছে কত সভাসমিতি হচ্ছে। ওঁরা ক্রমশঃ এমন নিয়ম করবেন যে, আপনাদের তেজারতি ব্যবসা আর হয়তো চলবেই না। কেননা যারা টাকায় চারআনা সুদে আপনার কাছে টাকা ধার নিচ্ছে তারা যদি নামমাত্র সুদে টাকা পায় তবে আর আপনার কাছে হাত পাতবে কেন?

যতীন চাটুয্যে হুঁকা টানিতে টানিতে একবার রাগতভাবে বিনয়ের দিকে চাহিলেন। যেন গভর্ণমেণ্ট একমাত্র বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই এ কাজে ব্রতী হইয়াছেন। রুক্ষস্বরে বলিলেন, ওসব গভর্ণমেণ্ট ফেণ্ট অনেক বোঝা গেছে ভায়া। কাগজে লেখালেখি করে সব বেটা, কাজের বেলায় কিছুই হবেনা। দেখে নিও।

কই কেমন করে হবে বল দেখি ব্যাপারটা?

তাঁহার স্বরে রাগ এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঈষৎ ভীতভাবও ছিল। সত্যই যদি বিনয়ের কথামত ব্যবস্থাই হয়। আজকালকার দিনে কত অসম্ভবই যে সম্ভব হইতেছে তাহার কি ঠিকানা আছে?

বিনয় বলিল, কেন হবেনা, খুব সহজ উপায়েই তো হতে পারে। গভর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শাখা ছোট ছোট গাঁয়েও খুলবার ব্যবস্থা ক'রবেন। সেখান থেকে গরীব নিঃসম্বল চাষাদের অল্প সুদে তাদের দরকারের সময় টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন ধরুণ কৃষিঋণ……

যতীন চাটুয্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বিনয়ের কথার মাঝখানেই, ওঃ এই! আরে তুমিও যেমন। ঐ ছোটলোক ব্যাটাদের আবার দরকার বলে কোন জিনিষ আছে না কি? আজ সহরে বায়োস্কোপ এল, ছুটে যাও ধার করতে। কাল কাবুলিওয়ালারা চড়া দামে গায়ের কাপড় বিক্রী করতে এসেছে, ধার কর। পরের বছর কাবলে বেটার কাছে টাকার জন্যে মার খাবে। তবু ধার করে কিনতে হবে। পরশু ফিরিওয়ালা রংচঙে কাপড় বিক্রী করতে এসেছে, ঘটি বাটি বন্ধক রেখে ধার করতে ছুটে যাও। ছোট লোক, ছোট লোক! ওদের আবার হিতাহিত বোধ আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে। ধান যখন চাট্টি হবে তখন মরিবাঁচি করে সব খরচ করে দেবে। তারপরে হাতে পায়ে পড়া, পরিবারের গয়না ঘটিবাটি যা পাবে বন্ধক রাখা—এসব তো আছেই টাকা ধার নেবার জন্যে। ওরা বুঝছে কো-অপারেটিভের মর্ম্ম! তাহ'লেই হয়েছে! যতীন চাটুয্যের কথাগুলা এতই সত্য যে বিনয় আর কোন প্রতিবাদ

করিতে পারিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এমনই হয়। যতই আইন তৈয়ারী হোক, ব্যবস্থাপক সভায় কাগজে-কলমে যতই বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাক জনসাধারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের শিশুর মত তাহাদের ভালোমন্দ জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবে ততদিন কিছুতেই কিছু হবে না।

যতীন চাটুয্যে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে উঠিলেন, বিনয়ও উঠিয়া পড়িল। কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ নাই, কোথাও যাইবার বিশেষ তাড়াও নাই—অনির্দ্দিষ্ট ভাবে মাঠের ধারের পথ দিয়া সে বেড়াইতে গেল।

তখন অগ্রহায়ণের শেষ। পাকা ধানের আঁটি কোথাও কাটা হইয়া স্তূপীকৃত হইয়া আছে, কোথাও এখনও কাটা হয় নাই। সান্ধ্যবাতাসে স্বর্ণশীর্ষ দুলিতেছে। অস্তসূর্য্যের সোণালী আলো বাতাসে তরঙ্গায়িত ধানের ক্ষেতের উপর পড়িয়া এমন চমৎকার লাগিতেছে যে চাহিয়া থাকিলে দু'দণ্ড আর চোখ ফেরে না।

এই পথের একপ্রান্তে গাছপালার ঘনচ্ছায়ায় সুনিবিড় একটা পুকুর আছে। একটু দূর পথ বলিয়া এখানে গ্রামের মেয়েরা সাধারণতঃ কেহই আসে না। বিনয় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল; এখন চকিত হইয়া দেখিল, মালতী একটা ঝুড়িতে একরাশ বাসন ও কাপড় লইয়া তাহারই ভারে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই পথ দিয়া অদূরবর্ত্তী ঐ পুকুরটার দিকে যাইতেছে। কেন যে নিকটের জলাশয় ত্যাগ করিয়া তাহাকে এত ভার লইয়া অতদূরে আসিতে হইয়াছে তাহার কারণটা মনে মনে বুঝিতে পারিয়া বিনয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই পাড়া-প্রতিবেশীদের শুভাকাঙ্ক্ষা এত অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, মালতী বেচারা পলাইয়া ফিরিতেছে।

অস্তসূর্য্যের আভায় মালতীর ব্যথিত করুণ মুখের প্রত্যেকটি রেখা বিনয়ের মনে মুদ্রিত হইয়া যাইতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাকে ডাকিয়া কথা ব'লে। অতুলের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চায়। কিন্তু এই নির্জ্জন বনপথে আসন্ন সন্ধ্যায় তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বিনয় পারিল না। আপন মনের যে দিকটা সে নিজের কাছেও গোপন করিয়া ফিরিতেছিল তাহাকে বাধা দিল। নিঃশব্দে দ্রুতপদে সে ভারাক্রান্তচিত্তে বাড়ীর দিকে ফিরিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে আসিল, নীহার যদি একবার আসে, তাহা হইলে মালতী তাহার মনের অনেক কথা বাধামুক্তভাবে হয়তো সখীর নিকট বলিতে পারে। হয়তো তাহার দুঃখের একটা সমাধান মিলে।

৩০

তার পরের দিন অবধি অপেক্ষা করিয়াও নীহারের শশুরবাড়ী হইতে কোন পত্র আসিল না। এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছে। বিনয়ের মা কান্নাকাটি সুরু করিলেন। চিঠি যদি বা না আসে তাহাতে ক্ষতি কি, বিনয় যাইয়া পড়িলে তাঁহারা তাহাকে শুধু হাতে কখনও ফিরাইতে পারিবেন না। যাহারা এত সনির্ব্বন্ধ করিয়া লেখা সত্ত্বেও একখানা চিঠির উত্তর দিবার মত ভদ্রতাটুকুও রাখে না, সেখানে বিনা আহ্বানে গায়ে পড়িয়া যাইতে বিনয়ের যথেষ্ট সঙ্কোচ হইতেছিল। কিন্তু মায়ের অশ্রুজল তাহাকে ঠেলিয়া বাহির করিল। নিজের মনের কোণে দুর্ব্বলতাও ছিল যথেষ্ট। না জানি তাহারা নীহারকে কত কষ্ট দিতেছে। অনভ্যস্ত স্থানে বিরুদ্ধ সংসারের মাঝে তাহার জীবন কাটিতেছে কেমন করিয়া।

একদিন সকালবেলায় একটা স্যুটকেশ হাতে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া নীহারের শশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করিল।

সাত আট মাইল রাস্তা। কোথাও ধানের ক্ষেতের শস্য সমস্ত কাটা হইয়া গিয়াছে, শূন্য শ্রীহীন মাঠ পড়িয়া আছে। কোথাও সর্ষের ক্ষেতে ফুলে ফুলে সমস্ত মাঠ যেন আগুন হইয়া আছে। শীতের সকালবেলাকার শিশিরসিক্ত পবিত্র একটি ভাব জলে স্থলে আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। মন্দ মন্থর গতিতে গাড়ী চলিয়াছে। নিস্তব্ধ নির্জ্জন বনপথ ধরিয়া এখন তাহাদের পথ দূর বিসর্পিল গতিতে যেন দিগন্তের চক্রবাল রেখায় মিশিয়াছে। অনেক দূরের নীল বনরেখা এখনও কুয়াশাঘেরা। চুপ করিয়া বিনয় ভাবিতেছিল, সভ্যতার আসল রূপটা কি? এই শিশিরে-ভেজা ভোরে সবুজ তৃণাচ্ছন্ন পথে এক অজ পাড়াগাঁয়ের উদ্দেশ্যে চলিতে সে যে আনন্দ পাইতেছে, ইহা তো লেশমাত্র তুচ্ছ নয়। জগত সংসারে চারিদিকে এখন কতই না বড় বড় ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। কাল সকালবেলায় খবরের কাগজে পড়িতেছিল, জাপানীদের অতর্কিত বোমাবর্ষণের ফলে কত চীনা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মারা যাইতেছে। ছাত্র স্কুলে যাইতে যাইতে, অনাথ বালকবালিকারা অনাথ আশ্রমের ভিতরে খেলাধূলা করিতে করিতে, শিশু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে মাতার পাশে ঘুমাইতে ঘুমাইতে বোমার ফলে প্রাণ হারাইতেছে। সভ্যতার উন্মত্ত প্রলাপ কি এই স্নিগ্ধ শিশিরমণ্ডিত প্রকৃতির বিশ্রব্ধ আলয়ে আসিতে পারিলে থামিতে পারিত না? এখানেও কি তাহার শান্তির অবকাশ মিলিত না? অথচ ইহার আর একটা দিকও যে নাই তাহা নয়। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডলটুকু পল্লীবাসীদের মনকে কই এতটুকুও তো উদার করিতে পারে নাই। এক টাকায় দু'আনা সুদ, প্রতিবেশীর নিন্দাকুৎসা করিয়া জাত-মারা, সম্পূর্ণ বিনা কারণে পরের অনিষ্ট করা, এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কোন মনোভাব তো দেখাই যায় না। যাহারা বাহির হইতে আসে তাহারা বিক্ষুব্ধ নগর কোলাহলের সংসারে শ্রান্ত মন লইয়া বাংলার পল্লীজননীর অপূর্ব্ব শ্যাম শান্ত শোভায় হৃদয় মন জুড়াইয়া লয়। কিন্তু ইহারই মাঝে যাহারা জন্মাবধি কাটাইতেছে, কই তাহারা জীবনের অতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটাইয়া উঠিয়া কখনো এইরূপভাব এমন করিয়া অনুভব করে বলিয়া মনে হয় না তো। কে যেন তাহাদের দুই চোখ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অন্ধচোখে অজস্র রূপ সম্ভারের একটি কণা ঐশ্বর্য্যও উদ্ভাসিত হয় না।

৩১

বেলা প্রায় এগারোটার সময় নীহারের শশুর বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। সামনের বৈঠকখানার ঘর দুইখানা পাকা দালান। বাকী আর সমস্ত খড়ের ছাওয়া কুঠুরি।

সদরের ঘরে কয়েকটি ছেলে মাষ্টারের কাছে পড়িতেছিল। একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক বালাপোষ গায়ে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

গরুর গাড়ী আসিয়া দরজায় থামাতে সকলেই কৌতূহলী

হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বিনয় চিঠির জবাব পায় নাই বলিয়া খবর দিয়াও আসে নাই।

আধাবয়সী ভদ্রলোকটি হাতের হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া বিনয়কে প্রশ্ন করিল, মহাশয়ের নিবাস? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বিনয় পরিচয় দিল। নমস্কার কুশলপ্রশ্ন শেষ হইবার পর ভবরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলিলেন, ও আপনি মেজবৌমার ভাই! তা বেশ, বেশ। বসুন।

বিনয় তক্তপোষের একধারে স্থান করিয়া লইয়া বসিল। ছেলেরা দুলিয়া দুলিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিল। ভবরঞ্জন-বাবু নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়িয়া ছেলেদের শাসন করিতে লাগিলেন, এই গোপাল, তোমার মণকষা হোল?……এই নিধে, এই বুঝি তোর হাতের লেখা! এক চাঁটি মারব এখনই। এই ক্ষেন্তি, যা বাড়ীতে তোর মেজকাকীমাকে খবর দিয়ে আয় যে তাঁর ভাই এসেছেন।

ক্ষেন্তি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া খবর দিবার পূর্ব্বেই নীহার খবর পাইয়াছিল। বামি ঝি হারাণের মাকে বলিয়াছিল, হারাণের মা নীহারের শ্বাশুড়ীকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিয়াছিল। তিনি রান্নাঘরে, যেখানে নীহার বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল সেখানে আসিয়া উঁকি মারিয়া একবার দেখিয়া শ্লেষ-হাস্য সহকারে বলিলেন, ও বৌমা, পোলাউ পরমান্ন রাঁধ গো! তোমার দাদা এসেছেন যে। গরীবের ঘরের শাকান্ন ওসব নবাব-বাদশা ঘরের ছেলের মুখে রুচবে কি?

নীহার এসব কথার কোন উত্তর করে না। জানে যে উত্তর করিলে এখনই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে। ম্লান হাসিয়া ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া রাখিয়া চায়ের জল চড়াইল। দাদা চা খাইতে ভালবাসেন, এতটা পথ গরুর গাড়ীতে আসিয়া নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় বিনয় বাড়ীর একটি ছেলেকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরে, কেমন আছিস?

নীহারের তখন চোখে জল মুখে হাসি। হলুদ বাটিতেছিল, আধময়লা কাপড়ে তাড়াতাড়ি হাত মুছিয়া পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিল। একখানা পিঁড়া বসিবার জন্য পাতিয়া দিল।

তোকে নিতে এসেছি যে রে!

নীহারের চোখে মুখে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রপদে চায়ের আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম আনিতে আনিতে বলিল, সত্যি দাদা?

বিনয়ের ভগ্নীপতির এতক্ষণে দেখা মিলিল। পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া বিনয়কে দেখিয়া আবশ্যকীয় কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল।

স্বামীর উপস্থিতিতে নীহার মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিয়া কাজ করিতেছিল। বিনয় বলিল, ওরে চায়ে একটু আদা দিস। খুব ভোরে বেরিয়েছিলাম, রাস্তায় ঠাণ্ডা লেগে গেছে। নীহার মশলার ঝুড়িটার মধ্যে আদার সন্ধান করিতেছিল, তাহার স্বামী ভবতারণ কঠিন রুক্ষ স্বরে কহিল, দাদার না হয় মনে নেই। পুরুষ মানুষ, তায় স্বেচ্ছাচারী। অত আবার বেটাছেলের কখন মনে থাকে। কিন্তু তুমি আজ রবিবারের দিনটায় কি বলে জেনে শুনে আদা খাওয়াচ্ছ!

নীহার ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি আদা রাখিয়া দিল।

বিনয় তাহার ভগ্নীপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, একবার নীহারকে কিন্তু আমার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

ওসব কথা আমাকে কেন? মা আছেন—দাদা আছেন—মাথার উপর। তাঁদের বলে দেখ।—এই বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করিয়া ভবতারণ তথা হইতে চলিয়া গেল।

নীহার মৃদুস্বরে একটির পর একটি প্রশ্ন করিতে লাগিল।

…মা কেমন আছেন দাদা? সইয়ের বিয়ে এখনও হয় নি, না? তোমার সেই বড় চাকরি যোগীনবাবু করে দিয়েছেন? ছোটদা আজকাল কি করে? মাগো, ছোটদা যা হয়েচে, কি করে যে পড়ায় তার মন বসেচে ভেবে পাইনে। বুধি গাইটার কি বাছুর হয়েছে? বকনা?…

বিনয় তাহার অজস্র প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিয়া সেই পিঁড়িতে বসিয়া নীহারের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিল। এই কয়েক মাসের মধ্যে তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখে একটা ভীত করুণ দীনভাব। সেই সরলা আনন্দময়ী কিশোরী নীহার মরিয়া গিয়াছে যেন, তাহার কোন চিহ্নই আজ খুঁজিলেও মেলে না।

শুধু চায়ের পেয়ালাটা দাদার দিকে বাড়াইয়া দিতে নীহার লজ্জায় দুঃখে যেন মরিয়া যাইতেছিল। দাদা প্রথম এ বাড়ীতে আসিয়াছেন, একটা মিষ্টিও চায়ের সঙ্গে তাঁহাকে দিতে পারিলে তবু মনটা একটু শান্ত হইত। ভাসুরপো গোপালকে দিয়া লুকাইয়া কিছু জলখাবার আনিতে দিবে বলিয়া সে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, দাদা তুমি একটু বোস, আমি চট করে আসছি।

বিনয় বাধা দিয়া বলিল, থাক্ তোকে যেতে হবেনা। আমি এখন আর অন্য কিছুই খেতে পারব না। সমস্ত রাস্তা গরুর গাড়ীতে ঝাঁকানি খেতে খেতে আসছি। শুধু এক পেয়ালা চা চাইছিলাম। তা আমার যে কি দরকার বা না দরকার তা দেখছি তুই এখনও ভুলিস নি। নয় রে নীহার?

দাদা যে তাহার উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিয়াছেন তাহা দেখিয়া নীহার লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের মাটির দাওয়ায় পিঁড়া পাতিয়া বসিয়া একটা কলাই বাহির করা এনামেলের পেয়ালায় চা খাইতে খাইতে বিনয় নিজেও যথেষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল, এবাড়ীতে তাহার আদর আপ্যায়নের ঘটায় কেহই সমুৎসুক হইয়া নাই। রান্নাঘরের আর একটা উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়াছে। পাছে কয়লা পুড়িয়া যায় তাই একটা উনুন হইতে অবিশ্রান্ত ধোঁয়া উঠিতেছে। এই ধোঁয়া, তাহার হলুদ ও কালি-লাগা এই অর্দ্ধমলিন কাপড়, সামনের ঐ দুর্গন্ধ নালাটা ও মাড়ের গর্ত্তটা, এসবের জন্যই দাদার সামনে নীহার লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। আপন বাড়ীর আপন জীবনের এ সব দৈন্য সে দুই হাতে দাদার সামনে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়। চা খাওয়া শেষ করিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাই, ওঁদের বলে দেখি তোর যাওয়ার কথা। তুই ততক্ষণ রান্না বান্নাগুলো সেরে নে। অনেক দিন তোর হাতে খাই নি। এখন থেকেই লোভ হচ্ছে রে। তার পর ধীরে সুস্থে গল্প করা যাবে।

নীহারকে একটু খুসী করিতে মুখে উৎসাহ দেখাইলেও বিনয় পুনরায় যখন সেই সদরের ঘরে তক্তাপোষে আসিয়া বসিল—যেখানে ক্ষেন্তি আর আন্না চুলোচুলি করিতেছে, গোপাল মাথা দুলাইয়া পড়িতেছে, পঙ্কু শ্লেটের পিছনে আঁক জোক কাটিতেছে—তখন কেহ তাহাকে সম্ভাষণ বা একটা আহ্বানও করিল না; সে সময় বিনয়ের সমস্ত মন এখান হইতে বাহির হইবার জন্য খাবি খাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা (২)

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি এচ-ডি

৪

আর এক শ্রেণীর কবিতা বিশেষভাবেই গদ্য-কবিতার রূপ ও অনুপ্রেরণার উপযোগী বলিয়া মনে হয়। মনের ক্ষণিক, অগভীর উচ্ছ্বাস, চলতি মুহূর্ত্তগুলি অর্দ্ধ-সক্রিয় কল্পনার উপর যে স্বল্প-স্থায়ী ছায়া তুলিকা বুলাইয়া যায়,—এইগুলিই গদ্য-কবিতার আলগা বুননির মধ্যে সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। 'পুনশ্চ'-এর অধিকাংশ কবিতাই এই জাতীয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে উত্তেজিত, প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত কল্পনার নিগূঢ় ঐক্য-সংহতি নাই; ভাবের অনুষঙ্গের মধ্যে একটা শিথিল আকস্মিকতা, একটা অনিয়ন্ত্রিত, অযত্ন-বিন্যস্ত পারম্পর্য্য আছে। কবি যেন অলস-মন্থর গতিতে, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ করিয়াছেন—তাঁহার চোখের সামনে উপস্থিত বস্তুপুঞ্জের বিশৃঙ্খলার মধ্যে কোনমতে একটা পদচারণার সঙ্কীর্ণ পথ করিয়া লইয়াছেন। 'পুকুরধারে' ও 'সুন্দর' কবিতা দুইটিতে তিনি স্মৃতির গহন অরণ্যে পথ হারাইয়াছেন—বর্ত্তমানের "নোঙর-ছেঁড়া" দুটি দিন তাঁহাকে অতীতের অনুরূপ অনুভূতির কথা মনে পড়াইয়া দিয়াছে। এই যে বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে সাদৃশ্য-বোধ ইহা নিছক কল্পনার খেলা মাত্র, মানস-প্রজাপতির পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে স্বচ্ছন্দ-বিহার। 'স্মৃতি' কবিতাটিতে কোন একটি পশ্চিমের শহরের নিরুদ্বেগ, শান্ত জীবনযাত্রার চিত্র নিতান্ত অকারণেই কবির মনের মধ্যে আনাগোনা করে—ইহা যে তাঁহাকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহার কোন নিদর্শন নাই। 'বাসা'তে ময়ূরাক্ষী নদীর কবিত্বপূর্ণ নাম কবির মনে এইরূপ একটা সৌন্দর্য্যে শান্তিতে ঘেরা কাল্পনিক নীড়-রচনার ইচ্ছা জাগাইয়াছে; কিন্তু তাঁহার কাম্য প্রতিবাসী-দম্পতি যেন এই কাব্যাবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খায় নাই। "দেখা"তে এক বর্ষাদিনের পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের দুইটি বিভিন্ন রূপ ছন্দব্যতিরেকেও প্রশংসনীয় কবিত্ব-শক্তির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার শেষের দিকের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহাদের চিত্র-সৌন্দর্য্যই কবির একমাত্র লক্ষ্য—ইহাদের পিছনে 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে'র মত কোন প্রচণ্ড, দুর্ব্বার উল্লাস শক্তি-যোজনা করে নাই। এই দুইটি দৃশ্য মাত্র কবির "দেখার টুকরো", "ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে" বিস্মৃতি-প্রবাহ হইতে সংরক্ষিত "দুটি একটি কুঁড়েমির দিনের" বর্ণালিম্পন—ইহারা অখণ্ড, অমর কাব্যানুভূতির গৌরব দাবী করে না। "ফাঁক" কবিতায় কবি বার্দ্ধক্যে কাজ-ভোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন—যন্ত্রবদ্ধ কর্ত্তব্যের বিস্মৃতির ফাঁক দিয়াই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মানবজীবনের লীলা-চপল ও ব্যথা-করুণ মুহূর্ত্তগুলি তাঁহার মনে প্রবেশ লাভ করে। "একজন লোকে" একজন পথিকের পরিচয়হীন, অন্তরে বাহিরে অজ্ঞাত-ইতিহাসের অস্তিত্ব কবির মনে একটা ভাবলেশহীন, চিন্তার-ছায়া প্রক্ষেপ করিয়াছে।

এই শ্রেণীর কবিতার দুইটি উৎকৃষ্টতম উদাহরণ 'শ্যামলী'তে অন্তর্ভুক্ত 'হারানো মন' ও 'বিদায়-বরণ'। প্রথমটিতে মনের একরূপ আত্মবিস্মৃত ও কুয়াসাচ্ছন্ন, ঝাপসা আত্মচেতনার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মীভূত অবস্থার চমৎকার বর্ণনা আছে। 'বিদায়বরণে' বর্ষাপ্রভাতে যে সমস্ত ফিকে রং-এর, অর্দ্ধস্পষ্ট, ভাবনার আবছায়া ভাষার মধ্যে ধরা না দিয়া চিত্তাকাশে লঘুপদে সঞ্চরণ করে, তাহাদের সমগ্রতাকে একটি অবগুণ্ঠিতা, অভিমানিনী নারী-মূর্ত্তিতে কল্পনা করা হইয়াছে।

> "যত কিছু ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
> ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
> কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
> তাপ-হারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া,
> সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
> যেন ঘোমটা-পরা অভিমানিনী।"

এই দুইটি কবিতার বিষয় ও কল্পনার ভাব-গত ঐক্যের জন্য ছন্দের অভাব বরণীয় না হইলেও সহনীয় হইয়াছে।

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে এইবার সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে। আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে অলস উদাস মানস অবস্থার কাব্য-বর্ণনা বুঝি বা কল্পনার শৈথিল্য বা নিষ্ক্রিয়ত্বের সূচনা করে। কীটসের Ode on Indolence মোটেই শিথিল, অলস কল্পনার সৃষ্টি নয়। যেমন কোন দক্ষ চিত্রকর যখন দিগন্তে ধূসর কুহেলিকার ছবি আঁকেন, তখন ইহার আপাত দৃশ্য বর্ণ-বিরলতা প্রকৃতপক্ষে রেখা ও রং-এর খুব সূক্ষ্ম নিপুণ সমাবেশ, সেইরূপ মনের স্তিমিত, গোধূলি-অন্ধকারের বর্ণনাও খুব সতেজ, নির্ব্বাচন-কুশলী, পটভূমির আলো-ছায়া-বিন্যাসে সুদক্ষ কল্পনা-মায়ার উপর নির্ভর করে। "ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমি"তে যে কুঁড়েমির ছবি আঁকা হয় তাহা আর্টের দিক দিয়া খুব উচ্চস্তরের নয়। কবি তাঁহার সমস্ত কাব্য-জীবন ধরিয়াই কাজ-ভোলানো গান গাহিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই কাজ তিনি ভোলাইয়াছেন প্রয়োজনের হিসাব-নিকাশের ঊর্দ্ধে

আনন্দের নিবিড়তর অনুভূতির দ্বারা। যেখানে এই আনন্দ ফুটিয়া ওঠে নাই, সেখানে লৌকিক কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি লেখকের উপদেশের মত শোনাইয়াছে; তাহা পাঠকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে নাই। 'একজন লোকে' কবি একজন পথিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে অন্তরঙ্গ পরিচয় পান নাই এই তথ্য আমাদের জানাইয়াছেন। কিন্তু এই কবিতাতে কবির যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে তাহা মোটেই কাব্যোচিত নহে। কবি-কল্পনা এই সমস্ত লৌকিক পরিচয়-নিরপেক্ষ; বরং অপরিচয়ের ব্যবধান তাহার পক্ষে একটা ব্যাকুল আগ্রহ ও করুণ ব্যগ্র জিজ্ঞাসার হেতু হয়। যে সুন্দরী জল ভরিতে গিয়া তাহার কঙ্কণ-ঝঙ্কারের মধুর ইঙ্গিতে কবিকে উন্মনা করিয়াছিল বা যাহার নীরব গূঢ়ার্থব্যঞ্জক হাসি তাঁহার নিরুদ্দেশ যাত্রার তরুণীকে অস্তসূর্য্যের রক্তচ্ছটার অভিমুখে চালাইয়াছিল, সেই কল্পনাজগতবিহারিণীদের তিনি কোন নাম-গোত্রাত্মক পরিচয়ের প্রতীক্ষা করেন নাই। তাহাদের সাঙ্কেতিকতার বিদ্যুৎ-স্পর্শ এক মুহূর্ত্তেই তাঁহার কল্পনাকে ভাস্বর করিয়াছে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁহার স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণকালে যে নিঃসঙ্গ শস্যচ্ছেদনিরত বালিকার মধুর গান শুনিয়াছিলেন বা যে দুইটি বালিকা একদিন এক হ্রদের ধারে "তুমি কি পশ্চিমের দিকে যাইতেছ?" এই সহজ, সরল প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাকে সূর্য্যাস্তরাগরঞ্জিত মেঘলোকের মধ্য দিয়া অনন্ত যাত্রার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে লৌকিক অপরিচয় ত তাঁহার কল্পনাকে প্রতিহত করে নাই। কেবল তথ্য বা নেতিমূলক (negative) চিন্তাধারা দর্শন-বিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কবির জগতে তাহাদের কোন মূল্য নাই। আসল কথা, কবি-প্রতিভার যে রঞ্জন-রশ্মি বাহ্য-পরিচয়ের অস্থিমাংস ভেদ করিয়া একেবারে প্রাণশক্তির উৎসদেশে পৌঁছে, তাহা এই সমস্ত কবিতায় আবৃত রহিয়াছে। এখানে আমরা কাব্যের অপরিণত কাঁচা মাল যে পরিমাণে পাই, তাহাদের চরম পরিণতি ও রূপান্তরসাধন সে পরিমাণে পাই না। এই কবিতাগুলি কাব্যজগতের নীহারিকা-মণ্ডলী—একরূপ অস্পষ্ট, আলো-আঁধারে মেশা রশ্মি বিকীরণ করে; তারকার অখণ্ড, উজ্জ্বল জ্যোতি তাহাদের অনধিগম্য।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, 'পুনশ্চ'-এর শেষ তিনটি কবিতায়—'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন'—একটা ছন্দ-প্রবাহ অনুভব করা যায় এবং প্রধানত এই জন্যই তাহাদের মধ্যে একটা ভাব-গত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলিতে চিত্রের সমাবেশ ও ভাব-ব্যঞ্জনা একটি কেন্দ্রস্থ রসকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—অনাবশ্যকের প্রক্ষেপ তাহাদিগকে অযথা ভারাক্রান্ত করে নাই। —ছন্দ যে শক্তিশালী কল্পনার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি—তা সে যতই ক্ষীণ ও দুর্নিরীক্ষ্য হউক—এই সত্য এই কবিতা তিনটিকে 'পুনশ্চ'-এর অন্যান্য কবিতার সহিত তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে।

৫

অপর এক শ্রেণীর কবিতা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিন্তা ও অনুভূতির আধার। এইগুলিতে কবির কল্পনা বিশ্বপ্রকৃতি, সৃষ্টি-রহস্য ও মানব-সত্তার দুর্জ্ঞেয়তা প্রভৃতি দুরূহ আলোচনায় নিবিষ্ট হইয়াছে। 'পুনশ্চ'-এ 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি খুব উচ্চস্তরের কল্পনার নিদর্শন। আদর্শের অভিযানে চলমান মানব-জাতির শোভাযাত্রা, তাহাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাসের ঘূর্ণীবায়ু ঠেলিয়া দুঃসাধ্য অগ্রগতি, নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাহাকে হত্যা, এই হত্যার অপ্রত্যাশিত তীব্র প্রতিক্রিয়া, শেষে নানা বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এক শুভপ্রভাতে এই আদর্শের অবতার এক নব-জাত শিশুর সম্মুখে যাত্রা-শেষ—এই সমস্তই ইতালীয় মহাকবি ডান্টের মহিমান্বিত, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরকে সমভাবে প্রসারশীল কল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই বিরাট, দ্রুত-সঞ্চারী গতিশীলতার অনুসরণে ছন্দের কথা আমাদের মনে থাকে না—ইহার একটা নিজস্ব অন্তর্নিহিত তাল ছন্দের হিসাব-নিকাশের পদক্ষেপ-রীতি অতিক্রম করিয়া আমাদের বক্ষে স্পন্দিত হইতে থাকে। এই কবিতাটি কবির গদ্যরীতি প্রয়োগের অসামান্য সাফল্যের নিদর্শন। 'শেষ-সপ্তক'-এর অধিকাংশ কবিতাই দার্শনিক-ভাবাপন্ন। ৫, ৯, ১২, ২২, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যক ও "শ্যামলী"তে 'আমি' নামক কবিতাতে মানব-সত্তার দুরবগাহতার বিস্মিত উপলব্ধি কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। প্রতিদিনের অনুভূতিরসে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত মানব-সত্তা তাহার অখণ্ড সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হয় না, যদিও এই সমগ্রতার উপলব্ধি কবি-প্রাণের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মানস মানচিত্র জলে স্থলে, বাষ্পে সূর্য্যালোকে, সূচনায় সমাপ্তিতে, ব্যঞ্জনায় পূর্ণপ্রকাশে বিচিত্র ও রহস্যময়—তাহার কারণ শিল্পীর যে-ধ্যান অপ্রকাশের যবনিকার অন্তরালেই সক্রিয়, তাহা এখনও নিজ সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে নাই। মানুষের লৌকিক পরিচয় তাহার একটা ছদ্মবেশ, ভালবাসার বসন্ত-পবনে তাহা অপসারিত হইয়া যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, তাহা স্বয়ং-স্বতন্ত্র ও অসাধারণ; আমাদের জীবনের অম্লান, প্রকৃতির চির-চঞ্চল গতির সঙ্গে এক ছন্দে বাঁধা তারুণ্যের সঙ্গে অনাদি কালের জন্মজন্মান্তর হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ, বহুজীবনের আসক্তি-লোলুপতায় জীর্ণ, বহু ভ্রমণে শ্রান্ত একটা বার্দ্ধক্য, সহযাত্রিতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; এই সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিলেই আমাদের সত্তার মুক্ত, উজ্জ্বল স্বরূপটি চেনা যায়। হঠাৎ এক নিমেষের অসামান্য স্পর্শে অস্তিত্বের সহজাত অমরতা-বোধ নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতির সহিত স্ফুরিত হয়। বস্তু-জগতের রং ও রূপ ব্যক্তিত্বের আত্ম-চেতনার মধ্যেই প্রতিফলিত—'মানুষের অহংকার-পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প, জগৎ হইতে ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও হৃদয়াবেগ মুছিয়া গিয়া নীরস অস্তিত্বের শুষ্ক কঙ্কাল প্রকটিত হইবে এবং ভগবানকে পুনরায় আমিত্ব-বোধ জাগাইতে সাধনা করিতে হইবে।

প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ লীলা ও গতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-লাভের প্রধান উপায়। এই প্রকৃতির সহিত একাত্মতার অনুভূতি কবির সমস্ত বয়সের কাব্যেই অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। "শেষ-সপ্তক"-এর ৪, ৮, ২৩, ২৬, ২৯, ৪৪ ও ৪৬ সংখ্যক কবিতা ও "শ্যামলীতে" 'অকালঘুম', 'প্রাণের রস' ও 'শ্যামলী' নামক কবিতাতে প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধির সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। যৌবনের মায়া-মোহের লুপ্তাবশেষ, অস্তসূর্য্যের বিচিত্র-বর্ণরঞ্জিত বাষ্প-ঘনিমার মত, আমাদের মানসাকাশকে আবিল ও অস্পষ্ট করিয়া তোলে—এই অলস আবেশ-জড়িমার মরীচিকা হইতে বহিঃপ্রকৃতি আমাদিগকে "শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতা"র মধ্যে আহ্বান করে—কবি অস্তিত্বের এই

সহজ, সনাতন ধারার সহিত নিজ প্রাণের প্রবাহ মিশাইয়া দিয়া সমস্ত দ্বন্দ্ব-সমস্যার অতীত এক শান্তি ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে চাহেন। অতীত যুগের শিল্পীরা শিল্পসাধনায় নিজ নাম স্বাক্ষর করেন নাই—সৃষ্টির আনন্দ তাঁহাদের খ্যাতির লোলুপতাকে অন্তরালবর্ত্তী করিয়াছিল। সেইরূপ কবির গানগুলিও বহিঃপ্রকৃতির আত্মবিস্মৃত প্রাণহিল্লোলের মত চলতি মুহূর্ত্তের অঞ্জলিভরা দান—ইহারা পাতার কম্পন, হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলকের মত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সহজ আনন্দের প্রতিচ্ছবি। এই নামের আকাঙ্ক্ষারহিত সৃজনানন্দে কবি ভগবানের সহধর্মী। এক শরৎ প্রভাতে সৃষ্টির নবীনত্ব প্রাত্যহিক অভ্যস্ত তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করিয়া কবির চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যেমন করিয়া সহমরণোদ্যত বধূ মৃত্যুর আকস্মিকতার পিছনে "চিরজীবনের অম্লান স্বরূপকে" প্রত্যক্ষ করে। আর একদিন এক অতীত দিবস তাহার সমস্ত আকস্মিক বিক্ষেপ ও অনাবশ্যক বস্তু-সঞ্চয়ের ভার মুক্ত হইয়া এক অভিনব রসমূর্ত্তিতে, রূপ ও ব্যঞ্জনার অপরূপ সামঞ্জস্যে কবির পশ্চাৎ-দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক বনস্পতি—যে তাহার "শাখাব্যূহের জটিলতা" অতিক্রম করিয়া তাহার শিরোদেশকে নিঃশব্দ আকাশের আলোক-প্লাবিত শান্তির মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়াছে—কবির ভাষাকে প্রাঞ্জল, নিঃসন্দিগ্ধ ঋজুতা দিয়াছে ও দক্ষিণ বাতাসের মধ্যবর্ত্তিতায় যে ভালবাসার মন্ত্র নবকিসলয়ের মর্ম্মে ধ্বনিত হয় সে মন্ত্রকে তাঁহার নিবিড়তম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের সাধারণ জীবনে যে দিন-পরম্পরা প্রয়োজনের হাইড্রলিক চাপে পিণ্ডীভূত, একাকার হইয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য হারায়, কবির বিশিষ্ট দৃষ্টি তাহাদিগকে এই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্রপেষণ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিটি দিনের উপর এক নূতন গৌরব ও সৌন্দর্য্য আরোপ করিতে চাহে। কবিও এই অফুরন্ত বৈচিত্র্যস্রোতে নিত্য স্নান করিয়া প্রত্যেক দিন নিজের নূতন নামকরণ করিবেন—আজকের দিনের নাম খাটবে না কালকের দিনে। "শেষ-সপ্তক"-এর ৪৪ সংখ্যক ও "শ্যামলী"র শেষ কবিতাটি শ্যামলী কুটীরের পরিকল্পনা ও তাহার কার্য্যে পরিণতির বিষয়ে লিখিত। নিখিল বিশ্ব-জগতের সঙ্গে নিগূঢ় আত্মীয়তা-বোধ কবির একটা মৌলিক, অনায়াস-লব্ধ অনুভূতি। ইহা তাঁহার কল্পনাকে ঊর্দ্ধাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষাবর্ত্তন ও ভূগর্ভে প্রাণ-স্পন্দনের রহস্যময় প্রথম অঙ্কুরোদ্ভেদ—এই উভয়ের সহিতই এক আশ্চর্য্য ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে—বিশ্বের বিচিত্র, বিপুল প্রাণ-যাত্রার সঙ্গে ইহার গতিচ্ছন্দকে মিলাইয়াছে। বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় কবি তাঁহার কল্পনার দুঃসাহসিক অভিযান সংযত করিয়া তাঁহার এই মৃত্তিকাপ্রীতিকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন; মাটির ঘরের মধ্যে এক স্নেহশীতল, সনাতন বিশ্ববিধানের সহিত সামঞ্জস্যশীল, ক্ষমা ও বিস্মৃতির ব্যঞ্জনায় স্নিগ্ধ, ও বাঙ্গালাদেশের প্রকৃতি ও নারী জাতির শ্যামল মাধুর্য্যের প্রতীক্ আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুইটি কবিতায় আবেগের আন্তরিকতা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে ভাবগত ঐক্যসৃষ্টির হেতু হইয়াছে।

কয়েকটি কবিতার মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও বিশ্ব-প্রসারী কল্পনার (cosmic range of imagination) পরিচয় মিলে। "পুনশ্চ"-এ 'কীটের সংসারে' কবিতায় প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে কাব্য-রসে অ-রূপান্তরিত কিছু কৌতূহল ব্যক্ত হইয়াছে। মৃত্যুর প্রতি কবির চিরন্তন আকর্ষণ "পুনশ্চ"-এ 'মৃত্যু' নামক ও "শেষ-সপ্তক"-এ ৩৯ ও ৪০ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিন্তার রসহীন সমষ্টি মাত্র; অপর দুইটিতে মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর অর্থপূর্ণ মন্তব্য উপযোগী কল্পনার সহায়তায় নিবিড়, রস-ঘন রূপ পাইয়াছে। এই গতিশীল সংসারের গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র উপায় মৃত্যু, অন্যথা পরিবর্ত্তনহীন বর্ত্তমানের পাষাণভার অসহনীয় হইত; মৃত্যুর তিমির-তোরণ দিয়াই, প্রতিদিন রাত্রির অবসানে যেরূপ, সেইরূপ কল্পান্তেও, প্রথম জাত অমৃতের বিজয় প্রত্যাবর্ত্তন। একটি দিন-রাত্রি, স্বল্পস্থায়ী মানব-জীবন ও অনন্তময়ের, বিশাল কল্প-যুগ—এই তিন ক্রম-বর্দ্ধমান পরিধির মধ্যে মৃত্যুর অনুরূপ প্রক্রিয়া ও অভিন্ন ফল কবি চমৎকারভাবে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছেন। সময় সময় দুই-একটি ছত্রের মধ্যে কবিতার সনাতন দীপ্তি এই কারুকার্য্যহীন হেলায় রচিত আধারের মধ্য দিয়াও বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

> আমি মৃত্যু-রাখাল
> সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
> যুগ হতে যুগান্তরে—
> নব নব চারণ-ক্ষেত্রে
>
> —শেষ সপ্তক, '৩৯'

মহাকালের বিরাট পটভূমিকায় এক এক সভ্যতার উদ্ভব ও বিলয়, সৌরজগতে নূতন নূতন গ্রহের আবির্ভাব ও তিমির-তলে অবগাহন—অতি নগণ্য, উপেক্ষণীয় ব্যাপার—'বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘ ও ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতই' ইহাদের অস্তিত্বকাল, মহাকালের ধ্যান-ধৃত অক্ষ-মালার এক একটি বীজমাত্র। এই চিরাবর্ত্তিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে মহাকাল যে অক্ষুব্ধ শান্তিতে বিরাজমান, কবি তাহারই প্রার্থী। আবার মহাকালের এই বিশাল বিচরণ-ক্ষেত্রের সহিত তুলনায় মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমৃতভরা, আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলি অমরতার বেশী দাবী করিতে পারে।

> কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
> সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
> তখনো সে (তারা ?) থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
> কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।
>
> —শেষ সপ্তক, '২১'

শুকতারার দ্বৈত-জীবন—একটি গ্রহ-জগতের হৃদয়-সম্পর্কহীন বিশাল মরুভূমিতে, আর একটি মানব-জীবনের সুখ-দুঃখভরা, শ্যাম-সরস ক্ষুদ্র স্নেহ-নীড়ে—কবির কল্পনাকে স্পর্শ করিয়াছে ও এই দুই-এর মধ্যে, তাহার জ্যোতিষ্ক-জীবন অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিচয়টি যে আমাদের নিকট বেশী সত্য তাহা কবি ঘোষণা করিয়াছেন।

এই দার্শনিকতা-প্রধান কবিতাগুলি বিষয়-গৌরবের জন্যই অনেক পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিকতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কল্পনার শিখাও অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির ও প্রোজ্জ্বল। যেমন কোন কোন সৌধে বৃহদাকার পাথরগুলি নিজ নিজ গুরুভারের জন্যই কোন বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকেও পরস্পরকে স্বস্থানে ধরিয়া রাখে, তেমনই এই কবিতাসমূহের ভাব-

গরিমা ছন্দ-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও ইহাদিগকে একটা গঠন-গত ঐক্য ও দৃঢ়বদ্ধ সংহতি দিয়াছে। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ইহাদের মধ্যে কল্পনাশক্তির অপ্রাচুর্য্য নাই। তথাপি মনে হয় যেন ছন্দের অভাবের জন্য ইহারা চরম প্রকাশ-সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কবি অঞ্জলি ভরিয়া যে স্বর্ণরেণু আহরণ করিয়াছেন, আধারের শিথিলতার জন্য যেন অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া তাহার কতক অংশের অপচয় ঘটিয়াছে। কবিতাগুলির সমাপ্তির মধ্যে চরম পরিণতির (climax) সুরটি বাজিয়া ওঠে না। ছন্দ-প্রবাহের মধ্য দিয়া যে একটি ক্রমবর্দ্ধমান বিপুল গতিবেগ আহরিত হয়, আবেগ-কম্পন পর্দ্দায় পর্দ্দায় উচ্চতর সুরে আরোহণ করিতে থাকে, এখানে তাহার অভাবের জন্য একটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়। বিভিন্ন পংক্তিগুলি স্ব-স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চল গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া থাকে, ধ্বনি-তরঙ্গের অনিবার্য্য স্রোত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া তাহাদের ছোট ছোট সুরগুলিকে সংহত করিয়া, বিরাট ঐক্যতানের মহাসমুদ্রে লুপ্ত করিয়া দেয় না। কাব্য-জগতে ছন্দের প্রধান অবদান—স্মরণীয়তা। শেষ-সপ্তক-এর কবিতাগুলি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু যে সহজ আনন্দ ছন্দরূপে মূর্ত্ত হইয়া কবির রচনাকে আমাদের মনে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয় তাহার আস্বাদন এখানে মিলে না। ছন্দের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হইলে এই বিচ্ছিন্ন হীরকখণ্ড-গুলি মহাকালের বক্ষে মণিহারের ন্যায় চিরদিন ধরিয়া দোদুল্যমান হইত এই আক্ষেপবোধ আমাদের রসোপভোগের আনন্দকে কিঞ্চিৎ ম্লান করিয়া দেয়।

৬

গদ্য-কবিতার মধ্যে প্রেম-কবিতারও যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে "শেষ-সপ্তক-এর" ১, ২, ৩ ও ৩১ সংখ্যক ও "শ্যামলী"র 'দ্বৈত', 'শেষ পহরে' 'বাঁশীওয়ালা' ও 'মিলভাঙ্গা' নামক কবিতাগুলিকে এই পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। আখ্যায়িকা কবিতার মধ্যে অনেকগুলিতে যদিও প্রেমের স্পর্শ আছে, তথাপি মোটের উপর ঘটনা-বিবৃতিই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবেগপ্রধান প্রেম-কবিতাতে ছন্দো-ঝঙ্কারের বিশেষ সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে। প্রেমের আবেশ জমাইতে হইলে সুরের সাহায্য অত্যাবশ্যকীয়। ইহা ব্যতীত এই জাতীয় কবিতাতে যে তীব্র হৃদয়াবেগ বর্ত্তমান, তাহা গদ্য-কবিতার অতি-পল্লবিত মুখরতাকে সংযত করে। তথাপি আধুনিক প্রেম-কবিতায় হৃদয়াবেগ অপেক্ষা সমস্যা-সঙ্কুলতাকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়ার রীতি অনুসৃত হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে ডন ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাউনিং এই জাতীয় কবিতার প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাতে প্রেমের চিরন্তন রহস্য-লীলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকাশগুলি তাহাদের সহজ, ঢেউ-খেলানো গতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। এখানে কল্পনার খুব উচ্চ সুরের তারে ঝঙ্কার নাই, প্রেমের শান্ত, মৃদু কম্পনগুলি মনের উপর যে বিচিত্র রেখা অঙ্কন করিয়াছে সেইগুলিকেই অনুচ্ছ্বসিত ভাব-সংযমের সহিত প্রকাশ করার চেষ্টা হইয়াছে। যে প্রেমের দান আমরা দিনের পর দিন হেলাভরে, উপেক্ষার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি, অকস্মাৎ একদিন সুকঠিন মৃত্যু-বিচ্ছেদের অভিঘাতে তাহার অস্বীকৃত মহিমা দীপ্ত হইয়া ওঠে। প্রেমের হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগ মুখে মুহূর্ত্তের জন্য অমৃত স্পর্শ মাখাইয়া দেয়, জোয়ারের অতর্কিতভাবে উৎক্ষিপ্ত দুর্লভ রত্নের ন্যায় সমস্ত জীবনে তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটে না। বসন্তারম্ভে বিকশিত একটি অরুণ কিশলয় সেই অকথিত প্রেমের বাণী, যাহা অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষায় নীরব রহিয়া গিয়াছে। আবার শুভ মুহূর্ত্তে উচ্চারিত একটি প্রেম-নিবেদনে পরিচয় যেরূপ সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়, সমস্ত জীবনের কার্য্যকলাপে তাহা হয় না—এই একটি মুহূর্ত্ত জীবন-মৃত্যুর বহু-বিস্তৃত পটভূমিকায় অবিনশ্বর উজ্জ্বলতায় আঁকা থাকিবে। প্রেম বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে যে অসম্পূর্ণ আভাস-ইঙ্গিত, যে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব-পরিচয় থাকে তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে—প্রেমিক-যুগল নিজ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার আকুলতা দিয়া পরস্পরকে পূর্ণ বিকশিত করে। তাহার পূর্ব্বের অবস্থা কুহেলি-মণ্ডিত, বিশ্ব-জাগরণের পরিচয়-সূত্রের সহিত অসংলগ্ন উষার মত :

> "উষা যখন আপনা-ভোলা
> যখন সে পায়নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
> পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখন-পত্রে।"
>
> —শ্যামলী, 'দ্বৈত'

'মিল ভাঙ্গা'তে আদর্শ-পার্থক্যের জন্য বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-যুগলের মধ্যে পূর্ব্বানুরাগের করুণ স্মৃতি যে ক্ষণিক মিলনের আভাস আনে তাহা একের মনে ক্ষুব্ধ আবেগ জাগাইয়াছে। "শেষ সপ্তক"-এর ৩১ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রিয়ার মৃত্যুর পর শোকোদ্‌ভ্রান্তচিত্ত পুরুষ নিজ বৈঠকখানা পাড়ার ক্লাবে পরিণত করিয়াছে—ইতর তর্ক-বিতর্ক, সুলভ আমোদ ও আবিল কোলা-হলের দ্বারা নিজ শোকের উপর বিস্মৃতি-প্রলেপ দিবার জন্য। একদিন কোনও সাময়িক উত্তেজনা ক্লাবের সভ্যবৃন্দকে বাহিরে টানিয়াছিল—ক্লাবের অধিবেশন বন্ধ ছিল। সেই নির্জ্জনতার রন্ধ্রপথ দিয়া মৃত প্রিয়ার অশরীরী উপস্থিতি, করুণ অনুযোগ ও নীরব ভর্ৎসনার সহিত আদর্শভ্রষ্ট প্রেমিকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। এই ব্যথিত অনুশোচনার সুরটি ম্লান সুরভির মত সমস্ত কবিতাটিকে পূর্ণ করিয়াছে—ছন্দোহীন পংক্তিগুলি এক একটি বিষণ্ণ-মন্থর দীর্ঘশ্বাসের মতই শোনাইয়াছে। মোটের উপর ছন্দোহীন গদ্যে গ্রথিত এই প্রেম-কবিতাগুলি প্রেমের উন্মাদনা নহে, ইহার অবসাদাত্মক নীচু সুরের কয়েকটি ভাব সুন্দররূপে ফুটাইয়াছে।

৭

অন্যান্য কতকগুলি কবিতা বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সবগুলির মধ্যেই প্রগাঢ় মৌলিক চিন্তাশীলতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। "পুনশ্চ"-এ 'পত্র' 'বিচ্ছেদ' ও "শেষ সপ্তক"-এ '১৫', '১৬', ও '৩৮' সংখ্যক কবিতা আর্ট সম্বন্ধে গভীর মন্তব্যেপূর্ণ। কবিতার সঙ্গে অবকাশের সম্বন্ধ তারার সঙ্গে আকাশের পটভূমিকার ন্যায়। ছাপার বই-এ সংগৃহীত কবিতাবলী আকাশের নীল বক্ষ হইতে বিচ্যুত পিণ্ডীকৃত নক্ষত্রসমূহের ন্যায় অস্বাভাবিক ও অশোভন। শূন্যতার আবেষ্টনের মধ্যেই কবিতার মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়া ওঠে। ছবি ও কবিতার পরস্পর সম্পর্ক ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অন্তরতার নিত্য সম্বন্ধ, রূপরেখাটি লিপি-কবিতার বিষয়-বস্তু।

"পুনশ্চ"-এর 'বিচ্ছেদ' ও "শেষ সপ্তক"-এর ৩৮ সংখ্যক কবিতায় মেঘদূতের বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, আসক্তিলিপ্ত প্রেমবিরহের মধ্য দিয়া কিরূপে মুক্তি, প্রসার ও সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছে ও স্থাণুহইতে গতিশীলে, ব্যক্তিগত বেদনা হইতে বিশ্বব্যাপী অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া কাব্যের অনন্ত সৌন্দর্য্যলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার চমৎকার বর্ণনা আছে।

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "শেষ সপ্তক"-এর ৪৩ সংখ্যক কবিতা কবির জন্মদিন উপলক্ষে লিখিত। জন্মদিনের প্রত্যেক প্রত্যাবর্ত্তনই কবিকে তাঁহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের অখণ্ড সমগ্রতা উপলব্ধি করিবার অবসর দিয়াছে। বিভিন্ন বর্ষের জন্মদিন-কবিতাগুলি একত্র সংগ্রহ করিলে কবির কাব্য-জীবনের একটা সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বর্ষে বর্ষে তিনি জীবনকে কোন নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন, তাহার নিকট কোন নূতন সৃষ্টি ও আদর্শের প্রত্যাশা করিয়াছেন, আসন্ন মৃত্যুর কৃষ্ণ পটভূমিকায় ইহার খণ্ডিত পর্য্যায়গুলি কি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া সুস্পষ্টতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—এই অন্তরঙ্গ ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নামের আশ্রয়ে যে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিগুলি আপন আপন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়লীলা শেষ করিয়া এখন একজন পরিণত-বয়স্ক বৃদ্ধের জীবনেতিহাস উদ্‌ঘাটনের জন্য রঙ্গমঞ্চ খালি রাখিয়া গিয়াছে, এই কবিতায় তাহাদের প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত অথচ সার্থক পরিচয় চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবির শেষ জীবনের যে ছবি তাঁহার গুণানুরাগী ভক্ত-বৃন্দের "শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ও ক্ষমায় প্রতিফলিত", তাঁহার এই মানসী মূর্ত্তিকেই তিনি "নিজ শেষ বেলাকার সত্য পরিচয়" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মোটের উপর দেখা যায় যে, তাঁহার কবিত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশের যুগে তিনি আত্ম-সমাহিত, নিজ কল্পনার ধ্যানেই বিভোর—তাঁহার পরিচয় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্রৌঢ় বয়স হইতে বাহিরের উৎসাহ-উদ্দীপনা, বন্ধুর সান্ত্বনা ও ভক্তের সেবা তাঁহার মানসী মূর্ত্তি গঠনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন-ধারা কম-বেশী প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। রচনার পূর্ণ জোয়ার কতকটা মন্দীভূত হইলে একদিকে লৌকিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য, অন্য দিকে নিজ প্রতিভার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কবির অন্তর্জীবনকে অনেকটা বহির্মুখী করে। কবির নির্জ্জন মানসলোক বহুপদচিহ্নাঙ্কিত হয়—বহির্জগতের স্তুতি-নিন্দা-বিচার ও প্রীতি তাঁহার জীবনের গতিকে কিছু পরিবর্ত্তিত কক্ষপথে সঞ্চালিত করে। প্রৌঢ় বয়সের কবি এক নূতন রূপ ও মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শেষ বয়সের ইতিহাস, যতটা তাঁহার নিজ কবিতায় নহে, তাহার চেয়ে বেশী, ক্র্যাব রবিনসনের দিন-লিপির মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'শ্যামলীর' অন্তর্ভুক্ত 'তেঁতুলের ফুল'। রবীন্দ্রনাথের 'পুষ্প-কবিতা'র সংগ্রহ খুব বিচিত্র ও কৌতুহলোদ্দীপক। দেশী বিলাতী, খ্যাত অখ্যাত নানাবিধ ফুল তাঁহার কাব্য-মালিকায় স্থান পাইয়াছে। 'পূরবী' ও 'মহুয়ায়' এই শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতা আছে। এই পুষ্প-প্রীতি বিষয়ে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তুলনীয়। তিনিও ইংরেজ কবির ন্যায় অনেক উপেক্ষিত, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত কুসুম-সুন্দরীকে প্রথম লক্ষ্য করিয়া আবিষ্কারকের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত তিনিও এক এক জাতীয় ফুলের মধ্যে একটা বিশেষ প্রকারের ভাব-ব্যঞ্জনার সন্ধান করিয়াছেন এবং এই ভাব-মধ্যকোষের চারিদিকে তাহার বর্ণ-গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য বৈশিষ্ট্যের পাপড়িগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মোটের উপর পুষ্প-কবিতায় ইংরেজ কবির সহিত তুলনায় তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চিন্তা অনেকটা সঙ্কীর্ণ নীতিকথার খাতেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রসার অধিকতর ব্যাপক ও তাঁহার ভাব-ধারা আরও প্রচুরতর স্রোতে উচ্ছ্বসিত। 'তেঁতুলের ফুলে' তেঁতুল গাছের রুক্ষ, বিপুলায়তন দেহে পেলব-সুকুমার পুষ্প-সুষমার অতর্কিত আবির্ভাবে কবির মন বিস্ময়ানন্দের চমক অনুভব করিয়াছে। বিশেষতঃ যে তেঁতুল গাছটী কবির শৈশবের স্বপ্ন-কল্পনা ও তাঁহার পারিবারিক জীবন-ধারার সদা-চঞ্চল পরিবর্ত্তন স্রোতের মধ্যে চিরস্থায়িত্বের প্রতীকের মতই অটল মহিমায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার অঙ্গে যৌবন-চাঞ্চল্যের অপ্রত্যাশিত বিকাশ তাঁহার বিস্ময়কে গাঢ়তর করিয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি-রোমন্থনের মন্থর, বিলম্বিত উপভোগ গদ্য-কবিতার পল্লবিত বিস্তারের মধ্যে সুন্দর উপযোগিতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৮

১৩৪৬ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ নিজ গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম রসবোধের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কের মধ্যে কতকগুলির সম্বন্ধে আগেই বিচার হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি দুইটা নূতন যুক্তি ও কয়েকটা উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন। (১) গদ্য-কাব্যে 'কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতি আপনা-আপনি উদ্ভব হয়…। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতি-মাধুর্য্য, অতি-লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না।' (২) কবি অনুভব করেন যে তাঁহার গদ্য-কাব্যের বিষয়-বস্তু তিনি অপর কোনরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। অনলঙ্কৃত গদ্য-রীতির মধ্যে যে উচ্চ-তম কাব্যোৎকর্ষে পৌঁছান যায়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের গল্প, বাইবেলের অনুবাদ, যজুর্ব্বেদের উদাত্ত গদ্যমন্ত্র ও গীতাঞ্জলির ইংরেজী গদ্য-অনুবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে 'কোমলে কঠিনে' মিলিয়া যে এক নূতন সংযত রীতির উদ্ভব তিনি প্রত্যাশা করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া সিদ্ধি পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। যদি বিশুদ্ধ কাব্যোচিত সুকুমার সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশ করা যায়, তবে প্রকাশ-ভঙ্গীর অভিনবত্ব আপেক্ষিক অপকর্ষেরই হেতু হয়। কাব্য-মনোভাবের সহিত গদ্য মনোভাবের যদি যথার্থ সংমিশ্রণ হইয়া থাকে, তবেই গদ্য-পদ্য মিশ্রিত অক্ষর-রীতির উপযোগিতা বিচার্য্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই গদ্য-মনোভাব কোন উপাদানে গঠিত, তাহা তাঁহার গদ্য-কবিতা হইতে বুঝা যায় না। সাধারণতঃ রসিকতা (humour or wit), তীক্ষ্ণ বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ ও আলোচনা এবং

বাস্তব-রসের অতি-প্রাচুর্য্য কবিদের পক্ষে গদ্য মনোভাবের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয়। ইংরেজী কবিদের মধ্যে চসার, ডন ও ব্রাউনিংর এই গদ্য-প্রধান মনোভাব ছিল বলা যাইতে পারে—কিন্তু ইহারা কেহই কবিতার ছন্দোময়ী মূর্ত্তিকে উপেক্ষা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যে তীক্ষ্ণ মনন-শক্তির ও দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই মনন শক্তিও দর্শনপ্রবণতা প্রচুরভাবে কাব্যরসে অভিষিক্ত। রসিকতা ও বাস্তব-রসের, এই কবিতাগুলির মধ্যে একান্ত অভাব। কাজেই ইহাদের মধ্যে গদ্য-পদ্যের একটা সার্থক সমন্বয় না হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা কাব্য-ক্ষেত্রে গদ্যের অনধিকার-প্রবেশের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এই যৌথ কারবারে গদ্য আইনসঙ্গত অংশীদারের মর্য্যাদা পায় নাই—ইহাদের সম্বন্ধ অনেকটা দুধ ও জলের সম্বন্ধের ন্যায়; পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু আস্বাদের মিষ্টত্ব কমিয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তিও আমাদের সন্দেহ-নিরসনের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। কবি যখন বলেন যে গদ্য-কবিতায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অন্য কোনও রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার সমস্ত অতীত রচনা এক বাক্যে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করে। এবিষয়ে তাঁহার শক্তিও অনুমান-সাপেক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ, অখণ্ডনীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত বিষয়, চিন্তা ও অনুভূতি তিনি এই গদ্য-কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটাই আরও অপরূপ-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিতায় ছন্দোময় বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটী গদ্য কবিতা ছাড়া (ইহাদের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) আর কোথাও প্রকাশ-ভঙ্গীর অনন্য-সাধারণতা (uniqueness) সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি না। যদি ডান ও বাঁ হাতে লিখিতে প্রায় তুল্যরূপে দক্ষ কোন ব্যক্তি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন যে তাঁহার বাঁ হাতের লেখাটি তিনি আর কোন উপায়ে লিখিতে পারিতেন না, তবে তাঁহার উক্তি আক্ষরিকভাবে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার পিছনে বাস্তবের সহিত একটা প্রকাণ্ড অনৈক্য বর্ত্তমান। গদ্য-কবিতাগুলির সমস্ত অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ ও কবির দৃঢ় পক্ষ-সমর্থন সত্ত্বেও ইহারা যে বাম হস্তের রচনা, আমাদের এই ধারণা বিচলিত হয় না।

কবির উদ্ধৃত উদাহরণগুলিও বর্ত্তমান আলোচনায় ঠিক প্রযোজ্য নহে। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই গদ্যের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ (rhythm) রক্ষিত হইয়াছে। উল্লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহে বিষয়-গাম্ভীর্য্যের সহিত ধ্বনি-তরঙ্গ মিশ্রিত হইয়া কাব্য-ছন্দের অনুরূপ আবেদনের সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতে গদ্যপদ্যের ব্যবধান বিশেষ মূলগত নহে—কাজেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোন উপাখ্যান বা মন্ত্র নিজ অন্তর্নিহিত বিষয়-গৌরবে ও ভাবানুষঙ্গে কাব্যচ্ছন্দে বাঁধা না পড়িয়াও কাব্যাতীত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। বাইবেলের সমগ্র ধর্ম্মানুশাসন ও বিষয়ের বিরাট ব্যাপকতাকে গাঁথিয়া তুলিতে পারে, কবিতার অশেষ ছন্দো-বৈচিত্র্যের মধ্যেও এতটা বিষয়োপযোগী নমনীয়তা (adaptability) নাই—কাজেই ইহার গদ্যরূপ অনিবার্য্য। কিন্তু ইহার তুচ্ছতম আখ্যায়িকার মধ্যেও গম্ভীর মৃদঙ্গনাদের মত একটা সঙ্গীত-ধারা প্রবাহিত—ইহার rhythm এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করা যায় না। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের মধ্যেও এই গতিচ্ছন্দ বর্ত্তমান; বিশেষতঃ গীতি-কবিতার অবয়ব-সংক্ষেপ ইহাদের রসের গাঢ়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ছন্দ-কবিতার প্রাণ—ইহার নিগূঢ় বক্ষোস্পন্দন। ইহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইহার গতিচ্ছন্দের মধ্যে তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে; ইহার উচ্চধ্বনিকে যথাসম্ভব মৃদু করিয়া ইহাকে ক্ষীণতম, কষ্টে শ্রুতিগোচর স্পন্দনে পরিণত করা যাইতে পারে; প্রবল ভাবাবেগে মুহূর্ত্তের জন্য বিলুপ্তও করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন না কোন রূপে কাব্যে ইহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য। রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিও যে ছন্দো-বর্জ্জনের এই পরীক্ষায় অতি বিরল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, ইহাই ইহার ব্যাপক অনুসরণ বিষয়ে অনুপযোগিতার চূড়ান্ত প্রমাণ। (সমাপ্ত)

আবির্ভাব-মাঙ্গলিক

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ঘোরে ঘর্ঘরাঘর যুগের চাকা চক্রবাল ওই অন্ধকার,
আসে জগৎগুরু প্রলয়রোলে ঐ শোনা যায় ছন্দ তার।
ওঠে ঝঞ্ঝাবাতাস মানবনারীর ভাঙ্গলো বিলাসকুঞ্জবন,
ওই রুদ্রধাতার পাল্লাতে আজ পড়লো ভেঙ্গে সব বাঁধন।
ঝরে রক্তবাদল্ বাজছে মাদল অগ্নিবোমার ঝরছে শিল,
করে আর্ত্তনাদ আজ বিশ্বমানব উঠছে কেঁপে সবনিখিল।
জাগো ভক্ত সাধু শক্ত বুকে রক্ত-পথে জল ঢালো,
ওই কল্কী আসে মাল্যগাঁথো শঙ্খবাজাও দীপজ্বালো।

ওরে ধর্ম্ম কবে মুদলো নয়ন পাপের কালো মর্ম্মে ঝরি',
করে ন্যয়ের সমাজ-পদ্ম থেকে পালিয়ে গেছে ছন্ন হরি।
আজ সভ্যতার এই জৌলুষেতে ঈশ্বরেরি নেইকো ঠাঁই,
ওরে জল্লাদ হোল পূজ্য কাঁদে প্রহ্লাদ আজি যন্ত্রণায়।
আজ সর্ব্বঘরে দ্রৌপদী আর সীতার চলে নির্য্যাতন,
ভার পারছেনা আর বইতে মহী সইছে না আর এই বেদন।
তাই অগ্নিদাহে তপ্তপথ আজ ভক্ত সাধু জল ঢালো,
ওই কল্কী আসে মাল্যগাঁথো শঙ্খবাজাও দীপজ্বালো

ওরে সত্য ও প্রেম বিদায় নেছে জীবনটা আজ অত্যাচার,
হোল পায়ের তলায় পিষ্টগুনী কাঁদছে কবির বীণ সেতার।
নব সাম্যবাদের ধাপ্পাতে আজ উচ্চনীচ ওই সব সমান,
আজ সমান হোল কাঞ্চন ও কাচ স্বর্গ এবং আন্দামান।
ওই বিশ্বে পুতিগন্ধ ওঠে বন্ধ হয়ে আসছে দম্,
ওই আকাশ ফেটে অগ্নিবোমার তাল বেজেছে বোবম্ বোম্।
জাগো ভক্তসাধু শক্তবুকে রক্তপথে জল ঢালো,
ওই কল্কী আসে মাল্যগাঁথো শঙ্খবাজাও দীপ জ্বালো।

ওই ঘুরছে নবীন যুগের চাকা মিথ্যাবাদীর দল সরো,
আজ বিশ্বে নবীন পর্দ্দা ওঠে ভক্ত সাধু গান ধরো।
এই ঘূর্ণীচাকার তূর্ণ বেগে উল্টে যাবে স্বর্গতল,
সব উল্টে যাবে শাস্ত্রপাতি বিশ্ব হবে রংমহল।
আর ভবিষ্যতের শিল্পী কবি বিশ্বে তোদের নেইকো ডর,
ওরে সর্ব্বনাশক ধ্বংসে আসুক স্বর্গ তোদের মাথার পর।
আজ মানববলির রক্তধারায় ধৌত হবে পাপকালো,
ওই কল্কী আসে মাল্য গাঁথো শঙ্খ বাজাও দীপজ্বালো।

জঙ্গম

বনফুল

ভন্টুর বাসায় যখন শঙ্কর গিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। মাহিনা বাড়াতে ভন্টুর দৈন্যদশা অনেকটা ঘুচিয়াছিল। মুখে সে যা-ই বলুক চাল সে বদলাইয়াছে। আগে বাড়িতে ঢুকিলেই ময়লা বিছানা, ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া মাদুর, দড়ির আলনায় স্তূপীকৃত মলিন জামাকাপড়, দালানের কোণে ভাঙা তক্তাপোষ প্রভৃতিতে যে দারিদ্র্য প্রকট হইয়া থাকিত এখন তাহা আর নাই। বাড়িতে এখন বেশ একটা লক্ষ্মী-শ্রী দেখা দিয়াছে। সে বাড়িও এখন নাই, ভন্টু বাড়ি বদলাইয়াছে, বেশ ভদ্রগোছের দ্বিতল একটি বাড়ী। দ্বিতলের ছোট দুইখানি ঘর লইয়া ভন্টু থাকে, একটি শুইবার বসিবার ঘর—অপরটি বাথরুম। বাথরুম না হইলে ইন্দুমতীর চলে না। একতলার শ্রেষ্ঠ ঘরখানি অবশ্য বাকু লইয়াছেন। ঢুকিতেই প্রথমে বাকুর ঘর, ঢুকিয়াই শঙ্কর বাকুর দরাজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, "উপদেবতা নন তাহলে বাঁচা গেল, কিন্তু অবিশ্বাস কোরো না, ওঁরা আছেন।"

বৌদিদির সহিতই কথা হইতেছিল। বৌদিদি ঘরের মেঝেতে পান সাজিতে সাজিতে শ্বশুরের সহিত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে দিতে গল্প করিতেছিলেন। ঘাড় নাড়িয়া যখন কুলাইতেছিল না, তখন উঠিয়া গিয়া শ্বশুরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছিলেন। বধির বাকু তাহা না হইলে কিছুই শুনিতে পান না। শঙ্করকে দেখিয়া বৌদিদি একমুখ হাসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

"এস, বড় রাত করলে কিন্তু, ঠাকুরপো বোধহয় তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ, মৃন্ময় ঠাকুরপোও আসেনি এখনও।"

"ভূতের গল্প হচ্ছিল না কি ?"

বৌদিদি হাসিলেন।

"ননটুর অসুখ করেছিল কি না, তার পথ্যের দিন ঠাকুরপোর আপিসের এক বন্ধু কিছু জ্যান্ত কই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছগুলো দালানের কোণটায় ঢালা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা মাছ কখন যে লাফাতে লাফাতে গিয়ে ওই পুরোনো বড় তোরঙ্গটার পিছনে গিয়ে ঢুকেছিল তা আমরা কেউ টেরও পাই নি। ক্রমে সে মাছ মরে' পচে' বাড়িময় দুর্গন্ধ, ঠাকুরপো চারদিকে ফিনাইল ছেটাচ্ছে, কিছুতেই গন্ধ যায় না। বাবা বললেন, পত্রপাঠ এ বাড়ি বদলাও, নিশ্চয় কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। আজ ঘর ধোয়া হচ্ছিল, তোরঙ্গটা সরাতে গিয়ে সেই পচা মাছ বেরুল।"

বৌদিদি হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, "যত আজগুবি কাণ্ড আপনাদের, এ যুগে ভূত আছে না কি।"

বৌদিদি উঠিয়া বাকুর কানে চুপি চুপি বলিলেন, "শঙ্কর ঠাকুরপো ভূতটুতে একদম বিশ্বাস করে না, বলছে আপনাদের যত সব আজগুবি কাণ্ড।"

বাকু তামাক খাইতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি নলটি মুখ হইতে নামাইয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তাহার পর নল দিয়াই সামনের মোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন "বস। তোমরা আজকালকার ছোকরারা দুপাতা ইংরিজি পড়ে' কিছুই তো মানতে চাও না। একটা গল্প বলি শোন।"

বৃদ্ধ গড়গড়ায় একটা মধ্যম গোছের টান দিয়া শুরু করিলেন, "শোন। তখন আমি ঝরিয়া কলিয়ারিতে কণ্ট্রাকটারী করি। ঠিক দুকুরবেলা, বোশেখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর চারিদিকে, কোল রেজিং হচ্ছে, আমি শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম ভন্টুর গর্ভধারিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পরণে টকটকে লালপেড়ে কাপড়, মাথায় চওড়া সিঁদুর! আমি অবাক হয়ে গেলুম, এখানে এল কি করে', কথা কইতে যাব, মিলিয়ে গেল।"

বাকু গড়গড়ায় টান দিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর ?"

"খানিকক্ষণ পরে টেলিগ্রাফ পেলুম মারা গেছে। তোমার সায়ান্স কি বলে ?"

"কোথা ছিলেন তিনি ?"

"দেশের বাড়িতে, দু'শো মাইল দূরে।"

শঙ্কর কি বলিবে, চুপ করিয়া রহিল। বৌদিদি বহুবার-শ্রুত এই কাহিনীটি আর একবার শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে পানের খিলিগুলিতে লবঙ্গ গাঁথিতে লাগিলেন। এই হাসি বাকু যদি দেখিতে পান তাহা হইলে অনর্থ ঘটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি খিলিগুলি মুড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

"তুমি বস, আমি ঠাকুরপোকে ডেকে দিই।"

বাকু গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাম্রকূট চর্চ্চা করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিলেন।

"বউমাটিকে নিয়ে এস একদিন, দেখি।"

তাহার পর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মিলিয়ে দেখেছিলে ?"

শঙ্কর স্মিত-মুখে ঘাড় নাড়িল।

"ঠিক মিলে গেছে তো, জানি মিলবেই।"

শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। বাকুর বদ্ধ ধারণা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মুখ এক ছাঁচের হইবেই। ভন্টুর বিবাহের পরও বাকু শঙ্করকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—লক্ষ্য করে দেখ তুমি, ভন্টুর আর নতুনবউমার মুখের 'কাট' হুবহু এক রকম, হতেই হবে যে। ভন্টুর গর্ভধারিণীর ফোটোগ্রাফ আছে—আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ নাক মুখ চোখ গড়ন সমস্ত একরকম। শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াছিল, কারণ প্রতিবাদ করা বৃথা। বাকু এ বিষয়ে এমন গোঁড়া যে যদি কোন স্বামীস্ত্রীর মুখ একরকম না হয় তাহা হইলে তাঁহার ধারণা উহারা

স্বামীস্ত্রী নয়, কোনরূপ গোলমাল আছে। এ প্রসঙ্গে একটি গল্পও তিনি করেন। একবার ট্রেণে যাইতে যাইতে তিনি নাকি একটি বেখাপ্পা দম্পতী দেখিয়াছিলেন। স্বামীর মুখ গোলাকার, কিন্তু স্ত্রীর সোজা লম্বা। বাকুর ঘোরতর খটকা লাগে। দুই চারি ষ্টেশন পরেই খটকা ভাঙিল; পুলিশ আসিয়া হাজির হইল, ছোকরা আর এক জনের স্ত্রীকে লইয়া সরিতেছিল!

মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল।

বৌদিদি আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো তোমাদের ওপরেই যেতে বললে। তোমরা ওপরে ব'সগে, আমি গরম টরম করি সব ততক্ষণ।"

বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিলেন, "বউমা এ কলকেটায় আর কিছু নেই, তুমি আর একটা কলকে ঠিক করে দিয়ে যাও"

মৃন্ময় ও শঙ্কর উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, শঙ্করের বগলে একটা পুলিন্দা ছিল, শঙ্কর তাহা যথাসম্ভব সঙ্গোপনেই রাখিয়াছিল, তবু তাহা বৌদিদির দৃষ্টি এড়াইল না।

"বগলে ওটা কি, শঙ্কর ঠাকুরপো।"

"শাড়ি একখানা"

"অমিয়ার জন্যে কিনলে বুঝি"

শঙ্কর কেবল মুচকি হাসিয়াই উত্তর দিল।

মৃন্ময়ও হাসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার হাসিটা কেমন যেন প্রাণবন্ত হইল না, বরং মুখখানা যেন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হাসিকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়ার ঘটনাটা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল বোধ হয়। ঘটনাটা অনেকদিনের হইলেও সে ভোলে নাই।

শঙ্কর ও মৃন্ময় উপরে উঠিয়া গেল।

ভনটু বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দুমতী ঘরের এককোনে বসিয়া উলের কি যেন একটা বুনিতেছিল। শঙ্কর ও মৃন্ময় প্রবেশ করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও আধুনিক কায়দা অনুযায়ী নমস্কার করিল।

"আসুন"

ঘরে খান কয়েক মোড়া ছিল, শঙ্কর ও মৃন্ময় উপবেশন করিল। ভনটু বিছানায় উপুড় হইয়াই রহিল এবং বলিল, "শঙ্কর তুই এসে আমার কোমরটার ওপর চড়ে ব'স তো"

"কেন, কি হল কোমরে"

"জখম হয়েছে"

ইন্দুমতী মুখ টিপিয়া হাসিল এবং বলিল, "আমি যাই নীচে দেখিগে দিদি কি করছেন—"

ভনটু উঠিয়া বসিল এবং বলিল, "লবষ্টার-মেধ যজ্ঞের হোতাকে আর খজলে লাভ কি, তিনি একাই একশ"

ইন্দুমতী বলিল, "চা করে' আনব?"

শঙ্কর বলিল, "এখন আর চা খেয়ে কি হবে। আপনি বসুন।"

ভনটু মুখ সূচালো করিয়া বলিল, "ওঁকে অত সমীহ করে লাভ কি। উনি একটি চামাটু লুকিয়ে চিংড়ি মাছ ভাজা খেতে চান"

ইন্দুমতী বড় বড় চোখ দুইটি ভনটুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "তুমি সবাইকে ওই কথা বলে' বেড়াচ্ছ বুঝি"

ভনটু গলার ভিতর হইতে গোঁক গোঁক শব্দ করিল।

মৃন্ময় ভনটুর সান্নিধ্যে কখনও স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করে না, হয়তো সে এই নিমন্ত্রণেও আসিত না; কিন্তু ভনটুকে এড়াইয়া চলা এখন তাহার পক্ষে অশোভন, ভনটু এখন তাহার ওপর-ওলা কেরাণী। শঙ্করের পকেট হইতে কুমার পলালকান্তির দেওয়া খবরের কাগজটা দেখা যাইতেছিল; মৃন্ময়ের তাহা চোখে পাড়তে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

"আজকের কাগজ নাকি ওটা।"

"হ্যাঁ।"

"দিন তো, দেখাই হয়নি আজকের কাগজ।"

কাগজখানা লইয়া সে একধারে সরিয়া বসিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিল।

শঙ্কর ইন্দুমতীকে বলিল, "ভনটুর কথা বিশ্বাস করি না আমরা। বলুন আপনি।"

অনুযোগভরা সুরে ইন্দুমতী বলিল, "দেখুন তো কাণ্ড, শনটু ননটু ওরা দুজনে রোজই আমাকে বলত কাকীমা গলদা চিংড়ি ভাজা খাব পয়সা দাও, দোকানে কেমন ভাজা হচ্ছে গরম গরম। আমি তাদের বললুম, দোকানের ভাজা খাবার দরকার কি—গলদা-চিংড়ি তোরা কিনে আন আমি ষ্টোভে লুকিয়ে ভেজে দেব তোদের দুপুরে"

"লুকিয়ে কেন"

"ফনতি মিনুর যে আবার পেট ভাল নয়, দেখতে পেলে কাঁদবে"

ভনটু মন্তব্য করিল, "থিফ্ কোথাকার"

"নিজেদের খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই বল, আমার নামে দোষ দেওয়া কেন শুধু শুধু"

অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ইন্দুমতী বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর একটু হাসিল এবং বলিল, "কেন বেচারীকে রাগালি শুধু শুধু"

ভনটু পুনরায় গোঁক গোঁক করিয়া শব্দ করিল। বিছানার উপর একটা রেজেষ্ট্রি খাম পড়িয়াছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কিরে"

"পান-উলির পরামর্শে কানা করালীকে একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি লিখেছিলাম, চিঠিখানা ফিরে এসেছে। সত্যি কি করা যায় বল তো। আমি তো উইলের কথা মা-কে কিচ্ছু বলিনি"

"বলবার দরকার কি"

"বাবার অত টাকা মাঠে মারা যাবে?"

"ব্যাঙ্ক মাঠ নয়"

"কানা করালী যদি না ফেরে"

"টাকাটা সুদে বাড়ুক না। তুই হাত দিলেই তো সব উপে যাবে, তোর হাত তো যাদুকরের হাত"

"তবু একটা কিছু—"

"বছর কয়েক চোক গিলে বসে থাক এখন। পরে কোন উকিলের পরামর্শ নিলেই হবে"

"সেই কাকটা আছে এখনও?"

"সেটা ডাইং আপিস খুলেছে। পানউলি আর একটা এনে পুষেছে, ওর ধারণা করালী ফিরে এসে যদি কাক দেখতে না পায় খুন করে ফেলবে ওকে"

"বলিস কি"

"লাদলদে ব্যাপার। পান-উলি শবরী কাই:"

সহসা মৃন্ময় চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কি—"

মনে হইল কেহ যেন তাহার মাথায় ডাঙশ মারিয়াছে।

"কি"

"এই দেখুন স্বর্ণলতার নাম রয়েছে"

ম্যানেজারের কবলে অচিনবাবুর সহায়তায় যে সব নারী কবলিত হইয়াছিল কাগজে পুলিশ তাহাদের যে ফর্দ্দটা বাহির করিয়াছে শঙ্কর দেখিল তাহাতে সত্যই স্বর্ণলতার নাম রহিয়াছে। মৃন্ময় বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বিহ্বল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।

৮

গভীর অন্ধকার রাত্রি।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় শুইয়া আছে। অতিশয় দ্রুত ছন্দে আজ সন্ধ্যা হইতে যে যে ঘটনাগুলি তাহার মানসপটে রেখাপাত করিয়া গেল তাহাদেরই কথা সে ভাবিতেছিল। অচিনবাবু, চুনচুন, নিবারণবাবু, শৈল, মৃন্ময়, ভন্টু, পলাশকান্তি, ম্যানেজার, কপিলবাবু, আসমি, দারজি—সকলেই একই জীবনের বিকাশ অথচ প্রত্যেকেই কত বিভিন্ন। সে গত কয়েকদিন হইতে কাব্যরচনার উপযোগী বিষয় খুঁজিতেছিল—এই তো এত বিষয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো নূতন বস্তুর পরিচয় মিলিতেছে, ইহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া গাঁথিলেই তো কাব্য হয়. জীবনই তো কাব্য, প্রত্যেক জীবনের হাসি-কান্না, হতাশা বৈরাগ্য প্রকৃতির পীড়ন এবং সেই পীড়ন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস—ইহাই মানব-জীবন এবং ইহাই মানব-জীবনের কাব্য। সমস্ত অন্তর দিয়া জীবনের সত্যকে অনুভব করিতে হইবে, কল্পনার বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত করিয়া তাহাকে বাণী-লোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সার্থকভাবে ইহা করিতে পারিলেই তো কাব্য হইল। মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়াই আকাশের দিকে চাহিতে হইবে। সহসা কবি লোকনাথের কথাগুলি শঙ্করের স্মরণ হইল। তিনি এই সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন—কল্পনার ভঙ্গীতে ও রসসৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, আরও থাকা চাই বাস্তব সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, সৎ অসৎ উচ্চ নীচ সকলকেই অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়া মানব-জীবনের বিচিত্র বিকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে। তাহাদের মহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, তাহাদের জীবনচরিতের অন্তরালে অজ্ঞাত সেই প্রাণশক্তির দুর্জ্ঞেয় পিপাসার সন্ধান করিতে হইবে—যে পিপাসা নানাজনকে নানাপথে লইয়া যাইতেছে। ছোট খাঁচায় বড় পাখীর পাখা ঝাপটানির যে রক্তারক্তি—মনুষ্য-জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতিশাসিত মানুষের দুর্দ্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অকূতের আকাঙ্ক্ষা—এই উভয়ের দ্বন্দ্বই কাব্যলোকের আলো-ছায়া।

...সহসা অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমের ঘোরে শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল। রঙীণ শাড়িখানি পাইয়া আজ সে ভারী খুশি হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অমিয়াকে মনে করিয়া শঙ্কর শাড়িখানা কেনে নাই—শাড়িখানা দেখিয়াই অমিয়ার কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। নানারূপ ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সে অমিয়ার দিকে মন দিতে পারে না। মনে হয় তাহার প্রতি সে অবিচার করিতেছে, বাহিরের ঐশ্বর্য্য দিয়া তাই সে অমিয়াকে ভুলাইতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় সত্যই কি অমিয়া ভোলে? ভোলে কি না তাহা শঙ্কর জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে অমিয়া কখনও বিচলিত হয় না, তাহার আচরণ সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন করে না। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়—হয় তো তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ তাহার মনে জাগে না, স্বামীর সম্বন্ধে কোনরূপ হীন ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নীরবে শান্তমুখে সে পত্নীর কর্ত্তব্য করিয়া যায়। শঙ্কর নিজে কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বই কি। যুবতী পত্নীকে কোন যুবক-স্বামী ভাল না বাসে।

৯

শঙ্করের মা দেশে থাকেন। শঙ্করের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্করের নিকট আসিয়া তিনি থাকিতে রাজি হন নাই। নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি পল্লীগ্রামে থাকিতে চান। স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া তাঁহার স্মৃতি ধ্যান করিবার জন্য নয়; তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক তাহা মনে হয় না, বরং মনে হয় যে বিধবা হইয়া তিনি যেন সুস্থতরই হইয়াছেন। অম্বিকাবাবুর প্রখর প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য যেন বিকল হইয়াছিল, চাপমুক্ত হইয়া তিনি যেন সুস্থ বোধ করিতেছেন। তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন পল্লীপ্রীতির জন্যও নয়। অবশ্য নিরীহপ্রকৃতির মানুষ তিনি, নিজের পূজা আহ্নিক লইয়া অনাড়ম্বর নিরুপদ্রব পল্লীজীবন যাপন করা কষ্টকর নয় তাঁহার পক্ষে। কিন্তু এজন্যও তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন না। একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া দেশে থাকার হেতু অন্য। তিনি দেশে থাকেন শঙ্করের জন্যই। দূর হইতেই তিনি পুত্রের মহিমাচ্ছটা নীরবে উপভোগ করেন, নিকটে আসিয়া তাহাতে ছায়াপাত করিতে তাঁহার ভয় শঙ্কা হয়, নিকটে আসিলে তাঁহার দুর্ভাগ্যের ছায়া পাছে পুত্রকেও স্পর্শ করে। তাঁহার অন্য কোন প্রকার পাগলামি নাই, কিন্তু তাঁহার এই একটা বদ্ধ ধারণা যে—যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে, তাঁহার ধারণা তাঁহার সংস্পর্শে ছিল বলিয়াই গিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি শঙ্করের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছেন।

কালীঘাটে একটা মানত ছিল, তাহাই শোধ করিতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শঙ্করের কাছে কয়েকদিন ছিলেন। অমিয়া যদিও তাঁহার কাছে ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল ছিল কিন্তু তিনি তাহাকে তখন তেমন ভাল করিয়া দেখেন নাই। রঙীণ কাপড়-পরা নতমুখী বধূটি তখন তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাই। এই কয়দিনে অমিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে কেমন যেন একটা অনুকম্পামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়াছে। অমিয়া শঙ্করের বধূ বলিয়া নয়, অমিয়া শঙ্করের অনুপযুক্ত বলিয়া অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু কিছু বলেন নাই। যখন তাঁহার মত্ততা থাকে না তখন তিনি অতিশয় নীরবপ্রকৃতির লোক, নিজেকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন এবং প্রায় অধিকাংশ সময়ে ঠাকুর ঘরেই কাটান। অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিলেন, একটা অনুকম্পা-মিশ্রিত স্নেহও জাগিল, ইচ্ছা হইল যে তাহাকে বকিয়া ঝকিয়া সংশোধন করিয়া শঙ্করের উপযুক্ত করিয়া দেন; কিন্তু তাহা হইলে

শঙ্করের কাছে থাকিতে হইবে, তাহা তো অসম্ভব। তিনি মানত শোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ট্রেণে চড়িয়া শঙ্করকে শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"বউটাকে দেখিস একটু, সব সময়ে নিজেকে নিয়ে থাকলেই কি চলে?"

"আচ্ছা।"

ট্রেণ চলিয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল মা একথা বলিলেন কেন? ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মায়ের কথাটা সে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল। কোন নিগূঢ় অর্থ আছে না কি? পরমুহূর্ত্তেই হুইলারের ষ্টলের পুস্তক সম্ভার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সব ভুলিয়া সে সেই দিকেই আগাইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে কয়েকখানা বই কিনিয়া সে বাড়ি ফিরিল। ভাল বই দেখিলে সে লোভ সামলাইতে পারে না, ধার করিয়াও কিনিয়া ফেলে। জানে সব বই সে পড়িতে পারিবে না, পড়িবার সময় নাই, তবু কেনে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া গেল, চোখে পড়িল দোতলার জানালায় অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখের একটা পাশ, কবরীর খানিকটা অংশ, রঙীন শাড়ির বিশ্রস্ত প্রান্তটুকু, আর কিছু নয়—অমিয়ার এ রূপ সে তো কখনও দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

জন্ম মৃত্যু বিয়ে—বিধাতাকে নিয়ে

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে জীবনের সব ফুরিয়ে গিয়ে চারিদিকে একটা খাঁ খাঁ করা ফাঁকা শ্মশান বুকে নিয়ে চলাফেরা যে কি কষ্টকর, তা কয়জন অনুভব করতে পারে? রমেশ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। সন্ধ্যার পর যখন সে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের সেই ছোট্ট মেস্‌টার চিলের কোঠায় ফিরতো, তখন সেই এঁদো পড়া বাড়ীটাকে তারই জীবনের ঠিক দোসরটি বলেই মনে হোতো।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং ॥

শঙ্করাচার্য্যের সেই শ্লোকের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ হচ্ছে, জীর্ণ ইষ্টকরূপ দাঁতগুলি বের-করা মান্ধাতার আমলের এই বাড়ীখানা।

ম্যানেজার হরিবাবুর তাঁবেদারীতে উড়ে বামুনের মা-গঙ্গা-মার্কা মসুর ডাল ও হলুদ-গোলা-মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে যে দশটি প্রাণী এই পাঁচখানা অন্ধকার ঘরে বাস করে, তার মধ্যেই একাদশ মূর্ত্তি এই চিলের কোঠাবাসী রমেশ।

এত ড্যাম্প, গুমোট, পায়রার বিষ্ঠা, পানের ছোপের দাগ, শ্যাওলা, ঝুল ও ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ একসঙ্গে কোথায়ও থাকতে পারে, তা এই ৩৫।১ সি নম্বর বাড়ীখানা না দেখ্‌লে কল্পনা করা কঠিন। তার উপর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাসীন্দারা সব যে যার স্বগ্রামে স্বস্থানে সরে পড়েছে, আছে এই ভ্যাপ্সা মহাশূন্যতা আঁক্‌ড়ে চিলের কোঠাবাসী মুখ-বোজা নিরীহ রমেশ।

তার কারণ অতি সুস্পষ্ট। রমেশের রিক্ত জীবনে যাবার চালচুলো কোথাও নেই। গত দুই বছরের মধ্যে বুড়ীমা, আনন্দ পিসি, তিন বছরের ভাইপো জগা, আর বাড়ীর পুরোনো চাকর রামু—পর পর মারা গেছে। তারপর হঠাৎ একদিন সব নিঃশেষে শেষ ক'রে দিয়ে তার জগতের রঙটুকু একেবারে আঁচলের খুঁটে মুছে নিয়ে চলে গেছে তার পাঁচটি বছরের গৃহসঙ্গিনী যমুনা। সেদিন নিবন্ত চিতায় জল ঢেলে বাড়ী ফিরে সে কি নিদারুণ একাই যে রমেশ অনুভব করেছিল তা ব'লে বোঝাবার ভাষা নেই। গাঁয়ের ভিটে ও ধানের জমিগুলির বিলি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে রমেশ সেই যে তার জীবনের শ্মশান থেকে সজলনেত্রে বিদায় নিয়ে কলকাতার এই চিলের কোঠায় এসে ঢুকেছে, তারপর একবছর ঘুরে এলো।

পনর টাকার টিউশনী মাত্র ভরসা। সহায় সম্বলহীন রমেশ, তার চেয়ে ভাল চাকরি আর কোথায়ই বা পাবে? পাওয়া সম্ভব হ'লেও অকালবৃদ্ধ কুঁজো এই ভাঙ্গা মন নিয়ে চাকরি খোঁজেই বা কে? নিরস শ্রীহীন জীবনের এই দুর্ব্বহ জের টেনে টেনে হিসাবের খাতার শূন্য পাতা ভরবারই বা প্রয়োজন বা তাগিদ কোথা? তবু দিনের পর দিন সরকারদের বাড়ীর সাত বছরের চঞ্চল বালক টুলুকে ঘণ্টা দুই ধরে মুন্ প্রাইমার, ধারাপাত ও বালকদের পদ্যের বই মুখস্থ করাতে হয়। যোগ বিয়োগ কষাতেই হয় এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে শ্রান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে ফিরে এসে এই শ্যাওলাপড়া ছাদটুকুতে ছেঁড়া মাদুরখানা বিছিয়ে চিৎ হয়ে মোহমুদ্গরও আওড়াতে হ'য়।

"কা তব কান্তা
কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতিব
বিচিত্রঃ ॥

—কালো মেয়ে—স্নিগ্ধ চোখ জুড়ানো কালো!

সে কালোর শীতল প্রাণদায়ী মাধুর্য্য তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। পিঠঢাকা কালো চুলের তরঙ্গ, লতার কোমল বল্লরীর মত বাহু দুটিতে সাদা শাঁখা আর সোনার পাতলা জল তরঙ্গ চুড়ি। আয়ত ঢল ঢল চোখ দু'টিতে কূলহারা অপার কুহক, চোখ দুটি তুলে চাইলে মায়ায় প্রাণটা আকুল হ'য়ে উঠ্‌তো। এই ছিল তার যমুনা সিঁথের সিঁদুর, কপালে সোনালী টিপ, পায়ে আলতা, আর মুখে ঠাণ্ডা মিষ্টি হাসি। এত যার একদিন ছিল, জগতে তার রাজ-ঐশ্বর্য্যেও আকাঙ্খা থাকৃতে পারে কি? আর এত যার জন্মের মত দেউলে ক'রে দিয়ে চলে গেছে, তার যে অপরিসীম রিক্ততা কি ইহ জনমে ভরবার?

এমন মানুষও মরে! তারপরও আবার তাকে হারিয়ে রমেশকে জীবনের জের টেনেই চলতে হয়! কোথায় সে গেল?

চারটি দিনের জ্বরে এমন ক'রে সে নিষ্করুণ উপেক্ষায় তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা যে রমেশ কখনও কল্পনায়ও আনতে পারেনি। মা গিছলেন, পিসী গিছলেন, জগা গিছল, অমন বিশ্বাসী বাপের কালের ভৃত্য রামু গিছল—সব সহ্য হয়েছিল—যমুনার কূলহারা আরক্ত চোখে চোখ রেখে তার স্নিগ্ধ মমতাভরা হাসিটুকু দেখে। তারপর আর কি নিয়ে বেঁচে থাকা যায় বল দেখি ?

মৃতের স্মৃতিই যার জীবনের সম্বল, বাস্তব ছনিয়াটা তার চারপাশে ছায়াচিত্রের অলীক কলরবের মত থেকেও নেই। হাসি-কান্নার এই ভরাহাটে খালি ঝুড়ি নিয়ে সে শুধুই বসে আছে, বেসাতি করবার উপকরণ তার কিছুই নেই। চারধারের আনন্দের রঙিণ খেলায় মুহুর্মুহু পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে, শুধু তার সঙ্গে সে খেলার নাড়ীর যোগটা গেছে কেটে।

* * *

একটু দূরেই—গলি। জীবনলাল সরকার ঐ গলির ৩৭নং বড় গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়ীটার তেতলায় ১৭নং ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সেইখানে কৌচবিছান, ফিটফাট সাজান ড্রয়িংরুমে খোলা জানলাটার ধারে বসে রমেশ সাত বছরের ফুটফুটে ছেলে টুলুকে পড়ায়। টুলু ফর্সা, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কপাল ঢেকে পড়েছে, কালো ইজের হাতকাটা জামাপরা ছোট্ট দেহখানি চঞ্চলতায় সদাই নাচছে। অঙ্ক সে কখনও শুদ্ধ কষে না, একটা না একটা ভুল করে বসে থাকবেই। গল্প শোনায় তার অসম্ভব ঝোঁক, ধারাপাতের নামতার ফাঁকে ফাঁকে সে রমেশকে জিজ্ঞেস করে বসে, রাক্ষসীর প্রাণ এতটুকু সোনার কৌটায় কি ক'রে ঢুকতে পারে ? তা'লে টুলুর প্রাণটা ঠিক্ কোন্‌খানে ঢুকে আছে ? মায়ের সিঁদুরের কৌটায় ? আর মায়ের প্রাণটা বাবার সিগারেটের ডিবায় থাকতে পারে কি-না। রমেশ—জীবনের সেরা সিনিক্ রমেশ তাদের গাঁয়ের কাঁটালীচাঁপা-ঘেরা উঠানে সঞ্চরণশীলা যমুনার সুখস্মৃতির জলে ডুব সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে কষ্টে হুঁস করে টুলুর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। টুলুর শিশু প্রাণে কি জানি কি ক'রে সে মূক বেদনার মীড় বেজে ওঠে, সে চেয়ারের হাতলের ওপর কষ্টে উঠে রমেশের গলা জড়িয়ে ধরে নীরবে তার গালে গাল রাখে। বলে—মাষ্টারমশাই, তুমি অমন করছো কেন ?" তখন টুলুর চোখেও জল!

টুলু পড়ে আর থাকে থাকে কেবলি চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামে, চেয়ারটা টেনে ওদিকে নেয়, আবার তার উপর জুৎসই করে নড়ে চড়ে বসে, দু-চার বার পড়াটা নিয়ে গ্যাঙায়, আবার ওঠে, তার কালো বেরাল বাচ্চাটাকে কোথা থেকে ধ'রে এনে টেবিলের তলায় ছেড়ে দেয়, তারপর রমেশের মুখে "আঃ"—ধমক শুনে অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি এসে বই তুলে নেয়। রমেশ তাকে পড়ায় আর স্মৃতির অতলতলে ডুবে বাইরে নীচে বারান্দার ওধারে চালাঘরের উঠানে আনমনে চেয়ে থাকে। তার অর্দ্ধ-সজ্ঞানে চেতনার তলে তলে সেখানে আলগোছে গরীব গৃহস্থের ঘরকন্না চলে। অসম্ভব রাগী বুড়িমা রাঁধে, বিধবা মেয়ে রাণী মায়ের অনর্গল গালমন্দের ফাঁকে ফাঁকে জল তোলে, উঠান ধোয়, বাটনা বাটে। তার ছিপ্‌ছিপে গৌর নিরাভরণ লতানে শরীরটুকু রমেশের স্মৃতি-লুব্ধ মনের আনাচে কানাচে ঝিক্‌মিক্ করে, পুরনো ঢাকাই সাড়ীর ছেঁড়া জরীদার আঁচলটার মতো। তার ঘুমন্ত মনের অগোচরে না-জানি কখন তার প্রাণপুরুষ এই রিক্তা শান্তশ্রী মেয়েটির ছবি অলক্ষ্যে এঁকে নিয়েছিল গোপন চিত্তপটে—সিক্ত মায়া সজল রঙের তুলি ধরে। মা রাগে, আর রাণী কেবলই হাসে। পোড়ারমুখী হাড়হাবাতে মেয়ে শুনে গালে হাত দিয়ে ঢং করে বলে, 'আমার কচি চাঁদপানা মুখ নাকি পোড়া, মা তুমি গাল দেবে দাও, জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা বোলো না বাপু।" মা বলে, নবছরে কপাল ত পুড়িয়ে খেয়েছিস্, এখন চাঁদমুখ নিয়ে করবি কি ? মানুষ নড়েচড়ে কিন্তু সে অগোছাল এলোমেলো গতির মালা গেঁথে অলক্ষ্যে জীবন-দেবতা গল্প রচেন। রমেশও জানত না তার একঘেয়ে নিরস জীবনে ঐ নীচের মুখরা মেয়েটির আনমনা গতি নিয়ে জীবন-দেবতার খাতায় একটা মুখরোচক গল্প গড়ে উঠছিল।

হঠাৎ একদিন পড়াতে এসে রমেশ জীবনবাবুর এই তেতলা ফ্ল্যাটের ছোট্ট সংসারটিতে বাঁধা পড়ে গেল। টুলুর জ্বর, একশো পাঁচ টেম্পারেচার, জ্বরের তাড়নে বেচারী ভুল বকছে, 'মাষ্টারদা, আমি আজ পড়ব না, তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না! মাষ্টারদা—ও মাষ্টারদা, কই, তুমি এলে ? ওখানে অমন করে কি ভাবচো ? আমার যে তেষ্টা পেয়েচে।' একমাথা টাক নবীন এটর্নি জীবনবাবু এসে রমেশকে অনুরোধ করলেন, তাঁদের এখানে কদিন এসে তাকে থাকতে হবে। টুলুর মা, মোটা থপ্‌থপে সুন্দর মানুষটি একগাল হেসে চোখে সজল মিনতি নিয়ে রমেশকে ধরে বসল, সমানে দিবারাত্র টুলু মাষ্টারদা মাষ্টারদা করছে, তাঁকে মাথার কাছে না পেলে ওকে খাওয়ান দায়। রমেশকে এসে এখানে একটা দিন থাকতেই হবে। টুলুর রাঙা বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিহীন চোখের দিকে চেয়ে রমেশ না বলতে পারল না, এই উপলক্ষ ক'রে মসজিদবাড়ীর মেসের হলুদ গোলা ঝোল আর ভাত তার উঠল।

টুলুকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানিও শেষ হ'লো, আর ঐ নীচে ৩৭নম্বর বাড়ীর গা-ঘেঁষা চালাঘরে জীবনের রঙ আসন্ন ট্রাজেডির গাঢ় প্রলেপে ঘনিয়ে উঠলো। একুশ দিনে যখন টাইফয়েড্ জ্বরের প্রথম রেমিশন হ'য়ে টুলুর জ্ঞান ফিরে এলো তখন তার ক্ষীণ বাহুর বেড়ে মাষ্টারদার গলা জড়িয়ে তাকে হাঁপাতে দেখে তার মা মনোরমা দেবীও রমেশকে বড় স্নেহের চোখে দেখে ফেললেন। টুলু সেরে উঠলেও রমেশকে আর কাছ ছাড়া করবেন না বলে মনে ঠিক দিয়ে রাখলেন। তার আহার নিদ্রা ত্যাগ করা অক্লান্ত সেবাতেই এবার তিনি টুলুকে ফিরে পেয়েছেন। মানুষটির উদাস অন্যমনস্ক বেদনাস্তব্ধ মুখখানা দেখে এই সন্তানের জননীর বুকখানা টলটল্ করে উঠ্‌তো। কিসের ওর এত ব্যথা ? জিজ্ঞেস করলে কি একরকম মরা হাসি হাসে, কথাটা উড়িয়ে দিয়ে আবার কোথায় চিন্তার অনলে ডুব দেয়। রাত্রে সারা ফ্ল্যাট্‌খানা যখন নিশুতি হয়ে যায়, পাশের ফ্ল্যাটের রেডিও গ্রামোফোনের ঘ্যানঘ্যানানিও যখন থেমে আসে, তখন রমেশ ঐ নীচের চালাঘরের যূঁই-গন্ধরাজ-ঘেরা উঠানটুকুর দিকে আনমনে চেয়ে বসে থাকে। তখনও সেখানে সংসারের হাবিজাবি ফুরোয়নি। কেরোসিনের ডিবের

মিট্‌মিটে আলোয় এঘর-ওঘর চলছে, বাসনের ঠুন্‌ঠান্, "ওরাণী, ওলো, সেই খুরোওয়ালা গেলাসটা কোথা রাখলি? না বাপু, তোর সঙ্গে পারবার জো নেই" ইত্যাদি হাঁক ডাকে সবে একটু ঢিমে পড়ে আসছে, রাণীর পদ্মের পাপড়ির মত ভাষা চোখ তখন আকাশে মেলা, যুঁই ঝোপের বেড়া ধ'রে সে হেলে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। চাঁদের আলো তার কালো চুলের ঢেউয়ে হার মেনে সারা মুখখানাতে মাধুরীর বন্যা ঢেলে দিয়েছে। রমেশের এ মুখ দেখে দেখে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে, এ যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অথচ বিস্মরণের নিতান্ত অবহেলার নেওয়া বাতাস;—না হলে বাঁচি না, অথচ কখন যে নাক ভরে টানি, তাও টের পাইনে। রমেশ আজ দু'দিন কেন যেন ঐ উঠানে তার আনমনা চোখ আল্‌তোভাবে ফেলে রেখে স্মৃতির জলে প্রাণভরে ডুব দিতে আগের মত পারছে না। চোখ দু'টি তার নিজের অজ্ঞাতে যেন কি হারানো বস্তু খোঁজে, তাদের খোঁজার তাগিদে যমুনার মিঠে স্মৃতি মনের আসরে জমতে পায় না। অগত্যা রমেশ ভাবনা চিন্তা মুলতুবী রেখে ঔৎসুক্য ভরে দেখতে লাগলো ঐ উঠানের অবিরাম আনাগোনা। তখন তার ঠাহর হ'লো, ঐ চলাফেরা হাঁকাহাঁকির মধ্যে রাণী নেই। তবে কি সে কোথাও বেড়াতে গেছে। তা গেল গেলই, তাতে বাউণ্ডুলে রমেশের কি? কিছুই না, তবু যেন ওদিকটা একেবারে খাঁ খাঁ করা শূন্যে পরিণত হয়েছে, যেন রামের বনবাসের পর, কোন্ সোনার অযোধ্যাকে চষে মাঠ-সই ক'রে দিয়েছে।

* *

*

হঠাৎ আবার পরের দিনের সব অপূর্ণতা ভ'রে উঠলো। রাণী ফিরে এসেছে! সকাল ন'টায় ঘোড়ার গাড়ী করে গরদের সাদা শাড়ী প'রে সে এসে নামলো, মাকে প্রণাম ক'রে এসে যার সঙ্গে দাঁড়াল সে নাকি তার কি রকম ঠাকুরপো। মা জিজ্ঞেস করলেন, "কার সঙ্গে এলি লা?"

রাণী। এই যে গদাঠাকুরপো নিয়ে এয়েছে মা?

মা। গদা? কই ওকে তো কখনও—

বলতে বলতে একজোড়া গোঁপ নিয়ে কালো ঢ্যাঙা গদাধর এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালো, দাঁত বার ক'রে একগাল হেসে বললো, 'আমাকে চিনবেন না, রাণীর শ্বশুরবাড়ীর দূরসম্পর্কের কুটুম আমরা। চিরকাল ওদেরই ওখানে মানুষ। এতটুকু মেয়ে যখন সে, স্বামীঘর করতে গেল তখন থেকেই রাণীর ফাই-ফরমাস খাটতে এই গদা-ঠাকুরপোই দিন নেই রাত নেই এক পায়ে হাজির থাকতো।' মা অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে থাকেন।

গদাধরের বাঁকা তেড়ি, সাজগোজের বিশেষ পারিপাট্য; বিড়ি খাবার সে রাজা; মুখে সর্ব্বদা খই ফুটছে। রোগার ওপর দেখতে সে মন্দ নয়। ছিমছাম দীর্ঘ মসৃণ দেহযষ্টিতে একটা বাহ্যিক জৌলুস আছে, কিন্তু দাঁতের ফাঁকে একটা নিরেট কাঠিন্য মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। রমেশের মনে হয়, এ মানুষ কোথায় যেন নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি, মিছরির ছুরি, কঠিন ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলার মত হয়তো অজান্তে কাটে। কি ক'রে যে কি হ'লো, রমেশ ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। সেই থেকে গদাধর মাঝে মাঝে আসতে যেতে লাগলো, আর তার আসা-যাওয়ার তালে তালে একটা করুণ ট্রাজেডি উঠানের কল্যাণমণ্ডিত ঐ সংসার টুকুতে জেগে উঠলো। ঠাকুরপো এলে রাণীর যেন কি হয়ে যায়, সে যেন অকারণে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, আনাচে কানাচে তাদের ফিস্ ফিস্ করে কথা হয়, গদাধর সাধে, চোখ রাঙায়, আর রাণী হাসে, কিন্তু যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। তারপর সে চলে গেলে দু-চার দিনের জন্যে রাণী যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে; তার সুঠাম দেহলতা ম্লান বিষাদে কেমন যেন হ'য়ে যায়। সে চলে ফেরে যেন তার অপ্রসন্ন দেহটাকে জোর করে টেনে টেনে, যেখানে সেখানে চলতে ভুলে অন্যমনে দাঁড়িয়ে যায়, অনাবশ্যক কি একটা জিনিসের দিকে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে অপলকনেত্রে চেয়ে থাকে। চপলা আনন্দমুখরা মেয়ে তারপর আবার ক্রমশ যেন ধীরে ধীরে বেঁচে ওঠে, হাসে কথা কয়।

এই একবছর ধরে দিনের পর দিন ঐ তেতলার জানলার ধারে চেয়ারে বসে বসে রমেশ টুলুকে bad man, black cat, sly fox, tall girl পড়িয়েছে; সে জানতো না তারই চোখের সামনে এমন করে টল্ গার্লের পিছনে ব্যাধের মত স্লাই ফক্স লেগে যাবে। একটি বছর ধরে আনমনা দৃষ্টি মেলে যখন রমেশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ উঠানের দিকে চেয়ে থাকতো, তখন রাণী প্রথম প্রথম রাগতো, দুম দাম করে দরজা আছড়াতো, রমেশের দিকে কঠোরভাবে চেয়ে হঠাৎ "মর মিন্সে" বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতো। তারপর ক্রমশ যখন সে দেখলো তাতেও রমেশের সাড় নেই, নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে সে সমানেই তাদের অনাবৃত ঘর-সংসারের দিকে নির্লোভ নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তখন বোধ হয় বুদ্ধিমতী রাণী আসল ব্যাপারখানা ঠাহর করে নিলো। শেষে দেখে দেখে এই শোকমগ্ন আত্মভোলা মানুষটিকে হাসাবার জন্য রাণী মায়ের সঙ্গে অযথা ফষ্টিনষ্টি করতো, হেসে হেসে টুলুর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতো। "অ টুলুবাবু, তোমার কালো মেনীকে আমায় দেবে?"

টুলু। কেন?

রাণী। আমাদের আজ মাছ আসেনি কি-না, ওকে কেটে ডালনা ক'রে খাবো।

বিধবার বাড়ী মাছ নিয়ে রঙ্গ রসিকতা শুনে মা চটে উঠে বলতেন, 'আ মর্ মুখপুড়ী, ছোঁড়াটার সঙ্গে আদিখ্যেতা করবার আর কথা পেলিনে?'

টুলু রেগে বলে, 'না, মেনীকে দেব না, তুমি রাক্কুসী।'

রাণী একদিন মায়ের জ্বর হওয়ায় রমেশকে দিয়ে কাছের ডিস্পেন্সারী থেকে ওষুধ আনিয়েছিল। রমেশের সামনে লজ্জা করা, আর গাছ বা পাথরকে দেখে ঘোমটা টানা একই কথা। এতেও রমেশের দিক থেকে কোন সাড়াই এলো না। সেই থেকে রাণী এই ধ্যানী বুদ্ধটির চোখের সামনেই আদুড় গায়ে স্নান করে, ঝাঁট পাট দিতে বুকের কাপড় সরলেও টেনে দেবার তার খেয়াল থাকে না; কারণ, সে জানে এ মুনির মন সহজে টলবার নয়। তবু রাণী কেমন যেন মমতার টানে রমেশকে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া দিয়ে দেখতো, যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে ব্যথা তার লঘু হয়। কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা!

* *

*

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অমানিশা তার

কৃষ্ণাম্বরখানি ক্রমশই গাঢ় রঙের ছোপে ছুপিয়ে নিচ্ছেন ; তাঁর সেই কালো আঁচলের তলায় ঘর-বাড়ী সব মুছে আবছা হ'য়ে আসছে। গড়ের মাঠ থেকে ক্লান্ত দেহমনকে টেনে বাড়ীর কাছ বরাবর আসতে রমেশের কানে ডাক এলো, 'একবারটি এদিকে শুনুন।' রমেশ চেয়ে দেখলো অন্ধকারে দরজার ফাঁকে কুণ্ঠিত-ভাবে দাঁড়িয়ে রাণী ; সে যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেল। তাকে কাছে পেয়ে রাণী জড়িত পদে এগিয়ে গিয়ে অনেক ইতস্তত ক'রে আমতা আমতা ক'রে বললো, 'আ—আমার ব—বড় বিপদ, রমেশদা। মা আমার যাবার পথে—'

তার দুই চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা বইল ; চোখে আঁচল দিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেখে রমেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো, জিজ্ঞেস করলো, 'মায়ের কি হয়েছে ?"

রাণী। আজ তিন দিন থেকে নাগাড়ে জ্বর, এক্কেবারে হুঁস নেই। আমার একা একা বড্ড ভয় করছে। তুমি একবারটি ওপরে এসো।

রমেশ রাণীর সঙ্গে ওপরে এসে অচৈতন্যা বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়ে দেখলো বিষম জ্বরে গা তার পুড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলো, 'কে দেখছে ?'

রাণী। ঐ যে গো পাড়ার হুমোপ্যাথী ডাক্তার দেবেন চাটুয্যে, সেই যে টাক মাথায় বেঁটে-পারা লোকটি।

টাইফয়েডের জ্বর, আঠাশ দিন নিলো। রাণী রমেশকে ছাড়ে না, চলে যেতে চাইলে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। সে কাছে থাকলে রাণী হাসে, পরম উৎসাহে রোগিণীর ও তার সেবা যত্ন করে, রমেশকে পাঁচ ব্যঞ্জন রেঁধে প্রাণ ঢেলে যত্ন করে খাওয়ায়, তাকে রোগিণীর শিয়রে বসিয়ে নিজে গুন গুন করে গান করতে করতে স্নানাহার সেরে নিয়ে আবার গাছ-কোমর বেঁধে হাজির হয়। আর রমেশ চলে গেলে ভয়ে আতঙ্কে তার আহার নিদ্রা ছুটে যায়, অবিশ্রান্ত ঘর আর বার করতে থাকে, তার ডাকাডাকি কান্না-কাটিতে রমেশ না এসে পারে না। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রমেশের পা দু'খানা ধরে রাণী কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'একা একা এই বেহুঁস মানুষ নিয়ে আমার রাতটা যে কি করে কাটে তা জানেন না তো। আপনাকে পেলে আমি বুকে যেন সাতটা হাতীর বল পাই, সেটুকু একবারটি বুঝতেন যদি—"

অবস্থা দেখে জীবনবাবু ও তাঁর স্ত্রী রমেশকে আর আটকে রাখতে পারেন না ; টাইফয়েডের রোগীর বাড়ী থেকে টুলুকে নজরবন্দী ক'রে আটকে রাখাই তখন তাঁদের দু'জনের কাজ হয়ে পড়ে। রমেশ এই দুই বাড়ীর মাঝে পেণ্ডুলামের ঘড়ির মত দুলতে থাকে। আর সবই রমেশের সহ্য হয়, ভয় পেলে চঞ্চলা মুখরা মেয়ে রাণীর চোখের আয়ত স্তব্ধ দৃষ্টি সহ্য হয় না। তখন এই অস্থির ব্যস্তবাগীশ মেয়ের চপল চোখে শ্যামা স্নিগ্ধা শান্তস্বভাবা যমুনার সেই আয়ত স্থির চোখের কূলহারা অতলতা জেগে ওঠে। অসঙ্কোচে রমেশের হাতখানা তার উষ্ণ দুই মুঠার মধ্যে ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে মায়ের শিয়রে যখন রাণী দাঁড়ায়, আর থর থর করে ভয়ে উদ্বেগে কাঁপতে থাকে মায়ের অনর্গল প্রলাপোক্তি শুনে, তখন যমুনার শোক-স্মৃতির জলে মগ্ন রমেশ অনুভব ক'রে অবাক হয় তার নিজের দেহের মাঝে এক অপূর্ব্ব সুখশিহরণ—কম্পিতা নারীদেহের দিকে এক দুর্জ্জয় টান। তার শোকমগ্ন মন অসাড় হয়ে থাকে, কিন্তু প্রাণ-দেহের কূলে কূলে জাগে কিসের কলনাদী জোয়ার। কোথা থেকে একটা পরম তৃপ্তি ও সুখবোধ এসে তার হাতের মধ্যে দিয়ে রাণীর উষ্ণ কম্পিত হাতে চাপ দেয়, লজ্জার মাথা খেয়ে সে পরম বাঞ্ছিত হাত দু'খানা টেনে নিতে চায়। সে নিজের দুর্ব্বলতায় নিজের কাছেই লজ্জায় মরে যায়, মৃতা যমুনার পায়ে অনুতাপে মনে মনে অজস্র মাথা খুঁড়তে থাকে। রমেশের বিরক্ত উদাস মনের বিরুদ্ধে তার লুব্ধ প্রাণের ও দেহের এ কি ষড়যন্ত্র!

সরলা রাণী কিন্তু হাতে চাপ অনুভব ক'রে অবাক বিস্ময়ে এই পাষাণ-প্রাণ রমেশদা'র মুখের দিকে চেয়ে থাকে ; তার অধরের হাসিতে, চোখের সুস্পষ্ট প্রেমের মুগ্ধ পূজায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই। এ মেয়ে যেন নিজেকে দিতেই এসেছে, এমনি ক'রে হিসাব ভুলে বেসামাল হয়ে দিয়ে ফেলাই তার যেন স্বধর্ম।

এমনি ক'রে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে তাদের দু'জনের পনর দিন কাটলো। তখনও বুড়ীর জ্ঞান হয় নাই। হঠাৎ সে দিন রাত্রে গদাধর এসে হাজির, তখন দুটি মাথা পাশাপাশি রোগক্লিষ্টা বৃদ্ধার পাণ্ডুর শীর্ণ মুখের ওপর ঝুঁকে তার অশ্রান্ত প্রলাপ শুনছে। দু'জনকে অমন ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াতে দেখে গদাধরের সেই কঠিন দাঁতের ফাঁকে এক শুষ্ক কঠিন ক্রূর হাসি জেগে উঠলো। তাকে আচমকা আসতে দেখে রাণী যেন কেমনতর হয়ে গেল, তাকে তাড়াতাড়ি হাত ধরে টানতে টানতে ও-ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, 'ঠাকুর-পো, মায়ের আজ আটাশ দিন নাগাড়ে জ্বর।'

গদা। হুঁ! তা তো হলো, কিন্তু ওটি কে, বৌঠান ?

রাণী। পাশের বাড়ীর মাষ্টার মশাই। এই বিপদে একা মেয়ে মানুষ আমি—

গদা। (পরুষ কণ্ঠে) শুনছো বৌঠান, আমি এসে গেছি, এখন ওসব আর চলবে না, বুঝতে পারছো তো ? ওটিকে এবার বিদেয় করো।

রাণী। ছিঃ! ভদ্দর লোক। এই বিপদে এত করলে, আর আজ কি-না তুমি উপর-পড়া হয়ে—

তার পর একটা মাত্র পাতলা দেয়ালের ব্যবধানে ওপাশে রমেশের কানের গোড়ায় সে কি কদর্য্য কলহ। রাণীর ভয়ার্ত্ত কাতরোক্তি, আর গদাধরের নিষ্ঠুর অশ্লীল ব্যঙ্গ ও তিরস্কার। রমেশ ঠায় কাঠের মত দাঁড়িয়ে যা শুনলো সে হচ্ছে রাণীর পূর্ব্ব-জীবনের ছন্দপতনের গোপন ইঙ্গিত, গদাধরের কাছে রাণীর আত্মসমর্পণের করুণ ট্রাজেডি। কথাটা যে নির্ম্মম সত্যি তা রমেশ বুঝলো রাণীর নীচু গলার কাতরোক্তিতে—গদা-ঠাকুরপো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আস্তে কথা বলো। তুমি যা ভেবেছ—আমি তা নয়, সত্যি বলছি, ঠাকুরের দিব্যি, উনি—

এই কলহের মাঝখানে রমেশ এসে তাদের ও-ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। বৃদ্ধার হঠাৎ হুঁস হয়েছে! এ ঘরে এসে ওরা দাঁড়াতেই মা শীর্ণ দুই হাত তুলে কন্যাকে বুকের কাছে টেনে নিল, জড়িত স্বরে বললো, মা রাণী, যখনই হুঁস হয়েছে, এই মুখখানা আমার শিয়রে দেখেছি। ও-বাড়ীর মাষ্টার না ?

রাণী। হ্যাঁ মা, সেই যে রমেশ-দা গো—তোমার অসুখে একদিন ওষুধ এনে দিয়েছিল!

মা। বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও। আমার মেয়েটা

একা ছিল, তুমি না এলে কি হ'তো? তোমার সোনার দোয়াত-কলম হোক, বাবা, আমার দিন ফুরিয়ে এয়েচে, তোমার মত দেবতার পায়ে ওকে দিয়ে যাই, তুমিই ওকে দেখো। ওর ত্রিসংসারে আপন বলতে কেউ নেই বাবা, শ্বশুরবাড়ী—সে জল্লাদ-পুরী, ঐ মেয়ে বলেই এখনও সেখানে যায়।

বলতে বলতে বৃদ্ধার আবার সংজ্ঞা লোপ হ'লো। দু-তিন দিন গদাধরের দুর্দ্দান্ত দাপটে রাণীর যে কি ক'রে কাটলো তা ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই হতভাগিনীই অন্তরে অন্তরে বুঝলো। গদাধরের ক্রূর কঠিন চাহনি আর বিদ্রূপের হাসির ঠ্যালায় রমেশ গিয়ে আবার ও-বাড়ীতে নিজের ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছে। হঠাৎ সে নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে রইলো। তার নিজেরই অলক্ষ্যে সেই শোক-তপ্ত মরুর কোথায় এক হরিত রম্যোদ্যান করে যেন ফলে ফুলে মুকুলে বল্লরীতে সরস সজীব হয়ে উঠেছিল; আজ তা আবার অকস্মাৎ নিমেষের ঝড়ে যেন বিধ্বস্ত ছিন্নপত্র শ্রীহীন হয়ে গেছে। যমুনার স্মৃতির শ্মশানের মাঝে নতুন ক'রে গড়ে উঠেছে বড় মধুর ক'রে অদর্শনের রিক্ত শ্মশান।

রাণী!—গদাধরের মত নরপশুর হাতে হয়তো ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা হৃতসর্ব্বস্বা রাণী! কই, তবু সে কলঙ্কের কাহিনী জেনেও তো তার প্রতি এতটুকুও বিতৃষ্ণা আসে না! সে চপলা মুখরা মেয়ের মুগ্ধ চঞ্চল চোখ দুটি এখনও তেমনি তাকে ঘিরে আছে, তার দেহসৌরভ, সিক্ত কুন্তলের স্পর্শ স্মৃতি এখনও তেমনি আবেশময়। সে হঠাৎ-শোনা কলঙ্ককাহিনী যেন রাণীর প্রেমের পূর্ণচন্দ্রে অনিবার্য্য কলঙ্কলেখা, তাতে তো সে চাঁদের সুষমা কমায় না। চাঁদ থাকবে আকাশে, সে মর্ত্ত্যবাসী, মাটির কুঁড়ে থেকে নিঃশব্দে পান করবে সেই চাঁদের মাধবী জ্যোৎস্নাধারা। আকাশের চাঁদের সঙ্গে মাটির জীবের প্রণয়, তাতে তো আপন করবার জুলুম অধিকার করে বসবার স্বার্থগন্ধ নেই যে ঐ কলঙ্কে তার এসে যাবে? রমেশ ভাবলো, 'এ হ'লো ভাল, শত গদাধর এসেও তার নিভৃত গবাক্ষের চোখ ভরে দেখাটুকু কেড়ে নিতে পারবে না। এই নির্জ্জনে যমুনার মধুস্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে চলবে জীবন্ত রাণীর চলাফেরার স্বর্ণসূত্র—জরির একটি পরম রমণীয় আঁচল বুনে বুনে।

হঠাৎ তিন দিন পরে সন্ধ্যার ঘোরে ঝড়ের মত এসে অশ্রুসিক্তা বা তার পায়ের ওপর ভেঙে পড়লো। 'রমেশ-দা' চলো গো, শীগগির চলো, মা আমার বুঝি যায়,—'

রমেশ তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে উঠেও আবার থমকে দাঁড়াতে রাণী ব্যাকুল হয়ে বললো, 'ঠাকুর-পো নেই, রাজগঞ্জ গেছে, পরশু ফিরবে।'

যখন তারা দু'টিতে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালো তখন বৃদ্ধার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছে, দৃষ্টিহীন ঘোলা চোখ দুটিতে জাল পড়ে আসছে। রমেশকে কাছে অনুভব ক'রে সে দৃষ্টির মাঝে ক্ষণিকের জন্যে চেতনার আলো পড়লো, বিবর্ণ ওষ্ঠ তার অস্পষ্ট জড়িতস্বরে কি বললো, ঝুঁকে পড়ে রমেশই কেবল শুনতে পেলো,'বেশ করেছ, বেশ করেছ, বাবা, ওকে তবে তুমিই দেখো।' ইহ-পরকালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মায়ের কল্যাণ-দৃষ্টি হয়তো দেখতে পেয়েছিল তাঁর অবর্ত্তমানে কোথায় তাঁর নিরাশ্রয়া কপোত শিশুটির ভাবী নীড়। রাণী কিছু শুনতে না পেয়ে মায়ের বুকের ওপর পড়ে বলতে লাগলো, 'কি বলছো মা, আমায় বলো। আমি যে রাণী, তোমার মেয়ে হতভাগী রাণী—'

তখন বৃদ্ধার প্রাণ-প্রদীপ নিভে গেছে।

*　　*　　*　　*

চিতার আগুন যখন নিভে এলো, তখন গঙ্গার ওপারে পশ্চিমে মেঘের কোলে কোলে সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানেও দিনের মৃত্যুর সমারোহ, তার চিতাগ্নির ওপারে সন্ধ্যারাণীর সন্তর্পণ পদবিক্ষেপ। শান্ত রসাম্পদ জগৎ জুড়ে পাখীর কূজন, আকাশের গায়ে মন্থর মেঘের নিথর গতি, চারিদিকে ঘনায়মান ছায়ার কুহক মায়া। রমেশ যখন চিতায় জল দিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে সিক্তবস্ত্রে এসে কাছে দাঁড়ালো, তখন মাথায় হাত দিয়ে রাণীর স্তব্ধ চোখ দূরে ওপারে তট ঘেঁষে সাজানো নৌকার মেলা দেখছে। হাতখানা হাঁটুর ওপর রাখা, পাশে একটা কিসের পুঁটলি! পরণে একখানা গরদের ছেঁড়া পুরানো সাড়ী। পিঠ ঢেকে পড়েছে কালো চুলের ঢেউ। রমেশ বললে, 'রাণী চলো, বাড়ী যাই।'

রাণী। তুমি যাও।

রমেশ। আর তুমি?

রাণী। আমি আর ওখানে ফিরবো না। মায়ের চিতায় আমার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আজ আমার ছুটি গো ছুটি।

রমেশ। তুমি কোথায় যাবে?

রাণী। অদৃষ্ট আর দুই চোখ যেখানে নিয়ে যায়।

রমেশ। ছিঃ, পাগলামি করো না।

রাণী পুঁটলি খুলে দেখাল তার মাঝে রাণীর গহনা, মায়ের টাকা পয়সা, চাবির গোছা, চন্দন-মাখা ঠাকুরের ছবি, পূজার জপমালা, গলার সোনাবাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা—সবই। সে বললো, 'এই তো দেখলে—আমি সব ছেড়ে পথেই বেরিয়েছি, শ্বশুরবাড়ীর লোহার পিঁজরে সেখানকার উঠতে-বসতে গঞ্জনা হাড়ভাঙা খাটুনি আর ঐ জল্লাদ গদার সঙ্গ, ওসব আর আমার সইবে না। সে আমার যা দুর্দ্দশা করেছে তার বেশি সর্ব্বনাশ মেয়েমানুষের তো আর হয় না, আর আমার পথে ভয় কি? তুমি আমাকে কাশীর একখানা টিকিট কেটে দিও, বাবা বিশ্বেশ্বর আমায় পায়ে ঠাঁই দেবেন। তিনি তো আর মানুষ নন; মুখ-বোজা দেবতা।

রমেশ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গঙ্গার রক্তিম জলের শান্ত ঝিলিমিলিতে চোখ মেলে রইলো। তারপর সনিঃশ্বাসে বললো, 'তবে, তাই চলো।'

ষ্টেশনে এসে রাণীকে একটা ওয়েটিং রুমে বসিয়ে বললে, 'তুমি এইখানে বসো। সেই রাত ন'টার গাড়ী। আমি এলাম বলে, একটু দেরী হ'লে ভয় পেয়ো না, আমি ঠিকই আসবো কিন্তু।'

তিন ঘণ্টা ঠায় বসে বসে ভয়ে উৎকণ্ঠায় যখন রাণী অস্থির হয়ে উঠেছে তখন রাত নটায় রমেশ এসে হাজির। একটু থেমে তার দিকে চেয়ে সে বললো, 'ওঠ রাণী, তোমার টিকিট কেটেছি, গাড়ী ছাড়লো বলে।'

মানুষের ছুটাছুটি, ফেরিওয়ালার চীৎকার আর ট্রেণ ছাড়ার হট্টগোলের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে রমেশ তাকে একটা মেয়ে থার্ডক্লাস কামরার ভিড়ে তুলে দিয়ে হাতে টিকিটখানা গুঁজে দিল, বললো, 'পথে সাবধানে থেকো, সঙ্গে কাশীর যাত্রী অনেক পাবে।'

রাণী প্লাটফর্মে নেমে গললগ্নী বাসে রমেশের পায়ের ধূলো নিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে গাড়ীতে উঠে গেল, ও-পাশে গিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে বসলো। রমেশ তার ঝরা অশ্রুবিন্দুগুলি পায়ে নিয়ে মিনিটখানেক থমকে চেয়ে রইলো, তারপর ট্রেণ ছাড়ার হট্টগোলে কোথায় মিশে গেল।

সে রাত্রি ও তার পরদিন সকাল দশটা অবধি রাণীর ঠায় বিনিদ্র কাটলো। চিরদিনের বিদায়, তবু শেষ সময়ে দু দণ্ড কাছে রইলো না, সব সময়টুকু কাটিয়ে কোথা থেকে উড়তে উড়তে এসে তাকে তুলে দিয়ে গেল! এ মানুষটা কি সত্যিই পাথরে গড়া গো? অনির্দ্দিষ্ট পথ, অচেনা দুনিয়া, একা সে মেয়েমানুষ, কোথায় সে একা যাবে, নির্ব্বান্ধব কাশীর অলিগলিতে না জানি কত ধূর্ত্ত চতুর গদাধর তার পথ আগলে আছে, কে জানে?

উঃ! কি নির্দ্দয়ই মানুষ হতে পারে! একবারটি রমেশদা' তো মুখ ফুটে বলতে পারতো, 'চলো রাণী, তোমাকে কাশীতে দিয়ে আসি।' না, তারই বা দোষ কি? রমেশদা' তো ঐ রকমই, আর সে তো মানুষ, সত্যিই তো আর দেবতা নয়। তার পর গদার-মুখে অমন নোঙরা কথা শোনার পর নারীর ওপর পুরুষের শ্রদ্ধা কত আর থাকে? নারীর পদস্খলন, বাপ্‌রে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ঘরে সে কি কেউ কখনও ক্ষমার চোখে দেখতে পারে?

রাণী মনে মনে ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বার বার বলতে লাগলো, 'এ তুমি কোন্ পাথরের মূর্ত্তির পায়ে আমার অবুঝ মনকে বেঁধে দিলে ঠাকুর? এই স্মৃতির আগুন বুকে ক'রে এ মানুষটিকে ভোলবার দুশ্চর তপস্যা আমার কবে কি ক'রে সাঙ্গ হবে গো, দেবতা?'

সমস্ত রাত ধরে অন্ধকার ভেদ ক'রে হু হু করা বাতাস ঠেলে ট্রেণ আর্ত্তনাদ করতে করতে ছুটেছে রাণীর মনের দুর্ভাবনার খরস্রোতের সঙ্গে যেন সমানে পাল্লা দিয়ে। বেলা দশটায় মোগল-সরাই ষ্টেশনের ভিড়ে ভয়ত্রস্তা ব্যাকুলা রাণী পুঁটলি হাতে নেমেই অবাক্। তার অসাড় হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে ডান হাতে তার বাম হাতখানি ধরে রমেশ বললো, 'চলো, ও-ধারে কাশীর গাড়ী।' রমেশের মুখে প্রসন্ন হাসি!—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এর আগে রাণী এ মানুষটাকে কখনও হাসতে দেখে নি।

রাণীর পক্ষে চোখের জলে পথ দেখে চলা দায় হ'লো। অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে সে এসে কাশীর গাড়ীতে একটা কামরায় রমেশের পাশে বসলো, দু'হাতে তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে গাঢ় গদগদ অস্ফুটস্বরে যেন আপন মনেই বললো, 'তবে তো আমার মন ভুল করে নি গো ঠাকুর, অজান্তে দেবতার পায়েই এ বাসী ঝরাফুল উচ্ছ্বগু হয়ে গেছে।' অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ?'

রমেশ। একটা মেয়ে একা পথে ভেসে যায়, দাঁড়িয়ে দেখি কি করে রাণী। আমার এ শূন্য জীবনের আর এতই কি দাম?

রাণী। তুমি তো সবই শুনেছ! তবু?

রমেশ নিঃশব্দে তার আঁচলে নিজের এক বছরের সঞ্চয় দু'শ টাকা বেঁধে দিল। হেসে বললো, 'জগন্নাথ যদি তোমায় পায়ে না ঠেলে, তুচ্ছ ভুল-চুকের মানুষ আমি, আমি ফেলবার কে রাণী?"

বিধাতা এই অবসরে তাঁর বাঁধা গাঁটছড়া আরও শক্ত ক'রে বেঁধে দিলেন এই দুইটি পথহারা মানুষের অন্তরে অন্তরে; তাই বুঝি বলে—Marriages are made in heaven—স্বর্গেই বিবাহের গাঁটছড়া বাঁধা হয়।

কৃষক

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

যে করে ধরিলে হল, হে কৃষক, সেই দৃঢ় করে
ধরিলে অভয় শঙ্খ, জাহ্নবী শিবের জটাচ্যুত,
এল যথা বাহিরিয়া ভগীরথ কম্বুকণ্ঠ স্বরে,
তেমতি আহ্বানে তব স্বর্ণশীর্ষ ধানের মঞ্জরী
বাহিরিয়া এল ঊর্দ্ধে সূর্য্যালোকে আঁধার সন্তরি।

দৃঢ়করে কর' কর' কর্ষণ মৃত্তিকাগর্ভ হ'তে—
বিলুপ্ত কনক রত্ন আহরিবে সহর্ষে, সুব্রত!
অন্ন দাও জনে জনে, দাও অস্থি লোকহিত ব্রতে
হে দধীচি, অচিরে সাম্যের শুভ বাণী—
বিকীর্ণ করিয়া দাও মৃত্তিকায় লৌহ হল হানি।

চীরধারী তৃণ দিয়া রচিয়াছ ঋষির আশ্রম,
সর্ব্বত্যাগী হে সাধক, সার্থক পরার্থে আত্মদান।
অন্নদাতা পিতা তুমি পূত তব সফল জনম
আত্মোৎকর্ষ কর' কর' নৃপতি জনক ঋষি সম,
পালক বাৎসলমতি, সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি, নমঃ।

অভীপ্সা

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

যুগ যুগান্তে জনমে জনমে হে প্রিয়
এমনই করিয়া সুগভীর ভালবাসিয়ো।
রূপে রসে গানে সুবাসে সাজায়ে
তব অবদানে দিওগো পাঠায়ে
মোর দোষ ত্রুটি এমনই হাসিয়া ক্ষমিয়ো
যুগে যুগান্তে হে প্রিয়।
তব হেমদীপ জ্বলিছে প্রভাত আকাশে,
করুণার হাসি কৌমুদীরাশি বিকাশে,
যা দান করেছ মোরে বারে বার
দিয়াছি আঘাত প্রতিদানে তার
তুমি কাছে ধীরে এসেছ আবার তবুও
জনমে জনমে হে প্রিয়।
সেই কথাগুলি উঠিছে আকুলি' স্মরণে,
দুকুল উপচি' জল ঝরঝর নয়নে।
বল দাও সখা যেন পারি দিতে
যা কিছু আমার তোমারে চকিতে
জীবন-তটিনী প্রেম-পারাবারে মিশায়ো
যুগে যুগে তুমি হে প্রিয়।

প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে বাঙ্গালা গদ্য রচনার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা আরম্ভ হয় আরও পরবর্তী কালে। খ্রীষ্টীয় ১৮৫২ সালে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানির নাম 'ফুলমণি ও করুণা'—ইহা মিসেস্ মুলেন্স্ কর্তৃক লিখিত। ইহা সামাজিক উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার পর উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহাও সামাজিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপন্যাসখানির নাম 'ঐতিহাসিক'—রচয়িতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সেগুলি বহু চিন্তাশীল তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে সে যুগে একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিল। কারণ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশের পূর্বে আর কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করেন নাই। পর পর ইহার সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭, ১৮৬২, ১৮৬৫। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

গ্রন্থখানির মধ্যে দুইটি উপাখ্যান আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যেও যে রোমান্সের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে ভূদেববাবুই প্রথমে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইতিহাস-বর্ণিত নর-নারীর বিরহ-মিলন তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ 'রোমান্স অব হিষ্ট্রি'র আদর্শে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচিত। আখ্যায়িকা দুইটিও উক্ত ইংরেজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। কিন্তু অনেক স্থলে লেখক নিজের কল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন; একেবারে আগাগোড়া আদর্শের অনুসরণ করেন নাই।

'সফল স্বপ্নে'র উপাখ্যানটি অতি ক্ষুদ্র। ইহার মধ্যে কোনরূপ অভিনবত্ব নাই এবং এই আখ্যায়িকাটি উপন্যাস পদবাচ্যও নহে। ইহাতে ছোট গল্পের লক্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সে লক্ষণও খুব উঁচুদরের নহে। ইহার আখ্যায়িকাটি এই—গজনী নগরাধিপতি সুবক্তগীন প্রথমে একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি বনপথ অতিক্রম করিতে করিতে অকস্মাৎ দস্যুহস্তে বন্দী হইলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া একজন দাসক্রেতার নিকটে বিক্রয় করিল। কিন্তু দাসত্ব স্বীকার করিয়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বীরত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি তাঁহার বিলুপ্ত হয় নাই। কিছুদিন পরেই সম্রাট আলপ্তগীন ঐ ক্রীতদাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমশ আপন গুণ দেখাইয়া সুবক্তগীন সম্রাট আলপ্তগীনের মন্ত্রী হন। পরে সম্রাটের অনূঢ়া কন্যাও তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। সুবক্তগীন ও সম্রাটকন্যা জেহীরার দৃষ্টি বিনিময় ও প্রণয়সঞ্চার এইটুকুমাত্র এই উপাখ্যানের রোমান্স্। এ কাহিনী নিতান্ত মামুলি ধরণের—সেইজন্য রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' বলিয়াছেন "এ উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র, তাহাতেও রচনাচাতুর্য বা কৌশল তাদৃশ কিছুই নাই।"

কিন্তু 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' অন্তর্গত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক আখ্যায়িকাটির বর্ণনার চমৎকারিত্ব, ইতিহাস অনুযায়ী চরিত্রবর্ণনা, ঘটনার প্রবাহ প্রভৃতি পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করিবে। এই গ্রন্থে ভূদেববাবুর ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা, কাজেই মাধুর্যহীন। ভাষা সরল ও মাধুর্যসম্পন্ন হইলে বিষয়টি যে আরও উপভোগ্য হইত সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তথাপি বলিতে হয় যে এই আখ্যায়িকার চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবর্ণনা এবং করুণরসাত্মক পরিসমাপ্তি মনোরম হইয়াছে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' আখ্যায়িকাটি এই :—মহারাষ্ট্রের অধিপতি শিবাজী একদা দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে পর্বত-পথ হইতে অপহরণ করিয়া কিছুদিনের জন্য নিজের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে দুর্গের বাহিরে যাওয়া ভিন্ন রোসিনারার অন্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল। দুর্গের দাসীগণ রোসিনারার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। শিবাজীর সহিত দেখা না হইলেও শিবাজীর সৌজন্যের পরিচয় রোসিনারা প্রতিদিনই পাইত এবং মুগ্ধ হইয়া ক্রমশ সে শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। শিবাজীর সহিত রোসিনারার সাক্ষাৎ হইলে পর উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হয় এবং বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন মোগল সেনাপতি ঐ দুর্গ অধিকার দ্বারা রোসিনারাকে উদ্ধার করিয়া আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করেন। প্রণয়বিহ্বলা রোসিনারা তাহার পিতার নিকট ফিরিয়া শিবাজীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে থাকেন। বাদশাহ তাঁহার কন্যার কাছ হইতে শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং বন্দী শাহজাহানের সহিত রোসিনারাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

ওদিকে শিবাজী পুনরায় নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হিন্দু সেনাপতি জয়সিংহের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন। জয়সিংহ তাঁহার সন্ধি ঘটাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাদশাহের অপর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজীকে অনুরোধ করেন। শিবাজী সেই যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধশেষে শিবাজী দিল্লী গমন করিলে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে সম্মান না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ অপমান করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শিবাজী কৌশলে তথা হইতে পলায়ন করেন। মোগলদরবারে শিবাজীর আগমন সংবাদ পাইয়া রোসিনারা অসীম আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে এইবার হয়ত তাহার সহিত শিবাজীর মিলন হইলেও হইতে পারে। পরমুহূর্তেই পিতার প্রকৃতি স্মরণ করিয়া সে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল; আশা ও নিরাশার মধ্যে তাহার মন ক্রমাগত আন্দোলিত হইতেছিল।

শিবাজী বন্দী অবস্থা হইতে পলায়ন করিবার সময়ে রোসিনারাকে ভুলেন নাই। তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সমস্ত উপায় ঠিক করিয়া এক অঙ্গুরীয় দিয়া এক বারবণিতাকে রোসিনারার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর ভার্যা হইলে আওরঙ্গজেব শিবাজীর ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিবেন এবং শিবাজীও হয়ত তাঁহার স্বজাতীয়দিগের নিকট আর পূর্বের ন্যায় সম্মান ও সমাদর পাইবেন না, একথা চিন্তা করিয়া রোসিনারা শিবাজীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন, তিনি বারবণিতার সহিত গমন করিলেন না। শিবাজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজের অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া প্রিয়তমের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার গর্হিত মিলনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

ইহাই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র গল্পাংশ। এই উপন্যাসখানি সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

"ভূদেববাবু ইংরেজি উপন্যাসের পদ্ধতিতেই যে ইহার উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে; যৎকালে এই অঙ্গুরীয় বিনিময় রচিত হয়,

তখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বল, 'দুর্গেশনন্দিনীই' বল, ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক কোনও গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হয় নাই। অতএব ঐ বিষয়ে যে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ভূদেববাবুই তাহার মূল। এক্ষণে ঐরূপ প্রকৃতির গ্রন্থরচয়িতারা যে সকল বিষয়ে ভূদেববাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, একথা আমরা বলি না। কিন্তু সকলেই যে ভূদেববাবু হইতেই উহার স্বাদ প্রথম গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অবশ্যই বলিব।" (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)

উপন্যাসখানি ট্র্যাজেডি—মিলনাত্মক নহে, বিয়োগাত্মক। উপন্যাসের ঘটনাধারা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বহিয়া আসিয়া ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইয়াছে। রোসিনারা শিবাজীকে ভালবাসিল, তাহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তাও হইল। ইহার পর রোসিনারা তাহার পিতার নিকটে ফিরিল। কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না। বরং শিবাজীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাওয়াতে সে বন্দিনী হইল। বন্দিনী রোসিনারা কতদিন কত সায়ংসন্ধ্যায় তাহার মনোমন্দিরে শিবাজীর ধ্যান করিয়াছে। শিবাজীর চিন্তায় বিভোর হইয়া সে কল্পলোকে বিচরণ করিয়াছে; বৃদ্ধ শাহজাহান তাহা বুঝিয়া তাহাকে কত সান্ত্বনা দিয়াছেন, কত আশা দিয়াছেন। কিন্তু যখন উভয়ের মিলনের সুযোগে উপস্থিত হইল তখন রোসিনারা শিবাজীর মিলন-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল। আপন প্রেমাস্পদের জন্য একদিকে দিল্লীশ্বরের ভয়, অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়, ইহাই শিবাজীর সহিত রোসিনারার মিলনে বাধা ঘটাইল। এই যে একটা মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া রোসিনারার নারীজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সকল সুখের অপচয় হইয়া গেল ইহাই এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির উপকরণ।

উপন্যাসখানিতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাস-অনুরূপই হইয়াছে। শিবাজীর স্বদেশপ্রেম, সাহসিকতা ও ধূর্ত্ততা চমৎকার ফুটিয়াছে। শিবাজী বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, উপন্যাসখানিতে কৌশলে তাহাও রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বীরত্বে যেমন অসাধারণ ছিলেন, প্রতিহিংসাতেও তাঁহার সেইরূপ অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার দুর্গে অবস্থানকালে রোসিনারার প্রতি তাঁহারই এক সৈনিক আসক্ত হইলে বীরের মতই তিনি তাহার প্রতিহিংসা লইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে আদেশ দিয়া তিনি মুহূর্ত মধ্যে সেই সৈনিককে বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া শিবাজী তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। এই যুদ্ধের ফলে শিবাজী তাঁহার দেহের স্থানে স্থানে আঘাত পান এবং সেই সময়ে সেবা করিতে আসিয়াই রোসিনারার অঙ্কুরিত প্রণয় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' আওরঙ্গজেবের শঠতা, চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর মহত্ত্ব, স্বদেশহিতৈষিতা এবং শিষ্যবাৎসল্য অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। রাজপুত বীর জয়সিংহের চরিত্র উদারতায় এবং মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নারীচরিত্র বর্ণনাতেও লেখক উপন্যাসখানির মধ্যে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রোসিনারার চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে শিবাজীকে ভালবাসিয়াছিল—শিবাজীর সহিত মিলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মিলনের সুযোগ পাইয়াও সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যে মুহূর্তে সে জানিয়াছে যে তাহার সহিত মিলন হইলে শিবাজী একাধারে তাহার স্বজাতি ও আওরঙ্গজেবের ঘোরতর শত্রু হইবেন, সেই মুহূর্তে চির-আকাঙ্ক্ষিত আসন্ন মিলনের প্রতি সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। মিলন প্রত্যাখ্যান করিয়া সে দুঃখকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এ দারুণ দুঃখেও তাহার পরম সান্ত্বনা এই যে সে শিবাজীকে অশুভের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল। রোসিনারার অন্তরে যে প্রণয় জাগিয়াছিল তাহার আকর্ষণ ছিল প্রবল, কিন্তু প্রেমাস্পদের শুভাকাঙ্ক্ষায় সেই প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান করার শক্তিও তাহার ছিল পর্বত-নিঃসৃত নির্ঝরের মত দুর্বার। শিবাজীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে শিবাজীকে ব্যথা দিয়াছে। কিন্তু নিজে অধিকতর ব্যথিতা হইয়াছে। তাহার প্রেমের আদর্শ, তাহার ত্যাগ এবং স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ বৃদ্ধ শাহজাহানকে আশ্চর্য করিয়াছিল। এমন কি বারবণিতাও তাহার আচরণে মুগ্ধা হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্রচিত্রণ আধুনিক যুগের বিশিষ্টতা। ভূদেববাবু কুশলতার সহিত রোসিনারার অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাজীর জয় পরাজয়ে চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে উপন্যাসখানিতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

প্রেমে, অনুকম্পায় ও সহানুভূতিতে রোসিনারার চরিত্র অত্যুজ্জ্বল চিত্র। সে সম্রাট্‌কন্যা, সেবা কখনও কাহাকেও করে নাই। কেহ কখনও তাহাকে সেবা করিতে শিক্ষাও দেয় নাই। কিন্তু তাহার অন্তরে প্রেম অঙ্কুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শিখিয়াছে সেবা করিতে। শিবাজী যখন আহত তখন শিবাজীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সে নীরবে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে। বন্দী শাহজাহানের প্রতি তাহার সমবেদনাও চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কোথাও তাহার কুসুমকোমল অন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কোথাও তাহার মধ্যে অপরূপ তেজ ও ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি বিরোধীগুণের সমন্বয়ে সে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্রচিত্রণ ভিন্ন উপন্যাসখানির আর একটি গুণ ঐতিহাসিক ঘটনা-সন্নিবেশ-নৈপুণ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কেবল চরিত্র বর্ণনা বা ঘটনা-বর্ণনাই সর্বস্ব নহে। যে পটভূমিকার উপরে ঘটনাগুলি ঘটিবে তাহাও ঐতিহাসিক হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য উপন্যাসকার এই উপন্যাসের ঘটনা-বর্ণনা প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অস্ত্রশস্ত্র, সেনা, দিল্লী নগরী ও সেখানকার সম্রাটপ্রাসাদ, বন্দী শাহ্‌জাহানের দুরবস্থা ও তাঁহার নির্মিত ময়ূরসিংহাসন প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। বাদশাহ্‌ আওরঙ্গজেবের দরবার, বাদশাহের জন্মতিথির বিবরণ প্রভৃতি চিত্রিত করিতে গিয়া তিনি দিল্লী সম্রাটের ঐশ্বর্য বিলাস প্রভৃতির একটা হুবহু চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা বর্ণনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় আর্ট সম্বন্ধে লেখকের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনার যে আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ইহারই সমসূত্রে পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণ বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন।

জয়লব্ধ

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ। বাহিরে ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা বাজল। প্রহরী-বেষ্টিত প্রদ্যুম্নকিশোর ধীর পদবিক্ষেপে ঘরের মধ্যে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে ইন্দিরা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে প্রদ্যুম্ন চমকে উঠলেন। তখনই মনের আবেগ দমন করে আবার পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত মূর্ত্তি হয়ে গেলেন। প্রহরীরা অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

ইন্দিরা। তুমি এসেছ?

প্রদ্যুম্ন নিথর নিস্তব্ধ

ইন্দিরা। রজনীর নিস্তব্ধতায় নির্জ্জনে নিভৃতে একদিন তুমি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলে, আজ আমি তোমার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। তুমি আমায় ক্ষমা কর। সেদিনকার নির্দ্দয়তার জন্য আমি ক্ষুব্ধ, অনুতপ্ত।

প্রদ্যুম্নকিশোর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

নিষ্ঠুর হোয়ো না, দয়া কর। আমি নারী, তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। এখানে আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। তোমার যা বলবার আছে বল।

প্রদ্যুম্নকিশোর ঈষৎ হাসিলেন

শুধু হাসি! অবজ্ঞা শ্লেষপূর্ণ হাসি! এক বৎসর আগে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে তুমি নারাজ। কিন্তু কেন? দেখ, আমি নিজে এই সুদূর পথ অতিক্রম ক'রে তোমার কাছে এসে মিনতি করছি, তবু কি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। বহুদিন আগে একবার বলেছিলে তুমি আমায় ভালবাস, সে কি মিথ্যা?

প্রদ্যুম্নকিশোর চুপ করে রইলেন

তোমার এই ক্লেশের তুমি চাও প্রতিহিংসা। তাই ইচ্ছা ক'রে নীরব থেকে তুমি আমায় প্রাণদণ্ড দিতে চাও। একজন নারীকে পরাজিত ক'রে হে বীর, তুমি জয়ের শ্লাঘা পেতে চাও! বেশ, তবে তাই হোক। তুমি যখন ক্ষমা করলে না তখনই আমার মৃত্যু হয়েছে। যে প্রেমের ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে আমি তোমার কাছে এসেছিলুম, সে প্রেম যখন তুমি ভুলে গেছ, তখনই আমার মৃত্যু হয়েছে। এ প্রেমের অবমাননা আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেশী।

প্রদ্যুম্নকিশোর চঞ্চল হয়ে উঠলেন

যে গর্ব্বিতা নারী সেদিন তোমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, আজ পরাজিতা পদদলিতা সেই নারীই তোমার ক্ষমা, দয়া, প্রেম ভিক্ষা করছে। তুমি যে কত মহান আজ আমি তা বুঝতে পেরেছি। (পায়ের কাছে বসে) আমায় ক্ষমা কর। বল, তুমি আমায় আগেকার মতই ভালবাস? তোমায় সেদিন অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে দিয়ে থেকে আমি তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। মনের কথা সেদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুমি চলে যাবার পর স্বরূপপ্রকাশ পেয়েছে। বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি নেই। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার সকল ভার তুমি নাও।

ইন্দিরার হাত ধরে প্রদ্যুম্নকিশোর তুলে দাঁড় করালেন

নিষ্ঠুর, আর কষ্ট দিও না। বল, বল, তুমি আমায় ভালবাস?

সম্মতিসূচকভাবে প্রদ্যুম্নকিশোর ঘাড় নাড়লেন

তবুও নীরব! বেশ। তোমার কথা কওয়া আমি চাইনি। চেয়েছিলুম প্রেম। তোমার পরশে আমার দেহ কম্পিত হয়েছে। আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহিত হয়েছে। হে নাথ, আমি নারী। তোমার কাছে পরাজয়ই আমার জয়। তোমার চরণে আমার গর্ব্বিত শির নত হওয়াই আমার মান। শুধু আর কয়েক ঘণ্টা। তারপর সব শেষ। কাল প্রাতে ইন্দিরার মৃতদেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। শুধু এই কয়েকদণ্ডের জন্য তোমার ক্ষমা, দয়া, প্রেম ভিক্ষা করছি। হে স্বামিন, সেদিন তুমি আমায় পত্নীত্বের গৌরব দিতে চেয়েছিলে। আমি তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। আজ মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে তোমার চরণস্পর্শ ক'রে প্রার্থনা করছি সে গৌরব আমায় দাও। আমার নারী জন্ম সার্থক হোক।

ইন্দিরা প্রদ্যুম্নকিশোরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। প্রদ্যুম্নকিশোর তাকে তুলে বুকে টেনে নিলেন। ধীরে ধীরে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারাগার। ভোর হয়ে আসছে। ইন্দিরা স্থির হয়ে বসে আছেন। বিশাখা কাঁদছেন

ইন্দিরা। বিশাখা, কেঁদে কি হবে বোন। তার চেয়ে চিরবিদায়ের আগে তোর মধুর কণ্ঠের একটা গান আমায় শুনিয়ে দে। সেই গানটা 'সুখের স্বপন টুটে গেছে হায়।' আজ তার উপযুক্ত সময় এসেছে।

বিশাখা। বেশ গাইছি। কিন্তু—

কান্না কোনমতে চেপে গান ধরিলেন

সুখের স্বপন টুটে গেছে হায়, আছে পড়ে শুধু স্মৃতি।
সুরের ঝঙ্কার বাজে প্রাণে আজও, থেমে গেছে মধু গীতি॥
তাহার গলের কুসুমের ডোর,
শুকায়ে গিয়াছে না হইতে ভোর,
ভালবাসা দিয়া লভিনু বেদনা, এ কি গো প্রেমের রীতি॥
হৃদি-উদ্যানে ফোটে না' ক ফুল, গাহে না পাখীরা গান।
মলয় বাতাস থেমে গেছে হায়, কেঁদে মরে মিছে প্রাণ॥
প্রদীপ আমার নিভে গেছে আজ
কার তরে আর বৃথা এই সাজ
হাসির বদলে নয়নের জল, সাথী হবে মোর নিতি॥

গাইতে গাইতে বিশাখা কেঁদে উঠলেন

আমি পারব না, গাইতে পারব না—

ইন্দিরা। ছিঃ বোন। তুই সাহস না দিলে আমি হাসি মুখে কি করে মৃত্যুবরণ করতে যাব বল্‌। বাবার সঙ্গে মরবার আগে শেষ দেখা করতে চেয়েছিলুম। মহারাজের আদেশ পেলুম না। বলে পাঠালেন, একেবারে বধ্যভূমিতে সাক্ষাৎ হবে।

নেপথ্যে পদধ্বনি

ইন্দিরা। (চমকে) কে যেন আসছে ?

বিশাখা। বোধ হয় কারারক্ষী। (শিউরে উঠে) তোমাকে নিতে আসছে।

ইন্দিরাকে আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন

ইন্দিরা। ছিঃ কাঁদছিস্‌ কেন ? আমি তো শান্ত স্থির। কোন ভীতিই আমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না। মরবার আগে শুধু আর একবার তাঁকে দেখবার সাধ ছিল। গজেন্দ্র কথা দিয়েছিল আমার সে সাধ পূর্ণ সে করাবে। হয়ত সে আমারই মত কৃতসঙ্কল্পে বিফলকাম হয়েছে। শুধু এই একটা সাধ, আশা। নচেৎ মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত।

কারাগারের দরজা খোলবার শব্দ। পরে মহারাণী বিজয়ার প্রবেশ

ইন্দিরা। মহারাণি !

রাণী। হ্যাঁ বোন। (বিশাখার প্রতি) তুমি বাইরে যাও। আমাদের নিভৃতে কতকগুলি কথা আছে।

বিশাখার অভিবাদন করে প্রস্থান

রাণী। (ইন্দিরাকে কাছে টেনে) ইন্দিরা—

ইন্দিরা। মহারাণি—

বলতে বলতে ইন্দিরা কেঁদে ফেললেন

রাণী। প্রদ্যুম্ন কথা কইলে না ?

ইন্দিরা। না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ তিনি করবেন না। তবে আমার আর দুঃখ নেই। আমাকে তিনি চরণে স্থান দিয়েছেন, পরলোকে আমাদের মিলন হবে।

রাণী। তোমার পিতার তুমি একমাত্র সন্তান। কালভোরে তোমার পিতাকে এই দণ্ডের সমাচার দেওয়া হবে। তোমার মৃত্যুতে তিনি ভেঙ্গে পড়বেন। হয় ত' বাঁচবেন না। তার চেয়ে আমার কথা শোন। এই দণ্ডে তুমি কারা পরিত্যাগ কর। এই নাও আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। কেউ তোমায় বাধা দেবে না। রাজরোষ আমি নিজমস্তকে ধারণ করে তোমায় রক্ষা করব। তোমার মনের দ্বন্দ্ব আমি বুঝতে পেরেছি।

ইন্দিরা। যদি বুঝতে পেরে থাকেন তো এ আদেশ কেন করছেন দেবী ? প্রদ্যুম্নকে মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে আমি নিজের জীবন বাঁচিয়ে কি করে যাব ? সে জীবনে আমার কি প্রয়োজন ? কোন তৃপ্তি কোন শান্তিই তো পাব না। তার চেয়ে মৃত্যুই আমার শ্রেয়।

রাণী। আমি আশীর্ব্বাদ করছি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করবার সাহস ও শক্তি যেন ভগবান তোমায় দেন। এবার আমরা যাই। (ইন্দিরাকে) তবে আসি বোন।

মহারাণী বিজয়ার প্রস্থান

ইন্দিরা। বিশাখা—

বিশাখার প্রবেশ

বিশাখা। কই, গজেন্দ্র তো এল না। কোন খবরও পাঠালে না। তবে কি মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার দেখা পাব না ?

বিশাখা। হয়ত' গজেন্দ্র মহারাজের সম্মতি পায়নি—

নেপথ্যে পদধ্বনি

ইন্দিরা। বিশাখা, এই বুঝি তিনি আসছেন !

কারাগারের দরজা খুলে ঘাতকের প্রবেশ

ইন্দিরা। (চমকে) তুমি কে ?

ঘাতক। মৃত্যু।

বিশাখা চীৎকার ক'রে কেঁদে ইন্দিরাকে জড়িয়ে ধরলেন

বিশাখা। না, না, আমি তোমায় যেতে দেব না। আমাকে না মেরে ফেললে আমার বুক থেকে কেউ তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

ইন্দিরা। (গাঢ়স্বরে) ছিঃ বিশাখা, কাঁদিস্‌নি। কোথায় আমাকে তুই সান্ত্বনা দিবি, না নিজেই কেঁদে আকুল !

ঘাতক। সময় উত্তীর্ণ-প্রায়।

নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি

ঘাতক। ঐ ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে—আর অপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়।

ইন্দিরা। আমি প্রস্তুত।

ঘাতকের সঙ্গে ইন্দিরার প্রস্থান। কাঁদিতে কাঁদিতে বিশাখা তাঁদের অনুসরণ করলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারাগারের অপর অংশ। বধ্যভূমি। ধীরে ধীরে প্রভাত হচ্ছে। ঘাতক ও ইন্দিরার প্রবেশ

ঘাতক। সময় উপস্থিত। ভগবানের নাম স্মরণ কর।

বেগে ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি। ইন্দিরা, মা—

ইন্দিরা। বাবা—

ধনপতি ইন্দিরাকে বুকের মধ্যে টেনে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন

ধনপতি। মহারাজের প্রেরিত দূতমুখে এই মাত্র এ সর্ব্বনাশের সংবাদ জানতে পারলুম। এ আমি কি ক'রে সহ্য করব ? ইন্দিরা, তুই আমার একমাত্র সন্তান। তুই ছাড়া সংসার অন্ধকার—ওঃ ভগবান ! এ কি করলে—

মাথা চাপড়াতে লাগলেন

ইন্দিরা। বাবা, বাবা, অধীর হোয়ো না—

বেগে বিশাখার প্রবেশ

বিশাখা। মহারাণী অনেক কষ্টে মহারাজের মত করিয়েছেন। এই বধ্যভূমিতে সেনাপতিকে নিয়ে আসবার জন্য মহারাজের আদেশ-পত্র নিয়ে গজেন্দ্র কারারক্ষীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি। মহারাজ কালকেতু ও মহারাণী বিজয়ার প্রবেশ

ধনপতি। (ছুটে মহারাজের সম্মুখে হাঁটুগেড়ে বসে) মহারাজ, আমার অবোধ কন্যার প্রাণদান করুন। আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, নয়নের পুত্তলিকে আমায় ফিরিয়ে দিন। তার জন্য আপনি যা চাইবেন তাতেই প্রস্তুত। আমার প্রাণ, অর্থ, যা-কিছু আপনার অভিপ্রেত সব নিন, শুধু আমার মেয়ের জীবন ভিক্ষা দিন।

রাজা। তা হয় না ধনপতি। তোমার এই খামখেয়ালী কন্যার জন্য আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। এর জন্যে একজন নিরীহ নির্দ্দোষ ব্যক্তির কঠোর শাস্তি হয়েছে। এ অপরাধের দণ্ড তাকে ভোগ করতে হবেই। তুমি নিরপরাধ, তোমার প্রাণ অথবা অর্থ নিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া সুবিচারের কাজ নয়।

ধনপতি। আপনি দয়ার সাগর। নতজানু হয়ে আপনার কাছে আমি করুণা ভিক্ষা করছি। আমার একমাত্র সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা। তুমি তার অপরাধের গুরুত্ব জান না, তাই এ অনুরোধ করছ। ঘাতক, তুমি প্রস্তুত!

ধনপতি উঠে দাঁড়ালেন

ঘাতক। (অভিবাদন করে) হ্যাঁ, মহারাজ।

ইন্দিরা। মহারাণী, আমার অন্তিম প্রার্থনা—

বিশাখা। (একটু এগিয়ে) ঐ যে ওঁরা আসছেন।

প্রহরী-বেষ্টিত প্রদ্যুম্নকিশোর ও গজেন্দ্রর প্রবেশ। এসে মহারাজা ও মহারাণীকে অভিবাদন করলেন। ইন্দিরা প্রদ্যুম্নকিশোরকে প্রণাম করিলেন

ইন্দিরা। আমার শেষ দেখা, অন্তিম বাসনা পূর্ণ হয়েছে মহারাণী। আপনার কৃপায় আমি আজ তৃপ্ত। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি প্রস্তুত।

রাজা। ঘাতক!

ধনপতি 'ওঃ ভগবান' বলে চোখ ঢাকলেন। বিশাখা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। ঘাতক ইন্দিরার দিকে অগ্রসর হতে প্রদ্যুম্ন চীৎকার করে উঠলেন

প্রদ্যুম্ন। ঘাতক, স্তব্ধ হও।

ঘাতক দাঁড়িয়ে গেল। মহারাজের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে

মহারাজ, আমায় শাস্তি দিন। ইন্দিরার প্রাণ ভিক্ষা দিন।

সকলে হতবিস্মিত হয়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন

রাজা। (প্রহরীদের প্রতি) তোমরা যেতে পার।

ঘাতক ও প্রহরীদের প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন, তুমি ভণ্ড, প্রতারক, কাপুরুষ। তোমার স্বেচ্ছাকৃত মৌনাবলম্বনের জন্য তুমি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সেনাপতির ভার গ্রহণ করনি। এই প্রতারণার জন্য আমার এবং দেশের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা জান?

প্রদ্যুম্ন। হ্যাঁ মহারাজ, জানি। আমি দোষী, আমায় শাস্তি দিন।

রাজা। তোমার এ মৌনাবলম্বনের কারণ কি?

প্রদ্যুম্ন। বলতে পারব না মহারাজ।

রাজা। উত্তম, তবে রাজকার্য্যে অবহেলা, প্রতারণা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। ঘাতক—

ইন্দিরা। (ছুটে এসে নতজানু হয়ে) মহারাজ, অপরাধ ওঁর নয়, আমার।

রাজা। হেঁয়ালী রাখ। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও। অর্থাৎ—

ইন্দিরা। আপনার সেনাপতি আমার কাছে এক বৎসর-কাল মূক থাকবার এবং কারণ কাউকেও বলবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই ওঁর এই বিপদ।

ধনপতি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

রাজা। প্রতিজ্ঞার কারণ?

ইন্দিরা চুপ করে রইলেন

বিশাখা। আমি বলছি মহারাজ। সেনাপতি প্রদ্যুম্ন-কিশোর অবন্তীপুরে গিয়ে সখির কাছে প্রেম নিবেদন করেন। সখি বলেছিল যে একবৎসর কাল যদি মূক থাকতে পারেন তবেই বুঝব আপনার প্রেম শুধু মুখের কথা নয়। একবৎসর পরে আমার সাক্ষাত পাবেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে আমাকে হারাতে হবে।

রাজা। সেই প্রতিজ্ঞার মেয়াদ ফুরিয়েছে কি?

বিশাখা। না। আরও চার মাস বাকী।

রাজা। (হেসে) তবে প্রদ্যুম্নকিশোর, তোমার একূল ওকূল দুকূলই গেল। রাজরোষেও পড়লে, প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হ'ল, অতএব ইন্দিরাকেও হারাতে হ'ল। তোমাদের সমস্ত ব্যাপারটা আমি মহারাণীর কাছ থেকে শুনেছিলুম। শুধু পরীক্ষা করে দেখছিলুম সত্যই তোমরা উভয়ে উভয়কে ভালবাস কি-না। আমি তোমাদের দু'জনকেই মুক্তি দিচ্ছি। তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য যদি—

রাণী। আমি পরীক্ষা করছিলুম, তোমার কাছে ইন্দিরার জীবন বড়, না প্রতিজ্ঞা বড়। তাকে হারাতে হবে জেনেও যখন তুমি তার প্রাণ রক্ষার্থে কথা কয়ে ফেললে, তখনই তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝতে পারলুম। তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তোমায় ইন্দিরাকে হারাতে হবে। কি বল ইন্দিরা?

ইন্দিরা সলজ্জ ভাবে মাথা হেঁট করলেন

মহারাজের আদেশে যদিও তোমরা মুক্ত, কিন্তু আমার আদেশে তোমরা বন্দী। শ্রেষ্ঠী ধনপতি, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই প্রেমিক যুগলকে বিবাহ-বন্ধনের সুবর্ণ শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলি। আপনার মত পেলে—

ধনপতি। মহারাণী, এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। এর চেয়ে ভাল বিবাহ আমার কন্যার যে হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমি নিজে ইন্দিরাকে প্রদ্যুম্নের হস্তে সমর্পণ করছি।

ইন্দিরার হাত প্রদ্যুম্নের হাতে ধরিয়ে দিলেন। উভয়ে ধনপতিকে প্রণাম করলেন

রাণী। (নিজের গলার হার খুলে ইন্দিরার গলায় পরিয়ে দিয়ে) আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জয়লব্ধ পতিকে নিয়ে তুমি চির সুখী হও।

উভয়ে মহারাজ ও মহারাণীকে প্রণাম করলেন
ধীরে ধীরে যবনিকায় পতন

মাদুরা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মাদ্রাজ প্রদেশের দ্বিতীয় সহর মাদুরা। সোনার বাঙ্গালার দ্বিতীয় নগর ঢাকা। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ঢাকার নামে নাকের ডগা কুঁচকে আসত, একটা গভীর বেদনা সকল দেশপ্রিয়ের চেতনাকে অভিভূত কর্ত। বঙ্গ আমার, জননী আমার! বিশেষ, মানুষ আমরা নহিতো মেষ! আমাদের দ্বিতীয় জনপদ, প্রাচীন ঢাকা, এ গর্ব্ব খর্ব্ব করেছে। আত্মীয় বিরোধের কুরুক্ষেত্র ঢাকা—কয়েক মাস শোণিত-তৃষায় ধ্বংস-লীলার তাণ্ডবে আত্ম-বিস্মৃত ছিল। তাই বলছিলাম সহরের প্রাদেশিক তালিকায়, কে প্রথম, কে দশম—এ গণনায় তার গৌরব অ-গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়না।

মাদুরা বোধ হয় মধুর শব্দের অপভ্রংশ। তা হ'লে এর নামকরণ সার্থক। কারণ মাদুরা পর্যটনের সুখের রেশ স্মৃতির পটে চিরদিন হর্ষের ছবি আঁকে।

তাজমহল মোগল ভারতীয় স্থাপত্যের মুকুটমণি। এর শান্ত-সৌন্দর্য্য-অপরিমেয়। গভীর প্রেমের মূর্ত্ত বিকাশ—তাজমহল। স্বপ্ন-রাজ্যের সুষমামণ্ডিত এই মর্ম্মর সৌধ সম্রাট সাহজাহানের বিরহ-বেদনাকে রূপ দেবার জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল। তাই এর বর্ণ নির্ম্মল শুভ্র। এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব শান্ত গম্ভীর। কিন্তু গাম্ভীর্য্য সুন্দরকে আশ্রয় করেছে, তাই সে চির-আদৃত। সন্তপ্ত বিরহীর দরদী প্রাণ তাজমহলের প্রেরণার উৎস।



মাদুরার মন্দিরের ভাস্কর্য্য

এ চিন্তাকর্ষক স্মৃতির-মন্দির মুসলমান মোগল সম্রাটের কৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত। তাই তাজ মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তিত আদর্শে গঠিত। সে আদর্শ পুতুল-গড়ার ঘোর বিরোধী। এমন কি মানুষ হিসাবেও অতি-মানবের মূর্ত্তি-চিত্রণ ইশলাম জগতে নিষিদ্ধ। প্রিয়জনের বা অতি মানবের সমাধি-মন্দির রচনা কিন্তু ইসলাম অনুমোদিত। তাজের আকার মসজিদের মত। মুস্লিম প্রার্থনা-গৃহের সু-শৃঙ্খলতা সম্রাটের শোক-স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে এই প্রেমের আগারকে সৌন্দর্য্যের আধার করেছে।

মাদুরা মন্দিরের পরিকল্পনার মূলেও অমনি এক স্নেহের স্মৃতি বিদ্যমান। দুলালী রাজকুমারী মীনাক্ষীর অমল-স্মৃতিকে অমর করেছে মাদুরার মিনাক্ষী মন্দির এবং তার প্রকাণ্ড লীলা সরোবর। আশৈশব ভক্তি-বিহ্বলা রাজকুমারী মীনাক্ষীর দেহে পার্ব্বতী স্বয়ং অধিষ্ঠিত—স্বপ্নে ও জাগরণে তাঁর ভূপতি-পিতা এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। হিমাচল রাজ-নন্দিনী উমারাণী ভক্তি ও সাধনায় দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামীরূপে লাভ করেছিলেন। রাজকুমারী মীনাক্ষী পুণ্য বলে সুন্দরেশ্বর মহাদেবের পরিণীতা ঈশ্বরী। মাদুরার একাংশে সুন্দরেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। অন্যদিকে মীনাক্ষী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। নশ্বর মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হয়ে মীনাক্ষী শিবত্বলাভ করেছিলেন—এ রহস্য আর্য্য-দ্রাবিড় সভ্যতার মূলতত্ব। মানুষের দেহ জীবাত্মার মন্দির। জীবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার অংশ মাত্র। দেহ তাঁরই প্রকৃতিপ্রসূত। মানুষের স্বভাব, নিজের প্রকৃতি, অধ্যাত্ম—অর্থাৎ আত্মার অধিকৃত। নরদেহে অবহিত আত্মার চরম আশা—অনাদি অব্যক্ত শিব-সুন্দর পরমাত্মায় আপনার বিলুপ্তি। পরিণয় দেহের মিলন নয়—প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিশ্রণ।

এই আদর্শে পরিপুষ্ট হিন্দুর সংস্কৃতি, পার্ব্বতী পরমেশ্বর বা মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের পরিণয়ে—জীবাত্মার ইন্দ্রিয়-মুক্তি এবং পরমাত্মায় জীবাত্মার মিলন বোঝে। পার্ব্বতী পরমেশ্বর বাক্য ও অর্থের মত সম্পৃক্ত। এ আদর্শ বুকে রেখে মাত্র ভক্তিভরা প্রাণে, পৃথিবীর নানা প্রলোভনের পথে বিচরণ ক'রে, মানুষ জ্ঞান এবং মোক্ষ লাভ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

> মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
> কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।
> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।

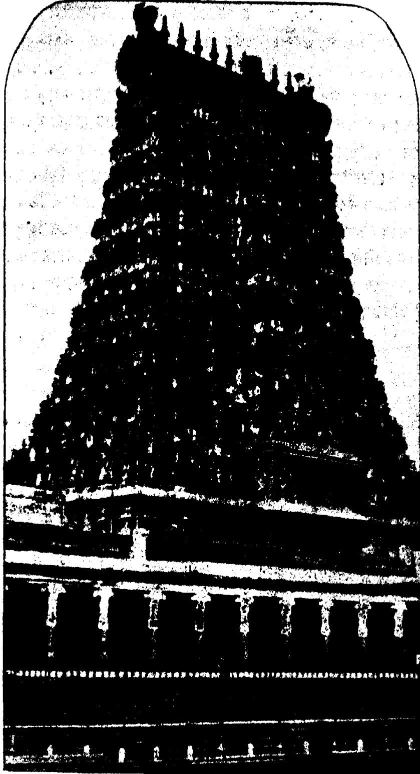
আমাকে চিত্তে রেখে, মদ্গতপ্রাণ হয়ে, পরস্পরে আমার প্রসঙ্গে নিত্য তুষ্টিলাভ ক'রে এবং অনুরক্ত হ'য়ে, সতত আমাতে যুক্ত থেকে প্রীতি ভরে আমাকে ভজনা করলে, আমিই ভক্তকে বুদ্ধিযোগ দান করি। তার ফলে তারা আমাকে লাভ করে।

মীনাক্ষীর মুক্তির কাহিনী মানুষের মনে আশার প্রদীপ জ্বালে, শ্রান্তপ্রাণে আনন্দের বাঁশী বাজায়। কারণ আনন্দ মিলনের উপাধি। শিল্প আনন্দ জাগায়। শিল্পী এই মিলনের আনন্দ উৎসকে জাগিয়ে রাখবার জন্য আত্মহারা হ'য়ে রস পরিবেশন করেছে। তাই এ স্মৃতি মন্দির দেব-মন্দির। হেথায় শোকের গাম্ভীর্য্য নাই—জীবাত্মার তিরোধানে পরমাত্মা লাভ। তাই চারুশিল্প নিপুণ হাতে কল্পনাকে প্রাণবন্ত করেছে। মন্দিরের মাঝে অনন্ত দেবতার প্রতীক প্রতিষ্ঠিত। যে সব মূর্ত্তির দর্শনে, চিন্তায় বা ধ্যানে অখণ্ড ঈশ্বরের বিভূতির কথা চিত্তে জেগে ওঠে, প্রাণে তুষ্টি আথে, চিত্ত রমণীয় হয়, সেই সব মূর্ত্তি মন্দির প্রাচীরের গায়ে, বিমানের উপর এবং মণিপীঠে সমাহিত। দিকে দিকে ত্রিদিব সঙ্গীত মুখরিত করছে নর্ত্তকী। নানা মুদ্রায় নানা ভঙ্গে ছন্দ প্রাণবন্ত। ফুল, লতা, কল্পতরু প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ। ভক্তি জাগরণের পরিবেশকে সমীচীন এবং অনুকূল কর্ব্বার জন্য মন্দিরে নানা দেব-দেবী এবং পুরাণবর্ণিত চিরস্মরণীয়দের মূর্ত্তি রচিত। দেবদেবীরা একেশ্বরের বিভূতির প্রতীক মাত্র।

মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দির দেখে মনে ঐ রকম ধারণা জন্মে। মন্দির অপূর্ব্ব। যেমন বিশাল তেমনি সুন্দর। বিমানের এবং লম্বালম্বা দালানের প্রত্যেক মূর্ত্তিটি এত সুন্দর, নিখুঁত এবং সুরক্ষিত যে মনে হয় তারা সদ্যনির্ম্মিত।

মন্দিরের মধ্যে এক সুন্দর টেপাকুল্লাম সরোবর আছে। তার

নাম লিলিট্যাঙ্ক। ইউরোপীয়েরা মধ্যযুগে সেই সরসীতে স্নান-রতা দেব-দাসীদের পদ্ম ভ্রম করে, সরোবরকে কমল-সরসী বা লিলিট্যাঙ্ক নাম দিয়েছিল। আমরা যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনের স্নান-রতাদের নামে



মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির

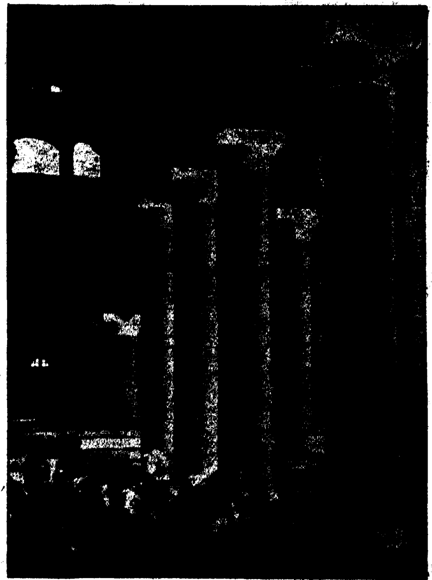
অভিহিত কর্ত্তে গেলে, এর যে নাম দিতে হয়, তাতে স্ত্রী জাতির অসম্মান অনিবার্য্য। পৃথিবী থেকে অশোকবনের গৌরবলুপ্ত হয়েছে কিন্তু চেরী-বিভীষিকা অদ্যাপি বিদ্যমান।

একটি দালানে থামের গায়ে পঞ্চপাণ্ডবদের পূর্ণাবয়ব প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। বূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ রাজপুত্রদের পরিকল্পনা আদর্শ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মুখে দাড়ি আছে। অন্যান্য অনেক পৌরাণিক বীরপুরুষদের মূর্ত্তি এই লম্বা দালানের থামের গায়ে বর্ত্তমান। ভারতীয় তথা চীনা ভাস্কর্য্যের দ্বারপালকের মূর্ত্তিগুলি পর্য্যালোচনা করলে বুঝা যায় দুই জাতির আদর্শ বীরপুরুষের ধারণা। গ্রীক ভাস্কর্য্যে মানুষমাত্রই সুগঠিত এবং সবল। পুষ্ট দেহ তুষ্ট চিত্ত গ্রীক চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আদর্শ। প্রাচ্যে কিন্তু বিশ্ব-মনের অশেষ রূপ চারুশিল্পে প্রতিভাত। মূল ভাবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ নয়। দ্বারপালের কর্ত্তব্যের কঠোরতাকে মূর্ত্তি দেবার জন্য, হিন্দু ও চীনা শিল্পীর কঠোর ভীম-দর্শন দ্বারপালের পরিকল্পনা। ইলোরা গিরিগুম্ফায় এবং পেনাঙের চীনা মন্দির প্রভৃতিতে পাপীদের প্রস্তর-মূর্ত্তি করুণ এবং বীভৎস।

সিংহ, হস্তী এবং ঘোটক হিন্দু শিল্পীর প্রিয়। পিছনের পায়ে ভর ক'রে লাফিয়ে উঠেছে এমন পাথরের ঘোড়া মাদুরা এবং অন্যান্য দক্ষিণ দেশের মন্দিরের স্তম্ভ। কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরে হাতী ঘোড়ার প্রাচুর্য্য। তাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব হর্ষের উৎস। পাথরের হাতীর সবল দেহে বেগ সঞ্চারিত। তারা মানুষের মনকে সচল এবং সবল করে। দক্ষিণ ভারতের দণ্ডায়মান অশ্বেরা তেমনি বলের প্রতীক। সিংহের অবয়ব কিন্তু অপ্রকৃত। মাদুরায় এক প্রকাণ্ড সিংহ আছে—তার মুখ-বিবরে একটা পাথরের গোলা আছে। হাত দিয়ে তাকে ঘোরানো যায়। সিংহ গড়বার পর ভাস্কর তার মুখবিবরের ভিতর অস্ত্র দিয়ে কেটে ঐ গোলক নির্ম্মাণ করেছে। বাঙ্গালী শিল্পী হাতীর দাঁতের মধ্যে ঐ রকম সব রূপ নির্ম্মাণ করতে পারে। এ সব দেখবার পর ভাবনা আসে। শিল্প-সাধনাকে চিরায়ু কর্ব্বার জন্য শিল্পী-সঙ্ঘদের বিভিন্ন জাতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেই কি হিন্দু সভ্যতা এ সাধনাকে স্বল্পায়ু করে ফেলেছে। জাতির গণ্ডী পুরুষানুক্রমে শিল্পীকে একই চর্চ্চায় নিযুক্ত রেখে নিশ্চয়ই একদিন শিল্পের উন্নতি সাধন করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পুকুরে যেমন পলী পড়ে, তেমনি দক্ষতাও প্রাণহীন হয়েছিল। বৌদ্ধ যুগে জাতিভেদ উঠে যাবার পর নূতন শিল্প-সম্পদে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। কারণ জাতিভেদের নিগড়ে বাঁধা আড়ষ্ট রুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে নানা দিকে নানারূপে আত্ম-প্রসার করেছিল। কারণ যাই হ'ক—আজ আর মাদুরার মন্দির গড়তে পারা যায়না, এ কথা নিশ্চিত।

মাদুরার মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের অনেক সম্পত্তি আছে। সোনায় মোড়া হাতীরা মন্দিরের প্রশস্ত অলিন্দে ঘুরে বেড়ায়। মীনাক্ষী নানা সাজে ভূষিত হ'য়ে সৌন্দর্য্যপ্রিয় মহিলাকুলের চিত্ত-বিনোদন করেন। তিনি যে পাথরের পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, সে পাথরখানি নাকি মরকত। হীরা-মুক্তার আভরণ যে তাঁর কত লক্ষ টাকার—তা হিসাব করা যায়না। মন্দিরের প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ সোনার পাতে মোড়া ধ্বজস্তম্ভ বহুমূল্য।

হাজার থামের দালান এক অপূর্ব্ব নিকেতন। সোজাসুজি দেখলে মনে হয় থামের কারুকার্য্য সেই ভাবেই নির্ম্মিত। আবার তির্য্যকভাবে দেখলে মনে হয়, থামের গায়ে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি তির্য্যকভাবেই নির্ম্মিত

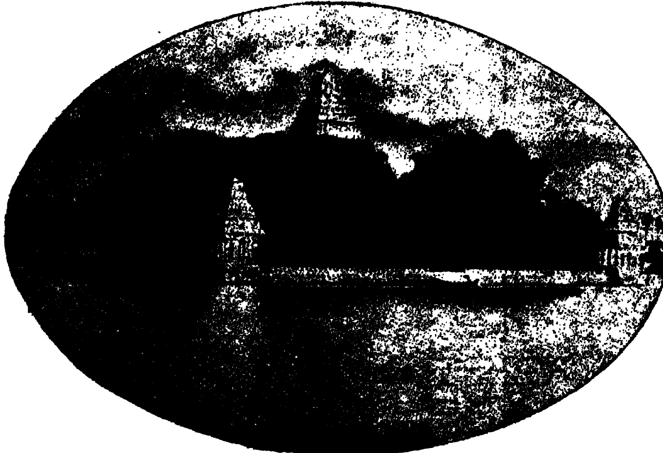


মাদুরা—তিরুমল নায়েকার মহল

হয়েছে। হাজার থাম দিয়ে চতুষ্কোণ স্থল সাজালে—যেমন সোজাসুজি পথ দৃষ্ট হবে তেমনি কোণাকোণিও রাস্তা দেখা যাবে। কিন্তু উভয় দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে থামের মূর্ত্তিগুলি সমান দেখাতে গেলে বিশেষ শিল্পের প্রয়োজন। এ বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রেলের এক সাহেব। অনেক পর্য্যবেক্ষণ করে বুঝলাম যে থামের কোণে কোণে নর্ত্তকী, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে শিল্পী এ অলিন্দকে এমন রহস্যময় করেছে।

গণেশের মূর্ত্তি, নটরাজের মূর্ত্তি প্রভৃতি নানা দেব দেবীর সুদৃশ্য মূর্ত্তিতে মাদুরার মন্দির পূর্ণ। এর বিশাল অলিন্দগুলিতে আমরা দিনের মধ্যে দুবার ঘুরতাম। তখন পুস্তকে এর আয়তনের বর্ণনা পাঠ করিনি। এখন বুঝছি, কেবল মন্দিরের মাঝে ভ্রমণ করেই আমরা প্রতিদিন তিন মাইল পথ ঘুরতাম। সংবাদপত্রে আবহাওয়ার বিবরণে সহরের তাপের পরিমাণ বুঝলে গরম অসহ্য হয়। অজ্ঞতা আশীর্ব্বাদ।

আসল টেপাকুলাম মন্দির হ'তে প্রায় দুই মাইল দূরে। প্রকাণ্ড সরোবর—পুরীর নরেন্দ্র সরোবরের মত, কিন্তু আকারে বড়। পাথর দিয়ে গাঁথা। পাড়ে পাথরের প্রাচীর—মাতাল, ভাবুক কিম্বা কবি জলে পড়তে পারেনা। মাঝে পাথর দিয়ে ধার-গাঁথা এক মস্ত দ্বীপ আছে। তার উপর বাগান, অট্টালিকা ও মন্দির। একখানি নৌকা সর্ব্বদা দিঘীর পার হতে লীলা দ্বীপে যাত্রীদের নিয়ে যায়। উৎসবের সময় শ্রীমতী মীনাক্ষী দেবীর ভোগ মূর্ত্তি ঐ মন্দিরে বসে পূজা গ্রহণ করেন। টলমল করছে কাকচক্ষুর মত জল। অন্তরে ভাগাই নদীর সঙ্গে সংযোগ আছে। আমরা যেদিন ঐ দ্বীপে গিয়েছিলাম একদল কুমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে এসেছিল। স্বচ্ছন্দ আনন্দে মেয়েগুলি হরিণ শিশুর মত ছুটাছুটি করছিল।



মাদুরার টেপাকুলম্

—আহা! আমাদের মেয়েরা এ সুখ পায়না—বল্লেন আমার সহধর্ম্মিণী।

—আমি যদি কোনোদিন ডারবী পাই বা আলিবাবার মত রত্নাগার লুঠ করতে পারি, লালদিঘি বা গোলদিঘির মাঝে একটা দ্বীপ গেঁথে দেব।

এ কথায় তিনি তুষ্ট হলেন না। বল্লেন—তোমাদের কল্পনা কম, মেয়েদের প্রতি ভালবাসা নাই। ঢাকুরের লেকের দ্বীপগুলায় মেয়েদের বন-ভোজন কর্ব্বার ব্যবস্থা করতে পার না?

—তা হ'লে ব্যর্থ প্রেমিকদের ডুবে মরবার অসুবিধা হবে।

এর প্রত্যুত্তর শুনলে ভারতবর্ষের পুরুষ পাঠকেরা ধর্ম্মঘট করবে। মোট কথা, দক্ষিণে কুমারীদের যত্ন অধিক। আমাদের এ অঞ্চলেও দিন দিন মহিলাদের শ্রদ্ধা বাড়ছে। বাঙ্গালী এখন কন্যাদের সযত্নে শিক্ষা দিচ্ছে ও প্রতিপালন করছে।

মাদুরা বহুদিনের প্রসিদ্ধ সহর। এখানে সমৃদ্ধিশালী হিন্দু নরপতিগণ রাজত্ব করেছেন। যবদ্বীপে এক মাদুরা সহর আছে—নিশ্চয়ই তার স্থাপয়িতা কোনো পোলচরে বা পাণ্ড্যের ভূপতি। রোমকেরা এ রাজ্যকে বলত—রিজিও পাণ্ডিয়ন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অগষ্টসের সভায় এ রাজ্যের দূতের স্থান ছিল। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বাণিজ্য ক'রে পাণ্ড্যের রাজত্ব সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। এখনও মাদুরার সাড়ি ও রূপার কারুকার্য্য প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একবার মাদুরা মুসলমানের কবলে পড়েছিল। তখন প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি ধূলিসাৎ হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিন পরে হিন্দু রাজত্ব বিজয়নগরের সেনাপতি থিরুমল্ল নায়ক মাদুরা বিজয় করেছিলেন। আধুনিক মন্দির প্রভৃতি তাঁরই গঠিত।

নায়ক রাজাদের প্রাসাদ এখনও বিদ্যমান। এর গঠন হিন্দু-সারা-সেনিক। গ্রীক ডোরিক থাম, সারাসেনিক খিলান ও গম্বুজ, রোমক কার্ণিস, প্রাচীর গায়ে বালি ও সিমেন্টের জমানো হিন্দু কারুকার্য্য আজিও বিদ্যমান। নাই রাজগৌরব, স্বাধীনতার ধ্বজা, হিন্দু পণ্ডিতদের সভা। এখানে এখন ইংরাজের আদালতের কাজ হয়। এক পক্ষের পয়সা নিয়ে উকীল প্রতিপক্ষের উপর গালিবর্ষণ করে। পেস্কার, পেয়াদা, কনষ্টেবল উভয় পক্ষের নিকট উপহার চায়। আর সাক্ষীরা জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে। মানুষের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মত অট্টালিকারও ভাগ্য-বিপর্য্যয় জগতের ধারা।

রাত্রি তিনটার সময় মাদুরা ছাড়বার কথা। সেদিন বৈকালে ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ফারমিনজার সংবাদ দিলেন তিরুপল্লী কুণ্ডমের সুব্রহ্মণ্য মন্দিরের। যখন নামটা কায়দা করবার চেষ্টা করছি, তিনি একজন মোটর চালককে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন। স্থানটি মাদুরা হতে সাত আট মাইল দূরে। পাহাড়ের গায়ে গাঁথা মন্দির। স্তরে স্তরে উঠেছে। বাহির হতে দেখতে তত বিচিত্র নয়। কিন্তু তার ভিতরের রচনা-কুশলতা চিত্তাকর্ষক।

একটা কথা আলোচনা করতে করতে মাদুরা হ'তে ত্রিবাঙ্কুরাভিমুখে যাত্রা করলাম। কৃপণের কাছে অর্থের মূল্য নাই। অর্থের অপব্যবহার মহাপাপ। কিন্তু অর্থাভাবে কেহ তীর্থ, ধর্ম্ম বা পুণ্য করতে পারে না—অন্ততঃ সসম্মানে।

আর একটা কু-কথার সমাধান করেছিলাম প্রথম দিন। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় মন্দিরের নক্সা করেছিল। ক্ষত্রিয় পাণ্ড্যে রাজারা অর্থব্যয় করেছিল। কিন্তু উচ্চ বিমানে উঠে জীবন সংশয় করে যারা মন্দির গড়েছিল, আর যারা পাহাড় কেটে পাথরের চাঙ্গড় বহন করে এনেছিল, তারা অ-ব্রাহ্মণ। তারা বা তাদের বংশধরেরা নিশ্চয়ই মাদ্রাজী অস্পৃশ্যতার উপদ্রবে মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তে পায়নি। পরে শুনলাম, এখন মন্দিরের দ্বার সকলের পক্ষে উন্মুক্ত। এর পুণ্য অর্জ্জন করেছেন মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ রাজন ও কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট। কতকটা ডাঃ আম্বেদকারের হুঙ্কারেরও সাফল্য আছে। দল বেঁধে ওরা খৃষ্টান হ'লে ভোট-গোনা স্বায়ত্তশাসন যন্ত্রের মন্ত্রী হবার আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আশা থাকবেনা। সুতরাং মন্দিরের দ্বার-উন্মোচন বিধেয়। এ সব ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গুণগুণ স্বরে গান গাহিলাম—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

রেডিও-বিভ্রাট

শ্রীঅজিত লাহিড়ী

সকালবেলা। একটি মোটাসোটা গোলগাল চেহারার ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পড়িতেছিল। পাঠ্যবিষয়—সেইদিনকার রেডিও-প্রোগ্রাম। নীল পেন্সিল হাতেই ছিল, একটি জায়গায় বিশেষভাবে দাগ দিতে দিতে ভদ্রলোকটি নিজের মনেই কহিলেন, 'আজ বেলা নয়টার সময় মিসেস্ মুখার্জ্জি রান্না সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন; ভালই হয়েছে, আজ কলেজ বন্ধ।—' এমন সময় জনৈক ভৃত্য আসিয়া ভদ্রলোকটির হাতে একটি বইয়ের পার্শেল দিল। ব্যস্তভাবে তিনি মোড়কটি খুলিয়া ফেলিলেন। মোড়কটি চেয়ারের পাশে পড়িয়াছিল, তাহাতে ভদ্রলোকের নাম লেখা ডক্টর রামধন রায়, ডি-এস্‌সি, প্রফেসার অফ্ কেমিষ্ট্রি, চিন্তামণি কলেজ।'

রামধনবাবুর হাবভাবে বোঝা গেল তিনি বইখানি পাইয়া খুব খুশী হইয়াছেন। বইখানি—'পাকপ্রণালী।'

রামধনবাবু নিবিষ্টভাবে পুস্তকপাঠে মত্ত, এমন সময় ঘরে ঢুকিলেন, প্রফেসার-গৃহিণী বিরজা দেবী। গৃহিণীকে দেখিয়া অপ্রস্তুতভাবে রামধনবাবু বইখানি লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফলকাম হইলেন না। বইখানি দেখিয়া বিরজা দেবী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'ভোর না হ'তেই পাকপ্রণালী হাতে উঠেছে। আচ্ছা, তোমার কি পেটের চিন্তা ছাড়া আর কাজ নেই?—' রসিকতা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া রামধনবাবু কহিলেন, 'হেঁ, হেঁ, তোমার মত পাকা গিন্নী থাকায় আমরা ত পাহাড়ের আড়ালেই আছি গো—'

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। বিরজা দেবী সংসারের চাল, ডাল, তেল, নুনের হিসাব বোঝেন, গহনার প্যাটার্ন বোঝেন, শাড়ী ব্লাউজের রং বোঝেন—অতসব সূক্ষ্ম রসবোধে তাঁহার কোন আবশ্যক নাই, তিনি রাগ করিয়া কহিলেন, 'তা ত বটেই! আমি মোটা—আমি পাহাড়—'

রামধনবাবু শান্তিপ্রিয় লোক, যুদ্ধের আবহাওয়া তাহার মোটেই সহ্য হয় না—ভয়ে যুদ্ধের খবর পর্য্যন্ত তিনি পড়েন না। যুদ্ধের উপক্রমেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কহিলেন, 'আহাহা, আমি তাই বল্‌লাম নাকি? শোন, শোন, মানে ··· ইয়ে ···

'থাক্ আর সোহাগে কাজ নেই। কিন্তু বলি, আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একবার নিজের চেহারাটা দেখা হয়েছে কি? আমি না হয় পাহাড়, আর নিজে—'

এত সহজে মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় রামধনবাবু উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, 'হিমালয় পর্ব্বত! হ'ল ত? আচ্ছা, এবার বল ত চিংড়িমাছের চীনেকাবাবে—'

'আবার খাওয়ার গল্প? আমি চল্‌লাম।—'

আহাহা, রাগ কর কেন? আমি বলছিলাম কি জান—অশোক ধ'রেছে আজ দুপুরবেলা আমার হাতের ··· মানে ··· ইয়ে ··· আমাদের হাতের রান্না খাবে। বুঝতে পারলে না—আমাদের অশোক গো—'

'হ্যাঁ, বুঝলাম অশোকঠাকুরপো—তাই কি?'—

'ঠিক্, ঠিক্ অশোকঠাকুরপো! সেই অশোকঠাকুরপো—'

'কি যে আবোল-তাবোল বক তার ঠিক নেই। আচ্ছা, কাল মা যে অত ক'রে ব'লে গেলেন যে, অশোকঠাকুরপোর সঙ্গে বিশাখার বিয়ের—'

'আরে সেইজন্যই ত অশোককে আজ আসতে বলেছি—'

'তবে যে বল্‌লে সে নিজে থেকে আমাদের হাতের রান্না খাবে ব'লে—'

'আহাহা, ও একই কথা হ'ল। মানে ··· ইয়ে ··· ও বল্‌লে আজ আসবো?—আমি বললুম এস।—'

'তা হ'লে সত্যি? ওমা, এতক্ষণ ত ব'লতে হয়। কিছুই যোগাড়-যন্ত্র হয়নি। বিয়েটা হ'লে কিন্তু বেশ্ হয়! অশোকঠাকুরপো এবার এম্, এস্-সিতে ফার্ষ্ট হ'ল ···

'হবে না? ছাত্র কার?—

'সেইজন্যই ত ভয়। ছাত্রটি মাষ্টারের মত পেটুক হ'লেই হ'য়েছে! সারাদিন রান্নাঘরে বসে থাকা, আর 'খাই খাই'—হাড় জ্বালাতন! কিন্তু অশোকঠাকুরপোর বাবা রাজী হ'বেন ত? ওরা বড়লোক—আর আমাদের গরীবের ঘরের মেয়ে···

—আরে বড়লোক গরীবলোক ব্যাপারটাই ত এ যুগের ফ্যাশান্। অশোক এ যুগের ছেলে ··· তারপর বোনটি একে সুন্দরী তায় শিক্ষিতা, তার উপর আবার স্পোর্টস উওম্যান্। একবার ভাব হ'লে হয়—একেবারে লুফে নেবে।—'

'যাও! নিজের ছাত্র সম্বন্ধে ওইভাবে কথা ব'লতে লজ্জা হচ্ছে না?—'

'গিন্নী, এটা বিংশ শতাব্দী! প্রেমের বীজ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত ওৎ পেতেই আছে, কখন যে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তা কেউ ব'লতে পারে না।—'

'যাও আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না। কিন্তু তা যাই বল বাপু, আমাদের কালে কিন্তু অতশত ছিল না, বাপমায়ে বিয়ে দিত, ব্যস্। এখন আবার মেয়েরাও বিয়ের নামে নাক সিটকায়। সেদিন মা'র কাছে অশোকঠাকুরপোর সঙ্গে ওর বিয়ে হ'লে বেশ হয় এইকথাটুকু শুধু বলেছি—বিশাখা শুনতে পেয়ে ফোঁস্ ক'রে উঠলো, বল্‌লে—ওসব পড়ুয়া ছাত্রে আমার দরকার নেই—'

রামধনবাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে কহিলেন, 'ইস্ নটা বাজে যে! আর ত সময় নেই। তুমি শিগগীর এইখানে সমস্ত রান্নার বন্দোবস্ত কর। ঠিক্ নটার সময় রেডিওতে মাংসের পোলাও সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবে।—'

'রেডিও দিয়ে আবার কি হ'বে?—'

'মানে—ইয়ে—অশোক আবার রেডিওর রান্না খাবে বলেছে যে?—

'যত সব পাগলের কাণ্ড! কিন্তু ওকে খেতে ব'লেছ ত?—'

'অ্যাঁ, তাই ত! সে কথা ত মনে ছিল না! দাঁড়াও, আমি দিলীপকে ব'লছি।—'

রামধনবাবু ডাকিলেন, 'দিলীপ, দিলীপ—'

দিলীপ রামধনবাবুর পুত্র। বয়স অনুমান চোদ্দ-পনর বৎসর। সে ও তাহার এক বন্ধু তপন পাশের ঘরে রেডিও শুনিতেছিল। পিতার আহ্বানে সে উত্তর দিয়া কহিল, 'যাই, বাবা।'—তারপর রেডিও বন্ধ করিতে করিতে তপনকে কহিল, 'ঠিক নটা দশ মিনিটের সময় দিল্লী থেকে বক্সিং সম্বন্ধে বাঙ্গালায় বক্তৃতা দেবে, তুই আসিস, বেশ মজা ক'রে শোনা যাবে।'—এই বলিয়া সে পর্দ্দা তুলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

রামধনবাবু দিলীপকে কহিলেন, 'তুই চট্ ক'রে অশোককে একটা টেলিফোন ক'রে দে ত। ব'লবি যে আজ দুপুরে বাবা তোমাকে এখানে খেতে ব'লেছে। বারোটার মধ্যেই যেন আসে।—'

বিরজা দেবী কহিলেন, 'বিশাখাকেও আসতে ব'লতুম কিন্তু বাড়ীতে পড়াশুনা হয় না ব'লে ও আজকাল হোষ্টেলে আছে। পড়া না ছাই। বাড়ীতে আড্ডা দেওয়ার সুবিধা হয় না ত—নইলে ভারি ত আই-এস্‌সি পরীক্ষা!—'

বিরজা দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বিশাখা এইবার আই-এস্‌সি পরীক্ষা দিবেন। আপাতত তিনি হোষ্টেলের ড্রেসিংরুমে প্রাতঃ প্রসাধনে

এবং মৃদুস্বরে সঙ্গীতে রতা। বিশাখা দেবীর তন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল তাহার অন্তরঙ্গা বান্ধবী উত্তরা। উত্তরার হস্তে টেনিস্ র‍্যাকেট্ এবং একটি দৈনিক সংবাদপত্র। উত্তরা কহিল, 'এখনও সাজগোজ হয়নি? টেনিস্ খেলতে যাবি না? ছুটির দিনে সকালে খেলার পারমিশ্যান্ পাওয়া গিয়েছে।—'

বিশাখা ব্রাশ্ দিয়া চুল ঠিক করিতে করিতে কহিল, কাল কেমন খেলা দে'খলি?—

উত্তরা কহিল, 'বেশ। চমৎকার খেলে ওই ছেলেদের সিঙ্গল্‌স্ চ্যাম্পিয়ন্ অশোক বোস—আর চেহারাটাও বেশ স্মার্ট'!

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাইয়া তাচ্ছিল্যভরে বিশাখা কহিল, 'ছাই। তোর কাছে ত পুরুষমাত্রেই রাজপুত্তুর!—'

হাতের কাগজটা টেবিলের উপর রাখিয়া উত্তরা কহিল, 'চোখের সামনেই ত ডকুমেন্ট র'য়েছে। আজকে ওর ছবি ছাপা হ'য়েছে—দেখ্ না খুলে—'

তেমনিভাবে বিশাখা কহিল, 'দায় প'ড়েছে—'

উত্তরা কহিল, 'কত বড় বড় অক্ষরে ওর নাম ছেপেছে দেখেছিস্? আর তুই ত কাল জিত্‌লি জুনীয়ার লীগে—কিন্তু তোর নাম খুঁজে বের ক'রতে হ'লে মাইক্রোস্কোপ্ দরকার।—'

বিশাখা সেইভাবে কহিল, 'হ্যাঃ, কাগজে নাম ছাপা হ'য়েছে ব'লে কি রাজা হ'য়ে গেল নাকি? কাগজে নাম বের করা ত ভারি একটা কঠিন কাজ! এডিটর কি সাব্-এডিটরের সঙ্গে আলাপ থাকলে একটু তোষামোদ কিম্বা দু-চারদিন চপ্-কাটলেট্ চা-সিগারেট খাওয়ালেই হল! ব্যস্! অত সস্তা পাব্‌লিসিটিতে আমার দরকার নেই।—'

উত্তরা কহিল, 'কিন্তু লতিকা যে বললে তুই ওকে চিনিস্—কে রে ছেলেটা?—'

বিশাখা কহিল, 'ক'লকাতা শহরে সবশুদ্ধ ১৪,৮৫,৫৮২ জন লোক আছে। তাদের সবাইকে কি আমি চিনি, না চেনা সম্ভব? সারাদিন অশোক বোসের প্রশংসা ক'রবার অনেক সময় পাবি—কিন্তু আজ যে বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে পিকনিক্—সেকথা স্মরণ আছে কি?—'

ব্যস্তভাবে উত্তরা কহিল, 'মাই গড! একেবারে ভুলে গিয়েছি—' এই বলিয়া দ্রুতপদে উত্তরা চলিয়া গেল। বিশাখা উত্তরার ফেলিয়া যাওয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল—সামনেই অশোক বোসের ছবি। বিশাখা কাগজ ফেলিয়া দিল, কি মনে করিয়া আবার কাগজখানি লইয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।

অশোকদের বাড়ী। অশোক টেলিফোনে কথা কহিতেছিল ... 'হ্যাঁ, আমিই অশোক। কে বলুন ত? ... ও ... স্যার্ গুড্ মর্নিং! ছবি তোলাবেন? ... বেশ্ ত। কোথায়? বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে একটার সময়? নিশ্চয়ই যাব ... আজ্ঞে হ্যাঁ ... ঠিক্ বুঝেছি ... আজ্ঞে আচ্ছা—'

অশোক টেলিফোন্ রাখিয়া দিল। অশোকের ঘরে তখন আরও চার-পাঁচটি যুবক বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। অশোক কহিল, 'বুড়ো ডক্টর খাশ্‌নবিশের ছবি তুলতে হবে। হ্যাঁ, তুই কি বলছিলি অজয়?—'

অজয় কহিল, 'আজকের কাগজে বিশাখা রায়ের নাম দেখলাম—টেনিসে লেডিজ্ জুনীয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ন হ'য়েছেন।—'

উত্তেজিতভাবে অশোক কহিল, 'আরে রেখে দাও তোমার বিশাখা রায়! বাঙালী মেয়েরা আবার খেলতে জানে? ও সমস্ত কারসাজি! হয় মেয়েটি কোন এডিটর কি সাব্-এডিটরের আত্মীয়া, না হয় ত বুঝতেই পারছো মেয়েটির নাম ছাপিয়ে ঘনিষ্ঠতা ক'রতে চায়।'—এই বলিয়া অশোক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

অজয় কহিল, 'এ তোমার হিংসার কথা। আজকালকার মেয়েরা খুব বেশ্ উন্নতি করছেন।—'

অশোক ক্যামেরা পরিষ্কার করিতেছিল, সে কহিল, 'ছুটো বল্ মারলেই টেনিস্ খেলা হয় না। ওদের বল্ গে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতে।—' এই বলিয়া সে ফোকাস্ ঠিক করিতে লাগিল।

বিকাশ কহিল, 'খুব ত ক্যামেরাম্যান্! বললাম যে একটা ফটো তুলে দে—তা আজ না কাল—'

অশোক কহিল, 'যা চেহারা, তার আবার ফটো! আচ্ছা বেশ্, আজ ঠিক দুটায় বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে আসিস্, তুলে দেব।—'

বিকাশ কহিল, 'এত জায়গা থাকতে বোটানিক্যাল্ গার্ডেন কেন? আর অনন্ত সময় থাকতে কাঠফাটা রোদের মধ্যে বেলা ২টায় কেন?—'

অশোক কহিল, 'শুনলি ত! প্রফেসর খাশ্‌নবীশের ছবি তুলতে হবে। আজ অনেক কাজ। বেলা বারটায় প্রফেসার ডক্টর সেনের বাড়ীতে ভোজন—তারপর ঠিক একটা বিশ মিনিটে প্রফেসার ডক্টর সেনের ফটো উত্তোলন—বোটানিক্যাল্ গার্ডেন ভ্রমণ—বেলা বারটায় ব্যারাক্‌পুরে দিদির গৃহে চা খাওন এবং সন্ধ্যা ছটায় মেট্রোতে ছবি দেখন—'

অজয় কহিল, 'অতঃপর হাওড়া ষ্টেশনে গমন—রাঁচি এক্সপ্রেস্ ধরণ—রাঁচি আগমন এবং পাগলা গারদে থাকন।—'

উচ্চহাস্যের সহিত সভা ভঙ্গ হইল।

রামধনবাবুর বাড়ী। ঘড়িতে নয়টা বাজে। রামধনবাবু ষ্টোভ ধরাইতেছেন। রন্ধনের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছেই প্রস্তুত—ডেকচি, ঘি, তেল, নুন, মাল মসল্লা। বিরজা দেবী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা-সেটা করিতেছেন। ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে নয়টা বাজিল। পাশের ঘরে রেডিওতে বক্তৃতা আরম্ভ হইল।—'ক্যাল্‌কাটা কলিং। ... হ্যাঁ, আজ রান্না সম্বন্ধে কিছু ব'লবো। সব ঠিক আছে ত? ... উনুনে আঁচ আছে? ... এবার কি কি জিনিস লাগবে শুনুন। পেশোয়ারী চাল একসের, ঘি আধসের হ'লেই হবে। গোটা ধ'নে দুই তোলা, লবণ আড়াই তোলা, ছোট এলাচ আধ তোলা ...'

রামধনবাবু একটি বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডে সমস্ত জিনিসপত্র ওজন করিতেছেন—গৃহিণী পাশে দাঁড়াইয়া। ডেকচিতে ক্রমে ঘি, চাল, মশল্লা দেওয়া হইল।

এমন সময় পাশের ঘরে দিলীপ ও তপন প্রবেশ করিল। দিলীপ রেডিওর কাঁটা ঘুরাইয়া দিল্লীর সহিত যুক্ত করিয়া দিল। হঠাৎ রেডিওতে আরম্ভ হইল,—'হ্যাঁ, এইবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াও।—'

রামধনবাবু পূর্ব্বেকার নির্দ্দেশমত নীচু হইয়া খুন্তি দিয়া কি করিতেছিলেন, এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন।

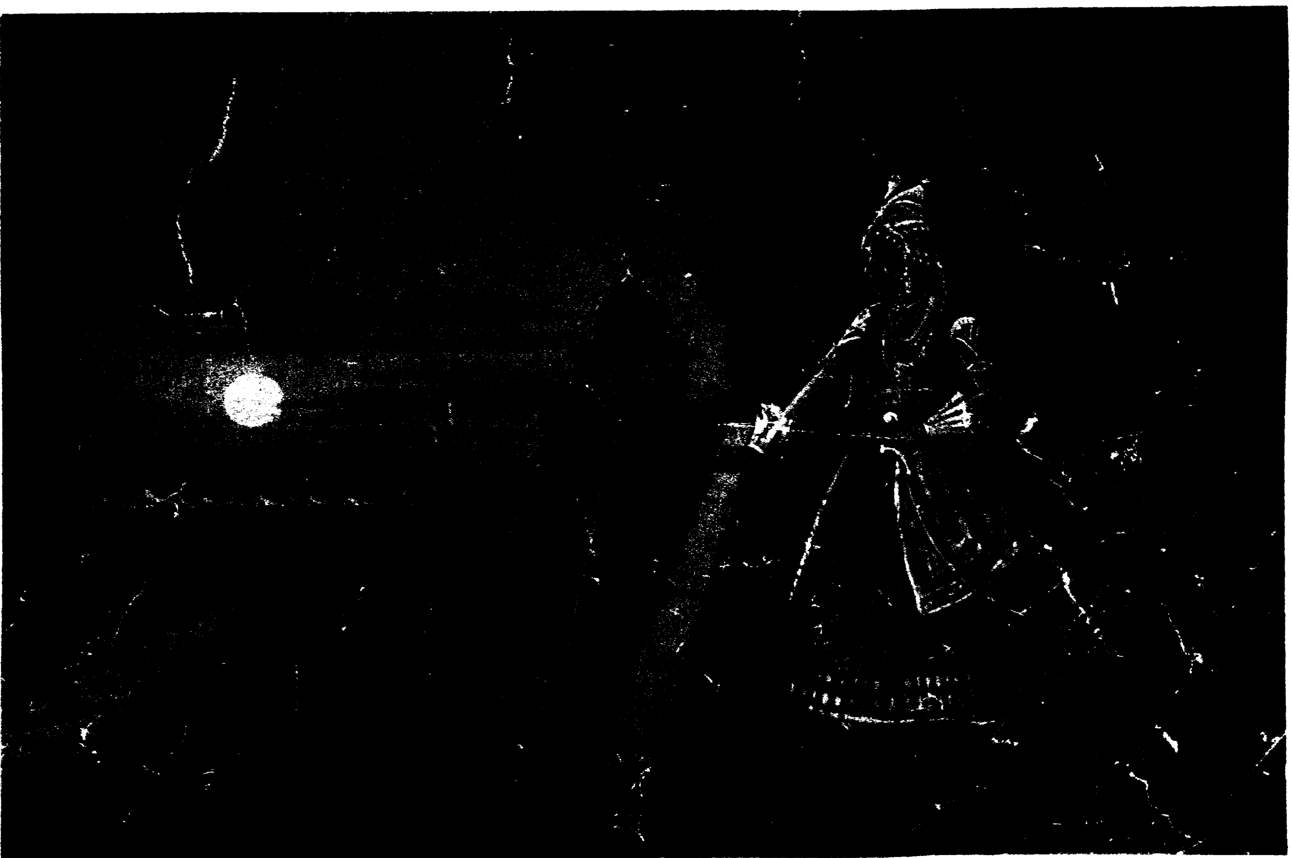
রেডিওতে বলিতেছিল, 'মাথাটা একটু নীচু ক'রে ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বুকের কাছে আন, তারপর এক পা পিছিয়ে বাঁ হাতটা জোরে সামনের দিকে চালাও।—'

রান্নার মধ্যে বক্সিং ঢুকিয়া বিপর্য্যয় ঘটিল। ডেক্‌চি উল্টাইল, রামধনবাবুর হস্তসঞ্চালনে বিরজা দেবী নক্ ডাউন্ (আহত) হইলেন—সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার! এই সময়ে ঘটনাস্থলে অশোকের প্রবেশ। তখন 'বরফ' 'বরফ' 'ডাক্তার, ডাক্তার', 'সামাল, সামাল' রব উঠিল।

বোটানিক্যাল্ গার্ডেন্। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। একটি ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক গাছের ছায়ায় একটি বেঞ্চে বসিয়া তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। বুকের উপর খবরের কাগজটি ঠিক আছে, কিন্তু ভদ্রলোকের নাসিকা গর্জ্জন শুনিলে মনে হয়—কাগজ পড়া তিনি অনেকক্ষণ বন্ধ করিয়াছেন। একটি কুকুরও সেই গাছের ছায়ায় দিব্য-নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। দুইটি যুবক বই হাতে করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোকটির নিকটে আসিয়া একটি যুবক দাঁড়াইয়া সঙ্গীকে কহিল—'একটা মজা দেখ্‌বি?'

কি?—'

'দেখ্—' এই বলিয়া ছেলেটি পকেট হইতে [illegible] বাহির করিয়া



পদ্মিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৈয়দ সাদিগ আলি মিরজা (মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ লাইব্রেরীর চিত্রের প্রতিলিপি) ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

খাতা হইতে খানিকটা কাগজ ছিঁড়িয়া তাহার উপর অনেকটা নস্য ঢালিল, পরে সেই কাগজটি লইয়া অতি সন্তর্পণে ভদ্রলোকটির নাকের নিকট ধরিল। নিঃশ্বাসের টানে অনেকখানি নস্য ভদ্রলোকের নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল। ভদ্রলোকটি একটু নড়িতেই ছেলে দুইটি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিল। কিছুক্ষণ পরেই 'কাঁপাইয়া বনস্থল' কামান গর্জ্জনের মত আওয়াজ হইল —'হাঁচ্চোঃ—' কুকুরটি এই আচমকা শব্দে ভীত হইয়া 'কেঁউ, কেঁউ' করিয়া পলায়ন করিল। হাঁচির আর বিরাম নাই—'হাচ্চোঃ, হাচ্চোঃ হাচ্চোঃ—' সেই শব্দে পথচারী দুএকটি লোক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'য়েছে মশায়?—' কোন উত্তর নাই, কেবলমাত্র শব্দ— হাচ্চোঃ—। দুইজন, চারিজন করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ছোট-খাটো ভিড় জমিয়া গেল। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন,'কি হ'য়েছে মশায়?—'

এই সময় ভিড়ের পিছনে একটি সিডন বডী মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। মোটর হইতে নামিল, বিশাখা, উত্তরা ও আরও কয়েকটি মেয়ে ও একজন টীচার। একজন ভৃত্য টিফিন্ কেরিয়ার, বাস্কেট্ প্রভৃতি নামাইতে লাগিল।

বিশাখা কহিল, 'এত ভিড় কিসের রে?—'

উত্তরা কহিল, 'কে জানে। হয়ত কোন মিটিং হবে। চল্ ও গাছতলায় বসা যাক্।—'

মেয়েরা সেই ভিড়ের একটু পিছনেই আড্ডা জমাইল। উহাদের সঙ্গে যে টীচারটি আসিয়াছিলেন তিনি কহিলেন, 'তোমরা শান্ত হ'য়ে খাওয়া দাওয়া কর। আমি একবার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে এখুনি ঘুরে আসছি।—' তিনি চলিয়া গেলেন।

ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তিনি কহিলেন, 'থাক্, ওতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হয়নি আমার। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝুন একবার! নিরীহ ভদ্রলোকের উপর যারা এ রকম জুলুম করতে পারে, তাদের দ্বারা দেশের কি উপকারটা হবে শুনি?—'

পাশের একটি ভদ্রলোক কহিলেন, 'যা বলেছেন মশায়, এই ক'রেই বাঙ্গালী জাতটা একেবারে উচ্ছন্ন গেল।—'

ভুঁড়িওয়ালা। 'যাবে না? যত সব অকর্ম্মণ্য বখাটে বোম্বেটের দল। দিনরাত রেষ্টুরেণ্টে চা আর সিগারেট খেয়ে বাপের পয়সা ফুঁকবে আর বায়োস্কোপের গল্প করবে। যত সব!—'

আরও লোক জমায়েৎ হইতেছিল।

একটি অল্পবয়স্ক বাবু কহিলেন, 'এই দেখুন না, আজকাল মেয়েরা—'

ভুঁড়িওয়ালা। 'তুমি থাম না হে ছোক্‌রা! উনি এলেন বক্তৃতা দিতে। চোখে আঙুল দিয়ে আর কি দেখাবে—চোখের সামনেই ত জলজ্যান্ত দৃশ্য! যত সব!—'

মেয়েরা তখন মহা উৎসাহের সঙ্গে বাস্কেট্ হইতে খাবার বাহির করিয়া আহারের আয়োজনে ব্যস্ত।

উত্তরা গান আরম্ভ করিয়াছে।

বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে যখন এই সব ব্যাপার ঘটিতেছিল, সেই সময় রামধনবাবুর গৃহের অবস্থা অন্যরূপ। বিরজা দেবীর মাথায় ব্যাণ্ডেজ। রামধনবাবুর হাতে পায়েও তদ্রূপ। টেবিলে খাওয়া চলিতেছে, কিন্তু নীরবে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিতেই অশোক বলিয়া উঠিল, 'সর্ব্বনাশ!'

রামধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'ল?'

অশোকের মুখে একটা আস্ত চপ্, সে কোনমতে কহিল, 'এন্‌গেজমেণ্ট্।'

রামধনবাবু আহার্য্য সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, 'ও কিছু নয়। চপের মধ্যে কাঁচা-লঙ্কার কুচি আছে কি-না, তাই বোধ হয় একটু ঝাল লেগেছে…এর সঙ্গে পদিনাপাতা থাকলে…'

বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে বিরজা দেবী কহিলেন, 'আবার! লজ্জাও করে না!'

রামধনবাবু ভীত ভাবে একবার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

এই সময় পাচক অশোকের প্লেটে কি দিতে যাইতেছিল, অশোক নিষেধ করিল। রামধনবাবু কহিলেন, 'নাও হে নাও একটু। ওটা একটা নূতন জিনিস। দাও হে ঠাকুর।' ঠাকুর দিল। রামধনবাবু অশোকের আহারের দিকে চাহিয়া উৎসাহের সহিত কহিলেন, 'কেমন, ভাল নয়? ও কি, ওরকম ক'রে খাচ্ছ কেন? আগার দিকটা আগে খাও…তারপর…উঁহু…তুমি বুঝতে পারছো না। দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি'— প্রবল উৎসাহের সহিত রামধনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠাকুরটি ঠিক এই সময়ে রামধনবাবুকে পরিবেশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই পাচকের সহিত সংঘর্ষ এবং ফলে তাহার হস্তস্থিত পাত্রটি উল্টাইয়া গিয়া সমস্ত আহার্য্য রামধনবাবুর মাথা এবং গায়ের উপর পড়িল। রামধনবাবু ঝোলে, মাংসে, তরকারীতে প্রায় স্নান করিয়া উঠিলেন।

অশোক হাসিতে হাসিতে একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল, সঙ্গে দিলীপ। অশোকের টু-সীটার গাড়ীখানি দরজার পাশেই ছিল। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতেই দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাচ্ছ অশোকদা?—'

—'বোটানিক্যাল্ গার্ডেন—'

বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই ভদ্রলোকের চারিপাশে তখন রীতিমত জনতা। পিছনের দিকে একটি বেঁটে ভদ্রলোক পায়ের আঙুলে ভর করিয়াও কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না, কারণ তাঁহার সম্মুখে ছয়ফুট লম্বা আর একটি লোক। একটি ন-দশ বৎসরের ছেলেও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহার হাতে একটা রঙীণ বল। ছেলেটি এক-একবার মজা দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে, পরক্ষণেই হতাশ হইয়া হস্তস্থিত বলটি মাটীতে আছাড় দিয়া আবার লুফিয়া লইতেছে। অশোকের গাড়ী এই দিক দিয়াই আসিতেছিল, জনতা দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া ভিড়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্যামেরাটি চামড়ার ষ্ট্র্যাপে বদ্ধ অবস্থায় দেহে লম্বমান, হাতে ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ড। সেই বেঁটে ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া অশোক প্রশ্ন করিল, 'কি হ'য়েছে মশায়?'

বেঁটে ভদ্রলোকের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। তিনি রাগ করিয়া কহিলেন, 'নিজের চোখ আছে দেখে নিন্ না।—'

লম্বা লোকটি এই সময় বেঁটেকে কনুই-এর ধাক্কা দিয়া কহিল, 'ঠেলছেন কেন মশায়?—'

সেই বল-হাতে ছেলেটি এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে অশোকের ক্যামেরাটি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, এইবার সে কহিল, 'আপনি ফটো তোলেন?'

অশোক উৎফুল্ল হইয়া কহিল, 'ঠিক্ বলেছ, ফটো তুলবো। কিন্তু এখান থেকে ত সুবিধা হবে না … দাঁড়াও…'

চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া অশোক কহিল,'ঠিক হ'য়েছে … চল, ওই গাছটার উপর থেকে ছবি তুলবো।—'

দুইজনে সেইদিকে অগ্রসর হইল।

ভিড়ের অন্যপাশে মেয়েরা তখন খাওয়া শেষ করিয়াছে। একজন তরুণী কহিল, 'কি রকম ভিড় হ'য়েছে দেখেছিস্—'

উত্তরা কহিল, 'তা আর হবে না, সামনে দেখবার জিনিসও ত কম নেই।—'

বিশাখা কহিল, 'কিন্তু কি যে হচ্ছে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।—'

অপর একটি তরুণী কহিল—'যে রকম ভিড় হ'য়েছে, আমার কিন্তু ভয় করছে ভাই।—'

বিশাখা কহিল, 'দেখিস্‌, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাস্‌ নে। উত্তরা, এক কাজ ক'রবি?'

'কি?—'

বিশাখা কহিল, 'ওখানে কি হচ্ছে দেখতেই হবে। ··· একটা কাজ করা যাক্‌। লতিকাদিও নেই, ড্রাইভারটাও গাছের তলায় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ··· সিডনবডীর গাড়ী আছে, ওর ছাদে এক একজন ক'রে উঠলেই বেশ দেখা যাবে।—'

'কিন্তু গাড়ীটা যে দূরে রয়েছে।—'

'একটু ঠেল্‌লেই হবে। চল্‌ ··· চল্‌ ···'

মেয়েরা নূতন মজা পাইয়া মুহূর্কলরবে গাড়ীর দিকে চলিল।

সেই ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক তখন একটি বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া রীতিমত বক্তৃতা শুরু করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রী-স্বাধীনতাই হচ্ছে এ যুগের বেকার-সমস্যার প্রধান কারণ।—'

জনতার একপাশে একটি তরুণ যুবক আড়নয়নে মেয়েদের দিকে চাহিয়া কহিল, 'ঠিক্‌, ঠিক্‌।'

'ওরাই ছেলেদের মস্তিষ্ক-চর্ব্বণ করে। ওদের বিলাসের উপকরণ জোটাতেই ছেলেরা হয় ফতুর।'

অশোক একটি গাছের নীচু ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ক্যামেরা ঠিক করিতেছিল, সেই বল-হাতে ছেলেটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ড্‌। অশোক যখন ক্যামেরার ফোকাস্‌ ঠিক করিতে ব্যস্ত, সেই সময় হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। ভিড়ের সেই বেঁটে লোকটি কিছুই দেখিতে না পাইয়া ক্রমশই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। লম্বা লোকটি যখন কহিল, 'ব্যাপার যে বেশ্‌ জ'মে উঠলো মশায়।'

বেঁটে বিরক্তভাবে কহিলেন, 'পাগল!'

তখন নানা জনে নানা মন্তব্য করিতে লাগিল। কেহ কহিল, 'বোধ হয় কংগ্রেসী।'

অপর একজন কহিল, 'উহু, আমার মনে হয় গবর্মেণ্ট স্পাই!'

'কিম্বা কম্যুনিষ্ট্‌।'

'চাঁদা চাইবার ফিকিরও হ'তে পারে।'

বেঁটে কহিলেন, 'চাঁদা! স'রে পড়ি বাবা!'

ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। একদল বাহির হইতে চায়, অন্যদল প্রবেশ করিতে চায়।

বিশাখাদের দল ইতিমধ্যে গাড়ীটা ঠেলিয়া প্রায় ভিড়ের নিকটে লইয়া আসিয়াছে। বিশাখা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া কহিতেছে, 'আর একটু, আর একটু—' যে গাছটিতে বসিয়া অশোক ছবি তুলিতে ব্যস্ত, মেয়েদের গাড়ী তাহার তল দিয়া যাইতেছিল। অশোকের দৃষ্টি ক্যামেরাতেই আবদ্ধ। বিশাখার দৃষ্টিও জনতার দিকে। হঠাৎ অঘটন ঘটিল। অশোকের ঝুলান পায়ের সহিত ধাক্কা খাইয়া টাল সামলাইতে না পারিয়া বিশাখা 'উঃ মাগো' বলিয়া সশব্দে একেবারে 'পপাত ধরণীতলে'। মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠিল। জনতার যে সকল লোক এই দিকে চাহিয়াছিল তাহারা 'হৈ হৈ' করিয়া উঠিল। অশোক ব্যাপারটা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, সে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া বিশাখার কাছে ছুটিয়া আসিল। সেই বল-হাতে ছেলেটি আগেই আসিয়াছে। ততক্ষণে বিশাখা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। লজ্জায়, ক্রোধে বিশাখার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সম্মুখে অশোককে দেখিয়া তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান রহিল না। ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া বিশাখা এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া সে সেই 'বল-হাতে' ছেলেটির হাত হইতে বলটি কাড়িয়া লইয়া অশোককে লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বলটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অশোককে আঘাত না করিয়া সেই ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোকের ভুঁড়িতে আঘাত করিল।

চারিদিকে হৈ হৈ, ছুটাছুটি, গালাগাল আরম্ভ হইল।

মেয়েরা ততক্ষণে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছে, লতিকাদিও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবার সময় বিশাখার পা হইতে একপাটি স্লিপার কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। বিশাখা কহিল, 'আমার আর একটা স্লিপার?'

লতিকাদি ধমক দিয়া কহিলেন, 'আর স্লিপার খুঁজতে হবে না, এখন চল।'

মেয়েদের গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া সুবিধা হইতেছিল না।

অশোক এতক্ষণ স্লিপারটি খুঁজিতেছিল। যখন সে কোনমতে সেটি উদ্ধার করিল তখন মেয়েদের গাড়ী খানিকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে। অশোক জুতা হাতে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে গাড়ীর নিকট আসিয়া কহিল, —'আপনার স্লিপার—'

বিশাখা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চাহিল—গাড়ী চলিয়া গেল। অশোক বোকার মত জুতা হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন রসিকতা করিয়া কহিয়া উঠিল, 'গলায় মালা ক'রে রাখুন গে।'

অশোকের চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। সে আর বিলম্ব না করিয়া নিজের গাড়ী লইয়া মেয়েদের গাড়ী অনুসরণ করিল। দুইটি মোটর সবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিয়া চলিল।

হোষ্টেলের গেটের সম্মুখে মেয়েদের গাড়ী থামিতেই বিশাখা নামিয়া পড়িল, তাহার একপায়ে জুতো। হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ সেই সময় গেটের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার একপায়ে জুতো কেন বিশাখা?'

বিশাখা লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি স্লিপারটি খুলিয়া হাতে লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ আবার কহিলেন, 'শোন, তোমার দিদি টেলিফোন করেছিলেন, তোমার ভগ্নীপতি ডক্টর রয় তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।—' বিশাখা পলাইতে পারিলে বাঁচে—কথা ভালভাবে শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

একটু পরেই গেটের সামনে অশোকের গাড়ী থামিল। সে গাড়ীর ষ্টার্ট বন্ধ না করিয়াই জুতা হাতে হোষ্টেলে ঢুকিতেছিল কিন্তু গেটের দারোয়ানজী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, 'আভি ভিতর যানেকা হুকুম নেহি।'

অশোক স্লিপার হস্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অশোকের যখন ওই অবস্থা সেই সময় গেটের ভিতর হইতে বাহির হইলেন ডক্টর রামধন রায় এবং বিশাখা। অশোক মুখব্যাদান করিয়া আগন্তুকদিগের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বিশাখা অশোকের দৃষ্টি এড়াইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু রামধনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অশোক, তুমি!'

অশোক একদৃষ্টিতে বিশাখাকেই দেখিতেছিল। সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'অ্যাঁ!—'

'এখানে দাঁড়িয়ে যে?'

'দাঁড়িয়ে? ···ও···হাঁ···অনেকক্ষণ বসেছিলুম কি না, তাই দাঁড়িয়ে পা দুটো ঠিক করে নিচ্ছি—'

'তা এত জায়গা থাকতে মেয়েদের বোর্ডিং-এর সামনে—'

'এই মানে ··· ইয়ে ··· ইনি একটা জিনিষ ফেলে এসেছিলেন

'ইনি ! কে বিশাখা ? ···'

মুগ্ধভাবে অশোক কহিল, 'বিশাখা ···'

'বিশাখাকে চেন না ··· ও যে আমার শাল্ ··· থুরি ··· স্ত্রীর বোন্ ।—'

বিশাখা ফুটপাথ হইতে চীৎকার করিয়া কহিল, 'জামাইবাবু, আপনি যাবেন ত চলুন ··· নইলে ···

'এই যাই ··· তোমার হাতে ওটা কি অশোক ?'

অশোক বিব্রত ভাবে জুতাটি লুকাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল, 'আজ্ঞে ওটা—'

রামধনবাবু কহিলেন, 'দেখিই না।' পরে অশোকের হাত হইতে জুতাটি টানিয়া লইয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, 'এ কি ব্যাপার !'

সামনেই অশোকের গাড়ী ছিল। বিশাখা সেই গাড়ীতে উঠিয়া ডাকিল, 'আসুন।'

রামধনবাবু এইবার বিশাখার দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'ও কার গাড়ী ?'

অশোক বিনীতভাবে কহিল, 'আজ্ঞে আমার।'

বিশাখা গাড়ীর ষ্টার্ট দিয়া কহিল, 'যারই হোক্, আসুন—'

রামধনবাবু কহিলেন, 'কিন্তু ···'

বিরক্তভাবে বিশাখা কহিল, 'আঃ, যাবেন ত আসুন—নইলে আমি চললুম—'

'গাড়ী চালাবে কে ?'

বিশাখা কহিল, 'কেন ? আমি। এই দেখুন না—'

বিশাখা গাড়ী ষ্টার্ট দিল। রামধনবাবু 'আহা হা কর কি ··· কর কি—' বলিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ী এবং চালক দুইই দৃষ্টির বাহিরে।

রামধনবাবুর গৃহের অভ্যন্তর। বিশাখা ও বিরজা দেবী কথা কহিতেছেন। বিরজা দেবী কহিলেন, 'ধন্যি সাহস তোর ! একা গাড়ী হাঁকিয়ে এলি ?'

'এ আর বেশী কি—আজকালকার মেয়েরা এরোপ্লেন চালায়—'

'কিন্তু অশোক কি মনে করলে বল্ ত ?'

'মনে করলে ত ভারি বয়েই গেল।'

'ওর সাথে বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে ···'

'আমি বিয়ে করলে ত ?—'

'থাম্, আর ন্যাকামি করতে হবে না—'

'যে লোক সবার সামনে আমাকে অপমান করলে—'

সেই সময় অশোক ও রামধনবাবু ঘরে ঢুকিলেন।

রামধনবাবু থিয়েটারী ভঙ্গীতে কহিলেন, 'অপমান ! কার সাধ্য তোমাকে অপমান করে ?—'

বিশাখা কহিল, 'যান্, আপনারা সকলেই সমান। যে আমাকে ইচ্ছে ক'রে গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিল, যে লোক আমার স্লিপার নিয়ে কেলেঙ্কারী করলো—তার সাথে আমি কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না—'

বিশাখা ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিল। রামধনবাবু এবং বিরজা দেবী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রামধনবাবু অশোকের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ব্যাপার কি অশোক ?'

'ব্যাপারটা একেবারে অ্যাক্‌সিডেণ্ট, স্যর ··· সব বলছি শুনুন।'

বিশাখা রাগ করিয়া চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। দিলীপ পাশের ঘরেই ছিল, সে কহিল, 'মাসী, কি হ'য়েছে ?'

'হয়েছে তোর মাথা আর মুণ্ডু !'

'সেটা ত আর নতুন ক'রে হ'তে পারে না, সে ত আছেই। কিন্তু আমি তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাতে পারি। আচ্ছা, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।'—দিলীপ চলিয়া গেল।

রামধনবাবু অশোকের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কহিলেন, 'সব ত শুনলুম, আচ্ছা এক ফ্যাসাদ্ বাধিয়েছ বাপু ! বিশাখা যেরকম জেদী মেয়ে। ··· তা আর না হবে কেন, ওঁরই ত বোন্।—' এই বলিয়া তিনি স্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

গম্ভীর কণ্ঠে বিরজা দেবী কহিলেন, 'থাক্, আর রসিকতা ক'রতে হবে না।'

ভীতভাবে রামধনবাবু কহিলেন, 'না, না ··· মানে ··· ইয়ে ··· আমি এখন করি কি ?'

বিরজা দেবী কহিলেন, 'তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, যা করবার তা আমিই করছি।'

রামধনবাবু কহিলেন, 'হেঁ হেঁ, বেশ্ ··· বেশ্ ··· আমি ততক্ষণ না হয় সেই মটন্ চপ্‌টা ···'

'চুপ্ কর।'—এই বলিয়া বিরজা দেবী হাঁকিলেন, 'বিশাখা—'

অন্য ঘর হইতে উত্তর আসিল, 'কি ?—'

—'একবার এদিকে এস।'

বিশাখা আসিলে গম্ভীর কণ্ঠে বিরজা দেবী কহিলেন, 'বিশাখা, তুমি অশোককে বল ছুঁড়ে মেরেছ ?'

উদ্ধতভাবে বিশাখা উত্তর দিল, 'বেশ্ ক'রেছি মেরেছি—উনি কেন আমায় ঠেলে ফেলে দিলেন।'

'শোন বিশাখা, তুমি যে বল্‌টা মেরেছিলে, সেটা অশোকের গায়ে লাগে নি, লেগেছে এক বুড়ো [illegible]। অশোক বাগান থেকে আসবার সময় শুনেছে, [illegible] –'গাড়ীর নম্বর নিয়ে নাও, থানায় যাব।—' তোমাদের গাড়ীর নম্বর নিতে পারে নি, নিয়েছে অশোকের গাড়ীর। যদি এই ব্যাপার নিয়ে থানায় গণ্ডগোল ওঠে—ব্যাপারটা কি রকম হবে ভেবে দেখ ত ?—'

বিশাখা কহিল,—'তা আমি কি ক'রবো ?—'

বিরজা দেবী কহিলেন, 'তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল্ শুনতে পাবেন, কাগজে হৈ চৈ হবে—তোমার কাজের জন্য হয়ত কয়েকটি নির্দ্দোষী মেয়েরও কলেজ থেকে নাম কাটা যাবে। তোমার জন্য তাদের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ত একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।—'

বিশাখা চুপ করিয়া রহিল।

বিরজা দেবী কহিলেন, 'মা এসব শুনলে কি রকম কষ্ট পাবেন ভেবে দেখ ত ? অশোকের বাবাও হয় ত—

রামধনবাবু এতক্ষণ একটি পুস্তকের শেল্‌ফে বই খুঁজিতেছিলেন। তিনি একটা কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া কহিলেন, 'তারপর তোমার দিদি—'

বিরজা দেবী বাধা দিয়া কহিলেন, 'থাম। ভেবে দেখ দেখি কি কেলেঙ্কারী হবে।—কিন্তু এখনও সময় আছে। অশোক ওখানকার থানার ইন্‌স্‌পেকটারকে চেনে। সে ইচ্ছে ক'রলে সব ঠিক্ ক'রে দিতে পারে। কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে—'

এই সময় দিলীপ আসিয়া কহিল, 'মাসী, শিগ্‌গির এস।—'

বিরজা দেবী ধমক দিয়া কহিলেন, এখন যা এখান থেকে।—দিলীপ ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল। বিরজা দেবী কহিলেন, ভেবে দেখ বিশাখা, এখনও সময় আছে।

পাশের ঘরে তখন ভীষণ কাণ্ড ! দিলীপ সেই ঘরে আসিতেই তাহার বন্ধু তপন ব্যস্তভাবে কহিল, সরে দাঁড়াও, পটকায় আগুন দিয়েছি।

'সর্ব্বনাশ, ওটা যে বোমা পটকা ! ভয়ানক আওয়াজ হবে যে।—'

দিলীপদের বোমা-পটকায় যখন আগুন জ্বলিতেছে, সেই দুঃসময়ে রামধনবাবুর ভৃত্য ব্যস্তভাবে রামধনবাবুকে খবর দিল—'বাবু, পুলিশ সাহেব অশোকদাদাবাবুর গাড়ী—

বিরজা দেবী কহিলেন, অ্যাঁ, তবে কি এটা সত্যি নাকি?—কি হবে?'

এক মুহূর্ত্তে তাঁহার নকল গাম্ভীর্য্যের খোলস তিরোহিত হইয়া মুখে চোখে নারীসুলভ আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়া উঠিল।

রামধনবাবু শেল্ফ্ হইতে পাকপ্রণালী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, 'অ্যাঁ!'

ঠিক সেই সময় সশব্দে দিলীপের বোমা-পটকা গর্জ্জিয়া উঠিল—'দুম্-দাম্—পট-পটাস্।'

রামধনবাবু ভীত হইয়া যেমনি শেল্ফ্ হইতে হাত সরাইতে যাইবেন অমনি শেল্ফ্ শুদ্ধ উল্টাইয়া তাহার দেহের উপর পতিত হইল। রামধনবাবু পাকপ্রণালী হাতে একরাশ পুস্তকের তলে সমাধি লইলেন। বিরজা দেবীও মূর্চ্ছাক্রান্ত হইয়া সোফায় এলাইয়া পড়িলেন। বিশাখা ভয় পাইয়া একেবারে অশোকের কাছে সরিয়া আসিতেই অশোক কহিল, শিগ্গির চলুন।—

ভীতকণ্ঠে বিশাখা কহিল, কোথায়?

অশোক কথা না বলিয়া বিশাখার হাত ধরিয়া এক রকম জোর করিয়াই নীচে নামাইয়া লইয়া চলিল। ··· তারপর একেবারে রাস্তায়।

অশোকের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট্।

অশোক আসিতেই সার্জ্জেণ্ট কহিল, 'You have parked the car on the wrong side, Babu?—

অশোক হাসিয়া কহিল,—'I am sorry ··· কিন্তু এর জন্য দায়ী ইনি' এই বলিয়া সে বিশাখাকে দেখাইয়া দিল।

সার্জ্জেণ্টটি হাসিয়া কহিল, 'Arrest her! Put her in the lock up!' এই বলিয়া সাহেব চলিয়া গেল।

অশোক হাসিমুখে পকেট হইতে স্লিপারটি বাহির করিয়া কহিল, 'বন্দিনীকে এটা নিতে হবে!—এবং সমস্ত ক্রটি মার্জ্জনা করতে হবে।'

লজ্জিতভাবে বিশাখা কহিল, যান্, আপনি ভারি দুষ্টু?

যাহার কিনারা নাই

শ্রীনারায়ণ গুপ্ত

সারাদিনের কর্ম্মের ক্লান্তির পর আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, শত বাধাবিঘ্ন আসিলেও বর্ষামুখর সন্ধ্যাটি ঘুমাইয়াই কাটাইয়া দিব।

সবেমাত্র চা-এর পাত্রটি হইতে পানীয়ের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত পান করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। নানা চিন্তা আসিয়া ভিড় জমাইল। ভাবিলাম, আচ্ছা বিপদ!

উঠিয়া নিদ্রা আকর্ষণের জন্য ধূমপানের আয়োজন করিতেছি, অমনি পাশের বাড়ীর গবাক্ষ-পথ দিয়া করুণ সুর ভাসিয়া উঠিল। বলা হয় নাই যে, আমার বাসস্থানের পার্শ্বে সংকীর্ণ গলির ওপাশে এক গৃহস্থ পরিবার বাস করেন! সেই স্থান হইতে প্রায়ই কথা কানে আসিয়া থাকে।

শুনিলাম—'ওগো, আমায় আজও বুঝ্লে না।' ভাবিলাম, কত কি রহিয়া গিয়াছে, যাহা হয়ত কেহই জানিল না, বুঝিল না। অমন কত মানুষ রহিয়া গেছে, যাহারা নিজেদের বুঝে নাই বা পরকেও বুঝিতে পারে নাই বা বুঝিতে চায় নাই।

এত বেশী কথা তাঁহাদের মধ্যে হইয়া থাকে যে শুনিয়া শুনিয়া আর শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

আবার পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সবে যেন নিদ্রালস মুহূর্তের অনুভূতি আসিয়া ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। আরও উচ্চৈঃস্বরে কথাজোর করিয়াই যেন আমার এই স্বল্পালোকিত গৃহে প্রবেশের দীর্ঘ-পথ পাইয়াছিল।

শুনিলাম। 'যবে থেকে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, জীবনে এমন কিছু করা বাকী রাখি নি, যাতে তোমায় সুখী করতে পারি। আজও হদিস্ পেলাম না, কি করে তোমায় সুখী করা যায়।'

ভাবিলাম, জীবনে কেহ-ই ত সুখী নয়। তবে সুখ লইয়াই ত এত দ্বন্দ্ব এত সংগ্রাম, এত বিড়ম্বনা। সুখ অর্জ্জনের জন্যই ত সহস্র দুঃখকে হাসি দিয়া বরণ করিয়া থাকি। অশ্রুর অন্তরালে জীবনের যে সত্য-কাহিনী লুকাইয়া রহিয়া গেল, তাহা বলা ত হইয়া ওঠে না। তাহারই বা এমন কিসের গরজ; যে সুখ দিবার জন্য তাহার স্বামীর নিকট এই মর্মান্তিক নিবেদন। মনকে মানাইবার জন্য একটা মন-গড়া বিচার দিয়া পুনরায় দেহ এলাইয়া দিলাম।

বাতায়ন-পথের ভাঙা-স্সারসি দিয়া যেটুকু চন্দ্রালোক বিছানার শুভ্র বস্ত্রাবরণ-চুম্বন করিতেছিল, তাহাতেও মেঘ বাদ সাধিল। সারাদিনটি আজ বর্ষাক্লান্ত। চতুর্দিক কেমন যেন থমথমে হইয়াই আছে। তবু ভাঙা মেঘের দল এতক্ষণ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এখন তাহারা ভীড় বাধাইল। ঝিরঝিম করিয়া পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আবার শুইয়া পড়িলাম।

ঘুম আর আসিল না। অবিরত সেই কথাটিই মনকে নাড়া দিতে লাগিল—"ওগো, আমায় আজও বুঝ্লে না!'

শুনিয়াছিলাম বটে যে, রমেশ রায় ধনীর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যজীবনে তিনি নাকি এক দুঃস্থ পরিবারের সুন্দরী অনূঢ়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ রমেশবাবুকে পিতার অর্জিত ধনসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। ···

পৃথিবীর পথ-চলায় দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্য ঐ নব-দম্পতিতে আঘাত দিতে শুরু করে। প্রাচুর্যে প্রতিপালিত রমেশ এ দৈন্যের মধ্যে দিশাহারা হইয়া যায়। উভয়ের কাছে যাহা-কিছু সঞ্চিত ছিল, এ দুই বৎসরে তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ তাহাদের দুইজন ও দুইজনের মাধ্যাকর্ষণ এক শিশুপুত্রের ভরণপোষণ রমেশের সম্বল এক সদাগরী দপ্তরের কয়েকটি মুদ্রায় কোন গতিকে হইয়া থাকে। তাহাদের দেখিলে হয়ত বলিবেন যে, এমন সুখের সংসার অল্পই দেখিয়াছেন। দারিদ্র্যেও যে সুস্থ প্রেম অমর-কাহিনী রচনা করিয়া যায় তাহাই হয়ত ধারণা জন্মিবে। আমি ইচ্ছা করিয়াই আপনাদের আনন্দকে ছিনাইতে চাহি না।

সত্যই তাহারা যখন সামান্যভাবে সজ্জিত হইয়া সিনেমার জন্য চলিতে থাকে, তাহাদের চলার ছন্দে এত মিল, তাহাদের ব্যবহারে এত সম্প্রীতি যে ভুল করিয়াও কেহ ভাবিবে না, সাংসারিক জীবনে একটি নারীর সহিত এক পুরুষের সম্বন্ধ নিবিড় করিবার কি প্রচেষ্টা।

ভাবিতেছিলাম বলিয়া কখন যে নিদ্রাতুর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়াছিলাম জানি না। যখন উঠিলাম দেখি বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য সমাধা করিয়া আধুনিক পিরাণ গায়ে ও আধুনিক পাদুকাদ্বয় পরিয়া ছাতিটি বগল-দাবা করিয়া আমি বাহির হইলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমিও এক ইংরেজ সওদাগরের দপ্তরে যাহারা কলম চালাইয়া থাকে—তাহাদেরই একজন নগণ্য ব্যক্তি।

অফিসে গিয়া অবধি কেমন যেন মন মানিতেছিল না আজ বড়বাবুর প্রথম কন্যার বিবাহ। তাই বেশী কাজের বা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার বালাই নাই! মেঘ্লা দিন। কেমন যেন এক অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কি যে ভাবিতেছিলাম, মনে নাই। দেখি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বেয়ারা আসিয়া জাগাইয়া দিল। মনে হইল প্রাণ ভরিয়া তাহাকে তিরস্কার করি। কিন্তু তাহাতে ত' স্বপ্নে হারাইয়া যাওয়া রাণীকে ফিরিয়া পাইব না। আহা, এতক্ষণ বলি নাই। আমি একজন এই নগরীর এক অপরিচ্ছন্ন পল্লীর ততোধিক অপরিষ্কার

মেস-ভবনের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের একজন কেরাণি হইতে পারি। তবু সহস্র অবিবাহিত কেরাণির মত একক জীবন আমার নয়। আমার ভাগ্যে স্ত্রী আসিয়াছে। একটি কন্যারত্নও। তবে স্ত্রীর ভাগ্য মন্দ বলিতে পারেন, কারণ তাহার ভাগ্যে আজও ধনরত্ন আসিল না। না আসিলেই বা কি? যে কন্যা ও যেরূপ স্ত্রী পাইয়াছি তাহা কয়জনার ভাগ্যে ঘটে।

চেয়ারে বসিয়াই ঘুমাইতেছিলাম। কখন যে কন্যারত্ন রাণু আসিয়া আমার নিকট বসিয়া কত কথা বলিয়া গেল জানি না। কত হাসি, খেলা, গল্প, গান ইতিমধ্যে হইয়া গেল যে তাহার রেশ এখনো লাগিয়া আছে। আজ ছয়মাস হইল, স্ত্রী ও কন্যার মুখ দেখি নাই। ভাবিয়াছি, পূজার বন্ধে যদি অর্থের সঙ্কুলান করিতে পারি ত একবার যাইব।

অল্প আয় বলিয়াই নহে, গ্রামের ভগ্ন এক পূর্ব্বপুরুষের ভিটায় এখনো সাঁঝের বাতি জ্বলিয়া থাকে। সেখানে বৃদ্ধা মাতা আমার স্ত্রী কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাহাদের আনিতে ইচ্ছা হয়। আনিবার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার নয় বলিয়াই মনকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি, বাপঠাকুর্দার ভিটা দেখিবে কে, যদি তাহাদের লইয়া আসি। মাঝে মাঝে মন মানে না। যে দিন তাহাদের সঙ্গ পাইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া ওঠে, সেদিন যে করিয়াই হৌক, ক্ষণিকের জন্য বুকের কান্নার বুকের মধ্যেই সমাপ্তি ঘটাইবার জন্য এক সিনেমা-গৃহে এক আমেরিকান নৃত্যগীতবহুল চিত্র দেখিয়া আসি। তাহাতে মন ভুলিতে চায় না। তবে চিত্রকথার ঘাত-প্রতিঘাতে রাণুদের কথা ভাবিবার অবকাশের পথ ক্ষণতরে বন্ধ হইয়া যায়। অফিসে ক্ষণিক নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম বাড়ী গিয়াছি, রাণু বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বলিতেছিল, তোমায় আর যেতে দেবো না বাবা। বলিলাম, 'পাগ্‌লী, এবার যে যেতে হবে, তোর সেই ছোট্ট খোকা, আর মস্ত সাদা হাঁস ফেলে এসেছি। আনতে হবে যে।'

রাণু বলিয়াছিল, 'ওদের আর চাই নে বাবা, তুমি হলেই চল্‌বে। তোমাকে নিয়েই পুতুল খেলা করবো।' মুখ-ভাঙা এক মৃৎপুত্তলীকে হলুদ-রঙের সাজ পরাইয়া আমার হাতে দিয়া ছুটিয়া গেল মিনি বিড়ালটিকে আন্‌তে।

তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া যাইতে দেখিলাম, টেবিলের সামনে দেওয়ালে যে ঘড়িটি চলিতেছিল, তাহাতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল।

এত বেশী 'ফাইল' জমিয়া গিয়াছে যে সারাদিন কাজ করিলেও শেষ হইবে না। পাশের চেয়ার আজিকার মত শূন্য! যিনি এটি অলঙ্কৃত করেন তাঁহার আজ 'ফুলসজ্জা'র জন্য ছুটি। ইনি পরাণচন্দ্র তরফদার। আজ সন্ধ্যায় তিনি চতুর্থবার পাণিগ্রহণের পর মধু-যামিনী যাপন করিবেন। তাঁহার ভাগ্যে যে তিনটি কুমারী আসিয়াছিল, তাহারা ইহলোক হইতে একে একে বিদায় লইয়াছে বলিয়া।

সারা দিন কলম চালাইবার পর দেহ যেন দুর্বল হইয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে পদচারণার পর বাসায় আসিয়া নির্জন কক্ষটি খুলিলাম, তখন অকস্মাৎ এক কালো চামচিকা ডানা মেলিয়া আমার কান ঘেঁষিয়া পলাইয়া গেল। ভয় যে না পাইয়াছিলাম তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হয়, তবু মনে সান্ত্বনা আনিয়া দেহ এলাইয়া দিলাম। পরিশ্রান্ত মন ও দেহ অপর্যাপ্ত বিশ্রাম চাহিতেছিল। নিবিষ্ট চিত্তে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সামান্য নিদ্রার রেশ আসিয়াছিল মাত্র, শুনিলাম সম্মুখের বাতায়ন-পথ হইতে এক অস্পষ্ট ক্রন্দনের বিলাপ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। পরের কথা শোনার দোষ আগে ছিল না, ইদানীং একা একা থাকিয়া কেমন যেন পরের কথাটি আড়ি পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে যখন কন্যা-রত্নটির জন্য প্রাণটি ব্যাকুল হইয়া পড়ে তখন সুবিধা পাইলেই তাহাদের উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দেখি, কখন তাহাদের শিশুপুত্রটি আমার দিকে চাহিয়া হাসিবে। মাঝে মাঝে এমন ব্যবস্থাও ঘটিয়া গিয়াছে যাহা হয়ত বা দৃষ্টিকটু। ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, তাহাদের পুত্রের সহিত আলাপ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

কানে আসিতেছিল—'সারা দিন ছেলেটা জ্বরে বে-ঘোরে কাটাচ্ছে, তোমার একটু দরদও হয় না। যদি না পার এই নাও বিক্রি কর। যে করে হোক্ একে বাঁচাও।' তারপর শুনিলাম একটা গুমরান কান্নার সুর।

কয়েকদিন দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাদের বাড়ীতে জনসমাগম, ডাক্তার বৈদ্যের ছড়াছড়ি। প্রায় দিন পনের কাটিয়া গিয়াছে। সবে ঘুম হইতে উঠিব, কানে চীৎকার ভাসিয়া আসিল। দেখিলাম সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের শিশুপুত্রটি মাতা ও পিতার গৃহবিবাদের অশান্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বিদায় লইয়াছে। কয়েক দিন পরে দেখিলাম—তাহাদের পরিবর্তে অন্য এক গৃহস্বামী সেস্থানে গৃহস্থালীর আয়োজন করিতেছেন।

ঐ অঘটনের পর হইতেই গৃহের জানালা বন্ধ করিয়া রাখিতাম। কদাচিৎ যদি বা খুলিয়া ফেলিতাম মৃত শিশুপুত্রটির হাস্যময় মুখখানি আমায় যেন ডাকিয়া কি বলিতে চাহিত।

ইহার পর হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, পূজার ছুটির পর ফিরিয়া আসিয়া অপর কোথাও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিব।

মন কিছুই মানিতেছিল না। এই অশান্তির মধ্যে মনের কোণে একটি ছোট্ট ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছিল—তাহা কন্যা রাণুর হাতছানি দিয়া আমাকে আহ্বান।

ভয় হইতেছিল যদি ডাকে সাড়া না দি, হয়ত বা আবার মূক্ মৌনতার দোহাই দিয়া আমাদের মায়া কাটাইয়া যাইতে পারে।

তাড়াতাড়ি অনেক কিছুর দোহাই দিয়া পূজার পাঁচদিন পূর্বেই ছুটি লইয়া ফেলিলাম। গৃহিণীর আদেশ অনুসারে মা'র জন্য পূজার কাপড়, গৃহিণীর জন্য তাম্বুল বিলাস, সিন্দুর ও কন্যার তালিকাটি সম্পূর্ণভাবে দেখিয়া শুনিয়া পূজার বাজার শেষ করিয়াছিলাম।

ট্রেণ চলিতেছিল। এক্সপ্রেস গাড়ী। হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া সকলকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল। রাণুর জন্য যে ডল পুতুলটি পোষাক পরিয়া বাক্সের উপর বসিয়া ছিল তাহা অকস্মাৎ জানালা দিয়া হাওয়ার দাপটে উড়িয়া গেল। প্রাণপাত করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। ঈষৎ চন্দ্রালোকে দেখিলাম ঘন বনানীর মধ্যে এক লতাগুল্মে আটকাইয়া গেল। বিবেক হারাইতে বসিয়াছিলাম বই-কি। মনে হইতেছিল ঝাঁপাইয়া পড়ি, নয়ত চেন টানিয়া দি। কিন্তু যে পশ্চিমা যাত্রিটি তাহার নবপরিণীতাকে লইয়া এই কক্ষ আশ্রয় করিয়া চলিতেছিল সে আমার ক্ষণিকের দুর্বল চিত্তকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিল।

পুতুলটি হারাইয়া যাওয়ায় মনে নানা আতঙ্কের ছায়া পড়িতেছিল। তবু মন মানাইয়া লই। গাড়ী চলিতে থাকে।

খানিক তন্দ্রার পর জনমুখরিত কিউল জংসনে গাড়ী আসিবার পর দেখি—তাহারা দুজনে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে। সিন্দুর ও অলক্তক-রঞ্জিত নবপরিণীতা পত্নী পতিটির সম্মুখে উভয়ের আহার্য রাখিয়া বসিয়া আছে। স্বামীর নেহাৎ পীড়াপীড়িতে সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া খাইতে বসিল। দেখিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর সম্পূর্ণ ভোজন সে চাতুরী করিয়া সম্পূর্ণ করাইতে পারে নাই ততক্ষণ নিজেকে অভুক্ত রাখিয়াছিল। স্বামীর প্রসাদের কণা ভোজনের পর খানিক গল্পের পর নিদ্রাতুর নয়ন দুইটি মিলাইয়া দিয়া স্বামীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।

সারারাত জাগিয়া রহিয়া ট্রেণ চলিয়াছিল। তেমনি করিয়াই প্রায় পলকহীন দৃষ্টিতে পশ্চিমা মজদুর তাহার প্রিয়তমাকে চক্ষু দুইটি দিয়া কি যে দেখিতেছিল তাহা সে-ই জানে।

* * * * *

হঠাৎ কেমন হইয়া গেলাম। চোখের সম্মুখে দেখিলাম আনমনা হইয়া প্রিয়তমা কি বলিতে চাহিতেছে, রাণু কথা কহিতেছে না; রমেশ-বাবুর স্ত্রী রক্তহীন, বিষাদ একদৃষ্টিতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছেন; আফিসের বড়বাবুর বড় আদরের নববধূ ফোপাইয়া কেন কাঁদিতেছে; দারোয়ান রামটহল আরা জিলায় পড়িয়া থাকা দুখী পত্নীটির জন্য প্রেম-বিলাপ করিয়া ভজন করিতেছে।

মন আনচান করিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল, শয্যাশায়ী জননীর জন্য এক গুচ্ছ দ্রাক্ষা আনিবার কথা ছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আফ্‌সোস্ জন্মিয়াছিল। যখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম, পূজার আকাশে যেন কেমন এক অস্বাভাবিক থম্‌থমে ভাব ছিল।

হয়ত বা জোর বৃষ্টি নামিবে বলিয়া!



কথা ঃ শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত　　　　সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এল্‌-সি

ধ্রুপদ

মিশ্রা-মল্লার—তেওরা

মেঘ-মৃদঙ্গে জাগে আনন্দ
অম্বর ধরাতলে গম্ভীর গরজনে, উল্লাসে উচ্ছল ছন্দ।
কম্পিত সব বন-বীথি, ঝঙ্কছে সকরুণ গীতি
চঞ্চল পূরবিয়া পবনে, মূর্চ্ছিল কদম্ব গন্ধ।

ধূসর দিগন্তে বর্ষার নৃত্য,
অসীম অনন্তে সন্তরে চিত্ত,
অশান্ত হরষেতে মাতি, বিদ্যুত চমকিছে ভাতি
বর্ষণ-মুখরিত রাতি, মন্দ্রিছে মল্লার ছন্দ।

অস্থায়ী

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II মা রা সা | ন্‌া -সা | রা -সা I ন্‌া সা সা | সধ্‌া -ণ্‌া | প্‌া -া I
মে ঘ মৃ দ ০ ঙ্গে ০ জা গে আ ন০ ০ ন্দ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
ম্‌া প্‌া প্‌া | ণ্‌া ধ্‌া | ন্‌া সা I সা রা রা | পমা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা I
অ ম্ব র ধ রা ত লে গ ম্ভী র গ০ র জ০ নে০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
জ্ঞমা জ্ঞা মা | রা -া | সা সা I ণ্‌া -ধ্‌া -ন্‌া | -সন্‌া রা | সা -া II
উ০ ল্লা সে উ ০ চ্ছ ল ছ ০ ০ ০ ০ ০ ন্দ ০

অন্তরা

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II { মা পা পা | ণা ধা | না না I না -র্সা -া | -ণা -ধা | না -র্সা I
ক ম্পি ত স ব ব ন বী ০ ০ ০ ০ থি ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
না র্সা র্সা | না র্সা | র্রা র্সা I না -র্সা -র্রা | -ধা -ণা | পা -া } I
ঝ ঙ্কৃ ছে স ক রু ণ গী ০ ০ ০ ০ তি ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
মা পা পা | ধা র্রা | না র্সা I ণা -ধা -ণধা | না -র্সা | র্সা -া I
চ ঞ্চ ল পূ র বি য়া প ০ ০০ ব ০ নে ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পণা ধণা পা | মা পণা | মা -পা I মজ্ঞা -মজ্ঞা -মা | -রা -সা | সা -া II
মূ০ র্চ্ছি ল ক ন্দ০ স্ব ০ গ০ ০০ ০ ০ ০ ন্ধ ০

সঞ্চারী

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II ন্া সা সা | ধ্া -ণ্া | ম্া প্া I ধ্া ণ্া ধ্া | ন্া-সা | সা -া I
ধূ স র দি ০ গ ন্তে ব র্ষা র নৃ ০ ত্য ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
সা রা রা | রা রপা | মজ্ঞা -মজ্ঞা I জ্ঞমা জ্ঞা মা | রা -সা | সা -া II
অ সী ম অ ন০ ন্তে০ ০০ স০ ন্ত রে চি ০ ত্ত ০

আভোগ

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II { মা পা পা | পণা পা | না না I না -র্সা -নর্সা | -ধা -ণধা | না -সা I
অ শা ন্ত হ০ র যে তে মা ০ ০০ ০ ০০ তি ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
না র্সা র্সা | র্রা র্মমা | র্রা র্সা I না -র্সনা -র্রর্সা | নর্সা -ধণা | পা -া } I
বি দ্যু ত চ ম০ কি ছে ভা ০০ ০০ ০০ ০০ তি ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
পা র্রা র্রা | র্রা র্রা | র্রর্সা র্রা I র্মজ্ঞা -র্মজ্ঞা -র্মা | র্রা -না | -র্সা -া I
ব র্ষ ণ মু খ রি০ ত রা০ ০০ ০ তি ০ ০ ০

\+ ২ ৩ + ২ ৩
র্সা ধণা পা | মা -পা | পণা ধণা I মজ্ঞা -মজ্ঞা -মা | -রা -ন্া | সা -া II II
ম ন্ত্রি০ ছে ম ০ ল্লা০ র০ ছ০ ০০ ০ ০ ০ ন্দ ০

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পটভূমিকা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

জাপানের কি সমাজ-জীবনে কি রাষ্ট্রীক জীবনে পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ৬৭০ খৃষ্টাব্দে ফুজিওয়ারা পরিবারের অভ্যুত্থানের কাল থেকে জাপানের রাষ্ট্রীক জীবন পরিবার-প্রভাবক্লিষ্ট ছিল। এই পরিবারের প্রভাব বার শতাব্দী কাল অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। সম্রাটের অব্যবহিত নিম্নেই সোগানদের স্থান। এই সোগানেরা ছিল জঙ্গীলাট। এদের সহযোগিতায় সম্রাট তাঁর রাজকার্য্য চালাতেন। প্রকৃতপক্ষে সোগানরাই সম্রাটের নামে রাজকার্য্য চালাত এবং তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অব্যাহত। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এই সোগান দল আবার তকুগাওয়া পরিবারের আওতায় চলে যায়—তার মানে, এক পরিবারের আওতা থেকে অন্য পরিবারের আওতায়। কমোডর এম্-সি পেরী যখন ১৮৫২-৫৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে তার রণপোত নিয়ে যুদ্ধ করতে যান তখন তিনি এই তকুগাওয়া পরিবারের প্রভাব বেশ বিলীয়মান দেখতে পান। এর কারণ বোধ হয় জাপানের এক নবীন চিন্তাধারার উত্থান, কেন না, এই নবীন মতবাদ চাইত যে জাপানের রাষ্ট্রে সোগানদের প্রভুত্ব থাকবে না। সম্রাট নিজ ক্ষমতাবলে সরাসরিভাবে রাজ্যশাসন করবেন। নবীন মতবাদের প্রভাবে ও কালের ধর্ম্মে সোগানদের ক্ষমতা ক্রমশই লোপ পেতে থাকে। পরিবার-প্রভাবের আড়াল ভেঙ্গে যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এক ঘটনায় জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় ফিরে যায়। সোগান ইয়োসিনোবুকে একটি স্মারক-লিপিতে বলা হয় যে, তিনি যেন তার কর্ত্তৃত্বপদ ছেড়ে দেন। এই স্মারক-লিপির অধিকাংশ উদ্যোক্তাই ছোটখাট স্থিতস্বার্থের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক পদ-মর্য্যাদায় এরা অনেকেই সোগানদের পরের স্তরে। দেশব্যাপী এদের শক্তি ক্রমশই সংহত হতে লাগল। তার ফলে জীর্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সোগান ইয়োসিনোবু এই পরিবর্ত্তন অনুভব করেই সম্ভবত তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এত বড় ত্যাগ নাকি খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক, সামন্ততন্ত্র ও সামরিক ক্ষমতার ভাঙ্গাগড়ার মাঝে যে সব গঠনতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেই একদিন "Charter Oath of Five Articles" নামক সনদ সৃষ্ট হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে এই সনদ প্রচারিত হয়, তার মানে যে-বৎসর সোগান ইয়োসিনোবু তাঁর সামরিক ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন তার পরের বৎসর। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, ইয়োসিনোবুর ত্যাগ-পত্র দাখিল করা মানে—একটা নবীন শক্তির উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করা। সত্যি তাই হয়েছিল। এরপর জাপানের রাজনৈতিক জীবনে কতক বণিক ও নব্য সামরিক সম্প্রদায়ের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৬১-৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানে একটি নূতন সংস্কারের চেষ্টা চলতে থাকে। সাৎসুমা, চসু, টোসা এবং হিৎসেন প্রভৃতি গোষ্ঠীর সামন্ত নেতারা সম্রাটের নিকট এক আবেদন জানায়। তারা চায় যে, দেশের একটা ব্যাপক-সংগঠন-শক্তি গড়ে উঠুক এবং সম্রাটের মাঝে সেই শক্তির উৎস কেন্দ্রীভূত হোক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অগষ্ট তারিখে জাপানে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। রাজন্যবর্গও সামন্ত নেতাদের মধ্যে যে একটা প্রভেদ ছিল তা এবারে লোপ পেল। তা ছাড়া, সম্রাটের মন্ত্রীসভার মাঝে প্রধান চারটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধির স্থান হ'ল —অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আর একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। জাপানে পূর্ব্বে যে সব ছোটখাট সামন্ত-শাসিত এলাকা ছিল—তার বেশীর ভাগ শাসনকর্ত্তারাই স্বাধীনভাবে চালাত। তাদের জীবনে যুদ্ধবৃত্তিই একমাত্র বৃত্তি ছিল। জাতীয়তার ভিত্তিতে সামরিক নীতির ব্যাপক প্রয়োগ দেখে তারা খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, তাদের চোখের সামনে এত বড় পরিবর্ত্তন তাঁদের কাছে অনেকখানি মনে হয়েছিল। তাই সাৎসুমা গোষ্ঠীরই একজন নেতা—তাকামোরি সাইগোর নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই সামন্ত বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। ইতিহাসে এর নাম হচ্ছে সাৎসুমা বিদ্রোহ। জাপানের ইতিহাসে পরিবার-প্রভাবের পরই এই সামন্ত-নেতাদের প্রভাব ছিল। কিন্তু আর একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, এই সামন্ত-তান্ত্রিক প্রভাব থেকে সম্রাটের শক্তির মুক্তির জন্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে।

এর পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যিক শক্তির গতি বোঝা যাবে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম রেলপথের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সার্ব্বজনীন শস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এর পরই আমরা জাপানকে দেখতে পাই আক্রমণকারী হিসাবে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কুরাইল দ্বীপ জাপান রুশিয়ার কাছ থেকে নেয়। চীনের কাছ থেকে আদায় করে লুচু দ্বীপ। ১৮৯৪-৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ফরমোজা, পিস্কাডোর প্রভৃতি দ্বীপগুলি নিয়ে নেয়। চীনের দাসত্ব থেকে কোরিয়ার তথাকথিত স্বাধীনতা—জাপান দাবী করে এবং কোরিয়ার স্বাধীনতা চীন স্বীকার করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাপান ব্রিটিশের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। চুক্তি থাকে যে, যদি তৃতীয় পক্ষ চুক্তিকারীদের কাউকে আক্রমণ করে তা হ'লে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। এই ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কেন না কোরিয়ায় অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ে তখন রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। এই মন কষাকষির পরিণতি হ'ল প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে জাপান ও রাশিয়া যুদ্ধে নামল। জাপান জয়ী হল; লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থারের মেয়াদী স্বত্ব পেলে; দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের উপর প্রভুত্ব পাকাপোক্ত করলে। জাপান ক্রমশ সামরিক ও আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। বিশ্ব-রাজনীতিতে তার প্রবেশ-পত্র আদায় করলে।

এশিয়ার একটি শক্তি-হিসাবে জাপানের এই বিজয় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে অনেকখানি ভাবনার কারণ হল। বোধ হয় রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীশক্তিগুলি জাপানকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে লাগল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-জাপান চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল রুশিয়াকে দাবিয়ে রাখা। ব্রিটিশ কূটনীতিতে রুশিয়া সম্পর্কে একটা ভয় বরাবরই ছিল। ইঙ্গ-জাপান চুক্তি যে শুধু জাপানকে নিজের স্বার্থের জন্যই করতে হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। জাপান যদি পোর্ট আর্থার, কোরিয়া, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় স্ব-প্রধান হয়ে ওঠে তা হ'লে ব্রিটিশেরও ঢের ভয়ের কারণ আছে। এই উদ্দেশ্য মনে চাপা রেখে প্রথমবারের ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের চুক্তির সময় রাজনৈতিক আবহাওয়া অন্যরূপ ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন ইঙ্গ-জাপান চুক্তি হয় তখন জাপান বিজয়ী। ওদিকে চীনে বিপ্লব চলছে। তা ছা'ড়া ব্যবসার খাতিরে আমেরিকা একেবারে চীনের ভিতরে ঢুকে ব্রিটিশের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। এবারে এই চুক্তির রূপ হ'ল অনেকটা আত্মরক্ষামূলক।

উভয় দেশই উভয়ের সাহায্য করবে যদি অন্য কোন শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু আমেরিকা সম্বন্ধে একটা কথা রইল এই যে, যদি জাপান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধে তা হ'লে ব্রিটিশ এই চুক্তির অনুশাসন মানতে বাধ্য থাকবে না। এ রকম অবস্থায় ব্রিটিশের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠবে না। যাক ইতিমধ্যে জাপান কোরিয়া গ্রাস করলে ১৯১০খৃষ্টাব্দে। জাপান কিন্তু বসে নেই। সে তার সাম্রাজ্যের প্রসারতা ও শক্তি বাড়িয়েই চলছে। গত মহাযুদ্ধের সময় জাপান মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের জার্ম্মান অধিকৃত দ্বীপগুলি আত্মসাৎ করলে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতে যখন জাপান ক্রমশ সম্মানে ও মর্য্যাদায় স্ফীত হয়ে উঠেছে তখন ভেতরেও তার বণিক-স্বার্থ-সমর্থিত একটা উদগ্র জাতীয়তা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছে। তা ছাড়া, নৌ ও সামরিক সেনাপতিরাও অনেকে চাচ্ছিল যে. তাঁদের ক্ষমতাটা রাষ্ট্রে স্থায়িত্ব লাভ করুক। জাপানের রাষ্ট্রে বণিক স্বার্থ ও সামরিক ক্ষমতার যে সংঘাত তা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে পর পর সাফল্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জাপানে আর একটি নবীন উগ্র মনোবৃত্তির সৃষ্টি হ'ল।

জাপানও ব্রিটিশ গঠনতন্ত্রে দুটো অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়: ব্রিটিশ গঠনতন্ত্রে রাজার স্থান অনেক পরিমাণে মন্ত্রীসভা ও পার্লামেণ্ট দ্বারা সীমাবদ্ধ করা আছে। রাজা কাগজে কলমে হয়ত অনেকখানি শক্তিশালী; কিন্তু হ'লে কি হবে, তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্য মেনে চলতে হয়। মন্ত্রীসভাকে সব সময়ই পার্লামেণ্টের বিধান মেনে চলতে হয়। জাপান গঠনতন্ত্রে প্রায় সবই এই রকম আছে: দুইটি পরিষদ আছে, ক্যাবিনেট আছে, প্রিভি কাউন্সিল আছে। রাজনৈতিক দলেরও স্থান আছে। ডাইট্ বছরে কয়েক মাসের জন্য বসে ও আলোচনা করে। কিন্তু সম্রাট যদি ইচ্ছা করেন তা হ'লে ডাইটের যে-কোন সময় অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ক্ষমতা সম্রাটের আছে।

জাপানী গঠনতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বালাই নেই, ক্যাবিনেট সর্ব্বেসর্ব্বা। ক্যাবিনেট ডাইটের কাছে দায়ী নয়। সম্রাট ও ক্যাবিনেটের ইচ্ছায় জাপানে প্রায় সবই সম্ভব। গঠনতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণে ব্রিটেনে যে জিনিস সৃষ্ট হয়েছে, জাপানে হয়েছে তার ঠিক উল্টো জিনিস। জাপানে রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের উপর প্রভুত্ব করছে। আর ব্রিটেনে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সহযোগিতায় কাজ করছে। ব্রিটিশ জাতির গঠনতন্ত্রের এইটেই সবচেয়ে মহত্তর পরিচয়। জাপানী গঠনতন্ত্রের এমন মহৎ পরিচয় নেই। জাপানে দুইটি রাজনৈতিক দল। একটি মিনসিতো অন্যটি সিউকেই। মিনসিতো উদারনৈতিকদের দল। এর ভিত্তি মূল নাগরিক সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। আর সিউকেই হচ্ছে সংরক্ষণশীলদের দল। এ রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে দুইটি সম্প্রদায়ের, এক ভূমিস্বত্বভোগী জমিদার, আর অভিজাতদের। নানা কারণে এই দল দুইটির রাজনৈতিক প্রভাব শিথিল হয়ে আসতে থাকে। ফলে জাপানের জাতীয় জীবনে সর্ব্বপ্রভুত্বকামী একক দল গঠনের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। দল এবং বিরোধী দল এই নীতিতে ডাইটের নিয়মতান্ত্রিক অনুশাসন মেনে চলা—এই নবীন আন্দোলনকারীদের চিন্তার বহির্ভূত ছিল। তারা সর্ব্বপ্রসারী শক্তির ওপর ভর ক'রে দাঁড়াতে চাইলে। জাপানে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ ন্যাশনাল মবিলিজেশন বিল নামে একটি বিল পাশ হয়। এই বিলের ধারায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা থেকে প্রমাণ হবে, কি ভাবে জাপানী রাষ্ট্র দিন দিন এক-নায়কত্বের দিকে চলে যাচ্ছে। শুধু রাষ্ট্রই জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন—আর কিছু নেই।

It was drafted by the Government Planning Board; it empowers the Government to determine wages and labour conditions. Control exports and imports. Expropriate goods, plants, houses, mines, water rights.

Fix transportation charges.
Store raw materials.
Make vocational censuses.
Subsidize industry
Censor publication."*

* *Inside Asia* by John Gunther.

উৎসব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমার বুকের বাগানে,
কোন্ সময়ের মরশুমী ফুল,
কখন ফোটে কে জানে!
ফুলেই ভরা আমার গৃহ,
ফুট্‌ছে শীতে দোপাটী ও
নিত্য নিশিগন্ধা ফুটে,
বাদল স্মৃতি জাগানে।

২

একদিকে তার গোলাপ ফোটে,
একদিকেতে চামেলি,
রামধনুকের সাত রঙেতে,
রঙিণ আমার শ্যামলী।
ভ্রমর এসে গুঞ্জে শীতে,
মোর তুলসী মঞ্জরীতে
(জবা) আমার জবার এতই কদর,
দাঁড়ান শ্যামা পা মেলি'।

৩

দোল যে আমার লেগেই আছে,
উৎসব আর ফুরায় না।
আমার প্রজাপতি-ঘুড়ির,
লাটাই সূতা গুড়ায় না।
দেব দেবতার এ দরবারে,
অকর্ম্মারি দর যে বাড়ে
রসের ভিয়ান চলতে থাকে,
উষ্ণতা তার জুড়ায় না।

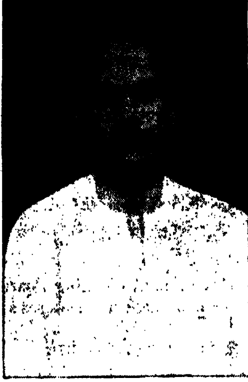
৪

কোথায় যাব এ সব ফেলে
অন্য কি কাজ আমারি?
ফুল ফোটা বুক ধার ধারে না,
রৌপ্য সোনা তামারি।
কাজ কি আমার যশ কি মানে?
অনুরাগী আমায় জানে,
হস্ত আমার হয় না মলিন,
রাজ-দুয়ারে ঘা মারি।

পূজার ছুটি

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল্

প্রতি বৎসরই পূজার ছুটীতে বেড়ানটা একটা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই এবৎসর ছুটিতে অষ্টভূজা ও বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন-মানসে বিন্ধ্যাচল যাওয়া স্থির করিলাম। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মেসার্স হীরালাল আগরওয়ালা এণ্ড সন্সের মালিক শ্রীযুক্ত জহরীলাল আগরওয়ালা ও শ্রীযুক্ত গণেশলাল আগরওয়ালা মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের অষ্টভুজা পাহাড়ে অবস্থিত "গোপাল নিকেতন" বাঙ্গলোতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আমি সপরিবারে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বে মেলে বিন্ধ্যাচল যাত্রা করিলাম। প্রত্যূষে মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌছিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মোগলসরাই একটি বৃহৎ জংসন—প্রতি বৎসরই ইহার আকার বর্দ্ধিত হইতেছে—যেদিকে তাকান যায় শুধু রেললাইনও রেলগাড়ী। আমার সঙ্গে বহু মালপত্র ও লোকজন থাকায় মির্জ্জাপুর ষ্টেশনে নামাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আমার বন্ধুবর জাহ্নবীবাবু ও গণেশবাবুর নির্দ্দেশমত ষ্টেশনে তাঁহাদের স্থানীয় মুনিবজী কিষণলালবাবু ও মির্জ্জাপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালাবাবু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে আমরা বিনা ক্লেশে ষ্টেশন হইতে মালপত্র নামাইয়া লালাবাবুর মোটরে ও অপর দুইখানি ঘোড়ার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল-পথে যাত্রা করিলাম। মোটর গাড়ীর যাত্রীরা অবিলম্বে পাহাড়ের উপরে বাঙ্গালোতে পৌছিলেন—আমরা যাহারা ঘোড়ার গাড়ীতে ছিলাম তাহারা বিলম্বে অষ্টভূজা পাহাড়ের নিম্নে মালপত্র সহ পৌছিলাম। মীর্জ্জাপুর ষ্টেশন হইতে অষ্টভূজা পাহাড় প্রায় পাঁচ মাইল পথ। পাহাড়ের নীচে দেখিতে দেখিতে বহু পুরুষ ও স্ত্রী. জমায়েৎ হইল—তাহারা সকলেই মোট বহিবার প্রার্থী—আমরা তাহার মধ্য হইতে পাঁচছয় জনকে লইয়া পাহাড়ের পথে উঠিলাম। আমার ছোটপুত্রকে পাহাড়ে তুলিবার জন্য একখানি একাগাড়ী লইলাম। পাহাড়ের নীচু হইতে আমাদের বাঙ্গলো আধ মাইল পথ হইবে—ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিয়া এক সমতল স্থান দেখিলাম—প্রথম বাঙ্গলোখানি ইদানীং 'ডাক-বাংলা' রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তৎপর কিছুদূরে একখানি বাড়ী এবং তাহার পশ্চিমদিকেই আমাদের থাকিবার 'বাঙ্গলো'—এই বাড়ীখানি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী এবং বৃহৎ হলঘর বিশিষ্ট—ইহার পশ্চাৎদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে প্রকাণ্ড ত্রিকোণ বারান্দা—এই স্থানে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনপ্রাণ শীতল হয়—অদূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। বাড়ীর নিম্নদেশে নানা শ্রেণীর গাছপালা এবং প্রকাণ্ড খাদ। এই জঙ্গলে আমরা অনেক দিন ময়ূর বেড়াইতে দেখিয়াছি। এই স্থান হইতে পাহাড় অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে প্রায় চারি মাইল রাস্তা। অথচ যেন মনে হয় অতি সন্নিকট। পাহাড়ের নীচে অনেক পাথর ব্যবসায়ী পাহাড় কাটিয়া পাথর তৈয়ার করিয়া দূর দেশে পাঠাইয়া থাকেন। আমরা মনের আনন্দে এই 'বাঙ্গলায়' দিনযাপন করিয়াছি। আমাদের একটি সঙ্গীর ব্যবহারে আমরা কয়েকদিন মানসিক অশান্তি পাইয়াছি মাত্র। এই 'বাঙ্গলা'র সীমানার মধ্যে অদূরে ছোট একতলা একখানি 'বাঙ্গলা' আছে—সেইখানি সাধারণকে ভাড়া দেওয়া হয়। এই 'বাঙ্গলা'র উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে অষ্টভূজা দেবীর মন্দিরে যাতায়াতের সোজা রাস্তা। আমরা অনেক বাঙ্গালী-ভদ্রলোক ও মহিলাকে এই পথে দেখিতে পাইয়াছি। শেয়ার মার্কেটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ জে, সি, দত্ত এই পাহাড়ে ছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিষ্টার মিঃ জে, সি, সেট মহোদয়কে ডাকবাঙ্গলায় দেখিয়াছি। এই পাহাড়ে মাত্র তিন খানি 'বাঙ্গলা' আছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব দিকে একটু উঁচু পাহাড়ে 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটি আশ্রম আছে—সেখানে অনেক বাঙ্গালী-ভদ্রলোক আসিয়া বাস করেন।



লেখক

এই পাহাড়ের দক্ষিণে একখানি মাঠ অতিক্রম করিলে একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে এবং এখানে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী, একটি বৃহৎ পাকা ইন্দারা এবং আরও কয়েকখানি পাকা বাড়ী আছে। এখানে কয়েকটি সাধু বাবাজীকে দেখিলাম। জোৎস্না রাত্রে সহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাধুদর্শন ও বিশ্রামার্থে এখানে আসিয়া থাকেন। এই স্থানটি অতীব মনোরম—চারিদিকে খোলা মাঠ ও দূরে বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী মালাকারে দৃষ্ট হয়। এই স্থানটির নাম গেড়ুয়াতলা। এই স্থান হইতে পশ্চিম-উত্তর কোণে একটি প্রশস্ত পাকা রাস্তা গিয়া অষ্টভূজার মন্দিরগাত্রে মিশিয়াছে। অপর একটি রাস্তা পূর্ব্বমুখী "কালী খোপে" গিয়াছে। কালী খোপ অতি রমণীয় দেবস্থান। গেড়ুয়াতলা হইতে রাস্তাটি দিয়া পাহাড়ের সমতল স্থান অবধি গেলে অতি বৃহৎ সোপানশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়; প্রায় ১৮০টি সুপ্রশস্ত বাঁধানো সোপান অতিক্রম করিলে নিম্নদেশে প্রাচীরবেষ্টিত একটি মন্দির দৃষ্ট হয়—এই মন্দিরে শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আছে। লোকে বলে এখানকার মা জাগ্রতা—এই স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় কথাটি সত্য। পাহাড়ের এই নিম্নদেশে আসিয়া একবার চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় যেন আমরা এক পাতালপুরীতে আসিয়াছি—চারিদিকে অভ্রভেদী অত্যুঙ্গ গিরিশ্রেণী ও তাহার উপরে অসংখ্য বৃক্ষরাজি—এইস্থানে কাহারও রাত্রিকালে আসা নিষিদ্ধ। এই স্থান রাত্রিকালে যে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা সহজেই অনুমেয়। স্থানটি শ্বাপদসঙ্কুল বলিয়া মনে



শ্রীশ্রীঅষ্টভূজা দেবীর মন্দিরের একাংশ
(পাণ্ডাঠাকুর ও তাহার সহচরসহ)

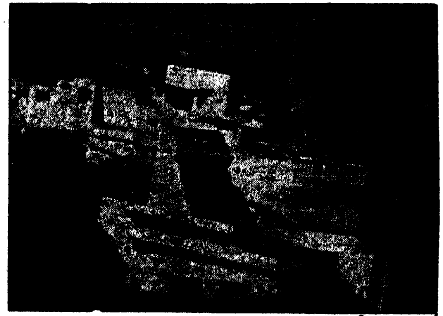
হয়। এই স্থান সাধকের রম্যস্থান। এইস্থানে কয়েকজন সাধুবাবার দর্শন পাইলাম। আমরা মায়ের ভয়ঙ্করী অথচ অভয়া মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। এখানে একটি প্রকৃতিপ্রদত্ত 'কূয়া' আছে, তাহার জলের রং দুধের ন্যায়—অনেকটা ভুবনেশ্বরের গৌরীকুণ্ডের জলের ন্যায়। এই জল অতীব হজমী। অনেক দূর দেশে এই জল পাঠান হয়। আমরা প্রত্যহ এইস্থান হইতে জল আনাইয়া পান করিয়াছি—প্রতি কলসী জল দুই আনা হিসাবে দিতে হয়। এই কালী খোপের জল ভিন্ন কয়েকটি কুণ্ডের জলবিখ্যাত হজমীকর। এই পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীশ্রী৺অষ্টভুজা দুর্গা—এই মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা দুইটি—একটি পাহাড়ের উপর দিয়া তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই রাস্তায় প্রায় পঞ্চাশটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলে মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হওয়া যায়। মন্দিরে একটি ছোট নাটমন্দির আছে—নাটমন্দির অতিক্রম করিয়া একটি দালান হইয়া একটী ক্ষুদ্র গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলে অষ্টভুজা দেবীর সৌম্য শান্ত পাষাণ মূর্ত্তি দর্শন করা যায়—এখানে পাণ্ডার কোন উপদ্রব নাই। আপনি স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন পাণ্ডা তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এখানকার পাণ্ডারা বলেন যে, এই হচ্ছে প্রকৃত বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্ত্তি। এই মন্দির হইতে উত্তর দিকে প্রায় শতাধিক প্রশস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান অতিক্রম করিলে পাহাড়ের নিম্ন দেশে পৌঁছান যায় ও সেখানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীযুক্ত ধর্ম্মশালা আছে। সেস্থান হইতে পাহাড়ের নিম্নদেশ হইয়া পূর্ব্বমুখে একটি পাকা রাস্তা বিন্ধ্যাচল ও মীর্জ্জাপুরের দিকে গিয়াছে এবং তাহার বিপরীত দিকের রাস্তা এলাহাবাদের দিকে গিয়াছে। মহাষ্টমীর দিনে এই অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরে বহুলোকসমাগম হয়। এই পর্ব্বতের উপর শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত দেবীর যুদ্ধ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। এই পাহাড়ের নিম্নভাগে বিন্ধ্যাচল গ্রাম অবস্থিত—এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্টাফিস, বাজার ও পাথরের দোকান অবস্থিত; এখান হইতে ভারতের বহুস্থানে শিল নোড়া হইতে সুরু করিয়া ছোটবড় সকল রকম পাথর রপ্তানি হয়। এখানে পাথরের দাম নাই বলিলেই হয়, কিন্তু এই জিনিষ যখন অন্য সহরে পৌঁছায় তখন তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।



অষ্টভুজা পাহাড়ের একাংশ—বিন্ধ্যাচল

এই বিন্ধ্যাচলে পতিতপাবনী সুরধনী গঙ্গার পাদদেশে হিন্দুর পুণ্যতীর্থ বিন্ধ্যবাসিনী অবস্থিত—বিন্ধ্যবাসিনী শ্রীশ্রীকালী মূর্ত্তি—সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি—দর্শনে ভক্তির সঞ্চার হয়—মন্দিরের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমমুখী এই কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজমান। ইহা বাহান্ন পীঠের এক পীঠ স্থান—এখানে সতীর দেহের একাংশ পড়িয়াছিল। উক্ত শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের মূর্ত্তি ভিন্ন আরও কয়েকটি বিগ্রহ এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই মন্দির বড় রাস্তা হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত এবং ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পাণ্ডাদের বাসস্থান। হিন্দুদের অন্যান্য তীর্থের ন্যায় পাণ্ডারা মন্দিরের চারিদিক ঘিরিয়া আছেন। এখানে প্রত্যহ মায়ের সম্মুখে অসংখ্য ছাগবলি হয়। এখানেও পাণ্ডাদের কোন জুলুম আছে বলিয়া মনে হইল না। এই স্থানে চৈত্র সংক্রান্তি ও শিবরাত্রিতে বহুলোকের সমাগম হয়। বিন্ধ্যাচল একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

অষ্টভুজা পাহাড়ে অবস্থানকালে আমরা জলের অভাব অনুভব করিয়াছি। বাঙ্গালী মাত্রই জল খুব ব্যবহার করেন—এখানে সেই জলের অভাব। এতদ্ভিন্ন খাবার যাবতীয় জিনিষ পত্রাদি পাহাড়ের নীচে শিউপুর ও বিন্ধ্যাচল হইতে আনিতে হয়। দুগ্ধ, দধি ও সময়ে সময়ে মৎস্য পাহাড়ের উপরেই পাওয়া যায়—মূল্য ও খুব বেশী নহে। এখানকার দৃশ্যও যেমন রমণীয়, স্বাস্থ্যও তেমনি অতুলনীয়। দিনের বেলা বেশ আরামেই কাটে, কিন্তু রাত্রির আগমনে, বিশেষত কৃষ্ণপক্ষে মনে ভীতির সঞ্চার আনে। সমস্ত পর্ব্বত নিস্তব্ধ ও লোকের গতায়াত নাই। অবশ্য কোথাও কোন চুরি বা ডাকাতির সংবাদ শুনি নাই, তবে নিস্তব্ধতা মনে ভীতি আনে। এখানে কোন হিংস্র শ্বাপদের সন্ধান পাই নাই বা শুনি নাই—তবে স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, তাঁহারা কখন কখন বন্য বরাহ বা ভল্লুকের কথা শুনিতে পান—চাক্ষুষ অনেকেই দেখেন নাই। স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের পক্ষে এইস্থান খুবই উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এখানে আসিবার সময় আমার বন্ধু-বান্ধবেরা এই দেশের লোকের সম্বন্ধে নানা কথা বলায় আমার মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি এখানে বাস করিয়া দেখিলাম যে এখানকার লোকেরা সদালাপী, ভদ্র ও দয়াশীল। আমরা এখান হইতে একদিন ট্রেণ যোগে এলাহাবাদে প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে স্নান ও পিণ্ডাদি দান করিতে গেলাম। এই পুণ্যতীর্থ অতীব রমণীয়—একদিকে বেগবতী পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্রোতে বালুরাশি বিধ্বস্ত হইতেছে, অপর পার্শ্বে শান্তশীলা পুণ্যসলিলা যমুনা ধীর স্থির ও কচ্ছপসমাকুল। এই সঙ্গম স্থানে নৌকায় আসিতে হয়—নৌকার মাঝিদের সঙ্গে বড়ই দর-কষাকষি করিতে হয়। এই কারণে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা ঘাটে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পরে মাঝিরা নরম হইল। নৌকায় এক ঘণ্টা যাপন বেশ আরামদায়ক। সঙ্গমের পাণ্ডারা কাঠের পাটাতন করিয়া শীকার সন্ধানে বসিয়া থাকেন। এখানে নাপিতেরা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করে। "প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, মরগে পাপী যথা তথা"—এই প্রবাদের সুযোগ লইয়া নাপিতেরা টাকা সিকি হাঁকিয়া বসে। এখানে পাণ্ডাদের ও তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গদের দৌরাত্ম্য একটু বেশী। যা' হোক আমরা দুই দিকে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনায় স্নান করিয়া ভোজ্যাদি দান কার্য্য সমাপন করিয়া আবার নৌকা যোগে প্রায় তিন ঘণ্টা পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই সঙ্গম স্থানের উত্তর পাড়ে পাণ্ডাদের অসংখ্য পাকা বাড়ী দেখা যায় এবং অদূরে বি, এন, ডবলু রেলওয়ের গঙ্গার উপরিস্থিত বৃহৎ পুল দৃষ্ট হয়। এই সঙ্গমে আসিবার কালে এলাহাবাদ"কোর্ট বা দুর্গ দেখা যায়। এই কোর্ট মোগল রাজত্বের রুচি ও স্থপতিবিদ্যার পরিচয় দান করিতেছে। বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন



অষ্টভুজা পাহাড়ের উপর হইতে শ্রীশ্রীঅষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের দৃশ্য

এবং এখনও ইহা অটুট অবস্থায় পুরাকালের কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। এই দুর্গ মধ্যে হিন্দুর অমর তীর্থ "অক্ষয় বট"—সহস্র সহস্র বৎসর অক্ষয় অমর হইয়া বিরাজমান আছে। ইহার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনা যায়, তাহা লিখিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা এলাহাবাদে একদিন থাকিয়া তৎপর দিবস বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা একদিন মীর্জ্জাপুর শহর দেখিলাম—শহরটি বেশ মনোরম—পুণ্যতোয়া গঙ্গার উপরে অবস্থিত এবং বহু ধনী ব্যবসায়ীর বাসস্থান। এখানকার গালিচা ও সতরঞ্চ বিখ্যাত। এখানে বহু গালা-ব্যবসায়ী আছেন এবং তাঁহাদের একটি সভা এখানে আছে। কলিকাতার বাজার দরের সঙ্গে সর্ব্বদা আদান-প্রদান চলিতেছে। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ গালা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিদাস আগরওয়ালা ও তাঁহার পুত্র লালাবাবু ওরফে শ্রীরাম ঘনশ্যামসুন্দর মহাশয়ের আতিথেয়তা ও সৌজন্যে আমরা বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসায় আমরা অষ্টভুজা পাহাড়ের নীচ ভাজিতে বাধ্য হইলাম এবং কয়েকদিন পুণ্য ভূমি বারাণসী ধামে থাকিবার মানসে কাশীধামে আসিলাম। এখানেও আমার মক্কেলের সৌজন্যে তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকা ঠিক গঙ্গার উপরে মীরঘাটে পাইলাম। এই বাটীর মালিক কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ৺গণপৎ রায় খেমকা মহাশয় এবং তিনি এই বাটীর নিম্নে অহোরাত্র হরিনাম কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়া শতাধিক অনাথা বিধবার ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই নিষ্ঠাবান মাড়োয়ারী ভদ্রলোকই বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের ঠিক পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্রীশ্রী৺সত্যানারায়ণ জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কাশীধাম চির নূতন এবং হিন্দুর পুণ্যতীর্থ। এখানে কয়েকদিন বেশ আনন্দে পুণ্যতোয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। তৎপর আমরা কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার অন্নকূট মহোৎসব দর্শন করিয়া ২৭শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম।

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ষড়জ গ্রাম রাগ

ষড়জ মধ্যমা জাতি হইতে 'ষড়জ গ্রাম' রাগ উৎপন্ন। তার ষড়জ ইহার গ্রহও অংশস্বর, ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ, মধ্যম ইহার ন্যাসস্বর, ষড়জ অপন্যাস স্বর। অবরোহি বর্ণে প্রসন্নান্ত অলঙ্কার। ইহাতে কাকলী নিষাদ ও অন্তর গান্ধার ব্যবহৃত হয়। ইহার মূর্চ্ছনা ষড়জাদি—উত্তর মন্দ্রা। নাটকের প্রতিমুখ নামক সন্ধিতে বীর রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে এই রাগ প্রযুক্ত হয়। এই রাগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা গুরু। বর্ষাকালে দিবসের প্রথম প্রহরে এই রাগ গেয়। এই রাগের আলাপ নিম্নলিখিতরূপে করিতে হয়। স স বী ম ধ ম বি স সনি ধাপা ধা ধ বি গ সা | রিগা সাম গ প নি ধ নি স। স মা সা | স গ রি গপ নিধপ মা মা—

এই রাগের করণ—বী বী গা ধা গ রি সা সা নী ধ পা পা। বী বী গ ধা গ বী সা সা সা (ষড়জম্) স সা গা নী ধা বী বী গ ধা গা বী সা সা নি ধা পা পা | রী রী পা পা নি ধা নি সা সা সা সা রি স রি পা ধা নিধ পা মা মা মা মা

রী	রী	গা	ধা	গা	বী	সা	সা	১
স	জ	য়	তু	ভূ	•	ত্তা	•	
নী	ধা	পা	পা	রী	রী	গা	ধা	২
ধি	প	তিঃ	•	প	রি	ক	র	
গা	রী	সা	সা	সা	সা	সা	সা	৩
ভো	•	গী	ন্দ্র	•	কু	•	ন্ত	
সা	সা	গা	ধনি	নী	নী	নী	নী	•
লা	•	ভ	র•	ণঃ	•	•	•	
গা	রিগ	ধা	ধা	গা	রী	সা	সা	৫
গ	জ•	চ	•	র্ম্ম	প	ট	নি	
নী	ধা	পা	পা	রী	রী	পা	পা	৬
ব	স	নঃ	•	শ	শা	•	ঙ্ক	
নী	ধা	নী	সা	সা	সা	রি	সরি	৭
চূ	•	ড়া	ম	নিঃ	•	•	• •	
পা	ধা	নিধ	পা	মা	মা	মা	মা	৮
শ	•	• •	•	•	•	•	•	

শুদ্ধ কৈশিক রাগ

কার্ম্মারবী ও কৈশিকী এই দুই জাতি হইতে শুদ্ধ কৈশিক রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তার ষড়জ ইহার গ্রহও অংশস্বর। পঞ্চম ইহার ন্যাসস্বর; এই রাগে কাকলী নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবরোহী বর্ণে প্রসন্নান্ত অলঙ্কার, ইহার মূর্চ্ছনা ষড়জাদি-উত্তরমন্দ্রা। ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ। এই রাগ মঙ্গল গ্রহের প্রিয়। শীত ঋতুতে দিনের প্রথম প্রহরে নাটকের নির্ব্বহন নামক সন্ধিতে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে এই রাগ প্রয়োগ করিতে হয়।

ইহার আলাপ—সা সা গা মা গারি গা মা সা নি সা বি সা ধা মা ধা নী | ধা পা মা গা মা পা পা—

স স স স বি বি স স রী রী গা গা স স স স ম ম রি গ ম স স রী রী স নি স স স স রি রি ম ম প প ধ ম ধ স ধ নি স স স স রি রি গ গ স স প প ধ ম গ ম প প প প—ইতি বর্ত্তনী।

সা	সা	সা	সা	সা	সা	নী	ধা	১
অ	•	গ্নি	•	জ্বা	•	লা	শি	
সা	সা	রী	সা	সা	রী	গা	মা	২
খা	•	কে	•	শি	•	•	•	

মন্তব্য—রাগবিবেকাধ্যায়ের প্রারম্ভিক প্রথম প্রবন্ধ ১৩৩৭ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই দ্বিতীয় অংশ।

মা	গা	রী	সা	সা	সা	সা	সা	৩
মাং	•	•	স	•	শো	ণি	ত	
সা	সা	সা	সা	নী	সা	নী	নী	৪
ভো	•	•	জি	ণি	•	•	•	
মা	মা	গা	রী	মা	মা	পা	পা	৫
স	•	র্বা	•	হা	•	রি	ণি	
ধা	নি	পা	মা	ধা	মা	ধা	সা	৬
নি	•	র্মাং	•	সে	•	•	•	
সা	সা	সা	সা	নী	ধা	পা	পা	৭
চ	•	•	র্ম	মু	ণ্ডে	ন	•	
ধা	মা	গা	মা	পা	পা	পা	পা	৮
সো	•	•	স্তু	তে	•	•	•	

ভিন্ন কৈশিক মধ্যম রাগ

ষড়জ-মধ্যমা জাতি হইতে 'ভিন্ন কৈশিক মধ্যম' রাগ উৎপন্ন। ষড়জ ইহার গ্রহও অংশস্বর, মধ্যম ন্যাসস্বর, অথবা মন্দ্র ষড়জ ন্যাস স্বর, মূর্চ্ছনা ষড়জাদি। সঞ্চারিবর্ণে প্রসন্নাদি অলঙ্কার, ইহা কাকলী নিষাদযুক্ত একটি সম্পূর্ণ রাগ। ইহা চন্দ্রগ্রহের প্রিয়। দানবীয়, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে দিবসের প্রথম প্রহরে এই রাগ প্রযোজ্য।

ইহার আলাপ—সা নি ধা সা মা | ম ম ধ ম ম ম ধ ম গা মা ধা ধা নি ধা স স সা গা মা ধা নী ধা সা সা ধা মা ম গা স গা স সা ধা মা মা | সা গা মা ধা নী ধা সা সা ম ধা প মা প মা মা |

ইহার বর্ত্তনী—স স নি ধ স স ম ম ম ধ ম গ ম ধ নি ম ম | নি ধা নী ম ধ নি স | নি ধ নি স স স স স স ধ ধ | ম ম গ স স গ মা সা গ গ ধা ধা ধ ধ ম ম ধ ম গ ম ম ধ স স | স স ধ ম ধ প মা পা মা মা |

সা	সা	নী	ধা	সা	সম	মা	মা	১
বৃ	হ	দু	দ	র	বি	ক	ট	
মা	ধা	মা	গা	মা	ধা	নী	মা	২
গ	•	ম	ন	জ	র	ঠ	বি	
মা	নী	ধা	নী	মা	ধা	নী	নী	৩
ভ	•	গুং	•	সু	বি	পু	ল	
নী	ধা	নী	সা	সা	সা	সা	সা	৪
পী	•	না	•	ঙ্গম্	•	•	•	
মা	মস	সা	সা	নী	ধা	পা	পা	৫
অ	রিং	দ	ম	ন	বি	ষ	ম	
ধা	নী	সা	মা	গা	বী	সা	মা	৬
লো	•	চ	নং	সু	র	ন	মি	
মা	মা	মা	মা	ধা	নী	মা	মা	৭
তং	বি	না	•	য়	কং	•	•	
সা	সা	ধা	নী	মা	মা	পা	মা	
ব	•	•	•	ন্দে	•	•	•	

ইতি আক্ষিপ্তিকা। ইতি ভিন্ন কৈশিক মধ্যম।

ভিন্ন তান-রাগ—

মধ্যমা ও পঞ্চমী জাতি হইতে 'ভিন্ন তান' রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চম ইহার অংশও গ্রহস্বর। ঋষভ স্বর এই রাগে অল্প ব্যবহৃত হয় বা বর্জ্জিত, মধ্যম স্বরেরও ব্যবহার অল্প। মধ্যমই ইহার ন্যাস স্বর। ইহাতে কাকলী নিষাদের ব্যবহার আছে। সঞ্চারি বর্ণে প্রসন্নাদি অলঙ্কার। মূর্চ্ছনা হৃষ্যকা। এই রাগ মহাদেবের প্রিয়। দিবসের প্রথম প্রহরে করুণ রসে এই রাগ গেয়।

এই রাগের আলাপ—পা নী সা গা মা পা ধা পা ম গা মা মা | ম ম ধ ম ম গ সা সা স স স মা গ ম পা পা পা নী সা গা মা ধা পা ম গ ম মা | ম ম ধ প ধ ধ স স পা পা স স স মা গ ম পা পা ম ম প প ধ ধ নি নি প ধ ম ধ ম গ গ সা সা গ স গ (পঞ্চম) পা পা পা নী সা গা পা পা ধা পা ম গ মা মা।

ইহার বর্ত্তনী—পা পা নী নী স স গ গ পা পা নী পা নী সা গ গ স গা মা পা ধা পা ম গা মা পা পা (পঞ্চম) পা সা সা ধা মা পা পা (ষড়জ) স স গ গ (পঞ্চম) নী সা গা মা পা ধা ম গা মা মা মা।

পা	পা	নী	নী	সা	সা	গা	গা	১
হ	র	ব	র	মু	কু	ট	জ	
সা	গা	মপ	মগ	সা	সা	সা	সা	২
টা	•	লু•	লি•	তং	•	•	•	
সা	গা	মা	পা	ধা	পা	মপ	মগ	৩
অ	ম	র	ব	ধূ	•	কু•	চ•	
সা	গা	মা	পা	পা	পা	পা	পা	৪
প	রি	ম	লি	তং	•	•	•	
ধা	পা	সা	মা	পা	পা	ধা	ধা	৫
ব	হু	বি	ধ	ক	সু	ম	র	
সা	সা	পা	পা	ধা	পা	মা	গা	৬
জে	•	রু	ণি	তং	•	•	•	
ধা	পা	পম	মপগ	সা	গা	মা	পা	৭
বি	জ	য়•	তে••	গ	•	ঙ্গা	•	
ধা	পা	মগ	মা	মা	মা	মা	মা	৮
বি	ম	ল•	জ	লং	•	•	•	

ইতি আক্ষিপ্তিকা। ইতি ভিন্ন তান রাগ।

গৌড় পঞ্চম রাগ

ধৈবতী ষড়জ, মধ্যমা জাতি হইতে গৌড় পঞ্চম রাগ উদ্ভূত। ধৈবত ইহার অংশ ও গ্রহস্বর। মধ্যম ন্যাসস্বর। এই রাগে পঞ্চম স্বর বর্জ্জিত। এই রাগ শনিগ্রহ ও কন্দর্পের প্রিয়। ইহার মূর্চ্ছনা ধৈবতাদি। কাকলী নিষাদ ও অন্তর গান্ধার এই রাগে ব্যবহৃত হয়। আরোহি বর্ণে প্রসন্ন-মধ্য অলঙ্কার। ভয়ানক, বীভৎস ও করুণ বিপ্রলম্ভরসে গ্রীষ্মকালে দিবসের মধ্যবর্ত্তী দুই প্রহরে উদ্ভট নৃত্যের সহিত এই রাগ গেয়।

ইহার আলাপ—ধা মা ধ ধ ম ধ ধ ধ নি ধ নি ধ ধধ নি স রি গ গ রি

গ রি গ গ ধ ধ নি ধ ধ নি ধ ধ ম গ ম ম গা মা ম (ধৈবত) ধ ধ ধ ধ ধ নি ধ নি ধ ধ ধ ধ ধ স ধ নি ধ স রি গ ধ নি ধ ধ ধ নি ম ম নি ধ স গ স ম গ (মধ্যম) ম ম ম ধ মধ ধ ধ নি ধ নি ধ ধমা ধ ধ মা ধ ধ নি ধ নি ধ ধ ধ ধ ম ম ধা ম ম ধ ধ নি ধ নি ম ধ ম গা গ স স গ সা | ধ ধ নি ম ম নি ধ গ স স ম গ ম (মধ্যম) ম ম ম ধ ম ম ধ ম ম ধ ধ নি ধ নি ধ মা ম ধ নি ধ নি ধ নি ধ ধ স ধ ধ ধ ধ স ধ ধ নি ধ নি ধ নি ধ ম ধ ম গা গ স গ ম গ ম ধ ধ ধ ধ ধ নি ধ নি ধ গ স স ম গ ম ম ধ স রি ম ধ ম গ ধা ধ ম ধ ধা ধা | ধ ধ নি ধ ধ স ধ ধ নি ধ ধ ধ ধ ধ নি ধ ধ ধ ম ধ স রি ম গা মা মা মা ধ ধ ধ ম ধ ধ ধ ধ ধ ধ ধ ধ ধ ধ ধ নি ধ নি ম ধ ম গা মা মা ॥

ইহার করণ—ম ধ ম ধ ধা ধ নি ধা স ধ নি ধা ধ স রি গা ধ নি ধা ম গা মা মা। ধ ম ধ মা।• (মধ্যম) ম নি ধ ধ রি ধ

ধা ম ম ম ধা গ মা ধা নি ধ ধ নি ধা ম ম ম স গ ম ধা ধ নি ধ নি ধ নি ধা ধ ধ ধ স। ধ নি ধা ধ স রি গ ধ নি ধা ম ধ স রি ম ধ ম ধ ধা ধ ধ ধ নি ধ নি ধ নি ম ধ মা মা গা মা মা।

ধা	ধা	ম	ধা	সা	সা	সা	সা	১
ঘ	ন	চ	ল	ন	থি	•	ন্ন	
ধা	ধা	ধা	ধা		ধা	সা	ধা	২
প	•	ম্ন	গ	রি	ষ	ম	বি	
সা	সা	মা	মা	মা	ধা	ধা	মা	৩
নিঃ	•	শ্বা	•	স	ধু	•	ম	
ধা	ধা	মা	গা	মা	মা	মা	মা	৪
ধু	•	ভ্র	শ	শি	•	•	•	
মা	মা	মা	গা	ম্যা	ধা	ধা	ধা	৫
বি	র	চি	ত	ক	পা	•	ল	
ধা	নী	ধা	মা	মা	মা	মা	গা	৬
মা	•	লং	•	জ	য়	তি	জ	
মা	ধা	ধা	ধা	ম	মা	মা	মা	৭
টা	•	ম	ণ্ড	লং	•	•	•	
ধা	ধা	ধা	ধ নি	গা	মা	মা	মা	৮
শ	•	•	••	স্তাঃ	•	•	•	

ইতি আক্ষিপিকা (ইতি গৌড় পঞ্চমঃ)

গৌড় কৈশিক রাগ

কৌশিকী ও ষড়জ মধ্যমা জাতি হইতে কৈশিক রাগ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার গ্রহ ও অংশ স্বর ষড়জ, পঞ্চম ন্যাসস্বর। ইহাতে কাকলী নিষাদ ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ। ইহার মূর্চ্ছনা ষড়জাদি আরোহি বর্ণে 'প্রসন্নাদি' অলঙ্কার। এই রাগ শঙ্করের প্রিয়। করুণ, বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে শীত ঋতুতে দিনের দ্বিতীয় মধ্যম যামে এই রাগ গেয়।

ইহার আলাপ—সা সা সগ সনি স রী ম গ গ স মম পম নিপ পগম গ রিরি গ ম ম স। গ মা স নি স রি ম গ প ম পপ রিম পা ধা ধা মা পা ধা নি রি না পা ধা সনি সা সা। সা সা (ষড়জ) স স স স স স স স ম গ স গ স নি সা সা। সা সা স স গ স স ম গ স রি গ স গ স ধ স প৯ পমা পা পা ধম পা পা গম গ গ ম (পঞ্চমী) পপ গগ মম গগ গমগ। পম মগ মগ গ রী রী রিগ মম (ষড়জ) সসসস সসস সস গস ধসা গধ স রী মা মা প ম পা পা—ইত্যালাপ—।

ইহার করণ—নিস নিধ সস রিম রিগম মম গপ পনিগা পমগারি প রী রী রিম রিম মমরী মরিগসা মপধস রিমা পমা পা পা রিম রিম ম পা পা রিম পনি রী রী রিমসা পধ সস সনিসা সম রিগা সগ স নি নী নিনিনি স ধধ স ধ মম পপপা গাগ গনি পপ ধনী গগগপ গ মা গা রী রীরিগা মা ম (ষড়জ) স স নী নিসা গা রী রিম গম সা গা মা পা পনি ধনি গমগ ধধম রি স গা সগ সনি ধসা ধস রিমা পম পা পা পম ধমা রিমা রীসধ সারী রিম মম মগ সা ধধ সস মম পপ মম পা পা পপ পগ মম পা পা পা।

সা	সা	সা	সা	নী	নী	নী	না	১
ভ	•	স্মা	•	ভ্য	•	ঙ্গ	বি	
নী	নী	সা	রী	রী	গা	সা	সা	২
ভূ	•	ষি	ত	•	দে	•	হং	
সা	সা	রী	সা	রী	সা	রী	সা	৩
সু	র	ব	র	সু	নি	স	হি	
রী	রী	রী	রী	মা	মা	মা	মা	৪
তং	•	•	•	ভী	•	ম	ভু	
সা	সা	সা	সা	রী	রী	রী	রী	৫
জং	৪	গ	ম	বে	•	ষ্টি	ত	
সা	সা	সা	সা	মা	মা	রি	মা	৬
বা	•	ছং	•	সু	র	ব	র	
রী	মা	মা	মা	পা	পা	পা	পা	৭
ন	মি	ত	প	দং	•	•	•	
রী	রী	রী	রী	পা	পা	পা	পা	৮
চ	•	ন্দ্র	ক	লা	•	ক	র	
সা	রী	রী	রী	সা	সা	নী	নী	৯
স	•	স্তু	তি	ধ	ব	ল	•	
নী	নী	সা	নী	রী	মা	রী	গা	১০
সু	র	স	রি	দ	•	সু	ধ	
সা	সা	সম	সরি	সা	সা	সধ	ধনি	১১
রং	০	••	••	প্র	ণ	ম	ত•	
পধ	পধ	পপ	পপ	মপ	মপ	পা	পা	১২
স•	ত•	ত•	••	নি•	ষ্ক•	লং	•	
পধ	পধ	রিম	পম	ধা	সা	সা	মা	১৩
স•	ক•	ল•	••	প	র	ম	•	
ধা	নী	পধ	মা	পা	পা	পা	পা	১৪
শি	ব	মৎ	জে	য়ং	০	•	•	

বেসর ষাড়ব

ষড়জ মধ্যমা জাতি হইতে 'বেসর ষাড়ব' রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যম ইহার অংশ গ্রহ ও ন্যাসস্বর। ইহার মূর্চ্ছনা মধ্যমাদি কাকলী নিষাদ ও অন্তর গান্ধারের ব্যবহারে এই রাগ শ্রুতিমধুর হয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ। আরোহিবর্ণে প্রসন্নাদি অলঙ্কার। এই রাগ শুক্রগ্রহের প্রিয়। শান্ত, শৃঙ্গার ও হাস্যরসে দিবসের শেষ প্রহরে এই রাগ গেয়।

ইহার আলাপ—মা মা রী গা সা রী গা মা মা গা মা সা।

মামারী মা পা ধা নী প নী ধা মা নী ধা সা সা। সা ধা সা রী গাধা সনী ধা নী ধ (পঞ্চম) পা পা স ধা স গা ম রী গা রী মা মা ম রী গা রী ধা মা ম রী ম গা গ মা সা সা স রী গ মা ম গ স নি ধ নি ধস

ধস নিধ নিধা (পঞ্চম) প স ধগ স ম গ রী ম গা মা মা মা মা সা মধা নী সা রী গা মম গ সা নী ধ নি ধ স নি ধা নী ধ (পঞ্চম) পা পা। প প নি ধ ধ নি প প নি ধ ধ নি মা মা। ম ম নি ধা ধ ধ গ মা।

স স ম রী রী গা মা মা। ম রি রি গ সা সা। স রি রি গ মা মা ম রি রিগ রি রি ধা মা ম রি রি গ রি রি ধ স রি রি সা রি গ স গা স ধ নি ধ স স ধ নি ধ গ গ ধ নি ধ ধ স ধ নি ধ ম ম ম স স নধ

ম রি রি ম রি গ স গ সা ধ নিধ স নি ধা নি ধা (পঞ্চম) পা পা পা প প প নি ধনি ধ ধ নি ধ নি মম নি ধ ধ স স স গ ধ ধ স ধ ধ মা রি গ স গ স ধ স রি গ ম রি গ মা মা। ম রি গ সা রি গ মা মা ম রী গ রি গ মা। স রি গ রি ধ রি রি রি ধ রি রি রি মা মা। গ ম ম গ ধ ধ ম ধ ম রি রি ম রি গ স গ স ধ নি ধ সনি ধ নি ধা। (পঞ্চম) পা পা। প প প প প প। নিধ নিধ ধনি ধনি ম ম নি নিধ নিধ ধ মা গ স গ স ধ নি ধ স নি ধ নী ধ স রি গ গ রি সনি ধা সা প ধা স রী ম গা মা মা।

ইহার করণ—ম ধা ম ম গ মা মা ম ম গ ম মা। স স ম রি মা ম ম ম রি ম মা ধ ধা নি ধ নি ধা ধ স ধ নি ধা ধা ধা ম রিগ মগ মা মা (ঋষভ) রি ধ রী রী রী রী ধ রী রী রী রী গ রি গ মা মা নী প ধা মা রিগ রিগ রিগ সা। সম। (ধৈবত) নিধ ধস ধনি ধা পা পা। পপ (ধৈবতং) ধ নী নী মা মা। মা রি মা রি গ ম নি ধা ধা ধা (ধৈবতং] ধ নি ধ গ (ষড়জ) সা নী ধা সা রী গা মা ম ম ধা রি রি রি গ গ ম ম রি গ রি নি পধ মম রিগ রিম রিগা সসা ধনি ধস ধনি ধধ (পঞ্চম) পা। (ধৈবতং) ধগ সস মগ রিগ মা মা গা মা মা।

মা	গা	রী	সা	রী	গা	রী	সা	১
ই	০	ন্দ	গো	•	ব	ম	নি	
রী	সা	রী	গা	মা	মা	মা	মা	২
দা	০	রু	সং	•	চি	য়ং	•	
মা	রী	গা	সা	নী	ধা	সা	সা	৩
ফু	ল্ল	ক	•	ন্দ	ল	সি	•	
পা	ধা	সা	রী	গা	মা	মা	মা	৪
লি	•	ঙ্ক	সো	•	হি	য়ং	•	
রী	রী	পা	পা	মা	পা	ধা	নী	৫
ম	•	ত্ত	দ	•	ঙ্কু	র	নি	
পা	ধা	মা	গা	রী	গা	রী	সা	৬
না	•	য়	সো	•	হি	য়ং	•	
মা	রী	গা	সা	নী	ধা	সা	সা	৭
কা	•	ন	নং	•	সু	র	হি	
পা	ধা	সা	রী	গা	মা	মা	মা	৮
•	০	ন্ধ	সী	০	য়	লং	•	

ইতি আক্ষিপ্তিকা। ইতি বেসর ষাড়বঃ।

বোট্ট রাগ

পঞ্চমী ও ষড়জ মধ্যমাজাতি হইতে 'বোট্ট' রাগ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার গ্রহ ও অংশস্বর পঞ্চম। ন্যাসস্বর মধ্যম। ইহাতে গান্ধার অল্প ও কাকলী নিষাদ ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ। আরোহিবর্ণে প্রসন্নান্ত অলঙ্কার। এই রাগ মহেশ্বরের প্রিয়। হাস্য শৃঙ্গার রসে ও উৎসবে দিনের শেষ প্রহরে এই রাগ গেয়।

এই রাগের আলাপ—প মি সা সা ধ গা রী পা নী ধা পা মা গরী ম মা মা মা। ম পা পা প নি নি মা ম ধা সা স নি ধা ধ ম গা ম গা রি রি সা রী প মা পা পা প সা স প প ম প প ম প ম প প মা। প ধ নি প ধ ম ধ স গ রি রি রি প রি রি প রি প প প (ষড়জ) সা। স স গ রি পা (পঞ্চম) প প প প ম গ রি ম গা মা মা ম ধা ধা ধ ধ নি ধ নি সা ম ম ধ ধ স স রি রি গ গ রি গা গ (পঞ্চম) প প স স ধ স নি ধ ধ ধ ধ ম স মা ম গা রি রি ধ রি রি ধ রি রি (ঋষভ) রি রি প রি রি প পা প নি ধা পা মা গ রি ম গা মা মা। গা ম। ম গ ম ম গা ম ম গ প ম ম গা গ রী রি রি রি ধ ধ স গা গা রী। রি স ম ম গ গ প ম প প ম প পা পা প ম প ধ নি ধ নি মা মা ম ধা ধ মা ম ধা সা রী গা গা পা প রি পা প ম প ধ নি প ধ ম ধ মা বি গ ম পা ধা পা মা গা রি প গা মা ম (মধ্যম) ম গা ম ম গ ম ম গ ম প ম গা গ প মা গা মা পা পা প নি ধ ধ নি ধ নি নি পা নি ধ ধ স স স ধ ধ গ রী গ রি রি গ পা প প ধ প ধা প ধ স স ধ ধ গ স গ। সা স স ম রি রি প ম প ম ম পা পা প ম ম প প ধ ধ স স পা। স স স ম স ম রি রি গা গ স স প প প প ধ ধ নি প ধ ম ধ ম গ রি ম গা গ। স গ স ধ স প প ধ ধ স রি রি প গ প প প ম গ রী, ম গা গ গা। মা মা গ ম ম (মধ্যম) মা প নি ধ নি রি ধা ধ নি প প প ধ ম ম রি গ রি ম রি গ। স সা স স স গ স স গ ধ ধ ধ গ স স স ম রি রি রি প রি পা প। পা প স ধ সা স পা প (ষড়জ) রি স রি রি পা প। প ম ম প প ধ ধ ধ ধ নি প ধ মা ম রি রি ম ম রি রি গ রি প রি প প প প প (ষড়জ) স সা স ধ ধ গ ধ ম গ রি পা পা পা ধা ধা পা পা সা সা পা পা ধ ধ প প ম ম গ গা গা রি ধা রি রি ধ রি রি (ঋষভ) রি রি পা (পঞ্চম) প ধা পা মা গা রী গা রী স গা মা মা।

ইহার করণ—ধা ম ম গ ম মা ম ম গ ম মা (পঞ্চম) প গ ম মা ম ম গ ম সা ধ ধ ধ নি প ধ মা ধ নি প ধ সা রি গ রি ম রি ম সা ম ম গ রি সা। রি গ রি গ (পঞ্চম) প প প প নি নি ধা মা মা। মা ম ম ধ ধা ধ ম ম ধ ধা স রি ধ গা ধ গ গ ধ রি গ (পঞ্চম) পা প প প নি নি ধ স স ধ গ স মা গা রী মা রি মা (মধ্যম) নি ধা ধা ধা ধ ধ ধ নি। পা মা গা রী রি পা রী নি ধা (ষড়জ) স স ম ম মা রি রি রি রি প ম ম ম নি ধা পা মা গা রী রি মা গা মা মা ধ রি রি ধ রী রি ধ রি রি রি প প রি প প রি প প রি প প ম নি নি ধ নি ধা নি নি ধা ধ ধ ধ নি ধ ধ ম ধ মা মা ম ম ধ ধ (ষড়জ) স (ঋষভ) রি (পঞ্চম) প প নি নি নি নি ধ ধ নি নি নি প ধ ধ ধ রি প প ম ধ ম ম রি রি গ রি (পঞ্চম) প নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ রি রি ম গ সা মা নি ধ নি ধা ধ ধ ধ নি প প প ধ গ ম রী গ রি রি প রি পা ম গা গা মা মা।

সা	ধা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	১
প	ব	ন	বি	লু	লি	ত	•	
ধা	পা	মা	পা	ধা	পা	মা	মা	২
ভ্র	মি	ও	ম	ধু	ক	র	০	
ধা	পা	মা	গা	রী	গা	সা	নিধ	৩
জ	ল	জ	বে	•	ণু	প	রি•	
সা	রী	মা	পা	পা	পা	পা	ধা	৪
পি	•	ঞ্জ	রি	তে	•	•	•	
সা	রী	মা	পা	পা	পা	পা	ধা	৫
ম	•	ন্দ	ম	•	ন্দ	গ	তি	
সা	সা	পা	পা	ধা	পা	মা	গা	৬
হং	•	স	ব	ধু	•	•	•	
ধা	পা	মা	ধা	পা রী	গা	সা	নিধ	৭
বিঁ	চ	র	ন্তি	বি	ক	সি	ত•	
পা	পা	পম	গম	মা	মা	মা	মা	৮
কু	মু	দ•	ব•	নে	•	•	•	

ইতি আক্ষিপ্তিকা। ইতি বোট্টরাগ।

কর্জ্জনার পুলে

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মোহিনীর চোখের পাতা জলে ভরিয়া গিয়াছে, ঠোঁট কাঁপিতেছে, গণ্ডদ্বয় রক্তাভ হইয়া গিয়াছে, গলার স্বর গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই, তা যে অবস্থায়ই সে পড়ুক না কেন, তাহাদের কোমলস্বভাব—কেবল মোহিনীরই যে তাহা আছে এমন নয়।

বৃদ্ধা মোহিনীর শক্ত মন এতটা গলিয়া গেল কেন? মোহিনী যেন দেখিল, লোকটার কথার ভঙ্গীতে, তাহার বিস্ফারিত চাহনিতে, বলিতে বলিতে তাহার দৃঢ় শরীরের ঝাঁকুনিতে একটা কবেকার কোন্ লোকের কথা মনে পড়িতেছে। যেন কিসের টানে সে তাহার আরও কাছে আসিয়া বসিল, তাহার মুখের দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিল।

লোকটা বলিয়া যাইতেছে—আমি ভবঘুরে…কিছু আমার নেই। কিন্তু আমার সেই মা—যে আমায় মানুষ করেছে, সেই বেনে বুড়ি, তার কথা আমি ভুলতে পারি না। সে তার ছেলেদের কাছে শহরে যেত না, গেলে যে তার ছেলেরা আর খোরাকির টাকা পাঠাবে না। এই খোরাকির সামান্য টাকা থেকে পেটে না খেয়ে কিছু সে জমাত, আমায় পাঠিয়ে দিত…এখনো মাঝে মাঝে দেয়। আমি কবে চলে এসেছি কিন্তু মা ভোলে নি। মা—মাকে তো দেখি নি, সে-ই আমার মা। বুঝি এমনি হয়—নইলে মাকে মানুষ ভোলে না কেন?

মোহিনী বলিল—বুঝি তোমার মা'র কথাটা মনে পড়েছে? হাঁ, সে তোমার মা-ই বটে। আমিও এমনি একটি ছেলেকে মানুষ করেছিলাম…কিন্তু যাক সে কথা। আজ আমি বড়ছেলের কাছে যাচ্ছিলাম বর্দ্ধমানে। সঙ্গে ছিল চাষের গুড়, বস্তা কতক চাল আর একটা পেটরায় গোটা কতক টাকা—পোষ কিস্তির অষ্টমের টাকা। তা কর্জ্জনার পুল পেরুতে গিয়ে ডাকাতে সব কেড়ে নিলে। তা হোক্, মধুসূদনের ইচ্ছে…। দুঃখ হচ্ছে হারাধনকে কিই বা দেব… আমি না দিলে সে কিই বা খাবে…কে জানে বেঁচে আছে কি-না সে…।

পাশের ভাঙা চালাটায় ভিতর হইতে একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধা বলিল—ও ঘরে বুঝি তোমার বৌ…অসুখ করেছে?

লোকটা নিভন্ত আগুনে ফুঁ দিয়া একটা পোয়ালের নুটি ধরাইতেছিল তামাক খাইতে। পোয়ালের আগুনে দেখা গেল, তাহার চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে। তাহার হাতের হুঁকাটা কাঁপিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—হারাধন, হারাধন কে? বৃদ্ধা বলিল—সে কে তা বুঝি বলি নি?…ঐ যাকে আমি মানুষ করেছিলাম সে-ই তো আমার হারাধন। আহা তাকে আমি এই দশ বছর দেখি নি…

লোকটা লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চালাঘরের মেঝেটায় আটি কতক খড় পুরু করিয়া পাড়িল। নিজের গায়ের চটখানা তাহার উপর পাতিয়া দিল। একটা গরুর গায়ে একখানা ছট জড়ানো ছিল সেটা আনিয়া বৃদ্ধাকে দিয়া ইঙ্গিতে বলিল—মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়। মুখের উপর দুইটি আঙুল রাখিয়া ইঙ্গিত করিল—কথা না বলিতে।

অবসন্ন দেহে বৃদ্ধা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙিল তাহার গাড়োয়ানের ডাকাডাকিতে। ডাকাতের লাঠিতে গাড়োয়ানটির মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল। হাত পা বাঁধা সেই পাশের চালায় পড়িয়া গোঙাইতেছিল। ডাকাতেরা তাহার বাঁধন খুলিয়া দিয়াছে। এখনও অনেক রাত্রি আছে। গাড়োয়ানটি বলিল, ডাকাতরা সব জিনিস ফিরাইয়া দিয়াছে মা…আর দেরী করা নয়—আপনি ওঠো।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্য

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ধরার মাধুরী ভুঞ্জনলোভে দেবতারা এই মর্ত্ত্যে নামে।
মাটির কুসুমে যে মধু এখানে কোথা পারিজাতে স্বর্গধামে?
যে সুষমা হেথা নশ্বরে রাজে
কোথা সে সুষমা শাশ্বত মাঝে?
দেবের হ্লাদিনী গোপপল্লীতে পুরায় তৃষিত মনস্কামে।

শ্যামল গোষ্ঠে গোচারণসুখ জলকেলি হ্রদ-নদ-সলিলে
সখাসখী মিলি সুখে গলাগলি—এ মাধুরী কভু স্বর্গে মিলে?
জননীর করতালির সঙ্গে
প্রাঙ্গণতলে নাচন রঙ্গে
বাঁশের বাঁশীর কুহরে কুহরে কি মাধুরী ঝরে মলয়ানিলে!

দানবে দলিতে দেবতারা নামে এ যে ঘোরতর মিথ্যা কথা।
পলকে প্রলয় ঘটাতে যে পারে তার কেন হেন দুর্ব্বলতা!
মেঘে কি তাহার নাহিক অশনি?
জলে কুম্ভীর, বনে কাল ফণী?
যমের দণ্ড অতি প্রচণ্ড কোথা তার তবে নিস্ফলতা?

চির-দিবালোকতপ্ত আসন স্বর্গে, হেথায় পদ্মাসন,
অনিমেষ আঁখি জুড়াতে স্বর্গে কোথা শ্যামশোভা, নীলাঞ্জন?
নিদাঘে শীতল বটের ছায়ায়
বরষার ঘন মেঘের মায়ায়
সুপ্তির লোভ নিদ্রাহারারা কেমনে করিবে সংবরণ?

দেবতা আপন প্রেমেরে হেরিতে চাহে যে প্রিয়ার সজল চোখে।
চাহে সে যে মান ভাঙাইতে তার স্বরচিত রসমধুর শ্লোকে।
ছন্দ তালের ভঙ্গপ্রমাদ
সাধ ক'রে করি রচি অপরাধ
শত শাসনের বন্ধন হ'তে নেমে আসে তাই মুক্তিলোকে।

দেবীর অধরে সে মাধুরী নাই যাহা মানবীর হৃদয়ে রাজে।
জননীর স্তনে যে পীযূষধারা দিতে নারে তাহা চন্দ্রমা যে।
জীবনের কথা বলিব না আর,
মরণও হেথায় করে সঞ্চার
যে নবীন স্বাদ বিচিত্রতার মিলে তা কি অমরতার মাঝে?

মর্ত্ত্যমানব স্বর্গই চায় দৃষ্টি তাহার স্বর্গ পানে।
দেবতারা আসে স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্য মাটির মধুর টানে।
যাতায়াত চলে চিরকাল ধ'রে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য বাঁধা প্রেমডোরে
দেবতা-নরের প্রেমের লীলায় কে বড় কে ছোট কেই বা জানে?

গণদেবতা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চগ্রাম

একত্রিশ

আগুন জ্বলিলেই প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুস্তরে প্রবাহ জাগিয়া ওঠে। শুধু তাই নয়, আগুনের আশপাশের বস্তুগুলির ভিতরের দাহগুণ অগ্নির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া যেন সখীর আগ্রহে কাঁপে। খড়ের চালে যখন আগুন জ্বলে—তখন পাশের ঘরের চালের খড় উত্তাপে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশরের মত ফুলিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। অগ্নিকণার স্পর্শ না পাইলেও—উত্তাপ গ্রাস করিতে করিতে সে চালও এক সময় দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে।

বাঙ্গালা দেশে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে সরকারী জরিপ হইয়া গেল, তাহার ফলে জমিদারের দেয় সেস্ অনেক বাড়িল, কিন্তু জমিদারেরা আয়বৃদ্ধির একটা সহজ সুযোগ পাইয়া খাজনা বৃদ্ধির জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। শিবকালীপুর অঞ্চলে—শিবকালীপুরেই প্রথম খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আগুন জ্বালাইল দেবু ঘোষ। নূতন পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষ কৌশল করিয়া তাহাকে ফৌজদারী মামলার আসামী করিয়া হাজতে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু আগুন তাহাতে নিভিল না। যে অগ্নি-কণাটির সংস্পর্শে ঘরে আগুন লাগে—সে তো অল্প সময়ের মধ্যেই অঙ্গার হইয়া যায় না। আগুন তাহাতে কোন কালেই নেভে না। আগুন জ্বলে, সে আগুনের উত্তাপে আশ-পাশের ঘরেও আগুন লাগে। তেমনি ভাবেই শিবকালীপুরের ধর্ম্মঘট চারি পাশের গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল। দিন কয়েকের মধ্যেই এ অঞ্চলের প্রায় সকল গ্রামেই ধুয়া উঠিল—খাজনা বৃদ্ধি দিতে পারিব না। দিব না। কেন বৃদ্ধি? কিসের বৃদ্ধি?

আষাঢ় মাস। প্রবল বর্ষণে মাঠ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ধান চাষের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। রাত্রি থাকিতে চাষীরা মাঠে গিয়া পড়ে। চারিপাশের গ্রামগুলির মধ্যস্থলে মাঠের মধ্যেই কাজ করিতে করিতে ধর্ম্মঘটের আলোচনা চলিতেছিল।

মহুগ্রামের শিবুদাস শিবকালীপুরেরও প্রজা, সে সেদিন দেবুর মজলিসে আসিয়া যোগও দিয়াছিল, জলভরা মাঠের আইল কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত হইয়া একবার তামাক খাইবার জন্য বসিল। চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরাইয়া তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই আশপাশ হইতে কয়েকজন আসিয়া জুটিয়া গেল। কুসমপুরের রহম শেখই প্রথম কথাটা আরম্ভ করিল।

—চাচা, তুমরাও লাগালছ শুনলাম?

শিবুদাস একটু হাসিল।

—আমাদের তো কাল জুম্মার লমাজ—মছজেদেই সব ঠিক হবে আমাদের।

শিবু এবার প্রশ্ন করিল—দৌলত শেখ? শেখজী রাজী হ'ল?

দৌলত শেখ চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী লোক। শিবুদাসের অভিজ্ঞতায় শিবুর সন্দেহ জাগিয়া উঠিল দৌলত শেখ সম্বন্ধে। তাহাদের গ্রামেও ঠিক ওই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভদ্রলোকেরা ধর্ম্মঘটে যোগ দিতে রাজী হয় নাই। তাহাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে মামলা মোকদ্দমা করিবে স্থির করিয়াছে। কেহ-কেহ আপোষে বৃদ্ধি দিবে বা দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নিজে হাতে চাষ করে না বলিয়া তাহারা জমিদারকে ধরিয়াছে। প্রথমেই তাহারা বৃদ্ধি দিতেছে বলিয়া ভদ্রতা এবং আনুগত্যের দাবীও তাহাদের আছে। ইহারা সকলেই চাকুরে এবং গরীব ভদ্র গৃহস্থ।

রহম হাসিয়া বলিল—তেলে আর পানিতে কখনও মিশ খায় চাচা? শ্যাখ আলাদা মামলা করবে। ই-সবের ভিতর সি নাই।

কুসুমপুরের পাশেই দেখুড়িয়া গ্রাম, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস দুর্দ্ধর্ষ লোক, দুর্দ্ধর্ষপনার জন্যই সে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন সে অন্যলোকের জমি ভাগে চষিয়া খায়, শিবকালীপুরের এলাকার মধ্যেই কঙ্কনার ভদ্রলোকের জমিতে চাষ দিতে আসিয়াছিল—আমাদের গাঁয়ের শালারা এখনও সব 'গুজুর-গুজুর' করছে। আমি বলে দিয়েছি—যে দেবে সে দিতে পারে, আমি দোব না।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—জমি তো আর পাঁচ বিঘে। পাঁচশ বিঘে গিয়েছে, পাঁচ বিঘে আছে। যাক—ও পাঁচ বিঘেও যাক। তারপর তল্পীতল্পা নিয়ে বম-বম ক'রে পালাব একদিন!

রহম বলিল—তুরা সব তাক্ জানিস না। মেড়ার মতন ঢুঁ মারতেই জানিস। লড়াই কি শুধু গায়ের জোরে হয়? প্যাঁচ হ'ল আসল জিনিস। 'আমুতির' (অম্বুবাচীর) লড়াইয়ে সিবার এইটুকুন জনাব আলি—কেমন দিলে—তুদের হারান গয়লাকে দড়াম ক'রে ফেলে, দেখেছিলি? সিবার গাছ কাটার মামলা নিয়ে বাবুদের সঙ্গে কেমন লড়েছিলাম আমি?

রহম বিশেষ বড়াই করে নাই। বছর দুয়েক আগে—রহম জমিদারের জমি ভাগে চাষ করিত। দুই পুরুষ ধরিয়া ওই জমিটা তাহাদের কাছেই ছিল। আপনার জমির মতই তাহারা জমিটার যত্ন কদর করিত। সেই জমির আইলের একটা তালগাছ রহম কাটিয়াছিল। তাল গাছগুলি লাগাইয়া গিয়াছিল তাহার বাপই। জমিদার সেই কারণে রহমকে ধরিয়া আনিয়া মাথায় একটা চড় বসাইয়া দিয়াছিল। রহম থানায় ডায়রি করিল যে, জমিদার তাহাকে থামে বাঁধিয়া জুতা দিয়া মারিয়াছে, শুধু থানায় ডায়রিই নয়, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগের কমিশনার, এমন কি—লাট সাহেবের মন্ত্রীর নিকটেও সেই মর্ম্মে তার পাঠাইয়াছিল। গ্রামশুদ্ধ জুটিয়া জমিদারের কাছারির সম্মুখে জটলা পাকাইয়া করিয়া তুলিয়াছিল সে এক ভীষণ কাণ্ড! শেষ পর্য্যন্ত সদর হইতে রিজার্ভ ফোর্স লইয়া একজন ডেপুটি আসিয়া ব্যাপারটা মিটমাট করিয়া দিয়াছিলেন।

ও-দিক হইতে দ্বারিকা চৌধুরী আসিতেছিল চাষের তদ্বিরে। সাদা কাপড় দিয়া ডবল করা ছাতাটি মাথায়, লাঠি হাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে এ অঞ্চলে সকলেই বড় দূর হইতেই চিনিতে পারে। তা' ছাড়াও—লোকটিকে সকলেই শ্রদ্ধা সম্মান করে। শিবুদাস দূর হইতে চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—চৌধুরী আসছেন, চুপ কর।

চৌধুরীরা একপুরুষ পূর্ব্বে জমিদার ছিল, জমিদারী গিয়াছে, তবুও চৌধুরী এখনও সাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও চৌধুরী ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই, এই কারণেই শিবুদাস বলিল—চুপ কর।

চৌধুরী কাছে আসিয়া অভ্যস্ত মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল—কিগো বাবা সকল, তামাক খেতে বসেছেন সব?

আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে চৌধুরী এমনি ভাবেই সকলকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। আপনি বলিয়া সম্বোধন করিলে প্রত্যুত্তরে তুমি এ সংসারে কেহ বলিতে পারে না।

শিবুদাস উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—পেনাম। জমি দেখতে চলেছেন?

প্রতি-নমস্কার করিয়া চৌধুরী বলিল—হ্যাঁ। তারপরে? জল তো এবার ভাল, এখন শেষ রক্ষা করলে হয়, কি বলেন?

রহম বলিল—সালাম। শেষ-রক্ষে হবে না চৌধুরী মাশায়।

—সেলাম। কি রকম? শেষ-রক্ষে হবে না কি ক'রে বলছেন শেখজী?

—পাপ। পাপের লেগে বলছি। আল্লার দুনিয়া পাপে ভরে গেল। বড়লোকের গোড়ের তলায় দুনিয়া শুদ্ধ কুত্তার মতন লেজ নাড়ছে; পাপের আবার বাকী আছে চৌধুরী মশায়?

—তা বটে। তবে, বড়লোক, গরীবলোক—সে তো আল্লাই ক'রে পাঠান শেখজী।

—তা পাঠান, কিন্তু বড়লোকের পা চাটতে তো বলেন নাই আল্লা। এই ধরুন, আপনার মতন লোক, এককালে আপনারাও আমীর ছিলেন, জমিদার ছিলেন—ছিরে চাষা আজ আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে—আপনি তার মন রাখতে আপনাদের আমলের কাগজপত্ত সেরেস্তা—দিলেন নাই।

চৌধুরী তবুও হাসিল। কিন্তু এ কথার কোন উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে চলিতে বলিল—আচ্ছা, তা হ'লে চলি এখন।

* * * *

চৌধুরী ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরি নারায়ণ, পার কর প্রভু!

একান্ত অন্তরের সঙ্গেই সে এ কামনা করিল। রহমের কথার শ্লেষ তাহাকে আঘাত করিয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু ওইটাই একমাত্র হেতু নয়। কিছু দিন হইতেই সে জীবনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে। সে অস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন যেন গভীর এবং প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এ কালের সঙ্গে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। মানুষের রীতি-নীতি, মর্ম্ম-ধর্ম্ম সব পাল্টাইয়া গেল। তাহারই পুরানো পাকা বাড়ীটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ঝুর ঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়ীটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনিভাবেই সে কালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে। লোকে আর পরকাল মানে না, দেবতা ব্রাহ্মণকে ভক্তি নাই, প্রবীণকে সমীহ করে না, রাজা জমিদার মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; অভক্ষ্য ভক্ষণে দ্বিধা নাই। পুরোহিতের ছেলে সাহেবী ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়া টিকি কাটিয়া কি না করিতেছে? কঙ্কনার চাটুজ্জেদের ছেলে চামড়ার ব্যবসা করে। গ্রামের কুমোর পলাইয়াছে, কামার ব্যবসা তুলিয়া দিল, বায়েন ঢাক বাজানো ছাড়িল; ডোমে আর তালপাতা বাঁশ লইয়া ডোম-বৃত্তি দেয় না, নাপিত আর ধান লইয়া ক্ষৌরী করে না; তেলে ভেজাল, ঘিয়ে চর্ব্বি, নুনের ভিতর মধ্যে মধ্যে হাড়ও বাহির হয়। সকলের চেয়ে খারাপ লাগে—মানুষের সঙ্গে মানুষের অমিল। প্রত্যেক লোকটিই একালে স্বাধীন—প্রধান; কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না। এই প্রজা-ধর্ম্মঘট সে-কালেও হইয়াছে, নূতন নয়, কিন্তু এইবারের ধর্ম্মঘটের যাহা আরম্ভ—তাহার সহিত কত প্রভেদ! জমিদার সে কালে অন্যায় করিলে—অন্যায় দাবী করিলে ধর্ম্মঘট হইত; কিন্তু এবার জমিদার যে বৃদ্ধি দাবী করিতেছে—চৌধুরী অনেক বিবেচনা করিয়াও সে দাবীকে অন্যায় বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাহার বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বৃদ্ধি একটা জমিদারের প্রাপ্য হইয়াছে। আইনে বিশ বৎসর অন্তর জমিদার শস্যমূল্যের অনুপাতে একটা বৃদ্ধি পাইবার হকদার। অবশ্য পরিমাণ মত পাইতে হইবে জমিদারকে। অন্যায্য দাবী করিলে—ন্যায্য প্রাপ্যের বেশী দিব না এ কথা লোকে বলিতে পারে, কিন্তু একেবারে দিব না এ কথা বলিতেছে কোন্ ধর্ম্মবুদ্ধিতে, কোন্ বিবেচনায়?

আপনাকে ঐ প্রশ্নটা করিয়া চৌধুরী পরক্ষণেই আপনার মনে হাসিল। ধর্ম্ম-বুদ্ধি? তাহাদের পুরানো বাড়ীটার পলেস্তারা-খসা ইট-বাহির-করা দেওয়ালের মত মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া—লোভ ক্ষুধা আর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব পেটটাই একালে মানুষের সার হইয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধি? তাও যদি উদরসর্ব্বস্ব স্বার্থসর্ব্বস্ব হইয়া পেটটাই ভরাইতে পাইত—তবুও একটা সান্ত্বনা থাকিত। এ-কালে কয়টা লোকের ঘরে ভাত আছে? জমিদারের ঘর ফাঁক হইয়া গেল, চাষীর গোলায় আর ধান ওঠে না; সব গিয়া কয়টা মহাজনের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ছিরু পাল—মহাজনী করিতে করিতে শ্রীহরি ঘোষ হইল—জমিদারের গোমস্তা হইল—অবশেষে পত্তনি-দার হইয়া বসিয়াছে। কালে কালে আরও কত হইবে। এই সময় মানে মানে যাওয়াই ভাল। অন্তরের সঙ্গেই সে হরিকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিল—পার কর প্রভু!

চারিপাশ জলে ভরিয়া গিয়াছে, এ মাঠ হইতে পাশের নীচু মাঠে কল-কল শব্দে জল বহিয়া চলিয়াছে। আবার আজ আকাশে মেঘ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বর্ষণও রহিয়াছে। চৌধুরী সন্তর্পণে পিছল আলপথের উপর দিয়া চলিতেছিল। তাহার নিজের জমির মাথায় দাঁড়াইয়া চৌধুরী দেখিল গরুদুইটার পিঠে পাঁচন লাঠির আঘাতের দাগ ফুটিয়া রহিয়াছে, চৌধুরীর রাগ সহজে হয় না, কিন্তু গরু দুইটার পিঠের দাগ দেখিয়া সে আজ অকস্মাৎ রাগে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। রহম-শেখের কথার জ্বালা—জীবনের উপর আক্ষেপ এমনি একটা

নির্গমন-পথের সুযোগ পাইয়া অগ্নি-শিখার মত বাহির হইয়া পড়িল। চৌধুরী জল-ভরা জমিতে নামিয়া পড়িয়া—কৃষাণটার হাতের পাঁচনটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখবি? দেখ্‌বি?

কৃষাণটা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওই? কি, করলাম কি গো?

—গরু দুটোকে এমনি ক'রে মেরেছিস যে?

চৌধুরী পাঁচন উদ্যত করিয়াছিল, কিন্তু পিছন হইতে কে ডাকিল—হাঁ হাঁ চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দেখিল, তারা নাপিত, তাহার সঙ্গে আর একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ভদ্রযুবা। চৌধুরী লজ্জিত হইয়াই পাঁচনটা ফেলিয়া দিল। বলিল—দেখ্‌ দেখি বাপু, গরু দুটোকে কি রকম মেরেছে দেখ্‌ দেখি? অবোলা জীব, গরু—ভগবতী!

ভদ্রযুবাটি হাসিয়া বলিল—ও লোকটার কিন্তু গরু দুটোর সঙ্গে খুব তফাৎ নেই চৌধুরী মশায়। তফাৎ কেবল—অবোলা নয়, আর ভগবতী নয়।

চৌধুরী আরও লজ্জিত হইয়া বলিল—তা বটে। ভয়ানক অন্যায় হ'ত। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

তারা নাপিত বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়ের নাতি।

তৎক্ষণাৎ চৌধুরী সেই কর্দ্দমাক্ত আলপথের উপরেই মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ওরে বাপরে! বাপরে! আজ আমার মহাভাগ্যি। আপনার পুণ্যেই আজ আমি মহা অন্যায় করতে করতে বেঁচে গেলাম।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া গিয়া বলিল—না না না। আপনি প্রণাম করবেন না চৌধুরী মশায়। আপনি আমার বাবার চেয়েও বয়সে বড়।

—আপনি ঠাকুর মশায়ের বংশধর। আপনার পিতামহ আশীর্ব্বাদ করলে—মহাপাপীও স্বর্গে যায় বাবা। আপনাদের বংশ আমাদের এখানকার মহাগুরু।

তারা নাপিত বলিল—বিশ্বনাথবাবু সদরে গিয়ে দেবু ঘোষকে খালাস ক'রে আনলেন চৌধুরী মশায়। নিজে জামিন দিলেন।

—দেবু খালাস হ'য়ে বাড়ী এল? অনিরুদ্ধ? প্যাতু?

—অনিরুদ্ধের জামিন হ'ল না। সে নিজে কবুল খেয়েছে; তার জেল হয়ে যাবে। এদের দু'জনের কিছু হবে না।

তারাচরণ বলিল—কলকাতাতে দাদাঠাকুর খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন, চৌধুরী মশায়। তা আপনি ঠিক বলেছেন—আমাদের মহাগুরুই বটেন।

চৌধুরী একথার কোন উত্তর দিল না। সে ভাবিতেছিল মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র কলিকাতায় খবর পাইয়া দেবুঘোষের জামিন হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে! ন্যায়রত্ন মহাশয় জীবনে কখনও কোন বৈষয়িক ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন নাই। কঙ্কনার বাবুদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বিষয়-বিভাগের সময় তাহারা চৌধুরীকে ধরিয়াছিল, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিষয়ের ব্যাকরণ আমার জানা নাই। ও সন্ধি-বিচ্ছেদ করতে আমি অপারগ।

বিশ্বনাথ বলিল—আচ্ছা তা হ'লে চলি চৌধুরী মশায়।

বিশ্বনাথ অগ্রসর হইল, পিছন পিছন তারাচরণও চলিল। বিশ্বনাথ আসিলেই তারাচরণ তাহাকে কামাইয়া দিতে যায়। নগদ পয়সা, পরিমাণেও কিছু বেশী প্রাপ্য হয় তাহার। তা ছাড়া, আজ সে এই দেবু ঘোষের জামিনের ব্যাপারে একটা গুপ্ত রহস্যের গন্ধ পাইয়াছে। বিশ্বনাথবাবু কলিকাতায় বসিয়া দেবু ঘোষের খবর পাইল কি করিয়া?

চৌধুরী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—একটুকু দাঁড়াবেন?

—বলুন।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। কিছু অপরাধ নেবেন না যেন।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—বলুন। এত সঙ্কোচ করছেন কেন?

—আপনি কলকাতা থেকে দেবু ঘোষের জামিন হ'তে এলেন—

—কেন, তাই জিজ্ঞাসা করছেন?

—হ্যাঁ। আপনি এই সবের মধ্যে আসছেন—

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দেবু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। কঙ্কনার স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

—তা বেশ করেছেন। কিন্তু আপনি এ সবের ভেতর আসবেন না। বিষয় হ'ল বিষ; নরকের পথের রথ—আপনারা আমাদের মহাগুরু—

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল, সে আপনাদের দাদু। আমার দ্বারা ও আর হবে না চৌধুরী মশায়। শাস্ত্রও আমি পড়ি নি—আর আমার গলায় পৈতে পর্য্যন্ত নাই।

শিবকালীপুরের নজরবন্দী যতীনও একদিন চৌধুরীকে এই কথা বলিয়াছিল, চৌধুরী সেদিন হাসিয়াছিল; কিন্তু আজ মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্রকে ঠিক সেই কথা বলিতে শুনিয়া চৌধুরী বিস্ময়ে বেদনায় স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া গেল। বিশ্বনাথ ও তারাচরণ চলিয়া যাইবার পর সে আবার বলিল—হরি—নারায়ণ—ত্রাণ কর প্রভু! (ক্রমশঃ)

মৃত্যু-মাধুরী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ কাব্যরঞ্জন

যে মৃত্যুর মাঝে তুমি পড়েছ ঢলিয়া,
কি অমৃত তার মাঝে পড়িছে গলিয়া—
আমি জানি তাহা! রুদ্র শ্মশানের চিতা-
বহ্নি ঐ তনুলতা অগ্নি শুচিস্মিতা—
ছাড়িল পিঙ্গল বেশ—হ'ল অপরূপ
নিকষিত হেমকান্তি! ভীষণ স্বরূপ

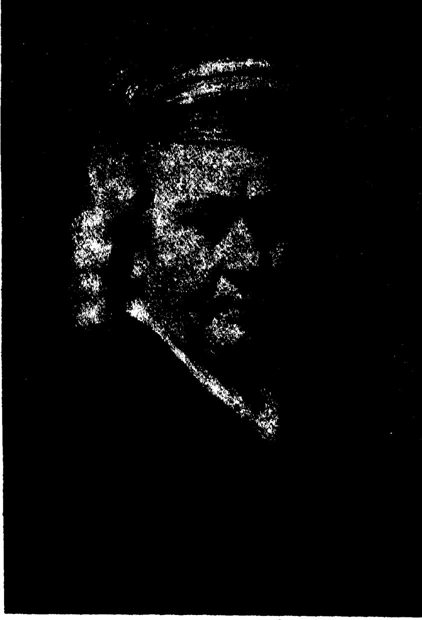
ত্যজিয়া মরণ যেন হ'ল মনোহর!
কল্পনায় ছিল যাহা অতি ভয়ঙ্কর—
হ'ল সে সুন্দর! ছাড়ি' অলজ্জটাভার,
বিশ্বত্রাস রক্ত নেত্রে—ধূর্জ্জটি আবার
ধরিল মোহন মূর্ত্তি! হ'ল মধুময়
নদ-নদী তৃণ-বল্লী কুসুমনিচয়।

শোকে আর সুখে কিছু নাহি দেখি ভেদ,
অন্তরের মাঝে জাগে মধুর নির্ব্বেদ!

রেম্‌ব্রাণ্টের দেশে

শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

তখন অগাষ্ট মাসের প্রায় শেষ ; নেদারল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ডের একটি ছোট গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমি ও আমার ডাচ্ বন্ধু ও বান্ধবী হ্যারি বাক্‌মান এবং ইদা ভ্যান ইক চলেছি রাইন নদীর ধার দিয়ে। হল্যাণ্ডের কৃষক

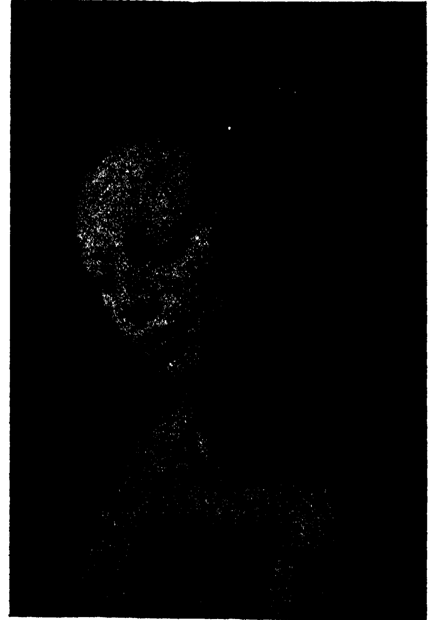


নিজের শেষ প্রতিকৃতি (১৬৬৯)
—সরকারী চিত্রশালা—আমষ্টারডাম

তরুণীরা ছোট ছোট সরু খাল দিয়ে ফুল বোঝাই নৌকা বেয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে শহরের পানে। দূরে দেখা যায় শতাব্দীর অকেজো নিশ্চল উইণ্ডমিল ; ঠাণ্ডা বাতাস বেগে তার ভগ্ন পাখার ভিতর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে চারিদিককার নির্জ্জনতায় এক অপূর্ব্ব সুর সৃষ্টি করছে।

গ্রামখানির নাম Vogelenzang বা পাখীর গান। গ্রামখানির নামকরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, এই জাতির অন্তর কতখানি কাব্যরসে পূর্ণ। পথ-চলার আবেগ, আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলা এবং আমার অনর্গল বক্‌বকানি। চিত্রকরদের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ডাচ্ চিত্রকরগণ একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁরা Rembrandt, Franz Hals, Vermeer, Mæs প্রভৃতি। এমন কি, এঁদের পরে আধুনিক চিত্রকরদের মধ্যেও এখনও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী হল্যাণ্ডীয় ভ্যান্ গক্ (Van Gogh)-এর দান ইউরোপের বর্ত্তমান চিত্রকরদের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ প্যারিসের শিল্প-সমাজ ও তাঁদের রচনা কৌশল। এই ফ্লেমিশ-বাদীর প্রভাব একদিন সারা পৃথিবীর চিত্রকরদের ঘরে ঘরে পৌঁচেছিল। যাই হোক, এদের কথাই আমরা বলতে বলতে মাঠের মধ্যে অরণ্য-কানন-মাঝে একটি বাড়ীর সম্মুখে হাজির হলাম। বন্ধু বল্‌লে, "ওটা কি জান?" উত্তরে বললাম, "বোধ হয় কারুর বাগানবাড়ী। বান্ধবী হেসে উঠলেন, বল্‌লেন, "না, না, ওটা বাগানবাড়ী নয়।" আমি আবার বল্‌লাম, "তা হ'লে হাসপাতাল ;" শুনিয়া হ্যারি ও ইদা জোরে হেসে উঠলেন। ভেবে পেলাম না যে ওটা কি হতে পারে। বনের মাঝে—লোকজন নেই, নির্জ্জন—শহরের কোলাহল থেকে বহুদূরে —এটা কি হতে পারে ? আমি ঠিক করতে না পেরে বন্ধু ও বান্ধবীর সঙ্গে এগিয়ে চললাম—আমার উৎসুক নেত্র ক্রমশ বাড়ীখানির সদর দরজার নিকটতর দৃশ্যে নিবদ্ধ হতে লাগল। আমরা সকলে দরজার নিকটবর্ত্তী হলে দেখলাম লেখা রহিয়াছে, "Ingang" অর্থাৎ প্রবেশপথ। ভিতরে প্রবেশ করে যা দেখলাম তাতে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইলাম। বান্ধবীর কোমল হস্তস্পর্শে ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, ভ্যান গফ্ ! বন্ধু বল্‌লে, "হ্যাঁ, এটা Rijks Museum, Kroller Muller, হল্যাণ্ডের একটি আধুনিক বিখ্যাত চিত্রশালা।"

এখানে প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের চিত্র রক্ষিত আছে। স্থানটি হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ থেকে কিছুদূরে। আমি প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, এই চিত্রশালাটি রাজধানীতে স্থাপিত না হয়ে এ জঙ্গলে কেন ?" উত্তরে বন্ধু বল্‌লে, "এখানে আসে যারা প্রকৃত শিল্পী ও শিল্পানুরাগী এবং সমালোচক, ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে—শান্তিতে



মিস্‌কপ্—(ডেট্রয়ট মিসেস সিলিয়ান হাসের চিত্রসংগ্রহ হইতে)

নির্জ্জনে ওঁদের সঙ্গে আলাপ করতে। ওঁদের যারা চায়, শুধু তারাই আসে এখানে।" যে ছবিটি তখন আমি দেখছিলাম তা বিখ্যাত

চিত্রকর ভ্যান্ গফের আঁকা "ধোপার বাড়ী"। ছবিটির আধুনিক রচনা কৌশল ও বর্ণবিন্যাস শুধু চোখে দেখবার নয়, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির দ্বারা উপভোগ করবার নয়; ছবিটি শুধু দেখবার নয়, পড়বার। একটির পর একটি চিত্রের উপলব্ধির ভাষার অন্বেষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। যে ভাষায় চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে তাতে আমরা বর্ণের সঙ্গীত শুনতে পাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তখন দূর দিগন্তে অস্তরাগের শেষ রশ্মি চিত্রশালার উদ্যানের এক প্রান্তে একটি নগ্ন মর্ম্মর মূর্ত্তির উপর চুম্বন করেছে। আমরা উদ্যানের পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে গোধূলির ধূসর অন্ধকারে নিকটস্থ একটি গ্রাম্য কাফিখানায় ঢুকে পড়লাম।



ঘুমন্ত সিংহ—(১৬৪০)

কাফি পান করছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ আমার কাছে এসে আমায় অভিবাদন করে বললেন, "আপনি কি ভারতীয়?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভারতীয়।" বৃদ্ধ হিন্দু দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা বলতে লাগলেন। তিনি লে ডেন্ (Ley Den) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে হিন্দুর মহাভারতের বিশেষভাবে চর্চ্চা করেন। হিন্দু সংস্কৃতির মূলে যে শিক্ষা রয়েছে তা জগৎকে কত উন্নত করতে পারে তাই তিনি বিশ্লেষণ করতে করতে বলিলেন, "ভারত কখনও পরাধীন থাকতে পারে না। ভারতের চিন্তাধারা স্বাধীন। এই স্বাধীন জীবন-ধারার জন্যেই তার সংস্কৃতিকে জগতের অন্য কোন বিদেশীয় প্রভাব বিনষ্ট করতে পারবে না বা পারে না। হিন্দুজাতি জগতে এত বড় যে তাদের দান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে। তোমার দেশের শিব কি, তা বিশেষভাবে জানতে বা বুঝতে হলে যে জ্ঞান প্রয়োজন তা সাধারণ জ্ঞান বা সহজ দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি বা অনুভব করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। যে দেশ শিব, শিবানী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, বুদ্ধ, শঙ্কর এবং এ যুগের গান্ধী ও টেগোর সৃষ্টি করেছে সেই দেশের একটি হিন্দু সন্তানকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করছি।"

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বৃদ্ধের হাত স্পর্শ করে নতমস্তকে ভারতীয় ভাষায় ও হিন্দু প্রথায় প্রতিনমস্কার জানালাম। তিনি আমাদের সঙ্গে কাফি পান করতে করতে যখন আমার পরিচয় পেলেন যে আমি চিত্রকর, তখন তিনি আরও আগ্রহে আমার কাছে ভারতের গল্প শুনবেন এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই বৃদ্ধের পরিচয়ে বুঝলাম তিনি একজন পণ্ডিত প্রফেসর। আমি তাঁকে বলিলাম, "প্রফেসার, আমি আজ ভারত থেকে রেমব্রাণ্টের দেশে এলাম।" আমার কথা শেষ না হতেই বৃদ্ধের সমস্ত গাল রক্তিম হয়ে কেঁপে উঠল; চক্ষু আরও দীপ্ত হয়ে উঠল; তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "রেমব্রাঁ, রেমব্রাঁ।" বলে তাঁর পকেট থেকে একটি ছবি বাহির করিয়া আমাদের দেখালেন। ছবিটি রেমব্রাণ্টের নিজের আঁকা প্রতিকৃতি; এই ছবিখানি রেমব্রাণ্টের শেষ অঙ্কিত নিজ প্রতিকৃতি। এক্ষণে আমষ্টার্ডামের সরকারী চিত্রশালায় ছবিটি রক্ষিত আছে। বহু শিল্পী ও পর্য্যটক এই ছবিটি ও আর একটি চিত্র যাতে রেমব্রাণ্টের বিরাট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় তা দেখতে এই চিত্রশালায় যান। শেষোক্ত ছবিখানির নাম, "নৈশ প্রহরা" ইহা আমষ্টার্ডামের গৌরব এবং সমগ্র ডাচ্ জাতির শিল্প-প্রতিভার মুক্তিবাণী।

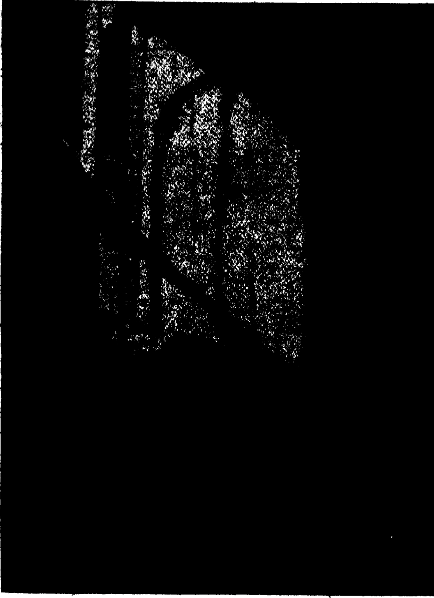
আমরা সাগ্রহে ছবিটি দেখতে লাগলাম। ভদ্রলোক রেমব্রাণ্টের কথা বলে যেতে লাগলেন, "রেম্-ব্রাণ্টের মৃত্যু এক অপূর্ব্ব কাহিনী। জান তাঁর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, রেমব্রাণ্টের শেষ সম্বল?" বলতে বলতে প্রফেসরের গলা ভারী হয়ে এল। বলতে লাগলেন, "রেমব্রাঁ একদিন কত বিচিত্র অনুভূতি, কত বিভিন্ন ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে আম-ষ্টার্ডামের সেই নিভৃত কক্ষের কোণে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে একখণ্ড তামার পাতে আঁচড় কাটতেন। তাঁর জীবনের আদর্শ—আলো ও ছায়া কি—তারই গবেষণা; এটাই একদিন তাঁর জীবনের সম্বল হয়েছিল। এক জাগ্রত আনন্দের মাঝে—কত বিশ্লেষণ, বিচার—



দণ্ডায়মানা মহিলা—(এচিং) —ব্রিমেনের চিত্রশালা

অতীতের নিয়মগুলিতে নিজেকে বদ্ধ না রেখে চিত্রশিল্পের এক নূতন যুগ তিনি প্রবর্ত্তন করেন। রেমব্রাণ্টের জন্ম হয়েছিল লেডেন-এ

১৬০৭ সালে। এই লেডেন স্থানটি পুরাতন রাইন নদীর মোহানার ধারে অবস্থিত। পরে রেম্‌ব্রাণ্ট তাঁর কার্য্যস্থল আমষ্টার্ডামে নিয়ে যান।



দার্শনিক—(লণ্ডনের ন্যাশান্যাল গ্যালারী)

জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে রেম্‌ব্রাণ্ট তাঁর আদর্শ জগতে আজ দান করে গেছেন। তিনি একজন উইণ্ড-মিলের স্বত্বাধিকারীর পুত্র। ছোট বেলায় রেম্‌ব্রাণ্ট তাঁদের মিলে বসে বসে বস্তা সেলাই করতেন। একদিন হঠাৎ তিনি মিলের ভিতর প্রভাতের আলো অন্ধকারের সঙ্গে খেলা করেছে দেখতে পেয়ে "আলো, আলো" বলে চিৎকার করে ওঠেন। সূর্য্যালোক একটি ছোট্ট জানালার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেছিল। কেবলমাত্র উইণ্ড-মিলের ঘূর্ণায়মান পাখা অল্প সময়ের জন্য মাঝে মাঝে জানালার সামনে আসিয়া আলোক-স্রোতে বাধা দিচ্ছিল। পাখা জানালার মুখ থেকে সরে গেলে আলো আবার সেই অন্ধকারময় মিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। ভিতরে কতকগুলি ইন্দুর একটি খাঁচায় টানানো ছিল। সমগ্র অন্ধকারের মধ্যে আলো মাঝে মাঝে ইন্দুরগুলির উপর পড়ায় তাদের দেখা যাচ্ছিল। এ দৃশ্য রেম্‌ব্রাণ্টের মনকে চঞ্চল করে তুলল। এই আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব সম্মেলন রেম্‌ব্রাণ্টের সকল ইন্দ্রিয়কে জাগরিত করে তুলছিল। সেই দিন থেকে বালক রেম্‌ব্রাণ্ট সারাজীবন আলো ও ছায়ার এই অপূর্ব্ব সমাবেশ চিত্রশিল্পের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করবার আদর্শে ব্রতী হন। বাল্যকালের এই প্রেরণায় তিনি পূর্ণজীবনে চিত্রের ভিতর এক নব চেতনার সৃষ্টি করে চিত্রজগতে বিপ্লব এনে দিলেন। এই চেতনার পূর্ণ-বিকাশের আনন্দে তাঁর জীবন এক গভীর উপাসনার ভিতর দিয়ে দারিদ্র্য ও ক্লেশের পীড়া অগ্রাহ্য করে সমগ্র জাতির গৌরব-বর্ত্তিকা ও একটি ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবিরূপে যুগে যুগে জাগরিত রয়েছে। জীবনযুদ্ধের আঘাতে সমস্ত জীবন তাঁর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। জীবনের ছোট ছোট ক্লেশপূর্ণ টুক্‌রোগুলিই তাঁর চিত্রের ভাষা বা শিল্প-জগতের নতুন বর্ণের এক অপূর্ব্ব ছন্দ ও সংহতি। তিনি ছবির ভিতর ছবি আঁকেন নি, তিনি এঁকেছিলেন অনুভূতি। জীবনের প্রত্যেক ক্ষণ, আয়ুমুহূর্ত্তগুলি যে অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, তাহারই ছবি তিনি এঁকে এক বিপ্লবের প্রবর্ত্তন করেন। অন্ধকার রাত্রে শুরু হয় ছবি। ঝড়ের রাতে হিম বাতাস, বরফের ঝড়, অন্ধকারে পৃথিবীর নিয়ম, মানুষের মানুষ-গড়ার আইন-কানুন অস্বীকার ক'রে এক নব জীবনের বার্ত্তা বহন করে একদিন সমস্ত সম্পদ ঋণের দায়ে হারিয়ে আমষ্টার্ডামের রাস্তায় তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

মিনতি

শ্রীনীতীশচন্দ্র মজুমদার

বর্ষা যেদিন আসবে ঘিরে
ব্যথায় ভরা প্রাণের পরে
সেদিন ভুলে গেয়েছ তুমি
আমার গানের ছত্র।
রোদন ভরা পাত্রখানি
শিয়রে মোর থাকবে জানি
গানের শেষে ঘুমের পরে—
লিখব পাওয়ার পত্র।
এই জীবনের জটিলতায়
আমার কথা খুঁজবে কোথায়—
প্রাণের প্রান্তে একটি কোণে
গোপন হয়েই থাক্ না—।
ফাগুনে আর আষাঢ় শেষে
যে ক্ষণটি পড়বে খসে
আমার তরে অশ্রু তোমার
একটু ঝরেই থাক্ না—।

এসো

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ

ধূসর আকাশ চেয়ে আছে চারিদিকে,
বুকে ওড়ে কালো চিল,
রবির কিরণ হয়ে গেছে অতি ফিকে,
মানুষ মৃত্যু-নীল।
নরকঙ্কালে পৃথিবীর বুকভরা,
বোমারু বিমান ওড়ে—
দানবের হাতে নিপীড়িত হ'ল ধরা
মরণের চাকা ঘোরে।
প্রকৃতি পেয়েছে মহাশ্মশানের রূপ,
ভালবাসা শুধু নাম,
প্রেমের বদলে জ্বলিছে হিংসাধূপ
এজগতে অবিরাম।
নতুন মানুষ পৃথিবীর বুকে এসো,
করো বারি সিঞ্চন,
ধরার মানুষে তুমি শুধু ভালোবেসো,
মিনতি আকিঞ্চন।

আর্য্য পূজাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

স্বস্তিবাচনের পর "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি পাঠ শাস্ত্রে বিহিত আছে। তদ্ যথা :—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা পবনো দিক্‌পতি-র্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, উভয় সন্ধ্যা, পঞ্চভূত, দিন, রাত্রি, পবন, দিক্‌পতিগণ, পৃথিবী, আকাশ, খেচর ও অমরগণ ব্রাহ্মণের আদেশ পালনপূর্ব্বক এই পূজা স্থানে সন্নিধান করুন। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থের অনুসন্ধান করিতে হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় :—সাধকের হৃদয় সর্ব্বদা পবিত্র থাকে বলিয়া হৃদয়কেই অর্চ্চনার উপযুক্ত স্থান বলা হয়। এই স্থানে সূর্য্যাদি দেবগণ সর্ব্বদা সন্নিধান করিয়া সাধকের কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ হউন। "সূর্য্য" আত্মকারক গ্রহ। সেই জন্য সূর্য্য বলিতে আত্মাকে বুঝায়। আত্মাই প্রাণশক্তি বা অন্তর্য্যামিরূপ নারায়ণ। বহির্জগতে তাহার নাম সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভর্গ। এই সূর্য্য হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং গ্রহনক্ষত্রাদি বিশ্ব তাহাদের সত্তাসংস্থিতির জন্য সূর্য্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। সূর্য্যের কিরণের কিছুদিন অভাব ঘটিলে জগতের প্রাণশক্তি লোপ পায়। এমন কি দুই একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে জীবগণের মন সূর্য্যকিরণের অভাবে নিতান্ত খিন্ন এবং তমসাচ্ছন্ন থাকে। অতএব বহির্জগতে সূর্য্যাই আমাদের দেবতা। আমরা পূজাস্থানে যে কোন দেবতার জড়মূর্ত্তি প্রকাশ করি তাহার প্রকাশক সূর্য্যই হইবেন। অন্তর্জগতে এই সূর্য্যের নাম প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহাই আমাদিগকে বিচারবুদ্ধি দেয়। অতএব সূর্য্যই অন্তর্জগতের আত্মা। আত্মার প্রথম সন্নিধিকল্পনা উপরিলিখিত কারণে একান্ত আবশ্যক। তাই পূজাদিকার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে আত্মার সান্নিধ্য কল্পিত হইয়াছে।

সোম অর্থে চন্দ্র। জ্যোতিষ শাস্ত্রে চন্দ্রকে মনঃকারক গ্রহ বলা হইয়াছে। এ কারণে চন্দ্র অর্থে মনঃ বুঝিতে হইবে। আত্মার সান্নিধ্যের পর ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ সন্নিকর্ষ না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তনের দ্বারা ভূমণ্ডলের জীবকে আলোক দান করে। এই আলোকে জীবের মনঃ প্রফুল্ল থাকে। চন্দ্র যেরূপ কলার হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা ভঙ্গ ও গঠন করিয়া থাকে, মনও সেইরূপ সংকল্প বিকল্প বৃত্তির দ্বারা প্রতিনিয়তই সৃষ্টি-ধ্বংস সাধন করিতেছে। চন্দ্র যেরূপ পৃথিবীর অনুগত হইয়া তাহারই পরিপোষণ করিতেছে, মনও সেইরূপ দেহের অনুগত হইয়া ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দ্বারা বিষয়রসে দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে চন্দ্রকে মনঃকারক গ্রহ বলা হইয়াছে। মনের সান্নিধ্য না থাকিলে যখন কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন আত্মকারক গ্রহ সূর্য্যের পর পূজাস্থানে মনঃকারক গ্রহ চন্দ্রের আহ্বান যুক্তিসঙ্গত। 'যম' অর্থে অহিংসাদি পঞ্চ। শাস্ত্রে পাওয়া যায় "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।" অর্থাৎ অহিংসা সত্যকথন্ বা সত্য ব্যবহার, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও দানগ্রহণের অভাব এই কয়টীকে যম বলে। পূজাদি কার্য্যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন আছে বলিয়া অহিংসাদি যমের সন্নিধি কল্পনা শাস্ত্রসঙ্গত। 'অহিংসা' অর্থে হিংসার অভাব। হিংসা বলিতে হত্যা বা বধ বুঝায়। অনেক সময়ে মানব রুদ্ধচিত্তে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাতে কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এইরূপ কার্য্য যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা ভাববধ করেন। পূজাদিকার্য্যে এই ভাববধ বা হিংসা থাকিলে পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হইবে। তাই পূজাদি কার্য্যে অহিংসা বা ভাবসত্তা নামক যমের প্রয়োজন। 'সত্য কথন' বা 'সত্যব্যবহার'ও পূজাদি ব্যাপারে একান্ত আবশ্যক। মুখে "এষ গন্ধঃ অমুক দেবায় নমঃ" বলিয়া যদি পুষ্প দান করি, তাহা হইলে সত্য কথন বা সত্য ব্যবহার থাকিল না। সত্যব্যবহারের অভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাই বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করিবার জন্য পূজাদিকার্য্যে সত্যব্যবহার নামক যমের প্রয়োজন। তৎপরে 'অস্তেয়' বা অচৌর্য্য। পূজাদি ব্যাপারে না থাকিয়া মন যদি বিষয়ান্তরের দ্বারা বলবৎ আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে মনের চৌর্য্য বলে। এই মনের চৌর্য্য বা অন্যমনস্কতায় পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ হয় না। তাই পূজাকালে মনের অস্তেয় বা অচৌর্য্য নামক যম একান্ত আবশ্যক। 'ব্রহ্মচর্য্য' অর্থে অষ্টবিধ মৈথুনত্যাগ। "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্।" স্মরণাদ্যষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগই মনের ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ঘটিলে চিত্তশুদ্ধি নষ্ট হয়। তাই পূজাদি ব্যাপারে ব্রহ্মচর্য্য নামক যমের একান্ত প্রয়োজন আছে। 'অপরিগ্রহ' অর্থে বিষয়ান্তরের অগ্রহণ। পূজাকালে পূজাদি ব্যাপারে স্থিতিলাভ না করিয়া মন যদি বিষয়ান্তর গ্রহণ করে তাহা হইলে পূজা ফলবতী হয় না। সেই জন্য পূজাসময়ে বিষয়ান্তর গ্রহণ বা 'অপরিগ্রহ' নামক যমের একান্ত প্রয়োজন। এই গেল পঞ্চবিধ যমের বিবৃতি। তৎপরে 'কালের' আহ্বান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 'কাল' অর্থে ধর্ম্ম বা সংস্কার। সংস্কার বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শক্তিই বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম করিয়া থাকে। পূজাদি কালে আত্মা, মন ও যমের আহ্বানের পর কার্য্যে ব্রতী হইবার নিমিত্ত পূজনধর্ম্ম বা পূজনসংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। তাই ধর্ম্মপর্য্যায় কালের সান্নিধ্য পূজাসময়ে শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে। অনন্তর 'সন্ধ্যার' আহ্বান। সন্ধ্যা দুইটী। অগ্রসন্ধ্যা এবং পশ্চিম সন্ধ্যা। অগ্রসন্ধ্যায় রাত্রি হইতে দিবার উৎপত্তি এবং পশ্চিম সন্ধ্যায় দিবা হইতে রাত্রির উৎপত্তি হয়। দিবা জীবের কর্ম্মকাল অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থা এবং নিশা সুষুপ্তি বা কর্ম্মত্যাগের কাল। দিবা ও নিশার মধ্যবর্ত্তী কালকে সন্ধ্যা বা স্বপ্নকাল বলে। অগ্রসন্ধ্যায় সুষুপ্তি হইতে ক্রমশঃ স্থূলভাবে বা জড়বিষয়ে আগমন হয় এবং পশ্চিম সন্ধ্যায় স্থূলের সমাধি হইয়া স্বপ্ন বা কল্পনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ সন্ধ্যা অর্থাৎ স্বপ্ন বা কল্পনার অবস্থাই পূজার উপযুক্ত ভাব। সেই কারণেই পূজাকালে উভয় সন্ধ্যার সন্নিধি আবশ্যক। সন্ধ্যার আবাহনের পর পঞ্চভূতের সন্নিধি কল্পনা সাধক করিয়া থাকেন। 'পঞ্চভূত' অর্থে ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চক। ক্ষিতির সূক্ষ্মাবস্থা হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। সেইরূপ জল হইতে রসনা, তেজঃ হইতে চক্ষুঃ, বায়ু হইতে ত্বক্ এবং আকাশ হইতে কর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হয়। এই জন্য 'পঞ্চভূত' অর্থে ইন্দ্রিয় পঞ্চ বুঝায়। পূজাদি কার্য্যে বিষয় রসে ব্রহ্মরসের আস্বাদন নিমিত্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিকলতা একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য হৃদয়রূপ আসনে তাহাদের সন্নিধি কল্পনা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ। 'অহ' বা দিন অর্থে দিবাভাগ। দিবাভাগে জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে বলিয়া দিবাকে জীবের জাগ্রৎ অবস্থা বা ব্রহ্মে জাগরণ বলে এবং 'ক্ষপা' বা নিশা অর্থে তাহার বিপরীত অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থা হইতে সুষুপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় লক্ষ্য বুঝায়। পূজাদি ব্যাপারে দিবা ও নিশা উভয়েরই প্রয়োজন আছে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতির শ্রবণ মননই দিবা বা ব্রহ্মে জাগরণ। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পর্য্যালোচনা-

পূর্ব্বক নিদিধ্যাসন বা ব্রহ্মে লয় অবলম্বন করার নাম নিশার সুষুপ্তি। দিবার কর্ম্ম বা ব্রহ্মালোচনা এবং নিশার সুষুপ্তি বা ব্রহ্ম লয় এই উভয়বিধ অবস্থাই গুরুভেদে পূজকের স্থায়সঙ্গত বলিয়া পূজাদি কার্য্যে দিবা ও নিশার সন্নিধানকল্পনা শাস্ত্রে বিহিত আছে। তৎপরে পবনের উল্লেখ শাস্ত্রে আছে। 'পবন' অর্থে বায়ু। বিশুদ্ধ প্রাণ-বায়ু জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত স্পন্দনশক্তি দেয়। এই প্রাণবায়ুর অভাব বা বিশৃঙ্খল অবস্থা উপস্থিত হইলে জীবের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর অর্থ বিধিমত কর্ম্মশক্তি-লোপ। এই জন্যই পূজাদি কার্য্যে 'পবন' বা অবিকল প্রাণবায়ুর সান্নিধ্যের একান্ত প্রয়োজন। "দিক্‌পতি" অর্থে ইন্দ্রাদি লোকপাল। এই ইন্দ্রাদি লোকপালগণ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের রক্ষাবিধান করেন। পূজাদিকালে ইন্দ্রিয়সমূহকে অব্যাহত না রাখিলে পূজায় বিশৃঙ্খলা ঘটে। এই কারণেই পূজাদিকার্য্যে দিক্‌পালগণের সান্নিধ্য শাস্ত্রসঙ্গত। 'পৃথিবী' অর্থে পার্থিব শরীর। পার্থিবশরীরই সমস্ত কার্য্যের অধিষ্ঠানভূত। এই নিমিত্তই পূজাদিকার্য্যে পার্থিবশরীরের স্বাস্থ্য এবং সান্নিধ্য কল্পিত হইয়া থাকে। "আকাশ" অর্থে গগন —আ পূর্ব্বক 'কাশ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'অন্' প্রত্যয় করিলে আকাশ শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। কাশ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করা। যাহা সম্যক প্রকারে প্রকাশ করে তাহার নাম আকাশ। আকাশ সকল পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছ অর্থাৎ প্রকাশশীল। আকাশের মধ্য দিয়া কোন বস্তু বাধা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আকাশ সমস্ত পদার্থেরই প্রকাশক। সেই জন্য আকাশের গৌণ অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা যাইতে পারে। কারণ পরমাত্মাই সমস্ত বস্তুর প্রকাশক। পূজাদিকালে প্রকাশশীল ব্রহ্মের সান্নিধ্য না থাকিলে কাহার পূজা এবং কিসের দ্বারা পূজা হইবে ? এই ব্রহ্মের অধ্যাস বুদ্ধিমাত্রেই সতত বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহাকে জাগাইতে হইবে। সেই জন্যই তাঁহার আহ্বানের প্রয়োজন। সেই কারণেই ব্রহ্মার্থ-বোধক আকাশের সান্নিধ্যবাসনা ন্যায়সঙ্গত। খেচর অর্থে আকাশ-চর। যাহারা আকাশে পক্ষভরে বিচরণ করে তাহারা ভূতলেও চরণদ্বয় দ্বারা সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধস্থূলের উপরে যাহাদের বিচরণ তাহারা তমবহুল এবং যাহারা স্থূল পৃথিবী এবং সূক্ষ্ম আকাশের উপরেও বিচরণ করে তাহারা রজোগুণসম্পন্ন। সেইজন্য খেচরশব্দে রজোগুণসম্পন্ন জীব বা মনের রাজসিক বৃত্তি বুঝায়। পূজাদিকার্য্যে চেষ্টাবত্ব বর্ত্তমান থাকায় রাজসিকবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন। তাই খেচর সকলের সান্নিধ্য কল্পিত হইয়া থাকে। "অমর" অর্থে মনের সাত্ত্বিকবৃত্তি বুঝায়। সাত্ত্বিকবৃত্তিই ধ্যানোপযোগী বলিয়া পূজাদিব্যাপারে সাত্ত্বিকবৃত্তির সান্নিধ্য কল্পনা একান্ত যুক্তিসঙ্গত। উপচার সংগ্রহের দ্বারা পূজার নাম রাজসিক পূজা। রাজসিক পূজাই সাধারণতঃ পূজা বলিয়া গণ্য হয় ; কিন্তু যখন মনের রাজসিকবৃত্তির নাশের পর উপচার সংগ্রহে প্রবৃত্তি থাকে না, কিম্বা ইন্দ্রিয়নাশহেতু শক্তি থাকে না তখন কেবল সাত্ত্বিকবৃত্তিসকল ধ্যান ও মানসপূজার নিমিত্ত অমর হইয়া থাকে। পূজাদিকার্য্যে মনের সাত্ত্বিকবৃত্তি নাশের কোনই অবকাশ নাই। সাত্ত্বিকবৃত্তিকে ছাড়িয়া দিলে পূজা চলে না, তাই পূজাদিকার্য্যে অমর অর্থাৎ মনের সাত্ত্বিকবৃত্তির আহ্বান বিশেষ যুক্তিসঙ্গত। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে স্বস্তিবাচনের পর "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠের ব্যবস্থার মধ্যেও আর্য্যঋষিগণ বিজ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের অভিপ্রায়। এই "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি বচনের অনুরূপ আর একটী ঋষিবচন আমরা পাই। যথা :—

আদিত্যচন্দ্রাবনি লোহনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

এই বচনও পূর্ব্বের অর্থসূচনা করিয়া দেয়। এই গেল সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠ। তৎপরে পূজার সংকল্প।

বঙ্কিম-বন্দনা

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

ধূর্জ্জটীর জটাজালে অবরুদ্ধ ভাগীরথী সম
যে বঙ্গভাষার স্রোত কুলপ্লাবী দেবভাষা মাঝে
বেদনার্ত্ত অবরোধে দ্বিধাগ্রস্ত শঙ্কিত চরণে
আপনার পথ খুঁজি ফিরেছিল মুক্তি অভিলাষে
তুমি তারে দেখায়েছ অভীপ্সিত প্রকাশের পথ।
সার্দ্ধশত বর্ষ আগে উপন্যাস নামে শুধু যারা
'চকমকির বাক্স' খুলি গণেছিল সুদীর্ঘ প্রহর
ভাস্বর ভানুর দীপ্তি তাহাদের তরে আনি দিলে,
সপ্তচ্ছটা মাঝে শুধু মুগ্ধ আঁখি বিস্ময় চকিত।
বঙ্গভারতীর শুধু স্রষ্টা নহ, দ্রষ্টা তুমি ঋষি !
বঙ্গের অন্তরতল চক্ষে তব পড়েছিল ধরা,
'আনন্দমঠের' মাঝে সন্তানের আদর্শ জাগায়ে
তাইতো বাঁধিলে তুমি সপ্তকোটী সন্তানের ঘর।
তোমার 'কমলাকান্ত' কত দুঃখে, কত ব্যথা পেয়ে
লোকোত্তর যে কাহিনী রেখে গেছে অহিফেন ঘোরে
সুস্থ মস্তিষ্কের মাঝে সর্ব্বজ্ঞ এই বিংশ শতাব্দীতে
শতাংশও মেলে নাক—ফোটেনাক নিঃসঙ্গ 'কমল'।
তোমার দানের বোঝা ঋণরূপে যত ওঠে বেড়ে
অভাব তোমার তত গুরু ভার সম বাজে বুকে—
ওরা করে হাহাকার, অশ্রু ফেলে, দূষে ললাটেরে,
আমি বলি—ভয় নাই, সকলের মাঝে আজো
তুমি আছ বেঁচে।

কাজ্‌লা-পুকুর

কাদের নওয়াজ

কাজ্‌লা পুকুর, টল্‌মল্ করে কাজল জল,
বুকে তার দোলে কাঁসাতলি—আর ফোটে কমল।
কূলে কূলে ঢেউ ফুলে ফুলে ওঠে নিতি সাঁঝে,
দূরে বট্-মূলে রাখালিয়া সুরে বাঁশী বাজে।
আধো আলো-ছায়া কালো হয়ে নামে থির নীরে,
তারি পাশে বসি বেশ দেখা যায় কুমুদীরে।
মেঠো কুমড়ার ক্ষেত হতে আসে মিঠি হাওয়া,
পুকুরের বুকে সেই হাওয়া করে আসা-যাওয়া।
গ্রামের বধূরা জল নিতে আসে ঘাট-টিতে,
শোন্ ফুলে আর দ্রোণ ফুলে ছাওয়া মাঠটিতে—
ডাকে সে তখন কোয়া কোয়া রবে কোয়া-পাখী,
মেঘের আড়াল হতে যেন তার মেলি আঁখি—
রাকা চাঁদ দেখে চাঁদমুখ যত গ্রামবধূর,
মনে হয় বুঝি সুধার ভাণ্ড ল'য়ে গরুড়—
মুক্ত করিতে আসিছে তাহার বিনতা-মা'য়
পল্লী-বধূর রূপ ধরি সে যে দিন কাটায়।
আরো মনে হয় এ পুকুর কভু তুচ্ছ নয়,
কালিদহ-সম কমলে-কামিনী হেথায় রয়।
এরি জলে স্নান করিলে হয়ত ভার্গবের—
প্রভাস-তীর্থ চেয়েও পুণ্য মিলিত ঢের।
হয়ত হেথায় ফুটিবে স্বর্ণ-কমলদল,
সেদিনে স্মরিয়া কবির অর্ঘ্য—অশ্রুজল।

বিষবৃক্ষের অমৃত ফল

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে কয়েক বন্ধু মিলিয়া একটি মেস করিয়া থাকিত। বয়সে প্রায় সকলেই নবীন। কেহ সদ্য উকিল হইয়াছে, কেহ ওকালতি পড়িতেছে, কেহ বা এম. এ পাশ করিয়া দু-একটা টুইশান সম্বল করিয়া চাকরি খুঁজিতেছে। দুই-একজন মেডিকাল কলেজেও পড়িতেছে। মোট কথা, এখনও কেহ গভীরভাবে সংসারে প্রবিষ্ট হয় নাই; সেজন্য কেহই ঘোরতরভাবে এখনও স্বার্থপর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

আজ সোমবার। সকালের দিকে অনেকেই বাড়ী হইতে ফিরিয়া বরাবর আপিসে বা কলেজে গিয়াছিল। সেজন্য পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। আপন আপন আপিস, কলেজ, ছাত্রগৃহ ইত্যাদি স্থান হইতে সন্ধ্যায় ফিরিয়া সকলেই প্রায় সত্বর বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত আছে।

দ্বিতলের ৩নং ঘরের বারান্দার এক কোণে নিখিলেশ একা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নিখিলেশ এম্-এ এবং ল একসঙ্গে পড়িতেছে। সম্প্রতি সে দোলপূর্ণিমার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিল। ছুটি হইবার দুই দিন আগেই সে চলিয়া গিয়াছিল। ঐ দুটা দিন তাহার বন্ধু ও সতীর্থ প্রক্সি হইয়া তাহার কলেজের কাজ চালাইয়া দিয়াছিল।

বসন্ত আপনাদের ঘর ও পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্কিমের ঘরে খোঁজ করিয়া না পাইয়া বারান্দায় আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিল।

জিজ্ঞাসা করিল—বন্ধু, তালপত্রবীজন, চন্দনানুলেপন এবং নব-কিশলয়-বিস্তারণের প্রয়োজন কি? কালিদাস কবিরাজের এই ত ব্যবস্থাপত্র।

নিখিলেশ শুধু ফোঁস করিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। কিছু বলিল না।

বসন্ত এবার রহস্য ত্যাগ করিয়া বলিল, ব্যাপার কি ভাই? অমন মুখ ভার ক'রে রয়েছিস্ কেন? বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছিস্ নাকি?

নিখিলেশ এবার কথা কহিল। বলিল, আমি ঝগড়া করিনি। সে-ই করেছে।

বসন্ত এবার আপন সরল ভাষায় বলিল, গাধা কোথাকার। তুই ঝগড়া করিস্‌নি তো ঝগড়া হ'ল কি করে? এক হাতে তালি বাজে?

নিখিলেশ কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া বলিল, এটা একটা কথার কথা, বসন্ত। একটা হাত যদি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, আর অপর হাতটা যদি সবেগে এবং 'না-বলা না-কওয়া' সেই দাঁড়িয়ে থাকা হাতের উপর ছুটে আসে তা হ'লে শব্দ হয় না—তালি বাজে না?

বসন্ত একটা নিরাশাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, না, তোর এবার অনেকখানি বুদ্ধি হয়েছে দেখছি! অপর হাতকে—'যুদ্ধং দেহি' রবে আগিয়ে আসতে দেখে—তোর দাঁড়িয়ে থাকা হাতটা যদি একেবারে শুয়ে পড়ে বা 'হাতযোড় করে' দাঁড়ায়, তা হ'লে অপর হাত তালি বাজাবে কি ক'রে?

নিখিলেশ বলিল, সত্যি বসন্ত, আমার কোন দোষ নেই। গেল সপ্তাহে বাড়ী যাইনি। তুমি বললে, লেকচার যাবার ভয় নেই, তুই যা। তাই দু দিন আগে চলে গেলাম। গাঁয়ের ছেলেরা সব ধরে বস্‌ল থিয়েটার করতে হবে।

—তাই বল্ যে গাঁয়ে গিয়ে থিয়েটার করা হয়েছিল। কিসের প্লে করেছিলি? 'শিরিফরহাদ্', না 'লয়লামজনু'?

—না, তা হ'লে আর রক্ষা ছিল?

—তবে কি 'প্লে' করেছিলি?

—বিষবৃক্ষ।

—মশায়ের কিসের পার্ট নেওয়া হয়েছিল?

—নগেন্দ্র।

—তা হ'লে তো তোর বৌয়ের ভারি অপরাধ দেখ্‌ছি। ওদের তো মাত্র একটি প্রণয়িনী। নগেন্দ্র একা কুন্দনন্দিনীতেই অস্থির। তার উপর আবার সূর্য্যমুখী। তুই বিষবৃক্ষ 'প্লে' কর্‌তে গেলি কেন?

—তা হ'লে কি তুমি বল্‌তে চাও, মোহমুদ্গর ড্রামাটাইজ্ করে প্লে করতে হবে? আর তাতেই বা পার পেতাম কি করে? 'কা তব কান্তা' বললেও তো বিপদ কম হতে পারত না।

—না, আমাকে তুই হারালি এবার। তা কি হয়েছে খোলসা করে বল্‌বি, না, শুধু হা-হতোহস্মি কর্‌বি? সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি।

তখন নিখিলেশ তাহার গভীর বিপত্তির কথা সবিস্তারে বন্ধুর কর্ণগোচর করিল।

ব্যাপারটা এই:

সে কিছুই পূর্ব্বে জানিত না। বাড়ী পৌঁছিতেই বাল্যবন্ধু সবাই ধরিয়া বসিল, থিয়েটার করিতেই হইবে। বলাইবাবুর কাছে নাটকে রূপান্তরিত বিষবৃক্ষের একখানি পাণ্ডুলিপি ছিল। তাঁহার পরামর্শে ঐ বই লওয়া হইল। পার্টও তিনি সব ঠিক করিয়া দিলেন। দিলেন দিলেন, তাহাকে যদি সন্ন্যাসীর পার্টটি দিতেন তাহা হইলে কোন গোলোযোগই হইত না। অভিনেতাদিগের স্ত্রীদের জন্য বসিবার পৃথক্ ব্যবস্থা হইয়াছিল যাহাতে তাহাদের একটি কথাও শুনিতে কোন অসুবিধা না হয়। হাততালি খুবই পড়িয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল, প্লে বেশ ভাল জমিয়াছিল। বিশেষত তাহার অর্থাৎ নগেন্দ্রের পার্টের সুখ্যাতি সবাই করিয়াছিল। একটি মুখের সুখ্যাতি শুনিতে কেবল বাকি ছিল। রাত্রি তিনটার সময় বাকি সুখ্যাতিটুকু শুনিবার জন্য সে বাড়ী ফিরিয়াছিল। তাহার কিছু পূর্ব্বেই তাহার ছোটভাইয়ের সঙ্গে তাহার স্ত্রী বাড়ী পৌঁছিয়াছিল। বাড়ী পৌঁছিয়া হাতমুখ বেশ করিয়া ধুইয়া শয্যাপ্রান্তলগ্না স্ত্রীকে সে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অভিনয় কেমন লাগিল। তাহার ফলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা না বলিলেই ভাল হয়। শয্যাপ্রান্তটুকু ত্যাগ করিয়া স্ত্রী মুহূর্ত্তে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তাই শুধু সে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, হঠাৎ মাটিতে যাইবার কারণ কি। বেশ তীক্ষ্ণ—যাহাকে চলিত কথায় ঝাঁঝালো বলে—সুরে স্ত্রীর মুখ হইতে শুধু এই কয়টি কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, ডাহিনে ও বামে চিনির নৈবেদ্যের মত যাহার একদিকে সধবা স্ত্রী ও একদিকে বিধবা স্ত্রী বর্ত্তমান, তাহার আর গৃহকোণের পুরাতন ও পরিত্যক্ত স্ত্রীতে কি প্রয়োজন? বাকি রাত্রিটুকু ব্যর্থ সাধ্যসাধনায় কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া একবার এবং আসিবার পূর্ব্বেও একবার সে কথা কহাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। উপরন্তু খানিকটা চোখের জল দেখিয়া আসিয়াছিল। নিখিলেশের মন কাজেই সেজন্য বড়ই খারাপ আছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

অভিনয়ের প্রহসনের বিবরণ সবখানি শুনিয়া বসন্ত নিখিলকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করিয়া পূরা দস্তর খানিকটা হাসিয়া লইল। তারপর বলিল, তুই খালি গাধা নোস্, নিখিল, একেবারে এক নম্বরের গাধা। তোর কোথায় খুশী হয়ে মেসসুদ্ধ লোককে একটা উচ্চাঙ্গের ভোজ দেওয়া উচিত, আর তার বদলে তুই হতাশ প্রেমিকের মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছিস্।

নিখিলেশ অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বসন্তের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি শেষটা এই নিয়ে এমন নির্দ্দয় পরিহাস শুরু করলে?

এবার সত্য সত্যই তাহার চোখে কয়বিন্দু জল দেখা দিল।

প্রেম যে মানুষকে একেবারে পাগল না করুক্‌ অর্দ্ধেক পাগল করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বসন্ত ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, ছিঃ নিখিল, তুই একেবারে ছেলেমানুষ! আরে এটা যে তোর ওপর তোর বৌয়ের অত্যন্ত টানের—তোদের ভাষায়—প্রেমের লক্ষণ, সেটুকু ধরবার মত তোর বুদ্ধি ও বয়স দু-ই হয়েছে।

নিখিলেশ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, হ্যাঁ, টান না ছাই! টান থাক্‌লে মানুষ মানুষকে এমন কষ্ট দিতে পারে?

বসন্ত বলিল, তা ঠিক; টান থাক্‌লে মানুষ মানুষকে কষ্ট দিতে পারে না। কিন্তু মেয়েমানুষ অর্থাৎ স্ত্রী পারে। 'প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ' ইত্যাদি তো তোদের কাব্যেরই কথা ভাই।

নিখিলেশ এতক্ষণ নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া ফট্‌ করিয়া চোখ দুটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি কি তা হ'লে বল্‌তে চাও এটা রাগের লক্ষণ নয়?

বসন্ত বলিল, হ্যাঁ, তাই বল্‌তে চাই। এটা রাগের লক্ষণ নয়, অনুরাগের লক্ষণ। অতএব বন্ধু, ধৈর্য্যং ধর এবং বেরিয়েও পড়। চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌। যেতে যেতে কি করে এবং কত শীঘ্র 'মধুরেণ [illegible]' হতে পারে তারই পরামর্শ করা যাবে। ওঠ্‌।

তখন দুই বন্ধু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হেদুয়ার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

২

অতসীগ্রামে অর্থাৎ নিখিলেশের বাড়ীতে ততক্ষণ ঘোরবেগে প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়া গিয়াছে। বিজয়ার আর অনুশোচনার সীমা ছিল না। নিখিলেশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় জোর ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল ইহারই মধ্যে বিজয়ার মন পাল্টা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গভীর রাত্রের নির্দ্দয় অভিমানের প্রচণ্ড কারণ দিবালোকে অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছিল। ক্রোধ-শয্যা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া—ষ্টেশনের পথপানে বিজয়া বহুক্ষণ চাহিয়া ছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা এক একবার জাগিতেছিল, হয়ত বা গাড়ী 'ফেল' হইয়া বা করিয়া নিখিলেশ শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। সে ইহাও ভাবিয়া রাখিল, যদি নিখিলেশ সত্যই ফিরিয়া আসে তাহা হইলে সেও সত্যসত্যই এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে যাহাতে তাহার স্বামী খুশী না হইয়া পারিবে না।

কিন্তু বিজয়ার কল্পনার এ আনন্দ বেশীক্ষণ রহিল না। হতভাগা গাড়ীখানা বহু বিলম্ব করিয়া বাঁশীর শব্দে চারিদিক চমকিত করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পোষা ঘোড়ার মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ পরে আরোহীদিগকে বুকে লইয়া মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে কঠিন কলিকাতার পানে ছুটিয়া চলিল। আজ বিজয়ার মনে হইল, মাঝে মাঝে এক আধ দিন ট্রেণ যদি না আসিয়াই চলিয়া যায় এবং সারা দিনরাতের মধ্যে যদি আর দ্বিতীয় ট্রেণ না পাওয়া যায় তো বেশ হয়। অন্তত ভুল করিয়া একটু বেশী মনে করিয়া ফেলিলেও বেশীক্ষণ অনুতাপ করিতে হয় না। স্বামীরাও তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া মান-অভিমানের পর দু দণ্ড স্বস্তি পায় এবং স্ত্রীরাও অনুতাপের বাতাস দিয়া প্রেমাগ্নিকে উজ্জ্বলতর করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন গাড়ী রীতিমত আসিয়া বিজয়ার স্বামীরত্নকে বিদেশে লইয়া গেল তখন অনুতাপের দীপ্ত বহ্নি তাহাকেই দহন করিতে লাগিল।

দশটার সময় ত্রিদিবেশকে ভাত দিতে হইবে; কাজেই বিজয়া অনুতাপ বা প্রেমবহ্নি বেশীক্ষণ জ্বালাইয়া রাখিতে পারিল না। উঠিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি রন্ধনকার্য্য শেষ করিতে হইল। বাড়ীর অপর প্রাণী বৃদ্ধা শাশুড়ী। শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিয়া বিজয়া তাঁহার দিবানিদ্রার যোগাড় করিয়া দিল। সে দিন হঠাৎ দুইটি বধূ ননদদিগের সঙ্গে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। পরিচয়ে বিজয়া জানিল তাহাদের মধ্যে একজন গতরাত্রের "সূর্য্যমুখী"র স্ত্রী ও অপরটি হতভাগিনী "কুন্দনন্দিনী"র দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—যাহা শুনিবামাত্র বিজয়ার চোখের দৃষ্টি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। যে সব অভিনেতাদের আবার বাড়ীতে স্ত্রী থাকে স্বামীর তেমন সব প্রণয়িনী বা স্ত্রী থাকিলে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে খুব বেশী উদারতার প্রয়োজন হয় না। তারপর যখন তাহারা স্বামীদের অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, তখন বিজয়া আপনার কাছে আপনি লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। ছি, ছি, কি ছেলেমানুষী—কি অন্যায়ই সে করিয়াছে!

তাহারা উঠিয়া গেলে বিজয়া লুকাইয়া চোখের জল ফেলিয়া মনটাকে একটু হালকা করিয়া লইল। পরে সন্ধ্যার মধ্যে গৃহকার্য্য সারিয়া আপনার শয়নকক্ষের দুয়ার রুদ্ধ করিল ও লুকাইয়া স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

বিজয়া লিখিল:

প্রিয়তম,

কাল রাতে আমার মরণ হইয়াছিল, তাই তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম ও কথা কহি নাই। পুরুষ 'কুন্দ' ও পুরুষ 'সূর্য্য-

মুখী'র স্বামী সাজিলে যে রাগ করিতে নাই এ বুদ্ধিটুকুও ভগবান্ আমার ঘটে দেন নাই। আমায় ক্ষমা করিও এবং ক্ষমা যে করিয়াছ তাহার প্রমাণস্বরূপ পত্র পাইয়াই মাত্র একটি দিনের ছুটি লইয়া অধীনাকে দর্শন দিয়া যাইও। নহিলে আমার দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকিবে না।

আর একটা কথা—আমার নির্বুদ্ধিতার গল্প যেন তোমার বন্ধুদের কাছে করিও না। দোহাই তোমার, তাহা হইলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইবে। স্বামীই স্ত্রীর লজ্জা নিবারণ। আমার লজ্জা যেন তুমি বাড়াইও না। ইতি—

শ্রীচরণের দাসী—বিজয়া

৩

চোখের জলে ভাসিয়া বিজয়া যখন চিঠিখানি সমাপ্ত করিতেছিল, চিঠির উদ্দিষ্ট-ব্যক্তি তখন বিচিত্রায় এক নূতন সবাক্ চিত্রে মনোনিবেশ করিতে ব্যর্থ-প্রয়াস পাইতেছিল।

মেস হইতে বাহির হইয়া বসন্ত নিখিলেশের চিত্তবিনোদনের জন্য হেদুয়ায় খানিকক্ষণ বসিয়াছিল। কিন্তু সেখানেও নিখিলেশের দুঃখ বা উদ্বেগের উপশম না হওয়ায় তাহাকে লইয়া বসন্ত বিচিত্রায় "দুর্জ্জয় অভিমান" দেখিতে আসিয়াছিল।

কিন্তু "দুর্জ্জয় অভিমানের" গল্পাংশ একটু দুর্জ্জয় রকমের। তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। গল্পাংশটি এইভাবের:

নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত যুবকের দল কলেজ বটবৃক্ষে বাসা বাঁধিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শশাঙ্কশেখর ও মোহিনী-মোহন বিশিষ্ট বন্ধু। কঠোর অধ্যয়ন কালের সুদীর্ঘ-রজনী তাহাদের বন্ধুত্বের প্রজ্জলিত বর্ত্তিকা আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। অধ্যয়ন শেষ করিয়া দুজনে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে উভয়ে স্থূল জগতের অবশ্য অনুসরণীয় জীবিকার পথ বাছিয়া লইল।

শশাঙ্কের বন্ধুপ্রীতি একটু বেশী ছিল, তাই একেবারে তাহা লুপ্ত হইল না। তরুলতা ও পত্রপুষ্পবাহুল্যের আড়ালে কোথাও একটু আধটু—পূর্ব্বোক্ত, সমতলক্ষেত্রের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ উঁকি-ঝুঁকি মারিত। ইহা লইয়াই বেচারা শশাঙ্কের অশান্তির সীমা ছিল না। কি করিয়া এই অশান্তি এক বিয়োগান্ত উপন্যাস ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিল তাহাই—এই "দুর্জ্জয় অভিমান"-এর মূলকথা।

শশাঙ্কের স্ত্রীর নাম শর্ব্বরী। স্বামীর বন্ধুদের সে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। দেশের বন্ধুদের সে একপ্রকার দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিদেশের বন্ধুদের সে সব সময়ে পারিয়া উঠিত না, যদিও সে দিকে তাহার সতর্ক দৃষ্টির অল্পতা ছিল না। ডাকঘরের ব্যাগে চড়িয়া—তাহারা কখন কোন্ পথ দিয়া আসিয়া নীরব ভাষায় স্বামীর সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিত তাহা সব সময়ে সে ধরিয়া ছুঁইয়া পাইত না। তথাপি যে সব বন্ধু দূর হইতে এক-আধখানা চিঠি ছুড়িয়াই ক্ষান্ত হইত তাহাদের সে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিত। অবশ্য ইহারা যাহাতে বাড়াবাড়ি না করে সেদিকেও তাহাকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিতে হইত।

একদিন তদারক করিতে আসিয়া—শর্ব্বরী যাহা দেখিল তাহাতে তাহার ধমনির প্রতি রক্তবিন্দু জমিয়া বরফ হইতে চাহিল। স্বামীর পকেট অনুসন্ধান করা তাহার নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। সেই নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির প্রথম কর্ম্মটি করিতে আসিয়া শর্ব্বরী সেদিন একখানি পত্র পাইল। পত্রে এইভাবে লেখা ছিল:

প্রিয়বর

পুরাতন প্রেম কি এমন করিয়াই ভুলিতে হয়? নূতন সংসার পাতিয়া কি এমনি করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে হয়? আকাশে যখন অনিন্দ্যা রূপসীর এলোকেশ ছড়াইয়া পড়ে, তাহার তীক্ষ্ণ হাসির ঝলক যখন বাতায়ন-পথে উঁকি দিয়া চলিয়া যায়, মাঝে মাঝে হরিদঞ্চল দুলিয়া ওঠে, তখনও কি একবার মনে পড়ে না কোথায় আজি সে?'

বাতাস আজিও তেমনি উতলা হইয়া বহিতেছে। মেঘের ডাকে আজি হৃদয় তেমনি গুরু গুরু করিয়া উঠিতেছে। তরুলতার পত্রপল্লব আজিও সেই দিনের মতই সজলচোখে চাহিয়া আছে। আজিও কি বৃথায় সে তোমার পথপানে চাহিয়া থাকিবে?

তোমার মোহিনী

চিঠি পড়িয়া শর্ব্বরীর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সব কথা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যাহা বুঝিয়াছে তাহাতেই সে অস্থির হইয়া উঠিল। 'প্রিয়' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে; আবার বরও লিখিয়াছে। তাহা হইলে কিই বা বাকি রাখিয়াছে? এতদিনে তাহা হইলে সে স্বামীর স্বরূপ দেখিতে পাইল। কি বিশ্বাসঘাতক! আর সে-ই বা কি পাপিষ্ঠা! অমন এলোকেশ কাটিয়া ফেলিয়া ওই হাসির মুখে আগুন জ্বালিয়া দিয়া অঞ্চলটির ফাঁসে গলাটি সমর্পণ করিতে পারিল না পাপিষ্ঠা?

কিন্তু তখন কোথায় সে পাপিষ্ঠা যাহার গলায় ফাঁসটি আঁটিয়া দিয়া সে শান্তিলাভ করিবে! অন্তত স্বামীকেও তখন কাছে পাইলে তাহাকে কতকগুলা কথা শুনাইয়া দিয়া সে কতকটা গায়ের জ্বালা মিটাইত। কিন্তু স্বামী তখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ফিরিতে অন্তত সন্ধ্যা।

শর্ব্বরী ভাবিতে লাগিল, মোহিনীকে একবার দেখিতে হইবে—যেমন করিয়াই হউক্। তারপর তাহার জীবন্ত মুখে আগুন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কত প্রকারের কত উদ্ভট কল্পনাই তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্কে উদিত হইতে লাগিল।

স্বামী আসিয়া ঘরে না ঢুকিতেই সাধ্বী প্রশ্ন করিল, তোমার মোহিনীর ঠিকানাটা কি জানতে পারি না?

হঠাৎ প্রশ্ন শুনিয়া শশাঙ্ক একবার যেন চমকিত হইয়াছিল। এটুকুও শর্ব্বরীর চক্ষু এড়াইল না।

শশাঙ্ক শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, তার ঠিকানা এত সরল ও সহজ যে তুমিও ইচ্ছা করলে চোখ বুজে সেখানে চলে যেতে পার। নৈহাটি ষ্টেশনে নেমে বাইরে এসে যে রাস্তায় পড়্‌বে সেই রাস্তা দিয়া সোজা উত্তর দিকে চলে যাবে। খানিকটা গিয়ে বাঁ হাতে সুপারি গাছ দিয়ে ঘেরা যে প্রথম বাড়ীটি দেখ্‌বে সেইটিই তাদের বাড়ী।

শর্ব্বরী শ্লেষের সহিত বলিল, বাড়ী তো চিন্‌লাম। কিন্তু আলাপটা কত দিনের জানতে পারি?

...ক সহজভাবেই উত্তর দিল, স্বচ্ছন্দে। তারপর চক্ষু মুদিয়া ...য় ভাবাবেগেই হইবে বলিল, সে কি আজকের। কত কালকার আলাপ! পরস্পর পরস্পরকে একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারতাম না। লোকে কত কথাই বলত। তখন তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই ছিল না, তোমাকে দেখার বহুকাল আগের কথা, কাজেই ক্ষমার যোগ্য।

স্বামীর বেহায়াপনায় শর্ব্বরী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল! এই সম্পর্ক লইয়া এমন বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে মুখে একটুও বাধিল না। আচ্ছা, সেও ইহার প্রতিশোধ লইবে।

সারা রাত্রি ধরিয়া সে কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অতি ভোরে উঠিয়া মেয়েকে জাগাইয়া বলিল, সে গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলে যেন ইহাই বলে। তখনও রাস্তায় লোক চলিতে শুরু করে নাই। বাড়ী হইতে রেলের ষ্টেশন মাত্র মিনিট চারেকের পথ। ষ্টেশনে আসিয়া নৈহাটির একখানি টিকিট কিনিয়া শর্ব্বরী কলিকাতাগামী এক গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মাঝে মাঝে এইভাবে গঙ্গাস্নানে যাওয়া তাহার অভ্যাস থাকিলেও আজ তাহার বুকে কে যেন ঢেঁকির পাড় দিতেছিল। গলা শুকাইয়া আসিতেছিল ও চক্ষু ছাপিয়া বার বার জল আসিতে চাহিতেছিল, কখন বা জোর করিয়া তাহা রোধ করিতেছিল, কখন বা আঁচল দিয়া মুছিয়া তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

নৈহাটি পৌছিতেই সে নামিয়া পড়িল এবং স্বামীর নির্দ্দেশমত রাস্তায় উত্তর দিকে বরাবর আসিয়া সুপারি গাছ-চিহ্নিত বাড়ী দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রথমেই ছোট বাগান। সেটা পার হইয়াই একেবারে বাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িল। সেখানেও কয়েকটি গোলাপ ফুলের ঝাড়। তাহার সম্মুখে এক যুবতী গুন গুন করিয়া কি একটা গান গাহিতে গাহিতে এক একটি করিয়া গোলাপ ফুল তুলিতেছে।

যুবতী শর্ব্বরীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই শর্ব্বরী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বুঝি মোহিনী?

যুবতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নামাইল।

শর্ব্বরী অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া গেল। 'লজ্জা তো খুব দেখছি। তোমার স্বামীটি কোথায় জান্‌তে পারি?'—শর্ব্বরী শ্লেষপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

যুবতীর চক্ষে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তথাপি সে আঙ্গুল দিয়া সম্মুখের দিকে একটি ঘর দেখাইয়া দিল।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া শর্ব্বরী ক্ষিপ্রপদে সেই কক্ষের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল ও আঁচল হইতে সেই চিঠিখানা লইয়া মোহিনীমোহনের টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, এই চিঠিখানা একটু সময় ক'রে পড়ে দেখবেন, তা হ'লে ঘরের অনেক কথাই জান্‌তে পারবেন।

বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দুয়ারের সম্মুখেই "মোহিনী"র সঙ্গে দেখা। তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বলিল, যদি পুরোণো পীরিত ভুলতেই না পারো, পরের সংসারে আগুন না জ্বালিয়ে কাছেই গঙ্গা, সেখানে গিয়ে ডুবে মরলেই পার।

বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে সেখান হইতে বাহির হইয়া শর্ব্বরী নিজেই গঙ্গার দিকে ছুটিয়া চলিল।

শর্ব্বরী স্থির করিয়াছিল মোহিনীকে একটি কঠিন গোছের শাস্তি দিয়া সে গঙ্গার শীতল জলে ডুবিয়া সংসারের সব জ্বালা জুড়াইবে। মাগো মা, পতিতপাবনি, তোমার চরণে স্থান দাও মা বলিয়া সবেগে লাফ না দিয়া হউক্, আস্তে আস্তে আসিয়া ডুব দিবে—আর উঠিবে না।

এই সমস্ত স্থির করিয়া শর্ব্বরী ঘাটে নামিয়া দুই-এক পা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে তাহার হাত ধরিয়া কে টানিল। চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল সেই সর্ব্বনাশিনী। সর্ব্বনাশিনী মধুর-হাসিয়া বলিল, দেখুন দিদি, আমি মোহিনী নই, আমার নাম বিমলা। মোহিনী উনি—আমার স্বামী, যিনি ঐ উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যে চিঠি আপনি এনেছিলেন, সেখানি ওঁরই লেখা। শশাঙ্কবাবুকে উনিই লিখেছিলেন। আমি নই। এখন চলুন।

বলিয়া বিমলা প্রায়-বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা শর্ব্বরীকে একপ্রকার ধরিয়া লইয়া গেল।

শর্ব্বরীকে লইয়া বিমলা ও মোহিনীমোহন তাহাদের বাড়ীতে পৌছিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত সমস্তভাবে শশাঙ্ক ষ্টেশন হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া দুঃখে ও লজ্জায় শর্ব্বরী স্বামীর পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৩

দুর্জ্জয় অভিমান শেষ হইল। মিলনান্ত গল্প দেখিয়া ও শুনিয়া সবাই একপ্রকার প্রসন্নমনে যে যাহার গৃহে ফিরিতে লাগিল।

বসন্ত ও নিখিলেশ বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। মাণিকতলা ষ্ট্রীটে পড়িয়া নিখিল একবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, ওরা দুজন যদি সময়মত না এসে পৌছাত তা হ'লে শর্ব্বরী তো জলে ডুবতে পারত?

বসন্ত বলিল, নিশ্চয়ই পারত এবং তার পারাই উচিত ছিল।

নিখিল আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। আরও অনেকক্ষণ দুইজনে নিঃশব্দে চলিল। মেসের কাছাকাছি আসিয়া সে একবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় বসন্ত, থিয়েটার করা থেকে এরকম কিছু হতে পারে?

বসন্ত একটু আগাইয়া ছিল। মুখ ফিরাইয়া বলিল, এরকম মানে? গঙ্গায় ডোবা? তোদের দেশে গঙ্গা আছে।

নিখিল ভয়ে ভয়ে বলিল, গঙ্গা নেই, তবে অন্য নদী আছে।

বসন্ত পুনরায় বলিল, তাতে জল আছে তো অর্থাৎ বারো মাস জল থাকে তো?

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, থাকে।

বসন্ত বলিল, তা হ'লেই হ'ল। একটা উপায় হবে এবং হওয়াই উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের মনে হইল সে-ই নিখিলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য।

ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়া বসন্ত বলিল, নিখিল, তোর মনের ভাবটা আমি বুঝেছি। কিন্তু তুই কি ষ্টুপিড্। একদিন থিয়েটার করেছিস্ বন্ধুদের সঙ্গে—বান্ধবীদের সঙ্গে নয়। তাতেই এত?

একটু সাহস পাইয়া নিখিল বলিল, ওতেও তো এক বন্ধু চিঠি লিখেছিল—বান্ধবী নয়। তাতেই কি না হ'তে পারত?

—না, তুই একেবারে 'হোপলেস', নিখিল। এত রকমের কল্পনা না ক'রে তুই এক কাজ কর্। একটা দিনের জন্য বাড়ী যা, সন্ধি করে আয়। ঠিক যখন তোর শর্ব্বরী জলে নামতে যাবে, তুই তার আঁচল টেনে বল্‌বি—সে কুন্দ ও সে সূর্য্যমুখী নারী নহে, পুরুষ। প্রমাণ—ঘরে তাদের স্ত্রী আছে। তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিখিল কিছু বলিল না; কিন্তু ভাবে বুঝা গেল, পরামর্শটা তাহার তেমন মন্দ লাগিল না।

ততক্ষণে উভয়ে মেসে আসিয়া পৌঁছিল। কড়া নাড়িতে ঠাকুর আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তখন অপর সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। যাহারা এইরূপ দেরী করিয়া আসে তাহাদের জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে—ইহাই মেসের সাধারণ নিয়ম।

হাত মুখ ধুইয়া লইয়া উভয়ে খাবার-ঘরে গিয়া খাইতে বসিল। বসন্তের প্রচুর ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে সমগ্র খাদ্য নিঃশেষে খাইয়া লইয়া বলিল, তুই যে কিছু খেলিনে, নিখিল? একেবারে ছেলেমানুষ!

বসন্তের কথার সুর এতক্ষণে একটু নরম হইয়া আসিয়াছিল। এতটুকু কোমলতাতেই নিখিলেশের চোখের কোণ আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে প্রায়-অভুক্ত অবস্থাতেই উঠিয়া পড়িল।

সারা রাত্রি নিখিলের বড় দুর্ভাবনায় কাটিল। ঘুম চোখে একেবারে আসিতে চাহে না। শেষ রাত্রে একটু নিদ্রা আসিল। তাহার মাঝেও সে স্বপ্ন দেখিল—বিজয়া নদীর জলে ধীরে ধীরে নামিতেছে। গলা জলে দাঁড়াইয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—তুমি তোমার কুন্দ ও সূর্য্যমুখীকে লইয়া সুখে থাক। আমি চলিলাম—বলিয়া সে অশ্রুসজল চক্ষে ডুব দিতে যাইবে এমন সময় নিখিলের নিদ্রা টুটিয়া গেল।

নিখিলের দুর্ভাবনা শতগুণে বাড়িয়া গেল। বসন্ত তখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তাহাকে এই দারুণ দুঃস্বপ্নের কথা বলিয়া মনটা একটু হালকা করিয়া লইবে তাহারও উপায় নাই।

বেলা সাতটার সময় বসন্তের ঘুম ভাঙ্গিল। নিখিলের শুষ্ক মুখ ও নিদ্রাবিহীন চক্ষুর পানে চাহিয়া বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি রাতে মোটেই ঘুমাস্ নি?

নিখিলের চোখে এবার সত্য সত্যই জল আসিয়া পড়িল। সে অতি ক্লিষ্ট-কণ্ঠে রাত্রির স্বপ্ন কথা বলিল।

সব শুনিয়া বসন্ত গম্ভীর মুখে বলিল, নিখিল, ডাক্তারি শাস্ত্রমতে তোর এ রোগকে হিষ্টিরিয়া বলা চলে। তোর রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন। এসব ক্রনিক বায়ুবৃদ্ধির ফল।

নিখিল কাতর স্বরে বলিল, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আমার মন বড় খারাপ হয়েছে।

বসন্ত পরিহাসের সুরে বলিল, শেষটা তোর জন্যে একখানা স্বপ্নদর্শন গোছের বই কিনতে হবে দেখছি। কিন্তু তুই নিজের মন নিয়েই অস্থির নিখিল, তোর বৌয়ের মনেও যে একটা অনুশোচনা উঠতে পারে—এটা তুই কিছুতেই ভাবতে পারছিস্ না!

নিখিল ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, তুমি যা বললে বসন্ত, তাই বোধ হয় ঠিক হবে। রাগ ক'রে অনুতপ্ত হওয়াই তার স্বভাবের প্রধান অঙ্গ।

বসন্ত বলিল, তবে কেন মিছামিছি ভেবে কষ্ট পাচ্ছিস্? এখন আমার কথা শোন্, আজ কলেজ ক'রে সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী যা, রাত্রেই পৌঁছবি।

বন্ধুর কথাগুলি নিখিলকে অনেকটা সতেজ করিয়া দিল। সে উঠিয়া স্নানাহার করিয়া নিয়মমত কলেজে গেল।

৪

ট্রেণ ছাড়ে ঠিক সাতটায়। মিনিট পনর পূর্ব্বেই নিখিল গাড়ীতে আসিয়া বসিল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে নিখিলের মনে হইল যেন আজ বহু বিলম্বে গাড়ী ছাড়িতেছে। নিজের ঘড়িতে সন্দেহ জন্মিল। ষ্টেশনের ঘড়িতেও দৃষ্টি পড়িতে দেখিল ঠিক সাতটা। সিনেমার কাহিনী, নিজের তন্দ্রাবস্থার স্বপ্ন, আসিবার সময়কার বিজয়ার অভিমানের স্মৃতি—সব মিলিয়া নিখিলের চিত্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। কোন চিন্তাতেই সে স্থির হইয়া মন দিতে পারিতেছিল না। ফলে সময় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর মনে হইতেছিল।

পিছন হইতে একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, নিখিলবাবু, আজ যে বে-বারে এবং বে-গাড়ীতে? কোন ছুটি-টুটি আছে নাকি?

নিখিল মুখ ফিরাইতে দেখিল একজন পরিচিত 'ডেলি-প্যাসেঞ্জার।' বলিল, না ছুটি কোথায়? বিশেষ একটা কাজ পড়ায় যাচ্ছি। কালই আবার ফিরতে হবে। আপনি বুঝি এই ট্রেণেই বরাবর ফেরেন?

ভদ্রলোক বলিল, শনিবারে 'চারটে দশ' নাই, অন্যবারে এই গাড়ীতেই যাই।

নিখিল সময় কাটাইবার একটা উপায় পাইয়া গল্প লইয়া বসিল। বলিল, ষ্টেশন থেকে নেমে তো আপনাকে অন্তত দুটি মাইল হাঁটতে হবে। পৌঁছুতে রাত নয়টা দশটা হবে বোধ হয়। আবার সেই ভোরে উঠে বেরুতেই হবে। কষ্ট নিশ্চয়ই হয়।

ভদ্রলোক মুখখানা যথাসম্ভব বিমর্ষ করিয়া বলিল, কষ্ট আর হয় না! কিন্তু উপায় কি? স্ত্রী মারা গেছে তিন বছর। তারপর থেকেই এই দুরবস্থা। দুটো ছেলে দুটো মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে, কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা তো করতে হবে। ছোট দুটো এমন নেওটা হয়েছে যে যত রাতই হোক্ না কেন, আমি বাড়ী না ফিরলে তারা ঘুমোবে না। কি বিপদেই যে পরিবার ফেলে গেছে তা ভগবান্‌ই জানেন।

নিখিল একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার স্ত্রী কি রোগে মারা যান্ জিজ্ঞাসা করতে পারি? প্রসবের সময় কি?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সে কথা আর বলেন কেন। ছিল সে খুবই ভাল। কিন্তু বড় অভিমানী। কথায় কথায় ছিল তার অভিমান। একদিন তাই নিয়ে সামান্য বচসা হয়। তার অভিমান সেদিন অগ্রাহ্য করে কলকাতা চ'লে আসি—তখন তো আর ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছিলাম না। ফিরে এসে তাকে আর দেখ্‌তে পাইনি। যেদিন চলে আসি সেই রাত্রেই সে আত্মহত্যা করে।

কথাটা শুনিবামাত্র নিখিলের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। আজ সে চারিদিকে কি দেখিতেছে, কি শুনিতেছে! সত্য সত্যই তাহার ভাবনা হইল আজ বাড়ীতে ফিরিয়া তাহার অদৃষ্টেই বা কি আছে।

ইহার পরে ভদ্রলোকটিকে একটা মৌখিক সান্ত্বনার কথা বলিতেও সে ভুলিয়া গেল। দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

হালিশহর আসিতে ভদ্রলোক নামিয়া গেল। গাড়ীতে ক্রমশই লোক কম হইয়া আসিতে লাগিল। কাঁচড়াপাড়া হইতে যখন গাড়ী ছাড়িল তখন সে কামরায় ছিল সে-ই একমাত্র আরোহী। গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল নিখিলের মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক ততই দাগ কাটিয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। শেষে মদনপুর গাড়ী থামিল। নিখিল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নামিয়া পড়িল।

টিকিট যে লইতেছিল সে নিখিলের পরিচিত। হাত পাতিয়া টিকিট লইয়া বলিল, এত রাত্রে যে!

এসব প্রশ্নের কোন অর্থ নাই; তাই উত্তরও তেমন থাকে না। যাহা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়া নিখিল ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল ও বাড়ীর দিকে দ্রুতবেগে চলিল।

কয়েক মিনিট একটানা বেগে চলিয়া পথের অর্দ্ধেক আসিয়া পৌছিল। বাড়ীর যতই কাছাকাছি আসিতে লাগিল, আতঙ্কটা ততই যেন বাড়িতে লাগিল। ক্রমশ দুটা বড় গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়া তাহাদের চুনকামকরা বাড়ী ঈষৎ দৃষ্টি-গোচর হইল। নিখিল গতি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করিয়া লক্ষ্য করিল—বাড়ী হইতে কোন কোলাহল বা কান্নাকাটির শব্দ আসিতেছে কি-না। বুঝিল কোন কিছু শব্দ শুনা যাইতেছে না। তাহা হইলে বাড়ীতে বিশেষ কিছু গোলোযোগ হয় নাই।

নিখিল এবার একটু আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। একটু চলিতেই সে তাহার শয়ন কক্ষের পার্শ্বে আসিয়া পৌছিল। জানালার নীচের অংশ বন্ধ। উপরের অংশ তখনো খোলা আছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ঘরের একদিকে সামান্য একটুখানি জমি বেড়া দিয়া ঘেরা। সেদিকের জানালাটার সবখানিই খোলা। বেড়া ডিঙ্গাইয়া জানালা দিয়া সে একবার উঁকি মারিল। দেখিল বিজয়া শয্যা ছাড়িয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। দুঃখে ও অনুতাপে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে অনুচ্চস্বরে ডাকিল—বিজয়া!

বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই মুহূর্ত্তে উভয়ের চোখোচোখি হইয়া গেল।

নিখিল মৃদুস্বরে বলিল, আস্তে দরজা খুলে দাও, কাউকে ডেকো না।

বিজয়াকে আর দুইবার একথা বলিতে হইল না। ধীরে ধীরে কক্ষের দুয়ার খুলিয়া বিজয়া বাহিরে আসিল। একটু পরেই দরজার কাছে আসিয়া পৌছিল। নিখিলও ততক্ষণ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়ার পায়ের শব্দ পাইয়া নিখিল বলিল, দুয়ার খোল, ভয় নাই, সত্যিই আমি।

সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার খুলিয়া গেল। নিখিল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সম্মুখে ফিরিবামাত্র বিজয়া একেবারে স্বামীর কক্ষলগ্ন হইয়া সেদিনের প্রতিজ্ঞামত সত্যই 'কিছু' খাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হইয়া স্বামীর বক্ষের মাঝে মুখ লুকাইল।

কবি-কথা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

বৌঠাকুরাণীর ব্যবহারে কবির মনে যে অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; উপরন্তু তাঁহারই ব্যবস্থায় তখনকার জনপ্রিয় নামী কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটায় বৌঠাকুরাণীর প্রতি কবির শ্রদ্ধাও নিবিড়তম হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজে যেমন ভাল রাঁধিতে পারিতেন, নিজের হাতের তৈয়ারী আহার্য্য প্রীতিভাজনদিগকে খাওয়াইতেও তেমনি ভালবাসিতেন। সুতরাং বালক-কবির অদৃষ্টে বৌঠাকুরাণীর আপন হাতের প্রস্তুত প্রসাদের আস্বাদ লইবার সুযোগ প্রায় প্রত্যহই ঘটিত। যে বিখ্যাত কবিকে বৌঠাকুরাণী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং যাঁহার প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রায়ই স্নেহভাজন দেবর-কবিকে খোঁটা দিয়া বলিতেন—'কস্মিন কালেও তুমি বিহারীবাবুর মত কবিতা লিখতে পারবে না' —তিনিই একদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান কবির সহিত স্নেহভাজন বালক-কবিকে পরিচিত করিয়া দিলেন। প্রবীণ কবির সহিত এই প্রথম পরিচয়-প্রসঙ্গে বালক-কবির রচিত একখানি কাব্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

কবি বিহারীলাল সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। প্রীতিভোজনে কবির বিশেষ নিষ্ঠা, ভোজন-বিলাসী বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও প্রচুর; কাজেই বৌঠাকুরাণী সযত্নে বিবিধ আহার্য্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় অভ্যাগত কবির পার্শ্বেই ঠাকুরবাড়ীর উদীয়মান কবিটির বসিবার আসন পড়িয়াছে। পাশাপাশি উভয়কে বসাইয়া বৌঠাকুরাণী সহসা মুখটিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—কবি-ভোজনের আগেই কিন্তু কিঞ্চিৎ কাব্যালোচনা করতে চাই।

কবি বিহারীলাল হাসিমুখে উত্তর দিলেন—এ ত জানা কথা; সরস্বতীর প্রসাদ পেতে হলে কাব্য-পরিচর্য্যা অপরিহার্য্য; অন্যথায় ভোজ্য লাভ নৈব চ, নৈব চ।

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—পূজার মন্ত্র কিন্তু আজ আলাদা, একেবারে নতুন। তা ছাড়া—আপনি শ্রোতা হয়ে শুনবেন, মন্ত্র পড়ব আমি।

একটু গম্ভীর হইয়া বিহারীলাল কহিলেন—ব্যাপার কি? দেবী কি নিজেই তা হ'লে মন্ত্র রচেছেন?

বৌঠাকুরাণী হাসিমুখে উত্তর দিলেন—মন্ত্র দেবীর নয়, আর এক কবির। সেইজন্যেই ত বলছিলুম—মন্ত্র আজ আলাদা, আর আপনি শুধু শ্রোতা। যদি খুশী মনে অনুমতি করেন, তবে পাঠের ব্যবস্থা করি।

প্রসন্নমুখে কবি কহিলেন—দেবীর যখন এত আগ্রহ, মন্ত্র তা হ'লে নিশ্চয়ই তেজোময়, প্রচুর আনন্দ পাওয়া যাবে, আর প্রসাদটিও আজ পরিতোষজনক হবে। তা হ'লে পুজা সুরু হোক।

আমাদের বালক-কবি এতক্ষণ সকৌতুকে শ্রদ্ধেয়া বৌঠাকুরাণী এবং

শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান কবিচূড়ামণির কথোপকথন শুনিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে নূতন আর এক কবির কথা উঠিতে তাঁহার অন্তরটি যেন দুলিয়া উঠিল ; কিন্তু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না—নূতন কবিটি কে ?

পরক্ষণে বৌঠাকুরাণী দেরাজ হইতে যে সুশ্রী খাতাখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে নিজের আসনে ফিরিয়া আসিলেন, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বালক-কবির উভয় চক্ষুর কালো কালো স্বচ্ছ তারা দুটি কপালের দিকে বুঝি ঠেলিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, ঐ খাতাখানি যে বালকের নিজস্ব ; আর ইহার পরিচিত পাতাগুলি তিনিই যে অতি সন্তর্পণে সমান আয়তনের সরু সরু অক্ষরে আগাগোড়া ভরাইয়া রাখিয়াছেন স্বরচিত 'কবি-কাহিনী' নামক নূতনতম কাব্যের কথাগুলি গাঁথিয়া ! খাতাখানি রহস্যময়ী সঙ্গিনীর হাতেই কবি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তাহা বৌঠাকুরাণীর দেরাজের ভিতর হইতে এ সময় কেমন করিয়া বাহির হইয়া আসিল ?

চিন্তায় আঘাত দিল বৌঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর—এমনি আমার ভুলো মন, এই ছেলেটির সঙ্গে এখনো আপনার পরিচয় করে দিইনি—অথচ ডেকে এনে একে আপনার পাশেই বসিয়েছি। বোধ হয় চেনেন না শ্রীমানটিকে ?

বিহারীলালের মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল ; পার্শ্বে উপবিষ্ট গম্ভীরপ্রকৃতি নির্ব্বাক ছেলেটির পানে অপাঙ্গে চাহিয়া কহিলেন—কবিদের যাচাই করবার শক্তি কষ্টিপাথরের চেয়ে বেশী-বই কম নয়। এক নজরে চেয়েই আমরা মানুষ চিনতে পারি, কস্‌বার দরকার হয় না।

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—তা হ'লে শুধু চেয়ে দেখেই এ ছেলেটিকে চিনে ফেলেছেন আপনি ? ভারি আশ্চর্য্য ত ! কিন্তু চিনলেন কিসে, আর কি চিনেছেন—দয়া করে বলুন না ?

পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বিহারীবাবু কহিলেন—কেন, এতে আশ্চর্য্য হবার মত ত কিছু নেই। এর ছিপছিপে লম্বা চেহারা আর গায়ের রঙটার জেল্লা জানিয়ে দিচ্ছে—এ ছেলে ঠাকুরবাড়ীর সোনারচাঁদ না হয়ে যায় না। এই বয়সেই প্রতিভায় ওর মুখখানা যেন জল্ জল্ করছে। জ্যোতিবাবুর অনুজ নিশ্চয়ই, আর আপনার 'দেবর-লক্ষণ'—নয় কি ?

হাসিমুখে বৌঠাকুরাণী কহিলেন—'দেবর-লক্ষণ' তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিভার কথা যা বললেন, আমি ত তার কিছুই খুঁজে পাইনে ওর মুখের পানে চেয়ে। গুণের মধ্যে দেখতে পাই, মেয়েলী-সুরে বেশ মিষ্টি ক'রে কবিতা পড়তে পারে। সেইজন্যেই ত আদর ক'রে ডেকে এনে আপনার ঠিক পাশেই বসিয়ে রেখেছি কবিতা পড়াবার জন্যে।

বিহারীবাবু সহাস্যে কহিলেন—বেশ ত, কাজ শুরু হোক ; বেশী গৌরচন্দ্রিকার কি দরকার।

বৌঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ খাতাখানি বিস্ময়বিহ্বল দেবরের হাতখানির উপর রাখিয়া এবং তীক্ষ্ণ হাসির ঝলকে তাহাকে বিব্রত করিয়া কহিলেন—আর দেরী নয়, চটপট পড়ে ফেল ; পড়তে ভাল পার বলেই কাব্যখানি পড়বার ভারটি দেওয়া হয়েছে তোমাকে। ফেল করলেই মুস্কিল, আর পাস করলেই রীতিমত ফলার।

বালক-কবি প্রথমে একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন, পরক্ষণে অল্প একটু হাসিয়া বৌঠাকুরাণীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন—ও, আমি বুঝেছি।

বালকের মৃদু কথা কয়টি চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বৌঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—কবিতাটির নাম হচ্ছে 'কবি-কাহিনী' ; ছেলেবেলা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত একটি মানুষের জীবন-কথাই এর বিষয়-বস্তু ; আর ঐ মানুষটি কোন রাজা-উজীর বা রাজপুত্র নন, যোদ্ধা যাদুকর বা অদ্ভুত রকমের কোন বাহাদুর পুরুষও নন ; তিনি হচ্ছেন অতি নিরীহপ্রকৃতির এক কবি-মানুষ। এঁরই মনের ছবি কবি এঁকেছেন এই কাব্যে।

বিহারীবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—বটে, তা হ'লে শোনবার আগেই না-বলে পারছিনে, মানুষের মন নিয়ে যিনি কারবার করতে সাহস পেয়েছেন, তিনি বাহাদুর। আচ্ছা, পড় ত খোকা—

দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কথাগুলি বুঝি বালক-কবির মনের সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া দিল, তাঁহার অন্তরে যে উৎসাহের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, কণ্ঠেও তাহার আভা পড়িল। বালক-কবি আবেগের সুরে তাঁহার সযত্ন-রচিত এবং স্বহস্তে লিখিত ১১৮৫ লাইনের ক্ষুদ্র কাব্যখানি কবিচূড়ামণি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে পড়িয়া শেষ করিলেন।

পড়ার পরেও ঘরখানির ভিতরে কাব্যের শেষ মর্ম্মবাণীর রেশ যেন সুগন্ধস্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহে সঞ্চারিত হইতেছিল :

"প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে ;
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।"

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন—কাব্য ত শুনলেন, এখন বিচার করুন। আপনার অভিমতটি আবার কবিকে জানাতে হবে। তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

বিহারীবাবু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিলেন—কবি যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন, আমি তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে তাঁকে অভিনন্দিত ক'রে জিজ্ঞাসা করতুম, দৃষ্টিভঙ্গির এমন কঠোর সাধনা তিনি কতকাল ধরে চালিয়েছেন ?

মুখের হাসি সযত্নে চাপিয়া বৌঠাকুরাণী প্রশ্ন করিলেন—আপনার বিচারে তা হ'লে এই কবিটির দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্য্য রকমের, আর অনেক কিছু দেখেশুনেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ?

কণ্ঠে জোর দিয়া বিহারীবাবু উত্তর করিলেন—নিশ্চয়ই। এই কবির দৃষ্টি শুধু পরিচিত ক্ষুদ্র গণ্ডীটির ভিতরেই আবদ্ধ নয়, তিনি সমস্ত জগতের দিকে চেয়ে বিশ্বমানবের সত্যকার রূপটি দেখবার চেষ্টা করেছেন ; মাত্র একটি বালিকার প্রেম নয়, বিশ্ব-প্রেমের একটা অস্পষ্ট আলোর আভাও তাঁর কাব্যের উপর পড়েছে।

বিস্ময়ের সুরে বৌঠাকুরাণী বলিলেন—তাই নাকি, কিন্তু কবিতাটি পড়ে আমি ত মোটামুটি এইটুকুই বুঝিছি, কবির ছেলেবেলার ছেলে-খেলা, আর তার প্রেমিকা বালিকাটির কথাতেই কাব্যের বেশী ভাগ ভ'রে আছে। বাকিটুকু হচ্ছে—প্রিয়ার মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাস, ক্রমে শান্তিলাভ, পরে বৃদ্ধ বয়সের কতকগুলো এলো-মেলো চিন্তার উচ্ছ্বাস। এইখানেই কাব্যখানি শেষ হয়েছে'।

বিহারীবাবু চুপ করিয়া বৌঠাকুরাণীর সমালোচনা শুনিতেছিলেন ; আর কাব্যখানির প্রকৃত কবির কোমল অন্তরটি তখন আবেগ ও উত্তেজনায় বুঝি তোলপাড় করিতেছিল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা আগ্রহ তাহার চোখের তারা দুটিকে মজলিসের সর্ব্বাধিক সম্মানভাজন মানুষটির মুখে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার মন্তব্যটুকু শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিল।

বিহারীবাবু হাসিমুখে ঘাড়টি একটু নাড়িয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—কিন্তু কবি বেচারীর প্রতি যে অবিচার করা হ'ল বৌ-মা, লেখার কথা আমি ধরচিনে, হয় ত খুঁত থাকতে পারে—সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার চোখের উপরে কাব্যের কবিটির মূর্ত্তিখানি যেন আগাগোড়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, আর তার মুখ থেকে এমন একটা সুরের ঝঙ্কার উঠে কানে বাজছে যাতে বেশ নতুনত্ব আছে, মোটেই একঘেয়ে নয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বৌ-ঠাকুরাণী কহিলেন—আপনি নিজেই কবি মানুষ কি-না, তাই কাব্যের কবিটির চেহারাখানিও আপনার চোখে ধরা পড়েছে, সেইসঙ্গে কাব্যের সুরটুকুও কানে ঝঙ্কার দিচ্ছে। আমরা কিন্তু কিছুই ধরতে পারিনি। যাই হোক, সমালোচনাটি আপনিই করুন, শুনে জ্ঞান সঞ্চয় করি।

একটু গম্ভীর হইয়া বিহারীবাবু কহিলেন—সমালোচনা আমি করব

না, আর ও-কাজে আমার আস্থাও তেমন নেই। আমি শুধু কাব্যের কবি-নায়কের আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছি কাব্যের লেখক-কবির রচনা থেকেই—বলিয়াই তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট রবির দিকে হাত খানি বাড়াইয়া কহিলেন—খাতাখানি দাও ত বাবা—

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বালক-কবি শ্রদ্ধাভাজন কবির করকমলে 'কবি-কাহিনী'র পাণ্ডুলিপিখানি সসম্ভ্রমে সমর্পণ করিলেন।

বিহারীবাবু প্রথম পৃষ্ঠাটি খুলিয়াই বলিলেন—এই কাব্যের কবি তাঁর নায়ককে শৈশব থেকেই কবিসুলভ মনোবৃত্তি দিয়েই গড়ে তুলেছেন। সে নিজের মনেই প্রকৃতির কোলে খেলা করে বেড়ায়:

জননীর কোল হ'তে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।

এর পরেই দেখি, শিশু শৈশবের গণ্ডী পার হয়েছে, গতিও তার বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নি; গৃহের ক্ষুদ্র আবেষ্টন এখন আর তাকে ধরে রাখতে পারে না, বৃহত্তর প্রকৃতির দিগন্তবিসারী কোলে অবাধে খেলা করে বেড়াচ্ছে:

যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
'দেখিত ধান্যের শীষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি' গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে,
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।

যৌবনে পড়েও নায়ক-কবি প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্রটি একইভাবে বজায় রেখেছেন দেখতে পাই:

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতিদেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

কিন্তু প্রকৃতিকে সঙ্গিনীর মত পেয়েও কবির আশা মেটেনি। তিনি আরও নিবিড়ভাবে তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এই বিরাট রহস্যময়ীর জ্ঞাত অজ্ঞাত দুটো দিকের সকল অংশগুলি নিখুঁতভাবে দেখে ঠিক মত তাকে জানবার—উপলব্ধি করবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আকুল করে তোলে। তাই রাত্রির আঁধারে সমস্ত জগত যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নির্ভীক কবি তখন একা পর্ব্বত-শিখরে উঠে সবার অলক্ষ্যে তার সাধনা শুরু করেন, ঘুমন্ত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে বলেন:

শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব-চরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি' হে আদি জননী,
শাবকের মতো এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটি কবির স্বচক্ষে দেখা; প্রত্যেক রূপটি কবির অন্তরে দোলা দিয়েছে, তাকে মুগ্ধ করেছে। প্রলয় রূপ দেখে কবি বলছেন:

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বত-চূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মতো
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব।
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হ'তে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা-দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।

রাত্রির রূপে মুগ্ধ কবি বলছেন আবেগের সুরে:

অমা-নিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার-গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।

উষার রূপে তন্ময় হয়ে কবি স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রকৃতির উদ্দেশে বলছেন:

কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষার—
হাসি-হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মতো
আধ-ঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি।

কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের বিপুল সৌন্দর্য্যও ক্রমে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াল, কবির মনে এল অরুচি। শুধু প্রকৃতির সুষমা এখন আর কবিকে তৃপ্তি দেয় না, কবি উপলব্ধি করেন একটা অভাব, যেন তাঁর বুকের ভিতরটি খালি; মন আবার দুলে উঠল সেই শূন্য অংশটি পূর্ণ করবার চিন্তায়:

এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?
মনের মন্দির-মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

ভেবে ভেবে কবি অনুভব করলেন—প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ মানুষের মন মুগ্ধ করতে পারে, আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু মানুষের বিশাল অন্তরটি তাতে ভরে না, এখানে প্রয়োজন—মানুষের মন। তাই কবি উপলব্ধি করলেন এতদিনে:

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

এই মনটির সন্ধানে কবি এবার বন-ভ্রমণে বেরুলেন। তাঁর বিশ্বাস, বনের মধ্যেই মানুষের মনটির সন্ধান পাবেন। একদা সারাদিন ভ্রমণের পর কবি শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়েছেন:

হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে—
কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার,
নয়নে বহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদ ময়
কি দুখে উদাস হয়ে করিছ ভ্রমণ?

নির্জ্জন বনের মধ্যে এভাবে সহসা মানুষের মুখে মনের কথা শুনে কবি আনন্দে অভিভূত হলেন, মনে হ'ল—এতদিনে বনদেবী বুঝি বালিকার মূর্ত্তি ধরে মানুষের মনের সন্ধান দিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর হৃদয়ের দুয়ারটি তখনি তার কাছে খুলে দিলেন। বালিকাও খুশী হয়ে অন্তর দিয়ে কবিকে আহ্বান করল—ঐ যে বিজন বন দেখছ, ওখানে আমার পর্ণকুটীর, আমার সাথে তুমি চল। আরও বলল:

আমার বীণাটি ল'য়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।

বালিকার অনুরোধ কবি উপেক্ষা করতে পারলেন না, তার পর্ণকুটীরে গিয়ে উঠলেন। বালিকার ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করল; তিনি দেখলেন, বালিকাও তাঁর মত প্রকৃতির ভক্ত; তার সঙ্গে মিলে মিশে বনের পশু-

পক্ষীর সাথেও দিব্যি ভাব করে ফেলেছে সে। কবি ক্রমে বালিকার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়ে উঠল। উভয়েই উভয়কে ভালবেসেছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মিলন হয়ে গেল। বনবালা তার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা উজোড় করে কবির উপরে ঢেলে দিল, কিন্তু কবির মন তাতে ভরল না ; উন্মত্তের মতন কবি প্রিয়াকে বলেন :

—আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢালো ভালবাসা হৃদয়ে আমার।
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা।

প্রিয়তমের আকুলতা প্রিয়তমাকে অবাক করে দেয়, সে ভেবে পায় না—একথার কি অর্থ। সে ত সর্ব্বান্তঃকরণে কবিকে ভালবেসেছে, সর্ব্বস্বই ত সে কবির পায়ে উৎসর্গ করেছে, তবে? বালিকার মনের কথা বুঝি কবির মনের তারে ঝঙ্কার দিয়েছিল ; তাই একদিন অর্থটা তিনিই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন—কবিদের মন কি অল্পে তুষ্ট হয় দেবী? হৃদয় তাদের এতবড় যে অল্পে ভরতে চায় না। আরো বললেন :

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী,
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম আছে যাহাদের মন,
তাহাদের তরে দেবী, নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিয়ে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙেচুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তারা আকুল বিলাপে।

বালিকার বুকটি বুঝি কেঁপে উঠল একটা অজানা আতঙ্কে, সুন্দর মুখখানি তুলে গাঢ়স্বরে উত্তর করল :

যা ছিল আমার কবি, দিয়াছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমার প্রেমে দিছি বিসর্জ্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর,
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।

কিন্তু কবির আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। যা কোথাও পাওয়া যায় না, কবি তাকেই আয়ত্ত করতে চান। একদিন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মেশাতে চেয়েছিলেন একাঙ্গ হয়ে ; এখন তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—প্রিয়ার হৃদয়ের সাথে এমন করে নিজের হৃদয়টি মেশাবেন, দেহের আড়াল যাতে ঘুচে যায়। নিজের মনেই প্রশ্ন ওঠে :

ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি,
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?

ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে কবির আশা মেটে না, কিসে এ ভালবাসা সার্থক করতে পারেন—তাও ভেবে পান না। নিজের মনেই আক্ষেপ করেন :

আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না, চাহিতেছি যাহা।

অজানা অপরিচিত পদার্থটি না পেয়ে,আর সেটির মধ্যেই জীবনের পরিতৃপ্তি ভেবেই কবি একদিন তারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। দেশের পর দেশ ঘুরলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না সেই অজানা পদার্থটির সন্ধান। দুর্গম যাত্রাপথে তাঁর কানে বাজে কুটীরবাসিনী বনবালার মর্ম্মবাণী :

কেন ভালবাসিলে আমায়?
কিছুই নাহিক গুণ, কিছু জানি না আমি,
কি আছে? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয়?

কবির অন্তর বুঝি আকুল হয়ে উঠল এই মর্ম্মবাণীর আকর্ষণে। অবশেষে নিষ্ফল পর্য্যটনের পর ক্লান্ত কবি এক দিন ফিরে এলেন সেই পূর্ব্ব-পরিচিত গহন বনে—বনবালার পর্ণ-কুটীরে। দেখলেন, আগেকার মতই আর সব ঠিক আছে, বাহ্য প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি ; পাখী তেমনি গান গাইছে, বায়ু তেমনি ঝর ঝর করেই বইছে ; কিন্তু তাঁর প্রিয় জীবন-পুষ্পটিই শুধু শুখিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আর কবির মিলন হ'ল না। কবি দেখলেন :

শীতল তুষার 'পরে
বালিকা ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে কবি অনুভব করলেন এতদিন পরে—মানুষ নিকটের পদার্থকে অবহেলা করে অজানার সন্ধানে যখন দূরে চলে যায়, তার ফল কিন্তু বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সে তখন নিকটের জানা বাক্তিটিকে হারায়, দূরের অজানাটিকেও খুঁজে পায় না। প্রিয়ার মৃত্যুর পর কবি শোকে অভিভূত হলেন। সেই শোকার্ত্ত অবস্থাতেই তাঁর মনে একটা শক্ত প্রশ্ন জেগে উঠল—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্যই কি সব নিঃশেষ হয়ে যায়, মৃত্যুর পরে আর কি কিছু থাকে না? মানুষ কি তবে :

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিশায়ে তাহাতে!
এই ভালবাসা যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?

জগতের পানে প্রকৃতির পানে তাকাতেই তাদের গতি যেন কবির চোখের সামনে ভেসে উঠে ; তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—কালের স্রোত একই ভাবে বয়ে চলেছে অনন্ত কালের বুকে। প্রকৃতি সেইভাবেই বিভিন্ন রূপের বিকাশ ক'রে মানুষের মনে দোলা দিচ্ছে। সবাই কাজে ব্যস্ত, নীরবে কেউ বসে নেই :

সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীর মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া।

কালের কাণ্ড দেখে কবিও শোকতাপ ভুলে গেলেন, কালের তরঙ্গে তিনিও ভেসে চললেন, চিন্তাকে সাথী ক'রে।

কবির জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে আমরা দেখছি—সারা যৌবন ও প্রৌঢ়কাল চিন্তার সাধনা করে তিনি এখন বৃদ্ধ, মাথার চুলগুলি শনের মত সাদা হয়ে গেছে—জট ধরেছে ; মুখশ্রী শান্ত, গম্ভীর। হিমালয়ের গগনভেদী তুষারশুভ্র শিরোদেশের শোভা দেখতে দেখতে কবির মনে জেগে উঠল বিশ্বমানবের দুর্গতি, মানব-সভ্যতার নামে চরম অনাচার, স্বাধীনতাহীন মানবের হীনতার নিকট আত্মবিক্রয়। কবি যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখছেন :

দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার ক'রে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা।
যে-পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হাত মাতারে তার পরায় শৃঙ্খল
সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন—সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন—সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল—সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্ব্বল—বলের পদে আত্ম-বিসর্জ্জিতে।

মানব-সভ্যতার নামে চরম বর্ব্বরতা কবির প্রাণে নিদারুণ ব্যথা দিয়েছে ; তাই কবির কণ্ঠ থেকে আবেগ-কম্পিত স্বরের ঝঙ্কার উঠছে :

সামান্ত নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান-অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া।
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার।

জ্বালার পর শান্তি; কবির অন্তরও ক্রমে শান্ত হ'য়ে এল। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবার প্রাক্কালে দূর ভবিষ্যতের পানে চেয়ে কল্পনার দৃষ্টিতে যে মনোরম ছবিখানি কবি দেখতে পেলেন, তাতেই তাঁর অন্তর ভ'রে গেল, সারাজীবনের চিন্তার সাধনা সার্থক হ'ল, সত্য বুঝি বিশ্বপ্রেমের আলেখ্যখানি তুলে ধরল তাঁর সম্মুখে, কবি দেখলেন:

এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিয়াছে কোটি কোটি মানব-হৃদয়।
নাহিক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।

বিশ্বমানবের এই মহামিলনী দেখতে দেখতে কবির চোখের তারা দুটি দীপ্ত হয়ে চিরদিনের মতন নিবে গেল।

হাতের খাতাখানি নিকটের আধারটির উপর রাখিয়া শ্রান্তকণ্ঠে কবি বিহারীলাল কহিলেন—আলোচনাটা বোধ হয় একটু বেশী লম্বা হয়ে গেল—নয়?

বৌঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি, আমাদের আনন্দটুকু ঐ অনুপাতে লম্বা হ'য়ে গেছে। একে নতুন কাব্য, তায় আপনার মতন বিখ্যাত কবির মুখে তার আলোচনা—

বিহারীবাবু কহিলেন—কিন্তু আমার আলোচনা হচ্ছে এখানে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কাব্য; কাজেই প্রশংসার বেশীটুকু পাওয়া উচিত কাব্য-কর্ত্তা কবির—যিনি লিখেছেন।

একটু গম্ভীর হইয়া বৌঠাকুরাণী এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন কবিকে—কাব্যখানি সত্যিই তাহলে আপনার ভাল লেগেছে?

বিহারীবাবু সহজকণ্ঠে উত্তর দিলেন—ভাল না লাগলে এতখানি সময় আমি কি শুধু শুধু ক্ষুধা বাড়াবার জন্যে অপচয় করেছি, বউমা? সত্যই, কবির পরিকল্পনাটি আমার সমস্ত মনটা নেড়ে দিয়েছে। সাধারণ দুটি প্রাণীর ছবি আঁকতে আঁকতে কবি বিশ্ব-মানবের মিলনের যে ছবিখানি এঁকে ফেলেছেন, সেটি সত্যই অদ্ভুত, আমি মুগ্ধ হয়েছি।

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—কিন্তু এই কাব্যের কবিটিকে যদি আপনি দেখেন, এমনি অপ্রস্তুত হবেন যে; আমাদের সঙ্গে হয়ত এর পর কথাই বলবেন না আর।

সকৌতুকে বিহারীবাবু কহিলেন—তাই নাকি! কিন্তু তা হ'লে ত অন্ধকারের মধ্যে আনাড়ী মানুষটিকে ফেলে রাখাও আর উচিত হচ্ছে না, বউমা! অপ্রকাশকে এখনি প্রকাশ ক'রে সংশয়টি ভঞ্জন করা হোক।

মুখের হাসি আরও তীক্ষ্ণ করিয়া বৌঠাকুরাণী কহিলেন—আমি কিন্তু জানতুম, কবি মানুষেরা দিব্যদৃষ্টিতে অনেক কিছুই দেখতে পান—

বিহারীবাবু সহাস্যে কথাটার উত্তরে কহিলেন—আর প্রদীপের নিচেই অন্ধকার—একথাটাও যে কবিরাই তৈরী করেছেন, সেটা ভুলে যাবেন না, বৌমা।

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—এখানে কিন্তু বিকল্পে ব্যতিক্রম হয়েছে;—নিচে নয়, আপনার ঠিক পাশেই যে!

আমাদের বালক-কবি এ সময় সুবৃহৎ সোফাটির ভিতরে জড়সড় ভাবে বসিয়া ঘামিতেছিলেন। কাব্য-আলোচনার সময় তাঁহার অন্তরটিও বুঝি পাখা মেলিয়া বিজন বনে—হিমাদ্রির শিখরে চিন্তাকুল কবির সাথে সাথে ছুটিতেছিল, এখন আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন সময় বৌঠাকুরাণীর ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলি তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, সুন্দর মুখখানি লজ্জায় সিঁদূরের মত লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমালোচক কবির মুখের প্রশস্তি তাঁহার মনের সমস্ত সঙ্কোচ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। পার্শ্বের আসনখানির দিকে ঝুঁকিয়া সঙ্কুচিত কবি-বালককে সবলে তাঁহার বিপুল দেহের দিকে টানিয়া বর্ষীয়ান কবি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—আরে ছোকরা, ডিঙ্গি বেয়ে কিস্তি মেরে ব'সে আছ এই বয়েসে! সরাসরি একবারে সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি? এখন তোরে নিয়ে কি করি বল্—কোলে করে নাচবো, না দেশশুদ্ধ সবাইকে ডেকে তোর কাব্য শোনাব?

কবির আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া বৌঠাকুরাণী মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন, এইবার সুযোগ বুঝিয়া ঈষৎ পরিহাসের ভঙ্গিতে কহিলেন—সর্ব্বনাশ! করচেন কি আপনি? এর পর আপনার ছোকরা-কবির পা দুটি কি আর মাটিতে পড়বে ভেবেছেন? এই ভয়ে আমি যে ওকে বরাবর খাটো করেই রেখেছিলুম।

বিহারীবাবু সহাস্যে কহিলেন—কিন্তু কবির কাব্য-ভাণ্ডারের চাবিটি আপনিই ত নিজের হাতে খুলে দিয়েছেন মা-লক্ষ্মী?

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—তখন কি ভেবেছিলুম যে খেলা-ঘরের ভাঁড়ার দেখে আপনিও মশগুল হবেন—অত সুখ্যাতি তার করবেন? ওর মনের সাধ কি জানেন—আপনার সারদামঙ্গল-এর মতন কবিতা লিখবে। আমার কাছে ও কথা তুললেই আমি বলতুম—কস্মিনকালেও তুমি কবি হতে পারবে না, বরং সর্ব্বদা ভাববে—'মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী' :আমি 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।' একথা শুনে কবিযশপ্রার্থীর মুখখানি কি রকম রাঙা হয়ে উঠত—তা যদি দেখতেন!

বিহারীবাবু কহিলেন—তা হ'লে আপনি সত্যই কবির প্রতি অবিচার করতেন। আমি জোর গলায় বলচি, আমাদের বালক-কবি ভেলায় চড়েই সমুদ্দুর পার হয়েছেন। বড় হয়ে আমাদের কবি মানোয়ারী জাহাজ চালিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী তোলপাড় করবে দেখবেন। কি বল কবি, বাড়িয়ে বলেছি কি?

বালক-কবি এবার মৃদু হাসিয়া কহিলেন—বৌঠানের কথাই ঠিক—'মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী—গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।'

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—এটা হচ্ছে অভিমান! কবিমানুষের মন খুঁজেই অস্থির, আমি কবি-মনের খবর রাখি।

বিহারীবাবু কহিলেন—সে কথা মিছে নয়। আপনি খবর না রাখলে এত শীগগীর কি কবিকে আমরা খুঁজে পেতুম। যাই হোক, আজ থেকে আমিও একটি নতুন বন্ধু পেলুম। আলোচনা আমাদের জমবে ভালো। মনে কোন সঙ্কোচ রেখো না কবি, আমার বাড়ীতে এখন থেকে নিত্যই যাওয়া চাই—বুঝলে?

বালক-কবি হাসিয়া কহিলেন—নিশ্চয় যাব; দেখবেন—কালই গিয়ে হাজির হয়েচি।

বালকের পিঠটি চাপড়াইয়া বিহারীবাবু কহিলেন—লজ্জা তা হ'লে ভেঙেছে, বেশ; এই ত চাই। কিন্তু দেখো বাবাজী, আমার বাড়ীর তেতালার নিরেলা ছোট ঘরখানির মেঝের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কবিতা বাঁধছি দেখে লজ্জায় যেন পিছিয়ে এসো না—বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বৌঠাকুরাণীও সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিলেন—পেছবার ছেলে ও নয়, দেখবেন তখন—আপনার পাশেই জেঁকে বসেছে। যাক্, অনেক ত খেটেছেন, খাবার ব্যবস্থা এবার করি?

সহাস্যে বিহারীবাবু কহিলেন—নিশ্চয়ই, খাটুনীর মজুরী ভাগাভাগি করেই নেবো—দুই কবি পাশাপাশি বসে; কি বল হে মিতে?

হাসিতে হাসিতে বৌঠাকুরাণী কহিলেন—আগে থেকেই ভেবে-চিন্তে তাই দুই কবিকে পাশাপাশিই বসিয়েছিলুম।

১৩

কবি বিহারীলালের সহিত আমাদের বালক-কবির ঘনিষ্ঠতা এখন গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কবি এখন দিনে দুপুরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে যান। সেখানে তেতালার ছোট ঘরখানির ভিতরে পথের কাজ-করা মসৃণ মেঝেটির উপরে বসিয়া উভয়ের মধ্যে কবিতা ও সঙ্গীতের চর্চ্চা হয়; প্রবীণ ও নবীনের প্রাণ-খোলা আলাপে ঘরখানি মুখরিত হইয়া ওঠে।

বালক-কবির প্রতিভার রশ্মিটুকু ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে এখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দিকে প্রায় প্রত্যেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু কবির খ্যাতি একটি ছেলেকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে। এই ছেলেটির নাম প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুরবাড়ীর পরিজনদের কেহ না হইলেও এবাড়ীতে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও কবির সহিত তাহার বন্ধুত্ব ঘটে। কিন্তু কবির কোন কবিতাকেই তাঁহার এই বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুটি কোন দিনই ভাল বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহার ধারণা—এসব বালক-কবির পাগলামী বা ছেলেখেলা মাত্র। এমন কি, নামী কবি বিহারীলালের প্রশংসাও তিনি প্রসন্নমনে স্বীকার করিয়া লন নাই, মুখ বাঁকাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন—এর নাম ব্যাজস্তুতি। ছেলেমানুষের কবিতা শুনে 'যাচ্ছে তাই' না ব'লে 'বেড়ে হয়েছে' বলেছেন।

বন্ধুর কথাটা কবির মনে ভারি আঘাত দিয়াছে। পড়িবার ঘরে বসিয়া কথাটা ভাবিতেছেন, এমন সময় পা দুটি টিপিয়া টিপিয়া কবির সেই রহস্যময়ী সঙ্গিনীটি চিন্তামগ্ন কবির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর কবিকে সহসা চমকিত করিয়া কহিল—আমি জানি তোমার কি হয়েছে।

চমকিত কবির বেদনাতুর মুখখানি সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সচকিত দুটি চোখের তারাও বুঝি হাসিতে ভরিয়া গেল; হাসিমুখে কহিল—তুমি কি সর্ব্বদর্শী, আমার মনের ভিতরটাও দেখতে পাও?

হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া বালিকা উত্তর করিল—কেন মশাই, তুমিই ত বলেছ—আমি তোমার মানসী। নইলে এমন ক'রে মনের কথা বলতে পারি? কবি-কাহিনীর কবির কথা কি তা হ'লে মিছে? তুমিই ত বলেছ—মানুষের মন চায় মানুষেরই মন!

কবিও হাসিয়া কহিলেন—তুমি এলেই আমার মুখ যেন বন্ধ হয়, আর মনের দরজাটি খুলে যায়।

ফিক করিয়া হাসিয়া বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—তা ত যাবেই, আমি যে—মানসী। তোমার মনের কথা আমার মুখ দিয়ে ফুটে বা'র হয়—এই ত তুমি চাও। এখন কথা শোন—তোমার ঐ বাচাল বন্ধুটিকে আচ্ছা করে জব্দ করা চাই, বুঝলে?

বিস্ময়ের সুরে কবি কহিলেন—সর্ব্বনাশ, তুমি ত দেখছি জাঁহাবাজ মেয়ে—

সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কহিল—নইলে ডাকাতি ক'রে মনের কথাটি টেনে বার করতে পারি? কিন্তু যা বললুম, করা চাই।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া কবি প্রশ্ন করিলেন—কি করে জব্দ করব? সে কি সোজা ছেলে ভেবেছ!

তেমনি হাসিয়া বালিকা কহিল—তোমার চেয়েও শক্ত নাকি? বেশ ছেলে যাহোক, খালি খালি নিজেকে খাটো করছ? ভাবো না, জব্দ করবার উপায় ঠিক খুঁজে পাবে। ঐ যে মাষ্টার মশাই আসছেন, আমি পালাই।

বলিতে বলিতেই বালিকা পাশের দরজাটি দিয়া এক ছুটে ভিতরে চলিয়া গেল। কবির মনের তারে তাহার কথাগুলি যেন ঝঙ্কার দিতে লাগিল—ভাবো না, উপায় ঠিক খুঁজে পাবে।

প্রত্যহ এই সময় পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবিকে পড়াইতে আসেন। এদেশের ও বিদেশের প্রাচীন কবিদের কবিতাবলী তিনি এই অদ্ভুত মেধাবী ছাত্রকে বুঝাইয়া দেন, আবার ছাত্রের মুখে তাহাদের ব্যাখ্যা শুনেন। তাঁহাদের কবিতার অনুকরণে ছাত্র-কবিকেও নিজের ভাষায় কবিতা লিখিতে হয়। এদিন কথায় কথায় অনুকরণের কথা উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—যাদের প্রতিভা থাকে, মৌলিক রচনার শক্তি থাকে, তাঁদের পক্ষেই বিখ্যাত লেখকের রচনার অনুকরণ করা সম্ভব। সে রচনার একটা নতুন রূপ প্রকাশ হয়ে ওঠে, পাঠকেরা পড়ে আনন্দ পান! কিন্তু অক্ষম লেখকদের হাতেই এই অনুকরণ 'হনুকরণ' বা অপহরণ হয়ে দাঁড়ায়, আর সেগুলো হয় সাহিত্যের আবর্জ্জনা। বিলাতে তোমারি বয়সী একটি ছেলে—নাম হচ্ছে তার চ্যাটার্টন—বড় বড় ইংরেজ কবিদের রচনার নকল ক'রে এমন চমৎকার কবিতা লিখতেন যে, অনেকেই প্রথমে তা ধরতে পারেননি। ম্যরিস, রসেটি, ব্রাউনিং-দম্পতির কবিতাও ত তুমি পড়েছ, এঁরাও ইটালীর আধুনিক কবিদের কাব্যের অনুকরণে কবিতা লিখে খুব খ্যাতি পান।

শিক্ষকের কথায় আনন্দ ও উৎসাহের আলোকে বালক-কবির মুখখানি যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সঙ্কোচের যে আঁধারটুকু ছিল, তাহাও বুঝি পলকের মধ্যে সরিয়া গেল। শিক্ষকের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কবি কহিলেন—দেখুন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে আমার ভারি ভাল লাগে ব'লে তারই অনুকরণে আমিও কতকগুলো কবিতা লিখিছি, আপনাকে লজ্জায় দেখাইনি; কিন্তু আজ আপনার কথায় মনে সাহস হচ্ছে—পড়ে আপনাকে শুনাতে। যদি বলেন—

পণ্ডিত মহাশয় প্রসন্নমুখে কহিলেন—বলাবলি কি, আরো আগে তোমার দেখানো উচিত ছিল আমাকে। দেখছি, তোমার লজ্জা আর সঙ্কোচ এখনো কাটেনি, কিন্তু এ দুটোকে কাটাতে হবে। যাক্, তোমার কবিতা বা'র কর আমি শুনব।

পদাবলীর অনুকরণে লেখা কবিতাগুলি কবির দফ্তরেই ছিল, বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। প্রায় একটি ঘণ্টা ধরিয়া কবিতাগুলি শুনিবার পর পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের উদ্দেশে প্রশস্তি বাচন করিলেন—একেই বলা চলে সত্যিকার অনুকরণ; এমন অনেক সমজদার আমাদের সমাজে আছেন, যাঁরা শুধু বাইরেটা একনজরে দেখতেই অভ্যস্ত, ভিতরে সেঁধুতে চান না—তাঁদের কাছে তোমার কবিতাগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের লেখা পদাবলী বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়। আমি দেখছি, তোমার প্রতিভা একটা দিকেই নয়—চারদিক দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। অনুকরণেও তুমি ওস্তাদ।

শিক্ষকের উচ্চ প্রশংসায় বালক-কবির নেত্রমণিদুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে মনের মণিকোঠা হইতে তাঁর সেই মানসীর বাণী যেন কর্ণপটাহে সশব্দে ঝঙ্কার তুলিল—ভাবো না, উপায় ঠিক খুঁজে পাবে।—পরক্ষণে কবির কোমল মুখটি সত্যসত্যই যেন ইস্পাতের মতন শক্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার দিকে বন্ধু প্রবোধচন্দ্র আসিলেন কবির সহিত গল্প জমাইতে। এই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়েরা প্রাচীন কবিদের "কাব্য সংগ্রহ" ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের সংগৃহীত এবং বহুযত্নে প্রকাশিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' পড়িতে বা সংগ্রহ করিতে অনেকেই আগ্রহান্বিত। প্রবোধচন্দ্রের কথার মাত্রাই এখন হইয়াছে প্রাচীন পদাবলীর অতি পরিচিত দুই-চারিটি ব্রজবুলি। বালক রবিকে অপ্রস্তুত করিতে তাহাই সদাসর্ব্বদা শুনাইয়া দেন, অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া বলেন—হ্যাঁ, একেই বলে আসল কাব্য, কানে ঢুকলেই প্রাণ একেবারে তর্!—আজ দুপুরে বিদ্যাপতির পদাবলী পড়ছিলুম, এখনো যেন কানে বাজছে—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহত নয়;
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয়।"

আহাহা—কি সুন্দর রচনা, রস যেন পদ্ম চুঁয়ে ঝরে পড়ছে।

মুখখানি তুলে মৃদুস্বরে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—পদাবলীটি কার বললে ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবির সুকোমল মুখখানি বিদ্ধ করিয়া প্রবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন—বলেছি ত আগেই, শোননি ! আর কার—বিদ্যাপতির। আজ দুপুরে তাঁকে নিয়েই পড়েছিলুম। তুমি ত ওসব ছোঁবে না, তা ছাড়া বোঝাও শক্ত, বিদ্যে চাই—বুঝলে !

মুচকি হাসিয়া কবি কহিলেন—রসের কথা তুলে কিন্তু বে-রসিকের মতন গোড়াতেই যে গলদ করে বসলে !

চোখ দুটি কপালের দিকে তুলিয়া বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কথার মানে ?

হাসিমুখে কবি কহিলেন—মানে হচ্ছে, পদটির রচয়িতা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি নন।

মুখখানা বাঁকাইয়া বন্ধু প্রতিবাদ করিলেন—বিদ্যাপতি নন, বললেই হ'ল অমনি, আমি নিজের চোখে দেখিছি !

ধীর-কণ্ঠে কবি কহিলেন—তর্কে দরকার কি, চণ্ডীদাস আনাচ্ছি, পদটা তাতেই জ্বল্ জ্বল্ করচে দেখতে পাবে।

বন্ধু এবার নরম হইয়া সুর পাল্টাইলেন, কহিলেন—থাক্ আর আনতে হবে না, এখন মনে হচ্ছে—চণ্ডীদাসই বটে ; নামটা আমি গুলিয়ে ফেলেছিলুম। তা যারই হোক, দুজনেই ত পদকর্ত্তা, কিন্তু কেমন মিষ্টি রচনা বল দেখি ; অমন লিখতে পারো—তবে বলি—হ্যাঁ, লিখতে শিখেছ।

সহজকণ্ঠে প্রসন্নমুখে কবি উত্তর দিলেন—খেপেছ তুমি, ওঁদের পদের মানেই সব বুঝতে পারিনে, ওঁদের মতন লিখব আমি ? হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা সুখবর তোমাকে দিচ্ছি শোন ; সমাজের লাইব্রেরীর পুরোনো বইগুলি খুঁজতে খুঁজতে আর এক প্রাচীন কবির হাতে লেখা একখানা পুঁথী আবিষ্কার করে ফেলেছি। পদকর্ত্তার নাম হচ্ছে ঠাকুর ভানু সিংহ ; চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক তিনি, আর পদগুলি এমনি চমৎকার যে শুনলেই লাফিয়ে উঠবে তুমি, এখনো ছাপার হরফে বেরোয়নি।

সংবাদটি শুনিতে শুনিতেই বন্ধুর আগ্রহ সীমা অতিক্রম করিবার জো হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন—বল কি, তা হ'লে ত তুমি দুর্লভ রত্ন আবিষ্কার করেছ দেখছি ! তা, আমাকে দেখাবে না ?

একটু গম্ভীর হইয়া কবি কহিলেন—দেখাতে আপত্তি নেই, তবে আসলটি কিন্তু এখনো আনা হয়নি ; তা থেকে কতকগুলো পদ কাপি ক'রে আজ এনেছি। তোমার যদি ভাল লাগে, পরে আসলটি এনে দেখাব।

কণিকরা পদগুলি শুনিবার জন্য বন্ধুর বিপুল আগ্রহ দেখিয়া কবিকে তখন প্রাচীন কবিদের অনুকরণে রচিত পদাবলীর খাতাখানি বাহির করিয়া পড়িয়া শুনাইতে হইল। কবি পড়িতে শুরু করিলেন :

"গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহু কী ভয় তাহারে,
ভয়-বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি'
পন্থ দেখায়ব মোর।
ভানু সিংহ কহে, "ছিয় ছিয় রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয়সে মরণসে
অব তুঁহু দেখো বিচারী॥"

বন্ধু এবার ধৈর্য্য হারাইয়া বিপুল উল্লাসে সরবে বলিয়া উঠিলেন—বিউটিফুল ! এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও লিখতে পারেন নি। আসল পুঁথীখানি যেমন করে হোক আনা চাইই, আমি সেখানি প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ছাপবার জন্যে অক্ষয়বাবুকে দেখিয়ে বলব—দেখুন প্রাচীন পদকর্ত্তা ঠাকুর ভানুসিংকে আবিষ্কার করেছি। চারদিকে অমনি হৈ হৈ পড়ে যাবে।

কবি এখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিলেন—তা হ'লে ত ভারি ভাবিয়ে তুললে আমাকে দেখছি !

সবিস্ময়ে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ?

কবি কহিলেন—আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, এ লেখা সত্যিই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হাত দিয়ে বেরুতে পারে না। আর ঠাকুর ভানুসিংহ বলে দুনিয়ায় কেউ নেই, ঠাকুর আমার পদবী, আর ভানু মানে রবি। আসলে লেখাগুলি আমার।

বন্ধুর মুখে আর কথা নাই ; হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তাহার পর শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন—বটে ! হ্যাঁ, নিতান্ত মন্দ হয়নি এ লেখাগুলো।—বলিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ইহার পর কবিবন্ধুর লেখার আলোচনা করিতে আর তিনি কোন দিন সাহস পান নাই।

বন্ধুর প্রস্থানের পরেই মধুর হাসির শব্দে ঘরখানি মুখরিত করিয়া কবির রহস্যময়ী সঙ্গিনী দেখা দিল। মুখখানি মচকাইয়া ভুরুদুটি বাঁকাইয়া কহিল—কেমন জব্দ ! যা বলেছিলুম, এখন ত তাই হ'ল।

হাসির আলোর ঝলকে কবির মুখখানিও ভরিয়া গেল ; বালিকার মুখের পানে চাহিয়া উল্লাসের সুরে কহিলেন :

নয়নে ওঠে যে আভাষি,
হাসি ছড়ায়ে এসেছে মানসী।

বালিকা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—শুধু হাসি ছড়িয়ে নয়, জয়-পতাকা উড়িয়ে।

কবি কহিলেন—সত্যি, তুমি যদি প্রেরণা না দিতে, আমার ঐ দুরন্ত বন্ধুটিকে এত শীঘ্র এমন ক'রে হারাতে পারতুম না।

—প্রেরণা তুমি বরাবরই পাবে তোমার দীর্ঘ জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত—আর এমনি ক'রেই সকলকে হারাবে।

—কিসে বুঝলে বল ত ?

—ভাবলেই বুঝতে পারবে।

—ভাবতে বসলেই দেখি—আমি হয়েছি মস্ত কবি।

—আর আমি হয়েছি তোমার মানসী।

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আশা ও আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা এবং প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া যুদ্ধের আরও চারিটি সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, রণক্ষত পৃথিবীর বয়স বাড়িয়া গেল আরও একটি মাস, কিন্তু প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য কোন রণাঙ্গনেই যুদ্ধের অবস্থায় বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে নাই। ইয়োরোপের রণক্ষেত্রে অক্ষশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট রুশিয়া এখনও সাফল্যজনকভাবে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, সুদূর প্রাচীর রণাঙ্গনে প্রবল জাপ আক্রমণের চাপে উপযুক্ত সৈন্য ও সমরোপকরণের অভাবহেতু বৃটিশ বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। একদিকে অক্ষশক্তি আত্মরক্ষার্থ পশ্চাদপদ, অপরদিকে একের পর এক ভূঅঞ্চল দখল করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রসর—যেন এক বিরাট তুলাদণ্ডে ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্যই পূর্বস্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ চলিতেছে!

সুদূর প্রাচীর অভিযান

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের অবস্থা পর্যালোচনা করিবার সময় 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যায় আমরা জাপ বাহিনীর রেঙ্গুনাভিমুখে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই সময়েই রেঙ্গুনের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। জাপ বাহিনীর অগ্রগতির কৌশল ও রেঙ্গুন বন্দরের ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যায় আমরা দেখিয়াছিলাম যে জল এবং স্থল উভয় দিক হইতে রেঙ্গুন যদি আক্রান্ত হয় তাহা হইলে রেঙ্গুনের পক্ষে সিঙ্গাপুরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা দুঃখের হইলেও বিস্ময়ের হইবে না। আমাদের এই আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই আমরা অধিকতর সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা হয় নাই। রেঙ্গুন রণক্ষেত্রেও বৃটিশ বাহিনীকে আর একবার পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য সিঙ্গাপুরে মিত্রশক্তি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, রেঙ্গুন রণক্ষেত্রে তাহা সে বিস্মৃত হয় নাই। রেঙ্গুন অবরুদ্ধ হইবার পূর্বেই বৃটিশ বাহিনী নিরাপদে সরিয়া গিয়া জাপ সেনানায়কগণকে বৃটিশ সৈন্য বন্দী করিবার আশায় নিরাশ করিয়াছে, সহর পরিত্যাগের পূর্বে 'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণ করিয়া সমস্ত সহরটি জ্বালাইয়া দিয়া ভস্মাচ্ছাদিত ভূমি ব্যতীত শত্রুর জন্য আর কিছুই রাখিয়া যায় নাই। কিন্তু বৃটিশবাহিনী সাফল্যজনকভাবে পশ্চাদপসরণে সক্ষম হইলেও রেঙ্গুনের যুদ্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

সমগ্র মালয় এবং দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে জাপান যে কৌশল অবলম্বন করিয়া শত্রুকে বাধাদানে রত বৃটিশ বাহিনীর প্রচেষ্টা বিফল করিয়াছে, রেঙ্গুনের যুদ্ধেও সেই কৌশলই অবলম্বিত হইয়াছে। জাপান কোন স্থানে আক্রমণ পরিচালনার পূর্বে বিমান হইতে সেই অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে, তাহার পর সেই অঞ্চল ও তত্রস্থ বাহিনীকে মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। কুয়ালা-লামপুর, বাটু পাহাং প্রভৃতি বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপানকে আমরা এই কৌশল অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। রেঙ্গুন অভিযানকালে জাপ-বাহিনী যখন সিটাং নদী অতিক্রম করে সেই সময়ে ধারণা করা হইয়াছিল যে, জাপ বাহিনী রেলপথ ধরিয়া দক্ষিণে রেঙ্গুন অভিমুখে অগ্রসর হইবে। জলপথে বিশেষ কোন ভৌগলিক বাধা না থাকায় বৃটিশ বাহিনীর আত্মরক্ষার অসুবিধার কথাও কর্তৃপক্ষ মহলে আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু জাপবাহিনী সিটাং অতিক্রম করিয়া সোজা দক্ষিণাভিমুখে না ছুটিয়া পশ্চিমে রেঙ্গুন-প্রোম পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। বাহিনীর অপর একাংশ পেগুর দিকেও অগ্রসর হয়। জাপানের ইচ্ছা ছিল ইরাবতী নদীর নিম্নাঞ্চল এইভাবে মূল ভূভাগ হইতে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে, রেঙ্গুনে যুদ্ধরত সৈন্যগণকে তাহা হইলে মূল সৈন্যবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব হইবে। সিঙ্গাপুরের ন্যায় রেঙ্গুনকেও সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সেই সময় বঙ্গোপসাগর হইতে জাহাজযোগে জাপ সৈন্য রেঙ্গুনের দক্ষিণে অবতরণ করে। ফলে রেঙ্গুন ও পেগুতে যুদ্ধরত বৃটিশ সৈন্যকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। ফলে জাপ অবরোধ ভঙ্গ করিয়া বৃটিশ বাহিনীর প্রোমের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ থাকে না। প্রথম আক্রমণ বিফল হওয়ার পর পেগুতে যুদ্ধরত বৃটিশ বাহিনীর সহায়তায় জাপ বাহিনী ভেদ করিয়া বৃটিশ সৈন্যদল প্রোমের পথে প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার। পেগু হইতে রেঙ্গুনের পথে সিটাং নদীর পশ্চিম তীরে উন্মুক্ত প্রান্তর থাকিলেও জাপ বাহিনী অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়াই রেঙ্গুন-প্রোম পথের দিকে অগ্রসর হয়। জেনারেল ওয়াভেল ব্রহ্মের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনায় অসুবিধা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জাপ-বাহিনী অরণ্য যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছে। উন্মুক্ত প্রান্তর অপেক্ষা অরণ্য পথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টাই তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী অরণ্য যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া বিরাট বাহিনী পরিচালনায় অসুবিধা অনেক। এক বিশাল বাহিনীকে সমরেখায় শত্রুর অভিমুখে পরিচালন জঙ্গলে সম্ভব হয় না, প্রয়োজনমত লক্ষ্য স্থির করাও অসুবিধাজনক হইয়া ওঠে। শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ রক্ষা করাও হয় কঠিন। কিন্তু জাপ বাহিনী অরণ্য অঞ্চলে যুদ্ধে বিশেষ পটু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া হাল্কা সমরোপকরণ সহ সমগ্র বনাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া স্ব স্ব দায়িত্বে তাহারা অগ্রসর হয়। নির্দিষ্ট গতিতে কোন বিশেষ পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়া, প্রতিপক্ষের সৈন্যদলের কোন নির্দিষ্ট অংশে আঘাত হানা প্রভৃতির জন্য তাহাদিগকে অধিনায়কের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন করে না। সুযোগ ও সুবিধামত অগ্রসর হওয়া, একাধিক দলের সহিত সংযোগ রক্ষা, আক্রমণের সময় ও স্থান নির্ণয় ইত্যাদি

যাবতীয় করণীয় কার্যাদি ক্ষুদ্র দলগুলি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী নিজ দায়িত্বে করে। কিন্তু এই সকল সুবিধা বৃটিশ বাহিনীর নাই। আধুনিক রণনীতির সহিত অভ্যস্ত না হইবার ফলেই এই অসুবিধা। সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া মাসের পর মাস যুদ্ধ করা, বিশাল বাহিনী লইয়া রণক্ষেত্রে সকল যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া স্থিতি-যুদ্ধের যুগে বিশেষ কার্যকরী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আধুনিক রণনীতিতে তাহা আর বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। স্থিতি-যুদ্ধের যুগে রণনীতি ও রণকৌশল (strategy and tactics) নির্ভর করিত সমগ্র বাহিনীর অধিনেতার নির্দেশের ওপর; কিন্তু বর্তমানের গতি যুদ্ধে রণপরিকল্পনা (strategy) পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত হইলেও রণকৌশল (tactics) নির্ভর করে প্রতি সৈনিকের ওপর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সৈন্যেরা অগ্রসর হয় এবং রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে কোন্ দুর্বল স্থানে কিরূপে আঘাত হানিতে হইবে তাহার দায়িত্ব সেই ক্ষুদ্র দলের সৈন্যদের উপরই অর্পণ করা হয়, নিজেদের বিবেচনা মত তাহারা অগ্রসর হয়, আক্রমণ পরিচালনা করে, পশ্চাতে হটিয়া আসে। দলের সংখ্যাল্পতা ও স্বল্প সমরোপকরণের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর, পার্বত্য পথ অথবা বনাঞ্চল সকল স্থানেই সহজে প্রয়োজনমত অগ্রসর হওয়া চলে, প্রাকৃতিক বাধা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে না। জেনারেল ওয়াভেল সমর-নীতির এই অবস্থার প্রতি অবহিত হইয়াছেন, কাজেই ভবিষ্যতে উত্তরব্রহ্মের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী জাপানের এই কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

রেঙ্গুন হইতে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়াছে। উত্তর ব্রহ্মে যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বে জাপবাহিনী সপ্তাহ কাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটাইয়াছে। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ—পেগু ও রেঙ্গুনের চতুষ্পার্শ্বে জাপ বাহিনী পরিখাদি খনন করিয়াছে। জাপানের সামরিক তৎপরতা হ্রাস আসন্ন আক্রমণের পূর্বাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে জাপানের সামরিক তৎপরতা পুনরায় ধীরে ধীরে আরম্ভ হইতেছে। রেঙ্গুন-মান্দালয় ও রেঙ্গুন-প্রোম পথে জাপবাহিনী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, থারাবডি নাকি জাপ বাহিনী ইতিমধ্যে দখল করিয়া লইয়াছে। রেঙ্গুনের যুদ্ধ শেষ হইবার পর জাপান যে মান্দালয় অভিমুখে অগ্রসর হইবে একথা আমরা রেঙ্গুনের পতনের পূর্বে 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যাতেই উল্লেখ করিয়াছি। উত্তর ব্রহ্মে জাপানের গতি কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবে, তাহাদের অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্য কি এবং লক্ষ্য কোথায়, বৃটিশ বাহিনীর নিকট হইতে কোন্ কোন্ স্থানে তাহাদের বাধা পাওয়া সম্ভব—সকল আলোচনাই আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর বিগত সংখ্যাতেই করিয়াছি। ঐ সকল অভিমত পরিবর্তনের কোন কারণ এযাবৎ ঘটে নাই, কিন্তু পুনরুল্লেখ হইতে বিরত থাকার উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে আর দ্বিতীয়বার উহা লইয়া আলোচনা করিলাম না।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধেও বৃটিশ বাহিনী জাপ সেনার বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। জাভার যুদ্ধ মিত্রশক্তির অনুকূলে শেষ হয় নাই, টিমর দ্বীপ জাপান হস্তগত করিয়াছে, পোর্টমর্সবি, ডারউইন ও উইণ্ডহামে জাপ বোমাবর্ষী বিমান হইতে প্রচণ্ড বোমা বৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রশক্তির বিমান বাহিনীও টিমর, লে এবং রবাউলে বোমা বর্ষণ করিয়াছে, কয়েকটি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ এবং সাবমেরিণকে ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করা গিয়াছে। জাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্য, আক্রমণের গতি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা পত্রান্তরে আলোচনা করিয়াছি—পুনরুল্লেখ বাহুল্য হেতু নিষ্প্রয়োজন।

ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্র

বিগত চারি সপ্তাহে রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি পূর্বের ন্যায় রুশের অনুকূলেই চলিয়াছে। লেনিনগ্রাড, খারকভ, ক্রিমিয়া, প্রতি অঞ্চলেই সোভিয়েট সৈন্যের প্রবল আক্রমণ চলিয়াছে, স্থানে স্থানে জার্মানবাহিনী পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারে নাই। কার্চ উপদ্বীপে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু হইয়াছে। খারকভ রণাঙ্গনে ফন্ বোক-এর বাহিনী রুশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সচেষ্ট। সোভিয়েট সাঁড়াশি-বাহু দুইদিক হইতে ওরেলকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ডোনেৎস্ অববাহিকা ও টাগারনগের উত্তরপূর্বে রুশ বাহিনীর আক্রমণ চলিয়াছে প্রচণ্ডবেগে। মধ্য রণাঙ্গনে জেনারেল জুকোভের সৈন্যদলও বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতেছে। ষ্টারায়া রুশায় ষোড়শ নাৎসী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত নূতন জার্মান সৈন্য প্রেরিত হইলেও রুশ অবরোধভঙ্গ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। খারকভে যুদ্ধের অবস্থা যেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে হিটলার স্বয়ং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ফন্ ব্রাউচিৎস্‌কে পুনরায় জার্মান বাহিনীর প্রধান-সেনাপতির পদে নিয়োগ করিয়া খারকভের যুদ্ধে শেষ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে উক্ত রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইয়াছে। ফন্ ব্রাউচিৎসের পুনর্নিয়োগ যে গুরুত্বপূর্ণ ইহা নিঃসন্দেহ। সোভিয়েট শক্তির প্রবল আক্রমণে ক্রমপশ্চাদপর বিহ্বল নাৎসীবাহিনীর মনে নৈতিক শক্তি পুনর্জাগ্রত করিবার জন্য হিটলার বিপর্যয়ের কারণস্বরূপ ফন্ ব্রাউচিৎস্‌কে দায়ী করিয়া তাঁহাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং নাৎসী বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের গতি তাহাতে পরিবর্তিত হয় নাই। নাৎসী বাহিনীর বাৎসরিক উৎসবে কয়েকদিন পূর্বে হিটলার ক্রিমিয়া হইতে যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে বলেন যে ক্রিমিয়ার বরফ গলিতে শুরু করিয়াছে, অবিলম্বে সোভিয়েট শক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার আয়োজন সর্বতোভাবে সম্পন্ন করা হইতেছে, এ অবস্থায় হিটলারের পক্ষে জার্মানীতে স্বয়ং উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। সেইজন্যই তিনি রণক্ষেত্র হইতে বাণী পাঠাইয়া নাৎসী বাহিনীকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ রণাঙ্গনে বিশেষ দক্ষিণ অঞ্চলে বরফ পড়া এখনও শেষ হয় নাই, নাৎসীবাহিনীর প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের সংবাদও আজ পর্য্যন্ত রয়টার আমাদিগকে পরিবেশন করেন নাই। উপরন্তু, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ এবং মধ্য রণাঙ্গনে সর্বত্র সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতির কথাই আমরা আজও শুনিয়া আসিতেছি। সোভিয়েট বাহিনীর প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ যে বিশেষ গুরুতর

পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে উহাতে সন্দেহ নাই, স্বয়ং হিটলারের সন্ত্রস্ত ভাবই সোভিয়েট শক্তির প্রাচুর্য এবং নাৎসী বাহিনীর ক্রমপরাজয়জনিত দুর্বলতার বিষয় নগ্নভাবেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ইহারই ফলে গৃহীত পদ পরিত্যাগ করিয়া দৃপ্ত হিটলারকে আজ পদচ্যুত ব্রাউচিৎস্‌কেই সেই স্থানে পুনর্নিয়োগ করিতে হইয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতে জার্মানী রুশিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতি-আক্রমণ পরিচালনা করিবে বলিয়া শাসাইয়া আসিতেছে, তাহার গতি কিরূপ হইবে এবং কতখানি সাফল্য তাহা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব সে সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যায় বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। উভয় পক্ষের শক্তি, সমরোপকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রত্যেক বিষয়েই বিস্তৃত আলোচনা হওয়ায় বর্তমান সংখ্যায় আমরা তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। তবে নাৎসী অভিযানের অপর একটি দিক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কোন কোন সমর-বিশেষজ্ঞের মতে জার্মানী অদূর ভবিষ্যতে ককেশাশে আক্রমণ পরিচালনা করিবে; আবার অপর কেহ মনে করেন তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্মানী দক্ষিণ ককেশাশের দিকে অভিযান করিবে। এই সকল বিভিন্ন ধারণা হওয়া বিশেষ বিস্ময়ের নহে। বিশেষ আঙ্কারাস্থ জার্মান দূত ভন প্যাপেনের আবাসগৃহের অনতিদূরে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়, তাহা হইতে অনেকেই এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছেন যে জার্মানী তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য এইভাবে একটা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া লইল। কিন্তু জার্মান-তুরস্ক সম্বন্ধে এইভাবে অতি দ্রুত কোন সমাধানে উপনীত হইবার পূর্বে অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। জার্মানী সমগ্র শীতকালে রুশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, আগামী বসন্তে রুশিয়াকে প্রবল প্রতিঘাত হানা তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। নাৎসী সৈন্য-বাহিনীর নৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। অবশ্য তুরস্কের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও উক্ত উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়, উপরন্তু তুরস্কের মধ্য দিয়া দক্ষিণ ককেশাশের তৈলখনি বাটুম পর্য্যন্ত তাহা হইলে জার্মানীর হস্তগত হইতে পারে। কিন্তু আরও এক বিষয়ে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আমেরিকাস্থ রুশ-দূত মিঃ লিট্‌ভিনফ্ বারম্বার মিত্রশক্তিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে নূতন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে একই সময়ে একাধিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধের ফলাফল আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে। হিটলার এ পর্য্যন্ত যে সকল সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে একের পর এক দেশকে তিনি পদানত করিয়াছেন বটে, কিন্তু একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়া একাধিক রণাঙ্গনের সৃষ্টি তিনি করেন নাই। বর্তমানে যদি তুরস্কের মধ্য দিয়া হিটলার বাটুমের তৈলখনির প্রলোভনে অভিযান পরিচালনা করেন তাহা হইলে প্রাচ্যের সম্মিলিত বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে অপর একটি নূতন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে হিটলারের পক্ষে কৃষ্ণসাগরে রুশ নৌশক্তি খর্ব করা প্রয়োজন, পূর্ব ভূমধ্য সাগরেও অধিকার বিস্তার আবশ্যক এবং শেষোক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধেও সমধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এদিকে রুশ সমরাঙ্গনেও দুই হাজার মাইল রণক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন হইবে বলিয়া বোধ হয়। মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানীর অভিযান কোন্ উদ্দেশ্যে কি ভাবে করা সম্ভব সে সম্বন্ধে আমরা "ভারতবর্ষ-"এর গত মাঘ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং বর্তমানে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট।

রুশ-জাপান সম্পর্ক

অনতিবিলম্বে জাপান রুশিয়া আক্রমণ করিবে কি না তাহা লইয়া যথেষ্ট গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। জাপান জার্মানীর মিত্র। বর্তমানে জার্মানী রুশিয়ার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত। ফলে জাপ-জার্মান সম্পর্ক অনুযায়ী রুশিয়াও জাপানের শত্রু। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে রুশিয়া। সমষ্টি যুদ্ধের (total war) ভবিষ্যৎ গতি নির্ভর করিতেছে রুশ যুদ্ধের ফলাফলের উপর। রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর আগামী বসন্ত বা গ্রীষ্মাভিযান যদি সফল না হয়, রুশিয়া যদি ইয়োরোপের রণাঙ্গনে জার্মানীকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে সমষ্টি যুদ্ধের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে যথেষ্ট, জাপানের উপরও এই প্রতিক্রিয়া আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। আজ যদি জার্মানী রুশিয়ার নিকট পরাজিত হয়, তাহা হইলে সুদূর-প্রাচীর যুদ্ধও জাপানের অনুকূলে চলিবেনা। সুতরাং ইয়োরোপের রণাঙ্গনে জার্মানীকে বাঁচাইয়া রাখাও জাপানের প্রয়োজন। এদিকে আদর্শবাদের দিক দিয়াও জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে মৈত্রী সম্ভব নয়। ভ্লাডিভষ্টক হইতে জাপানের দূরত্ব যথেষ্ট নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করেনা। রুশিয়ার শক্তির পরিচয়ও সম্প্রতি লাভ করা গিয়াছে। ঘরের পাশের প্রতিবেশীর এতাদৃশ ক্ষমতা উপেক্ষা করাও জাপানের পক্ষে সম্ভব নয়। মাঞ্চুকুও সীমান্তে জাপান পূর্ব হইতেই যথেষ্ট সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। এই সকল কারণে অদূর ভবিষ্যতে রুশ-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকে নিঃসন্দেহ হইয়া পড়িয়াছেন।

কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধ বিষয়গুলিও চিন্তা করা প্রয়োজন। জার্মানী আগামী বসন্তে রুশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য জাপানকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়া প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করিতে চায় ইহা সত্য, কিন্তু জাপানের পক্ষে যে কোন মুহূর্তে রুশিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া সম্ভব কিনা তাহাও বিচার্য।

রুশিয়ার সহিত জাপানের স্থায়ী মৈত্রী যেরূপ সম্ভব নয়, তেমনই রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পূর্বে তাহার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে জাপানের নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। একটা প্রশ্ন বিশেষ জটিল সমস্যার আকারে দেখা যায়: রুশিয়া যদি পূর্ব ও পশ্চিমে একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উভয় রণাঙ্গনে তাহার পক্ষে সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব হইবে কিনা এবং শেষ পর্যন্ত তাহা রুশিয়ার অনুকূলে যাইবে কি? যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে একই সময়ে একাধিক রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যে

আশঙ্কার বিষয় তাহা আমরা জানি। রুশিয়া ইয়োরোপে এক শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত। ইহার উপর যদি সাইবেরিয়া জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে পূর্ব রণাঙ্গনে শত্রুকে উপযুক্ত বাধাপ্রদান রুশিয়ার পক্ষে সম্ভব হইবে কি? দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনার প্রধান অসুবিধা হইতেছে রাষ্ট্রের সমগ্র সামরিকশক্তিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া উভয় রণক্ষেত্রে সমান মনোযোগ প্রদান এবং প্রয়োজন মত ত্বরিত গতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। এক রণক্ষেত্রে শত্রুর চাপ যদি প্রবল হয় তাহা হইলে অপর রণক্ষেত্র হইতে সাময়িকভাবে সৈন্য আনিয়া শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সত্বর দ্বিতীয় রণাঙ্গনে অভাব পূরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। রণক্ষেত্রের দূরত্ব অনুযায়ী যাতায়াত ও সরবরাহে বিলম্ব ঘটে, তদুপরি সংযোগ ব্যবস্থা যদি বিঘ্নসঙ্কুল হয় তাহা হইলে বিপদের গুরুত্ব আরও বেশী। গত গ্রীষ্মে রুশ রণাঙ্গনে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সময় এই অসুবিধার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রুশিয়া লাভ করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্মানীর প্রবল চাপ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মার্শাল বুদেনী দক্ষিণ রণাঙ্গন হইতে যে সৈন্য সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন, তাহারই ফলে দ্রুত ওডেসার পতন সম্ভব হয়। কিন্তু রুশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা এরূপ নয়। সুদূর ভূখণ্ডকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুশিয়া বহু পূর্ব হইতেই তাহার সামরিক ব্যবস্থা যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত করিয়াছে। ভ্লাডিভষ্টক যে বহুদিন হইতেই জাপানকে প্রলুব্ধ করিতেছে ইহা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত নয়। সেই উদ্দেশ্যে সাইবেরিয়া রক্ষার জন্য পশ্চিম-রুশিয়া নিরপেক্ষ সামরিক বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপীয় রুশিয়ার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; মস্কোর উপর উহা নির্ভরশীল নহে। সৈন্য, সামরিক উপকরণ, রণসম্ভার সমস্তই ইহার পৃথক। এখানকার সৈন্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল ব্লুচার। এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ন্যায় ইহার সমর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। মার্শাল ব্লুচারের অধীনে সাইবেরিয়ায় ত্রিশ লক্ষ সৈন্য সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রতিদিন বহু নূতন বাহিনীকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। বিমান, রণসম্ভার প্রভৃতি সাইবেরিয়ার ভৌগলিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্মিত ও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতেছে। রুশিয়া বহুবার জানাইয়াছে যে, ইয়োরোপের রণক্ষেত্রে নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত পূর্বপ্রান্ত হইতে কোন সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। রুশিয়ার এই উক্তি সত্য হওয়া বিশেষ বিস্ময়ের নহে। কারণ, জার্মান আক্রমণে বাধা প্রদানের নিমিত্ত যদি সাইবেরিয়া হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণাদি প্রেরিত হইত তাহা হইলে হীনবল সাইবেরিয়াকে সেই অবস্থায় আক্রমণ করিবার সুযোগ জাপান বোধ হয় পরিত্যাগ করিত না। এতদুপরি জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করিলে তাহার বিপদও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে। ভ্লাডিভষ্টক হইতে টোকিওর দূরত্ব বিমান পথে আদৌ নিরাপদ নয়। টোকিওর লোকসংখ্যাও যথেষ্ট এবং তথাকার অধিকাংশ গৃহাদি কাষ্ঠনির্মিত। ফলে সাইবেরিয়া আক্রমণ করিলে জাপান রুশিয়াকে যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে, রুশিয়ার প্রতি-আক্রমণে জাপানকে তদপেক্ষা যথেষ্ট অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর ও ব্রহ্মের যুদ্ধেও জাপান বর্তমানে নিযুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরে ইঙ্গ-মার্কিণ যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত অষ্ট্রেলিয়ায় তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করা প্রয়োজন। কিন্তু এখনও তাহা জাপানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ব্রহ্মের যুদ্ধেও মাত্র প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়াছে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির এখনও যথেষ্ট দেরী। ভারত মহাসাগরে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যবস্থাও এখনও শেষ হয় নাই। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং সেখানে জাপান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম ভারত মহাসাগরে প্রতিষ্ঠা লাভ এখনও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কলম্বো অধিকার করিতে না পারিলে তাহা সফল হওয়াও দুষ্কর। রবার, টিন প্রভৃতি কাঁচা মালের দ্বারা জার্মানীকে সাহায্য প্রদান করিতে হইলে এডেনের পথে জার্মানীর সহিত তাহার সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন হইবে। বিজিত অঞ্চলসমূহে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ আবশ্যক। কিন্তু খাস জাপান এবং তাহার রাজধানী যদি বিপদাপন্ন হয় তাহা হইলে উপরোক্ত সকল ব্যবস্থাই যথেষ্ট বাধা পাইবে এবং জাপানের পক্ষে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজনানুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করাও যথেষ্ট দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। এতদ্ব্যতীত, সাইবেরিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা হইতে সাহায্য লাভ পূর্ব রুশিয়ার পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য হইবে না, উপরন্তু জাপানের বিপদ ইহাতে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে। জাপান কর্তৃপক্ষ এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। চীনের সহিত একটা চরম মীমাংসা করাও এপর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই সকল কারণেই জাপান এখনও মস্কোতে দূত প্রেরণ করিতেছে। রুশিয়ার সহিত মৎস্য ধরিবার চুক্তির মেয়াদ সেই জন্যই সে বর্দ্ধিত করিতে সচেষ্ট। মিত্রতার আচরণের অন্তরালে জার্মানীর ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অক্ষশক্তির সহযোগী জাপান যে কুণ্ঠিত নয় ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও রুশিয়াকে আক্রমণ করিবার ক্ষেত্র ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে দূত বিনিময় বা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রতি জাপানের মনোযোগী হইবার প্রয়োজন হইত না। তবে জাপানের সহিত রুশিয়ার মৈত্রী যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না ইহা অবধারিত সত্য, একথা বারম্বার আমরা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলি নাই। কাজেই জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ যে অনিবার্য ইহাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু এই সত্য কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে জাপান যে জাল নিক্ষেপ করিয়াছে তাহা গুটাইয়া ডাঙ্গায় তোলা প্রয়োজন। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অতর্কিতে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে জাপান যেরূপ আমেরিকার সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা চালাইয়া কালবিলম্ব ও ইত্যবসরে আপনার সমরায়োজন সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিল, রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পূর্বেও তেমনই দূত বিনিময়, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার অবসর সে গ্রহণ করিবে।

সমষ্টি যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

বর্তমান বিশ্বসংগ্রামে ভারতের অবস্থা কি তাহা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত কয়েক সংখ্যাতে বিশদভাবে আলোচনা

করিয়াছি। পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামের উত্তাপ দেহে না লাগাইয়া ভারতের পক্ষে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করা যেরূপ অসম্ভব, বর্তমান যুদ্ধের রূপকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতাও সেইরূপ ভারতের আছে। অথচ ভারতের সাম্প্রতিক অবস্থা ত্রিশঙ্কুর দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। শান্তিপ্রিয়, নিরস্ত্র ভারতবাসীর স্থান আজ কোথায় তাহা মিঃ চার্চিলের বক্তৃতায় নগ্নভাবে প্রকাশ পাইবার পর ভারতের উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেন ও ভারতের বিপদ যে পৃথক নয় তাহা ভারতবাসীর নিকট অস্পষ্ট নাই, জাপান ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকুক এ কামনাও কোন ভারতবাসী করে না। ফ্যাসিস্ত বিরোধী ভারতবর্ষ বিশ্ব-ফ্যাসিস্ত বিরোধী সংগ্রামে বৃটেনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফ্যাসিস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রয়োজন উদ্দীপনার, প্রয়োজন চাকাটি ঘুরাইয়া দেওয়ার। শুধু ভারতবাসী নয়, বৃটেনে কমন্সের সদস্যরাও অনেকে এই কথা একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভারতকে বুঝিতে দেওয়া হউক—বর্তমান যুদ্ধ ভারতবাসীর আত্মরক্ষার যুদ্ধ, নিজ মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার, স্বীয় স্বাধীনতাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার যুদ্ধ। ভারতবাসীকে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন যে স্বীয় দেশকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই গণতন্ত্রবাদী বৃটেনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে যুদ্ধ করিতেছে।

আমরা একাধিকবার বলিয়াছি এই উদ্দেশ্য সাধনের ভূমিকা-রূপে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর বর্তমান রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। ভারতে জনবল যথেষ্ট। শত্রু সৈন্যের যে সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্য সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে জাপানকে সাফল্যজনক প্রতিরোধ করা বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে একাধিকবার কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষ সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। কাঁচা মালও ভারতে যথেষ্ট আছে। ভারতে সমর সম্ভার উৎপাদন ব্যবস্থা করিলে একদিকে যেমন স্বল্প রণসম্ভারের প্রশ্ন দূর হইয়া যাইবে, অপর পক্ষে বিদেশ হইতে জলপথে সুদূর প্রাচীতে সমরোপকরণ প্রেরণের বিপদাশঙ্কাও তেমনই দূর হইবে। রণক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণাদি অতি অল্প সময়ে প্রেরণ করাও সম্ভব হইবে। কিন্তু এই উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইলে ভারতীয় শ্রমিকদিগের প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। ভারতীয় শ্রমিকগণ যদি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে এই যুদ্ধ তাহাদের, নিজ স্বার্থ, নিজ জন্মভূমি রক্ষার জন্যই তাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহা হইলে রণক্ষেত্রের বিবিধ ভয়াবহ প্রতিকূলতার মধ্যেও তাহারা উৎপাদন ব্যবস্থা শিথিল করিয়া দিতে পারে না।

২৬।৩।৪২

বর্ষশেষ

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি, তারি সনে বর্ষ হ'ল শেষ,
দুঃখের দুরন্ত রাত্রি নেমে এলো নিদ্রিত প্রাঙ্গণে,
মৃত্যুর কুটিল দৃষ্টি লঘু ছন্দে করিল নিঃশেষ,
জিতেন্দ্রিয় পার্থ চলে অন্ধকারে উর্ব্বশী সঙ্গমে।

যে দেবতা সুপ্ত ছিল অন্তরের মণি-কোঠাটিতে,
সে আজ ফিরিয়া এলো মরণের উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় ;
যে আঁখি উঠিত কাঁদি এতদিন দূরে ছেড়ে দিতে,
চিরবিদায়ের ক্ষণে আজি সেথা হাসি দেখা যায়।

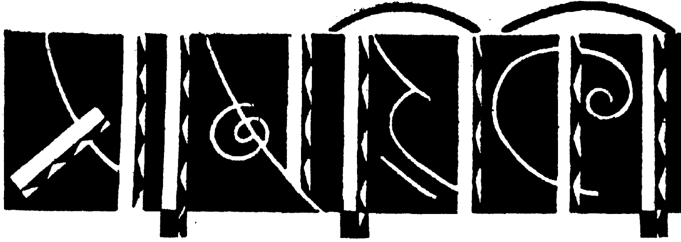
অতীত মরিয়া গেছে, ইতিহাস মিথ্যা হ'ল তাই,
আজি বিংশ শতাব্দীতে বৃদ্ধ বিধাতার হ'ল ছুটি,
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভরি শোনা যায় ধ্বংসের সানাই,
মরণের সরোবরে জীবনের ফুল ওঠে ফুটি।

বছরে বিদায় দিয়ে আশার আলোকে ব্যথা ঢাকি
শ্মশানের মাঝে বসি নববর্ষ পানে চেয়ে থাকি।

কবিতা

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

ভীমরুল্ বোল্তার চাকেতে, ঢিল্ মারা ভাল নয়—জানত ?
তেড়ে এসে হুল্ তার ফোটাবে, মিথ্যা এ কথা নয়—মানত ?
করে যারা গুণ্ গুণ্ অধুনা, জেন চাকে মধু আছে, তাইতে—,
ফুরুলেই মোম রেখে তাহারা,অন্য কোথাও যাবে পাইতে।
তাই বলি, কবিতার চাকেতে, খোঁচাইতে বো'ল না'ক তোমরা ;
মধু আর হুল্ আছে এখনো, ভীমরুলও ছাড়া আছে ভোমরা।
আধুনিক মধু যেন দু'দিনের, পুরাতন বাসি মোম খাঁটী যে,
তাই বলি : কোষ্ঠি ও কবিতায়, কিবা ফল, কষে আর ঘষে সে !
আজ যদি বোমারু ও বিমানে, ছন্দের বন্ধনে বাঁধা যায়—
হয়ত' তা' কাল্কের বাতাসে, মিলনেরই বন্দনা গাবে হায়।
লেক্ই হো'ল কৈলাস-সরোবর, সন্ধ্যার তীর্থ সে আজিকার ;
হয়ত' তা' হ'বে ডোবা কালকে, ব্যাঙ্ আর ব্যাঙাচিরই গৃহ-দ্বার !
তাই বলি, সমুঝে ও সাম্লে, আধুনিক কবিতায় দিও মন।
মধুপের গুঞ্জন ভালো ভাই, মাছি যেন নাহি করে ভন্ ভন্॥
কবিতার পাশে আজ গবিতা, যেন সৎমার ছেলে আর মেয়েটি,
ছন্দের বন্ধন নাই যার—কবন্ধ বলা তায় ক্ষতি কি ?
ছন্দের বন্ধনে বাঁধা যে, সেই হো'ল সত্যিই কবিতা,
শ্যাম-পাদ বাঁধা আছে নূপুরে, পৃথিবীকে বাঁধিয়াছে সবিতা !



নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যে নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা ২৯শে মার্চ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-মন্ত্রিসভা যে বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা মধ্যপথে বন্ধ করা হইয়াছিল। ঐ বিল দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়—সেই জন্য এই নূতন বিলের প্রয়োজন। আমরা নিম্নে সমগ্র বিলটি প্রদান করিলাম। সকল পক্ষের অভিমত লইয়া এই বিল রচিত হয়—কাজেই আমাদের বিশ্বাস, এই বিল গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত করা হইলে ইহা দ্বারা দেশের লোক উপকৃত হইবে।

নূতন শিক্ষা বিলে মাধ্যমিক শিক্ষার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, পরিত্যক্ত বিলে প্রদত্ত সংজ্ঞা অপেক্ষা তাহা ব্যাপকতর। পুরাতন বিলে মাধ্যমিক শিক্ষা বলিতে প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পরবর্ত্তী শিক্ষা ব্যতীত অন্য প্রকার শিক্ষা বুঝাইত এবং কোন শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা কিনা তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরই হস্তগত থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নূতন বিলে মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রবেশিকা পরীক্ষার পরবর্ত্তী শিক্ষা ব্যতীত অপর সকল প্রকার শিক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশেষতঃ নিম্নোক্ত প্রকারের শিক্ষাগুলিও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যথা—(১) সাধারণ শিক্ষা (২) ব্যবহারিক শিক্ষা (৩) কৃষি শিক্ষা (৪) শিল্প শিক্ষা (৫) ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পর্কিত শিক্ষা এবং (৬) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক বিধি অনুসারে নির্দ্ধারিত অন্যান্য সকল প্রকার বৃত্তিমূলক ও বিশেষ-শিক্ষা; সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সাধারণ বিষয়গুলির শিক্ষা ত থাকিবেই, উপরন্তু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্পর্কিত শিক্ষা এবং নিছক ইসলামিক ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্পর্কিত শিক্ষাও ধরা হইয়াছে।

পুরাতন বিলে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক্ষণে যে সকল স্কুল আছে, মাধ্যমিক বোর্ড গঠনের দুই বৎসর পর সেগুলি স্বতঃই অনুমোদিত হইয়া যাইবে এবং উহাদিগকে নূতন করিয়া বোর্ডের নিকট হইতে অনুমোদন লইতে হইবে। নূতন বিলে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, নূতন আইন আমলে আসিবার সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদন-প্রাপ্ত স্কুলগুলি অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু সঙ্গত সময়ের মধ্যে বোর্ডের বিধানসকল পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর অস্থায়ী অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলগুলি তিন বৎসর পর্য্যন্ত অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে; তাহার পর নূতন বিলের নিয়ম পালন করিলে উহাদিগকে স্থায়ী অনুমোদন দেওয়া হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ৬০ জন সদস্য থাকিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে :—

(১) সভাপতি—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৭ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত হইবেন।

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার (পদাধিকারবলে)।

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার (ঐ)।

(৪) শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার (ঐ)।

(৫) মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কিত শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর (ঐ)।

(৬) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (ঐ)।

(৭) ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টর (ঐ)।

(৮) ফিজিক্যাল এডুকেশনের মহিলা ডিরেক্টর (ঐ)।

(৯) কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ঐ)।

(১০) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষাসম্পর্কিত শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসার (ঐ)।

(১১) প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত স্কুলসমূহের একজন ইনস্পেক্টার ও একজন মহিলা ইনস্পেক্টার (ঐ)।

ইঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান থাকিবেন।

(১২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এগারজন সদস্য। ইঁহাদের মধ্যে চারিজন মুসলমান ও পাঁচজন হিন্দু (তপশীলভুক্ত ২ জন), একজন দেশীয় খৃষ্টান ও একজন শ্বেতাঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্যে অন্যূন সাতজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজসমূহের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা শিক্ষক থাকিবেন।

(১৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত তিনজন, ইহার মধ্যে দুইজন মুসলমান ও একজন হিন্দু থাকিবেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল নির্ব্বাচিত দুইজন সদস্য, তন্মধ্যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান থাকিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত এই ৫ জনের মধ্যে অন্যূন তিনজন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিবেন।

(১৪) অনুমোদিত উচ্চবালক বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পাঁচজন হেডমাষ্টার, ইহার মধ্যে দুইজন মুসলমান এবং তিনজন হিন্দু (তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের একজনসহ) থাকিবেন।

(১৫) অনুমোদিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিষ্ট্রেসগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দুইজন হেডমিষ্ট্রেস, ইহাদের মধ্যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান থাকিবেন।

(১৬) অনুমোদিত উচ্চ মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যালগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ২ জন প্রিন্সিপ্যাল।

(১৭) অনুমোদিত টোলসমূহের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন অধ্যক্ষ।

(১৮) অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয় ও অনুমোদিত উচ্চ মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৩ জন—ইঁহাদের মধ্যে ১জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু (তন্মধ্যে ১ জন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের)।

(১৯) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত পরিষদের ৫ জন প্রতিনিধি—তন্মধ্যে ২ জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু (১ জন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের) এবং ১ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অথবা ইউরোপীয়ান থাকিবেন।

(২০) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার ২ জন প্রতিনিধি—তন্মধ্যে ১ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান থাকিবেন।

(২১) এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদিগের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাদেশিক বোর্ডের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ২ জন—তন্মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন।

(২২) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ৮ জন—তন্মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও ৩ জন হিন্দু (১ জন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের) ও ১ জন বৌদ্ধ থাকিবেন।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত এই ৮ জন সদস্যের মধ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, চিকিৎসা এবং অধ্যাপনা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যতদূর সম্ভব নিযুক্ত করা হইবে।

(২৩) বাঙ্গালা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্না ২ জন মহিলাকে বোর্ডের সদস্যরূপে কো-অপ্ট করা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে ১ জন মুসলমান ও ১ জন হিন্দু মহিলা থাকিবেন।

পুরাতন বিলে, গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসরে পর পর সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন, এই ব্যবস্থা ছিল। নূতন বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, শিক্ষা সচিব, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারদ্বয় এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, এই কয়েক ব্যক্তির মনোনীত তিনজনের প্যানেল হইতে গবর্ণমেণ্ট একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি পাঁচ বৎসরকাল কার্য্য করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অপর সভাপতি নিযুক্ত হইবেন।

পুরাতন বিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৭ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নূতন বিলে সদস্য সংখ্যা ২২ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জন হইবেন নির্ব্বাচিত (৭ জন মুসলমান, ৬ জন হিন্দু)। অবশিষ্ট ৯ জন সদস্য হইবেন:—বোর্ডের সভাপতি ও সহঃ সভাপতি, দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার, দুইজন সরকারী কর্ম্মচারী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত একজন স্কুলসমূহের পরিদর্শক ও একজন স্কুলসমূহের মহিলা পরিদর্শক।

নূতন বিলে নিম্নোক্ত নয়টি বিষয়ের জন্য নয়টি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করিবার বিধান আছে, যথা,—ইসলামিক, হিন্দু, বালিকাদের ও তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থ, অনুমোদন ও সাহায্যদান, পরীক্ষা গ্রহণ, বৃত্তিকরী শিক্ষা এবং শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা।



ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন আইন-সচিব
সার সুলতান আহমদ



ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন শ্রম-সচিব
সার ফেরোজ খাঁ নূন

ইসলামিক ও হিন্দু মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটির ক্ষমতা সমান। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মোট সদস্যের অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ বিরোধী না হইলে স্কুল ও মাদ্রাসায় অনুমোদন ও অননুমোদন, পাঠ্য পুস্তক বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে সাবকমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

পুরাতন বিলের তুলনায় নূতন বিলে সরকারী অর্থ সাহায্যদানের ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পুরাতন বিলে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা এবং আইন আমলে আসিবার পর প্রতি বৎসর কিছু কিছু বাড়াইয়া পঞ্চম বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা ছাড়া বোর্ডের কার্য্যালয় ও কর্ম্মচারী প্রভৃতির জন্যও বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা ছিল। নূতন বিলে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকার উপর ১৯৪৩ সালে ৫ লক্ষ, ১৯৪৪ সালে ১০ লক্ষ, ১৯৪৫ সালে ১৫ লক্ষ, ১৯৪৬ সালে ২০ লক্ষ এবং ১৯৪৭ সালে ও তৎপরবর্ত্তী বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা সাহায্যদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বোর্ডের কার্য্যালয় ও কর্ম্মচারীদের জন্য বার্ষিক অনূর্দ্ধ এক লক্ষ টাকাও গবর্ণমেণ্ট দিবেন। এ সকল ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অন্যান্য উদ্দেশ্যে আরও অধিক অর্থ সাহায্যদান করিতে পারিবেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তচ্যুত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, পুরাতন বিলে সে জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু নূতন বিলে বাঙ্গালার একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মনোনীত দুইজন—এই তিনজনকে লইয়া গঠিত একটি কমিটির সুপারিশমত, এই ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক অর্থ সাহায্য দানের বিধান করা হইয়াছে। গত ১৯শে চৈত্র এই বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হইয়াছে। বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটীর নিকট দেওয়া হইয়াছে। ঐ কমিটীকে তাঁহাদের রিপোর্ট আগামী ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদে দাখিল করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সিলেক্ট কমিটীর সাহায্য হইয়াছেন—(১) সৈয়দ বদরুদ্দজা (২) ডাঃ ফানাউল্লা (৩) আবদুল ওয়াহেব খাঁ (৪) ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল (৫) হরেন্দ্র-কুমার সুর (৬) রসিকলাল বিশ্বাস (৭) প্রেমহরি বর্ম্মণ (৮) ডাঃ হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় (৯) এচ-এস-সুরাবর্দ্দী (১০) খাজা সাহাবুদ্দীন (১১) ফজলর রহমন (১২) আবদুল্লা অল-মামুদ (১৩) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৪) অতুলচন্দ্র সেন (১৫) সাহেদ আলি (১৬) ডবলিউ-সি-ওয়ার্ডসওয়ার্ড (১৭) শিক্ষা সচিব খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম খাঁ।

এ-আর-পি ব্যবস্থা—

বিমান আক্রমণ হইলে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। প্রথম যখন এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তখন সাধারণ শিক্ষিত লোকগণ উহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। ফলে এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানগুলি কি সহরে, কি সহরতলীতে—এমন লোকের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যাহাদিগকে নিঃস্বার্থ কর্ম্মী বলা যায় না এবং এখন তাহাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ শুনা যাইতেছে। লোক বিপন্ন হইলে কি করিবে, এ-আর-পি'র কর্ম্মীরা তাহাই সকলকে শিক্ষা দেন এবং নিজেরা বিপন্নের সাহায্যার্থ কি করিবেন, তাহার শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ হইলে প্রকৃত বিপদের সময় কোন পক্ষই লাভবান হইবেন না। সেজন্য আমরা মনে করি, কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই সেবক-বাহিনীর সংশোধনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বিপদের সময় তাহাদিগকে আমরা প্রকৃত সেবকরূপে পাইয়া উপকৃত হইতে পারি।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসংঘ—

গত ১৫ই মার্চ্চ কলিকাতায় ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসংঘের বার্ষিক সভায় শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার সংঘের নূতন সভাপতি ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সংঘের পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতি শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এবারের বৈশিষ্ট্য এই যে—সকল দলের মিলনে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংঘকে শক্তিশালী করিতে পারিলে শুধু যে সংবাদপত্রসেবীরা উপকৃত হইবেন তাহা নহে, দেশবাসীর অভাব অভিযোগ দূরীকরণেও সংঘ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন। এবারের দলাদলি-মনোভাববর্জ্জিত কার্য্যনির্ব্বাহকগণের নিকট সে জন্য সকলেই অনেক নূতন কাজের আশা রাখেন।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি—

বর্ত্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য সকল খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে লোক বোমা পড়িয়া মরিবার পূর্ব্বেই না খাইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। সহরে আটা পাওয়া যায় না—যাহা পাওয়া যায় তাহাও ৪ গুণ দর ; এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ফল দেখা যায় না। কয়লা ছয় আনার স্থলে প্রায় দেড় টাকা মণ হইয়া থাকিল। চিনি, ডাল, চাল সকল দ্রব্যই অস্বাভাবিক দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। সহরতলীতে বহুস্থলে কেরোসিন তৈল আর পাওয়া যাইতেছে না। কাপড়ের দাম দ্বিগুণ বা তিন গুণ। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। সাধারণ দরিদ্র লোক এক বেলা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হইতেছে না—কখনও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। শুনা যাইতেছে, আটার মত চালও আগামী শ্রাবণ ভাদ্র মাসে দুর্লভ হইবে। এখন হইতে এ বিষয়ে ব্যবস্থা না করিলে দেশবাসীকে যে অনাহারে মরিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণেশ্বরে দীনবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার—

গত ১৫ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বর (২৪ পরগণা) জনসংঘের বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সংঘের তরুণ কর্ম্মীদের চেষ্টায় তথায় একটি 'নৈশ বিদ্যালয়' পরিচালিত হয়। খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ও তাঁহার পত্নী নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সংঘের অন্যতম কর্ম্মী আড়িয়াদহনিবাসী দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররূপে গবেষণা করার সময় বিষ সংস্পর্শে সহসা পরলোকগমন করায় সংঘের কর্ম্মীরা ঐ দিন 'দীনবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার' নামক একটি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবর্ষসম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন। নৈশ বিদ্যালয় ও পাঠাগার পরিচালন ব্যাপারে জনসংঘের কর্ম্মীদের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

আর্ত্ত সেবা—

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ভারতীয় কলিকাতায় আগমন করিতেছে। কেহ বা পদব্রজে মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া, কেহ সরাসরি ষ্টীমারে চট্টগ্রাম হইয়া রেলপথে, কেহ বা পদব্রজে চট্টগ্রাম হইয়া রেলপথে আসিতেছে। তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা নিজ চক্ষুতে না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। প্রায় সকলেই সহায়সম্বলহীন, আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় ফিরিতেছে। কলিকাতার বহু সেবা সমিতি তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম্মীবৃন্দ, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর (খারিজ ও এডহক), সেবকবৃন্দ ও বিশেষ করিয়া মাড়োয়ারী সেবা সমিতির কর্ম্মীরা এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোককে আহারাদি দিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। কত ভারতীয় ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহার হিসাব করা দুষ্কর। যে সকল সেবক তাহাদিগকে সাহায্যদানে ব্রতী হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি ও দুঃস্থ দেশবাসীদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পাকিস্থান ও মুসলিম জনস্বার্থ—

'জমায়েৎ উল-উলেমা হিন্দ'-এর বার্ষিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে মৌলানা হুসেন আহমেদ আলি পাকিস্থান সমর্থন মুসলমান-স্বার্থের খাতিরেই যে করা যায় না তাহার কারণ দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার যুক্তি সুযুক্তি। তিনি বলেন যে ভারতের যে কয়টি প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সেই সকল প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, সেখানে তাহাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কোনও চাপ দেওয়া সম্ভব হইবে না। অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম, বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবে হিন্দুর সংখ্যা এত বেশী যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত অনুপাতে পার্থক্য এত অল্প যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার্থ যথেষ্ট চাপ দিতে পারিবে। সে জন্যও অন্তত পাকিস্থান গঠন করা ভারতের মুসলিম জনস্বার্থের অনুকূল নয়। লীগ-নেতারা তাঁহার এ যুক্তি মানিয়া লইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারতে বিদেশী মূলধন—

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি বা পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারত সরকার এই সকল সম্পত্তির সাহায্যে ইতিমধ্যে গৃহীত ভারতের ঋণ অনেকটা শোধ দিয়াছেন এবং তাহার বদলে এদেশে টাকার হিসাবে নূতন সরকারী ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভারত আজ বিদেশী ঋণের কবল হইতে মুক্ত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দেশের কল্যাণে অন্য দিক দিয়া আরও বেশী সদ্ব্যবহার করা যাইত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। এ দেশের অনেক রেল কোম্পানি, বড় শিল্প কারখানা ও পোর্ট ট্রাষ্ট ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত আছে। এই বিদেশী মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ জোগাইতে গিয়া এদেশ হইতে বছর বছর অনেক অর্থ বাহিরে যাইতেছে। তা ছাড়া, এই মূলধনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়দের কর্ত্তৃত্ব বিশেষভাবেই দেখা যাইতেছে। কোম্পানি পরিচালিত রেলগুলিতে ইউরোপীয়দের শেয়ার মূলধন নিয়োজিত থাকায় রেলের চাকরি ও রেলপথের জন্য মাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে ইহারা আজ অহৈতুক সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে। অনুরূপ কারণে দেশের পোর্ট ট্রাষ্ট ইত্যাদিতেও আজ দেশীয় স্বার্থের বদলে বিজাতীয় স্বার্থই কায়েমী হইয়াছে। এ অবস্থায় জাতীয় কল্যাণ দেখিতে গেলে বিদেশী মূলধনের শোচনীয় দাসত্ব হইতে দেশকে উদ্ধার করার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে দরকার।

সরকারী ব্যবস্থা—

যুদ্ধ আমাদের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এ কথা সর্ব্বদা সরকারী মহল হইতেও শুনা যাইতেছে। কাজেই সাধারণ অধিবাসীদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে বহু স্থানে আশ্রয় স্থল নির্ম্মিত হইতেছে—বিপন্ন কলিকাতাবাসীদিগকে তথায় রাখিয়া আশ্রয় দেওয়া হইবে—ইহাই সরকারের অভিপ্রায়। কিন্তু এই ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ যদি বেসরকারী লোকদিগের সহিত সহযোগিতা করিতেন, তাহা হইলে কাজ যেমন সহজ হইত, ব্যয়ও তেমনই অল্প হইতে পারিত। মফঃস্বলে যে ভাবে আশ্রয় স্থল নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলি সত্যই মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে কি কেহই তদন্ত করিয়া দেখেন

নাই। সহরেও যেমন, পল্লীগ্রামেও তেমনই সাধারণ মধ্যবিত্তগণই অধিক বিপন্ন হইবেন। ধনী ব্যক্তিরা অর্থব্যয় করিয়া সহজেই আশ্রয় লাভ করিবে এবং শ্রমিকগণ বহুদূরে যাইয়া নিরাপদ স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে। কিন্তু দরিদ্র মধ্যবিত্তদের পক্ষে বিপদ বিষম হইবে। যাঁহাদের উপর আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ভার প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা যদি সর্ব্বদা এ কথাটি মনে রাখিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে কাহারও কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অব্যবস্থা—

কলিকাতা কর্পোরেশন যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য সহরের লোকদিগকে জল সরবরাহ করিবার উদ্দেশে যে নলকূপ বসাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশগুলি কাজের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে দেওয়াল তৈয়ারী করা হইয়াছে, সেগুলির কার্য্যকারিতার কথাও কর্পোরেশনের সভায় আলোচিত হইয়াছে। বহুস্থলে ইটের উপর ইট সাজাইয়া দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে—তাহার সহিত বালি বা সিমেন্টের নাকি কোন সম্পর্ক নাই। সাধারণের অর্থ এই ভাবে অপব্যয়িত হইতে দেখিয়া কলিকাতাবাসীমাত্রেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা সত্বর অবলম্বিত হইলে লোকের মন হইতে শঙ্কা দূর হইতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত লোক কি পাওয়া যাইবে?

সাংবাদিকের আকস্মিক মৃত্যু—

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নারায়ণ দাস ভট্টাচার্য্য গত ৮ই চৈত্র প্রাতঃকালে অকস্মাৎ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। শনিবার রাত্রেও তিনি আপিসে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম্মভীরু এবং সদালাপী ভদ্রলোক, বন্ধুসমাজে তাঁহার সমাদর ছিল। বছর কয়েক তিনি কলিকাতার সাহিত্য-সেবক সমিতির সম্পাদকও ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী, পাঁচটি পুত্র ও তিন ভাই এবং অগণিত গুণানুরাগী বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কিরণশশী সেবায়তন—

কলিকাতা সহরে যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উত্তর কলিকাতা ১০৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার পরিচালিত 'কিরণশশী সেবায়তন' তাহাদের অন্যতম। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র নান মহাশয়ের অর্থসাহায্যে ভাণ্ডারের এই সেবায়তনের কার্য্য দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। সেবায়তনের জন্য বর্ত্তমান গৃহের পশ্চিম দিকে ছয় কাঠা জমী গ্রহণ করা হইয়াছে ও শীঘ্রই তথায় পৃথক গৃহ নির্ম্মিত হইবে।

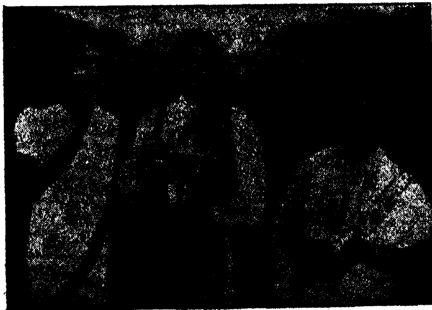


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বার্ষিক খেলাধূলার উদ্বোধনে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ১০০ মিটার দৌড়ে (১) জ্যোৎস্না সোম (২) মীরা আইচ ও (৩) স্মৃতি দেবী

তাহা ছাড়া এবার বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর চেষ্টায় সেবায়তন ছয় হাজার টাকা দান পাইয়াছেন। বহু মধ্যবিত্ত লোক বিনা ব্যয়ে বা অতি অল্পব্যয়ে সেবায়তনে চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। কাজেই যাহাতে এই সেবায়তন সর্ব্বপ্রকার সাহায্য লাভ করে, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলবাসী ছাত্রীদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন (বাম হইতে দক্ষিণে)—স্মৃতি বিশ্বাস, জ্যোৎস্না সোম ও রাধা চট্টোপাধ্যায়

লঙ্কা-সমস্যা—

পৃথিবীর লঙ্কা উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ ওলন্দাজ-পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হইয়া থাকে। ঐ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ হন্দর (এক হন্দর প্রায় ১ মণ ১৪ সের) লঙ্কা বিদেশে রপ্তানী হইত। ইন্দোচীন হইতেও বৎসরে ৮০ হাজার হন্দর লঙ্কা বিদেশে প্রেরিত হইত। ঐ স্থানগুলি এখন জাপানীদের হস্তগত। কাজেই শুধু ভারতে নহে, সমগ্র জগতে এবার লঙ্কা-সমস্যা দেখা দিবে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সার মহম্মদ আজিজল হক লণ্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থানে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে দুই বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার রায় গত ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে কাজ করিয়াছেন এবং বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউণ্টকমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি নানাক্ষেত্রে নিজ কর্ম্মকুশলতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ও উন্নতি লাভ করিবে।

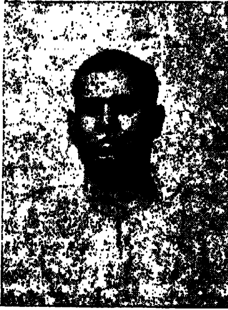
বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল—

নার্সদের পক্ষ হইতে সিষ্টার তরু ঘোষ ও মিডওয়াইফদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী সুধা সরকার এবার ৩ বৎসরের জন্য বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের

সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মহিলা এই সম্মান লাভ করেন নাই। গত ১৪ই মার্চ তাঁহাদের নির্ব্বাচনে সাফল্য উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মিলনে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েদের এখন নানাকারণে নার্স ও মিডওয়াইফদের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইতেছে। কাজেই তাঁহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য বাঙ্গালীদের নার্সিং কাউন্সিলে প্রবেশে সকলেই প্রীত হইবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় গত ৯ই মার্চ রঙ্গপুরে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং পারিশ্রমিক না লইয়া বহু ছাত্রকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং তাঁহার সরল ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহার প্রিয় ছিল।



৺সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ—

সম্প্রতি ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এক অভিনব আদেশ প্রচার করিয়াছেন। অভিনব বলিতেছি এই কারণে যে, যে আদেশ তিনি জারি করিয়াছেন সে ধরণের আদেশ গত দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামে ডাকাতেরা ডাকাতি করে এবং দিন দিনই তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামের যে সকল লোকের বন্দুকের লাইসেন্স আছে তাঁহারা নাকি ডাকাতির সময় সে সব বন্দুক ব্যবহার করেন না। বন্দুকের 'অধিকারী', এই গর্ব্বই নাকি তাঁহাদের সম্বল। কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে ; তবে এই প্রসঙ্গে বলিবার কথা এই যে, এই সকল ব্যাপারে অর্থাৎ বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য বন্দুকের ব্যবহার করিতে গিয়া ইতিপূর্ব্বে বহুলোক বিপন্ন হইয়াছেন। তাই শিকার করিতে বা লোক দেখানোর জন্য বন্দুকের লাইসেন্স লওয়া হইত। এদেশের শাসনকর্ত্তারা যদি বন্দুক ব্যবহারের সুযোগ দিতেন ত আজ ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এরকম আদেশ জারি করিতে হইত না।

জার্ম্মান-তুরস্ক সন্ধি—

প্রকাশ পাইয়াছে যে নিম্নলিখিত সর্ত্তে ফন পেপেন আনকারায় যাইয়া তুরস্কের সহিত জার্মানীর সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন—(১) তুরস্ক ইউরোপীয় নববিধানে সহযোগিতা করিবে (২) তুরস্ক তাহার নিরপেক্ষতা বৃটেনের পরিবর্ত্তে চক্রশক্তির অনুকূলে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিবে, তবে তুরস্ককে সরকারীভাবে ইঙ্গ-তুর্কী মৈত্রী অস্বীকার করিতে বলা হইবে না (৩) যুদ্ধরত উভয় পক্ষের জন্যই দার্দ্দানেলিস এই সর্ত্তে উন্মুক্ত থাকিবে যে—তুর্কী এলাকার স্থলে, জলে বা অন্তরীক্ষে কোন যুদ্ধ হইতে পারিবে না। এই সকলের বিনিময়ে জার্মানী তুরস্ক আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে এবং যুদ্ধান্তে কয়েকটি গ্রীক দ্বীপ ও গ্রীসের প্রধান ভূখণ্ডের কিছু অংশ দেওয়া হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্ব তুরস্ককে দেওয়া হইবে।

'পোড়া-মাটি' নীতি—

রেঙ্গুন, মালয় প্রভৃতি দেশে বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ 'পোড়ামাটি' নীতি গ্রহণ করিয়া সুন্দর সহরগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন। এই নীতি নেপোলিয়নের রুশ আক্রমণের সময় ১৮১২ সালে সর্ব্ব প্রথম অনুসৃত হয়। এবারের যুদ্ধে জার্মান আক্রমণের ফলে সোভিয়েট রুশিয়া কোন কোন সহরে এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। রুশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং শত্রুর হাতে পড়িবার ভয়ে সেখানকার ঘর বাড়ী, আপিস-আদালত, শিল্প কারখানা ইত্যাদি তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে জনসাধারণ তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু রেঙ্গুনের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। ভারতে শত্রুর আক্রমণ আসন্ন, কাজেই আমাদের ভয় অকারণ নহে। দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই তীব্র ভাষায় এই নীতির নিন্দা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা আশা করি বৃটিশ সামরিক কর্ত্তারা দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য এই নীতি এখানে অনুসরণ করিবেন না।

বিক্রয়-কর আইন ও মাসিকপত্র—

বিক্রয় কর আইন যখন রচিত হয়, তখন দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রগুলিকে উহার আমল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাসিক-পত্রগুলি বাদ যায় নাই। এ বিষয়টি সংবাদপত্রসেবী সংঘের পক্ষ হইতে নূতন অর্থসচিব ডক্টর শ্রীযুতশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানান হইলে তিনি মাসিকপত্রগুলিকেও বিক্রয় কর আইনের আমল হইতে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মাসিক পত্রের নিকট হইতে পূর্ব্বে বিক্রয়-কর আদায় করা হইয়াছে তাঁহাদের কি হইবে? তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত কর গভর্ণমেণ্ট প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

পরলোকে প্রফুল্লচন্দ্র রায়—

কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রসায়নশাস্ত্রের জনপ্রিয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে দেওঘরে সহসা পরলোক-গমন করিয়াছেন। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রথম হইতে অধ্যাপক রায় উক্ত কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্যরূপে ইহার নানারূপ উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া অধ্যাপক রায় সহরের বহু



অধ্যাপক ৺প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঢাকা জেলার পাইনা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

কবি চণ্ডীচরণ মিত্র—

২৪ পরগণা বেলঘরিয়ানিবাসী পল্লীকবি চণ্ডীচরণ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার লিখিত বহু কবিতা নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন ও কখনও নিজের নাম প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। গত ১৬ই চৈত্র বেলঘরিয়া উচ্চইংরাজি বিদ্যালয় ভবনে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হইয়াছে।



কবি ৺চণ্ডীচরণ মিত্র

ধর্ম্মগ্রন্থ ও বিক্রয়-কর—

বিক্রয়-কর আইনের আমল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে বাদ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন পুস্তক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কোন নির্দ্দেশ প্রকাশিত হয় নাই। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়াও আমরা কোন নির্দ্দেশ পাই নাই। অথচ এখন সকল গ্রন্থের উপরই বিক্রয়-কর আদায় করা হইতেছে। যাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থগুলির তালিকা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, সেজন্য আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। এ ক্ষেত্রে গৃহীত কর প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা না করিলে ব্যবসায়ীদিগকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

ভারত সরকারের ট্যাক্স-নীতি—

বর্ত্তমান যুদ্ধের গোড়াতেই ভারত সরকার তাঁহাদের যুদ্ধের ব্যয় মিটাইবার যে অভিনব পন্থার অনুসরণ করিতেছেন তাহা অতি-দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে মৃত্যুতুল্য হইতে বসিয়াছে। যুদ্ধ সুরু হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে প্রায় পঁয়ষট্টি কোটি টাকা আদায় করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির যে সুযোগ আসিয়াছিল সরকারের নানারূপ বিরুদ্ধ কার্য্যনীতির দরুণ দেশের লোক তাহাও বিশেষ কিছু কাজে লাগাইতে পারে নাই। এ অবস্থায় নূতন ট্যাক্স যোগাইতে গিয়া আজ তাহাদের যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকাশের যোগ্য নহে। ইংলণ্ডে সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য দেশের সরকার ঋণ গ্রহণের উপরই বেশী জোর দিতেছেন, আর ভারতে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাকে কোন মতেই সমর্থন করা চলে না। গত তিন বৎসরে ভারতীয় রেল বিভাগের ৪৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষেও ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অর্থসচিব বরাদ্দ বলিয়াছেন। রেল বিভাগ হইতে উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়া দেশবাসীদের করভার হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে—ইহাই তাহারা আশা করিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যত শুধু যে তাহাই হয় নাই তাহা নহে, উপরন্তু নূতন ট্যাক্স বসাইয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মনোনয়ন—

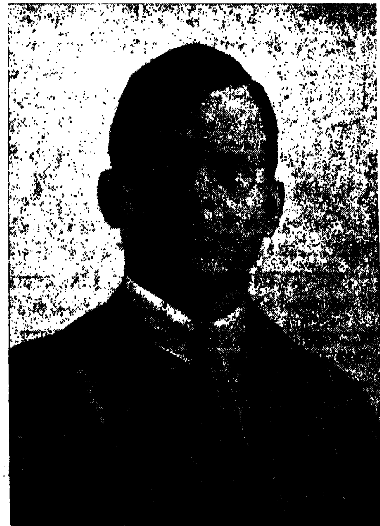
১লা এপ্রিল ১৯৪২ হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৩ এক বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মনোনীত হইয়াছেন—(১) শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (২) মেজর পি-বর্দ্ধন (৩) খাঁ সাহেব ডবলিউ, জামান (৪) মহম্মদ গুলজার (৫) হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (৬) সুরেন্দ্রনাথ দাস (৭) বি-এম-মণ্ডল (৮) ভবেশচন্দ্র দাস। শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁহার মত লোকের মনোনয়নে যোগ্য পাত্রেই সম্মান প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকোচ গ্রহণ—

গত ১৭ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন—বাঙ্গালা প্রদেশের জনৈক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর আনুমানিক হিসাব অনুসারে—আদালতসমূহের কর্ম্মচারীরা উপরি-পাওনা হিসাবে প্রতি বৎসরে গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় যদি এই সঙ্গে উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করার কোন উপায় নির্দ্ধারণে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে দেশবাসী সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিত। এই উৎকোচগ্রহণ বন্ধ করার কি কোন উপায় হইতে পারে না?

অমূল্যকৃষ্ণ মিত্র—

পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার অমূল্যকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় গত ১৩ই নভেম্বর সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র বিহারে বাঙ্গালী আইনজীবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।



৺অমূল্যকৃষ্ণ মিত্র

অমূল্যকৃষ্ণ. তীক্ষবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিহারের প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভার দান ঃ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বৃটিশের সমর প্রচেষ্টায় যোগদান করিতে অসম্মত হওয়ায় ভারতে শাসন-তান্ত্রিক অবস্থায় একটা অচলতার সৃষ্টি হয়। এই অচল অবস্থা কেমন করিয়া দূর করা সম্ভব তাহা এ দেশে ও বিলাতে রাজনীতিকদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা চলিতেছিল এবং ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা ওঠে। সে স্বায়ত্তশাসন কি রকম তাহা এতদিন জানা যায় নাই। বৃটিশ মন্ত্রিসভা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃটিশ সমর পরিষদের অন্যতম মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে প্রস্তাবের খসড়া দিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বিমানযোগে দিল্লী আগমন করিয়া ভারতের বিভিন্ন দলের—কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু-মহাসভা, শিখ, এংলো-ইণ্ডিয়ান, দেশীয় রাজন্যবর্গ ইত্যাদি নেতাদের সহিত একে একে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কোন কোন নেতার সহিত একাধিকবারও সাক্ষাৎ করেন। গত সোমবার ১৮ই চৈত্রের কাগজে বৃটিশ মন্ত্রিসভা রচিত খসড়ার মূলমর্ম্ম ভারতের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটিশ সমর পরিষদের মন্ত্রীবর্গ যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিপূর্ত্তি সম্বন্ধে এদেশে যে উদ্বেগ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে যথাসম্ভব সত্বর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাষায় বিজ্ঞাপিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ভারতে একটি নূতন যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তোলা। এই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি সামন্ত-রাষ্ট্র (Dominion) বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা বৃটিশ যুক্তরাজ্যের (United kingdom) এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের সহিত এক আনুগত্যের সূত্রে গ্রথিত থাকিবে বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সমান বলিয়া গণ্য হইবে। আভ্যন্তরীণ বা বাহিরের কোন ব্যাপারেই কাহারও অধীন থাকিবে না।

বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব

(ক) বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র ভারতে নির্ব্বাচনের দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। সেই প্রতিষ্ঠান ভারতের জন্য একটি নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা রচনা করিবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কি পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত হইবে, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

(খ) এই রাষ্ট্রব্যবস্থা রচনার ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ভারতের দেশীয়-রাজ্যগুলির যোগদানের ব্যবস্থা করা হইবে। সে ব্যবস্থা কি ভাবে করা হইবে তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

(গ) এভাবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা রচিত হইবে বৃটিশ সরকার তাহা নিম্নলিখিত সর্ত্তে মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন ঃ

(১) বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশ যদি নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না থাকে তবে সেই প্রদেশে বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাই অব্যাহত রাখিতে পারিবে। পরে যদি কখনও সে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করিয়া তাহাতে যোগ দিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারার ব্যবস্থাও থাকিবে।

যে সমস্ত প্রদেশ নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যাইবে না, তাহারা যদি নিজেরা মিলিয়া কোনও নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা রচনা করে তবে বৃটিশ সরকার সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাও মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, এই রাষ্ট্রব্যবস্থাধীন প্রদেশগুলি মিলিত প্রদেশগুলির অধিকারেরই সমান থাকিবে। নিম্নে যে পদ্ধতি বর্ণিত হইতেছে সেই পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতিতে এইরূপ পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

(২) বৃটিশ সরকার এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা রচয়িতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বুঝাপড়ার পর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। ইংরেজের হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে কর্তৃত্ব সমর্পণ করিলে পর যে সকল বিষয়ের উদ্ভব হইবে, এই সন্ধিতে সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা নিবদ্ধ থাকিবে। বৃটিশসরকার এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা ইহাতে থাকিবে। কিন্তু ভবিষ্যতে বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর অন্য কোনও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থির করার ভার ভারতীয় যুক্তরাজ্যের উপরই থাকিবে, এই অধিকারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ভারতের কোনও দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিক আর নাই দিক, নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা অনুসারে যেরূপ প্রয়োজন হইবে, সেরূপভাবে বর্ত্তমান সন্ধি-সমূহের সংশোধন করিতে হইবে।

(ঘ) যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ভারতের প্রধান সম্প্রদায়ের জননায়কগণ অন্য কোনও পদ্ধতি স্থির করিতে না পারিলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা-রচয়িতা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে।

যুদ্ধ শেষ হইবার পর প্রদেশগুলিতে নূতন নির্ব্বাচন প্রয়োজন হইবে। সেই নির্ব্বাচনের ফলাফল জানামাত্র প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলির সকল সদস্য মিলিয়া একটি নির্ব্বাচকমণ্ডলী হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা-রচয়িতা প্রতিষ্ঠান নির্ব্বাচন করিবেন। সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতে এই নির্ব্বাচন হইবে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর যত সদস্য থাকিবে তাহার প্রতি দশজনের দরুণ একজনকে লইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে।

যদি কোন ভারতীয় রাজ্য এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহে, তবে বৃটিশ-ভারতের মতই রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে ; সেই প্রতিনিধির অধিকার বৃটিশ-ভারতের প্রতিনিধির অধিকারের সমানই থাকিবে।

(ঙ) বৃটিশ সরকারকে একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চালাইতে হইতেছে। ভারত রক্ষা করাও এই প্রচেষ্টার অংশ। ভারত বর্ত্তমানে যে সঙ্কটের সম্মুখীন সেই সঙ্কট যতদিন থাকিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা রচিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারত রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব অপরিহার্য্য ভাবে বৃটিশ সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকিবে এবং বৃটিশ সরকারই উহা স্বহস্তে রাখিয়া ভারতরক্ষার ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কিন্তু ভারতের সামরিক নৈতিক এবং বৈষয়িক সম্বল সংহত করার কর্ত্তব্যভার ভারত সরকারের উপরই থাকিবে। ভারত সরকার ভারতের জনগণের সহযোগিতায় সেই কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করেন যে, ভারতের বড় বড় সম্প্রদায়ের নেতারা অবিলম্বে এবং সক্রিয়ভাবে নিজেদের দেশ সম্পর্কে, বৃটিশ চক্রবর্ত্তী-শাসিত দেশগুলি সম্পর্কে এবং সম্মিলিত দেশগুলি সম্পর্কে যেসমস্ত পরামর্শাদি হইবে, তাহাতে যোগ দিন। বৃটিশ সরকার তাহাদিগকে সেই আহ্বানই করিতেছেন। এ ভাবে সক্রিয় এবং গঠনমূলক সাহায্য করিয়া তাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য একান্ত ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন।

উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ বলেন—ইহা ঘোষণা নহে, প্রস্তাব মাত্র। ভারতীয় জনমত ও বিভিন্ন দল ইহা গ্রহণে স্বীকৃত হইলে বৃটেনের সমরকালীন মন্ত্রিসভা কত দূর পর্য্যন্ত ঘোষণায় অগ্রসর হইতে পারেন তাহাই প্রস্তাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, মুসলিম লীগ, শিখ সর্ব্বদল সম্মিলন ও হিন্দু মহাসভা—সকলেই বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ জননেতা ও সংবাদপত্রও বৃটিশ প্রস্তাবের বিপক্ষে গিয়াছেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, দেশীয় রাজ্য, শিখ, দ্রাবিড় ইত্যাদি নানা অংশে ভাগ করিবার চেষ্টা। ইহা দ্বারা ভারতের ঐক্য এবং যে ঐক্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পক্ষে একান্তরূপে অপরিহার্য্য—তাহা বিনষ্ট হইবে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি—মহাত্মাজীর ভাষায়—'পোষ্ট ডেটেড্ চেক' অর্থাৎ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে

ভারতীয় জনগণের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা না দেওয়া। ভারতীয় বিভিন্ন দলের মতামত জানিতে পারিয়া স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারত ত্যাগ স্থগিত রাখিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন সর্ব্বদলকে সম্মত করাইয়া কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় কি-না। যদি এই প্রত্যাখ্যান অপরিহার্য্যই হয় তাহা হইলে তার ফল যত অশুভই হোক না, কোন উপায় নাই। কারণ ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কোন প্রকার আপোষমীমাংসার কথা বিবেচনা করা চলে না। কাজেই কংগ্রেসকে আগুপিছু অনেক কথা ভাবিতে হইবে। সরাসরি কোন সমস্যাকে অস্বীকার করিলেই সমস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি মেলে না। সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার করিয়া ধীরভাবে সেই পথ লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। এই প্রকার সঙ্কট-অবস্থা ভারতের ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নাই। সুতরাং নূতন পরিস্থিতিকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতেই সমাধান করিতে হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ বসু—

ভাগলপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি ৬৮ বৎসর বয়সে সহসা ভাগলপুরে নিজ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রায় বাহাদুর উমাচরণ বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। এই পরিবার একশত বৎসরেরও অধিক কাল ভাগলপুরে বাস করিতেছেন এবং সুরেন্দ্রবাবু ভাগলপুরের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পাদপদ্ম

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বৃহৎ পুষ্করিণীর পারে বুড়া ধর্ম্মরাজের দেউল। এ ধারে কয়েকটা তেঁতুলগাছ, শতাব্দীর অক্রবক্র শিকড়গুলি জমি আঁকড়িয়া কোনমতে টিকিয়া আছে। ওধারে আঙিনার প্রান্তে বটবৃক্ষটি স্থূল কাণ্ডের উপর অটুট গর্ব্বে শাখা মেলিয়া যুগ-যুগান্তের নর-নারীর ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছে। রক্ষা-কবচের মত উহার মূল ঘেরিয়া আছে কয়েকটি সিন্দুর-লিপ্ত তৈলার্দ্র শিলাখণ্ড, আর বড় বড় কতকগুলি মাটির ঘোড়া—গ্রাম্য-দেবতার বাহন।

আজ এখানে গাজনের নাচন লাগিয়াছে। ডুডুম্ ডুম্ ঢাকের বাদ্য, মহাদেব অক্লান্ত উদ্যমের সহিত নাচিয়া কুঁদিয়া খেলা দেখাইতেছে। হাতের ত্রিশূল উঠিতেছে নামিতেছে, বুকে পিঠে মজবুত পেশীগুলি পা দুটির বিচিত্র ব্যূহরচনা উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। দেহে অফুরন্ত সৌষ্ঠব, কে যেন কালো পাথর খুদিয়া ছাই মাখিয়া দিয়াছে, ভঙ্গিতে জড়িমা নাই, সঙ্কোচ নাই।

যে-ছেলেটি পার্ব্বতী সাজিয়াছিল সমবয়সীদের পালে ঢুকিয়া সে তখন পেয়ারা চিবাইতে শুরু করিয়াছে। উহাকে ঘেরিয়া ছেলেরা একযোগে কলরব করিয়া ওঠে, হাতের বালা কাঁকন খুঁটিতে থাকে। কেহ বা ছোপানো নীল শাড়ীখানার আঁচল ধরিয়া দেখে। মনে ঈর্ষা জাগে জাগড়টি একটু ছিঁড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে। ভয় হয়, পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে।

আঙিনায় বেজায় ভিড়। চাতালের বাহিরে জন কত মেয়ে, মাথায় ঘোমটা। দু-একজন শিশু কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নয়-দশ বছরের রাঙা সুতার কাপড়-পরা ছোট মেয়েটা মাথায় একগঙ্গা সিঁদূর মাখিয়া হাসিতেছে। তাহারই পাশে একটি যুবতী গোলগাল মুখ, নিটোল গড়ন, আধ-ময়লা বেশ, ললাটে সিন্দূরের লেশ মাত্র নাই। নাচিতে নাচিতে মহাদেব পাছে আসিয়া পড়ে, তালে তালে গ্রীবা দোলে, তির্য্যক নেত্র বেগে ঘুরিতে থাকে। দেখিয়া যুবতীর স্নিগ্ধ মুখে কৌতুক ফুটিয়া ওঠে, সে ফিরিয়া হাসিয়া লয়।

দেউলের দাওয়ায় মোড়ার উপর বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক নাচ দেখিতেছিলেন। মোটা-সোটা ব্যক্তিটি গ্রামের ভূস্বামী মহীধরবাবু। বন্ধুবর অর্দ্ধেন্দ্র সম্প্রতি আসিয়া তাঁহার বাড়িতে অতিথিরূপে আছেন। অর্দ্ধেন্দ্র খাটো-খোটো, চোখে পুরু একজোড়া চশমা, দেহের সজীব তারুণ্য বয়সের চাপে ঘন গম্ভীর। তিনি কলেজের অধ্যাপক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক, ভারতীয় শিল্পকলায় শ্রদ্ধাবান। বেলাশেষে পুকুর পাড়ে বকুল ও কেয়া ফুলের মিশ্রিত উগ্র গন্ধ, ছায়ানিবিড় আবেষ্টনী, তাণ্ডবের প্রচণ্ড উন্মাদনা এতক্ষণ তাঁহাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

নাচ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, চমৎকার। একেই বলে যথার্থ ফোক্ ড্যান্স্। অ্যানা পাভ্‌লোভা উদয়শঙ্করও বোধ করি এর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতেন। আশ্চর্য্য এই, এত ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্তের মধ্যে আজও এই আর্ট বেঁচে আছে।

নরহরি করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিল। সে ধর্ম্ম-ঠাকুরের সেবাইত, ব্রাহ্মণ নয়, নীচ জাতি। এ গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর বসতি নাই, কেবল কয়েক ঘর ডোম বাগ্‌দি, বাউড়ি। পর্ব্বের দিনে মন্দির প্রাঙ্গণে তাহারা উৎসব করে, আর দেবতার প্রীত্যর্থে পাঁঠা হাঁস বলি দিয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দ্র বলিলেন, ওহে নামটি কি বল্লে তোমার? হ্যাঁ, নরহরি, চল ত একবার ঠাকুর-ঘর দেখাবে।

নরহরি শশব্যস্ত হইয়া ডাকিল, ওরে ক্ষেমি, ক্ষেমি-ই—

সিঁদূরহীন সেই যুবতী মেয়েটি অগ্রসর হইয়া বলিল, ডাকচো, বাবা?

—হাঁ রে। বাবুরা ঠাকুর-ঘর দেখবেন। আলোটা জ্বাল্ ত।

পুরাতন জীর্ণ মন্দির, ফাটল ধরিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে বটের শিকড়গুলি স্বচ্ছন্দে গজাইতেছে। সামনে সুড়ঙ্গের মত পথ, মুখে ছোট্ট দরজা। তাহার উপর একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ফলকে কোনো জৈন তীর্থঙ্করের ক্ষোদিত নগ্ন মূর্ত্তি—যেন কালস্রোত রোধ করিতে গিয়া নিজেই মুছিয়া গিয়াছে।

ক্ষেমি আলো জ্বালিয়া আনিল। অর্দ্ধেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ও বুঝি তোমার মেয়ে নরহরি?

সে কহিল, হ্যাঁ, তবে আপন মেয়ে নয়। ওকে [illegible]

থেকে পেলেচি। সাত বছরে বিয়ে দিলুম, কপালে সইলো না। সেই থেকে এখানে আছে, ঠাকুর-সেবা করে, ভোগ রাঁধে।

অভ্যন্তর সমাধি-মন্দিরের মত আলো-বাতাসবিহীন নিঝুম, স্তব্ধ। মেঝে দেয়াল কতকালের অবরুদ্ধ গুমটে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উপরে খিলানের চাঁদোয়া কথায় কথায় প্রতিধ্বনি করে। স্তরে স্তরে অন্ধকার অনির্ব্বচনীয় রহস্যের ভারে জমাট হইয়া ঝুলিতেছে। প্রান্তস্থিত মৃন্ময় প্রদীপের রশ্মিগুলি ভয়ে হিম-শিম খাইয়া যেন আর পা বাড়াইতে চায় না।

মহীধরবাবু ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, বাপ্ রে।

সিংহাসনের উপর ঠাকুরের শিলামূর্ত্তি, গাঁদা ফুলের মালা আর রাশি রাশি বনফুল। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। একধারে কতগুলি হাঁড়িকুড়ি রান্নার সরঞ্জাম, আর কোণে পশুহননের একটি খড়্গ।

অর্দ্ধেন্দ্র প্রত্নতাত্ত্বিকের চক্ষু দিয়া মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিলেন। ভাস্কর্য্য সাধারণ রকমের, বিশেষত্ব নাই। চারিদিক দেখিতে দেখিতে প্রদীপের নিকটবর্ত্তী একটি ছোট শিলাখণ্ড চোখে পড়িল।

—ওটি কি ?

নরহরি বলিল, আজ্ঞে ঠাকুরের পাদপদ্ম।

আলোর কাছে অর্দ্ধেন্দ্র সেটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। হাতের থাবার চেয়েও ছোট, চৌকা ধরণের আকার, কষ্টি পাথরের মত মসৃণ। দুইটি পদচিহ্ন, মধ্যে একটি শূন্য নিপুণভাবে খোদাই করা।

—আশ্চর্য্য। দেখেচেন মহীধরবাবু, বলিয়া সেটি তুলিয়া ধরিলেন।

উৎসাহের সহিত নরহরি শুদ্ধ ভাষা ধরিল, আজ্ঞে পাদ-পদ্মের কী অপার মহিমা। মস্তকে ধারণ করলে বাত যক্ষ্মা সব দূর হয়। মাহাত্ম্য শুনে নানা দেশ থেকে লোক আসে—

অর্দ্ধেন্দ্রর মনোযোগপূর্ণ দৃষ্টি চোখা হইয়া পড়িয়াছিল একটি প্রশস্তির উপর। তিনি বলিলেন, প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের। পালি ভাষায় শিলা লিপি—

রুদ্ধ স্যাঁৎসেতে বায়ুর কুপিত গন্ধে মহীধরবাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, আর কতক্ষণ থাকবেন ? আমি বাইরে দাঁড়াই।

তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অর্দ্ধেন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা, নরহরি, তোমরা ত ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান কর। স্তবটা কি বল্‌তে পার ?

—আজ্ঞে পারি বই কি। শুনবেন ?—বলিয়া সে ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া করযোড়ে স্তব কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন,
নাই ছিল জল স্থল, নাই ছিল আকাশ,
মেরু মন্দার না ছিল, না ছিল কৈলাস।

পয়ারের কথা ও সুর প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া অপার্থিব মহাশূন্য ধীরে ধীরে রচনা করিতেছিল। অতীন্দ্রিয়ের ফাঁকা অনুভূতি, নাই-নাইর বিরাট অন্ধকার তাহার মুহ্যমান অন্তরের সবটুকু চেতনা যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইল। চক্ষু মুদিয়া বিকার-গ্রস্তের মত সে ঐ বৈচিত্র্যহীন শব্দগুলি আবৃত্তি করিয়া গেল।

স্তব শেষ হইলে সে হঠাৎ অনুভব করিল, সব অন্ধকার। কোথাও কিছু নাই। মনে হইল তাহারই ধ্যানের রূপায়ন বাহিরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।

ভয়ার্ত্ত স্বরে সে ডাকিল, বাবু মশায় !

অন্ধকারে দূর হইতে আওয়াজ আসিল, তাই ত হে, আলোটা যে নিভে গেল। বোধ করি তেল ছিল না।

—দাঁড়ান, জ্বালি।

—না, কাজ নেই। আমি বেরিয়ে যেতে পারবো'খন।

বাহিরে আসিয়া অর্দ্ধেন্দ্র কহিলেন, চমৎকার স্তবটি। আমি খুব খুশী হয়েচি নরহরি।

পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তিনি নরহরির হাতে দিলেন। বলিলেন, এই নাও। না না, ওতে আপত্তির কিছু নেই। ঠাকুরের ভোগ দিও।

নরহরি গড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, ধর্ম্মরাজ আপনাকে রক্ষা করুন।

তখন রাত্রি হইয়াছে। শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্না মাঠে ঘাটে শালবনের প্রান্তভাগে পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্য বিছাইয়া দিয়াছিল।

বাড়ি ফিরিবার পথে মহীধরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন অর্দ্ধেন্দ্রবাবু ? চমৎকার, নয় ?

অর্দ্ধেন্দ্র বলিলেন, হ্যাঁ তা বই কি। তবে ব্যবস্থাটা কেমন ওলট্ পালট্ রকমের। যেখানে যা দরকার নেই, সেটি ঠিক সেই জায়গায় রয়েচে, যেমন ধরুন দেব-মন্দিরে খড়্গ। ন বছরের মেয়ের সিঁদুর মেখে বেড়াবার কোনো প্রয়োজন ছিল কি ? বরঞ্চ ও জিনিসটা ঢের বেশী মানাতো ক্ষেমির মাথায়। আর—

—আর কি ?

—আর ঐ যে প্রাচীন মহাযান বৌদ্ধ যুগের শিলাখণ্ড, যার প্রকৃত ইতিহাস ওরা কিছু জানে না, যাকে অসহায়ভাবে জড়িয়ে ধরে ওরা কতগুলি মিথ্যা কুসংস্কার গড়ে তুলেচে, ওর স্থান একটা জীর্ণ দেউলের ভিতর নয়, মিউজিয়মে। শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে ঐতিহাসিক পুরাবৃত্তের ওপর কতখানি রশ্মিসম্পাত করতে পারেন বলুন ত ?

মহীধরবাবু ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, যা বললেন। তবে কি জানেন, ওদের অশিক্ষা কুসংস্কারের মূল অসংযম। মদ খায়, বিধবার সাঙ্গা দেয়, এমনি কত কি অনাচার।

দর্শকের ভিড় ভাঙিয়া গেলে মহাদেব নরহরির বাড়ি চড়াও করিয়া বসিল। ইতিমধ্যে কোনো সুযোগে গায়ের ছাই ভস্মগুলি সে পুকুরের জলে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।

তাণ্ডবের গ্লানি তখনো দূর হয় নাই, বক্ষের স্থূল মাংস পিণ্ডগুলি থাকিয়া থাকিয়া চমক দিতেছে। হাত দুটি পিছনে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে ডাকিয়া বলিল, চাট্টিখানি মুড়ি এনে দে ক্ষেমি, আর একটু গুড়। বড্ড খিদে পেয়েচে।

ঘরের ভিতর হইতে মুড়ি আনিয়া ক্ষেমি বলিল, নাচ দেখে বাবুরা খুশী হয়েচে। টাকা দিয়ে গেচে।

মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে সে বলিল, রেখে দে বাবুদের কথা। তুই কেমন দেখলি তাই বল্।

ক্ষেমি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার পার্ব্বতী ঠাকরুণটি

একেবারে বাচ্চা, মানায় নি। এবার থেকে একা বেরিও। আর হরহুর্গায় কাজ নেই।

—দূর, মহাদেব কখনো একা বেরোয়? যাকে মানায় তাকেই সঙ্গে নেব। এখন থেকে তুই হবি পার্ব্বতী। মিটি মিটি তাহার পানে চাহিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া ক্ষেমি বলিল, আমার ভারি বয়ে গেছে তোমার পার্ব্বতী সাজতে।

সে বলিল, ক্ষেতিটা কি শুনি? কতবার বলেচি না, এই ধরগে দু বিঘে জমি নিজের, আর চার বিঘে ভাগে নিয়েচি সেদিন। বিঘেয় দু বিশ করে ধান। ওতে তোর সারা বছর পায়ের ওপর পা দিয়ে দিব্যি চলে যাবে। বল্ হ্যাঁ কি না।

ক্ষেমি সত্যই বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছে। সে বালবিধবা, ঠাকুরসেবা করে, ভোগ রাঁধে। পালক পিতার যত্ন শুশ্রূষা করিতে হয়। সাঙ্গা বিবাহের কত প্রস্তাব আসিয়াছে, সে কান দেয় নাই। কিন্তু যেদিন অধর আসিয়া তাহার কাছে ধন্না দিয়া পড়িল, বলিল তাহার মন চুরি করিয়াছে—তাহাকে ছাড়িয়া সে বাঁচিবে না, সেদিন তাহার বুকের ভিতর নারীত্ব যেন গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। যৌবন এখন আর বারণ মানিতে চাহিল না। সে শিহরিয়া উঠিল, কী এ সব? সাঙ্গা করিতে তাহার যে বাধার অন্ত নাই। বিস্মৃতপ্রায় বাল্য স্বামীর কথা মনে পড়ে। উহার প্রতি ক্ষেমির বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই সত্য, কিন্তু জীবন-পথ হইতে উহাকে অপসারিত করিবার কোনো উদ্দেশ্যই কি ছিল না দেবতার? ঠাকুর রক্তমাংসে গড়া নয়, পাষাণ। তবু সে ত জীবন্ত, শুধু দয়াদাক্ষিণ্য আশীর্ব্বাদ নয়, সকলের মত রাগ রোষ ঈর্ষা দ্বেষ সবই যে আছে!

অধর নাছোড়বান্দা। নরহরিকে ধরিয়া পড়িল, তুমি ওকে বুঝিয়ে বল বাবাঠাকুর, ওর কোনো কষ্ট হবে না। বুড়ো হয়েচ এখন, এমন তেমন হলে কে ওকে দেখবে?

কথাটা নরহরির মনে লাগিল, বটেই ত। ক্ষেমিকে ডাকিয়া বলিল, সাঙ্গা কর মা। তোর ভাল হবে। মেয়েমানুষ, স্বামী নিয়ে থাকলে ঠাকুর রাগ করবেন কেন? ভক্তি মনে রাখিস, তিনি তাতেই খুশী হবেন।

ক্ষেমি মনে আশ্বস্ত হইল। মুখে বলিল, ও বেজায় মদ খায় বাবা।

অধর জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল, রাম রাম। তোকে ছুঁয়ে দিব্যি করচি।

পাড়াময় হৈ চৈ, বিন্দির মেয়েকে নাকি ভূতে পাইয়াছে। উঠানে মেয়েটা দাঁতে খিল ধরিয়া পড়িয়া আছে। দৃষ্টি শূন্য, মুখ দিয়া গেঁজ বাহির হইতেছে। ওঝা আসিয়া জোরুসে ঝাড় ফুক্ শুরু করিয়াছে। মুখে কুটা দেয়, গাঁয়ে ঝাঁটা মারে, বিড় বিড় করিয়া মন্তর পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, বল্, তুই কে? মেয়েটা নাকি সুরে কাঁদিয়া বলে, আমি সুরেশ। যাচ্চি, মেরো না—

ভূতে-পাওয়া মেয়ের কথা শুনিয়া সবাই অবাক। চার-পাঁচ বছরের ছেলে সুরেশকে কে না দেখিয়াছে! জনশ্রুতি, গ্রামের পাঁচী ডাইনী তাহাকে খাইয়াছে। মাগীর কী দাঁত, দাঁত নয় গজদন্ত। সব করতে পারে ও, ও-ই হয়ত সেই মরা ছেলেটার ভূত মেয়ের ঘাড়ে চাপাইয়াছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল, মার্ ডাইনী মাগীকে।

অমনি সকলে সমস্বরে চীৎকার করিল, মার্ মার্।

নরহরি বলিল, ওরে থাম থাম। ধর্ম্মরাজের ইচ্ছা নইলে কি কিছু হয়? ডাইনীর সাধ্য কি? ঠাকুরের পাদপদ্ম এনে মাথায় ছুঁইয়ে দিচ্চি। ও এখ্খনি আরাম হয়ে যাবে।

তারপর ক্ষেমিকে ডাকিয়া বলিল, যা ত মা, ঠাকুর-ঘর থেকে পাদপদ্ম নিয়ে আয় ত।

ক্ষেমি ছুটিয়া চলিল। ভূতের এ কি কাণ্ড? যাই-যাই করিয়াও নামিতেছে না। তবে ভরসা এই, পাদপদ্মের স্পর্শ গায়ে লাগিলে ও আর পলাইবার পথ পাইবে না।

আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া সে দেউলের তালা খুলিল। ভিতরে অন্ধকার, বাহিরের প্রখর আলো চোকে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া দিল। এক ধারে প্রদীপের নিকটে একটি ছোট্ট চৌকির উপর যেখানে পাদপদ্ম, সেইদিকে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইল। হাতড়াইয়া ঠেকিল, কয়েকটি ফুল। কিন্তু কই? দেশলাই ঠুকিয়া সে আলো জ্বালিল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, পাদপদ্ম সেখানে নাই!

আলো হাতে সে এধার ওধার ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কোথাও নাই। কী সর্ব্বনাশ! ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া আসিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া নরহরিকে বলিল, বাবা, নেই, পাদপদ্ম নেই।

নরহরি চমকিয়া উঠিল।—অ্যাঁ বলিস কি রে? তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

পাদপদ্ম অন্তর্ধান করিয়াছে!

নরহরি ভাবনায় পড়িল। সেকালে বিষ্ণুপুর হইতে মদন-মোহনের তিরোধানের কথা সে শুনিয়াছে—কত অশান্তি কত অকল্যাণ। তেমনি কোনো অনর্থ বাধিয়া বসিবে না ত?

ক্ষেমিকে বলিল, বুঝেচি মা। ঠাকুর রোষ করেচেন। কিন্তু কেন করলেন? আমরা ত কোনো দোষ করি নি।

বুক-ভাঙা কান্না ক্ষেমির কণ্ঠে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। কষ্টে সংবরণ করিয়া কহিল, করেচি বাবা। ভেবে দ্যাখো, আমার কি সাঙ্গা করা ঠিক?

নরহরি বুঝিল। কিন্তু এত বড় সর্ব্বনাশের পর কি-যে বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সে নিজমনে বকিয়া গেল, কে জানে দেবতার মনে কি আছে। স্তব পড়তে পড়তে আঁধার হয়ে গেল, ভিতরে বাইরে অন্ধকার। বাতিটা শুদ্ধু নিভে গেল।...

বিপুল বিক্রমে অধর আসিয়া ধর্ম্মরাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধ জুড়িয়া দিল। ক্ষেমিকে বলিল, গেছে ত বয়ে গেছে। ঠাকুর ত আর একটা নয়, তেত্রিশ কোটি। রূপ[illegible] সাক্ষাত-দেবতা। তোকে একদিন নিয়ে যাব সেখানে, পূজো দিবি[illegible] দেখ্‌বি তখন আমার কথা ফলে কি না।

ক্ষেমির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। আশৈশব সে যাঁহাকে পূজা অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছে তাঁহাকে ছাড়িলে ধর্ম্ম সহিবে কেন?

তিক্ত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, না না। আমার সাঙ্গা হবে না। আমার কাছে আর তুমি এসো না গো, এসো না।

একটু চুপ থাকিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত অধর বলিল, প্যাদপদ্ম ফিরে না পেলে তুই সাঙ্গা কর্‌বি না, কেমন? আর আমিও বলচি ওকে আনবোই। সব হচ্চে ঐ ডাইনী মাগীর কাণ্ড-মাণ্ড। বেটি ঘটি চালায়, বাটি চালায়, ভূত চালায়। ওকেও অমনি ক'রে চালিয়ে নিয়ে গেচে। ঘ্যাঁক্‌ করে ধরবো'খন, তখন দিতে পথ পাবে না। চল্‌লুম—

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রবাবু গ্রাম্য অর্থনীতির গবেষণায় মগ্ন, পল্লীবাসীর আয় ব্যয় ঋণ সঞ্চয় খাদ্যাখাদ্যের তথ্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া নরহরি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল।

অর্দ্ধেন্দ্র বলিলেন, গল্প শুনেচ ত নরহরি? রাক্ষসীদের প্রাণ ছিল কৌটোর মধ্যে বন্ধ, আর সেই কৌটো থাকতো জলের তলে পাতালপুরীর অন্ধকারে। তেমনি আমাদের এই দেশের প্রাণকে জানতে হলে গ্রামের ভেতর তার সন্ধান করতে হবে। বুঝলে ত?

—আজ্ঞে।—যতটুকু বুঝিল সে ঘাড় নাড়িল তার চেয়ে ঢের বেশী।

পকেট হইতে একটি নোট বহি বাহির করিয়া অর্দ্ধেন্দ্র লিখিতে বসিলেন, পোষ্যের সংখ্যা গরু-বাছুর জমিজমা দুধের পরিমাণ। তারপর বাড়িটি ঘুরিয়া দেখিয়া বাসের রীতি পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। হেঁসেল ঘরে ক্ষেমি রাঁধিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা নরহরি, তোমাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের চলন আছে শুনতে পাই। তবে ও মেয়েটিকে আবার বিয়ে দিলে না কেন?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নরহরি বলিল, সে আর কি বলবো বাবু মশায়, সব আমাদের বরাত। সেই যে অধর—যে সেদিন মহাদেব সেজে নেচেছিল না? তারই সঙ্গে ওর সাঙ্গা ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। লোকটি বেশ শক্ত সমর্থ, স্বাস্থ্যবান। তোমার ও মেয়ের সঙ্গে মানাবে ভালো।

নরহরির চোক ছল ছল করিয়া উঠিল। তা বাবু, সাঙ্গা বুঝি আর হয় না। বড় অমঙ্গল ঘটেচে, পাদপদ্ম অন্তর্ধান করেচেন।

—বল কি?

কিছুকাল অধ্যাপক তাহার মুখের পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, পাদপদ্মের অন্তর্ধান—সেজন্য বিয়ে বন্ধ! তা কেমন করে হয়? না না, এ বিয়ে—

একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা ত তোমাদের কুসংস্কার। বিয়ে হবে না কি হে? আমি বলচি নিশ্চয় হবে।

নরহরি শুধু হাত দুটি কপালে ঠেকাইল। বলিল, ধর্ম্মরাজের ইচ্ছা।

চিন্তিত মনে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহীধরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোথা দিগ্বিজয় করে এলেন অর্দ্ধেন্দ্রবাবু?

জামা খুলিতে খুলিতে অধ্যাপক বলিলেন, দিগ্বিজয় কি না বলতে পারি না। তবে এতদিন যে একটা মস্ত ভুল আমায় পেয়ে বসেছিল, আজ তা-ই জয় ক'রে ফিরে আসচি।

—কি রকম?

—সেদিন বলছিলাম না, এখানকার ব্যবস্থাটা একটু গোলমেলে রকমের, শিলাখণ্ডের স্থান ঐ জীর্ণ দেউলের মধ্যে নয়? কিন্তু ও আমার বুঝবার ভুল। এখন দেখছি, যেখানে যা দরকার বিধাতাপুরুষ সেটি ঠিক সেইখানে বসিয়ে দিয়েচেন। তাঁর ঘড়ি কখনো বে-ঘরে বাজে না।

মহীধরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, বিধাতার ঘড়ি! সে আবার কোন্ টাইম রাখে, ষ্টাণ্ডার্ড, না লোক্যাল?

গম্ভীরভাবে অধ্যাপক জবাব দিলেন, বিধাতার কোনো ষ্টাণ্ডার্ড টাইম নেই। দেশকালপাত্রবিশেষে তাঁর ব্যবস্থা।

হন্ত-দন্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া অধর ক্ষেমিকে জানাইল যে, ডাইনী মাগীকে পুকুর ধারে একা পাইয়া বেশ ঘা কত উত্তম মধ্যম বসাইয়া দিয়াছে সে, আর ইহাও শাসাইয়াছে যে, ঠাকুরের পাদপদ্ম যদি দিন তিনেকের মধ্যে যথাস্থানে চালান না হয় তবে যে সেওড়া গাছ হইতে সেই পেত্নীটা নামিয়া আসিয়াছে তাহারই ডালে জিব বাহির করিয়া উহাকে ঝুলিয়া পড়িতে হইবে।

ক্ষেমি কিন্তু বড় মন-মরা হইয়া পড়িল। সব সময় একা বসিয়া কি সব ভাবিতে থাকে, উনানের উপর হাঁড়ির ভাত ধরিয়া আসে, ঘরের ভিতর কাক ঢুকিয়া সব ছত্রছন্ন করিয়া দেয়—কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

বিকাল বেলা ন' বছরের মেয়েটা সিঁদুরের কৌটা আর এক বাটি তেল লইয়া আসে। বলে, চুল বেঁধে দে না ক্ষেমি মাসী। তাহাকে দেখিয়া সে ওঠে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া—আপদ! এখানে এসেচিস কেন মর্‌তে? যা না যমের বাড়ি। তারপর চকিতে হাত হইতে সিঁদুরের কৌটাটি তুলিয়া লইয়া ঠাকুর-ঘরের মেঝের উপর সজোরে ছুঁড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে, ঠাকুর—ঠাকুর—

দিনের অন্তর্যাতনা রাত্রে জাগিল বিভীষিকা রূপে। তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল, নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা। পদতলে মহেশ্বর, দলিত মথিত বক্ষপঞ্জরগুলি মর্ মর্ করিয়া উঠিল যে। হরমৌলীর জটাজাল বাহিয়া জাহ্নবীর ফেনিল কল্লোল, স্তিমিত শশিকলা, উগ্র বিষধর … ববম্ বম্। নৃত্যলাস্যে অট্টহাস্য উঠিল, রক্ত দে … রক্ত দে! ডাকিনী যোগিনী প্রতিধ্বনি করিল, রক্ত দে … রক্ত দে! সভয়ে দেখিল সে, ছিন্ন-মস্তা, নগ্ন কবন্ধ হইতে রক্ত ফিনকি দিয়া উঠিতেছে।

ক্ষেমি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। অর্দ্ধ-নিদ্রা অর্দ্ধ-জাগরণের চমক দৃষ্টি ভয়বিহ্বল কল্পনাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিল। শুনিল, অট্ট হাসি … তা থৈ … রক্ত দে! মাথায় তাহার খুন চড়িয়া গেল। হৃদপিণ্ডের ধমনীতে অফুরন্ত রক্ত টগবগ করিয়া উঠিল।

বিকারগ্রস্ত মস্তিকের ভিতর অকস্মাৎ একটা কঠোর সঙ্কল্প জাগিতেছিল। মনে পড়িল, মন্দিরপ্রান্তে খড়্গ পড়িয়া আছে।

ফুটবল ঃ

ফুটবলের মরশুম এখনো সুরু হয়নি তবে প্রতিবারের মতো এবারও খেলোয়াড়দের ক্লাব পরিবর্ত্তনের পালা সমারোহে শেষ হ'য়েছে। অবশ্য সংখ্যা অন্যান্য বারের তুলনায় কিছু কম তবে উত্তেজনা বিন্দুমাত্র কমেনি। খেলোয়াড়দের ক্লাব পরিবর্ত্তনের ফলে ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স, কালীঘাট ও স্পোটিং ইউনিয়ান ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে এবং লাভবান হ'য়েছে ভবানীপুর ও মোহনবাগান। ওসমান তাঁর পুরাতন ক্লাবে ফিরে এসেন। ইষ্টবেঙ্গল থেকে কে দত্ত, এন গুহ, এ নন্দী ও গাঙ্গুলী ভবানীপুরে এসেছেন আর ভবানীপুর থেকে গিয়েছেন দেব রায়। কে দত্তের ক্লাব পরিবর্ত্তনে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই কেননা এবিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু অপর কয়েকজনকেও ঐ সঙ্গে আসতে দেখে আশ্চর্য্য হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এরিয়ান্স থেকে গড়গড়ি, আর ভট্টাচার্য্য ও এস ঘোষ মোহনবাগানে এসেছেন; স্পোটিং থেকে এসেছেন কে চ্যাটার্জ্জি, এ দত্ত। কালীঘাট থেকে পি চক্রবর্ত্তী ইষ্টবেঙ্গলে এবং অনেকগুলি তরুণ খেলোয়াড় বিভিন্ন ক্লাবে যোগদান ক'রেছেন। বাঙ্গলার বাহির থেকে খেলোয়াড় আমদানীর চেষ্টা এবার কোন ফুটবল প্রতিষ্ঠানকেই প্রলুব্ধ করেনি। বোধ হয় ভবিষ্যত দুর্দ্দিনের কথা ভেবে কোন ক্লাব খেলার বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছেন না আর ক'লকাতার মত বিপদজনক এলাকায় জীবন পণ করে ফুটবল খেলায় যোগ দিতে বোধ হয় কোন বাইরের খেলোয়াড় রাজী হচ্ছেন না। যে কারণেই হউক যখন বাহির থেকে খেলোয়াড় আমদানীর লোভ তাঁরা একবার সংবরণ করতে পারলেন তখন আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও এই আদর্শকে তাঁরা সম্মান দিতে পারবেন।

ক্রীড়ামোদীদের ধারণা ছিল যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য এ বৎসরের ফুটবল মরসুম বুঝি বাঙ্গলা দেশে দেখা যাবে না। কিন্তু আই এফ এ'র কার্য্যকরী সমিতি এক সভায় স্থির করেছেন অন্যান্য বৎসরের মতই কলকাতায় ফুটবল খেলা এবৎসরও পরিচালনা করা হবে। বিমান আক্রমণ থেকে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের রক্ষার জন্য উক্ত কার্য্যকরী সমিতি যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কলকাতার যে সব উন্মুক্ত ময়দানে ফুটবল খেলান হয় সেখানে দর্শক এবং খেলোয়াড়দের কি ভাবে বিমান আক্রমণকালে তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন তা স্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করেন নি। বিমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যদি উন্মুক্ত ময়দানে পরিখাগুলিই একমাত্র আশ্রয় হিসাবে তাঁরা নির্ব্বাচন করেন তাহলে ফাঁকা ময়দানেই ফুটবল খেলাগুলি শেষ করতে হবে। মাঠে খুব কম লোকই জীবন বিপন্ন করে খেলা দেখতে যাবে। বর্ষাকালে কলকাতার ফুটবল ময়দানের শোচনীয় অবস্থা ক্রীড়ামোদীরা সহজে ভুলতে পারে না। আশ্রয় স্থান হিসাবে যে পরিখাগুলিকে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে তারাই তখন জলের মধ্যে আত্মগোপন করবে। সেই অবস্থায় যদি আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন অসহায় দর্শকরা কি ভাবে আশ্রয় পাবেন তা বিশেষ চিন্তার বিষয়। কলকাতার ফুটবল ময়দানগুলি খুবই বিপদজনক এলাকায় রয়েছে। কলকাতায় অন্যত্র কোথাও ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করলে এই অবস্থা থেকে অনেকখানি নিরাপদ হতে পারত। বাঙ্গলা দেশের ছোট ছোট সহরেও আই এফ এ যদি এবৎসরের মত ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন তাহলে এর থেকে কম ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড়রা যে আনন্দলাভ করত তা আমাদের মনে হয় না। বেশীর ভাগই খেলোয়াড় স্কুল কলেজের ছাত্র; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর সকল স্কুল কলেজ ১৫ই এপ্রিলের পূর্ব্বে দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ থাকবে। এর পর ছাত্রদের কলকাতার ময়দানে কতখানি আকর্ষণ করবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কলকাতার ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের ঝুঁকি বোধ হয় কম অভিভাবকই তাদের নিতে দিবেন। যুদ্ধ বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব প্রান্তে এসে পড়েছে, কোনদিকে যে যুদ্ধের গতি শেষ হবে একথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। জনসাধারণের মনে আজ ত্রাসের রেখা ফুটে উঠেছে, মনের এই অবস্থায় আমোদ প্রমোদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবার নয়। তবে কলকাতার ময়দানে বাঙ্গলা দেশের জনপ্রিয় ফুটবল খেলা কিভাবে চলবে তার কথা ভাববার সময় ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড় উভয়ের কতখানি আজ আছে তা সন্দেহের কারণ। ভবিষ্যত দুর্দ্দিনের চিন্তা আজ উভয়েরই মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যে দুর্দ্দিনের জন্য আজ আমরা এতখানি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি তা না এলেই মঙ্গল। তবে আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

পৃথিবীর মুষ্টিযোদ্ধা জোলুই ঃ

পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জোলুই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওবে সাইমনকে ষষ্ঠরাউণ্ডে ভূতলশায়ী ক'রে তাঁর পৃথিবীর সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। ১৯৪০ সালে ওবে সাইমনকে পরাজিত করতে জোলুইকে ১৩ রাউণ্ড পর্য্যন্ত লড়তে হয়েছিল। সেবার জো নিজেমুখেই স্বীকার করেছিলেন 'আমি ভাগ্যক্রমে জয়লাভ করলাম।' সেই কথা স্মরণ করে এবার অনেকেরই ধারণা হয়েছিল জোলুই বুঝি পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপ হারাবেন। চতুর্থ রাউণ্ডে সাইমন জোকে বিপর্য্যস্তও করে তুলেন। সকলেই জোলুয়ের পরাজয় নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু জো হঠাৎ বিপুল উৎসাহে আক্রমণ চালিয়ে সাইমনকে ষষ্ঠ রাউণ্ড আরম্ভ হবার ৬ সেকেণ্ড পরেই ভূতলশায়ী করলেন। জোলুইকে এপর্য্যন্ত নিজের সম্মান রাখতে গিয়ে ২১ বার মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে এত অধিকবার পৃথিবীর আর কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়নি। পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা আজ বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হলেও তাঁর স্বভাব বেশ একটু অদ্ভুত ধরণের। জোলুই বর্ত্তমানে আমেরিকান সৈন্যদলে যোগদান করেছেন।

ঘস্ মহম্মদের বিবাহ ঃ

ভারতের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ঘস মহম্মদ সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের শ্রীমতী এ হোসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হউক আর ভারতের টেনিস মহলে ঘসমহম্মদের নাম অক্ষুণ্ণ থাকুক—এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

৯

বাইটন কাপ ঃ

এ বৎসর বাইটন কাপে মাত্র ১৮টি টীম যোগদান ক'রেছে। বাঙ্গলার বাইরের থেকে কোন টীম আসেনি। বি এন আর 'এ' এবং 'বি' ক'লকাতার বাইরের টীম। বাইটন কাপের এবার আর ততো আকর্ষণ নেই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খেলাধূলার আকর্ষণ ক'মে যাচ্ছে।

অখেলোয়াড়ী মনোভাব ঃ

প্রথম ডিভিসন হকি লীগে মোহনবাগান ও পাঞ্জাব স্পোর্টসের খেলায় কয়েকজন পাঞ্জাবী খেলোয়াড় অত্যন্ত হীন মনের পরিচয় দিয়েছে। তাদের মতে মোহনবাগান যে গোলটি দেয় তা সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং তাদের এই মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য কয়েকজন খেলোয়াড় আম্পায়ারকে আক্রমণ ক'রে যাঁরা মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই কয়েকটি পাঞ্জাবী খেলোয়াড়ের আচরণ দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যান। অবশ্য বি এইচ এর কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার বিচারে খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন এবং ঠিক ক'রেছেন পাঞ্জাব স্পোর্টস লীগের আর কোন খেলায় যোগদান ক'রতে পারবে না।

হকি লীগ ঃ

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ খেলায় পোর্ট কমিশনার ২৭ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম স্থানে আছে সি বি এস। তৃতীয় বিভাগ 'এ'তে বি ই কলেজ প্রথম হয়েছে। অন্যান্য বারের মত হকি খেলার আকর্ষণ এবার না থাকলেও খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একেবারে নিম্নশ্রেণীর হয়নি। প্রথম বিভাগের খেলায় নিম্ন স্থান অধিকারী বি এণ্ড এ রেলওয়ে দলের কাছে চতুর্থ স্থান অধিকারী রেঞ্জার্স দলের ৩-১ গোলে পরাজয় ক্রীড়ামোদীদের আশ্চর্য্য করে। বিজয়ী দলের রোজারিও একাই ৩টি গোল দিয়ে দলের সম্মান রাখেন।

প্রথম বিভাগ হকি

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
পোর্ট কমিশনার	১৬	১২	৩	১	৩৭	৫	২৭
মিলিটারী মেডিক্যালস	১৬	১১	৪	১	২৪	৪	২৬

নিখিল ভারত টেনিস সঙ্ঘ ঃ

নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পি আর দাস
সাধারণ সম্পাদক—মিঃ এস ব্রুক এডওয়ার্ডস
কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এ দে

সকলেই যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হয়েছেন সুতরাং এসম্বন্ধে আমাদের মতামত নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !"—১৷৹
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "মিস্‌মিদের কবচ"—৷৷৹
য. না. সে. প্রণীত "কিন্তু"—৷৷৹
শ্রীবিভূতিকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "জীবন-পথে"—১৷৹
শ্রীতুষ্টচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "সহজ পারফিউমারী শিক্ষা"—১৲
শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত গীতাভিনয় "সুবল-মিলন"—১৲, "অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ"—১৲
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রজনীগন্ধা"—১৷৷৹
শ্রীআশীষ গুপ্ত প্রণীত "স্বপ্নদেখা মেয়ে"—২৲

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের ত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

গত ঊনত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' কি ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আমরা ভারতবর্ষের চাঁদা বা বিজ্ঞাপনের হার বৃদ্ধি করি নাই। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৷৹, ভি-পি—৬৸৹, ষাণ্মাষিক ৩৷৹, ভি-পিতে ৩৷৵৹। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া মণিঅর্ডার কূপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কূপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন নেয়োগী

নারায়ণ যাত্রা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস





ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৯

দ্বিতীয় খণ্ড | উনত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা



ভারতের কারখানা-শিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষ, বিপুল তার জনসংখ্যা, বিশাল অফুরন্ত তার ধনরত্ন। কৃষিক্ষেত্রে, অরণ্যে, মৃত্তিকাগর্ভে, সাগরতলে যে অপরিমিত ঐশ্বর্য্য রয়েছে, নিত্য উৎপন্ন হচ্ছে এবং আজও কত গুপ্ত রয়েছে, তার হিসাব করা—আর আকাশের নক্ষত্রগণনা করা একই রকম কঠিন। Max Muller বলেছেন—"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India.

"If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which will deserve the attention of even those who have studied Plato and Kant, I should point to India."

নৈসর্গিক সমৃদ্ধি ও মানব চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ এই ভারতবর্ষে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন—ভারতবর্ষে সকল রকম মিলিয়ে বৎসরে চার হাজার কোটী টাকার তন্তু, তণ্ডুল, খনিজ, জলজ, বনজ ও জীবজ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। সাধারণ লোকের পক্ষে এক সঙ্গে এর কল্পনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সকল দিক দিয়ে দেখলে সেটা সহজ ব'লেই মনে হবে, কারণ এ বিশাল দেশ তার অভাব মিটিয়ে প্রতি বৎসর বাইরে রপ্তানি করে প্রায় দুই শত কোটী টাকার মাল, নিজের টাকায় কেনেও প্রায় পৌনে দুইশত কোটী টাকার বিদেশী পণ্য।

ভারতের অসংস্কৃত পণ্য.

সংক্ষেপে বলা চলে, এদেশের তুলনা নেই। এদেশের মত এত রকম রত্ন এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর এমন কোনও দেশই নেই। পাট যা না হ'লে পৃথিবীর বাণিজ্য অচল, তা আর কোথাও হয় না বললেই হয়। চীনাবাদাম, রেড়ীর বীজ, ইক্ষু, লাক্ষা, অভ্র, মোনাজাইট, ইলমেনাইট,. পশুচর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতের স্থান প্রথম। কার্পাস, তামাক, অধিকাংশ তৈল-বীজ, চা, ম্যান্‌গানিজ প্রভৃতি অজস্র অসংস্কৃত পণ্য বিষয়ে তার স্থান দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থান নিয়ে আরও কত আছে; আর আছে প্রায় সকল রকমই মোটামুটি।

শিল্প-প্রধান ভারত

ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচয় নিতে গেলে দেখতে পাব, আমরা বহু দেশ থেকে যদিও এখন পিছিয়ে কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। বর্ত্তমানে নতুন শিল্পের ও শিল্পজাত পণ্যের কথা আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। সেই কথাটা বললেই মনে হয় যে শিল্পজগতে আমরা যেন প্রথম প্রবেশ করছি; যেন অতীতে আমাদের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান কিছু ছিল না। আমরা চাষীর জাত, কৃষিই আমাদের সম্বল, এ ছাড়া আমরা কিছু জানতাম না, জানিও না।

অবস্থার গতিকে দাঁড়িয়েছে কতকটা তাই-ই। কেবল এই জ্ঞানটুকু জগতের কাছে প্রচার করবার জন্য যে বিরাট প্রচেষ্টা ও প্রচার শতাব্দী ধ'রে চ'লেছে, তা একেবারে বিফল হয় নি। আমরা নিজেরাই ভুলে গেছি, আমাদের অতীতের কথা; আত্ম-বিস্মৃত হয়েছি, আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি। এখনও কোটী কোটী ভারতবাসী আছেন যাঁরা মনে করেন যা-কিছু নতুনতর, যা-কিছু ভাল, যা তৈরী করতে যন্ত্রপাতি লাগে, তা সবই বিদেশীর দেওয়া; বিদেশী না দিলে আমাদের দেশে এ সকল বস্তু তৈয়ারী হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের মনের এই ধাঁধা দূর করতে হয় বিদেশীর কথা দিয়ে। যারা অন্তর দিয়ে ভারতকে ভালবেসেছিলেন বা এখনও ভারতের কল্যাণ অন্তরের সঙ্গে কামনা করেন, এমন বিদেশীর অভাব হয় নি। তাঁরা প্রতিবাদ ক'রেছিলেন যে, ভারত কেবল কৃষিক্ষেত্র ছিল না। শিল্পে তাহার অতুলনীয় স্থান ছিল। Mr. Montgomery Martin ব'লেছিলেন—"I do not agree that India is an agricultural country; India is as much a manufacturing country as an agricultural; and he who would seek to reduce her to the position of an agricultural country, seeks to lower her in the scale of civilization ... She is a manufacturing country, her manufactures of various descriptions have existed for ages and have never been able to be competed with by any nation whenever fair play has been given to them."

পুরাতন বাণিজ্য

যখন বিদেশী বাণিজ্যের ফলে আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হ'য়ে গেছে, তখন মার্টিনের মত লোক পূর্ব্ব অবস্থার কথা জোর ক'রে লোককে জানাচ্ছিলেন। ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রাচীনের তুলনায় এটা অতি আধুনিক কথা। শিল্প-বাণিজ্যের গতি দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ আমরা বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রভাবে হা-হুতাশ করি, Pliny একদিন সেইরূপ ব'লেছিলেন—"In no year does India drain our Empire of less than fifty-five million sesterces (£400,000) giving back her own wares in exchange which are sold at once hundred times their prime cost."

শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির কারণ

কতক অন্তর্বিদ্রোহের ফলে, কতক বিদেশী আসার সময় অশান্তির জন্য ভারত-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ রকম সময়েও তার বহির্ব্বাণিজ্য বিরাট ছিল, দেশ দেশান্তরে তার শিল্পসম্ভার আদৃত হ'য়েছে। ভারতবর্ষে বিদেশী দ্রব্য আমদানির পথে প্রবল বাধা ছিল, পার্লামেণ্টে জিজ্ঞাসিত হ'য়ে Munroএর কারণটা বললেন—"the religion and civil habits of the natives and more than anything else, the excellence of their own manufacture." তা ছাড়া বিদেশে বহু সমাদরে এবং বহু মূল্যে বিক্রীত হওয়ার জন্য ভারতীয় শিল্পের প্রতি ঈর্ষ্যা, ইউরোপীয় জাতির আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-বিস্তারের চেষ্টার ফলে অত্যধিক আমদানি-শুল্কের প্রবর্ত্তনই আমাদের শিল্পনাশের প্রধান কারণ। ইংলণ্ডে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর প্রতি এক শত টাকার মালে শতাধিক টাকা শুল্ক বসে। তা না হ'লে হয়ত ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে কেউই সমকক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না। Horace Hayman Wilson পার্লামেণ্টে ব'লছিলেন—""had not this been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their ontset and could scarcely have been again set in motion, even by the power of the steam."

তখন বাণিজ্যের তালিকায় যা ছিল তা এক কথায় Sunderland সাহেব ব'লেছেন—"The source of her wealth was largely her splendid manufactures. Her cotton goods, silk goods, shawls, muslins of Dacca, brocades of Ahmedabad, rugs, potteries of Sind, jewellery, metal work and lapidary work, were famed not only all over Asia, but in all the leading markets of North Africa and Europe." এ সব খাঁটি সত্যি কথা, অস্বীকার করলে ইতিহাসের অবমাননা করা হয়।

নব প্রেরণা

এর পরে মস্ত বড় ব্যবধান। ক্রমে আমরা কৃষক হ'য়ে পড়লাম। বিদেশীর প্রয়োজন হ'ল, বিদেশের বাজারে চাহিদা হ'ল, আমরা সোৎসাহে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ক'রতে লাগলাম, চাষী ব'লে পরিচয় লাভ করলাম।

এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে আমরা আজ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আজ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ শিল্প-প্রচেষ্টায় অষ্টম, কাহারও কাহারও মতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। আটত্রিশ কোটী লোকের চেষ্টায় অষ্টম স্থান অধিকার করা খুব গৌরবের না হ'লেও যে-রাজনৈতিক চাপের মধ্যে দিয়ে এইখানে এসে পৌছুতে পারা গেছে, তাতেও গৌরব আছে।

ইউরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে, ভারতের ধনরত্ন যখন পৌছে গিয়ে তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে, তখনই তার উদ্ভাবনীশক্তি স্ফূর্ত্তি পেয়েছে, নানা রকম যন্ত্রপাতি কলকব্জা কারখানার উৎপত্তি

হ'য়েছে। আমাদের দেশে এসকল কিছু তখন হয় নি; বিদেশী জিনিষের চাপে তখন আমরা বিব্রত।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের নূতন ক'রে শিল্প সঞ্জীবন হ'য়েছে ১৯০৫-৬ সাল থেকে, বিশেষত বাঙ্গালা দেশে যখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ ক'রলে; রাজনৈতিক কর্ম্মের প্রতিবাদে অর্থনৈতিক চাপ দেবার চেষ্টা ক'রলে। এর কথা আবার পরে আলোচনা করব।

আধুনিক শিল্পপ্রচেষ্টা

এরও আগে যে আমাদের দেশে বৃহদাকার শিল্পপ্রচেষ্টা হয় নি, তা বলা চলবে না। সকল প্রকার শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমানে আমি বড় বড় কয়টি শিল্পের কথা ব'লব। যদিও সকলগুলিই উনবিংশ শতাব্দীতে সফল হয় নি, তবুও চেষ্টা হ'য়েছে এবং ব'লতে আমার লজ্জা নেই যে, এর অনেকগুলি ইংরেজ চেষ্টা করেছে।

লৌহ—সর্ব্বপ্রথমে হয় লৌহশিল্প উদ্ধারের চেষ্টা। ১৮৩০ সালে এক ইংরেজ দক্ষিণ ভারতে আর্কট প্রদেশে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হন; আবার ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আর্কটে চেষ্টা হয়; সেটাও না হ'য়ে ১৮৭৫ সালে পুনরায় চেষ্টা হয় এবং তাও বিফল হয়।

কার্পাস—১৮৩৮ সালে প্রথম কার্পাস বা তূলার কল হয় শ্রীরামপুরে, বাউরিয়া কটন মিল; তার পরেরটি হ'ল Bombay Spinning and Weaving Co. ১৮৫১ সালে।

পাট—১৮৫৪ সালে Ishra Yarn Mill নামে প্রথম পাটকল আবির্ভূত হয় শ্রীরামপুরে। পৃথিবীর প্রথম পাটকল জন্মায় ডাণ্ডি শহরে—কারণ তিমির তেল পাট ভিজিয়ে বয়নের উপযোগী নরম করবার জন্যে প্রয়োজন; ডাণ্ডিতে ঐ তৈল প্রচুর পাওয়া যাওয়াতে ডাণ্ডিই পাটকলের প্রথম নমুনা দেখায়।

রেলপথ—১৮৫৪ সালেই ভারতে প্রথম রেলপথ দেখা দেয় এবং শিল্পপ্রসারে যে রেলের প্রভূত সাহায্য দরকার, তা বিশেষ বলা বাহুল্য। তা ছাড়া রেল-সংক্রান্ত প্রকাণ্ড শিল্পও দেশে জন্মাতে পারে।

তাম্র—১৮৫৭ সালে "সিংভূম কপার কোম্পানী" সিংহ-ভূমিতে প্রথম কারখানা স্থাপন ক'রে তামা উদ্ধার করবার চেষ্টা করে, তখন সেটা সফল হয়নি।

কাগজ—১৮৭৪ সালে প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয় শ্রীরামপুরে মহামতি কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড পাদ্রী কর্ত্তৃক। সাদা আর বাদামী কাগজের তাঁদের দেওয়া নাম "শ্রীরামপুর" আর "বালী" আজও চলছে। এ সময় বাইবেলের বাঙ্গলা অনুবাদ ছাপবার জন্যে কাগজের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁরা একেবারে কলকব্জার সাহায্যে কাগজ তৈয়ারী করবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি, তাঁরাই নানারকমে বাঙ্গলার যুগাবতার, তাঁরাই ভারতে ভারতীয় ভাষার প্রথম সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" ১৮১৮ সালের ৩১ মে তারিখে প্রকাশিত করে বাঙ্গালীর কাছে নতুন আলোক উপস্থিত করেন।

কয়লা ও চা—আরও দুটি বস্তুর উল্লেখ করা প্রয়োজন, যদিও তারা manufacturing industry বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়; তবুও তারা ভারতের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তারা কয়লা ও চা। ভারতবর্ষে ১৭৭৪ সালে কয়লা প্রথম আবিষ্কৃত হ'লেও ১৮১৪ সালে খনির কাজ প্রথম আরম্ভ হয় এবং অকৃতকার্য্য হয়। কয়লার সবিশেষ সংবাদ নেবার জন্যেই ১৮৫৬ সালে Geological Survey of India-র সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি যে কত প্রয়োজনীয় তা আপনাদের ব'লে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

চা'র নিয়মিত বাগান ১৮৩৬ সালে ইংরেজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়; C. A. Bruce তার Superintendent নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। ১৮৩৯ সালে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে Assam Company স্থাপিত হয়; অন্যান্য শিল্পের ন্যায় চা সম্বন্ধেও নিরাশ হবার প্রভূত কারণ ছিল; কিন্তু কুলিমজুরদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার ক'রে একে সফল করা হ'য়েছে। ১৮৩৮ সালে চা ইংলণ্ডে পৌছয়, ব্যবসায়ীরা সে ঘটনা স্মরণ ক'রে ১৯৩৮ সালে শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন ক'রেছেন।

বিঘ্নের মধ্যে সফলতা

অন্যান্য শিল্পের চেষ্টা হয়নি, সেকথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না, কিন্তু বর্ত্তমানে বৃহদাকার শিল্প বলতে যা বোঝায়, তারা তা নয়, সুতরাং বর্ত্তমানে তাদের কথা ধরলাম না।

বিংশ শতাব্দী ভারতের শিল্পের নতুন অধ্যায়। হিসাবমত ধরতে গেলে আজ চল্লিশ বছরই প্রকৃত শিল্পপ্রচেষ্টা হ'চ্ছে এবং যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা গেছে, তা গৌরবের। বিশেষ ক'রে গৌরবের কথা এই, এতে দেশে সরকারী সাহায্য কিছুই পাওয়া যায়নি, উপরন্তু অনেক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রেছেন তাঁরা; এবং বিদেশীকে তাদের সস্তার মাল আমদানি করতে দিয়ে ভীষণ অসুবিধাও সৃষ্টি ক'রেছেন। যাই হোক, তা সত্ত্বেও যতটা হ'য়েছে, তারই আলোচনা করব।

বিংশ শতাব্দীর যে সময়ের কথা বলছি, এরই মধ্যে দুটো বৃহদাকার শিল্প দেশের মাটীতে শিকড় বসাতে সক্ষম হ'য়েছিল।

কাপড় কল—বিংশ শতাব্দীর যাত্রা যখন শুরু হ'ল তখন দেশে ১৯৩টি কাপড়ের কল ব'সেছে, তাতে ৪৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকু আর ৪০ হাজার ১০০ তাঁত খাটছে।

পাট—পাটকলের সংখ্যা তখন ৩৬ এবং ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০০ টাকু এবং ১৬ হাজার ২০০ তাঁত ব'সে গেছে।

কয়লা ও চা—এতদিনে কয়লা ও চা বেশ সমৃদ্ধিলাভ ক'রেছে এবং অনেকগুলি কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভেষজ—রাসায়নিক ও ভেষজ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য ১৯০১-২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল নব জাগরণের সূচনা করলে।

Hydro-electric—আরও অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল ১৯০২ সালে; মহীশূরে কাবেরী নদীর জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ ক'রে প্রকাণ্ড Hydro-electric Scheme সৃষ্টি হ'ল। পরে আরও এরূপ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হ'য়েছে।

সিমেণ্ট—সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলে সিমেণ্ট কারখানা। জাতির জীবনে সিমেণ্টের প্রচুর প্রয়োজনীয়তা আছে, সুতরাং এর আবির্ভাবের কথা উপেক্ষা ক'রব না। ১৯০৪ সালে মাদ্রাজে প্রথম কল স্থাপিত হ'ল; কাজ খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে

লাগল। ১৯১৪ সালে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাত্র তিনটি কল ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিল। পরের কথা পরে বলছি।

জাতীয় আন্দোলন—বাঙ্গালা দেশ

এইবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ফিরে আসি। যখন রাজশক্তি কিছুই সাহায্য করবে না, অথচ জাতির সম্বিৎ যখন ফিরেছে তখন উপায় একটা ভাবতেই হয়। অপর প্রদেশের কথা না বলতে পারলেও বলতে পারি বাঙ্গলার এই একটা মহাসন্ধিক্ষণ। এই সময় বাঙ্গালী Bank, Insurance থেকে আরম্ভ করে কাপড়ের কল, মোজা গেঞ্জি (Hosiery), চামড়ার কারখানা, দিয়াশলাই, চিনির কল, প্রসাধনের সামগ্রী, চীনামাটীর দ্রব্যাদি, কলাই বা এনামেল, পেন্সিল কলম, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সাবান, কাচ, হাড় ও শিঙের জিনিস প্রভৃতি সকল দিকে তার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছড়িয়ে দিলে। সকলগুলিই যে একেবারে সফল হয়নি এবং হওয়া সম্ভব নয়, সেটা বেশ বুঝতেই পারা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরিকল্পনার রূপ এই সময় ফুটে ওঠে।

চিনি—বাঙ্গলা দেশে চিনির কল স্থাপিত হ'ল স্বদেশী আন্দোলনের জন্য—যশোহর কোটচাঁদপুরে ১৯০৫-৬ সালে।

লৌহ—আনন্দের বিষয় টাটা কোম্পানী দেখা দিলে ১৯০৮ সালে এবং ১৯১১ সালে তারা বাজারে পিগ্ আয়রণ (pig iron) বার করলে। ১৯১২ সালে হ'ল প্রথম ইস্পাত।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে বিশেষ চেষ্টা হ'লেও এই সময় থেকে কাচ ও দিয়াশলাই শিল্প দুটি বড় ক'রে গ'ড়ে উঠতে থাকে এবং তারাও আজ ভারতের বড় শিল্পের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

দিয়াশলাই—১৮৯৪-৯৫ সালে কারখানার আবির্ভাব হ'য়েছে। তন্মধ্যে যারা কিছুদিন টিকে ছিল তারা Gujrat Islam Match Factory, Ahmedabad ও Amrit Match Factory, Kotah, Bilaspur. তন্মধ্যে গুজরাটের কারখানাই ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং পরে লাভবান হয়। বাঙ্গলা দেশের দুই কারখানা Orient Match Mfg. Co. Ld. ও Bande Mataram Match Factory ১৯০৫-০৬ সালে জন্মে।

কাচ—১৮৯২ সালে আধুনিক পন্থায় কাচ তৈয়ারীর কারখানা হ'ল। ১৯০০ পর্য্যন্ত ৫টি জন্মে, তন্মধ্যে তিনটি ইংরেজ পরিচালিত। ১৯০৬-১৩ মধ্যে ১৬টি দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলনের ঝোঁকে। ১৯১৪ সালে মাত্র তিনটিতে দাঁড়ায়। তারপরে যুদ্ধের সুযোগ এসে পড়ল। যথাস্থানে সকল শিল্পের সবিশেষ পরিচয় দিচ্ছি।

অন্যান্য জাতীয় আন্দোলন

ভারতীয় শিল্পপ্রসার লাভ করবার একটু বেশী সুযোগ পেলে ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে; কিন্তু এটা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এর চেয়ে বেশী কাজ করলে নিরুপদ্রব আইন আন্দোলন ১৯৩০-৩১। যদি আর কারও কিছু করতে না পেরে থাকে, কার্পাস শিল্প যে শক্তি সঞ্চয় করে নিল এই সুযোগে, তার তুলনা নেই।

রক্ষণ শুল্ক

জাতীয় আন্দোলনের দিকটাই দেখে যাচ্ছি, অপর একটা দিক দেখিয়ে দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। বিষয়টি Protection বা রক্ষণশুল্ক। ১৯২১ সালে Indian Fiscal Commission স্থাপিত হয় এবং ১৯২৩ সাল থেকেই কোন্ শিল্প সংরক্ষণ লাভের উপযুক্ত তার অনুসন্ধান করবার জন্যে এবং শুল্কের পরিমাণ ধার্য্য করবার জন্যে Indian Tariff Board স্থাপিত হয়। ছোট্ট ক'রে ব'লে রাখি, এর সহায়তা না পেলে আজ লৌহ, ইস্পাত, চিনি, দিয়াশলাই, কাগজ এতটা প্রসার লাভ করতে পারত না।

মহাযুদ্ধ—গত ও বর্ত্তমান

দুটো যুদ্ধের কথা উল্লেখ না করলে ভারতের শিল্পোন্নতির মূলে যে কার্য্যকারণপরম্পরা বর্ত্তমান, তাকে উপেক্ষা করা হয়। ১৯১৪-১৮ সালেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে ভারতের শিল্প-সম্ভাবনার যে বিরাট ক্ষেত্র প'ড়ে আছে, তাকে কাজে লাগাতে পারলে আবার জগতে সে ভেল্কি দেখিয়ে দিতে পারে। তার সর্ব্বাপেক্ষা নিখুঁত প্রমাণ হচ্ছে ১৯৩৯ সালে শুরু হ'য়ে অনির্দ্দেশ-পরিসমাপ্তির এই মহাসমরে। আজ ভারতবর্ষ তার জোর ক'রে পঙ্গু করা দেহখানা নিয়ে যে সাহায্য করছে এবং নিত্য নূতন ক্ষেত্রে যে উদ্ভাবনী প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিচ্ছে, তা হয়ত ইংরেজকেও চমৎকৃত ক'রেছে। আর খুব বড় বড় তালিকা বেরুচ্ছে, সেগুলো ভারতের শিল্পসম্ভারের নাম সগৌরবে বহন ক'রে কৃতকৃতার্থ হচ্ছে।

শিল্পবিচার—কার্পাস

কারখানা—ভারতশিল্পের কথা আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নাম আসে কার্পাস শিল্প। ভারতবর্ষ যখন কার্পাস শিল্পে জগতে বহু খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছে তখন ইউরোপ তুলার নামও জানত না। শুনতে অদ্ভুত লাগবে কথাটা, কিন্তু Dictionary of Commercial Products of India নামক বিরাট গ্রন্থের প্রণেতা মহাপণ্ডিত Watt ব'লেছেন—"It would not be far from correct to describe cotton as the central feature of the world's modern commerce. Certainly no more remarkable example of a sudden development exists in the history of economic products than in the case with cotton. The enormous importance of the textile today, in the agricultural, commercial, industrial and social life of the world, renders it difficult to believe that little more than two hundred years ago cotton was practically unknown to the civilized nations of the west." এই অবস্থা যখন ছিল, তখন ভারতের প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্রাদি যে বিশেষ সমাদৃত হ'ত, সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ কার্পাস শিল্পে ক্রমশ স্বাবলম্বী হ'তে চ'লেছে, ছয় লক্ষাধিক মজুর প্রায় চারি শত (৩৮৫) বড় কারখানায় কাজ

করছে এবং এখন (১৯৪০-৪১) উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ৪২৭ কোটি গজ এবং প্রায় ৬৩ কোটি পাউণ্ড সূতা। যুদ্ধের কল্যাণে এই পরিমাণ আরও অনেক বেড়েছে। এক কথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষ বহুল পরিমাণে এখন নিজের বস্ত্র তৈয়ারী ক'রে নিচ্ছে। মিল ও তাঁতে এখন ভারতের প্রয়োজনের শতকরা ৮৯ ভাগ মেটাচ্ছে। একবার ভেবে দেখুন সেই দিন—যখন এক বৎসরে (১৯২০-২১) আমরা ১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার সূতা ও ৮৮ কোটি ৫৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার কাপড় অর্থাৎ এক শত দুই কোটি টাকার তুলার বিদেশী জিনিস কিনেছিলাম। এটা মাত্র এক বৎসরের কথা, আমরা বৎসরের পর বৎসর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে গড়ে বৎসরে ৪০ কোটি টাকার তুলার মাল কিনেছি। আজ সেটা এগারো কোটি টাকার দাঁড়িয়েছে, তবে অন্যান্য তন্তুজাত বস্ত্রাদি আরও আছে।

সহজেই বুঝতে পারা যায়, এ ঘটনা হঠাৎ সম্ভব হয়নি। বিদেশী বণিকের চাপে পড়ে ভারত সরকার কোন সুযোগই ভারতের মিলগুলিকে দিতে পারেননি; উপরন্তু ভারতে প্রস্তুত ২০নং বা তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সূতা হ'তে প্রস্তুত বস্ত্রাদির উপর ভারত সরকার ১৮৯৬ সালে শতকরা পাঁচ টাকা excise duty চাপিয়ে দিলেন। এর চাপে ভারতীয় মিলগুলির অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায় ১৯২৫-২৬ সালে এই শুল্ক রদ করা হয়।

আমদানি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মিল-সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ হ'তে ১৯১০ সালের মধ্যে ৬৬টি নতুন মিল স্থাপিত হ'য়েছিল। আবার অসহযোগ আন্দোলনের ১৯২১-২৫ সালের মধ্যে ৮৪টি এবং নিরুপদ্রব আইন আন্দোলন উপলক্ষে ১৯৩০-৩৫ সালের মধ্যে ১৭টি নতুন মিল স্থাপিত হ'য়েছিল। আমদানির দিকটা দেখলে অবস্থাটা আরও পরিস্ফুট হবে। ১৯১৯-২০ সালে কার্পাস দ্রব্যাদি আসে ৮৮ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার, আন্দোলন সুরু হ'তেই পর বৎসর ৪৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকায় নামে অর্থাৎ এক বৎসরে ৪৩ কোটি টাকার আমদানি পড়ে যায়। আবার ১৯২৯-৩০ সালে ৫৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার আমদানির পর বৎসর অর্থাৎ নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হতেই ২২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকায় নামে। এই হ্রাসের পরিমাণ, এক বৎসরে ৩১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। এর পর বিদেশী আমদানির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে।

এই সকল আন্দোলনের ফলে বোম্বাই প্রদেশ খুব লাভবান্ হয়েছে। ভারতের মিলে সমস্ত উৎপাদিত বস্ত্রের শতকরা ৬৫ ভাগ এবং সূতার ৫০ ভাগ একা বোম্বাই সরবরাহ করে। বাঙ্গলার অবস্থা শোচনীয়। বস্ত্রের শতকরা ৪.৫ ও সূতার ৩.৫ ভাগ মাত্র হয়, অথচ সমস্ত ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১৬ জন বাঙ্গলায় বাস করে।

তাঁতি—তাঁতের কথা একবার বলা দরকার। টকলি দিয়ে হাতে কাটা সূতা আর তাঁতে বোনা কাপড়ই ভারতকে জগতে শিল্প-বাণিজ্যে প্রধান স্থান দিয়েছিল। এখনও তাঁত বেঁচে আছে এবং বৎসরে যত কাপড় ভারতে জমে অর্থাৎ মিলে তৈরী, আমদানি করা আর তাঁতের কাপড় মিলিয়ে যে পরিমাণ কাপড় হয়, তার সিকি তাঁত দেয়। যদি কেবল ভারতে উৎপন্ন কাপড় ধরা যায়, তা হ'লে এখনও মোট পরিমাণের শতকরা চল্লিশ ভাগ তাঁত হ'তে পাওয়া যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৮১ কোটি গজ কাপড় ভারতের তাঁতে তৈয়ারী হ'য়েছে।

মিল ও তাঁতের যত সূতা প্রয়োজন হচ্ছে, তার নব্বই ভাগ ভারতের মিল দান করেছে। তাঁত বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা হচ্ছে, বড় বড় মাথা তাতে লেগেছে, তাই সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলাম।

ভারত তার তুলার জন্য চিরকালই প্রসিদ্ধ। ভারতের তুলাই, বিশেষত ঢাকার তুলা মসলিন তৈয়ারী করা সম্ভব ক'রেছিল। তার তন্তু বা আঁশ ছোট ছিল কিন্তু অত্যন্ত কোমলস্পর্শ বা নরম ছিল; তার আর নমুনা পর্য্যন্ত নেই। এখনও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে; আমেরিকা প্রথম। বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেল তুলা সেখানে হয়, ভারতবর্ষের পরিমাণ ৫২ লক্ষ বেল বা গাঁট। গাঁটে থাকে চার শত পাউণ্ড বা ৫ মণ। পঞ্চনদ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক তুলা উৎপাদন করে। এত তুলা থাকা সত্ত্বেও আমরা কাপড়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী। কিছু তুলা মিশর, টাঙ্গানাইকা, কেনিয়া হ'তে আমদানি করা হয়, তার তন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ব'লে। মিহি কাপড়ের সূতার জন্যে সেটা প্রয়োজন, সময় সময় তার পরিমাণ (১৯৩৭-৩৮) এক লক্ষ ৩৪ হাজার টন এবং দাম ১২ কোটি টাকা পর্য্যন্ত হ'য়েছে।

ভারতের তুলা চাষীর এক প্রকাণ্ড আয়, কোনও কোনও বৎসর (১৯২৫-২৬) ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টন ৯৫ কোটি টাকায় বিক্রীত হ'য়েছে এবং জাপান তার প্রধান ক্রেতা। ভারতের মিল যদি এত না চলত তা হ'লে বিদেশী যে বৎসর কম মাল নেয়, তাতে আমাদের বিপদ খুব বেশী হ'ত। এখন ভারতের মিলে ৬ লক্ষ টন ভারতের তুলা ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ—কার্পাস শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, আমার মনে হয় এক বিশাল ক্ষেত্র এখনও প'ড়ে রয়েছে। ভারতের লোকে গড়ে ১৬ গজ কাপড় পরে, জগতের সভ্য সমাজের পরিহিত বস্ত্রের গড় ৫৪ গজ, সুতরাং আমাদের দেশের লোকের এখনও প্রচুর অভাব। ৩৯ কোটি লোকের অধিকাংশই এখন অতি কম মাত্রায় বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। তার ওপর আমাদের দেশের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আমাদের রপ্তানি করা চলছে এবং চলবেও। ব্রহ্ম, হংকং, ষ্ট্রেট্স্ সেট্‌লমেণ্টস্, সিরিয়া, শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড আমাদের বস্ত্র ও সূতার ক্রেতা। আসিয়ায় শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য ছড়িয়ে পড়তে পারে।

শিল্পবিচার—পাট

কাপড় বা তুলার কথা ছাড়লেই পাটের কথা আসে। জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ, তার ভেতর আবার বাঙ্গলা, আসাম, বিহার ও নেপালের খানিকটা নিলে, জগতে তার একচেটিয়া অবস্থা। চীন ও ফরমোসায় পাট আছে অতি সামান্য, কিন্তু ব্রেজিল ও অন্যান্য সকল দেশে কমবেশী চেষ্টা হচ্ছে ভারতের এই একাধিপত্য বিনাশ করবার জন্য। পাট ছাড়া অন্যান্য তন্তু দিয়ে পাটের পরিবর্ত্তে কাজ চালাবার বিশেষ চেষ্টা চলছে। সুতরাং বলতে হয়, তুলার মত পাটের ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল নয়, বরং চিন্তার কথা যথেষ্ট আছে। দিকে দিকে এর লক্ষণ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে। পাট

বাঙ্গলার চাষীর অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রসাধন বিলাস সবই যোগাবার মূল। পাটের দাম চড়া থাকলে উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, পাঠশালা, দোকান পসার, ক্রয় বিক্রয় ভাল চলে। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে চাষীর কাঁচা পাট বেচা পয়সা প্রধান আয়।

বৎসরে প্রায় ৭০ লক্ষ গাঁট পাট জন্মায়, বাঙ্গলায় তার শতকরা ৮৫ ভাগ। কাঁচা পাট কেনে ইংরেজ ও জার্মাণী বেশী, তৈরী চট, বস্তা প্রভৃতি নেয় আমেরিকা বেশী। ১৯২৫-২৬ সালে ৩৮ কোটি টাকার কাঁচা পাট ও ৫৯ কোটী টাকার পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হ'য়েছিল অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটী টাকা এক বৎসরে বিদেশীর নিকট পাওয়া গিয়েছিল। এ সুদিন বরাবর থাকে না। তার উপর আর এক কথা, পাট বিক্রীর বেশী লাভ পায় ফড়িয়া দালাল আর মিল-মালিকেরা।

বর্ত্তমানে ভারতে ১০৭টি মিল আছে, তাতে বৎসরে ৬৫ লক্ষ গাঁট পাট ব্যবহৃত হয়ে সাড়ে তিন লক্ষ লোকে ১১ লক্ষ টন মাল উৎপাদন ক'রেছে। যুদ্ধের হিড়িকে আরও কিছু বেড়েছে, কিন্তু এ দিন থাকতে পারে না। পাটজাত দ্রব্যাদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রস্তুত হওয়াতে দর নেমে যায়, সেই জন্যে মিলমালিকরা দল পাকিয়ে সপ্তাহে মজুরির সময় নিয়ন্ত্রিত করছেন, সুতরাং এ দিক দিয়েও বেশ বোঝা যায় পাট ও পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ খুব ঘোরালো না হ'লেও বিস্তারের সীমা পৌঁছে গেছে।

পাট শিল্প সম্বন্ধে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। সাধারণত ভারতবর্ষ অধিকমাত্রায় কাঁচা মাল রপ্তানি করে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু রপ্তানির শতকরা ৬৬·২ ভাগ তৈয়ারী করা মাল, বাকী ৩৩·৮ ভাগ কাঁচা পাট। দেশে এই শিল্প বিদেশীরা স্থাপিত করে; এখন অনেক দেশীয় মিল হয়েছে তার মধ্যে মারোয়াড়ী বা হিন্দুস্থানী প্রধান।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য্য করা আছে; তা থেকে ভারত সরকার সাড়ে তিন কোটী টাকার উপর আদায় করেন এবং বহুকাল সেটা নিজেরা হজম করতেন। পরে অনেক লেখালেখি, আলোচনা, আন্দোলন হওয়ার ফলে প্রাদেশিক সরকার অধিকাংশ টাকা ফেরত পান। এতে বাঙ্গলা সরকারের হঠাৎ খুব আয় বৃদ্ধি হ'য়েছে অর্থাৎ মোট শুল্কের শতকরা ৬২ ভাগ ফিরে পাচ্ছে।

প্রধান দুই শিল্পের কথা ছেড়ে চ'লে যাবার সময় আরও একটু বাকী থেকে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। তুলার দানা ছাড়াতে এবং বাণিজ্যক্ষেত্রের উপযোগী গাঁট বাঁধতে যে কারখানাগুলি ভারতে ছড়িয়ে আছে তার মজুর সংখ্যা দুই লক্ষের কম নয়। সুতরাং কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে এ কথাটা ভুললে চলবে না।

ঠিক সেই রকম ভাবে পাটের কথা ধরা দরকার। পাটকে গাঁট বাঁধতেও চল্লিশ হাজার লোক খাটছে। তুলা আর পাট-চাষী ছাড়া কারখানায় যে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থান হচ্ছে, এতে আনন্দ হবার কথা।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লৌহ, তাম্র, শর্করা, দিয়াশলাই, কাগজ, কাচ, রবার, সিমেণ্ট, তামাক, সাবান, চামড়া, পশম, হোসিয়ারী শিল্প সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব এবং তাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ বিস্তারের সম্ভাবনার বিষয়ে ইঙ্গিত দেব। অন্যান্য শিল্প—কি করতে বাকী এবং এখনই কি আরম্ভ করা দরকার, সেই বিষয়ে কিছু ব'লে প্রবন্ধ শেষ করব।

ভাঙ্গা-হাট

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে আর নাহি গ্রামের লক্ষ্মী, চলে গেছে গ্রাম ছাড়ি।
পুণ্যের হাট অবেলায় যেন ভেঙ্গে গেছে তাড়াতাড়ি।
পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকি,
কুঞ্জে কাননে ডাকে নাকো পাখী।
বন-পথপাশে ফোটে নাকো আর বন-যূথিকার সারি।
কানন-প্রান্তে কেয়ার গন্ধ বাতাস করে না ভারি।

পঙ্ক ঠেলিয়া উঠেছে সায়রে, ছেয়েছে 'কচুরি'-বন।
চারি পাড়ে তার শৃগাল শকুনি করিতেছে বিচরণ।
একদা যাহার স্বচ্ছ সলিলে,
তুলিত তুফান বালকেরা মিলে;
উঠিত যেথানে পল্লী-বধূর সুমধুর গুঞ্জন—
ভগ্ন সে-ঘাট, শুকা'য়েছে বারি, ছেয়েছে 'কচুরি' বন।

বিশালাক্ষীর মন্দিরে আর ভক্ত নাহিক আসে।
দেয়ালের ফাটে অশ্বত্থ-বট গজা'য়েছে চারিপাশে।
ভিতরে জমেছে জঞ্জাল মাটি,
ছেড়ে গেছে প্রাণ, আছে প্রতিমাটি।
ঘিরিয়া তাহায় নাচিয়া বেড়ায় চামচিকা উল্লাসে।
অর্চ্চনা আর হয় নাকো তাঁর ধূপ-ধুনা ফুলবাসে।

গোচারণে যেথা চরিত গোধন—কাঁটাবনে গেছে ভরি'।
উৎসবহীন বারোয়ারী-তলা শূন্য র'য়েছে পড়ি'।
পাততাড়ি ল'য়ে সকালে-বিকালে,
আসেনা 'পোড়ো'রা আর পাঠশালে।
আটচালা তা'র রয়েছে দাঁড়া'য়ে কোন মতে প্রাণ ধরি'।
কুকুর সেথায় লয়েছে আড্ডা—ঘুমায় আরাম করি'।
মুদীর দোকান হোয়েচে অচল—নাহিক খরিদ্দার।
পল্লীবাসীর বৈঠক সেথা বসে না দু'বেলা আর।
হাটের তলায় জমে না'ক হাট,
লুপ্ত হোয়েছে নদীর সে-ঘাট।
খেয়ার নৌকা চলেনা খেয়ায়, থেমে গেছে পারা-পার।
কোন্-সে দানব মায়া-বলে সব করিল রে ছারখার।

মন্দিরা হাতে আসেনা ভিখারী, ভিক্ষা নাহিক জোটে।
পাড়ায়-পাড়ায় সন্ধ্যার শাঁখ আর না বাজিয়া ওঠে।
আঁধারে ছেয়েছে গ্রামের আকাশ,
চারিদিকে খোলা মরণের গ্রাস,
শান্তির নীড়ে উঠিয়াছে ঝড়, দুখের বন্যা ছোটে।
বাংলা-মায়ের কণ্ঠাভরণ হায় রে ধূলায় লোটে!

স্বয়ম্বরা

শ্রীআশালতা সিংহ

(৩২)

বিনয় সরিয়া যাইবামাত্র অন্তরাল হইতে নীহারের শাশুড়ী, বড়যা এবং ননদ একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া প্রায় একত্রই বলিতে লাগিলেন—ওমা! কি ঘেন্নার কথাগো, তোমার দাদা কি সায়েবের বাড়ী এয়েছেন? চা খেয়ে সকড়ি হাতটা মুছে নিলে পকেট থেকে একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বার করে। কেন হাতে একটু জল নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। ঐ ম্লেচ্ছ ঘরের মেয়ে কত আর ভালো হবে মা! আর তাও বলি, মাথার উপর দাদা রয়েচে, মা রয়েচে, গুরুজনদের কাছে যাওয়ার কথা না ব'লে সোয়ামীর কাছে যাওয়ার কথা তোলানো কেন? আমাদের ছেলে তেমন নয়। কেটে ফেল্‌লেও সে আমাদের উপর কথা ব'লবে না। সে শিক্ষা এবাড়ীতে পায়নি।

নীহার নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন শুনিতে লাগিল। বাঙ্গালীঘরের মেয়ে; গুরুজনের সমস্ত লাঞ্ছনা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবার অভ্যাস ছোটবেলা হইতেই শিখিয়াছে; আর কিছু শেখে নাই।

যাহাই হউক শেষ পর্য্যন্ত সে যাত্রা তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠিল। নীহারের শাশুড়ী আড়াল হইতে জোরে জোরে বিনয়কে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, মেয়ে নিতে এসেছেন কিন্তু এদিকে পূজোর তত্ত্বে বোনাইকে এমন ধুতি চাদর পাঠিয়েছিলেন যে লোকে বাড়ীর ঝি চাকরকেও পূজোতে তারচেয়ে ভালো জামা কাপড় দেয়!

বিনয় এবার শীতের তত্ত্ব সাধ্যমত মূল্যবান ও পছন্দমত জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে নিজে কিনিয়া আনিয়া পাঠাইবে কথা দিয়া একমাসের জন্য বোনকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার অনুমতি পাইল।

ফিরিবার সময় আর একখানা গরুর গাড়ীতে নীহার চলিল। মুক্তির আনন্দে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পথের ধারে যাহা কিছু দেখে তাহাতেই বন্য মৃগীর মত উল্লসিত হইয়া উঠে। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে তাহারা বাহির হইয়াছিল। শীতের অলস মধ্যাহ্নে জনবিরল নির্জ্জন পথ দিয়া গাড়ী মন্থর-গতিতে আপন খুসীমত চলিতেছে। দূরের ঐ বিসর্পিত পথ যাহা দিগ্বলয়ে যাইয়া মিশিয়াছে, ঐ নীলাকাশে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—এ সমস্তই নীহারের কাছে এত নূতন এত সুন্দর লাগিতেছিল। কতদিন এসব দেখে নাই। জগতে যে এমন দৃশ্য আছে, এমন আকাশ আছে, সে কথাই যে মনে পড়িবার অবকাশ হয় নাই। রান্নাঘরে দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া উনুনে কয়লা দেওয়া এবং রাত্রিতে কেরোসিনের টেমি জ্বালাইয়া সেই উনুনের পাশে বসিয়া ভাত রাঁধা—এই দৃশ্যতেই চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া গেছে—তাই ছোটখাট আনন্দ, বনপথের সাধারণ দৃশ্যও আজ নীহারের কাছে অপূর্ব্ব লাগিতেছে। গাড়ীর ছইয়ের ভিতর হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া সে উল্লসিত হইয়া বলিল, দাদা দেখ দেখ, অরহড়ের ক্ষেতে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে! মনে আছে ছোটবেলায় ঐ কলাই ক্ষেতে কতদিন লুকিয়ে পালিয়ে আসতাম। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও খেয়াল থাকত না। এই তো সেদিনের কথা, কিন্তু মনে হয় কতকাল!

বিনয় ব্যথার হাসি হাসিল। কতকালই বটে ভাই, কতকালই বটে। যে মেয়েটি মাঠের পথে টাটকা কলাই তুলিতে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া ছুটাছুটি করিত সে তো হারাইয়া গেছে। আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। দু'জনের গাড়ী পাশাপাশি যাইতেছিল, বেশ গল্পকরা যায়। বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, তোকে যে আমি 'চয়নিকা' কিনে দিয়েছিলুম, আর যে বইগুলো বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলি, পড়িসতো? হ্যাঁ, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, তোর নামে যে ভারতবর্ষ মাসিকপত্র যান্মাসিক গ্রাহক করে দিয়েছি, কলকাতাথেকে তা নিয়মিত পাস তো?

নীহার কোন উত্তর দিল না। নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, ওবাড়ীতে মেয়েমানুষের বেশি পড়াটড়া ওঁরা পছন্দ করেন না। তোমার মাসিকপত্রগুলি ক'মাস নিয়মিত পেয়েছিলাম, তারপর আবার চাঁদা দেবার সময় হ'লে উনি বকাবকি করতে থাকেন। ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বিনয় বলিল, তবু তো বেশ থাকিস তুই নীহার। যেন মনে হয় কোন কষ্টই নাই। লক্ষ্মী মেয়েটির মত হাসিমুখে রয়েচিস।

নীহার তাহার বড় বড় সরল আয়ত চোখদুটি মেলিয়া ধরিয়া কহিল—আর যাই হোক, আমি তো তোমাদের ভাবনার হাত থেকে রেহাই দিয়েছি দাদা। মন্দকি, আমিও বেশ আছি এক রকম।

বিনয় আর কিছু বলিতে পারিল না। কেবল নীহারের কথা নয়, মালতীর কথাও তাহার অত্যন্ত মনে পড়িতে লাগিল। মালতীর মত মেয়ের জীবনটাও কি একেবারে আশাহীনভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। কোথাও কোন পথ কোন আশার আলো কি দেখা যায় না? নীহারের দিকে চাহিয়া সে কোনক্রমে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল, তুই বাড়ী গিয়ে মালতীর কথা একটু জানতে চেষ্টা করিস। শুনে এসেছি একটা পঞ্চান্ন বছরের বুড়োর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছে। আর তাতে নাকি তার অমতও নেই। বুঝতে পারিনে কিছুই…

নীহার বলিল, মেয়েদের ঐ কথাটি তোমরা বুঝতে পারবে না কিছুতেই দাদা। মালতী এমন কিছুর জন্যে ঐ বিয়েতে ও মত দিয়েছে, যার কাছে তার আপন জীবনের সুখদুঃখ তো ছেলেখেলা!

বিনয় মৃদুস্বরে কহিল, বুঝতে পারি একটু একটু। কিন্তু

ঐ জিনিষই কি আমাদের দেশের মেয়েদের একদিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অসহায়—কিন্তু সেই একই সঙ্গে মহিমান্বিত করে তোলেনি? এর ত্যাগ, এর মর্য্যাদাবোধ বুঝতে পারি। কিন্তু নিজের জীবনও নষ্ট করে ফেলা পাপ। কোন জিনিষ বা কোন যুক্তি দিয়েও তার মোচন হয় না। একথাটা কেন তারা মানেনা, সেটা বুঝতে পারিনে।

নীহার হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, মালতীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তার সব দুঃখযন্ত্রণা মিটে যেত। কিন্তু তার কি সে ভাগ্য আছে? তাছাড়া···

বিনয় অজ্ঞাতসারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ওসব বলিসনে নীহার। আমি বিয়ে করব! খাওয়াব কি? সর্ব্বনাশ! নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আর বলব না। তুমি খাওয়ানোর কথা ভাবছ, কিন্তু মালতী সার্থক হয়ে যেত, ওসব কথা ভাববার তার অবকাশও হোত না।

বিনয় বলিল, তাছাড়া মা ওর উপর এমন খড়্গহস্ত হয়ে রয়েচে, বাড়ী ঢুকতেও দেবে না হয়তো। যদি সে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসে, লুকিয়ে তাকে আসতে হবে।

নীহার সবিস্ময়ে বলিল, লুকিয়ে আসবার মেয়ে তো সে নয়। কিন্তু কি হয়েছে দাদা?

—বাড়ী গেলেই নিশ্চয় শুনতে পাবি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রত্নময়ী যখন তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাইতে যাইতেছিলেন তখন নীহার আসিয়া প্রণাম করিল, মা, আমি এসেছি!

হাসিয়া অশ্রুজল ফেলিয়া রত্নময়ী মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

(৩৩)

এখানে আসিয়া নীহার আবার যেন আগেকার দিনগুলি ফিরিয়া পাইয়াছে। বাড়ীঘর ঝাড়িয়া মুছিয়া, ভাইদের সঙ্গে কৌতুক করিয়া, রান্নাঘরে মায়ের কাজ কাড়াকাড়ি করিয়া বাড়ীর সর্ব্বত্রই সে একটা আনন্দের বন্যা সৃষ্টি করিল।

দুপুর বেলায় বিনয়ের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তুমি তো দু'দিন পরেই ক'লকাতা চলে যাবে। আজ সেই আগেকার মত একটা কবিতা পড়না দাদা, শুনি। আর হয়তো শুনতেও পাব না। তুমি হয়তো আবার ছুটিতে আসবে, তখন আমি কিন্তু শ্বশুরবাড়ী চলে গেছি। আমার মেয়াদ তো বেশিদিনের নয়।

বিনয় ভাল করিয়া বসিয়া টেবিল হইতে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' খানা টানিয়া লইয়া কবিতা বাছিতে লাগিল।

নীহার হঠাৎ উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এখনই আসছি।—বলিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট পনের কুড়ি পরে মালতীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। মালতী যে আর এবাড়ী আসিবে তাহা বিনয় ভাবিতে পারে নাই। নীহার তাহাকে কেমন করিয়া কি সাধ্যসাধনায় বা কি কৌশলে আনিল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মালতীর মুখ বিষণ্ণ কিন্তু প্রশান্ত। সে ধীরভাবে নিঃশব্দে নীহারের পিছনে মাটিতে একটু দূরে বসিল।

অন্তবারে সে বিনয়কে প্রথম দেখা হইবার পরে বা কোথাও যাইবার আগে প্রণাম করে। এবারে করিল না। যদিও তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু বিনয়ের মনে এত লাগিবে সে তাহা যেন নিজেও জানিত না। গম্ভীর হইয়া সে কবিতার বইটার পাতা নিরর্থক উল্টাইতে লাগিল।

নীহার বলিল, এইবার পড়।

বিনয় পড়িতে লাগিল রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কবিতা 'মুক্তি'; শুধু কবিতা পড়া নয়, নীহারের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া অবধি তাহার মনে যে একটি বেদনার সুর জাগিয়াই ছিল, সেই বেদনার আভা আসিয়া লাগিল তাহার কণ্ঠস্বরে। তাই যখন সে পড়িতেছিল :

"এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা।
এই জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক একটা কিছু
সেকথাটা বুঝ্‌ব কখন্ দেখ্‌ব কখন ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌ছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা"···
··· ··· ··· ···

তখন কবির বাণীর সহিত তাহার ব্যথিত হৃদয়েরও আবেগ আসিয়া মিশিতেছিল। পড়া শেষ হইয়া গেলে মুখ তুলিয়া দেখিল, নীহার ঘরে নাই, কখন বাহির হইয়া গেছে। মালতী একা বসিয়া আছে। নীহার যে ইচ্ছা করিয়া চলিয়া গেছে বিনয় তাহা বুঝিতে পারিল। সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। গলার স্বর কাঁপিয়া গেল, তবুও রুদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া প্রাণপণ বলে কহিল, অতুলের ব্যবহারের জন্ত তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। আর সম্পূর্ণ বিনা কারণে সে সব ক্লেশ তোমাকে সইতে হচ্ছে তা'ও আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি ভেবে ভেবে যে পথ স্থির করেচ, সে ছাড়া আর অন্য পথ কি ছিল না? মানুষের জীবনটা কি এতই তুচ্ছ যে হেলায় তাকে বিলিয়ে দেওয়া যায়? পঞ্চান্ন বছরের একটা বুড়োর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, জীবন নিয়ে এটা কি পরিহাস নয়? আমাদের দেশের মেয়েরা এতই নিরুপায়, অসহায়। কিন্তু অন্য দেশের মেয়েদের পানে চেয়ে দেখ—তারা এমন নয়। কেমন করে এটা হয় বলে দিতে পার? কোথা থেকে তারা জোর পায়, নির্ভয় পায়। নিজেদের বলিদান না দিয়েও মাথা তুলে মানুষের মত দাঁড়াতে পারে। অথচ তোমরাই বা কেন পার না···একবার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া বিনয়ের সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছে। সে এমন অসঙ্কোচে বলিতে লাগিল যেন বড় স্নেহের পাত্রী কাহাকেও বুঝাইয়া ভুল পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছে।

মালতী স্থিরস্বরে মুখ তুলিয়া বলিল—অন্য দেশের কথা তুলচেন, তাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা মানুষ, কিন্তু আমরা যে শুধু মেয়েমানুষ। তাছাড়া আর কিছুই তো নই।

—কেন তোমরাও কি ইচ্ছা করলে মানুষ হ'তে পার না?

—না—মালতী মাথা নাড়িল। একটু পরে আবার তেমনই শান্তকণ্ঠে বলিল—আমাদের কাছে আপনারা কখনো বড় কিছু দাবী ক'রলেন না। আমাদের কাছে চাইলেন শুধু মেয়েমানুষ হয়ে থাকা। অন্য দেশের সে বিশ্বগ্রাসী দাবী কই আপনাদের? তাই তো আপনারা নিজেরাও ছোট হ'য়ে যাচ্ছেন দিন দিন, আর আমাদেরও দুর্গতির সীমা নেই।

বিনয় অবাক হইয়া গিয়াছিল। মালতীর সহিত এভাবে এত কথা কোনদিন বলে নাই। শুধু জানিত সে সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু অন্য রকম। পল্লীগ্রামের মেয়েদের মত ঘুমাইয়া এবং পরচর্চ্চা ও ডাঁটা চচ্চড়ির চর্চ্চা করিয়াই সময়টা কাটাইয়া দেয় না। পড়াশোনা করিয়া বাইরের দুনিয়াটার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর রাখিতে চায়। একটু গভীরচিত্ত, এই মাত্র। কিন্তু তাহার নির্ভরহীন জীবনের একক বেদনা ভিতরে ভিতরে তাহার মনকে যে কতদূর পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আভাসেও জানিত না। তাই ভারি বিস্মিত হইল।

বিনয় বলিল, জোর করে দাবী করিয়ে নাও আমাদের দিয়ে। সে ভার তোমরা না নিলে আর কে নেবে? জোর করেও তো নিতে পার।

মালতী ঈষৎ ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, আপনি কাদের কথা বলছেন জানিনে। শুনতে পাই বাঙ্গালী মেয়েরা আজ নানাদিক দিয়ে নানা পথে উন্নতির পানে অগ্রসর হচ্চেন। কিন্তু আমি যে তার মধ্যে নেই। আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই। কোন রকম করে জীবন কেটে যাচ্চে। আরও যতদিন বাঁচব কোন ক্রমে কেটে যাবে। তার জন্যে আমি বড় একটা মাথা ঘামাইনে। বিনয়ের ইচ্ছা হইল খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করে, আমাকে দিয়া তোমার জীবনের কোন দুঃখের কি প্রতীকার হয়না মালতী? হয়তো একথা সে পরমুহূর্ত্তেই জিজ্ঞাসা করিত কিন্তু নীহার ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে বিনয়ের জন্য চা। মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, মা কায়েত পিসীর বাড়ী থেকে ঘুরে এলেন।

মালতী ইঙ্গিত বুঝিল। 'আজ আসি' বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। কাহারও দিকে তাকাইল না।

নীহার উত্তেজিতস্বরে কহিল, ওকে আর আমি কোনদিন ডাকব না দাদা। আজ একরকম জোর করে আমি তাকে নিয়ে এসেছিলাম। মা যদি কিছু অন্যায় করেন, তুমিও কি তাতে সায় দেবে দাদা? কিছু ব'লবে না?

বিনয় চা খাইতে খাইতে মৃদুস্বরে কহিল, যদি জানতিস আগের থেকে যে এ বাড়ীতে এ'লে তাকে অপমানিত হতে হবে, তাহলে না ডাকাই ভালো ছিল।

নীহার আরও কিছু শুনিবার জন্য প্রত্যাশা করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। কিন্তু বিনয় চিন্তান্বিতভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, একটা কথাও আর বলিল না—দেখিয়া একরকম রাগ করিয়াই সে উঠিয়া গেল।

(৩৪)

বাড়ী ফিরিয়া মালতী দেখিল ছোটখাট একটা খণ্ডপ্রলয় বাধিয়া গেছে। ছোট মা ঘুমাইতেছিলেন, খোকা অন্যদিন দিদির পাশে শুইয়া থাকে। আজ মালতী দুপুরবেলায় তাহার কাছে ছিল না বলিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া মায়ের কাছে উপদ্রব করাতে ছোট মায়ের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া মেজাজ একেবারে বিকল হইয়া গেছে। তিনি ছেলেটাকে দু'ঘা পিটাইয়া অনির্দ্দিষ্ট কাহার উদ্দেশ্যে চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া যখন একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন সেই সময় মালতীর বাপ অনন্ত ঘরে আসিয়া এক গ্লাস জল চাহিলেন। স্বামীকে দেখিয়া মালতীর বিমাতা একবারে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন: বেহায়া মেয়েকে দু'ঘা জুতো বসাতে পারনা পিটে। ছি ছি, মান-খাতির বাপের ইজ্জত সব একেবারে নষ্ট করলে। এমন পাজি এমন অসৎ মেয়ে এই কলিকালে দু'টি দেখিনি। আবার সইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই বলে গেছে তাদের বাড়ী! এততেও লজ্জা নেই! নাটকের এই অঙ্কে মালতী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল এবং কোন কথা না বলিয়া তাহার অসমাপ্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাজ আরম্ভ করিল। প্রাঙ্গণের পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া রান্নাঘর ধুইল, মুছিল। তাহার পর উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি হাতে লইয়া মাজিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

অনন্ত তাহার পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা অনেকটা ভালো মেজাজে ছিল। অন্যদিনের মত স্ত্রীর কথার সহিত যোগ না দিয়া কহিল, আঃ, শুধু শুধু বকচ কেন? ছেলেমানুষ, একটু আধটু যদি কোথাও বেড়াতে যায়, তাতে হয়েচে কি? সর্ব্বদাই কি বকতে হয়?

অনন্তর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দুর্গামণি আকাশ হইতে পড়িলেন। প্রথমটায় বিস্ময়ে হতবাক হইয়া কিয়ৎকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কারণ তাঁহার মুখে প্রতিবাদ শোনা জীবনে এই বোধ করি প্রথম। এতদিন মালতীকে যখনই তিনি বকিয়াছেন—স্বামী তাহার পোষকতা করিয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন।

ক্রমশঃ তাঁহার বিস্ময় করুণ রসে পরিণত হইল এবং তিনি চোখে আঁচল দিয়া বলিলেন, এতই যদি দরদ মেয়ের উপর তবে…

কিন্তু অনন্ত বাধা দিয়া নিম্নস্বরে কহিল, শোন, বিপিন আজ বলছিল, মালতীর সঙ্গে বে দিলে জমি পাঁচ বিঘে বেকসুর ছেড়ে দেবে, আর পাঁচশো টাকা নগদ!…তা ছাড়া…দুর্গামণির চোখের আঁচল মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখ হইতে নামিয়া গেল। অর্দ্ধ অবিশ্বাসের সুরে তিনি বলিলেন, সত্যি? না, তা আর হতে হয় না…

—সত্যি নয়তো কি, এইমাত্র আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তা মন্দ পাত্র কি, পায়ের উপর পা দিয়ে রাজার হালে ব'সে খাবে। এখানে ঘর নিকিয়ে বাসন মেজে দিন যাচ্ছে।

দুর্গামণির আবার মুখ ভার হইল। কহিলেন, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার মেয়েকে দিয়ে কতই বাসন মাজাচ্ছি, এই ক'দিনই না আমার বাতের ব্যথাটা একটু জোর হয়েছে তাই…

অনন্ত বেগতিক দেখিয়া স্ত্রীর সহিত সন্ধির আশায় বলিল, হ্যাঁ, তা জানি। এই বলছিলুম—বিয়ে হ'লে বড়লোকের হাতে পড়বে, খেতে মাখতে পাবে। হ'লেই বা দোজ-পক্ষ। বেটা-ছেলের আবার বয়স কি। এখানে থাকতে কোনদিন তো একটা ভালো শাড়ি অবধি কিনে দিতে পারিনি…তা…কিন্তু আবার

দুর্গামণির অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া সে কথাও শেষ করা হইল না। মনের মাঝে মাতৃহীনা চির-উপেক্ষিতা কন্যার জন্য যেটুকু সমবেদনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, বেশ, তাহলে তুমি উয্যুগ করে ফেল সংক্ষেপে। মাসের সাতাশে দিনটে ভালো আছে। তার পরেই আবার পোষ মাস পড়ে যাবে কিনা।

পঞ্চান্ন বছরের বিপিন, তাহার থাকিলই বা দুই জামাই, নাতি নাতনী। পাঁচশো টাকা নগদ দিতে চাহিয়া এবং পাঁচবিঘা জমি যাহা তাহার কাছে অনেক দিন হইতে বন্ধক পড়িয়াছিল বেকসুর খালাস দিতে চাহিয়া অনন্তও দুর্গামণির কাছে সে অত্যন্ত সৎপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইল।

(৩৫)

বাসনের পাঁজা লইয়া মাজিবার জন্য নিরালা পুকুরের ঘনছায়ায় আসিয়া মালতী হঠাৎ হাতের কাজ ফেলিয়া জলে পা ডুবাইয়া চুপ করিয়া বসিল। কাহার উপর একটা অনির্দ্দেশ্য অভিমানে সমস্ত মন ভরিয়া উঠে। আর একবার তাহার জীবনে এমনই একটা জটিল সমস্যা জাগিয়াছিল। কিসের লোভে জানিনা, পরেশ খুড়োর মত মালতীর বাপের বয়স একটা লোকের সঙ্গে অনন্ত মেয়ের বিয়ের ঠিক করিতেছিল; তখন মালতী বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে হইয়াও কোথা হইতে এত বল পাইয়াছিল মনে যে, স্পষ্টই বাপকে জানাইয়াছিল, তাহা হইলে যেদিকে দু'চোখ যায় সে চলিয়া যাইবে। কিন্তু আজ আর সে উৎসাহ সে বল খুঁজিয়া পায়না যেন। আজ মনে হয় তাহার নিজের জন্য চিরজীবন সে কি নিজে একাই যুদ্ধ করিবে? তাহার কথা তাহার চেয়েও বেশি করিয়া ভাবিবার, তাহার ভালোমন্দ তাহার চেয়েও ঢের বেশি করিয়া বিচার করিবার, তাহার লাভক্ষতি শুভাশুভ সমস্ত ভার লইবার কেহই কি নাই? চিরজীবন কাটিবে এমনই এক হৃদয়হীন রুক্ষ জগতে যুদ্ধ করিয়া?···কিসের জন্য সে বিদ্রোহ করিবে। জীবনে তাহার এমন কি আছে যার জন্য ভাবিয়া মরিবে। যেমন করিয়া যেদিক দিয়া হোক দিনগুলা কাটিয়া গেলেই হইল। তা ছাড়া আর কিছু ভাবিবার নাই।

অপরাহ্ণের আলো সেই নির্জ্জন পুষ্করিণীর সোপান প্রান্তে আসিয়া পড়িল। হেমন্তের শীতার্ত্ত সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মালতীর মনে হইতে লাগিল, তাহার অভিমান যেন রূপ ধরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। করুণ মধুর আঁখি সম্পাতে সে কাহার পানে অনিমেষ হইয়া চাহিয়া আছে। এমনই কল্পনায়, মোহে, মধুর স্বপ্নে বেলা যে কখন পড়িয়া গিয়াছে ঠাহর পায় নাই। হঠাৎ কি একটা শব্দে চমকিয়া দেখিল, ওপাড়ার তিনু হারাণ প্রভৃতি কয়েকটা ছেলে দলবদ্ধ হইয়া এইদিক দিয়া যাইতেছে। তিনু মালতীকে লক্ষ্য করিয়া একটা ঢেলা ফেলিয়া খুব যেন বাহাদুরি করিয়াছে—এই ভাবে সঙ্গীদের সহিত হাসাহাসি করিতেছে।

মুহূর্ত্তে রূঢ় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল মালতী। শীত লাগিতেছিল, গায়ে আঁচলটা ভালো করিয়া টানিয়া দিয়া মাজা বাসন কয়েকখানা হাতে তুলিয়া লইয়া কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সোজা চলিয়া গেল। ক্রমশঃ

প্রেমের তাজমহল

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

ছোট ছোট সুখ-পাথর কুড়ায়ে
জীবনের তাজ নিয়ত গড়ি,
যারা দিয়ে গেল প্রেমের কণিকা
কত বেদনায় তাদের স্মরি!

কারো ভুলি নাই—উজল হইয়া
তাহাদের স্মৃতি বুকেতে রাজে,
কত যে মধুর পরশ-পাথর
জ্বল জ্বল করে বুকের মাঝে।

কত যে দিঠির হীরক-কণিকা
আজো আঁধারেতে উঠিছে জ্বলে',
কত যে বাণীর—পান্না চুণীর
কাজ করা আছে—মরম তলে!

কত চুম্বন জহরৎ আজো
ফুল হ'য়ে তাজমহল বুকে,
রূপের প্রভায় আলো করে' আছে
আঁধার বুকেতে স্মরণ সুখে!

কত নিমেষের—কত ছোট সুখ
কত বেদনার চোখের জলে,
গলিয়া গলিয়া পাথর হয়েছে
গড়েছি এ তাজ সমাধি তলে।

কাহারো ভুলিনি—প্রেমের পূজারী!
তোমরা রয়েছ আজিও বুকে,
তোমাদের প্রেম-মুক্তা কুড়ায়ে
গড়েছি এ তাজ মরণ সুখে!

জোছনা উজল নীরব নিশীথে
তোমরা আসিও যাইও দেখে,
তোমাদের প্রেম-মণিকা কুড়ায়ে
কি কথা নীরবে গিয়াছি লিখে!

যাবে সাজাহান—তাজও রবেনা
শুধু যে প্রেমের যমুনা কুলে,
এ তাজমহল—মর্ম্মরে গাথি'
কালের বুকেতে রাখিনু তুলে!

ত্রিবাঙ্কুর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভারতমাতার পদ-প্রান্ত ত্রিবাঙ্কুর। শিলা-বহুল উপকূল নিরন্তর তিনদিকে তিনটি উত্তাল সিন্ধুর অভিযান সহ্য করছে। পুণ্যভূমির চরণপ্রান্তে ভারত-মহাসাগর। ভারতের দক্ষিণ সীমানায় দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির। তার অদূরে সাগরের বক্ষ ভেদ ক'রে কয়েকটি প্রস্তর-খণ্ড মাথা তুলে সিন্ধুর তরল-তরঙ্গ বেগকে শাসন করছে। মহাসিন্ধু অষ্টপ্রহর তাদের পাষাণ দেহের উপর অসুর বিক্রমে আছড়া-আছড়ি করছে। তার লবণাম্বুর সংখ্যাহীন কণিকা নীল গগনে পরাজয়ের অপমান বার্ত্তা নিয়ে ছুটছে। ভাষা ভীষণ গর্জ্জন-গম্ভীর।

নবীন সাধু বিবেকানন্দ একদিন সাঁতার কেটে ওদের মধ্যে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে বসে ভারতমাতাকে ধ্যান করেছিলেন। মায়ের 'নীল-সিন্ধু-জল ধৌত চরণতল, অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল' মাত্র মহাপ্রাণ নরেন্দ্রনাথকে প্রফুল্ল করেনি। কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রাণকেও যুগ-যুগান্তর কুমারিকা অন্তরীপ মহীয়সী ভক্তির আবেগে উৎফুল্ল করেছে। হিমগিরি মহেশ্বরের পরিকল্পিত লীলাভূমি—শব্দহীন, ভাষাহীন, অন্তর্দৃষ্টি-সৌম্য-, গম্ভীর। কুমারিকা অন্তরীপ প্রকৃতির মন্দির। তার চঞ্চল ঊর্ম্মি-মুখরিত বেলা, রৌদ্রস্নাত হাস্য-মুখ নীল আকাশ এবং সচল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, মনোমুগ্ধকর। পলে পলে চূর্ণ আশার মত ভাঙ্গা ঢেউ বালু-বেলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে পরাজিত তরঙ্গ নূতন উৎসাহ-অনু-প্রাণিত হয়ে আবার নবীন উদ্যমে অগ্রগমন করছে। এ দৃশ্য দেখে দেখার লোভ ক্ষান্ত হয়না।

ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন এবং তিনাবল্লী প্রাচীন কেরল রাজ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূল মালাবার, প্রাচ্য উপকূল করমণ্ডল। কবে তাদের এই নামকরণ হয়েছিল, তার স্পষ্ট ইতিহাস বিরল।

ভারতের মালাবার উপকূল চির-দিন মহাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের অভিযান দমন করেছে। কিন্তু তার উদারতা মানব-সঙ্ঘের দুর্ব্বার স্রোতকে প্রতিরোধ করেনি। কে জানে অতীতের কোন মহাযুগে আগন্তুক মলয়ালম মালাবারের অধিবাসীর একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ করেছিল। তারপর জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুপ্রেরণা নিয়ে দ্রাবিড় এলো। তাদের অনুসরণ করলে আর্য্য ব্রাহ্মণ। মনোরম সৌধ-সম্ভারে দক্ষিণ ভারত সমৃদ্ধ হ'ল। আর্য্যদের বেদ-বেদান্ত দ্রাবিড়ের ঐকান্তিকতায় নবীনরূপে দীপ্ত হ'ল। মলয়ালম, দ্রাবিড় এবং আর্য্যের সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবন-প্রবাহ এক খাদে বহিল। মালাবারের সম্মিলিত সমাজের জীবন-স্রোতের ভাব-ঐশ্বর্য্য এবং ধন-সম্পদ প্রাচীন সভ্য জগতকে আকৃষ্ট কর্ল্লে। ত্রি-ধারা পরস্পর বিরোধী হয়ে উচ্ছেদের মহাসমরে আত্ম-নিয়োগ করলেনা। এদের মিলন জীবনের এক অপরূপ রূপের সন্ধান পেলে। মিলনের প্রবল শক্তি এদের রাজসিক বলে বলবান করলে। অরণ্যানীর নিঝুম নিস্তব্ধতায় ঋষিরা বিশাল বিশ্বপ্রাণের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর্য্যদের স্মৃতিগ্রন্থ হ'ল সমাজের অনুশাসনের মূল। কিন্তু সে দেশাচারকে উচ্ছেদ করলেনা। মলয়ালম-জাতির জীবনের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছিল মাতৃ-জাতির সশ্রদ্ধ পরিকল্পনায়। দ্রাবিড়-চিত্ত সুন্দরকে মূর্ত্তি দেবার আবেগে চারু-শিল্পের সাধনা করেছিল। আর্য্যের আত্মা অণু-পরমাণুর মাঝে পরমাত্মার আনন্দ উপলব্ধি করেছিল। এ তিন আদর্শ মিলন-বিমুখ হলনা। ভারতের চরম সীমার নামকরণ হল কন্যাকুমারী। পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনের পরম আবেগ, কন্যা-কুমারীর আকার ধারণ কর্ল্লে। ঋষিরা ঠিক ঐ আকাঙ্ক্ষাকে ঐরকম রূপ দিয়ে-ছিলেন হিমাদ্রি কন্যা উমার পরিকল্পনায়। এ দুর্ব্বার আবেগ আর্য্য সংস্কৃতির চরম চেতনা। জীবাত্মার চিরন্তন আশা, কুমারীর রূপ, মলয়ালম চিত্তকে তৃপ্ত করলে। মহীয়সী আশা নারীত্বের কোমল কমনীয়তায় প্রকটিত হল। কন্যাকুমারীর মুখ সরল হাসির ত্রিদিব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। এ মূর্ত্তির এক হাতে বরমাল্য। অন্য করে আশার প্রদীপ। কুমারিকার অনতিদূরে এঁরা শুচীন্দ্রম মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান কন্যা-মূর্ত্তি। সাধনায় জীবাত্মায় পরমাত্মা অবহিত হন। সেই সাধনারতা কন্যাকুমারী। এমনি সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন হিমাচল শিরে উমা। কন্যার মূর্ত্তি ভারতসিন্ধুকূলে এক সুন্দর মন্দিরে অধিষ্ঠিত। সে মন্দির দ্রাবিড় শিল্পের নিদর্শন, নয়নমুগ্ধকর, সুন্দর, গম্ভীর। তার নিভৃতে শান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজিত—শত তৈল দীপের মৃদু আলোকে উদ্ভাসিত দেবী, কন্যা-কুমারীর বর-মূর্ত্তি।



দশেরা উৎসবের সময় ত্রিবান্দ্রামের জনাকীর্ণ পথে মহারাজের শোভাযাত্রা

তাই বলছিলাম—ভারতের প্রান্তে অধিষ্ঠিত কন্যা-কুমারী—মাতৃজাতির শ্রদ্ধা বাড়িয়ে মলয়ালমকে তৃপ্ত করেছেন, মন্দির-নির্ম্মাতা দ্রাবিড়ের শিল্প তৃষা মিটিয়েছেন, নিজের রূপে আর্য্যের মূল সংস্কৃতিকে মূর্ত্ত করেছেন। তাঁর পদপ্রান্তে বিক্ষুব্ধ সাগর। পৃথিবীতে যত মনোরম স্থান আছে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুমারিকা অন্তরীপের পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অসমীচীন নয়।

প্রতি যুগে সভ্য সমাজের বীর পর্য্যটকের দল মালাবার উপকূলে নেমে ভারতে প্রবেশ করেছে। গ্রীস ও রোম এবং মিশর দেশ হতে অর্ণবপোত বহু বণিকের দলকে এ পথে এ দেশে এনেছে। ভারতের সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, রেশম, পশম, ধুনা ও মসলার সঙ্গে প্রাচীন সভ্য

জাতিরা তাদের দেশের পণ্য বিনিময় ক'রে পরস্পরের সহায়তা করেছে। ভারতের বণিক তাদের দেশ পরিভ্রমণ করেছে। এরা বিনিময় করেছিল —ভাব। ভারতের কৃষ্টি মিশর ও গ্রীসে পৌঁছে তাদের সংস্কৃতিকে সচেতন করেছিল। আর মিশর ও গ্রীসের অপূর্ব্ব ভাবরাশি এবং সৌন্দর্য্য-বোধ ভারতের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। মানাশা বংশের একদল য়িহুদী কোচিনে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাদের বংশধর—কোচিন জ্যু—আজিও মালাবার সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে নিশ্চয় হজরত মুশার অনুশাসন এ দেশে পৌঁচেছিল। সিরিয়ান খৃষ্টীয়ের উপনিবেশ আছে এ অঞ্চলে। তারা এনেছিল প্রভু ঈশার সন্দেশ। আজিও সিরীয়ান খৃষ্ট সম্প্রদায় মালাবারে আদৃত। পরে এসেছিল—আরব। তাদের বংশধরেরা এদেশের লোককে ইশলামে দীক্ষিত করে পয়গম্বরের বাণী শুনিয়েছে। কিন্তু মালাবারের এই সকল জনসজ্ঞ এক মুখ হয়ে সম্মিলিত জীবনের একটি নূতন স্রোত বইয়েছে। দেশের রাজা চিরদিন হিন্দু। মালাবারী সবাই ঘোর জাতীয়তাবাদী। ত্রিবাঙ্কুরে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ নাই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে সংগ্রাম নাই। এদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর্লে এ সত্য উপেক্ষা কর্ব্বার উপায় নাই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বেঁধেছে। কিন্তু মালাবারের জাতীয় ইতিহাস প্রজায় প্রজায় ভ্রাতৃ-বিরোধের কলঙ্ক কাহিনীতে কলুষিত নয়।

ত্রিবাঙ্কুরের ভিতর ভ্রমণ কর্লে আজিও এ কথা মনে জাগে।

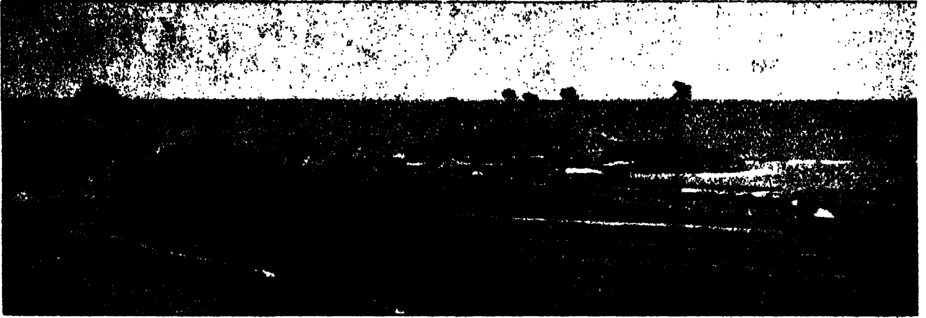
ত্রিবাঙ্কুর হিন্দু রাজত্ব। কিন্তু এর অধিকাংশ প্রজা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। বলা বাহুল্য এই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী স্বল্প-দৃষ্টি-ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু নিজেকে মালাবারী বলে। এক শ্রেণীর আধুনিক মুস্লেমের মত নিজেকে ভিন্ন জাতীয় বলে না। তাই মালাবারে হিন্দু-খৃষ্টান লড়াইয়ের সমাচার শুনি না। সত্যই কবির ভাষায় মালাবার সমাজ সম্বন্ধে বলা চলে—

> কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে যত মানুষের ধারা
> দুর্ব্বার স্রোতে আসে কোথা হতে, সমুদ্রে হয় হারা।
> হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন।
> শক্ হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

চীনা এ সমাজে আছে কিনা জানি না। তবে গ্রামের কুটীরগুলার মাথা চীনা কুটীরের মত। মাদাম চিয়াং কাই সেকের নবীন ভারত-প্রীতিতে শীঘ্রই সর্ব্বত্র চীনার বান ডাক্‌বে, এমন কল্পনা স্বপ্ন নয়।

মালাবারের আদিবাসীদের কি ধর্ম্ম ছিল তা' বলা কঠিন। কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে এদেশের চলন, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি ভূপতি-বংশ এবং কালিকাটের জামোরিণ রাজারা হিন্দু নামে পরিচিত। ইংরাজি পনেরো ও ষোল শতকে এদেশে পর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজেরা স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। কুইলন এমনি একটি স্থান!

আমরা মাদুরা হতে ত্রিবাঙ্কুর গিয়েছিলাম। রাত্রি তিনটায় ষ্টেশন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ফারমিনজার এবং ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামস্বামীর সৌজন্যে বেশ আরামে ট্রেনে চড়লাম। তারে সংবাদ দিয়ে তারা মন-মাদুরীতে আমাদের জন্য প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করলেন এবং শেনকোট্টায় মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করলেন।



কুমারিকা অন্তরীপ—ভারতের দক্ষিণান্ত শিলাবিন্দু

সমাজ; আর্য্য-দ্রাবিড় কৃষ্টিও রাজশক্তির অবনতির যুগে মলিন হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণের উদার আধ্যাত্মিকতা অবনতমুখ হয়েছিল। আত্ম-রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে, মানবাত্মার এক নবীন অশ্রদ্ধ পরিকল্পনা প্রচার কর্লে—সে ভাব হল দেশদ্রোহী, আর্য্য ব্রাহ্মণের নিজের সংস্কৃতির বিরোধী। জীব যদি শিব, জীবের দেহ শিবমন্দির। মন্দিরে পাথরে গড়া শিবের প্রতীক প্রতিষ্ঠা করে, ব্রাহ্মণ বিধান কল্লে যে দেবতা, প্রতিমা, যতি এবং দণ্ডী দর্শন ক'রে যে প্রণাম না করে তার রৌরব নরকে স্থান হয়। দেব মন্দির সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। প্রত্যেক হিন্দু-শিশুকে দেব-মন্দিরের সম্মুখে হেট-মুণ্ড হয়ে প্রণাম কর্ত্তে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু জীব-শিবের সজীব দেহ মাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে হল পবিত্র ও নমস্য দেউল। আর শূদ্রের জীব-শিবের দেহ-মন্দির হ'ল অপবিত্র, অস্পৃশ্য। এ ধারণার মূলগত দীনতা সমাজের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে হীনত্ব আরোপ ক'রে তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। তাই দক্ষিণ ভারতে এ উপকৃত সমাজের বহু ব্যক্তি আত্ম-সম্মান ফিরে পাবার জন্য উদার খৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয়ে ত্রাণ পেয়েছে। পশ্চিম ভারতে ইসলাম বহু অত্যাচার জর্জ্জরিতকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছে। মালাবারের খৃষ্টীয়

শেনকোট্টা ত্রিবাঙ্কুরের প্রবেশ দ্বার। এখানে গাড়ি বদল ক'রে আমরা পশ্চিম ঘাটের গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করলাম। স্নানাহারের পর এই পার্ব্বত্য প্রদেশে রেলে পরিভ্রমণ মনোরম। পাহাড়গুলা খুব উঁচু নয়। রাঁচী থেকে হাজারীবাগ যেতে যেমন রাস্তা, পথটা সেই রকম। পথে অনেক গিরি-নদী, বহু জঙ্গল আর দারুণ উত্তেজক সৌন্দর্য্য। হেথায় কাশ্মীর পথের দুরন্ত বিশালতা নাই। শিলঙ্ পথের পারিপাট্য নাই। এ পথ প্রকৃতির শান্ত কোলের মাঝে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তাই সর্ব্বদা ভয় হয়। পাছে পথ শেষ হয়।

মাঝে মাঝে মলয়ালম গ্রাম। মেয়েদের পরণে সাদা লুঙ্গি, উপর দেহ টাইট ফতুয়া ঢাকা আর কোমরে গোঁজা একখানা চাদর বক্ষস্থলকে আবৃত করে পৃষ্ঠে অঞ্চলরূপে দোলে। অবশ্য মুক্তবেণী। তাতে ফুল গোঁজা। এই হল সারা ত্রিবাঙ্কুরের মলয়ালম্ জাতির পোষাক। অনেক কলেজের মেয়ে সাড়ি পরে। কিন্তু তাও বহুমূল্য নয়। পরিষ্কার জাত। কিন্তু অঙ্গরাগে, প্রসাধনে, লিপ্‌ষ্টিকে, রোজরুযে এরা পয়সা নষ্ট করেনা। বস্ত্র পরা সাধারণ। পূর্ব্বে বলেছি দক্ষিণ ভারতে বিশেষ মালাবারে পুরুষের পোষাক আরও সরল। একখানা থান কাঁচা রাজি,

আর পাড়-ওয়ালা চাদর। ওদেশে কেহ কেহ হাতকাটা সার্ট পরে। কিন্তু ভদ্রবেশের সেটা অনিবার্য্য উপকরণ নয়।

বলছিলাম রেল-পথের কথা। শৈলপথে এ রেল মাইল বিস্তৃত। ষ্টেশনে দাঁড়ালেই কদলী-বিক্রেতা ভডম্ ভডম্ করে চীৎকার করে। পরে একজন ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিলেন ভডম্ ভডম্ নয় ফডম্ ফডম্। অন্ধের দিবারাত্রির অনুভূতির মত শব্দের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করলাম না। কলার বিভিন্ন নামে প্রাদেশিক সীমা বোঝা যায়। বাঙ্গালায় কলা, উড়িষ্যায় কড়া বা কেলা, অন্ধ্রে আরটি পণ্ডু, তার পর চকর-কেলি। আসল দ্রাবিড়ে ওড়লি পালাম এবং মালাবারে ফডম্। ওড়লি পালাম কদলী ফলমের তামিল উচ্চারণ এবং ফডম ফলম্ কিনা এ গবেষণা সুনীতিবাবুর মস্তিষ্কের শ্বেত কোষের স্পন্দনের কারণ হওয়া উচিত। অবশ্য মন্দিরের রূপের ক্রম-পরিবর্ত্তন শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এবং গাঙ্গুলী মহাশয়ের উত্তমাঙ্গকে বহুদিন পরিশ্রান্ত করেছে।

কুইলন অবধি সোজা পশ্চিমদিকে ছুটে গাড়ি দক্ষিণ মুখে ত্রিবাঙ্কুর যায়। আরব সাগর স্থানে স্থানে দেশের মাঝে প্রবেশ ক'রে সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি করেছে। ঘন নারিকেলের বাগান আর কদলী কানন। ত্রিবাঙ্কুরের কলা রূপে, রসে, গন্ধে শ্রেষ্ঠ।

ত্রিবেন্দ্রম ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী। সন্ধ্যায় পৌঁছে একটি মহিলা সহযাত্রীর নির্দ্দেশমত আমরা রাজ-চোলটি তে আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বার জন্য গেলাম।

—সে কি কথা। আবশ্যক হ'লে শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখতে যাই।

—সেখানে তো বাস করতে হয় না।

—না তা হয় না। বিবাহের পর আমার স্বামী আমার বাপের বাড়িতে বাস করছেন। তার বিবাহের পর আমার ভাই নিজ শ্বশুর গৃহে বাস করছেন। আর আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার ননদেরা তাদের পতি-পুত্র নিয়ে বাস করছেন।

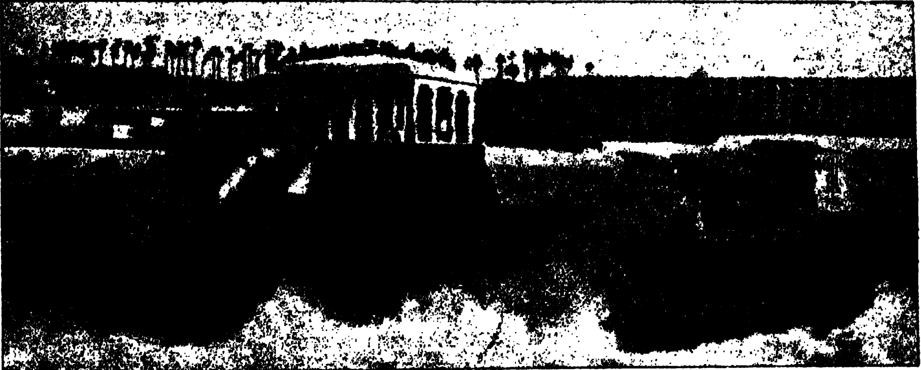
ব্যাপারটা বার দুই শুনে, বেশ বুঝে আমার স্ত্রী বল্লেন—ওমা? কি অলক্ষণের কথা। ঘর-জামাইয়ের দেশ।

ওদেশে ঘর-জামাই হওয়া লজ্জার কথা নয়। ঘর-বউ নায়ারদের মধ্যে অসাধারণ। সুতরাং শ্রীমতী ঘর-জামাই শব্দের অন্তর্নিহিত শ্লেষ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারলেন না।

নায়ার সংসারের আরও সমাচার পেলাম। ব্রাহ্মণ যে কোনো জাতের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। তাদের পুত্রকন্যা জননীর জাতি-শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। আমাদের এ মহিলা বন্ধুটির পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা নায়ার। তাই তিনি নায়ার শ্রেণীভুক্ত।

—মজার রীতি—বল্লেন আমার স্ত্রী।

মহিলাটির যথেষ্ট রসবোধ আছে। তিনি বল্লেন—মজার কথা আমার ভাই আর আমার বিমাতার কন্যার পক্ষে। বেচারারা। আমি নায়ার —আমি মার বিষয় পাব। আমার ব্রাহ্মণ ভাই বাবার বিষয় পাবে।



কুমারিকা অন্তরীপ—স্নানের ঘাট

সেদিন নবমী। শুনলাম বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রা দেখবার জন্য সেখানে বহু যাত্রী এসেছে। স্থানাভাব। সুতরাং আমরা রেলের রিটায়ারিং রুমে বাসা নিলাম। প্রকাণ্ড ঘর—দুটা স্নানের কামরা, নূতন আসবাবপত্র। মেট্রন মেমসাহেব সামনের এক প্রকাণ্ড সজ্জিত ড্রইং রুম দেখিয়ে উপদেশ দিলেন, কোনো বড়লোক সাক্ষাৎ করতে এলে, আমরা তাকে ঐ ঘরে বসাতে পারি। বড়লোক কেহ এলো না। এলো মোটর ড্রাইভারের দল। আমরা শস্তায় মোটর ভাড়া করে রাত্রে ভোজনের পর সমুদ্র তীরে গেলাম। অনেক মহিলা ও ভদ্রলোক বালু বেলায় বসে আরব সাগরের চূর্ণ তরঙ্গের উপর চাঁদের আলোর খেলা দেখছিলেন। তাঁরা আড় চোখে আমাদেরও দেখে নিলেন।

যখন আমি জলের ধারে জলের জোনাকী করামনিকারা তুলে ফিরলাম, দেখলাম একটি মহিলা নারী-সুলভ কুতূহলে আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট আমাদের পরিচয় নির্চ্ছেন। আমার স্ত্রী পরিচয় করে দিলেন। তারপর পুলিস কোর্টের জেরা।

—আমরা মায়ার আমাদের কন্যাগত কুল, বল্লেন মিসেস নায়ার।

—তাহ'লে আপনাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় না।

আমার ব্রাহ্মণী বিমাতার মেয়ে বাপের সম্পত্তি পাবে না। আমার সহোদর ভাই আমার মা-বাপের বিষয় পাবে না।

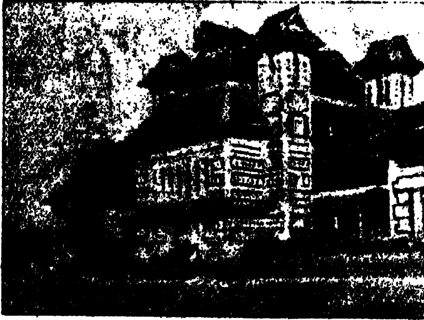
কথাটা তলিয়ে বুঝলে ওদেশের ব্রাহ্মণেতর জাতির দায়ভাগের আইনটা বোঝা যায়। অনেক খৃষ্টান ঐ আইন মানে। ওদেশের চুলিয়া মুসলমানেরও সমাজে কন্যাগত কুলের আইন চলে। তবে আধুনিক দেশ-ব্যাপী আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজ, মালাবার প্রভৃতি দেশে মুসলমানেরা হিন্দুপ্রথা বর্জ্জন ক'রে আরবী আইন মতে বিষয়ের উত্তরাধিকারী হ'চ্চে।

আমি সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি দেখিনি। ত্রিবাঙ্কুরে বহুগ্রাম এবং ক্ষুদ্র সহরের ভিতর আমরা পরিভ্রমণ করেছি। অনেক লোকের সহিত বাক্যালাপ করেছি। আমার মনে হয় ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে স্ত্রী-শিক্ষার খুব আদর। গ্রামে তরুণীরা তাড়াতাড়ি কুটির পরিষ্কার ক'রে পুস্তক নিয়ে ছুটে বিদ্যালয়ে যাচ্চে, এ দৃশ্য সাধারণ। আমার স্ত্রী একদিন সগর্ব্বে একটি মেয়েকে দেখালেন। সে এক হাতে বই অন্য হাতে বাজারের ঝুড়ি নিয়ে ছোট ভাইটির সাথে যাচ্চে। উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ে যাবার পথে বাজার ক'রে ভ্রাতার মারফত তরিতরকারী, ফডম্ ও আনারস কিনে বাড়ি পাঠাবে

ত্রিবেন্দ্রাম হতে কেপ কমোরিণ নিকট, পথ চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মত ফেরো কনক্রিটের। পথের দুধারে একটানা লোকের বসতি। এই গ্রামগুলিতে বহু বিদ্যালয় ও গির্জ্জা আছে অবশ্য জীর্ণ মন্দির আছে। সেগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। কারণ হিন্দুর সংখ্যা এদেশে অল্প।

কন্যা কুমারিকায় আমরা যে রাজ-হোটেলে বাস কর্ত্তাম তার পাশে একটি কনভেন্ট আছে। সেখানে বহু মেয়ে-ছাত্রী বাস করে। আমার স্ত্রী মাদারের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কনভেন্টে ছাত্রীদের দৈনিক জীবন আমাদের অতিশয় আনন্দিত করলে। মেয়েরা গৃহ পরিষ্কার করছে, ইঁদারা হতে জল তুলছে, ছাগল গরু, হাঁস, মোরগ প্রভৃতিকে খাওয়াচ্ছে। অথচ ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে পাঠ করছে। মালায়ালম, ইংরাজি এবং কিছু ফরাসী সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এরা দল বেঁধে ল্যাটিন ভাষায় "আভে মেরিয়া" গান ক'রে, মেরি-মাতার বেদীতে ধূপ-ধুনা বাতি জ্বালিয়ে পূজা করে। হিন্দুর মেয়েরা কন্যা কুমারীর মন্দিরে পূজা করতে যায়। মেরী-মাতা আর কন্যা কুমারী মালাবারী মনোবৃত্তির পোষক।

এক দিন মন্দিরের মধ্যে একদল মেয়েকে দেখে আমি ইংরাজিতে আমার স্ত্রীকে কুমারী মূর্ত্তির তাৎপর্য্য বোঝালাম। মেয়েগুলি আমার স্ত্রীকে বল্লে—এঁকে বলুন আমাদের বুঝিয়ে দিতে। আমি আমার



ত্রিবান্দ্রামের যাদুঘর

মনোভাব বোঝালাম, তারা তুষ্ট হ'ল। একটি কুমারী জিজ্ঞাসা করলে—উনি যে পাথরটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওটি মরকত কেন?

আমি বল্লাম—মরকত সবুজ অথচ বহুমূল্য। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান। বৈদিক মন্ত্র শান্তি কামনায় ওষধয়ঃ শান্তি, বনস্পতয়ঃ শান্তি ইত্যাদি বলে। আমাদের দেশে লক্ষ্মীপূজায় ধানের শীষ দিতে হয়। কন্যা মহাদেবীর প্রতীক অথচ তিনি ঈশ্বরের আগমন-প্রার্থী। তিনি রত্ন এবং শস্য দান করেন, অথচ তারা তাঁর পদতলে। তাঁর মন চায় শিবের সাথে মিলন অর্থাৎ মুক্তি। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি তাই এ মিলন পুনর্মিলন। ও পান্না আমাদের মত সংসারীকে তিনি দান করেন—নিজের আত্মা চায় মিলন।

একটু বোঝালে তারা মোটামুটি বুঝলো। পুরুতের নিকট অনেক ফুলের মালা নিলে। বাহিরে দেখলাম কতকগুলি, বোধহয় খৃষ্টান মেয়ে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হিন্দুর মেয়েরা যেমনি বাহিরে এলো অমনি মালা নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হ'ল। প্রত্যেকে সেই ফুলের মালার টুকরা মাথায় গুঁজে যুদ্ধ শেষ করলে। স্ত্রীকে বল্লাম—এই আসল প্রকৃতি। খেলা হল কুমারকুমারী বৃদ্ধ ও যুবার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। আর দেহ-সজ্জা নারীত্বের স্বভাব।

—তা' ছেলেমানুষরা মাথায় ফুল গুঁজবেনা?

নিশ্চয়! তাদের মনে মনে আশীর্ব্বাদ করলাম—যেন জীবনের কঠোরতাকে তারা এমনি হেঁসে খেলে উপেক্ষা করে।

একটি মহিলা মুনসেফ আছেন ত্রিবেন্দ্রমে। লেডী ডাক্তার আছেন অনেক। সার রামস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্কুরের সচিবোত্তম। এঁর উদ্যমে রাজ্যে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। অতি সুন্দর বাড়ি ঘর। একটি প্রফেসারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি শিক্ষা পদ্ধতির সুখ্যাতি কর্ল্লেন। তবে সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি পাঠ না ক'রে কোনো মন্তব্য করতে পারিনা। নূতন মন্ত্রিত্বের যত্নে রাজধানীতে একটি মাদ্রাজ একোয়েরিয়মের মত মাছের প্রদর্শনী, পশুশালা, মিউজিয়ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশের আসল সমৃদ্ধি বেশী বৃদ্ধি হয়নি। কারণ রবারের বাগান এবং কফির ক্ষেত্রগুলি পুঁজিবাদীদের হাতে। কুইলনের টালির ব্যবসার অবস্থাও তদ্রূপ। মিল প্রভৃতি এখনও বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকারী বড় চাকুরী শুনলাম রাজ-পরিবারস্থ লোকের প্রাপ্য। রাজ্যে অনেক বড় বড় প্রাসাদ আছে—সেগুলি সব রাজ-সরকারের।

নূতন ব্যবস্থার ফলে দেশে বহু সুগম রাস্তা হ'য়েছে। সস্তায় যান-বাহনের ব্যবস্থা ক'রেও ষ্টেট প্রজার সুবিধা ক'রেছে। রাষ্ট্র উন্নতিমুখ। কিন্তু সাধারণ প্রজার অর্থ-স্বাচ্ছল্য বাঙ্গলা বা মাদ্রাজ হ'তে বিশেষ ভাল এমন মনে হয়না। তবে নর-নারী সবাই তুষ্ট। এরা দেশ-হিতৈষী। ধর্ম্মকর্ম্মে পরস্পরের মধ্যে আদৌ বিরোধ নাই।

আমরা বিজয়ার শোভা যাত্রা দেখলাম। পুলিস খুব কর্ম্মঠ আর লোকেরা সংযত। প্রায় তিন মাইল লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শোভাযাত্রা দেখবার জন্য। বেশ ধীর সংযত জনতা। সসম্মানে পুলিস আমাদের একেবারে রাবণ-বধ মাচার পাশে স্থান দিলে। আমার স্ত্রীকে দেশের বড়মানুষদের বাড়ির মহিলাদের মণ্ডপে স্থান দিতে চাহিল। কিন্তু হংস মধ্যে বকরূপে তিনি সবার দৃষ্টি-ভাজন হবার ভয়ে পাতিব্রত্যকে উচ্চাসন দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখলেন।

শোভাযাত্রায় দেখলাম ত্রিবাঙ্কুর সৈন্যদের। ইংরাজের অধ্যক্ষতায় নিয়ন্ত্রিত ফৌজ। ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন রাজবংশের যুবকেরা নায়ক। দেশের সেনা। কতকগুলি শিখ, এবং পাঠান হাভিলদার, সুবাদার প্রভৃতি আছে। কোচিনের রাজার ছোট ভাইকে পূর্ব্বোক্ত প্রফেসারটি আমার সঙ্গে একদিন পরিচয় করে দিলেন। অমায়িক যুবক। যেহেতু বেচারা রাণীর ছেলে, মেয়ে নয়, সে সামান্য হাত-খরচ পায়। তার ভগ্নীরা অধিক অর্থ পায়। এদের তাই চাকুরী কর্ত্তে হয়।

শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত রাজহস্তীরা সগর্ব্বে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। নগ্নদেহে পাইকেরা নিশান প্রভৃতি বহন করছিল। নগ্ন-দেহ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতি সারি বেঁধে পুষ্প অর্ঘ্য প্রভৃতি হাতে নিয়ে এলো। তার পর রথে তরুণ রাজা—সুপুরুষ, সৌম্য-মূর্ত্তি হাস্য-মুখ। পোষাক রাজপুত রাজাদের মত—বোধহয় খালি পা। তিনি খড়ের রাবণকে তীর মারলেন। তার পর ইংরাজ, শিখ, পাঠান, তেলেগু, তামিল, মালায়ালম, হিন্দু, মুস্লিম ও খৃষ্টান সেপাহী সবাই বন্দুকের আওয়াজ ক'রে কল্পিত রাক্ষসদের দফা-রফা করলেন।

এই রকম রাবণ-বধ দেখেছিলাম কাশ্মীরে। সেখানে সমারোহ অধিক। বহু ইংরাজ এবং অন্ততঃ একজন মুসলমান পীর সে সভায় উপস্থিত ছিল। বেচারা রাবণ! (আগামী বারে অবশিষ্টাংশ)



কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি

কৃত্তিবাসী বাঙ্গালা রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি, বাঙ্গালা-ভাষার অন্যতম প্রতিষ্ঠাস্তম্ভ। এই ভাষা-রামায়ণ প্রণীত হইবামাত্র ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং ইহার অসংখ্য নকল-পরম্পরায় দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। এই রামায়ণ-সুধা স্বর-সহযোগে দেশময় বিতরণ করিবার জন্য পল্লীতে পল্লীতে পাঁচালির দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অসামান্য জনপ্রিয়তার ফলেই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুপ্রাচীনকাল হইতেই প্রক্ষিপ্ত ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাসের পদানুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী অনেক কবি রামায়ণ বা রাম-কথা-মূলক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পাবনা জেলার চাটমোহরের অদূরস্থ অমৃতকুণ্ডা নিবাসী অদ্ভুতাচার্য্য উপাধিক নিত্যানন্দ নামক কবির রামায়ণ জনপ্রিয়তায় কৃত্তিবাসের প্রায় সমান আসন অধিকার করিয়াছিল এবং উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে উহা সমধিক সুপ্রচারিত হইয়াছিল। আসামের অনন্ত কন্দলি, ত্রিপুরা অঞ্চলের ভবানী দাস, পশ্চিমবঙ্গের দ্বিজ মধুকণ্ঠ কবিচন্দ্র ও গুণরাজ খাঁ ইত্যাদি কবিও উল্লেখযোগ্য রামায়ণ-কথার কবি। পাঁচালি-গায়কগণ পালাগান করিবার সময়, কৃত্তিবাসের রামায়ণকেই মূলত অবলম্বন করিতেন বটে, কিন্তু অন্যান্য কবির রচনা হইতেও কবিত্বময় বা জনপ্রিয় অংশ-সমূহ গাহিতে ছাড়িতেন না। এইরূপে তাঁহাদের অবলম্বিত পুথিগুলি পাঁচমিশালি খিচুড়িতে পরিণত হইত। নকল-পরম্পরায় এই সকল পুথির দেশময় প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা উদ্ধার করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া যাহা বাজারে চলিতেছে, তাহা মূলত ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ। মিশনারীগণ হাতের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পুথি পাইয়াছিলেন, বিশেষ বিচার বিতর্ক না করিয়া তাহাই ছাপিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পুঁথি বিশৃঙ্খল-পত্র ছিল, কোন কোন স্থান হয়ত পাঠের অযোগ্যও হইয়া গিয়াছিল। মুদ্রণকার্য্যের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন নাই। ফলে বাজার-চলতি রামায়ণে অদ্যাপি আগের প্রসঙ্গ পরে, পরের প্রসঙ্গ আগে এবং চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান অনেক প্রসঙ্গ একদম বাদ—এইরূপ নানাপ্রকারের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বাজার-চলতি যে-কোন সংস্করণের—এমন কি, বহু বাগাড়ম্বর সহকারে শ্রীযুক্ত উদ্ভট-সাগর-সম্পাদিত চক্রবর্ত্তী-চ্যাটার্জ্জি প্রকাশিত সুমুদ্রিত সংস্করণেরও উত্তরকাণ্ড খুলিয়া দেখুন, আদিতেই লেখা আছে :—

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গধারী॥

কোন সম্পাদক একবার ভ্রমেও নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, এই দুই ছত্রের অর্থ কি? বৈকুণ্ঠ নগরী আজি কালিকার হয় কেমন করিয়া? এবং সেই নগরী শঙ্খচক্র ইত্যাদি ধারণ করেই বা কেমন করিয়া? অথচ উদ্ভটসাগর মহাশয়ের ভূমিকা পড়িয়া মনে হয়, তিনি বুঝি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত রামায়ণের হাতের লেখা পুথি

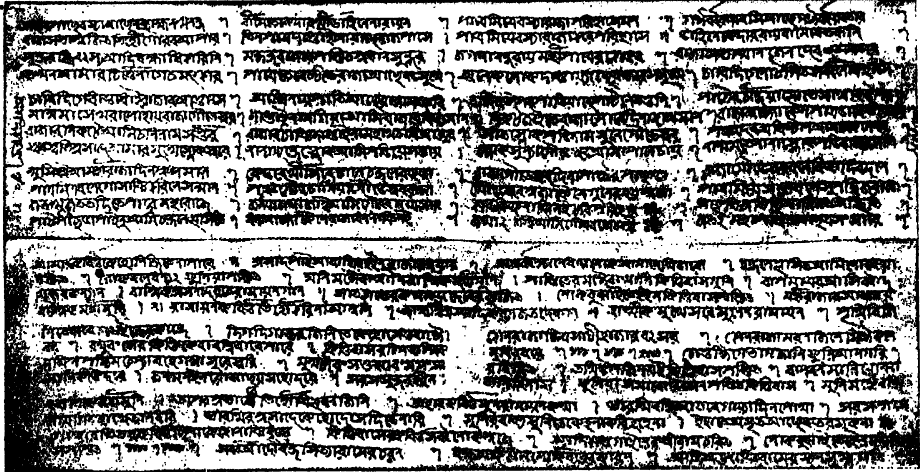
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ। ১ম পাতা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা এবং ২য় পাতা ১ম পৃষ্ঠা

সমস্তগুলিই দেখিয়া শেষ করিয়া ঐ সকল পুথি অবলম্বনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন!

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি লইয়া যাঁহারাই নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে বাজার-

প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমার বহু পরিশ্রমের ফল এইরূপে লোকলোচনের গোচর করিতে পারিয়াছি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শ পুথি অনুসন্ধানের ফলে বঙ্গের পুথিশালাগুলিতে দ্রুত কৃত্তিবাসী পুথি জমিয়া উঠিয়াছে এবং



কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ। ২য় পাতা ২য় পৃষ্ঠা, তৃতীয় পাতা ১ম পৃষ্ঠা

চল্‌তি কৃত্তিবাসী রামায়ণে এবং রামায়ণের পুথিগুলিতে গুরুতর পাঠ-ভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শৈশবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সম্পাদনে পরিষদ ১৩০৭ সনে কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ড প্রকাশিত করেন। ভূমিকায় হীরেন্দ্রবাবু মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলেন:

"পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ··· এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ··· প্রচলিত রামায়ণে এমন কোন এক পংক্তি বিরল, যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে নাই।"

ইহার পর ১৩১০ সনে হীরেন্দ্রবাবুর সম্পাদনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ড বাহির হয়। সেই পুথির অপ্রাচুর্য্যের যুগে হীরেন্দ্রবাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধারে যতটুকু কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই বঙ্গভাষাভাষীগণের চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কয়েক বৎসর হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনের গুরুভার এই প্রবন্ধের দীন লেখকের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদিকাণ্ডের সম্পাদন শেষ হইলে উহা মুদ্রিত করিবার জন্য যখন পরিষদকে অনুরোধ করিলাম, তখন পরিষদের আজন্ম পোষিত প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ-নীতি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। অর্থাভাবের অজুহাতে আমার সেই দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফল পরিষৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ৬৪ পৃষ্ঠা ভূমিকাসহ মৎসম্পাদিত সেই কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ড ১৯৩৬ সনে

সমস্ত পুথিশালায় কৃত্তিবাসী পুথি একত্র করিলে উহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে সন্দেহ নাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একখানি পুথি হইতে উদ্ধৃত হইয়া ৺ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে কৃত্তিবাসের অধুনা-প্রসিদ্ধ আত্মবিবরণ মুদ্রিত হয়। ডক্টর সেনের বিবরণে দেখা যায়, (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, ১২৪ পৃষ্ঠা) হুগলী জেলায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রাম হইতে অদূরে স্থিত বদনগঞ্জ গ্রামনিবাসী ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় একটি রামায়ণের পুথিতে এই আত্মবিবরণটি পাইয়া ডক্টর সেনকে তাহার একটি নকল প্রেরণ করেন। সেই নকল হইতে এই আত্মবিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রিত হয়।

কিন্তু মুদ্রিত আত্মবিবরণ হইতে নানা সমস্যার উদ্ভব হইল। উহাতে কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস" এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। "পূর্ণ" শব্দটি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং শব্দটি পূর্ণ না পুণ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। আত্মবিবরণে দেখা যায়, কৃত্তিবাস রাজা গৌড়েশ্বরের আদেশে বাঙ্গালায় রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য কি-না তাহাও পরখ করিয়া দেখিবার দরকার হইল। প্রথম ছত্রে বেদানুজ নামক এক মহারাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। দীনেশবাবু অনুমান করিয়াছিলেন,—বেদানুজ পাঠ ঠিক নহে, প্রকৃত পাঠ হইবে "যে দনুজ"। মহারাজার নাম বেদানুজ নহে, দনুজ। দীনেশবাবুর এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও মূল পুথির পাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার, এই কথা সমস্ত অনুসন্ধিৎসুরই মনে জাগিল।

তখন মূল পুঁথিটির অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ মৎসম্পাদিত কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে, ভূমিকা।৵—।৶০ পৃষ্ঠা। বহু অনুসন্ধানেও মূল পুথি পাওয়া গেল না। কিন্তু আত্মবিবরণ বর্ণিত কৃত্তিবাসের বংশাবলির বিবরণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের প্রামাণ্য কুলগ্রন্থ মহাবংশের বিবরণ দ্বারা আশ্চর্য্য রকমে সমর্থিত হওয়ায় আত্মবিবরণটির অকৃত্রিমত্বে সন্দেহ করিবার অবকাশ ছিল না। অধিকন্তু দেখা গেল, অনুরূপ কিন্তু সংক্ষিপ্ততর আত্মবিবরণ পরিষদের পুথিশালার দুইখানি পুথিতে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুথিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুথিতে আছে। বিস্তৃত বিবরণ মৎসম্পাদিত আদিকাণ্ডের ভূমিকায় ।৶০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই ভাবে আত্মবিবরণটির অকৃত্রিমত্ব ও গুরুত্ব প্রতিপাদিত হইলেও এই মূল্যবান আত্মবিবরণের মূল পুথির অনাবিষ্কার পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিল। এই আত্মবিবরণ ডক্টর সেনই শুধু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ১৯০১ সনে উদ্ধৃত করেন নাই; তাহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎপ্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে উহার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা:

"কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপ্রকাশিত পুথি হইতে জানা যায়, বেদানুজ রাজার মহাপাত্র (রাজা দনৌজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত উধোমুখোর পৌত্র, শিয়োর পুত্র) নৃসিংহ সেই মুসলমান বিপ্লবের সময় পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।"—১৬৫ পৃষ্ঠা

এই অংশের পাদটীকায় উদ্ধৃত আছে:

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
কৃত্তিবাস আদিকাণ্ড।"

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দীনেশবাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বেই এই আত্মবিবরণ-সম্বলিত পুথি অথবা তাহার নকল নগেন্দ্রবাবুর হস্তগত হইয়াছে এবং স্বপ্রণীত পুস্তকে তিনি তাহার ব্যবহার করিয়াছেন। ১৩২০ সনে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় কৃত্তিবাসের সময় নির্ণয় করিতে যখন চেষ্টা করেন, তখন পর্য্যন্ত বদনগঞ্জে হারাধন দত্তের বাড়ী এই পুথির এক নকল বিদ্যমান ছিল—মূল পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে মূল, নকল, কিছুই পাওয়া যায় নাই। দুই জন বিশ্রুতকীর্ত্তি পণ্ডিতের ব্যবহৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অমূল্য উপাদানের মূল এইরূপে বেমালুম অদৃশ্য হইয়া গেল! কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ড সম্পাদনের সময় আমি বহুস্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়াও আত্মবিবরণের মূল পুথি কোথায় গেল তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আজীবন বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহকার্য্যে তিনি অনেক ব্যয় করিয়াছেন, অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সমস্ত সংস্করণগুলিতে বহু নূতন তথ্য, নগেন্দ্রবাবুর পুথিশালার পুথিগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া দীনেশবাবু নিজ গ্রন্থের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দীনেশবাবু এমন মন্তব্যও করিয়াছিলেন যে, এই অমূল্য পুঁথিগুলি ব্যক্তিবিশেষের হাতে না থাকিয়া কোন সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানে স্থান লাভ করা উচিত। হইলও তাহাই। নগেনবাবুর বাঙ্গালা পুথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিনিয়া লইল, সংস্কৃত পুথিগুলি বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় কিনিয়া লইলেন। কিন্তু কুলগ্রন্থের পুথিগুলি বসু মহাশয় আজীবন যক্ষের ধনের মত সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই হাতছাড়া করেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথি সংগ্রহের অবৈতনিক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া আমি ১৩৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার জন্য এই পুথিগুলি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। বসু মহাশয় সম্মত হইলে আমার প্রেরিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ গিয়া বসু মহাশয়ের সমস্ত পুথির তালিকা করিয়া নম্বর বসাইয়া আনিল। কিন্তু উহাদের জন্য যে মূল্য দিতে আমার সামর্থ্য ছিল, তাহাতে বসু মহাশয় পুথিগুলি হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না।

শ্রীমান সুবোধের তৈয়ারী তালিকাতেই প্রথম দেখিতে পাইলাম, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ সম্বলিত ত্রিপত্রাত্মক কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের একখানা পুথির আরম্ভ মাত্র বসু মহাশয়ের সংগ্রহে আছে। তালিকা করিবার সময় সুবোধ উহা আগাগোড়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বসু মহাশয় নকল লইতে দেন নাই। সুবোধ ঢাকা ফিরিয়া বলিল, প্রচারিত আত্মবিবরণের সহিত উহার পাঠের প্রভেদ অল্পই। হারাধন দত্তের পুথি কোথায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে, এতদিনে তাহার সন্ধান পাইলাম। কিন্তু "বেদানুজ" নামটি লইয়া এত মারামারি হইল—"পুণ্য" না "পূর্ণ" ইহা লইয়া দীনেশবাবু, ষ্টেপলটন্ সাহেব, যোগেশবাবু, বর্ত্তমান লেখক এবং অন্যান্য অনেকে এত ঘুরপাক খাইল, তথাপি নগেনবাবু হারাধন দত্তের পুথি হাতে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন কেন, সে রহস্যের কোন মীমাংসাই করিতে পারিলাম না। পুথি হস্তগত করিবার পূর্ব্বে ইহা লইয়া কোন উচ্চবাচ্য করাও সঙ্গত মনে করিলাম না।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের ১ম সংস্করণে প্রকাশের বৎসরের নির্দ্দেশ-সূচক কোন অঙ্ক না থাকায়, ইহার জন্য অনেক খুঁজিতে হইয়াছে। ৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগের ১ম সংস্করণের ১০৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায় বসু মহাশয়ের পুস্তক প্রকাশের বৎসর ১৩০৫ সন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

বসু মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার নাবালক নাতির অভিভাবকগণের নিকট ১৯৪০ সনে আমি আবার স্বয়ং উপস্থিত হইলাম এবং অল্লায়াসেই ঐ সমস্ত পুথি উচিত মূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইলাম। এইরূপে বসু মহাশয়ের আজীবনের সংগ্রহ অমূল্য কুলগ্রন্থগুলি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় স্থান লাভ করিয়াছেই, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণের মূল পুথিও উহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। আত্ম-বিবরণের এই মূল পুথিটি পাঠ করিয়া এবং প্রচারিত পাঠের সহিত মিলাইয়া নগেনবাবু কেন এই মূল পুথি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম। এই অপ্রীতিকর ব্যাপার লইয়া বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণ ইহাতে বিজড়িত এবং অধুনা তাঁহারা পরলোকগত। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে মূল পুথির অবিকল পাঠ এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-কারের প্রচারিত পাঠ পাশাপাশি সটীক মুদ্রিত হইল। উহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ মূল পুথি গোপন করিবার কারণ বুঝিতে পারিবেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের প্রামাণ্য কুলগ্রন্থে প্রাপ্ত মুখটি বংশের তালিকায় এবং এই আত্মবিবরণে প্রাপ্ত তালিকায় কি রকম আশ্চর্য্য মিল আছে, পাঠকগণ তাহাও লক্ষ্য করিতে পারিবেন। নিম্নে শুধু কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের লক্ষ্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছি।

১। মহারাজার নাম বেদানুজই আছে।

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত নহে। ঐ তথ্যমূলক ছত্রগুলি সমস্তই সংস্কারকগণের প্রক্ষেপ—মূলে উহা নাই।

৩। মূলে "পুণ্য" মাঘ মাসই আছে, "পূর্ণ" নহে।

চারি পৃষ্ঠা জুড়িয়া এই আত্মবিবরণটি লিখিত। ঐ চারিটি পৃষ্ঠারই ফটোগ্রাফ এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। পাঠকগণ মূল পুথির পাঠের প্রত্যেক অক্ষর পরখ করিয়া লইতে পারিবেন। পুথি-খানির আকৃতি ১৬½"×৫½"। ভাল তুলট কাগজে সুস্পষ্ট অক্ষরে দুই পৃষ্ঠায় লেখা। প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠা সাদা, উহাতে শুধু "আদিকাণ্ড" আর উপরের দিকে পেঁচাল অক্ষরে দুইবার "শ্রীশ্রীহরি সহায়" লিখিত আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে পুথির আরম্ভ হইয়াছে। পয়ারের প্রত্যেক চরণ ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিত এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১২ লাইন করিয়া লিখিত। ফলে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পয়ারগুলি ১২ ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে ৫টি করিয়া ছত্র সজ্জিত। পুথির লেখা দেখিয়া অনুমান হয়, পুথিখানি শ-খানেক বছরের বেশী পুরাতন নহে। কাজেই ১৪২৩ শকাব্দা বা ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত পুথিতে আত্মবিবরণ পাওয়ার কথা একেবারেই অলীক। অন্য খণ্ডিত আত্মবিবরণগুলি যেমন নাতি-প্রাচীন. পুথিসমূহেই পাওয়া গিয়াছে, এই পূর্ণাঙ্গ আত্মবিবরণের পুথিটিরও বয়স অনুরূপ নাতি-প্রাচীন।

সৌভাগ্যক্রমে, এই তিন পাতার পরবর্ত্তী পাতাগুলি সম্বলিত সম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুথিখানিও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কাজেই পুথির বয়স সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজনই নাই। পুথিখানি ১২৪০ সনের নকল, কাজেই বর্ত্তমান ১৩৪৮ সনে উহার বয়স ১০৮ বছর মাত্র হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুদ্রিত প্রাচীন পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় রামায়ণের পুথিগুলি বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একদিন দেখিতে পাইলাম, উহার ১৫নং পুথিখানি রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথি এবং ৪ পাতায় আরব্ধ হইয়া ১৮৪ পাতায় সমাপ্ত। অনুলিপির তারিখ ১২৪০ সন, কিন্তু বর্ণনায় বিবরণ-সঙ্কলয়িতা পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত করেন নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সংগ্রহে প্রাপ্ত পাতা তিনখানির মাপ ১৬½"×৫½"; পরিষদের পুথিখানির মাপ লিখিত হইয়াছে ১৬¾"×৫½"। মাপের প্রায় মিল দেখিয়া এবং ৪ পাতায় আরম্ভ দেখিয়া অনুমান করিলাম, সম্ভবত ইহাই নগেনবাবুর তিন পাতার পরবর্ত্তী পাতাসমূহ। কিন্তু আমার হস্তগত তৃতীয় পাতায় শেষ এবং পরিষদের পুথির ৪র্থ পাতায় আরম্ভে মিল নাই দেখিয়া একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম। তৃতীয় পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ শেষ হইয়াছে। তাহার পরে দশ অবতারের বর্ণনা আরব্ধ। উহা তৃতীয় পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্যভাগে শেষ হইয়াছে। তাহার পর হইতে তৃতীয় পাতায় শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিলাম :

জত জত অবতারে হৈল জত নাম।
সংসারে দুর্লভ রামনাম অনুপাম॥
ব্রহ্মমন্ত্র কাহা হৈতে হইবেক প্রচার।
ভুবনে দুল্লভ কথা রাম অবতার॥
মনেতে চিন্তিয়া ব্রহ্মা ডাকে সরস্বতী।
ব্রহ্মাকে আসিয়া দেবী করিল প্রণতি॥
ব্রহ্মা বলেন সুন দেবী আমার যুগতি।
আমার আরতি তুমি যাহ বসুমতী॥
রামনাম বিনা যেবা আন নাহি জানি।
তার কণ্ঠে থাকি প্রচারহ রাম বাণী॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থান।
ব্রহ্মার বরে গেলা দেবী ক্ষিতি সন্নিধান॥
ব্রহ্মার বচনে দেবী বেড়ান সংসারে।
অনেক খুজিল নাম না পাইল প্রচারে॥
ব্রহ্মার চরণে গিয়া কৈল নিবেদনে।
অনেক খুজিলাম নাম না সুনি শ্রবণে॥
এতেক বলিয়া দেবী গেলা নিজ স্থান।
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা করেন অনুমান॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্রহ্মা ভাবেন মনে বেথা।
কোনজনে প্রচারিব অদ্ভুত রাম কথা॥
চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মন।
হেনকালে নারদ মুনি দিলা দরসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা মুনিকে বসিতে আসন।
নারদ বলেন কেন গোসাঞি বিরস বদন॥
ব্রহ্মা বলেন নারদ মুনি সুন বাক্য সারে।
কাহা হৈতে রাম কথা হবেক প্রচার॥
নারদ বলেন গোসাঞি সুন মোর বাণী।

এই ছত্রেই তৃতীয় পাতা শেষ।

ওদিকে পরিষদের ১৫নং পুথির বিবরণে উহার আরম্ভ বা আদি নিম্নরূপে বর্ণিত :—

চ্যবন মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক মুনি তপে তপোধন ॥
ইত্যাদি।

কাজেই তৃতীয় পাতার শেষ ছত্র—"নারদ বলেন গোসাঞি স্তন মোর বাণী"—এই ছত্রের মিল (এই বর্ণনা মতে) ৪ পাতায় আদিতে নাই। তবু পুথিখানি নিজ চোখে দেখা প্রয়োজন মনে করিলাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে পুথি পাইয়া অনেক রহস্যেরই মীমাংসা হইল। এই পুথির কাগজ, অক্ষর, লিখিবার ছন্দ, পরিমাপ অবিকল আত্মবিবরণের তিনপাতার সদৃশ—এবং ইহাই যে নগেনবাবুর তিনপাতায় পরবর্ত্তী পুথি, সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পুথির বিবরণ লেখক ৪ পাতায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম হইতে অনেকখানি বাদ দিয়া পরে "আদি" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিবরণ লেখকের এইরূপ অনবধানতা প্রশংসনীয় নহে। ৪ পাতায় প্রকৃত আদি নিম্নরূপ :

[তৃতীয় পাতার শেষ : নারদ বলেন গোসাঞি স্তন মোর বাণী]

৪র্থ পাতায় আরম্ভ :

অত্রিক মুনির পুত্র আছে চ্যবন নামে মুনি ॥
তাহার ঘরেতে হব বিষ্ণু অবতার।
তি হোঁ শ্রীরামের কথা করিবেন প্রচার ॥
এত জদি বলিল নারদ মুনিবর।
নারদের বোলে ব্রহ্মা হরিল অন্তর ॥
আপনে ঘর গেলা ব্রহ্মা ভাঙ্গিয়া দিআন।
সকল দেবগণ গেলা আপনার স্থান ॥
কিত্তিবাস আরাধিল বাল্মীক চরণে।
প্রথম সিকলি গাইল আদ্য রামায়ণে ॥
চ্যবন মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধম্মেতে ধাম্মিক মুনি তপে তপোধন ॥
ইত্যাদি।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বিবরণ সঙ্কলনকারীগণ বিবরণ লিখিতে প্রথম নয় ছত্র বাদ দিয়াছিলেন বলিয়াই আমায় ধাঁধায় পড়িতে হইয়াছিল।

পুষ্পিকায় তারিখ ইত্যাদি পুথি-সমাপ্তিসূচক তথ্য থাকিলে বিবরণে পুষ্পিকাটি অবিকল উদ্ধৃত করাই বিবরণ লেখার প্রচলিত প্রথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই প্রচলিত প্রথারও ব্যতিক্রম হইয়াছে এবং এই ব্যতিক্রম নিতান্ত মারাত্মক হইয়াছে। কারণ পুষ্পিকাটি পড়িলেই বুঝা যায়, পুথিখানি বদনগঞ্জ হইতে আহৃত। পুষ্পিকাটির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

ইতি আদিকাণ্ড রামায়ণ সমাপ্ত। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকো দোষ নাস্তিকং আপ্তবিস্মৃতি রামং মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং! লিখিতং শ্রীপিতমলাল স্কুল। সাকিম সামপুর পরগণে জাহানাবাদ। পঠনার্থে শ্রীরঘুনাথ ভকত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ। সন ১২৪০ বারসও চব্বিস সাল তারিখ ২৮ আঠাস্যা কার্ত্তিক রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন প্রহরে সমএ সমাপ্ত হইল।

ইহার পরে সুলিখিত দেবনাগর অক্ষরে একটি হিন্দী দোহা উদ্ধৃত আছে।

এই পুথিখানিই যে বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের সংগৃহীত পুথি, সেই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। এই পুথিরই কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণমূলক প্রথম তিনপাতা নগেনবাবু নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বাকী পাতাগুলি কি করিয়া পরিষদে স্থান লাভ করিল, সেই রহস্যের মীমাংসা দীনেশবাবু, নগেনবাবু বা ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় আজ বাঁচিয়া থাকিলে জানা যাইত। পরিষদে পত্র লিখিয়া জানিয়াছি, পুথি পরিষদে কিরূপে আসিল তাহার কোন বিবরণ পরিষদের পুথির তালিকায় নাই, তবে পুথিখানি হুগলি জেলায় প্রাপ্ত বলিয়া তালিকায় উল্লিখিত আছে।

এখন আত্মবিবরণের অবিকল মূল ও দীনেশবাবুর প্রচারিত পাঠ পাশাপাশি উদ্ধৃত হইতেছে—টীকায় আমায় বক্তব্য বলিলাম।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

মূল পুথির পাঠ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।
অথো আদিকাণ্ড আরম্ভ।
আদিকাণ্ড রামায়ণ স্তনহ কাহিনি।
প্রথমকাণ্ড রামায়ণ মধুরস বাণি ॥(১)
পুর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ(২) মহারাজ।
তার পুত্র(৩) আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

সংস্কারকের পাঠ

(মূল পুথির পাঠ হইতে ব্যতিক্রমগুলি নিম্নরেখ করা গেল)

পুর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র(৩) আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

(১) আত্মবিবরণের প্রচারিত পাঠে এই অংশটুকু বাদ পড়িয়াছে।
(২) মূল পুথিতে নামটি বে-দা-নু-জ রূপেই লিখিত। ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রামাণ্য বংশ-তালিকায় ও সমীকরণ বিবরণে দেখা যায়, মুখ বংশের উৎসাহ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন। উৎসাহের পুত্র আহিত লক্ষ্মণ সেনের সভায় প্রথম সমীকরণে এবং উৎসাহের পুত্র অভ্যাগত দ্বিতীয় সমীকরণে শ্রেষ্ঠ কুলীনগণের সমমর্য্যাদায় কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন। ইহার পরে রাজা দনুজমাধবের সভায় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারি সমীকরণ হয়। ইহাদের মধ্যে ৪র্থ সমীকরণে অর্থাৎ দনুজমাধবের রাজত্বের দ্বিতীয় পাদে আমরা আহিত-পুত্র উদ্ধবকে সম্মানিত দেখিতে পাই। উদ্ধব-পুত্র বিকর্ত্তন ও শিয়ো ৭ম সমীকরণে অর্থাৎ দনুজমাধবের রাজত্বাবসানে সম্মানিত দেখিতে পাই। শিয়ো-পুত্র নরসিংহ ১৪শ সমীকরণে সম্মানিত হন। "বে-দা-নু-জ" পাঠ "যে দনুজ"-রূপে সংশোধন সঙ্গতরূপেই করা যায়। দনুজের সভায় সম্মানিত উদ্ধব। তাঁহার পুত্র দনুজমাধবের রাজ্যাবসানে সপ্তম সমীকরণে সম্মানিত শিয়ো তাঁহার পুত্র নরসিংহ। ডক্টর সেন অথবা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ষষ্ঠ ছত্রের "পুত্র"কে "পাত্র-"রূপে সংশোধন

দেসের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ॥
বঙ্গদেসে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেস ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতির ॥
সুস্ত ভোগ কর‍্যা বিহরএ গঙ্গাকুলে।
বসত করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ॥
গঙ্গাতিরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চোতুর্দ্দিগে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা সুতিল তথাই ॥
পোহাইতে আছে জখন দণ্ডেক রজনি।
ব্রাহ্মণের মুখে সুনি কুঃকুরের ধ্বনি ॥(৫)
কুঃকুরের ধ্বনি সুনি ওঝা চারিদিকে চাহে।
আকাস বাণি হয়্যা তথা গোসাঞি জে রহে ॥
মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার যোসনা ॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জে জগতে বাথানি।
দক্ষিণ পস্ছিম চাপ্যা বহেন গঙ্গা সোনি ॥(৬)
ফুলিয়া চাপিআ হইল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়এ সন্ততি ॥
গর্ভেস্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়।
মুরারি সুজ্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥(৭)
জ্ঞানেতে কুলেতে সিলে মুরারি ভূসিত।
সাতপুত্র হইলো তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ট পুত্র হইল তার নাম জে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥

(দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥(৪))
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুজে বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায় ॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন(৫) কুকুরের ধ্বনি ॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায় ॥
মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া (জে) জগতে বাথানি ॥
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী ॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্র পৌত্রে বড়য় সততি ॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয়।
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল(৮) মুরারি ভূচিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥

করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধবের পৌত্র নরসিংহের পক্ষে রাজা দনুজমাধবের পাত্র হওয়া খুব:সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমার অনুমান হয়, "পূর্ব্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা" এই ছত্রের পরে উদ্ধব ও শিয়োর পরিচয়াত্মক দুইটি ছত্র লিপিকর প্রমাদে পড়িয়া গিয়াছে। এই ছত্র দুইটি নিম্নরূপে পুনর্গঠন করিলে সম্পূর্ণ অর্থসঙ্গতি হয়, যথা :

পূর্ব্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
আছিল তাহার পাত্র শ্রীউদ্ধব ওঝা ॥
উদ্ধবের পুত্র শিয়ো তেজে মহাতেজা।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

(৩) ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দনুজ রায় বাঁচিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। বঙ্গদেশে "প্রমাদ" এবং নরসিংহের গঙ্গাতীরে পলায়ন সুলতান কৈসায়ুসের রাজত্বে ৬৯০ হিজরায় বা ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল (J. A. S. B. 1922. p. 410)। তবে দীর্ঘ রাজত্বের দ্বিতীয় পাদে পিতামহ উদ্ধব 'পাত্র' হওয়া সত্ত্বেও, ঐ রাজত্বেরই শেষে পৌত্র নরসিংহেরও পাত্র হওয়া খুব সম্ভব না হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে।

(৪) ডক্টর সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে", সম্ভবত প্রুফ দেখার গোলমালে, এই দুই ছত্র ৫ম সংস্করণের ১২৪ পৃষ্ঠার নিম্ন হইতে স্থানচ্যুত হইয়া ১২৫ পৃষ্ঠায় নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকাণ্ডে (১ম সংস্করণ, ১৬৫ পৃষ্ঠা) কৃত্তিবাসের বংশ-বিবরণে এই স্থানটুকু নিম্নরূপে উদ্ধৃত আছে :

দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥

ডক্টর সেন পাঠ দিয়াছেন :

দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥

দুই পাঠেরই পরিবর্ত্তনগুলি শুধু অনাবশ্যকই নহে, তিঁহ ইত্যাদি শব্দ বসাইয়া প্রাচীনত্ব দর্শানচেষ্টা সরল বুদ্ধিপ্রণোদিত নহে। সোজা অর্থ, দেশের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের অধিকার বিস্তৃত ছিল, কাজেই বঙ্গে তাঁহারা সংসারের সেরা সুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

(৫) "ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুকুরের ধ্বনি"—ব্রাহ্মণের মুখ-নির্গত কুকুরের ধ্বনি বলিয়া ভুল করিয়া সংস্কারক "আচম্বিতে শুনিলেন" এই রকম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণের মুখে" ইহার সঙ্গত অর্থ বোধ হয়—"ব্রাহ্মণের অভিমুখে, তিনি যে স্থানে শুইয়াছিলেন সেই দিকে।"

(৬) সোনি = স্বর্নী = স্বর্ণময়ী, সোনার গঙ্গা, স্বর্ণবরণা গঙ্গা।

(৭) ২১শ সমীকরণে গাভো বা গর্ভেশ্বরের তিন পুত্রের নাম ঠিকই দেওয়া আছে—মুরারি, গোবিন্দ, সূর্য্য। বসুর মহাবংশ, পৃঃ ২১।

(৮) "শীলে"কে, "ছিল"-রূপে পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসঙ্গত।

(৯) নিতান্ত অনর্থক পরিবর্ত্তন।

(১০) মুরারির পুত্রগণের নাম ধ্রুবানন্দের মহাবংশে ৩৪শ সমীকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত মহাবংশ, ৩৯ পৃষ্ঠা। যথা —অষ্টৌতস্য পুনবঃ ॥

ভৈরবঃ শৌরির্মদনোঽনিরুদ্ধো বনমালিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো নিবাসশ্চ ব্যাসশ্চেতি মহৌজসঃ ॥

কাজেই দেখা যায়, মুরারির আট পুত্র, যথা—ভৈরব, শৌরি, মদন, অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস, ব্যাস। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন সাত পুত্র, যথা—ভৈরব, মদন, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস, সুস্থির, ভাগ্যবান, বনমালী। মহাবংশের তালিকার সহিত এই তালিকায় পাঁচটি নামের মিল আছে। বাকী রহিল শৌরি, অনিরুদ্ধ, শ্রীনিবাস। ইহাদের স্থানে কৃত্তিবাস সুস্থির ও ভাগ্যবানের নাম করিয়াছেন ; ইহা নামান্তরও হইতে পারে, লিপিকার প্রমাদও হইতে পারে। ৫৩শৎ সমীকরণে অনিরুদ্ধ, বনমালী, ভৈরব এবং শৌরির সম্বন্ধাবলী বিবৃত আছে। সংস্কারক মুরারির পুত্রগণের নাম বুঝিতে না পারিয়া সমস্তগুলি নামকে বনমালীর

মহাপুরূস মুরারি জগতে বাখানি।
ঠাকুরাল ধর্ম্ম চরিত্র গুনে মহা গুনি ॥
মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস আছেন সাস্ত্রে অবগতি ॥
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালি।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি ॥
কুলে সিলে ঠাকুরালে গোসাঞির প্রসাদে।
মুরারি পুত্র সব বাড়এ সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতার জস জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হইল এক জে ভগিনি ॥ (১১)
সংসার আনন্দ লয়্যা আইল কির্ত্তিবাষ।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় সড রাত্রি উপবাষ ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে খুসি।
স্রিকর ভাই তার নির্ত্ত উপবাসি ॥
বলভদ্র চোতুভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিনি হইল সতাই উদর ॥
মালিনি নামেতে মাতা বাপ বনমালি।
ছয় ভাই উপজিল সংসার গুণসালি ॥
আপনার জন্মরস কহিব জে পাছে।
মুখটী বংসের কথা আর কহিতে আছে ॥
সুজ্জ পণ্ডিতের (১৩) পুত্র হইল নামে বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সুজ্জ পুত্র নিসাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংথ লোক রয় জাহার দুয়ার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন থাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয়াদিত্য ঠাকুর বড়ই সুন্দর।
বিদ্যাপতি রূদ্র য়োঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারানসি পর্য্যন্ত কির্ত্তি ঘুসএ সংসার ॥
মুখটি বংশের পদা (১৬) সাস্ত্র অনুসার।
ব্রাহ্মণে সজ্জনে সিখে জাহার আচার ॥
কুলে সিলে ঠাকুরালে ব্রহ্মাসৃচজ্যগুণে।
মুখটি বংসের কথা কত কব জনে জনে ॥

মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্ম চর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥(৯)
মদ রহিত(১০) ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুশীল ভগবান তাথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর (১২) ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া। (১৪)
পাত্র-মিত্র সকলে দিলেন থাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্দর। (১৫)
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি পোষয়ে যাঁহার ॥
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্যগুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥

বিশেষণে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তথি = তথা = এবং শব্দটি তাঁহার সন্দেহের উদ্রেক করা উচিত ছিল।

(১১) মহাবংশের ৬৫ পৃঃ, ৫৩ শৎ সমীকরণে বনমালীর পুত্রগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উহার পাঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত মহাবংশের পুথিসমূহের পাঠদ্বারা সংশোধিত হইয়া যাহা দাঁড়ায়, তাহা মৎসম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভূমিকায় ।৵০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, কৃত্তিবাস, শান্তি, মাধব-মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ, চতুর্ভুজ, বনমালীর এই সাত পুত্র। কাজেই কৃত্তিবাস আত্মবিবরণীতে যে বলিয়াছেন, তাহার ছয় সহোদর মহাবংশ নামশুদ্ধ তাহার সমর্থন করিতেছে। আত্মবিবরণের তালিকায় "ছয় সহোদর" বলিয়াও কিন্তু সাত জনের নাম করা হইয়াছে, যথা—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তি, মাধব, শ্রীকর (শ্রীকণ্ঠ), বলভদ্র, চতুর্ভুজ, ভাস্কর। কনিষ্ঠ ভাস্করের নাম মহাবংশে পাওয়া যায় না। অন্য ছয় নামে চমৎকার মিল আছে।

(১২) শ্রীকণ্ঠ সংক্ষেপে শ্রীকর হইতে পারে ; কিন্তু উহা শ্রীধররূপে পরিবর্ত্তন করাতে মূল নামই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

(১৩) মহাবংশে তিন ভাই মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দের মধ্যে মাত্র মুরারিই কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং তাঁহারই মাত্র বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। মহেশের "নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা" ইত্যাদি খুঁজিলে সম্ভবত সূর্য্যের পুত্রগণের নাম বাহির করা যায়।

(১৪) "প্রসাদী" অর্থ যাহা দেবতাকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া প্রসাদীকৃত হইয়াছে। যেমন প্রসাদী বাতাসা, প্রসাদী নৈবেদ্য। ঘোড়ার ক্ষেত্রে সেই অর্থ সঙ্গতরূপে বড় খাটে না। কাজেই প্রসাদ শব্দ প্রসাদীরূপে পরিবর্ত্তন সঙ্গত হয় নাই।

(১৫) "বড়ই সুন্দর" শব্দ দুইটিকে "বসুন্দর"-রূপে পরিবর্ত্তন একেবারে জবরদস্তি।

(১৬) "পদা" = পদ্ধতি, প্রথা, চাল্‌চলতি, চিরাচরিত সামাজিক আচার-ব্যবহার ধারা। "পদা শাস্ত্র অনুসারে"-কে "পদ্ম শাস্ত্রে অবতার"-রূপে পরিবর্ত্তন নিতান্ত অর্থহীন।

(১৭) এই "পুণ্য" শব্দটি মূলে স্পষ্ট আছে। উহাকে "পূর্ণ"-রূপে পরিবর্ত্তন করায় কত যে গোলযোগ ও অনর্থক বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-সময় লইয়া আলোচনাকারী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আশা করি, এইবার এই বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

(১৮) পিতামহ বাঁচিয়া থাকিতে পিতার নবজাত সন্তানকে কোলে

আদিত্যবার শ্রী পঞ্চমি পুন্য (১৭) মাঘ মাস।
তথি মৰ্দ্ধে জন্মিলেম পণ্ডিত কিত্তিবাস॥
সুভ ক্ষণে গৰ্ব্বে থাকি পড়িলাম ভুতলে।
উত্তম বস্ত্র দিআ পিতামহ আমা কৈল কোলে॥
দক্ষিণ জাইতে নাম রাখিল কিত্তিবাষ।
কিত্তিবাস বলিয়া নাম করিল প্রকাস॥
এগার নীবড়ে জখন বারতে প্রবেস।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উসা পোহালে যুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গার পার॥ (২০)
তথায় করিনু আমি বিস্তার উদ্ধার।
জথা২ পাইলাম আমি বিস্তার প্রচার॥
স্বরস্বতি অধিষ্টান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষ বিস্তার প্রসর॥
য়াকাস বানি হইল সাক্ষাত স্বরস্বতি।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারথি॥
বিস্তা সাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিআ ঘরকে গমন॥
ব্যাস বসিষ্ট জেন বালমিক চ্যাব্যান।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিস্তার প্রসন॥
ব্রহ্মার শাত্রিস গুরু মহা উৰ্দ্ধাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি কৈল বিস্তার উৰ্দ্ধার॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রসংসিলা মোরে অসেস বিসেসে॥
সাত শ্লোকে ভেটিল্যাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহসম রাজা আমি করিলাম গোচর।

সপ্তঘটী বেলা জখন দিয়ানে পড়ে কাটী।
সিঘ্র ধায়্যা আইল দুত হাথে সুবর্ন্ন লাটী॥
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কিত্তিবাষ।
রাজার আদেস হইল করহ সম্ভাস॥
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনারূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার॥
রাজার ডাইনে আছে পাত্র জগতানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ন।
পাত্রে মিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন॥

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুর্ণ (?) মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা (১৮) আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস (১৯)
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার॥
তথায় করিলাম আমি বিস্তার বিচার॥ (২১)
যথা যথা যাই তথা বিস্তার প্রচার॥"(২)
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥ (২২)

বিস্তা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাই আমার বিস্তা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উঝাকার। (২৩)
হেন গুরুর ঠাই আমার বিস্তার উদ্ধার॥
গুরু স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষে বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে। (২৪)
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥ (২৫)
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে (২৬) পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাটি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুথটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী (২৭) পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥ (২৮)
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসি আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥

লইতে যাওয়া সেই আমলে নিশ্চয়ই নির্লজ্জতা বিবেচিত হইত। পিতামহকে পিতারূপে পরিবর্ত্তিত করিবার কোন হেতু নাই।

(১৯) দক্ষিণ দিকের সঙ্গে কৃত্তিবাস নামের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইতেছি না। কৃত্তিবাস=শিব ঈশান বা পূর্ব্বোত্তর কোণের অধিপতি, "পিতামহের উল্লাস" অনাবশ্যক প্রক্ষিপ্ত।

(২০) বৃহস্পতিবার শেষ হইলে শুক্রবারে, কাজেই বারান্তরে, কবি ফুলিয়া হইতে উত্তরে বড়গঙ্গা অর্থাৎ মূল গঙ্গার (পদ্মার) পার কোন গুরুর নিকট পাঠের নিমিত্ত গিয়াছিলেন। বড় গঙ্গা যশোরে ধরিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

(২১) এই পরিবর্ত্তনে মূলের অর্থ একেবারে বিকৃত হইয়াছে। মূলে কবি বলিতেছেন, বড় গঙ্গার পার যেখানে যেখানে তিনি বিস্তার প্রচার পাইয়াছেন, সেই সেই স্থান হইতেই তিনি বিস্তার উদ্ধার করিয়াছেন। বিস্তা-বিচারের কোন কথাই এখানে নাই।

(২২) মূলে "ভাষ" ভাষা নহে। অর্থ বাক্য, বক্তৃতা, Language নহে।" "আপনা হইতে স্ফুরে" জবরদস্তি প্রক্ষেপ। ইহার পরে নকলে মূলের দুই লাইন বাদ পড়িয়াছে।

(২৩) মূলে উৰ্দ্ধাকার স্পষ্ট। উর্দ্ধি শব্দটির এক অর্থ আলো তেজ। কাজেই শব্দটি সম্ভবত উৰ্দ্ধাকার=প্রদীপ্ত। উহা উঝাকার-রূপে পরিবর্ত্তিত না করিলেও চলে।

(২৪) মূলের "সাত শ্লোক" নকলে "পঞ্চ শ্লোক"-রূপে অনর্থক পরিবর্ত্তিত এবং রাজপণ্ডিত হইবার ইচ্ছামূলক ছত্রটি নূতন যোজনা এবং নিছক কল্পনা মাত্র; মূলে ইহার কিছুই নাই। নিতান্ত অসাধু ও দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত কল্পনা, সন্দেহ নাই।

(২৫) এই দুই ছত্র নকলকারক বা সংস্কারকের নূতন যোজনা।

(২৬) মূলে দিয়ানে। মূলের অর্থ দিবান বা রাজসভায় যখন সপ্তঘটির কাটি পড়িল অর্থাৎ সপ্তঘটিকা বা ঘণ্টা সমাপ্তিসূচক শব্দ

গন্ধর্ব্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব্বয়বতার।
রাজসভা পুজিত তিহো গৌরব আপার॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইআ য়াছে রাজ পাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বাম্মেতে তরুনি।
সুন্দর স্রিবৎস্য আদি ধর্ম্মাদিকারিনি॥
মকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজা সভাখান জেন দেব অবতার।
তথন আমার চির্ত্তে লাগে চমৎকার
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডায়্যাছে রাজার সমুখে॥
চারিদিগে নাট গীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাণ্ডা ধাই রাজার আণ্ডাসে।
আঙ্গিনায় পাতি আছে রাঙ্গা মাজুরি।
তথির উপর পাতিয়াছে পাটনেত তুলি॥
পাটের চাঁন্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসের থরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইলাম গিয়া আমি রাজার বিদ্যমান।
নিকট জাইতে রাজা মোরে দিলা হাত সান॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বর।
রাজার নিকটে আমি চলিলাম সর্ত্বর॥
রাজার ঠাঁঞি দাণ্ডাইলাম হাথ চারি আন্তর।
সাত স্লোক (৩০) পড়িলাম সুনে গৌড়েশ্বর॥
পঞ্চ দেব অধিষ্টান আমার কলেবর।
স্বরস্বতি প্রসাদে আমার মুখে স্লোক স্বরে॥
নানা ছন্দে স্লোক আমি পড়িয়ে সভায়।
স্লোক সুন্যা গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা স্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজা দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ সিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছাড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে গোসাঞি করিলে সম্মান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পুজা কৈলে গুণের হয় পুজা॥
পাত্রমিত্রে সভে বলে পুন দ্বিজরাজে।
জজ খুজ তত দিতে পারে মহারাজে॥
জথা জথা জাই আমি গৌরব মাত্র সার।
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার॥
আকৃতি প্রকিতি আমি যত অস্থিতি। (৩১)
পাট পাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভুসিতি॥

গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অব[illegible]।
রাজসভা পুজিত তি হোঁ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাদিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওাসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥(২৯)
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসের থরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্প লাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পুজা কৈলে গুণের হয় পুজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥

উৎপাদনকারী আঘাত যখন ধ্বনিত হইল। সংস্কারকের উদ্দিষ্ট সম্ভবত রৌদ্র-ছায়া। দেয়ালের গায়ে গৃহাদির মুদ্রিত ছায়া দেখিয়া যখন সপ্তঘটি বেলা হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল। দিয়ান কে দেয়ালে পরিবর্ত্তিত করায় অর্থান্তর হইয়া গিয়াছে।

(২৭) মূলে বুহন্দ, অর্থ—সিংহদ্বার বা দেউড়ি।

(২৮) সংস্কারক—পূর্ব্বে "সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর" ছত্রটি ছাড়িয়া অন্য একটি ছত্র যোজনা করিয়াছিলেন। এখন পরিবর্ত্তিত আকারে অনুরূপ এই ছত্রটি বসাইয়াছেন। কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া যে মাঘ মাসের মড়া পোহান যায় না, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

(২৯) মূলে "পাট নেত তুলি" অর্থাৎ রেশমের তোষক বা গদি। সংস্কারক "পাছড়া" বা শাড়ী জানেন, তাহা হইতে পাছুড়ি করিয়া মাজুরির সহিত মিল দিয়াছেন। কিন্তু মাদুরের উপর রেশমের শাড়ী পাতিয়া বসা যে সুশোভন, আরামদায়ক এবং সুসঙ্গত নহে তাহা আর খেয়াল করেন নাই।

(৩০) বোধ হয় পূর্ব্ব প্রেরিত সপ্তশ্লোক। উহাকে পূর্ব্বে সংস্কারক পঞ্চশ্লোকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু এখানে সাত শ্লোকই রাখিয়াছেন।

(৩১) এই চারি ছত্র সংস্কারক বাদ দিয়া গিয়াছেন। প্রথম ছত্রটি

ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
জথা জথা জাই আমি গৌরব জে চাহী ॥
জত জত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবির্ত্ত কেহো নিন্দিতে না পারে ॥

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥ (৩২)

প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ার।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে য়ানন্দিত।
লোক বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মর্দ্ধে বাখানি বাল্মিক মহামুনি।
পণ্ডিতের মর্দ্ধে বাখানি কিত্তিবাস গুণি ॥
বাপ মাএর আসির্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মিক প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥
মহারাজার আজ্ঞায় (৩৪) বাল্মিক মহামুনি।
রামায়ণ কবির্ত্ত তিহো করিলা আপুনি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কয়্যা জত দেবগণ।
বাল্মীক মুখে সবে সুনেন রামায়ণ।
পৃথিবি জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে ॥
কোন রাজা জিও সাটী হাজার বৎসর।
কোন রাজা মরন জিনে সির্দ্ধ কলেবর ॥
রঘুবংশের কিত্তি কেবা বর্নিবারে পারে।
কিত্তিবাস রচিল বাল্মিক মুনির বরে ॥
চোতুর্দ্দিকে ভাগ জানি ফুলিআ নগরি।
দক্ষিণ পশ্চিমচেপ্যা বহে গঙ্গা সুরেস্বরি ॥
মুখটী বংশ ওঝা বংশ সংসার বিদিত।
তথি উপজিল এই কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥
বাপ বনমালি য়োঝা মানিকী উদরে।
জনম লইল য়োঝা ছয় সহোদরে ॥
সরস সুন্দর হইল বানি বিলাস।
ফুলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥
মুনি মর্দ্ধে বন্দিব বাল্মিক মহামুনি।
তপের প্রভাবে তিহো ত্রিভুবন জিনি ॥
তাহার কবির্ত্ত শুন রামায়ন কথা
ভারথি বন্দিআ তবে গায়্যা দিল পোথা।
সরস ভাসে গায় গিত হাথে তাল ধরি ॥
ভারথির প্রসাদে কেহো দোস দিতে নারি।
মুনির বাক্য শুনিতে কেহ না করিহ হেলা।
ইহাতে অমৃত আছে কত রস কলা ॥
পোথার ভিতর কবির্ত্ত ছিলা কেহ নাহি বুঝে।
কিত্তিবাসের কবির্ত্ত সর্ব্বলোক পুজে ॥
আদিকাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত।
লোক বুঝাইতে কৈলা কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥

প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় (৩৩) রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর (৩৪) বরে ॥

দুর্ব্বোধ্য। সম্ভবতঃ অর্থ এই যে, আমার আকৃতি ও প্রকৃতি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল (shabby-looking) ; তথাপি আমার বিস্তার আদরস্বরূপ আমি চন্দনভূষা এবং পাটের কাপড় রাজার নিকট উপহার পাইলাম।

(৩২) এই দুই ছত্রের নিতান্ত অসাধু-সংযোজনের উদ্দেশ্য, সর্ব্বসাধারণের এক মিথ্যা ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যে, কৃত্তিবাস রাজাজ্ঞায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। মূল পুথির উদ্ধার হওয়াতে এই অন্যায় প্রচেষ্টা ধরা পড়িল।

(৩৩) এইখানেও "বাল্মীকি প্রসাদ"কে "রাজাজ্ঞায়" পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

(৩৪) "মহারাজার আজ্ঞায়" অর্থাৎ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায়।

(৩৪) "বাল্মীক মুনির বরে" পরিবর্ত্তন করিয়া "সরস্বতীর বরে" করা হইয়াছে।

জঙ্গম

বনফুল

১০

অনেক দিন পরে শঙ্কর একা মাঠে গিয়া বসিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া সে নিজেরই অতীত জীবনটার পর্য্যালোচনা করিতেছিল। ভাবিতেছিল যাহা তাহার কাম্য তাহার সন্ধান মিলিয়াছে কি? সারা জীবন সে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলুক এই কামনায় তাহার চিত্ত সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া সে সাধ তাহার মিটিয়াছিল। আজও তাহার সহপাঠীরা এবং শিক্ষকেরা তাহার ভাল-ছেলেত্ব লইয়া সগর্ব্বে আলোচনা করেন। পরীক্ষায় প্রথম হইবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অন্তরে চিরস্থায়ী হইল না! ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পরই তাহার মনে দেশ-সেবা করিবার আগ্রহ জাগিল, মনে হইল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হইয়া, বন্যা-দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া, চরকা চালাইয়া, খদ্দর পরিধান করিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। অনন্যকর্ম্ম হইয়া কিছুকাল এ কর্ত্তব্য সে পালনও করিয়াছিল কিন্তু যে-ই খবর বাহির হইল যে সে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছে অমনি তাহার মত বদলাইয়া গেল, অমনি অবলীলাক্রমে সে কলেজে ভর্তি হইয়া বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান পড়িতে লাগিল। শুধু পিতার আদেশেই নয়, তাহার নিজেরও মত বদলাইয়াছিল বই-কি! চরকা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে কিছুই হইতেছে না, দেশের লোকের সত্যকার কোন উপকারই সে করিতে পারিতেছে না, কেবল হুজুকে মাতিয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। ক্রমশ সে বুঝিয়াছিল যে বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাধনাই প্রকৃত দেশ-সেবা, বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি না করিয়া চরকা চালাইতে গেলে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি হইবে না! একটা নূতন আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যেন সে আই. এস-সি. এবং বি. এস-সি. পাশ করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্রহ্মচর্য্য এবং বিজ্ঞানসাধনার আদর্শ মফঃস্বলে অটুট ছিল কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সুরমা, রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, বেলা, শৈল, মুক্তোরা আসিয়া তাহার মনে যে আলোড়ন তুলিল তাহাতে তাহার পূর্ব্বজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধস্বপ্ন আদর্শকর্ত্তব্যের সমস্ত মানদণ্ড উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। মনে হইল, জীবনকে উপভোগ করাই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, চার্ব্বাক দর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। কিন্তু সে দর্শন অনুসরণ করিয়াই বা লাভ কি হইল? কত রামী, বামী, ক্ষেন্তি, কত বীণা আশা রাধা, কত মিষ্টিদিদি তেতোদিদি আসিল এবং গেল—সকলের নামও মনে নাই—কিন্তু কি হইল? জীবনকে উপভোগ করা হইল কি? পীবর বক্ষ, চটুল চাহনি, লাস্য হাস্য ভাব ভঙ্গী কিছুরই তো অভাব ছিল না, তবু মনে এখনও অতৃপ্তি কেন? কেন মনে হইতেছে জীবনটা বৃথায় গেল? জীবনকে সে তো কম উপভোগ করে নাই। কিন্তু এখন আর ওসব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। চুনচুন কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আর তেমন মাদকতা নাই। চুনচুনের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে সে উত্তেজিত হইয়া ওঠে বটে, কিন্তু তাহার কাছে গেলেই সে উত্তেজনা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, মনে হয় ভ্রাতাভগ্নীর নিকট আসিয়াছে।

যে বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একদিন চরকা-নীতিকে উপহাস করিয়াছিল সে বিজ্ঞানও তাহাকে বেশী দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের অনিবার্য্য প্রভাবকে অস্বীকার সে করে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোনরূপ প্রগতি যে অসম্ভব তাহা সে জানে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াই যে করিতে হইবে ইহাও সর্ব্বতোভাবে সে স্বীকার করে, তবু সে বিজ্ঞানচর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছে। সুযোগ পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। কেন? সহসা তাহার মনে হইল আমাদের চিন্তার সহিত আমাদের কার্য্যের কি সত্যই কোন যোগ আছে? চিন্তা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় তাহাই কি আমরা সব সময়ে করি? কোন সময়ে কি করি? তাহার মনে হইল চিন্তা করা শিক্ষিত মনের বিলাস মাত্র, আমাদের কার্য্যের সহিত তাহার কচিৎ সম্পর্ক থাকে। আমরা যাহা করি তাহা চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া করি না, নিজের সুখের জন্য করি। সে সুখের পিপাসা অন্তরের যে অন্ধকার কন্দর হইতে উৎসারিত হয় তাহার সন্ধান আজও আমরা পাই নাই। চিন্তা করিয়া সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিতের একটা আদর্শ আমরা খাড়া করি বটে, কিন্তু তদনুসারে আমরা চলি না, আমরা চলি নিজেদের আন্তরিক প্রেরণায়। সে প্রেরণার সহিত যদি কেতাদুরস্ত নীতির মিল থাকে ভালই, যদি না থাকে তাহা হইলেও আমরা নিরস্ত হই না, যাহা করিবার আমরা ঠিক করিয়া যাই, কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি তখন যেন আমাদের উপর ভর করিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এই শক্তিই তাহাকে হয়তো বিজ্ঞানের পথ হইতে সাহিত্যের পথে আনিয়াছে, সুগম সুপরিচিত পথ হইতে টানিয়া দুর্গম অপরিচিত পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াও কিন্তু আর একটা যুক্তির মোহ হইতে শঙ্কর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল যে, দেশের মনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করা যদি সত্যই প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যস্থতাতেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্যই সে বিজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত বাহন। বিজ্ঞানকে সম্যকরূপে গ্রহণ করিবার মত সুস্থ মনোবৃত্তিও দেশের সাহিত্যই গঠন করিবে। তাই সাহিত্যের পথকেই সে জীবনের পথ রূপে বাছিয়া লইয়াছে, এই পথ ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

হঠাৎ যেন আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছাত্র-জীবনে স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্য্য তাহার মনে যে দেশ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, আনন্দমঠ পাঠ করিয়া যে দেশকে সে জননী জন্মভূমি বলিয়া জানিয়াছিল সেই দেশাত্মবোধই তাহাকে জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে এতদিন পরিচালিত করিয়াছে, তাহার সকল কর্ম্মে প্রেরণা জোগাইয়াছে। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা"—রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্কল্পকে সে-ই তো মূর্ত্ত করিবে! সাহিত্যের পথই তাহার পথ, এই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু ইহার নাম কি সাহিত্য-পথে চলা? সংস্কারক আপিসে চাকরি করা মানে কি সাহিত্য-চর্চ্চা? শঙ্করের রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। "নারীস্তোত্র" নামে সে যে কবিতাটা লিখিয়াছিল মজুমদার মহাশয় তাহা 'সংস্কারক' পত্রিকায় ছাপিতে নিষেধ করিয়াছেন। সে নিজে সহকারী সম্পাদক, অনায়াসেই সে লেখাটা তাঁহাকে না দেখাইয়াও ছাপিতে পারিত। কিন্তু অদ্যাবধি সে কোন লেখা সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে ছাপে নাই, সম্পাদক মহাশয়ও এ যাবৎ তাহার কোন লেখায় আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, আজ হঠাৎ 'নারী-স্তোত্র' কবিতাটা তাঁহার খারাপ লাগিয়া গেল? অশ্লীল? কি এমন অশ্লীলতা আছে উহাতে! 'শৃঙ্গার' 'স্তন' 'স্বচ্ছবসনা' 'নীবিবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটা কথায় দাগ দিয়া তিনি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ ভাল কবির কবিতাতে এসব কথা নাই? কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও—শঙ্করের হাসি পাইল—ওই বেরসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হীরালাল মজুমদারের নির্দ্দেশ অনুসারে কাব্যরচনা করিতে হইবে নাকি! চণ্ডীচরণ দস্তিদারের কথা মনে পড়িল। ওই লোকটি হয়তো হীরালালবাবুর হৃদয়-হরণ করিতে পারিবে। কাব্যরস-বিবর্জ্জিত খাঁটি কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি। কম কথা বলেন। ঠিক সময়ে—কখনও কখনও ঠিক সময়ের পূর্ব্বেও—আপিসে আসেন এবং রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যান। নিলয়কুমারের সহকারী হিসাবে বাহাল হইয়াছেন, 'সংস্কারক' পত্রিকার ব্যবসায়ের দিকটা দেখাই নাকি তাঁহার একমাত্র কার্য্য। শঙ্করের কিন্তু সন্দেহ হয় নীরবে তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। সর্ব্বদাই যেন একটা মুখোস পরিয়া আছেন। একটি বাজে কথা বলেন না, রসিকতা করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করা যায় না। চণ্ডীচরণ অতীত জীবনে পড়াশোনার বিশেষ ধার ধারেন নাই, থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত না কি পড়িয়াছিলেন এবং তাহার জোরেই নাকি তিনি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কোন সদাগরি অফিসের কেরানীগিরি জোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছয়মাস পূর্ব্বে তাঁহার কেরানীজীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু সামর্থ্য এবং চাকুরি-স্পৃহা এখনও শেষ হয় নাই বলিয়া পুনরায় তিনি কাজে লাগিয়াছেন। এই ইতিহাসটুকুই শঙ্কর জানিত, আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে চণ্ডীচরণ শুধু কেরানীমাত্র নহেন, তিনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিকও। অর্থাৎ সাহিত্যের দরবারে তাঁহারও কিঞ্চিৎ দাবী আছে। তাঁহার প্রত্নতত্ত্বও আবার এমন বিষয়ে যে সম্বন্ধে শঙ্করের কোন জ্ঞান নাই। প্রাচীন মিশর তাঁহার বিষয়। সবজান্তা নিলয়কুমার নাকি ইজিপ্টোলজির একজন সমঝদার, তিনি চণ্ডীচরণকে খুব উৎসাহিত করিতেছেন। খবরটা শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়াছে, তাহার মনে হইতেছে হয়তো এই দাবীর জোরেই চণ্ডীচরণবাবু একদিন তাহাকে পদচ্যুত করাইয়া নিজেই 'সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বসিবেন এবং ভিতরে ভিতরে হয়তো তাহারই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

অনেক রাত্রে শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল মৃন্ময়ের স্ত্রী হাসি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যাহা শুনিল তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময় আপিসের টাকা ভাঙিয়া ধরা পড়িয়াছে। সে নাকি এখন জেলে। অতিশয় শান্তকণ্ঠে হাসি সংবাদটি দিল। বিস্ময়ে শঙ্করের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সে চুপ করিয়া হাসির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময় চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে? এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু ইহার সম্ভাব্যতা লইয়া বিচার করিবার সময় নাই, শঙ্করের মনে হইল অবিলম্বে কিছু একটা করা প্রয়োজন।

"আপনি বসুন, আমি ভন্টুর কাছে যাই, দেখি কতদূর কি করা যেতে পারে। হয়তো কোথাও কোন ভুল হয়েছে—"

"কোথাও যাবার দরকার নেই। ভন্টুবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছু হবে না। কিছু ভুলও হয়নি, উনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছেন, টাকাও ফেরত দিতে রাজি নন, ওঁর জেল হবেই।"

"কত টাকা?"

"দশ হাজার।"

"দশ হাজার! এত টাকা কি ক'রে পেলে?"

"আপিসের সিন্দুকে ছিল: কেশিয়ারের টেবিল থেকে চাবিটা সরিয়ে টাকাটা নিয়েছেন।"

"টাকাটা কোথা?"

হাসি চুপ করিয়া রহিল।

সহসা তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা টপটপ করিয়া গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়াছিল। ভাবিতেছিল কি করিয়া এই নূতন সমস্যাটির সমাধান করিবে। মৃন্ময়ের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, হাসিই সমস্যা। হাসির আপনজন কেহ নাই। মৃন্ময়ই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে পরিবারে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে সেখানে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। সংবাদ পাইলে মুকুজ্যে মশাই অবশ্য আসিবেন, ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো একটা ব্যবস্থাও করিবেন কিন্তু হাসির তাহা ইচ্ছা নয়। হাসি শঙ্করকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছে, মুকুজ্যে মশাইকে যেন খবর না দেওয়া হয়, তিনি তাহার যে উপকার করিয়াছেন সে ঋণই সে জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না, ঋণের বোঝা আর সে বাড়াইতে চাহে না। কিন্তু সে যে ঠিক কি করিতে চায় তাহাও এখন পর্য্যন্ত খুলিয়া বলে নাই।

"তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

অমিয়া শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল।

"না। হাসিকে নিয়ে কি করা যায় তাই ভাবছি।"

"আমাদের কাছেই থাক, কি আবার করবে।"

"আমাদের কাছেই থাকবে?"

"আমাদের কাছেই এসেছে যখন—কোথায় আর যাবে, যেতে বলাটা কি ভাল দেখায়?"

"তা বটে। তা হ'লে থাক।"

শঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইল। অমিয়া তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া চুল কুরিয়া দিতে লাগিল।

"ঘুমোও তুমি।"

"ঘুমুচ্ছি।"

শঙ্করের কিন্তু ঘুম আসিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমিয়া না হইয়া যদি অপর কোন মেয়ে হইত তাহা হইলে হাসির অভ্যাগমে সে শঙ্কিত হইয়া পড়িত। হাসি সুন্দরী এবং যুবতী। অমিয়ার মনে কিন্তু এতটুকু শঙ্কা নাই। শঙ্কর সম্বন্ধে সে এত নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় যে শঙ্কর তাহার আচরণে অবাক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় যে অমিয়া বোধ হয় অতিশয় নির্বোধ। আবার মনে হয়, কই বুদ্ধিহীনতার আর কোন লক্ষণ তো সে দেখিতে পায় না। কেবল এই বিষয়েই—যে বিষয়ে নারীবুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রখর—সেই বিষয়েই সে নির্ব্বোধ?

১১

তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। শঙ্কর নীচের ঘরটায় বসিয়া 'কাব্যে বাস্তবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' কথাটা যে অর্থে লইয়া বাস্তব-বাদীদের বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহা তাঁহার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে উপহাসযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উপহসিত সমালোচকদের পক্ষ লইয়া নানা উদাহরণ দিয়া শঙ্কর ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল যে, সমালোচকগণ কাব্যে যে 'বস্তু'র সন্ধান করিয়াছেন তাহা সাধারণ বস্তু নহে। সে বস্তুর সংজ্ঞা বিভিন্ন। কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থই কাব্য-বস্তু হইতে পারে না—যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকজনের মর্ম্মগ্রাহ্য হয়। যে সব সমালোচক কাব্যে বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা সেই বস্তুরই সন্ধান করিয়াছেন যাহা রসিক-চিত্তগ্রাহী। কাব্যলোকের কুসুম এবং উদ্ভিদবিদ্যার কুসুমে আকাশ-পাতাল তফাৎ—ইহা যে নিয়মে সত্য বিদেশাগত অবাস্তবতা অথবা অতি-বাস্তবতা, সেইই এক নিয়মে এই সমালোচকগণ কর্ত্তৃক অবাস্তব শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে যাহা 'অকাব্য' তাহাই কাব্য-বিচারে অবাস্তব, কারণ কাব্যের বস্তু তাহাতে নাই।

"শঙ্কর আছ নাকি ভাই?"

দ্বার ঠেলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ভনটুর মেজকাকা প্রবেশ করিলেন।

"এ কি, আপনি কবে এলেন?"

"কঠিন বন্ধন ভাই বুঝলে, মায়ার বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন—"

"বসুন।"

উপবেশন করিয়া মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, "রঙীন চশমাটা নাকে এমন এঁটে বসেছে যে খোলা দুষ্কর।"

"কবে এলেন?"

"এলাম মানে! গেলুম কবে?"

শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিল মুক্তানন্দ এখন প্রতি কথারই দার্শনিক জবাব দিবেন।

"তোমরা যেতে দিচ্ছ কই ভাই, বার বার যাচ্ছি আর ফিরে আসছি।"

"কাল ভনটুর সঙ্গে দেখা হ'ল, সে তো কিছু বললে না।"

"আমি বিনোদের বাসাতেই উঠেছি। মানে ভনটুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না—"

মিটিমিটি চাহিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। তাহার পর যেন মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "সেইজন্যেই তো তোমার ঠিকানা জোগাড় করে এই ভোরে তোমার কাছে আসা! তুমি একটা উপায় বাতলে দাও ভাই—"

"কিসের উপায়?"

"ভণ্টুর কাছে যাবার।"

"কেন, ভনটুর কাছে যাবার বাধাটা কি?"

"ওই দেখ, তুমি বুদ্ধিমান লোক হয়ে বুঝতে পাচ্ছ না—বাধাটা কি। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহীর বাড়িতে যেতে এমনিতেই তো কত বাধা, তার উপর ভনটু নিজের ভাইপো, মোটা মাইনের চাকরি করে শুনেছি, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে করেছে। গেলেই ভাববে, ওই রে, বাবাজী কোন মতলবে এসেছে নিশ্চয়। আজকাল সন্ন্যাসী দেখলেই লোকে ভাবে—ব্যাটার কোন মতলব আছে—"

মুক্তানন্দ চক্ষু বুজিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর হাস্যমুখে চুপ করিয়া রহিল। সহসা চক্ষু খুলিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, "আমি একটা উপায় ভেবে এসেছি তুমি যদি রাজি হও।"

"বলুন।"

"তোমাকে কিন্তু একটি মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলতে হবে যে আমার সঙ্গে রাস্তায় তোমার হঠাৎ দেখা, তুমি যেন জোর ক'রে আমাকে ভনটুর কাছে নিয়ে এসেছ—"

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, "বেশ। বিকেলে আসবেন তা হ'লে, এখন ব্যস্ত আছি একটু।"

ইহাতে মুক্তানন্দ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উঠিয়া বলিলেন, "বিকেলে? আচ্ছা, তাই আসব। লেখক-হিসেবে তোমার নামডাক খুব শুনছি। আনন্দের কথা, তোমার নামডাক হবে না তো কার হবে। লিখছ নাকি কিছু এখন?"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মুক্তানন্দ একবার ঝুঁকিয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, "লেখ, তোমাকে আর বিরক্ত করব না তা হ'লে"

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সবই মায়া, কিছুই কিছু নয়" বলিয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্করের মনে পড়িল, আজ বৈকালে হাসির জন্য একবার প্রফেসার গুপ্তের নিকটও যাইতে হইবে। প্রবন্ধটা এখনই শেষ করা প্রয়োজন। লিখিতে যাইবে, নিপু আসিয়া প্রবেশ করিল। হিরণদার আড্ডায় নিপুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছিল। হিরণদার আড্ডার অধিকাংশ সভ্যের সহিত এখন আর দেখাই হয় না, কেবল নিপু আর ছবি টিকিয়া আছে। নিপুও সাহিত্যরসিক। সে না কি গোপনে গোপনে সাহিত্য-রচনাও করে, কিন্তু

কাহাকেও তাহা দেখায় না। সহসা সকলকে তাক লাগাইয়া প্রভাত-সূর্য্যের মত অনিবার্য্য দীপ্তিতে একদিন বঙ্গসাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া সে সমুদিত হইবে—ইহাই তাহার আকাঙ্খা। এখন অন্ধকারে তাহার তপস্যা চলিতেছে। দরিদ্রের সন্তান। এখনও বিবাহ করে নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহই তাহাকে তাহার বিদ্যা অথবা সাহিত্যসাধনার জন্য শ্রদ্ধা করে না। সে বেকার, অসামাজিক। একমাত্র শঙ্করই তাহাকে আমল দেয়—তাই সে শঙ্করের কাছে আসে। কিন্তু শঙ্করের কাছে আসিয়াও সে স্বস্তি পায় না। মনটা কেমন যেন বিষাইয়া ওঠে।

"কিছু লিখছ না কি ?"

শঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল দেখাইল।

"কিছু হয় নি। তুমি যা লিখেছ' তা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন—"

"ঠিক এমনি ক'রে কোথায় বলেছেন ?"

নিপু কয়েকটা প্রবন্ধের নাম করিল। শঙ্কর তাহার একটাও পড়ে নাই। পড়িবে কখন ? চাকরি করিতেই সমস্ত সময় চলিয়া যায়।

ছেঁড়া জামার পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া নিপু বলিল, "ধারটা শোধ করতে এসেছি। কেরানীগিরি জুটেছে একটা।"

"তাই না কি, শুনিনি তো।"

"তথাপি ইহা সত্য।"

নিপু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যেও কেমন যেন একটা চাপা ঈর্ষ্যা চকমক করিয়া উঠিল।

"চলি এখন !"

নিপু চলিয়া গেল।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর প্রবন্ধটা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিপূজা

শ্রীমানকুমারী বসু

ছাব্বিশে সায়াহ্ন চৈত্র তেরশত সনে
বঙ্কিম বিদায় সে যে আজো জাগে মনে।
হাহা করে মরুদ্ব্যোম
পবন ভাস্কর সোম
কি আঁধার দশ দিক অশ্রুল নয়নে।
কলকণ্ঠ ভুলি কুহু
গাহিল যে আহা উহু
বিষাদে ঝরিল ফুল বন উপবনে।
জাহ্নবী উঠিল ফুলে
তরঙ্গ ছুটিল কূলে
বুকপাতি লবে আজি অমূল্য রতনে।
দেখি বাতায়ন-পথে
শায়িত সুবর্ণ রথে
দ্বিতীয় সুধাংশু দেব কুসুমশয়নে।
বঙ্গ-মা বঙ্কিম-হারা
কোটি চক্ষে বহে ধারা
কোটি বক্ষ ভেঙ্গে গেছে বজ্র প্রহরণে।
মধু মাখা উপন্যাস
সগৌরব ইতিহাস
বিজ্ঞান দর্শন ভরা সে বঙ্গদর্শনে।
ধর্ম্মতত্ত্বে ধর্ম্মাচর্য্য
অসমাপ্ত কত কার্য্য
সহসা চলিয়া গেলে অমর সদনে।
অকালে ছাপ্পান্ন বর্ষে
নিঠুরা নিয়তিস্পর্শে
চলি গেলে শূন্য করি তব রাজাসনে।
সেদিন কম্পিত বক্ষে
শোক অশ্রুসিক্ত চক্ষে
কি দৃশ্য দেখিনু বসি কক্ষ-বাতায়নে।
বঙ্কিম বিদায় সেই আজো জাগে মনে।
আজি যে রয়েছ দেব অমর ভবনে।
তোমারে ডাকিছে নরে ভয়াকুল মনে।
বিশ্বে যেন নাহি প্রীতি
সুসুপ্ত বিপণি বীথি
দেহ যেন প্রাণহীন সদা হয় মনে।
চমকিতা মাতৃভূমি
কোথা তুমি কোথা তুমি
এস বিভাবসু রূপে তিমির হরণে।
কে রচি আনন্দমঠ
স্থাপিয়া মঙ্গলঘট
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিবে মায়ের চরণে।
গড়িতে শকতি কার
সুবর্ণ প্রতিমা মার
পূজিবে কে হৃদি রক্তে সে রাঙ্গা চরণে।
করে নিয়া বরাভয়
তোমারি আসিতে হয়
তুমিই শিখাবে পূজা মাতৃভক্তগণে।
এস দেব সত্যানন্দ
হে গুরু কমলাকান্ত
তোমারে ডাকিছে নরে ভয়াকুল মনে।
এস দেব এস গুরু
ডাকে ভক্তগণে
জানি ভক্তি আবাহনে আসিবে স্বয়ং।
শুনাইবে মহাগীতি বন্দেমাতরম্।

* * *

অষ্ট চত্বারিংশ বর্ষে বাৎসরিক ক্ষণে
সশ্রদ্ধ তর্পণ করি প্রণমি চরণে।

রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায়

একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জগতে খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী ভারতীয় কবিগণের মধ্যে একমাত্র কালিদাস কাব্য ও নাটক এই উভয়ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কালিদাস কিন্তু মহাকবি নামেই পরিচিত। কাব্য ও নাটকের কোন মৌলিক পার্থক্য সে যুগে স্বীকৃত হইত না। নাটককে বলা হইত দৃশ্যকাব্য। "দৃশ্যশ্রাব্যত্ব ভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্।" সুতরাং সংস্কৃত নাট্যকারগণ সকলেই কবি। বর্তমান যুগে আমরা যে নাটককে কাব্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি সে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। ইউরোপে নাটককে কাব্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা হইত। আরিষ্টটল্ প্রমুখ দার্শনিকগণ কাব্য হইতে নাটকের আভ্যন্তরীণ পার্থক্যও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য স্বতন্ত্র কলা-হিসাবে নাটকের চর্চা ইউরোপে বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ইউরোপের নাট্য-সাহিত্য সুসমৃদ্ধ এবং অশেষ প্রকার বৈচিত্র্যে মণ্ডিত।

আমাদের দেশে নাটক চলিয়াছে কাব্যের তালে তালে। তাই বলিয়া নাটকের প্রকারভেদ ও নিজস্ব লক্ষণ কিছুই ছিল না এমন নহে। পঞ্চ সন্ধি, প্রস্তাবনা, প্রবেশক, বিষ্কম্ভক, পতাকাস্থান, ভরতবাক্য প্রভৃতি নাটকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু এসব নিতান্তই বাহ্যিক। নাটকের প্রকারভেদ নির্ভর করিত অঙ্কের সংখ্যা ও নায়ক-নায়িকার প্রকৃতির উপর। আর সব বিষয়েই ইহা কাব্য হইতে অভিন্ন ছিল। নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করিত নাট্যকারের কবিত্ব শক্তির উপর। সুতরাং শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করা মোটেই দুরূহ ব্যাপার ছিল না। সেইজন্য কবি কালিদাসও নাট্যকার কালিদাসের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। শকুন্তলা নাটকের যে জগৎ জুড়িয়া খ্যাতি তাহার মূলে কালিদাসের অলোকসামান্য কবিত্ব শক্তি। ইউরোপীয় সাহিত্যে নাটক কাব্যাংশে হীন বা কবিত্ববিহীন হইলেও উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ নাটকের অস্তিত্ব কল্পনা করাও শক্ত। কবিত্ববর্জিত উৎকৃষ্ট নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে মাত্র একখানি পাওয়া যায়—শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী।

আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যসমালোচনার রীতি-অনুসারে নাটককে কাব্য হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছি। এখন নাটকের মধ্যে নাটকীয় চরিত্রগুলির উক্তি-প্রত্যুক্তি ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে সাজাইতে যাওয়া নিছক পাগলামি বলিয়া গণ্য হইবে। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, আজকাল কবি গিরিশচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত নন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতামাত্র কিন্তু নাটক রচনায় তিনি তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত রত্নাবলী-নাটকের বঙ্গানুবাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া তিনি বাংলা-ভাষায় মৌলিক নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন। নিছক পাশ্চাত্য ছাঁদে নাটক রচনা করিয়া তিনি কাব্য ও নাটকের মাঝখানে বিচ্ছেদের একটি সুস্পষ্ট রেখা টানিয়া দিলেন। ইহার পূর্বে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী-ব্যক্তিদের বাড়ীতে শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রত্নাবলী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি নাটক সমাদরে অভিনীত হইত। বাঙ্গালীর কাব্যরসপিপাসু মন সে-জাতীয় অভিনয়ে অনির্বচনীয় তৃপ্তি পাইত। মাইকেলের পর যে-সকল নাটক রচিত ও অভিনীত হইতে লাগিল তাহাদের আদর্শ শেক্সপীয়রের রচনাবলী। বাঙ্গালার গ্রামে নগরে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ীতে পূজা ও বিবাহাদি উপলক্ষে কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, বিদ্যাসুন্দরযাত্রা, সখের যাত্রা প্রভৃতির অভিনয় হইত। এই যাত্রাগুলি ছিল আমাদের দেশে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ-বিতরণের প্রধান উপায়। সেকালের যাত্রা ও কথকতার কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বিকীরণ' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"এমনি কতকাল চলেছে দেশে, বার বার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে ক'রে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে-শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যা-ই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।"

এই নবযুগের প্রভাবে যাত্রা কথকতা ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনাদরের ফলে ক্রমশ বিলুপ্ত-প্রায় হইল। এ সকলের পরিবর্তে আমরা যাহা পাইলাম, আমাদের সাহিত্যে তাহা কতখানি সজীবতা ও সরসতা আনিয়াছে, জাতিকে কতখানি শিক্ষা ও আনন্দ বিতরণ করিয়াছে সে-কথা বিচার করিবার দিন এখনও আসে নাই, কারণ এ যুগের জের এখনও পর্যন্ত চলিতেছে। কিন্তু একটা বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বাঙ্গালী নাট্যকারগণ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া ইংরেজি নাটকের একটানা অনুকরণ করিয়া চলিয়াছেন ; কিন্তু এমন একখানি নাটকও রচিত হইয়াছে কি যাহা ইংরেজী সাহিত্যের যে-কোন উৎকৃষ্ট নাটকের পাশে স্থান পাইবার যোগ্য, যাহা জাতীয় সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদরূপে সমাদৃত? বাঙ্গালা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কাব্য ও উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু সেরূপ উৎকৃষ্ট নাটক কোথায়? বাঙ্গালীর প্রতিভা পাশ্চাত্য রীতিকে ঠিক মত আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

আমাদের পরমসৌভাগ্য যে রবন্দ্রীনাথ একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি আসিয়াই কাব্য ও নাটকের মাঝখানের এই বিশ্রী বিলেতি বেড়াটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অমনি কাব্য হইতে রসের বন্যা আসিয়া নাটকে প্রবেশ করিল। পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ আবার ফিরিয়া আসিয়া যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিল। নর-নারীর বিচিত্র হৃদয়বৃত্তিগুলি সঞ্জীবিত হইয়া বিচিত্র সঙ্গীত তুলিল। শৃঙ্গার ও বীররস অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে নূতন রূপ পাইল। কোন নাটক সমালোচনা করিতে গিয়া সকলের আগে আমরা ইহার য়্যাক্সন্ লইয়া মাথা ঘামাইতে বসি। য়্যাক্সন্ ইউরোপীয় নাটকের অপরিহার্য ধর্ম, ইহাকে বাদ দিলে নাটক হয় না, ইহা ব্যাহত হইলে নাটকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। য়্যাক্শন্-বাচক কোন পরিভাষা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাই কারণ আমাদের দেশের কাব্যামোদিগণ নাটকে য়্যাক্সন্-এর দাবী কোন দিন করে নাই। য়্যাক্সন্ বজায় রাখিতে গিয়া একটা সুন্দর প্লট উৎকট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে এরূপ নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভূরি ভূরি আছে। রবীন্দ্রনাথ য়্যাক্সন্ মানেন নাই, তিনি মানিয়াছেন গতি। তাঁহার মতে সাহিত্যের দুটি মৌলিক উপাদান চিত্র ও সঙ্গীত। চিত্র ভাবকে রূপ দেয় আর সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যে গানের এত প্রাচুর্য। ভাব যেখানে মন্থর হইয়া আসিতেছে, ঘটনার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য, কোন সমস্যা জমিয়া উঠিতেছে, সেইখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা কিংবা অন্ধ

বাউল আসিয়া গান গাহিয়া সব ত্রুটি সারিয়া লইতেছে। এইরূপে গানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে নাটকের শেষে ভাব একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। কৃষ্ণযাত্রাও অনেকটা এই ধরণের। রাধা-কৃষ্ণের মাঝখানে পূর্বরাগ, মান, বিপ্রলম্ভের দুস্তর সমস্ত, কিন্তু বৃন্দা দূতীর গান সকল প্রকার বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দূর করিয়া দুইটি হৃদয়কে এক করিয়া দিতেছে। ফাল্গুনী নাটকের অন্ধ বাউল যেমন গান না গাইলে রাস্তা পায় না, বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্যও তেমনি গানের সাহায্যে আপনার রাস্তা করিয়া চলিয়াছে। সহজিয়া ও বৈষ্ণবদের বিরাট সাহিত্যের দিকে তাকাইলেই কথাটা ভাল করিয়া পরিস্ফুট হইবে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। ইংরেজ অধিকারের পর হইতে বাঙ্গালীর নাটক যে-ধারাটি অবলম্বন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন প্রকার যোগ নাই। রবীন্দ্রনাথ সুপ্রাচীন কালিদাসের ধারাকে আপনার নাটকের মধ্যে আনিয়াছেন, আবার স্বদেশী যাত্রার যে ধারাটি বহুকাল ধরিয়া চলিয়া শেষে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সীমা-রেখায় ঠেকিয়া নিশ্চল হইয়াছিল তাহাকেও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু মাঝখানের একটা যুগ তিনি ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছেন। সে-যুগটা মুখ্যত বিজাতীয় সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ। তিনি যে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করেন নাই একথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং কোন কোন স্থলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট তিনি গভীরভাবে ঋণী। তবে এ কথাও সত্য যে অনুকরণের মোহে পড়িয়া জাতীয় সাহিত্যের আদর্শকে কোথাও তিনি বিকৃত করেন নাই, বরং বহু মহিমোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত-ধারাটি জাতীয় সাহিত্য বিকাশের ধারা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ধারাটিও কিন্তু অবহেলার বিষয় নয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের উন্মেষে তাহার দানও যথেষ্ট। বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা এবং ধর্মজীবনের সহিত সেও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বাঙ্গালা নাটকের এই দুইটি ধারা যেদিন ঐকত্র 'মলিত হইবে সেই দিন হইতে বাঙ্গালা নাটকের যথার্থ বিকাশ শুরু হইবে।

১৮৮১ খ্রীঃ কুড়ি বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম নাটক—'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম খাঁটি বাঙ্গালা নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই চব্বিশ বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে বাঙ্গালা নাটক বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। তর্করত্নের নাটকগুলি একেবারে প্রাণহীন, সেকেলে পাঁচালির ভাষায় রচিত এবং অত্যন্ত লঘু ধরণের। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অনেকস্থলে সংস্কৃত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন ; কিন্তু সংস্কৃত নাটকের যে সজীবতা, চরিত্রসৃষ্টির কৌশল এবং রসের বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখা যায় তাহার লেশমাত্র প্রভাব তাঁহার নাটকে দেখা যায় না। নাটক-সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রতিভা তাঁহার ছিল না এবং নাটক রচনার খাঁটি প্রণালীটি তাঁহার অগোচর ছিল। অবশ্য তাঁহাকে স্বহস্তে পথ কাটিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার হাত হইতে কোন উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি প্রত্যাশা করা যায় না। রামনারায়ণের নাটকের সাহিত্যিক মূল্য কেবল হাস্য-রস-সৃষ্টিতে। রামনারায়ণের সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদনও কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী এক সময় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভাষা কৃত্রিমতাপূর্ণ ও আড়ষ্ট। বিষয়বস্তুগুলি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির অনুকূল থাকিলেও ভাষার আড়ষ্টতা এবং চরিত্রসৃষ্টিতে নৈপুণ্যের অভাববশত তাঁহার নাটকগুলি সত্যিকারের নাটক হইয়া ওঠে নাই। তর্করত্ন ও মধুসূদন সাময়িকভাবে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের অভাব দূর করিয়াছিলেন মাত্র। দীনবন্ধু মিত্রের হাতেই নাটক প্রথম যথার্থ সাহিত্যিক রূপ পাইল। তাঁহার নীলদর্পণ (১৮৬০) ও সধবার একাদশী (১৮৬৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তরকারী রচনা। কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকে তৎকালীন সামাজিক কুরুচির প্রভাব খুব বেশি। অশ্লীলতা অনেকস্থলে সুরুচির মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং অতিরঞ্জনের ফলে হাস্য ও করুণরস অনেকস্থলে বীভৎস রসে পরিণত হইয়াছে।—সাহিত্যের শুভ্র সুন্দর রূপটি দীনবন্ধুর নাটকে নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ মধুসূদন ও দীনবন্ধু উভয়েরই মৃত্যু হয়। তখন রঙ্গমঞ্চে মনোমোহন বসুর প্রবল প্রভাব। তাঁহার প্রথম নাটক 'রামাভিষেক' রচিত হয় ১৮৬৭ খ্রীঃ। ইহার পর হইতে ১৮৮৯ খ্রীঃ পর্যন্ত মনোমোহন বসু অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ রচিত রাসলীলা গীতিনাট্যই তাঁহার সর্বশেষ দান। মনোমোহনবাবু আদিযুগের নাট্যকারগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নাটক রচনায় নবরীতির প্রবর্তক। বাঙ্গালা নাটকের বিকাশ ও পরিপুষ্টি-সাধনের যথার্থ পথটি তাঁহারই আবিষ্কার। কোন একটা জটিল সামাজিক সমস্যা লইয়া নাটক রচনা করিলে কিছুদিনের জন্য রঙ্গমঞ্চে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে কিন্তু নাটককে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের মূল উৎস রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের আশ্রয় লইতে হইবে। প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শকে যুগোপযোগী করিয়া সাহিত্যে রূপ দিবার একটা প্রয়াস মনোমোহনবাবুর প্রত্যেক নাটকে দেখা যায়। তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ পঙ্কিলতা ঘাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই পঙ্কিলতার গাঢ় ছাপ তাঁহাদের সৃষ্টির সৌন্দর্য ম্লান করিয়া দিয়াছে। মনোমোহনবাবু ধ্বংসমূলক পদ্ধতি ছাড়িয়া গঠন-মূলক রীতি অবলম্বন করিলেন। বহু বিবাহের দোষ দেখাইয়া রাম-নারায়ণ নবনাটক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নাট্যকার বাস্তবের উপর শুধু রঙ ফলাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বাঙ্গালাদেশের পচা পানাপুকুরের উৎকট দুর্গন্ধও স্থানে স্থানে মাখাইয়া দিয়াছেন। রামাভিষেক নাটকে মনোমোহনবাবু একমাত্র পত্নী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অচঞ্চল প্রগাঢ় প্রেমের চিত্র আঁকিলেন। ইহাতে বহুবিবাহের আবিলতার পরিবর্তে পত্নীপ্রেমের স্বর্গীয় সৌরভ আছে যাহার উন্মাদনায় রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া বৌবাজার থিয়েটারে হাজার হাজার দর্শকের ভিড় জমিয়া যাইত। মনোমোহনবাবু বাঙ্গালা নাটকে আদর্শবাদের প্রথম প্রবর্তক। তিনি যে রীতিটি দেখাইয়া দিলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর নাট্য-প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশলাভ করিয়া আসিতেছে।

'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার বৎসরেই গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক সৃষ্টি 'রাবণবধ' প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। ১৯১২ খ্রীঃ গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু, তাঁহার শেষ দান 'তপোবল' ঐ বৎসরের রচনা। বাঙ্গালা নাটক এতদিন একটি মাত্র ধারায় বহিয়া আসিতেছিল, ১৮৮১ খ্রীঃ তাহা দুইভাগ হইয়া গেল। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও মাইকেল মধুসূদন-প্রবর্তিত ধারাটি বাঙ্গালার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দাবী মিটাইতে অগ্রসর হইল, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভা ইহার পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতে লাগিল। ইহার পাশে যে নূতন ধারাটির উদ্ভব হইল তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। ১৮৮১ হইতে ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া তাহা ধীরে ধীরে আপনার নিজস্ব রীতির ভিতর দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদের মত লোকচিত্তে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিবার, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প লইয়া নাটক রচনায় ব্রতী হন নাই। আপনার নিভৃত সাধনকুঞ্জ ছাড়িয়া তিনি কোলাহলমুখর রঙ্গমঞ্চে গিয়া দাঁড়ান নাই, সামাজিক সমস্যার আবিলতার মাঝখানে আপনাকে টানিয়া আনেন নাই। রবীন্দ্র-নাথের প্রত্যেকটি নাটক—তাঁহার উন্নত অভিজাতরুচির স্নিগ্ধোজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত হইয়া নিজস্ব গৌরবে স্বতন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহার সম-সাময়িক নাট্যকারগণ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা-সৃষ্টির দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছিলেন। অনেক সময় বীণাপাণির হাতের বীণা কাড়িয়া লইয়া উন্মত্ত কদর্যতার মাঝখানে তাঁহাকে টানিয়া আনিতে দ্বিধা করেন নাই। সামাজিক সমস্যাকে প্রাণমাতানো করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের স্বভাব-সিদ্ধ দুর্বলতার সুযোগ লইয়াছেন, বাস্তবকে যথেচ্ছরূপে বিকৃত

করিয়াছেন এবং হাস্যরস সৃষ্টি করিতে গিয়া অশ্লীলতার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালীর নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রচেষ্টাও কোন উল্লেখযোগ্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে শেক্সপীয়রের অনুবাদ ও অনুকরণের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (Merchant of Venice), বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' (Comedy of Errors), মহাকবি হেমচন্দ্রের নলিনীকান্ত (Romeo-Juliet) প্রভৃতি অনুবাদগ্রন্থ নামে মাত্র পর্যবসিত। ইংরেজী হইতে অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষকৃত ম্যাক্‌বেথ-এর অনুবাদই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে মূলের সৌন্দর্য ও রস অনেকটা অবিকৃত আছে অথচ ভাষার স্বাভাবিকত্বও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা একসময়ে অভিনয়েও বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকের বিকাশ ও পুষ্টিসাধনে এই সকল অনুবাদ গ্রন্থের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। অনুবাদ অপেক্ষা অনুকরণ আরও শক্ত কাজ। অনুকৃতের রচনা ভাল করিয়া পড়িলেই চলে না, তাঁহার সহিত এক রসের রসিক ও এক ভাবের ভাবুক হইতে হইবে। গিরিশচন্দ্রের জনা শেক্সপীয়র কৃত Coriolaunus নাটকের বীরমাতা Volumnia-র আদর্শে অঙ্কিত। কিন্তু ইংরেজী নাটকের এই মৃদুস্বভাবা সংযতবাক্ মহীয়সী নারীর চরিত্রে সুকোমল মাতৃত্ব ও সুকঠোর বীরধর্মের যে অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়, জনা নাটকে তাহার লেশমাত্র নাই। জনা চরিত্র একেবারে নারীত্ববর্জিত একটা একটানা মত্ততার উচ্ছ্বাসমাত্র। গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রকে ছাপাইয়া সুর চড়াইতে গিয়া বীণার তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির একমাত্র সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর অনুকরণ ক্ষীরোদ-প্রসাদের নরনারায়ণ। ক্ষীরোদপ্রসাদ শেক্সপীয়রের কলা-কৌশল সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন, মহাভারতের আদর্শকেও অম্লান রাখিয়াছেন।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় অনুবাদ ও অনুকরণের ধার দিয়াও চলেন নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রসসৃষ্টি। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে ধারকরা মামুলি গতের মোহ এড়াইয়া সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ এই প্রাচীন উক্তিটার উপরই বেশি নির্ভর করিয়াছেন। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা রসসৃষ্টির পথে বিষম অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কালিদাসের শিষ্য। লেখনীর এরূপ আশ্চর্য সংযম কালিদাসের রচনা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁহার যৌবনকালে রচিত নাটক ও নাট্যকাব্যগুলির প্রকাশ-ভঙ্গী এবং শব্দবিন্যাস-প্রণালীও অনেকটা কালিদাসী ধরণের। কালিদাসের প্রভাব সব চেয়ে বেশিমাত্রায় পড়িয়াছে 'বিদায় অভিশাপ' নাটকে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মুখ্যত জাতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও যে ইহা একেবারে পাশ্চাত্য প্রভাববর্জিত এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বরং পাশ্চাত্যভাব প্লাবিত যুগে এরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে ইবসেন-রচিত A DOLL'S HOUSE নাটকের নোরার প্রভাব কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনুমান ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অর্জুন যে একদিন তাহাকে কুরূপা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন চিত্রাঙ্গদা সে-কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। তাই অর্জুনের প্রেমের মধ্যে রূপলিপ্সাকেই সে বড় করিয়া দেখিতেছে, অর্জুনের সহিত ব্যবহারে তাঁহার রূপলিপ্সাতেই সর্বদা ইন্ধন যোগাইতেছে। চিত্রাঙ্গদার মনের মধ্যে অহরহ যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে কবি তাহাকে অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। তাহার হৃদয় প্রেমতৃষ্ণায় ফাটিয়া যাইতেছে, সৌন্দর্যলোভী অর্জুনের সম্ভোগলালসা তাহার ভিতরের নারীপ্রকৃতিকে বারবার পীড়িত করিতেছে। চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলিতেছে :

সপত্নীরে—
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসর-শয্যায় ; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে' লও।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে সত্যই ভালবাসিয়াছেন। নির্জন অরণ্যে প্রিয়াকে উপভোগ করিয়াই তিনি তৃপ্ত নন। তিনি তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া সহধর্মিণীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রেমকে গৌরবমণ্ডিত করিতে চান। কিন্তু অর্জুনের প্রেমের উপর চিত্রাঙ্গদার দারুণ অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসকে ভান বা অভিমান বলা চলে না, ইহা অর্জুন-কৃত তাহার পূর্ব প্রত্যাখ্যানের বেদনাময় ফল। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলিতেছে :

গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা থাকে তাই—
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে ?

নারী-হৃদয়ের এই বিদ্রোহ, নারীর এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় না ! চিত্রাঙ্গদায় নোরার ছায়াপাত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের আরও দুই চারিটা স্থানে ইবসেনের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। THE WARRIORS OF HELGELAND ইবসেনের একখানি প্রসিদ্ধ রোমাণ্টিক নাটক। ইহা ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে রচিত এবং ইহার বিষয়বস্তু স্কাণ্ডিন্যাভিয়ার প্রাচীন বীর ও বীরাঙ্গনাদের জীবনচিত্র। গানারের স্ত্রী কিন্তু সিগার্ডের প্রণয়িনী বীরাঙ্গনা হিয়র্দিসের সহিত চিত্রাঙ্গদার খানিকটা সাদৃশ্য আছে, মনে হয়। হিয়র্দিস প্রণয়ী সিগার্ডকে বলিতেছে—I love you, and dare say so now without a blush, for mine is not the light love of a weak woman.

চিত্রাঙ্গদা তাহার প্রেমের কথা মদনকে শোনাইতেছে :

এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে নারী নির্বাক ধৈর্যে চির মর্মব্যথা—
নিশীথ নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা আমি সে-রমণী নহি ;

হিয়র্দিস বলিতেছে,—I will put on my armour and follow you wherever you choose to go. ... as a splendid Valkyrie will I follow you—urge you on to fight and to a hero's deads, so that your name may be famed abroad ; when swords are flashing I will stand by your side, and will go with your warriors across the stormy seas wherever fate may lead you ; and when your funeral song is sung, it shall honour Sigurd and Hjordis together !" (তৃতীয় অঙ্ক) এই অংশ পড়িতে পড়িতে চিত্রাঙ্গদার উক্তি মনে পড়ে—

সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে

রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভৃত্যরূপে
করিতাম সেবা, ক্ষত্রিয়ের আর্তত্রাণ
মহাব্রতে হইতাম সহায় তাঁহার।

ইবসেনের নাটকের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোন কোন নাটকে এরূপ অল্প বিস্তর সাদৃশ্য দেখা যায়। ইবসেনের THE LADY OF THE SEA নাটকের নায়িকা এলিডা এক অলৌকিক ভাবরাজ্যের অধিবাসিনী। বাল্য প্রণয়ী অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল নাবিকের প্রতি যুগপৎ তাহার দুর্নিবার আকর্ষণ এবং নিদারুণ ভয়, অন্ধকার মধ্যরাত্রে নির্জন উদ্যানে তাহার সহিত মিলনের আহ্বান 'রাজা' নাটকের সুদর্শনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার রহস্যময় প্রণয়ীর কথা স্মরণ করিয়া এলিডা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—'Oh, how can I feel! I only know that to me that he is terror,' 'oh! this misery—this horror! This horror!" অথচ তাহার আহ্বান অমান্য করাও যে তাহার পক্ষে অসম্ভব। অগ্নিকাণ্ডের সময় আগুনের উজ্জ্বলদীপ্তিতে সুদর্শনা প্রথমবার রাজাকে দেখিল—"ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়।" সাদৃশ্য কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয়বস্তু ও আদর্শ একেবারে ভিন্নপ্রকৃতির। প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথাও বলা যাইতে পারে যে, ইবসেনের কোন নাটকই দৃশ্যে বিভক্ত নয়, বড় বড় অঙ্কে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই দৃশ্যবিভাগ দেখা যায় না। 'নটীর পূজা' 'বাঁশরী' প্রভৃতি নাটক বড় বড় কতকগুলি অঙ্কে বিভক্ত। তা ছাড়া ইবসেনের অপূর্ব কবিত্বময় গদ্যের উপমা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যেই মিলিবে।

রূপক নাট্য রবীন্দ্রনাথের এক অভাবনীয় সৃষ্টি। ইহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। নাটকগুলি ভাব ও রসবৈচিত্র্যে অতুলনীয় হইলেও তেমন অভিনয়োপযোগী নয়। নাটকের প্রাণস্বরূপ যে য়্যাক্‌সন্ তাহা পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে, য়্যাক্‌সন্ গৌণ এবং আইডিয়াই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতিরিক্ত সাব্‌জেক্‌টিভিটি-র চাপে নাটকীয় চরিত্রগুলি একেবারে বৈচিত্র্যহীন, সবাই যেন এক ছাঁচে ঢালা। বাস্তব জগতের বৈচিত্র্যময় আবেগময় স্পন্দন ইহাদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। রূপকনাট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে অভিনয়োপযোগী বোধ হয় 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'। 'ডাকঘর' ইউরোপে সমাদর ও সাফল্যের সহিত অভিনীত হইলেও ইহা একেবারে নাট-ধর্মবিবর্জিত। কিন্তু ডাকঘরের অতুলনীয় কবিত্ব পাঠক ও দর্শকের মন সহজেই আকৃষ্ট করে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যগুলিকে নাটক না বলিয়া এক শ্রেণীর কাব্য বলাই অধিকতর সঙ্গত। আর একটা লক্ষ্য করিবার জিনিস এই যে, প্রত্যেক রূপকটি কবির অন্তর্জীবনের বা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কোন না কোন সমস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তর্জীবনের সমস্যা—অরূপের সহিত রূপজগতের বিরোধ, বার্ধক্যের সহিত যৌবনের বিরোধ, ইহাদের সমাধান 'রাজা' ও 'ফাল্গুনী' নাটকে। 'ঋণশোধ' বা 'শারদোৎসব'-এ কবি-প্রকৃতির সৌন্দর্যরহস্যকে আপনার মনোমত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কবিত্বময় দার্শনিকতা। প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তকরবী, দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্যা লইয়া রচিত। কিন্তু সমস্যা এখানে তাহার হাড়-বের-করা উৎকট রূপ লইয়া দেখা দেয় নাই, কল্পনা সঙ্গীত ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব রসবস্তু-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় শিল্পী, তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ও রসানুভূতি যে কতদূর সূক্ষ্ম তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার রূপকনাট্যগুলি সকলের আগে পড়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপক-নাট্য লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। আমাদের দেশের একটা সংস্কার এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন কিছু বাহির হইলেই তাহার মূল খুঁজিবার জন্য আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে ছুটি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনভিজ্ঞ সমালোচকদের মুখে একটা ধুয়া প্রায়ই শোনা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যের উপকরণ বেশির ভাগ আহরণ করিয়াছেন পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে। কুমুদনাথ দাস তাঁহার RABINDRA NATH—HIS MIND AND ART নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অংশবিশেষের সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের খ্যাতনামা অখ্যাতনামা কবিগণের রচনার অর্থগত সাদৃশ্য টানিয়া বুনিয়া বাহির করিয়াছেন এবং ঐ অংশগুলিকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব বলিয়া অসঙ্কোচে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এরূপভাবে বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বোঝা হইবে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গোড়ার দিকের একান্ত সত্য কথাটা এই যে, তিনি ভারতীয়—তিনি বাঙ্গালী। যে মাটিতে জন্ম—সেই মাটি হইতেই রস আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা পরিপুষ্ট হইয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যে মেটারলিঙ্কের প্রভাব সমালোচক-মহলে একটা প্রবাদবাক্যের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ক হইতে রূপকসৃষ্টির প্রেরণা পর্যন্ত পাইয়াছিলেন কি-না সন্দেহের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র রচিত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। প্রিয়রঞ্জনবাবুর মতে এই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকখানিই রবীন্দ্রনাথকে রূপক রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর এই নাটকখানির কোন প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর রূপক, রক্তমাংসের মানুষের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবর্জিত। রবীন্দ্রনাথের রূপক তো সেরকম নয়। কি কাব্যে, কি নাটকে, নরনারীর স্বাধীন হৃদয়াবেগকেই তিনি বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রচলিত নীতিবাদের ধুয়াকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে—নির্জলা নীতিউপদেশ। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য ইহারাই নাটকীয় ব্যক্তি। ইংলণ্ডে একসময় Mystery Play-র প্রচলন ছিল, প্রবোধচন্দ্রোদয় সেই জাতীয় রচনা।

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য খাঁটি ভারতীয় শিল্প। ভারতবর্ষ রূপকের দেশ। ভাস্কর্যে চিত্রশিল্পে কাব্যে নাটকে দর্শনে ভারতবর্ষের প্রতিভা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া রূপক সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদে উপনিষদে রূপকের অভাব নাই। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ একটা রূপকের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয়গণের দেবমূর্তির বিচিত্র পরিকল্পনাগুলি নিছক রূপক মাত্র। ভারতীয় ভাস্কর্যের সিংহমূর্তি রাজশক্তির প্রতীক সুতরাং রূপক। পুরী ভুবনেশ্বর কোণারকের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ কামকলাত্মক চিত্রগুলির অনেক রকমের রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যা দেশে প্রচলিত আছে। বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা এই ছোট খাট বাঙ্গালা দেশের দিকে তাকাই তাহা হইলেও দেখি রূপক সৃষ্টি করিবার নেশা বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক কিছু কম ভর করে নাই। চর্যাপদের যুগ হইতে বৈষ্ণব যুগের অবসানকাল পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানত রূপকসৃষ্টির ধারা অবলম্বন করিয়া রহিয়া আসিয়াছে। ইংরেজ অধিকারের পর—পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্জয় প্রভাবের ফলে বাঙ্গালী প্রতিভার রূপক সৃষ্টির করিবার ঝোঁক একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী আবার ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। কৃষ্ণ চরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যা বাদ দিয়াও—তাঁহার অন্যান্য সাহিত্যিক রচনার মধ্যে রূপক সৃষ্টির প্রচেষ্টা যথেষ্ট দেখা যায়। আনন্দমঠ ও কমলাকান্তের দপ্তরে ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশাকানন একটি সুসংবদ্ধ রূপক কাব্য। সুতরাং আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া একথা বলিতে সাহস হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে রূপক ধার করিয়া আনিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে যে একটি চিরন্তন ধারা

ধীরে ধীরে কাজ করিয়া আসিতেছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভার সংস্পর্শে তাহাই অভিনব রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য একদিকে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক রূপ, অপর দিকে তেমনি ইহা রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি স্বাভাবিক পরিণতির নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ কোন সাময়িক খেয়ালের বশবর্তী হইয়া একবারেই রূপকনাট্য সৃষ্টি করিয়া বসেন নাই। প্রথম 'রূপকনাট্য 'শারদোৎসব' ১৯০৯ খ্রীঃ রচিত ও প্রকাশিত হয় কিন্তু ইহার পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা রূপকের জাল বুনিতে শুরু করিয়াছে। প্রথম যৌবনের রচনা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'তারকার আত্মহত্যা'—কবিতাদুটি রূপকধর্মী। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করিবেন না, কারণ ইহার মধ্যে যে-গল্পটা আছে গল্প-হিসাবে তাহা একেবারেই নগণ্য, একটা বিশিষ্টভাবের প্রতীকমাত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের সোনার তরী, হিং টিং ছট্, দেউল, হৃদয়-যমুনা—কবিতাগুলি নিছক রূপক। রূপক সুস্পষ্টভাবে জমিয়া উঠিয়াছে 'খেয়া'র মধ্যে। ইহার সব কবিতাই রূপক, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'আমার নাই বা হোল পারে যাওয়া'—গান, শুভক্ষণ, অনাবশ্যক, বালিকাবধূ, সবপেয়েছির দেশে—প্রভৃতি কবিতার নাম করা যাইতে পারে। পরবর্তী কালে রচিত কোন কোন রূপক-নাট্যের উপর—খেয়ার রূপককাব্যের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রসিদ্ধ গল্প 'একটা আষাঢ়ে গল্প' ও 'শেষের রাত্রি' রূপক। এই গল্প দুইটি অবলম্বনে 'তাসের দেশ' ও 'গৃহপ্রবেশ' রচিত হইয়াছে। এরূপ ধারাবাহিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে রূপকসৃষ্টির প্রচেষ্টা আর কোনও ভারতীয় কবির রচনায় দেখা যায় না।

পূর্বগামী ও সমসাময়িক বাঙ্গালী নাট্যকারদের লেশমাত্র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাই। তাঁহার প্রবর্তিত নাট্যরীতিটির উৎপত্তি তাঁহার প্রতিভা হইতে। রবীন্দ্রনাথ নিজের হৃদয় হইতেও নর-নারীর হৃদয় হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন বাহির হইতে তাঁহাকে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে তখন তিনি তাঁহার যুগকে লঙ্ঘন করিয়া বহু শতাব্দী আগেকার রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রকেই অবলম্বন-রূপে ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যগুলির জন্ম তাঁহার ব্যক্তিগত চিন্তা ও অভিজ্ঞতা হইতে, এ বিষয়ে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন দেশের সাহিত্যের নিকট তিনি বিশেষভাবে ঋণী নন। তাঁহার প্রহসনগুলিও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রহসন রবীন্দ্রনাথের আগেও অনেক ছিল, তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারগণও অনেক উৎকৃষ্ট প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকল প্রহসন প্রায়ই-কুরুচিদুষ্ট, তাহা এক শ্রেণীর লোককে হাসায় আর এক শ্রেণীর লোককে কাঁদায় এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যের আবহাওয়াকে দুষিত করিয়া তোলে। বাঙ্গালা প্রহসনে অশ্লীলতাবর্জিত বিশুদ্ধ হাস্যরসের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা এবং হাস্যকৌতুক এই কয়টি তাঁহার হাস্যরস-প্রধান রচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে ধীরে ধীরে কাজ করিতেছে। শিক্ষিত সাহিত্যরসিক সমাজেই তাঁহার নাটক অভিনীত হয়। তাঁহার প্রভাবে বাঙ্গালার নাটক রচনার রীতিও ধীরে ধীরে বদলাইয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক নাট্যকারগণ চরিত্রসৃষ্টিতে বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাব বা প্রবৃত্তির প্রতীক মাত্র। ফলে তাহারা একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তব মানুষ কিন্তু এরূপ নয়। মনের মধ্যে নানা প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাহিরের ঘটনাবলীর প্রভাবে চরিত্রের ক্রমবিকাশের চিত্র রবীন্দ্রনাথই প্রথম আঁকিলেন। আধুনিক যুগের বাঙ্গালা নাটকের বিকাশসাধনে তাঁহার দুইটি দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) ভাষা ও উচ্ছ্বাসের সংযম, (২) মনোবিশ্লেষণমূলক চরিত্রসৃষ্টি। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মন্মথ রায়ের রচনার উপর রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের প্রভাব বেশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের মধ্যেই অনেক বড় বড় নাট্যকারের অভ্যুদয় ও অবসান ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যুগ এই সবেমাত্র শুরু হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নাটক সৃষ্টির প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার পরিবার হইতে। তাঁহার দুই বড় ভাই—গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যামোদী এবং নাটকাভিনয়ের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছু পূর্বে তাঁহাদের বাড়ীতে The Committee of Five নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির কার্য ছিল নাটকাভিনয় ও নাটকরচনায় উৎসাহদান। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' গুণেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল (১৮৫৮)। নাট্যকারকে তিনি দুই শত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সেকালের নাট্যকারদের রচিত অনেক নাটকই অভিনীত হইয়াছিল। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী ইহাদের অন্যতম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী, সরোজিনী ও অলীকবাবু এই কয়টি তাঁহার মৌলিক রচনা। প্রথম তিনখানি নাটক তাঁহার স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটকগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। মনে হয়, এই অনুবাদগুলিই সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের যোগসূত্র-স্বরূপ।

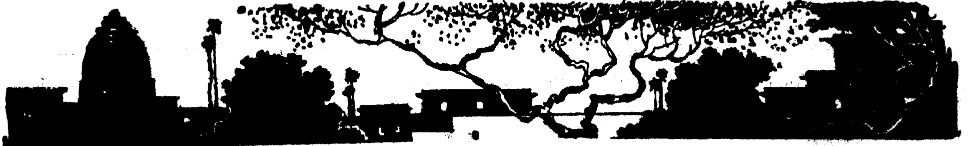
রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্য-কাব্যজাতীয় রচনার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। শোধবোধ, ঋণশোধ, অরূপরতন, গুরু, পরিত্রাণ ও তপতী এই ছয়খানি নাটককে গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ এগুলি তাঁহার আগেকার মৌলিক রচনার পরবর্তী মার্জিত ও সংশোধিত রূপ। এগুলি শুদ্ধ ধরিলে রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকের সংখ্যা সবশুদ্ধ একচল্লিশ। নাটকগুলি একশ্রেণীর রচনা নয়, কবির একপ্রকার মনোভাব হইতে উদ্ভূত নয়। সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের রুচি ও মনোভাব বার বার পরিবর্তিত হইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে এই পরিবর্তনের ছাপ গাঢ়ভাবে পড়িয়াছে। কবির এই মানসিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে নানা স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। নাটকগুলির প্রকৃতি অনুসারে ইহাদিগকে নীচের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইল:

১। প্রথম যৌবনের রচনা: বাল্মীকি প্রতিভা হইতে বিসর্জন পর্যন্ত (১৮৮১—১৮৯১)।

২। নাট্য-কাব্য: চিত্রাঙ্গদা হইতে কাহিনী পর্যন্ত (১৮৯১—১৯০০)।

৩। রূপক-নাট্য: শারদোৎসব হইতে রক্তকরবী পর্যন্ত (১৯০৮—১৯২৬)।

৪। শেষবয়সের রচনা: শোধ-বোধ হইতে চণ্ডালিকা পর্যন্ত (১৯২৬—১৯৩৩)।



একই ধারা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সনাতনী কালীকিঙ্করবাবু বলিলেন—একালের ছেলেমেয়েদের সবই উদ্ভট দেখছি। কি যে তারা ভাবে!

আধুনিক-মনোজ সকৌতুকে বলিল—কোনোখানেই তারা উদ্ভট নয়। মনে-প্রাণে তারা শাস্ত্র-পুরাণ মেনে চলে, ঠাকুর্দ্দা!

কালীকিঙ্করের দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! বলিলেন—ছাই মানে! তুমি যে কীর্ত্তিটি করেছো বাপু ··· জানি না ··· হুঁঃ!

উষ্মার তাপে কথার সূত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

হাসিয়া মনোজ বলিল—রাগ করলে তো হবে না! অর্জ্জুনের নজীর আছে! অর্জ্জুনকে অশাস্ত্রীয় বলতে চান্?

কালীকিঙ্কর কথার জবাব দিলেন না ··· গড়গড়ার নলটা মুখে পুরিলেন!

মনোজের এই শাস্ত্র-পুরাণ মানার কথা বলিতেছি। কিন্তু সে-কথা বলিতে গেলে সুমিত্রার কথা আগে বলিতে হয়।

পাঠক-পাঠিকা ক্ষমা করিবেন—হাই-লাইফের এলাকার পরিচ্ছেদ। আধুনিকতার তরঙ্গ-লীলার উৎস খুঁজিতে গেলে পথিককে ঐ হাই-লাইফের তুঙ্গ-শিরে উঠিতে হইবে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বালিগঞ্জে মস্ত কম্পাউণ্ড-ওয়ালা বাড়ীর দোতলার ঘরে সুমিত্রা বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কেশ-প্রসাধন করিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা-সিনেমা-গল্পের ষ্টাইলে কণ্ঠে গানের কলি উৎসারিত ···

সুমিত্রা গাহিতেছিল—

> ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
> আমার মুখের আঁচলখানি।
> ঢাকা থাকেনা হায় গো
> তারে রাখতে নারি টানি!

মা আসিয়া ডাকিলেন—সুমি ···

—মা ···

মা বলিলেন—তুই নাকি বেরুচ্ছিস্?

—হ্যাঁ।

—তার মানে?

সুমিত্রা বলিল—তোমাদের বাড়ীতে এখনি হট্টগোল সুরু হবে···সে হট্টগোলে আমার দারুণ অরুচি।

মার বিস্ময়ের সীমা নাই: সেই সঙ্গে বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—হট্টগোল কিসের! ··· পার্টি! পাঁচজন আসবে ···

সুমিত্রার কেশ-সজ্জা শেষ হইয়াছিল—মার পানে চাহিয়া সুমিত্রা বলিল—সে পাঁচজনকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মা। আসল কথা, তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা করছো ··· আর যে-পাঁচজন তোমাদের প্রসাদ-প্রার্থী হয়ে নিত্য এখানে যাতায়াত করে, তারা যে তোমার মেয়ের যোগ্য পাত্র নয় ··· এ-কথা তোমরা কেন বোঝো না ····

মা বলিলেন—এত অহঙ্কার তোর কিসের, শুনি? ··· এদের মধ্যে কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ প্রোফেসর, কেউ উকিল ···

হাসিয়া সুমিত্রা বলিল—বাইরে যিনি যে-কাজই করুন, সকলের একটি মাত্র লক্ষ্য ··· সে-লক্ষ্য তোমাদের ঐশ্বর্য্যের দিকে! বাপের একটি মাত্র মেয়ে ··· এবং সে-মেয়ের বাপের আছে অগাধ ঐশ্বর্য্য!

রাগে মার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল! মা বলিলেন—টাকা তো আর কারো নেই ··· শুধু তোমাদেরই যা আছে! ··· আদর দিয়ে উনি তোমার আস্পর্দ্ধা যতই বাড়িয়ে তুলুন, তবু এই ভেবে আমি অবাক হই যে লেখাপড়া শিখে সহজ-বুদ্ধি তোমার কখনো জাগবে না!

সুমিত্রা বলিল—সে সহজ-বুদ্ধি জেগেছে মা ··· আর জেগেছে বলেই আমার আশ্চর্য্য লাগে যে আমার জন্য তোমরা মানুষের মতো মানুষ না খুঁজে এই সব মাটীর পুতুল খুঁজছো ···

—মাটীর পুতুল!

—নয়? যারা বাঁধা এটিকেট মেনে চলে—সাজপোষাকে ক্রটি রইলো কি না, এই চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ তন্ময় ··· যাদের কথা গ্রামোফোনের বাঁধা-বুলির মতো, হাসি দম-খাওয়া পুতুলের হাসির মতো ··· তাদের তুমি মানুষ বলো, মা!

কথাটা বলিয়া সুমিত্রা এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না ··· চলিয়া গেল।

মা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ···

একটু পরে নীচে গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী-ষ্টার্ট করার শব্দ ··· চমকিয়া মা আসিয়া দাঁড়াইলেন খোলা খড়খড়ির সামনে এবং তাঁর শূন্য নয়নের দৃষ্টির সামনে দিয়া টু-সীটার গাড়ী হাঁকাইয়া মেয়ে সুমিত্রা ফটক পার হইয়া পথে বাহির হইল।

মার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তীব্র জ্বালা ··· মা গিয়া ঢুকিলেন সুমিত্রার বাপ অতুলানন্দর ঘরে। বলিলেন—নাও, যেমন আস্পর্দ্ধা দেছ মেয়েকে, করো এখন তার ফল ভোগ!

অতুলানন্দ কি-একটা বিল্ দেখিতেছিলেন ··· মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি হলো আবার?

মা বলিলেন—এদিকে পার্টি করছো ··· মেয়ে ওদিকে টু-সীটার হাঁকিয়ে হাওয়া খেতে বেরুলেন!

অতুলানন্দ বলিলেন—বেরুক্ না! এখন তো বেলা চারটে ··· তোমার পার্টি তো ছটায়!

মা বলিলেন—মেয়ে যে-লেকচার দিয়ে গেল, স্পষ্ট তাতে বলেই গেল, পার্টি তার চক্ষুশূল!

অতুলানন্দ কোনো জবাব দিলেন না ··· নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন।

মা বলিলেন—যতই বিলিতীয়ানা করো ··· বাঙ্গালীর মেয়ে ··· তাকে দেছ মোটর হাঁকাতে! যত সব অনাচার ··· অনাসৃষ্টি ····

কথাটা বলিয়া মা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অতুলানন্দ কিন্তু এ-কথায় টলিলেন না ··· তিনি চাহিয়া রহিলেন স্ত্রীর পানে ··· তাঁর দুচোখের দৃষ্টিতে ···

মা যদি সুস্থ-মনে তাঁর পানে চাহিতেন, তাহা হইলে হয়তো তাঁর মনে সন্দেহ জাগিত, ও-দৃষ্টিতে যেন কৌতুকের শিখা!

বালিগঞ্জ হইতে ওদিকে রসা রোড ধরিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে টু-সীটার চলিয়াছে ···

টালিগঞ্জের ডিপো পার হইয়া গাড়ী ধরিল পূর্ব্বমুখী পথ ··· রিজেণ্ট পার্কের সামনে দিয়া সোজা ··· অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্তরশ্মি মাঠে-বাটে গাছপালার মাথায় মাথায় যেন আবীর ঢালিয়া দিয়াছে!

সুমিত্রার ভালো লাগিল ··· গাড়ী থামাইয়া সুমিত্রা গাড়ী হইতে নামিল।

নামিয়া মাঠের উপর দিয়া চলিল, উত্তরদিকে ঘন পত্রপল্লবাকীর্ণ বেণুকুঞ্জের দিকে ···মাঠের বুকে ইতস্ততঃ বন-তরু-লতার ঝোপ··· নানা রঙের বিচিত্র ফুল ফুটিয়া আছে ··· ফুলের বুকে রবি-রশ্মিকণা পড়িয়াছে···মনে হইতেছিল, ছোট-ছোট ঝোপের মাথায় কে যেন দেওয়ালীর দীপ সাজাইয়া রাখিয়াছে! ··· একটা মাটীর ঢিপির উপরে বসিল সুমিত্রা ··· দিগন্তের পানে চাহিয়া চাহিয়া তার মুগ্ধ কণ্ঠে গানের বাণী ঝরিল···

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে?
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি
সবার কাছে।
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ডোরে
বাঁধলো মোরে গো ···

গাহিতে গাহিতে গান কখন্ শেষ হইয়াছে ··· গানের শেষে গানের সেই বাণী আর সুর বহিয়া মন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সুমিত্রার খেয়াল নাই! মন যেন মনে নাই ···

মন যখন মনে আবার ফিরিয়া আসিল, তখন স্তিমিত অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গেছে এবং পথে মোটরের হর্ণ বাজিতেছে!

সুমিত্রা চমকিয়া উঠিল ··· তার গাড়ীর হর্ণ, না?

তাই! কে হর্ণ বাজায়?

সুমিত্রা উঠিল ··· উঠিয়া গাড়ীর কাছে আসিল।

আসিয়া দেখে, রুক্ষ বেশ এক তরুণ বাঙ্গালী। সুমিত্রা বলিল—কি চাই?

যুবক বলিল—আপনার গাড়ী?

—হ্যাঁ···কথার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার ভঙ্গী দৃপ্ত হইল!

যুবক বলিল—ড্রাইভার দেখছি না!

—না।

—গাড়ী কে চালাবে?

—আমি নিজে ড্রাইভ করি।

—ও···

যুবকের কণ্ঠে যেন প্রচুর আরাম! যুবক বলিল—ভালোই হয়েছে···গাড়ীতে উঠুন···আমি ভারী বিপন্ন···আমাকে এখনি পৌঁছে দিতে হবে···সেই গড়িয়াহাটের মোড়ে যে বৌদ্ধ-মন্দির আছে···মানে, লোকের কাছে···সেইখানে। উঠুন···উঠুন···

কথা শেষ করিয়া যুবক নিঃসঙ্কোচে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল··· সুমিত্রা স্তম্ভিত!

যুবক বলিল—গাড়ীতে উঠে বসুন—আপনি গাড়ী চালাবেন ···আমি আমার বিপদের কথা বলবো! দয়া করে একমিনিট দেরী করবেন না···

সুমিত্রার মনে একরাশ কৌতূহল···সুমিত্রা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল···গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

গাড়ী চলিল। হু-হু হাওয়ার বেগে···

যুবক বলিল—পুলিশে তাড়া করেছে। দুদিন কোনোমতে লুকিয়ে ছিলুম···ঠিক ওরা সন্ধান পেয়েছে। ··· আপনি অবাক হচ্ছেন! অগাধ ঐশ্বর্য্যে আপনারা লালিত! দারিদ্র্য, ঋণভার ··· এ-সবের জ্বালা-যাতনা যে কী, তা তো বোঝেন না! সে জ্বালা অত্যন্ত অসহ্য হয়েছিল! চাকরি করছিলুম ··· সামান্য মাইনে ··· অথচ প্রত্যহ ষোলঘণ্টা করে খাটুনি! সে খাটুনির যা-কিছু লাভ, সে লাভ খাবেন মনিব। তাই ··· তার এ স্পর্দ্ধার শোধ নিয়েছি—তার নগদ দশ হাজার টাকা ··· নিয়ে চম্পট দিয়েছি! কেন নেবো না? তার টাকা বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে, অথচ এ-টাকায় আমার মুক্তি ··· স্বাচ্ছল্য! ··· কিন্তু মনিব শুনবে কেন? পুলিশে খপর দেছে ···। পুলিশ পাছু নেছে··· একটা রাত যদি সময় পাই ··· পুলিশকে দেখাবো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ··· হাঃ হাঃ হাঃ ···

কথা শুনিয়া সুমিত্রার বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! ···

গাড়ী থামাইয়া সে বলিল—তুমি চোর!

যুবক বলিল—চোর কে নয়? মনিব যখন আধ-পয়সার বদলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আদায় করে নেয়, সে চুরি করে না? ··· পৃথিবীতে যে যত বড় কৃতী, সে তত বড় চোর! হাঃ হাঃ হাঃ।

সুমিত্রার বুকে কাঁপন ··· চকিতে নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া লইয়া সুমিত্রা বলিল—নেমে যাও গাড়ী থেকে ···

যুবক বলিল—তার মানে? পুলিশের হাতে? যাবো কোথায়. শুনি? না, জেলে?

সুমিত্রা বলিল—জেলেই।···চোরকে আমি প্রশ্রয় দেবো, ভাবো?

যুবক বলিল—দেবেন না? নিশ্চয় দিতে হবে! না দিলে আমার সর্ব্বনাশ হবে! সেই সঙ্গে একটা ফ্যামিলি ···

—হোক্ সর্ব্বনাশ!

যুবক বলিল—তা হবে না, হে ধনাঢ্য-কন্যা! বিলাস-খেয়াল নিয়ে মত্ত থাকো তোমরা···তোমাদের আশেপাশে এই বিশীর্ণ দারিদ্র্য ··· সে দারিদ্র্য তোমার চোখের কোণে দেখতে পাও না! দেখতে চাও না! দেখলে ঘৃণায় শিউরে সরে যাও! ··· জানো, আমার বাবা দেনার দায়ে মরতে বসেছেন ··· মার মুখে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই! ছোট ভাই লেখাপড়া করতে পারছে না! আর তুমি টু-সীটার মোটরে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ! জানো, শুধু এ হাওয়া খেয়ে আমরা বাঁচতে পারিনা! ··· তোমার কাছে আমি পয়সা চাইছি না ·· তোমার গাড়ীতে একটু আশ্রয় দিয়ে আমার নিরাপদ করবে ···

আমায় মা-বাপ ভাই-বোনকে প্রাণ দেবে ··· ব্যস্! এটুকুও করতে পারবে না?···

সুমিত্রার মুখে কথা নাই!··· মনে হইতেছিল, দেহ-মন যেন ধীরে ধীরে পাথর হইয়া যাইতেছে!

যুবক বলিল—আমিও মোটর চালাতে জানি।··· ড্রাইভারের কাজ করেছি। তুমি না চালাও, তোমায় গাড়ী থেকে নামিয়ে নিজে আমি গাড়ী চালাবো ··· আমায় বাঁচতে হবে ··· সঙ্গে সঙ্গে ঐ দশ হাজার টাকাটাকেও বাঁচাতে হবে!···

সুমিত্রা নিস্পন্দ ··· নির্ব্বাক!

যুবক বলিল—ভেবে ছাখো, এখন কি করবে? গাড়ী তুমি চালাবে? না, তোমায় গাড়ী থেকে নামিয়ে এ গাড়ী আমায় চালাতে হবে?

সুমিত্রার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তীব্র কম্পন! হাত নড়িল,··· যন্ত্র-চালিতের মতো গাড়ীতে সে ষ্টার্ট দিল ···

গাড়ী চলিল।···সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ বাড়িল ··· আবার সেই হাওয়ার হু-হু বেগ!

একটা পুলিশ-ফাঁড়ি ··· তিন-চারজন লোক ··· হাতে টর্চ্চ-ল্যাম্প ··· পথের উপরে দাঁড়াইয়া আছে ··· আড়াল তুলিয়া! গাড়ী থামাইতে হইল।

একজন প্রশ্ন করিল—আপনারা?

চকিতের জন্য সুমিত্রার স্তম্ভিতভাব!

আর একজন বলিল—এ গাড়ীতে 'চোরাই মাল আছে। খবর পেয়েছি। মহিমরায় বলে স্যর প্রতাপনারাণের ড্রাইভার দশ হাজার টাকা চুরি করে টু-শীটারে চড়ে পালাচ্ছে···এই পথে··· সঙ্গে আছেন একজন ইয়ংলেডি!

সুমিত্রার বুকের মধ্যে যেন বাজ হাঁকিল ··· সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। সে আলোয় মস্ত সমাধানের উপায় যেন···

সুমিত্রা বলিল—হাউ ডেয়ার ইউ? আমার নাম সুমিত্রা দেবী ··· আমার বাবার নাম মিষ্টার অতুলানন্দ গুপ্ত!··· আপনারা বলতে চান ···

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—আপনার সঙ্গে এ ভদ্রলোকটি?

সুমিত্রা বলিল—আমার স্বামী।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশ ফাটিয়া কোথায় বাজ পড়িল! সে শব্দে পৃথিবী মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে ··· সুমিত্রা চক্ষু মুদিল অন্ধকার!···তার দেহ-মন ব্যাপিয়া ঘন-অবসাদের ভার!

চোখ চাহিয়া সুমিত্রা দেখে, ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া আছে ··· সামনে মা, বাবা ···

স্বপ্ন?

মা ডাকিলেন—সুমি ···

—মা···

মা বলিলেন—শরীর সুস্থ বোধ করছিস?

—হ্যাঁ। কিন্তু···

বাবা বলিলেন—কাল সকালে শুনিস'খন!···আজ থাক্।

মা বলিলেন—কিছু খাবি?

—দাও ··· এক গ্লাস জল শুধু ··· বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!

পরের দিন।

মা বলিলেন—তোমার মেজাজ বুঝে মনোজের সঙ্গে উনি কথা কয়েছিলেন। ওঁকে তুমি বলেছিলে পার্টির আগে বাড়ী থেকে চলে যাবে! সে কথা উনি আমাকে বলেন্ নি!··· বাড়ী থেকে তুমি চলে যাবে শুনে উনি মনোজকে ফোনে সে-কথা জানিয়ে বলেছিলেন বলেন, মেয়ে! তাকে তো এ-ব্যাপার নিয়ে শাসন করা যায় না। তাতে মনোজ বলে, আপনি ভাববেন না ··· আমি করবো উপায়—সঙ্গে সঙ্গে একটু শিক্ষা ··· আর তার সঙ্গে দেবো নিজের পরিচয়!

অর্থাৎ ···

মনোজ ঢুকিয়াছে আই-পিতে। চব্বিশ-পরগণায় এখন সে এ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ··· সুমিত্রার টু-শীটারের নম্বর জানে। সুমিত্রার টু-শীটারের পিছনে নিজের টু-শীটার চালাইয়া সে আসিয়াছিল ··· সতর্কভাবে ··· সুমিত্রার অলক্ষ্যে। তার পর সুমিত্রা মাঠে নামিয়া গেলে দূরে পুলিশ আউটপোষ্টে ব্যবস্থা করিয়া স্যর প্রতাপনারাণের চোর-ড্রাইভার পরিচয় দিয়া মনোজ আসিয়া ···

একটু রোমান্স! এ-বয়সে রোমান্সের লোভ সম্বরণ করা সহজ নয় ··· বিশেষ যেখানে বাড়ীর সাপোর্ট থাকে!

বিবাহের পর সুমিত্রা বলিল—এ ঠিক লভ্ নয়। মানে, কেমন একটা ··· অর্থাৎ কী, তা আমি ঠিক বলতে পারবো না! তবে যেভাবে তুমি আমার নিগ্রহ করেছিলে সেদিন ···

হাসিয়া মনোজ বলিল—ও-নিগ্রহ করেছিলুম বলে প্রজাপতির অনুগ্রহ মিললো। তাছাড়া পৌরাণিক নজীর আছে ··· সুভদ্রাকে অর্জ্জুন হরণ করেছিলেন ··· শ্রীকৃষ্ণ হরণ করেছিলেন রুক্মিণী দেবীকে! ··· তাঁদের সে-সব কীর্ত্তি ···

সুমিত্রা বলিল—থামো থামো, পুলিশের এ্যাসিষ্টাণ্ট-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট···নিজেকে তুমি ভাবো, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনের সমান! ··· তা ছাড়া সুভদ্রা দেবী অর্জ্জুনকে ভালোবাসতেন ··· রুক্মিণী দেবীও শ্রীকৃষ্ণের জন্য তপস্যা করেছিলেন!

হাসিয়া মনোজ বলিল—এ যুগে vice versa ··· এ যুগের শ্রীকৃষ্ণ করবেন রুক্মিণী দেবীদের জন্য তপস্যা ··· অর্থাৎ সে-নজীর মেনে আমিও তোমার জন্য তপস্যা করেছিলুম, তা জানো?

—কি রকম! আমাকে তুমি কবে চিনলে, জানলে ··· যে আমার জন্য তপস্যা করেছো?

মনোজ বলিল—তুমি টু-শীটারে করে বেড়াতে বেরুতে ··· নিজে ড্রাইভ করতে! দেখে আমার মনে হতো, সুভদ্রা দেবী এমনি ভাবেই রথ চালনা করতেন! কোনো দিকে তুমি চাইতে না ··· চমৎকার ড্রাইভ্ করার বিদ্যা আয়ত্ত করেছো! তোমাকে টু-শীটারে দেখে আমার মনে প্রথমে জাগলো সেই অতীতের স্বপ্ন-সুষমা! দেখতুম, যেন মহাভারতের সেই সুভদ্রা দেবী! তেমনি স্বচ্ছন্দ সুদৃঢ় ভঙ্গী! তাই থেকে জাগলো লভ্—তার পর পরিচয় নিয়ে একদিন তোমার বাবার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে দেখা

করলুম। ··· নিজের পরিচয় দিলুম ··· তোমাদের পাড়ায় বাড়ী নিয়ে সেই বাড়ীতে বাস করতে এলুম এবং তোমার বাবার হৃদয় জয় করলুম! তার পর একদিন সন্তর্পণে কম্পিত কণ্ঠে মনের আর্জী পেশ করেছিলুম! ··· উনি বললেন—চেনো না বাবা ··· মেয়েটি অত্যন্ত জেদী ··· তার উপর মেয়ের বিশ্বাস, ওর যে পাণি-প্রার্থনা করবে, তার সে প্রার্থনার মূলে থাকবে ওর বাবা অতুলানন্দের বিষয়-সম্পত্তি! ··· তিনি বললেন, মেয়ের এ পাগলামি যদি সারাতে পারো, ইউ টেক্ হার্ ···

সুমিত্রা নিঃশব্দে এ-কথা শুনিল ··· কোনো জবাব দিল না। মনে হইতেছিল, এ তো বিবাহ নয়—বিবাহ-নাট্য! এ বিবাহের অন্তরালে এত জল্পনা, এত চক্রান্ত চলিয়াছিল ···

মনোজ বলিল—আমাদের দেশের বরগুলো যতদিন না পণের মায়া ত্যাগ করে সম্মান-শ্রদ্ধা-ভরে কন্যাকে প্রার্থনা করবে, ততদিন তোমাদের উচিত বিলিতি কাপড়ের মতো তাদের বয়কট করা! ··· বরের দল বুঝুক, তারা এমন মূল্যবান নয় যে প্রচুর যৌতুক দিয়ে তাদের কণ্ঠ আকর্ষণ করতে হবে! কন্যার মূল্য বরের চেয়ে বেশী ··· এবং কন্যাকে লাভ করবার জন্য বর আসবে কন্যার কাছে তাঁর প্রসাদ-প্রার্থীর মতো!

চৈতন্য-বট কাশী

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

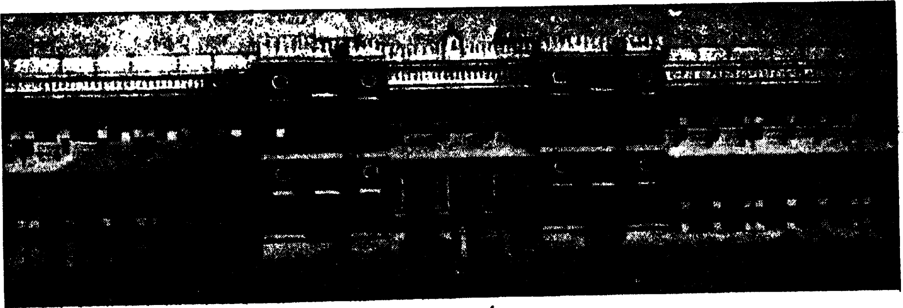
বারাণসী ভারতের সংস্কৃতির ও ধর্ম্মমতের উৎস। সেই জন্য ভারতের নব নব ধর্ম্মের সাধকগণ তাঁহাদের মত ও পথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বারাণসীতে আসন পাতিয়া থাকেন। বাঙ্গালার গৌরবনিধি প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বারাণসী আগমন করিয়া তথায় প্রেম-ভক্তির পতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছিলেন। বারাণসীর মত শৈব-পীঠেও বৈদান্তিক পণ্ডিতদের তিনি তর্কে ও জ্ঞানে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীতে আগমন করেন ১৪৩৬ শকাব্দে বা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে (চৈতন্যচরিতের উপাদান—২৩ পৃঃ)। চৈতন্যদেব প্রয়াগ হইতে কাশী আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে আসন পাতিয়াছিলেন এবং তপনমিশ্রের বাটী ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। সে কথা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে।

মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী;
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহির আসি।
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা;
আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা গেলা।
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা;
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
ভিক্ষা করায়ে মিশ্র কহে পায়ে ধরি;
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপাকরি।
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি;
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিব কতি।
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত যে রহিব
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব।
এত জানি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার;
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর।

(মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)

মহাপ্রভুর কাশীবাস কালেও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ছিলেন। এখানেই সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবন প্রকট করিবার যাবতীয় উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত চৈতন্যদেব পরিচয় করিয়া দেন।



এংলো বেঙ্গলী হাইস্কুল—কাশী

তপনমিশ্ররে আর চন্দ্রশেখরে;
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে।

চন্দ্রশেখরের ভীটার প্রাঙ্গণে বটবৃক্ষতলে বসিয়া সনাতনকে কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তিধর্ম্মের গুহ্যতত্ত্ব এবং অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা পরদিন বলিয়াছিলেন। সেই সব অমৃতবাণী শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতের ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রহিয়াছে।

ইহা প্রভুর শাস্ত্র প্রশ্ন করে সনাতন;
আপনি মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ।

এই স্থানেই পরম বৈদান্তিক পণ্ডিত স্বামী প্রকাশানন্দকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া দশসহস্র শিষ্যসহ চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং শৈব প্রধান বারাণসী ধামেও প্রেমের বন্যা ছুটিয়া গিয়াছিল।

সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন ;
প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে নর্ত্তন।
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার ;
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার।

(চৈ চ ; ২৫ পরি)

বারাণসী হইতে মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন, সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তারপর তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ গোস্বামী কাশীধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ও হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রচার করিবার নিমিত্ত চৈতন্যমঠ স্থাপন করেন।

ইহার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে শিখগুরু নানকের শিষ্য গুরুগোবিন্দ সিং কাশীতে যখন আগমন করেন তখন তিনি এই চৈতন্য মঠেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি প্রেমধর্ম্মের পরম অনুরাগী ছিলেন। সেই নিমিত্ত তদানীন্তন চৈতন্যমঠ অধিকারী তাঁহাকে সাদরে চৈতন্যমঠে রাখিয়াছিলেন। তদবধি গুরুগোবিন্দ সিংহের শিখ শিষ্যগণ এই স্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বাঙ্গালীর ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের



চৈতন্য-বট, কাশী

উদারতা ও ঔদাসীন্যে এই চৈতন্য মঠটি শিখ সম্প্রদায়ের দখলে চলিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে তপন মিশ্রের ভীটার উপর শিখ সম্প্রদায়ের আশ্রম রহিয়াছে, এই আশ্রমের তোরণে দেবনাগরী অক্ষরে 'চেতন মঠ' খোদিত আছে। সুস্পষ্ট না হইলেও লিপি পাঠ করিলে সহজে অনুমান হয় এই অক্ষর প্রায় দুইশত বর্ষের পুর্ব্বের খোদিত অক্ষর, ইহার ফটোও গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতের বৈষ্ণব সাধনার চারিটী প্রধান ধারার প্রবর্ত্তক রামানুজ, মাধবাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠকটী এই 'চৈতন্যবট' ও তপন মিশ্রের বাটির সন্নিকটেই এখনও রহিয়াছে। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের কয়েকখানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে যে—বল্লভাচার্য্যেরই বৈঠকের সন্নিকটে এক বট বৃক্ষতলায় বসিয়া মহাপ্রভু সনাতনকে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই 'জতনবট' বা 'চেতন বট' যে 'চৈতন্য বট', তাহা কাশীর অবাঙ্গালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অনুমান করেন।

চন্দ্রশেখরের ভীটাটী এখন কাশীর জনৈক পুরবাসী ভগবানদাসের অধিকারে এবং চৈতন্য বড়তলাটী বর্ত্তমানে বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির দখলে রহিয়াছে। এই মহল্লের প্রাচীন অধিবাসীগণ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থানে পুরাণ একটি বটগাছ দেখিয়াছেন এইরূপ তাঁহারা সাক্ষ্য দেন এবং অনেক দলিল ও কাগজে এই স্থানটি বহুদিন হইতে 'যতনবট', বা 'চেতন বট' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

উক্ত বটগাছের তলায় বহু শতাব্দী হইতে দুগ্ধ ও দধির একটি বাজার প্রত্যহ বসিয়া থাকে। এখনও সেই দুধ-দৈ-এর সট্টি (বাজার) নিয়মিত হয় এবং বেনারস মিউনিসিপ্যালিটী গয়লাদের নিকট হইতে দান (খাজনা) গ্রহণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গ যেখানে বহিয়াছিল সেখানে দুধ-দৈ এর বাজার বসা বিচিত্র নহে।

একটী বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার প্রাক্কালে এক গয়লার অনুরোধে 'তক্র' (ঘোল) পান করিয়াছিলেন এবং গয়লাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন এই স্থানে কেনা-বেচা করিলে সে লাভবান হইবে।

কাশী বাঙ্গালীর প্রিয় তীর্থ, কাশীতে চল্লিশ হাজারের অধিক বাঙ্গালী নর-নারী বাস করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় সেই কাশীধামে বাঙ্গালীর পরমগৌরব চৈতন্যদেবের স্মৃতিজড়িত স্থানটী ও চৈতন্য মঠটীর কোন সংবাদ বাঙ্গালী রাখেন না। প্রবাসী বাঙ্গালীরাই ত বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাধনার বর্ত্তিকাবাহক। কিন্তু তাঁহাদেরই ঔদাসিন্যে আজ সেই চৈতন্য-বটতলা ও চৈতন্য মঠ বিলুপ্ত।

মহাপ্রভু বিশ্বেশ্বরের রাজত্বে যে কৃষ্ণপ্রেমের স্রোত বহাইয়া গিয়াছিলেন এখনও তাহা ফল্গু নদীর ধারার ন্যায় অন্তঃসলিলা হইয়া রহিয়াছে। কাশীতে এখনও অনেক অ-বাঙ্গালী গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মপন্থী এবং চৈতন্যপ্রভুর পরম অনুরাগী। শ্রীমৎ গোপাল দাস আগরওয়ালা একজন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি এই চৈতন্য মঠটি উদ্ধারে তাঁহার সকল চিত্ত ও বিত্ত নিয়োগ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ও বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্য অল্প হইলেও অদম্য উৎসাহ ও গৌরগতপ্রাণ থাকায় তিনি এই 'চৈতন্যবট' সংরক্ষণে কিঞ্চিৎ সফল হইয়াছেন।

নানা গবেষণার ফলে তিনি 'চৈতন্য বট' ও চন্দ্রশেখরের ভীটা এবং তপন মিশ্রের ভীটায় স্থাপিত 'চৈতন্য মঠে'র স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের আন্দোলনের ফলে বেনারস মিউনিসিপ্যালিটীর দখলের স্থানের উপর তিনি সেই প্রাচীন চৈতন্য বটতলায় একটি পাথরের চাঁদনী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বেনারসের পৌরসভা এই স্থানে চৈতন্য মহাপ্রভু যে আগমন করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে একটি ছাদওয়ালা মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার সম্মতি দিয়াছেন। বেনারস মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৩৮ সালের ২৫শে জানুয়ারীতে গৃহীত ৪৮২ নং প্রস্তাব পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

Extract from the Benares Municipality's Resolution No 482 Dt 25. 1. 38.

Gopal Das applied on 12, 11. 37 requestiug that he may be allowed to built a covered Dalan at his own cost over the Chowbatra on which 'Satti Dudh Dahi' exists at 'Jatanbar', Kotwali ward saying that some pictures of Lord Gouranga will be provided on the walls to commemorate his presence in Benares on 1515 A. D. When he preached his doctrine to his desciple, * * *

Resolved that B. Gopal Das he allowed to bnild a covered Dalan at his own cost over the chowbatra on which 'Satti Dudh Dahi' exists at 'Jatan bar' Provided he writes a deed of disclaim and the 'Satti' will continue to be held along.

Further resolved a letter of thanks be sent to him.

সেই মতন বড়তলায় ২২´ লম্বা ১৩´ চওড়া একটি পাথরের চৌতারা ও তাহার উপর পাথরের তিন ফোকরওলা চাঁদনী এবং নিম্নে পোস্তা ও মাটীর তলে একটী ঘর নির্ম্মাণ গোপালদাসবাবু করিয়াছেন। চাঁদনীর উত্তর দিকে দেয়াল চন্দ্রশেখরের বাটীর সংলগ্ন। আর তিন দিক উন্মুক্ত। এই দেয়ালে তিনটি কুলঙ্গী রহিয়াছে। তাহার মধ্যটিতে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গদেবের প্রমাণ মূর্ত্তি দেয়াল গাত্রে অর্দ্ধ উত্তোলিত করিয়া (রিলিফ) সিমেণ্টে প্রস্তুত রহিয়াছে। ডান পাশের কুলঙ্গীর মধ্যে চৈতন্যদেব বটবৃক্ষতলে বসিয়া তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, বলভদ্র ভট্ট, রঘুনাথ ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতেছেন এই তৈলচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। বাম কুলঙ্গীতে প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গে প্রভু সকাশে উপস্থিত চিত্রটী অঙ্কিত করিয়া সব বারাণসীবাসী হরিনামে মাতিয়াছিলেন তাহারই নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে।

এই চাদনীর প্যারাপেট ও আলিসায়—বাঙ্গলায় বড় বড় অক্ষরে 'চৈতন্যমঠ',

> 'ষড়ভুজ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহেশ্বর,
> প্রেমভক্তি যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর।'
> 'হরে রাম, হরে রাম,
> রাম রাম, হরে হরে।'

প্রভৃতি লেখা রহিয়াছে। এই লেখা যে কেবল মহাপ্রভুকে স্মরণ পথে আনয়ন করে তাহা নহে—বাঙ্গালা ভাষারও মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

কাশীর প্রধান বাজার বিশ্বেশ্বরগঞ্জের সম্মুখ হইতে চৈতন্যবট বেড় দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, বেনারস মিউনিসিপ্যালিটি সেই রাস্তার নাম "চৈতন্য রোড" করিয়া মহাপ্রভুর কাশী আগমনের স্থানের স্মৃতিটী জাগরূক রাখিয়াছেন। বাঙ্গালী তার জন্য কৃতজ্ঞ।

গোপালদাসবাবু চন্দ্রশেখরের ভীটা ও তাঁর উপরিস্থ বাটীটী ক্রয় করিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য মঠ, পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লক্ষ্ণৌ সভাসমিতি রেজিষ্টার আফিস হইতে "দি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ মিশন" নাম দিয়া একটী সঙ্ঘ রেজিষ্টারি করিয়াছেন। এই সঙ্ঘের পক্ষে গোপালদাস বাবাজী বেনারস ল্যাণ্ড একুইজিসন কলেক্টার মহাশয়ের নিকট চন্দ্রশেখরের বাটী ক্রয় করিবার আবেদন করেন এবং ৭৫০০৲ মূল্যের বিনিময়ে সাধারণের উপকারার্থে এই বাটী জমি ক্রয় করিবার আদেশও হইয়া গিয়াছে। অর্থাভাবে তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

গোপালদাস বাবাজী • চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম ভেদ করিবার জন্য বঙ্গ ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী অ-বাঙ্গালীদের পাঠ করিবার উৎসাহ দিয়া থাকেন, বিনা মূল্যে চৈতন্য ভাগবত আদি বিতরণ করেন। তাঁহার নিকট প্রায় দুই তিন মণ অতি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই সব প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধারে যত্নবান হইলে মূল্যবান গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। 'দি মহাপ্রভু মিশন', গোপালদাসবাবু ও চৌখাম্বার উকীল শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু এল, এল, বি মহাপ্রভুর কাশীবাসের স্থান সংরক্ষণে পরম যত্নবান—তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া চৈতন্যদেবের সাধন-ধামটী রক্ষা করাই সকলের কর্ত্তব্য—কারণ বৈষ্ণব গ্রন্থে যে চারটী গোড়ীয় বৈষ্ণব সাধনোচিত ধাম—বৃন্দাবনধাম, নবদ্বীপধাম, পুরী ধাম ও কাশীধাম—কথা উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে অন্যতম ধাম কাশী ও এই "চৈতন বটতলা"।

একটি চিত্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পল্লীর কুটীর জীর্ণ, নিতান্তই দরিদ্রের ঘর
স্বল্প তার আয়োজন, চারিদিকে অভাব বিস্তর—
গৃহের দুঃখিনী বধূ সাধ্যমত করে তা মোচন,
হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া আর কোন নাহি আভরণ,
সীমন্ত ভরিয়া তার আছে আর উজ্জ্বল সিন্দূর,
আয়তির চিহ্ন তাত ভূষণ বলি হবে না মঞ্জুর।

গা ধুয়ে এসেছে বধূ দীঘি হ'তে সকাল সকাল,
এলাচিবাসিত পানে করিয়াছে ঠোঁট দুটি লাল
ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে ভালে পরি' কাঁচপোকা টিপ,
চামেলিবাসিত তেলে খোঁপা বাঁধি হাতে সন্ধ্যাদীপ।
বহুদিন পরে আজ আলতা পরেছে বধূ পায়
মাসে একদিন আসে নাপতিনী। পরিয়াছে গায়
লাল-পেড়ে শাড়ীখানি সদ্য ধোওয়া, বহুদিন পরে
রজক করেছে কৃপা। তাই বধূ আজি গর্বভরে
লাক্ষা রক্ত পাদুখানি, বহু যত্নে এড়াইয়া জল,
নানা ভঙ্গিমায় ফেলি আলোকিত করে গৃহতল।

উড়ে যায় বকপাঁতি নীলাকাশে সন্ধ্যাতারা জাগে
পশ্চিম দিগন্তসীমা রঞ্জিত এখনো সন্ধ্যারাগে,
শিরীষ শাখায় পিক মুহুর্মুহুঃ হানে কুহুরব,
ফুটেছে বাতাবি ফুল আসে তার মধুর সৌরভ।
গৃহিণীর লালপাড়ে ঘেরা রাঙা পাদুখানি পানে
গৃহকোণে বসি পতি ঘন ঘন মুগ্ধ দৃষ্টি হানে,
চলন্ত পদ্মের অঙ্গে ভাবমগ্ন ভ্রমরের মত
সাথে সাথে লগ্ন হ'য়ে ঘুরে তার দৃষ্টি মুগ্ধ নত।
অতি তুচ্ছ চিত্র ইহা, কোন দিন কবিতায় ঠাঁই
দিবে এরে হেন কবি এযুগের পল্লীতেও নাই।
দুঃখিনী বধূর তবু এর চেয়ে উৎসব পরম
কবে হবে? এই তার সাজসজ্জা বিলাস চরম।
তৃপ্ত পতিপ্রেমে দৃপ্ত লাক্ষারক্ত ওদুটি চরণ,
ধরিয়া ধরণী ধন্য—অঙ্গে তার জাগে শিহরণ।
দৃষ্টি কাঙালের বটে, প্রেমগর্ব্ব কাঙাল বধূর,
মাটির বাটিতে ঢালা সুধা তবু সমান মধুর।



কথা ও সুর—শ্রীনিতাই ঘটক। স্বরলিপি—কুমারী বিজলী ধর।

গান *

প্রিয়তম, অভিমানে চলে গেলে তাই,
(যবে) কাছে এসে বসেছিলে আঁখি তুলি নাই॥
শোনাতে পারিনি গান কণ্ঠের
জানাতে পারিনি ভাষা হৃদয়ের
অপরাধ হ'য়ে থাকে যদি তায়
ক্ষমা ক'রো মিনতি জানাই॥

তুমি যবে এসেছিলে প্রিয় মোর, কণ্ঠ হারায়েছিল বাণী,
সরমের অবগুণ্ঠন কে মরমের পরে দিল টানি'।
জেনো তবু, আমি তব চরণে
নিবেদিত জীবনে ও মরণে
ক্ষণেকের লজ্জায় তোমারে ভুল ক'রে
যেন না হারাই॥

সা প্ ধ্ II রা -রগা সা -া | -া -া -া -া I পা প্রা রা রগা | না রা গা পমা I
প্রি য় ০ ত ০০ ম ০ ০ ০ ০ ০ অ ভিং মা নেং চ লে গে লে

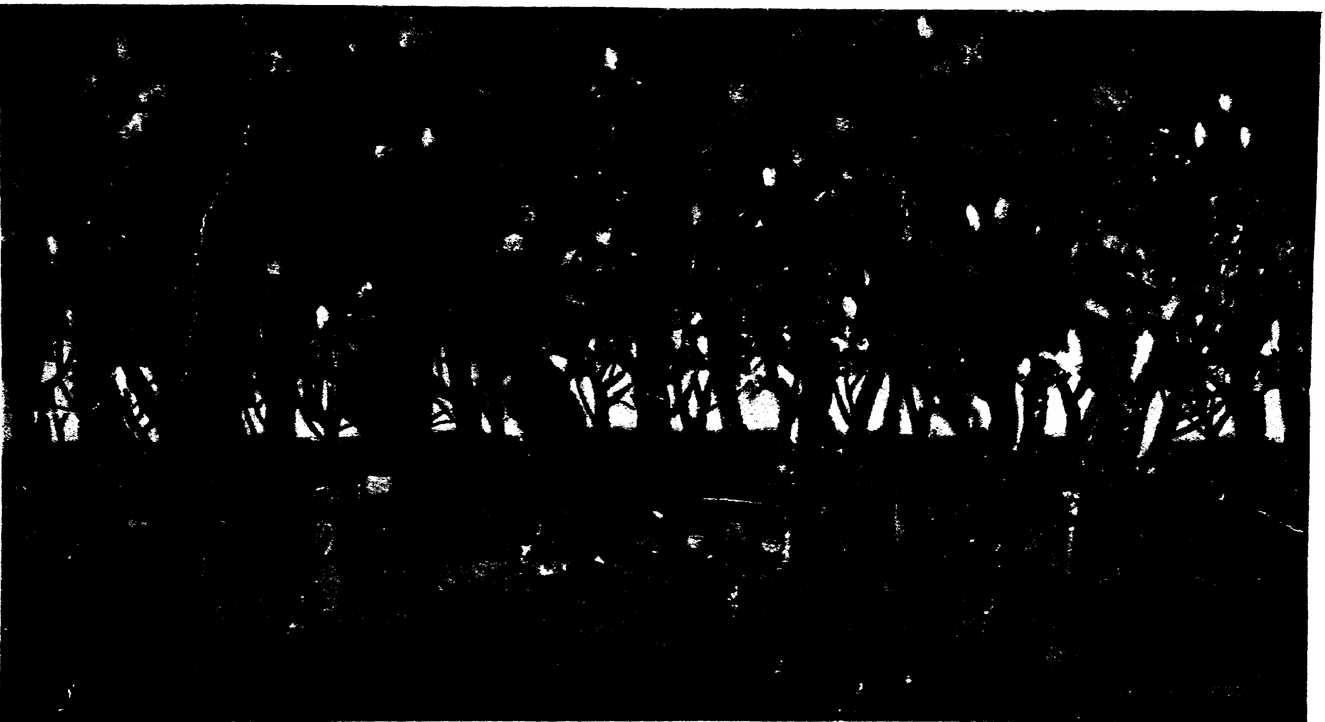
I গমা -রগা -া -গমা | -রমা -গরা সা প্ ধ্ I রা -রগা সা -া | -া -া গা রা I
তাং ০০ ০ ০০ ০০ ০ ই প্রি য় ০ ত ০০ ম ০ ০ ০ য বে

I গা গপা পা পা | গা পা ধনা পধা I পমা -া -া -া | পা ধা গা সা I
কা ছেং এ সে ব ০ সেং ছিং লে ০ ০ ০ আঁ খি তু লি

I গা - | -া | -া -া সা প্ ধ্ II
না ০ ০ ০ ০ ই প্রি য় ০

II গা পমা গা রা | গা পা ধা -না I পধা -নর্সা ধনা -া | -া -া -া -া I
শো না তে পা রি নি গা ন কং ০ ন্ ঠেং ০ ০ ০ ০ র্

I পা পনা না নধা | না র্সা র্সা নর্সা I ধা না নপা -া | -া -া -া -া I
জা নাং তে পাং রি নি ভা ষাং হৃ দ য়েং ০ ০ ০ ০ র্



শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখার্জ্জী
মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস

বনপথ

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

I গা পা ধর্সা -র্ণা । ধা ণা ধা পা I পধা গা পা -া । -া -া -া -া I
অ প রা০ ধ্ হ' য়ে থা কে য০ দি তা ০ ০ ০ ০ য়্

I সা গা ঋগা -পমা । ঋা -া -া -া I ন্া ঋসা ন্া ধপ্া । ন্া সা ঋগা ঋগা I
ক্ষ মা কো০ ০ রো ০ ০ ০ ক্ষ মা কো রো মি ন তি০ জ্ঞা০

I গা সা -া -া । -া -া সা প্ধ্া I ধ্া -ঋা ঋগঋা -া । -া -া -া সা I
না ০ ০ ০ ০ ই প্রি য়০ ত ০ ম০০ ০ ০ ০ ০ ০

I প্া প্ঋা ঋা ঋগা । ন্া ঋা গা পমা I গমা -ঋগা -া -গমা । -ঋমা -গঋা সা প্ধ্া II
অ ভি০ মা নে০ চ লে গে লে তা০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ই প্রি য়০

II গা মা গা ঋা । ঋা ঋগা ঋা সা I ন্া ন্সা ন্া -ধ্া । -া -া -া -া I
তু মি য বে এ সে০ ছি লে প্রি য়০ মো ০ ০ ০ ০ ম্

I প্া -ন্া সা গা । হ্মা ধপা হ্মা গা I গা সা সগা -া । -া -া -া -া I
ক ণ্ ঠ হা রা য়ে ছি ল বা ০ ণী ০ ০ ০ ০ ০

I সা সমা মা -া । ঋা মা পা -ধা I পা ধা গা -া । -া -া -া -া I
স র মে র্ অ ব গু ণ্ ঠ ন কে ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা গা -ঋা । সা ন্া ধ্ন্া প্ধ্া I ধ্ঋা -গঋা সা -া । -া -া -া -া I
ম র মে র্ প রে দি০ ল০ টা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা গা ঋা । গা পা ধা না I পধা ধনা নপা -া । -া -া -া -া I
জে নো ত বু আ মি ত ব চ০ র০ ণে০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা না না নধা । না র্সা র্সা না I ধা ধনা না পা । -া -া -া -া I
নি বে দি ত০ জী ব নে ও ম র০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I গা পা ধর্সা -র্ণা । ধা -ণা ণপা -া I পধা গা পা -া । -া -া -া -া I
ক্ষ ণে কে০ র্ ল ০ জ্জা০ য় তো০ মা রে ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ধা মা গা । ন্া ঋা গমা ঋগা I সা -া -া -া । -া -া সা প্ধ্া II II
ভু ল্ কো রে যে ন না০ হা০' রা ০ ০ ০ ০ ই প্রি য়০

* মেয়েরা গানখানি "C" অথবা C sharp সুর ক'রে গাইবেন।

নিশিগন্ধা

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সকাল হইতেই সুপ্রীতির আজ যেন কি হইয়াছে।

দরিদ্র অভাবগ্রস্ত সংসার—জীবন-সংগ্রামমুখরতার মাঝে এমনি কত অভাব অভিযোগ আর অশান্তির বন্যাপ্রবাহ তো তাহার জীবন-নদীতে সর্ব্বদাই শত আবর্ত্তের তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে, আজ বার বৎসর তো ইহার মাঝ দিয়াই জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু আজ তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া আসে কেন? কাহার মুখ দেখিয়া যে সুপ্রীতি আজ ঘুম হইতে উঠিয়াছিল! কিন্তু সেকথা আর ভাবা চলিল না।

ঘড়ির কাঁটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। বেলা প্রায় আটটা বাজে—এখনও ভাত চাপিল না। সকাল নটার মধ্যেই স্বামীর অফিসের ভাত তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে। তাহার মাঝে ডাল, ভাজা, দু-একটা তরকারি—অফিসের টিফিন। ইহার পর আবার ঈশ্বর বাদ সাধিয়াছেন—কোথা হইতে যে এই পোড়া যুদ্ধবিগ্রহ আসিয়া দেখা দিল—ইহা যেন তাহাদের নিষ্ঠুর ভাগ্য-লিপিকে আরও পরিহাস করা। ইহার সহিত যোগ দিয়াছে আবার বেঙ্গল টাইম!

কয়লার দাম বাড়িয়াছে। সংসারের সাশ্রয়ের জন্য গুল পাকাইয়া উনান ধরানোয় আজ এক নতুন বিপত্তি উপস্থিত। গুলগুলি তেমন করিয়া এখনও শুকায় নাই, কোথা হইতে পরিষ্কার আকাশে কালো মুখো একরাশ মেঘ জমিয়া উঠিল।

তাহাকেও যদি আয়ত্তের মাঝে আনা গেল, কিন্তু অবাধ্য ছেলেমেয়েগুলা লইয়া আর পারা যায় না।

—মা খিদে পেয়েছে—

সুপ্রীতি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—খিদে পেয়েছে তো মা'র পিণ্ডি গেল—সাত-সকালে খিদে পেয়েছে—

স্বামী প্রশান্তকুমার ঘুম হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধুইতেছিল। পুত্রের অনুযোগ শুনিয়া তাহার পিতৃহৃদয় স্নেহ-উচ্ছল হইয়া উঠিল। সুপ্রীতিকে কহিল, আহা খিদে পেয়েছে বল্‌ছে—কিছু দাও না খেতে।

সুপ্রীতি প্রদীপ্ত কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, আমার বাপের যে তালুক আছে। মাসের প্রথমে যে সেই তালুকের আয় আসে —আর তুমি যে মাসের মাইনে পেয়ে আগেই আমার হাত-খরচের ব্যবস্থা করো—যা দিয়ে সংসারের এই সব অভিযোগ মেটাবো!

প্রশান্ত নিরস্ত হইল। পুত্রকে ডাকিয়া কহিল—আয়, এই নে পয়সা—যা গরম জিলিপি কিনে আন্।

বড় মেয়ে রানু হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—মা খুটু জিলিপি খাবে—বাবা পয়সা দিয়েছে—আমিও খাবো মা।

সুপ্রীতি গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আমার এ সর্ব্বনাশটা না করলেই চল্‌তো না। একজনকে আদর দেখানো হোল—এখন সবাই তো আমার মাথা ছিঁড়ে খাবে?

প্রশান্ত সকলের হাতেই একটা-দুইটা পয়সা দিয়া সে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত যদি অশুভ হয় তাহা হইলে সকল দিক্ হইতেই অশান্তির আক্রমণ আসে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—প্রশান্তবাবু বাড়ি আছেন নাকি? প্রশান্তবাবু—

ছেলেমেয়েরা জিলিপি কিনিয়া পরমানন্দে গৃহে ফিরিতেছিল, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহারা জানাইয়া দিল—বাবা ভেতরেই আছে।

বাজখাঁই কণ্ঠস্বরের মাঝেই প্রকাশ পাইয়াছিল—বাড়িওয়ালার শুভাগমন বার্ত্তা।

আশু বিপদমুক্তির সম্ভাবনায় প্রশান্ত নীরবতাকেই আশ্রয় করিয়াছিল—কিন্তু বিধি বাম!

প্রশান্ত বাহির হইয়া আসিয়া স্মিতহাসি হাসিয়া আহ্বান জানাইয়া আদরে আপ্যায়িত করিল—আসুন ব্রজমোহনবাবু, সকালবেলাতেই একেবারে—সুপ্রভাত সুপ্রভাত!

…হ্যাঁ, কি আর করি বলুন—আপনারা সব যেমন কাজের মানুষ, সকালবেলা না এলে তো আর সাধু-সাক্ষাতের পুণ্যসঞ্চয় করা যায় না!—হাঃ-হাঃ করিয়া হাসিয়া ব্রজমোহনবাবু নিজের রসিকতাতেই ফাটিয়া পড়িলেন।

ওদিকে বাহিরে এক ভিখারিণী কাতর আবেদন শুরু করিয়াছে—মা, দুটো ভিক্ষে পাই মা—ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'বে মা—সোনার সংসার সোনায় ভরে উঠবে মা।

সুপ্রীতি রান্নাঘর হইতেই বিদায় দেয়—হাত জোড়া মা, ঘুরে এসো। ভিখারিণীকে যদি বা বিদায় করা গেল, কিন্তু প্রশান্ত আসিয়া আবার অনুনয় জানাইল—ওগো, একটু চা ক'রে দা'ও না তাড়াতাড়ি, এদিকে আবার অফিসের সময় হয়ে গেছে।

সুপ্রীতি বারুদ ফাটা হইয়া উঠিল—এরকম ক'রে সবাই মিলে জ্বালালে আমি সত্যিই কিন্তু আর পারিনে বাপু!

প্রশান্ত কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল—চুপ্ চুপ্—ঘরে আবার সাত-সকালে পাওনাদার এসে হাজির হয়েছে—বাড়িওয়ালা কর্ত্তা গো। এক কাপ চা ক'রে দাও, আজকের মতন তো বিদেয় করি।

সুপ্রীতি ব্যস্তভাবে হাত চালাইল। অদৃষ্ট-দেবতাকে বার বার ধিক্কার দিল—এত কষ্টই যদি দেবে ভগবান, তবে দুখানা হাতের বদলে চারখানা হাত দিলে না কেন?

অদৃষ্ট-দেবতা ইহাতে আরও একটু ব্যঙ্গ করিয়া বাদ সাধিলেন! তপ্ত খানিকটা ভাতের ফ্যান উছলাইয়া উঠিয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া পড়িল।

শিরায়িত হাতখানি তাহার লাল হইয়া উঠিল। সুপ্রীতি অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে আপন মনেই খানিকটা গজগজ করিতে করিতে খানিকটা আলুবাটা হাতে লেপিয়া দিল।

বাড়িওয়ালাকে বিদায় দিয়া কলঘর হইতেই প্রশান্ত তাড়া দিল—শীগ্‌গির ভাত বাড়ো, দেরি হ'য়ে গেছে ভয়ঙ্কর।

খাইতে বসিয়া একপ্রস্থ স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল। বাকী বাড়িভাড়া পাওনার দরুণ বাড়িওয়ালা এককাপ চা গলাধঃকরণ করিয়াও কয়েকটি বেশ কড়া কড়া কথা শোনাইয়া গেছে। প্রশান্ত সাধারণত নিরীহ প্রকৃতির হইলেও রাগ হইলে তাহার বড় কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

এদিকে দগ্ধ হাতখানির প্রদাহ তখন খুবই বাড়িয়া গেছে সুপ্রীতির। সকাল হইতে মেজাজও তাহার ভালো নাই; সুতরাং সামান্য সাংসারিক কথাতেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে খণ্ডপ্রলয় বাধিয়া গেল।

ডাল ধরিয়া গেছে। ভাজাও কাঁচা—ভাতেরও ভালো করিয়া ফ্যান ঝরে নাই। মাছের তরকারিটা টানিয়া লইয়া প্রশান্ত মুখ বিকৃত করিয়া উঠিল। সুপ্রীতি তখন স্বামীর টিফিনের জন্য পরোটা ভাজিতেছে।

প্রশান্ত অভিযোগ করিল—ছাই হয়েছে, একটা তরকারিও মুখে দেবার উপায় নেই—দাও, একটু নুন দাও।

সুপ্রীতি জ্বলিয়া উঠিল—ছাই হওয়ার যে কপাল, সোনা আর হবে কোত্থেকে?—জমিদারের মেয়ে আনলে ঘর এতদিনে সোনা দানায় ভরে যেত, আমার কপালও এমনভাবে আর পুড়তো না!—

প্রশান্তের পুরুষত্ব সুপ্রীতির এই নির্ম্মম বাক্যবানে আহত হইয়া উঠিল—হ্যাঁ, এমন নির্ম্মম সত্যি আর কিছু হতে পারে না। ভাতের থালা ফেলিয়া প্রশান্ত উঠিয়া পড়িল।

সুপ্রীতি মনের জ্বালায় ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। অনেকগুলি কড়া কথা তাহার মনের মাঝে জমিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু অশ্রুর আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়।

ব্লাক-আউটের অন্ধকারে নগরীর পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। সুপ্রীতিদের বাড়ির অন্ধ সঙ্কীর্ণ গলি-পথে শুধু একটা অস্পষ্টতার ঘনছায়া। এ পথে এখন আর মানুষের পদধ্বনি বড় একটা সন্ধ্যার পর শোনা যায় না।

বাতায়ন-পথ হইতে সুপ্রীতি সেই অন্ধকার অস্পষ্টতার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল—কোন কিছুই দেখা যায় না।

সুপ্রীতি সেই সুপরিচিত পদধ্বনির অপেক্ষায় ছিল। সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি নামিয়া আসে—অমাবস্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল—প্রশান্তের আগমনের কোন চিহ্নই নাই। সুপ্রীতির অন্তর উদ্বেগের আশঙ্কায় ভরিয়া ওঠে—এত রাত্রি তো তাহার কোন দিনই হয় না।

ব্ল্যাক-আউট হইবার পর হইতে প্রশান্ত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ি ফিরিয়া আসে। কোন দিনই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আজ হঠাৎ হইল কি তাহার?—

সুপ্রীতি অনুমান করিয়া লইল—সকালের কথায় প্রশান্ত আহত হইয়াছে। অভিমানভরেই এতক্ষণ সে বাড়ি ফিরিতেছে না। কিন্তু আঘাত কি একা প্রশান্তই পাইয়াছে? অভিমানের সমুদ্রতরঙ্গ সুপ্রীতির অন্তরে উদ্বেলিয়া উঠিল।

পুত্র কন্যারা আহার সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নির্জ্জন মুহূর্ত্তগুলি অত্যন্ত আশঙ্কাময়।

প্রশান্ত আজ রাগ করিয়া আহার না করিয়াই অফিস গেছে। রাস্তায় কোন বিপদ আপদ হইল না তো?—

সুপ্রীতি ঈশ্বরের নিকট স্বামীর নিরাপদ কামনা করে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে পা যখন তাহার ধরিয়া আসিয়াছে সুপ্রীতি আসিয়া তখন শয্যায় আশ্রয় লইল।

সেই মুহূর্ত্তেই ঠিক দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। সুপ্রীতি বুঝিল—প্রশান্ত আসিয়াছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া নীরবে আবার কক্ষে ফিরিয়া আসিল সে। প্রশান্তও কোন কথা কহিল না।

প্রশান্তের এই নীরবতা এই দারুণ উপেক্ষায় সুপ্রীতির অন্তর আরও ভারী হইয়া উঠিল। কোন প্রশ্নই সে আর করিল না।

উঠিয়া ভাত বাড়িয়া দিতে গেলে প্রশান্ত কহিল—আজ আর খাবোনা—খেয়ে এসেছি।

সুপ্রীতি এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—খাবে না যদি বলে গেলেই ছিল ভালো। ভাতগুলোও নষ্ট হোত না, আর মানুষের গতরও একটু জিরেন পেতো।

প্রশান্ত নীরবে শয্যার আশ্রয় লইল এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার নাসিকার প্রবল গর্জ্জনধ্বনি শোনা গেল।

সুপ্রীতিকে এ যেন নির্ম্মম তিরস্কার করা।

রান্নাঘরের বাকী কাজকর্ম্ম সারিয়া সে যখন শুইতে আসিল রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা।

প্রশান্ত তখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে।

স্বামীর কাছ হইতে কতকটা দূরত্ব স্থাপন করিয়া সুপ্রীতিও শুইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রি, অন্ধকারে সুপ্রীতি তাহার অঙ্গে করস্পর্শ অনুভব করিয়া বুঝিল—প্রশান্তের প্রেম-সম্ভাষণ!—

নারীর চিরজয়ী অভিমান আসিয়া তাহার অন্তরকে মর্ম্মমথিত করিয়া তুলিল।

প্রশান্তের আহ্বানে সে সাড়া দিল না।

অনেক উশ্‌খুশ্ করিয়া প্রশান্ত ডাকিল—ওগো, শুনছো?—কোন উত্তর না পাইয়া সে সুপ্রীতির গা ধরিয়া মৃদু নাড়া দিল।

সুপ্রীতি বিরক্তি প্রকাশ করিল—কি, কি হয়েছে কি?—

—বলছি—এদিকে সরে এসো না।

সুপ্রীতি স্বামীর হাত ছাড়াইয়া দিয়া আরও দূরে সরিয়া গেল।

প্রশান্ত তাহার কাছে সরিয়া আসে।

সুপ্রীতি এবার অভিমানে ভাঙিয়া পড়ে—সমস্ত দিন হাড়-ভাঙা খেটে একটু শুয়েছি, তাও কি তোমার চক্ষুশূল হচ্ছে! কতটুকুই বা বিশ্রাম পাই—তাতেও তোমার আপত্তি? আবার তো ভোর না হতেই তোমার সংসারের বন্দীশালায় গিয়ে হাজরি দিতে হবে—তার ওপোর আবার তোমার বাক্যবান, তাও সহ্য করতে হবে। কত অপরাধই যে করেছিলাম—

সুপ্রীতির কণ্ঠস্বরে বেদনার অশ্রুকারুণ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রশান্ত গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইল।

সুপ্রীতির অভিযোগ এতটুকুও মিথ্যা নয়। সংসার-কারাকক্ষ

জীবনে তাহার বন্দীত্ব আর সংগ্রাম-মুখরতায় পঙ্গুমনের মাঝে রঙের স্পর্শ জাগিতে পারে না—তাহার নির্ম্মমতা এবং নিষ্ঠুরতা আজ তাহাকে কঠোর এবং বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিয়াছে।

স্বামীর কাছ হইতে আর কোন জবাব না পাইয়া সুপ্রীতির ক্ষুব্ধ অন্তরে অশ্রুবন্যা আবেগে উথলাইয়া উঠিল।

•

সুপ্রীতি কিন্তু এরূপ ছিল না কোন দিনই।

তাহার সুন্দর দেহতনু, তাহার সুকোমল অঙ্গলাবণ্য, তাহার সরস মিষ্টি ব্যবহারে শুধু দাম্পত্য প্রেমেরই উজ্জ্বলতা ছিল। প্রশান্ত তাহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

অর্থ-প্রাচুর্য্য প্রশান্তের সংসারে ছিল না বটে, কিন্তু অফুরন্ত প্রীতির সুস্নিগ্ধধারা কখনও ব্যাহত হয় নাই তাই বলিয়া। সংসার ছিল তখন ক্ষুদ্র, অভাব অভিযোগের অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বা তাহাদের জীবনের সুখশান্তিকে গ্রাস করিতে পারে নাই। আজ অভাবের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার অনল তাহাদের সুখ-সম্পদ মনের ঐশ্বর্য্য সব কিছুকেই পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছে। তবুও মুহূর্ত্ত আসে। অশান্তির প্লাবনের মাঝে পুণ্যবারির অভিসিঞ্চনে অশুভতা দূর হইয়া শুভতা জাগিয়া ওঠে।

অন্ধকার রাত্রির মাঝে কোন এক মুহূর্ত্তে আবার স্বামী-স্ত্রীর কলহ বিরোধের সেতু ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রভাতের অস্পষ্টতার মাঝে বসন্তের কোকিল ডাকিয়া ওঠে।

সুপ্রীতি চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল বাহিরের উষার ফিকে ফিকে আলো তাহার শয্যার খানিকটা অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

স্বামীর নিবিড় বাহুবন্ধনের মাঝে কখন যে সে নিজেকে বাঁধিয়া দিয়াছে তাহা আর মনে নাই।

বিগত দিবসের মালিন্য-অভাব, অভিযোগ-কলহ, মনের অশান্তি—সে সব কথা আর কিছুই মনে হইল না।

স্বামীর ঘুমন্ত মুখখানিতে প্রগাঢ় প্রেমচুম্বনের প্রীতি-রেখা আঁকিয়া দিয়া সুপ্রীতি উঠিয়া নিজেকে স্বামীর বাহুমুক্ত করিয়া লইল।

প্রভাত হইয়া গেছে।

সুপ্রীতির জীবনে আবার প্রবল কর্ম্মস্রোতের চাঞ্চল্য জাগিয়াছে।

সেই সংগ্রাম—যন্ত্ররথের সেই একটানা ঘর্ঘর শব্দ—পুত্রকন্যার কান্নাকাটি—রান্নাবান্না—স্বামীর অফিসের আয়োজন—সুপ্রীতি একা আর কত দিক্ সামলাইবে?

কিন্তু তবুও সুপ্রীতির মাঝে প্রীতির অনাবিল ধারা—গত রাত্রের প্রেমস্পর্শে তাহা যেন সংসারের মাঝে মন্দাকিনীর সুধাধারা বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে।

বাপ-নেওটা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

খোকা বাপেরই নেওটা। বাপের সঙ্গে না হইলে খায় না, বেড়ায় না। এমন কি বাপ যাহা ভালবাসে খোকাও তাহাই ভালবাসে। পিছনে হাত দুইটি জড়ো করিয়া বাপ যেমন বেড়ায়, খোকাও বাপের পিছনে পিছনে তেমনি করিয়া বেড়ায়। সিগারেট খাইতে খাইতে ধোঁয়ায় ছোপ ধরা নখগুলি তাহার বাপ দাঁত দিয়া কামড়ায়, খোকাও তাহার হাতের নখ দাঁত দিয়া কামড়াইতে শিখিয়াছে। মা বাপে দাম্পত্য কলহ হয়, একটু পরে মিটিয়াও যায়। কিন্তু খোকা মা'র উপর চটিয়াই থাকে। একদিন এইরূপ ঝগড়ার পর খোকা তাহার মা'র কাছে কিছুতেই গেল না, মা'র হাতে খাইল না। মা প্রথমে হাসিল, তাহার পর রাগ করিল, স্বামীর কাছে নালিশও করিল যে ছেলের মাথা খাওয়া হইতেছে।

সেদিন খোকা তাহার বাপ মা'র সঙ্গে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে। রাধেয় নাটকের অভিনয় হইতেছে। কর্ণের প্রতি সকলেই সমবেদনা দেখাইতেছে। পরশুরামকে দেখাইয়া খোকা তাহার বাপকে বলিল—সন্ন্যাসী দুষ্টু! তাহার বাপ যখন বলিল—কিন্তু সন্ন্যাসীটা তার বাপের খুব ভক্ত, খোকা তখন শান্ত হইয়া গেল। তাহার বাপ আরও বলিল—বাপের কথায় সন্ন্যাসীটা তার মা'কে কেটে ফেলেছে। খোকা জিজ্ঞাসা করিল—কেন? বাপ বলিল—তার মা তার বাপের কথা শুনতো না তাই। শুনিয়া খোকা খুব প্রবীণের মতো ঘাড় নাড়িতে লাগিল। তাহার বাপ মা দুইজনেই হাসিল।

খোকার জ্ঞান বুদ্ধি হইতেছে। হইলে কি হয়—সে বাপকে পাইয়া বসিয়াছে। তাই বাপকে প্রায়ই বেড়াইতে গেলে খোকাকে সঙ্গে লইতে হয়। সেদিন এস্প্ল্যানেড হইতে ফিরিবার পথে তাহার বাপ খোকাকে একটা হাওয়া-বন্দুক কিনিয়া দিল।

আজ খুব ভোরে খোকার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখিল তাহার বাপ মা পাশাপাশি শুইয়া আছে। খোকার সহিল না—সে দুইজনের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামী স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহারা দেখিল—খোকা দুইজনের মাঝে বন্দুক হাতে নিয়া বসিয়া আছে!

আজও চায়ের আসরে তাহার বাপ মা'র মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতেছে। বাপ বলিতেছে—আমি যত বলি চায়ের মজলিশটা এই বারান্দায় জমে ভাল; এখানে ষ্টোভটা জ্বালো—গল্প কোরতে কোরতে চা খাবো, না তুমি সেই দৌড়চ্ছ রান্নাঘরে চা আনতে টোষ্ট আনতে। মা বলিল—হাঁ, তোমার যেমন বুদ্ধি, এমন সাজানো বারান্দা—এখানে ষ্টোভ জ্বেলে ঝুল্ হোক আর কি, ছবিগুলো নোংরা হয়ে যাক্, দেয়ালের রং নোংরা হয়ে যাক্…। কিন্তু সকলেই চমকাইয়া উঠিল—দড়াম্ করিয়া একটা আওয়াজ শুনিয়া। খোকা তাহার বন্দুকটা ছুড়িয়াছে তাহার মা'র ছবিটাকে লক্ষ্য করিয়া। বারান্দার দেওয়ালে তাহার বাপের ছবির পাশে তাহার মায়ের ছবিটা কাঁপিয়া হেলিয়া পড়িল। খোকা মুখে বলিতেছে—মা দুষ্টু!

কালিদাস

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আহার শেষ করিয়া কালিদাস সম্মুখে রক্ষিত পুঁথিখানি তুলিয়া লইলেন। মালিনী ইত্যবসরে বেদীর নীচেটিতে আসিয়া বসিয়াছিল এবং বেদীর উপর একটি বাহু রাখিয়া কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া পরম তৃপ্তিভরে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কবি পুঁথির পাতাগুলি সাজাইতে সাজাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

কালিদাস: আচ্ছা শোনো এবার। ইন্দ্রসভা থেকে বিদায় নিয়ে মদন আর বসন্ত হিমালয়ে মহাদেবের তপোবনে উপস্থিত হলেন। অমনি হিমালয়ের বনে উপত্যকায় অকাল-বসন্তের আবির্ভাব হ'ল। শুক্‌নো অশোকের ডালে ফুল ফুটে উঠ্‌ল—আমের মঞ্জরীতে ভোমরা এসে জুট্‌ল—শোনো—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ।—

কালিদাস একটু সুর করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিলেন; মালিনী মুগ্ধ তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দুটি কখনও আবেগভরে মুকুলিত হইয়া আসিল, কখনও বা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; নিশ্বাস কখনও দ্রুত বহিল, কখনও স্তব্ধ হইয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পীর মত দেহ ছন্দের তালে তালে দুলিতে লাগিল। এ কি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি! প্রতি শব্দ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কল্পনার অলৌকিক লীলাবিলাসে, ভাবের অগাধ গভীরতায়, ছন্দের অনাহত মন্দ্র মহিমায় মালিনী আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। এমন গান সে আর কখনও শুনে নাই। মালিনী জানিত না যে এমন গান মানুষ পূর্ব্বে আর কখনও শুনে নাই—সে-ই প্রথম শুনিল।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন।

(এই দৃশ্যের উল্লিখিত অংশ কয়েকটি মণ্টাজ (montage) দ্বারা দেখাইতে হইবে)

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। তারপর মালিনী গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র কালিদাসের মুখের পানে তুলিল, ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলিল—

মালিনী: কবি, স্বর্গ বুঝি এমনিই হয়?—কোন্ পুণ্যে আমি আজ স্বর্গ চোখে দেখলুম!—না না, আমি এর যোগ্য নই, এ গান আমাকে শোনাবার জন্যে নয়…এ গান রাজাদের জন্যে, দেবতাদের জন্যে—

সহসা মালিনী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

মালিনী: কবি, একটা কথা শুনবে? আমার রাণী-মা'কে তোমার গান শোনাবে?

কালিদাসের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

কালিদাস: মালিনী, রাজা-রাণীদের আমার গান শুনিয়ে কি লাভ? তোমার ভাল লেগেছে, এই যথেষ্ট।

মালিনী: (ব্যাকুলভাবে) না না, কবি—আমার ভাল লাগা কিছু নয়, আমার ভাল লাগা তুচ্ছ। আমি কতটুকু? আমার বুকে আমি—(এইখানে মালিনী দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিল)—এত ভাল-লাগা ধরে রাখতে পারি না!—কবি, বলো আমার কথা শুনবে?—রাজাকে শোনাতে না চাও, শুনিও না, কিন্তু রাণীকে তোমার গান শোনাতেই হবে। বলো শোনাবে! আমার রাণী ভানুমতী—ওগো কবি, তুমি জানো না—তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনিই তোমার গানের মরম বুঝবেন, তিনি তোমার গানে ডুবে যাবেন—

কালিদাসের বিমুখতা ক্রমে দূর হইতেছিল, তবু তিনি আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—

কালিদাস: কিন্তু কাব্য যে এখনও শেষ হয় নি—

মালিনী: তা হোক। যা হয়েছে তাই শোনাবে।

কালিদাস তখন নিরুপায় হইয়া বলিলেন—

কালিদাস: তা—ভাল। রাণী যদি শুনতে চান্—

কালিদাসের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মালিনী সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওয়াইপ্

রাণী ভানুমতীর মহলে একটি কক্ষ। মেঝের উপর স্থানে স্থানে মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত। একটি গজ দন্তের পালঙ্কের উপর ভানুমতী অর্দ্ধশয়ান রহিয়াছেন। বক্ষের নিচোল কিছু শিথিল; চুলের ফুল আতপ্ত দ্বিপ্রহরে মুশড়াইয়া পড়িয়াছে। রাণীর কাছে দাসী-কিঙ্করী কেহ নাই, কেবল মালিনী পালঙ্কের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ব্যগ্র হ্রস্ব কণ্ঠে কথা বলিতেছে।

মালিনী: হ্যাগো রাণি-মা, সত্যি বলছি তোমাকে, এমন গান তুমিও শোনোনি কখনও! শুনতে শুনতে মনে হয় যেন—যেন—(মালিনী দুই হাত নাড়িয়া নিজের মনের অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না)—কি বলে বোঝাব তোমাকে ভেবে পাই না।—চোখে জল আসে, বুক ভরে ওঠে—নাঃ বলতে পারছি না। তুমি একবার নিজের কানে শোনো না, রাণি-মা! দেখো তখন, সব ভুলে যাবে, সংসার মনে থাকবে না।

মালিনীর উদ্দীপনা দেখিয়া ভানুমতী একটু হাসিলেন।

ভানুমতী: বড় সরলা তুই মালিনী। সংসার ভুলিয়ে দিতে পারে এমন কবি আজকাল আর জন্মায় না। আমি সব আধুনিক কবির গান শুনেছি; তারা সব স্তাবক—চাটুকার; কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে রাজার প্রশস্তি লিখতে জানে—

মালিনী: ওগো রাণি-মা, আমার কবি তেমন নয়—সে কারুর খোশামোদ করে না; সে কেবল ঠাকুর-দেবতার গান লেখে। মহাদেব পার্ব্বতী—মদন বসন্ত—এই সব—

ভানুমতী আলস্যজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : যাই হোক, আমার মালিনীটিকে যে-কবি এমন ক'রে পাগল করেছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

মালিনী উৎসাহে আহ্লাদে রাণীর উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল

মালিনী : দেখবে তাকে রাণি-মা ? দেখবে ?

ভানুমতী : দেখতে পারি। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব, ভেবে পাচ্ছি না।—তোর কবি তো রাজসভায় যাবে না—আর আমার মহলে আনা, সেও অসম্ভব।

মালিনী : অসম্ভব কেন হবে রাণি-মা। তোমার হুকুম পেলে আমি সব ঠিক করতে পারি।

ভানুমতী : কী ঠিক করতে পারিস ?

মালিনী : এই—আমার কবি চুপি চুপি মহলে এসে তোমাকে গান শুনিয়ে যাবে—কেউ কিছু জানতে পারবে না। তুমি শুধু তোমার চেড়িদের একটু তফাতে রেখো—আর বাকি যা করবার তা আমি করব।

ভানুমতী ঊর্দ্ধে চক্ষু তুলিয়া একটু ভ্রূকুটি করিলেন, একটু হাসিলেন ; ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—

ভানুমতী : মন্দ হয় না—নতুন রকমের হয়। আর্য্যপুত্রকে—

এক যবনী প্রতীহারী প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। নীল চক্ষু, সোনালী চুল, বক্ষে লৌহজালিক। ভাঙা-ভাঙা উচ্চারণ।

প্রতীহারী : দেবপাদ মহারাজ আশ্ছেন—সংগে কঞ্চুকী মহাশয়।

বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া প্রতীহারী অপসৃতা হইল। রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। তাঁহার চোখের ইসারা পাইয়া মালিনী চুপি চুপি ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য প্রবেশ করিলেন : পশ্চাতে কঞ্চুকী। কঞ্চুকী নপুংসক ; কৃশকায়, মুণ্ডিতশীর্ষ, কদাকার। চক্ষের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও অসন্তোষ স্থায়ীভাব ধারণ করিয়াছে ; নিম্ব ভক্ষণের অব্যবহিত পরে মুখের আকৃতি যেরূপ হয়, কঞ্চুকীর মুখের সহজ অবস্থাই সেইরূপ।

ভানুমতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধহস্তে স্মিতমুখে আর্য্যপুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন ; উভয়ের চোখে-চোখে যে প্রসন্নতার বিনিময় হইল তাহা হইতে অনুমান হয় যে এই রাজ-দম্পতীর মধ্যে প্রণয়ের উৎসধারা এখনও মন্দবেগ হয় নাই।

রাণীর দিকে আসিতে আসিতে রাজা একবার পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : তুমি এখন যেতে পারো, কঞ্চুকী—

কঞ্চুকী পশ্চাৎ হইতে রাজ-দম্পতীকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া চলিল। দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া সে একবার তাহার সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ফিরাইল ; ঘরের কোণে দণ্ডায়মানা মালিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কঞ্চুকী সেইদিকে তাকাইয়া রহিল ; তারপর নিঃশব্দে মুণ্ডসঞ্চালন করিয়া তাহাকে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইঙ্গিত করিল। মালিনী শঙ্কিত মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া কঞ্চুকীর অনুবর্ত্তিনী হইল।

কক্ষ শূন্য হইয়া গেলে ভানুমতী দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া স্নিগ্ধ কৌতুকের স্বরে বলিলেন—

ভানুমতী : আজ বুঝি আমার সতীন আমার পতি-দেবতাকে ধরে রাখতে পারল না ?

মহারাজ স্মিতমুখে ভ্রূ তুলিলেন।

বিক্রমাদিত্য : তোমার সতীন ! সে আবার কে ?

ভানুমতী : তাকে আপনি চেনেন না, আর্য্যপুত্র ?—পুরুষ জাতি এমনিই কপট।—আমার সতীনের নাম রাজসভা ; যাকে ছেড়ে আপনি একদণ্ড থাকতে পারেন না।—

রাজা ভানুমতীর কুন্তল হইতে একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ভানুমতী বলিয়া চলিলেন—

ভানুমতী : —শুনেছি কনিষ্ঠা ভার্য্যার প্রতি পুরুষের অনুরাগ বেশী হয় ; মহারাজের কিন্তু সব বিপরীত—জ্যেষ্ঠার প্রতিই তাঁর আসক্তি প্রবল। রাজ্যশ্রী চির-যৌবনা—তাই বুঝি তাকে এত ভালবাসেন মহারাজ ?

বিক্রমাদিত্যের মুখ হইতে কৌতুকের ছায়া অপসৃত হইল ; তিনি ভানুমতীর মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ গভীর অনুরাগ ভরে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : তা জানি না। রাজ্যশ্রী যদি যায়, তবু তুমি আমার বুক জুড়ে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি যাও, আমার চোখে রাজ্যশ্রীর এ সম্মোহন রূপ কি থাকবে ? রাজলক্ষ্মী যে তোমারই ছায়া, ভানুমতী।

বাষ্পাকুল চক্ষে ভানুমতী পতির বক্ষের উপর ললাট রাখিলেন, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : ও কথা বলতে নেই, প্রিয়তম। রাজলক্ষ্মীই প্রধানা, আমি কেউ নই। মহাকাল করুন, রাজলক্ষ্মীর কোলে আপনাকে তুলে দিয়ে যেন যেতে পারি।

কিছুক্ষণ উভয়ে তদবস্থায় রহিলেন।

বাহিরে মানমন্দির হইতে দিবা তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

রাণীর একজন সখী মঞ্জীর বাজাইয়া কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া রাজদম্পতীকে আশ্লেষবদ্ধ দেখিয়া জিহ্বা কর্ত্তনপূর্ব্বক লঘুচরণে পলায়ন করিল।

রাজারাণী পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া পালঙ্কের উপর পাশাপাশি বসিলেন। ভানুমতী হাসিমুখে বলিলেন—

ভানুমতী : কিন্তু আজ মহারাজ তিন প্রহরের আগেই সভা থেকে পালিয়ে এলেন কেন তা তো বললেন না ! সভা-কবিরা কি চিত্ত-বিনোদন করতে পারল না ?

বিক্রমাদিত্য মুখের করুণ ভাব করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : চিত্ত-বিনোদন ! সভা-কবিদের ভয়েই তো তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি ভানুমতী !

হাস্য গোপন করিয়া রাণী কপট-ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতী : ছি মহারাজ, আপনি বীরকেশরী—আর, কয়েকজন নির্জ্জীব হংসপুচ্ছধারী কবির ভয়ে পালিয়ে এলেন !

বিক্রমাদিত্য : উপায় কি ! কবি দিঙ্‌নাগ সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি 'কুম্ভকর্ণ-সংহার' নামে কাব্য শেষ করেছেন, আমাকে

শোনাবার জন্যে উটের পিঠে কাব্য বোঝাই করে সভায় নিয়ে আসছেন। শুনে অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বররুচি—যাঁরা সভায় ছিলেন, সকলেই উঠে দ্রুত প্রস্থান করলেন। আমিও আর বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা ক'রে অন্তঃপুরের দিকে চলে এলাম। এখানে অন্তত দিঙ্‌নাগ ঢুকতে পারবে না।

ভানুমতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

বিক্রমাদিত্য : এবার এস—পাশা খেলা যাক।

ভানুমতী হাস্য সম্বরণ করিয়া ডাকিলেন—

ভানুমতী : সুজাতা ! মধুশ্রী !

দুইটি কিঙ্করী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভানুমতী : খেলার আয়োজন কর। মহারাজ পাশা খেলবেন।

সখিদ্বয় ত্বরিতে কাজে লাগিয়া গেল। সুজাতা কুট্টিমের মধ্যস্থল হইতে মৃগচর্ম্ম অপসারিত করিতেই মর্ম্মরের উপর অঙ্কিত অক্ষবাট বাহির হইয়া পড়িল। মধুশ্রী দুইটি পক্ষ্মল আসন তাহার দুই পাশে বিছাইয়া দিল, তারপর ঘরের কোণ হইতে গজদন্তের একটি ক্ষুদ্র পেটিকা আনিয়া অক্ষবাটের পাশে রাখিল।

রাজা ও রাণী উঠিয়া গিয়া আসনে বসিলেন। রাজা পেটিকাটি অক্ষবাটের উপর উজাড় করিয়া দিয়া পাশ্টি তিনটি হাতে তুলিয়া লইলেন ; রাণী রঙীণ গুটিকাগুলি সাজাইতে লাগিলেন।

রাজা পাশ্টিগুলি সশব্দে ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : আজ তোমাকে নিশ্চয় হারাব।

তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় রাণীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না। রাণী মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ভানুমতী : ভাল কথা মহারাজ। কিন্তু যদি হেরে যান, কী পণ দেবেন ?

বিক্রমাদিত্য : যা চাও। অঙ্গদ কুণ্ডল দণ্ড মুকুট—কিছুতেই আপত্তি নেই।—জয় কৈতব নাথ !

মহারাজ ঘর্ঘর শব্দে পাশা ফেলিলেন। খেলা আরম্ভ হইল।

ওয়াইপ্

খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। আরও কয়েকটি সখী কিঙ্করী আসিয়া জুটিয়াছে এবং চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া স-কুতূহলে খেলা দেখিতেছে। রাজার পাশে সুরা-ভৃঙ্গার ও পানপাত্র, রাণীর পাশে তাম্বূলকরঙ্ক। দু'জনেই খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন; খেলার মত্ততায় কখনও কলহ করিতেছেন, কখনও উচ্চ হাস্য করিতেছেন। মুখের অর্গলও ঘুচিয়া গিয়াছে; প্রগল্‌ভ শাণিত বাক্যবাণে পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতেছেন। সখীরা পরম কৌতুকে এই রঙ্গ উপভোগ করিতেছে।

ওয়াইপ্

খেলা শেষ হইতেছে। মহারাজের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার অবস্থা ভাল নয়। তবু তিনি বীরের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত লড়িতেছেন।

কিন্তু কোনও ফল হইল না ; বিজয়লক্ষ্মী রাণী ভানুমতীকেই কৃপা করিলেন। বাজি শেষ হইল।

উচ্ছলিত হাস্যে ভানুমতী বলিলেন—

ভানুমতী : মহারাজ, আবার আপনি হেরে গেলেন !

বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত বিমর্ষভাবে এক পাত্র সুরা পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর কপট ক্রোধের ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য : অয়ি দর্পিতা বিজয়িনি, তোমার বড় অহঙ্কার হয়েছে ! আচ্ছা, আর একদিন তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করব।—এখন তোমার পণ দাবী কর।

ভানুমতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন ; তাঁহার চক্ষু দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। কুহক-মধুর স্বরে বলিলেন—

ভানুমতী : এখন নয় আর্য্যপুত্র। আজ রাত্রে—নিভৃতে—আমার বর ভিক্ষা চেয়ে নেব।—

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চক্ষু দুটিও প্রীতহাস্যে ভরিয়া উঠিল।

ফেড্ আউট : ফেড ইন্

পুরঃসীমার অন্তর্ভুক্ত বিহারভূমি ; অদূরে অবরোধের তোরণদ্বার দেখা যাইতেছে।

বৃক্ষগুল্মাদিশোভিত বিহারভূমির উপর দিয়া কালিদাস ও মালিনী অবরোধের পানে চলিয়াছেন। কালিদাসের বাহুতলে অসমাপ্ত কুমারসম্ভবের পুঁথি। মালিনী সাবধান সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে।

কবি মৃদু হাসিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতেও বিশেষ সতর্কতা নাই ; তিনি যেন মালিনীর এই ছেলেমানুষী কাণ্ডে লিপ্ত হইয়া একটু আমোদ উপভোগ করিতেছেন মাত্র। ক্রমে দু'জনে অবরোধ দ্বারের অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালিনী সংহতকণ্ঠে বলিল—

মালিনী : আস্তে ! সাম্‌নেই দেউড়ি।

কালিদাস উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নবযুবক শাস্ত্রীটি,শূলহস্তে পাহারায় নিযুক্ত—আর কেহ নাই।

মালিনী দ্রুত-অনুচ্চকণ্ঠে কালিদাসকে কিছু উপদেশ দিয়া একাকিনী তোরণের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস বৃক্ষ-কাণ্ডের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রক্ষী দ্বারের সম্মুখে পরিক্রমণ করিতেছিল, মালিনীকে আসিতে দেখিয়া একগাল হাসিল। মালিনী পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া নিজ ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রাখিল।

রক্ষী ঘোর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—

রক্ষী : কি হয়েছে ! অমন করছ কেন ?

মালিনী : চুপ্—চেঁচিও না। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি—

রক্ষী : কী জিনিস ?

মালিনী : (রহস্যপূর্ণ ভাবে) লাড়ু !

কোঁচড়ের উপর হাত রাখিয়া মালিনী ইঙ্গিতে জানাইল যে লাড়ু ঐখানে লুক্কাইত আছে। রক্ষীর মুখের ভাব আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রক্ষী : অ্যাঁ ! লাড়ু !—আমার জন্যে এনেছ ! দেখি দেখি !

মালিনী মাথা নাড়িল।

মালিনী : এখানে নয়। খাবে তো ওদিকে চলো—ঐ মল্লিকা ঝাড়ের আড়ালে।

লাড়ু খাইবার জন্য মল্লিকা-ঝাড়ের আড়ালে যাইবার কী প্রয়োজন? কিম্বা মালিনীর মনে আরও কিছু আছে! উৎসাহে রক্ষী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দ্বার ছাড়িয়াই বা যায় কি করিয়া?

রক্ষী : তা—তা—দেউড়ি খালি থাকবে?

মালিনী : তাতে কি হয়েছে? এ সময় কেউ আসবে না।

রক্ষী : তা আসে না বটে—কিন্তু কঞ্চুকী মশাই—; কাজ নেই মালিনী, তুমি লাড়ু দাও, আমি এখানে দাঁড়িয়েই খাই।

মালিনী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল।

মালিনী : দেউড়িতে দাঁড়িয়ে লাড়ু খাবে? কেউ যদি দেখে ফেলে কি ভাববে বল দেখি!—

রক্ষী : তাও বটে! কিন্তু উপায় কি বলো? দেউড়ি ছাড়া যে বারণ।

মালিনী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

মালিনী : বেশ, কাজ নেই তোমার লাড়ু খেয়ে—আমি আর কাউকে থাওয়াব। এত যত্ন করে নিজের হাতে তৈরি করেছিলুম—

রক্ষী : না না মালিনী, তোমার লাড়ু খাচ্ছি—চল কোথায় যাবে।

দেয়ালের গায়ে বল্লম হেলাইয়া রাখিয়া রক্ষী মালিনীর পিছনে চলিল। ওদিকে কালিদাস গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন। তোরণ হইতে প্রায় বিশ কদম দক্ষিণে একটি মল্লিকার ঝোপ ছিল, মালিনী ও রক্ষী তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সাবধানে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মালিনী রক্ষীকে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া দাঁড় করাইল। রক্ষী ব্যাপার না বুঝিয়া বিস্ময়ভরে মালিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মালিনী : হয়েছে। এবার তুমি চোখ বোজো।

রক্ষী : চোখ বুজব? কেন?

মালিনী ধমক দিয়া বলিল—

মালিনী : যা বলছি কর। আর, যতক্ষণ হুকুম না দিই, চোখ খুলবে না।

রক্ষী চক্ষু মুদিত করিল। না করিয়াই বা উপায় কী? লাড়ুর লোভ যতটা না হোক, মালিনীকে প্রসন্ন রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। সে আবার একটুতেই চটিয়া যায়।

মালিনীর কিন্তু রক্ষীকে বিশ্বাস নাই; সে জানে হয়তো চোখের পাতার ফাঁকে দেখিতেছে। মালিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। না, চোখ বুজিয়াই আছে, দেখিতেছে না। তখন মালিনী হাত তুলিয়া কালিদাসকে ইসারা করিল।

কালিদাস বৃক্ষতল হইতে বাহির হইয়া গুটি গুটি অরক্ষিত দ্বারের দিকে চলিলেন।

ওদিকে রক্ষী চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—

রক্ষী : কি হ'ল? লাড়ু কই?

মালিনী চকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—

মালিনী : এই যে। হাঁ কর।

রক্ষী হাঁ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুদুটিও খুলিয়া গেল। কালিদাস তখনও অর্দ্ধপথে; মালিনী ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল—

মালিনী : ও কি করছ! চোখ বন্ধ কর—চোখ বন্ধ কর!

রক্ষী চোখ বন্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ'টিও বুজিয়া গেল। মালিনী গলা বাড়াইয়া দেখিল কালিদাস নির্বিঘ্নে তোরণ প্রবেশ করিলেন। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে রক্ষীর মুখের পানে চাহিল; হাসিয়া বলিল—

মালিনী : নাও—এবার মুখ খোলো।

রক্ষী যুগপৎ চক্ষু ও মুখ খুলিল।

মালিনী : দূর! হ'ল না। চোখ বন্ধ, মুখ খোলো—এই রকম—বুঝলে?

মালিনী প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও রক্ষী কৃতকার্য্য হইল না; হাঁ করিলেই চক্ষু খুলিয়া যায়। মালিনী হাসিতে লাগিল। রক্ষী কাতর স্বরে বলিল—

রক্ষী : কি করি—হচ্চে না যে!

মালিনী : তা হ'লে লাড়ু পেলে না—

হাসিতে হাসিতে মালিনী দ্বারের দিকে চলিল, অর্দ্ধপথে থামিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—

মালিনী : তুমি ততক্ষণ অভ্যেস কর। ফিরে এসে যদি দেখি ঠিক হয়েছে তখন লাড়ু পাবে।

মালিনী অবরোধের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল। রক্ষী বিমর্ষমুখে ফিরিয়া আসিয়া বল্লমটি তুলিয়া লইল; তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গভীর মনঃসংযোগে চক্ষু মুদিত রাখিয়া মুখব্যাদান করিবার দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল।

কাট

অবরোধের অভ্যন্তরে একটি উদ্যান। মহাদেবী ভানুমতীর সখী কিঙ্করীর সংখ্যা কম নয়—প্রায় গুটিপঞ্চাশ। তাহারা সকলেই আজ উদ্যানে আসিয়া জমিয়াছে। কেহ বৃক্ষশাখা লম্বিত ঝুলায় ঝুলিতে ঝুলিতে গান গাহিতেছে; এক ঝাঁক যুবতী ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে; কোথাও দুইটি সখী পাশাপাশি বসিয়া মালা গাঁথিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে।

দূর হইতে কালিদাস তাহাদের দেখিতে পাইয়া সেইদিকেই চলিয়াছিলেন; পিছন হইতে মালিনী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর একটু হইলেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; অবরোধের মধ্যে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে সখীরা কেহ দেখিয়া ফেলিলে আর রক্ষা থাকিত না! মালিনী দৃঢ়ভাবে কালিদাসের হাত ধরিয়া তাঁহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

ওয়াইপ্

(ক্রমশঃ)



দীন চণ্ডীদাসের পদের পুঁথি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

চণ্ডীদাস-পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া কতকগুলি পদ "একক-সম্পূর্ণ"! পদাবলীর সমগ্রতায় সুরের ঐক্য আছে, কিন্তু রসে ভাবে গাঢবন্ধ পদগুলির বক্তব্য যেন তাহারই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং সেই পরিপূর্ণ পূর্ণতার মধ্য হইতে এক আবেগাকুল ব্যাঞ্জনার অসমাপ্ত বাণী তাহাকে বাক্যাতীত অসীমের পথে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে। বেদনার সে-কি তীব্রতা, অনুভূতির সে-কি সুধা-বিষের জ্বালা, যেন বুঝিতে পারি, অথচ সহ্য করিতে পারি না। এই অসহ আনন্দের অননুভূত-পূর্ব্ব আস্বাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামধেয় গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের কয়েকটী পদেও যেমন, চণ্ডীদাসভণিতাযুক্ত অপর কতকগুলি পদেও তেমনি। তদ্ভিন্ন চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহুপদ একটা আখ্যায়িকা অনুসরণ করিয়াছে। সেগুলির কবিত্ব অতি নিম্নশ্রেণীর; ছন্দের আড়ষ্টতা, ভাবপ্রকাশের দৈন্য এবং অন্ত্যানুপ্রাস মিলনের অক্ষমতা তাহার মধ্যে এতই সুস্পষ্ট যে একজন সাধারণবুদ্ধি-সম্পন্ন ছাত্রের দৃষ্টিতেও তাহা ধরা পড়িবে। চণ্ডীদাস-পদাবলীর এই পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই বহুদিন পূর্ব্বে গত সন ১৩৩৩ সালের পৌষসংখ্যা ভারতবর্ষে আমি "দীন চণ্ডীদাস" নামক দ্বিতীয় একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাহার পরিচয় প্রকাশ করি। অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমার সম্পাদকতায় চণ্ডীদাস পদাবলী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদকতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুই খণ্ডে "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" প্রকাশ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পদ সন্নিবেশের যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা যে নিতান্তই কল্পনাশ্রিত, সুতরাং ভ্রমসংকুল, সম্প্রতি একখানি "দীন চণ্ডীদাসের পদের পুঁথি" আবিষ্কৃত হওয়ায় আর একবার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুঁথিখানির পরিচয় দিয়া পরে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় মাঝে মাঝে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। গত বৎসর "চণ্ডীদাস-নান্নুর" সাহিত্য-সম্মেলন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত বনপাস্ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় মহাশয়ের নিকট চণ্ডীদাস-সাহিত্য-সম্মেলনের গল্প করেন। কথা-প্রসঙ্গে ত্রিভঙ্গবাবু বলেন যে তাঁহাদের বাড়ীতে একখানি পুঁথি কয়েক পুরুষ ধরিয়া পূজা-প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। পুঁথিখানি তিনি দেখিয়াছেন, সেখানি চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলীর পুঁথি। সতীশবাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ত্রিভঙ্গবাবু পুঁথিখানি কলিকাতায় লইয়া আসেন। পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সতীশবাবু আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি এই প্রবন্ধে তাহাই ব্যবহার করিয়াছি এবং তজ্জন্য সতীশবাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ৩১০ সংখ্যক পদ হইতে ১২০২ সংখ্যক পদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও পুঁথির অনেক পাতা পাওয়া যাইতেছে না। মাঝে মাঝে এইরূপ লেখা আছে—"এই অবধি একানই পাত। পরে ছিয়ানই পাতে লেখে"॥ (এইস্থানে পদসংখ্যা ৪৯৮, মাঝে কয়েকটী পদ নাই, পরের পদ সংখ্যা ৫১৭) * * "এই হইতে একশত দুইএর পাত বেবাক হইল। তারপর একশত চল্লিশ পাতের প্রথম লেখা যায়"। (৫৫১ পদের পর ৭৩২ পদ, মাঝের পদগুলি নাই) * * (১০১৭ সং পদের তিন পংক্তির পর) "এই অবধি বাসরের দুইশত পাত তামাম। তাহার পর ২১৯ পাতে লেখে"॥ ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় আদর্শ পুঁথিতেও এই পাতাগুলি ছিল না। তজ্জন্যই লিপিকার ঐরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পুঁথির লিপিকাল কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়।

এই পুঁথি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় দীন চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণ লীলাত্মক একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অন্যত্র প্রাপ্ত পুঁথি দৃষ্টেও জানা যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও শ্রীরাধার জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক-অপৌরাণিক প্রায় কোন লীলাই বর্ণন করিতে বাকী রাখেন নাই। তিনি ঝুলন, গোষ্ঠ, রাস, দোল ইত্যাদিও যেমন বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি অভিসার, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা আদি লইয়াও কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে মাথুর বিরহ আদিরও অভাব নাই। আবার কাকমাল্য দাস, ভ্রমরদূত, পবনদূত প্রভৃতিও আছে। আমাদের আলোচ্য পুঁথি হইতে জানা যায় দীন চণ্ডীদাস শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান ছিলেন, অন্ততঃ তাঁহার কাব্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর "দানকেলীকৌমুদী"র পরে রচিত হইয়াছিল। দীন চণ্ডীদাসের ১১৭১ পদে আছে—

"বড়াই রসের তরু দোঁহে রসাইয়া।
দানকেলি কৌমুদিনী কহিয়াছে ইহা॥"

কবি লিখিয়াছেন—"বিচিত্র পালঙ্কপরে সোনার দুলিচা। সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ গালিচা"॥ সোনার দুলিচা হয় কিনা জানিনা, তবে দুলিচা গালিচা দিয়াও কবির সময় নির্ণীত হইতে পারে। পুঁথির প্রথম দিকের পাতাগুলি পাওয়া গেলে এবং তাহার মধ্যে পুঁথি আরম্ভের ধারা দেখিলে কবিকে আরো একটু ভাল ভাবেই ধরিতে পারা যাইত। আমাদের দুর্ভাগ্য সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। পুঁথির এক দিকের যে অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাকে নায়িকা বর্ণনার উপক্রমণিকা বলিতে পারি। অংশটী এইরূপ—

শ্রীমতী রাধিকা রাজার বালিকা তিঁহো সে রসের সখা।
তাহার প্রধান আট ডাল ভেল এই সে ব্যাসের লেখা॥
এক ডাল ভেল তাহে উপজল ললিতা তাহার নাম।
তাহা হৈতে হল নবোঢ়ার রস গুন অতি অনুপাম।

তাহাতে মঞ্জরি সপ্ত সপ্ত করি জে হয়ে রসের নাম।
প্রেম সে মঞ্জরি হইতে হইল রসোল্লাস গুণ গ্রাম॥
লিলা সে মঞ্জরি রতি সে সুন্দরী সে কহে ভাবের কথা।
তাহারে বলিয়ে ভাবের উল্লাস শুনিতে হিয়াতে বেথা॥
কস্তুরি মঞ্জরি তাহা শুন পুন কহনে নাহিক যায়।
প্রেম রস কথা সদা উচাটন প্রেমের উল্লাস কয়॥
লালীম মঞ্জরির সতত আমোদ রূপের উদ্গার রসে।
তাহাতে হইল রূপের উল্লাস রূপ অনুপাম বেশে॥
রাগ মঞ্জরির রাগেতে মোহিত ধরিয়া হাথেতে তাল।
তাহাতে হইল রসের উল্লাস কহিল রসের সার॥
কেলি সে মঞ্জরি কেলি কলা রসে গৃহেতে গৃহিণী হয়া।
সতত কহয়ে গৃহের চাতুর্য্য দিল গৃহল্লাস কয়া॥
কেলি মধু মঞ্জরির কথা কহিতে কতেক জানি।
শ্রীমতীর কাছে সতত থাকয়ে সখির উল্লাস বাণি॥
চণ্ডীদাস কহে নবোঢ়া কহিল কহিয়ে উৎকণ্ঠা রস।
শুনিতে শ্রবণে হেন লয় মনে যাহাতে সকল বস॥

মোক্ষ (মুখ্য) সখী ললিতা ১ মঞ্জরি ৭ এব ৮॥ রস ভোলা॥

এইরূপে প্রধানা অষ্ট সখীর সম্বন্ধেই বর্ণনা ছিল। বিশাখা সখীর বর্ণনা অসম্পূর্ণ। তাহার পর পাতা পাওয়া যায় নাই। কবি ললিতাকে নবোঢ়া রসের ও বিশাখাকে উৎকণ্ঠিতা রসের উৎপত্তি-হেতু বলিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে বিরাট ভ্রান্ত ধারণা সাধারণে প্রচলিত আছে। পদকল্পতরুর ভূমিকায় ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ইহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে পরিশিষ্টে দেওয়া কর্ত্তব্য', এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক"। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায়মহাশয় পদকল্পতরুর সুবিস্তৃত ভূমিকায় মাত্র উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়াই বক্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন—"* * * তাঁহার (বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাস পদাবলী সম্পাদকের) লেখার অনবধানতা হেতু মনে হয় যেন তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস অভিন্ন পদকর্ত্তা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐরূপ তাঁহার সিদ্ধান্ত হইলে উহাতে পূর্ব্বোক্ত হেত্বাভাস ঘটে এবং ঐ মন্তব্য পদাবলীর আলোচনার দ্বারাও সমর্থিত হয় না। কেননা চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের বহু পদ পাওয়া যায়। * * * দীন চণ্ডীদাস ভণিতার পদে যখন লিপিকর-দিগের ভ্রম প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন। তখন দ্বিজ চণ্ডীদাসের এই পদগুলিতেই কি জন্য লিপিকরদিগের ভুল বলা যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবল শক্তিশালী কিন্তু পদাবলীর উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশশূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোন অচিন্ত্যনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। সুতরাং আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে বরং বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াও মানিতে রাজী আছি, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসকে কিছুতেই দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া মানিতে পারি না। (পদকল্পতরু ভূমিকা ৯৪ পৃঃ) প্রত্যেক চিন্তাশীল রসজ্ঞ ব্যক্তিই এই মন্তব্য অনুমোদন করিবেন। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র আজ স্বর্গগত। অদ্যকার কোন আলোচনাতেই তিনি যোগ দিতে আসিবেন না। ইহা জানিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীন চণ্ডীদাস সম্পাদক যখন তাঁহাকে সাধারণের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন এবং পদাবলী সম্বন্ধে তথাকথিত সাধারণের বিরাট ভ্রান্ত ধারণাকে ভূমিকা করিয়া তাহার উপর সতীশচন্দ্রের নাম আরোপ পূর্ব্বক এই ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছেন, তখন বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে সতীশচন্দ্রের উপরি-উক্ত মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করিতে হইল। বলা বাহুল্য পদাবলী-সাহিত্যে সতীশচন্দ্র সাধারণ ছিলেন না এবং এ সাহিত্যে তাঁহার বিরাট ভ্রান্ত ধারণাও ছিল না। দীন চণ্ডীদাসের পদের নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই কথা আর একবার প্রমাণিত হইয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দীন চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি খণ্ডিত। তাহাতে অতি অল্পসংখ্যক পদই আছে। সুতরাং কোন্ পদের পর কোন্ পদ ছিল জানিবার উপায় নাই। তথাপি সম্পাদক মহাশয় চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি লইয়া দীন চণ্ডীদাসের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি আগ্রহের আতিশয্যে তিনি কালীয়-দমন-যাত্রার গোবিন্দ অধিকারীর "শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি" (৩৭২ সং) পদটীও চণ্ডীদাস ভণিতায় তুলিয়া দিয়াছেন। পদটীর ভণিতা "এ দাস গোবিন্দে তব তজবিদে পেতে পারে কিনা পারে"। "ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া" পদ ধনঞ্জয় রচিত। এমন অসামঞ্জস্য কত দেখাইব। দুই খণ্ড পদাবলীর আলোচনা করিতে হইলে ঐরূপ এক খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইবে। দীন চণ্ডীদাসের পুঁথির আলোচনাতেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" এই পদ যাঁহার রচিত, অথবা বিরহের এবং আক্ষেপানুরাগের উৎকৃষ্ট পদগুলি যিনি রচনা করিয়াছেন, নিম্নের পদটী তাঁহার রচিত বলিলে কবি-প্রতিভার সম্মান রক্ষা হয় কিনা সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। এই পদটীও বিরহের পদ এবং দীন চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট রচনাবলীর অন্যতম।

আর কবে পুন শ্রীমুখমণ্ডল পরশ করিব হেন।
শ্রীমুখমণ্ডলে কর্পূর তাম্বুল কবে তুলি দিব পুন॥
শ্রীঅঙ্গ শীতল পাখার বাতাসে তুষিব পিয়ার মন।
দু বাহু পসারি নিজ কোরে করি এ দশা করয়ে কোন॥
যদি সুফল সুদিন থাকয়ে এবে সে কুদিন দশা।
কোলের মাণিক রাখিতে নারল হইল সুদিন ভাসা॥
মনে ছিল সাধ লইয়া সে পিয়া করব আনন্দ কেলি।
এ সুখ সম্পদ সুখের আমোদ বিধি সে ভাঙ্গল ভালি॥
কোথা হতে আল' অক্রুর মুরতি ক্রুর সে হৃদয় তার।
তেঞি তার পিতা মাতা সে বুঝিয়া এ নাম রাখিল যার॥

হিয়া ভেদি ছেদি কাড়িয়া লইয়া চলিলা মথুরাপুর।
চণ্ডীদাস বলে সো হরি মিলব হব মনোরথ পুর ॥

ভাবের দৈন্য, প্রকাশের আড়ষ্ট ভঙ্গি, দুর্ব্বল ছন্দ এবং অধম মিল একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মাথুর বিরহের পদের যদি এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, তবে আর অন্য পদে কৃতিত্বের আশা কোথায়?

৮৮৯ পদে—এবে কহি শুন পরকীয়া সুখ স্বকীয়া থাকুক দূরে।
পরকীয়া সনে রস আস্বাদন কহিতে মরম সরে ॥

এই বলিয়া কবি ভ্রমর সম্বাদে রাধার কৃষ্ণনাম শ্রবণ, রূপ শ্রবণ, চিত্র দর্শন, কুটীলা তিরস্কার, পূর্ব্বরাগ আদি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" পদটী এখানে নাই, পুঁথির অন্যত্রও নাই। এই পদ দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইলে এই স্থানেই লিখিত থাকিত। কারণ কবি এই স্থানেই কৃষ্ণনাম শ্রবণের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। শ্রীরাধার রূপ বর্ণনের পদ চণ্ডীদাস-ভণিতায় কয়েকটীই পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে তাহার একটীও নাই। পুঁথি হইতে শ্রীরাধার রূপ বর্ণনের পদ তুলিয়া দিলাম।

ধেনুর সঙ্গেতে একদিন পথে যাইতে জাবট দিয়া।
আয়ানের ঘরে এক গোয়ালিনী দেখিল নয়ন চায়া ॥
অলপ বয়েস চাঁচর সুবেশ নানা মালতীর দাম।
কিবা সে দেখিল রূপে টলমল কেবা অতি অনুপাম ॥
বেড়ি কাল জাদ বেণীর বন্ধনে, সন্ধান লাখেক অলি।
ফুলের সুগন্ধ পাই মধুকর উড়ে উড়ে ফিরে ভালি ॥
সোনার থোপনা তাতে ঝাঁপাবলি দুলিছে পিঠের মাঝে।
তা দেখি আকুল চিত বেয়াকুল নাচে মনমথরাজে ॥
দুসারি মুকুতা সিঁথার থেচনি মণি মাণিকের চুলি।
সরস কপালে সিন্দুর রচনা চান্দ মুখ শোভা ভালি ॥
তার মাঝে মাঝে মলয়জ বিন্দু কি তাহা কহিমু রঙ্গ।
বিধুরে বেড়িয়া তারার গাথনি চান্দ লাজে দিছে ভঙ্গ ॥
নাসা যেন দেখি তিলফুল লখি তাহাতে বেসর শোভা।
মুকুতার ঝুরি অধর উপরি যেন সে হিঙ্গুল আভা ॥
বিম্বফল যুগ দেখিলাম রূপ নয়ন খঞ্জন পাখি।
অতি সে চঞ্চল খঞ্জন দেখিতে মনরথ তাহে সাথি ॥
কটাক্ষ চাহিতে চিত নাহি থির মনমথ মাঝে ডুবে।
না পায় সাঁতারি উঠু ডুবু করি তোমারে কহিল এবে ॥
সে রস চাহনি কিবা সে লাবণি নয়ান চঞ্চল রাগে।
হিয়ার পুতলি মরম যেখানে সেখানে যাইয়া লাগে ॥
সোনার কিঙ্কিণী বাজে রিনি ঝিনি কেশরী জিনিয়া মাজা।
নানামত গান নানামত তান সে মেনে রমণী ধ্বজা ॥
রাতুল চরণ যেমন জাবক তাহাতে নূপুর সাজে।
যেন রাজহংস গমন মাধুরি কত রাগ ধ্বনি বাজে ॥
চণ্ডীদাস বলে সে নব বয়েস তোহে মিলায়ব বিধি।
হেন লয় মনে জানল কারণ উয়ল উত্তম নিধি ॥

কবিতাটী পড়িয়া মনে হয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবির কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। যদিই বা মনের মধ্যে কোন কিছু কল্পনা করিতেন, তাহাও প্রকাশের সামর্থ্য ছিল না। গতানুগতিকতা রক্ষা করিতে গিয়া নিরর্থক বাজে বকিয়া পুঁথির কলেবর বাড়াইয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "প্রথম প্রহর নিশি" পদটী পড়িয়াছেন এবং জ্ঞানদাসের সুপ্রসিদ্ধ "মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুন শুন মরমের সই" পদটী অবগত আছেন, তাঁহারা দীন চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটী পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন।

"শুন লো মরম সখি তোরা।
নিশি অবশেষ কালে ঘুমে অচেতন ভালে স্বপনে দেখিল চিত চোরা।
একে নব ঘনশ্যাম পীতবাস অনুপাম বান্ধে চূড়া নানা ফুল দিয়া।
হাসিয়া নাগর রায় আসিয়া বৈঠল ঠায় দুটী করে কর আরোপিয়া ॥
এ কে হাম বিরহিনী কহেন একটী বাণী কোপে দিল কর ছাড়াইয়া।
পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি বসাইল যতন করিয়া ॥
সুতান চতুর ধরি মোহে নিজ কোরে করি আলিঙ্গন বেরি আচম্বিতে।
দারুণ কোকিলনাদ মনে না পুরিল সাধ বুঝিলাম হইল প্রভাতে ॥
যেমন সতিনী প্রায় ঘন ডাকে উভরায় মনে না পুরল মন আশা।
ননদিনী পাপমতি জানিবা দেখয়ে কতি হেন বুঝি নিশি ভেল উষা ॥
তুরিতে নাগর রাজ রাখিয়া নূপুর সাজ বড় দুখ রহল মরমে।
হেনক সময় কালে ভাঙ্গি ঘুম অবহেলে মিলি আঁখি দূরে গেল ঘুমে ॥
নিশির স্বপন এই দেখিল মরম সই পিয়া সনে না পামু বঞ্চিতে।
চণ্ডীদাস কহে ধনী মেলিব নাগরমণি হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥"
(৫২০ সং)

মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত এই কবিও এক "ছত্রিশ অক্ষরের করুণা" লিখিয়াছেন। এমন নিকৃষ্ট রচনা মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও আছে কি না সন্দেহ। ছত্রিশ অক্ষরের মধ্যে একটা অক্ষর তুলিয়া দিলাম।

টলবল করে	টলটল দেহে	টেরা সে বিষম বাঁশি।
টানিলে না টলে	বুকে টেরা হয়ে	হৃদয়ে রহিল পশি ॥
টাটক হইয়া	সুধামুখী ধনী	টেরা সে নয়নে চেয়া।
টারিয়া যাইবে	তটস্থ রমণী	টুটিল বিরহ দিয়া ॥
টানাটানি করে	টেরেতে লইয়া	মরিতে টাকর দিয়া।
টান টোন করি	টাকাই তা সনে	টের দূর দিকে রয়া ॥
টিপ টাপ করে	টেটালির পারা	টিকাদিনী পারা রাধা।
টল টল করে	অবলা পরাণ	সকল করিল বাধা ॥
টাটক হইয়া	টানিয়া রাখিব	আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিয়া	টেটকারি দিয়া	অক্রুর সে মহামতি ॥
চণ্ডীদাস কহে	টাটক হইয়া	টারল গোকুলনাথ।
টিপানে জানিল	টেরা হয়ে নাথ	ছাড়ব গোপীর সাথ ॥

মথুরায় শ্রীমতীকে স্মরণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বকুলতলায় বসিয়া মুরলী ধ্বনি করিয়াছেন এবং মথুরা-নাগরীগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মুরলী তাহাদের মনোহরণ করিয়াছে। কাঁখে কনক গাগরি লইয়া জল ভরিবার ছলে বকুলতলে আসিয়া তাঁহারা বিতর্ক করিতেছেন, এ-কি নব জলধর না অন্য কিছু? কেহ বলিলেন মেঘ হইলে বৃষ্টি হইত, আমরা সিঞ্চিত হইতাম ইত্যাদি। পবন দূত, ভ্রমর দূত ইত্যাদিও আছে, কিন্তু কোথাও কবিত্বের সম্বন্ধ নাই। এই কবির একটী উৎকৃষ্ট রচনা তুলিয়া দিতেছি, অনুকরণ করিতে গিয়াও কবির অক্ষমতা ধরা পড়িয়াছে। এই পদটিই বোধ হয় দীন চণ্ডীদাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ। তথাপি "ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। পাখী হঞা উড়ি যাও না দেয় বিধি"। এই পদের সঙ্গে কিম্বা—"ধিঁ জিজ্ঞাসা করিল, পরাধিনী যেহ। তাহার অধিক ধিক্ প্র সঙ্গে না টাকার সঙ্গে?" পদের সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না।

পুঁথিখানার মধ্যে দ্বিজ বা বাঙ্গালী পিঁজরা হাত হইতে নামাইয়া বিরহের উৎকৃষ্ট পদগুলির এঁচোইয়া গাহিতে লাগিল— নির্ব্বাচিত পদটী এই—

"পুরুষ এল মজুরাতে ঘাসের বোঝা বয়ে
বীর বসিল মন্দিরেতে দুঃখজয়ী হয়ে।"

গানটি দুলালীর কাছেই তার শেখা! দুলালী পিঞ্জরার উপর শাল চাপা দিয়া চলিয়া গেল।

উৎসবের সানাই বাজিয়া উঠিল; সে সানাইর সুরে একটা করুণ রাগিণী মায়ের বুকে বাপের বুকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আছাড় খাইতে লাগিল।

সবই হইল—যা যা বিবাহে হইয়া থাকে। আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম, কর্মিগণের ব্যস্ততা, পণ্ডিতদের শিখা নাড়া, বরপক্ষের সাজসজ্জা, মেয়েদের মঙ্গলাচরণ, নাচ, গান, উলু ধ্বনি। শিশুদের চেঁচামেচি লাফালাফি, বুড়োদের হাঁকডাক, গালাগালি—কিছুরই অভাব হইল না; অভাব হইল শুধু—যাঁর জন্য এত আয়োজন, তার। বরাসনে বর বসিয়া, কুশাসনে পুরোহিত বসিয়া—কিন্তু কনে কোথায়? বিয়ের চেলি আঙ্গিনায় লুটাইতেছে, কনে কোথাও নাই।

দুলালী—ও দুলালী! প্রথমে চাপা গলায় ডাক, তারপর গলা ছাড়িয়া ডাক, তারপর ডাক ছাড়িয়া কান্না—দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, পথ ঘাট মাঠ সব খোঁজা; তারপর পুকুরে জাল ফেলা! জালে ওঠা এক প্রকাণ্ড বোয়াল—তার আবার প্রকাণ্ড পেট! এ পেটে কি শ্রেষ্ঠী-কুমারীর কোন কিছু আছে? এক গুচ্ছ চুল—একখানা কঙ্কণ—অন্তত একটি আংটি! হায় রে হায়! কোন 'অসম্ভব' সম্ভব হইল না। বর ভগ্নহৃদয়ে বিদায় লইল; বরের বাবা কনের চরিত্রে সন্দিহান হইলেন; বন্ধু বান্ধবেরা সম্ভব অসম্ভব নানা অনুমান করিতে লাগিলেন; কনের মা শোকে ও কনের বাবা লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, উৎসবের তেল পুড়িয়া নিভিয়া গেল এবং সেই অর্ধদগ্ধ দীপদণ্ড, হিমভার-নমিত কেতনপুচ্ছ, অসম্বৃত সাজসজ্জা ও জনহীন উৎসবের আঙ্গিনায় যখন ভোরের আলো পড়িল, মনে হইল এ একটি গতপ্রাণ ঐশ্বর্যের নগ্ন কংকাল!

৩

এদিকে শ্রেষ্ঠী-কুমারী পিতা-মাতার কোন সুখ-স্বপ্নের অলীক মায়ামূর্তির মত শ্রাবস্তী পুরী হইতে অন্তর্ধান করিয়া সেই ঘেসেড়া যুবকের সঙ্গে মিলিত হইল। তারপর দুজনাতে পথ চলিতে চলিতে নদনদী পল্লী মাঠ অতিক্রম করিয়া যেখানে আসিয়া পড়িল তার কথা ইতিপূর্বে স্বপ্নেও হয় ত তারা কোন দিন ভাবে নাই। প্রথম তারা চলিয়াছিল একটা নতুন আগন্তুক ভাবের উত্তেজনায়। তারপর চলিয়াছিল শুধু চলার আবেগে। কোন্ পথে চলিয়াছে, কোথায় তার শেষ হইবে এ বিষয়ে কোন একটা ধারণাই তাদের মনে ছিল না। তার পর যখন তারা একদিন দিনান্তের পর্যটনক্লান্তি বহন করিয়া ভারি পায়ে এক শহর-প্রান্তের সরাইতে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং সরাইওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, এটা রাজগেহ, তখন তাদের সে উত্তেজনা প্রথমে বিস্ময়ে ও পরে ভয়ে পর্যবসিত হইল।

কিন্তু পথ চলিতে চলিতে বিদেশ তাদের অনেকটা অভ্যাস হইয়া গেছে এবং শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া যাইবারও এখন কোন উপায় নাই। সুতরাং তাদের নবমিলনের যে প্রত্যাশিত সুখ এতদিন পথচলার তাড়নায় উপভোগ করিবার অবকাশ মিলে নাই তারই স্বপ্নমূর্তিকে বাস্তব করিবার জন্য তারা এই রাজগেহকেই তাদের প্রথম বাসরগেহরূপে বরণ করিয়া লইল। রাজগেহও অতিথি সৎকারে বিমুখ হইল না। ঘেসেড়ার দেহ সবল সুপুষ্ট; ঘেসেড়ানীর হাত পা লঘু, সেবা-কুশল। সুতরাং রাজগেহের রাজগৃহে না হউক, রাজার আস্তাবলে তাদের স্থানাভাব হইল না।

মগধের রাজগৃহে বছর কয়েক বাস করিয়া শ্রেষ্ঠী-কুমারী ঘেসেড়াকে একটি পুত্ররত্ন উপহার দিল। কিন্তু তার প্রথম প্রণয়ের তরুণ উচ্ছ্বাসে ততদিন ভাটি ধরিয়াছে। সেই আগন্তুক ভাবের অভিনবতার মোহ পরিচয়ে পরিচয়ে কাটিয়া গেছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে যখন সে আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার সত্য পরিচয় লাভ করিল, তখন তার চিত্ত মথিত করিয়া জাগিয়া উঠিল কোন এক অনাদৃত অতীতের একখানা ভরা চিত্র। পরিত্যক্ত শ্রাবস্তীর সেই খেলাধূলা—স্নেহময় পিতার সতর্ক পাহারা, স্নেহময়ী জননীর নিবিড় বাহুবেষ্টন। সে স্বপ্ন কি আর সত্য হয় না! অতীত কি একটি মুহূর্তের জন্যও বর্তমানে ধরা দেয় না? কী নিষ্ঠুর মহাকালের বিধান!

দুলালী আর শান্তি পায় না। জন্মভূমির সেই ছায়াশীতল আম্রতলায় বা বাপের সেই নির্বাত স্নেহনীড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ওঠে। এইখানে এই বিভূঁই বিদেশে ত তার আপনার বলিতে কেহ নাই। স্বামীর মুখ সে নিত্য একভাবে দেখে—বাঁধা গতে কথা, বাঁধা ধরণে হাসি, বাঁধা চালে চলন! শিশু পুত্রের সেই একই রকম সেবার দাবী। তা ছাড়া, একটু মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া তার একঘেয়ে পরিশ্রমের লাঘব করে, তার দুঃখে কষ্টে পিঠে মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়, এমন কেহ ত এদেশে নাই! এখানকার দিন-ভরা খাটুনির পুরস্কার রূঢ় হিসাব-দাবী; নির্মম কৈফিয়ৎ তলব! এখানকার ক্ষুধার অন্নে নিত্য-উপকরণ কটু ব্যঞ্জন; তাতে না আছে এক ছিটা স্নেহ, না আছে এক ফোঁটা দুধ। মানুষের চোখে এখানে রক্ত নাই, মুখে হাসি নাই, বুকে করুণা নাই। আছে শুধু কুটিল দৃষ্টি, কঠোর আদেশ, প্রাণহীন লৌকিকতা—যা সবল তাড়নার চাইতেও তিক্ত—বিরূপ-বিস্বাদ! এখানে গড়াগড়ি দেবে সে কোন মুখে! আজ কোথায় পড়িয়া আছে সেই শৈশবের খেলার আঙ্গিনা—যেখানে ভাইয়ের সঙ্গে গলাগলি করিয়া সে নমুয়া আর দীমুয়ার লাকড়ি খেলা দেখিত। যেখানকার প্রতি ধূলিকণা ভাই-বোনের নূপুর গুঞ্জনে মুখরিত ও হাস্য কলরবে প্রাণময় হইয়া উঠিত! সে মায়ের হাতে পরিবেশন করা অন্ন! কী অমৃত তাতে মাখান ছিল! পানের জল কী মিষ্টি! কী সুবাস! আজ সে সব কথা মনে পড়িয়া দুলালীর চিত্ত এই উদাসীন জনারণ্যে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। স্বামীর সোহাগ, পুত্রের আধ আধ বোল তাকে আর ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।

তবু সে বুকের কথা বুকে চাপিয়া আরও দুই বৎসর কাটাইয়া দিল। অবশেষে একদিন ফাল্গুনের বাতাসে গোধূম পত্রের কম্পিত শীর্ষ যখন শ্রাবস্তীর ভুট্টাক্ষেতে ভাইয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার কথা মনে করাইয়া দিল এবং আকাশের কোন্ হইতে একটুকরা কাল মেঘ বিবাহদিনের আচার-আয়োজন-রতা জননীর সজল

আঁখি দুটি চিত্তপটে আঁকিয়া গেল, দুলালী তখন আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ঘেসেড়াকে বলিল, "চল না, এবার ফিরে যাই।"

ঘেসেড়া চোখ দুটি বড় বড় করিয়া দুলালীর অনুনয়ভরা মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ফিরে যাবে ?"

দুলালী সঙ্কোচের সহিত বলিল, "দেশে !"

ঘেসেড়া একটু থামিয়া ভাবিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "তোমার এ অবস্থায় কি যাওয়া সম্ভব ?"

দুলালী আপনার শরীরের দিকে চাহিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল—কিছু বলিল না।

ঘেসেড়ার বুঝি ভাবোদয় হইল ; কাছে এক লিচু গাছের পাতার আড়ালে বসিয়া একটা কোকিলও ডাকিয়া উঠিয়াছিল। সে দুলালীর মুখচুম্বন করিল। এটাই দুলালীর প্রস্তাবের জবাব—তাকে নিবৃত্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং আপাতত আর শ্রাবস্তী গমন ঘটিয়া উঠিল না।

৪

যথাকালে শ্রেষ্ঠী-কুমারী আর একটি সুসন্তান প্রসব করিল। একটু সুস্থ হইয়াই সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "এবার ?"

"এবার ত আর বাধা দেখি না।" বলিয়া সে ঘাস কাটিতে বাহির হইয়া গেল।

দুলালী এবার বিপুল আশ্বাসে ও আনন্দে বসিয়া বসিয়া খুব করিয়া বাপের বাড়ীর চিত্র মনে মনে আঁকিতে লাগিল। ঘরের কোণের দ্রাক্ষালতায় নিশ্চয় এতদিনে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে-ই উহা যত্ন করিয়া রোপণ করিয়াছিল। নন্দুয়া একদিন এক শেয়ালের উপর লাঠি ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া লতাটির একটি ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল—আর যে তার কান্না! অসতর্ক নন্দুয়া নিশ্চয়ই এত নিষ্ঠুর না যে একদিন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে গিয়া লতাটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বসিবে। সে থোকা থোকা আঙ্গুর! খোকার দেখিয়া কতই আহ্লাদ হইবে। আর একটা নাসপাতির গাছও তার ছিল। সেটা এতদিনে দোল খাইবার মত বড় হইয়াছে—খোকার কি আনন্দ হইবে! তার পর বাড়ীর পাশের সে ভুট্টাক্ষেত। দীনুয়ার বোন কোশলীর ছেলেটি এতদিনে ত বেশ বড় সড় হইয়াছে, তার সঙ্গে অই ভুট্টাক্ষেতে লুকোচুরি খেলিয়া খোকা কি আমোদ পাইবে!

দুলালী এসব ভাবে, আর তার মনের উৎসাহ বাড়িয়া চলে। এমন সময় হঠাৎ একটা চিন্তা তাকে ভয়ঙ্কর একটা ঘা দিয়া বসিল। সে যে-ভাবে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল, তাতে তার বাবা যদি তাকে আর বাড়ীতে স্থান দিতে রাজী না হন! ভাই বন্ধু যদি দুশ্চরিত্র মনে করিয়া তাকে ঘৃণা করে! এটা তবু সে সহ্য করিতে পারিবে, যদি বাবা তাকে তাড়াইয়া না দেন, মা তাকে অনাদর না করেন। কিন্তু সাত বছর ত এক দুই দিনের কথা নয়! বাবা যদি বাঁচিয়া না থাকেন ? মা যদি—আর সে ভাবিতে পারিল না ; সমস্ত অঙ্গে কাঁটা দিয়া তার মাথাটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দাওয়ায় জল ছিটাইয়া সে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিল এবং অভ্যাস মত তার স্বামীর শয্যা রচনা করিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িল—"তিনি ত এখনও ফেরেন নি।" এতক্ষণ এ কথাটি খেয়ালেই আসে নাই—কি যে ভোলা মন!

দুলালীর তখন মনে হইল, অন্যান্য দিন এতক্ষণে সে বাড়ীতে আসিয়া পুরান হইয়া যায়। আজ কেন আসিতেছে না যেই মনে হইল, এ বড় অতিরিক্ত দেরী হইয়া যাইতেছে, অমনি তার উঠ-বোস আরম্ভ হইয়া গেল। একবার সে ঘরে আসে, একবার দরজার কাছে যায়, দরজায় দাঁড়াইয়া গলা বাড়াইয়া চোখ নিংড়াইয়া যতটুকু তার দেখিবার শক্তি আছে বাহির করিয়া লয়—অই দূরের ধূসর গ্রামখানার অন্ধকার কোল পর্যন্ত পাঠাইয়া দিতে চায়—স্বামীর তবু ছায়াটি পর্যন্ত দেখা যায় না।

অবশেষে ঘেসেড়া আসিয়া উপস্থিত হইল—চার জন মানুষের কাঁধে। ঘাস কাটিতে গিয়া এক গোক্ষুরের লেজ সে চাপিয়া ধরিয়াছিল—গোক্ষুর উলটিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছে।

বহু ওঝা আসিল, মন্ত্রতন্ত্র পাঠ হইল, কিন্তু ঘেসেড়া যে চোখ মুদিয়াছে, সে চোখ আর খুলিল না।

সারারাত পতির শয্যাপার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া ভোর বেলা হতভাগী এক ছেলেকে কোলে করিয়া ও একছেলের হাত ধরিয়া মগধরাজ্য ত্যাগ করিল। এই সহায়হীনা আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দিতে এই বিশাল রাজ্যে যে কেহই অগ্রসর হইল না, এ কথা সত্য নহে। কেউ কেউ তার শরীরের লোভে, কেউ কেউ সেবার লোভে, কেউ কেউ দুটি ভাবী কৃতদাসের লোভে, আর ক্বচিৎ কেউ বা অনুকম্পার বশেও বলিল, "তুই আর এ দুটি দুধের বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যাবি দুলালি! থেকে যা—এখানে থেকে যা! আহা বিধাতার যে কি বিচার!" কিন্তু দুলালী থাকিল না। এমন কি যাত্রা করিবার আগে একবিন্দু জলগ্রহণও করিল না। কেবল একটা ছাগী দুইয়া খানিকটা দুধ একটা ঘটিতে করিয়া লইল শিশু পুত্রটির জন্য, আর কোঁচড়ে খানিকটা ভুট্টা ছিঁড়িয়া লইল বড় পুত্রের উদ্দেশে ; এই সম্বল করিয়া একদিনের সুখলালিতা দুলালী আজ জ্যৈষ্ঠের শেষে আকাশের অনলবর্ষণ মাথায় করিয়া ধূলিমাখা তপ্তবায়ু বুকে ঠেলিয়া নিঃসহায় পথে বাহির হইয়া পড়িল।

৫

রাজগেহ হইতে শ্রাবস্তী একমাসের পথ। দুলালী পথে পথে ভিক্ষা করিয়া দুই বোঝা কাঁধে লইয়া পনর দিনের পথ যাইতে দুই মাস কাটাইয়া দিল। দুই মাসের পর বুঝি বিধাতার দয়া হইল। কিন্তু অন্তর্যামীর সে দয়া অন্তরের উপর নয়—দেহের উপর। তার দেহকে ভার মুক্ত করিয়া কোলের শিশুটি খসিয়া পড়িল অর্ধপথে। হতভাগিনী যুক্তকর করিয়া মানুষের বিধাতাকে অশ্রুর অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিল। তারপর আবার পথ চলিতে লাগিল। এবারকার চলাটা অপেক্ষাকৃত সহজ। মাথার উপর মেঘপটলের আচ্ছাদন, পায়ের তলায় ধৌত তৃণের আস্তরণ। পথে ঘাটে আহারের জন্য অন্ন না মিলিলেও জল আছে ; বিশ্রামের জন্য শয্যা না মিলিলেও গাছতলা আছে। অনুগঙ্গ প্রদেশের বিরলজলা বর্ষা অল্পেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং বৃষ্টির উৎপাতও তেমন নাই।

দুলালী খুব ক্লেশ না করিয়াই আরও একমাস পথ চলিল। এবার শ্রাবস্তীর বণিকদের সঙ্গে ক্বচিৎ কোন দিন বা সাক্ষাতও হয়। শ্রাবস্তীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তারা বলে—ভালইত দেশের অবস্থা। কেবল একটা বড় ঝড় হইয়া যা কিছু ক্ষতি করিয়াছে। ঝড়ে শ্রেষ্ঠীবাড়ীর কি ক্ষতি হইতে পারে? ভুট্টাক্ষেতটা নষ্ট করিয়া দিতে পারে; গমের গোলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে; তার দ্রাক্ষা লতাটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে কি? দ্রাক্ষালতার কথা ভাবিয়া দুলালী খোকার দিকে চাহিল, খোকা বলিল, "মা, অত তাড়াতাড়ি চলিস্ না।" বলিতেই তার পা একখানা পিছলাইয়া গেল। 'ষাট্' বলিয়া মা তাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তুলিয়া লইল এবং আঁচল দিয়া মুখ মুছাইতেই দেখিল সে মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেছে। "বাবা! তোর বড় ক্লান্তিবোধ হচ্ছে?" বলিয়া সে ছেলেকে কোলে করিয়া এক গাছতলায় বসিয়া পড়িল। অল্পক্ষণ বাতাস করিতেই ছেলের চোখ দুটি মুদিয়া আসিল এবং নির্ভর সুপ্তির নিয়মিত নিশ্বাস তার ক্লান্ত দেহকে ধীরে ধীরে দুলাইতে লাগিল।

মা'র ভারি তৃষ্ণা পাইয়াছে। গেল দিনটা সে এক মুঠাও খাইতে পায় নাই। এক ফলওয়ালা দয়া করিয়া তাকে দুটি নাসপাতি দিয়াছিল, সে দুটি দিয়া ছেলেকে কোন রকম শান্ত রাখিয়াছে, নিজে এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নাই। ধীরে ধীরে ছেলের মাথা কোল হইতে নামাইয়া পরণের কাপড়ের এক মাথায় একটা পুঁটলি পাকাইয়া তার উপর রাখিল; তারপর উঠিতে গিয়াই দেখে মস্ত ভুল হইয়াছে। এখন সরিতে গেলেই হয় কাপড় ছাড়িতে হইবে, নয় খোকার মাথা মাটিতে নামাইয়া রাখিতে হইবে। খোকার মাথা মাটিতে নামাইবার কথা মনে করিতেই তার বোধ হইল যেন, কে তার বুকের উপর ঝামা দিয়া গেল। সেটা হইল না, পরণের কাপড়খানা দুই খণ্ড করিয়া সে একটু দূরে এক খালের জলে গলা ভিজাইতে গেল।

দুলালী উপুড় হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিতেছে, এমন সময় তার কানে গেল—'ওমা!' দুলালী লক্ষ্য করিল—মা ডাকটা সম্পূর্ণ ফুটিতে পায় নাই; আধেক উচ্চারিত হইতেই যেন কে তাকে চাপিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। অঞ্জলিভরা তৃষ্ণার জল জলে ঢালিয়া দিয়া সে ঊর্দ্ধমুখী ছুটিল, যেখানে ঘুমন্ত খোকাকে একলা ফেলিয়া আসিয়া ছিল। কোথায় খোকা? খোকা! ও খোকা! খোকা কোথাও নাই! দূরে বনের ভিতর শোনা গেল একদল নেকড়ে বাঘের পৈশাচিক চীৎকার!

দুলালী ছুটিল সেই বনের দিকে। তখন তার আর্তনাদ ও অঙ্গভঙ্গি বাচ্চাহারা বাঘিনীর মত এমনি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে নেকড়ের দলও বুঝি ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। তাদের পলায়নে বন যেখানে কাঁপিতেছিল, সে পাগলের মত সেখানে ছুটিয়া গিয়া দেখিল—কিছুই নাই; কেবল কালো মাটি উজ্জ্বল, টাট্‌কা, উষ্ণরক্তে লাল হইয়া আছে, যেন কে নিষ্ঠুর নখে এইমাত্র সেখানে একটা সদ্যফোটা রক্তোৎপল ছিঁড়িয়া গেছে! অভাগিনী মা সেখানে আছাড় খাইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল।

নিষ্ঠুর রহস্যপ্রিয় বিধাতার সহিল না যে মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁর কৌতুকচেষ্টা বিফল করিয়া দেয়। আকাশে তাঁর মেঘের কলসীতে জল জমা ছিল; ধারা বর্ষণ হইয়া দুর্ভাগা মাকে সচেতন করিয়া দিল। চেতনা পাইয়া সে কিছুক্ষণ বনের ভিতর ছুটাছুটি করিল। এ ঝোপে ও ঝোপে নাড়া দিল; গাছে গাছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাহিয়া দেখিল। গাছের তলায় ঝরাপাতা সরাইয়া সরাইয়া খুঁজিল। পাখীর ডাক শুনিয়া খরগোসের সাড়া পাইয়া 'খোকা খোকা' বলিয়া চেঁচাইল, বনের হরিণ মুখের ঘাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া দুই ডাগর চোখে তার দিকে চাহিয়া রহিল। বনমোরগ মানুষের অস্তিত্ব বুঝিয়া পলাইতে গিয়া আবার তার দিকে কু কু কু করিয়া তাকাইল। কিন্তু বিধাতার মন গলিল না।

সারাদিন ছোটাছুটির পর সন্ধ্যার সময় সে এক গাছতলায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। যা তা ভাবনা—আগা নাই, গোড়া নাই, জোড়া নাই! হঠাৎ একবার তার মনে হইল, সে যেদিন বাড়ী হইতে পলাইয়া আসে, সে-দিন তার বাপমাও হয়ত এমনি পাগল হইয়া তাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কত কাঁটাবনে বন্ধুর পথে ছুটিয়াছিল। যেই সে কথা মনে হওয়া, অমনি সে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল শ্রাবস্তীর পথে।

আধক্রোশ দৌড়াইতেই গলায় ও বুকে তীব্রবেদনা বোধ হইল। তবু দুলালী দৌড়াইতে ছাড়িল না। আরও খানিকটা দৌড়াইয়াই সে বসিয়া পড়িল এবং সেইখানেই ধীরে ধীরে তার চৈতন্য লোপ পাইল।

এক বণিক উটের সারি বাণিজ্যদ্রব্যে বোঝাই করিয়া শ্রাবস্তী যাইতেছিল। সে পথের পাশে এক নেকড়াপরা অচেতন ধূলি-মলিন বিদেশিনীকে দেখিতে পাইয়া উটের পিঠে তুলিয়া লইল এবং সাবধানে আগুলিয়া রাখিয়া গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল। শীতল বাতাসে ও সেই কুব্জপৃষ্ঠ জীবের সচল দোলানিতে দুলালীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জ্ঞানলাভ করিয়াই সে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং লাফাইয়া মাটিতে পড়িবার উপক্রম করিল। বণিক তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল, "বাছা, ভয় পাইও না। দেখিতেছি, তুমি নিতান্ত দুর্বল। আগে এই দুধটুকু খাও; তারপর যেখানে যাইতে চাও, তোমাকে পৌঁছাইয়া দিব।" বণিকের মুখে সাধুভাষা শুনিয়া এবং তাহার সদয় ও সরল ব্যবহার দেখিয়া দুলালীর ভয় দূর হইল। ইঁহার অনুরোধ রক্ষা না করা অধর্ম হইবে মনে করিয়া সে দুধটুকু খাইয়া ফেলিল। তার-পর বণিকের আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাকে আপন অবস্থা ও পরিচয় নিবেদন করিয়া ফেলিল। বণিক সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাকে অভয় দিলেন; কিন্তু তার বাপ-মায়ের কথা কিছুই বলিলেন না।

শ্রাবস্তীতে পৌঁছিতে আরও দুই দিন লাগিল। এই দুই দিন বণিকের করুণায় দুলালীর কোন কায়িক ক্লেশ সহিতে হইল না; কিন্তু তার মনটি কেন জানি দমিয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, কে যেন দুই অদৃশ্য হাত বাড়াইয়া কেবলই তাহার গলা চাপিয়া ধরিতেছে। তার হাতে পায়ে কে যেন খণ্ড খণ্ড পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রাশি রাশি কি সব ভাবনা কে যেন তার মাথার ভিতর ঠাসিয়া ঢুকাইয়া দিতেছে—সে তার আগাগোড়া কিছুই মিল করিতে পারিতেছে না। অবশেষে যখন বণিক তাকে তার পিত্রালয়ের পথে নামাইয়া দিলেন, তখন বাস্তবিকই আর তার পা চলে না। মাথায় পাথরের বোঝা ও বুকের

ভিতরে একটা শূন্যতার বেদনা লইয়া পা টানিয়া টানিয়া সে তার শৈশবের খেলাঘরের দিকে চলিল।

• কোথায় সে ঘর? প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড ঘরখানার টালির ছাদ কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, মাটির দেয়াল ক'খানা ভিটার উপর ঢিপি হইয়া পড়িয়া আছে। তুলালী ডাকিতে চাহিল—"মা!" কথা গলায় বিঁধিয়া গেল। অপরিচিত লোকের সাড়া পাইয়া এক বৃদ্ধা আঙ্গিনার কোণে একখানা খড়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে তুলালীর ধাই। তুলালী তাকে চিনিতে পারিয়া কষ্টে ডাকিল, 'ধাই মা!' ধাই-মা কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল এবং তার বাপ-ভাইয়ের নাম করিয়া আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তুলালী তার কান্না হইতে বুঝিয়া লইল, যে পথে তার সোনার চাঁদ শিশু তুটি গিয়াছে, সে পথে তার মা, বাপ, ভাই—তিনজনেই গিয়াছে। শ্রাবস্তীতে এক রাত্রে ভীষণ ঝড় হইয়া চল্লিশখানা ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছিল। কিন্তু কোন ঘরের তলে কোন মানুষ চাপা পড়ে নাই, চাপা পড়িয়াছে কেবল তিনটি প্রাণী—শ্রেষ্ঠী তনয়ার মা আর বাবা আর ভাই—তার অদৃষ্ট-দেবতার কৌতুক-যূপে বলির পশু। তুলালী কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। না কাঁদিল, না হাসিল। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল

> উভো পুত্তা কালং কতা, পন্থে মষ্হং পতি মতো
> মাতা পিতা চ ভাতা চ একচিত কস্মিং ডয্হরে।

৬

তথাগত বসিয়া আছেন ধ্যানমগ্ন। একটু পূর্বে এক পুত্র-শোকাতুরা তাঁর পায়ের কাছে আপন মৃত সন্তানকে নামাইয়া রাখিয়া তার প্রাণদানের দাবী করিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন—এমন ঘর থেকে এক মুঠো সরষে আন, যে ঘরে কেউ কোন দিন মরে নাই; তবেই তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব। মা চলিয়া গেছে সেই সরিষার অনুসন্ধানে। তাকে বিদায় করিয়া তিনি বদ্ধাসন হইয়া নির্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত বসিয়াছিলেন, এমন সময় তুলালী ছুটিয়া আসিয়া তুই হাতে চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল

> "উভো পুত্তা কালং কতা, পন্থে মষ্হং পতি মতো
> মাতা পিতা চ ভাতা চ একচিত কস্মিং ডয্হরে॥"

ভগবানের ঠোট তুখানি কাঁপিয়া উঠিল—প্রথম আলোর আঘাতে পদ্মপলাশের মত। তিনি না চাহিয়াই বলিলেন

> "যো চ বস্সমতং জীবে অপস্সম্ উদয়ব্ব্যয়ং
> একাহং জীবিতং সে য্যো পস্সতো উদয়ব্ব্যয়ং।+

মধুর অথচ গভীর সুরের সেই শ্লোক শুনিয়া শ্রেষ্ঠী-কুমারী খানিক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর গলবস্ত্র হইয়া তথাগতের পায়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। আনন্দ অশ্রুপূর্ণ চোখ তুটিতে জিজ্ঞাসা লইয়া গৌতম বুদ্ধের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর মনে কেবলই প্রশ্ন হইতেছিল—এ যে যথার্থই তুঃখিনী—এ কি ভাবে একে বিদায় করিলে প্রভু!

মহাবুদ্ধ মৃতু হাসিয়া বলিলেন—"অচিরেই ওর তুঃখাবসান হইবে।"

শিষ্যগণ অবাক হইয়া ভাবিল—এ কি মৃত্যুর দ্বারা?

তুলালীর চিত্ত কিন্তু হঠাৎ কি-করিয়া এক প্রগাঢ় শান্তিতে ডুবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া ধাইমাকে ডাকিল। তারপর তার সাহায্যে সেই ভাঙ্গা ঘরের মাটীর স্তূপ সরাইয়া ফেলিয়া তাতে খড় দিয়া একখানা অতি নীচু এবং অতি সামান্য ডেরা বাঁধিয়া লইল।

এই ঘরে সে কাটাইয়া দিল একমাস। দিনে একবার একখানা রুটি সেঁকিয়া মুখে দেয়, একবার পাড়ায় ঘুরিয়া দীন তুঃখীদের খবর নেয়, আর বাকী সময় ঘরে বসিয়া চোখ মুদিয়া কি ভাবে।

একদিন সে এক পীড়িত কাদামাখা কুকুরকে ধুইয়া মুছাইয়া নিজের সেদিনকার সম্বল একমাত্র রুটিখানা খাওয়াইয়া দিয়া পৈঠার উপর দাঁড়াইয়া পায়ে জল ঢালিতেছে—এমন সময় লক্ষ্য করিল সেই পাদোদক নীচের দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে। তুলালী তার দিকে চাহিয়া রহিল; হাতের ঘটি হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া ঠন্ ঠন্ করিতে করিতে কোথায় চলিয়া গেল, সে জানিতেই পারিল না। ধাই আসিয়া ডাকিল, "কি মা! এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?" ··· কোন উত্তর নাই—হয় ত তার কথা সে শুনিলই না। অই পা-ধোওয়া জলের মধ্যে এ আগুনে-পোড়া নারী কি দেখিয়া এমন বিমূঢ় হইয়া গেল? সে-ই জানে কি দেখিল; কিন্তু সে নড়িল না। ধীরে ধীরে বেলা পড়িয়া আসিল; গাছের ছায়া আঙ্গিনা হইতে বাড়িয়া বাড়িয়া ঘরের চাল পর্যন্ত ডুবাইয়া দিল এবং পরে গাছগুলিও পাতার ফাঁকে কালো হইয়া উঠিল; কিন্তু তুলালী অবিচলভাবে দাঁড়াইয়াই রহিল। দাঁড়াইয়া রহিল—সেই জলের দিকে চাহিয়া রহিল। মাথার উপর ঘরের ছাঁচ কালো, পায়ের তলে জলের ধারা কালো, বাহিরে গাছতলা কালো, সেই আঙ্গিনা জোড়া কালোর মধ্যে কেবল তার কালো চোখ তুটি উজ্জ্বল। হঠাৎ সে বিড় বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল

> "তুন্নিগ্ গহস্স লহুনো যথকাম নিপাতিনো
> চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।"

তার মনে হইল, এই জলটা যতক্ষণ ঘটির মধ্যে আবদ্ধ ছিল ততক্ষণ ছিল নির্মল, ছিল অচঞ্চল। কিন্তু যেই সে মুক্ত হইল, অমনি সে ছড়াইয়া পড়িল—পঙ্কিল হইল—'থল' হইতে নীচের দিকে ছুটিল। চিত্তকেও তেমনি ছাড়িয়া দিলে সে ছড়াইয়া পড়িবে কারণ সে

"দেয় না ধরা, নিপুণ ধারা, যথায় খুশী ছুটিয়া চলে।" তাই তাকে ধরিয়া রাখিতে হইবে—মুখে বল্গা পরাইয়া তাকে শাসন করিতে হইবে।

তুলালী যখন এমনি ধ্যানমগ্ন, তখন আবার ধাই আসিয়া বলিল, "ওমা! রাত হয়ে এল যে, সন্ধ্যাদীপ জ্বালবে না?"

তুলালী যেন ঘুমাইয়া জাগিয়া উঠিল। তাইত! সন্ধ্যা হইয়া আসিল—এখন যে দীপ জ্বালাইতে হয়। তাড়াতাড়ি সে ঘরে গিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিতে স্থাপন করিল এবং মঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া সেই দীপশিখার প্রতি চাহিয়া রহিল, আবার ধ্যান!

+ যে জন্ম মৃত্যু না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ সে, যে জন্ম মৃত্যুকে জানিয়া এক বৎসরও বাঁচে।

এই যে দীপশিখা আকাশে ধুঁয়া ছড়াইয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া জ্বলিতেছে—এমনি জ্বলে ত আমাদের বাসনা! চায় সে ভূমি—চায় সে জল—চায় সে আকাশ—চায় সে নক্ষত্র ছিঁড়িয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতে! যা চায় তা পায় না! আরও বেশী করিয়া চায়! আকাশ থাকে আকাশের আসনে, নক্ষত্র থাকে নক্ষত্রের রাজ্যে, বাতাস শুধু ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়! এই ত আমাদের জীবন! এই আচ্ছন্ন আলোকহীন জীবনের পরিণাম কি?

"কামনার ফুল চরণে মগন—মৃত্যু আসিয়া গ্রাসে
সুপ্ত পল্লী নিরুপায় যেন বন্যার জলে ভাসে।" (ক)

ওগো কে এই দুর্ভাগ্য হইতে মানুষকে ত্রাণ করিবে? কে এই যমলোক জয় করিবে?

'কো ধম্মপদং সুদেশিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি?'

দুলালী এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না; তার অন্তর কেবলই মথিত হইতে লাগিল এবং সে দীপশিখা তার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তারপর সহসা একবার মঞ্চ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রদীপের সলিতাটি সুচ দিয়া টানিয়া তেলে ডুবাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসনা নিভিল—দুলালী নির্ব্বাণ লাভ করিল!

সেই রাত্রেই সে ভগবান তথাগতের চরণে আশ্রয় পাইল—সে থেরী হইল—তার নাম হইল পটাচারা।(১)

(ক) পুপ্ফানিহেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং
সুত্তং গামং মহোহেব মচ্চু আদায় গচ্ছতি
ধর্ম্মপদ, পুপ্ফ বগ্‌গো

(১) পটাচারা শব্দের অর্থ প্রথমে পতিত, পরে আচারসম্পন্ন।

মাছরাঙা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

এই বিস্ময়কর সুন্দর সৃষ্টির ভিতর পুষ্প, প্রজাপতি ও পক্ষীর মত মনোহর বোধ হয় আর কেহই নয়। বিশ্ব-স্রষ্টা ইহাদের দেহে যে চিত্রণ ও অঙ্কন-কলা-কৌশলের এবং বিন্যাস-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদিগের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। নিসর্গানুরাগী কবিকুল চিরকালই এই তিনটি প্রীতিপ্রদ প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহাদের রূপ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিনের বর্ণ-বৈচিত্র্যই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিহঙ্গমগণের আরও একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাদের কণ্ঠ হইতে সঙ্গীতের ন্যায় সুললিত স্বর-লহরী নির্গত হয়। ইহাদিগকে কানন-সভার বৈতালিক বলিলে ভুল হয় না। অবশ্য সকল পাখীই সুকণ্ঠ নয়। যাহারা বিশেষ সুদর্শন তাহারাই সুকণ্ঠ, ইহাও সত্য নয়। কর্কশকণ্ঠ কাকের মতই কৃষ্ণকায় কোকিল কমনীয় কণ্ঠের জন্য কল্পনা-কুশলী কবিকুলের প্রশস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য কবিরাও পক্ষীকে কিরূপ উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন, তাহা শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক পড়িলে বুঝা যায়। বর্ণ-বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক, সামান্য শব্দেই শঙ্কিত হইয়া সঞ্চরণশীল চির-চঞ্চল বিহঙ্গমগণ প্রকৃতি মাতার শ্যামল অঞ্চলের উপর বসিয়া যখন শ্রুতি-তর্পণ সঙ্গীতের তরঙ্গ তুলিয়া থাকে তখন অ-ভাবুকের মনেও ভাব-সঞ্চার অসম্ভব নয়। প্রাণীদের মধ্যে পাখীরাই সকলের আগে নিদ্রা হইতে জাগে এবং নব-দিবসের আগমনী-গান গাহিয়া আমাদিগকেও জাগাইতে চেষ্টা করে। তিমির-যবনিকা তুলিয়া ফেলিয়া পূর্ব্বাকাশে উষার কনকাভা যেমন উঁকি মারে অমনই শ্যামসুন্দর শাখীসমূহ হইতে লক্ষ লক্ষ পাখী কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়া পরম-দেবতার প্রভাত-আরতি সমাপন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও আবার নবোৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান জানায়। যেমন অত্যন্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যশালী পুষ্পপুঞ্জকে বিশেষ সুরভিশালী হইতে প্রায়ই দেখা যায় না, তেমনই বিহঙ্গমগণের মধ্যে যাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বর্ণৈশ্বর্য্য অত্যন্ত অধিক তাহারা প্রায়ই সুকণ্ঠ হয় না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে পাখীর কথা "ভারতবর্ষ-এর" পাঠকবর্গকে জানাইব তাহারাও তেমন সুকণ্ঠ নয়, তবে বিশেষ বর্ণ-বৈচিত্র্যশালী বটে।

মৎস্যরঙ্গ এই সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা মাছরাঙা। মৎস্যেই যাহাদের রঙ্গ বা আনন্দ তাহারাই মৎস্যরঙ্গ। অবশ্য এই আনন্দের অংশ মৎস্যগণ পায় না। কারণ মাছরাঙার আনন্দ বা প্রাণ-ধারণের পন্থা মাছের মৃত্যু-যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই প্রসারিত। মৎস্যরঙ্গ হইতে মাছরাঙা শব্দের উৎপত্তি হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে মৎস্যরঙ্গ শব্দের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই না। এই পক্ষীর কুরর ও উৎক্রোশ এই দুইটি নামই সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। জৈন-সূরী হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধান-চিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ কোষ-গ্রন্থে "উৎক্রোশো মৎস্যনাশনঃ কুররঃ" এই তিনটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কুরর পক্ষীর চীৎকার কতকটা উচ্চ আর্ত্তনাদের মত শুনায় বলিয়া প্রাচীন কবিগণ কেহ কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিলে কুরর বা কুররীর ন্যায় কাঁদিতেছেন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে এইরূপ উপমা প্রথম প্রাপ্ত হই। রামের বিরহ-বেদনায় বিহ্বল হইয়া রাজা দশরথ দেহত্যাগ করিলে পুত্র-বিচ্ছেদকাতরা ও পতি-বিয়োগবিধুরা কৌশল্যা কুররীর ন্যায় করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন (ক্রোশন্তীম্ কুররীম্ ইব) করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস যেখানে এইরূপ উপমার আশ্রয় লইয়াছেন পৃথিবীতে সেরূপ সকরুণ দৃশ্য অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। সতী-শিরোমণি সীতা দীর্ঘকাল দারুণ দুঃখ ভোগের পর রামের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সুগভীর সুখ-সাগরে সন্তরণ করিতেছেন তখন রামচন্দ্র প্রজা-রঞ্জনের জন্য বাধ্য হইয়া সসত্ত্বা সীতাকে সহসা লক্ষ্মণের সহিত বনে পাঠাইলেন। লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে প্রবেশ করিয়া সীতাকে সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বিষাদভারাক্রান্ত অন্তরে মন্দমন্থরপদে অযোধ্যায় ফিরিয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ যতক্ষণ দৃষ্টি-পথের অন্তরালে না গেলেন সীতা ততক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন লক্ষ্মণকে আর দেখা গেল না তখন সীতা শরবিদ্ধা কুররীর মত উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। এই অবস্থার বর্ণনায় কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাস লিখিয়াছেন—

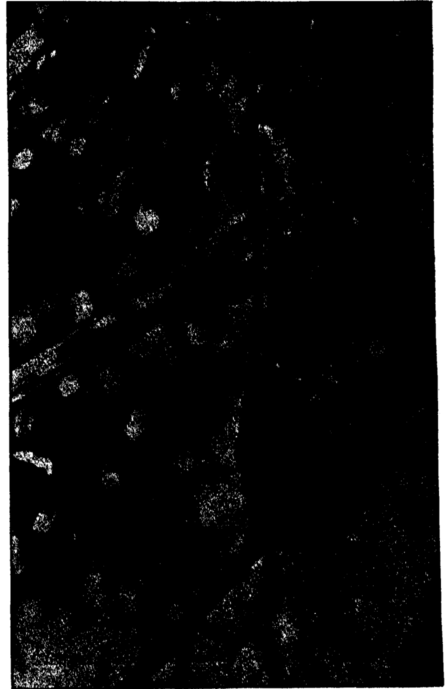
তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং রামানুজে দৃষ্টি-পথ ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীবভূয়ঃ॥

তারপর সীতার ক্রন্দনে সমগ্র বনভূমি কাঁদিয়া উঠিল। বিষাদে ম্রিয়মাণ ময়ূরেরা নৃত্য ভুলিয়া সীতার অশ্রুকরুণ মুখের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। বন-বক্ষে বিরাজিত তরুরাজি হইতে পুষ্পপুঞ্জ অশ্রুবিন্দু সমূহের মত ঝর-ঝর ঝরিতে লাগিল। সীতার দুঃখে বিষাদম্লান মৃগীগণের মুখ হইতে অর্দ্ধ-চর্ব্বিত তৃণখণ্ডগুলি খসিয়া পড়িল। যেন সীতার প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত হইয়া সমগ্র তপোবন শোক-স্তব্ধ মূর্ত্তিতে অজস্র বেদনাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমরা ভারতের কাব্য-কাননে 'কুররী' শব্দের সন্ধানে বাহির হইয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে এইরূপ শোক-করুণ দৃশ্যের সম্মুখে আনিয়া যদি তাঁহাদের অন্তর-তন্ত্রীতেও একপ্রকার বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হওয়ার কারণ হইয়া থাকি, আশা করি তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

মৎস্যরঙ্গ অপেক্ষা মাছরাঙার পক্ষে মৎস্যনাশন নামটিই অধিক উপযোগী। আয়ুর্ব্বেদেও উৎক্রোশ পক্ষীর উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ইহার মাংসকে স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য, রসে ও পাকে মধুর, শুক্রজনক, রক্তপিত্তনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

এই পক্ষী ইংরেজীতে 'কিংফিশার' আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহার সাধারণ লাটিন নাম 'এলসেডো'। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর মাছরাঙার ভিন্ন ভিন্ন লাটিন নাম আছে। প্রতীচীতে একটা বাক্য প্রচলিত আছে, মাছ না থাকিলে মাছরাঙা থাকিত না। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। মাছ না থাকিলে মাছরাঙা শব্দটি থাকিত না বটে, কিন্তু এই জাতীয় পক্ষী থাকিত না ইহা কিরূপে হইবে? মাছ না থাকিলে ইহারা অন্য কিছু খাইয়া জীবন-ধারণ করিত। জীবিত থাকিবার বা জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন আহার্য্য আহরণ করে। বাঘ মানুষ খায় বলিয়া মানুষ খাইবার জন্য বাঘের সৃষ্টি, ইহা কেহ মনে করেন না। তেমনই মাছ খাইবার জন্য মাছরাঙা বা মাছ আছে বলিয়াই মাছরাঙা আছে, ইহা মনে করাও ভুল। শুধু মাছরাঙা নয় অন্যান্য নানা জাতীয় পক্ষী মাছ খাইয়া জীবনধারণ করে। মাছ অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষেরও একটি প্রধান খাদ্য। সুতরাং কোন একটি বা কতকগুলি জীবের জন্য মাছের সৃষ্টি এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্রষ্টা অমুক জীব কেন সৃষ্টি করিয়াছেন এই জিজ্ঞাসার সংশয়াতীত উত্তর বৈজ্ঞানিকগণও দিতে পারেন না। তবে ইহা সত্য যে প্রাণীদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত সংখ্যাধিক এবং যাহাদের শরীরের সহিত আত্মরক্ষার উপযুক্ত কোন অস্ত্র সংযুক্ত নাই তাহারা সহজেই অপর জীবের আহার্য্যে পরিণত হইয়াছে। মৎস্যেরা এইরূপ প্রাণী। আক্রমণকারীদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত কোন অস্ত্র ইহাদের দেহে নাই বলিয়া জলতলবাসী হইলেও অন্তরীক্ষচারী পক্ষীদিগের পক্ষেও ইহাদিগকে আক্রমণ ও গলাধঃকরণ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। কাঁকড়ার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রশালী এবং শামুক, গুগলি প্রভৃতির ন্যায় কোষস্থ প্রাণীকে আক্রমণ ও ভক্ষণ সেরূপ সহজ-সাধ্য নয়। সেইজন্য মৎস্যাশী পক্ষীর সংখ্যা অধিক। আফ্রিকায় একপ্রকার ঈগল পক্ষী আছে যাহারা শুধু মাছ খাইয়া বাঁচে। তাহারা হ্রদ বা নদের বক্ষ হইতে বড় বড় মাছ সুদৃঢ় চঞ্চুর সাহায্যে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া শৈল-শীর্ষে নির্ম্মিত নীড়ে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করে।

মানুষ ছাড়া আর সকল প্রাণীই অবিরাম আহার্য্য আহরণে ব্যস্ত। ভক্ষ্যই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, খাদ্যের জন্য জীব-জগতে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা প্রতিনিয়ত চলিতেছে। কোন পক্ষী জল হইতে, কেহ স্থল হইতে, কেহ-বা অন্তরীক্ষ হইতে ভক্ষ্য সংগ্রহ করিতেছে। কেহ-কেহ জলচর, স্থলচর ও খেচর ত্রিবিধ জীবকে ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে আহার্য্যের প্রকৃতির সহিত প্রাণী মাত্রেরই আকৃতির সম্পর্ক আছে। বক দীর্ঘ-চঞ্চু না হইলে তাহার পক্ষে তীরে তীরে বিচরণ করিয়া জলাশয়ের গর্ভ হইতে জলতলচারী জীবকে আক্রমণ করা সম্ভব হইত না। বিবর্ত্তবাদীরা বলেন, জীবগণ প্রথম হইতেই এই যোগ্যতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহা ইভলিউশন বা ক্রমঃ বিকাশের ফল। পূর্ব্বজগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি পরবর্ত্তিগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃষ্ট হয় না। ভক্ষ্যপ্রাণীর প্রকৃতি ও তাহার পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী ভক্ষক প্রাণীর আকৃতি ক্রমশ পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে। যাহারা প্রধানত উড্ডীয়মান পতঙ্গাদি প্রাণীকে খাইয়া জীবনধারণ করে তাহাদিগের সহিত মৎস্যাদি জলচর জীব ভক্ষণকারী পক্ষীর আকৃতিগত পার্থক্য ক্রমশ পরিস্ফুট বা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অপর পক্ষে যে সকল পাখী ভূতল হইতে শস্যকণা বা পোকা-মাকড় খুঁটিয়া খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহাদের চঞ্চু প্রভৃতির আকার ক্রমশ অন্যপ্রকার হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যের প্রকার ও খাদ্য সংগ্রহ করিবার প্রণালীভেদে এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে একই শ্রেণীভুক্ত পক্ষীগণ পরে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়া অসম্ভব নয়। ডারউইন প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদীরা প্রকৃতির ক্রোড়ে জীবের বিভিন্ন জাতির প্রথম আবির্ভাব এবং তাহাদের পরবর্ত্তী ক্রম-বিকশিত হইবার কাহিনী কহিয়াছেন। বানরের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া সুসভ্য নরে বিবর্ত্তিত হইবার বিবরণ বিবর্ত্তবাদীর প্রদত্ত

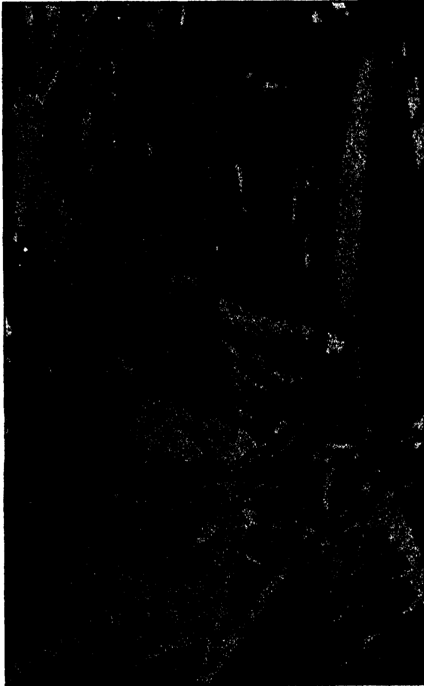


পক্ষীর সন্তান-বাৎসল্য—মাতা ভক্ষ্য কীট-পতঙ্গ চঞ্চুপুটে আনিয়া শাবককে দিতেছে। নীড়টি লক্ষ্য করিবার যোগ্য

বিচিত্রতম বার্ত্তা সন্দেহ নাই। আহার্য্য আহরণ প্রতিযোগিতায় যাহারা জয় লাভ করিতে পারে নাই তাহারা এই বিশাল বিশ্ব হইতে ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু জীবকে আজ দেখিতে পাই না। শুধু ভূস্তরে অবস্থিত প্রস্তরীভূত পঞ্জরপুঞ্জ তাহাদের অতীত অস্তিত্বের সাক্ষ্য আমাদিগকে প্রদান করিতেছে। বিবর্ত্তবাদীরা ইহাকে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) বলিয়া থাকেন।

আমরা বাল্যকালে শান্তস্বভাব, সুদৃশ্য ও সুকণ্ঠ পক্ষীগুলিকে দেখিয়া মনে করিতাম তাহারা অহিংসার মূর্ত্তি। ভাবিতাম তাহারা বনজাত

সুপক্ব ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। পরে বুঝিলাম তাহা নহে। নানা প্রকার কীট পতঙ্গই পক্ষীদের প্রিয় ও প্রধান ভক্ষ্য, তাহারা আদৌ অহিংস নয়। আমরা পক্ষীদিগকে পিঞ্জরে পুরিয়া ছাতু ও ছোলা খাইতে বাধ্য করি বটে, কিন্তু উহারা সেই আহার্য্য প্রীতির সহিত গ্রহণ করে না, পেটের জ্বালায় খায় মাত্র। সুসভ্য মানুষ ছাড়া আর কেহই অহিংস নয়। বৃহত্তর প্রাণী ক্ষুদ্রতরদিগকে, ক্ষুদ্রতরগণ তাহাদের অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর যাহারা তাহাদিগকে খাইয়া যে ভাবে জীবন ধারণ করে তাহাতে জীবগণের জীবনধারণ-ব্যাপারে হিংসার অপ্রতিহত আধিপত্যই আমরা দেখিতে পাই। যাহারা তৃণভোজী বা ফলাহারী তাহারাও অহিংস নয়। অহিংস হইলে তাহাদের পক্ষে ভক্ষ্য আহরণ ও আত্মরক্ষা সম্ভব হইত না। এই যে হিংসাত্মক সংহারকার্য্য নিসর্গের বুকে নিয়ত চলিতেছে ইহা অবশ্য স্রষ্টার ইচ্ছাতেই হইতেছে। ইহাতে ফল এই হইতেছে, কোন জাতীয় প্রাণী অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া সৃষ্টির বুকে বিশৃঙ্খলা জন্মাইতে



মাছরাঙার স্বধর্মী বকজাতীয় একপ্রকার পক্ষীর নীড়—শ্বেতবর্ণ ডিমগুলি পক্ষী-মাতার পেটের নীচে দেখা যাইতেছে

পারিতেছে না। সৃষ্টি ও পালনের প্রবাহকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই এই ধ্বংস-লীলা। ভগবান নিজেই এই ধ্বংস-কার্য্য করিতেছেন, বাঁচিবার জন্য আগ্রহান্বিত জীবগণ নিমিত্ত মাত্র।

জীব-জগতের বা পক্ষী বিভাগের যে অংশটি মাছরাঙা ও তাহার জ্ঞাতিগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও বিধাতার বিশাল কর্ম্মমন্দিরে ইহাদের ত কাজ আছে, ইহারাও বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয়ের জন্য আসিয়াছে এবং নিয়ন্তার কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় ইহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে। যে সকল পক্ষী জল হইতে আহার্য্য আহরণ করে, এক প্রকার বৈশিষ্ট্য তাহাদের সকলের দেহেই দৃষ্ট হয়। মাছরাঙা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং উহা ছাড়া ইহার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান।

নাম শুনিলে মনে হয় মাছরাঙা মাত্রই মাছ খাইয়া জীবনধারণ করে; কিন্তু মনোযোগ সহকারে দেখিলে আমরা জানিতে পারি, সকল মাছরাঙা মৎস্যভোজী নহে। তবে আমাদের দেশে যে সকল মাছরাঙা সাধারণত দেখা যায় তাহারা মৎস্যাহারী বটে। ইহাদের লাটিন নাম এলসেডো ইস্‌পিডা। রবিনরেড ব্রেষ্ট, নাইটিঙ্গেল, স্কাইলার্ক প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী ইংলণ্ডে থাকিলেও এলসেডো ইস্‌পিডাই এই দ্বৈপায়ন দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বিহঙ্গম। অবশ্য ইহারা নাইটিঙ্গেল বা স্কাইলার্কের মত কল্পনাকুশলী কবিকুলের কর্ণতর্পণ ও চিত্ত-রসায়ন সঙ্গীত-ধারা বর্ষণ করে না, বর্ণৈশ্বর্য্যই ইহাদের মনোহারিত্বের একমাত্র কারণ।

আমাদের দেশেও এমন মাছরাঙা আছে যাহারা জীবনরক্ষার জন্য শুধু মাছের উপর নির্ভর করে না, পোকা-মাকড় এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। একপ্রকার শ্বেত-বক্ষ উৎক্রোশপক্ষী ভারতে লক্ষিত হইয়া থাকে যাহারা জল এবং স্থল উভয় স্থান হইতেই ভক্ষ্য সংগ্রহ করে। অষ্ট্রেলিয়ার সলিললেশশূন্য মরুময় অংশগুলিতে একজাতীয় মাছরাঙা দেখা যায় যাহারা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে স্থলচর জীবে পরিণত হইয়াছে। তবে খাদ্যভেদে বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে এই পক্ষীদের মধ্যে পরস্পর আকৃতিগত পার্থক্য যতই জন্মিয়া থাকুক স্বজাতিত্বের নিদর্শন একটা সাদৃশ্যও অস্বীকার করা যায় না। এই শ্রেণীর পক্ষীর এমন একটা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে মাছরাঙা মাত্রই যাহার অধিকারী। চঞ্চুপুটের দৃঢ়তা এই জাতীয় পক্ষীর একটি প্রধান লক্ষণ। এই দৃঢ়তা না থাকিলে জল হইতে ছোঁ মারিয়া মাছ তুলিয়া লওয়া এবং চঞ্চুপুটে চাপিয়া উড়িয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি প্রত্যেক জলচর পক্ষীর চঞ্চুই দৃঢ় হইয়া থাকে। কোন-কোন মাছরাঙার চঞ্চু ক্রৌঞ্চ বা বলাকার চঞ্চুর মত লম্বা। কোন-কোন মাচরাঙা দেখিতে অনেকটা বকের মত। হংস, সারস, বক প্রভৃতি মৎস্যাশী পক্ষী অপেক্ষা মাছরাঙার চঞ্চু দৃঢ়তর হওয়া দরকার। কারণ তাহারা সাধারণত ধৃত মৎস্য জলে বা জলের ধারে আহার করে না, দূরে লইয়া যায়। ইহাদের সুদৃঢ় ও সুকঠিন চঞ্চুপুটে ধৃত হইলে সেই মৎস্যের পক্ষে মুক্তিলাভের কোন আশাই থাকে না। মাছরাঙার মুখ বড় এবং মুখের পর দেহটি ক্রমশ নিম্নগামী হইয়া ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পুচ্ছে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক-ভেদে ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে আকৃতিগত তারতম্য জন্মিয়াছে তাহা চঞ্চু, পক্ষ ও পুচ্ছ এই তিনটি অঙ্গেই অধিক পরিস্ফুট। মৎস্যজীবী মাছরাঙাদের চঞ্চু দীর্ঘতর, দৃঢ়তর এবং সুক্ষ্মাগ্র হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের পুচ্ছ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। পুচ্ছ দীর্ঘ হইলে ইহাদের পক্ষে সবেগে জলে ডুবিয়া মাছ ধরা সহজ হইত না। পুচ্ছ ছোট হইলেও ইহা জলে বিচরণের সময় দাঁড়ের কাজ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। যাহারা পোকা-মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের চঞ্চু প্রশস্ততর এবং উহার তলদেশ সমতল। কাহারও কাহারও চঞ্চুর অগ্রভাগ শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় কিঞ্চিৎ বক্র। মৎস্যজীবী মাছরাঙা-কিরূপ তাহা আমাদের দেশের সাধারণ মাছরাঙা 'এলসেডো ইস্‌পিডা'-দিগকে দেখিলে বুঝা যায়। আমরা পূর্ব্বে যে শ্বেত-বক্ষ মাছরাঙার নাম উল্লেখ করিয়াছি উহাদিগকে মৎস্যাশী এবং পোকা-মাকড়ভোজী দুইই বলা চলে। সুতরাং ইহাদের দেহে এই দুইপ্রকার মাছরাঙা-বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত থাকা স্বাভাবিক। ইহাদের চঞ্চু মৎস্যজীবী সাধারণ মাছরাঙার মত দীর্ঘ এবং সেই চঞ্চুর তলদেশ পোকা-মাকড়ভোজী মাছরাঙাদের মত সমতল।

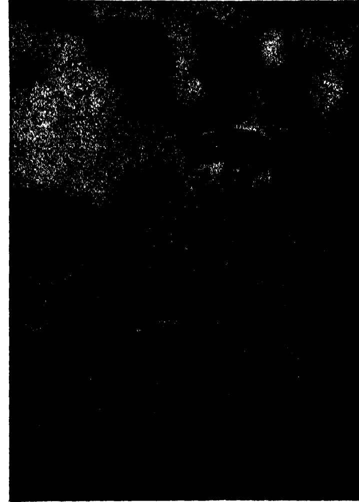
আমরা বলিয়াছি, মাছরাঙা কোকিল বা স্কাইলার্কের মত সুকণ্ঠ নয় কিন্তু বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কোন-কোন শ্রেণীর মাছরাঙার পক্ষগুলির বর্ণ-রাজির ঔজ্জ্বল্য অসাধারণ। এক জাতীয় মাছরাঙার

ইংরেজী নাম 'পায়েড-কিংফিশার'। বাসস্থল-ভেদে ইহাদিগকেও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। গিরিরাজ হিমাদ্রির নিম্নাংশে বিরাজিত বিরাট বনানীর বক্ষে এক প্রকার মাছরাঙা বাস করে। ইহাদিগের ইংরেজী নাম 'হিমালয়ান পায়েড-কিং-ফিশার'। অপরটি প্রান্তর-প্রধান প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া 'প্রান্তরবাসী পায়েড-কিংফিশার' বলিলে ভুল হয় না। হিমালয়বাসী পায়েড-মাছরাঙারা আকারে প্রান্তরবাসী পায়েড-মাছরাঙা অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর। প্রান্তরবাসী পায়েড-মাছরাঙাদের পক্ষ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। আমাদের দেশের সাধারণ মাছরাঙারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহাদের পক্ষের বিচিত্র বর্ণ-রাগ অত্যন্ত নেত্ররঞ্জন বা চিত্ততর্পণ। ইহাদের পাখা নীল ও কালো রঙের এবং কণ্ঠদেশ শুভ্র। ইহাদের দেহের তলদেশের কোন কোন অংশ কমলালেবু রঙে রঞ্জিত। এক রকম মাছরাঙা যাহারা তিত-আঙুলে (থ্রি-টোড) আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহারা আকারে প্রায় সাধারণ মাছরাঙার মত হইলেও ইহাদের সৌন্দর্য্য বা বর্ণৈশ্বর্য্য অতুলনীয়। দেখিলে মনে হয় যেন কোন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী শিল্পী নানা বর্ণরাগরঞ্জিত রমণীয় রত্নরাজি একত্র গ্রথিত করিয়া মনোরম বিহঙ্গম রচনা করিয়াছেন এবং মন্ত্রবলে উহার দেহে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিয়া আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেন উহাদের দেহ রক্তমাংসময় না হইয়া মণি-মাণিক্যময়। ইহাদের কমলালেবু রঙে রঞ্জিত পাখা বেগুনী ও নীল আভায় মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

এক শ্রেণীর মাছরাঙা সারস পক্ষীর ন্যায় দীর্ঘ চঞ্চুবিশিষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে 'সারস-চঞ্চু' বলা হয়। ইহাদের লাটিন নাম র‍্যাম-ফ্যালসিয়ন ক্যাপেনসিস্। এই সমুজ্জ্বল হরিদ্রা ও বাদামী বর্ণ-বিশিষ্ট পক্ষীর পক্ষগুলি ফিকে নীলবর্ণের কিন্তু পুচ্ছের প্রান্তভাগ উজ্জ্বল নীল-বর্ণে মণ্ডিত। শ্বেতবক্ষ মাছরাঙাদের (লাটিন নাম হ্যালকিয়োন স্মির্ণেন্সিস্) দেহে লাল ও বাদামী বর্ণের সমন্বয় দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ ও বক্ষ দুগ্ধ শুভ্র বলিয়াই ইহারা শ্বেত-বক্ষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের পক্ষ ও পৃষ্ঠের নিম্নাংশ সমুজ্জ্বল সবুজ আভাবিশিষ্ট নীলবর্ণে রঞ্জিত।

বর্ণভেদের ন্যায় এই জাতীয় পক্ষীর বিভিন্ন শ্রেণীর স্বভাবগত বিভিন্নতা বা আচরণগত পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ইহাদের আহার্য্য আহরণসম্বন্ধীয় আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এল্‌সেডো বা সাধারণ মাছরাঙারা মুক্ত স্থানে থাকিয়া মৎস্য শিকার করিতে ভালবাসে। ইহারা জলাশয় বা জলধারার তীরবর্ত্তী কোন ঝোপ-ঝাড়, বৃক্ষ বা পাহাড়ের শীর্ষ হইতে তীরবেগে শূন্যপথে অগ্রসর হইয়া সহসা জলে ঝম্প প্রদান করে এবং বিদ্যুৎ-গতিতে সন্তরণরত মৎস্যকে সুদৃঢ় চঞ্চুপুটে চাপিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে ও তথায় ধৃত মৎস্যটিকে সানন্দে গলাধঃকরণ করে। দেখিলে মনে হয় যেন ঊর্দ্ধ হইতে একটা উজ্জ্বল নীল আভা চপলা চমকের মত চকিতে চল-চঞ্চল জল-ধারার বুকে ছুটিয়া আসিল এবং নীল আলোকের ঝলকের মত আবার পলকে আকাশে উঠিয়া দৃষ্টি-পথের অন্তরালে চলিয়া গেল। 'টিট্-টিট্-টিট্' এইরূপ বিচিত্র ও সমুচ্চ শব্দে নিসর্গের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ইহারা ঠিক সবেগে নিক্ষিপ্ত তীরের মত সোজাসুজি মৎস্য-নিষেবিত নীরের দিকে উড়িয়া আসে।

অনেকে মনে করেন স্বাধীনতা-প্রিয় পক্ষীরা অসীম আকাশের কোলে বা নিবিড় বনানীর বুকে যথেচ্ছ উড়িয়া বা ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। কিন্তু তাহা নহে। পাখীরাও একটি সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া আহার্য্য আহরণ করিতে ভালবাসে। পাখা আছে বলিয়াই পাখীরা স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে ঐ অনন্ত আকাশের যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইবে, ইহা মনে করা ভুল। যেমন পাখীদের জীবন-যাত্রার কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে তেমনই তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রেরও একটা সুনির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। তাহারা সহজে সেই সীমার বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করে না। অন্যান্য পাখীর ন্যায় মাছরাঙাও নিজেদের খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র বাছিয়া লয়। আমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখিব, প্রত্যেক মাছরাঙা প্রত্যহ নিজের নির্ব্বাচিত স্থানটিতে আসিয়া মাছ শিকার করিতে ভালবাসে। আমরা একটি মৎস্যজীবী মাছরাঙাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে দৈনন্দিন একই জলাশয়ে মাছ ধরিতে দেখিয়াছি। স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে প্রত্যেক পাখী কোন নদী, নালা বা পুকুরকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লয় এবং উহার উপর আপনার অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন প্রয়োগ করে। আমরা লক্ষ্য করিলে জানিতে পারিব, পক্ষীমাত্রই একই বৃক্ষে বসিতে, একই শস্যক্ষেত্রে বা জলাশয়ে ভক্ষ্য অন্বেষণ করিতে ভালবাসে। আমরা যেমন গৃহপ্রিয় এবং আপন আপন পরিজন ও পল্লীর প্রতি আসক্ত পক্ষীরাও তেমনই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আবেষ্টনের দিকে আকৃষ্ট হয়। স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাহাদেরও আছে। পক্ষীদের প্রবল সন্তানবাৎসল্য এবং নির্ম্মিত নীড়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির কথা অনেকেই জানেন। দিনান্তের শান্ত-শীতল আকাশের বুকে যখন তাহারা কলরব করিতে করিতে দলবদ্ধ হইয়া বাসস্থলের দিকে উড়িয়া যায় এবং একই বৃক্ষের বক্ষে অনেকে যামিনী যাপন করে তখন তাহাদের গৃহানুরাগ ও স্বজাতিপ্রীতি উভয়েরই পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। উড়িবার শক্তি আছে বলিয়াই যত্র-তত্র



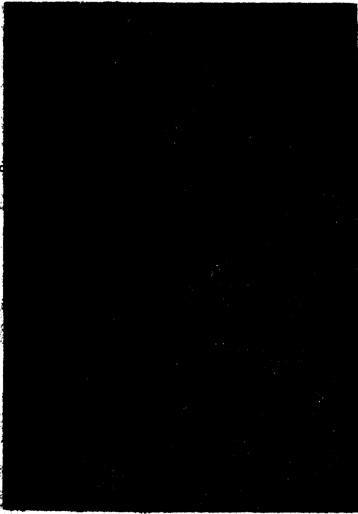
হিমালয়বাসী পায়েড-মাছরাঙা

অর্থাৎ যেখানে-সেখানে থাকা বা আহার্য্য আহরণ করা পক্ষীর স্বভাব নয়। উহাতে অসুবিধাও অনেক। কোন মাছরাঙার অধিকৃত কোন বিশেষ জলাশয় অপর কোন পক্ষী অধিকার করিয়া লইলে সে সেই স্থানটি ফিরিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। প্রত্যেক পক্ষীই আপনার অধিকৃত রাজ্যের অন্তর্গত কোন নির্দ্দিষ্ট, নিভৃত ও নিরাপদ স্থানে নিদ্রা যায়।

এমন কতকগুলি পক্ষী আছে যাহারা প্রায় সর্ব্বদাই সদলে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে। আমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেই বুঝিব, এরূপ পক্ষীর বিচরণক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক, ইহারাও একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরেই ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা যতই উড়িয়া বা ঘুরিয়া বেড়াক এই গণ্ডীর বাহিরে কখনও যায় না। অবশ্য যাহাদের বল ও বেগ অধিক তাহাদের অধিকৃত রাজ্য বা কর্ম্মক্ষেত্র ও বিস্তৃততর। সে যাহাই হউক, এ বিষয়ে সংশয় নাই যে পক্ষীরা ত আমাদের মতই গৃহানুরক্ত। বুঝিয়া

কতকগুলি পক্ষী আছে যাহারা যাযাবর জাতিদের মত ঋতুবিশেষে সাময়িক-ভাবে সদলে দেশান্তরে চলিয়া যায় এবং পুনরায় যথাসময়ে ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে ইংরেজীতে "মাইগ্রেটারী বার্ড" বলা হয়। এইরূপ পক্ষী শীত-প্রধান দেশেই অধিক। পক্ষীদের মধ্যে বিস্ময়কর সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রান্তরবাসী পায়েড মাছরাঙারা সাধারণ মাছরাঙার মত কোন বৃক্ষ-শীর্ষ বা গিরি-চূড়া হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে না। ইহারা শূন্য হইতে সহসা সলিল রাশিতে ডুব দিয়া মাছ ধরিয়া থাকে। প্রথমে ইহারা জলাশয়ের বিশ ফিট হইতে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উড়িতে উড়িতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে জলের কতখানি নীচে মৎস্য রহিয়াছে। পরে জলাশয়ের ঊর্দ্ধস্থ বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থলে আসিয়া ইহারা ক্ষণকাল থামে। ইহারা পক্ষদ্বয়কে বাতাসের গায়ে সজোরে আঘাত করিতে করিতে শূন্যে অবস্থান করে। অবশ্য দৃষ্টি থাকে সন্তরণকারী জলতলচারী মৎস্যের ঝাঁকের দিকে। যখন ইহারা মৎস্যদলের অবস্থান স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় তখন মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে জলে ডুব দেয় এবং যখন জল হইতে ওঠে তখন দেখা যায়, তাহাদের চঞ্চুপুটে পিষ্ট হইয়া



তিন-আঙ্গুলে মাছরাঙা

কোন হতভাগ্য মৎস্য মুক্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টায় রত রহিয়াছে। একটি জীব মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করে এবং অপর জীব আহার্য্য প্রাপ্তির তৃপ্তিতে উৎফুল্ল হইয়া সোৎসাহে উড়িয়া যায়। এই জাতীয় মাছরাঙা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। যখন জানিতে পারে, লক্ষ্য ঠিক হয় নাই তখন জলে কিছুদূর ডুবিয়া ইহারা আবার শূন্যে উঠিয়া অধিকতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৎস্যের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং নিঃসংশয় হইয়া পুনরায় জল-মগ্ন হয়। অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও আকস্মিক বলিয়া পক্ষীদের লক্ষ্য প্রায়ই ব্যর্থ হয় না।

ইহারা শূন্যে বা বায়ুমণ্ডলে কিরূপে স্থিরভাবে অবস্থান করে, এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিয়া উঠিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা শূন্যে অবস্থানের সময় পক্ষের দ্বারা বাতাসের গায়ে সবেগে আঘাত করে। এই সময় ইহারা বাতাসের গতির প্রতিকূলে অবস্থান করে বলিয়াই ইহাদের পক্ষে শূন্যের একই স্থানে থাকা সম্ভব হয়। এই সময় ইহারা পক্ষদ্বয়কে পশ্চাতে ও নীচের দিকে সঞ্চালন করে, সম্মুখের দিকে করে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি ত ঠিক এইরূপ প্রণালীতেই সাঁতার দিয়া থাকে। জলের গায়ে তাহার নিম্নাভিমুখী আঘাত বা পদ-সঞ্চালন তাহাকে ডুবিতে দেয় না এবং জলকে পশ্চাতের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া তাহার দেহকে অগ্রবর্ত্তী করিবার পক্ষ সহায়ক হয়। কিন্তু একই স্থানে অবস্থানকারী পক্ষীর বেলায় শেষোক্ত প্রক্রিয়া বায়ুর বেগের দ্বারা প্রতিহত হয় বলিয়া পক্ষীর পক্ষে আগাইয়া না গিয়া একই জায়গায় স্থির থাকা সম্ভব হয়। বাতাসের বেগ যতই বেশী থাকে পক্ষীর পক্ষে তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া শূন্যে স্থির থাকা তত সহজ হয়। তবে বেগ-বিরহিত বাতাসের ভিতরে ত আমরা পক্ষীদিগকে শূন্যের এক স্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। অবশ্য বাস্তবিক ব্যাপারে বিহঙ্গমগণের অনুভূতি আমাদের বোধশক্তি অপেক্ষা তীব্রতর বা সূক্ষ্মতর। তাহারা একপ্রকার (instinct) স্বাভাবিক শক্তিবলে ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে। পক্ষীদের নিজের গতি ও বেগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি বিস্ময়কর। একদিকে মৃন্ময়ী মেদিনীমাতার মাধ্যাকর্ষণ নামক প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে বাতাসের প্রতিকূল গতি, পক্ষী উভয় আকর্ষণকে প্রতিহত করিয়া আপনার ভার-সাম্য অব্যাহত রাখিয়া কেমন করিয়া শূন্যের একই স্থানে অবস্থান করে তাহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করা অসম্ভব নয়।

আমরা সাধারণত ভাবিয়া থাকি, বিহঙ্গমগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বায়ু-মণ্ডলে সঞ্চালনের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং তাহারা বাতাসের সহায়তা ব্যতিরেকে উড়িতে পারে না, কিন্তু সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে যাহা জানা যায়, তাহাতে এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে বলিয়াই বুঝা গিয়াছে। যখন আমরা দেখি, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৭, ১৮ বা ২০ হাজার ফিট উচ্চ স্থানের স্বল্প চাপবিশিষ্ট সূক্ষ্ম বায়ু-মণ্ডলে ও তাহারা একই প্রকার উড্ডয়ন-শক্তির পরিচয় প্রদান করে তখন বাতাসকে তাহাদের গতির নিয়ামক কেমন করিয়া মনে করিব? ঐরূপ উচ্চ স্থানে বাতাসের চাপ নিম্নের নভো-মণ্ডলের বায়বীয় চাপ অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধাংশ। নিম্ন-প্রদেশের অধিবাসীদের পক্ষে এইরূপ বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু এইরূপ স্বল্প-চাপ বায়ুর ভিতরে ত পাখীরা শুধু যে অনায়াসে উড়িয়া বেড়ায় তাহা নহে, আরোহণ, অবতরণ (প্যারাশুটিং), একই স্থানে অবস্থান (হভারিং) প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে ও স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। বাতাস তাহাদের গতির নিয়ামক হইলে বাতাসের চাপ হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উড়িবার শক্তিও কমিয়া যাইত।

পক্ষীরা কত বেগে উড়িতে পারে, এই প্রশ্নও আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। অনেকে এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করেন। অবশ্য সকল পক্ষীর উড়িবার সামর্থ্য সমান নয়। এমন পাখীও আছে যাহারা ঘণ্টায় একশত হইতে দুইশত মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে সক্ষম। তটিনীর বা সরসীর ঊর্দ্ধস্থ বায়ু-মণ্ডলে তীরবেগে উড্ডীয়মান উৎক্রোশের বিদ্যুৎ-বৎ গতি ধূলি-ধূসরা ধরণীর বক্ষে মন্দ-মন্থর চরণে বিচরণরত মানুষের পক্ষে বিশেষ বিস্ময়কর দৃশ্য সন্দেহ নাই। তবে তাহাদিগকে অতিশয় গতিশীল পক্ষীদের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। কেহ-কেহ পায়েড শ্রেণীর মাছরাঙাকে প্রায় এক মাইল মোটরে অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইহাদের গতি ঘণ্টায় ৩১ মাইলের অধিক নহে। পক্ষীর দ্রুতগামিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বের বহু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আধুনিক যুগের ব্যোমচারী বা বিমান-বিহারী মানবের পক্ষে সংশোধন করিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

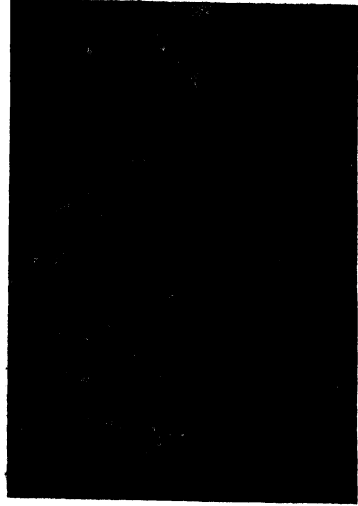
আমরা প্রান্তরবাসী পায়েড-জাতীয় মাছরাঙার কথাই পূর্ব্বে বলিতে-ছিলাম। প্রান্তরবাসী অপেক্ষা হিমাচলবাসী পায়েড-মাছরাঙারা আকারে বহুগুণ বৃহত্তর, ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। হিমাদ্রিবাসী পায়েড-মাছরাঙাদের দেহ প্রায় দেড়ফুট দীর্ঘ। কৃষ্ণবর্ণের উপর শুভ্র রেখারাজি বিরাজিত রহিয়া ইহাদের আকৃতি

পালকগুলিকে বিশেষ সুদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ পালক মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়াছে। প্রান্তরচারী পক্ষীদের মত ইহারা মুক্ত স্থানে থাকিতে ভালবাসে না। রবি-রশ্মিশূন্য নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন গভীর বনের ও অন্ধকার গিরি-কন্দরের বিজন স্তব্ধতার ভিতর বাস করিতে ইহারা ভালবাসে। ইহাদের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য মাছরাঙার মত ইহারা মাছ ধরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জলরাশির ঊর্দ্ধস্থ আকাশে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একই স্থানে অবস্থান করে না এবং ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবিতেও দেখা যায় না। সাধারণত জলের উপরিভাগের মৎস্যগুলিই ইহারা ধরিয়া থাকে। ইহারা বন-বক্ষে বিরাজিত জলাধার বা জলধারার পার্শ্ববর্ত্তী কোন নিভৃত ঝোপে-ঝাড়ে বা বৃক্ষ-শিরে লুকাইয়া থাকিয়া সন্তরণরত মৎস্যের গতি-বিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ বুঝিবামাত্র জলে ঝাঁপাইয়া লক্ষ্য-স্থল মৎস্যটিকে চঞ্চুপুটে লইয়া অন্য কোন স্থানে উড়িয়া গিয়া উহাকে তথায় ভক্ষণ করে, পূর্ব্বস্থানে প্রায়ই ফিরিয়া যায় না।

আমরা অতুলনীয় বর্ণৈশ্বর্য্যশালী তিন আঙ্গুলে মাছরাঙার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহারাও সম্পূর্ণরূপে আরণ্য পক্ষী। যে সকল প্রদেশ বর্ষার অজস্র ধারাপাতে বিশেষরূপে অভিষিক্ত হইয়া নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন সেই সকল বৃক্ষ-শ্যামল অঞ্চল এই সকল বিহঙ্গমের বাস-স্থল। হিমাদ্রি-ক্রোড়ে বিরাজিত বনরাজিতে এবং ভারতের কানন-কুন্তলা গিরিমালাপূর্ণ তালীবন শ্যাম পশ্চিমোপকূলে এই সকল বর্ণ-রাগ-বিচিত্র বিহঙ্গম দৃষ্ট হইয়া থাকে। শৈবাল-শ্যাম শিলাসমূহের পার্শ্ব দিয়া কল-কলতানে প্রবাহিত নৃত্যশীল পার্ব্বত্য-তরঙ্গিণী ইহাদের খাদ্যান্বেষণের ক্ষেত্র। প্রায়ই দেখা যায়, ইহারা এইরূপ একটি স্রোতস্বিনীকে অধিকার করিয়া এবং নিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় আসিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। বোম্বায়ের সমুদ্র-তীরেও ইহাদিগকে দেখা যায়। তথায় ইহারা সলিল-সিক্ত বেলা-ভূমির অধিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকড়া খাইবার জন্য আসিয়া থাকে। পদাঙ্গুলির বিচিত্র আকৃতির জন্যই ইহারা তিন-আঙ্গুলে আখ্যায় অভিহিত হয়।

আহার্য্য-আহরণ বা জীবন-যাপনের প্রণালী অনুসারে বিভিন্ন পক্ষীর পায়ের আকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। ঈগল, চিল, শকুন প্রভৃতি অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির শিকারী পক্ষীদের প্রখর নখরবিশিষ্ট পাগুলি বিশেষ সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। বিহগ জগতের সিংহ-শার্দ্দূল স্বরূপ এই সকল ভীষণ স্বভাব পক্ষী শিকারগুলিকে পদাঙ্গুলির সাহায্যে চাপিয়া ধরে বলিয়া তাহাদের পদদ্বয় তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হওয়া দরকার। হংসাদির ন্যায় যে সকল পক্ষীকে ভূতলে বিচরণ করিতে হয় তাহাদের পায়ের আকার প্রশস্ত হইয়া থাকে। এরূপ পক্ষী আছে যাহাদের পা গিরগিটি বা বহুরূপীর পায়ের মত বৃক্ষের শাখা প্রভৃতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিতে সক্ষম। শুক, কোকিল, মাছরাঙা প্রভৃতি পক্ষীরা এই জাতীয়। ইহারা ভূতলে বিচরণ করে না বলিলেও চলিতে পারে। সুতরাং ইহাদের পায়ের মাটির উপর চলিবার যোগ্যতা নাই বলিলেও ভুল হয় না। কিন্তু কোন বস্তুকে চাপিয়া ধরিবার পক্ষে ইহারা অত্যন্ত উপযোগী। টিয়া, কোকিল, কাঠঠোকরা প্রভৃতি পাখীর পদাঙ্গুলি যুগ্মভাবে পরস্পর সংলগ্ন বা যোড়া-লাগা। এই অঙ্গুলিগুলির আকৃতি কতকটা সাঁড়াশির মত। মাছরাঙার তৃতীয় এবং চতুর্থ পদাঙ্গুলিকে প্রায় সংযুক্ত দেখা যায়। সুতরাং তাহাদের পাকে আদৌ শক্তিশালী বলা চলে না। পদাঙ্গুলির কায খুব কম বলিয়া অনুশীলনাভাবে ইহারা ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়াছে। তিন-আঙ্গুলে মাছরাঙাদের পায়ে শুধু তিনটি অঙ্গুলি বা নখর থাকে।

আমরা 'সারস-চঞ্চু' নামক একশ্রেণীর মাছরাঙার নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা বৃহদাকার ও বর্ণ-বৈচিত্র্যবিহীন এবং ইহাদের চঞ্চু সারস বা বকের চঞ্চুর ন্যায় দীর্ঘ। দূর হইতে দেখিলে ইহাদিগকে বক বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। ইহাদের ইংরেজী নাম 'ষ্টক-বিল'। এদেশে বাদামী বর্ণাভশীর্ষবিশিষ্ট একপ্রকার সারস-চঞ্চু মাছরাঙা দেখা যায়। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ এবং সিংহলের সলিল-সিক্ত অংশগুলিতে ইহারা বাস করে। নিবিড় বনানীতে এবং ছায়া-শীতল বৃক্ষ-শ্যাম শৈল-সানু বা গভীর গহ্বরে বাস করিতে ইহারা ভালবাসে। হিমালয়বাসী পায়েড মাছরাঙাদের মত ইহারাও নিরাপদ, নিবিড় ও নিভৃত নির্জ্জনতা পছন্দ করে। ইহাদের খাদ্যতালিকা শুধু মৎস্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহারা যাহা পায় তাহাই খায় বলিলে ভুল হয় না। সর্পাদি সরীসৃপ, পঙ্গপালাদি পতঙ্গ এবং কাঁকড়া, গুগ্‌লি প্রভৃতি জলজ জীব যাহা যখন মিলে তাহার দ্বারাই ইহারা বুভুক্ষা নিবারণ করে। এমন কি, সুযোগ পাইলে ইহারা অপর পক্ষীর নীড় হইতে শাবক চুরি করিয়া ভক্ষণ করিতে কণামাত্র কুণ্ঠা অনুভব করে না। একজন লেখক একটি সারস-চঞ্চু মাছরাঙা কর্ত্তৃক মিনা জাতীয় পক্ষীর নীড় হইতে শাবক চুরি করিয়া খাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। মিনার ছানাটি আর্দ্রকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই মাছরাঙার নির্দ্দয় হৃদয় বিগলিত হইল না। এদিকে শাবকের আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া পক্ষী ও পক্ষিণী আসিয়া দেখিল মাছরাঙাটি বৃক্ষশাখায় বসিয়া দীর্ঘ চঞ্চুর সাহায্যে তাহাদের অশেষ-স্নেহভাজন সন্তানটিকে মৎস্য-গলাধঃকরণ করার ভঙ্গীতে গ্রাস করিতেছে। শোকে ও ক্রোধে আত্মহারা পিতা-মাতা সন্তানহন্তাকে প্রাণপণে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সে পলায়ন করিল।



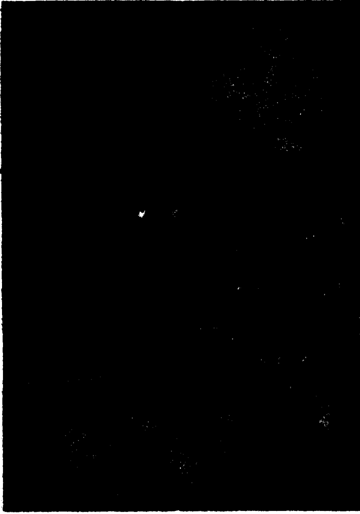
সারস-চঞ্চু মাছরাঙা

মাছরাঙাদের মধ্যে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের জন্য যাহারা দর্শকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে তাহাদের মধ্যে শ্বেত-বক্ষ পক্ষী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পক্ষের সমুজ্জ্বল নীলিমা সৌরকরে সমুদ্ভাসিত হইয়া অনুপম সুষমা ধারণ করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এই জাতীয় মাছরাঙা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাছরাঙা হইলেও মাছ ইহাদের আহার্য্য তালিকার প্রধান অংশ অধিকার করে না। ইহারা মাছ অপেক্ষা পোকা-মাকড় খাইতে অধিক ভালবাসে। ইহারা উড়িতে উড়িতে মাছ শিকার করিবার প্রণালীতেই ছোঁ মারিয়া তৃণগুচ্ছ বা ঝোপ হইতে কীট বা পতঙ্গ চঞ্চু-পুটে তুলিয়া লয়।

যে সকল মাছরাঙা সাধারণত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় আমরা তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই পাঠক-পাঠিকাকে প্রদান করিলাম। ভারতবর্ষে প্রায় চৌদ্দ রকমের মাছরাঙা রহিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবী

একশত ত্রিশ প্রকার এই জাতীয় বিহঙ্গম বিদ্যমান বলিয়া জানা যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় একশ্রেণীর মাছরাঙা আছে যাহারা 'লাফিং জ্যাকাস' আখ্যায় অভিহিত হয়। একপ্রকার উচ্চ ও বিচিত্র শব্দ ইহাদের কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হয়। এই শব্দ কতকটা উচ্চ হাস্যের মত বলিয়া এই পক্ষীদিগকে 'লাফিং জ্যাকাস' বলা হইয়া থাকে।

প্রায় সকল প্রকার মাছরাঙাই একই প্রণালীতে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে বুঝিব পক্ষীরা নিজেদের জন্য নীড় রচনা করে না, ডিম পাড়িবার ও সন্তানদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্যই প্রাকৃতিক প্রেরণার প্রভাবে ইহা প্রস্তুত করে। সুতরাং সাধারণত ডিম পাড়িবার সময়েই পক্ষীদিগকে নীড় নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। এমন কি, দক্ষিণ মেরুবাসী পেঙ্গুইন নামক পক্ষীরাও এই প্রেরণাবশে তুষার রাশির গাত্রে গৃহ রচনা করে। এই বিচিত্র ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিতেছে সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য স্রষ্টার বিস্ময়কর কৌশলের কথা। মাছরাঙারা নদীতীরে, গর্ত্তে, পরিত্যক্ত গৃহের প্রাচীরে অথবা বৃক্ষের কোটরে গোল ও সুড়ঙ্গাকার নীড় নির্ম্মাণ করে। এই সুড়ঙ্গাকৃতি গৃহের প্রান্তভাগে ডিম রাখিবার জন্য একটি কক্ষ থাকে।



সাধারণ মাছরাঙা (এল্‌সেডো ইস্পিডা)

এই সুড়ঙ্গ সাধারণত তিন হইতে চার ফুট পর্য্যন্ত গভীর হয়। সুড়ঙ্গের শেষাংশে ডিমের জন্য যে প্রকোষ্ঠটি প্রস্তুত করা হয় তাহার আকার বড়ই হইয়া থাকে। কক্ষতলে মৎস্যসমূহের হাড় বিছাইয়া ভাবী সন্তানদের জন্য শুভ্র শয্যা রচনা করা হয়। পক্ষী-মাতা ও পক্ষী-পিতা কর্ত্তৃক ভক্ষিত মৎস্যগুলির অস্থি ইহারা। অবশ্য প্রথমে সমগ্র মৎস্যটিকেই গলাধঃকরণ করা হয় এবং পরে উহার হাড়গুলি উদ্গীরিত হইয়া থাকে। প্যারেড-জাতীয় মাছরাঙারা নদীর তট-ভূমিতে গহ্বরাকার গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই সকল গহ্বর-গৃহের গভীরতা দুই হইতে ছয় ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণ মাছরাঙারা এক হইতে চার ফিট দীর্ঘ কোটর প্রস্তুত করে। এই কোটরের শেষাংশে ডিমের জন্য যে প্রকোষ্ঠ তৈয়ারী করা হয় তাহার প্রশস্ততা ও উচ্চতা পাঁচ হইতে সাত ইঞ্চি পর্য্যন্ত। তিন-আঙুলে মাছরাঙারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তীরে গৃহ গড়িয়া তোলে। ইহারা চঞ্চু ও পায়ের সাহায্যে দুই ফিট অপেক্ষাও কিছু গভীর গহ্বর প্রস্তুত করিতে পারে। চঞ্চু খনিত্রের কাজ করে এবং ইহারা পায়ের দ্বারা খনিত মাটিগুলিকে সরাইয়া ফেলে। মাটি বালুকাবহুল ও আলগা হইলে শ্বেত-বক্ষ মাছরাঙারা ছয় হইতে সাত ফিট পর্য্যন্ত গভীর নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারে।

আসামের অন্তর্গত কাছাড় জিলার উত্তরাংশের অধিবাসী এক শ্রেণীর মাছরাঙা নদীর তীরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তথায় ডিম পাড়ে। কেহ-কেহ নিসর্গ-নির্ম্মিত কোটর বা গহ্বরকে নীড়রূপে ব্যবহার করে। ইহারা নীড়কে নিরাপদ করিবার জন্য কর্দ্দমাক্ত শৈবাল সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সেই প্রকৃতি-প্রস্তুত কোটরের দ্বার নির্ম্মাণ করে। উত্তর-পশ্চিম বোর্নিয়োর অধিবাসী এক জাতীয় মাছরাঙার নীড়-নির্ব্বাচন-প্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত। ইহারা এক প্রকার মধুমক্ষিকার চক্রকে ডিম রাখিবার যোগ্যতম জায়গা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। পক্ষী হইয়া ইহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় বিষাক্ত হুলযুক্ত প্রাণীর সহিত কি প্রকারে প্রীতিপাশে আবদ্ধ হয় সেই রহস্য আমাদের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। যে যাহা হউক, ইহাতে ইহাদের ডিম কাহারও দ্বারা সহজে অপহৃত হইতে পারে না। আমরা অনুসন্ধানের সাহায্যে জানিতে পারি, অন্ধকার কন্দরে বা গহ্বরে নীড়-নির্ম্মাণকারী অন্যান্য পক্ষীর মত মাছরাঙারাও শ্বেতবর্ণ ডিম প্রসব করে। শ্রেণীভেদে প্রসূত ডিমের সংখ্যা চারিটি হইতে দশটি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য জগতে মাছরাঙা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচিত্র কথা ও কিম্বদন্তী প্রচারিত রহিয়াছে। এই কথা ও কিম্বদন্তীর কোন-কোনটি ক্লাসিক বা পৌরাণিক যুগের, কোন-কোনটি মধ্যযুগে জন্মলাভ করিয়াছে। রোল্যাণ্ড তাঁহার 'ফনে-পপুলার ড-লা-ফ্রান্স' নামক গ্রন্থে কহিয়াছেন, পুরাকালে মাছরাঙারা বর্ণবৈচিত্র্য বিরহিত, ধূসর বর্ণবিশিষ্ট সাদা-সিধা পক্ষী ছিল। বাইবেল-বর্ণিত বিশ্বব্যাপী বিরাট বন্যার বিচিত্র বৃত্তান্ত অনেকে অবগত আছেন। এই প্লাবনে পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছিল শুধু রক্ষা পাইয়াছিলেন নু ও তাঁহার আশ্রিত প্রাণিগণ। ঈশ্বরের আদেশে নু একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর আশ্রিতদিগকে লইয়া বাস করিয়াছিলেন। নৌকা ভারাক্রান্ত হইবার ভয়ে তিনি কতকগুলি প্রাণীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। মাছরাঙা এই সকল প্রাণীর অন্যতম। মুক্ত হইয়া মাছরাঙা সোজাসুজি সূর্য্যের দিকে উড়িয়া যাইবার সময় সে সৌরকর হইতে সমুজ্জ্বল বর্ণ-রাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পক্ষের ঊর্দ্ধাংশ নভো-নীলিমা হইতে নীলবর্ণ এবং অস্তরবির রক্ত-রাগে তপ্ত বা দগ্ধ হইয়া লোহিতাভ বাদামী বর্ণ লাভ করিয়াছে, ইহাও কথিত হয়। কেহ-কেহ কহেন, আমাদের মনু এবং বাইবেলের নু অভিন্ন ব্যক্তি।

ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যে সেয়িক্স ও হ্যালকিয়োনের প্রণয় কাহিনী রহিয়াছে। গ্রীক পৌরাণিক কথা হইতে এই কাহিনী লওয়া হইয়াছে। সেয়িক্স এক নাবিক-বালক এবং হ্যাল-কিয়োন একটি পরী। হ্যালকিয়োন বায়ুর ঔরসে এবং (সমুদ্রের) বেলার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। হ্যালকিয়োন সেয়িক্সকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিত এবং উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। পরস্পরকে ভালবাসিয়া তাহারা অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অবশেষে এক বিরাট বেদনাময় বিয়োগান্তক ব্যাপার তাহাদের সকল সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলে। একদিন সেয়িক্সের নৌকা বারিধিবক্ষে ডুবিয়া যায় এবং সে প্রাণপণে সন্তরণ করিয়া তীরে আসিতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু উত্তাল তরঙ্গরাজি তাহাকে গ্রাস করে। প্রাণাধিক পতিকে ডুবিতে দেখিয়া হ্যালকিয়োন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন দেবতারা দয়া পরবশ হইয়া উভয়কে মাছরাঙা জাতীয় মনোরম পক্ষী ও পক্ষিণীতে পরিণত করেন। পবনদেব তাঁহার অনুচর ঝড়দিগকে আদেশ করিয়াছিলেন তাহারা যেন হ্যালকিয়োন এবং তাহার সন্তান এই জাতীয় পক্ষিণীর ডিম

পাড়িবার ও ডিমে তা দিবার সময়ে বারিধি-বক্ষ বিক্ষুব্ধ না করে। কথিত আছে, হ্যালকিয়োন ও স্যেয়িক্সের নীড় সমুদ্র-সলিলে ভাসমান রহিত। শীত ঋতুর যে সাতদিন হ্যালকিয়োন ডিমে তা দিত তখন বাতাস আদৌ বেগে বহিত না। সেই সময় হইতে এই সময়টা (মাছরাঙার ডিমে তা দিবার সাতদিন) সমগ্র সমুদ্র শান্ত ভাব ধারণ করে বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচারিত। এই সময়টাকে 'হ্যালকিয়োন ডেজ,' বলা হয়। মাছরাঙাকে হ্যালকিয়োন নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এই পৌরাণিক কাহিনী পড়িয়া মনে হয়, একদিন করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রিয়-বিরহ-বিহ্বলা হ্যালকিয়োন সমুদ্রসলিলে ঝাঁপাইয়া পড়িবামাত্র দেবতাদের দ্বারা মাছরাঙায় পরিণত হইয়াছিল। সেই করুণ ক্রন্দনের অবশেষ বা আভাষ আজিও তাহাদের কণ্ঠে বাজিতেছে কি না কে বলিতে পারে। তাহাদের কণ্ঠে সেই কান্নার করুণ সুর শুনিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই কি আদিকবি বাল্মীকি প্রিয়-বিরহ-কাতরা ক্রন্দনাকুলা কৌশল্যার কথায় কহিয়াছিলেন "ক্রোশন্তীম্ কুররীম্ ইব" ?

মাছরাঙার দেহের কতকগুলি বিচিত্র গুণের কথা প্রচারিত রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পক্ষীর রৌদ্রশুষ্ক শরীর বজ্রপাত নিবারণে সক্ষম বলিয়া কথিত। কেহ এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছেন কি না জানি না। পশমী পোষাকের পাশে মাছরাঙার শুষ্ক শরীর রক্ষিত রহিলে কোন কীট-পতঙ্গ নাকি ঐ পরিচ্ছদের অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হয় না। মাছরাঙার শুষ্ক দেহের আর একটা অদ্ভুত গুণ, কোন ঘরে ইহা টাঙ্গাইয়া রাখিলে যে দিকে বাতাসের গতি ইহার চঞ্চুর অগ্রভাগ নাকি ঠিক সেই দিক নির্দ্দেশ করিবে। এই জলচর পক্ষীর আদি-জননী হ্যালকিয়োন পবন-দেবতার কন্যা সুতরাং বাতাসের সহিত মাছরাঙার সম্পর্ক পৌরাণিক কথায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় নয়।

বিশেষ বিবাহ-বিধি

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল

অতীতে ভারতবর্ষে অ-সম জাতিভেদ ছিল কিনা তাহা তর্কের বিষয়। তবে একথা আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে জাতিভেদ কঠোরতম হইয়াছে মধ্যযুগ হইতে—পৌরাণিক যুগে উহার অস্তিত্ব থাকিলেও উহা এরূপ ভ্রমদায়ক ছিল বলিয়া আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারিনা। পৌরাণিক যুগের অতি আদিতে বর্ণভেদ মনে হয় একেবারেই ছিলনা। শাস্ত্রের বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া অনেকেই দেখাইয়াছেন যে, বর্ণভেদ হইত গুণ ও কর্ম্মভেদ অনুসারে, জন্মগত জাতি বা বর্ণভেদ অর্ব্বাচীন ব্যাপার। যাহাই হউক এ সকল বিচারের ভার শাস্ত্রাভিজ্ঞগণের উপর। আমার যাহা বক্তব্য তাহাতে এ সকল প্রশ্ন না তুলিলেও চলে।

ইংরাজ আমলে আইন লোকাচার বা দেশাচারকে স্থান দিয়াছে—শাস্ত্রের ব্যবস্থারও উপর ("a usage will outweigh hundred written texts")। বর্ত্তমানে লোকাচার বা দেশাচার জন্মগত জাতি বা বর্ণভেদ স্বীকার করে সুতরাং আইনও তাহাকে স্বীকার করে। হিন্দুর শাস্ত্রে (অবশ্য একশ্রেণীর মতে) বা লোকাচারে বলে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুমতে অসিদ্ধ, সুতরাং আইনও হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার করিতে পারেনা—যদিও প্রাচীন শাস্ত্রে আমরা শত শত অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ পাই।

অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণায় অনেক গলদ আছে। অনেকে মনে করেন পাত্র ও পাত্রী সম-জাতির (জাতের) না হইলেই সেইরূপ বিবাহ মাত্রেই অসবর্ণ বিবাহ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রতি অসবর্ণ বিবাহে পাত্র-পাত্রী উভয়ে অবশ্যই ভিন্ন জাতির (জাতের), কিন্তু পাত্র-পাত্রী ভিন্ন জাতির হইলেই যে অসবর্ণ বিবাহ হইবে তাহার কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—ধরুন পাত্র ডোম জাতীয় ও পাত্রী হাড়ী জাতীয়া—এ বিবাহ কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ নহে। অসবর্ণ বিবাহের অর্থ ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ—ভিন্ন "জাতে"র মধ্যে নহে।

একটি কথা আমাদিগকে সকল সময় মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ণ মাত্র চারিটী ; যথা :—ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র। (আবার এতৎসহ ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে এক বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত কোন 'জাত' যতই অপর বর্ণের বলিয়া দাবী করুন তাঁহারা আইনের চক্ষে বর্ত্তমান বর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই পরিগণিত হইবেন, যেমন বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে প্রচারিত করিতে থাকিলেও আইন তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। উল্লিখিত বিবাহে ডোম ও হাড়ী উভয়েই শূদ্র, সুতরাং উহা স-বর্ণের মধ্যে বিবাহ—অসবর্ণে নহে। একই বর্ণের মধ্যে বহু ভাগ বিভাগ থাকিতে পারে কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের সংজ্ঞা উহা স্বীকার করে না। বর্ত্তমান আইনও হিন্দুর অসবর্ণ (inter-caste) বিবাহ সমর্থন না করিলেও স-বর্ণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে (inter-sub-caste) বিবাহ সমর্থন করে। এ বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের নজীর আমার উক্তির সমর্থক। কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থ ও তন্তুবায়ের মধ্যে হিন্দু বিবাহ সিদ্ধ বিবাহ বলিয়াই রায় দিয়াছেন।[১]

যুগ ভেদে আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয়। আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ইংরাজি শিক্ষার ফলে অথবা অন্য কোনও কারণে, তাহার বিচারের প্রয়োজন বর্ত্তমানে আমার নাই, আমরা দর্শক হিসাবে উহা দেখিয়া যাইতেছি এইটুকুই মাত্র বলিতে পারি। উহা ভাল কিম্বা মন্দ তাহা তর্কের বিষয়, তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে যুগ-ধর্ম্মের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাকে অস্বীকার করা নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত কিছুই নহে। যুগের তালে তাল রাখিয়া পা ফেলিতে শিক্ষার মূল্য অনেক। 'যাহা আছে তাহার পরিবর্ত্তন করিব না'—এই মনোবৃত্তি বহু অনর্থপাতের কারণ স্বরূপ। বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির মধ্যে এইরূপ মনোবৃত্তি অন্যতম। ডেলিজ্‌ল্ বার্ণস্ তাঁহার "পলিটিক্যাল আইডিয়াল্‌স্" গ্রন্থে রোমের পতনের কারণের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"Thus order became tyranny, and in the name of settled civilization all natural growth was checked, since as liberty tends to degenerate into licence so order tends to be corrupted into the unnatural fixity of the status quo."

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। "status quo" নষ্ট করিব না—এই মনোবৃত্তির ফলে হিন্দু সমাজের গতি শুদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুসমাজ আজ স্থাবর।

একথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না যে, হিন্দু সমাজের আধুনিক ভাবাপন্নদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছে।

(১) বিশ্বনাথ বনাম সরসীবালা ৪৮ ক্যালকাটা ৯২৬

আমি অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, কয়েকজন অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী বলিয়াই সমগ্র সমাজকে স-বর্ণ বিবাহ ভুলিয়া অসবর্ণ-বিবাহের পশ্চাতে ছুটিতে হইবে, আমার বক্তব্য এই যে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিতেছেন তাঁহারা যেন অপাঙক্তেয় না হন, আইন যেন তাঁহাদিগের রক্ষা-বিধান করে। ইহাতে হিন্দুসমাজের শক্তিবৃদ্ধিই হইবে। অসবর্ণ বিবাহ করিলে যদি জাতিপাত হয় তাহা হইলে সমাজের একটা বিশিষ্ট শ্রেণীকে সমাজ হইতে বাদ দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, হিন্দু-বিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে আদৌ সাহায্যকারী নহে, তাঁহাদিগকে "বিশেষ বিবাহ-বিধি"-র (Special Marriage Act) আশ্রয় লইতে হয়।

এই আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই আইনের সূচনায় লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা ক্রীশ্চান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্ম্মের বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে আইনসঙ্গত বিবাহ প্রচলনের নিমিত্ত এই আইন করা যাইতেছে। এই আইন প্রণয়নের মূলে রহিয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্মের-অভ্যুদয়। ব্রাহ্ম বিবাহ ও হিন্দুবিবাহে পার্থক্য রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মদিগের পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ তাহা আইনের চক্ষে ছিল অপরিচিত। ১৮৭২ সালের আইনের ফলে ব্রাহ্মগণ নিজ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকে আইনের সাহায্যে সুসিদ্ধ করিলেন। এই আইন পরে অ-ব্রাহ্মদিগকেও সাহায্য করিয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই বিধি অনুসারেই বিবাহ করেন। এই আইনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিবাহকালে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের প্রত্যেকেই ঘোষণা করেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ক্রীশ্চান বা ইহুদী বা হিন্দু বা মুসলমান বা পার্শী বা বৌদ্ধ বা শিখ, বা জৈন নহেন।

বহু হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ করিবার সময় এইরূপ ঘোষণা করিতে অপমান বোধ করিতেন। "আমি হিন্দু নহি"—এই কথা বলিতে কোন্ হিন্দু না অপমান বোধ করিবে? ইহারই প্রতিবিধান কল্পে বহু চেষ্টা হয়। যাহাতে "আমি হিন্দু" ইহা বলিয়াও অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে আন্দোলনও চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের "বিশেষ বিবাহ বিধি" সংশোধিত হয় (Act xxx of 1923)। সংশোধন অনুসারে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনগণকে আর বলিতে হয় না যে—"আমি হিন্দু, বৌদ্ধ বা শিখ, বা জৈন নহি।" অর্থাৎ বর্ত্তমানে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনগণ নিজ ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়াই অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারেন। ইহা হিন্দুদিগকে ধর্ম্ম-অস্বীকাররূপ অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই সংশোধনের কালে যে পাঁচটি নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছে তাহার প্রতি আমি প্রত্যেক আধুনিকপন্থী হিন্দুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ এই পাঁচটি ধারা ১৯২৩ সালে সংযোজিত হইয়াছে। উহাদিগের মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

ধারা ২২—হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী, একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত কেহ এই আইন অনুসারে বিবাহ করিলে সেই পরিবার হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা ২৩—হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ এই আইন অনুসারে বিবাহ করিলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারে, Caste Disabilities Removal Act২ অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের উপর যে সকল অধিকার বর্ত্তায় ও যে সকল নিষেধ প্রযোজ্য হয়, উক্ত ব্যক্তির উপরও সেই সকল অধিকার বর্ত্তাইবে ও সেই সকল নিষেধ প্রযুক্ত হইবে।

(২) উক্ত আইনের সারমর্ম্ম :—
এই আইনের দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বা জাতিপাতের ফলে যে সকল আইনের বা প্রচলিত রীতির জন্য কোন অধিকার বাজেয়াপ্ত বা আংশিক নষ্ট হয় তাহার প্রয়োগ বন্ধ হইল।

ইহাও বিধিবদ্ধ হইতেছে যে, এই ধারার বলে ধর্ম্মসংক্রান্ত বা দাতব্য কোনও ব্যাপারে কাহারও কোনও অধিকার জন্মাইবে না। (Provided that nothing in this section shall confer any right to any religious office or service or to the management of any religious or charitable trust)

ধারা ২৪—হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী যাঁহারা এই আইন অনুসারে বিবাহ করিবেন তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের সন্তানাদির বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (Indian Succession Act) অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে।

ধারা ২৫—এই আইন অনুসারে বিবাহকারী কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈনের পোষ্য গ্রহণের অধিকার থাকিবে না।

ধারা ২৬—এই আইন অনুসারে বিবাহকারী কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈনের পিতার অপর কোনও পুত্র না থাকিলে সেই পিতার নিজ ধর্ম্মানুযায়ী পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার থাকিবে।

উত্তম ব্যবস্থা! "আমি হিন্দু" এই কথা বলিলে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে পৃথক হইতে হয়, 'হিন্দু' বলিয়া বিবাহ করিলে যদি উত্তরাধিকার বিষয়ে হিন্দু আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, "হিন্দু" বলিয়া বিবাহ করিলে যদি হিন্দুর বিশেষ অধিকার পোষ্য পুত্র গ্রহণের অধিকার বিলুপ্ত হয় ও সর্ব্বশেষে "আমি হিন্দু" এই কথা বলিলে যদি আমার পিতার পোষ্য পুত্র গ্রহণের অধিকার জন্মায় অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মের চক্ষে আমি মৃত বলিয়া গণ্য হই, তবে হিন্দুর পক্ষে কি উহা কলঙ্ক, অপমান ও লজ্জার বিষয় নহে? প্রকৃতপক্ষে এই আইন কি হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহ প্রচেষ্টাকে বাধা দিতেছে না? "আমি হিন্দু" একথা বলিলে যদি হিন্দুর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয় তবে অসবর্ণ বিবাহকালে "আমি হিন্দু"—এ ঘোষণা কি কোন হিন্দু সন্তুষ্টচিত্তে করিবে? ১৯২৩ সালের আইন কি হিন্দুকে এক গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া অধিকতর গ্লানির কারণ ঘটায় নাই?

সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি যে ১৯২৩ সালের আইনের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অসবর্ণ বিবাহ আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সেক্ষেত্রে এই আইনের পুনঃ সংশোধন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকে হয়ত বলিবেন—হিন্দুর বিবাহ পাশ্চাত্য বিবাহের ন্যায় চুক্তি বা ঐরূপ কিছু নহে উহা একান্তভাবে ধর্ম্মের বিষয়; সুতরাং শাস্ত্র যাহাকে স্বীকার করে না হিন্দুসমাজ তাহাকে স্বীকার করিবে না, সেই জন্যই এই আইনের এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ অসবর্ণ-বিবাহকারী-হিন্দু নামে মাত্র হিন্দু থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু কার্য্যকালে হিন্দু আইন তাহাকে সাহায্য করিবে না। এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বহু যুক্তি অবশ্যই আছে কিন্তু তাহার উল্লেখের কোন প্রয়োজনই দেখি না—তবে এইটুকু মাত্র জিজ্ঞাসা করি বিবাহ ব্যাপারে তাঁহারা "বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন"কে (Child Marriage Restraint Act) বেশ হজম করিয়াছেন—অনেকে হয়ত বলিবেন আইনের বলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হইয়াছে তাঁহাদিগের উহাতে হাত নাই—কিন্তু উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পূর্ব্বেই কি বাল্য বিবাহ আপনা হইতে কমিয়া যায় নাই? যে ধর্ম্মের বিধি অনুসারে রজস্বলা কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের নরক গমন অবধারিত, সেই ধর্ম্মের সেই সমাজের লোক কি করিয়া বাল্য-বিবাহের অপক্ষপাতী হন? কয়জন ব্যক্তি বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বে রঘুনন্দনী ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া অধিক বয়স্কা (অর্থাৎ বিবাহ বিধি অনুসারে বালিকা নহে) কন্যার বিবাহ দিবার ফলে সমাজে অপাঙক্তেয় হইয়াছেন তাহা জানিতে পারি কি? বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিয়া সমাজ যদি রসাতলে না যাইয়া থাকে, কন্যার বাল্যকালে যিনি বিবাহ দেন নাই তিনি যদি সমাজে

স্থান পাইয়া থাকেন তাহা হইলে অসবর্ণ বিবাহকারীই বা সমাজে স্থান পাইবেন না কেন?

আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯২৩ সালের সংযোজিত আপত্তিকর ধারাগুলি কেবলমাত্র হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্ম্ম স্বীকারকারী বিবাহকারী (এই আইন অনুসারে) সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতেছে। পুরাতন আইনে এইরূপ ছিল না। পুরাতন আইনে (অর্থাৎ ১৮৭২ সালের) "আমি হিন্দু নহি" এই কথা বলিয়া বিবাহ করিলেও হিন্দু আইনের আশ্রয় পাওয়া যাইত (উত্তরাধিকার ব্যাপারে) এবং বর্ত্তমানেও যে পাওয়া যাইবে না এমন কোনকথা নাই। মৃত জ্ঞানেন্দ্র রায়ের সম্পত্তির সংক্রান্ত মামলায় (উহার বিবরণ ক্যালকাটা উইক্‌লিনোট্‌স্ ভল্যুম ২৬ পৃঃ ৭৯৯-এ পাওয়া যাইবে) হাইকোর্ট হইতে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনের ঘোষণা, মাত্র বিবাহকে আইনানুসারে সিদ্ধ করিবার জন্য—উহার অপর কোন মূল্য নাই। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের আইন অনুসারে বিবাহ করিবার কালে কোন হিন্দু উক্তরূপ ঘোষণা করিলেই অহিন্দু হইয়া যায় না, তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব নির্দ্ধারিত হয় হিন্দু আইন অনুসারে—ইণ্ডিয়ান্ সাক্‌সেসন্ এ্যাক্ট্ অনুসারে নহে ইত্যাদি।

সুতরাং ব্যাপারটি দাঁড়াইতেছে এই যে, বিশেষ বিবাহ বিধি অনুসারে বিবাহ করিবার সময়—হয় "আমি হিন্দু নহি"—এই ঘোষণা করিয়া হিন্দুর সকল অধিকার ভোগ কর—অথবা "আমি হিন্দু" ইহা বলিয়া হিন্দুর প্রত্যেকটি বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত হও—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহার দ্বারা কি অসবর্ণ বিবাহকারী হিন্দুকে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করা হইতেছে না?

অবশ্যম্ভাবীকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। যুগধর্ম্মের প্রভাবকে এড়ান বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অসবর্ণ বিবাহকারীকে অনর্থক লাঞ্ছনা করিলে ঐরূপ বহু হিন্দুর অপর ধর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। তাই বলি সকল দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই আইনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে কি এমন কোন উদারনৈতিক হিন্দু নাই যিনি "বিশেষ বিবাহ বিধি"র সংশোধনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন? আইন সভার কোন হিন্দু সদস্যই কি মনে করেন না যে সংযোজিত আপত্তিকর ধারা কয়টি (বিশেষ করিয়া ধারা ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬) একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিৎ?

বরষা রাতের আলোক অন্ধকারে

বন্দে আলী মিয়া

গভীর রজনী স্তব্ধ ভবন রুদ্ধ সকল দ্বার,
প্রাঙ্গণ 'পরে দ্বাদশী চাঁদের আলোক অন্ধকার।
টুটিল তন্দ্রা উঠিয়া বসিনু বিজন শয্যা 'পরে
হেরিনু তোমারে ক্ষীণ দীপালোকে ঘুমাইছ অকাতরে।
একটি ফাগুন মোর গৃহে আজ
রূপ ধরি যেন করিছে বিরাজ
প্রথম প্রণয় বিথারিছে দল ভীরু অন্তরে তার।

সে-দিন শুভ্র শারদ যামিনী আজিকে বর্ষা রাত
বকুল সুরভি বাতাসের সনে এসেছে অকস্মাৎ।
নত-আঙিনায় মেঘ সমারোহ বনে তার ছায়া লাগে
কামরাঙা পাতা লাগে অবনত কামনার অনুরাগে।
মল্লিকা ঝারি আজি বনতল
মদির গন্ধে হয়েছে উতল—
শ্যাম প্রান্তরে বর্ষা-বালিকা করেছে চরণ পাত।

সে-রাতে তোমার শয়নের পাশে এসেছিনু অভিসারে
দূর হতে মোরে ডেকেছিলে জানি ইসারায় বারে বারে।
নব-বিকশিত কুসুমের দ্বারে প্রথম আসিল অলি
পরশে তাহার তোমার পাপ্‌ড়ি উঠেছিল উচ্ছলি।
দেহ মন ভরি তব বৈভবে
ফিরে গিয়েছিনু একেলা নীরবে
আজি খুঁজি তায় বরষা রাতের আলোক অন্ধকারে।

যৌবন-সুরা কোথা পাবে আজ?

কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বর্ষাতি মন ভেঙে পড়ে ঘন অশ্রুবাদল মাঝে,
ঘরছাড়া সব দলছাড়া হয়ে' চলেছে মনের দুখে।
সঞ্চিত ধনে রক্ষিত ধরা শূন্য শ্মশানে রাজে,
মরে গেছে চাঁদ, নীল আকাশের বুকে।

মানব-হৃদয় রাজপথে কাঁদে রক্ত করবীদল,
মানস-বলাকা হ'য়েছে আহত—তুমি কি নীরব র'বে:
প্রাণহন্তার তূর্য্যনিনাদে? মোর চোখে ঝরে জল—
বিহ্বল হয়ে' আত্মার পরাভবে।

ভীরু আশা তব রেখেছ বৃথাই ভাবনা-নিবিড় দিনে,
প্রতিটি প্রহর কাছে আসে কবি, দুঃস্বপনের মত!
দুরন্ত মেঘ ভিড় করে' সুর জাগায় রুদ্র বীণে;
বিবর্ণ আবেশে বনবীথি সংহত।

জীবনের কোনো দ্রাক্ষা বনের চিহ্ন নাহিক কবি!
যৌবন-সুরা কোথা পাবে আজ?—কে দিবে তোমারে আনি!
দেখেছ কি তুমি সমাধির বুকে সাকীর মৃত্যুছবি?
রিক্ত তাহার প্রেমের পাত্রখানি।

মানব-বিহীন আগামী যুগের নব প্রভাতের তীরে
সাকির সমাধি র'বে কি জীবন-দ্রাক্ষালতার ঘিরে?



গণদেবতা

পঞ্চগ্রাম

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বত্রিশ

মহগ্রাম বা মহাগ্রাম এককালে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বহুসংখ্যক মাটির এবং ইটের বাড়ীর পড়ো-ভিটা গ্রামখানির প্রাচীনত্ব এবং বিগত সমৃদ্ধির প্রমাণ-হিসাবে আজও দেখা যায়। গ্রামখানি এখনও আকারে অনেক বড় কিন্তু বসতি অত্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। মধ্যে মধ্যে বিশ-পঁচিশ, এমন কি পঞ্চাশ-ষাট ঘর বসতির উপযুক্ত স্থান পতিত হইয়া পড়িয়া আছে; খেজুর কুল আঁকড় সেওড়া প্রভৃতি গাছ ও ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এগুলি এককালে না কি বসতি পরিপূর্ণ পাড়া ছিল। বসতি নাই কিন্তু এখনও দুই-চারিটার নাম বাঁচিয়া আছে। জোলাপাড়া-ধোপাপাড়ায় একঘরও বসতি নাই; পালপাড়ায় মাত্র দুই ঘর কুমোর অবশিষ্ট; খাঁয়ের পাড়ায় খাঁ উপাধিধারী হিন্দু পরিবার এককালে রেশমের দালালি করিয়া সম্পদশালী হইয়াছিল; রেশমের ব্যবসার পতনের সঙ্গে তাহাদের সম্পদ গিয়াছে, খাঁয়েরাও কেহ নাই; আছে কেবল খাঁ মহাজনদের ভাঙা বাড়ীর ইটের বনিয়াদের চিহ্ন। খাঁয়ের পাড়া পার হইয়া বিশ্বনাথ আপনাদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল, সঙ্গে তারাচরণ।

ন্যায়রত্ন—চন্দ্রশেখর ন্যায়রত্ন এ অঞ্চলের মহামাননীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। বহুকাল হইতেই বংশটি পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার জন্ম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। দেশ দেশান্তর হইতে তাঁহাদের টোলে বিদ্যার্থী সমাগম হইত। এখনও টোল আছে, ন্যায়রত্নের মত মহামহোপাধ্যায় গুরুও আছে, কিন্তু এ-কালে বিদ্যার্থীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বাড়ীর প্রথমেই নারায়ণ-শিলার খড়ো-ঘরের সম্মুখে খড়ের আটচালায় টোল বসে, এক পাশে লম্বা একখানি ঘরে ছাত্রদের থাকিবার ব্যবস্থা। ঘরখানি প্রকাণ্ড ঘর, সুদৃশ্য এবং মনোরম না হইলেও বাস করিবার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় না; সেকালে কুড়ি জন পর্য্যন্ত ছাত্র এই ঘরে বাস করিত, এখন থাকে মাত্র দুই জন। বিশ্বনাথ যখন আসিয়া আটচালায় ঢুকিল তখন তাহারাও কেহ ছিল না; বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তাহাদের দুইজনকেই চাষের কাজ দেখিতে পাঠাইয়াছেন। কেবল একটা কুকুর ন্যায়রত্নের বসিবার আসন ছোট চৌকীটার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া বাদলের দিনে পরম আরাম উপভোগ করিতেছিল। বিশ্বনাথ দেখিয়া শুনিয়া বিষম চটিয়া গেল। দাদুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি, সেই দাদুর আসনে আসিয়া বসিয়াছে একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর! এদিক-ওদিক চাহিয়া কিছু না দেখিয়া সে তারাচরণের হাতের ছাতাটা টানিয়া লইয়া কুকুরটার পিছন দিক হইতে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই ভিতরবাড়ীর দরজায় ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ!

মুখ ফিরাইয়া দাদুর দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এ ব্যাটা যদি আপনার কৃষ্ণসার আশ্রম মৃগ হয় তবে ঋষিবাক্যও আমি মানব না। ব্যাটা ঘেয়ো কুকুর—

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিল—ও আমার কাঙালীচরণ।

কাঙালী আপন নাম শুনিয়া মুখ তুলিয়া ছত্রপাণি বিশ্বনাথকে দেখিয়াও নড়িবার নাম করিল না, শীর্ণ-কাটির মত লেজটা নড়াইয়া জলচৌকীর উপর পটপট শব্দ আরম্ভ করিয়া দিল। ন্যায়রত্ন অগ্রসর হইয়া আসিতেই সে চিৎ হইয়া শুইয়া পা চারিটা উপরে তুলিয়া দিল। এবার বিশ্বনাথ না হাসিয়া পারিল না। ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিল—এক ঘা খেলেই ও মরে যাবে। যা ছাতা তুমি তুলেছিলে!

বিশ্বনাথ ছাতাটা তারাচরণের হাতে দিয়া বলিল—মাথা রাখবার জন্যে ছাতার ব্যবস্থা দাদু, ওর বাঁট আর শিক যতই মজবুত হোক—মাথা ভাঙবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। এক ঘা ওটাকে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। যাক্ গে—হঠাৎ ও ব্যাটা জুটল কি ক'রে? কি নাম বললেন ওর?

—কাঙালীচরণ নাম দিয়েছি ওর। নামেই পরিচয়, কেমন ক'রে কোথা থেকে এসে জুটল বেচারী। কিন্তু হঠাৎ বাড়ী এলে যে ভাই? কোনও খবর তো দাও নাই।

—বলব পরে। এখন শিবকালীপুর থেকে তারাচরণ আমার প্রায় চুলের মুঠি ধরে আছেন, ওগুলো কেটে ফেলে ওর হাত থেকে মুক্ত হই, দাঁড়ান।

তারাচরণ দাঁত মেলিয়া সবিনয়ে হাসিল।

—দাঁড়াও তারাচরণ, জামা গেঞ্জী খুলে আসি আমি।

বিশ্বনাথ ভিতরে চলিয়া গেল।

তারাচরণ ভূমিষ্ট হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বিশ্বনাথের সংবাদটা জ্ঞাপন করিয়া দিল—দেবু ঘোষের গেরেপ্তারীর খবর শুনে বিশুবাবু এসেছিলেন; জামিনে খালাস ক'রে আনলেন—দেবুকে আর পাতুকে।

ন্যায়রত্নের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পর মুহূর্ত্তেই তিনি স্বাভাবিক প্রসন্নমুখে বাড়ীর ভিতরেই চলিয়া গেলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই ন্যায়রত্ন শুনিলেন নারীকণ্ঠের কথা—আর ব'ল না, বুড়ীর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি। কানে কালা—বকলেও শুনতে পায় না; একবার কাপড় নিলে পনের দিনের কমে দেবে না। জবাব দিতেও মায়া লাগে।

বিশু বলিল—তাই ব'লে এই রকম ময়লা কাপড় পরে থাকবে! ছি!

—তা বটে। লোকজনের সামনে বেরুতে লজ্জা।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং
মলিনপি হিমাংশোর্লক্ষলক্ষ্মীং তনোতি।"

সখি শকুন্তলে, মধুরানাং আকৃতীনাং মণ্ডনং শোভনং কিমিব ন! তোমার সুন্দর বরতনুতে ওই ময়লা কাপড়খানাই

অপরূপ শোভন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার দুষ্মন্ত ওতেই মুগ্ধ হয়েছেন।

বিশ্বনাথ কথা বলিতেছিল স্ত্রীর সঙ্গে। সুন্দর একটি খোকাকে কোলে করিয়া তরুণীজায়া রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছিল ; সে লজ্জিত হইয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। বিশ্বনাথও হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

শূন্য উঠানে দাঁড়াইয়া ন্যায়রত্ন আবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল খোকাটি। সুন্দর খোকা, মনোরম একটি লাবণ্য যেন সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। বছর খানেক বয়স, সে আসিয়া বলিল—ঠাকুর !

জয়া তাহাকে শিখাইয়াছে কথাটি ; প্রপিতামহ ন্যায়রত্নকে সে বলে ঠাকুর। ন্যায়রত্ন পৌত্রের সহিত ভাই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রপৌত্রকে বলেন—বাবা, বাপি।

ছেলেটি আবার ডাকিল—ঠাকুর !

মুহূর্ত্তে ন্যায়রত্নের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তিনি দুই হাত প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—বাপি !

—আবা কোরো আবা গান কোরো। অর্থাৎ আবার গান করো। ন্যায়রত্নের শ্লোক আবৃত্তির মধ্যে যে সুরটি থাকে—শুনিয়া শুনিয়া শিশু সেই সুরের মাধুর্য্যকে চিনিয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, সে বলে-আবা গান কোরো। ন্যায়রত্ন শিশুর অনুরোধ উপেক্ষা করেন না, আবার তিনি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শিশুটির নাম অজয়, অজয় আবার বলে—আবা কোরো।

ন্যায়রত্ন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরেন। আনন্দে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তাহার মনে হয়—এ সেই। হারানো ধন তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে।

* *

ন্যায়রত্নের হারানো-ধন তাঁহার একমাত্র পুত্র শশীশেখর, বিশ্বনাথের বাপ। সৌম্যকান্তি সুপুরুষ শশীশেখর এমনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শুধু হিন্দুদর্শনই নয়, বৌদ্ধ দর্শন এবং বাপকে লুকাইয়া ইংরেজী শিখিয়া পাশ্চাত্য দর্শনও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই হইয়াছিল সর্ব্বনাশের হেতু।

সে আমলে চন্দ্রশেখর ন্যায়রত্ন ছিলেন আর একমানুষ। প্রাচীনকাল এবং সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মহাকালের তপোবন রক্ষী শূলহস্ত নন্দীর মত ভ্রূভঙ্গি করিয়া তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া সদাজাগ্রত ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শশীশেখরও আপনার ইংরেজী শেখার কথা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ সে কথা একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন একজন ইংরেজ। ভদ্রলোক আই-সি-এস কর্ম্মচারী হইলেও রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যানুশীলনেই বেশী অনুরাগী ছিলেন। আপন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র। ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জেলায় আসিয়া তিনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর ন্যায়রত্নের নাম শুনিয়া একদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন ন্যায়রত্নের টোলে। সাহেবের সঙ্গে ছিলেন জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার। দোভাষীর কাজ করিবার জন্যই সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শশীশেখর তখন সবে নবদ্বীপ হইতে দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। ন্যায়রত্ন সাদর অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। শশীর কিন্তু এতটা ভাল লাগিল না। তবুও সে চুপ করিয়াই রহিল। সাহেবও একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার ন্যায়রত্নকে বলিলেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না ন্যায়রত্ন মশায়—সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে আপনার এখানে আসেন নি। উনি এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আলাপের ভূমিকাই হ'ল অভ্যর্থনা। আর এটা আমার আতিথ্য-ধর্ম্ম। রাজার দরবারে পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মান যেমন প্রাপ্য—পণ্ডিতের কাছে রাজা-রাজপুরুষের সম্মানও তেমনি প্রাপ্য। এ আমার কর্ত্তব্য।

অতঃপর আরম্ভ হইল আলাপ। আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া সাহেব উঠিয়া হাসিয়া ইংরেজীতে হেড মাষ্টারকে কি বলিলেন। মাষ্টারটি ন্যায়রত্নকে কথাটা অনুবাদ করিয়া না-বলিয়া পারিলেন না। বলিলেন—সাহেব কি বলছেন জানেন ?

ন্যায়রত্ন কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

হেডমাষ্টার বলিলেন—গ্রীক বীর আলেকজেন্দার আমাদের দেশের এক যোগীপুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজেন্দার না হ'তাম, তবে এই ভারতের যোগী হবার কামনা করতাম। সাহেবও ঠিক তাই বলছেন। বলছেন যে ইংলণ্ডে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আমার এ ব্রাহ্মণজন্ম না হ'লেও আমি কিন্তু এই দেশেরই কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে কামনা করতাম, অন্যত্র জন্ম কামনা করতাম না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ন্যায়রত্নের কথার মর্ম্ম শুনিয়া হাসিয়া ইংরেজিতেই মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন—ইনফিরিয়রিটির এ এক ধারার বিচিত্র প্রকাশ। এটা যেন ভারতবাসীর প্রকৃতিগত।

মাষ্টারটির মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু সাহেবের কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার হইল না। ন্যায়রত্ন ইংরেজী বুঝিলেন না কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও কথার সুর শুনিয়া ব্যঙ্গের শ্লেষ অনুভব করিলেন। তবুও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শশীশেখর দৃঢ় স্বরে ঈষৎ উষ্ণতার সহিত ইংরেজীতেই বলিয়া উঠিল—না, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এ নয়। এই তাঁর এবং ভারতীয় মনীষীদের অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় মনের অতিরিক্ত কিছু বোঝ না—বিশ্বাস কর না, আমরা মনের সীমানা অতিক্রম ক'রে অন্তর এবং আত্মাকে বিশ্বাস করি।

মনকে চিত্তকে জয় ক'রে আত্মোপলব্ধির সাধনাই আমাদের সাধনা। আমাদের মন আত্মাকে পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দ্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত। সুতরাং তোমাদের মনোবিশ্লেষণে আমাদের ভারতীয় সাধক মনীষীদের কমপ্লেক্স বিচার-মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহেব সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ;

মাষ্টারটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, রাজপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টিকেও তিনি বিশ্বাস করেন না, স্থায়রত্ন বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শশী স্লেচ্ছভাষায় অবলীলাক্রমে কথা বলিয়া গেল! শশীর মুখে স্লেচ্ছ ভাষা!

এই লইয়াই পিতাপুত্রে বিরোধ বাধিয়া গেল।

স্থায়রত্ন কালধর্ম্মকে শিবের তপোবনের ঋতুচক্রের আবর্ত্তনের মত দূরে রাখিয়া সনাতন মহাকালধর্ম্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলেন—কখন কোন্ এক মুহূর্ত্তে সেখানে অকাল বসন্তের মত কালধর্ম্ম বিপর্য্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারই ঘরে শশীর মধ্য দিয়া স্লেচ্ছ বিদ্যার ভাবধারা সনাতন মহাকালধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অপর দিকে শশীশেখর, এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ফলে, সঙ্কোচশূন্য হইয়া আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংস্কৃতিমত জীবন নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

তারপর সে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। স্থায়রত্ন শূলপাণি নন্দীর মতই কঠিন নির্ম্মম হইয়া উঠিলেন। শশীশেখর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিল। স্থায়রত্ন তাহাকে বাধা দিলেন না। কিন্তু বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রবধূ এবং পৌত্রকে লইয়া যাইতে দিলেন না। সংকল্প করিলেন—শশী যে সংস্কৃতির ধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—সেই ধারাকে সংস্কার করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন ওই পৌত্রকে। এক বৎসর পরেই ঘটিল এই ঘটনার চরম পরিণতি। এক পণ্ডিত-সভায় পিতা-পুত্রে শাস্ত্রবিচার লইয়া বিতর্ক উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্য বিরোধ বাধিয়া গেল। শশীশেখরের সেই দীপ্ত চক্ষু, স্ফুরিত অধর, প্রতিভার বিস্ফুরণ আজও স্থায়রত্নের চোখের উপর ভাসে। তাঁহার চোখে জল আসে।

সভার শেষে পিতা পুত্রকে বলিলেন—আজ থেকে জানব আমি পুত্রহীন। সনাতন ধর্ম্মকে যে আঘাত করতে চেষ্টা করে—সে ধর্ম্মহীন। ধর্ম্মহীন পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা বরণীয় কল্যাণ আর কিছু কামনা করতে পারি না আমি।

শশীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল—তা হ'লেই কি সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হবে আপনার?

—হবে।

সেই দিনই চন্দ্রশেখর স্থায়রত্ন পুত্রহীন হইয়া গেলেন। শশীশেখর আত্মহত্যা করিল।

চন্দ্রশেখর স্তম্ভিত হইয়া কিছুকালের জন্য যেন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। মদনকে ভস্ম করিয়া মহাকাল অন্তর্হিত হইলে নন্দীর যেমন অবস্থা হইয়াছিল—স্থায়রত্নেরও তেমনি অবস্থা হইল। তারপর অকস্মাৎ একদা তিনি মহাকালকে—ওই নন্দীর মতই গিরিভবন-পথে বরবেশী মহাকালকে আবিষ্কারের মতই আবিষ্কার করিলেন।

বিশ্বনাথের পড়িবার বয়স হইতেই তিনি বিশ্বনাথকেই প্রশ্ন করিলেন—দাদুর কোথায় পড়তে মন? আমার কাছে—না কল্পনার স্কুলে?

ছয়-সাত বৎসর বয়সের বিশ্বনাথ বলিল—বাড়ীতে তোমার কাছে পড়ব দাদু—আর ভাত খেয়ে স্কুলে যাব।

স্থায়রত্ন সেই ব্যবস্থাই করিলেন। সেই বিশ্বনাথ আজ এম-এ পড়ে, স্থায়রত্নের স্ত্রী-মারা গিয়াছেন, পুত্রবধূ বিশ্বনাথের মাও নাই; বিশ্বনাথের বিবাহ দিয়া স্থায়রত্ন আজ সংসার করিতেছেন—আর কালধর্ম্মকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধ দ্রষ্টার মত তাহার চরণক্ষেপের দিকে চাহিয়া আছেন। কিন্তু তবু আজ দুই-দুইবার তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। বিশ্বনাথ এ কি করিতেছে? স্থানীয় বৈষয়িক গণ্ডগোলে আপনাকে জড়াইতেছে কেন?

সমস্ত দুপুর তিনি চিন্তা করিয়াও নিরস্ত হইতে পারিলেন না। অপরাহ্ণে পৌত্রের ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন—বিশু!

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল শিশু অজয়—ঠাকুর! কোলে চাপি। বাড়ি যাই। বাড়ি যাই অর্থাৎ বাহিরে যাই।

হাসিয়া স্থায়রত্ন ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন—বিশ্বনাথ নাই। অজয়কে কোলে তুলিয়া লইয়া পৌত্রবধূকে প্রশ্ন করিলেন—হলা রাজ্ঞী শউন্তলে! রাজা দুষ্মন্ত কোথায় গেলেন?

হাসিয়া মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া জয়া বলিল—দেবু ঘোষ স্কুলের বন্ধু, সে এসেছে—তাই দেখা করতে গেল বাইরে।

স্থায়রত্ন অজয়কে আদর করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; তারপর বলিলেন—শউন্তলে, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি ভাল ক'রে রক্ষা ক'র দেবী। বলিয়া প্রপৌত্রকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

প্রার্থী

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারেক বিমুগ্ধ চোখে দূর হ'তে ফিরে চাও তুমি,
বঙ্কিম গ্রীবায় আর নয়নের তীর্য্যগ আক্ষেপে

কুরঙ্গের দৃষ্টি হানো, হোক্ দৃষ্টি আনত আভূমি,
নয়নে নয়ন রেখে স্মৃতি-তন্ত্রী সুরে যাক্ কেঁপে।
দিবসের শেষ রশ্মি রোমাঞ্চিত করুক তোমায়
রজনীর কৌতূহল জানাক্ তোমারে সন্ধ্যাতারা,
পুরাতন স্মৃতি যেন তব মনে জাগে পুনরায়,
অপরূপ কল্পনায় পুলক জগতরে করে আত্ম-হারা।

তুমি আছ, আমি আছি, আর আছে বর্ত্তমান কাল,
অতীত গিয়াছে ডুবে, তার সাথে সমস্ত প্রয়াস,
গাঢ়তম পরিচয় করিবার, শত বাক্য জাল
আর কি আনিতে পারে প্রণয়ের রহস্য-আভাস?
স্পর্শের ইঙ্গিত নয়, কথায় সঙ্গীতও নাহি চাই,
মুগ্ধ চোখে ফিরে চাও, কোনো প্রার্থনাই আর নাই।

দ্বিধা

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মানুষের মন থাকে তার নিজের কাছেই রহস্যাবৃত। আমরা যে মনকে দেখি সচরাচর প্রাত্যহিক জীবনে, তার আড়ালে গোপন র'য়ে যায় আসল অন্তর। অকস্মাৎ কোন সামান্য ঘটনার মধ্যে আচম্বিতে তার আত্মবিকাশ—দেয় পরিচয় ঘটিয়ে নিজের কাছে নিজেরই।

ভালোমন্দ না ভেবেই সে ভালোবাসে। যেমন কলেজের বন্ধুদের মধ্যে যাকে ভালো লাগে তাকে ভালোবাসে, তেমনি সে ভালোবাসে বাড়ীর বুড়ো চাকর হরিয়াকে। কি করে, তার মন চায় ভালোবাস্‌তে—এর মধ্যে আদর্শ বা নীতিবাদ নেই, নেই অন্তরের শাসন। নিতান্তই সহজ এবং স্বাভাবিক বৃত্তি। বোধ হয় এটাই মানবমনের এই বয়সের ধর্ম্ম। যাই হোক, ওসব সে অত তলিয়ে ভাবে না, ভাববার কি থাক্‌তে পারে এতে। কিন্তু একদিন সত্যই যখন আত্মপরিচয় পেলে সে, সেদিন তার ভাবনা হাতপা গুটিয়ে আপনাকে লুকোতে চাইল। সে কথাটা অতীশ জীবনে কোন দিন ভুলতে পারবে না।

সেদিন ছুটি ছিল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে বেরুলো। বাড়ীতে ভালো লাগে না, তাই ট্রামগাড়ীর 'ষ্টপে' এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কোথায় যাবে সে? যে দিকের গাড়ী আগে আসবে সে দিকেই যাবে। গাড়ী এলো একটা, কোথাকার তা ভাববার দরকার নেই। সে উঠ্‌ল। এ পথটা এমন সমাজচ্যুত যে এখানে তার পরিচিত বন্ধুবান্ধব কেউ থাকে না। কোথায় যাবে সে এই দুপুরে? সিনেমাতে অরুচি। ভালো লাগে না তার এই ছবির উপর অবাস্তব কল্পনার রঙ্‌। এ পাড়ায় আছে কতকগুলো অফিস, দোকান, বড় বড় বাড়ীগুলো মাথা উঁচু করে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে আছে—কোথাও পরিচিত লোকের আড্ডা পর্য্যন্ত নেই। হঠাৎ তার স্মরণে এলো, মণিকুন্তলা থাকে এদিকেই। ওই মোড়টা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা গলি পাওয়া যায়—সেই গলিতে মণি থাকে।

সে ভাবলে একবার হঠাৎ গিয়ে হাজির হ'লে মণি কিছু মনে করবে না ত? বেশ সহজ সরল অথচ স্নিগ্ধ ওই মেয়েটি। কলেজের আর পাঁচটা মেয়ের মত অতি-আধুনিকতার উগ্রতা মণির মধ্যে নেই। তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। 'লেডি-সীট' ছোড়িয়ে—কণ্ডাক্টরের ওজন-করা কণ্ঠস্বর। চকিতে সে মুখ তুলে চাইলে। দেখলে ওপাশের মেয়েদের আসনে একজনের বসবার মত স্থান আছে। কিন্তু নবাগতা মহিলা সেদিকে তাকিয়েও তাকালেন না। অন্যায় হ'লেও প্রতিবাদ করা অশোভন। অতীশ উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই সে থাক্‌ত—কারণ গাড়ীতে আর একটুও জায়গা ছিল না। জায়গা যদি বা ছিল আইনমতে তার সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করা নিষিদ্ধ।

ওপাশের ফিরিঙ্গি মেয়েটি একবার অতীশের পানে চেয়ে হেসে ব'ললে, তার পাশে বসতে। নিতান্তই সৌজন্য। তবু তার মনে হ'ল, দুইটি নারীর অন্তরের দুটি দিক দুজনের মধ্যে প্রকাশিত হ'ল একই মুহূর্ত্তে। এরা অধিকারের দাবী জানাতে যেমন পারে তেমনি প্রসন্ন দক্ষিণহস্তে মানুষকে আশ্রয়ও দিতে পারে। অবশ্য অতীশের এতবড় কথাটা অতি সামান্য একটুক্‌রো ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে মনে এল।

যাক্‌, গাড়ী থেকে নেমে সে মণিকুন্তলার বাড়ীর পথে চল্‌তে লাগ্‌ল। 'দশ', 'বারো', 'চৌদ্দর-এ'—সব কটা নম্বর ছাড়িয়ে সে 'ষোলর-দুয়ের-সি' নম্বর আঁটা বাড়ীটার দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। মণিকুন্তলার বাড়ী।

ডাকবে, না কড়া নাড়বে? কোন 'কলিং বেলও' ত দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না ছাই। হয় ত এখুনি কেউ এসে পড়বে এদিকে, তা হ'লে বাঁচা যায়। আচ্ছা, মণি কি ঘুমোচ্ছে, না পড়ছে। একমাস বাদে পরীক্ষা। কিন্তু কড়া নাড়লে যদি আর কেউ আসে। সেটাই সম্ভব। তাকে সে কি বল্‌বে? বল্‌বে, 'অতীশ এসেছে মণিকে সংবাদ দিন।' সেটা যেন কেমন কেমন দেখায়। তা ছাড়া, কলেজে মণির সঙ্গে তার পরিচয় যদিও যথেষ্ট আছে, মণির বাড়ীর কারুর সঙ্গে মুখ চেনাচিনি পর্য্যন্ত নাই। অতীশ দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ভাবে। আচ্ছা, মণির নাম ধরে ডাকবে সে? কথাটা মনে হ'তেই তার দেহে শিহরণ এল। একটু কুণ্ঠা, একটু ভদ্রতাবোধ—দুয়ে মিলে অতীশ নিজের কাছেই অপদস্থ হ'ল। একবার সে ভাবলে—দূর ছাই, চ'লে যাই। সে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে দিলে। তারপর মনে হল, নাঃ, যেন নেহাতই নাটকীয় হ'চ্ছে তার এই এসে ফিরে যাওয়া।

নিতান্ত দেখা করা ছাড়া অতীশের কোন প্রয়োজনের তাড়না ছিল না। তাই, যখন মনে হ'ল, মণি যদি প্রশ্ন করে 'এমন অসময়ে আপনার উদয়, কি সৌভাগ্য' বা ঐরকম একটা সাধারণ কথা, অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয় এটা, তখন সে কি জবাব দেবে! জবাব না হয় একটা দেওয়া যাবে। কিন্তু ··· কিন্তু কি জবাবটা দেবে সে? সে কি বল্‌বে, 'তোমায় দেখ্‌তে এলাম।' কথাটা ভাবতেই অতীশের চোখমুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। একান্ত নির্জ্জনেও সে নিজের কাছে লজ্জিত হল। না, না, বল্‌বে—অকারণে, এমনি খেয়াল হ'ল—তাই। কিন্তু এমন খেয়ালের যদি মণি অন্য কোন অর্থ করে, তবে? অতীশ আবার ভাবলে ফিরে যাওয়া যাক। কিন্তু পরক্ষণে তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। পেয়েছে সে আপনার আসবার সঙ্গত কারণ। মণির সঙ্গে যেদিন তার প্রথম আলাপ—বিচিত্র ভাবে তাদের আলাপ হ'ল—তর্কের মধ্য দিয়ে। লাইব্রেরিতে ছিল সেদিন বিতর্ক-সভা—বাদ-প্রতিবাদে, উত্তর-প্রত্যুত্তরে কখন যে তারা ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গেছে অতীশ বা মণিকুন্তলা কেউ জানতে পারেনি। সেদিনকার তর্কের মীমাংসা যা হোক একটা হ'য়েছিল কিন্তু মণিকুন্তলা অতীশকে নিজের বাড়ীতে যাবার জন্যে ব'লেছিল, নিজের খাতার পাতায় বাড়ীর পথের একটা নক্সাও সে ছ্‌কে

দিয়েছিল। এ নিশ্চয়ই শুধু মুখের কথা নয়। যদিই-বা তা হয়, তাতেই বা কী এমন ক্ষতি? মুখের কথারও মূল্য আছে বই কি। মনের কথা ত মানুষ সব সময় মুখের ভাষায় ব্যক্ত করে। যাক্ কৈফিয়ৎ একটা পাওয়া গেছে—অতীশ খুশী হ'ল নিজের উপর।

এই প্রসঙ্গে বলি, মণিকুন্তলার সঙ্গে অতীশের আলাপ খুব বেশি দিনের নয়। তবে পরিচয়, সেই প্রথম যেদিন সে মণিকে দেখেছিল সেদিন থেকেই শুরু হ'য়েছে। আলাপটা মৌখিক কিন্তু পরিচয়—আন্তরিক। কাজে কাজেই এখানে আলাপ অল্প হ'লেও পরিচয় বেশী হ'তে অসুবিধা ছিল না। কলেজে তারা সুযোগ খুঁজে আলাপ করেনি আর পাঁচজনের মত। কিন্তু যেদিন তাদের বাক্যবিনিময় হ'ল সেদিন দেখ্‌ল ওরা আলাপের প্রথম অধ্যায় ছাড়িয়ে কাছাকাছি এসে প'ড়েছে। সহজ সরল তাদের কথাবার্ত্তা—যেন বহুদিনের পরিচয়।

তাই আজ অতীশ চলে এল, সাত-পাঁচ ভাবলে না। যত দুর্ভাবনা তার মাথায় চাপ্‌ল এই ষোলর-দুয়ের-সি বাড়ীটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

নিজের আসবার কারণ একটা দেখাবার মত খুঁজে সে পেল। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেও বাঁচল, কিন্তু তবু ডাকবার মত শক্তি যেন অতীশের নেই। অবশেষে সে নিজের উপরই বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।—যাহোক্ একটা কিছু তাড়াতাড়ি করা দরকার। একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকালে সে—যদি কাউকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তেতলার ছাদ বেয়ে গোটা কয় ধুতি নেমে এসেছে দোতলার জানলার কাছ পর্য্যন্ত। কয়েকখানা শাড়ীও ঝুলছে। ভালো করে শাড়ীগুলোও যেন অতীশ দেখল না। পাছে লজ্জিত হ'তে হয়, এই তার ভয়। তবে ওগুলোর মধ্যে যেখানা ফিকে আসমানী রঙের—সেখানাই বোধ হয় মণিকুন্তলার। অতীশ আবার একবার আপনার মনকে শক্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলে। কেন, কেন তার এ দুর্ব্বলতা, এ সংশয় কেন? এমন দোলাচলচিত্তবৃত্তি তার কোনদিনই ত ছিল না।

খোলা দরজার মধ্য দিয়ে দেখা গেল, একজন লোক সুমুখের উঠানটা পার হ'য়ে যাচ্ছে। বোধ হয় চাকর-বাকরই হবে, অতীশ তাকে ডাকবে কি না ভাবতে ভাবতেই সে চোখের আড়ালে চলে গেল।

ডান পাশের বাড়ীটায় আধাবয়সী মোটা এবং বেঁটে একটা লোক অতীশের পানে চাইতে চাইতে ঢুকে গেল। একজন গোলাপছড়িওয়ালা বোধ হয় গলির খানিকটা পর্য্যন্ত এসে একটু জোরে হাঁক দিয়ে আবার ঘুরে গেল। আপনার অক্ষমতায় অতীশ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ল। এরকম ভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই সাচ্ছন্দ্যকর নয়। সে আড়চোখে ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখ্‌ল, কম ক'রে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে আছে সে বোকার মত, এই দরজার সাম্‌নে। যে লোকটা ওই বাড়ীতে ঢুক্‌ল সে কি ভাবলে অতীশকে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখে? যা খুশী তাই ত লোকটা ভাবতে পারে। ভরা দুপুর বেলা, নির্জ্জন পথ, শাড়ী ঝুলছে এমন একটা বাড়ীর সামনে একজন যুবককে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখ্‌লে যে যা ইচ্ছা তাই অনুমান ক'রতে পারে।

কথাটা অতীশের মোহগ্রস্ত মনকে নাড়া দিল। তার অবলুপ্ত চেতনা যেন মুহূর্ত্তে সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে স্থির করলে এবারে একটা কিছু করা তার অবশ্যই কর্ত্তব্য। মরীয়া হ'য়ে সে কড়াটা আঁকড়ে ধরল।

অতীশ দরজার কড়া নাড়ল। খুব সন্তর্পণে। এত আস্তে শব্দ হ'ল যে তার নিজেরই যেন কেমন লাগল। তবু সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় কি-না। তারপর আবার মৃদু শব্দ ক'রলে কড়াটা দরজার উপর বুলিয়ে। ভাব্‌লে, পরিচিত কণ্ঠে কেউ বলবে জানালাতে মুখ বাড়িয়ে, 'কে!' অতীশ মনশ্চক্ষে মণিকুন্তলার সুডৌল-সুবর্ণ বাহু দুটি দেখ্‌তে পেল। হাতে তার দুগাছি সরু চুড়ি। মণির কানের সেই পরিচিত দুল দুটি অতীশের চোখের সাম্‌নে দুল্‌তে লাগল। আনমনে সে একবার উপরের জানলার পানে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। সেখানে ছিল না কেউ, তবু তার এ দ্বিধা। যদি কেউ এসে পড়ে। হয় ত দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যাবে।···অতীশ আবার কড়া নাড়ল। এবারে একটু জোরে।

'কে গা' ব'লে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক নীচেকার উঠানে গলা বাড়িয়ে কর্কশকণ্ঠে এগিয়ে এলো। অতীশকে দেখে সে একটু অপ্রতিভভাবে ঘাড় থেকে কাপড় টেনে মাথায় চাপা দিলে। বাড়ীর ঝি। বল্‌লে, "কি চাই আপনার? বড়বাবু বাড়ী নেই। দুপুরে ত তেনার দেখা পাওয়া যায় না। উপরে ঘুমোচ্চে তিনি।"

অতীশ তার কথা শুনে হাস্‌ল না, শুধু ব'ললে, "দিদিমণি আছেন ত? মণিকুন্তলা—"

বৃদ্ধা তার মুখের পানে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললে, "বুঝেছি। আপনি দাঁড়াও।" তারপর আপনার মনে বকৃতে বকৃতে চলে গেল, "মেমসাহেবদের যত্ত সব আনৃথাই কাণ্ড। আমরাও তো বাবু মানুষ ছিলাম। এমন আশৈলে কাণ্ড দেখিনি কখনো।"

ঝি তেতলায় গিয়ে জানালে যে কোন এক কলেজীবাবু এসেছে দিদিমণির সঙ্গে দেখা ক'রতে। এ সেই মিহিরবাবু নয়, নতুন কে একজন—তাকে ঝি চেনে না। মণিকুন্তলা কি একখানা ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। সে মুখ না তুলেই বললে, "ননসেন্স। টায়ার্ড—।" ঝি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ—তারপর ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল, "না হয় সাহেবী লেখাপড়া তুমি শিকেছো। আমি বাপু বাংলা ছাড়া বুঝিনে।" এইবারে মণি-কুন্তলার চৈতন্য হ'ল, সে চোখ দুটো কপালে তুলে ভণিতা ক'রে বললে, "কি ব'লছিস্?"

"বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু—কে এক ভদ্দরনোক তোমার সাথে মুলোকাৎ ক'রতে এয়েছেন একবার দেখো গিয়ে; বেশ, ভালো নোক ব'লেই ত মনে হ'ল বাপু।"

"তোর চোখে সবাই ভালো। বুড়ো বয়সে এবার একটা বিধবা বিয়ের আয়োজন আমায় ক'রতে হবে দেখ্‌ছি।"

ঝি চটে গেল, "খুব হ'য়েছে। মস্করা করবার কথা খুঁজে পাও না? আজকালকার ছুঁড়িদের ওই এক ঢঙ্। বুঝিনে বাপু। যাও, তুমি এখন ভাবন ক'রে দেখা কয়ো গিয়ে, আমি তেনাকে খাড়া ক'রে রেখে এসেছি।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে খানিক চুপ ক'রে থাক্‌ল। তারপর বল্‌লে, "যা বলুগে. দিদিমণি বাড়ী নেই। এক একদিন এক একজন কেন যে আসে বুঝতে পারিনে। ভালো লাগে না ছাই।"

মণিকুন্তলা বাড়ীতে নেই শুনে অতীশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল—এ যেন আপনার কাছ থেকেই সে মুক্তি পেলে। মণি থাক্‌লে তার সঙ্গে দেখা হ'ত বটে। তা না হয়ে এই বেশ ভালো হ'য়েছে। তারপর সে আঁকা বাঁকা গলির পথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে প'ড়ল। সেখানে প্রচুর আলো, অনেক লোক, গাড়ী ঘোড়া—সবটা মিলিয়ে সুসমঞ্জস গতি। তার বেশ ভালো লাগ্‌ল। বিকেল হ'য়ে এসেছে। সে গড়ের মাঠের দিকে হাঁটা দিল।

পরদিন কলেজে মণিকুন্তলার সঙ্গে দেখা। সে ত রোজই হয়, কলেজ খোলা থাক্‌লে। নতুন কিছু নয়। তবু অতীশের কাছে মণিকুন্তলা যেন আজ নবপরিচিতা। আগেকার সে সহজ সাচ্ছন্দ্য যেন তার কোথায় হারিয়ে গেছে। গতদিনের দুপুরে অতীশ নিজের কাছে ধরা প'ড়ে গেছে। তাই এত লজ্জা, এত শঙ্কা। তাই যেন তার কাছে মণিকুন্তলা মধুরতরভাবে নতুনরূপে ধরা দিয়েছে। কতবার যে অতীশ সহজ হবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই পারল না। একবার সে ভাবলে যে কালকে দুপুর বেলায় মণি কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করে। সে যে তার বাড়ী গিয়ে দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছে, সে কথাটা জানিয়ে দেয়। নাঃ থাকগে। কি হবে ব'লে।

মণিকুন্তলা ক্লাশের একটি একটি ছেলেকে দেখ্‌ছে আর ভাব্‌ছে—এখনি হয়ত ওই ছেলেটা গায়ে প'ড়ে দাঁত বার ক'রে ব'লবে, "মিস্ মল্লিক, কাল আপনার ওখানে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখা পাইনি। একদিন এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক'রে যাবো আবার।"

ভাব্‌তেই তার মনটা রাগে রী-রী ক'রছে।

অতীশের সঙ্গে লাইব্রেরীতে কাছাকাছি দেখা। অতীশ অপাঙ্গে দেখে আবার পড়ায় মন দিল। মণিকুন্তলা তার কাছে এসে একটু হেসে বললে, "কেমন আছেন অতীশবাবু! আই সি। ইউ আর ভেরি সিরিয়াস। ওটা কি, দেখি দেখি, ইস্ আপনার খাতায় সব ভ্যালুয়েবল্ নোট্‌স্। আমায় একদিন যদি দয়া করে দেন।"

অতীশের চোখমুখ অকারণে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে কিছুতেই আগেকার সাচ্ছন্দ্য আপনার আচরণে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না। অন্তরের গোপনদেশে যে আলোড়ন চ'লেছে তারই আভাস ভেসে উঠ্‌ল তার চেহারায়। সে অতি কষ্টে মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালে, দেবো নিশ্চয়ই।

মণিকুন্তলা চলে গেল না। তারই পাশের চেয়ারে ব'সে পড়ল। বইয়ের পাতার উপর মুখ গুঁজে হুমড়ি খেয়ে পড়বার প্রাণপণ প্রচেষ্টা অতীশের।

মণি তার মুখের পানে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগ্‌ল। তার মনে হ'ল, অতীশ কেন যায় না তার বাড়ীতে। কলেজের এত ছেলে সবাই ত যায়, তারা না বল্‌তেও সেধে যায়। অথচ মণি যে অতীশকে আহ্বান করেনি তা নয়। বেশি গায়ে প'ড়ে রোজ রোজ ত আর কেউ বল্‌তে পারে না—'অতীশবাবু, যাবেন. একদিন আমাদের বাড়ী।'

এপাশের চেয়ারে অতীশ ভাবছে—কালকের দুপুরের কথা বলবে কি না? আবার কি মনে হ'ল—ভাব্‌লে, থাকুগে।

ঢাকিও না মুখখানি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

ঢাকিও না মুখখানি সঙ্কোচে ব্রীড়ায়
লতাবগুণ্ঠিত ক্ষুদ্র কুসুমের মত,
আমি যে লুকাতে চাই প্রণয়প্রচ্ছায়
লয়ে সর্ব্ব দৈন্য-ভরা হৃদয় আহত।

তোমার কুঞ্চিতকৃষ্ণ অলক আলোকে
পুলকের প্রস্রবণ স্বতঃ প্রবাহিত,
তোমার সরম নম্র কম্পিত উরসে
ক্ষণিক লভিবে শান্তি একান্ত আশ্রিত।

নিতান্ত সরলসুখে পরমনির্ভয়ে,
সর্ব্ব তিক্ত বিষদগ্ধ সংসার ঝটিকা
বিব্রত করিছে নিত্য তাই তো আলয়ে
ফিরিয়া এসেছে পাখী ত্যজি' বিমানিকা।

ঢাকিও না মুখখানি সরমে সঙ্কোচে,
নম্রতার মাঝে যেন সর্ব্ব দৈন্য ঘোচে।

দীপশিখা

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বোমার আঘাতে ফেটে হ'ল চৌচির
শুধু বাড়ি নয়, কবরশালারও ছাদ,
বহুদিন পরে মুখ ফোটে মৌনীর,
বহুকাল পরে শব করে প্রতিবাদ।

প্রতিবাদ করে বুভুক্ষিতের দল,
ঘুম ভেঙ্গে উঠে তারা দাবী করে রুটি,
মেসিন-গানের সুরে হ'ল চঞ্চল
ঘরে পোষ-মানা বলাকার ডানা দুটি।

ম'রে ম'রে যার মৃত্যু গিয়াছে স'রে,
পুষ্পকে এলো জীবনের বাণী তার;
এতকাল গেছে মাল টেনে তার ঘ'রে,
আজ আলো মাঝে আবরি অন্ধকার।

দুঃখ মরুর রুক্ষবুকের কাছে
কে যেন নূতন দীপশিখা জ্বালিয়াছে।

জন্ম ও জাতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা হইবে—না গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা হইবে? ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ বলা হইবে, না যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে, যে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে? এই প্রশ্ন আজকাল প্রবলভাবে উত্থিত হইয়াছে। প্রশ্নটির মীমাংসা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ হিন্দুর বিবাহ, উপনয়ন, অশৌচ প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠান তাহার জাতি বা বর্ণের উপর নির্ভর করে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব—সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই জাতিবিভাগ স্বীকার করে। জাতি বা বর্ণ বিভাগ হিন্দুর জীবনে এত বৃহৎ বস্তু যে হিন্দুধর্মের একটি নাম হইতেছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। সুতরাং বর্ণ বা জাতি কিরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে ইহা অবশ্যই নিশ্চয়রূপে জানা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, শূদ্রের পুত্র শূদ্র হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা আজকাল অনেকের মনঃপূত নহে। তাঁহারা বলেন যে জন্ম অনুসারে জাতি বিভাগ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে—গুণ এবং কর্ম অনুসারে জাতিবিভাগই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ" (গীতা ৪।১৩)। যাঁহারা বলেন যে জন্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করা উচিত নহে তাঁহারা এই বাক্যের অর্থ করেন—"গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি (ঈশ্বর) চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" প্রধানতঃ এই বাক্য হইতে তাঁহারা স্থির করেন যে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

কিন্তু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে ইহা দেখা যাইবে যে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় নহে, জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। মহাভারতের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণের (দ্রোণাচার্য্যের) পুত্র হইলেও যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার কর্ম ছিল ক্ষত্রিয়োচিত, ব্রাহ্মণোচিত নহে। তিনি এরূপ ক্রুর-স্বভাব ছিলেন যে রাত্রিকালে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা করেন এবং উত্তরার গর্ভস্থ শিশু হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। সুতরাং তাঁহার গুণ বা কর্ম কিছুই ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করিলে অশ্বত্থামাকে কিছুতেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না। কিন্তু যখন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ধরিয়া আনা হইল তখন তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহাকে বধ করা হইল না, তাঁহার সহজাত মস্তকের মণি কাটিয়া লইয়া তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বলিলেন

জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্গৌরবর্চ্চ।
মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব, ১৬।৩২

অর্থাৎ দ্রোণপুত্রকে জয় করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে কারণ সে ব্রাহ্মণ এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবন্ধু র্ন হন্তব্যো আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৫৩

অর্থাৎ "শাস্ত্রে আমি (ভগবান) বলিয়াছি যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও বধ করিতে নাই, আবার ইহাও বলিয়াছি যে—যে আক্রমণকারী তাহাকে বধ করা উচিত। আমার উভয় আদেশই পালন করিতে হইবে।" (মস্তকের মণি গ্রহণ করাই বধতুল্য হইয়াছে)।

দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই, ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে [illegible] অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা হয় নাই, জন্ম অনুসারেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। এক ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণের মত এবং কর্ম ক্ষত্রিয়ের মত হইলে কি জাতি হইবে? একই ব্যক্তির গুণ ও কর্মের পরিবর্ত্তন হয়, ইহা দেখা যায়। গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করিলে এই সকল ক্ষেত্রে বারবার জাতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কোনও এক ব্যক্তির গুণ ভাল বা মন্দ ইহাও অনেক সময় নির্ণয় করা দুরূহ হয়—মিত্রপক্ষের লোক যাহাকে ভাল বলেন, শত্রুপক্ষের লোক তাহাকেই মন্দ বলেন।

গীতার উপদেশ আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করিয়া জাতি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেই অর্জ্জুন বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না, ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব।" গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা যদি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেন, "ভাল কথা। তুমি আজ হইতে ব্রাহ্মণ হইলে। কারণ ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা উচিত (শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা—গীতা ১৮।৪২) সে সকল গুণই তোমার আছে। ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কর্ম। সুতরাং তুমি ভিক্ষা জীবিকা গ্রহণ করিলে তোমার গুণ ও কর্ম উভয়ই ব্রাহ্মণোচিত হইবে। সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ হইবে।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিলেন না। বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ না করিলে তোমার পাপ হইবে।" অর্থাৎ "তুমি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ পরিত্যাগ করা পাপ।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (১) (গীতা ১৬।২৪)। মনুসংহিতা একটি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ইহা যে গীতার এবং মহাভারতের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এ বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সকল পণ্ডিতগণ একমত। মহাভারতের বহুস্থলে মনুসংহিতার উল্লেখ আছে এবং মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়াছেন তখন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে মনুসংহিতাকেও তিনি প্রামাণিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। মনুসংহিতা ১০।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পিতা ও মাতার যে বর্ণ পুত্রেরও সেই বর্ণ (২)। শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলিয়াছেন তখন এরূপ হইতে পারে না যে গীতায় জাতি-নির্ণয় সম্বন্ধে মনুসংহিতার বিপরীত মত তিনি গীতায় প্রচার করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, তোমার সকল কথাই না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ (গীতা ৪।১৩)

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি—তুমি ত ইহার কোনও উত্তর দিলে না। ইহার উত্তর এই যে ঐ বাক্যের এই অর্থ নয়। এই বাক্যের অর্থ এই যে গুণ অনুসারে কর্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে। এখানে কর্ম শব্দের অর্থ কর্ত্তব্যকর্ম। ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে পূর্ব জন্মের কৃতকর্ম অনুসারে যাহার যেরূপ গুণ হয় তাহাকে তদনুরূপ জাতিতে ভগবান জন্মপ্রদান করেন এবং তদনুসারেই বিভিন্ন জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এই কথা গীতা ১৮।৪১ শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥

অর্থাৎ হে অর্জুন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম তাহাদের স্বভাবজাত গুণ অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম কি তাহা

---

(১) তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
(২) সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

উল্লেখ করিয়া ভগবান ১৮।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে নিজ নিজ কর্ম করিয়া লোকে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিলে একথা বলা যায় না। কারণ কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিলে সকলেই ত নিজ জাতির কর্ম করিবে। জন্ম অনুসারে জাতি এবং জাতি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দেশ করিলেই একথা বলা যায় যে, যে ব্যক্তি তাহার জাতির নির্দিষ্ট কর্ম করিবে সে সিদ্ধিলাভ করিবে।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য কেহ কেহ বলেন যে বর্ণ জন্মের উপর নির্ভর করে না, কর্মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য বিশ্বামিত্রকে কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তপস্যার অলৌকিক শক্তি। তপস্যার দ্বারা দেহের উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব, সুতরাং তপস্যার দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য বিশ্বামিত্রকে কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে বর্ণ কর্মের উপর নির্ভর করে না। যদি কর্মের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে ব্রাহ্মণের কর্ম করিয়াই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, এত কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হইত না। বিশ্বামিত্রের ন্যায় আরও কয়েকজন ঋষি তপস্যার দ্বারা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাভারত বনপর্ব ১৭৯ অধ্যায়ে দেখা যায়—সর্প জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ব্রাহ্মণ কে"; যুধিষ্ঠির উত্তর দিতেছেন "যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপঃ ও ঘৃণা লক্ষিত হয় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ"। যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিয়াছেন যে শূদ্রের মধ্যেও এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত এবং ব্রাহ্মণের এই সকল গুণ না থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত নহে। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ দুইটি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে (১) যাহার জাতি ব্রাহ্মণ (২) যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে। এই বাক্যের উদ্দেশ্য সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করা। কি ভাবে জাতি নির্ণয় করা হইবে, তাহা নির্দেশ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে কে ক্ষত্রিয় ও কে বৈশ্য তাহাও উল্লেখ করা হইত, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কথাই থাকিত না। সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল গুণ কত পরিমাণে থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মনুসংহিতা প্রামাণিক গ্রন্থ, এ কথা মহাভারতে অন্যত্র বলা হইয়াছে।[৩] পূর্বে বলা হইয়াছে যে মনুসংহিতাতে ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ করা হইবে। মহাভারতে এক স্থলে মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলিয়া অন্যস্থলে মনুসংহিতার বিরুদ্ধ মত প্রচার করা হইবে ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে বর্ণ জন্মের উপর নির্ভর করে না, গুণের উপর। তাঁহাদের মতে সত্যকামের মাতা জবালা বহু পুরুষ-গামিনী ছিলেন, তথাপি সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলা হইল কারণ সত্যকাম সত্যকথা বলিয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে জবালা বহু পুরুষগামিনী ছিলেন না। উপনিষদের বাক্যটি হইতেছে "বহ্ অহং চরন্তী"। "বহ্" শব্দটির ক্লীবলিঙ্গ, দ্বিতীয়ার এক বচনে প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ এবং এই বাক্যের অর্থ, "আমি বহুপরিমাণে পরিচর্যা করিয়াছিলাম।" যদি ইহা বলা উদ্দেশ্য হইত যে জবালা বহু পুরুষগামিনী ছিলেন তাহা হইলে বলা হইত "বহূন্ অহং চরন্তী"। অর্থাৎ বহু শব্দের পুংলিঙ্গ দ্বিতীয়ার বহুবচন থাকা উচিত ছিল। সত্যকামের আচার্য গৌতম প্রথমে সত্যকামের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে জন্মের দ্বারা জাতিনির্ণয় করাই সাধারণ নিয়ম। যখন গৌতম বালকের বংশপরিচয় জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি যোগলব্ধ দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলেন যে এই বালক ব্রাহ্মণবংশপ্রসূত।

জন্ম অনুসারে জাতিনির্ণয় করার ব্যবস্থাতে আজকাল অনেকে যে আপত্তি করেন, তাহার কারণ ইঁহারা মনে করেন যে জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা; ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করা কোনও কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে; সুতরাং এই কারণে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা সমীচীন নহে; যে ব্যক্তি ভাল কাজ করিয়াছে, সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই প্রকার যুক্তি সঙ্গত নহে। জন্মের পূর্বের বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি বলিয়া আমরা মনে করি যে জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। বর্ণ বা জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও জন্মের উপর সুখ ঐশ্বর্য প্রভৃতি এত বেশী পরিমাণে নির্ভর করে যে জন্মকে আকস্মিক ঘটনা বলা সমুচিত হয় না। ঈশ্বর যদি পক্ষপাতশূন্য হয়েন তাহা হইলে বিনা কারণে এক ব্যক্তিকে উত্তম গৃহে জন্ম দিয়া সুখী এবং আর একজনকে মন্দ গৃহে জন্ম দিয়া অসুখী করিতে পারেন না। অপর দিকে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা যেরূপ যুক্তিসঙ্গত, জন্মের পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করাও সেইরূপ সঙ্গত। হিন্দুধর্ম বলে যে জন্মের পূর্বেও আমরা কর্ম করিয়াছি এবং সেই কর্ম অনুসারেই আমাদের জন্মের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি উত্তম জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে পূর্ব জন্মে উত্তম কর্ম করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে ব্যক্তি পূর্বজন্মে মন্দ কর্ম করিয়াছিল—ইহা বেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

> রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্
> ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা
> কপূয়চরণা কপূয্যাং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা
> শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।
>
> ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭

অর্থাৎ যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা উত্তমযোনি লাভ করে, যথা ব্রাহ্মণযোনি বা ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মন্দযোনি লাভ করে, যথা কুকুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।

উত্তম কর্ম করিলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু স্বর্গে কেহ চিরকাল থাকিতে পান না। পুণ্য ক্ষীণ হইলে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে হয়। স্বর্গবাসের পর যে কর্ম অবশিষ্ট থাকে তাহার দ্বারা পরজন্ম নির্দিষ্ট হয়।

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। আমরা পূর্বজন্মে কি কর্ম করিয়াছি তিনি সকল অবগত আছেন। কে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিবার উপযোগিতা অর্জন করিয়াছে তাহা তিনি সম্যক অবগত আছেন। আমরা অহঙ্কার-বশতঃ মনে করি যে কাহার কোন্ বর্ণোচিত গুণ আছে তাহা আমরা স্থির করিতে পারি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান অতিশয় সামান্য। কাহার কি গুণ আছে তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি। বিশেষতঃ কাহার মনে কি সুপ্ত সংস্কার আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। অতএব কাহার কোন্ বর্ণ হওয়া উচিত আমরা তাহা বলিতে পারি না। ঈশ্বরই তাহা জানেন।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে কেহ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে সদ্গতি লাভ করিবে এবং চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে অসদ্গতি লাভ করিবে এমন কোনও কথা নাই। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম

---

(৩) পুরাণং মানবোধর্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ (মহাভারত)
পুরাণ, মনুসংহিতা, বেদ, বেদাঙ্গ, আয়ুর্বেদশাস্ত্র—ইহারা ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির দ্বারা ইহাদিগকে আঘাত করা উচিত নয়।

করিয়া মন্দ কর্ম করিলে নরকে যাইতে হইবে এবং পরজন্মে কুকুর প্রভৃতি নীচ যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। অপরপক্ষে চণ্ডাল যোনি লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে সে ইহজন্মেই মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। এ কথা ভগবান গীতায় স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে ঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিং ॥

গীতা ৯।

"চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতির লোক, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে।"

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ গীতা ১৮।

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ বর্ণবিহিত কর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক অনুধ্যান করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে।"

বর্ণবিভাগ দ্বারা স্থির হইয়াছে কাহার কোন্ কর্ম করা উচিত। যিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন, নিজ বর্ণ বিহিত কর্ম করিলে সকলেরই এক ফল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে আমাদের জন্ম নির্দিষ্ট হয়, জন্ম অনুসারে বর্ণ বা জাতি নির্দ্ধারিত হয়, কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে, নিজ বর্ণবিহিত কর্ম ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হইলে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া দেন, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সদাসর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মৃত্যুর পর তাঁহাকে লাভ করা যায়।

দাদা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম্-বি-ই

হগ্ মারকেটের মোড়ে ট্রামখানিতেই কণ্ডাক্টার তিনজনের কাঁধের উপর দিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া দাদার থুৎনির তলায় তালু রাখিয়া বলিল, "বাবু, টিকিট!"

কিন্তু দাদার নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইয়া কণ্ডাক্টার তর্জ্জনীর দ্বারা দাদার চিবুকের তলায় একটি ঠোনা মারিয়া আবার বলিল, "বাবু টিকিট!"

পুরুষ মানুষের নিকট হইতে ঠোনা খাইলে ব্যবহারটা অস্বস্তিকর হইয়া ওঠে। দাদা টিকিটের কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "টিকিট কবায় ক'রে কিনব?" চিবুক-স্পর্শের ব্যাপারটা তিনি কিন্তু চাপিয়া গেলেন, কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

পার্শ্বেই একটি পাঞ্জাবী-পরা কলেজের ছোকরা দাঁড়াইয়াছিল, বগলে লজিকের বই ও নোট লিখিবার খাতা—বুক পকেটে মাঝারি দামের ঝরণা কলম গাঁথা রহিয়াছে। তরুণ বয়সের জীব ঘটনাটি সব দেখিয়াছিল! রুখিয়া দাঁড়াইল, পাঞ্জাবীর আস্তিনটা ইতিমধ্যে গোটানো হইয়া গিয়াছে।

দাদা ভাবিলেন, ছোকরা বোধ হয় তাঁহাকে মারিবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে একটি অচল সিকি বাহির করিলেন।

সিকি দেখিয়া ছোকরা আরও রুখিয়া উঠিল, "সে কি মশাই? আপনি আবার ভাড়া দিচ্ছেন?" দাদা চমকিত হইয়া ভাবিলেন, তাও তো বটে। অচল সিকিটাও পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন। ছোক্‌রা দাদার উপর আদেশপূর্ণ হিতোপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। উপর দিকে মুখ করিয়া চড়া গলায় হুকুম করিল, "এই কন্‌ডাক্টার, ইধার আও!" কন্‌ডাক্টার অনেকটা ছাতু খাইয়া হজম করিয়া থাকে, বাঙ্গালী ছোক্‌রার হুঙ্কার শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। দাদাকে ছাড়িয়া ছোক্‌রাকেই ধরিল, "এই—টিকিট!"

'এই' শব্দের প্রয়োগে কিঞ্চিৎ উগ্রভাব ছিল: ছোক্‌রা "চোপ্ রও" বলিয়া আরও খানিকটা আস্তিন গুটাইয়া ফেলিল। ছোক্‌রাকে ক্রমান্বয়ে আস্তিন গুটাইতে দেখিয়া ও কন্‌ডাক্টারের রূঢ় সম্বোধন শুনিয়া দাদা বালসুলভ ক্ষিপ্রতাসহ ট্রামের কাঠের মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন এবং অবসাদগ্রস্ত পক্ষাঘাত রোগীর মত ফুটবোর্ডের দিকে হাঁটিতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের ভিতর বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। ট্রামের ব্যাপারটা কতদূর গড়াইল ও ছোক্‌রাটির কি অবস্থা ঘটিল, তাহা জানিবার জন্য দাদার মনে কোনরূপ আগ্রহ দেখা দিল না।

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিব, দাদা ভাড়া দেন নাই এবং কোন দিনই পারত পক্ষে দেন না। তাঁহার মতে দেওয়ার কথাও নয়। যে মানুষকে মাসে ৩৫৲ টাকা মাহিনার ভিতর তিনটি কন্যা, দুইটি পুত্র এবং একটি গোটা পত্নীর অন্ন-সরবরাহ করিতে হয় সে ট্রামের ভাড়া দিতে বাধ্য থাকিবে কোন্ যুক্তিতে?

দাদাকে উপলক্ষ করিয়াই চলন্ত ট্রামের মধ্যে হয় ত দাঙ্গা চলিয়াছে, আর রাস্তার ফুট পাথের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে দাদা অচল সিকিটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বার বার মাথায় ঠেকাইতেছেন। সিকিটি অচল অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া দাদার পকেটে পকেটে ঘুরিতেছে। ট্রামে গতায়াতের সময় এই বিশেষ মুদ্রাটির বেশী রকম প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। ট্রামে উঠিয়া অনেকটা পথ অগ্রসর হইলে অপরিচিত কন্‌ডাক্টার যখন ভাড়া চাহিয়া বসে তখন নানা পকেট সন্ধান করিয়া ভাবটা দেখান—ঐ যা, টাকার থলিটা ফেলে এসেছি—এখন উপায়! কন্‌ডাক্টার ইতিমধ্যে অন্য যাত্রীদের নিকট ভাড়া সংগ্রহ করিতে থাকে। দাদাও অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া যান। কন্‌ডাক্টার ফিরিয়া আসিয়া আবার যখন তাগাদা দেয় তখন অচল সিকিটা দিয়া দেন। মুদ্রার অতি মসৃণ স্পর্শানুভূতি কন্‌ডাক্টারকে সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে। এপিঠ ওপিঠ ঘুরাইয়া দেখে তাহার পর বলে "এ ত চলবে না।" দাদা তখন মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া অন্য দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। এসব ঘটনা এমন হিসাব করিয়া একের পর এক যোগ দিতে থাকেন যাহার ভিতর

ট্রামের ঘূর্ণ্যমান চক্র তাঁহার গম্য স্থলের প্রায় নিকটে আসিয়া পড়ে। দাদাও অমনি গম্ভীরমুখে বলেন, "যদি না চলে ত কি করছি বল···নেমে যাই।" কনডাক্টার আপত্তি করে না। সিকিটা আবার যথাস্থানে চলিয়া যায়, দাদা ট্রাম হইতে নামিয়া পড়েন। এদিন দাদা বাকী পথটা পায়ে হাঁটিয়াই শেষ করিয়া দিলেন।

২

আপিসে ঢুকিবার আগে কে একজন বলিয়া উঠিল, "ঐ রে, দাদা দি গ্লাই ফক্স আসছেন, নস্যির কৌটো সামলাও।" আপিসের টেবিলে বসিয়াই দাদা পাশের ভদ্রলোকটাকে বলিলেন, "রামু ভাই, মনে আছে ত কাল শনিবার?"

রামু উদাসকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ—কিন্তু টিপ্, টাকা ও পাশ কোনটাই জোগাড় হয় নি।"

দাদা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন একটা উইন্ ধরিয়া কালই তেলের বাকী টাকাটা শোধ করিয়া দিবেন। কাপড়গুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাহা কিনিতে হয়। যে কয়টি গোটা কাপড় আছে তাহাও রজক আটকাইয়াছে। বাকী টাকা না পাইলে সে কিছুতেই কাপড় ফেরত দিবে না। হাজার হোক্, ধোপা ছোটলোক ত? তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। সব কিছুই একটা বাজী ধরিয়া সাম্‌লাইয়া লইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। রামু সঙ্কল্প ফাঁসাইয়া দিল। টিপ্ ও টাকা সংগ্রহ হয় নাই কেন দাদা বুঝিলেন। ঘোড়দৌড়ের টিপ্ সংগ্রহ করিতে হইলে অগ্রিম টাকা ফেলিতে হয় আর টাকা সংগ্রহ না হওয়ার কারণ রামু তাঁহার টিপ্ বিশ্বাস করে নাই। লোকটা একেবারে বোকা। টাকা পাওয়া যায় নাই তাহা না হয় বুঝিবার সঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু সিনেমার পাশ পাওয়া গেল না কোন্ কারণে?

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু সিনেমার পাশটা? দাদা সহজে দমিবার পাত্র নহেন। পাশটা বলিয়া চেয়ারের উপর দোদুল্যমান পা দুইটা তুলিয়া বাবু হইয়া বসিলেন। তাহার পর রামুর স্বর্গীয় পিতার অসংখ্য গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "এও কি একটা কথার কথা। তোমার সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি টিকিট কালেক্টার, আর তুমি পাশ পেলে না—মাত্র দুটো পাশ?"

রামু ইতিমধ্যে কাজে মন দিয়া ফেলিয়াছে। না দিয়াই বা করে কি? দাদা এখন থামিবেন মা। লেজার খাতা খুলিতেই একটি সাংঘাতিক নাম রামুর চোখের সামনে পড়িয়া গেল—হট্ ফেভারিট্ একটি ঘোড়ার নাম এবং ব্যাঙ্কের হিসাবের পরিবর্ত্তে ঘোড়া কোন্ দিন কয় মিনিট কয় সেকেণ্ডে কত ফারলং ছুটিয়াছে তাহার তালিকা ও তালিকার নীচেই তুলনামূলক হিসাব। নম্বর দেওয়া পাতা ছিঁড়িবারও উপায় নাই।

ভীতভাবে দাদার দিকে তাকাইয়া রামু বলিল, "এ কি সর্ব্বনাশ করেছেন আপনি—আমার লেজার বইটের খাতায় রেসের টিপ্ লিখে রেখেছেন?" দাদা তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিলেন, "কাল ওটা ভুল ক'রে হয়ে গেছে, বেয়ারার দোষ। যাক্, ঘোড়ার বংশ ইতিহাস না লিখে ভালই করেছি। সকলে জেনে ফেলত।"

রামু অধীর হইয়া বলিল, "সে কি দাদা! বড়বাবু দেখলে আমার চাকরি যাবে যে!"

দাদা তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "হ্যাঃ, চাকরি গেলেই হ'ল কি না? ও টিপ্ত বড়বাবুর জন্যই বার করেছিলাম। দেখ না, সামনের কাল বড়বাবু আমাকে কি রকম তোয়াজ করেন। আমি নিশ্চয় বলে দিচ্ছি, এ টিপ্ ভুল হবার নয়। একেবারে তিন-চার লেংথে বাজী মেরে দেবে। বড়বাবু ফুলে বাড়ী ফিরবেন।"

রামু—কিন্তু আমার লেজারটায়···অ্যাঁ!

দাদা—আরে চেপে যাও না। ঘোড়ার নামটা কেটে দাও, তা হ'লেই হবে।

রামু—শুধু ঘোড়ার নাম কাটলে কি হবে। আরো কত কি লিখেছেন—সেগুলো?

দাদা—হ্যাঃ, তুমিও যেমন। এইদিকে খাতাটা আনো···

রামু উৎকণ্ঠিত হইয়া দাদার টেবিলে খাতাটা রাখিয়া দিল, যদি উদ্ধারের কোন পথ বাহির হয়। দাদা অবলীলাক্রমে একটা কালীভর্ত্তি মোটা দোয়াত পাতাটার উপর উল্টাইয়া দিলেন। রামু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—করলেন কি?

দাদা বলিলেন, "আরে চেপে যাও না!"

এই সময় রামু লক্ষ্য করিল, বড়বাবু দাদার টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

তাড়াতাড়ি দাদার গা টিপিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "বড়বাবু আসছেন। এখন উপায়?

দাদা লেজারের দিকে মুখ রাখিয়াই দোয়াতটাকে রামুর দিকে গড়াইয়া দিলেন। যেটুকু অবশিষ্ট কালী ছিল, তাহা রামুর ধোপদোরস্ত শার্টকে বিচিত্রিত করিয়া দিল। বড়বাবু ঘটনাটি দেখিয়া দাদার টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার আগেই দাদা রামুকে ধমক দিয়া বসিয়াছেন, "কি কাণ্ড তোমার!"

বড়বাবু। আপিসটা কি তোমাদের হোলী খেলার জায়গা মনে করছ?

দাদা অভ্যাস মত মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "স্যর, রামুর নড়াচড়াতে দোয়াতটা লেজারের উপর উল্টে গেল।

বড়বাবু—অ্যাঁ লেজারের উপরে! দেখি!

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাকেও মাথায় হাত দিতে হইল। বড়সাহেব হিসাবের খাতা এইরূপ দেখিলে তাঁহার চাকরি থাকিবে? উত্তেজনায় তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের কামরায় ঢুকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রামু ও দাদার ডাক পড়িল।

রামু বেচারা অত্যন্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ। কাতরভাবে দাদাকে বলিল, "এখন কি হবে দাদা—তুমি আমার এ কি করলে?" দাদা, 'চেপে যাও না' বলিয়া বড়বাবুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, মাঝপথে প্রায় আদেশ করিয়াই বলিলেন, "একটা সিনেমার পাশ বার করে ফেল, তাগ বুঝে বড়বাবুর হাতে গুঁজে দিতে হবে।"

প্রায় আধঘণ্টা কাল সময় কাটিয়া যাইবার পর দেখা গেল, উভয়েই হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিতেছেন।

টিফিনের ঘণ্টা পড়িল। দাদা বলিলেন, "রামু, তোমাকে ত বাঁচিয়ে দিলাম, মাড়োয়ারীদের হিং-এর কচুরী আর ডালমুট কিছু খাইয়ে দাও।"

রামু বলিতে চাহিয়াছিল, "আমাকে বাঁচালেন কি রকম। নিজের কুকীর্ত্তি ঢাক্‌বার জন্যে আমাকে জড়ালেন, আজ··· [illegible]

দাদা অন্তর্যামী, বলিলেন, "না হয় একটু [illegible] ফেলেছি।

তাই বলে দাদাকে খাওয়াবে না? তোমার বাবা এ দিক দিয়ে দিল্‌দরিয়া লোক ছিলেন। তাঁহার কাছে খেতে চাইলে কি খুশীই হতেন। বিশেষ ক'রে আমার প্রতি।" সত্য ঘটনার সহিত দাদার উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। রামুর বাবা আমাদের দাদা দি গ্রাই-ফক্সকে চিনিতেন না। রামু পূর্ব্ব ঘটনা ভুলিয়া আসিতেছিল। দাদার মিষ্টবাক্যের প্রবাহে পড়িলে জেল ফেরতা পাকাচোর পর্য্যন্ত গলিয়া যায়, রামু ত কোন্ ছার!

দাদার যকৃতের ক্রিয়াও অসাধারণ। পরের পয়সায় উড়ন্ত ঘুড়ি ভাজিয়া খাওয়াইলেও হজম করিয়া ফেলিতে পারেন। গোটা পনর হিং-এর ফুল্‌কা কচুরী ঘুড়ির কাগজের তুলনায় কিছুই না। সাড়ে তের আনার কচুরী ও কয়েকখানি উপরি হিসাবে আদায় করিয়া উদর-গহ্বরে চালাইয়া দিলেন। তাহার পর তৃপ্তির সহিত একটি ঢেঁকুর তুলিয়া বিস্ময়বিহ্বল রামুকে দেখাইয়া দিব্য সহজকণ্ঠে বলিলেন, "এই যে বাবু দাম দেবেন।"

রামু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। কোন্‌দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাদা অসঙ্কোচে আফিসের দিকে চলিয়াছেন।

বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ফুটপাথের ধারে বসিয়া কচুরী বিক্রয় করিলে কি হয়, ব্যবসাবুদ্ধিতে সে কাঁচা নয়। ব্যাপারটা বুঝিয়া সে রামুর কোঁচা ধরিয়া বলিল, "এক রূপিয়া আঢ়াই পইসা!" রামু ঘায়েল হইয়া গিয়াছে। পকেটে মাত্র কয়েক আনা পয়সা আছে, তাহা হইতে ট্রামের ভাড়াও দিতে হইবে। ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, "আমার সঙ্গে এস, আপিস থেকে জোগাড় ক'রে দিচ্ছি।"

অনিশ্চয়তাকে ব্যবসাদার বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইল না। বলিল, "তুম্‌হারা চান্দিকা বুতাম দে যাও।"

উপায়ন্তর না থাকায় বেচারা রামু বোতাম খুলিয়া দিল, তারপর দাদাকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আপিসের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাদা ভীষণ মনঃসংযোগে খাতা দেখিতেছেন। দাদা যখন খাতা দেখেন তখন স্বয়ং বড়বাবু পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস পান না। কারণ বাস্তবিকই তিনি হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে আপিসে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এদিক দিয়া বড়সাহেবকেও তিনি ভয় করেন না। রামু দাদাকে কাজে নিবিষ্ট দেখিয়া আত্মসংযম করিল।

এ দিন আর দাদাকে হিসাবের খাতা হইতে একটিবারও দৃষ্টি ফিরাইতে দেখা গেল না। রামুর দাদার সহিত আলাপ করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; হিসাবের গহন বনে দাদা যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি! সাড়ে পাঁচটার ঘণ্টা পড়িলে আপিস বন্ধ হইয়া গেল। রামু শশব্যস্তে মাড়োয়ারীর দোকানে ছুটিল তাহার চাঁদির বোতাম উদ্ধার করিতে, দাদাকে আঘাত দিবার কথা সে একদম ভুলিয়া গেল। দাদা গম্ভীরমুখে আফিস হইতে বাহির হইয়া ট্রামের দিকে চলিলেন।

৩

বৈকাল কাটিয়া গিয়া শনিবারের সন্ধ্যা জমকাল হইয়া আসিতেছিল। পাশ পাওয়া যায় নাই। দাদা বাড়ীতেই বসিয়া আছেন, এমন সময় অতর্কিতভাবে তেলওয়ালা জানালার ধার হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "বাবু, বাড়ী আছেন!"

দাদা দেয়ালের দিকের কোণটায় তক্তপোষের উপর বসিয়া তাঁহার ফেভরিটের বংশ-পরিচয় পড়িতেছিলেন। এমন সময় তেলওয়ালা বলিল, "বাবু বাড়ী আছেন!"

বেরসিক কি গাছে ফলে? কোণে বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাগাদাদার তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। সুযোগটা দৈব-প্রেরিত। বড় মেয়েকে ইসারায় জানাইয়া দিলেন, শীগ্‌গির লেপ নিয়ে আয়। ... এমত অবস্থায় কি করিতে হয়, গৃহস্থের বাড়ীতে সকলেই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে সুস্থাবস্থায় লেপের ব্যবহার কৌতূহলোদ্দীপক। দাদা মুখ পর্য্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার পর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সে কি কাঁপুনি!

তেলওয়ালা ঘরের দরজার সামনে আসিয়া বলিল, "বাবু কোথায়?"

কন্যা লেপ-মুড়ি-দেওয়া পিতাকে দেখাইয়া দিয়া গুণচটের আড়ালে রোয়াকের পিছনে চলিয়া গেল।

দাদা তখন সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া লেপের ভিতর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া চলিয়াছেন।

তেলওয়ালা—"সে কি, বাবুর আবার জ্বর এলো না কি?"

দাদা লেপের ভিতর মুখ রাখিয়াই জড়িতকণ্ঠে বহুকষ্টে বলিলেন, "আর ভাই, বল কেন, এই একটু আগে বেশ ছিলাম—এই দেখ না—ম্যালেরিয়া কি না ... উহুহু ... বড্ড শীত গো বড্ড শীত ... তেলওয়ালা ... মারা গেলাম হে, মারা গেলাম ... আজ ভাই তা হ'লে এসো ... কথা বলতে পারছি না ... উহুহু ..."

তেলওয়ালা এবার কড়া হইবে বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। এ ত মজার চালাকি! যখনই তাগাদা করিতে আসিবে, তখনই দেখিবে বাবু জ্বরে কোঁকাইতেছেন। বাবুর জ্বরও চমৎকার! সঙ্কল্প যাহাই করিয়া আসুক, জাতে সে বাঙ্গালী! কত আর কঠোর হইতে পারে? ভদ্রলোক ঠক্ ঠক্ করিয়া জ্বরে কাঁপিতেছেন, তাঁহাকে কি আর পাওনার জন্য তাগাদা করা চলে? অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁপুনি দেখিয়া কাল আসিব বলিয়া তেলওয়ালা ফিরিল। রাস্তায় নামিয়া ভাবিতে লাগিল, কাল যদি জ্বর থাকে ত নিজে কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে।

দাদার জানালাটার অনেক সুবিধা আছে। মুখ বাড়াইলে মোড় পর্য্যন্ত দেখা যায়। সোমত্ত বড় মেয়ে বেশ খানিকটা গলা বাড়াইয়া দিয়া বাবাকে বলিল, "মোড় ফিরেছে।"

পনর মিনিট কাল মোটা লেপের তলায় থাকিয়া সমস্ত দেহটা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উঠিয়া বসিয়া ছেঁড়া গামছাটা দিয়া দেহ নিঃসারিত ক্লেদ মুছিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ওরে ... লেপটা কাছেই রাখিস্ ... আবার দরকার হতে পারে। আজ আবার ধোপা আসবে বলেছে। যত সব ছোটলোক... বুঝলি তো?"

বড়মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল, ছোটলোক আসিলে কি করিতে হইবে সে জানে। জ্বর ডাকিয়া না হয় তেলওয়ালা ও ধোপার মত বাজে লোকদের অত্যাচার হইতে বাঁচা গেল, কিন্তু সকালে চায়ের বন্দোবস্ত হয় কেমন করিয়া? মুদি পণ করিয়াছে নগদ দাম না পাইলে সে কিছুই বিক্রয় করিবে না। দাদা ভাবিলেন, ব্যবসা বুদ্ধিতে পাকা রকম কাঁচা না হইলে এইরূপ মন্তব্য কেহ

প্রকাশ করে? ছোটলোক কি-না ··· তিন পয়সার চা বিক্রয় করতেই ভয়ে অস্থির।

রাস্তার আলো জলিতেই দাদা সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। রাম্মুর বাড়ী গিয়া কোন লাভ নাই। সে এমন কাঁচা ছেলে নয় যে নিজের জন্ত একটি পাশ না রাখিয়া সবই বড়বাবুকে দিয়া দিয়াছে। সে যে পাশগুলি প্রতি শনিবারই সস্তা দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। আর সেই পয়সায় তার পান সিগারেটের খরচ চলে, এ খবর দাদার অবিদিত নয়। সে যাহাই হউক, দাদা আমাদের অচল সিকি ও উপরি দুই আনা পয়সার উপর নির্ভর করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। শনিবারের সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর বসিয়া থাকা যায়?

তার দুই ট্রাম বদলাইতেই দাদা মেট্রোর নিকট আসিয়া পড়িলেন। সিনেমা দেখা নাই হইল, সিনেমা-দর্শকদের ত দেখা চলে? দাদা বাছিয়া বাছিয়া দর্শক দেখিতেছিলেন। পায়চারি করিতে করিতে তাঁহার নিজের অজ্ঞাতে একটি পানের দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—একটি ক্রেতা ধপ্‌ধপে ডব্‌ল্ ব্রেষ্ট শার্টের উপর কোট চড়াইয়া ময়লা কোঁচানো ধুতি পরিয়া বিড়ি কিনিতেছে। ঠিক এই রকম ধরণের মানুষ তিনি খুঁজিতেছিলেন। অর্থাৎ সোহুরের মত চালাক নয়, অথচ পূরা মাত্রায় সৌখীন। নিজে হাতে কাপড় কুঁচাইয়া যে চাল মারিতে বাহির হয় তাহার মত বোকা পাইলে ছাড়িতে আছে? যেন দীর্ঘকালের পরিচয়। নিকটে আসিয়াই বলিলেন, "কি রকম আছ ভাই? চেহারা একদম্ বদ্‌লে গেছে ··· ইস্ তোমাকে চেনবার উপায় নেই। তা পিসিমা ভাল আছেন? বাড়ীর অন্য খবর সব ভাল? তোমার মেয়ে কতবড় হয়েছে? ···" ইত্যাদি প্রশ্নমালা এমনভাবেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল যে লোকটি উত্তর দিবার অবকাশ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

দাদা তখনও বলিয়া চলিয়াছেন, "ইস্, কত দিন বাদে দেখা বল ত? তখন তুমি ছোট ছিলে ··· আরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? আমি কি আজকের মানুষ? ভাল খাই দাই বলেই চেহারাটা কি বলে এখন ··· হেঁ ··· হেঁ ··· মানে ঠিক বুড়োটে হয় নি। তা একটা বিড়ি ছাড় দেখি।"

আধা-গ্রাম আধা-শহরবাসী মানুষটি বিনা দ্বিরুক্তিতে একটি বিড়ি দিল দাদা; পানওয়ালার চির-জলন্ত দড়ির সাহায্যে বিড়ি ধরাইয়া বলিলেন, "আরে, এতদিন বাদে দেখা, তুমি আমাকে বিড়ি খাওয়ালে, চল তোমাকে শহুরে খাওয়া খাইয়ে দি। অতি নিকটে দেশী রেস্তর াঁতে লোকটাকে প্রায় টানিয়া লইয়া গেলেন, আধা-ফর্সা-প্রায় মেমসাহেব দোকানের হিসাব রাখিতেছে দেখিয়া বেচারা ভড়্‌কাইয়া গিয়াছে। বলিল, "এ কোথায় নিয়ে চলেছ বাপু! ওখানে যে ওরা র'য়েছে। দরকার নেই আমার বাপু খেয়ে ··· তা ছাড়া আমার আবার মেয়ে হ'ল কবে? তোমাকে ত কখন দেখিনি?"

কন্যা হইয়াছিল কি পুত্র হইয়াছিল, কিম্বা লোকটা নিঃসন্তান তাহা শুনিবার সময় দাদার ছিল না। লোকটাকে প্রায়-জোর করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর চালে হুকুম করিলেন, "এই বয়, চারঠো চিংড়ি কাট্‌লেট, চারঠো মটন্ চপ্, আউর চাপাটি লে আও।"

হুকুম করিতেই বয় সেলাম দিয়া আদেশানুসারে জিনিষগুলি আনিতে চলিয়া গেল।

এতক্ষণে লোকটি দাদাকে দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুধু আত্মীয় ভাবে নাই, সাহেবী-ধরণের সরাইখানায় আত্মীয়ের প্রতিপত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। কলিকাতার মত শহরে পোষাক-পরা খান্‌সামা সেলাম দিয়া হুকুম তামিল করে, লোকটা কি সোজা আত্মীয়? ঠিক করিল বাড়ীতে গিয়াই গল্প করিবে কি রকম বড়লোক আত্মীয়ের সহিত তাহার হঠাৎ দেখা হইয়া গিয়াছিল! মস্ত বড় হোটেলে খাতির করিয়া লইয়া গিয়া কত রকমের খাবার খাওয়াইয়া দিল! এমন সময় 'বয়' প্লেট ভরিয়া খাদ্য ত আনিলই, অধিকন্তু ছুরি কাঁটা আর কত কি আগড়ম-বাগড়ম, উহাদের সামনে ধরিয়া দিল। দাদা বলিলেন, "শিশিতে সস্ আছে, কাটলেটের উপর ঢেলে নাও।" লোকটা ভাবিল পরোটার বিলাতী নাম বোধ হয় কাটলেট হইবে। সমস্ত শিশিটা পরোটায় ঢালিয়া ঝোলে ভিজার মত করিয়া ফেলিল এবং তাহাই হুস্ হাস্ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। আহারের স্বাদ পাইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইল, পর জন্মেও যেন সে এমন একটি পরম দয়াল আত্মীয় পায়। পুরাপেট খাওয়াতে দাদার সশব্দে একটি ঢেকুর উদ্গত হইয়া আসিল। অতঃপর দাদা সোডা পান করিয়া আবার একটি ঢেকুর তুলিলেন; তাহার পর বলিলেন, "এইবার মিঠা পান দরকার! দেও ত হে দুটো বিড়ি, ফুকতে ফুকতে পান কিনে আসি।" বিড়ি হস্তগত হইতেই বলিলেন, "তুমি একটু বোসো, আমি মিঠা পান নিয়ে আসছি।" পানের দোকান বামে, দাদা চলিলেন সোজা একেবারে ট্রামের দিকে। দুই এক পদ সহজ পদবিক্ষেপে চলিয়াছিলেন। দোকান হইতে একটু দূরে আসিতেই দাদা মাঝ রাস্তা হইতে দেখিলেন, একখানা ট্রাম ছুটিয়া আসিতেছে, আরও দেখিলেন, নিকটেই ট্রামের ষ্টপেজ। 'রোখো রোখো' শব্দে ট্রামকে রুখিয়া দাদা একটি খালি সীটে জাঁকিয়া বসিলেন।

··· ওদিকে রেস্তর াঁয় ফোকটে খানা খাইয়া বেচারা আধা-শহুরে মানুষটির কি অবস্থা হইয়াছিল লিখিয়া পাঠকের দরদ নিঙড়াইবার চেষ্টা করিব না। শহরে এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটিয়া থাকে, যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

৪

দাদা যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন বেশ রাত হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিতেই স্ত্রী বলিলেন, "সেই কখন রান্না হয়েছে—সব জুড়িয়ে গেল।" দাদা রূঢ়ভাবে বলিলেন, কি রকম, আমার জন্যে রান্না হ'ল কেন? দেখলে না, আমি সেজেগুজে বেরিয়ে গেলাম। পয়সা কি ভেবেছ খোলাম কুচি? তোমার এইটুকু বুদ্ধি নেই, দেখলে আমি বাবু সেজে রাত্তিরে বার হলাম। না হয় বলতেই ভুল হয়েছিল, তাই ব'লে বুঝতে পারলে না আমার বাইরে নেমন্তন্ন ছিল। দাদার সংযম হারাইবার যথেষ্ট অজুহাত ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন রাত্রির খাবার খরচটা বাঁচাইয়া কাল সকালে চায়ের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। ট্যাঁক যে সাহারা মরুভূমির মত হইয়া আছে তাহা ত গৃহলক্ষ্মীকে বলা চলে না। অথচ যখন

হইয়াছে তখন আর দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। দাদা আবার বাহির হইলেন। রামুর নিকট ধার যদি পাওয়া যায় ভালই, তাহা না হইলে একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাত নয়টার কম হইবে না, দাদা রামুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামু—এত রাত্রিতে ব্যাপার কি দাদা?

দাদা—কিছু না ভাই, বলতে এলাম তোমার জন্যে কি লোকসানটাই না হয়ে গেল—তিরিশ—তিরিশটা টাকা সোজা কথা? ঘোড়াটা ভয়ে ভয়ে প্লেসে ধরেছিলাম—আমার হিসাবে ভুল হবার উপায় আছে? হবি ত হ, একেবারে উইনার। মাঝখান থেকে তিরিশ তিরিশটে টাকা মাঠে মারা পড়ল।

রামু—প্লেস হ'লেও জিতেছেন ত, কত টাকা? দাদা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, শেয়ারে আর কত টাকা পাওয়া যায়—মাত্র পনর। ব্রজেনকে ধরতে বলেছিলাম, কাল সকালেই সে দিয়ে যাবে। ...

পনর টাকা এক বাজীতে, ইস্, একমাসের মাহিনার কাছাকাছি ... রামুর আনন্দে প্রায় চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সামনের শনিবারের কোন খবর রাখেন না?"

দাদা—তুমি আমাকে এম্নি কাঁচা ছেলে পেলে? তিন-তিনটে উইনার হে ... তিন-তিনটে ... একেবারে যাকে বলে হট্ ফেভারিট। বাজী ধর আর টাকা ঘরে নিয়ে চল। কিন্তু একটু গোল আছে। সব কটা ঘোড়াই যে ছুটবে তার কোন মানে নেই। খবর পেয়েছি, স্বয়ং আস্তাবলের সহিসের কাছ থেকে, এ টিপ্ ... বুঝলে ভাই, নির্ঘাৎ! আরে বাবা, এতো সিওর্ টিপ্ কি মাগনায় পাওয়া যায়? নগদ কড়কড়ে পাঁচ টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছি। বুঝলে কি-না, তারপরে তিনটে উইনার। যেটাকেই ধর না কেন, লাভ একেবারে শয়ের কোঠায়। প্রথম এন্‌ক্লোজারে না ধরতে পারলে রেস খেলে সুবিধে নেই। অথচ শেয়ার ক'রে টিকিট কিন্‌বো সে পথও বন্ধ। বুঝতেই তো পারছ, আজকাল মন্দার বাজার—কে আমার মত লোকের টিপ্ বিশ্বাস করবে। কিন্তু চোখের সামনে দেখলে তো একেবারে উইনার!

রামু দাদার কথায় গলিয়া যায় নাই, জরিয়া গিয়াছিল ঠিক জারক নেবুর মত। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "একটু বসুন দাদা, এখুনি আসছি।"

দাদা বসিয়া রহিলেন। রামু নববধূর নূতন মাকড়ি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া নিকটেই স্যাকরার দোকানে গিয়া উঠিল। সংসারে অনটন কাহারও অপেক্ষা তাহার কম নয়। ফোকটে যদি কিছু উপরি পাওয়া যায়, যথা লাভ। রামু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরই দাদা সকালের চায়ের জন্য উসখুস্ করিতেছিলেন। রাত নয়টার পর সাধারণ কেরাণীর বাড়ীতে উনুন যে জলে না তাহা তিনি জানিতেন। জানিলে কি হয়, সকালের চায়ের ব্যবস্থা না হইলে সমস্ত দিনটাই মাটি। ডাকিলেন "বৌমা,—ও বৌমা—শুনছো গো!"

রামুর বৌ দরজার আড়ালে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল।

দাদা বলিলেন, "একটু গরম চা দিতে পার মা-লক্ষ্মী?"

মা-লক্ষ্মী ভিতরে নিপীড়িতা হইয়াই উত্তর করিলেন, "উনুনে আগুন নেই।" হিন্দু বাড়ীর বধূর নিকট 'অতিথি ভগবান, তাহাকেই সামান্য চা দিতে না পারায় অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। উত্তর করিলেন, "শুক্‌নো চা দিতে পারি?"

দাদা শুক্‌নো চায়ের জন্যই তো আসিয়াছিলেন, সুতরাং কিছুমাত্র আপত্তি উঠিল না। ইতিমধ্যে রামু মাকড়ি বন্ধক রাখিয়া নয়টি টাকা লইয়া আসিয়াছে।

রেস খেলা রামুর নেশা নয়, সংসারের অনটনের তাড়নায় কালেভদ্রে দুই-চার টাকা ধরিয়া ফেলে। পূর্ব্বে দুই-একবার জিতিয়াছিল। নিজে কখন রেসে যায় নাই, লোক-মারফৎ ধরাইয়াছিল। দাদার অদ্ভুত গণনাশক্তির খ্যাতি আগেও শুনিয়াছে। আজকের ব্যাপার একরকম প্রত্যক্ষ বলিলেই হয়।

দাদা বলিলেন, "আমি এবার উঠব ভাই।"

রামু তাঁহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা, এই যে পাঁচ টাকা। একটা উইনার পাইয়ে দিতেই হবে দাদা—দোহাই তোমার।"

দাদা টাকা দেখিয়া মুখের ভাব এমনই করিলেন যাহা হইতে প্রমাণ হয়, অর্থ সম্বন্ধে নির্লিপ্ততাই তাঁহার ধর্ম্ম।

রামুও নাছোড়বান্দা, জোর করিয়া দাদার তালুর ভিতর মুদ্রা কয়টা গুঁজিয়া দিল। দাদা বলিলেন, "টাকা না হয় তোমার খাতিরে নিলাম, কিন্তু ঘোড়া যদি না ছোটে ত আমাকে দোষ দিও না। তা ছাড়া, আমার টিপ্ হলেও রেস ত, জকি যদি ঘোড়া টেনে রাখে ত গণনায় ভুল হয়েছে বলতে পারবে না।"

রামু—না হয় দাদা, ভাবব টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়েছি।

দাদা—হ্যাঁ ... এই হ'ল গিয়ে রেস খেলার মত মন।

দাদা এতগুলি সর্ত্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন কেবল রামুকে টাকা জলে ফেলিয়া দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইবার জন্য। টাকা হস্তগত হওয়ার পর বলিলেন, "তা হ'লে আজ উঠি।"

উঠিতে পারিলেই দাদা এখন বাঁচেন, বিলম্বে যদি রামু তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে!

৫

পরের দিনের কথা। সবে সকাল হইয়াছে। প্রাতঃকৃত্য-গুলিও সম্পূর্ণ হয় নাই, এমন সময় তেলওয়ালা আসিয়া কড়া নাড়িল। দাদা জানিতেন, সে আসিবে, প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। দরজা খুলিয়া দিয়াই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি ধরিয়া বলিলেন, "কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তুই একটা সামান্য তেলওয়ালা—আমার সোমত্ত মেয়েকে অপমান করিস। জানিস্, ইচ্ছে করলে তোর সমস্ত তেল আমি একলা কিনতে পারি। এই নে—তোর চার টাকা সাড়ে দশ আনা।"

তৈল ব্যবসায়ী কাহাকেও কিছু বলে নাই—তৈল বিক্রয় করিয়া মূল্য চাহিয়াছিল—ইহাই তাহার অপরাধ! ছোট্ট ব্যবসা ফিরি করিয়া চালাইতে হইলে লাভের অংশের সহিত অতিরিক্ত যাহা না চাহিতে আসিয়া পড়ে তাহা অপ্রীতিকর হইলেও প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই।

তেলওয়ালা টাকা কয়টি বাজাইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "মা ঠাকরুণ, আজ কত তেল দিতে বলেছেন?"

দাদা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "জানি না, ভেতরে গিয়ে খোঁজ নাও।"

দাদার ভিতর-বাড়ী বলিতে গুণচটের ওপাশটা। দিনের বেলা শুইবার ঘরটি বৈঠকখানা হইয়া যায়—সেই সময় পুত্রকন্যা ও গিন্নী সকলে চটের পর্দার আড়ালে ছোট্ট রোয়াকে কোন প্রকারে নিজেদের গুঁজিয়া দশটা পর্য্যন্ত কালক্ষেপণ করিয়া থাকেন। ব্যবসা শেষ করিয়া তেলওয়ালা চলিয়া গিয়াছে।

মাসের শেষ দিন। দাদা এখন নগদ সাড়ে সাত আনার মালিক। গত রাত্রিতে রামুর দেওয়া পাঁচ টাকা হইতে সাড়ে পাঁচ আনা ও বিপদ আপদের জন্য অধিকন্তু দুই আনা, উভয়ে মোটে সাড়ে সাত আনা। অধিকন্তু বাদ দিলে মোট সাড়ে পাঁচ আনা লইয়াই সারাটি দিন কাটাইতে হয়। বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিবার উপায় নাই। স্ত্রী পুরাতন প্রতিশ্রুতিটা লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়া দিবেন। সেই কবে একজোড়া রুলি বানাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, গৃহিণী আজও তাহা ভোলেন নাই।

দাদা ভাবিতেছিলেন আজকের দিনটা কোন প্রকারে কাটাইতে পারিলেই হয়, কাল পয়লা। ছোট ছেলেটার আবার সকালেই জ্বর আসিয়াছে, কি রকম জ্বর কে জানে? একটা ফিভার মিক্‌শ্চার না আনিলে বাড়ীতে গিন্নী কাঁদিয়া হাট বসাইবেন।

দাদা একটি খালি শিশি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। শিশিতে আবার বড় মেয়ের নাম লেখা রহিয়াছে। থাকুক। প্রত্যেকবার নূতন শিশিতে ঔষধ আনিলে তাহার আবার দাম ধরিয়া দিতে হয়, সেই কারণে একই শিশিতে এবং একই মাপে বাড়ীর সকলেই ঔষধ খাইয়া আসিতেছে। ডাক্তারখানা বেশী দূরে নয়। বেলা তখন নয়টা হইবে। ডিস্পেন্সারীতে তখন দুই একটি করিয়া লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দাদা ভাবিয়াছিলেন নিরিবিলিতে ডাক্তারবাবুর নিকট ঔষধ চাহিয়া লইবেন। কিন্তু এত লোকের সামনে বাকী ঔষধের দামের জন্য ধমক খাইবার সম্ভাবনা থাকায় ইচ্ছাটা বাতিল করিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন অচল সিকিটা গৃহিতে ভোলেন নাই। একবার ভাবিলেন ছেলেটার জ্বর, ঔষধের জন্য না হয় সিকিটা চালাইয়া দি। একবার মুদ্রাটি চলিলে এইদিনেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে। বিনা ভাড়ায় ট্রামে চড়িতে হইলে ঐ অচল সিকিই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং ছেলের জ্বর হইলেও সিকি চালাইবার সঙ্কল্প যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। কি করা যায়? বুদ্ধি যেন ধাক্কা মারিয়া বলিল—কালী মন্দিরে চল।

চিন্তার সহিত দাদা কার্য্য চটপট করিয়া থাকেন। যথাসময়ে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, একটিও অচেনা কণ্ডাক্টার চোখে পড়িল না। গাড়ীতে ভিড়ও নাই যে ফুটবোর্ডে চড়িয়া পড়িবেন। গত্যন্তর না থাকায় একটি রিক্স ঠিক করিলেন যাতায়াতের চুক্তি করিয়া। অনেক দর কশাকশির পর রিক্স-ওয়ালা চোদ্দ পয়সায় মন্দিরের নিকট এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেও রাজি হইল। এক খেপের ঠিক করিলে ভাড়াটা হাতে হাতে দিয়া নামিতে হয়, সেই জন্য যাওয়া-আসা ও তৎসহিত অপেক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

মন্দিরের প্রবেশ-পথে নামিয়া দাদা কোট আর শার্ট খুলিয়া ফেলিলেন। পৈতাটা বহু পাক খাইয়া মালার মত গলায় ঝুলিতেছিল, অসংখ্য গিরো, চার-পাঁচটি ছোট-বড় মাদুলির সহিত জোট খাইয়া গিয়াছে। এমন একটি যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ দিকের কোমর পর্য্যন্ত ঝোলান সহজ ব্যাপার নয়। যাহা হউক, দাদা কোন প্রকারে পৈতার ব্যাপারটা সাম্‌লাইলেন। নকুলেশ্বর তলায় বেদির উপর একই স্থানে কতকগুলি টাট্‌কা সিন্দুরের টিপ্ পড়িয়া আছে দেখিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও ভক্তিভরে সিন্দুরের উপর কপাল ঘষিতে লাগিলেন। অল্প চেষ্টাতেই কপাল ধর্ম্মের অপরিহার্য্য টিকায় ভূষিত হইয়া উঠিল! মস্তক মুণ্ডনের জন্য পরামাণিক নিকটেই বসিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে একটি পারা-উঠিয়া-যাওয়া দর্পণ লইয়া নিজের মুখশ্রী দেখিয়া লইলেন। সজ্জা ভালই হইয়াছে। এইবার একটি বিল্বপত্র সহ সরা ও কিছু ফল সংগ্রহ করিতে পারিলেই কাজে নামা যায়। ব্রাহ্মণকে পয়সা দিয়া অর্ঘ্যের সরা কিনিতে হইবে? দেশের মানুষগুলি কি এতই অধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছে? দাদা কি উপায়ে অর্ঘ্যের সরাও সহজলভ্য করিয়া ফেলিলেন।

সরা হস্তে নাটমন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া বহুবার দেবীকে প্রণাম করিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। কিন্তু যাহাকে অথবা যাহাদের খুঁজিতেছিলেন তাহাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ অবশ্য রবিবার। রবিবার হইলে কি হয়, সেই কারণে রবি ত তাঁহার রশ্মি কমাইবেন না। অবস্থাটা তেমন আশাপ্রদ লাগিতেছিল না। সৎকার্য্যে নিষ্ঠা থাকিলে অধ্যবসায় সফল না হইয়া যায় কোথায়? দেবী সদয়াও হইলেন, দাদা দেখিলেন একটি অবস্থাপন্ন মেদিনীপুর-বাসীর দল পরকালের পাকা ব্যবস্থার জন্য দেবীর শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে আসিয়াছে। শিকার পাওয়া গিয়াছে, এখন উপযুক্ত ভাবে আক্রমণ করিতে পারিলেই হয়। ফলাফল ত তাঁহারই হাতে। দাদা বোম্ বোম্—মহাকালী ও কতকগুলি উনঃস্বর ও বিসর্গযুক্ত অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করিতে করিতে তীর্থযাত্রীদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কপালে সিন্দুরের জলন্ত টিকা, বক্ষে পুরাতন যজ্ঞোপবীত, তদুপরি সংস্কৃতের নব শুদ্ধি। সব কয়টির মিলিত প্রভাবে মিদনাপুরবাসী ভক্তদের আকৃষ্ট বলিব না, কুপোকাৎ করিয়া ফেলিলেন। ঘনিষ্ঠতার প্রকরণে যে সব আচার অথবা মৃত্যুবান দাদা অব্যর্থ মনে করিয়া থাকেন সব কয়টিই তিনি প্রয়োগ করিলেন—ভক্তের দল দাদাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল; কারণ তাহারই সারটিফিকেটের উপর স্বর্গদ্বারে প্রবেশানুমতি নির্ভর করিতেছে। দাদা তাঁহার সম্মোহন শক্তির দ্বারা ভক্তদের এমনভাবে বশ করিলেন যে, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকলকে মাতৃদর্শনের জন্য মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া নিজে তাগ বুঝিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। বলাই বাহুল্য, যে-পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই দিক দিয়া ফিরেন নাই। কারণ রিক্সওয়ালা তখনও দাদার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

রিক্সওয়ালা অপেক্ষা করিতে থাকুক, ভক্তের দল মন্দিরে পূজা করুক, আমরা দাদাকে অনুসরণ করি। মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই এক বাণ্ডিল বিড়ি ও দুই প্যাকেট

কাঁচি সিগারেট কিনিয়া ফেলিলেন। তাহার পর জামা-কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া একটি গেঞ্জি কিনিলেন এবং তৎসহিত দুইটি ফাও সকলের অজ্ঞাতে তাঁহার বৃহৎ পকেটে পূরিয়া ফেলিলেন। দোকানে যে রকম ভিড় জমিয়াছিল তাহাতে হাত সাফাই-এর কসরৎ না করিলে, নিজের প্রতি হতশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িত। দোকান হইতে ভিড়ের পাশ কাটাইয়া যেই রাস্তার দিকে মুখ করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন একটি থার্ড ক্লাশ বন্ধ ও খালি ছ্যাকরা গাড়ী তাঁহারই সামনে দিয়া কেওড়াতলার দিকে চলিয়াছে। দাদা বন্ধ গাড়ীর সুযোগ ছাড়িলেন না। ভাড়ার ফুরণ না করিয়াই চলন্তি গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দোকানের বিপরীত দিকে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ওরে, ভবানীপুর—জগুবাবুর বাজারে—"

মোড়ের কাছে রাস্তা জাম হইয়া গিয়াছিল, মোষের গাড়ীর সহিত মটর গাড়ীর সংঘর্ষে ; সেই সূত্রে বচসা বা বাক্যুদ্ধের অন্ত নাই। এমন অবস্থায় দাদা কি চুপ করিয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিতে পারেন? দোকানদারের নাগালের অনেকটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন, এখন ছ্যাকরাগাড়ীর গাড়োয়ানটির চোখেও ধূলি না দিলেই নয়! কাজেই মোষের গাড়ীর ছোটলোক গাড়োয়ানটাকে সায়েস্তা করিবার জন্য দাদা তাড়াতাড়ি নামিয়া ভিড়ের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

একটু পরেই দেখা গেল, ভীড়ের পিছনের সরু গলিটি পার হইয়া দাদা ট্রামের দিকে চলিয়াছেন! দাদা কত খেলাই জানেন। সোজা রাস্তা ছাড়িয়া এ-গলি ও-গলি করিয়া কত ঘুরপাক খাইলেন, তাহার পর যথাস্থানে আসিয়া একটি চলন্তি ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। ভিতরে ঢোকেন নাই, ফুট বোর্ডের উপর দাঁড়াইয়াই গম্য স্থলটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাজারে আসিয়া আটজনের জন্য মাংস কিনিয়া ফেলিলেন—তদুপরি উপযুক্ত পরিমাণে ঘি ও মশলা। মাংসের দোকান হইতে বস্ত্র বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্র-কন্যা ও স্ত্রীর জন্য পাৎলা কাপড় কেনা হইল, নিজেরটাও বাদ যায় নাই। এতগুলি বোঝা একলা বহন করা সম্ভব নয়, তাছাড়া কলিকাতার রাস্তা—মোটর চাপা পড়ার ভয় তো আছেই।

দাদা নানাদিক ভাবিয়া একটি ফিটন্ গাড়ী চড়িয়া বসিলেন এবং মাঝ পথ হইতে ঔষধের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ডাক্তারকেই লইয়া আসিলেন। চিকিৎসক পুত্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "কিছু না, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে। কাল সকালে জোলাপ দিলেই ঠিক হইয়া যাইবে।"

দাদা ডাক্তারকে অগ্রিম এক টাকা দিয়াছিলেন, স্ত্রীর সামনে আরও এক টাকা দিয়া দিলেন।

রাত্রির আহারের ব্যবস্থা একটু চড়া-ধরণের হইয়াছিল। নিমন্ত্রিতদের ভিতর রামু বাদ পড়ে নাই। গুরু আহারের পর দাদা কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কাঁচি সিগারেটটা শেষ করিয়াই বিছানায় আশ্রয় লইতে হইল।

সব কাজ শেষ করিয়া গৃহিণী দাদার বিছানায় আসিয়া বলিলেন, মাসের শেষে এত খরচ করছ ; কি ব্যাপার বল ত? আমার যে বড্ড ভয় করছে!···

তন্দ্রার আবেশটা গভীর নিদ্রার দিকে ঝুঁকিতেছিল, এমনি সময় পত্নী আসিয়া বাগ্‌ড়া দিলেন। দাদা বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, আঃ চেপে যাও না, সবই ত বোঝ। কাল তোমার রুলির ব্যবস্থা করে দেব

কথা কয়টি শেষ করিয়া এমন সঙ্কেত দিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইলেন যে, পত্নীর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার সাহস আসিল না। কর্ত্তা চার বৎসর বাদে নিজমুখে বলিয়াছেন কালই রুলির ব্যবস্থা করে দেব··· কি জানি, যদি মতটা বদ্‌লাইয়া যায়?···

যাত্রী

মীনা দোজা

পথিনরাতের যাত্রী আমি একা
অন্ধকারের নিবিড় বুকে লেখা
ভাগ্য আমার—চলছি অনিবার
নাইক' জানা কোথায় এ আমার
যাত্রা হ'বে—কোন্ খানে বা মোর
ফেলব ডেরা, রাত্রি হ'লে ভোর।
পারের বাঁশী বাজে উদাস সুরে
সুর মিলায়ে মনের গহনপুরে।
শ্রান্ত দেহ মিথ্যা আশার ভারে
ক্লান্ত আজি, চলতে নাহি পারে।

সব আকাঙ্ক্ষা সকল আশার
শেষ হয়েছে চাওয়া পাওয়ার।
শেষ মিনতি তোমার দোরে
ক্ষণিক দিও বসতে মোরে।
ভাব্‌লে শুধু বোঝাই বাড়ে,
আছে গোপন হিয়ার হারে
দুঃখের কথা গোপন ব্যথায়
জীবনপটে রোজনামচায়
রক্তে লেখা ; চলার পথের
পাথেয় আজ জীবন শেষের।—

সেইটুকু আজ এই জীবনের সাঁঝে
সান্ত্বনা মোর সকল দুঃখ মাঝে,
দুঃখ দিয়ে করলে পরখ প্রভু
আহাদ্ তবু জানাইনি ক' কভু।
[আহাদ্ = অভিযোগ]

চলতি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

জাপ-মিত্রশক্তি সঙ্ঘর্ষ

রেঙ্গুন হইতে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ করিবার পূর্বে শত্রুপক্ষ সপ্তাহকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটায়। উহা যে প্রবলভাবে দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনের পূর্বাভাস তাহা আমরা সেই সময়েই বলিয়াছি। জার্মানী যেমন অতর্কিতে প্রবলবেগে রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়া সাফল্য লাভের পর দ্বিতীয় আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্বে দম লয়, অক্ষশক্তির সহযোগী জাপানও সেইরূপ দক্ষিণ ব্রহ্ম ও রেঙ্গুনের যুদ্ধাবসানের পর নবোদ্যমে অভিযান চালাইবার পূর্বে স্বীয় শক্তি সংহত করিয়া লইবার মানসে কিছুদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিয়াছিল। চার সপ্তাহের কিঞ্চিদধিক কাল জাপান আবার তাহার অভিযান শুরু করিয়াছে।

দ্বিতীয় আক্রমণে উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন টাঙ্গু। জাপবাহিনী রেঙ্গুন ও পেগু অধিকারের পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রোম ও মান্দালয় পথে অগ্রসর হয়। এখানেও জাপবাহিনী পূর্বের ন্যায় কৌশলে যুদ্ধ চালায়। উত্তর ব্রহ্মে দুই সেনাপতির দ্বারা পরিচালিত মিত্রবাহিনী দুইটিকে জাপবাহিনী পূর্ব হইতেই বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। রেঙ্গুন-প্রোম পথে তাহারা থারাবড়ি দখল করিয়া মিত্রবাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। রেঙ্গুন-মান্দালয় পথেও মার্কিন সেনাপতি মিত্রশক্তিকে লইয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। টাঙ্গুতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া জাপবাহিনীকে প্রবল বাধা প্রদান করা হয়। কিন্তু মিত্রশক্তির উপযুক্তসংখ্যক বিমান বহরের অভাবেই শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ ও চীনাবাহিনী প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও টাঙ্গু পরিত্যাগে বাধ্য হয়। টাঙ্গুতে যুদ্ধ পরিচালনার সময় জাপ বিমানবাহিনী টাঙ্গুর উত্তরে পিনমানায় বোমা-বর্ষণ করে। "গুড ফ্রাইডে"র সময় মান্দালয় সহরে প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করা হয়। টাঙ্গুতে চীনাবাহিনী জাপ অবরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার পর য়্যাডাশে, আগায়, এবং অবশেষে ঘাইওলায় পশ্চাদপসরণ করে। সম্প্রতি এনাংএয়াঙ্গে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। উত্তর ব্রহ্মের যুদ্ধে এনাংএয়াঙ্গের গুরুত্ব যথেষ্ট, এনাংএয়াঙ্গ অঞ্চলে যে সকল তৈলখনি আছে তাহা হইতে বৎসরে একশত বিশ লক্ষাধিক গ্যালন খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে খনিজ তৈল যে কিরূপ মূল্যবান তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জাপবাহিনীর এনাংএয়াঙ্গ অধিকারের প্রাক্কালে মিত্রশক্তি উক্ত অঞ্চল পরিত্যাগের পূর্বে তৈলখনিগুলি নষ্ট করিয়া দিয়াছে কিনা তাহা জানা যায় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে একাধিক স্থানে মিত্রশক্তি পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করিয়াছে। উত্তর ব্রহ্মের যুদ্ধে উক্ত অঞ্চলেও যে বৃটিশবাহিনী পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে নাই এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন প্রামাণ্য সংবাদ এ পর্য্যন্ত পরিবেশিত হয় নাই। সম্প্রতি দুই দিন ধরিয়া প্রবল যুদ্ধের পর চীনাবাহিনী আবার এনাংএয়াঙ্গ শত্রুকবল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছে। যদি পূর্বেই উক্ত অঞ্চলে পোড়ামাটি নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অঞ্চল পুনরধিকৃত হইলেও আর্থিক লাভের কোন সম্ভাবনা উহাতে নাই। কারণ শত্রুর নিকট উহা অব্যবহার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে মিত্রশক্তির পক্ষেও উহা ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে সময় লাগিবে। অবশ্য সামরিক দিক হইতে এনাংএয়াঙ্গ পুনরধিকারের গুরুত্ব যথেষ্ট। বর্তমানে জাপ বাহিনী উত্তর ব্রহ্মে প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে; প্রথম ইরাবতী অঞ্চলে সমুদ্রোপকূলের কিঞ্চিৎ অভ্যন্তরে। এই অঞ্চলে জাপবাহিনী গত কয়েকদিন হইতে ক্রমাগত সৈন্য আমদানি করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন ব্রহ্ম রেলপথে মায়োলা ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং তৃতীয় সালুইন অঞ্চলে মাওচির উত্তরে। প্রশান্ত মহাসাগর ও

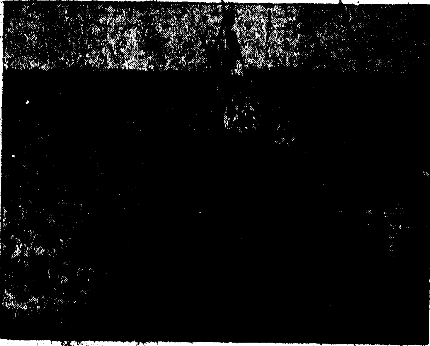


ভারত মহাসাগরে শত্রুকর্তৃক নিমজ্জিত—'ডরসেট্ সায়ার' জাহাজ

ভারত মহাসাগরে জাপযুদ্ধের অবস্থা পর্য্যালোচনান্তে আমরা জাপানের ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রতি এতাদৃশ অবহিত হওয়ার কারণ নির্দেশ করিব।

অষ্ট্রেলিয়ার উপর কিছুদিন পূর্বে বোমা বর্ষিত হইতে থাকিলেও সম্প্রতি জাপান টিমর, নিউগিনি, সলোমন প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়ার চতুষ্পার্শ্বর্বর্তী দ্বীপগুলিতে স্বীয় ঘাঁটি সকল অধিকতর সুদৃঢ় করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। এদিকে ফিলিপাইনেও প্রধান ভূখণ্ডের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে; ফলাফল মিত্র পক্ষের অনুকূলে যায় নাই। সম্প্রতি সেবু ও প্যানে দ্বীপে যুদ্ধ চলিতেছে। প্যানে দ্বীপে য়্যান্টিকস্থিত দুইটি ঘাঁটি হইতে মার্কিন সৈন্যদল সরিয়া আসিয়াছে। উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে স্যান জোসের নিকট আরও বহু জাপসৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

ভারত মহাসাগরেও এই চারিসপ্তাহের মধ্যে বৃটিশ নৌশক্তির সহিত শত্রুপক্ষের নৌবাহিনীর শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সিংহলের উপকূল হইতে দশমাইল দূরে বিমানবাহী জাহাজ 'হার্মিস্', আকিয়াব বন্দরে 'ইণ্ডিজ' এবং করমণ্ডল উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগরে আরও কয়েকখানি মিত্রপক্ষের জাহাজ সলিল



ভারতীয় রাজকীয় নৌবাহিনীর 'মাইন-সুইপার'—
কোচিনের যুবরাজকর্তৃক ভাসান হইতেছে

সমাধি লাভ করিয়াছে। অপর পক্ষে বঙ্গোপসাগরস্থ মিত্রশক্তির নৌবাহিনী হইতে আন্দামান ঘাঁটির নিকট জাপ ডেষ্ট্রয়ারকে ঘায়েল করা হইয়াছে। মার্কিণ বিমান হইতে আন্দামানে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। কলম্বো, ত্রিনকোমালী, কোকনদ ও ভিজাগাপাটামে শত্রুপক্ষ বোমা বর্ষণ করিবার সময় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতের ভূখণ্ডে ইহাই শত্রুপক্ষের সর্বপ্রথম বিমান আক্রমণ। অবশ্য অনতিবিলম্বে ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারতে সৈন্যাদি অবতরণ করাইবার জন্য এই বোমা বর্ষিত হয় নাই। তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ পরিচালনা করা আদৌ বিস্ময়ের নয় এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে পূর্ব হইতে ভারত মহাসাগরে জাপ নৌবাহিনীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বৃটিশ নৌশক্তিকে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে শক্তিহীন করিতে হইলে যেরূপ নৌযুদ্ধ পরিচালন প্রয়োজন, তেমনই ভারতীয় ...ীর উৎপাদন শক্তিকে আঘাত হানাও অত্যাবশ্যক। ভিজাগাপাটামে বালচাঁদ হীরাচাঁদের জাহাজ নির্মাণের বিশাল কারখানা ভারতের উপকূল রক্ষার্থ জাহাজ উৎপাদনে নিযুক্ত। বন্দর হিসাবে কোকনদের গুরুত্বও অত্যধিক। সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশের চাউল একমাত্র কোকনদ বন্দর দিয়াই চালান যায়। আর ভারত মহাসাগরে জাপ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির নৌসংযোগ ক্ষুণ্ণ করিতে হইলে কলম্বো অধিকার করা অবশ্যই প্রয়োজন। বন্দর হিসাবে কলম্বোর গুরুত্বও কম নয়। পূর্ব ও পশ্চিমগামী প্রত্যেক জাহাজকে কয়লা গ্রহণের জন্য এখানে থামিতে হয়। কলম্বো অধিকার করিতে পারিলে একদিকে যেমন ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দ্বার রক্ষা করা সহজ-সাধ্য হয়, তেমনই ভারতের দক্ষিণাংশে আক্রমণ পরিচালনার নিমিত্ত নিকটবর্তী ঘাঁটিও হাতে আসে। কিন্তু জাপানের ঐ উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই। কলম্বোতে বিমান আক্রমণকালে জাপ বিমান-বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সন্দেহ করা যাইতেছে যে, ভারত মহাসাগরে ১৮০০০ টনের জাপ বিমানবাহী জাহাজ হইতে বিমান আসিয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই সিংহল, ভারতবর্ষ এবং আকিয়াব-বন্দরস্থ 'ইণ্ডিজ' তথা আকিয়াব বন্দরে বোমা বর্ষিত হয়। কিন্তু তাহার পর জাপান হঠাৎ এই অঞ্চলে নিষ্ক্রিয়ভাব অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ইহা আক্রমণ পরিত্যাগের লক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না। আসন্ন ঝটিকার পূর্বে প্রকৃতি যে থমথমে নীরব ভাব ধারণ করে জাপানের নিষ্ক্রিয়তা তাহারই সহিত তুলনীয়। সিংহল এবং ভারতবর্ষে বোমা বর্ষণকালে এবং ভারত মহাসাগরে নৌসজ্ঘর্ষে জাপান উপলব্ধি করিয়াছে যে, এই অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করিতে হইলে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। আন্দামান ঘাঁটিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হওয়া দরকার। কিন্তু আন্দামান পোতাশ্রয়ে বিশাল যুদ্ধজাহাজ থাকিবার ব্যবস্থা আছে কি না আমরা জানিনা; সম্ভবতঃ নাই। ছোট ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার থাকিতে পারে। এদিকে ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে স্বীয় নৌপ্রাধান্য শক্তিশালী রাখিতে হইলে ভারত মহাসাগরে তাহার পক্ষে সমধিক ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ শেষ করিতে পারিলে জাপানের পক্ষে নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে করা স্বাভাবিক। জলযুদ্ধ ও নূতন রণাঙ্গনের প্রতি অবহিত হওয়া তখন তাহার পক্ষে অধিক সম্ভব। এতদ্ব্যতীত আর তিনমাসের মধ্যে ব্রহ্মের যুদ্ধ জাপানের পক্ষে শেষ করা রণনীতির দিক দিয়াও অত্যাবশ্যক। দীর্ঘ সময়ব্যয়, অধিক লোকক্ষয় এবং অপরিমিত সমরোপকরণ যথেচ্ছ ব্যয় করিবার মত অবস্থা জাপানের এখনও হয় নাই। এদিকে তিন মাসের মধ্যেই বর্ষা নামিবে। বর্ষার পূর্বে যুদ্ধ শেষ করিতে না পারিলে জাপানের পক্ষে উত্তর ব্রহ্মে যুদ্ধ পরিচালনা করা অত্যধিক কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে। জাপান যুদ্ধের গতি ভবিষ্যতে কোন্ পথে পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক, তাহা ইয়োরোপের রণাঙ্গনের অবস্থা পর্য্যালোচনান্তে আমরা আলোচনা করিব।

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

রুশিয়ার প্রচণ্ড শীত বসন্তকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া বর্তমান বর্ষের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। উত্তর রুশিয়ায় তুষারপাত

বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে ইতিমধ্যে বরফ গলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু-প্রত্যাশিত রুশ-জার্মান সজ্ঘর্ষ এখনও দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে নাই। হিটলার স্বয়ং একাধিকবার দম্ভোক্তি করিয়াছিলেন যে, বসন্তের আগমনে তিনি রুশিয়াকে এক হাত দেখিয়া লইবেন। বসন্ত আসিয়াছে, কিন্তু 'ফুরারের' হাত এখনও উঠে নাই। প্রবল আক্রমণে নাকি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে গলিত তুষার! বসন্তের আবির্ভাবে বিশাল প্রান্তরের বিরাট তুষার স্তূপ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বর্ষাস্নাত বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের ন্যায় রুশিয়ার পথে ঘাটে কর্দম সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কর্দম সমুদ্রের উপর দিয়া গুরুভার যান্ত্রিকবাহিনী পরিচালন দুঃসাধ্য। ফলে প্রত্যাশিত জার্মান অভিযান এখনও আরম্ভ করা জার্মান নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কবে এই কাদা শুকাইয়া শত চিড় খাইয়া ধরিত্রীর বুকফাটা হাহাকারে রূপায়িত হইয়া উঠিবে, হিটলার সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া দিন গুনিতেছেন। অর্থাৎ বসন্ত অভিযান স্থগিত হইয়াছে গ্রীষ্মাভিযানে। মে মাসের মধ্যভাগের পূর্বে এই অভিযান আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রুশিয়ার বিজয় অভিযানের বেগ মন্দীভূত হয় নাই। পূর্বের ন্যায় রুশিয়ার নগর দখলের সংবাদ আজও রয়টার মারফৎ পরিবেশিত হইতেছে। ষ্টারায়া রুশায় সোভিয়েটবাহিনী প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ সোভিয়েট সৈন্য স্মোলেন্স্কের অদূরে আসিয়া উপস্থিত। কালিনিন্ অঞ্চলেও রুশ-বাহিনী বিশেষ সাফল্য সহকারে জার্মান সৈন্যকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে। কুরস্ক অঞ্চলেও বর্তমানে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যের একাংশ কুরস্ক-ওয়েল রেলপথ পুনর্দখলে সমর্থ হইয়াছে! কিন্তু পূর্বের ন্যায় আমরা আজও বলিতেছি—রুশিয়ার এই বিজয়ে অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করা অনুচিত। রুশিয়া যে প্রচণ্ড শীতেও প্রবল নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের যান্ত্রিক যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ যে নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের তুলনায় সমান ফললাভ করে নাই ইহা অনস্বীকার্য। রুশিয়ার ক্রমাগত বিজয়ের সংবাদ আমাদিগের নিকট পরিবেশিত হইলেও ইহার বিস্তারিত বিবরণ সকল আজও পাঠকের নিকট অপ্রকাশিত। রুশিয়া প্রতিদিন কয়েকখানি করিয়া গ্রাম পুনর্দখল করিতেছে, জার্মান বাহিনীর প্রচুর সমরোপকরণ তাহার হস্তগত হইতেছে, যথেষ্ট জার্মান সৈন্য বন্দী ও হতাহত হইতেছে, এই সংবাদই আমরা লাভ করিয়াছি। কিন্তু এই সকল উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ সহরগুলি এখনও সোভিয়েট বাহিনী পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। ওডেসা, কিয়েভ, খারকভ্, স্মোলেন্স্ক্ প্রভৃতি সহরগুলি এখনও নাৎসী সৈন্যের অধিকারে। রষ্টোভ অধিকারে উদ্যত জার্মান সৈন্য প্রবল পাল্টা আক্রমণে বিতাড়িত হইলেও তাহারা টাগান্‌রগে ঘাঁটি করিয়া অবস্থান করিতেছে; সমগ্র শীতকালেও তাহাদিগকে উক্ত অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করান যায় নাই। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে উভয় পক্ষই আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। রুশিয়ার আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জার্মানীকে বহু রিজার্ভ সৈন্যও ইতিমধ্যে রণস্থলে প্রেরণ করিতে হইয়াছে। সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয় হইয়াছে তাহার বিস্তর। রুশিয়ার এই ক্রম বিজয়ে জার্মান সৈন্যের মনে একটা নৈতিক প্রভাব পড়াও স্বাভাবিক। দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী যে অজেয়—এই দৃঢ়বিশ্বাসের মেরুদণ্ডে সোভিয়েট রুশিয়াই প্রথম মর্মান্তিক আঘাত হানিয়াছে। সম্প্রতি হিটলার ও নাৎসী সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে মতান্তরের সংবাদ রয়টার আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন। হিটলার নাকি এপ্রিল মাসেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার পক্ষপাতী, কিন্তু অপরাপর নাৎসী সৈন্যাধ্যক্ষগণ আরও মাসাধিককাল অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক। ষ্টকহলমের "ডগেন্‌স্ নায়েটার" পত্রিকার মতেও জার্মানীর বসন্ত অভিযানের সম্ভাবনা নাই। জার্মান বন্দীরাই নাকি এই কথা স্বীকার করিয়াছে। তাহার উপর জার্মানীর বর্তমান সামরিক শক্তিও নাকি রুশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যজনক আক্রমণ পরিচালনার প্রতিকূল। যে র



ব্রহ্ম প্রত্যাগত নিরাশ্রয় লোকদিগকে আহার্য্যদানরতা স্বেচ্ছাসেবিকা

নূতন বাহিনী জার্মানী রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত অল্পবয়স্ক; যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা এখনও অনেকেই তাহাদের মধ্যে লাভ করে নাই। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পূর্বেই অনেক রুগ্ন আধা-অকর্মণ্য সৈন্যদিগকেও রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইতেছে। প্রাকৃতিক বাধা ও সামরিক শক্তিহীনতার জন্য জার্মানীর বসন্ত অভিযান বর্তমানে স্থগিত থাকার সংবাদ সম্প্রতি আমাদের নিকট পরিবেশিত হইলেও "ভারতবর্ষ"-এর পাঠকগণের নিকট ইহা আদৌ নূতন নয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে জার্মানী এবার রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিবে না। কেহ কেহ বলেন জার্মানীর আসন্ন অভিযান পরিচালিত হইবে খাস বৃটেনের বিরুদ্ধে; কাহারও মতে ককেশাশের দিকেই নাৎসী বাহিনী আক্রমণ শুরু করিবে। জার্মানী রুশিয়া আক্রমণ করিবে বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারাও স্বীকার করেন যে দীর্ঘবিস্তৃত রণক্ষেত্রে জার্মানী বোধহয় আসন্ন গ্রীষ্মে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। আমাদের পাঠকগণের নিকট কিন্তু এই সংবাদের মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। "ভারতবর্ষ"-এর গত বৈশাখ সংখ্যায় যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা আমরা পূর্বেই এই মন্তব্য করিয়াছি যে, রুশ সমরাঙ্গনে দুই হাজার মাইল রণ-ক্ষেত্রকে জার্মানীর পক্ষে সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন হইবে। রুশ রাজধানী মস্কো, দ্বিতীয় সহর লেনিনগ্রাড, দক্ষিণ রুশিয়ার রষ্টোভ ও অষ্ট্রাখান অঞ্চল, সুদূর উত্তরে মুরমান্স্ক প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে জার্মানী বর্তমানে তাহার স্বীয় শক্তি নিয়োগ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সেই সঙ্গে জার্মানী বৃটেন, ককেশাশ অথবা অন্য কোন অঞ্চলে রণক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিবে তাহার আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব।

ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্ক

অনধিকৃত ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্প্রতি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ফ্রান্সের পতনের বাইশ মাস পরে ফ্রান্সের রাজনীতিক ইতিহাসে এই পরিবর্তন একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্স মন্ত্রিসভায় নেতৃপদ অর্থাৎ গণতন্ত্র-শাসিত দেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছেন মঃ পিয়ারে লাভাল। মার্শাল পেতাঁ মঃ লাভালের পক্ষে এই ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সর্বাধিনায়করূপে অবস্থান করিবেন। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্তৃত্বভার এখন মঃ লাভালের উপর। জল, স্থল এবং বিমানবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে য্যাডমিরাল দারলাঁ ফ্রান্সের মন্ত্রিসভায় স্থানলাভ করিয়াছেন। লাভাল এবং দারলাঁর জার্মান প্রীতি সর্বজনবিদিত। মন্ত্রিসভার এই পরিবর্তন উপলক্ষে মার্শাল পেতাঁ বেতার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পরবর্তী পদাধিকারী হইবেন য্যাডমিরাল দারলাঁ এবং মার্শালের কর্তৃত্বাধীনে স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যাদি পরিচালনা করিবেন মঃ লাভাল। নব-গঠিত মন্ত্রিসভাকে সাহায্য প্রদান ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য ফরাসী জনসাধারণের নিকট মার্শাল আবেদন জানান। কিন্তু মার্শাল কেন যে লাভালের পক্ষে স্বীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিলেন সেকথা তিনি স্পষ্ট করিয়া জানান নাই, ফরাসী জনসাধারণও তাহা বুঝিতে পারে নাই। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে যে লাভালকে মার্শাল স্বয়ং পদচ্যুত করিয়াছিলেন, ষোল মাস পরে তাহারই হাতে সকল ক্ষমতা প্রদান করিবার এমন কি গুরুতর কারণ উপস্থিত হইল তাহা শুধু ফরাসী জনসাধারণ নহে, বিশ্বের সকল জনগণের নিকটেই রহস্যাবৃত হইয়া রহিল।



ব্রহ্ম প্রত্যাগতগণকে প্রদানের জন্য খাদ্য-সম্ভার

লাভালের এই নিয়োগ সম্বন্ধে জার্মানী হইতেও বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নাই। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মহল হইতে শুধু বলা হইয়াছে যে, মঃ লাভাল ও ফরাসী জাতিকে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করিতে হইবে এবং সেই সময়ে তাহাদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ কোন সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম। অর্থাৎ অনধিকৃত ফ্রান্সের রাজনীতিক ভাগ্যাকাশ হইল আরও নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, মঃ লাভালের অবস্থাও আদৌ ঈর্ষ্যাজনক নয়। মঃ লাভালের জার্মান পদলেহী মনোভাব অজ্ঞাত নাই; ফ্রান্সে জার্মান বিরোধী মনোভাব দলন ও যুদ্ধে ফ্রান্সের নিকট হইতে অধিকতর সহযোগ ও সক্রিয় সাহায্য লাভের জন্যই লাভালকে নিয়োগ করা হইয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের কথা হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, লাভালের অনুসরণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা

তাহার সম্মুখে জার্মানী উপস্থাপন করে নাই, লাভালের বিবেচনার উপরই তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ফ্রান্সের অধিকতর দুর্দিন আসন্ন, কারণ জার্মানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লাভালকে অধিকতর আত্মনিয়োগ করিতে ও সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে ; কারণ অন্যথা ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র হইতে যে তাঁহাকে একদিন নিঃশব্দে অপসৃত হইতে হইবে এই আশঙ্কা তাঁহার আছে। জার্মানীকে তুষ্ট করিবার প্রয়াসে বিফল হইলে সকল দায়িত্বই যে তাঁহার উপর বর্ষিত হইবে এইটুকু বুদ্ধি তিনি রাখেন।

কিন্তু সুদীর্ঘ বাইশ মাস বিচক্ষণতার সহিত ফ্রান্সের হাল ধরিয়া থাকিয়া আজ মার্শাল পেতাঁ কেন তাহা মঃ লাভালের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন ইহাই সমস্যা। লাভালের মধ্যস্থতায় জার্মানী হইতে মার্শালের উপর যে ইহার জন্য যথেষ্ট চাপ দেওয়া প্রয়োজন লাভালকে। বিজেতার সহিত অধিকতর সহযোগিতা না করিলে ফ্রান্সের সর্বনাশ সন্নিকট—একমাত্র এইরূপ ভীতি প্রদর্শন দ্বারাই মার্শালকে লাভালের অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করান সম্ভব। বর্বর নাৎসী জার্মানীর সর্বগ্রাসী যুদ্ধে আহুতি প্রদানের নিমিত্ত প্রচুর রণসম্ভার প্রয়োজন, প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তি ফ্রান্সের বিশাল নৌবহরও তাহার অত্যাবশ্যক। মার্শাল এতদিন ধরিয়া ফ্রান্সের নৌবহর জার্মানীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, অন্ততঃ মার্শাল আচরণ ও কথাবার্তায় তাহাই চাহিয়াছেন ; মার্শালের লাভাল অপেক্ষা দেশপ্রীতি ও উচ্চ মনোবৃত্তি ফ্রান্সের অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ে নিবদ্ধদৃষ্টি মার্শালের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশাই সম্ভবতঃ দাঁড়াইয়াছিল জার্মানীর প্রতিকূলে। ইহারই জন্য ফ্রান্সকে ইয়োরোপের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার ভীতি প্রদর্শন ও

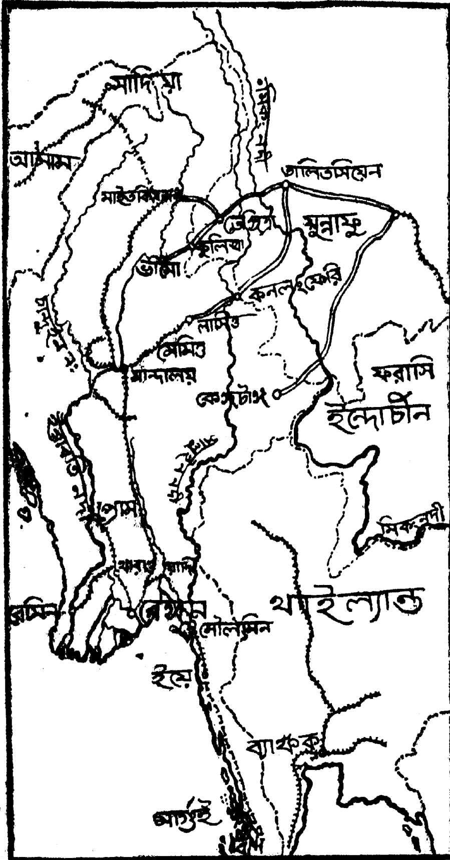
অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরদিকের মানচিত্র

হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। ফ্রান্সের এই নিদারুণ সঙ্কটজনক মুহূর্তে মার্শাল যে সুদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় তাহাকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ রাজনীতি-সমুদ্রে ভরা ডুবী হইতে বাঁচাইয়া লইয়া সুদূর সোনার কূলে ভিড়াইবার প্রয়াসে ধীর বিচক্ষণতায় অগ্রসর হইতেছিলেন তাহাই নহে, ফ্রান্সের মর্য্যাদাও তিনি যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। পেতাঁ গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে জার্মান অনুশাসনের অধীন হইলেও ফ্রান্সের প্রতি অনুরাগ পেতাঁর একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, অন্ততঃ লাভাল অপেক্ষা দেশপ্রীতি তাঁহার তুলনায় অধিক। মার্শাল উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের নৌবহর জার্মানীর একান্ত প্রয়োজন এবং একমাত্র এই নৌবহরের বিনিময়েই জার্মানীর সহিত দোকানদারী চলা সম্ভব। যেদিন জার্মানী নৌবহর হস্তগত করিবে সেদিন ফ্রান্সের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। আর এই জন্যই জার্মানীর রণোন্মাদ বর্বর জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব নয়। অনধিকৃত ফ্রান্সকে অধিকারের ভীতি সম্ভবতঃ সে প্রদর্শন করিয়াছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পেন ও ইটালীর মধ্যে তাহাকে বিভক্ত করিয়া ফ্রান্সের ক্ষুদ্রায়তনের ভয় হয়ত সে মার্শালকে দেখাইয়াছে, বিজেতার সহিত অধিকতর সহযোগিতা না করিলে অন্তর্বিপ্লবের অগ্নিতে ভস্মীভূত ফ্রান্সের মর্মন্তুদ ছবি হয়ত মার্শালের মানস নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে—ফলে বৃদ্ধ নিরুপায় মার্শাল ফ্রান্সেরই মুখের দিকে চাহিয়া স্বীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর তাহারই ফলে অনধিকৃত ফ্রান্সের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন।

সমষ্টি যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফল যে সুদূর প্রসারী ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ফ্রান্সে

জার্মান বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে মঃ লাভালের প্রতি গুলি নিক্ষেপ এবং ব্যাপকভাবে কম্যুনিষ্ট দলন হইতেই তাহা পরিস্ফুট। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নাৎসী বিরোধী দল এবং জার্মান বিরোধী মনোভাবকে কঠোর হস্তে দমন করা প্রায়োজন। কিন্তু ইহাই শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ও সমরোপকরণ সম্পূর্ণভাবে জার্মানীর পক্ষে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। আমরা একাধিকবার বলিয়াছি বৃটেনের বিরুদ্ধে



উত্তর ব্রহ্ম

প্রচণ্ডতম আঘাত হানিতে হইলে জার্মানীর পক্ষে ফ্রান্সের রণবহর অপরিহার্য। আফ্রিকাস্থ ফরাসী উপনিবেশসমূহও স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি জেনেভা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১৪ই এপ্রিল ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে ৬খানি যুদ্ধ জাহাজ, ১খানি বিমানবাহী জাহাজ, [illegible] ফ্লোটিলা লিডার, ১০খানি ডেষ্ট্রয়ার, ৬খানি অন্যান্য জাহাজ এবং মাসেল্স্ ও তুলোঁ বন্দরে অবস্থিত কয়েকখানি ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের কর্তৃত্বভার জার্মানী লাভ করিয়াছে। সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত এই সংবাদের সত্যতা কতখানি তাহা এখনও নির্ণয় করা কঠিন হইলেও জার্মানী যে অদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্সের রণতরী-বহর হস্তগত করিতে প্রয়াসী ইহা নিঃসন্দেহ। তাহার উপর ফ্রান্সে অবস্থিত জার্মান সেনার কর্তৃত্বভার প্রদান করা হইয়াছে ফন্ রুনষ্টেডের হস্তে। অতীতে এই জেনারেল সরাসরি বৃটেনের উপর আক্রমণ চালাইবার ইচ্ছা একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়া একদল বিশেষজ্ঞ এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, জার্মানী শীঘ্রই বৃটেনের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিলে এইরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় বটে, তবে আমাদের মনে হয় উক্ত ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে লক্ষ্য না করিয়া অন্যান্য রণক্ষেত্রের অবস্থা ও ঘটনাবলীর সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াই বিচার করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিলে বৃটেনের উপর জার্মানীর আক্রমণের আশঙ্কা অল্প বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রুশ যুদ্ধ হইতে জার্মানীকে বর্তমানে একেবারে সরাইয়া আনা হিটলারের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃটেন যে সমগ্র বিশ্বে নৌশক্তিতে অদ্বিতীয় ইহাও জার্মানীর অজ্ঞাত নয়। জার্মানী জানে বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিলে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দীর্ঘকাল তাহাকে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার মত তৈল ও কাঁচা মাল জার্মানীর আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহার উপর সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে নাৎসী সৈন্যের মনের উপর যে নৈতিক প্রতিক্রিয়া হইয়াছে কোন রণক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়া তাহা পুনরুদ্ধারের পূর্বে বৃটেনের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলে নাৎসী বাহিনী যে কতখানি নৈতিক শক্তি প্রয়োগে আক্রমণে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে তাহাও বিশেষরূপে বিচার্য। কারণ পরাজিতের মনোভাব লইয়া রণক্লান্ত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে যে সক্ষম হয় না, ইতিহাস তাহা একাধিকবার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী আগামী গ্রীষ্মে কিরূপভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বাকি থাকে ককেশাশ। আমাদের মনে হয় জার্মানী রুশিয়ার দক্ষিণ রণাঙ্গনে সবিশেষ অবহিত হইবে। নাৎসী বাহিনী যদি রষ্টোভ অধিকার করিয়া অষ্ট্রাখান পর্য্যন্ত দখল করিতে পারে তাহা হইলে পারস্যোপসাগরে প্রভুত্ব বিস্তার তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। আর এই পারস্যোপসাগরের পথে জাপানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা জার্মানীর পক্ষে প্রয়োজন। এই যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যেই জার্মানীকে ফ্রান্সের প্রতি অবহিত হইতে হইয়াছে। পশ্চিম এশিয়ার অভিযানে সাফল্য লাভ করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তিকে পূর্বে হীনবল করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই গত কয়েকমাস হইতে মাল্টায় অবিরত বোমা বর্ষিত হইতেছে। জেনারেল রোমেলও বর্তমানে আফ্রিকায় বিশেষ তৎপর হইয়া ওঠেন নাই, তাঁহার সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে

আফ্রিকায় নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ার ঘাঁটিতে শত্রুপক্ষ পূর্বেই বোমা বর্ষণ করিয়াছে। আফ্রিকাস্থ ফরাসী উপনিবেশ হস্তগত করিয়া জার্মানী অ্যাটলান্টিকে মার্কিন ও বৃটিশ যোগাযোগ সাবমেরিণের তৎপরতায় ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াসী হইবে বলিয়া বোধহয়। এদিকে ভূমধ্যসাগরস্থ সিসিলি, প্যান্টালেরিয়া, ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ, ক্রীট প্রভৃতিতে জার্মান ও ইটালীয়বাহিনী অবস্থিত। ফ্রান্সের নৌবহর ও স্পেনের সহযোগিতায় জার্মানীর ভূমধ্যসাগরকে নাৎসী হ্রদে পরিবর্তিত করিতে সচেষ্ট হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দক্ষিণ ককেশাশে অভিযান পরিচালিত করিবার জন্য কৃষ্ণসাগরে যেমন রুশ নৌশক্তির প্রাধান্য খর্ব করা আবশ্যক, তুরস্কের সহিত একটা বোঝাপড়া করাও সেইরূপ প্রয়োজন। কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীর দিয়া অগ্রসর হইলে বাটুমের তৈলখনিতে উপস্থিত হওয়া সহজ হয়। ইরাক ও ইরাণে নাৎসী সাঁড়াশী বাহিনী পরিচালনা করাও যথেষ্ট সুবিধাজনক হইয়া ওঠে। কিন্তু ইহার জন্য তুরস্কের সহিত একটা বুঝাপড়া দরকার। অন্যথা তুরস্ককে নির্লিপ্ত রাখিয়া ইরাক ও ইরাণে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে ভিসি সরকারকে সিরিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য জার্মানীর পক্ষে চাপ দেওয়া সম্ভব। আর এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার জন্য আবশ্যক জেনারেল রোমেলের সহযোগিতা। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীর ধরিয়া জেনারেল রোমেলের বাহিনী যদি সুয়েজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলে লোহিত সাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করা জার্মানীর পক্ষে সহজ হয়। অষ্ট্রাখান দখল করিয়া কাস্পিয়ানে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ইরাণের মধ্য দিয়া জার্মানীকে পারস্যোপসাগরে জাপানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু যদি ভূমধ্যসাগরকে নাৎসী হ্রদে পরিবর্তিত করিয়া ভিসি সরকারকে সিরিয়া দিয়া অভিযান প্রেরণের ব্যবস্থা জার্মানী করিতে পারে এবং জেনারেল রোমেল তাঁহার বাহিনী লইয়া সুয়েজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হন তাহা হইলে লোহিত সমুদ্র পথে জাপানের সহিত অধিকতর সহজে জার্মানী যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই জাপান কলম্বোর প্রতি অবহিত হইয়াছে। মার্কিন পরিষদেও তাই মাদাগাস্কার লইয়া উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। নবগঠিত ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলী যদি জাপানকে মাদাগাস্কারে ঘাঁটি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করে তাহা হইলে এডেনের পথে জার্মানীর সহিত সংযোগ রক্ষা জাপানের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। আমেরিকা হইতে সেই উদ্দেশ্যে বাধা প্রদানের নিমিত্ত মাদাগাস্কারকে পূর্বাহ্নে আক্রমণ করিয়া দখল করিবার জন্য আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। মাডাগাস্কারকে জাপানের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে দিবার অভিপ্রায় যদি আভাসে ধরা যায়, তাহা হইলে বৃটেন যে পূর্বাহ্নেই মাদাগাস্কারে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া জাপানের আশায় 'ছাই' দিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কারণ মাদাগাস্কারের গুরুত্ব বর্তমানে অত্যন্ত অধিক। বর্তমানে ভূমধ্যসাগরের পথ বিপদসঙ্কুল হওয়ায় পূর্বাভিমুখী বৃটিশ জাহাজসকল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিতেছে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার গুরুত্ব বর্তমানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেপটাউন, পোর্ট এলিজাবেথ প্রভৃতি বন্দরের গুরুত্ব আজ বৃটেনের নিকট আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। জাপান মাদাগাস্কারে ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পাইলে শুধু জার্মানীর সহিত জলপথে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধাই সে লাভ করিবে না, বৃটেনের ভারত মহাসাগরের পথও যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিবে।

কিন্তু জলপথে জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ব্যতীত স্থলযুদ্ধে জাপান ভবিষ্যতে কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে ইহা লইয়াও বহু মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। কাহারও মতে জাপান অবিলম্বে রুশিয়া আক্রমণ করিবে। কিন্তু জাপ-রুশিয়া সম্পর্ক লইয়া 'ভারতবর্ষ'-এর গত বৈশাখ সংখ্যায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, সম্প্রতি প্রত্যেক রণাঙ্গনেই একটা নিষ্ক্রিয় ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। একমাত্র ব্রহ্মের যুদ্ধে জাপান কিঞ্চিৎ তৎপরতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ করা বোধ হয় জাপানের ইচ্ছা। জাপান ও জার্মানীর এই মৌনভাব অর্থহীন না হওয়াই সম্ভব। জাপানের ব্রহ্মের যুদ্ধ সত্বর শেষ করিয়া লইবার প্রতীক্ষায় জার্মানীর পক্ষে অপেক্ষা করা অসম্ভব নয়। প্রাচ্যের ভূসম্পদে শক্তিশালী জাপানকে লইয়া একযোগে রুশিয়া আক্রমণ করিবার ইচ্ছা জার্মানীর থাকিতে পারে। আমেরিকার "ওয়াশিংটন পোষ্ট" পত্রিকাও রুশিয়াকে সাইবেরিয়ার বিমান ঘাঁটি জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত আবেদন জানাইয়াছে। জাপানের রাজধানী টোকিয়োর ওপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে। কে বা কাহারা কোন্ বিমান ঘাঁটি হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া গিয়াছে তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। মার্কিন বিমান চীনের পূর্বোপকূলের বিমান ঘাঁটি হইতে আসিয়া বোমা বর্ষণ করিয়া গিয়াছে বলিয়া জাপানের ধারণা। কিন্তু জাপান নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও পূর্বচীনে মার্কিন বিমানের সন্ধান সে পায় নাই। এই অবস্থায় আপন ঘর রক্ষার জন্য সাইবেরিয়া হইতে জাপানের সাবধান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রুশ-জাপান সঙ্ঘর্ষের অসুবিধার কথাও আমরা "ভারতবর্ষ"এর গত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানেও সে মত পরিবর্তনের কোন কারণ আমরা দেখি না। একমাত্র নরওয়েতে নূতন রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হইলে এই আশঙ্কা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইতে পারে—সে আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব। তাহা হইলে বাকি থাকে অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম—অতি সত্বর অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য নামাইয়া জাপান অষ্ট্রেলিয়া দখলের চেষ্টা করিবে না। আমাদের সেই ধারণা এখনও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সর্বপ্রথম প্রয়োজন ঈঙ্গ-মার্কিন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। ইহারই জন্য প্রয়োজন অষ্ট্রেলিয়াকে আক্রমণ। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজেকে নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন জাপানের নাই। টিমর, সলোমন, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে যদি জাপান সুদৃঢ় নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন করিতে পারে এবং অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরগুলিকে বোমাবর্ষণে ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সহজে বিফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অষ্ট্রেলিয়াকে জয় করাও জাপ[illegible]

পক্ষে সহজ নয়। সুশিক্ষিত অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী আপন দেশকে রক্ষা করিতে জানে। প্রভুত মার্কিন সৈন্য আসিয়া তাহাদের আরও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহা হইলে বাকি থাকে ভারতবর্ষ। ভারতের উপকূল সুদীর্ঘ। এই বিশাল উপকূলকে সুরক্ষিত রাখিবার মত নৌশক্তি ভারতের আছে কি না তাহা কলম্বো ও ভারতের উপকূল আক্রমণের সময় জাপান যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তবে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারত মহাসাগরে জাপ নৌবাহিনী যে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট ইহা আর অস্পষ্ট নাই। পোর্ট ব্লেয়ারেও সে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। ভারতের খনিজ সম্পদ ও যুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিবিধ কাঁচা মালও জাপানের পক্ষে যথেষ্ট প্রলোভনের বস্তু। এতদ্ব্যতীত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে স্থলপথে জার্মানীর সহিত যোগাযোগ রক্ষার সুবিধাও সে লাভ করিবে। এই সকল কারণে ভারতের প্রতি অবহিত হওয়া তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তবে মার্কিন সৈন্য ও বিমানের আগমনে ভারতের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। তদুপরি প্রচণ্ড শক্তির ফলে নাৎসী অভিযান যেরূপ দারুণ অসাফল্য বহন করিয়া পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, আসন্ন বর্ষায় জাপান ভারত আক্রমণ করিলে তাহার অদৃষ্টেও সেইরূপ পশ্চিম রণাঙ্গনের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইবে কিনা তাহা আক্রমণের পূর্ব্বে জাপানের একাধিকবার চিন্তা করিতে হইবে।

জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র

আমরা উপরেই বলিয়াছি, একমাত্র জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্র-শক্তি যদি কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেন তাহা হইলেই জাপান কর্তৃক রুশিয়া আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় রণক্ষেত্র হইবে কোথায়? ককেশাশ এবং ইরাক-ইরাণের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি এবং উক্ত অঞ্চল আক্রান্ত হইলে রুশ-জার্মান যুদ্ধ কোন্ অবস্থায় দাঁড়াইবে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং উক্ত অঞ্চলের যুদ্ধকে প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলা ঠিক চলে না। যে দুই হাজার মাইল বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন উত্তর-দক্ষিণ রুশিয়া জুড়িয়া সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই ককেশাশ এবং পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিবে মাত্র। একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকা যদি একযোগে অন্য কোন নূতন এক স্থানে জার্মানীকে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত করার নিমিত্ত আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সার্থকতা হয়। এক রাষ্ট্রের পক্ষে একাধিক রাষ্ট্রের দ্বারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ পরিচালনের অসুবিধা কোথায় তাহা আমরা অন্যত্র বহুবার আলোচনা করিয়াছি। জার্মানী বর্তমানে রুশিয়ার সহিত চরম বোঝাপড়া করিতে আগ্রহান্বিত। কারণ হিটলার ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে যে, আগামী আর এক শীতকে আসিবার সুযোগ দিলে সোভিয়েটকে পর্যুদস্ত করিবার আশা নাৎসী জার্মানীর পক্ষে ত্যাগ করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইহার জন্য রুশিয়ার প্রাণকেন্দ্রগুলিতে আঘাত হানিবার আয়োজন জার্মানী বহু পূর্ব হইতেই করিতেছে। ব্রেষ্ট বন্দর হইতে তিনখানি যুদ্ধ জাহাজ বৃটেন কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সকল ঝুঁকি মাথায় লইয়া এই উদ্দেশ্যেই ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া বাল্টিক সাগরাভিমুখে গিয়াছে। আমেরিকার সহিত রুশিয়ার সরবরাহ সংযোগ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য মুরমানস্কের গুরুত্ব কতখানি তাহাও জার্মানী জানে। সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলিকে নীলাম্বুরাশির অতলে প্রেরণের নিমিত্ত জার্মানী পূর্ব হইতেই ঐ অঞ্চলে অবহিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি নরওয়েতে প্রভূত যান্ত্রিক বাহিনী প্রেরিত হইতেছে। 'কুইস্‌লিং'-শাসিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নরওয়েতে যথেষ্ট বিদ্বেষ-বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং জার্মানীর বিশ্বাস ও আশঙ্কা মিত্রশক্তি নরওয়েতে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট। মঃ লিটভিনফ একাধিকবার মিত্রশক্তিকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির উপযোগিতা সম্বন্ধে আবেদন জানাইয়াছেন; লর্ড বিভারব্রুক্ সম্প্রতি রুশিয়ার সামরিক শক্তিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া অচিরে নাৎসীশক্তির ধ্বংসের আশা প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড আমেরি এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে। যুদ্ধের এই নব অধ্যায় যে মিত্রশক্তির অনুকূলে ইতিহাস রচনা করিবে প্রত্যেকের বক্তৃতার মধ্যে এই আশার বাণীই ধ্বনিত হইয়াছে। মিত্রশক্তির দ্বারা নরওয়ে আক্রান্ত হইলে একদিকে যেমন জার্মানীকে তাহার সামরিক শক্তি দ্বিধা বিভক্ত করিতে হইবে, রুশিয়ার পক্ষেও তেমনই সুবিধালাভ হইবে প্রচুর। একমাত্র এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলেই জার্মানী জাপানকে রুশিয়া আক্রমণে প্ররোচিত করিবে। মিত্রশক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে নূতন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করুন ইহা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি; আজ যদি বৃটেন ও আমেরিকা নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে নূতন সমরাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে নাৎসীশক্তির চরম পরাজয়ের দিন যে আরও দ্রুত আগাইয়া আসিবে তাহা নিঃসন্দেহ। সেই সঙ্গে প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় উন্মত্ত জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করিয়া আপনার সর্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিবে কি না কে জানে!

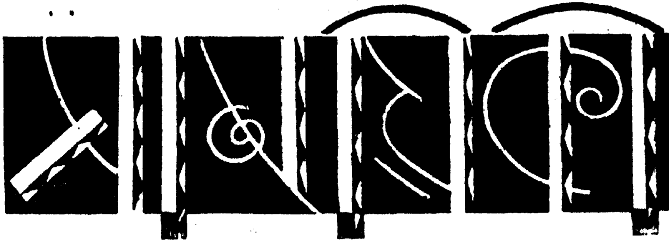
২৬।৪।৪২

মিলন-মাঙ্গলিক

শ্রীসুবোধ রায়

জীবনেরে নিতি ডাক দিয়ে যায়
অসীমের পারাবার,
সে নহে ক্ষুদ্র আঙিনার মাঝে
পঙ্কিল জলাধার।
জানি' এই কথা,— সেবা-সাধনায়,
আপনারে যেও ভুলে,
আনন্দ-লোক মাধুরী দুয়ার
আপনিই যাবে খুলে।

আলোক যেমন আপনা বিলায়ে
উৎসবে ভরপুর,
তোমাদের কথা, ভাবনা ও কাজে
লাগুক্ তাহারি সুর।
যাহারা শুনেছে অমৃতভরা
মহাজীবনের ডাক,
তাদের জীবনে চিরদিন বাজে
মিলনের শুভ শাঁখ।



জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা—

চীন দেশের চল্লিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় আট কোটি অধিবাসী ধর্ম্মে মুসলমান। বাকী অধিবাসীর মধ্যে বেশীটাই বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানের সংখ্যা খুব কম। তা সত্বেও সেখানে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে, সাম্প্রদায়িকতা সেখানে জাতীয় জীবনের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায় নাই। সম্প্রতি তত্রত্য মুসলমান জনগণের এক সভায় চীনা সেনানীমণ্ডলীর সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ জেনারেল পাই চুং-সি ভারতীয় মুসলমানদের নিকট জাতীয় ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। হিন্দুদের সহিত সমস্ত বিবাদ ভুলিয়া জাতীয় দুর্দ্দিনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের ঘরোয়া রাজনীতি বিশদভাবে তাঁহাদের জানা না থাকিলেও তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন যে, মুসলমান ধর্ম্ম কখনও বিপন্ন হইতে পারে না এবং ইসলাম ধর্ম্মের প্রেরণা কখনও মৃত হইতে পারে না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে বর্ব্বরতার যে অভিযান আগাইয়া আসিতেছে তাহা যদি বিজয়ী হয়, তবে কোন ধর্ম্ম, কোন জাতিই রক্ষা পাইবে না। কাজেই এই অভিযানকে প্রতিরোধ করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলকে পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিগুলির সহিত হাত মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি এই আবেদন মুরুব্বিয়ানা দেখাইবার ফাঁকা আওয়াজ নহে। সুতরাং জাপানী শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য চীন বিরাট ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়া আসিতেছে। এই আবেদন আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতাদের কাণে আবার নূতন করিয়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কথা স্মরণ করাইয়া দিক, ইহাই আমরা কামনা করি।



হাওড়া ষ্টেশনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

লোকাপসরণ-নীতি ও জনগণ—

প্রত্যাসন্ন শত্রু আক্রমণে দেশবাসীর অর্থ ও মন দুইয়ের মধ্যেই একটা দারুণ বিপর্য্যয় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অল্প সময়ের নোটিশে লোকদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার যে জরুরী নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, যুদ্ধের সময় ইহা অপরিহার্য্য হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণ, বিশেষত দরিদ্র সাধারণ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে, কোথায় আশ্রয় লইতে পারিবে তাহা দেখাইয়া দেওয়াও যুদ্ধের অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত। এজন্য অসহায় নরনারীদের বসবাসের জন্য ঘর বা বাড়ী ভাড়া করিয়া অথবা নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াও যদি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে হয়, অর্থ ব্যয় করিয়া তাহারই ব্যবস্থা হওয়া দরকার। 'বাড়ীঘর ছাড়িয়া যাও' বলিয়া অল্পদিনের নোটিশে দলে দলে নরনারীকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করার প্রয়োজন থাকিতে পারে,' কিন্তু তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা আরও বেশী প্রয়োজন। কলিকাতার খালি বাড়ীগুলি ভাড়া করিয়াই হউক বা নিরাপদ অঞ্চলে নূতন জমি দখল করিয়াই হউক, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু 'যাও' বলিলেই হয় না, কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া যাইবে—তাহাও বলা প্রয়োজন।

অপসৃত নরনারী ও দায়িত্ব—

জাপানী বোমায় পর্য্যুদস্ত যে সকল ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি ভারত-সরকারের নিকট তাঁহাদের বিনষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক আবেদন পাঠাইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা চাষবাস, ভূসম্পত্তি, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি লইয়া ছিলেন—শত্রু আক্রমণের ফলে বিব্রত হইয়া সমস্ত ফেলিয়াই তাঁহারা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেকেই আসিয়াছেন সম্পূর্ণরূপে কপর্দ্দকহীন হইয়া। এ অবস্থায় তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের প্রশ্ন একেবারে উপেক্ষার যোগ্য ত নহেই, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও জীবনধারণের কাজে সহায়তা করিবার জন্য এই আবেদন সম্পর্কে অবিলম্বে সুবিবেচনা অবশ্য কর্ত্তব্য।



পণ্ডিত জহরলাল কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশাগত দুঃস্থদের পরিদর্শন

ওয়ার-রিস্ক-ইন্সিওরেন্স অর্ডিনান্স—

সম্প্রতি সরকার কর্তৃক যে ওয়ার-রিস্ক ইন্স্যুরেন্স অর্ডিনান্স জারি হইয়াছে, তাহার ফলে ভারতীয় মিলমালিকগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া



সাংবাদিক সংঘের সভায় (অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে) পণ্ডিত জহরলাল

বাঁচিবেন। শত্রুর দ্বারা অথবা শত্রুকে বাধা দিবার সময় কারখানার যন্ত্রপাতি, অট্টালিকা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব বলিয়া কারখানাগুলি এই বীমা অর্ডিনান্সের আমলে পড়িবে। বৃটিশ ভারতের যে সকল কারখানা 'কারখানা আইনে'র আমলে পড়ে, এই পরিকল্পনায় সেগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে এই অর্ডিনান্সের আমলে আনয়নের বিষয়ে চিন্তা করা হইতেছে। শত্রু যদি ভারতে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভারত সরকার 'পোড়া মাটি'-নীতি গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া যে সকল ব্যবসায়ী আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, এই অর্ডিনান্সের ফলে তাঁহাদের অহেতুক আতঙ্ক অনেকখানি লাঘব হইবে। বর্ত্তমান বর্ষের ১লা এপ্রিল অর্থাৎ ভারতে শত্রু আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই এই বীমা অর্ডিনান্স কার্য্যকরী হইয়াছে। এই সঙ্গে ১৯৪০ সালের অর্ডিনান্সে যে কয়েকটি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বিশেষ গুরুতর। শত্রুর হাতে যাহাতে না পড়ে তদুদ্দেশ্যে সরকারের দ্বারা বা আদেশে ধ্বংসীকৃত কারখানার ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কোচিন বন্দর পথে বৃটিশ ভারতের যে সকল মাল বাহিরে যাইবে সেগুলিকে বাধ্যতামূলক ভাবে বীমা করিতে হইবে। তৃতীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—মজুত মালে বীমার হার সম্বন্ধে। প্রতি শত টাকায় দুই আনা হইতে বীমার হার তিন আনায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। তবে এই অর্ডিনান্সে মিল মালিকদের সম্বন্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু নাগরিকদের বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। নগরের ব্যক্তিগত বাড়ীঘর এবং সম্পত্তির মূল্য নিতান্ত অল্প নয়। তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে ভারত সরকারকে বিবেচনা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

স্যর ষ্টাফোর্ডের ব্যর্থতা—

ব্যাপারটা দুঃখের হইলেও সত্য যে স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে। স্যর ষ্টাফোর্ডের আনীত প্রস্তাব আমরা 'ভারতবর্ষ'এর গত সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়াছি। প্রস্তাবগুলি দেখিয়াই যে সত্যটা স্পষ্ট হইয়া পড়ে তাহা হইতেছে এই যে, উক্ত প্রস্তাব কোন প্রকৃত দেশ-[illegible] গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না। তাই ভারতীয় [illegible] মুসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভা—কোন প্রতিষ্ঠানই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের সময়ে সমর ব্যবস্থার সহিত দেশরক্ষার বিভাগ যদি ভারতীয়দিগের হাতে না থাকে তাহা হইলে সামান্ত মন্ত্রিত্ব বা বড় বড় দুই একটা চাকরির ভার লোক কেন গ্রহণ করিবেন? বৃটিশ মন্ত্রিসভা যদি পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতেন যে তাঁহাদের প্রস্তাব ভারতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে, তাহা হইলে সেখান হইতেই মিঃ চার্চিল তাহা নিজেই ঘোষণা করিতে পারিতেন। জহরলালজী তাই বলিয়াছেন, যদি সত্যই বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারতকে স্বাধীনতা দানে সম্মত থাকিতেন তাহা হইলে তাহা আটচল্লিশ ঘণ্টায় সম্পন্ন হইত। যুদ্ধ যখন ভারতের দ্বারে আসিয়া সমুপস্থিত, তখনও ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ মন্ত্রিসভার অবিশ্বাসের ফলেই স্যর ষ্টাফোর্ডের দৌত্য বিফল হইল। কিন্তু তবু আমরা স্যর ষ্টাফোর্ডের সহিত বলি যে, ভবিষ্যতে এই সমস্যার একদিন সমাধান হইবেই। তবে যত দ্রুত ভারত ও বৃটেনের মধ্যে সহযোগিতা অধিকতর দৃঢ় হয় ততই মঙ্গল। স্যর ষ্টাফোর্ডের দৌত্য সম্প্রতি বিফল হইল বটে, কিন্তু তাহার জন্য ভারতবাসী নিজ ধনপ্রাণ ও দেশরক্ষার ভার সম্যক গ্রহণ না করিয়া যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকে। শত্রুকে বাধাদানের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা দরকার। ভারতের বুকে অক্ষশক্তির আধিপত্য বিস্তার দেখিতে ভারত একান্ত অনিচ্ছুক; স্যর ষ্টাফোর্ডের দৌত্য বিফল হইলেও ভারত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে ও শত্রুকে সকল শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সর্ব্বদা অগ্রসর হইবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রচেষ্টা—

বাঙ্গালা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন: বাঙ্গালা প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে তাহাতে বাঙ্গালার সম্বৎসরের প্রয়োজন মিটে না। রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানি আবশ্যক হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বৎসর বাঙ্গালা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণ ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে



কলিকাতায় বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত মাধব শ্রী[illegible]রি আনে

বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। সেই জন্য এ বৎসর প্রত্যেক কৃষকের ধানের চাষ খুবই বাড়ানো দরকার। [illegible]র কৃষি বিভাগের বীজ লইয়া উন্নত

শ্রেণীর ধানের আবাদ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়। কাজেই সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষি বিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন করা উচিত। প্রত্যেক জেলার কৃষি কর্ম্মচারী বা স্থানীয় কৃষি পরিদর্শককে জানাইলে তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা উচিত, যেন তাহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে না হয়। যদি কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে তাহাতে ধানের চাষ করা উচিত। ইহা ছাড়া বর্ষাকালের উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্য-শস্য—শাক-সব্জী, ভুট্টা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাদ্য শস্যের অভাব কম হইবে। এস্থলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে হইবে। গত বৎসরের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও কম জমিতে পাট চাষ করাই সঙ্গত, কারণ যুদ্ধের জন্য কাঁচা পাটের এবং পাটজাত জিনিসের রপ্তানি অনেক কমিয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে পাটের দামও কমিয়া যাইবে। বেশী টাকার লোভে পাট বা অন্যান্য ফসল উৎপাদন না করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে দরকার।

মোমিন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা—

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে ভারতীয় মোমিন সম্প্রদায় সম্পর্কে যে প্রশ্নোত্তর হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আহম্মদাবাদের আঞ্জুমান হিমায়েৎউল-



স্বেচ্ছাসেবিকাগণ কর্ত্তৃক কলিকাতায় ব্রহ্মদেশাগত দুঃস্থব্যক্তিগণকে জলদান

আনসার-এর সভাপতি মিঃ আবদুল ওয়াহিদ ভারত সচিবের নিকট একটি তার পাঠাইয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় মোমিনদের সংখ্যা সাড়ে চারি কোটির কম নহে এবং তাঁহাদের নেতা মিঃ জহির উদ্দীন, মিঃ জিন্না নহেন। মুস্লিম লীগ নিজেদের সুবিধার জন্য মোমিন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দাবী করিয়া আসিয়াছেন, তাই মোমিন সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রকৃত নেতার নাম ও লোক সংখ্যার সঠিক সংবাদ জানাইয়াছেন।

বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিকল্পনা—

সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার আপৎকালের জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া কয়েক কোটি মণ চাউল, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া মজুত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার ফলে লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে কি না তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা দরকার; এই প্রসঙ্গে সরকারের ইহাও সম্ভবত দেখা উচিত যে, সরকারের পক্ষ হইতে এই সকল খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া বিক্রেতাদের উচিত মূল্য হইতে বঞ্চিত করা না হয়।

জরুরী ব্যবস্থার কথা—

কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী কলকারখানাপ্রধান জায়গাগুলিতে লোকের জীবনযাত্রা বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় যাহাতে ব্যাহত না হয়, বিশেষ করিয়া বিমান আক্রমণ হইলেও যাহাতে লোকে নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক, খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী সম্প্রতি তিনটি আদেশ জারি করিয়াছেন। তাহা এই—

(১) বিমান আক্রমণের অবসানসূচক ধ্বনি করিবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি চাল ডাল ইত্যাদির দোকান বা আড়তগুলি না খোলা হয় তবে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত দোকান ইত্যাদি খুলিয়া তাহার দ্রব্যাদি স্বীয় জিম্মায় লইয়া নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। (২) কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী শিল্পপ্রধান স্থানগুলির বাহিরে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি অর্থাৎ চাল ডাল, আটা, ময়দা, তৈল, কয়লা এবং দিয়াশলাই লইয়া যাইতে পারিবে না। (৩) আটা ও ময়দার কলসমূহের মালিকদের প্রতি সপ্তাহে নিজ নিজ মিলের মজুত মালের হিসাব কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে হইবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেহ মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সকল দ্রব্য এই প্রদেশেই উৎপন্ন হয় না, যেমন - ডাল, লবণ, কয়লা ইত্যাদি, এ সবই প্রদেশান্তর হইতে আমদানি হয়—সে সকল দ্রব্য যাহাতে আবশ্যকমত আমদানি হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মালপত্র মজুত রাখা সম্পর্কেও ব্যবসায়ীদের নিশ্চিন্ত করা দরকার, নতুবা তাহারা লোকসানের ভয়ে হয় ত মালপত্রই মজুত রাখিবে না।

অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গলা শিক্ষাদান—

অনেক অ-বাঙ্গালী সুযোগ সুবিধা না পাওয়াতে বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালা শিখিতে পান না। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গালা ভাষা শিখাইবার দুইটী ক্লাস কাশী সহরে খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। একটী বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলে এবং অন্যটী এংলো বেঙ্গলী ইনটারমিডিয়েট কলেজের গৃহে। অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মূল পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইবেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার শ্রীযুত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সরোজেশ চট্টোপাধ্যায় এই ক্লাস পরিদর্শন করিবেন। বাঙ্গালীটোলা স্কুলের ক্লাশে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশি ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিবেন। এতদিন বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালীদের এরূপ ভাবে বাঙ্গালা ভাষা শিখাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় অভিযান বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য বাঙ্গালীপ্রধান নগরে হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

হালিসহরে রামপ্রসাদ উৎসব—

গত ১২ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় ২৪ পরগণা হালিসহর গ্রামে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সাধনাস্থানে কবিবরের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ

সাহিত্যিক শ্রীযুত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, কংগ্রেস সেবক শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রভৃতি সভায় যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নৈহাটীর শ্রীযুত অতুল্যচরণ দে ও হালিসহরের শ্রীযুত গৌরসুন্দর গুপ্তের চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদের গান বাঙ্গালা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে—তাঁহার কথা আলোচনা করিয়া দেশবাসী এ যুগে অবশ্যই উপকৃত হইবেন।

বর্দ্ধমান পল্লীসাহিত্য সম্মিলন—

গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল শনি ও রবিবারে বর্দ্ধমান সহরের নিকটস্থ রায়ান গ্রামে জেলা পল্লীসাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শনিবার অপরাহ্নের অধিবেশনে কাজি নজরুল ইসলাম, রবিবার সকালের সভায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিকালের অধিবেশনে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের চারণ কবি শ্রীযুত কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। গ্রামে এইরূপ সুবৃহৎ অনুষ্ঠান ও এত আড়ম্বর সাধারণতঃ দেখা যায় না—কাজেই গ্রামবাসীদের এই সাহিত্যপ্রীতি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাগ্রহে এই সম্মিলনে যোগদান ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান সহর হইতেও জেলাজজ, অধ্যাপক সুকুমার সেন, কবি দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সুধী সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতীকার—

বর্ত্তমান যুদ্ধ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকেই কমবেশী বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাই এই সুযোগে অতিলোভী ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় কতকগুলি জরুরী প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। আজিকার দিনে পৃথিবীর সকল দেশেই খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যথোচিত পরিমাণে সরবরাহ করা একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যা আমাদের দেশেও প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চাল, ডাল, ময়দা, আটা, কেরোসিন তৈল, সাবু, কাপড়, সুপারী, খয়ের ইত্যাদির মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকবার সরকার হইতে মূল্যের হার বাঁধিয়া দিয়া এই সঙ্কটে ব্যবসায়ীদের অতিলোভের উদগ্র কামনা প্রশমিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি মালের আমদানি বাজারে এতই কমিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের দাম বাঁধিয়া দিয়াও কোন লাভ হইতেছে না। লোকে হয় জিনিষ পাইতেছে না, নহেত নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা বেশী দামে জিনিষ লইতে বাধ্য হইতেছে। আমরা আশা করি, যথাপ্রয়োজন মাল সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ একই-সঙ্গে মনোযোগ দিবেন। নতুবা এই সমস্যার সমাধানই যে কঠিন হইয়া পড়িবে তাহাই নহে, পরন্তু লোকজনের মনে একটা তীব্র অসন্তোষও ধূমায়িত হইতে থাকিবে।

নিজাম রাজ্যে শিক্ষাবিভ্রাট—

হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ জনই হিন্দু এবং তাহাদের মাতৃভাষা মারাঠী, তেলেগু অথবা কানাড়ী। উর্দ্দু ভাষা মাত্র শতকরা ১০ জন মুসলমান অধিবাসীর মধ্যেই প্রচলিত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজাম সরকার শতকরা ৯০ জন প্রজার তীব্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র উর্দ্দুকেই শিক্ষার বাহনরূপে প্রচলন করিয়াছেন। এমন কি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পর্য্যন্ত মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে বালক-বালিকাদের উর্দ্দু ভাষা শিখিতে প্রকারান্তরে বাধ্য করা হইতেছে। ইহার ফলে প্রজাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর স্বার্থবিরোধী এবং তাহাদের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর এইরূপ শিক্ষানীতি নিজাম-দরবার কেমন করিয়া অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দেশীয় রাজ্যে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্র কিরূপে প্রবলভাবে বিদ্যমান, নিজাম রাজ্যের এই শিক্ষানীতি তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত। নিজাম-দরবার যদি এই ভ্রান্ত শিক্ষানীতি অবিলম্বে ত্যাগ না করেন তবে রাজ্যের শতকরা ৯০ জন প্রজার মনে ঘোর অসন্তোষের সঞ্চার হইবে এবং তাহার ফল ভাল হইবে না।

জার্মানীতে বাঙ্গালী বন্দী—

গয়ার ডাক্তার পরলোকগত প্রিয়গোপাল মজুমদারের পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩১ সালে বিলাতে এফ-আর-সি-এস পড়িতে গিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ লাগিলে সে আর-এ-এম-সি'তে কমিশন পায়—তাহার পর ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জার্ম্মানীতে বন্দী



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

হইয়া আছে। বীরেন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার তৃতীয় ভ্রাতা সমরেন্দ্রও বিলাতে বৈমানিকের কাজ শিখিতে গিয়াছিল এবং শুনা যায় যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। দুই বৎসরেরও অধিককাল তাহার কোন সংবাদ এদেশে আসে নাই। তাহাদের মাতা দুই পুত্র (উভয়েই এক্ষণে ছাত্র) ও দুই অবিবাহিতা কন্যা লইয়া গয়ায় বাস করেন।

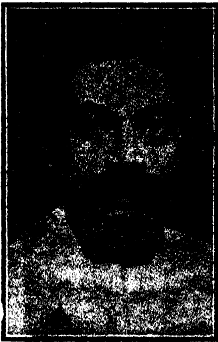
পল্লীরক্ষী বাহিনী—

বর্ত্তমান মহাসমর বাঙ্গালার দ্বারদেশে সমুপস্থিত। ফলে বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের ধনপ্রাণ আজ অতি বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। এ অবস্থায় পুলিশের মুখাপেক্ষী হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না। পল্লীরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা পল্লীবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এতাবৎকাল পল্লীবাসীরা সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেরাই

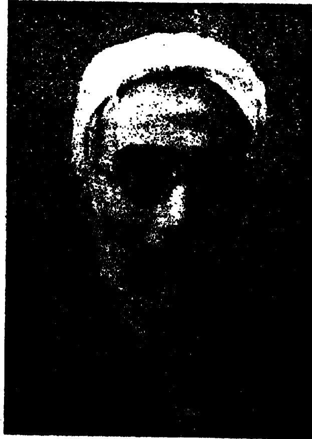
চোর ডাকাতের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে—ইহা হয়তো কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু শত্রুর আক্রমণ প্রত্যাসন্ন জানিয়া সরকারের রক্ষণশীল মনোভাবে কিঞ্চিৎ শিথিলতা আসিয়াছে দেখিয়া আমরা খুশী হইলাম। সম্প্রতি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় পল্লী-রক্ষী-বাহিনী গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া জেলার অধিবাসীদের নিকট এক আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, —"কোন কোন স্থলে দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা হাট-লুঠ, ডাকাতি ইত্যাদির ভয় দেখাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহারা এই প্রকার ভীতিপ্রদর্শনে উৎসাহিত হইতেছে। পুলিশের উপর এক্ষণে যে দায়িত্ব পড়িয়াছে, জনসাধারণের সহায়তা ও সহযোগিতা ভিন্ন তাহা বহন করা পুলিশের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই জেলার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও আইনানুগ অধিবাসীদের নিজেদের ধনপ্রাণ রক্ষার্থ 'গ্রামরক্ষীদল' গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছি।" চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রামবাসীদের নিজেদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে যে প্রেরণা দিয়াছেন আমরা আশাকরি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অনুরূপ প্রেরণা প্রদত্ত হইবে।

কর্পোরেশনের নূতন মেয়র—

গত ২৯শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের এ বৎসরের প্রথম সভায় শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর মেয়র ও মিঃ আদম ওসমান ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলেও তাহার পর আর কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। এখন এই বিপদের দিনে সকলে সমবেতভাবে কর্পোরেশনের কার্য্যে অবহিত হইবেন



মেয়র শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর



ডেপুটী মেয়র মিঃ আদম ওসমান

বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। নস্কর মহাশয় বহুদিন কর্পোরেশনের কাউন্সিলার আছেন—তিনি কংগ্রেসেরও সেবক। কাজেই তাঁহার মত যোগ্যপাত্রে এই সম্মান প্রদত্ত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা নবনির্ব্বাচিত মেয়র ও ডেপুটী মেয়রকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পাকিস্থান বিরোধী-দিবস—

গত ১০ই মে ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত কলিকাতাতেও কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে হিন্দুদিগের এক জনসভায় পাকিস্থান গঠনের নীতির তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। ডাক্তার বি-এস-মুঞ্জে আসিয়া ঐ সভার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের অর্থসচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন—ভারতের জনসাধারণ কোন দিনই পাকিস্থান নীতি সমর্থন করেন নাই বা করিবেন না—কাজেই আমাদের সমবেতভাবে ঐ ব্যবস্থার নিন্দা করিতে হইবে। ভারতে যে নূতন রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইবে, সকল ভারতবাসী সে ব্যবস্থা সমর্থন করিবে—কিন্তু তাহার মধ্যে কেহই হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান গঠন সমর্থন করিবেন না। ইহাই দেশবাসী সকলের অভিমত—কাজেই সকলকে এ বিষয়ে আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে।

জগদ্বন্ধু ভদ্র শতবার্ষিক উৎসব—

গত ১২ই বৈশাখ শনিবার সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতাস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মন্দিরে প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহকর্ত্তা ভক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের শতবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় সে যুগে যে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ দ্বারা 'গৌরপদ তরঙ্গিনী' প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেজন্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই তিনি ধন্যবাদভাজন। সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালক শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় উক্ত গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শুধু বৈষ্ণবদিগের নহে, বাঙ্গালার সাহিত্যিক মাত্রেরই নিকট বিশেষ আদরের জিনিষ হইয়াছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া উদ্যোক্তাগণ উপযুক্ত পাত্রেই শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন।

কামারহাটীতে মুরারী সম্মিলন—

গত ২১শে চৈত্র ২৪পরগণা কামারহাটীতে শ্রীযুত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে মুরারীমোহন গুপ্ত ও দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা উপলক্ষে বিরাট সঙ্গীতানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। পানিহাটী নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীতানুরাগী শ্রীযুত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কামারহাটীর চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের বহু সঙ্গীতানুরাগী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার বাহিরে মুরারী সম্মিলনের অধিবেশন এই প্রথম হইল এবং ইহার সাফল্যে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

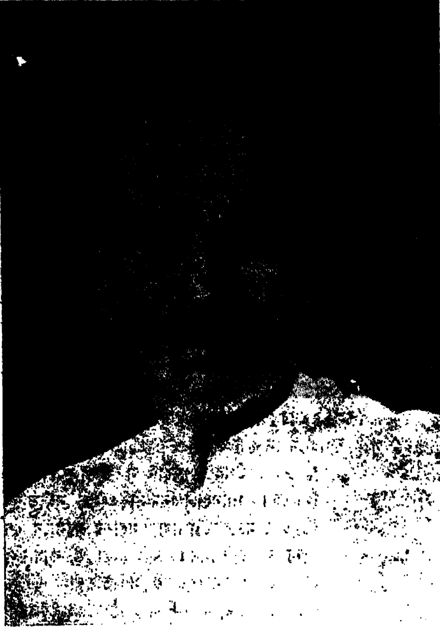
আগড়পাড়ায় নববর্ষ উৎসব—

গত ১লা বৈশাখ ২৪পরগণা আগড়পাড়া গ্রামে গঙ্গাতীরস্থ ঠাকুরবাটীর বিরাট নাটমন্দিরে স্থানীয় যুবকগণের উদ্যোগে নববর্ষ উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী উৎসবে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু সুধী উৎসবে যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

হসরৎ মোহনীর পরিকল্পনা—

মওলানা হসরৎ মোহনী ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদা বিশিষ্ট নেতা হিসাবেই পরিচিত হন এবং জাতীয়তাবাদী বলিয়াই সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি হায়দরাবাদ হইতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য একটি পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনায় বর্ত্তমান প্রদেশগুলিকে 'রাষ্ট্র', তাহাদের প্রস্তাবিত সমবায়কে 'যুক্তরাষ্ট্র' এবং যুক্তরাষ্ট্রগুলির সমবায়ে গোটা ভারতকে 'সংযুক্ত রাষ্ট্র' বলা হইয়াছে। তাঁহার পরিকল্পনাটি এই : (১) ভারতবর্ষকে পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্রীয় অঞ্চলে [illegible] করিতে হইবে : (ক) পশ্চিমভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্র : সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থান লইয়া ; (খ) দক্ষিণ-পশ্চি

যুক্তরাষ্ট্র : বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট লইয়া ; (গ) কেন্দ্রীয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার লইয়া ; (ঘ) পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও উড়িষ্যা লইয়া ; ও (ঙ) পূর্ব্ব



বিদায়ী মেয়র—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

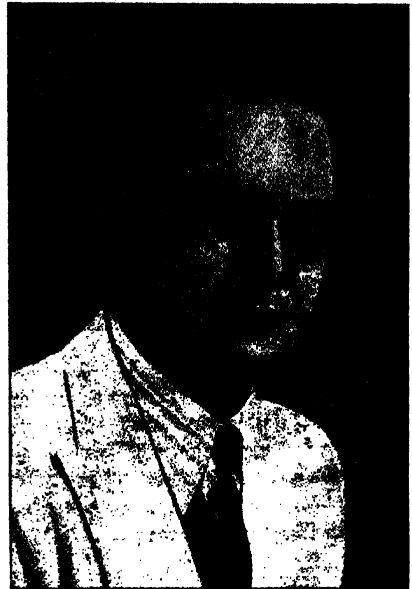
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : বাঙ্গালা ও আসাম লইয়া। (২) এই সকল যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলি সার্ব্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত হইবে। (৩) এই সকল যুক্তরাষ্ট্র সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া কেন্দ্রীয় সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবে। (৪) সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি-মৈত্রী, শান্তি চুক্তি ইত্যাদি সমস্ত পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনা করিবেন। (৫) পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার ছাড়া আর কোন্ কোন ক্ষমতা সংযুক্ত রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে, তাহা উক্ত পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্রের ভোটে নির্দ্ধারিত হইবে। (৬) প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ লাট বা বড়লাট নিয়োগ এবং নিজ নিজ আইন-সভা গঠন করিবেন। প্রত্যেক যুক্ত-রাষ্ট্রের এলাকাধীন রাষ্ট্রগুলি মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে যে ক্ষমতা দিবেন, যুক্তরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা তাহাই হইবে। (৭) সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকারের বড়লাট বা সভাপতি সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভোটে ভারতের যে-কোন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। (৮) সমস্ত নির্ব্বাচনই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং যুক্তনির্ব্বাচন প্রথায় অনুষ্ঠিত হইবে। (৯) সমস্ত পার্লামেণ্টারী দলকেই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দল হইতে হইবে ; সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন নির্বাচন হইতে পারিবে না ; যে-প্রার্থী নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক আবেদন করিবেন, তাঁহার নির্ব্বাচন সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হইয়া যাইবে। (১০) জাতীয়তাবাদী ও ধনতন্ত্রবাদীদের মতই সমাজবাদীদের ও রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ইহা ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র গঠনের পরিকল্পনা ; কংগ্রেস, লীগ ও বৃটিশ সরকার যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হন তাহা হইলে যুদ্ধ-কালের জন্য তিনি এই পরিকল্পনাটির প্রস্তাব করেন : (১) বর্ত্তমান বড়লাটকে সংযুক্ত রাষ্ট্রের অস্থায়ী সভাপতিরূপে এবং প্রাদেশিক লাটদিগকে অস্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় লাট হিসাবে মানিয়া লওয়া হইবে। (২) যুদ্ধান্তে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের কার্য্যকাল আপনা আপনি শেষ হইবে এবং তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের জায়গায় ভারতীয় জনগণ নিজ নিজ যুক্তরাষ্ট্রীয় লাট ও সংযুক্তরাষ্ট্রীয় সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। (৩) যুদ্ধকালে ভারত-রক্ষার জন্য বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ভারতের সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

মওলানা সাহেব বলেন তাঁহার এই পরিকল্পনা কংগ্রেস, লীগ ও বৃটিশ সরকার—সকলেরই গ্রহণযোগ্য। এই পরিকল্পনার একটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে। বর্ত্তমান বড়লাটকে অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত রাষ্ট্রের সভাপতি স্বীকার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার অস্থায়ী মন্ত্রীসভাটি কি ভাবে গঠিত হইবে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাও উল্লেখ করা হয় নাই।

রাজাজী ও পাকিস্থানীয় দাবী—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির বিশেষ অধিবেশনের প্রাক্কালে মাদ্রাজের কংগ্রেসী নেতা রাজগোপালচারি মহাশয় মাদ্রাজের আইন সভায় আলোচনার্থ সুপারিশের আকারে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করাইয়াছিলেন। দেশরক্ষা দায়িত্বের দিক হইতে অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগের সহিত একযোগে সচিব-সংঘ গঠন করা উচিত এবং লীগের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য এমন কথা দেওয়া যাইতে পারে যে, নূতন শাসনতন্ত্র রচনার সময় যদি লীগ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে আগ্রহশীল থাকে তাহা হইলে তাহা বিবেচনা করা



বিদায়ী ডেপুটী মেয়র—মিঃ এম-এ-এচ্-ইস্পাহানী

হইবে। একটা যুক্তির ফাঁক থাকিলেও ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে কংগ্রেসকে তথাকথিত পাকিস্থানী দাবী বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতিতে

আবদ্ধ করা চেষ্টা রহিয়াছে। মাদ্রাজের আইন সভা দুইটিতে মোট ১৯১জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫২জন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার মধ্যেও মাত্র ৩৬জন ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। এই দিক দিয়া প্রস্তাবের গুরুত্ব খুব বেশী না হইলে ব্যাপারটা যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই, কেন না ইহার পশ্চাতে প্রবীণ ও বিচক্ষণ নেতা এবং কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্য রাজাজীর অনুমোদন লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুখের বিষয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায়ও রাজাজীর এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র—

প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ রায় শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদে সকলেই দুঃখিত হইবেন। ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। এদেশে পরিশ্রমের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় না—তাই পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্ব ব্যাপারে আজও বাঙ্গালী আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যে স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিত লোক এই দিকে বিশেষ অগ্রণী হইয়া সত্যকার গঠনমূলক কার্য্য করিয়াছেন এবং সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র তাঁহাদেরই অন্যতম। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।



রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়

'যুগান্তর' বন্ধের আদেশ—

গত ২১এ এপ্রিলের "যুগান্তর" পত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা সরকার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য "যুগান্তর" বন্ধ করিয়া দেন এবং ঐ তারিখের কাগজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। তিনদিন পরেই উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। অবশ্য এজন্য বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলকে আমরা সাধুবাদ না করিয়া পারিতেছি না। শুধু 'যুগান্তর'ই নয়, পাঞ্জাবের "প্রতাপ", বোম্বের "সেন্টিনেল", কলিকাতার মুসলিম-লীগ পৃষ্ঠপোষিত ইংরেজী সান্ধ্য দৈনিক "ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া"কেও অনুরূপ দোষে (ভারত রক্ষা আইন) বন্ধ করা হইয়াছে। শত্রু ভারতের দ্বারে, এ সময় সংবাদপত্রকে তুচ্ছ অপরাধে বন্ধ করিয়া দিয়া সরকার অধিকতর বিপদকে আমন্ত্রণ করিতেছেন কি-না ভাবিবার বিষয়।

শ্রীযুত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—

ভারতবর্ষের লেখক শ্রীযুত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, অজিতকুমার গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'শিল্পের ইতিহাস' বিষয়ে সাফল্যের সহিত এম-এ পাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালার জনশিল্প সম্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অপর কোন বাঙ্গালী ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষালাভ করেন নাই। বর্ত্তমানে তিনি বৃটীশ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর 'বাঙ্গালা ঘোষণাকারী' পদে কাজ করিতেছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

ইণ্ডিয়ান টী-মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড

প্রায় এক মাসের অধিককাল পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতায় আশ্রয়লাভের জন্য সমাগত দুর্গতদের কষ্টে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড শিয়ালদহ ষ্টেসনে একটি চা-খানা খুলিয়াছিলেন। প্রত্যহ সকাল আটটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত তথায় পথশ্রান্ত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে বিনামূল্যে চা-বিস্কুট বিতরণ করা হইতেছে। এই অনুষ্ঠানটি সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ গত ১৭ই এপ্রিল এতদুদ্দেশ্যে হাওড়া ষ্টেসনেও একটি চা-খানা খুলিয়াছেন। প্রত্যহ সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত উহা খোলা রাখা হয়। প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তাঁহারা এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার কাপ চা এবং দুই লক্ষ ষাট হাজার বিস্কুট বিতরণ করিয়াছেন। আর্ত্তজনের দুঃখিকল্পে বোর্ডের এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন—

গত ২৫শে বৈশাখ শুক্রবার দেশের সর্ব্বত্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস আড়ম্বরের সহিত পালিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশকে কি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব করিবার শক্তি কাহারও নাই—তবে তাঁহার দানে যে বর্ত্তমান যুগের লোক বহু প্রকারে সমৃদ্ধ হইয়াছে, সে কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের কথা দেশে যত অধিক আলোচিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সাহিত্য সারাজীবন ধরিয়া পাঠ ও আলোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। বিভিন্ন পণ্ডিতের মুখে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা শ্রবণ করিলে রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্ব সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা কল্পনা করা সম্ভব। সে দিক দিয়াও রবীন্দ্রকথা আলোচনার উপকারিতা আছে। যাঁহাদের উদ্যোগে দেশের সর্ব্বত্র রবীন্দ্রদিবস পালিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আমরা সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

জন্মক্ষণ

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

প্রথম ভোরের সূর্য তুষারের বুকে
করেছিল অঙ্কিপিত-কম্পিত-চুম্বন,
অলক্তক-রশ্মিস্নাত ঝরণার মুখে।
বিভ্রান্ত মুখর মুগ্ধ সুপ্তোত্থিত ক্ষণ :
চঞ্চলা উর্বশী নামি' মোর স্তব্ধ চোখে
বিচিত্র চরণ-পাত করেছে কৌতুকে।

জন্মেছিনু অকস্মাৎ সমুদ্রের তীরে ;
ভোরের প্রথম আলো তরংগের বেগে
শোণিতে আবর্ত তুলি গিয়েছিল ফিরে।
অভাবিত সে উচ্ছ্বাসে ফেনপুঞ্জ জেগে
রাশি রাশি কল্পনায় ফেটেছে চৌদিকে ;
সার্থক আমার জন্ম সৈকত-শিয়রে ;

নবারুণ সাক্ষী করি কন্যা উর্বশীকে
সমুদ্র করেছে দান কম্পিত-প্রহরে।

গান্ধার ভাস্কর্য্যে বুদ্ধকাহিনী

শ্রীগুরুদাস সরকার

কলিকাতা যাদুঘরের গান্ধার গৃহের ৯১নং চিত্রে তিনটি মূর্ত্তি প্রবেশ দ্বারের সম্মুখস্থ চাঁদনীতে বসিয়া আছেন। অলিন্দের নিম্নাংশে সিংহমুখ ব্র্যাকেট শ্রেণী। চিত্রের মধ্যভাগে বুদ্ধদেব পদ্মপুষ্পে সমাসীন, পুষ্পের বৃন্তটি নন্দ ও উপনন্দ নামক দুইজন নাগরাজ ধরিয়া আছেন। নাগরাজ-দ্বয়ের কটিদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত। ইঁহাদের দুই পার্শ্বে অবনতজানু একজন শ্রমণ ও এক শ্রমণী। দুইটি মূর্ত্তিই ক্ষুদ্রাকৃতি। আচার্য্য ফুসে (Foucher) অনুমান করিয়াছেন যে এই শ্রমণ মৌদ্গল্যায়ন ও শ্রমণী উৎপলবর্ণা। বুদ্ধের মাথার উপরে ও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে তিনটি আলগা ফুল—মনে হয় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহাতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। বুদ্ধের দুইজন সুরলোকবাসী অনুচর দুইটি সমুচ্চ ও সুসজ্জিত আসনে বসিয়া আছেন। দিব্যাবদান মতে ইঁহাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মা ও অপরটি শক্র ; কিন্তু মূর্ত্তি দুইটির কিছু বিশেষত্বের জন্য এ পরিচিতি গ্রহণযোগ্য কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বামের মূর্ত্তির হাতে একটি পুঁথি। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর ইহা একটি বিশেষ চিহ্ন। দক্ষিণের মূর্ত্তির হাতে একগুচ্ছ পুষ্প। এটি হয়তো পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর হইতে পারে। উভয় মূর্ত্তিই মাল্য ধারণ করিয়া আছেন। একটির অনাবৃত কেশ ঝুঁটি করিয়া বাঁধা—অপরটির মাথায় রত্নখচিত উষ্ণীষ। দুইটি মূর্ত্তিরই চিন্তামগ্নভাব—হেলান মাথা আঙ্গুলের উপর ন্যস্ত। বামের মূর্ত্তিটির একটি পা ঝুলানো, অপরটি আসনের উপর তির্য্যগ্‌ভাবে রক্ষিত। বামের মূর্ত্তিটির একটি পা পাদপীঠে রক্ষিত, অপরটি ঝুলানো।

৯৫নং চিত্র একটি কীলকবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। উহা একটি উল্টান পদ্মপুষ্পের উপর বসান ছিল। ফলকটির মাথায়, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়, কলার মোচার ঠিক সরুদিকটার মত ঘনাবয়ব একটি সূচাল পাথরের খোঁচ। মনে হয় ইহার উপর একটা ছত্র বসান ছিল। এ চিত্রটি শ্রাবস্তীর প্রতিহার্য্য মণ্ডপের একটি অনুলেখ্য বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। মণ্ডপের পুরোভাগ নানা কারুকার্য্যে শোভিত। সম্মুখের দুইটি স্তম্ভের উপর দুইটি কাল্পনিক জীবের মূর্ত্তি ; তাহারই উপর, কতকটা বাহির হইয়া আসা কড়িকাঠের উদ্গতাংশে—খিলানের বহিঃপ্রান্ত নির্ভর করিতেছে। খণ্ডাংশে ভাগকরা, উপরের বারান্দা হইতে মেয়েরা উঁকি দিয়া দেখিতেছে। বারান্দায় পীল্‌পাদার আলিসা, মণ্ডপের দো-চালা কপালিকার (gableএর) অশ্বখুরাকৃতি খিলান, কার্ণিশের নীচে বিশাল একটি ঢেউখেলান মালা, আর তাহা স্থানে স্থানে ধরিয়া কয়েকটি নগ্ন পুরুষমূর্ত্তি। ব্র্যাকেটে সংযুক্ত সিংহমুখ অলঙ্কারগুলি পরবর্ত্তীকালে "কীর্ত্তিমুখে" পরিণত হইয়া থাকিবে (১)। দেবতাদিগের ন্যায় তাঁহার শিরোবেষ্টন শোভা, উপরে চারিদিক প্রভামণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ; তাঁহার আসন প্রস্ফুটিত পদ্মপ্রসূন। তাঁহার মাথার উপরেই প্রসাধক অলঙ্কার স্বরূপ দুইটি তরঙ্গায়িত সুদীর্ঘ পতাকা এবং পাক দিয়া জড়ানো বিস্তৃত মাল্যদাম। উপরের দুই কোণে বাঁধা ছাঁচের দুইটি মন্দির, তাহার ভিতর বুদ্ধদেব বসিয়া আছেন। অশ্বখুর খিলানের নিম্নে এবং দুই সীমানায় অবস্থিত এই দুইটি মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী ফলকাংশে কয়েকটি বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে, কোনটি বা উপবিষ্ট, কোনটি বা দণ্ডায়মান-ভাবে পরিকল্পিত। প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তিটির দুই পার্শ্বে উচ্চাসনে উপবিষ্ট দুইজন অনুচর—একজন খালি পায়ে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন—তাঁহার পদদ্বয় আড়াআড়িভাবে পদ্মের উপর সংস্থাপিত। বামদিকের মূর্ত্তিটির একপায়ে সাণ্ডাল (Sandal), অপর পদটি অনাবৃত ও পাদপীঠে সংলগ্ন। খোলা সাণ্ডাল নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি স্বীয় ললাটদেশ দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া আছেন, যেন কতই না চিন্তামগ্ন।

৯৩নং ফলকটির উপরে ছত্র ও নিম্নে একটি "আল" বা কীলক ছিল। ধর্ম্মব্যাখ্যানিরত বুদ্ধদেব পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি পদ্মের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার শিরোদেশের উপরিভাগে অমরার কুসুমসম্ভার। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন অনুচর দাঁড়াইয়া। আসন পদ্মের এক পার্শ্বে একজন নতজানু উপাসক, অপর পার্শ্বে জনৈকা নতজানু উপাসিকা। ইহারা যেন জগতের ভক্তিমগ্ন নরনারীর প্রতীক।

৯২নং চিত্রে পদ্মপুষ্পের নিম্নাংশে একজন নাগের দেহের ঊর্দ্ধাংশ ক্ষোদিত রহিয়াছে। এক পার্শ্বে টুলে বসিয়া একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি। এ খণ্ডিত ফলকটি মহাপ্রতিহার্য্য চিত্রেরই অঙ্গীভূত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। চিত্রের নিম্নে খরোষ্ঠী লিপিতে "সিহিলিকের সহচর সিংহ-মিত্রের দান" এই কথা লিখিত আছে।

৯৪নং ফলকটি অন্যান্য চিত্রের ন্যায় উঁচু করিয়া পাথরে খোদাই করা। গান্ধার শিল্প হইলেও এটি অনেক পরবর্ত্তী কালের। চিত্র-পীঠিকার মধ্যস্থলে উপবিষ্ট—বুদ্ধদেবের বাম দিকে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়—তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়—তাঁহার পরিচিতির চিহ্ন ভৃঙ্গার বা কমণ্ডলু হইতে। দক্ষিণ দিকের অনুচরটি অবলোকিতেশ্বর—তাঁহার হস্তস্থিত পুষ্পমাল্য তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। পেশোয়ার যাদুঘরে এরূপ মাল্যহস্ত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি আরও কয়েকটি রক্ষিত আছে। মৈত্রেয়ের কেশ ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। অবলোকিতেশ্বরের উষ্ণীষ একটি সূচাল রত্নাভরণে শোভিত।

৯৫নং চিত্রটি লাহোর যাদুঘরে রক্ষিত—একটি ক্ষোদিত চিত্রের ছাঁচ। ইহাতে মহাপ্রাতিহার্য্যের বিষয়বস্তু সবিস্তারে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

৯৬নং ফলক শ্রাবস্তীতে অনুষ্ঠিত "যমক প্রতিহার্য্য" বিষয়ক চিত্র। বুদ্ধের চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখার প্রভামণ্ডল ; আর তাঁহার পদতলে দেহ বিনির্গত জলস্রোত তরঙ্গায়িত। বুদ্ধের দুই পার্শ্বে চারিজন করিয়া উপাসক যুক্তকরে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৮৯নং চিত্রটি কাবুলের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। ইহার অনুরূপ আর কোনও পাথরে ক্ষোদাই চিত্র এ যাবৎ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার স্কন্ধ দেশ ও শিরোবেষ্টিত প্রভামণ্ডল হইতে অগ্নিশিখা বিনির্গত হইতেছে কিন্তু জল নিঃসারণের কোনও চিহ্ন নাই। ললিত-বিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদেব যখন প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন সেই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে আলোকপ্রভা বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। মহাবস্তু মতে শাক্যদিগের আমন্ত্রণে যখন তিনি কপিলবাস্তুতে আগমন করেন সেই সময়েও এইরূপ অলৌকিক দীপ্তি তাঁহার দেহ হইতে নিঃসারিত হয় কিন্তু এই অলৌকিক দৃশ্য যে শ্রাবস্তীর প্রতিহার্য্যমণ্ডপেই সমধিক দৃষ্ট হইয়াছিল দিব্যাবদান এই প্রবাদের সমর্থন করিতেছে। বুদ্ধের দুই পার্শ্বে যে দুইটি কমল মাটি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার একটির উপর দণ্ডায়মান দীপঙ্কর বুদ্ধ। দীপঙ্কর রহিয়াছেন বুদ্ধের বামপার্শ্বে—সুমেধ তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেছেন এবং

(১) "রূপম্" পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রচিত "কীর্ত্তিমুখ" বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (Rupam, No. 1, 1920, p. 19)

তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে আকাশ পথে উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। অপর যে বুদ্ধটি দক্ষিণ দিকে পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতে একটি ভিক্ষাপাত্র এবং বামপার্শ্বে একটি নগ্নশিশু, হয়তো ইহাতে বুদ্ধকে অঞ্জলি প্রদানের কাহিনী সূচিত হইয়াছে। মধ্যাবস্থিত বুদ্ধ দেবের প্রভামণ্ডলের শিরোভাগে দুইটি উড্ডীয়মান দেবমূর্তি ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

৯৭ হইতে ৯৯ ফলকে মহাপরিনির্ব্বাণের চিত্র। গান্ধার শিল্পে ও তৎপরবর্ত্তী যুগের শিল্প-ধারায়—এ বিষয়টি বহুবার বিভিন্ন ভাস্কর্য্য নিদর্শনে স্থান লাভ করিয়াছে। চিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক অঙ্গগুলি নিয়ে বর্ণিত হইল। বুদ্ধদেবের দেহ একখানি 'চারপাই'য়ের উপর শায়িত। তাঁহার মস্তক উপাধানে রক্ষিত। দর্শকের দৃষ্টিতে দেহভার বামাঙ্গে ন্যস্ত। বুদ্ধের শিষ্যবর্গ কুশীনগরের মল্লগণ এবং সমাগত দেববৃন্দ চারিদিক বেষ্টন করিয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন। উৎকীর্ণ দুইটি বৃক্ষ স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল দুইটি শালবৃক্ষের স্থানে। এই স্থানটি প্রাচীন কুশীনগরের অন্তর্গত। কুশীনগরের বর্ত্তমান নাম কাশিয়া। উহা যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত।

৯৯নং প্রস্তর-ফলকে মহাপরিনির্ব্বাণের প্রতিকৃতি বিস্তারিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ফলকের মধ্যস্থলে বুদ্ধের দেহ একখানি 'খাটিয়া' বা 'চারপাই'য়ে রক্ষিত। একটি শালবৃক্ষ রহিয়াছে তাঁহার মাথার দিকে, আর একটি পায়ের দিকে। চিত্রের শিরোভাগে উড্ডীয়মান দেবতাসমূহ। নিম্নের দুই সারিতে রাজোচিত বেশধারী ব্যক্তি—সম্ভবতঃ ইঁহারা মল্লদিগের নায়ক বা প্রধান স্থানীয়। ইঁহাদের কেহ কেহ বা শোকপ্রকাশ করিতেছেন, কেহ কেহ বা বুদ্ধের দেহের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। বৃক্ষ হইতে বহির্গত দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্ভবতঃ বনদেবী হইবেন। যে শ্রমণটি চামর হস্তে বুদ্ধের শিরোদেশের নিতান্ত সান্নিধ্যেই অবস্থিত, মনে হয় তিনি আনন্দ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। বামদিকের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া যে নগ্ন মূর্ত্তিটি দাঁড়াইয়া তিনি জনৈক আজীবক সাধু বলিয়াই অনুমান হয়। ইহার পরেই দণ্ডধারী যে শ্রমণ দণ্ডায়মান, তিনি সম্ভবতঃ বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য মহাকাশ্যপ। মহাকাশ্যপ কোনও আজীবিক সাধুর মুখে সংবাদ পাইয়া বুদ্ধের মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের পায়ের নিকট আরও কয়টি শোকোচ্ছন্ন শ্রমণ দাঁড়াইয়া। 'চারপাই'য়ের পার্শ্বে বজ্রপাণি শোকোচ্ছাসে অভিভূত হইয়া যেন ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতেছেন। বজ্রপাণির পরেই ধ্যানমগ্ন একব্যক্তি যোগাসনে উপবিষ্ট। অনুমান হয় ইনি বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্র। ইঁহার ও বজ্রপাণির মাঝখানে তিনটি দণ্ড 'ত্রিপদী'র (tripod) আকারে মাটিতে পোঁতা রহিয়াছে। এই 'ত্রিপদী' হইতে একটি জলপাত্র ঝুলিতেছে। হয় তো এই জলপাত্র সুভদ্রেরই হইবে। স্বর্গতঃ ডাঃ ব্লকের (Bloch) মতে সন্নিহিত এই তিনটি দণ্ডে সুভদ্র যে 'ত্রিদণ্ডিক' সাধু ছিলেন ইহাই সূচিত হইয়াছে। আধুনিক 'ত্রিদণ্ডী' স্বামীদিগকে কিন্তু তিনটি দণ্ড হাতে করিয়া লইয়া যাইতে বড় দেখা যায় না।

৯৭ ও ৯৮নং ক্ষোদিত চিত্রের বিষয়-বস্তু একই ; তবে শিল্পী তাঁহার কাজ কতক সংক্ষেপে সারিয়াছেন। উভয় চিত্রেই দেখা যায় একজন শ্রমণের কাঁধে দণ্ড এবং সেই দণ্ডের পিছনে একটি বোঁচকা ঝুলানো। অনুমিত হয় যে, এই শ্রমণ মহাকাশ্যপ। তিনি সংবাদ পাইয়া শেষ সময়ে বুদ্ধের দর্শন লাভ করিবার জন্য ত্বরিতপদে রাজগৃহ হইতে কুশীনগরে আসিয়া উপস্থিত হন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই। তাঁহার 'লাঠী' ও তৎসংলগ্ন 'গাঁঠরী' হইতে তিনি যে সত্তই পথ চলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহাই বুঝানো হইয়াছে। ৯৭নং চিত্রে একটি উপবিষ্ট ধ্যানরত মূর্ত্তিও দেখা যায়। ৯৮ নং চিত্রে দুইটির স্থানে তিনটি শালবৃক্ষ খোদিত। ১০১ নং চিত্রে দেখিতে পাই শালবৃক্ষদ্বয়ের নিকটেই শবাধার রক্ষিত, নিকটে পাঁচজন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বজ্রপাণি, এক ব্যক্তি, সম্ভবতঃ কুশীনগরের মল্লদি... অন্য তিনজন শ্রমণ। একজন শ্রমণের ... মহাকাশ্যপ হইবেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থোক্ত বর্ণনা মতে ... করিলে তাঁহার শব শবাধারে রক্ষিত এবং রাজচক্রবর্ত্তিদে... সহিত চিতায় দগ্ধ করা হয়।

১০০ নং চিত্র দুইটি ফলকে বিভক্ত। দক্ষিণ দিকের ফলকে ... পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ বুদ্ধের মৃত্যুকালীন চিত্র এবং বামদিকের ফলকে তাঁহার দেহ চিতায় দাহ করার চিত্র। চিতা পার্শ্বে অবস্থিত মল্লপ্রধানগণ দুগ্ধ ঢালিয়া চিতা নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যায় দীর্ঘ যষ্টির অগ্রভাগে নিবদ্ধ পাত্র হইতে তাঁহারা দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছেন।

১০২ হইতে ১০৫ নং চিত্র বুদ্ধের দেহাবশেষ বণ্টনের চিত্র। নির্ব্বাপিত চিতা হইতে বুদ্ধের দেহাবশেষ সংগৃহীত হইলে পর বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলি ও পাবার মল্লেরা, সর্ব্বসমেত সাতটি জাতি বা কৌম (tribes) নিজ নিজ দাবী লইয়া উপস্থিত হ'ন। সকলেরই ইচ্ছা যে ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ লইয়া তাহার উপর ধাতুগর্ভ স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন। 'ধাতু' বা দেহপদার্থ কুশীনগরের মল্লদিগের অধিকারে থাকায় তাঁহারা সুবিধা পাইয়া উহা বণ্টন করিতে অস্বীকার করেন, ফলে এই মল্লদিগের বিরুদ্ধে সপ্তজাতি একত্রিত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। দেহাবশেষ লইয়া শুধু কাড়াকাড়ি নহে—যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার উপক্রম হয়। দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ মল্লদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন এবং নিজে মধ্যস্থ হইয়া দেহাবশেষ বণ্টনের ভার গ্রহণ করেন। মল্লরা ইহাতে সম্মত হইলে শান্তিপূর্ণভাবে বণ্টনকার্য্য সমাধা হয়। ইহার পর স্তূপ ও চৈত্যাদি নির্ম্মাণার্থ সকলে নিজ নিজ অংশ লইয়া যান। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে কলিকাতা যাদুঘরের ভারহুত গেলারীর ঠিক দক্ষিণ দিকের হলঘরে তত্রস্থ শো দত্ত লিপি প্রভৃতির সহিত কাচমণ্ডিত শো-কেসে (show-case এ) একটি ষ্টিয়াটাইট প্রস্তরের সুদৃশ্য আধার সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহারই অভ্যন্তরে একসময়ে বুদ্ধদেবের দেহধাতুর কোনও অংশ অর্চ্চনার্থ রক্ষিত হইয়াছিল। এই আধারটি খৃঃ পূঃ ২য় হইতে ১ম শতাব্দীর মধ্যে সম্ভবতঃ রাজা মিলিন্দের (মেনান্দারের) রাজত্ব কালে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে উৎসর্গীকৃত হয়। আধার মধ্যে দুইখানি খরোষ্ঠী লিপি পাওয়া যায়। একখানিতে বিয়ক মিত্রের নামও ১৪ই কার্ত্তিকের উল্লেখ আছে—বর্ষের উল্লেখ যেখানে ছিল সে অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপরটির তারিখ ও ১৫ই কার্ত্তিক এবং উহা রাজা মিলিন্দের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে উৎকীর্ণ। আধারটি পাওয়া গিয়াছিল উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহির্দ্দেশে কাফিরিস্তান ও সোয়াতের মধ্যবর্ত্তী বাজাউর উপত্যকায়। পেশোয়ারের মির্জা আফজল সাহ ভারহুত (Bharhut) সরকারকে উহা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

১০২ নং চিত্র দুইখণ্ডে বিভক্ত। দক্ষিণের খণ্ডে বিপ্র দ্রোণ আধুনিক টেবিলের ন্যায় কোনও পীঠিকার সম্মুখে বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর আটটি বিভিন্নখণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। এই দেহাবশেষ খণ্ডগুলির সান্নিধ্যেই রাজপরিচ্ছদে ভূষিত দুইজন মল্ল প্রধান দাঁড়াইয়া। বামদিকের ফলকে এই আট অংশের একটি অংশ যে অশ্বপৃষ্ঠে বাহিত হইতেছে তাহাই দেখান হইয়াছে। চিত্রে এই অশ্বটি ব্যতীত অপর একটি অশ্বের আকৃতির ও কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান।

১০৩ নং প্রস্তরখণ্ডের একটি ফলকে অশ্বপৃষ্ঠে দেহধাতু বাহিত হইতেছে। চিত্র রহিয়াছে, অপর ফলকে দেখানো হইয়াছে স্তূপ-পূজা। ... হয়েছে। চিত্রে স্থান পাইয়াছে তাহা যে ধাতু-গর্ভ স্তূপ... নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১০৪ নং চিত্রের দক্ষিণের ... করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ধাতুখণ্ডগুলি নীত হইতেছে। ১০...

...কটি রত্নখচিত আধার কৃত্রিপৃষ্ঠে ...দিগু মাল্যাদি শোভিত, দেহাবশেষ ...যুক্ত ছত্রতলে সিংহাসনের উপর রক্ষিত। ...ও দাগ পড়িতেছে। সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইটি কলিকাতা যাদুঘর...।

দ্বারের সম্মুখইতে ১০৯ নং ফলক ত্রিরত্ন উপাসনার চিত্র। ১০৭ নং চিত্রে ...পুরুষমূর্ত্তি অর্দ্ধনতজানু অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার একটি জানু নত এবং অপরটি কতকাংশে উত্তোলিত। তিনি মাথায় করিয়া তিনটি চক্রের সমাবেশে গঠিত "ত্রিরত্ন" চিহ্ন বহন করিতেছেন। কালের ধ্বংস লীলায় শুধু ত্রিরত্নের নিম্নার্দ্ধভাগের চক্রটিই চিত্রে বিদ্যমান। এই ত্রিরত্ন চিহ্নের উত্তর পার্শ্বে কয়েকজন শ্রমণ উপাসনার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া।

১০৮ নং চিত্রেও দেখা যায় যে তিনটি পরস্পর সম্বদ্ধ চক্র ত্রিরত্নের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরের চক্রদুইটি পাশাপাশি সাজানো এবং নিম্নের চক্রটি উপরের দুইটির সহিত একত্র গ্রথিত। তিনটি এই ভাবে সজ্জিত হইয়া ত্রিশূলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধসমাজে ইহাই ত্রিরত্নদ্যোতক চিহ্ন বা প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সমবায় জ্ঞাপন করিত। প্রসাধক স্থাপত্য অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত একটি উদ্গত স্তম্ভের উর্দ্ধাংশে উঁচু করিয়া খোদাইকরা একটি মূর্ত্তি ত্রিরত্নচিহ্ন উচ্চে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উদ্গত স্তম্ভের দুই দিকে মুণ্ডিতশির শ্রমণ এবং বেশভূষাদৃষ্টে যেরূপ মনে হয়, কয়েকজন রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি; সর্ব্ব নিম্নে দুইটি পদ-চিহ্ন।

১০৯ নং চিত্রে একটি ত্রি-পত্র খিলানের (trefoil aroh) তলায় ত্রিরত্নের চক্রত্রয় উপবিষ্ট দুইটি মৃগের দ্বারা চিহ্নিত পীঠিকাবৎ পাদভূমির উপর সংস্থস্ত। মৃগদ্বয় যেন স্মরণ করাইয়া দেয়, মৃগদাবে প্রথম প্রচারিত নীতিধর্ম্মপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্মের নূতন ভাবধারার কি এক অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিণতি ঘটিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ এখনও দেব বিগ্রহে পরিণত হন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহাবশেষ ও ত্রিরত্নের পূজায় ক্রমোদ্বর্ত্তনের এই পথই সূচিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎপর্ণা

কুমারী লীলা মুখোপাধ্যায়

বাহিরে জোছনা রাতি জাগে মধুছন্দা,
পুঞ্জিত রজত ধারা ঝরে পড়ে অঙ্গে।
আঁখি মেলি স্রোতধীরে ফুল নিশিগন্ধা
...চাঁদ ভাসে পুলক তরঙ্গে॥

জল ভরা কুলুকুলু বয়ে চলে ঝর্ণা,
জোছনার আলোতে তার সারা দেহ শুভ্র
উপলেতে ঝলসিছে স্বর্ণের বর্ণা
আলো ভরা সব ধরা অরূপ অপূর্ব্ব॥

আঁধারের এতটুকু কোথা নাই গন্ধ,
অপরূপ সব কিছু মধুরের স্পর্শে।
জাগে নদী নর্ত্তকীর নূপুরের ছন্দ
প্রিয়তম উদ্দেশে বয়ে চলে হর্ষে॥

...ঐ দেখা যায় চন্দ্র,
সবুজ তৃণের বুকে আলোকের বন্যা।
সাথী হারা কাঁদে কুহু অধীর অতন্দ্র,
বিরহের বেদনায় উথলিল ঝর্ণা॥

দোলন চাঁপার প্রাণ চন্দ্রের স্পর্শে,
পুলকেতে ঢেলে দেয় মধু ভরা গন্ধ।
প্রিয় তার দূর হতে মুখ শশী দর্শে,
ফুল বুকে আজি তাই উথলে আনন্দ॥

আনমনা রূপসী কে এ গভীর রাত্রে
বসে আছ নদীকূলে তৃণে রাখি অঙ্গ।
রূপ সুধা টলমল তব দেহ পাত্রে,
এলে হেথা কার লাগি, চাহি কার সঙ্গ॥

অঙ্গের বর্ণেতে তার হার মানে ফুল
অঙ্গুলি হেরিয়া চাঁপা কলি পায় লজ্জা।
সারাদেহে খেলা করে তটিনীর ছন্দ
মেঘেতে লুকায় চাঁদ দেখি রূপসজ্জা॥

কালো মেঘ সরে যায় হেরি ঘন কুন্তল,
নিরুপায় চাঁদ ঢালে আলোকের ঝর্ণা।
তৃণ 'পরে খসে পড়ে এলায়িত অঞ্চল,
কেগো তুমি অপরূপ বিদ্যুৎপর্ণা?

পুষ্পের আভরণে হাসে চারু অঙ্গ
কার তরে হেন রূপে সাজিয়াছ তন্বী?
কৃতার্থ করিবে কারে দিয়া সুখ সঙ্গ?
কোন তুলনায় তব রূপরাশি বর্ণি'?

কার কোলে লুটাইবে ঐ তনু বল্লী?
প্রাণ তুমি দিয়েছে গো কারে করি শূন্য?
কে করিবে পান তব দেহ মধু মল্লী?
আপনারে দিয়ে কারে করেছ গো ধন্য?

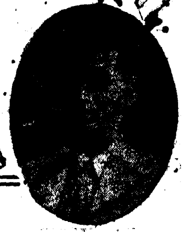
আর কত রবে একা? চাঁদ যায় অস্তে
ঝরে পড়ে ফুলদল জাগরণ ক্লান্ত।
আলো রেখা ম্লান চোখে চায় তৃণশস্পে,
জলভরে এল ধীরে নয়নের প্রান্ত॥

ঐ দূরে শুকতারা ছল ছল চক্ষে,
চোখ মেলে দেখ ওগো বিদ্যুৎপর্ণা।
হতাশায় বেদনা কি গুমরিছে চক্ষে?
কপোল বহিয়া নামে অশ্রুর ঝর্ণা॥

যারে চাহি সারারাতি লাজারুণ চক্ষে,
লয়ে মালা বসেছিলে দিতে তারে তূর্ণ।
অকরুণ অবহেলা ঢালি নিজ চক্ষে,
রূপসীর গর্ব্ব সে করে গেল চূর্ণ॥







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

বাইটন কাপ ঃ

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ বৎসরের মত হকি মরসুমও শেষ হ'ল। বাঙ্গলা দেশের হকি প্রতিযোগিতায় বাইটন কাপের আকর্ষণ বেশী। কেবল বাঙ্গালা দেশের নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শক্তিশালী দল এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বৎসর যোগদান করে হকি খেলায় নিজ নিজ দলের শক্তির পরিচয় দিয়ে আসছে। বাইটন কাপ খেলার আরম্ভ ১৮৯৫ সালে। নেভাল ভি এ সি বাইটন কাপ বিজয়ের সর্ব্বপ্রথম গৌরবলাভ করে। ক্যালকাটা কাষ্টমস সব থেকে বেশী ১১বার এই কাপ বিজয়ী হয়েছে।

এবৎসরের প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অপরদিক থেকে রেঞ্জার্স হকি খেলার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী কাষ্টমস দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে।

ফাইনাল খেলায় জয়লাভের জন্যে উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল কিন্তু খেলাটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফাইনাল খেলার উপযোগী হয়নি। এবৎসরের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির দরুণ বাঙ্গলার বাইরের শক্তিশালী হকি দল খেলায় যোগদান করেনি, ফলে প্রতিযোগিতার আকর্ষণও ক্রীড়ামোদীদের কাছে খুব বেশী ছিল না।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্দ্ধে রেঞ্জার্স দল অগ্রগামী থাকে। খেলা আরম্ভের চার মিনিটে নিস একটি বল মা'লে রেলদলের



পেন এণ্ড ইঙ্ক ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলী এবং প্রতিযোগিগণ

২-০ গোলে বি এন রেলদলকে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া পূর্ব্বে ১৮৯৯, ১৯১১, ১৯১৩, ১৯১৫, ১৯১৭ এবং ১৯৩৪ সালের ফাইনালেও বিজয়ী হয়েছিল। ১৮৯৫-৯৬ সালের প্রতিযোগিতার প্রথম দু'বছরেও এদেরই বিজয়ী বলা যায়। তখন রেঞ্জার্সের ক্লাবের নাম ছিল 'Naval Volunteers.' বি এন রেলদল ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সাল এই দু'বছর কাপ বিজয়ী হয়েছে এবং ১৯৩১-৩২, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ সালের ফাইনালে তারা প্রত্যেকবারই পরাজিত হয়েছে হকি খেলার দুর্দ্ধর্ষ ক্যালকাটা কাষ্টমস দলের কাছে। রেলদল এবারের সেমি-ফাইনালে শক্তিশালী মিলিটারী মেডিকেলসকে পরাজিত করে গোলরক্ষক ক্লার্ক তা প্রতিরোধ করেন কিন্তু সেই বলটিকে মেরে টৌভী দলের প্রথম গোল দেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার ২০ মিনিটে রবার্টসন গোলরক্ষক ক্লার্ককে সম্পূর্ণ পরাভূত ক'রে দলের ২-০ গোলটি করেন। খেলা শেষের দশ মিনিট পূর্ব্বে রেলদলের খেলা-বিজয়ী দল অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। কিন্তু তারা একাধিক সট্ কর্ণার পেয়েও গোলের অপূর্ব্ব সুযোগ নষ্ট করে। ঐদিন রেলদলের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না বলা যায়। কয়েকবার অতি অল্পের জন্য রেঞ্জার্স দল পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। রেঞ্জার্স দলের রক্ষণভাগের খেলার জন্যই তারা বিজয়ী হয়েছে। এই বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দেরই। রেলদলের

আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা অযথা সময় নষ্ট করে গোলের সুযোগ হারিয়েছে এবং দুর্বল বল সর্টের জন্য তারা বহুবার নিশ্চিত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মোটের উপর রেঞ্জার্স দল ঐদিন তাদের শক্তিশালী সেণ্টার ফরওয়ার্ড 'ববি লামসডনের' অনুপস্থিতিতেও খেলায় জয়লাভ করে কাপ বিজয়ের সম্মান পেয়েছে।

জো লুইয়ের ত্যাগ স্বীকার ঃ

পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই সম্প্রতি আমেরিকার সৈন্যদলে যোগদান করে অদ্ভুত ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অতি অল্প দিনে তিনি এপর্য্যন্ত ৩০০০০০ পাউণ্ডের উপর উপার্জন করেছেন। আয়ের গড়পড়তা হিসাব নিয়ে দেখা গেছে প্রতি সেকেণ্ডে তাঁর আয় পাঁচশত পাউণ্ড। এই প্রচুর উপার্জনের মোহ ত্যাগ করে তিনি মাত্র ২১ ডলার পারিশ্রমিকে সৈন্যদলে যোগদান করেছেন। পৃথিবীর এই বিখ্যাত মুষ্টি যোদ্ধার বাল্যজীবন অতি দুঃখপূর্ণ। জো লুই তাঁর এক ভগ্নীর দোকানের মেজে পরিষ্কার করে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ৫ পেন্স উপার্জ্জন করে বক্সিং শিক্ষার খরচ চালাতেন। পরে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং যশের অধিকারী হয়েও জো লুই কিন্তু একটু ভিন্ন ধরণের। অর্থ এবং খ্যাতি তাঁর মনের মধ্যের মানুষটির কোন পরিবর্ত্তন আনতে পারেনি। জো লুইয়ের ত্যাগ আজ ক্রীড়াজগতের খেলোয়াড়দেরই কেবল আদর্শ নয় পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারীর।

সাংবাদিকগণের এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ঃ

কয়েক বছর পূর্ব্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রের খেলাধূলা বিভাগের প্রতিনিধিদের চেষ্টায় 'প্রেস ক্লাব' নামে একটি সাংবাদিকদের খেলাধূলার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ঐ ক্লাবটি স্থানীয় ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে খেলায় যোগদান করে সাংবাদিক মহলে খেলাধূলা চর্চ্চার উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল। এই চেষ্টার ফলেই ঐ ক্লাবের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে কলকাতার সংবাদপত্রের খেলাধূলা বিভাগের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত চেষ্টায় 'পেন এণ্ড ইঙ্ক ক্লাব' এই নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এই ক্লাবের প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ যোগদান করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধি মুকুল দত্ত ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসীপ পেয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

টেবিল টেনিস ঃ

গত এপ্রিল মাসে আজিমগঞ্জে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে পর পর দুটি টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়েছে। জৈন স্পোর্টিং ক্লাব দ্বারা প্রথমটি এবং ওয়াই-এম্-এ-এর দ্বারা দ্বিতীয়টি পরিচালিত হয়েছিল। উভয় ক্লাবই কলিকাতার বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দুটি প্রতিযোগিতাই বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছিল। প্রথমটির ফাইনালে সভাপতি হয়েছিলেন ওখানকার জনপ্রিয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিরণলাল মুখার্জ্জি এবং দ্বিতীয়টির সভাপতিত্ব করেছিলেন বেঙ্গল টেবিল টেনিস এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী; উভয়েইবিশেষ আগ্রহের সহিত খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছিলেন।



কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমটিতে বিজয়ী হয়েছেন প্রফুল্ল মিত্র এবং রাণার্স আপ হয়েছেন কমল ব্যানার্জ্জি এবং দ্বিতীয়টিতে (আজিমগঞ্জ চ্যাম্পিয়নসিপে) বিজয়ী হয়েছেন কমল ব্যানার্জ্জী এবং রাণার্স-আপ হয়েছেন অনিল সোম। দ্বিতীয়টিতে বিজয়ী কমল ব্যানার্জ্জী সোনার কাপ ও সোনার মেডেল ও বিজিত অনিল সোম হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত কাপ ও স্বর্ণখচিত মেডেল পেয়েছেন।

ডি এন গুঁই স্মৃতি কাপ ঃ

পরলোকগত ডি এন গুঁই মোহনবাগানের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষা কল্পে মোহনবাগান ক্লাব একটি কাপ প্রদান করেছে। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালের দুটি বিজিত দলের মধ্যে একটি খেলা হয়ে যে দল বিজয়ী হবে তারা এই কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করবে। বর্ত্তমান বৎসরে বাইটন কাপের সেমি-ফাইনালে বিজিত কাষ্টমস দল ৩-১ গোলে মিলিটারী মেডিকেলস দলকে পরাজিত করে সর্ব্বপ্রথম এই কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

স্বর্গীয় ডি এন গুই, বাঙ্গলার ক্রীড়া জগতে একজন বিশিষ্টকর্মী ছিলেন, তাঁর স্মৃতিরক্ষার এই ব্যবস্থার জন্ম আমরা মোহনবাগান ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফুটবল ঃ

এক বছর পর কলকাতার মাঠে আবার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমানে যে গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দিন যাপন করছি তাতে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল এ বছরের ফুটবল মরসুম বুঝি আর আরম্ভ হবে না। যুদ্ধ বাঙ্গলার পূর্ব্ব সিংহদ্বারে হানা দিয়েছে কলকাতার মত সহর দিনদিন বিপদজনক হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় স্থানীয় খেলাধূলা স্বাভাবিকভাবে পরিচালন করার আশা করা যায় না। কলকাতার ফুটবল মাঠগুলি বিপদজনক এলাকার মধ্যে অবস্থান করায় বেশীর ভাগ ক্রীড়ামোদীই খেলার মাঠে উপস্থিত হ'য়ে বিপদের ঝুঁকি নিবেন বলে মনে হয় না। দর্শকবৃন্দ এবং খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পরিচালকমণ্ডলী যে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছিলেন তার কোন ব্যবস্থা পর্য্যন্ত এখনও আমরা দেখছি না। অথচ ইতিমধ্যে মাঠে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আশ্রয়ের সন্ধান লওয়া বিপদের সময় কতখানি যে অসম্ভব ব্যাপার তা পরিচালকমণ্ডলী কেন যে উপলব্ধি করতে পারছেন না তা আমরা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি। ফুটবল খেলার মাঠে উন্মুক্ত পরিখাগুলি খুব বেশী নিরাপদ নয় এবং মাঠের দর্শকদের পক্ষে তাদের সংখ্যা খুবই কম। যদি একদিন বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে মাঠের দর্শকেরা নিজের নিজের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে কি অবস্থার সৃষ্টি করবেন তা সহজেই অনুমেয়। দর্শকদের অর্থে যাঁরা আজ লাভবান হয়েছেন তাঁরা এই সময়ে দর্শকদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য কিঞ্চিত করুণার পরিচয় দিবেন আশা করি। বিপদ সময়ে প্রাচীর-বেষ্টিত মাঠ থেকে অতি অল্প সময়ে লোক অপসারণের জন্য আরও প্রশস্ত বহির্গমনের পথও প্রয়োজন। আমরা এখনও আশা করি আই এফ এ-এর এবিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য রয়েছে। আমাদের দর্শকদেরও প্রতি অনুরোধ, বিপদ সময়ে তাঁরা যেন কর্ত্তব্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর কাজে এবং নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা না আনেন।

ফুটবল খেলায় রেফারী সমস্যা ঃ

গত কয়েকবছর ধরে ফুটবল খেলার পরিচালনায় প্রথম শ্রেণীর রেফারীর একান্ত অভাব দেখা গেছে। একই রেফারীর মারাত্মক ভুল ত্রুটীর পরিচয় পেয়েও তাঁকে প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনার ভার দিতে পরিচালকমণ্ডলী দ্বিধাবোধ করেন নি। ফলে দর্শক এবং সমর্থকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হ'য়ে যেভাবে মাঠের স্বাভাবিক হাওয়া নষ্ট হ'ত তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করে বরং কর্ত্তৃপক্ষ নীরব থাকতেন। এ বিষয়ে আমরা একাধিক সংবাদপত্র কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন আনতে পারিনি। মারাত্মক ভুলত্রুটীর জন্য দায়ী রেফারীরা প্রহার পর্য্যন্ত খেয়েছেন। মাঠের স্বাভাবিক হাওয়া নষ্ট হওয়ার ফলে নির্দ্দোষ রেফারী পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে তীব্র মন্তব্য এবং কটু সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। আমাদের বিশ্বাস উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড়দের হাতে খেলা পরিচালনার ভার দিলে খেলার মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তবে একথা সত্য কোন দেশেই একবারে ত্রুটীবিচ্যুতিহীন রেফারিং সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় বলেই আমাদের দেশে মারাত্মক ত্রুটী বিচ্যুতিকেও উপেক্ষণীয় বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করি না। বাঙ্গালা দেশের ফুটবল খেলা যতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ততখানি অন্য কোন প্রদেশে করেনি। দর্শকেরা ফুটবল মরসুমে যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না। এই অর্থ থেকে রেফারীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা এবং দর্শকদের সুখ সুবিধার উপর দৃষ্টি রাখা আই এফ এর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশে ভিন্ন ব্যবস্থা। আই এফ এর নিজস্ব কোন খেলার মাঠ নেই এবং এখানের খেলার মাঠের দর্শনীর আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার তাঁদের ক্ষমতা কোথায়? খেলার মাঠগুলিকে কোন একজন ব্যবসাদার আজ দীর্ঘদিন ধরে লীজ নিয়েছেন। লাভের মোটা অংশ তাঁদেরই পকেটে যায়।

বাঙ্গালা দেশের দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র, বর্ষার প্রবল বারিপাত, কালবৈশাখীর রুদ্র ঝটিকার হাত থেকে খেলার মাঠে জামা কাপড় রক্ষা করার মত একমাত্র সহায় বগলের ছাতা। প্রাণের মায়া দর্শকেরা অনেকপূর্ব্বেই ঘোড়-শওয়ারের পায়ের তলায় সমর্পণ করে দেন। এই সমস্যা আমাদের চিরকালের। আই এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে স্বজাতীয়রা প্রবেশ করেও কিছু করতে পারেননি। আজ আমরাও এমন দর্শক যে, মান সম্মানের বালাই আমাদের এতটুকু নেই, পদাঘাত খেয়ে কোন প্রকারে মাঠের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেই জয়লাভের প্রথম অধ্যায়ে যেন পৌঁছে যাই।

বর্ত্তমানে আই এফ এ রেফারীদের যাতায়াতের ভাড়া কমিয়ে দিয়ে আর এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। পূর্ব্বে খেলা পরিচালনার জন্য রেফারীদের প্রতি খেলায় যাতায়াতের ভাড়া স্বরূপ ২৲ টাকার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে আই এফ এ আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য যাতায়াতের ভাড়া ১৲ টাকা ধার্য্য করেছেন। যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সকল জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতায়াতের ভাড়াও। এই অবস্থায় রেফারীরা আশা করেছিলেন বর্ত্তমান বৎসরে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে তাঁরা কিছু বেশী সুবিধা পাবেন। কিন্তু এই ছাঁটাই ব্যবস্থার ফলে খেলা পরিচালনা ব্যাপারে রেফারীদের কি পরিমাণ আগ্রহ থাকবে তা চিন্তার বিষয়। এত অল্প হারে রেফারী নিয়োগের ব্যবস্থাতে রেফারীদের সম্মানকেও যথেষ্ট খর্ব্ব করা হয়েছে। আই এফ এ যদি তাঁদের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা রেফারী এসোসিয়েশনকে জানিয়ে এই ছাঁটাই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতেন তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রেফারীরা এই ব্যবস্থাকে সহজভাবেই মেনে নিতেন, এমন কি কোন কোন রেফারী কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ না করে খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয়ও দিতেন। মানুষের যোগ্যতা আমাদের দেশে যতখানি উপেক্ষিত হয় অন্য দেশে ততখানি হয় না এর মূলে যত কিছু কারণ থাকুক না কেন আমাদের মধ্যে প্রবৃত্তির [illegible] অভাবই প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহের [illegible]

নেই। আমরা আশা করি আই এফ এ এবিষয়ে নিজেদের ব্যবস্থাকে বুলবজ্র রেখে গুণগ্রাহিতার অভাবের পরিচয় দিবেন না।

লক্ষ্মীবিলাস হকি ফাইনাল ঃ

মোহনবাগান ক্লাব লক্ষ্মীবিলাস হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহমেডান দলকে পরাজিত করে এই সর্ব্বপ্রথম কাপ বিজয়ের সুনাম লাভ করেছে। ১৯২৩ সালের ফাইনালে মোহনবাগান দল ঝান্সি হিরোজ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্য্যন্ত খেলায় পরাজয় স্বীকার করে।

প্রদর্শনী হকি খেলা ঃ

বাঙ্গলা দল বনাম বি এন রেলদলের এক প্রদর্শনী হকি খেলায় বাঙ্গলা দল ২-১ গোলে বিজয়ী হয়। প্রদর্শনী খেলাটি আশানুরূপ উচ্চাঙ্গের হয় নি। খেলার আরম্ভেই বাঙ্গলা দলের চরঞ্জিৎ রায় দলের প্রথম গোল করেন। প্রথমার্দ্ধে উভয় পক্ষে আর কোন গোল হয় না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার প্রথম দিকে সি ট্যাপসেল বাঙ্গলা দলের গোলটি পরিশোধ করেন। খেলার শেষ সময়ে চরঞ্জিৎ রায় দলের দ্বিতীয় গোলটি দিয়ে দলকে ২-১ গোলে বিজয়ী করেন। বি এন রেল দল পরাজিত হলেও তাদের খেলা বাঙ্গলা দল অপেক্ষা ভাল হয়েছিল। অধিকাংশ সময়েই তাদের মাঠে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশের হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অন্য দেশের তুলনায় যে নিম্নস্তরের তা আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি খেলাতে প্রমাণিত হয়ে আসছে। বাঙ্গলার হকি ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করতে হলে অনুশীলনের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী হকি খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে যতখানি অমনোযোগী দেখা যায় ততখানি দেখা যায় পরিচালকমণ্ডলীকেও। আজ বাঙ্গলার এই বাছাই দলে মাত্র একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের স্থান।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "গৃহ ও গ্রহ"—২॥০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহনের অজ্ঞাতবাস"—২৲
শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "পঁচিশে বৈশাখ"—১৲
লেডি ডাক্তার প্রণীত "কাম ও যৌন-জীবন"—১৲
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাণুর কথামালা"—২॥০
শ্রীপঞ্চুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মিলন-মন্ত্র"—১৷০
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "স্রোতের ফুল"—১৷০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "মুখ আর মুখোস"—॥০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাঙলা ও বাঙালী"—২৲
নির্মল দাশ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বহ্নি-বন্যা"—১॥০
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত "অপসরণ"—২॥০
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত এম-এ প্রণীত নাটক "অলকনন্দা"—১৲
শ্রীগোপীনাথ নন্দী প্রণীত "ঝরণা কলম"—১॥০
শ্রীসুপ্রভা দেবী প্রণীত "সন্ধ্যারাগ"—২৲
শ্রীজ্যোতি সেন প্রণীত উপন্যাস "নারী"—১৷৮০
শ্রীনির্ম্মল সুর প্রণীত উপন্যাস "প্রতিভার অপমৃত্যু"—১॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত